শক্তিপদ রাজগুরু

সেরা দশটি উপন্যাস

সেরা দশটি উপন্যাস

শক্তিপদ রাজগুরু
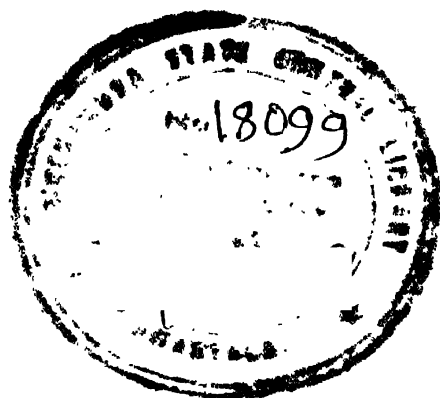
যূথিকা বুক স্টল
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩

Sera Dasti Upanyas
Best of Ten Novels
By Saktipada Rajguru

প্রকাশক
সত্যবান রায়
সত্যনারায়ণ প্রকাশন
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

বর্ণবিন্যাস
অ্যাড ওয়েভ কমিউনিকেশন

মুদ্রণ
নিউ বঙ্গশ্রী প্রেস
১২/২, মদন মিত্র লেন
কলকাতা — ৭০০ ০০৬

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

শ্রী শ্রী হরি সহায়

শক্তিপদ রাজগুরু বাংলা সাহিত্যের জগতে এক সুপরিচিত নাম। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি নিরলস ভাবে সাহিত্যসাধনা করে এসেছেন। জীবনকে—মানুষকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তারজন্য তিনি কখনও সুন্দরবনের গহনে, কখনও সারান্দার দুর্গম বনপাহাড়ে কখনও তরাই-এর অরণ্যবেষ্টিত চা বাগানে, কখনও কয়লাখনির অন্ধকার অতলে, দেশ দেশান্তরে বিচরণ করেছেন। সেই বিভিন্ন জীবন চর্যা, তাদের সমস্যা, সেই বহু বিচিত্র মানুষের কথাই বলেছেন তার সাহিত্যে। তাই তার সাহিত্য হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত—সজীব-বর্ণময়।

এই বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তার সাহিত্যকে বিশেষ মাত্রায় সংস্থাপিত করেছে। তাই সেই সব কাহিনী অবলম্বনেই গড়ে উঠেছে ''মেঘে ঢাকা তারা'', ''কুমারীমন'', ''অমানুষ'', ''অনুসন্ধান'', ''অন্যায়-অবিচারের'', মত বহু সার্থক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছায়াছবি।

বহু বিচিত্র পটভূমিকায় কখনও অরণ্য, কখনও চা বাগান, কখনও গ্রাম্য জীবন, কখনও শহর জীবনের বহু সমস্যা, সুখ-দুঃখকে নিয়ে রচিত দশটি উপন্যাস নিয়ে এই সংকলন। এতে শক্তিপদ বাবুর বিস্তৃত সাহিত্যকৃর্ত্তির স্বাক্ষরও রয়েছে বলেই এই নির্বাচিত উপন্যাসগুলি নিয়ে এই ডালি সাজানো হল। আশা করি, ভিন্নস্বাদ-ভিন্ন পটভূমিকা—বিচিত্র জীবন চর্যার অনুভূতিময় সংকলন পাঠকদের কাছে সমাদর পাবে।

সূচীপত্র

দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি

কাঠফাটা রোদে টিনের শেডগুলো তেতে ওঠে, সারবন্দী টানা শেড, বিস্তীর্ণ লাল কাঁকুরে প্রান্তরে মাত্র কয়েকটা আধমরা বট-অশ্বত্থগাছ দাঁড়িয়ে ধুঁকছে ওই মানুষগুলোর মত।

ওদিকে বেশ কিছু তাঁবুর ভিড়! মানুষগুলো এই টিনের চালায় আর ধরেনি, তাদের বেশ কিছুটা উপচে পড়ে ওই তাঁবুগুলোর মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে।

এই রোদে তবু মানুষের ভিড় এখানে থিক থিক করছে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা মেয়ে-পুরুষের দল লাইন দিয়েছে। ডোল অপিসের সামনে আধ ন্যাংটা ছেলে মেয়ের দল কলরব করে। মুখে চোখে ওদের শীর্ণতার ছাপ। যেন অবাঞ্ছিত ওরাই নিজেরা বেঁচে আছে নিজেদের অফুরান প্রাণশক্তি নিয়ে অভিশাপের মত।

দূর বাংলার মাটি থেকে এই মানুষগুলো এসে বানে ভাসা খড়কুটোর মত ঠেক খেয়েছে মধ্যপ্রদেশের ঊষর মানা প্রান্তরে।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর আগে থেকে এসেছে দণ্ডকারণ্যের মাটিতে পুনর্বাসনের আশায়, স্রোতের মত এসেছে। কিছু ভাগ্যবানরা সেখানে ঘরবসত পেয়েছে, পিছনে পড়ে আছে এখনও বেশ কয়েকহাজার পরিবার এই মানার প্রান্তরে কয়েক মাইল এলাকার মধ্যে।

...লাইনটা নড়ছে। কলরব ওঠে।

ওদিকে টিনের শেড-এর কাউন্টারের একপাশে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে চাল গম দিচ্ছে ওদের, কার্ডে দাগ পড়ছে।

হাঁক পাড়ে—নিশিকান্ত হালদার, ক্যাস পনেরো টাকা চল্লিশ পয়সা।

সপ্তাহের জন্য ওই কয়েক সের চাল গম আর নগদ কিছু পয়সা এই তাদের প্রাপ্য। আজ ক'বছর ধরেই চলছে ওই ব্যাপার।

কয়েক হাজার মানুষ আজও ঘরবসত পায়নি, এখানের ক্যাম্পে পড়ে আছে সপ্তাহান্তে ওই মুষ্টিভিক্ষা সম্বল করে।

...ওদিকে ভিড় থেকে বের হচ্ছে শরৎ দাস। বুড়োর চুলগুলো ক'বছরের মধ্যে পেকে শণের মত সাদা হয়ে গেছে, আগে লোকটা ছিল সতেজ-সোজা। ক'বছরে এখানের রোদের তাপে, শীতের ধমকে আর অনাহার অর্দ্ধাহারে শরৎ দাস নুইয়ে পড়েছে।

শরৎ দাস আধভাঙ্গা খুদ-ধান মেশানো চাল আর কিছু গম নিয়ে লাইনের বাইরে এসে হাঁপাচ্ছে।

বলে—কও নিমাই, সাতডা বছর এই ভিক্ষা নিই চলছে, হপ্তায় ওই চাল গম আর নগদ চোদ্দটা টাহা, কি হয় এতে? তাই কই...ভিক্ষা দিই ভিখারী বানাইয়া কাম নাই। বিবাক জাতডারে ভিখারী না বানাই ওগোর ঘর বসত—একটুন জমি দ্যান খাটি খাতি দ্যান। শ্যাষ বয়সে চাষীর ছাওয়াল চাষীর মতই বাঁচতে দ্যান—ভিখারীর মত বাঁচনের কাম নাই।

একথা বলে এদের অনেকেই।

জলের জোগান এখানে কম, ওদিকে লাইনে লোক ঘণ্টা দুই ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।

—জল দিমু। দশ পয়সা গ্লাস।

ওদিকে একটা কোকড়ানো অশ্বত্থগাছের নীচে চট, বাতিল কাঠের টুকরো দিয়ে একটু ছাউনি মত করে বিড়ি-পানের দোকান দিয়েছে। এই জায়গাটায় কয়েকটা দোকান মত আছে। ডোল-সরকারী ভিক্ষাই এদের একমাত্র সম্বল। তাই ওদিন এখানে সামান্য কেনা বেচাও হয়।

ডোল-এর টাকা চাল নিয়ে বের হয়ে আসতে ধরেছে তাদের কৃপাময়—কই যাও দাসজী, আরে ও নিশিকান্ত, বাদল, চান্দাটা দিই যাও। কইরে রসিদ গুলান লেখ।

ওদিকে নড়বড়ে টেবিলে রসিদ লিখছে গিরিজা। ছোকরা এদিকে চটপটে, এখানের মাটিতে এসেছিল গিরিজা তখন ছোট্ট। ক'বছরের মধ্যে মানা ক্যাম্পএ নোতুন এক শ্রেনী গড়ে উঠেছে। যারা ছোট অবস্থায় এসেছিল এখানের এই তাঁবু আর শেডের ভিক্ষাবৃত্তির কর্মহীনতার মাঝে, আলস্য আর ব্যর্থহতাশার অন্ধকারে দিশাহারা একটা নোতুন শ্রেণী গড়ে তুলেছে। জীবনের কোন আশা-আদর্শ তাদের নেই, মূল্যহীন হয়ে গেছে সবকিছু।

গিরিজা তাদেরই একজন।

শরৎ দাস বলে—চান্দা তো দিতাছি, কাম কিছু হইব?

এমন সময় মোটর সাইকেলটা এসে থামে। ইঞ্জিনটা গর্জাচ্ছে তখনও। কৃপাময় বলে—সুধাকান্তদা আইয়া পড়ছে। ওরেই জিগাও।

সুধাকান্ত দেখছে লোকগুলোকে। চেনে ওদের। সুধাকান্ত বলে—কলকাতা থেকে মন্ত্রীদের আনাচ্ছি, আমি কলকাতা হয়ে দিল্লী যাবো। এবার দণ্ডকারণ্যে আরও জমি তৈরী হয়েছে, সেখানে আট-দশহাজার লোকের বসতি করানো যাবে। চাঁদা ঠিকমত না দিলে আমরা কাজ করতে পারবো না।

অনেকেই বলে—এ কথাতো পাঁচ বৎসর থনে শুনত্যাছি। আর পইড়া মরছি এহানে।

এরমধ্যে রোদে পোড়া ডাঙ্গায় বেশ কিছু লোকও জুটে গেছে। সুধাকান্ত তাদের বোঝাবার চেষ্টা করে। গিরিজা জানে এই চাঁদার কিছুটা অঙ্ক মাসে মাসে তার হাতে আসে। তাই বাধা আসতে সে গর্জে ওঠে—চান্দা দিতে হইব। নয়তো যে হালা চান্দা দিমুনা কইবো তাগোর ঠাণ্ডা কইরা দিমু! গিরিজাকে চেনস না?

গিরিজা ইতিমধ্যে এই এলাকায় সেই সুনাম কিনেছে। কারণে অকারণে দুচার জনকে মারধোরও করে, মাঝে মাঝে রায়পুর শহরে গিয়ে কোনও দামী হোটেলে মদ খেয়ে সিনেমা দেখে ভটভটিয়ায় চেপে ক্যাম্পে ফেরে। সঙ্গীও জুটেছে দুচারজন।

গিরিজার কথায় কিছুটা কাজ হয়।

জানে ওরা গিরিজাকে। সেবার গুপীনাথ চাঁদা দেয়নি। প্রকাশ্যে বলেছিল যে কৃপাময়, সুধাকান্ত দল গড়ে লোককে জুলুম করে মাসে মাসে একটাকা করে চাঁদা নিচ্ছে, আরও পয়সা তুলছে আর নিজেদের পেট ভরাচ্ছে।

অনেকে কথাটা জানে।

কারণ সুধাকান্ত এখানে ক'বছর আগে রিফিউজী হয়ে এসেছিল। কিন্তু ক'বছর এই জনদরদীর ভূমিকা নিয়ে এদের হয়ে খাটার ভান করে যে পয়সা তুলেছে তা কম নয়। সুধাকান্ত এখন ফলাও করে খাটাল গড়ে দুধের ব্যবসা করছে রায়পুরে, দু'চারটে বড় বড় পুকুর দিঘী ইজারা নিয়েছে ধীবর সমিতির নামে। সে নিজে তার সেক্রেটারী। সেই পুকুরের বড় বড় মাছ কলকাতায় চালান দিয়ে বেশ পয়সা ক'রেছে, বাড়ি করেছে শহরে—নিজে মোটর সাইকেল দাবড়ে ঘোরা ফেরা করে।

সুধাকান্ত সে সময় বিপদে পড়েছিল।

গুপীনাথই মাথা তুলেছে। বেশ কিছু লোকও তার দলে আসতে চায়।—এর ক'দিন পরই দেখা যায় গুপীনাথ জঙ্গলের ধারে আহত হয়ে পড়ে আছে। তার তাঁবুটা তছনছ করা, একা গুপীনাথই নয় আর কয়েকজন মারধোর খেয়ে হাসপাতালে গেছে, বোমাও পড়েছিল কয়েকটা।

সুধাকান্ত সেদিন খুশী হয়েছিল গিরিজার কাজে, রায়পুরের বাড়িতে গিরিজাকে নিয়ে গেছল। সেইদিন সুধাকান্ত ওকে দীক্ষা দেয়, মদ তার আগে খায়নি গিরিজা।

তাই মাংস আর গেলাসে মদ দেখে ইতিউতি করে সে সুধাকান্তকে বলে, —সুধাদা ওসব খাই না।

হাসে সুধাকান্ত। কৃপাময়ও নিমন্ত্রিত, সে এরমধ্যে বেশ কিছুটা গিলেছে। কৃপাময় বলে,

—খাবিনা কি রে? লজ্জা করতিছে?

সুধাকান্ত বলে—খা গিরিজা। দেহে মনে তেজ বাড়বে, বুঝলি ওই ভেড়ার পালকে ঠাণ্ডা করে রাখতে হবে যখন য্যামন তখন ত্যামন ওষুধ দিয়ে। তা পারবি তুই। নে— খেয়ে দ্যাখ।

কৃপাময় বলে—ওরা কইতিছে, খাই ল!

গিরিজাকে ওদের দরকার। তাজা ছেলেটার সাহস আছে।

গিরিজার হাতে গোটা পঞ্চাশ টাকাও দেয় সুধাকান্ত।

বলে—এটা রাখ। আর কৃপাময়ের সঙ্গে থেকে কাজকম্ম দেখে নে, মাসে মাসে দেড়শো টাকা করে হাতখর্চা পাবি। তারপর রেশন ডোল ওসব তো আছেই।

তারপর থেকেই গিরিজার হাল বদলেছে।

সুধাকান্ত অবশ্য প্রকাশ্যে গিরিজাকে মাঝে মাঝে ধমকে ওঠে। আজও ওই জব্দ করে দেবার কথাটা বলতে সুধাকান্ত বলে,

—চুপ কর গিরিজা, শরৎ কাকা ঠিকই কইছে, প্রবীণ মানুষ ওগোর ছেন্দা ভক্তি কইরা কথা কইবি।

পরক্ষণেই মন্তব্য করে সুধাকান্ত—ওর কথা ছাড়ান দ্যান দাসমশাই, কাজ আমরা করছি। দ্যাহেন।

সুধাকান্ত ফস্ করে তার ব্যাগ খুলে খান কয়েক সরকারী খাম বের করে। এমন কিছু কাগজপত্র সে সবসময়েই হাতে রাখে। পার্টিদের দেখাতে হয় যে সে এদের জন্যই খাটছে। বলে সুধাকান্ত,

—হয়ে যাবে। পুনর্বাসন মিলবোই। শুধু জমিই তৈরী হলে হবে না তো, জমিতে যাতে ফসল হতি পারে তাই ড্যামও বানাইছে। দ্যাহেন।

ভাঁজকরা রঙ্গীন দাগমারা একটা ম্যাপ সে মেলে ধরে। মালকানগিরি অঞ্চলের নোতুন এলাকার ম্যাপ, তাতে একটা নদীর চিহ্নও রয়েছে। তেঁতুলে বিছের চেহারার মত হিজিবিজি কাটা পাহাড়ের চেহারা, সেখানে বয়ে চলেছে পটারু নদী। সেই নদীতে ড্যাম তৈরী হচ্ছে, জলসেচের এলাকাও দেখানো হয়েছে, বলে সুধাকান্ত—এসব এলাকায় বসবাস হইব, তারজন্যই কলকাতা যাবার লাগবো।

চাঁদা আদায়ের আর কোন অসুবিধাই হয় না।

কৃপাময় খুশী হয়। সুধাকান্ত বলে—দণ্ডকারণ্য অথরিটির সাথে আজ মিটিং আছে গিয়া, ওনারা সকলেই আইয়া পড়বেন।

কেষ্ট, জলধি আরও অনেকে বলে,

—একটু বলে কয়ে দ্যাখো সুধাকান্ত। এভাবে জানোয়ারের মত বাচ্চাদের নিয়ে থাকন যায় না, যদি ঘরবসত মেলে বেঁচে যাবো—নয়তো শেষই হবার লাগবো।

দণ্ডকারণ্য ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি সংস্থার কাজ এদের পুনর্বাসন দেওয়া। দেশবিভাগের পর ছিন্নমূল বাংলার উদ্বাস্তুদের ঠাঁই দেবার জন্য উড়িষ্যা আর মধ্যপ্রদেশের বেশ কিছু দুর্গম বন পাহাড় ঢাকা দণ্ডকারণ্যের গভীরে এদের বসতির পরিকল্পনা নিয়ে বিধান রায়ের পরিকল্পনা মত কেন্দ্র এই সংস্থা গড়ে তুলেছেন।

উড়িষ্যার কোরাপুট শহরে এদের প্রধান কর্মকেন্দ্র, ওখান থেকে দূরে দূরে বেশ কিছু দুর্গম পাহাড়-বনকে হাঁসিল করে সেখানে এক একটা উপনিবেশ কেন্দ্র গড়া হয়েছিল। উড়িষ্যার শেষসীমান্তের বন অঞ্চলে মালকানগিরি, উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশের সীমানার দিকে উমরকোট আর মধ্যপ্রদেশের বিস্তারের বন অঞ্চলে গড়ে উঠলো পাখানযোড় এলাকা।

যাতায়াতের জন্য তৈরী হ'ল পথঘাট, নদীতে তৈরী হ'ল ব্রিজ। বিভিন্ন উপনিবেশ কেন্দ্রে গড়ে উঠলো হাসপাতাল, স্কুল। বিজলি বাতিও জ্বলে উঠলো।

আদিম অরণ্যের বুকে গড়ে উঠলো ওই সব অঞ্চলে নোতুন জনপদ, কুমারী মৃত্তিকায় এলো ফসলের ইশারা। ঘরছাড়া বেশ কয়েক হাজার মানুষ আবার ঘর পেলো।

কিন্তু এই মানা ক্যাম্প তখন থেকেই ছিল ট্রানজিট ক্যাম্প। এখানে এসে অশ্রয় পেতো ছিন্নমূল পরিবাররা, তারা তখন এখানে থাকতো অন্য কর্তৃপক্ষের অধীনে। ক্যাম্প জীবন। রেশন আর ক্যাশ ডোল নিয়ে বেঁচে থাকা।

দণ্ডকারণ্য অথরিটি অরণ্যের মধ্যে জমি পত্তন করে জানাতো কিছু পরিবারের পুনর্বাসন করানো যাবে, তখন ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ সেইমত কিছু পরিবারকে দণ্ডকারণ্য অথরিটির হাতে তুলে দিয়ে তাদের কর্তব্য শেষ করেন।

তারপর থেকে সেই সব পরিবারের দায়িত্ব চলে গেল দণ্ডকারণ্য অথরিটির হাতে। নোতুন উদ্বাস্তু এসে আবার জমলো মানা ক্যাম্প-এ পুনর্বাসনের আশায়।

চাকাটা এইভাবেই চলছিল। ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে চলে যেতো এরা নোতুন বসতে।

কিন্তু এর মধ্যে কিছু লোকের চোখ খুলে গেছে। রাজনৈতিক প্রতিভারাও নিজেদের রাজ্যে নিজেদের প্রাধান্য দেখাবার জন্য হঠাৎ জনদরদী দেশপ্রেমিক সেজে রাতারাতি জনমত গঠনের সৎকাজে লেগে গেলেন।

পরিত্যক্ত দুর্গম বন পাহাড় অঞ্চলে তখন বসতি শুরু হয়েছে। গড়ে উঠেছে স্কুল, হাসপাতাল, বিজলি বাতি জ্বলছে। নোতুন মানুষরা এসে সেই কুমারী মাটিকে ফলবতী করে তুলেছে। দণ্ডকারণ্য অথরিটির সাহায্যে সরকারী অর্থে নোতুন উপনিবেশ গড়ে উঠেছে, তাই টনক নড়ে সেই দেশের মানুষদের।

এই সুখসুবিধাটুকুর দখলদারি তারাই চায়। ফলে বেশকিছু লোককে ক্ষেপিয়ে তারা আন্দোলনও শুরু করেছে।

—বিদেশীদের আমাদের মাটিতে দখল দেওয়ানো চলবেনা।

আজ ভারতের স্বাধীনতা এসেছে। সেই নেতারা স্বাধীনতার ষোলআনা পেয়েছেন, নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরবাড়ি, দেশজমি, ত্যাগ করে পথে নামতে হ'ল কিছুদিন পর তারা পরিণত হ'ল বাতিল ভিখারীর শ্রেণীতে।

যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই মানুষদের, বেশ কিছু সাজা নেতা সেই পবিত্র প্রতিশ্রুতির কোন মর্যাদাই আর দিল না।

ফলে কিছুদিনের জন্য উদ্বাস্তুদের আর মানা ক্যাম্প-এর থেকে বনের ভিতরে পুনর্বাসন করানো যায় নি। একটা সমঝোতার চেষ্টা চলেছে।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এই মানুষগুলো ভিক্ষাবৃত্তিব জীবনের অন্ধকারে নির্বাসিত হয়ে এক নোতুন শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে এখানে।

কিছু লোক এখনও আশা করে ঘর বসত পাবে। আবার বাঁচবে মানুষের পরিচয়ে।

টিনের দেওয়াল, উপরের ছাউনিও টিনের। সামনে একফালি উঠান মত। শরৎ দাস ক'বছর আগে এই ঘরে এসে মাথা গুঁজেছিল। ওর গিন্নি ললিতা দেখে শুনে বলে,

—কল তো মাত্তর একডা, জল পড়ে সুতার মত। আর পায়খানাও তো খোলা মেলায়। ছেলেমেয়েদের নে বিপদে পড়বো নাতো?

শরৎ দাস বলে—কডা মাস থাকবা, তারপর নিজেদের ঘর বসতে যামু। সেই কডা মাস যে ক'টা বছরে পরিণত হবে তা জনতো নো কেউ।

শরৎ বাড়িতে ঢুকে বলে—সেডা কনে গেল? তোমার রাজকন্যে? নিজেই তো দেহি জল ধরছো দুব্‌লা শরীর নে? আর পটলা?

ললিতা চাইল স্বামীর দিকে।

ঘেমে নেয়ে উঠেছে লোকটা। ললিতা বলে,

—আইলা তাইতা পুইড়া। জল খাওদিন্! ওগোর কথা ছাড়ান দ্যাও।

শরৎ দাস চুপ করে থাকে। বলে—কত আর ছাড়ান দিমু কও কেতকীর মা? কি যে করে?

পটলা এখানে এসেছিল তখন এইটুকু, পিঠোপিঠি ভাই বোন কেতকী আর পটল। কেতকী ফ্রক

পরতো—শীর্ণ চেহারা। শিয়ালদহ প্লাটফর্ম-এ পড়েছিল ক'মাস। তখন থেকেই কেতকী হাত পাততে বাধ্য হয়েছিল। তবে মেয়েটা রোখা গোছের।

সে তক্কে তক্কে থাকতো। ফড়েরা সব্জী নিয়ে বসতো পথের দুপাশে, ভোরবেলায় ধাপার দিক থেকে ঠ্যালাগাড়ি বোঝাই কপি আসতো। মেয়েটা এই ফাঁকে দুটো কপি না হয় বেগুন এটা সেটা তুলে নিয়ে দৌড় মারত।

শরৎ দাস ধমকে ওঠে,

—ওসব ক্যান করবি? লাজ লাগে না?

মেয়েটা উস্কোখুস্কো চুলগুলো কেশরের মত ফুলিয়ে বলে—খামু কি? তরকারীই তো খাই, চাল তো একমুঠা।

শরৎ দাস চুপ করে যায়। এর নাম বেঁচে থাকা? পথের ধারে বাতিল পাতিকাঠের টুকরো, ভাঙ্গা টিন, ছেঁড়া চট এই দিয়ে ঘর তৈরী করা। রোদের তাপে ঘামে, বৃষ্টির জল সবই ভিতরে পড়ে। আর খাবারও জোটাতে পারেনা। কোলের ছেলেটা পটল তখন হাঁটতে শিখেছে মাত্র। শীর্ণ ছেলেটা খিদের জ্বালায় চীৎকার করে।

শরৎ দাস তাদের মুখে অন্ন জোগাতে পারেনি।

এমনি সময় দণ্ডকারণ্যের কথাটা উঠেছিল। অনেক মানুষই বলে—তাই যামু। এখানে মরণের চেয়ে সেখানে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা তবু করুম।

সারা অঞ্চলে তখন সরকারের এই দণ্ডকারণ্যের বসতির সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কিছু মানুষ বলে,

—এদের বনবাসে পাঠানো চলবে না।

ষ্টেশন এলাকায় এসে ওই মানুষদের সামনে দাবী তোলে অনেকে—তোমরা এই নির্বাসনকে মেনে নিও না। যেভাবেই হোক এই বাংলাতেই তোমাদের বসতি দিতে হবে।

ওরা শুনছে কথাগুলো।

বাবুরা এসে গরম গরম বক্তৃতা দেয়, নানা কথা শোনায়। ওদের জন্য দবদও দেখায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

—খাতি দিবেন বাবু? কে ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া তোলে। ওই খেতে দেবার দায়িত্ব কেউ নেয়নি। তারা বক্তৃতা দিয়ে চলে যায়। সন্ধ্যার পর ঝুপড়িতে বাচ্চাদের কান্নার সাড়া ওঠে। খিদের জ্বালায় কাঁদে তারা।

কেতকীর মত অনেকেই দূরে দাঁড়িয়ে ওই সব কথা শোনে। ওদের চোখ তখন সব্জীওয়ালাদের ঝুড়ির দিকে। কিভাবে ছোঁ মারবে তারই মতলব করে। কেড়ে—চুরি করেই বাঁচতে হবে তাদের।

ওই শহরের পরিবেশ থেকে তারা এসেছিল মানা-র শূন্য প্রান্তরে ক'বছর আগে।

পটলা বসে আছে ওদিকে, এও শহর। কলকাতার কথা মনে পড়েনা তার। রায়পুর শহরেই এখন আসে সে। চাদরের নীচে ব্লাডার ভর্তি মহুয়ার মদ।

ওদিকে একজন পুলিসকে দেখে পটলা সরে গেল গলির মধ্যে। ওই গলির মধ্যেই চৈত-সিং-এর ডেরা। দূরপাল্লার ট্রাক ড্রাইভারদের জন্য আহার বিশ্রামের ঠাঁই আছে। রাস্তার ধারে কয়েকটা জাম, নিমগাছের ছায়ার নীচে লম্বা চালার সামনে বেশ কয়েকটা খাটিয়া ছড়ানো। ওদিকে রান্নার উনুন। রুটি তড়কা আণ্ডা কারী মাংস মেলে। আর মেলে এদিকে একনম্বর মহুয়ার মদ। ওটা মেলে গোপনে।

চৈত সিং পটলাকে দেখে বলে,

—আবে লৌণ্ডা। লায়া কুছ?

মালটা পাঠায় অন্যজন। পটলা বয়ে আনে মাত্র। তার জন্য পায় দু'তিনটে টাকা। আর দয়া করে চৈত সিং দেয় বাসি রুটি-তড়কা। পটলার একবেলার খাওয়া হয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর এখানে অন্য কাণ্ডও চলে।

চৈত সিং বলে—ই মাল ছোড়কে দু'সরা মাল-এর ধান্দা কর লৌণ্ডা। ছোকরি তো বহুৎ হ্যায়রে উধার। দু একঠোকো লে আও। দশরূপেয়া বখশিষ মিলেগা।

পটলা ভাবছে আজ কথাটা। দেখছে ক্যাম্প-এ এদিক ওদিকে মেয়েদের । না খেয়েও থাকে অনেকে। পটলার মনে পড়ে ভুতি মালতীদের কথা। তবু ভয়ে ভয়ে কথাটা তাদের বলতে পারে না। পটলা জানে রাতের বেলায় মাতাল ট্রাক ড্রাইভারদের স্বরূপটাকে। এক একটা যেন হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়।

...তবু দশ বিশ টাকার লোভটাও কম নয়।

কি ভাবছে পটলা। বৈকাল হয়ে আসছে। ক্যাম্প-এ ফিরতে হবে। বাসষ্ট্যান্ড-এর দিকে চলেছে।

কেতকী ক্যাম্প-এ এসেছিল তখন একটি ছোট মেয়ে। কলকাতার সেই জীবনে দেখেছিল সে অনেক কিছুই। তখনই বুঝেছিল বাঁচতে গেলে কেড়ে না হয় চুরি করেই নিজের প্রয়োজন মেটাতে হবে।

এখানে এসে প্রথম কিছুদিন চুপচাপ ছিল, তেমন কিছু নেই কারও, তাই চুরি করার সুযোগও কম। এখানে এসে নগ্ন অভাবের মাঝে তাই মেয়েটা ঘাবড়ে গেছল।

ক্রমশঃ দেখেছে কেতকী তার দিকে অনেকেই চায়। ক্যাম্প-এর কেরানীবাবুও সেদিন ডাকে মেয়েটাকে।

—এ্যাই শোন।

তখন দুপুরের স্তব্ধতা নেমেছে। চারিদিকের লালপ্রান্তরে লি লি রোদ্দ কাঁপে। এই সময়টায় কেউ বড় একটা বাইরে থাকে না। ওই টিনের গরমে সেদ্ধ হয় মানুষগুলো। রোদের তাপে শুকিয়ে গেছে গাছ-এর কচি পাতাগুলো।

ষ্টোর-এর কেরানীবাবুকে দেখেছে এর আগে কেতকী।

লোকটার মাথায় কদমছাঁট কাঁচাপাকা চুল, গোলমত মুখখানায় একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ ঝুলে থাকে। ডান হাতে কালো করে বাঁধা বেশ কয়েকটা বিভিন্ন সাইজ আর রং-এর মাদুলী।

খেতুবাবু দেখছে মেয়েটাকে। ময়লা ছোট ফ্রকের বাঁধন ছাপিয়ে মেয়েটার সদ্য-জাগা যৌবন ফুটে উঠেছে।

বেশ কিছুদিন এখানে এসেছে ওরা, খেতু দত্তও জানে 'বি' ব্লকে ওদের ঘরের নম্বর। তার কাছে এখানের সকলের রেশন কার্ডের সব হিসেব আছে।

—এ্যাই শোন! কেতকী তোর নাম না রে?

খেতুবাবুকে ডাকতে দেখে উঠে এল কেতকী। ওদিকে ভিতরের গুদামে থাকবন্দী চাল গমের বস্তা সাজানো। টিনে তেলও রয়েছে। এত মাল—অথচ তারা আধপেটা খেয়েই থাকে।

রোদে কেতকীর মুখটা টসটসে হয়ে উঠেছে। এমনিতে মেয়েটা দেখতে সুন্দরই। আর সবদিকে তাকে বঞ্চিত করে পথের মানুষের পর্য্যায়ে ফেলেছে। তবু মরা ডালেও আসে বসন্তের খবর। আসে কিশলয়—ফুলের ইশারা।

তেমনি মেয়েটার দেহেও সেই সাড়া এসেছে। হয়তো মেয়েটা এসম্বন্ধে অবহিত নয়, কিন্তু ফুলের খবর ফুল জানে না, সে খবর পৌঁছে যায় ভ্রমরের কাছে। এখবরও খেতুর মত লোকেদের কাছে ঠিক পৌঁছে যায়।

খেতু বলে—সরবৎ খাবি? উঃ যা গরম পড়ে এখানে। গা জ্বলে পুড়ে যায়!

—সরবৎ! কেতকী বলে।

খেতু হাসে—দ্যাখনা! বানাচ্ছি!

একটা কুঁজোতে জল থাকে। ঘটিতে একঘটি জল নিয়ে ওদিকের খোলা বস্তা থেকে মুঠো মুঠো চিনি মেশাচ্ছে খেতু। কেতকী দেখছে। চিনি তাদের কাছেও এখন দামী বস্তু। সেই চিনি এত এখানে। ঘটির জল আর চিনি তখন ঢালাঢালি করে সরবৎ তৈরী করছে খেতু। পাতিলেবুও মজুত থাকে, যুৎ করে পাতিলেবুর রস দিয়ে সরবৎ তৈরী করে খেতুবাবু মেয়েটাকে দেয়—একগ্লাস নে!

তেষ্টাও পেয়েছিল কেতকীর।

সরবৎটা ভালোই লাগে! এক নিঃশ্বাসে শেষ করে গ্লাশটা নামাতে খেতু বলে,

—ক্যামন লাগলো রে?

—ভালো!

খেতুবাবু বলে—রোজ দুপুরে এই সময় আসবি, সরবৎ খাওয়াবো।

কেতকী দেখছে লোকটাকে। খেতু বলে—বোস না পাখার নীচে। রোদে রোদে ঘুরে ফর্সা রংটা কালি হয়ে যাবে রে! এত সুন্দর তুই।

কেতকীকে সুন্দর কেউ বলে না, বাড়িতে মা শুধু গালাগালিই দেয়। এখানে ওখানে ঘুরে বেথুয়া শাক, দুচারটে মকাই আনে মাত্র। তাও সব দিন জোটে না। বাবা চুপচাপ থাকে।

আজ সেই অবহেলিত মেয়েটা হঠাৎ ওই খেতুবাবুর কি বিচিত্র চাহনির মধ্যে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে। খেতুবাবুও একটু সাহস পেয়ে এবার ওর গালে হাত দিয়েই আদর করে বলে,

—চিনি নিবি?

কেতকী দেখছে ওকে। এর মধ্যে খেতুবাবু প্যাকেটে চিনি খানিকটা মুড়ে এনে ওর হাতে দিয়ে বলে—কাল আসিস ব্যাগ নিয়ে, ভালো চাল দেব!

কেতকী চিনিগুলো নিয়ে বের হয়ে এল।

ও চিনি সে বাড়িও নিয়ে যায় নি। ওদের ব্লকের সুরভী, কালু, গিরিজারা সিনেমা দেখতে যাবে রায়পুরে, কি জমকালো হিন্দী বই এসেছে। কেতীকও চিনিটা নিয়ে গিয়ে সি ব্লকের চায়ের দোকানদার লালাজীর কাছে বিক্রী করে দেয় —হাতে পায় নগদ চার টাকা।

রায়পুর বেশী দূরে নয়। মাত্র কয়েক মাইল। বাস আছে আর আছে ট্রেনও। ছোটলাইনের গাড়ি—ওরা দল বেঁধে স্টেশনে এসেছে। ট্রেনে ওদের পয়সা লাগে না।

গিরিজা সিগ্রেট টানছে। ওদিকে কালু, মদন দাঁড়িয়ে।

সুরভির দিকে চাইছে গিরিজা। সুরভি এর মধ্যে শাড়ি পরেছে। ওর কালো মাংসল দেহটা ছোট ব্লাউজের বাঁধন মানে না। শাড়িটা পরেছে—ওর পেটের অনেকটা আঢাকা। গিরিজা বলে—কিরে সুরভি! আজকাল শুনি ভালোই রোজগার করিস! আজ তুই দেখা সিনেমা !

সুরভির গা গতরে কাঁপন লাগে। বলে সে—কি আর নাগর রে? তুই তো সুধাদার ল্যাজ ধরে আছিস!

হাসে গিরিজা—বল তাহলে তোর ল্যাজে ধরেই পইড়া থাকুম! যা মাল একখান হইছস।

হাসে সুরভি—ধ্যাৎ!

অকারণে শাড়ি দিয়ে ওর উদ্ধত বুকটাকে ঢাকার চেষ্টা করে। হঠাৎ কেতকীর চোখ পড়ে। গিরিজা দেখছে ওকে।

বলে গিরিজা—কিরে তোর এত লজ্জা দেখছি! তা যাবি নাকি সিনেমাতে?

সুরভি বলে ওঠে—ওর পিছন লাগস কেন? তর চোখ যেন শ্যালের চোখ! চলতো—টেরেন আইয়া পড়ছে।

দলবেঁধে চলেছে কেতকী ওদের সঙ্গে। হাসছে ছেলেগুলো। কালুও। গিরিজার পাশে বসেছে সুরভি। হাওয়ায় উড়ছে ওর আঁচল, গিরিজা গান গাইছে।

একটি সন্ধ্যা যেন কেতকীর কাছে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তার জামার নীচে চারটে এক টাকার নোট থেকে দুটো বের করতে যাবে। গিরিজা বলে,

—আমি দিচ্ছি।

একটু অবাক হয় কেতকী। বলে সুরভি—শ্লা আমারটা দে!

হাসে গিরিজা—তর পয়সার অভাব না কিরে সুরভি। ওর তো রোজগার নাই তাই দেখাচ্ছি।

সুরভি বলে—কেতকীর যা আছে দেখচি ক'দিন পর ও অনেকের মাথা ঘুরাই দিবে।

কেতকীর লজ্জা হয়! তবু মনে কি একটা নোতুন চেতনা জাগে। তার দামও আছে।

পর্দায় ছবি ফুটে ওঠে। নায়িকার পোষাক, তার যৌবন —সবকিছু চোখে দেখে কেতকী। কত বড় লোকের মেয়ে, গাড়ি-বিলাসের আয়োজন সব আছে। আর নায়কও তেমনি সুন্দর। গাড়ি নিয়ে দুজনে বের হয়, গান গায়, নদীর ধারে পাহাড় বনে।

এ এক স্বপ্নের জগৎ! কেতকী সেই জগতে যেন হারিয়ে গেছে। নেশা লাগা চোখ মন নিয়ে বাইরে এল; তখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে।

সুরভি বলে—আমি চলিরে।

সুরভিদি চলে গেল। কেতকী বলে,

—কোথায় গেল সুরভিদি!

কালু বলে ওঠে—কেন? তুইও যাবি নাকি চৈত সিং এর ধাবায়? এ্যাঁ—মরে যাবি তাহলে, যা কাণ্ড হয়!

গিরিজা ধমকে ওঠে—থামনা কালু!

কালু হাসে—ঠিক আছে গুরু! দ্যাখো নিজেই ট্রাই করে!

কেতকীর এবার ভয় ভয় করে, মনে হয় কি যেন গোপন ব্যাপার নিয়েই কথা বলছে তারা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরতে হবে। কেতকী বলে—দেরী হইল গিয়া, মায় বকবে গিরিজাদা!

গিরিজা বলে—চলতো। আমার লগে যাবি, কিছু কইবে না। চল, চা খাই লই!

গিরিজার বাবা নিশিকান্ত হালদার এককালে ফরিদপুরের কীর্তন খোলার গঞ্জের দোকানদার ছিল। গঞ্জের ছোট দোকান আর বাড়ির লাগোয়া কয়েককানি জমি দু'দশটা নারকেল সুপারির গাছ এইছিল সম্বল। বেশী কিছু নয়, তবু মাটির কাছাকাছি থেকে সেই জমি থেকে সংগ্রহ করতো তার অন্ন। গঞ্জের দোকানটা থেকেও আয়পয় সামান্য হতো, তবু শান্তিতেই ছিল নিশিকান্ত! সন্ধ্যার পর গঞ্জের হাটতলায় বসতো কীর্তনের আসর, নিশিকান্ত একাই জমিয়ে রাখতো। নাম-গান কীর্তন করতো ভালোই।

নিশিকান্ত তারপর সব হারিয়ে বহুঘাট ঘুরে এসেছে এখানে। এই শূন্য প্রান্তরে যেন নির্বাসনে এসেছে তারা, ভিক্ষান্ন নিয়ে বেঁচে আছে মাত্র। ছেলেমেয়েরাও অনেক স্বাধীন এখানে।

সুর এখানে সব যেন হাহাকারে পরিণত হয়েছে। তবু নিশিকান্তই ক্যাম্পের এদিকে অনেককে বলে কয়ে বাতিল কাঠ দিয়ে একটা চালা বানিয়েছে। সেবার কালীপুজোও হয়েছে ওপাশে, এখন সন্ধ্যার পর অনেকে এসে জোটে।

নিশিকান্ত বলরাম এ ব্লকের গোবিন্দ আরও অনেকে চাঁদা করে বাংলা মুলুক থেকে খোল দুখান আনিয়েছে। তুলসীমঞ্চ করে জল দিয়ে গাছটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আর সন্ধ্যার পর তবু হরিনামের আসর বসায়।

বুড়ো বুড়ি মেয়েরা অনেকেই আসে। নিশিকান্ত তন্ময় হয়ে নামগান করে, মনে হয় আবার সেই ফেলে আসা মাটি তার গ্রাম সেই কীর্তন খোলা নদীকে যেন দেখছে সে চোখের সামনে, মিটি মিটি আলো জ্বলে নৌকায়। এখুনি নাম গান সেরে হ্যারিকেন হাতে রাঙ চিত্তিরের বেড়ার পাশ দিয়ে নারকেল সুপারী গাছের ছায়ার নীচে দিয়ে বকুলফুলের মিষ্টি গন্ধভরা বাতাস টেনেটেনে ঘরে ফিরবে!

কিন্তু সেদিনগুলো —ঘরের স্বপ্ন তার হাবিয়ে গিয়েছে। ওই নিষ্ঠুর ভগবানই কি অপরাধে তাদের চরম শাস্তি দিয়েছে। তবু বলে নিশিকান্ত—দিন চেরডা কাল সমান যায় না গোবিন্দ, দিন বদলাবেই। তাঁর নাম কর—

তাই যেন ওরা আকুতিভরে নাম গান করে।

—ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

অনেকেই বসে থাকে। কোনদিন কথকতার আসরও বসে। বিষ্টু ভটচায এসে ভাগবত পাঠ করে।

গিরিজা সেদিন একটু তৈরী হয়েই ফিরছে। সুধাকান্তদাও আশ্বাস দিয়েছে একটা ব্যবস্থা হবে তার।

সে নাকি খবর পেয়েছে প্রায় দশ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এর মধ্যে ক্যাম্পে জমেছে বিভিন্ন ব্লকে প্রায় আঠারো হাজার মানুষ। কয়েক বৎসর ধরে তারা এখানে পড়ে আছে। সুধাকান্ত বলে গিরিজাকে—তোদের ব্যবস্থা করছি।

গিরিজা শহরের মোহে পড়েছে, আর এই ক্যাম্পের উন্নয়ন সমিতির কাজ করে দেখছে মাসে চাঁদা বাবদ নিদেন হাজার পনেরো টাকা ক্যাশ হাতে আসে সুধাকান্তদার।

তার থেকে খরচা সামান্যই। এই মন্দিরতলা ওরাই বানিয়েছে মাত্র হাজার চারেক খর্চা করে। তাতেই সুধাকান্তকে এরা মালা পরিয়ে সেদিন অভ্যর্থনা করেছিল উদ্বোধনের দিন।

গিরিজা মনে মনে হাসে!

কৃপাসিন্ধুও বলে—সুধাদা ব্যবস্থাটা ভালোই করেছে। খর্চা মাসে দু-চার হাজার, বাকী—!

ব্যাপারটা সুধাকান্তও জানে।

রায়পুরে বেনামিতে বাড়িও করেছে। দুধের ব্যবসা বাড়ছে, এবার বেশ কয়েক একর জমি কিনেছে শহর থেকে দূরে, সেখানে চাষ বাড়ি করছে। ডায়েরী ফার্ম করবে জার্সি হলষ্টেন জাতের গাইও কিনেছে।

সুধাকান্ত জানে একজায়গায় গাছ থাকলে মাটির গভীরে শিকড় চলে যায়, তায় মানুষ বলে কথা। সুধাকান্তর ভিতরের ব্যাপার জানে কৃপাসিন্ধু আর গিরিজাও।

সুধাকান্ত তাই ওদের সরিয়ে দিতেই চেষ্টা করছে এখান থেকে।

সুধাকান্ত বলে—গিরিজা ওখানে তর জন্যে ঠিকাদারির কাজ ঠিক করেছি, ক্যাম্প-এর অনেক কাজ হবে।

সুধাকান্ত আবার ঠিকেদারির কাজ করে, সেই কাজেই গিরিজা আর কৃপাসিন্ধুকে পাঠাতে চায়, বলে সুধাকান্ত,

—এত টাকার কাজ, তোদের উপর ভরসা করি তাই কইছি। আর সাত একর জায়গা, সরকারি খর্চায় বাড়িও পাবি, ক্যান যাবিনা?

গিরিজা ভাবছে কথাটা।

খবরটা তবু হাওয়ায় ভেসে আসে। হরিমণ্ডপে তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। নিশিকান্ত বলে—সবই ঠাকুরের দয়া হে। দ্যাহো যদি বসতি পাও শরৎ, গোবিন্দ। এহানে আর কডা বছর থাকলি মান্ষির পরিচয়টা আর থাকবে নি!

কথাটা সত্য। কারণ গোবিন্দ রামানুজরাও জানে। রামানুজ বলে,

—হক কথা কইছো নিশিদা। রায়পুর বাজারে গিই দরদাম করি জিনিষের ওরা কয়—হট্ যাগয়া বাঙ্গালী। ভিখ্ মাংগকে খাও।

আমরা হালা য্যান ভিখারীর জাতেই নামছি। খাটি খাতি চাই—দেহি।

শরৎ বলে—দ্যাহো, যদি ঘর জমি মেলে। নয়তো সব্বোনাশই হইব।

কথাটা ভাবছে শরৎও! বাবা হয়ে তার আজ সংসারে কোন মর্যাদা যেন নেই। গ্রামের ঘরে এটা ছিল না। ফিরছে সে বাড়ির দিকে। একান থেকে দূরে যেতে পারলে যেন বেঁচে যাবে সে।

পটলা ফিরছে বাড়ির দিকে। বেশ কিছুদিন থেকে সে চৈত সিং-এর ঠেকে মদ জোগান দিচ্ছে, ইদানীং নিজেও পথে মাল নিয়ে যাবার সময় একটু আধটু চুমুক মেরে খেয়ে জল পুরে দেয়, মেজাজটা বেশ খুশী খুশী লাগে। আর সিংজীর তড়কা রুটি খেয়ে ফেরে।

আজ মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে। নগদ টাকা ক'টাও মিলেছে। বাড়িতে পা দিতে শরৎ চাইল ওর দিকে। সরৎ বলে,

—কোথায় থাকস্? আর সেডা কোথায়? সেই ছেমড়ি?

ললিতা স্বামীকে বলে—আইবো। গেছে কোথায়?

শরৎ এখন থেকেই জমি বাড়ির দলিল যেন হাতে পেয়ে গেছে। বলে সে —এবার দেখমু তগোর। জমিডা পাই। খাটতি হলে তহন বুঝবি, বসি বসি খাওয়া বড় মজার, না?

পটলা বলে—এক থা তো চিরদিনই শুনছি। এদিকে খাতি দিবার মুরোদ নাই, পথে পথে শ্যাল শুয়ারের বাচ্ছার মত ঘুরছি।

পটলার শিশুমনে সেই শিয়ালদহ ষ্টেশনের ঝুপড়ির বুভুক্ষার দিনগুলো গভীর ভাবে রেখাপাত করে আছে। তাকে কেউ বাঁচতেও দেয়নি, নিজেই চেয়ে—লাথি খেয়ে চুরি করে নিজের পেট ভরিয়েছে। আজও সেই ব্যাপারই চলেছে।

গর্জে ওঠে শরৎ—বাবারে কি কস হারামজাদা? মুখ ভাঙ্গি দেব।

শরৎ রেগে উঠে কাছে এগিয়ে আসে, হঠাৎ চমকে ওঠে সে।—কি খাইছস্? এ্যাঁ গাল টিপলি দুধ বার হইব মদ গিলছস? দিমু শ্যাষ কইরা।

পটলার চুলের মুঠি ধরবার আগেই পটলা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—খবরদার গায়ে হাত দিবা না বাবা, বাবাগিরি ফলাইতে আসবা না। কি করছো বাবার কাম? খাতি দাও? পরতি দাও? রেশন দেয়, ডোল দেয় সরকার। তোমার কুন কাম নাই, বাবা হইয়াই খালাস। আইছ শাসন করতি।

থমকে দাঁড়ায় শরৎ। যেন গালে একটা চড়ই খেয়েছে, কথাটা কঠিন সত্য। সংসার গড়ে ওঠে জমি ঘর মাটিকে কেন্দ্র করে, মানবিক মূল্যবোধও। গড়ে ওঠে মা-বাবার কর্ত্তব্য, সন্তানের নিশ্চিত আশ্রয়ের আশ্বাস- টুকুকে ঘিরে । নৈতিক মূল্যবোধও বেড়ে ওঠে তাকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু জমি ঘর মাটি যাদের নেই সেই পথের যাযাবর মানুষদের জীবন ধর্ম, তাদের মূল্যবোধ সবই স্বতন্ত্র। কি হতাশা আর দৈনন্দিন সংগ্রামের মাঝে সবকিছু হারিয়ে গিয়ে পাশবিক সত্ত্বাটাই জেগে ওঠে তাদের।

তাই পটলও বদলে গেছে। শুধু পটল নয় এই বিরাট জীবনের মূলে এসেছে শুধু অবক্ষয়, হতাশা আর বিদ্রোহ।

ললিতা বলে—থামবা তুমি! ওগো মারবা ক্যান? নিজেরটা ওরা নিজেই খায়।

শরৎ জানে ললিতাকে মাঝে মাঝে পটল দুচার টাকা দেয়, কোথা থেকে চাল ডালও বাড়তি আসে। ইদানীং চিনি দিয়ে চা খায় ললিতা!

কোথা থেকে আসে তা জানে কিছুটা।

কেতকী ক'বছরেই দেখেছে অনেক। রেশন ষ্টোরের খেতুবাবুই তার চোখ খুলে দিয়েছিল সেদিন। কেতকী সেদিন খেতে বসেছে। ললিতা আর সে খায় শেষ কালে! পটলা কোনদিন বাড়ি ফেরে, নাহয় দুপুরে ও কোথায় খেয়ে নেয়। ললিতা বলে,

—পটলা রায়পুরে কোথায় কাম নিছে।

শরৎ জানে না। জানে কেতকী। গিরিজার সঙ্গে ইদানীং দেখা হয়। কালুটাও তকে খুশী রাখার জন্য সিনেমায় নিয়ে যায় মাঝে মাঝে। কালু ইদানীং চাল-এর কারবার করে। মফঃস্বল থেকে চাল এনে রায়পুরের কোন মহাজনের গদিতে দেয়। কালুও কিছু ছেলেকে একাজে এনেছে, তারাই মাল আনে। কালু বাসের ড্রাইভার, ট্রেনের ড্রাইভারদের সামলায়, পুলিশের নজর এড়িয়ে মাল আনায়।

কালু বলে—বুঝলি কেতকী গিরিজাটা শালা এক নম্বর হারামী! ওই সুধাকান্তের দালাল, শ্লা লুচ্চা, সুরভিরে শেষ কইরা ওরে চৈত সিং-এর ধাবায় দিছে, তিন নম্বরের যমুনা, সি ব্লকের মালতীরে লইয়া পড়ছে। গিরিজার সাথে মিশবিনা!

কালুও তার গা ঘেঁষে বসে, লোভী হাতটা কেতকীর গায়ের এখানে ওখানে কি যেন খুঁজছে, কেতকীর সারা মনে কি সাড়া জাগে। তবু জানে কেতকী ধরা সে দেবে না। কালুদের মত বুড়ো খেতুবাবুকেও সে এর মধ্যে চিনেছে।

কেতকী যেন জল! যখন যে পাত্রে থাকে সেই আকারই ধারণ করতে পারে। বলে সে,

—ঠিক কইছস কালু! গিরিজাটা হারামীই!

কালু দশ টাকার নোটটাই ওর হাতে দেয়। কেতকী বলে,

—টাকা লুম না, একখান্ শাড়ি দিবি কইলি—এহন্ দশ টাকা দিই ব্যস্।

হাসে কালু—এই ফাঁকে কেতকীকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,

—তোরে কালই শাড়ি দিমু। এ চালান ডা আসতি দে।

—ঠিক তো!

খেতুবাবুকেও দেখছে কেতকী। দুপুরের নির্জনতার মাঝে খেতুবাবুর দুচোখ জ্বলে ওঠে কেতকীকে দেখে। মেয়েটার দেহ ছাপিয়ে এখন যৌবন এসেছে। বয়সের তুলনায় কেতকীর দেহটা অনেক পুষ্ট। চোখে ওর ঝিলিক জাগে। কেতকীও ক'মাসে দেখেছে অনেক কিছু।

বলে সে—আর আসবো না।

—কেন? খেতুবাবু হাঁপাচ্ছে কি উত্তেজনায়। কেতকী বলে,

—চাল যা দিচ্ছ সব কাঁকর! বড্ড ঠকাও বাপু।

খেতুবাবু দাবড়া দু'হাত দিয়ে কেতকীকে তার রোমশ বুকের উপর টেনে নিয়ে বলে—আজ বাসমতী চাল আর একনম্বর ডাল দেব!

কেতকীর গায়ে মুখে লাগছে লোকটার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। ওর হাত দুটো কেতকীকে টানছে নির্জন গুদাম ঘরের দিকে। কেতকী পুরুষদের মনের ঝড়টাকে দেখেছে, গিরিজা—কালু, দুনম্বরের সতীশ রায়, ক্ষুদিরাম হোমিওপ্যাথকেও দেখেছে, সবাই একই। যেন কি হামলে পড়ে খেতে চায়।

বলে কেতকী—ছাড়গো। কেউ এসে পড়বে, কি যে করো বাপু!

খেতুবাবু —তাহলে আজ রাতে বাসায় আয়।

কেতকী হাসে। বলে সে—যাবো একদিন।

খেতু বলে—নাহয় চল না রায়পুরে ঘুরে আসি ভটভটিয়ায় চেপে। সিনেমা দেখে হোটেলে খেয়ে দেয়ে আসা যাবে।

কেতকী ভাবছে কথাটা। খেতু ততক্ষণে একথলি চাল-চিনি-ডাল এনেছে। বলে সে—রিক্সা ডেকে দিচ্ছি, সে নিয়ে যাবে, আর আজ সন্ধ্যায় তাহলে চল।

কেতকী বলে—ক'দিন আর যাবো বাবু, শুনছি বনবাসে চলে যেতে হবে।

খেতুবাবু চমকে ওঠে। তবু বলে সে—সে কবে হবে কে জানে!

কেতকী বলে—আমাদের ঘর হোক এ তোমরা চাওনা, না গো?

অবাক হয় খেতু—কেন?

কেতকী শোনায়—হলি পর আর আমাগোর গা গতর লুটপাট করতি পারব না, যেন মুরগী পোষা গো। মুরগীরে দানাপানি খাওয়াই গা গতর ভারি কইরা মাংস খায়, আমরা হালা তামাম লোকদের খাওয়নের মাংস হই গেছি!

হাসে খেতুবাবু—কি যে কস্ পাগ্‌লী!

নরম গাল টিপে একটু আদর করে বলে খেতু—তাহলে আইবি, বাস স্ট্যান্ডের আশপাশেই থাকস্ আমি লই যাবো।

কেতকী আজ সন্ধ্যায় গেছল রায়পুরে, গিরিজাও দেখেছে তাকে। গিরিজা শুধোয় —কই যাস্?

আজ গিরিজার জরুরী কাজ আছে, সুধাকান্তদা এসেছে, তাদের জরুরী লিষ্ট তৈরী হবে পুনর্বাসনের, ক্যাম্প অফিসারদের আজ খাওয়ানোর আয়োজন করেছে সুধাকান্তদা, সেখানেই এসব ব্যবস্থার কথা হবে।

এই বসতি দেওয়ার জন্য এর মধ্যে নানাভাবে ধরাধরি শুরু হয়েছে। অনেকে বিশ—পঁচিশ—পঞ্চাশ টাকা অবধি উপরিও দিয়েছে সুধাকান্তদের সমিতির ফান্ডে, গিরিজা জানে কত টাকা জমা পড়বে, অবশ্য সেও কিছু পেয়েছে।

কিন্তু এখান থেকে যদি চলে যেতে হয় বিপদেই পড়বে গিরিজা। আসছিল সে সুধাকান্তের বাড়িতে। শহরের বাড়িতে বসেই সুধাকান্ত এইসব গোপন লেনদেন করে। হঠাৎ গিরিজা তার পাশ দিয়ে অটোরিক্সাটাকে যেতে দেখে চাইল, অবাক হয়েছে সে।

রেশন ষ্টোরের খেতুবাবুর সঙ্গে সেজেগুজে চলেছে কেতকী, চোখে মুখে হাসির আভা। গাড়ির ঝাঁকানিতে মেয়েটা এসে পড়েছে খেতুবাবুর উপরই, একটা হাত দিয়ে খেতুবাবু কেতকীর ফর্সা নরম কোমরটাকে জড়িয়ে ধরেছে। ওই অনুভূতিটাকে মনে করতে পারে গিরিজা, কারণ সেও কয়েকবার জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটাকে। গিরিজার কাছে মেয়েরা সহজলভ্য বস্তুই। সুরভি, মালতী, বকুল, ময়না আরও কত মেয়েকে ভোগ করেছে সে। ওই কেতকীকে ভেবেছিল তার হাতের পুতুল। যে ভাবে হোক খেলাবে।

কিন্তু সেই কেতকী যে তাকেও অবহেলা করে অন্য লোকের ঘনিষ্ঠ হবে তা ভাবতে পারে নি। গিরিজা দেখেছে এর আগে মেয়েটাকে কালু, কনট্রাকটার অতীন ঘোষ আরও দু'একজনের সঙ্গে ঘুরতে।

আজ মনে হয় গিরিজা যেন হেরে গেছে, কোন মেয়ের ব্যাপারে সে এত ভাবেনি। একটার পর একটা মেয়ে তার হাতে এসেছে, খেলার পুতুলের মত। কিছুক্ষণ তাদের নিয়ে খেলে আবার বাতিল করে দিয়েছে, কিন্তু এই মেয়েটাকে নিয়ে আজ ভাবনায় পড়েছে গিরিজা। মনে হয় হেরে গেছে নিদারুণ ভাবেই ওর কাছে, এটা সহ্য করবে না গিরিজা।

কেতকীর তখন এসব দেখার অবকাশ নেই।

খেতুবাবু তাকে নিয়ে গেছে শাড়ির দোকানে, বলে সে—নে কেতকী, পছন্দ করে কিনে নে একটা শাড়ি।

কেতকী যেন স্বপ্ন দেখে, শাড়ি ব্লাউজ কিনে দুজনে এসেছে হোটেল ভেরাবল-এ। মেজেতে পুরু ম্যাটিং পাতা। আলোগুলোর ঔজ্জ্বল্য নেই, ঢেকে ঢেকে অল্প আলোয় জায়গাটাকে যেন স্বপ্নময় করে রেখেছে। মৃদু বাজনার সুর ওঠে। চকচকে টেবিল—গদি আঁটা চেয়ারে বসে কেতকী অন্য জীবনের স্বপ্ন দেখে।

খেতুবাবুই খাবারের অর্ডার দিয়েছে। মদের গ্লাশও আসে—খাবি নাকি রে?

এতটা উন্নতি হয়নি কেতকীর। ডাগর চোখে হাসির আভাষ এনে বলে—কি যে কত্তাবাবু! তুমি বুঝি খাও ওসব!

খেতুবাবুর চোখে তখন নেশার ঘোর। বলে সে,

—তোকে দেখেই নেশা লেগে গেছে কেতকী, ওসব আর খাবো কি?

নির্জন ঘরে কেতকীকে কাছে টেনে নেয়।

কেতকী খুশি মনে বাড়ি ফিরছে। বাসষ্ট্যান্ড থেকে হেঁটে এসে বাড়িতে ঢুকে বাবার চীৎকার শুনে থামলো। পটলাও রুখে দাঁড়িয়ে আছে। আর ললিতা বাবাকে কি বলে চলেছে চড়াস্বরে। শরৎ দাস এবার মেয়েকে সেজেগুজে দামী দোকানের নাম লেখা প্যাকেট হাতে করে ফিরে আসতে দেখে চীৎকার করে ওঠে।

—তুই কোন্ নরকে গেছলি? জবাব দে? একটা তো চোলাই মদ বেচে, আর তুই কি বেচস্? প্যাটে ভাত জোটে না ছেঁড়া কাপড় পইরা থাকি, তগোর এত সাজবেশ বাহারের খর্চা কোন্ বাপ জোটায়?

ললিতা দেখছে মেয়েকে। এ যেন অন্য কোন কেতকী। মায়ের চোখকে মেয়ে ফাঁকি দিতে পারেনি। ললিতা দেখছে ক'মাসের মধ্যেই মেয়েটার দেহ ছাপিয়ে এসেছে যৌবনের ঢেউ, চোখে তার সেই স্বপ্নের খবর। বলে ললিতা স্বামীকে —চুপ করো। আশপাশের লোক শুনছে।

শরৎ গর্জে ওঠে—শোনবে কি? ইবার গায়ে থুতু দিব। এতকালতো বাঁইচা আছি, ওগোর মনের লোভ এত ক্যান হইব? গরীব—বানে ভাসা খড় কুটোর গরীবের মত বাঁচাই ভালো, বেশী লোভ ভালো না।

কেতকী সরে গেল। তার ঘর বলতে ওই টিনের বেড়ার একপাশে একটু আশ্রয়। কোন গোপনীয়তাও থাকে না ওতে। বাবা ভাইদের সামনে কাপড় ছাড়তে লজ্জা করে।

রাত নামে। ললিতা ডাকে মেয়েকে—খাই ল।

কেতকী চাইল। বলে সে—খিদে নাই।

ললিতা শোনায়—বয়স হইছে। আর এত ঘোরার কাম নাই কেতকী। পাঁচজনে পাঁচ কথা শোনায়!

চুপ করে থাকে কেতকী। মনে হয় কোথায় যেন একটা ভুলই করেছে সে। অনেক পেতে চেয়েছিল সে।

খেতুবাবু লোকটার কথা মনে পড়ে। চার নম্বর সেকটারে ঝিলের ধারে থাকে, ওর বাসাটা দূর থেকে দেখেছে, লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারে সে।

এই প্রথম মনে হয় কেতকীর সে একটি ছোট্ট ঘর—একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেলে হয়তো এমনি জীবন থেকে সরে যেতে পারবে, এই বাড়ির পরিবেশও বিষিয়ে উঠেছে।

খেতু দত্ত সকালে স্নান করে ইষ্টমন্ত্র জপ করে, কারণ রেশন ষ্টোর, ডোল এসবের হিসাবে তার দুনম্বরী করা অভ্যাস। বেশ কাঁচা টাকাও আমদানী হয় এর থেকে। বস্তাবন্দী মাল আগে থেকেই শহরের মহাজনের গদিতেই থেকে যায়, নগদ টাকাটা হাতে আসে। ওজনের মার তো আছেই।

অনেক পাপ করে সে। তাই ইষ্টমন্ত্র জপ করে সেটাকে রোজই কমাতে হয়।

হঠাৎ দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে।

খেতু গিন্নীর চীৎকার শোনা যায়—কে এলো দেখতো নটু।

খেতুগিন্নীর ঘর জমজমাট, সকাল থেকেই কলরব ওঠে ছেলেমেয়েদের, চীৎকার করে খেতু—থামবি তোরা।

একটু শান্তিতে ঠাকুর নাম করবো তার উপায় নাই, সকাল থেকেই চেল্লামেল্লি জোড়ে শূয়োরের পাল।

দরজাটা খুলেছে খেতুগিন্নী। সামনে কেতকীকে দেখে চাইল। কেতকী দেখছে কয়েকটা ছেলেমেয়েদের, আর ওই খ্যাংরাকাঠির মত গিন্নীকেও।

গিন্নীর চোখ তো নয়, যেন ট্রেনের সার্চলাইট!

গিন্নী সেই আলোর ঝলক ফেলে তাকে দেখে বলে,—কি চাই?

কেতকী বলে—খেতুবাবু আছেন?

গিন্নী গর্জে ওঠে—তাকে দরকার ক্যান? তুমিইবা কে? এ্যাঁ সাত সকালে বাড়ি আইছো? কি সম্পক্কডা? কই গো—বলি ঠাকুর পূজা পরে কইরো, আসো। কোন্ ঠাইক্‌রাইন আসছে দ্যাখ।

—বলি বেত্তান্তডা কি?

কেতকী চুপ করে গেছে। কি একটা দুর্বার আশা নিয়েই এসেছিল সে। কালও খেতুবাবু বলেছিল তাকে ভালোবাসে। তার জীবনটা নাকি বৃথাই হয়ে গেল, তবু কেতকীকে পেয়ে সে ধন্য।

কেতকী আজ এসেছিল তাকে জানাতে, যদি একটুকু ঘরের আশ্বাস পায় ওই বয়স্ক মানুষটাকে মেনে নেবে। সেই ছোট্ট ঘরের স্বপ্নই দেখেছিল সে। ও জানতোনা যে খেতুবাবু মিথ্যা কথাই বলেছে। তার ঘরে এই স্ত্রী এত ছেলেমেয়ের ভিড়।

খেতুবাবু পুজোর কাপড় পরে এসে কেতকীকে দেখে নিমেষের মধ্যে বদলে যায়, বলে সে,

—কি চাই? এ্যাঁ রেশন কার্ডের গোলমাল তো অপিসে আইবো? ঘরে কি? আর শালা ক্যাম্পও হইছে নরকপুরী, যত্তোসব! জয় গুরুদেব।

খেতুবাবু নিমেষের মধ্যে বদলে গেছে। ও চলে গেল গুরুদেবকে ডাকতে। গিন্নীও তখন শোনায় কেতকীকে,

—মরণ। ক'খান কাড বাড়তি রাখছো? যাও দিন। চুরি করবা আর ধরা পড়লেই আইবা এখানে।

মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। কেতকী নেমে এল।

রাগে লজ্জায় অপমানে জ্বলছে সে। ক্রমশঃ কি হতাশার ছায়া ওকে ঘিরে ধরেছে, একাই ফিরছে। অনেকটা পথ।

ঝিলের এদিকে এসে হঠাৎ গাছের ছায়ায় গিরিজাকে দেখে চাইল। সুধাকান্তবাবুর ইজারা নেওয়া এ ঝিল! গিরিজা এসেছিল আজ বৈকালে মাছ-এর চালানের হিসাব দিতে, হঠাৎ কেতকীকে এখানে দেখবে ভাবেনি।

কালকের জ্বালাটা আজ তার মনে ঠেলে ওঠে।

—শোন।

দাঁড়ালো কেতকী, গিরিজা বলে,

—ক'দিন দেখছি কালু, ঘোষবাবু, খেতুবাবুদের সঙ্গে খুব মিশছিস? খেতুবাবুর সাথে কাল শহরে গেছলি?—খুব পিরীত দেখতাছি?

কেতকী চাইল ওর দিকে। ডাগর দুচোখে ওর জল নামে। কেতকী আজ হেরে গেছে নিদারুণভাবে।

—কি জবাব দে?

কেতকী বলে—ওরা সবাই শয়তান! শয়তানদের মিথ্যে ছলাকলায় ভুলছি এ্যাদ্দিন। ওগোর মুখে থুক্ দিই!

গিরিজা দেখছে মেয়েটাকে। বলে সে,

—নিশা কাটছে তাহলে?

কেতকী বলে—সবাই মিথ্যুক—লোভী—শয়তান! তুমিও বাদ যাও না গিরিজা দা! আজ কারোরে বিশ্বাস করি না। সব স্বপ্ন আমার মুছে গেছে গিয়া।

মেয়েটার দুচোখে জল নামে।

কোনরকমে চলে গেল সে। গিরিজা আজ বেশ কড়া কথাই শোনাতে চেয়েছিল, কিন্তু মেয়েটার চোখের জল দেখে থেমে গেছে সে। রাগ তারও কমে গেছে, দুঃখই হয় মেয়েটার জন্যে।

দুপুরেই অর্ডারটার কয়েকটা কার্বন কপি অপিসের বাইরের লম্বা দেওয়ালে লটকে দেওয়া হয়েছে। তখনও রোদের তেজ কমেনি—জ্বলছে তামাটে প্রান্তর। ঘুমন্ত ক্যাম্প যেন জেগে উঠেছে। কাতারে কাতারে লোক-জন—ছেলেমেয়ে এসে ভিড় করছে।

ওদিকে মাইকেও ঘোষণা করা হচ্ছে নামগুলো।

দীর্ঘ ক'বছর টানাপোড়েনে—দিল্লী কলকাতা ফাইল চালাচালির পর এবার মঞ্জুর হয়েছে প্রায় আট হাজার পরিবারেব দণ্ডকারণ্যের নোতুন বসতিতে পুনর্বাসনের খবর।

ধস্তাধস্তি চলেছে সেই লিস্টের সামনে। সুধাকান্ত লোকজনদের নিয়ে এসেছে। তারাই ভিড় সামলায়. কে ছিটকে পড়েছে—কেউ ধুকছে। তবু নামটা শুনে চীৎকার করে ওঠে আনন্দে।

মাটি-ঘর-বসত পাবে আবার। এই ভিক্ষান্নের দান থেকে নিষ্কৃতি পাবে। ক্যাম্পের আটহাজার পরিবারের অনেকেই আজ সুখী। সুখী হয়েছে নিশিকান্ত, শরৎ দাস, গোবিন্দ, রামানুজরা অনেকেই। তাই সন্ধ্যায় হরিসংকীর্তন পুজো চলেছে।

আর দু-তিন দিন পরই তাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে সেই নোতুন বসতে, উলুধ্বনি ওঠে—শঙ্খধ্বনি ওঠে হরির আটচালায়।

কালু, নরেশরা ভাবনায় পড়েছে। এতদিন এখানের জীবন —শহরের জীবনকে দেখেছে, এবার তাদের যেতে হবে দূর বনরাজ্যে। আর সেখানে কে কোথায় থাকবে জানে না, শুনেছে বিভিন্ন পরিবারকে বিভিন্ন অঞ্চলে রাখা হবে।

ভাবনায় পড়েছে পটলও। এখানে ধামতারির মহাজন রঘুনন্দন যাদব আর চৈত সিং-এর ধাবায় মাল চালান দিয়ে বেশ দুপয়সা পেতো।

সিনেমা দেখতো, ফূর্তি করতো। সেইসব বন্ধ হয়ে যাবে। আজ সেও গুম হয়ে গেছে।

আব গিরিজা—কৃপাসিন্ধুও বিপদে পড়েছে। তাই ছুটে গেছে সুধাকান্তের কাছে।

সুধাকান্ত এর আগে থেকেই আবার তিন চারজনকে রিক্রুট করেছে। তিন নম্বর ব্লকের মাধব, সাত নম্বরের যদুপতিরা এরমধ্যেই সুধাকান্তের মাছের, দুধের কারবারে লেগে গেছে। উন্নয়ন সমিতির কাজও দেখছে। ওদের এখনও পুনর্বাসন হয় নি। তাই ওদের একটা রাগ রয়েছে ওই যারা পুনর্বাসন পেয়ে গেল তাদের উপর।

তাই গিরিজা আর কৃপাসিন্ধুকে ঢুকতে দেখে চাইল যদুপতি। গিরিজা ওদের দেখে অবাক হয়। যদুপতি

বলে,—এসো গিরিজা, কৃপাদা। যাক বাঁইচা গেলে তুমরা। এহন জমি ক্ষেতি করবা মানুষের মত। আমাগোর বরাতে সেই ভিক্ষাই রইয়া গেল গিয়া। ভাগ্যবান তোমরা। সুধাদার কৃপায় হইছে।

কৃপাসিন্ধু তবু সুধাকান্তকে বলে,

—না হয় চাকরীই করুম। পুনর্বাসন লইয়া বাড়ির ওগোর পাঠাই দিমু সেখানে।

গিরিজা বলে—তাই ভালো।

সুধাকান্ত ওদের হঠাতে চায়। বলে সে,

— তা হয় না গিরিজা, কৃপাসিন্ধু। ফ্যামিলি মেম্বারদের সকলকে নিয়েই ওই পুনর্বাসনের অর্ডার। কৃপা তুমি কর্তা, তোমার নামেই জমি বাড়ি দিচ্ছে সরকার, তুমি না গেলে হেটো ক্যানসেল হইব। সরকার আর কোন দায়িত্ব রাখবে না।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন লওনি—তোমারে উদ্বাস্তু কল্যাণের কাজে ক্যামন করি রাখি?

অর্থাৎ কৃপাসিন্ধু থাকবে না এখানে, যেতেই হবে তাকে। সান্ত্বনার সুরে বলে সুধাকান্ত,

—যাও। আরে খেলতে জানলি কানাকড়ি দিয়েই খেলা যায়, ওখানেও আমার ঠিকাদারির কাম দেখবা দুজনে; ব্যবসা করবা। সব হইব।

যাও গিয়া। আমার জরুরী কাম আছে।

অর্থাৎ তাদের জোর করেই তাড়িয়ে দিল সুধাকান্ত। বাইরে এসে গর্জাচ্ছে কৃপাসিন্ধু—হালা চোর। ডাকাইতি কইরা চলছে—দিমু হক্কল কথা ফাঁস কইরা! হাজার হাজার গরীব উদ্বাস্তুব রক্ত শোষছে।

গিরিজা চুপ করে কি ভাবছে, বেশ বুঝেছে সে এবার তাদের চলে যেতেই হবে বনবাসে। সুধাকান্ত চেষ্টা করে সেই ব্যবস্থাই করেছে। মনে হয় একেবারে ছেড়ে দেবে বাড়ির সম্বন্ধ, কিন্তু এও জানে ক'বছর আগে সীতানাথ ছিল সুধাকান্তেব ডান হাত। সে ওর কাজের খবর কিছু প্রকাশ করেছিল ভাগের গোলমাল হতে। তার কয়েকমাস পরেই সীতানাথকে পাওয়া গেল মৃত অবস্থায় ঝিলের ওদিকের বনে। তার মৃত্যুটার কোন কিনারাই হয়নি।

গিরিজা জানে তাকে দল বাতিল করিয়ে সুধাকান্ত একদিন শেষ করে দেবে। ওর টাকা—লোকজন সবই আছে। গিরিজা যদি সুধাকান্তের টাকার লোভে নিজেকে বিক্রী না করে প্রতিবাদ দলই গড়তো নিজের, হয়তো এভাবে সুধাকান্ত তাকে জব্দ করতে পারতো না।

রাত্রি নেমেছে কলোনীতে।

গুম হয়ে বসে আছে কেতকী বটগাছের নীচে। রাতেরবেলায় এখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। দিনে গরম আর ভোর রাতে শীত করে। তারাগুলো জ্বলছে, ক'দিন পরই চলে যাবে এখান থেকে কেতকী। সব আশা-স্বপ্ন মুছে গেছে। হারিয়ে যাবে বনের গভীরে। শহর—একটি ঘরের আশ্বাস সব তার হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ গিরিজাকে দেখে চাইল।

—তুমি!

তারার আলো পড়েছে গিরিজার মুখে। সেই তেজী উদ্ধত ভাবটা আজ নেই। কেতকী হঠাৎ যেন ওই পরাজিত মানুষটার জন্যে কি বেদনা বোধ করে।

শুধোয় সে—কি হ'ল?

গিরিজা ওকে দেখে চাইল, বলে সে—তুই সেদিন বলেছিলি এখানে সব শালাই চোর! বেইমান। সেদিন হেসেছিলাম, আজ মনে হয় তোর কথাটাই সত্যি রে। এটা বেইমানির দুনিয়া। সব ব্যাটাই চোর। মায় আমিও। তাই লাথি খেয়ে এসেছি।

কেতকী ওর দিকে এগিয়ে আসে।

শুধোয় সে—কি হ'ল? পুনর্বাসন পাইছি। তোমরাও পাইছ। নিশিকাকা কয়—বাঁচলাম। বাবাও তাই কয়। আবার ঘর পাইছি কতোদিন পব।

—ঘর! গিরিজার কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গের সুর ওঠে। বলে সে,

—বনের মধ্যে যাইয়া বাঁচার লড়াই করতি হবে! এর নাম ঘর বাঁধা!

কেতকী আজ এই জীবনের ছলনাকে বুঝেছে। দেখেছে এরা শুধু দেহটাকেই চায়, খেতুবাবুদের মত লোকই বেশী। তাতে কেতকীরা বার বার ঠকেছে। গিরিজাও।

কেতকী বলে—বেশী লোভ করতি নাই। মনের জ্বালা শুধু বেড়েই ওঠে। তাই কই—বনবাসে চলো। সেখানেই ঘর বাঁধবো!

চমকে ওঠে গিরিজা। কেতকীকে সেদিন শাসন করতে চেয়েছিল নিষ্ঠুরভাবে। জোর করে তাকে দখল করতে চেয়েছিল, লুট করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই মেয়েটার মনের অতলের যন্ত্রণাটাকে দেখেনি। আজ কেতকী নিজে এগিয়ে এসেছে তাকে সান্ত্বনা দিতে। তবু বলে গিরিজা—ঘর বাঁধতে বলছিস কেতকী, কিন্তু কোথায় বাঁধবি ঘর?

কেতকী বলে—এরা আমাদের আগেই বাতিলের দলে ফেলেছে গো! বোঝনি?

হয়তো তাই। নাহলে এভাবে বিনা দোষে—কি পাপে তারা এই পথে পথে ঘুরছে তা জানে না। তাই রাগও হয়—জ্বালা ধরে মনে। গিরিজা বলে,

—ঠকছি আর ভুগছি ক্যান? মনে হয় তাই সব জ্বালাই দিই। শ্যাষ কইরা দিই। ঘর বাঁধনের দুঃখটাই শুধু বাড়বে কেতকী।

কেতকী বলে—ওসব ভাবার শ্যাষ নাই। মনের জ্বালাডাই বাড়ে গো। যা পাই তাই লই খুশি থাকতি চাই। আগে বুঝিনি—এহন সেটা বুঝছি।

গিরিজার হাতে ওর হাতখানা। দুজনে এই রাতের অসীম অন্ধকারে কি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখে। কেতকী চায় সামান্য কিছু পেয়ে সুখী হতে, নোতুন করে বাঁচতে, আর কোন মোহ তার নেই।

আট বছরের জীবনের দিনগুলোকে পিছনে ফেলে মানুষগুলো চলেছে আজ নোতুন বসতে। ওদের মনে অনেক আশা স্বপ্ন! নিশিকান্ত—শরৎ দাস—রামানুজ—গোবিন্দরা চলেছে ক'বছরের ঘর সংসার গুটিয়ে।

পটল—কালু—নরেশদেরও যেতে হচ্ছে। গিরিজা—কৃপাসিন্ধুরাও যাচ্ছে। সারবন্দী ট্রাকে মাল উঠছে। কয়েকদিনে এই লোকদের নিয়ে গিয়ে হাজির করা হবে নোতুন বসতে।

কালু বলে—গিরিজাদা, চলো বনবাসেই যাই গিয়া। হালায় সেখানে যদি গড়বড় দেহি জ্বালাইয়া দিমু। কি কও কৃপাসিন্ধুদা?

কৃপাসিন্ধু বলে—তাই চল।

নবীন রায় এদের কথাবার্তা শুনেছে। দেশে মাষ্টারীতে ঢুকেছিল পাশ করে। তারপর নানা ঘাট ঘুরে এখানে ন'বছর পড়েছিল। তবু ক্যাম্প-এ ছেলেদের পড়াবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দেখেছে নবীন ওই জীবন এদের সবকিছুকে যেন শেষ করে দিয়েছে।

নবীন বলে—ইস্পাতের ছুরিও পড়ে থাকলি মর্চে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের বাল্যকালও তাই গো। তখন থেকেই যদি দেখে বাড়ি নাই—ঘর নাই। বাবা মাও ভিখারী, তাদের ছেলেমেয়েদের অন্ন জোগানোর সাধ্য নাই। সেই পোলাপান-এর দল তখন বিগড়ে যায়। নষ্ট হয়ে যায়।

একটা জেনারেশন শেষ হই গেছে হালদারমশাই। এরা যদি সমাজের ভবিষ্যৎ হয় তাহলে সমাজের, দেশেরও সর্ব্বোনাশ হইব। দেশ স্বাধীন হওয়ার এই দাম। বীজ ধান যদি নষ্ট হয়—ক্ষেতে ফালাইলে ধান হইব না। ঘাসই হইব। তাই হইছে।

শরৎ দাস একথার সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে তার জীবনেই। পটল কেতকীকে দেখেছে। দেখেছে ক্যাম্পের ওই ছেলেদের।

কিন্তু করার তাদের কিছুই নেই।

ট্রাকগুলো চলেছে ক্যাম্প থেকে। অনেক তাঁবুই খালি হয়ে গেল, শূন্য হয়ে গেল অর্দ্ধেক ক্যাম্প। এরা চলে গেল দূর বন পাহাড়ের দিকে।

ওরা সকালবেলা বের হয়েছে। ক্রমশঃ পাহাড়শ্রেণী দেখা যায়। দণ্ডকারণ্যের শুরু। ক্যাম্প-এর খাতা থেকে এদের সকলের নাম মুছে গিয়ে নাম উঠেছে দণ্ডকারণ্য উন্নয়নের খাতায়।

পাহাড় আর বন। পাক দিয়ে উঠছে রাস্তা পাহাড়ের গায়ে । ট্রাকে চুপচাপ বসে আছে মানুষগুলো। শরৎ দাস বলে,

—এ যে গহন বন নিশিদাদা, পাহাড়ও তেমনি।

কুন্তি বুড়ি দুহাত জোড় করে নমস্কার করে ওই বন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। বলে সে—এহানে রামসীতা লীলা করেছে রে। এ হেই দণ্ডকবন!

ওর ভক্তিবিনম্র নমস্কার দেখার মত অবস্থা এদের নেই। ছায়া নেমেছে দীর্ঘ শালগাছ ঢাকা বনে, ট্রাকের গর্জন ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। গহন অরণ্যের ধ্যান সমাধিস্থ মূর্তির গাম্ভীর্যের মাঝে এরা স্তব্ধ হয়ে গেছে, মুখের হাসি মুছে গেছে।

ক্রমশঃ আবার অধিত্যকায় উঠে বন পাহড় কমে যায়। দেখা যায় শস্যক্ষেত্র। ধানও হয়েছে, মাথা তুলেছে মকাই-এর সবুজ খেত। আশপাশে কিছু গ্রাম বসত দেখা যায়। আম কাঁঠাল কলার বন, কোথায় সাইকেলে লোক চলেছে। গরুর গাড়িতে মালপত্র নিয়ে চলেছে হাটে। গ্রামের দিঘিতে দেখা যায় জল, স্নান করছে বৌ-ঝি-লোকজন, বাংলার গ্রামের মতই। তবে কিছুটা রুক্ষ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলের মত মাটির রং।

তবু আশা জাগে। কে বলে,

—এসব সেটলার্স ভিলেজ। মানে উদ্বাস্তুদের গ্রাম। কয়েক বছর আগে এসে ওরা এখানে বসবাস শুরু করেছিল বন কেটে। এখন মাটির বুনো ভাব গেছে, এরাও বদলেছে মাটিকে। এখন ফল ফসল হয়, মাঝে মাঝে সব্জীর খেতও দেখা যায়। গরু নিয়ে চলেছে রাখালরা। কোথাও চাষী লাঙ্গল দিচ্ছে মাঠে।

বৈকাল নাগাদ এসে যাত্রা থামল উমরকোট-এর জোন অপিসের সামনের মাঠে। চারিদিকে এখানে সবুজের আভাষ: কোথায় ড্যাম থেকে জল আসে মাঠে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে কর্মচারীদের ছোট-বড় সুন্দর কোয়ার্টার। ওদিকে বড় হাট, গঞ্জ সামনে স্কুল—ওপাশে বোর্ডিং—বিরাট সব্জীর খেতে ঢেড়স-কুমড়ো-ঝিঙে নানা সব্জী রয়েছে। ফুটবল খেলছে ছেলেরা। মাঠের ওদিকে বেশ এলাকা জুড়ে 'হাসপাতাল'। কয়েকটা শেডে এদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে, খাবার আয়োজনও করেছে কর্তৃপক্ষ।

শরৎ দাস—নিশিকান্ত—নবীন—রামানুজরা এর মধ্যে ট্রাক থেকে নেমে জায়গাটা বেশ ঘুরে ঘুরে দেখেছে। ওপাশে রাস্তার ধারে দোকান-পশরা, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকানও রয়েছে, কড়াই-এ গরম চমচম রসে ফুটছে। বাতাসে মিষ্টি সুবাস ওঠে।

নিশিকান্ত হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো! এই সুবাস তার চেনা! মনে পড়ে নদীর ধারে কীর্তনখোলা গঞ্জের দিনগুলোর কথা। হাটের দিন নৌকার ভিড় জমে। শশীময়রার দোকানে মিষ্টি তৈরী হতো।

নসুরাম—কালিপদ আরও অনেক দোকানদার বসতো বাঁশের মাচায়।

—কে হালদার কাকা না? চমকে ওঠে নিশিকান্ত। দেখছে দোকানদারকে। মাঝ-বয়সী লোকটি বলে—আমি রবি, কীর্তনখোলার শশী মাদকের ছেলে। নিশিকান্ত ওকে এইবার চিনেছে, ছেলেটাকে দেখেছিল তখন অনেক ছোট। নিশিকান্ত ওকে জড়িয়ে ধরে।

—তুই, রবি! কত বড় হইছিস গিয়া! কতদিন পর দেখছি তরে, ভালো আছিস তো? শশী ক'নে?

রবি জানায়—বাবা সাতনম্বর জামমুণ্ডায় বাড়ি জমি করছে। ভালোই আছে। আমি গঞ্জে দোকান দিছি। বহেন—জল খান।

টাটকা চমচম তুলে দেয় সবুজ শালপাতায়। সেই স্বাদ—নিশিকান্তের চোখ দিয়ে জল নামে। বলে নিশিকান্ত,

—এই মুলুকেই আইলাম রবি। তরা ঠাকুরের দয়ায় সুখী হইছস—

রবি বলে—প্রথমে আমরা এখানে এসে খুব কষ্টে ছিলাম কাকা। গ্রামখান্ তো বনের ধারে। ক্ষেতি করি

হরিণ—বনবরায় শেষ করে। ধানও হয় না। শেষ মেষ জানোয়ার মারি এখন গ্রাম বাড়ছে। মাটিও বেইমান নয়—লেগে থাকলে রূপ বদল হইবই! দেখবেন এহন কতো সুন্দর গেরাম, কলার বন—ফসলের খেত, সব আগে বনে ঢাকা ছিল, মানুষ এরে গড়ছে।

নিশিকান্ত বলে—শোন শরৎ, নবীন—রবির কথা। আমাদের ওই ছ্যামড়াদের কইবা জীবনটাই লড়াই। লড়াই কইরা গড়তি হবে। শহরের নেশাডা যেন ছাড়ান দেয়।

কথাটা ভেবেছে গিরিজাও। গিরিজা আর কেতকী দুজনে বের হয়েছে হাটতলার ওদিকে—সন্ধ্যার মুখে বিজলি বাতি জ্বলে, কোয়ার্টারগুলোর সামনের বাগানে বোধহয় স্বামী-স্ত্রী বসে আছে। ওদিকে বোর্ডিং-এ ছেলেদের কলরব ওঠে।

দুজনে চেয়ে থাকে ওই গ্রাম বসতের দিকে। এরা এই বনের গভীরে এসে শান্তিতে আছে। কেতকী বলে—আমরাও সুখী হবো।

কালু—পটল—নরুর দল ঘুরছে এদিকে ওদিকে। পথের ধারে চায়ের দোকানে বসে চা সিগ্রেট আর পান খাচ্ছে। পটল দোকানের আয়নায় চিরুনী দিয়ে চুলটাকে ঠিক করতে করতে শুধোয়—এখানে সিনেমা নেই?

দোকানদার সিনেমার সম্বন্ধে যেন আদৌ আগ্রহী নয়। বলে সে—দণ্ডকারণ্য অথরিটি দেখায় বটে ছবি টবি আর আছে কোন্ডে গাঁয়ে। তয় যায় না বড় কেউ! খেতের কাজ কাম আছে। দোকান পত্তর আছে। তয় যাত্রাগান হয় আমাগোর দলের।

পটলা ওসব ব্যাপারে আগ্রহী নয়। কালু বলে—জিগা না মাল ফাল যদি মেলে একটুন্।

দোকানদার দেখছে ওদের। নোতুন ছেলের দল চলেছে বনরাজ্যের নোতুন বসতে আর পথে মদের খোঁজ করছে। কালুর কথায় দোকানদার বলে—ক'বছর মানা ক্যাম্পে পইড়া থাকি বেশ উন্নতি করছ লাগছে? তয় যাচ্ছো মালকানগিরির জঙ্গলে মাল-এর নিশা ছুটি যাবে। লাজ লাগে না তুমাগোর?

কালু শহরের মেজাজ এনে বলে—কি হইছে? খুবতো জ্ঞান দিতেছ? পটলা চটে ওঠে। বলে সে—দিমু ঠাণ্ডা কইরা। বনে বাদাড়ে পইড়া আছো আবার কথা কওন লাগে?

দুচারজন দোকানদার—লোকজন জুটে গেছে। নিশিকান্ত—নবীন—শরৎ দাসরা ফিরছিল। ওরা এগিয়ে আসে।

—তরা।

ছেলেগুলো চুপ করে যায়। বলে দোকানদার,

—আমাগোর ছাওয়ালো ছেল কত্তা, তহন দুঃখ ধান্দা করি মাথার ঘাম পায় ফেলাই ই বনরাজ্যে আসি খাটছি, আজ বাঁইচা আছি ছাওয়ালদের লই। আর ইদের নিই ওই বনবাসে যাবে? এতো শহরের রোগ ধরছে।

নবী দেখছে ছেলেদের। মনে হয় তার মতে এরা সেই বিনষ্ঠ ভবিষ্যৎ পুরুষ। কোথাও শান্তি নেই এদের জন্য। নিজেরাও জ্বলবে, জ্বালাবে অপরকেও এদের লোভের আগুনে। যোগ্যতা অর্জন করে লোভ করলে সে উন্নতি তবু করতে পারে তার যোগ্যতা নিষ্ঠা দিয়ে, কিন্তু কোন যোগ্যতা যাদের নেই তাদের লোভটা যদি বেড়ে ওঠে তাতে অশান্তি আর সর্বনাশের আগুনই ধরবে।

নিশিকান্ত বলে দোকানদারকে,

—কিছু মনে করবেন না কত্তা। ওগোর হই আমরা মাপ চাইছি। চল—চল হারামজাদের দল।

শরৎ দাস এগিয়ে গিয়ে পটলের চুলের মুঠি ধরে কয়েকটা চড় চাপড়ই বসিয়ে দেয়।

গিরিজা কেতকী ফিরছিল। সুরভি-যমুনারাও ঘুরছে। নির্জন গাছের নীচে ওদের দেখে এগিয়ে আসে সুরভি—তুই, কেতকী! গিরিজাদার সাথে গেছলি?

যমুনা দেখছে ওদের।

সুরভি বলে—কি গো গিরিজাদা, এখন সুরভিরে আর চিনতেই পারো না। তয় নূতন ফুলের সন্ধানে ঘোরছো?

গিরিজা বলে—তোর আবার মানুষের অভাব? এ্যাঁ—চৈত সিং-এর ধাবাতে থাকলেই পারতিস। আর কালুতো সঙ্গেই আছে।

সুরভি বলে—উ শ্লার ট্যাকে তো কানাকড়িও নাই। দেখি নোতুন মানুষ জোটে কি না?

যমুনা হাসে উদ্দাম হাসি। বলে সে,

—কেতকী উ শ্লাকে বিশ্বাস করবি না খবরদার? আমাকে ও ফাঁসিয়েছিল।

কেতকীর ভালো লাগে না। দুজনে এগিয়ে চলেছে। গিরিজার আগেকার রূপটা যেন ওরা কেতকীর চোখের সামনে তুলে ধরেছে। গিরিজা সেদিন কি নেশার ঘোরে ভুলই করেছিল। আজ সেই শহরের জাঁকজমক—ক্যাম্প-এর ভিড়—সেখানে সুধাকান্তের সর্দারির চ্যালাগিরির পদ হারিয়ে নিজেকে অসহায় মনে করে গিরিজা। সে যেন একা —নিঃসঙ্গ। তাই একটি নির্ভর পেতে চায়।

বলে সে কেতকীকে—এ্যাই। রাগ করলে ওদের কথায়?

কেতকীও ভাবছে কথাটা। মনে হয় তার পাশেও কেউ নেই। কোন আশাই নেই। তাই ভরসা করেছিল সে গিরিজার উপরেই। তার পরিচয় পেয়ে মনে হয় অনেক ঠকবে সে। কি বেদনায় তার চোখে জল নামে।

অবাক হয় গিরিজা—এ্যাই! কাঁদছো নাকি?

কেতকী বলে—না। কার জন্যি চোখের জল ফেলবো?

বলে গিরিজা—বিশ্বাস কর তুমি। সেদিন ভুলই কবছিলাম ওই বাজে মেয়েগুলোর সাথে মিশে। ওরা মিশেছিল সেদিন নিজেদের দরকারে। আজ মনে হয় ভুলই করেছি। আর সে ভুল করুম না কেতকী। কথা দিচ্ছি তোমারে।

কেতকী চাইল ওর দিকে।

নোতুন করে যেন চিনেছে গিরিজাকে। গিরিজা বলে—ঘরই বাঁধুম কেতকী, জীবনের সাথে লড়াই কইরা বাঁচুম তোমারে লইয়া। ভুল আর হইব না।

কেতকীকে আবেগভরে কাছে টেনে নেয় সে। কেতকী আজ কি নিশ্চিন্ত আবেশে ওর কাছে ধরা দেয়। মনে হয় তার এত অন্ধকারেও কোথায় বাঁচার আশ্বাস আছে।

....পরদিন আবার যাত্রা শুরু হয়। ট্রাকগুলো চলেছে—উড়িষ্যা অন্ধ্রের সীমান্তের দিকে। ইন্দ্রাবতী নদীর ব্রিজ পার হচ্ছে তারা। লাল মসৃণ উর্বর পলিঢাকা মাটিতে বিস্তীর্ণ—আখের খেত সবুজ রং নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নবীন বলে—বাহারের আখ হইছে নিশিকাকা।

নিশিকান্ত, শরৎ দেখছে উর্বরা মাটিকে। নদীর ক্ষীর ধারায় এর মাটি সরস সবুজ।

বেশ কিছুটা এসেছে তারা। পথে পড়ে জেপুর শহর।

বাঁদিকে চলে গেছে পাহাড়ের উপরে জেলাশহর কোরাপুটের দিকে রাস্তা। সোজা রাস্তা গিয়ে ঢুকেছে জেপুর শহরে। এককালে এখানে ছিল জেপুর মহারাজার প্রাধান্য।

এখন সে সব দিন আর নেই। রাজা-মহারাজাদেব দিন ফুরিয়ে গেছে। পথের দুপাশে মাথা তুলেছে বিরাট বিরাট বাড়ি, সাজানো আধুনিক দোকান, সিনেমা হাউস।

কালু পটলরা চলেছে একটা ট্রাকে। কাল সন্ধ্যার পর থেকে ওরা গুম হয়ে আছে। কালু বলে—হালা সিনেমা এখানে আছে গিয়া।

শহরে দাঁড়াবার সময় নেই, শহর ছাড়িয়ে ট্রাকগুলো চলেছে এবার নোতুন জগতে, ক্রমশঃ শুরু হয় পাহাড় আর ঘন বন। এ বনের রূপ আলাদা। বিশাল দীর্ঘ শাল বাঁশবন সোজা মাথা তুলেছে, নীচে দিনের আলোও তেমন ঢোকে না। স্যাঁতসেঁতে আর ঠাণ্ডা—চীহড়লতা পলাশ-এর মোটা মোটা লতা আঁকড়ে রয়েছে গাছগুলোকে, বাতাসে ওঠে নাম না জানা ফুলের গন্ধ।

নবীন দেখছে বনরাজ্যকে।

নিশিকান্ত বলে—এযে গভীর বন হে, যে বন দেখে আসছি তার চেয়েও গভার, পাহাড় গুলোনও বেশ জব্বর।

বাঁদিকে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়গুলো মাথা তুলেছে।

নির্জন পথ। দু'একটা গাড়ি বের হয়ে যায়, সঙ্গে কোন কর্মচারী বলে,

—ওইসব পাহাড়ে যেতে মানা।

—ক্যান! শুধোয় শরৎ!

কর্মচারীটি বলে—ওখানে বোঙ্গা আদিবাসীরা থাকে। ওরা ওখানেই থাকে, নামে না। কোন নীচের লোক গেলে তাকেও শেষ করে দেয় বিষ তির দিয়ে।

চমকে ওঠে কুন্তি বুড়ি—কও কি বাবা! তালি কি মানুষ খায় তারা?

লোকটি বলে—তা শুনিনি, তবে ওদিকে কেউ যায় না ভয়ে।

সেই আদিম অরণ্যভূমির গভীরে চলেছে তারা, দুপুর গড়িয়ে আসছে, দু'একটা পাহাড়ী নদী পার হয়; ব্রিজ রয়েছে, নদীর নামও চেনা চেনা। তমসা—শবরী।

কুন্তি বলে—ইযে রামায়ণের নদী গো?

লোকটা বলে—আমরা যাচ্ছি যেখানে সেখানে নাকি বালিরাজার রাজ্য ছিল।

বনের কিছু এলাকা ফাঁকা—চারিদিকে পাহাড়।

ওদিকে একটা পাহাড়ের উপর কিছু ঘর বাড়ি দেখা যায়, পাহাড়ের উপর থেকে বেশ কয়েকটা বিরাট পাইপ নেমে এসেছে নীচের শেডে। পাকা বাড়ি দেখা যায় অনেক। শূন্য মাঠে বিরাট সব ইস্পাতের টাওয়ার রোদে ঝকমক করে, অসংখ্য তার ইনসুলেটর বসানো, যেন কোন কর্মযজ্ঞ চলেছে।

কর্মচারীটি বলে—ওই সেই বালিমেলা হাইডেল প্ল্যান্ট। পাহাড়ের উপর নদীকে বাঁধ দিয়ে বিরাট লেক করা হয়েছে। সেই ড্যাম-এর জল পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ করে এনে ওই পাইপ দিয়ে নীচের টারবাইনে ফেলে বিজলি তৈরী হচ্ছে।

...ছোট্ট শহর মতই। কিছু কোয়ার্টার বাজার হাটও আছে, ছোট এলাকাটা সুন্দর করে সাজানো। এদের ট্রাক এবার গিয়ে ঢুকেছে ওদিকে বনরাজ্যে, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পটারু নদীর জলধারা, টারবাইন থেকে বের হয়ে জল চলেছে নদী খাত বয়ে। সেই জলধারাকে বাঁধ দিয়ে জমা করা হয়েছে। বিস্তীর্ণ জল জমে আছে। অরণ্যের মধ্যে পাহাড়ে সেখান থেকে ক্যানেল দিয়ে জলকে পাঠানো হবে দূরের মাঠে।

নবীন বলে—না! বন আছে তবু জল পেলে বন কেটে এ মাটিতে ফসল ফলতে পারে কাকা। ওদিকের বসতিতে দেখলাম ক্ষেতি—জমি। ফসল ভালোই হইছে।

মাথা নাড়ে শরৎ।

বৈকাল নাগাদ তারা এসে পৌচেছে ঘুর পথে মালকানগিরির জনবসতে। অমরকোট-এর মতই এটা সমতল, বিরাট একটা দিঘি পথ পদ্মবনে ঢাকা। লোকে বলে বালি সাগর!

রামায়ণের বালিরাজার নামেই এই সরোবার, সবুজ পদ্মবন লাল ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে, এখানেই নাকি বালি রাজা স্নান করে তর্পণ করতো কোন অতীত যুগে।

এ সবই প্রবাদ মাত্র।

সেদিনের মাল্যবান গিরির আজ

মালকানগিরির বাজারে তখন বৈকালের ভিড় জমেছে। এদের ট্রাকগুলো এসে শহরের বাইরে জোন অফিসের ওদিকের মাঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত ধূলি ধূসর মানুষগুলো নামছে, অনেকেই ভিড় করে।

এরা আজ যারা মালকানগিরির বসতে রয়েছে তাদের অনেকেরই মনে পড়ে দশ বারো বৎসর আগেকার কথা। তারাও দূর পথ পাড়ি দিয়ে বহু অরণ্য পর্বত পার হয়ে সেদিন পৌচেছিল অরণ্য ঘেরা নির্জন মালকানগিরির বনরাজ্যে।
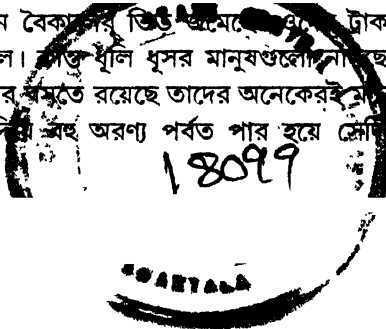
সেদিন তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য তেমন কেউ ছিল না, দণ্ডকারণ্যের কর্মীবিভাগের কয়েকজন কর্মী ছাড়া। তখনও এখানের আশপাশে আদিম অরণ্যভূমি। একটু জমি উদ্ধার করে সেখানে কিছু তাঁবু না হয় লম্বা টিনের চালা করা, আজকের মত ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে পাইপে জলও ছিল না।

ছিল না বিজলি বাতি।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ ডাকতো। দু'একটা মিটি মিটি লণ্ঠন জ্বলছে, গোল করে ছড়িয়ে রাখা হতো কিছু ট্রাক বুলডোজার, আর তারই কেন্দ্রে ছিল কিছু তাঁবু—টিনের চালা।

হুঁসিয়ারী করা হোত রাতে কেউ এলাকার বাইরে যাবে না।

তবু চিতে বাঘ ভালুক হানা দিত। এই জোন অপিস যেখানে হয়েছে সেখানেই মারা হয়েছিল দুটো বিরাট ভালুককে।

আজরে নিশিকান্ত শরৎ দাসের দল সেই মানুষগুলোর সংগ্রামের কাহিনী জানেনা। পটল-কালু-গিরিজার দল দেখছে আজকের সভ্য জগতের একটি জনপদকে।

দণ্ডকারণ্য অথরিটির জোন অপিসে ভিড় জমেছে।

এখানে সেই উদ্বাস্তুদের খাতায় নাম তুলে তাদের কার্ড নম্বর মিলিয়ে নোতুন বসতে এলটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে।

দেওয়ালে টাঙ্গানো বিরাট একটা ম্যাপ।

মালকানগিরির বাজার থেকে এবার যেতে হবে তাদের বনের মধ্যে ছড়ানো সেই নোতুন পত্তনে।

তরুণ জোন অফিসার মিঃ রায় বলেন,

—ডি-ডি-এ আপনাদের প্রতি পরিবারকে বসত বাড়ি সমেত সাত একর করে জমি দেবেন। বসত বাড়ি তৈরী করে দেওয়া হবে—চাষের জন্য বলদ দেওয়া হবে, আপনাদের পরের ফসল না ওঠা অবধি রেশন ডোল দেওয়া হবে। জমি উদ্ধার-এব কাজ করে দেবো যন্ত্রপাতি দিয়ে আমরা, কিন্তু তার পরবর্তী কাজটুকু করতে হবে আপনাদেরই।

আজকের অমরকোট-এর গ্রাম—মালকানগিরির কিছু বসতি দেখেছেন আপনারা, সেগুলো আগে ছিল দুর্গম অরণ্যে ঢাকা, ম্যালেরিয়া—কালাজ্বরও হতো, ক্রমশঃ মানুষের পরিশ্রমে আজ প্রকৃতিকে জয় করে আমরা নোতুন দণ্ডকারণ্য গড়েছি, আপনাদেরও সেই গড়ার কাজে স্বাগত জানাচ্ছি।

মাঠে ওই নবাগতরা শুনছে কথাগুলো। শরৎ দাস-নিশিকান্ত-রামানুজরা কি ভাবছে। নবীন মাষ্টার বলে,

—পরিশ্রম করে আবার গড়তে হবে নিশিকাকা!

শরৎ দাস বলে—তা গড়ুম।

কিন্তু কথাগুলো কালী, পটল, নরেনদের ভালো লাগেনি, ওরা ক্ষুণ্ণই হয়েছে। কৃপাসিন্ধুও এখন ওদের দলের নেতা হয়ে গেছে ক'দিনেই। কৃপাসিন্ধু বলে,

—হালায় বনবাসে আনি কয় খাটো নয় মরবা।

পটলা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলে—চল দেখিগে, নাহলে মজাখান দেখাইমু। কি কও কালীদা।

কালু দেখছে ওপাশে বসে থাকা গিরিজার দিকে।

গিরিজা আর কেতকী ওরা শুনছে কথাগুলো। সুরভি বলে,

—গিরিজা এহন দেহি খুব মজে গেছে গিয়া। ঘর বাঁধনের লাইগ্যা, তর ঘর কদ্দিন রয় হেইটাই দেখুম।

যমুনা বলে—আমার কিন্তু এদের মতলব ভালো ঠেকছে না। তরে কইছি সুরভি— মাঝে মাঝে শহরে যামু। এখান থেকে জেপুর শহরের বাস ছাড়ে। সিধাপথে যাইতে বেশীক্ষণ লাগে না, জেপুর থনে জগদ্দলপুর হই রায়পুরের বাস যায়। ব্যস—বেগতিক দেখলি সিধা কাইটা পড়ুম রায়পুরে।

চৈত সিং কইছে সব ব্যবস্থা কইরা দিবে।

কথাটা ভাবছে সুরভিও। গিরিজা শুনছে ওদের কথাগুলো। মনে হয় ওরা সব পথই চিনে গেছে। বন থেকে পালাবার কথাও ভাবছে, ওরা পালাতে চায় সেই নেশার জগতে।

গিরিজা বলে—রায়পুরে গিয়ে মরবি?

হাসে সুরভি। বলে সে—তুমি তো বাঁচার পথ পাইছ, ঘর পাইছ নাগর, আমাগোর কথা তো ভাবনের কেউ নাই। তাই মরণই ভালো গো।

যমুনা বলে—কেতকী কি কয় রে সুরভি?

সুরভি বলে ওঠে—মাগ নাই ছাওয়াল কান্দে,
ঘর নাই আগল বান্ধে!

কেতকীর হইছে তাই গিয়া।

হাসছে মেয়েরা নির্লজ্জ বেপরোয়ার মত। ধমকে ওঠে নবীন রায়।

—কি হাসছস্ তরা!

ওরা থেমে যায়।

শহরের পালা শেষ, এবার চলেছে তারা আরও ভিতরে নোতুন বসত পত্তনের জায়গার দিকে। আট দশ বছর আগেকার পত্তন করা গ্রাম বসত এখন অন্যরূপ নিয়েছে। পাঠশালে ছেলেদের পড়ার কলরব ওঠে, হাট বাজার বসেছে কোথায়। চাষী ক্ষেতের ফসল নিয়ে চলেছে হাটে। লাউ-কুমড়ো-টম্যাটো-ঝিঙে সবই হয়।

ক্রমশঃ রাস্তার রূপ বদলাচ্ছে, শেয হয়ে এসেছে আগেকার গ্রামগুলোর সীমানা। পিচের রাস্তাব চিহ্নও মুছে গেছে। বনের পথে ট্রাকগুলো চলেছে ধুলো উড়িয়ে, কাঁকর ঢালা পথ কোথাও বনের গভীরে হাবিয়ে গেছে। ছায়া অন্ধকার নামে বনতলে। কোথায় একটা ময়ূর উড়ে গেল ঝটপট করে।

চীৎকার করে এরা—ময়ূর।

একজোড়া বড় শিয়াল বন খেজুরের ঝোপ টপকে লাফ দিয়ে দৌড়লো।

কুন্তী বুড়ি বলে—ই যে বন বে? গভীর বন।

মাঝে মাঝে উইটিপি মাথা তুলছে—ভিজে ভিজে গা, মন্দিরের চূড়োর মত ঠেলে উঠেছে চূড়োটা।

প্রায় দশ বারো ফিট অবধি উঁচু উইটিপিগুলোর দিকে চেয়ে বলে নিশিকান্ত—অ নবীন। বাল্মিকী মুনিও তপস্যা করতি করতি উইটিপিতে ঢাকি গেছল গো!

কালু বলে ওঠে—কত শ্লা বাল্মিকী তালি আছে এ বনে?

শরৎ চাইল ওর দিকে। ধমকে ওঠে নবীন—ত্যানারা মহাপুরুষ,—তাগোর নামে ওসব কথা কইতে নাই।

গজগজ করে কালু—মহাপুরুষ! হঃ হালায় তাগোর দেশে আমাগোর মত কাপুরুষেরে ক্যান পাঠালো সরকার কতি পারো নবীনদা?

কতক্ষণ এসেছে জানে না। হঠাৎ কিসের শব্দে উৎকর্ণ হয়ে চাইল তারা। বনের মাঝে বড় বড় যন্ত্র কাজ করছে। সগর্জনে ধাক্কা মারে গাছগুলোকে, দু'একবার কেঁপে কেঁপে ছিটকে পড়ছে—শাল—মহুয়া—আসান—চাঁপাগাছগুলোর কি কি আর্তনাদ করে। রাজ্যের বাসা ভাঙ্গা পাখীরা কলরব করছে।

মেসিনে গাছগুলো টুকরো করছে, ওদিকে বুলডোজার মাটির পাহাড় ঠেলে আসছে। গাছের মূল শিকড়—নীচেকার ঝুপি জঙ্গল উঠে আসছে। কতো বৎসরের বুনো মাটির উপরেব স্তরকে ঠেলে সমান করে এক একটা বড় পগার দিয়ে জমি বের করা হচ্ছে বিস্তীর্ণ বনঅঞ্চলে।

এরা এগিয়ে চলে, অন্যদিকে ও বনের মধ্যেই কোথাও এমনি বনকাটাই পর্ব চলেছে। সারা বনের কয়েক মাইল ছেড়ে ছেড়ে বেশ কয়েকটা বসতের পত্তন করার আয়োজন চলেছে। কোথায় তৈরী হচ্ছে ঘরগুলোও।

কিছু কিছু ঘর উঠেছে।

বনের গভীরে এসে থামলো ট্রাকগুলো। এখানেও বেশ কিছু ঘর বাড়ি তৈরী হয়ে গেছে। ওদিকে একটা পাহাড়ী ঝর্ণা বয়ে চলেছে বনের ভিতরে। বালুচরের বুকে খানিকটা জল রয়েছে। সেখানে বাঁধ দিয়ে ছোট

ছোট রিজার্ভার করে পাইপ লাগিয়ে জল তোলা হচ্ছে। দু'চারটে টিউবওয়েলও রয়েছে লম্বা শেডের বাইরে।

তাঁবুও পড়েছে। আশেপাশে ছড়ানো রয়েছে ট্রাক—বুলডোজার—ডাম্পারগুলো। ক্যাম্প অফিসার আরও দুচারজন কর্মচারী এগিয়ে আসে ওদের দেখে। নিশিকান্ত—নবীন—শরৎ ওদিকের ট্রাক থেকে ছেলেমেয়ে বৌঝিরা নামছে। এতক্ষণ ওই বনের পথে টলতে টলতে ট্রাকে এসে গাগতর টাটিয়ে গেছে তাদের।

কালু-পটলারাও নেমেছে।

গিরিজা দেখছে এই বনরাজ্যকে। কৃপাসিন্ধু বিরক্তি ভরে বলে—হালায় এই গহন বনে থাকতি হবে?

কালু বিড়ি ধরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে বলে—শুধু থাকলি হবে না কৃপাদা, এরে গড়তি হবে। দ্যাশ উদ্ধার করতি হবে।

পটলা গজরাচ্ছে—এমন গড়ার কাঁথায় আগুন। ওরা থাকবেন শহরে আরামে আর আমাগোর জন্যি বাংলা থনে দূর করি দিই বনবাসে পাঠাবে? ক্যান? আমরা মানুষ লই?

গিরিজা শুনছে ওদের কথা।

রমেন দাসও গজরাচ্ছে—মরণ হতি দেরী হইবো না এহানে। সাপের কামড়ে না হয় বাঘ-ভালুকের প্যাটেই যাতি না হয়।

সুরভি—যমুনা চুপ করে গেছে কি অজানা ভয়ে। ক্যাম্প অফিসার বলে—সন্ধ্যার পর এই এলাকার বাইরে কেউ যাবেন না। এ বনে ভালুক-বনশূয়োর আছে। অর অন্ধকারে সাবধানে চলাফেরা করবেন। কাঁকড়াবিছা—সাপের উপদ্রবও আছে।

রামগতি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। তামাক খাচ্ছে আর কাশছে লোকটা। মানা ক্যাম্পের সেই ছিল নামী অভিনেতা। বরিশালের কোন গ্রামের যাত্রাদলের ছিল একনম্বর অভিনেতা। বয়সকালে গান যা গাইত তা নাকি অপূর্ব, আর তেমনি এক্টো করতো। মানা ক্যাম্প-এ এসে দিনকয়েক মেতেছিল যাত্রার দল নিয়ে। সে সব চলেনি। তবু আশা রাখে রামগতি দরকার হলে কলকাতার দলেই চলে যাবে। সেখানের নট্ট কোম্পানী তার দেশের দল তাকে পেলে লুফে নেবে।

রামগতির গিন্নী বলে—মুখে আগুন তোমার। এবার জমিতে হাল ধরো গিয়া—বসে খাতি আর দেবেনি সরকার। জামাই আইছ?

রামগতি তবুও চুপ করেছিল। ওই সাপ বিছের কথা শুনে বলে—তাহলে আর কি নাই তাই কন? হালায় আমাগোর কি মরতি আনছেন?

ক্যাম্প অফিসার বলে—এর চেয়ে গভীর বনে কত অসুবিধার মধ্যে থেকেছিল আগেকার উদ্বাস্তুরা, তাদের আজ অনেক সুন্দর গ্রাম বসতি হাট দেখলেন। সেসবও গড়ে উঠেছিল এর চেয়েও গহন বন কেটে; তারা পেরেছিল আপনারা কেন পারবেন না?

ক্যাম্প অফিসার বিক্ষুব্ধ মানুষদের দিকে চেয়ে থাকে। এদের ক'বছরে যে অধঃপতনের কাজটা অনেক এগিয়ে গেছে সভ্য জগতে বাস করার ফলে, সেটাকে ধরে নি। আগেকার উদ্বাস্তুরা এসেছিল শপথ নিয়ে, তাদের হারানো ঘর গড়তে হবে। এই তাদের নোতুন দেশ।

তারা পেরেছিল, কারণ সভ্য জগতের অবহেলা আর জ্বালাটাকেই দেখেছিল। আরও কারণ তারা অনেকেই যথাসম্ভব শীঘ্র পারে ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জা থেকে বাঁচতে চেয়েছিল, মনুষত্বকে হারায়নি।

কিন্তু দীর্ঘ আট ন'বছর ক্যাম্পে নিষ্ক্রিয় হয়ে রেশন আর ডোল সম্বল করে ধুকে ধুকে বেঁচে থেকে, আর সভ্য শহরে বাইরের বিকৃতি আর ঠাঁট ঠমক দেখে এরাও ভেবেছে তাদের করার কিছু নেই। সবকিছুই তাদের হাতে পাইয়ে দেবার দায়-দায়িত্ব অপরের। আর সেগুলো যথাসময়ে না পেলেই তারা প্রতিবাদ জানাবে, মিছিল করবে, বিক্ষোভ দেখাবে।

তবু নিশিকান্ত, শরৎ-নবনী-রামানুজ-এর দল ভাবছে তাদের ভবিষ্যৎ-এর কথা।

নবীন শুধোয়—তাহলে আমরা কে কোথায় থাকবো, ঘর-বাড়ি, জমি-জারাত সব দেখাই দিন।

ক্যাম্প অফিসার নির্মলবাবু বলে—সব হবে। আজ রাত্রে ছেলেরা ওই ক্যাম্পে আর মেয়েদের এখানের শেডে থাকতে হবে। দু'চারদিন একটু অসুবিধা করে থাকুন, তার মধ্যে বিভিন্ন গ্রাম-বসতির কাজ, বাড়ি তৈরীর কাজও শেষ হয়ে যাবে। এলটমেন্টও হয়ে যাবে!

কেতকী আর গিরিজা এই ক'দিনে দুজনে দুজনের কাছাকাছি এসে গেছে। গিরিজা বলে—ঘর বাড়ি দেবে শিগগির কইছে!

কেতকী বলে—এক বসতিতে দেবে তো আমার বাবাকেও, নাহলে কোন বনের ভিতর গিয়া পড়বো, তোমার সাথে দেখাও হইব না।

হাসে গিরিজা—যেখানেই যাবে তোমারে আমার ঘরেই আনুম। কেতকী কি লজ্জায় মাথা নামায়। তবু আজ এই স্বপ্নই দেখছে সে।

বলে কেতকী—তোমার বাবারে কইছ?

—কমু!

সন্ধ্যা নামছে আদিম বনরাজ্যে, পাহাড়ের ওদিকে সূর্য ঢলে পড়লেই এখানে আঁধার নামে, সেই আঁধার ঘনতর হয়ে ওঠে বৈকালের মুখেই।

ওদিকে ফাঁকায় কয়েকটা বড় বড় উনুনে কাঠ-এর আগুনে সেদ্ধ হচ্ছে ভাত-তরকারী। ওই ওদের খাদ্য। কোনরকমে বুভুক্ষু মানুষগুলো বসে পড়েছে ওই খেতে। পটলার চৈত সিং-এর ধাবার তড়কা রুটির স্বাদ লেগে আছে মুখে। কালুও মাংসটা পছন্দ করে বেশী, গিরিজারও এসব খাওয়ার অভ্যাস নেই। তবু খেতে বসেছে সে। কিন্তু কালু বলে,

—এসব খাতি পারমু না।

কুন্তি বুড়ি ফুঁসে ওঠে—তরে এক অন্ন পাঁচ ব্যানন দিবে কেডা?

খাতি হয় খা! তা বাপু লাবড়াটা ভালোই রাঁধছে! অ বাবু, একটু তরকারী দ্যান, ভাত দুগা খাই লই।

কৃপাসিন্ধু গজরাতে থাকে। বলে সে ক্যাম্প অফিসারকে,

—রাতে ডাল দিবার কথা, না দিই ওনলি লাবড়া দিচ্ছেন?

নির্মলবাবু দেখছে লোকটাকে। বলে সে গম্ভীর ভাবে,

—কাল থেকে ওসব ব্যবস্থা হবে। আজ তাড়াতাড়ি হয়ে ওঠেনি।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে মেয়ে-পুরুষেরা ভিন্ন শেডে চলে গেছে। টানা খাটিয়া পাতা—ক্লান্ত মানুষগুলো শোবার পরই গড়িয়ে পড়ে ঘুমে। কিন্তু ঘুমোয় কার সাধ্য, মশার উপদ্রবও কম নয়। বুনো মশাগুলো ঝাঁক বেঁধে এসে আক্রমণ করেছে মানুষগুলোকে। রাতের অন্ধকারে ওদের ওড়ার শব্দ ওঠে।

দূরে বনের গভীরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সাবধানী ডাক ডাকছে হরিণের দল, অন্ধকারে বন-বাদাড় ভেঙ্গে কারা দৌড়চ্ছে, জেগে উঠেছে ক্যাম্পের মানুষ। ভীত সন্ত্রস্ত চাহনিতে চেয়ে থাকে রহস্যঘেরা আদিম অরণ্যের দিকে।

কে বলে—বাঘ হইব।

—বাঘ!

ভয় পেয়ে গেছে এরা!

রাতটা জেগেই কাটে প্রায়। কোথায় রাতজাগা পাখী ডাকে কর্কশ স্বরে। এ অরণ্যের যেন নিজস্ব জীবন আছে, ভাষা আছে। বহু শতাব্দী ধরে এই অরণ্যভূমি তার স্বপ নিয়ে বেঁচেছিল। আজকের মানুষ তাকে নিঃশেষে বিনষ্ট করে তার দখল কায়েম করতে চায়।

তাই যেন নীরব নিষ্ঠুর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে হিংস্র আদিম অরণ্যভূমি।

দিনের আলোয় আবার এর রূপ বদলে যায়। সোনালী আলোর আভাষ জাগে, পাখী ডাকে, জেগে ওঠে মানুষগুলো। রাতের সেই বিভীষিকা মুছে গিয়ে কি আশ্বাস জাগে এদের মনে।

বুলডোজার চলছে, গাছের শিকড় লতাপাতাগুলো সমেত মাটি উঠিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে। বনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করে গড়ে উঠেছে সারবন্দী বাড়িগুলো।

নিশিকান্ত-শরৎ-রামানুজ-এর দল ঘুরছে আমিনবাবুর সঙ্গে।

শরৎ হাঁকে—পটলা, কোদাল লই আয়। জমির নিশানা দিতি লাগবো।

গিরিজা কোদাল ধরেনি, দুচার কোপ দিতে ঘাম ঝরছে। নিশিকান্ত বহুদিন পর আজ যেন বুক ভরে মাটির সোঁদা গন্ধটাকে ফিরে পায়। আট দশ বছর পথে পথে ঘুরেছে, মাটি-গাছ পাতার এই গন্ধটুকুও ভুলে গেছল।

নিশিকান্ত কোদাল কুপিয়ে চলেছে। বলে সে,

—মাটির তর ভালোই মনে লয় শরৎ।

শরৎ দাস বেশ কিছুক্ষণ কোদাল চালিয়ে তার জমির নিশানা বের করেছে।

রামানুজ বলে—মনে তো তাই হয়। তবে ধানের জমি ক্যামন হবে কে জানে? জল তো দেহিনা।

ওভারসিয়ারবাবু বলে—জল! ওই মাথায় যাচ্ছে সাব ক্যানেল, ওখান থেকে জল পাবে এ মাঠে এই বর্ষার মরশুমেই।

শরৎ হাঁক পাড়ে—পটলা। সিধে করে কোদাল চালা! অ কেতু! কুটো বাটাগুলো তোল। ডাল শেকড় সব শুখাই রাখ। জ্বালানী হইব।

সুরভিও মাঠে নেমেছে।

রামানুজ বলে মেয়েকে—সকলেরই কাম করার লাগবো। বসি খাওয়াতি পারমুনা।

পটলা, কালু নরেশ-এর দলের দেহ ঘামে ধুলোয় বিবর্ণ হয়ে গেছে, হাঁপাচ্ছে তারা। গাছের নীচে বসে ধুঁকছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে, মাটির কলসী থেকে জল খাচ্ছে।

কালু বলে—হাত দুখান টাটিয়ে গেল গিয়া।

পটলার পরণে রায়পুরের বাজার থেকে কেনা টেরিকটের প্যান্ট। নীচু হতে কষ্ট হয়।

শরৎ বলে—ব্যাটার ফুটানি আছে গিয়া। প্যান্টুল খুইলা লুঙ্গি পর। কাজ কাম না কইরা ডোল খাইছস—হালায় য্যান ভিখারীর বাচ্চা। কাম করণের সময় ফুটানি।

পটল চুপ করে শুনছে কথাগুলো।

কালু ফুঁসছে, তাদের যেন জোর করে ধরে এনেছে এখানে এইভাবে খাটিয়ে মারার জন্য।

দুপুরের রোদ ঠেলে উঠেছে। বেশ গরম।

ক্লান্ত ধূলি-ধূসর মানুষগুলো ফিরছে ক্যাম্প-এর দিকে। আর ক'টা দিন পরই নিজেদের ঘরে এসে উঠবে তারা।

কেতকী-ললিতা-কুসুম অন্য মেয়েরা ফিরছে, ওদের মাথায় শুকনো কাঠের বোঝা। কেউ তুলেছে বুনো আলু, বুনো কেঁদফল, বেল। আজ যেন নিজেদের মাটির উপর পা দিয়ে হাঁটছে তারা।

ললিতা দেখছে জমিগুলোকে।

শুধোয়—আমাগোর জমি?

শরৎ বলে—হ্যাঁ। উধার থেকে ওই গাছের মাথা অবধি, এদিকে নদীর ধার অবধি সব জমি—পেরায় সতেরো বিঘা জমি আমাগোরই। এবার সব্জী লাগামু, ধান দিমু আর মকাই লাগামু।

গিরিজা তখনও আলের এদিকটা বাঁধাচ্ছে। নদীর ধার ঘেঁসে বেশ কিছুটা জমি পেয়েছে তারা। নিশিকান্ত বলে—গিরিজা, জলেব আশ্রয় আছে, দু'একখানা জমিতে কিছু ফসল করুম।

গিরিজাও স্বপ্ন দেখে আজ।

ছায়ানামা দুপুরে নদীর জলে হাত পা ধুচ্ছে, হাতে পায়ে ব্যাথা। বহুদিন পর আজ কাজ করেছে তারা। হঠাৎ কেতকীকে দেখে চাইল।

—তুমি!

কেতকীর রূপও বদলে গেছে, ফর্সা রং রোদে টসটসে হয়ে উঠেছে। ঘামে চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে পিঠে, ছোট্ট শাড়িটা আঁটো করে পরা।

কেতকী বলে—দেখছি তোমারে।

—কেমন লাগছে? শুধোয় গিরিজা।

কেতকী বলে—মানুষের মতই গো। রায়পুরে দেখতাম তখন মনে লাগতো ক্যামন মেকি, নকল মানুষ। গিল্টি করা। ইখানে দেখছি মরদের মতন।

চাইল গিরিজা। সে দেখছে মেয়েটাকে।

আজ কেতকীও যেন বদলে গেছে। গিবিজা শুধোয়।

—মাঠে খাটতি কষ্ট হচ্ছে না?

কেতকী শোনায়, মাইয়াগোর চেন না? যখন যে পাত্রে রাখো সেইমতই দেখাবে। আর শরীর? শরীরের নাম মহাশয়। যা সওয়াবে তাই সয়! এও সয়ে যাবে গো। চলো— বেলা হই গেল।

ফিরছে ওরা দুজনে ক্যাম্প-এর দিকে।

তখনও গাছের তলায় বসে আছে কালু, পটলা, নরেশের দল। কৃপাসিন্ধু কি বলছে তাদের।

কৃপাসিন্ধুর প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি জায়গাটা। গভীর অরণ্য, আর এই মাটি তার কাছে বিশ্রী লাগে। সেও খাটতে নেমেছে নিজের জমিতে। বার বার মনে পড়ে মানা ক্যাম্প-এর কথা। সেখানে সাইকেল নাহয় অটোরিক্সায় চড়ে জামা কাপড় পরে চাঁদা আদায়ের নামে ধান্দায় ঘুরতো। রায়পুরে সুধাকান্তবাবুর মাছের কারবার দেখেও কিছু আদায় পেতো।

মনে মনে স্বপ্ন দেখতো কৃপাসিন্ধু, সেও এবার সুধাকান্তবাবুর ভিতরের সব খবর ফাঁস করে দিয়ে নিজে নেতা সেজে এবার নোতুন দল প্রতিষ্ঠা করবে। তার আয়োজনও করেছিল। কৃপাসিন্ধুর স্বপ্ন ছিল সে উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির নেতাই সাজবে।

কিন্তু তার আগেই সুধাকান্ত তাকে কৌশলে হটিয়ে দিয়েছে। তবু সাইকেলটা কেড়ে নেয় নি। কৃপাসিন্ধু তার মালপত্রের সঙ্গে সাইকেলটা এনেছে এখানে।

দুপুরের পর ওরা খেতে বসেছে। মোটা চালের ভাত আর লাউ কুমড়োর ঘ্যাঁট আর কুর্তি কলাই-এর ডাল। খিদের সময় তাই যেন অমৃত বলে বোধহয় অনেকের।

মানা ক্যাম্পের মত সারাদিন এখানে শুয়ে বসে বিনা কাজে কাটাবার সময় তার আর নেই। মানা ক্যাম্প-এ ওই রেশন আর ডোল নেওয়া, এখানে ওখানে ঘুরে কিছু শাক-পাতা সংগ্রহ করা আর বসে বসে পরনিন্দা-পরচর্চা করা ছাড়া আর কোন কাজই ছিলনা এদের।

ছেলেরা কেউ নামকা ওয়াস্তে স্কুলে যেতো। বইপত্রও তেমন নেই, হতাশা ভরা অন্ধকার জীবন। তাই চায়ের দোকানে কাজ খুঁজতো নাহয় দলবেঁধে শহর রায়পুরে যেতো, ঘুরে বেড়াতো লক্ষ্যভ্রষ্টের মত, নাহয় কেউ কেউ দোকানে চাকরের কাজ করতো। বাড়ির কাজে সবাইকে নিতনা। সন্দেহ করতো তাদেব—হয়তো কিছু নিয়ে পালাবে। ফলে তারা পথে পথে অন্ধকারের জগতের পথের সন্ধানই করতো।

এখানে এসেই আট ন'বছরের কর্মহীনতা, মূল্যহীনতার অভিশাপ থেকে তারা বেঁচে গেছে মনে হয়।

খাওয়া দাওয়ার পর শেডে-গাছের নীচে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার কাজে লাগে তারা। রামানুজ দেখছে তার মেয়ে সুরভিকে।

ওদিকের গাছের নীচে যমুনা সুরভি আরও কারা শুয়ে বসে আছে। ক'দিন থেকে ক্ষেতে কাজ করতে নেমে তাদের শহরের সেই জেল্লাটুকু মুছে আসছে। সুরভি এর আগে রায়পুরে চৈত সিং-এর দৌলতে রুটি-মাংস আণ্ডা খেতে পেতো। দু-এক গেলাস তাজা পানীয়ের স্বাদও পেয়েছিল। দেখেছে বিলাস-এর জীবনকে। টাকাও পেতো কিছু।

এখানে এসে সেসব বন্ধ হয়ে গেছে, গায়ের রংটায় এসেছে কালো ভাব, পাউডার স্নো মাখার মত সময় নেই, ভালো শাড়ি পরার অবকাশও নাই।

সুরভি ছায়ায় বসে চুল বাঁধছে।

যমুনা শোনায়—কার জন্য চুল বাঁধবি লা? বনবাসে আসি সব সখ সাধ শেষ হই গেল।

সুরভিও সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। বলে সে—তাই দেখছি, এহানে বাঁচুম কি কইরা কে জানে? ওই আদিবাসী মাইয়াগোর মত বুনো হই বাঁচতে হইব।

গজরাচ্ছে তারা। রামানুজ মেয়ের মনের অতলের এই জ্বালাটাকে ঠিক বুঝতে পারে না, বোঝার মত মানসিক অবস্থাও তার নাই। রামানুজ বলে—সুরভি তর মায়ের সাথে ঘরে চল, এহন হাতে ঘর নিকাইয়া মুছাইয়া রাখতি হইব।

সুরভি কি বলতে গিয়ে থামলো মাকে দেখে!

ওর মা ভাবিনী এমনিতেই চিররুগ্না, নানা ব্যাধিতে ভোগে তার চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা হয় নি। ও না গেলে মাকেই ওই বসতে গিয়ে ঘরদোর সাফ করতে হবে, ঝোপ জঙ্গল কাটতে হবে, তাই নিজেই উঠলো সুরভি বোদা মুখ করে। গজগজ করে সে।

—বাবার মাথা খারাপ হইছে মা। ওই বনের মাঝে বসতি করতি পারবো? এর চেয়ে রায়পুরে থাকলি আরামে থাকতা! নাহয় বাবাও কোথাও কাজ কাম খুঁজি নিত, আমিও কাজ করতাম—

ভাবিনী দেখেছে রায়পুরে মেয়ের চাল-চলন। অনেক রাতে ফিরতো মাঝে মাঝে। দামী শাড়ি পরে আসতো, উস্কো-খুস্কো চেহারা। যেন দেহের উপর ঝড় বয়ে গেছে। ভাবিনী মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে।

সুরভি মায়ের হাতে বিশ পঁচিশ টাকা ধরে দিত নিজের খর্চা কিছু রেখে। ভাবিনীর টাকাগুলো নিতে যেন ভয় ভয় করে। শুধোয় সে,

—কোথায় পালি টাকা?

সুরভি হাসার চেষ্টা করে বলে—কাজ করছি।

তবু ভয় যায় ভাবিনীর। স্বামীকেও বলতে পারে না মেয়ের কথা। নিজের মনের মধ্যে গুমরে ওঠে ভাবনাগুলো। মাঝে মাঝে ভাবিনী বলে,

—কি যে কাম করস বুঝিনা। কই-বাপু এসবে দরকার নাই।

সুরভি শাড়িটা ছাড়তে ছাড়তে বলে—তালি ওই রেশন আর ডোলার যা পাই তাতে হপ্তায় তিন দিন বড়জোর চারদিন চলে, বাকী ক'ডা দিন না খাই থাকবা?

ও প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বলে—যাও শুই পড়ো।

ভাবিনী শুধোয়—তুই খাবি না?

হাসে সুরভি—খাই আইছি।

তার খাবার জুটে যায়। তার সঙ্গীরাই তাকে রুটি-মাংস নাহয় রাইস কারী সব্জী সবই খাওয়ায়। সিনেমাতেও নিয়ে যায়।

সুরভির জীবন থেকে সেই দিনগুলো হারিয়ে গেছে। কি ব্যর্থতার জ্বালায় গুমরে ওঠে ওর সারা মন।

বনের মাঝে সারবন্দী বাড়িগুলো উঠেছে। মাটির দেওয়াল—টিনের ছাউনি, সামনে উঠান। দুদিকে দুটো ঘর—মাঝে একটু বারান্দা, আর বারান্দার পর একটা ঘর। সেটা বেশ বড় সড়। দেওয়ালের কড়িতে কিছু তক্তা পেতে সিলিং করা যায়। তক্তার অভাব নেই। শাল-সেগুন গাছ-এর ছড়াছড়ি, বাঁশও মেলে বনে।

বাড়ির লাগোয়া কিছু জমি, সবমিলিয়ে বাস্তুভিটে গড়ে উঠেছে বিঘে দু'তিন জায়গা নিয়ে প্রতি পরিবারের জন্য। ওদিকে মানুষগুলো এবার নিজের ঘর সামলাচ্ছে। নিশিকান্ত একটু অবাক হয়, তার দুই ছেলে—গিরিজা আর ভুজঙ্গ। ভুজঙ্গও মানাক্যাম্প-এ থাকার সময় ক্লাশ এইট অবধি পড়েছিল, কিন্তু তারপর আর এগোতে পারেনি। গিরিজা ভিড়েছিল সুধাকান্তের দলে। মস্তানি করতো।

নিশিকান্ত নিরীহ ধর্মভীরু ধরনের মানুষ। সে বাধা দেবার চেষ্টাই করতো।

—ওসব ঝামেলায় থাকিস না গিরিজা। ওসব আকাম করিস না। গিরিজা ওতে কিছু পয়সার গন্ধ পেয়েছে। সে বলে,

—কাম যহন নাই তহন আকামই করুম!

ওদের উপর তাই বিশ্বাস হারিয়েছিল নিশিকান্তের। বুড়োর স্ত্রীও মারা গেছে ওই মানা ক্যাম্পে।

গিরিজাও দেখেছে তার মায়ের অসহায় মৃত্যুটাকে। চিকিৎসার পয়সা নাই। ক্যাম্প-এ ডাক্তার একজন আছে। তাঁকে ডেকে আনার জন্য গেছল।

ডাক্তারবাবু বলেন—কলে যাইনা। এখানে আনো।

গিরিজা ফুঁসে ওঠে—আনা যাবে না ডাক্তারবাবু, তুলতে গেলেই মরে যাবে বোধহয়।

ডাক্তারবাবু জানান—তবে শেষ করে এনে আমাকে খবর দিতে এসেছো?

নিশিকান্ত হাহাকার করে ওঠে।

—শেষ আমরা করিনি ডক্তারবাবু! আমাদের যারা ঘর বাড়ি কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারী করেছে, তারাই শেষ করেছে ওরেও। আমাদের সকলেরেই শেষ করেছে, তবু যদি যান—

—ডাক্তারবাবু কষ্ট করে একশিশি ওষুধ দিয়ে বলেন,

—এইটা খাওয়াও, পরে কাল সুস্থ হলে নিয়ে এসো। দেখবো।

ডাক্তারের দেখার জন্য আর বসে থাকেনি গিরিজার মা, সেইদিন বৈকালেই মারা যায়।

গিরিজা সেই দুঃখের কথা ভোলেনি। গিরিজা বলে বাবাকে—কাম কইরা, নাম গান কইরা কি পাইছ? আমাগোর দাম কি যে আমাগোর কামের দাম দিব? তাই আকামই করুম!

তবু নিশ্চিন্ত হয়েছে নিশিকান্ত এখানে এই বনরাজ্যে এসে, তার ছেলে দুটোর মতিগতিও বদলেছে। গিরিজা-ভুজঙ্গ দুইভাই মিলে সকাল থেকে ক্ষেতে নামে, ডি-ডি-এ থেকে তাদের একজোড়া বলদও দিয়েছে, তার জন্য দুই ভাই বন থেকে বাঁশ কাঠ এনে ওদিকে গোয়াল বানিয়েছে।

নিশিকান্ত বলে—গোয়ালটা বড় করছিস ক্যান?

গিরিজা বলে—শুধু বলদই থাকবো বাবা? দু'একটা গাইগরুও আনবে ভুজঙ্গ।

ভুজঙ্গ বলে—ডি-ডি-এর অফিসারের সাথে কথা কইছি, দুইখান জারসি বাছুর দেবেন কমদামে। বছর খানেক পুষতি পারলি বাচ্চা দেবে—দুধ দেবে।

হাসে নিশিকান্ত। নিজেও সে লেগেছে ঘরবাড়ি সাফাই করতে, পথও হয়েছে, এবার একটা শুভদিন দেখে তারা আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রাম বসতে আসবে, তারই আয়োজন চলেছে।

ডি-ডি-এ কর্তৃপক্ষও পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

মাঠের মধ্যে সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছে। মালকানগিরির, কোরাপুট সদর দপ্তর থেকে চিফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিজে এসেছেন।

বনের মধ্যে এই নোতুন জনপদ উৎসবের সাজে সেজেছে, লাল-নীল পতাকা উড়ছে।

আশেপাশের বসতি থেকেও মানুষ জন আগে এসে যারা বসতি পত্তন করেছে তারাও ছেলেমেয়ে নিয়ে গরু মোষের গাড়িতে করে এসেছে।

জোন অফিসার মিঃ রায় চিফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারকে দেখাচ্ছেন গ্রামটা ঘুরে। ওদিকে বিরাট একটা দিঘি খোঁড়া হয়েছে। এখন জল বেশী নেই, তবে বর্ষার জলে টইটম্বুর হয়ে ভরে উঠলে এখানে মানুষের জলের অভাব থাকবে না।

গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে যাবার রাস্তাও হয়ে আসছে। ওই রাস্তা ধরে জিপ যাতায়াত করবে, চারমাইল হেঁটে গেলে বাস রাস্তা, সেখান থেকে মালকানগিরি জেপুর যাবার বাসও মিলবে। কয়েকখানা ছড়ানো

ছিটানো গ্রাম-এর লোকের জন্য তিন নম্বর গ্রামে একটা ছোট ডাক্তারখানাও গড়ে উঠেছে, কয়েকটা বেডের হাসপাতালও তৈরী হচ্ছে।

প্রাথমিক স্কুলও হবে দু-তিন খানা গ্রাম নিয়ে।

মিঃ রায় বলেন—নবীনবাবু আগে শিক্ষকতা করতেন, ওকেই এখানে সেই কাজ দিলে চলবে।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেবও সায় দেন—যোগ্যতা থাকলে দেবেন।

সামিয়ানায় সমবেত হয়েছে মানুবজন।

রামগতি আজ বহুদিন পর তার গানের এলেম দেখাবার সুযোগ পেয়েছে। প্রথমে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইল সে।

বহুদিন পথে পথে ঘুরেছে, তবু তার চিরসঙ্গী দোতারাটাকে ছাড়েনি। আজ লম্বা চুলে তেল মেখে স্নান করে শিল্পীর সাজে দোতারা বাজিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরে, তার হারানো সেই দিনের গান, ফেলে আসা নদী—তার বুকে কোন মাঝির উদাস সুরের রেশ, এই বনপর্বতের নির্বাসিত মানুষগুলোর মনে সেই রেশ তোলে।

কে সাবাস দেয়—বাহবা ভাই!

আরও দু-তিন খানা গান গাইতে হয় রামগতিকে। অনেকদিন পর রামগতি আজ মনের মত আসর পেয়েছে, শ্রোতাদের পেয়েছে। তাই প্রাণ খুলে গান করে।

ওদিকে নিশিকান্তরা গ্রাম পত্তনের দিন পুজো দিয়েছে।

শরৎ বলে—বাস্তু দেবতারে আহ্বান করো ভটচায। দশ বারো বছর সব হারাই পথে পথে ঘুরছি, আজ মাটি পাইছি। ঘর পাইছি। ত্যানার আর্শীবাদ চাই গ!

খিচুড়ি প্রসাদ। গিরিজাও রয়েছে। কেতকী ও মা—অন্য মেয়েদের সঙ্গে রান্নার কাজ করছে।

সকলেই আজ শালপাতা পেতে বসে পড়ে—রবাহূত অনাহূতরাও। নিশিকান্ত সকলকেই আহ্বান জানায়।

—বসেন সকলেই।

অন্যগ্রামের মাতব্বরাও এসেছে, তারাও বসে পড়ে।

নিশিকান্ত বলে—আইলাম আপনার লগে বসতি করতি হবে।

সাত নম্বর, পাঁচ নম্বর, তিন নম্বর সেটলার্স ভিলেজের মাতব্বররা এসেছে। তারাও বলে—বসত করেন। সুখে দুঃখে দিন কাটবো। তবু মাটি পাইছি, ঘর পাইছি, খাটি খাতি পাই একবেলা। শান্তিতে আছি কত্তা।

রামানুজও ভাবছে কথাটা।

উৎসবের নেশায় কালু, পটল-নরেশদের দলও কাজ কিছু করেছে। কৃপাসিন্ধুও সাইকেল হাঁকিয়ে এর মধ্যে বারকতক মালকানগিরি জোন অপিসে যাতায়াত করেছে, মাল-পত্র এনেছে মালকানগিরির হাট থেকে।

কৃপাসিন্ধু জোন অফিসার—চিফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারদের আশেপাশে ঘুরছে। ওদের জন্য বিস্কুট আর রসগোল্লা এসেছে মালকানগিরির থেকে, কোন গ্রামের বাড়ির গাছে নধর মর্তমান কলা দেখে সেইসবও কিনে এনেছে।

কৃপাসিন্ধু বলে—স্যার, একটা কাজকর্ম দ্যান আপনাগোর জোন অফিসে। যে কোন কাজ।

এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার সাহেব ঝানু আই-এ-এস্। তিনি দেখছেন এদের কার্যকলাপ। এর মধ্যে নবাগত অনেক লোকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। দেখেছেন তাদের বাড়ি-ঘরও। এর মধ্যে ক'দিনেই সেসব বাড়ির উঠোন দেওয়ালে গোবর মাটি দিয়ে নিকিয়েছে, উঠানে বসিয়েছে তুলসীমঞ্চ।

অনেকে বলে—বৃষ্টি নামলে কিছু আম-কাঠালের চারা দিতি কন্ স্যার।

কেউ বলেছে, বীজ ধান বীজ মকাই-এর কথা।

তারা জমির হালও বহাল করেছে। তার মধ্যে দেখেছেন তিনি দু'একটা বাড়ির উঠান ঠিকমত সাফ

হয়নি, কোনরকমে যেন তারা এসে উঠেছে. খবর নিতে বাড়ির অধিকারীর নামটাও জানতে পারেন তিনি।

—কি নাম আপনার?

কৃপাসিন্ধু বলে নামটা। আরও জানায় সে,

—মানায় থাকতি ওখানের ক্যাম্প উন্নয়ন সমিতির কাজ করছি স্যার। তাই কইছিলাম যদি কোন চাকরী দিতেন—

এ্যাডমিনিস্ট্রেটার সাহেব বলেন,

—এখানে আপনাকে জমি বসত বাড়ি দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে রিহ্যাবিলিটেট করাতে সরকারের খরচা হয়েছে প্রায় ষাট হাজার টাকা, সেই জমিতে ফসল ফলাতে হবে।

এখানে আমরা চাষী পরিবারদেরক বসত করাচ্ছি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের জন্য এই বসত নয়। এসব দেখেশুনে যদি আগেকার শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে—নিজে চাকরী খুঁজে নিবেন, চাকরী দেবার কোন শর্ত আমাদের নেই।

কৃপাসিন্ধু চুপ করে যায়। মানা ক্যাম্প-এ থাকতে অনেক নেতা মন্ত্রীরা আসতেন। কৃপাসিন্ধু তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। আজ দেখে এই সাহেব যেন বেশ কড়া।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটার সাহেব বলেন,

—আশাকরি জমিতে কি ফসল হয় দেখে যাবো পরে এসে। আর বাড়িঘর নিজেরাই সাফ কবে রাখবেন। বুনো জায়গা—নাহলে সাপ, কাঁকড়াবিছের উপদ্রব হবে।

অনেকেই শুনছে কথাগুলো। ওদের সামনে সাহেব যেন কৃপাসিন্ধুকে ইচ্ছে করেই অপমান করছে। চুপ করে থাকে কৃপাসিন্ধু।

ওদিকে তখনও উৎসবের কলবব চলেছে। কৃপাসিন্ধু ওই বেচাবাদের জন্য অনুকম্পা বোধ কবে। কৃপাসিন্ধু জানে ওদের এই পাবার স্বপ্ন একদিন ব্যর্থ হবেই। আর সেইটাকেই কাজে লাগাবে সে।

ওই সাহেবদের সব বড় বড় বুলি। বনবাসে পাঠিয়ে নিজেরা থাকবেন আরামে আব মববো আমরা।

কৃপাসিন্ধুর বৌ কমললতা দেখছে তার স্বামীকে। লোকটা কেবল ধান্দাতেই থাকে। এনিযে মানা ক্যাম্পেও নানা ঝামেলায় থাকতো, এখানে এসে কমললতা দেখেছে সকলেই যে যার জমি, বাড়িতে কাজ করছে। এখানেও কৃপাসিন্ধু ঘুরছে এর মধ্যে এখানে-ওখানে। আর এখানের কালু পটলদের নিয়ে কি সব করছে।

কমললতা বলে স্বামীকে—ঠিক কইছে সাহেব। জমিতে হক্কলেই কাজ কাম করছে, তুমি কি কবো? সাহেবদের চটাও ক্যান্?

কৃপাসিন্ধু ধমকে ওঠে—তুই থাম্‌তো! ঢের দেখছি অমন সাহেব। আমি দেখামু ওগোর। বুঝলি সত্যি কথাডা কই তাই ওগোর কাছে আমি খারাপ!

দণ্ডকারণ্যের এই অঞ্চলের মধ্যে ওই সাইকেল দাবড়ে ঘুরেছে অনেক গ্রামে। কৃপাসিন্ধু দেখছে এখানের আবহাওয়াটা। অনেক সমস্যাই আছে এখানে।

দণ্ডকারণ্য অথবিটি এই প্রদেশের বন জঙ্গল কেটে সাফ করে বুলডোজার চালিয়ে জমি হাসিল করছে, পথঘাট তৈবী করছে। সেই বসতযোগ্য জমি—হাঁসিল করা ফসলী ক্ষেতের চার ভাগের এক ভাগ দিতে হয় এখানের সরকারকে। এখানের সরকার সেই জমিতে তাদের আদিবাসীদের পুনর্বাসন করেন। ফলে পাশাপাশি অনেক গ্রামই আছে যেখানে একটা পার্থক্য চোখে পড়ে। কৃপাসিন্ধুর চোখেও পড়েছে সেটা।

এখানে বাংলাব উদ্বাস্তু পল্লীগুলো কিছুটা ছিমছাম, এরা অনেকেই শহর দেখেছে, দেখছে আট-দশ বছর ধরে নিঃস্ব জীবনের তীব্র যন্ত্রণাকে, অভাবকে। তাই মাটি-ঘর পেয়ে,তারা প্রথমেই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে যাতে সেই বিপদ, অভাবের মধ্যে না পড়ে।

চাষবাস শুরু করেছে, ডি-ডি-এ অথরিটি ভালো বীজ, উচ্চমানের মকাই, উলসী (রাই সরষে), তিল-

এর চাষ করতে সাহায্য করছে। তাদের এগ্রিকালচারাল ফার্মে পরীক্ষা করে ওই এলাকায় হতে পারে এমন বিশেষ জাতের ধান কিছু করেছে, সেই ধানের চাষ করে এরা, গরুবলদও পেয়ে কাজে লাগিয়েছে। আর চাষ করেছে কলাগাছ, কিছু সব্জীর। যা হাটে বিক্রী করে পয়সা কিছু পায়। বিশেষ ধরনের মেস্তাপাটও জন্মাচ্ছে পতিত অনুর্বর জমিতে, তিল আর মেস্তাও তাদের 'ক্যাস্‌ক্রপ'—বিক্রী করে পয়সা পায় কিছু।

কিন্তু আদিবাসীরা আগে থেকেই এখানে আছে। তারা এত দুঃখ পায়নি, তাই কিছুটা অন্যধরনের।

কৃপাসিন্ধু আদিবাসী গ্রামেও গেছে।

দেখেছে এখনও সেখানে বিশেষ সাড়া আসেনি। বনপাহাড়ের নীচে বহু উর্বর জমি আগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে, কিছু মকাই আর গঁদলুর চাষ হয় মাত্র, বাকী বনের ফল কন্দমূল তুলেই চালায়। আর গঁদলুর মদ হলেই খুশী।

ঘনবনে ঢাকা ঘরগুলোর আশপাশে আছে প্রচুর সুল্‌ফাগাছ, সাগুদানার গাছ। কাণ্ডগুলো বিরাট আয়তনের কাঁদি কাঁদি গুঁড়ি গুঁড়ি ফল নামে পামগাছের মত, সেই কাঁদিগুলোতে কেটে হাঁড়ি ঝোলানো।

—খাবি? কোন গাঁও বুড়ো আমন্ত্রণ জানায় কৃপাসিন্ধুকে। কৃপাসিন্ধু বসে পড়ে তাদের সঙ্গে। মকাই ভাজা—না হয় ঝলসানো খরগোসের মাংস আর ওই তাজা রস—নেশাও জমে ভালো।

এদের উন্নয়ন বাবদ যা আসে তা সেখানের কর্মচারীদের হাতে যায়, কিন্তু ডি-ডি-এ কর্তৃপক্ষের নজর অনেক তীক্ষ্ণ, আর উদ্বাস্তুবাও জানে। তাই তাদের উন্নয়ন-এর কাজটা কিছুটা দেখা যায়।

কৃপাসিন্ধু বলে—সর্দার তোমাদেব জমি জায়গায় চাষবাস করো সবাই। ওদিকে সেটলার বাবুরা তো বেশ ধান অন্য ফসল করছে। লেখাপড়া শিখছে।

দুচারজন বসতির লোক নেশাব ঘোরে বিড় বিড় করে কি যেন প্রতিবাদের ভাষায় কথা বলে।

—সরকারের জামাই ওরা। সব দিচ্ছে উদের সরকার। আমাদের কথা কই ভাববে?

রাঙা সর্দার মদ খেলেও এই কথাগুলো শুনে একটু চমকে ওঠে। সে তো শুনেছে এসব কথা।

এখন মনে হয় বাবুটা ঠিকই বলেছে। তাদের আশপাশের গ্রামবসতিতে নোতন আসা মানুষগুলো কেমন গুছিয়ে নিয়েছে। ভালোভাবে ভালো ঘরে থাকে। ফল ফসল করে।

বাড়ির আশেপাশে তাদেব মাথা তুলেছে আম—কাঁঠাল গাছ। ক্ষেতে আলু, কফি-বেগুন-আখ অবধি হয়। নদীতে বাঁধ দিয়ে জল তুলে চাষ করছে।

ডি-ডি-এর বাবুরাও যাতায়াত করে, খোঁজখবর নেয় ওদের।

আর তাদের জন্য যেন কেউ নাই।

রাঙা সর্দার বলে—তাতো বটে হে। বাবু ঠিক বলেছে বটে। বড় ভালো আছে লুকটা. লাওহে—

কৃপাসিন্ধুর ভালোই লাগে তাজা তাড়ি জাতীয় সাবুগাছের মদ। মনে হয় স্বাস্থ্যকরও। কৃপাসিন্ধু বলে—এত জমি পড়ে আছে সর্দার। তোমরা সব চাষ না করতে পারো বলো চাষ করিয়ে দিই। ফসল পাবে কিছু আর কিছুটা যারা চাষ করবে তাদের দিও।

দেখছে ওরা কৃপাসিন্ধুকে।

কৃপাসিন্ধুর মাথায় বুদ্ধিটা আগেই এসেছিল। বলে সে,

—জমি তো বুনো হয়ে পড়ে আছে। কিছুই পাও না। তবু কিছু পাবে।

কোন প্রবীণ মাথা নাড়ে—তা বটে হে সর্দার।

সর্দার বলে—বুঝ করি, পরে আসিস!

এখন তাদের বোঝবার মত অবস্থাও নেই। নেশায় ক্রমশঃ ঝিমিয়ে পড়ছে তারা। কৃপাসিন্ধু মনে মনে হিসাবটা কষছে।

গ্রীষ্মের দাবদাহ কেটে গিয়ে এবার পাহাড়গুলো ঢেকে ঢেকে আকাশ জুড়ে এসেছে কালো মেঘের দল। উষর মাটিতে এর মধ্যে দু'একপশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। সেগুলো ছিল কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টি।

এখানের কালবৈশাখীর রূপ দেখে চমকে উঠেছিল এরা।

এখন গ্রামবসতেই রয়েছে সবাই; রোদের তাপও তেমনি। জলের সঞ্চয় বলতে বনের ধারে পাহাড়ী ঝর্ণাটা! সেখানে বাঁধ দিয়েছে নিশিকান্ত-শরৎ-রামানুজ-গোবর্দ্ধন সকলেই। ফলে সেই নদীর বুকে কোমরভোর জল জমে আছে একটা এলাকা জুড়ে। ওদিকের দিঘিটা এখনও শূন্যপ্রায়। কাদাগোলা তলানি জলে গরু বাছুরদের স্নান করায়, নদীর জলই ভরসা!

কালু-পটলা-নরেশ-এর দল মাঠে বাধ্য হয়ে কাজ করতে নামে, কিন্তু গিরিজা—ভুজঙ্গ দুই ভাই-এর মধ্যে নদীর ধারের জমিতে কিছু ঝিঙে, কুমড়োর গাছ করেছে। ফলও ধরেছে তাতে।

সেদিন গিরিজা কলসীতে করে জল তুলে গাছে দিচ্ছে, ঠা ঠা রোদ্দুরে। হঠাৎ কেতকীকে দেখে চাইল।

কেতকী বাড়ির কাজ সেরে এসেছে নদীর জলে স্নান করে জল নিয়ে যেতে।

এসময় এদিকটা নির্জন। ওপারের বনভূমিতে ছায়া নেমেছে। কেতকী জামা খুলে আদুড় গা হয়ে জলে নেমেছে, দেখছে সে নিজেকে। ক'বছরের দুঃখ কষ্টের পর আজ তারও থিতু হয়েছে। কেতকীর মনে পড়ে রায়পুরের দিনগুলো। খেতুবাবুর লুব্ধ চাহনি, তার লোভী হাতদুটোর জ্বালাকর অনুভূতি আজ তার মনে কি দুঃসহ যন্ত্রণা আনে, সুরভি তাকে একদিন নিয়ে গেছল চৈত সিং-এর ধাবায়।

দেখেছে সেখানের জানোয়ারদের—ভয়ে শিউরে উঠেছিল।

আজ সেই ভয় নেই। নিজের এই অপরূপ যৌবন মাতাল দেহের ব্যর্থ কান্নার কি সাড়া শোনে বনে বনে! একজনকে মনে পড়ে।

হঠাৎ চমকে ওঠে কেতকী। নদীর এদিকের ঘন বনের পাশে জল তুলতে এসেছিল গিরিজা। সেও দেখছে কেতকীকে।

এভাবে কোনদিন দেখেনি সে।

মুগ্ধ বিস্মিত চাহনি মেলে দেখছে ওই অপরূপ মেয়েটিকে। হঠাৎ চমকে ওঠে কেতকী—তুমি!

যেন ধরা পড়ে গেছে গিরিজা।

—মানে জল দিতাছিলাম ক্ষেতে। স্নান করি বাড়ি ফিরবো তাই।

গিরিজাও জলে নেমেছে। তার দেহমনে কি দুঃসহ জ্বালা! কেতকী জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে নেয়। বলে সে,

—চোরের মত দেখনের খুব মজা, না?

গিরিজা বলে—চোরের মত ক্যান দেখুম? ভাবছি এবার তোমারে যদি ঘরে নিই যাই!

চাইল কেতকী। তার মনে কি সুর জাগে।

আজ সেই অবকাশ মিলেছে। গিরিজা এগিয়ে এসেছে ওর কাছে। বলে সে—জমি-ঘর পাইছি। তাই কই কেতকী, যদি তোর অমত না থাকে—

কেতকীও ওর কাছে এসেছে। দুটি অনাবৃত দেহ মন যেন গভীর নির্জনে এতদিন পর দুজনের কাছে আসতে চায়।

ব্যাপারটা দেখছে কুন্তিবুড়ি।

কুন্তিবুড়ি গ্রামে থাকতেও এর খামার ওর জমিতে ঘুরে ঘুরে ফাঁক পেলেই বেগুন-লাউ-এটা ওটা নাবলে সংগ্রহ করে আনতো। এখানে এসে সেই অভ্যাসটা ভোলেনি। বনে কোথায় আমলকী, বুনোকেঁদ-পিয়াল-শাক-বেল—এসব সংগ্রহ করে এনে বাণিজ্য শুরু করেছে।

সে আসছে বনের ওদিক থেকে, নদীর জলে গিরিজা আর কেতকীকে ওই অবস্থায় দেখে থমকে দাঁড়ালো।

বুড়ির বুঝতে কিছু আর বাকী থাকে না। হঠাৎ তার বিবেক নীতিজ্ঞান মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দেখেছে সে এই ক'বছরে অনেক কিছু।

পথেঘাটে ঘুরেছে, শিয়ালদহের ঝুপড়িতে—নানা ক্যাম্পে অনেক অনাচারই দেখেছে সে। গজগজ করছে।

কিন্তু এবার গ্রামের বুকেও এসব আর চলতে দেবে না সে।

কুন্তীবুড়ি ওদিকের ঝুপি বন দিয়ে চুপে চুপে ফিরে এল বসতের দিকে। তখন দুপুরের খর রৌদ্রের তাপে লি লি করছে চারিদিক। বনসীমা নিঝুম হয়ে আছে, গাছের পাতাও নড়ে না। পাহাড়গুলো বিবর্ণ হয়ে ধুঁকছে রোদে বিরাট কোন অর্দ্ধমৃত প্রাণীর মত।

রোদে বের হবার উপায় নেই।

কালু-পটলা-নরেশের দল দুপুরে এসে হাজির হয় কৃপাসিন্ধুর বাড়িতে। তাসের আসর বসে। রায়পুরের সেই উত্তেজনাময় জীবনের কোন আনন্দই এখানে নেই।

কালু বলে—এখানে মারা পড়তি হবে কৃপাদা। তোমার চ্যালা গিরিজাদাতো এখানি নাকি গেড়ে বসবে কইছে!

পটলা শোনায়—তা আর কইব না?

কালু শোনায়—পালাতেই হবে। কোথায় বা যাই ? শালা চৈত সিং-এর ধাবার মত একটা ডেরা গড়তি পারলে না কৃপাদা? তবু মুখ বদলানো যেতো।

কৃপাসিন্ধু চতুর লোক।

এরমধ্যে চারিদিকে ঘুরে ফিরে সে অনেক সন্ধান এনেছে। বলে সে—এখানের আদিবাসীদের খাসা জিনিষ আছে, কিছু খাবি?

সুলফা গাছের তাড়িই বের করে সে, কালু খুশীভরে চীৎকার করে—জিতা রও কৃপাদা!

ওরা ওই তাজা পানীয়ের নেশায় যেন তাদের সব দুঃখ ভুলতে চায়। পটলা বলে—খাসা জিনিষ কৃপাদা।

কৃপাসিন্ধু এই ফাঁকে বাইরে নজর রেখেছে। তার গিন্নী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওদিকে গুপী ভটচাযের বাড়িতে রামায়ণ শুনতে গেছে, ও এসে পড়লে ঝামেলা হবে। তাই নজর রেখেছে সে।

কালু বলে—একদিন চল না গুরু জেপুর বেড়িয়ে আসি। সুরভি-যমুনাবাও যাবে। সিনেমা দেখে খেয়ে দেয়ে আসা যাবে।

রায়পুরে এসবের ঢালোয়া ব্যবস্থা ছিল। বড় শহর। বোম্বাই কলকাতা মেন লাইন ট্রাঙ্ক রোডের উপর আধুনিক শহর, ব্যবসার জায়গা। কাঁচা পয়সা উড়ছে সেখানে। —সবকিছুরই খদ্দের আছে। তার তুলনায় জেপুর একমুঠো জনপদ, সেখানে এত ফুর্তির লেনদেন হয় না।

কৃপাসিন্ধু বলে—খরচার ব্যাপার। জেপুরে পয়সার রোজকারের পথও নাই তেমন। দু'চারদিন যেতে দে, ডি-ডি-এর ঠিকাদারীর কাজ শুরু হোক, সুধাকান্তদার গাড়ি থাকবে, যাবো একদিন।

গুপী ভটচাযের বাড়ির উঠানে একটা ঘন ছায়াঘেরা হরিতকী গাছ রয়ে গেছে, আগেই ছিল। বাড়ি তৈরীর সময় ওটা কাটা হয়নি, কাঠফাটা রৌদ্রে সেখানে ছায়া নামে। সেই ছায়ার নীচে গুপী ভটচায তার ঠাকুরঘরের সামনে বেদী বানিয়ে সেখানে রামায়ণ-ভাগবত পড়ে। অনেকেই আসে।

প্রতিজ্ঞতস্ত্বয়া বীর দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।

ঋষিনাং রক্ষনার্থায় বধঃ সংযম রক্ষসাম্''

রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে এসেছিলেন মুনি ঋষিদের রক্ষার জন্য। আর প্রায় দশবৎসর এখানে বাস করেছিলেন।

এই দণ্ডকারণ্য সত্যযুগে ছিল এক সমৃদ্ধ রাজ্য। সত্যযুগে মনু দণ্ডধর রাজার ছেলে ইক্ষাকুর ছিল শতপুত্র, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি, ছিল দুর্দান্ত। তার নাম ছিল দণ্ড। বিন্ধ্য আর শৈবাল পর্বতের মাঝখানে ঘোর দেশে মধুমত্ত নামে নগর তৈরী করে দণ্ডকে সেই প্রদেশের রাজা করে দেন ইক্ষাকু।

দণ্ড ঋষি শুক্রাচার্যকে পৌরহিত্যে বরণ করে রাজ্যশাসন করতে থাকে। শুক্রাচার্যের দুই কন্যা। অরজা আর দেবযানী।

এই শুক্রাচার্য ছিলেন অসুরদের গুরু। দেবতা আর অসুরদের যুদ্ধের সময় শুক্রাচার্য তার সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে অসুরদের বাঁচিয়ে তুলতেন, তাই দেবতারা কচকে পাঠান শুক্রাচার্যের কাছে গোপনে সঞ্জীবনী মন্ত্র জেনে নিতে।

দেবযানী কচের প্রেমে মুগ্ধ, কিন্তু কচ গুরুগৃহে থেকে সঞ্জীবনী মন্ত্র জেনে নিয়েই চলে যান। ব্যর্থ দেবযানীর পরে অন্যত্র বিবাহ হয়। আর শুক্রাচার্যের অন্যতমা কন্যা অরজা কঠিন ব্রতধারিণীর জীবন বরণ করে আশ্রমে থাকেন।

একদিন চৈত্রশেযের অপরাহ্নে শুক্রাচার্য আশ্রমে নেই, সেই সময় রাজা দণ্ড এসে উপস্থিত। অরজার রূপে সে মোহিত হয়ে তাকে কামনা করে, অবজা তাকে বাধা দেয়, নিরস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু উন্মাদ দণ্ড অরজার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে আশ্রমে অর্দ্ধমৃতবৎ ফেলে যায়।

শুক্রাচার্য ফিরে এসে কন্যার ওই অপমানিত অবস্থা দেখেন, সব জানতে পেরে তখন তিনি অভিশাপ দেন যে সপ্তাহকালের মধ্যে দণ্ড রাজার রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, সবকিছু হারিয়ে যাবে, ঢেকে যাবে গহন আদিম অরণ্যে। একটি প্রাণীও নিষ্কৃতি পাবে না।

সেই সমৃদ্ধ রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়—সারা রাজ্য ঢেকে যায়, গহণ অরণ্যে। এই অরণ্যানী নিয়েই আজকের দণ্ডকারণ্য।

সত্যযুগের পর ত্রেতা যুগের শরভঙ্গ, সুতীথ্ন মুনি, ঋষি ভরদ্বাজ এঁদের আশ্রম ছিল এখানে। রামচন্দ্র এই অরণ্যে এসেছিলেন সেইসব মুনিদের রক্ষার জন্য।

সেই দণ্ডকারণ্যের গহণে আজ এসে আশ্রয় পেয়েছে কোন দূর নদীমাতৃক শ্যামল বাংলাব প্রান্ত থেকে সর্বহারা কিছু মানুষ।

উঠানে স্তব্ধতার মাঝে গুপী ভটচাযের পাঠ-এর সুর ওঠে।

এই দণ্ডকাবণ্যে পম্পা তীরে মাতঙ্গ ঋষির আশ্রম, সেখানে নীচ কুলোদ্ভবা পরিচারিকা সাধিকা শববী। শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শনের ব্যাকুল বাসনা তার মনে।

কুন্তি বুড়ি জানে দুপুরের পর বৈকাল অবধি ভটচাযের বাড়িতেই পাওযা যাবে বসতের মুরুব্বিদের। আজই দেখেছে সে নিজের চোখে ওই ব্যাপারটা। তাই জানাবে সে—পঞ্চজনকে। শরৎ দাস খুব মুরুব্বিগিরি করে, নিশিকান্তও কম যায় না।

কুন্তির ভাইপো ওই কৃপাসিন্ধুকে সকলের সামনে সেদিন হেনস্থা করেছিল বড়সাহেব, এরা কোন কথা বলেনি, তাই দেখবে তাদের আজ।

কিন্তু এই পরিবেশে এসে দাঁড়িয়েছে কুন্তী!

হঠাৎ চাপা গর্জন শোনা যায়। ওরা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

আকাশের একপ্রান্তে কালো মেঘ খানিকটা উঠেছিল পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে, হঠাৎ সেই কালো মেঘ লাল হয়ে ওঠে। রক্ত লাল—বাতাসে জাগে স্তব্ধতা।

আর গর্জনটা ভেসে আসে, যেন ওই আদিম রহস্যময় বনপাহাড় কাঁপিয়ে কোন পুরাণের আমলের দৈত্যকুল আবার জেগে উঠেছে কি আদিম হিংসা নিয়ে।

ঝড়টা এসে আছড়ে পড়ে, আর সেই সঙ্গে উড়ছে ধুলো—ঝরাপাতা। দীর্ঘ শাল গাছগুলো যেন কি আতঙ্কে সমবেতভাবে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাতে চায় সেই রুদ্র দেবতাকে, বনরাজ্যে তখন ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে। ওদিকে একটা প্রাচীন আমগাছের বিশাল ডাল আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ে, নীচে কার বসত বাড়ির খানিকটা ভেঙ্গে পড়ল প্রচণ্ড শব্দে।

মানুষগুলো ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে, মুক্ত আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি জুড়ে বিজলীর ঝিলিক ওঠে. ওঠে বজ্র নির্ঘোষ।

—নারায়ণ! নারায়ণ! অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে গুপী ভটচায।

ভীতত্রস্ত মানুষগুলো দেখছে অনেকের সংগৃহীত খড়ও কিছু উড়ে গেল নিমেষের মধ্যে। বাড়িগুলো কাঁপছে— কোথায় কার চালের টিন বার কয়েক কেঁপে কেঁপে গা ঝাড়া দিয়ে ঝড়ের একটা দমকায় উড়ন্ত পাখীর মত ডানা মেলে উড়ে গিয়ে একটু দূরে আছড়ে পড়ল।

আর্তনাদ ওঠে ভীত কণ্ঠের।

তারপরই বৃষ্টি নেমেছে। ঝড়ের তাণ্ডব কিছুটা কমেছে, বৃষ্টির তোড় বাড়তে থাকে। শুকনো উষর মাটি যেন তৃষিত কোন প্রাণীর মত সেই জল পেয়ে তৃপ্ত হয়ে উঠেছে।

ঝড় থামে, বৃষ্টির তোড়ও কমে আসে।

বাতাসের উষ্ণতা কমে গিয়ে ঠাণ্ডা ভাব এসেছে। এবাব ওরা বের হয ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব করতে।

শরৎ দাসের গিন্নী ললিতা কান্না জুড়েছে।

তার ঘরের একদিককার ছাউনির টিন উড়ে গেছে, ওদিকে কে আর্তনাদ করে ওঠে। সেই বিশাল আমডালটা পড়েছে গতিলালের বাড়ির একপাশে, সপাটে পড়লে বাড়ির সবগুলোই শেষ হয়ে যেতো। এদিকে ছিল মেয়েটা, ডালটা পড়েছে তার উপরেই। আঘাতে তার দেহটা রক্তাক্ত হয়ে দলা পাকিয়ে গেছে। বৃষ্টিব জলধারায় মাটির বুকে তখনও ঝরছে তার পিষ্ট দেহটা হতে রক্তবিন্দু।

গতিলাল আর্তনাদ করে ওঠে—ই কি সব্বোনাশ হ'ল আমার।

স্তব্ধ হয়ে গেছে নোতুন মানুষগুলো। হঠাৎ দেখেছে তারা দণ্ডকারণ্যের এক সংহার মূর্তি, নিমেষের মধ্যে যেন সেই বনের কোন আত্মা এসে চরম একটা আঘাত হেনে গেল।

স্তব্ধ হয়ে গেছে এরা।

কুন্তি বলে—কোন্ মৃত্তিকায় আইয়া ঘর পাতলি দ্যাখ? মানুষের জায়গা না দৈত্যি দান্যের জায়গা!

কৃপাসিন্ধুও এসে পড়েছে।

গিরিজা এর মধ্যে চলে গেছে জোন অপিসে, গ্রামের পরিচারকও সাইকেল নিয়ে গেছে। মিস্ত্রী আনতে হবে ঘর মেরামতের জন্য, আর একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। জানানো দরকার!

জিপ নিয়ে এসে পড়েছেন জোন অফিসার, ওদের সঙ্গে। মিঃ রায় বলেন—বাড়ির চাল, অন্য যা ক্ষতি হয়েছে মেরামত করা হবে কালই।

এগিয়ে আসে কৃপাসিন্ধু। বলে সে,

—আর যে ক্ষতি হয়েছে গতিলালের, ওর যে মেয়ে মারা গেল তার কি ক্ষতিপূরণ দেবেন স্যার? জাইনা শুইনা আমাগোর এই বনবাসে আনছেন! আমরা মানুষ না?

মিঃ রায় দেখছেন লোকটাকে। এর আগেও দেখেছেন ওকে। জোন অপিসে ও যায় আশ-পাশের গ্রামের মানুষদের হয়ে কিছু দাবী আদায় করতে। এ এক অন্যধরনের মানুষ।

মিঃ রায় বলেন—ইচ্ছে করে এই বিপদ ঘটায়নি কেউ, ঝড়ের সময় আম কুড়োতে আসে ছেলেমেয়েরা, ডাল যদি ভেঙ্গে বিপদ হয় কি করতে পারি বলুন? আমরাও দুঃখিত।

কৃপাসিন্ধুর কথায় শরৎ দাস বলে,

—তা কৃপা, কি করা যাবে কও? আমার ঘরের চাল খান উড়ে গেল ঝড়ে—বাইরে থাকলি বিপদ হই যেতো। তাইলে ওগোর দোষডা কি?

কুন্তী চাইল শরতের দিকে। ও জানে শরৎ বেশী বাড়াবাড়ি করলে কুন্তিই সেই বাণ ছাড়বে। ওর ঘরের কেচ্ছা ফাঁস করে দেবে। ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ায় না।

নদীর ধারে এই প্রথম ওদের একজনকে ওরা চিতার আগুনে তুললো। জ্বলছে চিতাটা, কোন দূর হতে এসেছিল মেয়েটা পথে পথে বহু দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে, জ্বলেছে অনাহারের জ্বালায়, সেই দুর্গম পথ পার হয়ে এই অদিম অরণ্যের মৃত্তিকায় তার দেহ মিশে গেল।

চিতার লালাভ আগুন জ্বলছে, নদীর ওপারের বনবাজো তার আভা পড়েছে। হঠাৎ চমকে ওঠে এরা—দুজোড়া নীল চোখ জ্বলছে অরণ্যের অন্ধকারে। কে হাঁক পাড়ে।

—হুসিয়ার। জানোয়ার মনে হয়। গন্ধ পাইয়া আসছে। দুটো জ্বলন্ত চোখ, ঠিক দেখা গেলনা প্রাণীটাকে। এদের চীৎকারে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

তবু মানুষগুলোর সারা মনে জাগে কি আতঙ্ক। ওই সর্বনাশা ঝড়, এই মৃত্যু-অন্ধকারে জ্বলন্ত চোখের লোভী চাহনি নিয়ে কাদের আনাগোনা, তাদের মনে আতঙ্কই আনে।

গিরিজা বলে—কোন ভয় নাই। আগুনটা জ্বালাই রাখ।

গুপীনাথ ভট্টাচার্য স্মরণ করে—নারায়ণ। নারায়ণ।

চিতার আগুন নিভিয়ে কোনমতে ফিরে আসে সেই মানুষগুলো রাত কাটে কি আতঙ্কে। মিঃ রায় বলেন—এখানে তেমন কোন জানোয়ার নাই। আমাদের বুলডোজার ট্রাকটারের গর্জনে সব ভেগেছে। শিয়াল-টিয়াল হবে।

ওই রাতেই বনের পথে জিপ নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি।

সকালের আলোয় আবার সাহস সঞ্চয় করে এরা।

মিস্ত্রীদের নিয়ে কাজ করছে গিরিজা, শরৎ দাস—আর দু'তিন জনের বাড়িতে কিছু ক্ষতি হয়েছিলো সেগুলো মেরামত করা হচ্ছে।

শরৎ, নিশিকান্তরা গেছে মাঠের দিকে, একদিনের বৃষ্টির জল ঢালু বিস্তীর্ণ এলাকা গড়িয়ে এসে দিঘীতে জমেছে। মাঠে মাঠে জমি এখনও ভিজে রয়েছে।

কেতকী গিরিজাকে দেখে বলে,

—চা আনছি।

কালকের ঘটনাটা যেন ওদের মনে কোন রেখাপাতই করেনি। সহজভাবেই সেটাকে নিয়েছে কেতকী। ওর মা ললিতা বলে,

—মুড়ি একগাল লও। পটলাকে ডাক্—এহনও ঘুমাইতিছে।

পটলার ঘুম ভাঙ্গে দেরীতে। মানা ক্যাম্প-এর অভ্যাসগুলো এখানেও বদলায় নি। গিরিজা অবাক হয়।

—সেকি? মাঠে যায় নি?

পটলা হাঁকেডাকে উঠে ঘুমচোখে বাইরে এসেছে। গিরিজা বলে,

—এহনও ঘুমারা?

পটলা গম্ভীরভাবে চাইল ওর দিকে।

কেতকীর ব্যাপারটা সে জেনেছে সুরভিদির কাছেই। পটলা এটাকে ভালো চোখে দেখেনি। বলে সে গিরিজার কথায়,

—তুমার অনেক কাজ কাম গিরিদা, আমরা কি করুম এহানে?

গিরিজা বলে—তাই ঘুমাইবি আর ওই কৃপাদার ওখানে আড্ডা দিবি? এডা রায়পুর না, খাটবার লাগবো।

ওর মা ললিতা বলে—হেইডা কও ওরে।

পটলা বের হয়ে যাচ্ছে। কেতকী শুধোয়—কোথায় চল্লি?

জবাব দিল না পটলা। ললিতা চীৎকার করে।

—মর যমভরা। তরে বইসা বইসা খাওয়ামু?

পটলা ফুঁসে ওঠে—যারে খাওয়াবার তাগোরই খাওয়াও। লোকে কতো কথা কয় শুনতে পাও না? জিগাও তোমার মাইয়ারে—

কেতকীর মুখটা বিবর্ণ হয়ে ওঠে!

হঠাৎ দরজায় কুন্তিকে দেখে চাইল। ললিতা বলে,

—আসো দিদি।

কুন্তি বলে ওঠে—এলাম বটে, কথাটা তবে জানাতি এলাম! পটলা ঠিকই কইছে! মানে ওই তোর কেতকীর কথা কইতাছিলাম। হাজার হোক সোমত্ত বয়েসকাল, এহন বিয়া থা দিযা দে তালাস কইরা—আর নিশি হালদারের পোলা গিরিজার সাথে মিশতে না করবি, ওটা ভালো ছাওয়াল না।

আমাগোর কৃপা কইতাছিল—সাত নম্বরে নাকি ভালো পোলা আছে, মালকানগিরির বাজারে দোকান দিছে—

হঠাৎ গিরিজাকে দেখে থামলো বুড়ি।

বুড়ি ভাবেনি যে গিরিজাও এখানেই কাজ করবে মিস্ত্রীর সঙ্গে। ললিতা চুপ করে শুনছে কথাগুলো। কুন্তি বুড়ি বলে,

—যাই গিয়া।

তার কথার সুরটাই হারিয়ে গেছে হঠাৎ গিরিজাকে এখানে দেখে।

খুশিমনে বাড়ি ফিরছে শরৎ দাসরা।

নিশিকান্ত বলে—আজ রোদ দিলে কালই মাটির বতর হইব। লাঙল দিই বীজ ধান ফেলান্ যাউক শরৎ। কি কও রামানুজ?

রামানুজও সায় দেয়।

এবার রীতিমত চাষী বনে গেছে তারা। কিছু সব্জী লাগিয়েছিলো, একদিনের বৃষ্টিতে কুমড়ো গাছগুলো বেড়ে উঠেছে। ঝিঙে গাছে ফল ধরেছে।

শরৎ খুশিমনে বাড়ি ঢুকেই স্ত্রীর কথায় চাইল।

—এর বিহিত করবা না আমিই গলায় দড়ি দিই মরুম। পটলা কাজ করবে না আর ওই কেতকী—তোমার মাইয়ার নিন্দায় কান পাতা যায় না। কি পাপ করছি যে জ্বালাবে আমারে?

শরৎ দাস স্ত্রীর দিকে চাইল। দেখেছে শরৎ পটলের মতিগতি অমনি বিগড়ে গেছে। ক্ষেতের কাজ ও করে না। এখানে ওখানে ঘোরে। তবু ভরসা ছিল কেতকীর উপর।

সংসারের সব কাজই দেখে সে এখানে এসে। রায়পুরে থাকতে শরৎও তাদের শাসন করতে পারে নি। হয়তো দাবীও ছিলনা তার। আজ পিতৃত্বের সেই দাবীটুকু সে ফিরে পেয়েছে ঘর বসত আর জমি পেয়ে।

শরৎ দাস বলে—কি হইছে?

—ওই মাইয়ারে জিগাও। কুন্তি বুড়ি কইল—তোমার গুণধর পটলাও জানে! ওই মেয়ের লগে গিরিজার এত মেলমেশ ক্যান?

শরৎ একটু অবাক হয়। ওরা ক'টি পরিবার কয়েকবৎসর ধরে সুখে দুঃখে সঙ্গী হয়ে আছে। নিশিকান্তের স্ত্রী সেবার মানা-য় মারা যাবার পর ললিতাও ওই মা মরা গিরিজা আর ভুজঙ্গের জন্যে অনেক করেছিল।

এতদিন সেসব নিয়ে কথা ওঠেনি। ক্যাম্পের সেই জীবনে কে কোথায় ভেসে গেছল, কোন কাজের কৈফিয়ৎ ও কেউ চায়নি। কিন্তু এখানে এসেই যে-কোন কারণেই হোক নানা রটনা-আলোচনাই শুরু হয়েছে।

শরৎ বলে স্ত্রীকে—এই কথা!

ললিতা বলে—কৃপাসিন্ধুর সন্ধানে ভালো ছাওয়াল আছে বিহা দাও মাইয়ার।

শরৎ একটু অবাক হয়।

—এর মধ্যে এখানে এসে কৃপাসিন্ধু ঘটকালির ব্যবসাও করছে নাকি? ওর কথায় বিশ্বাস করবা না কাতুর মা। দেহি—কি করা যায়।

খবরটা নিশিকান্তের কাছেও পৌঁচেছে।

আজ দুপুরে রামায়ণ পাঠের আসরে এসে কুন্তি বুড়িই শুরু করেছে কথাটা মেয়ে মহলে। নিশিকান্ত একটু অবাক হয়।

গুপীনাথ বলে—ওসব কথা থাক।

সুরভির মা বলে—এর মীমাংসা হোক ঠাউরমশায়, সোমত্ত মাইয়া লইয়া ঘর করি, আমারও ভয় করে। কি নিশিদাদা কও কি কইবা। আর শরৎ দাদাও আইছ।—

শরৎ কি বলবে জানেনা। কথাটা আগেই ভেবেছিল নিশিকান্ত। তার সংসারে একজন কাজের লোকের দরকার। এখন দিন বদলেছে।

নিশিকান্ত বলে—তোমাগোর ভয ডরের কিছু নাই সুরভির মা, আমি ও শরৎ ঠিক করছি আগেই, এতদিন সময় হয়নি। এবার ভাবছি ঠাকুর মশাই ওগোর শুভ কাজটা সারি ফেলাইব। একটা বিহার দিন দেইখ্যা দ্যান।

অবাক হয় সুরভির মা, কুন্তি—আরও অনেকে।

রামগতি ওদিকে বসেছিল। সে বলে—খাসা হইব হালদার খুড়া। তাহলে বরযাত্রী—কন্যাযাত্রী দুই-ই যামু। আর গানও গামু।

গুপীনাথ ভটচার্য বলে—অতি শুভ প্রস্তাব! তাহলে নোতুন বসতে এবার সব শুভকাজই হবে নিশিকান্ত। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ! সব নিয়েই মানুষের জীবন। ওদের শুভকাজ হোক, দিন দেখে দিচ্ছি।

মাঠে লাঙল নেমেছে। অনেকদিন পব মানুষগুলো আবার সেই হারানো জীবনেব সুর-ছন্দ খুঁজে পেয়েছে। দশ বারোটা বছর তাদের জীবনে এনেছিল অভিশাপ আব বিপর্যয়। রামানুজ-নিশিকান্ত-শরৎ-বামগতিও নেমেছে হাল নিয়ে। গিরিজা কোদাল চালিয়ে আল বাঁধছে।

আকাশে দেখা দিয়েছে বর্ষার কালো মেঘছায়া। দু-চার পশলা বৃষ্টিও হয়েছে। শুক্‌নো বিবর্ণ মাটির বুকে এসেছে সবুজের স্নিগ্ধতা। বনের গাছ পাতার রং-এ ঘোর লেগেছে, পাহাড়গুলো সবুজ স্পর্শমাখা। কালো মেঘ ছেয়ে বৃষ্টি নামে।

কুমড়োগুলো তুলে নিয়েছে আগেই। ক্ষেতের প্রথম ফসল বেশ নধর বিরাট সাইজের কুমড়ো হয়েছিল। বেশ কিছুদিন চলবে। ওদিকে ঢেডস-ঝিঙেগাছেও এসেছে প্রচুর ফল। ধানের বীজগুলো সবুজ সতেজ হয়ে উঠেছে।

কৃপাসিন্ধু এখন অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তার নিজের জমি চাষ করার সময় সাধ্য কোনটাই নেই। কৃপাসিন্ধুর বৌ গজ গজ করে,

—লোকে মাঠে নামছে, সরকার জমি বলদ দেছে চাষ করবা না? কৃপাসিন্ধু চিরকালই নানা কৌশলে সংসার চালায়। তার মেয়ে রাণুও বড় হচ্ছে। সে সব ভাবনা তার নেই। কৃপাসিন্ধু বলে,

—থাম তো! নিজে খেটে যা পামু তার অর্ধেক পামু ভাগে দিই! গিরিজা আর শরৎদাসরা আধাআধি ভাগে চষবে জমি, ঘরে বইসা ধান পামু। অর ততক্ষণ অন্য ধান্দা করতি হবে।

ধান্দাটা সে ভালোই করেছে। কিছু নগদ টাকা দিয়ে হাল কিনে মজুরভাড়া করে সে পদমধুগাঁ—বেনাপুরের আদিবাসীদের সরেস প্রায় বিঘে বিশেক জমিতে চাষ করাচ্ছে। সেসব জমিতে জলের অভাব নেই—ঝর্ণা রয়েছে কাছেই। এর মধ্যে প্রথম বর্ষাতেই ধান পুতেছে।

এর জন্য দু-চারটে ছাগল, কিছু চাল আর মদ খাওয়ানোর খরচা গেছে আদিবাসীদের গ্রামে। হিসাব করে লাভের অঙ্কটাও দেখেছে কৃপাসিন্ধু।

এখন এদের সময় নাই।

জোন অপিস থেকেও সাহেবরা আসছেন। মিঃ রায়ও আসেন।

বলেন তিনি—হালদার মশাই, নীচু জমিতে ধান করুন। আর উপরের জমিতে এখন সব্জী করুন, পরে মেস্তাপাট দেবেন—না হয় তিল, কিছু মকাই।

রামানুজ বলে—ওসব চাষ জানিনা স্যার! ধানই দিচ্ছি।

সারা মাঠে মাথা তুলেছে ধান-এর গাছ। সবুজ হয়ে উঠেছে মাঠ। ওদিকের উপরের স্তরে ক্যানেলের কাজ চলছে, বয়ে গেছে ক্যানেলের সরু খাত। এখনও জল আসেনি।

নীচের দিকে নদীটির রূপ বদলে গেছে। গেরুয়া ঢল নেমেছে।

আর গ্রামের বাঁধও প্রায় ভরে উঠেছে। এবার আর গ্রীষ্মে তত জলের অভাব হবে না।

রামানুজ বলে—দু'একটা বছর পার করতি হবে শরৎদা, তারপর দেখবা মাটির তার আইবো।

ক্লান্ত মানুষগুলো যেন আব যুদ্ধ করতে চায় না। তারা চায় এরপর শান্তি আসুক। সমৃদ্ধি আসুক।

চাষ-এর পালা আপাততঃ শেষ হয়েছে। বৃষ্টির মেঘ-এর ধমক কিছুটা কম, গরুবাছুরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মানুষেরই মতই।

এমনি সময় ওদের গ্রাম বসতে বিয়ের সুর ওঠে। তিন নম্বর উলিপুরের বসতি থেকে হৃদয় এসেছে রসুনচৌকীর দল নিয়ে। ফরিদপুরের লোক হৃদয়, সেখানে ও বাদ্যকর ছিল। তারপর আর বিশেষ কোন উৎসব আসেনি তার সামনে। তবু সানাই আব নাগরা জোড়াটা সঙ্গে ছিল। ভাইপোকে নিয়ে সে এসে সানাই বাজাতে শুরু করেছে বহুদিন পব।

উঠানে সামিয়ানা টাঙানো, ওদিকে শরৎ দাস-রামানুজ-গতিলাল-অনেকেই ব্যস্ত। গুপী ভটচায পুরোহিতের পদটা পেয়ে গেছে এই চাকলার গ্রামগুলোয়।

কলাগাছ দিয়ে ছাদনাতলাও হয়েছে।

পটলা-কালুর দলও কাজে করছে। কৃপাসিন্ধু এখন ব্যস্ত। এই এলাকার প্রায দশ বিশখানা বসতিতে এর মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখান ওখানে মিটিংও করছে কৃপাসিন্ধু।

খুবই ব্যস্ত সে। আর তাব সঙ্গে ঘোরে কালু-পটলারাও। আজ পটলা তার দলবল নিয়ে রয়েছে। মালকানগিরির বাজার থেকে কৃপাসিন্ধুই রসগোল্লা আনিয়ে দিয়েছে। মাছও কিছু পেয়েছিল জেপুর বাজারে।

উলুধ্বনি ওঠে। হেসাক-কারবাইড-এর গ্যাসের আলো জ্বলছে, বসতের লোকজন অনেকেই নিমন্ত্রিত। আর এসেছে কুন্তিবুড়ি। তার লজ্জা শরম নাই। বলে সে,

—আমিই উদ্যুগ কইরা বিহাটা দিলাম কেতকী। নোতুন ঘরে যাই ভুলবি না যেন?

কেতকী আজ সবচেয়ে বেশী খুশী। আজ মনে পড়ে অতীতের সেই চরম দুঃখ আর অপমানের দিনগুলোর কথা। শিয়ালদহ প্লাটফর্মের একদিকে পড়ে থাকতে হতো, খিদের জ্বালায় হাতও পেতেছে কোনদিন।

মনে পড়ে মানা ক্যাম্পের কথা। তার হঠাৎ আসা যৌবনের সেই জ্বালাভরা চরম অপমানের মুহূর্তগুলোকে ভোলেনি। কোনদিন ভাবেনি আবার নিজের ঘরের ঠিকানা পাবে, একজনকে ভালোবেসে ঘর বাঁধবে। আজ কেতকী এই বন-পর্বতঘেরা পরিবেশকে নোতুন করে চেনে, এখানে এসেই জীবনের পরম নির্ভর খুঁজে পেয়েছে সে।

নোতুন চোখে দেখে আজ গিরিজাকে, ওই ছেলেটিই তাকে আজ পরম পবিত্র পরিচয় দিয়েছে, তাকে দিয়েছে ঘরের ঠিকানা। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির সুব ওঠে রাতের অন্ধকারে। এই বনবাজ্যে নোতুন মানুষের দল ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে।

একাই তার ঘরে বসে অছে কৃপাসিন্ধু—বাড়িতে কেউ নেই এখন। তার গিন্নী ছেলেমেয়েরা গেছে বিয়ে-বাড়িতে। অন্ধকারে বিয়েবাড়ির আলোর আভাস ওঠে, স্তব্ধতার মাঝে উঠছে কলরব, উলুধ্বনির শব্দ।

কৃপাসিন্ধু আজ একাই মদের বোতল আর মুড়ি বেগুনি নিয়ে বসেছে। দলবল কেউ এখানে নেই। সব

বিয়েবাড়িতে। শরৎদাস দুটো ছাগল কাটিয়েছে। মাংস আর ভাত দেবে বিয়েতে।

কৃপাসিন্ধু গজরাচ্ছে—ঘর বাঁধবি এই বনবাসে? বুঝবি ঠ্যালা এর পর। হাতের দুধো শ্লা হাড়ে গজাবে।

হঠাৎ অন্ধকারে টর্চের আলো দেখে চাইল। ভ্রভিত কণ্ঠে হাঁক পাড়ে কৃপাসিন্ধু,—কে?

এগিয়ে আসে ছায়ামূর্তিটা, সাইকেলটা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে রেখে ওকে দেখে বলে সে—আছো তাহলে কৃপাদা।

কৃপাসিন্ধু চাইল। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় চিনতে পারে লোকটাকে। সাত নম্বর ভিলেজেব হরিশ।

হরিশের মালকানগিরির বাজারে দোকান—আটা চাকি আছে। টুকটাক কনট্রাকটারিও করে। নিজে পাওয়ার টিলারও কিনেছে, ওর বাসনা বেশ কিছু জমি নিয়ে একাট ফার্ম মত করে, কিন্তু একলপ্তে এতজমি পাচ্ছে না। তাই ছড়ানো ছিটানো জমির খোঁজ পেয়ে সে বিভিন্ন জায়গায় এখন চাষ করছে।

—এসো হরিশ! কৃপাসিন্ধু বসালো ওকে। একটা গ্লাসে মদ ঢেলে এগিয়ে দেয়—নাও, একটু।

হরিশ সাবধানী ব্যক্তি! ইতিউতি কবে—এসময় খাবো? ওদিকে বিয়েবাড়িব নেমন্তন্ন। এলাম, ভাবলাম একটু দেখা করে যাই।

তাহলে জমির সন্ধান আর কিছু পেলে?

কৃপাসিন্ধু ওকে সহজেই হাতে পেয়েছে। দুজনেই সুবিধাবাদী জীব, আর হরিশের হাতে টাকাও কিছু এসেছে যে ভাবে হোক। কৃপাসিন্ধু বলে—পাবে ভায়া। তবে কিছু খবচা কবতে হবে। জমিগুলো দ্'একসন এদের হাতে আসুক। তারপর স্বপ্ন ছুটবে ব্যাটাদের, তখন পালাই পালাই রব তুলবে। ঠিক সেই মুখে দাও টাকা—নাও জমি, বাড়ি সবকিছু।

হরিশ কথাটা ভাবছে। তবু বলে সে—একবার এতবছব পথে পথে ঘুরেছে এরা, তবু বসতি পেয়েছিল, আবার সব হারিয়ে পথে নামবে?

কৃপাসিন্ধু বলে—মরুক গে ব্যাটারা। বুঝলে হরিশ মড়ক যখন লাগে তখন কে মববে কে বাচবে তাব কিছু ঠিক আছে কও?

হরিশ এতবড় সত্যের প্রতিবাদ কবতে পারে না। তাই ঘাড় নাড়ে সে—ঠিক কথা।

খুশী হয়ে বলে কৃপাসিন্ধু,

—তাহলে এগোর বাঁচা মরার কথা ছাইড়া দাও, নিজেদেব বাঁচার কথাটাই ভাবতে হবে।

হরিশ বলে—এক-দু বছর পর এসব জমি ক্যানেলের আওতায় আসবে।

হাসে কৃপাসিন্ধু—তার আগেই দ্যাহো কি হয়! আর এখন তো অনেক আদিবাসীদের জমি তোমারে চাষ করতে পাইয়ে দিছি, সেগুলান চাষ করো। তারপর ওদেবই সব এসে যাবে।

হাসে কৃপাসিন্ধু। হরিশও জানে যেভাবে হোক ওই সবল আদিবাসীদের ঠকাতে পারবে সে, কৃপাসিন্ধু তা জানে। তাই বসে সে,

—শেষ মেষ আমারেই ঠকাইবা না তো হরিশ?

হরিশ হাসে—কি যে কও? তোমার পয়সা ঠিক ঠিক দিই, আর জমি পাইলে তোমারেও দিমু।

দুজনে অন্ধকারে যেন এই বনবাসে রাজ্যদখলের স্বপ্ন দেখছে। ওদের চোখ জ্বলে। আদিম অরণ্যের বুকে অন্ধকার নেমেছে, চিতাবাঘটা ক'দিন ধরেই ঘুরছে বনে বনে। সেই রাত্রে বাতাসে সে মানুষের দেহের ঝলসানো গন্ধ পেয়ে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আগুন আর লোকজনের চীৎকার দেখে সাহস করে এগোতে পারে নি, নদীর ওপার থেকেই চীৎকার করে ফিরে গেছে।

কিন্তু চিতেবাঘটা এই বন পাহাড়ের এলাকা ছেড়ে যায়নি। পাহাড়েব একটা দুর্গম গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে সে ঝর্ণার জলে জিব লাগিয়ে চেটে চেটে জল খাচ্ছে, আর লুব্ধ চাহনিতে চেয়ে দেখছে ওই দূরের জনবসতেব দিকে। বাতাসে কিসের ঘ্রাণ নিতে চেষ্টা করে অলস পায়ে নেমে এল পাহাড় থেকে নদীর দিকে।

নদীর জল এখন একটু গভীর, বর্ষার বনপাহাড় ধুয়ে ঘোলা জল নামছে। ওদিকে কয়েকটা হরিণ চেয়ে আছে ধান ক্ষেত, সব্জী ক্ষেতের দিকে।

আগেও ওইদিকে ছিল বনভূমি, তাদের এলাকা। কচি পাতা ঘাস খেতো ওখানে। এখন ওদিকে যাবার উপায় নেই। ক'দিন আগেই একটা হরিণ মারা পড়েছিল। তারা দৌড়ে টপকে নদী পার হয়ে এপারের বনে ঢুকে প্রাণ বাঁচায়।

তবু ওই সবুজ ধান-কুমড়ো-শশা-ঝিঙের লোভ তাদের যায়নি!

কোয়াক্! ওদিক থেকে একটা চিতল হরিণ বনের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ দেখে ভীত কণ্ঠে সাবধানী ডাক ডেকে তির্যক রেখায় লাফ দিয়ে পালাল। দলের বাকী হরিণগুলোও মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

চিতাবাঘটার ওদিকে নজর নেই।

নদীর জলে নেমেছে সে, একটু স্রোত রয়েছে । সহজেই সাঁতার কেটে ওপারে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে সাবধানী দৃষ্টিতে জনবসতের দিকে চেয়ে এগোল গুঁড়ি হয়ে। দু-চারটে জোনাকী পোকা উড়ছে তার পাশে।

ক্রমশঃ জোনাকী পোকাগুলো যেন ঘিরে ধরেছে তাকে।

সাবধানে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে চিতাটা রাতের অন্ধকারে, ওই আঁধারে ঢাকা জনবসতের পানে।

বিয়েবাড়িতে কলরব কোলাহল ওঠে।

শরৎ দাস নিজে তদারক করছে—খাও ভূষণ, কইরে গতিলালের পাতে ভাত নাই, মাংসও দে! ওহে সীতু, যা দরকার চাইয়া লও।

মেয়েরাও বসেছে। বহুদনি পর এই হারানো মানুষগুলো আবার সামাজিক ভাবে একত্রে বসে অন্নগ্রহণ করছে, সামাজিক আনন্দ উৎসবের দিন । নিশিকান্তও দেখছে সব।

রামগতিও এসেছে। রামগতি বলে,

—বহুকাল পর আবার যে আমরা মানুষের সমাজে বাস করছি তা মনে হল হালদার মশাই, এতকাল তো ঘুরছি পথে পথে আর ক্যাম্পের খাঁচায় শ্লা জানোয়ারের মতন বাস করেছি!

তা বৌ-ভাতে কি করছো হালদার মশাই, এতকাল পরে ঘরে লক্ষ্মী নে যাইত্যাছ ধূম কববা কিন্তু!

হাসে নিশিকান্ত!

হঠাৎ একটা চীৎকার ওঠে—প্রথমে এরা শোনেনি, তারপর কানে আসে।

—বাঘ বাঘ-এ বলদ নে গেল! বাঘ হে—হুঁশিয়ার!

বাঘ! চমকে ওঠে ওরা! মুহূর্তের মধ্যে এই আনন্দ কলরব থেমে যায়। চীৎকারটা আসছে বসতির নদীর ধারের দিক থেকে। অন্ধকারে কারা মশাল জ্বেলে চীৎকার করছে। বাঘের নাম শুনে মেয়েরা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে।

অন্ধকারে বনপাহাড় থেকে যেন কি এক সর্বনাশ ওই বাঘের রূপ ধরে এগিয়ে এসে হানা দিয়েছে মানুষের বসতে। লাঠি-কুড়োল-টাঙ্গি নিয়ে কলরব করছে ওরা। ভুজঙ্গও ছুটে যায়। ছুটছে অনেকেই।

নিশিকান্ত হালদাবের পাশের বাড়ির গোপালই হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয়—নিশিকাকা তোমাগোর গোয়াল থনে একটা বলদরে তুলি নিই গেল বাঘে। এক লজর দেখছি। ইয়া বাঘ—চক্ষু জ্বলত্যাছে, বলদটার কল্লা মটকাই টাইনা লই গেল গিয়া!

চমকে ওঠে ভুজঙ্গ, গিরিজাও এসে পড়েছে।

গিরিজা গর্জে ওঠে, দেখুম তারে। চল ভুজঙ্গ—

বাধা দেয় নিশিকান্ত—রাইতের আঁধারে যাস্‌নে। আর ফিরি পাবি না ওরে।

অনেকেই জুটেছে। কালু বলে—ঝড়-বজ্রাঘাত-বাঘ-খরা হালা কি নাই এখানে? এখানের বনবাসে তবু থাকতি হবে?

রামানুজ গর্জে ওঠে—হ্যাঁ! থাকুম! ওগোর শ্যাষ কইরা থাকুম! সকাল হতি দে—দেখছি তারপর।

খুশীর ঝলমলে মনটা কি বেদনায় কালো হয়ে ওঠে। গিরিজা চুপ করে বসে আছে। তার জীবনের বাসররাত্রি, আশা করে গিরিজা ঘর বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই অন্ধকারের জানোয়ারটা যেন ইচ্ছে করেই আজ তাদের সর্বনাশ করেছে। সুন্দর বলদটাকে ভালোবেসে ফেলেছিল গিরিজা, কালো সাদার ছিট দেওয়া

নধর চেহারা। ডাগর চোখ—ক'মাসেই গিরিজার খুব বশ হয়ে গেছল। ডাইনে বাইত তাকে, গিরিজার শক্ত মুঠির চাপে হাল-এর ফলা মাটিতে চেপে বসতো। হেই তা-তা! ডাইনে—

গরুটা অনায়াসে চলতো, ফলার দুদিকে ঠেলে উঠতো গভীর মাটি, গিরিজা খুশী মনে গান ধরতো। তার এতদিনের সঙ্গী। ওই বাঘটাই তাকে শেষ করে গেল।

—শুনছো? চাইল গিরিজা কেতকীব ডাকে।

কেতকী বলে—আমি নাকি অপয়া, তাই না?

—কেন? গিরিজা অবাক হয় ওর কথায়। কেতকীর দুচোখ জলে ভরে আসে।

কেতকী বলে—নালি আজই বলদটারে বাঘে মারবে ক্যান?

গিরিজা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—ধ্যাৎ ! কি যে কও। বাঘড়া যে-কোন দিন মারতো গরু বাছুর। ওরে দু'একদিন দেখছি। ভাবিনি ব্যাটার এত সাহস হবে। এবার দেখছি ওরে। বলদ গেছে গিয়া—নোতুন বলদ আনুম রায় সাহেবেরে ধইরা! কান্দো ক্যান আজকের দিনে?

ওকে কাছে টেনে নেয় গিবিজা। বলে সে,

—সব ঠিক হইয়া যাইবো!

কৃপাসিন্ধু হরিশ দুজনেই নেশায় বুদ হয়ে আছে; ওই চীৎকার কলরব আর বাঘের নাম শুনে হাসছে কৃপাময়।

—হালা বোঝো ঠ্যালা? বিহার রাতেই কম্মো সাবাড় হইছে! তহনই কইছিলাম ওগোর, বনের ব্যাপার বোঝস্ না! এহন হইছে কি? হাসি মুইছা যাবে গিয়া!

হরিশ বিড় বিড় করে—চক্‌কে চক্ দুশো বিঘা হাসিল জমি পাইলে দেইখা লইবা ক্যামন চায বাড়ি বানাইমু! পুরানো জিপও একখান যদি পাই—

হবিশ আর কৃপাসিন্ধু দুজনের জিব দিয়ে যেন জল পড়েছে।

বাঘটা বেশী দূর নিয়ে যেতে পারে নি মড়িটাকে। নীদব ওদিকেব ঝোপের মধ্যে ফেলে প্রথম চোটে বেশ খানিকটা মাংস খেয়ে তার খিদে আপাততঃ মিটে যায়।

আশপাশের গাছের ডাল ভেঙ্গে মড়িটার উপর চাপা দিয়ে রেখে বাঘটা গিয়ে নামলো নদীর জলে। ভরপেট খাবার পর সারা দেহ তাপে গরম হয়ে ওঠে, নদীর জলে বেশ কিছুক্ষণ পড়ে থেকে বাঘটা পিছনেব দিকে চেয়ে তার জিনিসটাকে দেখে নিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সারা বসতির মানুষ বের হযেছে কুড়াল, টাঙ্গি, দা যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে। জোন অপিসেও খবর পাঠিয়েছে।

গিরিজার রাগটা সবথেকে বেশী।

ভুজঙ্গও চলেছে সড়কি হাতে। ধান ক্ষেতের আলে তখনও রক্তের দাগ মিলোয় নি। ওরা সেই রক্তের দাগ ধরে এগিয়ে যায়। নদীর এদিকটায় এখনও ঘন বন। পিটুস্—লতাপলাশ-এর জঙ্গল, নীচের দিকে চেয়ে অবাক হয় তারা।

এখানেই গরুটাকে আধ খাওয়া করে পাতা চাপা দিয়ে রেখে গেছে। নরম মাটিতে বাঘের পায়ের দাগও রয়েছে।

নিশিকান্ত বলে—ওই পাতাটাতা সরাস নি। ও ব্যাটা নির্ঘাৎ আইবো।

ভূষণ এককালে তাদের গ্রামের জঙ্গলে বনশূয়োর অনেক মেরেছিল গাদা বন্দুক দিয়ে। কিন্তু আজ হাতিয়ার কিছু নাই। বলে সে,

—বন্দুকখান থাকলি আজ দেখতাম ওরে!

কিন্তু করার কিছুই নাই। নবীন বলে—যে ভাবে হোক ওকে শেষ করতি হবে, নালি গরু মারছে, আশেপাশেই থাকবো। এবার কুনদিন মানুষও মারতি পারে ব্যাটা।

ভুজঙ্গ গর্জাচ্ছে।

কিন্তু করার কিছুই নাই। কে বলে—ব্যাটা ওই জঙ্গলে থাকতি পারে। তাড়ামু?

বাধা দেয় ভূষণ—না। মরীয়া হয়ে ঘাড়েও পড়তে পারে। তার চেয়ে জোন অপিসে খবর গেছে দ্যাহো কি করেন ত্যানারা। আর আমাগোরও সাবধানে থাকতি হবে।

ওইভাবেই শূন্যহাতে ভগ্ন মন নিয়ে ফিরে এসেছে মানুষগুলো। আরও কিছু ভাবতো, কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে। ওরা ফিরে এসেছে। গিরিজা চুপচাপ ভাবছে।

ভুজঙ্গই ব্যবস্থা করেছে। দুপুরের দিকে বলে সে গিরিজাকে,

—বাঘটাকে দেখবো একবার?

গিরিজাও তাই চায়। কিন্তু হাতিয়ার নেই। গিরিজা বলে,

—শুধুহাতে কি করবি?

ভুজঙ্গ বলে—জিনিষ আনছি আদিবাসী সর্দারের কাছ থনে।

কেতকী নিশিকান্তও জানেনা ব্যাপারটা।

কেতকীর মনটা ভালো নেই। বাড়িতে পা দিতে অমঙ্গলই হয়ে গেল গৃহস্থের। নিশিকান্ত বলে- -ও নিয়ে দুঃখ করবা না মা। এমনিও হই যেতো এডা।

দেহি! বলদ একখান্ আনুম এই হাটে। বেগুন বেচছি আটশো টাকার. শশাও বেচছি তিনশো টাকার, মাটিই দিচ্ছে ওসব। তয় এদের দেখছি না? গিরিজা ভুজঙ্গ গেল কই? কাম কাজ বাড়িতে কোথায় যে যায় তারা।

নিশিকান্তও বৌভাতের আয়োজন করছে!

আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা, নদীর বুকে ঢল নেমেছে—স্রোত একটু বেশী। ওদিকের পাহাড়ের গায়ে মেঘগুলো ভেসে ভেসে এসে ঠেকে যায়, সাদা ধোঁয়ার মত মেঘ! ঝির ঝিরে বৃষ্টি নামে। আঁধার ঘনিয়ে আসছে।

দুইভাই গিরিজা আর ভুজঙ্গ নদীর ধারে একটা মহুয়া গাছের ঘন পাতার আড়ালে বসে আছে দৃষ্টি মেলে। জন মানব নেই—আদিম অরণ্যের ধারে বসে আছে তারা। ভুজঙ্গের হাতে বল্লম, গাছের ডালে আটকে রেখেছে ধারালো টাঙ্গিটা। গিরিজার হাতে তির ধনুক। তিরের ফলাগুলো তিন চার ইঞ্চি লম্বা—ইঞ্চিখানেক চওড়া। ওগুলোর ফলায় তীব্র বিষ লাগানো।

গিরিজা এখানে এসে তির ধনুক ছোঁড়াও অভ্যাস করেছে। বেগুন অন্য সব্জীর ক্ষেতে খরগোস, কটরা হরিণ ও পাখীর উৎপাত হতো খুব। ওই তির ধনুক দিয়েই খরগোশ মেরেছিল অনেক। কিন্তু বাঘ মারা যায় এদিয়ে শুনেছে, পরখ করে দেখেনি।

কয়েকটা ময়ূর হঠাৎ ওদিকের বনে কলরব করে উড়ে গেল—ভুজঙ্গ ইশারা করে।

চমকে ওঠে গিরিজা। সবুজ বন থেকে বের হয়ে আসছে একটা চিতাবাঘ, বেশ বড়! এদিক ওদিক চেয়ে এসে নদীর জলের ধারে দাঁড়িয়ে আবার দেখতে থাকে আশপাশের চারিদিকে।

সারা গায়ে কালো কালো ছোপ, হলুদ কালো রং মিশে বাঘটা যেন বনের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। কি ভেবে বাঘটা নামলো ওই স্রোতে—মাথাটা জেগে আছে হাঁড়ির মত, সহজেই নদীর স্রোত পার হয়ে এপারে এসে উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে পাতা চাপা দেওয়া মড়িটার দিকে। দেখছে সেটাকে।

মনে হয় খুশী হয়েছে ভেবে যে, তার জিনিষে কেউ হাত দেয় নি।

মাটিতে মানুষের কোন পায়ের দাগও নেই, বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। বাতাস বইছে বনের দিক থেকে, গিরিজাদের গায়ের কোন গন্ধও পায়নি সে।

বাঘটার গলা দিয়ে একটা চাপা আওয়াজ বের হয়।

পিছনের পা দিয়ে বাঘটা মড়ির উপরের ডাল পাতাগুলো ছিটকে ফেলে।

এরা দেখছে ঘন পাতার আড়াল থেকে। বলদটার অর্দ্ধভুক্ত দেহটাকে এবার নিয়ে নিশ্চিন্তে বসেছে বাঘটা। সেই মুহূর্তেই গিরিজাও বাঘের পাঁজরা লক্ষ্য করে তিরটা ছুঁড়েছে। জোরে তীক্ষ্ণ ধার ফলাটা বিঁধে গেছে বুকের কাছে গভীর ভাবে, পরমুহূর্তে আর একটা তির ছুঁড়েছে, বাঘও লাফ দিয়েছে সেই মুহূর্তে—তিরটা লেগেছে চোখে। বিকট গর্জন করে ওঠে বাঘটা।

কোনদিক থেকে আক্রমণটা আসছে লক্ষ্য করার সময়ও পায়নি, সোজা লাফ দিয়েছে গাছের দিকে, আর সেই সঙ্গে ভুজঙ্গের হাতের ধারালো বল্লমটা সজোরে এসে গিঁথে গেছে ওর হৃৎপিণ্ডের কাছেই। রক্ত ঝরছে গা দিয়ে, চোখ দিয়ে, ভুজঙ্গ কুড়লটা ছুঁড়েছে। ভারি কুড়লটা বাঘের একটা পায়ের হাড়ে লেগে ছিটকে পড়ে—বাঘটাও আছড়ে পড়েছে কাদার মধ্যে। গর্জন করছে।

কোনরকমে উঠে ওই তির বেঁধা অবস্থায় বল্লমটাকে কামড়াতে থাকে, যন্ত্রণায় ককাচ্ছে। বল্লমের বাঁশ খানিকটা গুঁড়ো করে ফেলেছে, তবু বল্লমটাকে বের করতে পারেনি। ওই অবস্থাতেই নদীর জলে পড়েছে। কোনরকমে পালাতে হবে তাকে।

তার তেজও কমে আসছে। আসার সময় স্রোতে বেশীদূর টেনে নিয়ে যেতে পারেনি তাকে—এখন বাঘটা আধমরা অবস্থায় ভেসে চলেছে।

গিরিজা ভুজঙ্গরাও গাছ থেকে নেমে এসে নদীর এদিকের তীর ধরে দৌড়চ্ছে আর হাঁক পাড়ছে! গিরিজা বাঘের ওই ভাসমান মাথা লক্ষ্য করে আরও কয়েকটা তির ছুঁড়েছে, দু'তিনটা তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, একটা তির সিধে কপালে গেঁথে গেছে গভীরভাবে। ঝিমিয়ে আসছে বাঘটা।

ওদের চীৎকারে বসতের অনেকেই ছুটে আসে। কে জানে বাঘটা কাউকে আবার মেরেছে বোধহয়। তারা সড়কি-ল্যা'জা-বল্লম নিয়ে এসে দেখে স্রোতের টানে বাঘটা ভেসে ভেসে এদিকের তীরের দিকেই আসছে। স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তিও তার ফুরিয়ে আসছে।

জলের মধ্যে ভাসছে সে, আর নাগালের মধ্যে এলে কুঠার বল্লমের খোঁচায় তাকে মারাত্মক ভাবে আহত করছে লোকগুলো, কে সপাটে বাঘের মাথাতেই বসিয়েছে রডের এক ঘা, মাথাটা ফেটে যায়—রক্ত ঝরতে থাকে।

আধঘণ্টার মধ্যেই ওরা বাঘটাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে তীরের কাছে টেনে এনেছে। তীব্র বিষের জ্বালায় বাঘটা আধমরা হয়েই এসেছিল, চোখটা অন্ধ হয়ে গেছে, মাথাটা ফেটে রক্ত ঝরছে। তবু গজরাবার চেষ্টা করে, কিন্তু এরা পিটিয়ে শেষ করেছে তাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বাঁশে বেঁধে বিজয়ীর মত তারা বসতে ফিরছে, হেসাক জ্বলছে—সারা বসতের লোক ভেঙ্গে পড়ে! কেতকী দেখছে গিরিজাকে।

গিরিজার সারা দেহে কাদা—জামা কাপড় ভিজে গেছে। বলিষ্ঠ সতেজ তরুণ আজ পেরেছে প্রতিশোধ নিতে।

কেতকীর দুচোখে হাসির আভাস। বলে সে,

—উটাকে মারলা অমনি করে? তুমি কি গো!

হাসে গিরিজা—মারলাম বৈকি। বিয়েতে তোকে একটা বাঘই দিলাম। চামড়াখান্ রাখি দিবি আর নখগুলানও।

জোন অপিস থেকে জিপ নিয়ে এসে পড়েছেন মিঃ রায় আরও দু'একজন। সঙ্গে তাদের স্পট লাইট, রাইফেল। আজ রাতে তাঁরা চেষ্টা করতেন ওটাকে মারার।

কিন্তু ন'ফিট চিতাকে এভাবে কাবু হতে দেখে অবাক হন তিনি। গিরিজাকে শুধোন,

—তুমি জখম করেছিলে?

গিরিজা বলে—সঙ্গে আমার ভাইও ছিল। ওই যে বুকে বল্লমটা দেখছেন ওটা ওরই!

—সাবাস! খুশী হন মিঃ রায়। তিনি বলেন,

—এই বাঘটা এই অঞ্চলের অনেক বসতিতে হানা দিয়ে গরু বাছুর মেরেছে, দুটো মানুষও মেরেছিল।

ওদিক থেকে তাড়া খেয়ে এদিকের পাহাড়ে এসে এখানে ক্ষতি করতো। এতে শেষ করে সত্যি একটা ভালো কাজ করেছো!

নিশিকান্ত বলে—ব্যাটাতো আমার ভালো বলদটারে মারলো, এহন বলদ পাই কনে?

মিঃ রায় বলেন কি ভেবে—ঠিক আছে। গিরিজা ভুজঙ্গকে একটা বলদ দেবার ব্যবস্থা করা হবে, কাল আসুন।

নিশিকান্ত বলে—কাল তো স্যার আপনাকেই এখানে পায়ের ধুলো দিতে হবে। আমাগোর প্রথম কাজ। বৌভাত।

হাসেন মিঃ রায়—ও, ঠিক আছে। আসবো। কালই বলে দেব কবে গিয়ে আমাদের ক্যাটল ফার্ম থেকে বলদ আনবেন। চিঠিও দিয়ে দেব। এরকম যোগ্য সাহসীদের পুরস্কৃত করা দরকার।

কৃপাসিন্ধু ও খবরটা পেয়ে ঠিক খুশী হয় নি।

বাঘটাকে এমনি করে নাস্তানাবুদ করে তারা পিটিয়ে মারবে তা ভাবেনি সে!

কৃপাসিন্ধু বলে—আসলে এটাই সেই বাঘ না অন্যডা তার কিছু জানা হইল?

গিরিজা বলে—একডা তো মারছি, দরকার হয় সেডাকেও মারুম। বসতের উপর কুনজর দিলে তারেও ছাড়ুম না।

কৃপাসিন্ধু চুপ করে যায়।

দেখছে সে কেতকীকে। মেয়েটাকে হঠাৎ আজ নোতুন চোখে দেখে কৃপাসিন্ধু। ক'দিনেই তার রূপ আরও খুলেছে, সারা দেহে ওর ছাপিয়ে এসেছে যৌবনের মাতাল করা উচ্ছ্বাস। কি ভাবছে কৃপাসিন্ধু।

হরিশ পাল বছর কয়েক আগে মানা ক্যাম্প থেকে রিফুইজীদের একজন হয়ে এসেছিল মালকানগিরির দিকে। হরিশের বাবা ছিল বেকার—ওদিকের কমলাপুর গঞ্জের ছোটখাট আড়তদার। হরিশ তখন ছোট, বাবার সঙ্গে সব হারিয়ে এদেশে এসেছিল। বনগাঁ হয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে দেখেছিল এক বিচিত্র শহর কলকাতাকে! এত প্রাচুর্য সে এর আগে চোখে দেখেনি।

কিন্তু তারা যে কত গরীব অসহায় সেটাও বুঝেছিল। তখন থেকেই ওর শিশু মনে রেখাপাত করেছিল কথাটা।

কমলাপুরের দিনগুলো মনে পড়ে।

হরিশ বলে—আবার গঞ্জে যামু বাবা।

ওর বাবা বলে—সেহানে ফেরার দিন আর নাই হরিশ। পথে পথে ভিখারীর মতই ঘুরতে হবে।

সেই ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল মালকানগিরিতে।

তখন সবে এখানের উপনিবেশ গড়ে উঠছে। তাই মালকানগিরির কাছেই একটা নোতুন সেটলারস্ ভিলেজে জায়গা পেয়েছিল হরিশ। তার বাবা পালমশাই জমি ঘর দেখে বলে,

ভব জায়গা দেহে। দ্যাখ, কি করা যায়। তয় আমি কই মালকানগিরির বাজার পত্তন হইবে। নোতুন বাজারে আমি দোকান দিমু। তয় চাষবাস দ্যাখ।

হরিশ বলে—মূলধন কনে পাবো?

হাসে পালমশাই। বলে—সে হবে নি।

হয়েও গেছল। অবাক হয় হরিশ, বাবা এত কষ্টে কাটিয়েছে, তবু জানায়নি। ওর সুটকেশ ছিল প্রাণ। আঁকড়ে ধরে থাকতো এতদিন। আজ তার ভিতর থেকেই বের হয় বেশ কয়েক হাজার টাকা আর দেখেছে দুটো সোনার বিস্কুট মত। পাল মশাই আড়ত ব্যবসা সব বিক্রি করে ওইটুকু পেয়েছিল। এত কষ্টেও তার থেকে খরচ করেনি।

পালমশাই দোকান দিয়েছিল আর জেপুর থেকে এনেছিল একটা আটা চাকির মোটর মেসিন। সেই হ'ল মালকানগিরির বাজারে প্রথম হাস্কিং মেশিন—আটাচাকি ইত্যাদির কল। আদিবাসীরা দল বেঁধে এসে ভিড় করতো।

কলে ময়দা হচ্ছে, ধান দিলে চাল তৈরী হয়ে আসছে এসব ছিল তাজ্জব ব্যাপার। হরিশ ক্রমশঃ মাথা তুলেছে। পালমশাই-এর বয়স হয়েছে, হরিশ এর মধ্যে জোগাড় যন্ত্র করে জেপুরের ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে একটা জাপানী টিলার কিনেছে, কলে জমি চাষ হবে। ভাড়াও দিচ্ছে, আর আশেপাশের গ্রাম বসতের আদিবাসীদের জমি কিছু নিয়ে চাষ বাড়ি করেছে, তাদের কিছু দিয়ে বাকীটা নিজে বিভিন্ন খাতে খরচ দেখিয়ে ঘরে তোলে।

হরিশ তাই এই এলাকায় পরিচিত জন।

আর, কৃপাসিন্ধুর মত এলেমদার লোক পেয়ে হরিশ এবার নোতুন এলাকাতে তার দখল কায়েম করতে চায়। ওইসব এলাকার জমিতে দু-এক বছরের মধ্যেই ক্যানেলের জল আসবে, দুটো করে ফসল হবেই। ওটার খবর সে পেয়েছে।

কৃপাসিন্ধু সেইদিন বাঘ মারার ব্যাপারটা দেখেছিল। হরিশও শুনেছিল বাঘের কথা। কৃপাসিন্ধু ওর চাষবাড়িতে আনে খবরটা। হরিশ বাঘ বের হয়েছে শুনে খুশী হয়েছিল সেদিন।

বলে সে—বাঘ-এর ভয়ও থাকুক ওদের। দু চারটে গরু-বলদ—চাই কি মানুষও মারুক ব্যাটা।

কৃপাসিন্ধু কথাটা শুনে একটু অবাক হয়। বলে সে,

—কি বলছো হরিশদা!

হরিশ বলে—এমনিতে খুব আশা করে বসত করেছে, ওদের জানতে দিতে হবে যে বনের জানোয়ারও আছে। সাপ বাঘ বনশূয়োর হরিণেব উৎপাতে অতিষ্ঠ হতি হবে। দু-চারটে মানুষও মরবে। শ্যালাদের হঠাতে তবেই সুবিধা হবে।

—হটিয়ে দিতে হবে? একটু অবাক হয় কৃপাসিন্ধু।

হরিশ এর মধ্যে এখানের দু-এক বড় নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

হবিশ বলে—সবাই হয়তো যাবে না। দু-দশ খান গ্রামের বেশ কিছু লোক কষ্ট বিপদেব মধ্যে পড়ি পালাতি চাইবে। অমনি ত সাস করে তাদের জমি-বাড়ি-ঘরের টিন গরু-বলদ সব কিনতে হবে। টাকার দরকার ওগোর। টাকা আমি দিমু। আব তোমারেও তার থেকে ভাগ দিমু।

কৃপাসিন্ধু ভাবছে কথাটা। হরিশ জানে লোকটা ভাবনায় পড়েছে। কি ভেবে হরিশ শ-দুয়েক টাকা ওর হাতে দিয়ে বলে,

—এটা রাখো কৃপাসিন্ধু। তোমার ত খরচা আছে। আর মাসে মাসে আইবা। ওই টাকা তোমারে দিমু।

খুশী হয় কৃপাসিন্ধু! মনে হয় তার সমাজে সুধাকান্তদার মত লোকদের অভাব নেই। সুধাকান্ত মানা ক্যাম্পে জমিদারী চালিয়েছে, অর হরিশ পাল অরণ্যের অন্ধকারে এই মানুষগুলোর সবকিছু গ্রাস করতে চায় গোপনে।

কৃপাসিন্ধু চেনে ওদের।

আর এদের নিয়েই কৃপাসিন্ধুকে চলতে হবে। কৃপাসিন্ধু বলে,

—ওসব হয়ে যাবে।

তাই সেদিন বাঘ মারার খবর শুনে হরিশ পাল একটু হতাশ হয়। বলে সে,

শেষ মেষ বাঘটারে মারলো ওই বসতের লোকজন?

কৃপাসিন্ধুর মনে পড়ে গিরিজার কথা।

বলে সে—তাই তো দেখছি। তয় গিরিজা আর ভুজঙ্গই প্রথমে ঘায়েল করেছে ওটাকে।

গিরিজা! হরিশ মনে করার চেষ্টা করে সেই মুখটা।

কৃপাসিন্ধু বলে—সেই যে বিয়াতে বৌ ভোজ খাতি গেলা, সেই গিরিজা।

খেয়াল হয় হরিশের। এবার চিনতে পারে সে। মাথা নাড়ে—তাই তো দেখছি। এ্যাঁ—বিয়ার পর ব্যাটা মরদ হইছে লাগছে।

কৃপাসিন্ধু বলে—শুধু তাই নয় কয়—সে বসতের মানুষের যেই কন ক্ষতি করার চেষ্টা করবে তারেও নাকি অমনি কইরা মারবে।

হরিশ হেসে ওঠে! ক'বছরে এমন অনেক দেখেছে সে। এদিকের গ্রাম বসতেও কিছু এমন লোক এসেছিল, কিন্তু ক'বছর কঠিন সংগ্রামের জীবনে যুদ্ধ করে অতিষ্ঠ হয়ে শেষকালে মাথা নুইয়েছে, না হয় এখানের বসত ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে ঘরের সাজপত্র-গরু-বাছুর বিক্রী করে দিয়ে। জমি অবধি।

হরিশ পাল বেনামীতে এমন অনেক জমি নিয়েই এই চাষবাড়ি গড়ে তুলেছে।

কৃপাসিন্ধু দেখছে হরিশকে।

হরিশ বলে—আরে ভয় পাইছ মনে লয়? ছাড়ো দেহি! তয় ওগোর সঙ্গে কিন্তু সম্পর্ক রাখবা। রোজ সন্ধ্যাবেলায় হরিকীর্তনেও যাইবা। ওগোর সুখদুঃখের সাথী হইবা, আর এদিকে—

ইশাবাটা করে নিজের রশিকতায় হাসছে হরিশ। কৃপাসিন্ধুও এবার কৌশলটা বুঝে নিয়ে সে হাসিতে যোগ দেয়।

খুশী মনে বের হয়ে আসছে কৃপাসিন্ধু, হঠাৎ জিপের শব্দ শুনে চাইল। মাঠের রাস্তার ধুলো উড়িয়ে জিপটা আসছে। এমন জিপ মাঝে মাঝে এখানে আসে।

ডি-ডি-এ অফিসাররা নানা কাজে ঘোরেন, কৃপাসিন্ধু খেয়াল করে নি। দেখা যায় হরিশ এগিয়ে গিয়ে জিপ থেকে আপ্যায়ন করে কাকে নামাচ্ছে।

লোকটাকে এখান থেকে দেখেই চিনতে পারে কৃপাসিন্ধু।

অবাক হয় সে—সুধাকান্তদা!

সুধাকান্তও খুশী হয়—আরে কৃপা না! ক্যামন আছো? এদিকে আইছিলাম ভাবছি তোমাগোর কথা। বুঝলা হরিশ—কৃপাসিন্ধু একনম্বর কাজের লোক।

হরিশ বলে—ওর সাথে জানাচেনা হয়েছে।

হাসে সুধাকান্ত—হবেই তো। যাক্ ভাল হইছে কৃপা—ওরা সব রয়েছে। যামু তোমাদের বসত গুলানে। একবার খোঁজ খবর লই আসি।

বৃষ্টি এখানে যখন আসে তখন পাহাড় বন ঢেকে অঝোরে বৃষ্টি নামে। পাহাড় বন গড়ানি জলে নদী নালা সব ভরে ওঠে, মাটিতে কিন্তু এত জল তেমন থাকে না। দুচার দিন পরই ও-মাটি সব জল শুষে নেয়।

তাই দণ্ডকারণ্য ডেভেলাপমেন্টের কৃষিবিভাগও নানারকম গবেষণা করে চলেছে। এক একটি জোনের মাটির রকমও আলাদা, তাদের এক একটি জোনের দূরত্ব প্রায় এক দেড়শো মাইলের মত, মালকানগিরি দক্ষিণ উড়িষ্যার শেষ সীমান্তে, পাহাড় এলাকা। এর পরই শুরু হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের সীমা।

অমরকোট জোন উড়িষ্যার পশ্চিম সীমান্তে, এর পরই মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা। এখানের মাটির রকম আলাদা। কিছুটা সমতল ধরনের। এখানে মকাই-তৈলবীজ উল্‌সি ভালো হয়। ধানের ফলন তেমন হয় না।

আর পাখানজোড় জোন এলাকা পড়ে মধ্যপ্রদেশের মধ্যে। এখানের জমির কিছু সমতল—জলের ব্যবস্থা কিছু আছে। ফলে গম ভালো হয়, ধান-কপা পান-এর চাষও হয় এখানে।

তুলনামূলকভাবে মালকানগিরির এলাকা কিছুটা উষর। বিশেষ করে নোতুন এইসব বসতির পত্তন হচ্ছে, এখানের মাটি তাই এখনও 'তার' আসেনি।

এরা ভাবনায় পড়েছে।

ক'দিন ধরেই বৃষ্টি নেই। রোদের তাপও বেশ। ফলে ক্ষেতে যেটুকু জলের সঞ্চয় ছিল তা ফুরিয়ে আসছে।

সবুজ ধান ক্ষেত-এর বুকে গাছগুলোর সবে সবুজ রং ধরেছে, অনাবাদী মাটির এতদিনের সঞ্চিত উর্বরতায় তারা বেড়ে উঠেছে। কিন্তু ক'দিন বৃষ্টি নেই।

নদীর জলও আবার কমে গেছে।

রামানুজ-শরৎ দাস-নিশিকান্তরা ভাবনায় পড়ে। গিরিজাও দেখছে মাঠের হাল।

শরৎ বলে—ক'টা দিন বৃষ্টি হয়নি, ক্ষেত শুকাইব নাকি?

রামানুজ আশা দেয়—না! না! মেঘ ঘুরিতেছে। দেখবা বৃষ্টি হইবোই।

নিশিকান্ত বলে—তহন জোনের সাহেববা কইছিল মকাই বোনো, কিন্তু না শুনি বিবাক ধান রোপণ করলা, এহন!

ওরা তবু আশা ছাড়ে নি।

ফিরছে মাঠের দিক থেকে বসতের দিকে। অকাশের দিকে ওদের চোখ। খুঁজছে তারা বর্ষায় জলভরা দু'এক টুকরো মেঘের চিহ্ন।

হঠাৎ শব্দ শুনে চাইল। জিপটা এসে থেমেছে রাস্তায়। সুধাকান্ত জিপ থেকে নেমে এগিয়ে আসে।

—আরে নিশিকান্তবাবু, যাক্ তোমাদের সঙ্গে দেখা করতি এলাম। সব ভালো তো?

ওরা দেখছে সুধাকান্তকে। ওর চেহারায় এসেছে এখন আবও বেশী জেল্লা। দেহের মেদ একটু বেড়েছে। সুধাকান্ত এখন ভালোই আছে। নিজের জিপও করেছে।

নিশিকান্ত বলে—বহুদিনের পর দেখা। ভাবতেছিলাম আমাগোর ভুলই গেছেন গিয়া। চলেন গেরাম বসতে।

সুধাকান্ত ওদের সঙ্গে হেঁটেই চলেছে। এদিক ওদিকে ধান ক্ষেত।

সুধাকান্ত বলে—ধান তো ভালোই করেছেন, কিন্তু জল ঠিক না পাইলে?

রামানুজ বলে—শুনলাম ক্যানেলের জল দেবে, তাই চাষ করলাম।

সুধাকান্ত শোনায়—ক্যানেলের কাজ তো শেষ হয় নি।

যেন অনেকদিন পর সারা গ্রামের কোন পরিচিত জন এসেছে। গ্রামের আটচালাতে বসেছে সুধাকান্ত। দেখছে সে গ্রামবসত আর এখানের নোতুন মানুষগুলোকে।

মানা ক্যাম্পে হতাশাভরা মূর্তিগুলো দেখেছিল এখানে সেই দৃশ্যটা বদলে গেছে। মাটি—নিজের ঘরগুলোতে এরা এর মধ্যে অন্যরূপ এনেছে। বাড়ির লাগোয়া মাটিতে কিছু লাউ-কুমড়ো-পেঁপে গাছ এর সবুজ আভা। মাথা তুলেছে আম-কাঁঠাল-পেয়ারার গাছ, কলাগাছও লাগিয়েছে।

সুধাকান্তের জন্য চা এনেছে কেতকী।

সুধাকান্ত ওকে দেখে অবাক হয়। মাথায় ঘোমটা—সিঁথিতে সিঁন্দুর, মুখ-চোখে এসেছে শান্তি নম্র ভাব।

কেতকী প্রণাম করে ওকে।

সুধাকান্ত দেখছে অবাক হয়ে এদের পরিবর্তনগুলো। বলে সে,

—ভালোই হইছে। তা নিশিখুঁড়ো, ঘরে বৌমা আনছো। ছেলেরাও কাজ কাম করছে।

কৃপাসিন্ধু এর মধ্যে হরিশের পরামর্শ মত অনেক বদলে গেছে। এখন সে এদেরই একজন হয়ে উঠেছে। কৃপাসিন্ধু বলে,

—দু'একটা বছর যাতে টিকতি পারি হেই ব্যবস্থা করি দেন সুধাদা কত্তাদের বলে-কয়ে। আর উপরে তো আপনার খুব খাতির, দেখেন চেষ্টা করে ক্যানেলের জল যাতে পাই আমরা।

সমস্বরে ওরা আজ সেই আবেদনই করে। শরৎ দাস বলে,

—ঠিক কইছে কৃপাসিন্ধু। জল দিতি কন ক্ষেতে, ব্যস্।

সুধাকান্তকে দেখে এগিয়ে আসে কালু নরেশ-পটলার দল। ওদিকে সুরভিও দাঁড়িয়ে আছে। সুধাকান্ত শরৎ দাসদের কথায় বলে,

—দেখছি চেষ্টা করে। তোমাগোর কথা ভুলিনি শরৎদা।—আজ উঠি। জোন অপিসে কাজ কাম সেরে আবার কোরাপুটে যাতি হবে, তোমাদের ক্যানেলের জলের কথাই কমু গিযা।

নিশিকান্ত বলে—বেলা হইছে, দুগা ডাল ভাত খাই যাবেন?

হাসে সুধাকান্ত—খাবো অন্যদিন আজ চলি।

জায়গাটায় কয়েকটা বট মহুয়া গাছ ছায়ায় আবেশ এনেছে। এককালে ছিল গভীর বন। এখন আশেপাশের গাছ সব কাটা পড়েছে। এখানে গাছের নীচে ছিল আদিবাসীর কোন দেবতা। পাথরের নুড়ি মাটির ভাঙ্গা হাড়ি—কিছু ফুল আর তেলসিন্দুর মাখানো পাথর পড়ে আছে।

দেবতাকে মানুষ মাত্রেই কিছুটা সমীহ করে। তাই সেই আদিবাসীদের আর নবাগত মানুষগুলোর অনেকেরই পূজা পায়। গ্রামের লোক প্রথম গরুর দুধ —গাছের ফল এনে দেয়। আদিবাসীদের অনেকেও আনে মুরগীর ডিম, দুধ।

মারাংমোড়ার থানে তাই পুজো কিছু হয় আজও।

সুধাকান্ত জিপ নিয়ে আসছে, হঠাৎ এই ছায়া নির্জন ঠাঁইটায় কালু, পটলা, নরেনদের দেখে থামলো। সুরভি যমুনাও আছে। এদের সুধাকান্ত দূর থেকে বসতিতে দেখেছিল দু'একজনকে। আর দেখেনি, কিন্তু দলবেঁধে এখানে ওদের দেখে থামলো সে।

সুধাকান্ত ভাবছিল এদের কথাই। তার মনের অতলে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। সে গভীর জলের মাছ। সে সবকিছু প্রকাশও করেনি, এমনকি তার চ্যালা হরিশ পালকেও বলেনি সে। কিছু ব্যাপারে সুধাকান্ত মুখ খোলে না। তবে হরিশের উদ্দেশ্য যে তার উদ্দেশ্যের সহায়ক এটা জেনেছে সে। তাই হরিশকে সাহায্য করে নানা ব্যাপারে!

কালুদের শুধোয় সুধাকান্ত—তোদের দেখলাম না? কি ব্যাপার?

কালু বলে—এহানে ভালো লাগিতেছে না সুধাদা!

সুরভি এগিয়ে আসে। সুধাকান্ত চেনে ওদের। সুধা বলে,

—কি রে সুরভি, যমুনা এখানে দেখছি ভালোই আছস? কাজ কাম করস?

সুরভি বলে—কি কাজ করুম? ওই মাঠে!

হাসে সুধাকান্ত—কেন? কেতকীরে দেখলাম বেশ তো আছে, বিয়ে থা হয়েছে। তুইও এবার বিয়ে একটা করে ফেল সুরভি! যমুনাকেও বলছি!

সুরভি কথাটা ভাবে। তার বাবা নাকি এর মধ্যে দু'একজায়গায় পাত্র দেখেছে। কৃপাসিন্ধুও আসছে তার কাছে! সেও খবর আনছে। বোধহয় বিয়ে থা দেবার চেষ্টাও চলছে। সুরভি কোন বনবাসে গিয়ে ওমনি দুঃখ কষ্টের জীবনে জড়াবে না নিজেকে। যমুনাও গুম হয়ে বলে,

—মরণের জন্য বইসা আছি এহানে! শুনছি বাঘও আছে। বাঘেও নেয়না!

হাসে সুধাকান্ত—কি যে বলিস?

কালু বলে—কিছু কাজকাম দ্যান বাইবে। আমরা সকলেই চইলা যামু!

পটলা বলে—সিনেমা নাই, শহর বাজারও সেই জেপুর! কাজ কাম পাই না। এখানে মাঠেও কি এত কাম করুম!

নরেন বলে—তাই কইছি যা হয় করেন সুধাদা!

সুধাকান্ত এই উদ্ধত বিদ্রোহভরা ছেলেগুলোকেই হাতে আনতে চায়। কিছু টাকা পয়সা বের করে ওদের দেয় সু·কান্ত। বলে সে,

—কিছু রাখ, শহরে গিয়ে খেয়ে দেয়ে ফুর্তি টুর্তি করবি। আর শহরের এই ঠিকানাতে এইদিন যাবি, আমিও থাকবো। দেখি কি করা যায়!

চলে গেল সুধাকান্ত। কালু বলে,

—সুধাদা একডা মানুষের মত মানুষ। দ্যাখ ঠিক কিছু বন্দোবস্ত হইব! কিরে সুরুভি যাবি তো?

সুরভি বলে—যামু! এহানে থাকুম না।

রামানুজ এর মধ্যে দু'একজায়গায় মেয়ের সম্বন্ধ দেখেছে। কিন্তু পয়সাকড়ি নেই হাতে, বিয়ের খরচা আছে। আর মালকানগিরির ওদিকে আগের বসতির একটি ছেলের সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু তাদের দাবীও অনেক। ছেলেটি জেপুর থেকে পাশ করে চাকরী করছে কোন অপিসে।

হতাশ হয়েই ফিরছিল রামানুজ। মালকান গিরির হাটে দেখা হয়ে যায় কৃপাসিন্ধুর সঙ্গে। কৃপাসিন্ধু বলে,

—মেয়ের বিয়ের জন্য তো দৌড়াচ্ছ, অবশ্যি যদি অমত না থাকে পাত্র দেখাতে পারি। তবে একটু বেশী বয়স। কিন্তু মেয়েরও তো বয়স হয়েছে। তবু সুখেই থাকবো মাইয়া।

রামানুজ দেখেছে সুরভির মন মেজাজ এখানে এসে যেন বদলে গেছে। ওই বখাটে ছেলেগুলার সঙ্গে মেশে, আর ভয়ও হয় স্ত্রীর। ভাবিনী বলে—মাইয়ার গতিক সুবিধার বুঝছি না। কাজ কামও করে না। তাই কই যেহানে পাও বিয়া দিই দাও।

তাই রামানুজ খুঁজছে।

আজ কৃপাসিন্ধুর কথায় বলে সে—একবার দেহি চলো!

কৃপাসিন্ধু বলে—তাহলে দেইখাই যাও ঘর বর।

এদিকের পুরোনো সেটলার্স ভিলেজ নাম্বার বাহান্ন বেশ জমে উঠেছে। এখানেব মাঠ একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকা। মন্মথ হালদার এখানে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। নিজের জমি ছাড়াও আরও অনেকের জমি ভাগে নিয়ে একসঙ্গে চাষ করে। সেই সুবাদে হরিশ পালের ট্রাকটার ভাড়া নেয়। জানাশোনা হয়েছে কৃপাসিন্ধুর সঙ্গেও।

মন্মথ হালদার-এর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে ক'মাস আগে, তিন চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিপদে পড়েছে সে। ভাতজল করার তেমন কেউ নেই, তাই বিয়ে করার খবরও দিয়েছিল সকলকে।

মন্মথ হালদার এর মধ্যে দুভাই-এর নামে দুটো বাড়ির ভিটে—সেইমত দুজনেব চৌদ্দ একর জমি নিয়ে বসত করেছিল। তার কয়েক বছর পরই সেই ভাইকে অতিষ্ঠ করে, নানাভাবে উত্যক্ত করে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করিয়েছিল আর সেই সব জমি বাড়ি নিজেই দখল করেছে।

দুপুরে কৃপাসিন্ধু আর রামানুজকে আসতে দেখে খুশী হয়।

রামানুজ দেখেছে মন্মথের বাড়ি ঘর। বিস্তীর্ণ উঠানে রয়েছে রাশিকৃত মেস্তা পাট, ওদিকে গোলায় ধান আর বেশ কিছু তিলও রয়েছে। বড় একটা কুয়ো, ওর থেকে পাম্প সেটে জল তুলে মাঠে সেচ করছে। তার নীচে ওর ধান জমি। রামানুজ দেখছে ওই জলের জোগান থাকার জন্য মাঠের ধানে এসেছে সবুজ আভাস, বাতাসে মাথা নাড়ছে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত।

মন্মথের বয়স হয়েছে।

মাথার চুল গুলোয় এসেছে সাদাটে ভাব।

গলায় কণ্ঠি, শীর্ণ পাকানো চেহারা। তিন চারটে ছেলেমেয়েকেও দেখেছে রামানুজ। বড় ছেলেটা ওদিকে পাল্লায় ধান ওজন করাচ্ছে। সেও দেখছে এদের।

চীৎকার করে মন্মথ আর গোবিন্দ—এনাদের বসার জাগা দে। আর পুটিরে কয়ে দে —সরবৎ দেবার জন্যে।

এদের বলে মন্মথ —চলেন। এতডা পথ আইচেন সরবৎ খান্। পরে স্নান আহার করবেন, তখনই কথা হইব। তয় বাড়িঘর দেইখা যান্! কৃপাসিন্ধুদা—ওনারে সব কইয়া দিবা কিন্তু। মাইয়া দিবেন সব জানা দবকার।

কৃপাসিন্ধু জানে মন্মথের অবস্থা। তাই কথাটা আগেই সে জেনে রেখেছে। মন্মথ তাকেও শ'তিনেক টাকা দেবে যদি বিয়েটা হয়ে যায়, আর কৃপাসিন্ধু বলে—মেয়ে একটু বড় সড়, মানে আপনার সংসার দেখতে হবে, সেবাযত্ন করতে হবে তো।

মন্মথ বলে—একদিন দেখে আসি। আর সব শুভকাজ-এর দিন ক্ষণও তখনই ধার্য করে আসবো।

রামানুজ ভেবেছে এর মধ্যে। তার আর কোন আপত্তি নেই, শুধু আপত্তি রয়েছে একটু মন্মথের বয়সটা নিয়ে। নিদেন পঞ্চাশ বছর বয়স হবে, অবশ্য এখনও শক্ত সমর্থ আছে। আর ওই সতীনের ছেলেমেয়েরাও রয়েছে।

মন্মথ বলে—অবশ্যি খরচার কথা ভাবতে হবে না। ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রামানুজ শোনায়—একদনি আসুন। দেখে শুনে যাবেন। আর বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গেও একটা আলোচনা করে নিই গিয়া।

কৃপাসিন্ধু বলে—তা করবা বৈকি! তাহেল মন্মথবাবু আহেন একদিন।

রামানুজের স্ত্রী ভাবিনী সব শুনেছে স্বামীর কাছে।

বলে সে—তা বাপু অবস্থা যদি ভালো হয় দ্যাখো তাহলে। আর মেয়েরেও কইছি কথাটা।

সুরভি কালুদের সঙ্গে জেপুর যাবার আয়োজন করছে! এর মধ্যে পটলা খবর এনেছে জেপুরে দারুণ একটা সিনেমা এসেছে। যেমন গান তেমনি নাচ আর ফাইটিং যা আছে দারুণ! আর এই সময় সুধাকান্তদাও থাকবে ওখানে, দেখা করতে হবে। সুধাকান্তর দেওয়া টাকাটাও হাতে রয়েছে এদের।

নরেন বলে—হোটেলে খেয়ে দেয়ে বেশ ঘোবা যাবে। ক'দিন শ্লা কষা মাংস আর মাল খাইনি! এখানে পচা মহুয়া গিলে যেন মেজাজ বিশ্রী হয়ে গেছে।

পটলাও স্বপ্ন দেখে।

সুরভি বলে—তাহলে চল গিয়া বুধবাবই যামু। যমুনারেও কইছি। আর চাল-এর দর দেখুম ওখানে—যদি চালেব বেওসা করা যায় দেখুম।

কালু বলে ওঠে—চালের বেওসা ক্যান্ রে—তর যা আছে হেই ব্যবসাই কর গিয়া। শহর বাজার জায়গা।

সুরভি ধমকে ওঠে—চোপ হারামজাদা। দিমু চক্ষু গাইলা তর। যমুনারে যা না ওই ব্যবসায় নামাবি গিয়া।

ইদানীং কালু নাকি যমুনাকে একটা ভালোবাসার কথাও বলে-টলে। কালুর খুব ইচ্ছে যদি সুধাদার চেষ্টায় কোথাও একটা কাজকর্ম হয়, সে যমুনাকে বিয়ে করবে।

যমুনাও কথাটা ভেবেছে। দেখেছে কেতকীকে। সেই মেয়েটাও তাদের দলে মিশতো। কিন্তু এখানে এসে কেতকী ঘর বর পেয়েছে। হোক অভাবের সংসার, তবু দেখেছে যমুনা কেতকী অনেক শান্তিতে আছে—সেটা তার মুখচোখ দেখেই বুঝেছে। আজ যমুনার মনে হয় ঠকে গেছে তারা।

সুরভি অবশ্য বলে—ওসব বিয়েতে দরকার নাইরে! আজীবন দাসীবৃত্তি করতে পারবো না! যেভাবে হোক নিজেরটা নিজেই রোজকাব করমু স্বাধীনভাবে।

হঠাৎ তাই সুরভি সেদিন বাড়ি ফিরে অবাক হয়।

কৃপাসিন্ধুর সঙ্গে এসেছে একটি বয়স্ক ভদ্রলোক। গলায় কণ্ঠি শীর্ণ চেহারা। ছাতাটা রেখে দাওয়ায় বসে হাঁপাচ্ছে, তার বাবা রামানুজও ব্যস্ত। কোথায় তাদের বসাবে—কি খেতে দেবে তাই নিয়ে শশব্যস্ত।

ভাবিনী মেয়েকে বলে—একডু হাত লাগা। সরবৎটা ওনাদের দিই আয়! আর শোন, সরবৎ দিই প্রণাম কবস্ ওনারে।

সুরভি অবাক হয়—কে লোকডা যে গড় করার লাগবো?

বলে ওঠে ভাবিনী— তর ব্যবস্থা করার জন্যে তর বাপ দৌড়চ্ছে আর তুই কস্ লোকডা কে? সাত নম্বর ভিলেজের মস্ত লোক, বিরাট পয়সা। তুই বাপু অমত করস্ না।

চমকে ওঠে সুরভি। তাকে না জানিয়ে ওর মা বাবা যে তাকে একটা বুড়ো লোকের হাতে তুলে দেবে তা ভাবতে পারে নি। এইসব ষড়যন্ত্র চলেছে এতদিন তার অজান্তে। সুরভি রেগে ওঠে। তবে চতুর মেয়ে

সে। তাই মুখ বুজে গুম হয়ে সরবতের গ্লাশগুলো এনে ওদের সামনে নামিয়ে দেয়।

মন্মথ দেখছে ওকে। দেখতে শুনতে সুরভি মন্দ নয়। স্বাস্থ্যও ভালো। আর একটু ছিমছাম থাকে। সারা দেহে উদ্ধত যৌবনের প্রকাশ, বুড়ো মন্মথ দুচোখ মেলে দেখছে মেয়েটাকে কি অতৃপ্ত বুভুক্ষা নিয়ে। সুরভি পুরুষদের চেনে, ওদের চোখের জ্বালাধরা চাহনিও তার চেনা। গুম হয়ে চলে এল সে। মন্মথ তখনও তার দিকে চেয়ে থাকে।

কৃপাসিন্ধু বলে —মাইয়ার খুব লজ্জা। মানে লজ্জাশীলা—

মন্মথের খেয়াল হয়। সে এদিকে চেয়ে সায় দেয়—হঃ! তা মাইয়া ভালোই আপনার।

রামানুজ মনে মনে খুশী হয়। বলে সে,

—তাহলে আহারাদি সাইরা নিয়া কথাবার্তা কইবো।

ভাবিনী মেয়ের ওই মূর্তি দেখে চাপা স্বরে গজগজ করে, বলে সে সুরভিকে —কত ভাগ্যে অমন বর জোটে। তুই চুপ মাইরা থাকবি। বিহা আমি ওখানেই দিমু।

ডাল নামিয়ে তরকারী চাপিয়েছে ভাবিনী। সুরভিকে বলে,

—পরমান্ন চড়াই দে।

আয়োজনটা ভালোই হয়েছে। ভাবিনী ওদের খাওয়ার জায়গা করেছে। সুরভি খাবার এনে দেয়। কৃপাসিন্ধুও আজ এখানে আমন্ত্রিত, মন্মথ খেতে বসেছে। বলে সে—ডাইল-ব্যঞ্জন-লাবড়া উৎকৃষ্ট হইছে!

ভাবিনী বলে—ওসব সুরভিই রাঁধছে। মাইয়াই সব রান্নাবান্না করে।

সুরভি ওদিকে গুম হয়ে আছে। ওর মায়ের মিথ্যা কথাগুলো শুনে মন্মথ খুশী হয়। বলে সে—খাসা রান্না হইছে, উৎকৃষ্ট। কি হে কৃপাসিন্ধু?

কৃপাসিন্ধুও সায় দেয়—তা যা কইছেন।

মন্মথই কথাটা জানায়—মেয়ে পছন্দ হয়েছে। খরচার জন্য ভাবতে হইব না। আপনি শুধুমাত্র শাঁখা সিন্দুর দিই কন্যা সম্প্রদান করবেন!

কৃপাসিন্ধু বলে—তা ভালো। কিন্তু কিছু তো খরচা আছে। বিয়ে বলে কথা। বরযাত্রী—এহানের কন্যাযাত্রীগোরও খাওয়াতি হবে। নিদেন ধরেন হাজার খানেক তো পড়বোই। এহন ধান ওঠেনি, ফসল নাই।

ব্যাপারটা বোঝে মন্মথ।

তার চোখের সামনে সুরভির যৌবনমাতাল দেহটার ছবি ভেসে ওঠে। তার হাতের রান্নাও খেয়েছে। সবদিক থেকেই কাজের মেয়ে। মন্মথ হিসেবী লোক। বলে সে রামানুজকে,

—ধরেন এই সাতশো টাকা আনছি, খরচা বাবদ এডা রাখেন! আর বিয়ের দিন ধার্য করছি এই শ্রাবণেই! নালি ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক তিন মাসে বিহার দিন নাই!

ভাবিনীও ওদিকে দাঁড়িয়েছিল। সেও চায় মেয়েকে আগেই বিদায় করতে, দেরী হলে বিপদ হতে পারে। তাছাড়া বিয়ের খরচের টাকাও হাতে আসছে, সুতরাং কোন অসুবিধা হবে না। ভাবিনী শোনায়—তাহলে শ্রাবণেই হোক!

বসতের দুচারজনও এসেছে। নিশিকান্ত-রামগতি-শরৎ দাস রয়েছে। এসে জুটেছে কুন্তি বুড়িও। কুন্তি বলে,

—শাঁখ বাজা লো। শুভকাজ-এর খপর জানা সবাইকে! সোনার আংটি তয় বাঁকা হইলে কি দাম কমে? এমন পাত্র:

নিশিকান্ত, শরৎ দাসও বলে—তাই দাও রামানুজ!

ওদের ঠিক মত নেই, তবু বিয়েটা হোক সুরভির, এ তারাও চায়।

খুশী হয়ে ফিরছে মন্মথ। পাটিপত্র হয়ে গেছে। আর কৃপাসিন্ধুও খুশী হয়। তাকে আজ মন্মথ একশো টাকা আগাম দিয়েছে, বাকী দুশো টাকা আর একখানা ধুতি-শাড়ি দেবে বিয়ের দিনই।

সুরভি কদিন গুম হয়ে রয়েছে। সে ভেবেছে কথাটা।

কালু পটলাদের ওখানে সেই বটতলাতেও যায়, সেদিন যমুনাও রয়েছে। ওরা যাবে শহরে, কালু সুরভিকে দেখে বলে,

—তোর তো বিহা, শুনলাম বর-এর নাকি নাতি-পুতিও আছে। এক্কেবারে ঠান্‌দি হইবি।

সুরভির সারা মনে জ্বালা ধরে। বলে সে,

—যাঃ—বিহা করুম ওই ঘাটের মড়ারে? ওব বাপের বিহা দেখাইমু।

যমুনা চাইল ওর দিকে। বলে সে—তর বাপ দেহি খুব জনিষিপত্র বাজার করছে।

বাস রাস্তা এখান থেকে দূরে। ওই পথ ধরে বাস থেকে নেমে এই বসতে আসে লোকেরা। দেখা যায় দূরে গাছের ফাঁকে রামানুজকে। রামানুজ আর কৃপাসিন্ধু দুজনে মালকানগিরির গঞ্জ থেকে জিনিষপত্র নিয়ে ফিরছে। বিয়ের দিন পরশু, সময় আর নেই।

সুরভি গুম হয়ে দেখছে।

যমুনা বলে—বিহার রাতে থাকুম না। শহরে যামু। কি সিনেমা আইছে রে পটলা?

পটলা বলে—সিনেমা দেখার চেয়ে বেশী দরকার তাদের সুধাকান্তবাবুর সাথে। রাতে ওর বাসাতেই থাকুম, কথাবাত্তা হইব। মনে হয় কাজ হই যাবে। যমুনারে—তোরেও যাতি কইছে। কোরাপুট না জগদলপুরে কি কাজের ঠিক করছে।

কথাটা ভাবছে সুরভিও। ওরা চলে যাবে কাজ পেয়ে বনের এই জীবন থেকে বাইরের কোন শহরে। আনন্দে থাকবে সেখানে আর এই অন্ধকার নরকের জীবনে কোন বনবাসে একটা বুড়োকে নিয়ে ঘর করার নামে তিলে তিলে মরতে হাবে তাকে।

সুরভি বাড়ি ফিরতে ভাবিনী ধমকে ওঠে—কোথা যাস? আজ বাদ কাল মাইয়ার বিহা আর তব হুঁস নাই? রাজ্যের কাজ বাকি। নে বাজার মশলা সব তুইলা বাখ!

কুন্তি-বুড়ি দেখছে সুরভিকে। সে চিড়ে কুটছিল।

বিয়ে বাড়িতে কাজ করার নামে কুন্তি ক'দিন এখানেই রয়েছে। কাজকর্ম করছে। খাওয়া-দাওয়া জুটছে তার, পান-জর্দাও মেলে।

কুন্তি বলে—কি কস বউ? কয়না—যার বিহা তার মনে নাই পাড়া পড়শীর ঘুম নাই! এ হইছে তাই। তয় বউ—আর তো দুইডা দিন। ঘুইরা ফিইরা লউক। তারপর তো নিজের ঘরেই যাবে গিয়া!

সুরভি চুপ করে কথাগুলো শোনে। বাড়িতে রামানুজও ব্যস্ত! লোকজন আসছে।

ওদিকে উঠানে সামিয়ানা টাঙ্গানো হচ্ছে ছাদনাতলায়। মদন নাপিত কলাগাছ—বাঁশ কঞ্চি পুঁতছে। তার এখন অনেক কাজ।

সকালবেলায় বাস।

এখান থেকে গোবিন্দ ঘাঁটিতে গিয়ে বাস বদল করে তারা বৈকাল নাগাদ জেপুর শহরে পৌছবে। বেশ খুশিমনে অনেক আশা নিয়ে বের হয়েছে কালু, পটল, নরেন, যমুনাও আছে। আজ সেজেছে সে। ওরা চলেছে বনের মধ্যকার পায়ে চলা পথ দিয়ে। এপথে সাধারণ লোকজন কম যাতায়াত করে, পাহাড় টপকে গেলে গোবিন্দ ঘাঁটিতে পৌছাবে তারা।

যমুনা বলে—সুরভিব বরটা নাকি বুড়ো হাবড়া! তাই কইছিল বিহা করবে না।

হঠাৎ দেখা যায় শালবনের সুঁড়ি পথ বেয়ে নেমে আসছে সুরভি। অবাক হয় তারা—সুরভি!

সুরভি এগিয়ে আসে, বলে সে—আমিও যামু শহরে তগোর লগে।

যমুনা বলে—তর বিহা আজ?

সুরভি বলে—বিহা করুম না। চল. এমনি করে মরার চেয়ে বাইরে গিয়াই মরুম। চল।

পটলা বলে—পালাই যাবি, যদি জানতে পারে?

সুরভি জানে কি হতে পারে। আজ সে মরীয়া হয়ে এসেছে। কোনদিনই আর ঘরে ফিরবে না। বলে সে—সুধাকান্তদারে কমু, না হয় রায়পুরই ফিরে যামু তবু এখানে ওই বুড়োরে বিহা কইরা মরতে পারুম না। যা হয় হউক, চল।

সুরভির সাহসে ওরাও অবাক হয়েছে।

ওদের ফেরার সময় আর নেই। আজ বৈকালে শহরে পৌঁছতে হবে। ওরা এগিয়ে চলে বন পাহাড়ের সোজা পথ ধরে দূরের বাসরাস্তার দিকে।

ক'টা প্রাণী শহরের পরিবেশে এসে যেন নোতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। জেপুর শহরে তখন বৈকালের আলো নামছে। শহরের পথেঘাটে দোকানে লোকজনের ভিড়। বাস ট্রাকগুলো যাতায়াত করে। দোকানের বড় বড় কাঁচের পাল্লা বসানো শোকেসে নানা জিনিষ সাজানো।

ওদিকে একটা সিনেমাহাউসে তখন টিকিট কাটার ভিড় চলেছে। সামনে বিরাট পোষ্টারে তাদের প্রিয় শিল্পীদের নানা পোজের ছবি রয়েছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওরা।

পটলা এর মধ্যে সন্ধ্যার শো-এর আগাম টিকিট ক'খানা কিনে এনে বলে—চল। পাঁচটায় শো। তার আগে সুধাদার বাসায় যাই গিয়া।

সুধাকান্ত জানতো ওরা আসবে। ইদানীং সুধাকান্ত আর চৈত সিং মিলে ব্যবসাটা শুরু করেছে। বিভিন্ন শহরের নোংরা পল্লীতে কিছু মেয়ের দরকার। তাদের দিয়ে বেশ রোজগারও হয়। চৈত সিং ইদানীং ধাবার ব্যবসা ছাড়া এই ব্যবসায় নেমেছে।

সেই-ই বলে—সুধাবাবু দো চারটে লেড়কি লাও, মাহিনামে হাজার রূপয়া এইসা আয়েগা! সব ঝামেলা হম্ সামাল করেগা। রূপয়া হম্ দেগা।

সুধাকান্তও ভেবেছে কথাটা। তার সামনে এখন অনেক কাজ। নোতুন বসতি করার ব্যাপারে যে সব প্রস্তুতি চলেছে সেগুলোকে বানচাল কবতে চায় গোপনে অনেকেই। কারণ সেই নেতারা যদি এইভাবে তাদের মাটিতে রিফিউজী বসাতে না পারেন তাহলে বনকেটে তৈরী করা সেই সব জমিতে তাদের নিজেদের দখলই কায়েম হবে। ফলে তাদের লোকদের আরও বেশী জমি দিতে পারবে আর তাদের দলেরই জয় জয়কার হবে। সামনে নির্বাচনে বেশী ভোট পাবে তাদেরই দল।

রাজনৈতিক দাবা খেলায় ঘুঁটিতে পরিণত করতে চায়, এই হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের। এর আগে তারা দেশ মাটি হারিয়েছে এমনি এক পাশাখেলার দানে, এদেশে এসেও তারা আবার নেতানামক ব্যক্তিদের স্বার্থে বিকিকিনির পশরায় পরিণত হয়েছে।

মানাক্যাম্পে আটদশ বছর ভিক্ষান্নে দিন কাটিয়ে তারা আবার পায়ের নীচে মাটি পেয়েছে কিন্তু ওরা জানেনা তাদের ভাগ্য নিয়ে অন্ধকারে কারা আবার ছিনিমিনি খেলার আয়োজন করেছে।

সুধাকান্ত তা জানে। আর এই খেলায় সুধাকান্তকে সেই অন্তরালের ভগবানরা বেশ রসদ জোগাবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে, তাকে ওই দূর বনের মধ্যে বসতির লোকগুলো চেনে, ওদের মনে আনতে হবে হতাশার ভাব। যাতে ওরা সুখে বসবাস করতে না পারে।

সুধাকান্ত জানে এখানে বসবাস করতে গেলে ওই কর্তাদের হাতে রাখতে হবে, আর টাকাও পাবে সে। তাই সুধাকান্ত কাজে নেমে পড়েছে।

জেপুরের বাড়িটা শহরের বাইরে, সুধাকান্ত এখানে ট্রাকে করে মাল আনা নেওয়ার ব্যবসা করে, তাই বাড়ির ওদিকে ট্রাক একটা দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দুচারটে গাছপালাও রয়েছে। সুধাকান্ত ওদের আসতে দেখে চাইল।

—এসো।

সুরভি, যমুনাও এসেছে। মনে মনে খুশী হয় সুধাকান্ত।

বলে সে—তাহলে রাতে খাবার ব্যবস্থা করি, মুরগী চলবে তো কালু!

কালু বলে—ক্যান চলবে না?

পটলা শোনায়—শুধু মুরগীই? আর দু-একটা বোতল—

হাসে সুধাকান্ত—হবে, হবে। এখন জলটল খাও, সিনেমা দেখে এসো, তারপর বসা যাবে।

কালু শুধোয়—আর কাজের কিছু করলেন?

সুধাকান্ত কি ভাবছে। বলে সে—সে হবে কথাও হবে। অমিও বসে নাই। তোমাদের জন্য ভাবছি!

বলে সুরভি—আমার কাজ একটা চাই সুধাদা! যমুনাও আইছে।

সুধাকান্তবাবু দেখছে ওদের। রায়পুরের সেই চেহারা আর নেই, এখন স্বাস্থ্য আরো ভালো হয়েছে। ওদের দামও অনেক বেশী দেবে চৈত সিং।

সুধাকান্ত এখন টাকার হিসেবে ওদের ওই যৌবনের দাম কষছে। বলে সে—ঠিক আছে সুরভি, তোমরা এসে ভালোই করেছো। কাজের খবর আছে। যদি রাজী থাকো কাল থেকেই জয়েন দিতে হবে।

সুরভির ফেরার পথ আর নেই। তবু চাকরীর খবর পেয়ে মনে মনে খুশী হয় সে। বলে সুরভি—কাজ হবে তো?

সুধাকান্ত শোনায়—আমি যখন বলছি তখন হবেই। ঠিক আছে, সিনেমা দেখে এসো। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় কথাবার্তা বলবো।

রাত্রি নেমেছে।

শহরের পথে তখন আলো জ্বলছে, পথেঘাটে লোকজন দেখা যায়। তাদের গ্রামের মত অন্ধকার ঘিরে আসে না। বন পাহাড় ঘেরা সেই আদিম পরিবেশ এ নয়।

হারানো সেই জীবনকে ফিরে পেয়েছে এখানে সুরভীর দল। পটলাও খুশী। যমুনা আর কালুও স্বপ্ন দেখে এবার তাদের কাজ হবে। দুজনে বিয়ে-থা করে শহরেই ঘর বাঁধবে।

গুনগুন করে সিনেমার গান গাইতে গাইতে ওরা ফিরছে। সুধাকান্তও আয়োজন করে রেখেছে।

জানে একটা পুরুষ—এই ছেলের দলই তার কাজে লাগবে। এদের বেশীরভাগ সময় কেটেছে ওই ভিক্ষান্নে ক্যাম্পের ডোলের উপর, পড়াশোনা করেনি। বাবা-মা-সংসারের কোন শক্ত ভিতের পরিচয় এরা পায়নি, পায়নি কারো স্নেহ-ভালোবাসা, তাই মনে মনে এরা অবহেলার বিষে বিবেককে হারিয়ে নোতুন হৃদয় হীন বন্ধনহীন লড়াই করে নিজের সুখের জন্যই বাঁচাকে বড় করে দেখেছে।

সুধাকান্ত দেখছে ওদের। পটলা অনেকদিন পর ভালো মদ পেয়ে গিলছে। কালুর চোখ লাল হয়ে এসেছে। নরেন বলে,

—বলেন সুধাদা কি কাজ করতে হবে? দরকার হলে চাক্কু চালাতেও পেছামু না।

সুধাকান্ত বলে—সব বলছি। খা তোরা।

সুরভি-যমুনাও স্বপ্ন দেখেছে। তাদের চাকরী হয়েছে শহরে। সুধাকান্ত বলে—তাহলে চলে যা সুরভি, যমুনাও যা। আজ রাতেই গাড়ি যাচ্ছে ওতে গিয়ে সকাল নাগাদ রায়পুরে পৌঁছে গিয়ে আমায় চাশ বাড়িতে থাকবি। কোন অসুবিধা হবে না। বৈকালের মধ্যে আমি পৌঁছে গিয়ে কাজের ব্যবস্থা করে দেব নিজে সেখানে নিয়ে গিয়ে।

আর টাকা কিছু সঙ্গে রাখ, কাল খরচা আছে তোদের।

সুরভি যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। যমুনা তবু বলে,

—একা যাবো আমরা? কালুর চাকরী হবে বললেন?

হাসে সুধাকান্ত। বলে সে—সে ব্যবস্থাও করেছি। ওরাও কাল আমার সঙ্গে যাবে। তোরা আগে চলে যা। মানে একসঙ্গে গেলে যদি কেউ কিছু ভাবে! আর চাকরী কত লোককে দেব বল? ভয় করছে তো যাসনে বাপু।

চাকরীটা হাতছাড়া করতে রাজী নয় সুরভি।

সে বলে—ভয় কি রে যমুনা। দুজনে যাচ্ছি—সুধাদা তো বৈকালেই ফিরছে। আর রায়পুর—মানে তো চেনা জায়গা!

রাতের অন্ধকারে ওদের ট্রাকে তুলে বিদায় করে দিয়ে সুধাকান্ত যখন এদিকের ঘরে ফিরলো তখন কালুর দল গড়াগড়ি খাচ্ছে, প্রায় বেহুঁস অবস্থা ওদের।

কালু বিড় বিড় করছে—যা কয়েছো সব করুম সুধাদা। শুধু রায়পুরে নাহয় অন্য কোথাও কাজটা কইরা দিও মাইরী। যমুনারে নিয়া ঘর বাঁধুম—বড় ভালো মাইয়া।

হাসছে সুধাকান্ত।

যমুনার স্বপ্নও ওর মন থেকে মুছে দিয়ে ওটাকে জানোয়ারে পরিণত করবে সে। রক্তের গন্ধে যেন উন্মাদ করে তুলবে সে একপাল নেকড়েকে।

রামানুজ দুপুর অবধি আশা করেছিল সুরভি বসতির কোথাও আছে, ফিরে আসবে। বিয়েবাড়ির আয়োজন সবই হয়ে গেছে। রামগতি আর ভূষণ ওদিকে মাটির উনোন করে ডাল ভাত তরকারী রান্না করছে।

রাতে লুচিই হবে।

শরৎ দাসও রয়েছে। মেনু হবে লুচি, ছোলার ডাল, কুমড়োর ছক্কা, দই আর রামগতি কালবাতে বোঁদের ভিয়েন করেছে। বোঁদে দেওয়া হবে যাচাই করে। মাছ নেই, দুটো খাসি কাটা হয়েছে। ওদিকে গাছের ডালে কাটা ছাগলের ঠ্যাং দুটো বেঁধে ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। বসতির ছেলেমেয়েরা ভিড় করেছে সেখানে।

নিশিকান্তও এসেছে। রামানুজ চারিদিকে ছুটোছুটি করছে। ক্রমশঃ খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। পাওয়া যাচ্ছে না সুরভিকে। হাওয়ায় কথা ভেসে যায়। ভাবিনীর চোখে জল নামে।

কুন্তি বলে—ওমা কি সর্বনাশের কথা মা? বিয়ের কন্যা কিনা হাওয়া হই গেল?

রামগতি বলে—কালু-যমুনারা আছে কিনা দ্যাখ?

তাদেরও কোন পাত্তা নেই। শরৎ দাসের ছেলে পটলও নাই। মাথা ঠুকছে রামানুজ - সর্বনাশ হই গেল আমার। এহন কি হইব?

এসে পড়েছে মন্মথ দলবল নিয়ে। বরযাত্রীরা এসেছে, কৃপাসিন্ধুও এসেছে ওদের সঙ্গে সেজে গুজে। কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই অবাক হয়। কথাটা তারাও শুনেছে, চীৎকার করছে মন্মথ। বুড়ো হলেও কোঁচানো ধুতি—মটকার পাঞ্জাবী পরে এসেছে। টাকের উপর চন্দন ফোঁটাও পরেছে—যেন শুকনো ডাঙ্গায় টগর ফুল ছিটানো রয়েছে। মাথায় ঘটা করে টোপর চাপিয়ে এসেছে। নাপিত কৃপাসিন্ধু হাঁক পাড়ে— বর আইছে, শঙ্খধ্বনি করো জোকার দাও—

কিন্তু সারাবাড়ি স্তব্ধ। গর্জে ওঠে মন্মথ।

টাকা দিয়েছে সে আগাম, এ ধরনের অভ্যর্থনার জন্য তৈরী ছিল না। চীৎকার করে, সে,

—কথা কানে যায় না? আমি আইছি—জোকার নাই, বাদ্যিবাজনা নাই?

রামানুজ এসে পড়ে। আর্তনাদ করছে সে,

—আমাদের জেলে দ্যান হালদার মশাই, মাইয়া নাই—

—নাই! কন্যা নাই? আর্তনাদ করে ওঠে মন্মথ। কৃপাসিন্ধু ধমকে ওঠে,

— কি ভাবছো রামানুজ? এখানে হাত পাইতে ট্যাকা নিছ না? ধাপ্পাবাজ, চোর কাঁহাকা?

মন্মথ এই অপমানে লাফাচ্ছে। টাকাও গেল—মেয়েটাও ছিল বেশ পছন্দ সই, সেটাও গেল। সমূহ লোকসান হয়ে গেল তার।

রামানুজ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর মত, মন্মথ যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিয়ে চলেছে। সারা বসতের লোকজন জুটে গেছে। কৃপাসিন্ধু শাসায়। দেইখালম্ তোমারে। একজায়গায় টাকা নিই মেয়েরে কোথায় পাচার করছো? মেয়েরে ভাড়া খাটাইতা রায়পুরে সেডা জানি। এখনও করছো এখানে—

আর্তনাদ করে ওঠে রামানুজ—না। দিব্যি কইরা কইছি কৃপা—মাইয়া আমারে কিছু না কইয়া চলে গেছে গিয়া। বুড়া বরে বিহা করবে না, তবু জোর কবছিলাম। তাই মাইয়ারেই হারাইলাম।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

মন্মথ শাসায়—ওই সব ট্যাকা বুকে পা দিই আদায় করুম, না দিতি পারো গরু বলদই লই যামু, এক মাস-এর মধ্যে ট্যাকা দিতি হবে কয়ে গেলাম। চল হে—

নিশিকান্ত বলে—এলেন জল টল খেয়ে একটু শান্ত হয়ে যান।

গর্জে ওঠে মন্মথ—জল, এ পাপপুরীতে মন্মথ হালদার জলস্পর্শ করবে না। টাকা দিই দিও ভালো যদি চাও, তাই বলে গেলাম।

ববযাত্রী দল আর নাপিত টোপর সমেত মন্মথ হালদাব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেব হয়ে গেল। সারা বসতি ওপাশের বারো নম্বর ভিলেজের কিছু লোকজনও এসে পড়েছে। এমন কাণ্ড এই চত্বরে নোতুন ঘটলো।

তখন সন্ধ্যা নামছে।

বনপাহাড় ছেয়ে নামছে অন্ধকার। ছোট্ট জনপদেও নেমেছে কি বিষাদের স্তব্ধতা। দূরে দূরে কোন বাড়িতে ভীরু প্রদীপ জ্বলে। এই অন্ধকারে ভাবিনীর ক্ষীণ কান্নার সুব ওঠে।

বামানুজ চুপ করে গেছে। সারা বাড়িতে কেউ নেই আব। ছড়িয়ে পড়ে আছে ছাদনাতলা, রান্নার জিনিষপত্র, এঁঠো বাসন—শালপাতা, শোকস্তব্ধ বাড়িটায় যেন হাহাকার নেমেছে।

রাতেব অন্ধকারে দূর বনের পথ দিয়ে তখন ট্রাকটা ছুটে চলেছে, সুরভি আর যমুনা চলেছে এই বনবাসের অন্ধকাব থেকে আলোব দিকে, শহবের চোখ ধাঁধানো আলোর দিকে তারা লুব্ধ পতঙ্গের মত ছুটে চলেছে কি নেশার ঘোরে।

সাবা আকাশে এই ক'দিনে ভুলেও একটুকরো কালো মেঘ জমেনি। রোদের তাতও বেড়ে চলেছে। শ্রাবণের দিন পার হয়ে এসেছে ভাদ্রের শুরু। পাহাড বনে ছায়া নেমেছে। সারা মাঠের ধান ক'দিন বৃষ্টি না পেয়ে এর মধ্যে তামাটে রং ধরতে শুরু করেছে। রোদের তাতও বেড়েছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে গিরিজা।

ক'মাসের বৃষ্টিতে মাঠের ধানে এসেছিল সবুজ রং, আশ্বিনেই পাকতো। তাই এর মধ্যে ধান গাছে থোড় এসে গেছে; কিন্তু বুকে সেই ধানের সম্ভাবনা নিয়ে থোড়গুলোকে আর প্রসব করার ক্ষমতা যেন এই ধানগাছগুলোর নেই। মাঠের খালে ডোবায় সামান্য জল এখনও যা পড়ে আছে বোদের তাপে শুকিয়ে আসছে। বাতাসে জলভরা ধানক্ষেতের সেই শিহরণ আর নেই, যেন হাহাকার মিশে আছে বাতাসে।

—কি করছো এহানে? নদীব ধারে তোমার খাবার নিই গেলাম।

চাইল গিরিজা। কেতকী সকালে ঘরের কাজ শেষ করে মাঠে আসে গিরিজার খাবার নিয়ে। দুপুরের রৌদ্রছায়া নামে পাহাড়ের গায়ে, বনে বনে। নদীর ধারে মাঠের কাজ সেরে বসে দুজনে।

আজ গিবিজার মনে কি অজানা ভয় বাসা বেঁধেছে।

বলে সে—ভালো লাগছে না বৌ।

কেতকী চাইল ওর দিকে। গিরিজাব চোখে কেতকীর নোতুন রূপটা ফটে উঠেছে, আজ কেতকী মা হতে চলেছে। মাতৃত্বের চিহ্ন তার মুখে চোখে, সারা দেহে, ও যেন থোড় বুকে নিয়ে আসন্ন প্রসবা ধানক্ষেতের মতই পূর্ণ, সম্ভাবনাময়। কিন্তু ক্ষেতে আর জল নেই—আকাশে নেই মেঘের কালো ছায়া—নেই বৃষ্টির কোন আশ্বাস।

তেমনি মনে হয় গিরিজার কেতকীর ওই সম্ভাবনাময় মাতৃত্বেরও কোন আশ্বাস নেই। নগ্ন অভাব আর দুঃসহ অনটনের মধ্যে সবকিছু আশা হারিয়ে যাবে।

কেতকী স্বামীকে দেখছে। শুধোয় সে —এত কি ভাবো?

ও-সব কথা বলতে পারে না গিরিজা, তাই এড়াবার জন্য বলে,

—না, ভাবতিছিনা। দেখছি ক্ষেতের হাল। সব শুখাই আসতিছে রে। কি হইব ভগবান জানেন?

কেতকী আশ্বাস ভরা সুরে বলে,

—তোমার ওই কথা। দেখবা বৃষ্টি হইব, দু'একদিনের মধ্যে হইব। চল, খাই লও। বেলা পড়ি আসতিছে।

নদীর ধারে একটা ছায়াঘন হরিতকী গাছের নীচে বসেছে তারা। কেতকী ভাত আর সব্জী দিয়ে ডাল রেখেছে ওর সামনে। গিরিজা ওই লাবড়া খুব পছন্দ করে, আজ সেই তরকারীও যেন তার মুখে বিস্বাদ ঠেকে।

সুরভি-যমুনা অনেক দিন পর রায়পুরে ফিরেছে।

এই পথ-ঘাট তাদের চেনা, জগদলপুর থেকে যে রাস্তাটা পাহাড়বন পার হয়ে এসেছে রায়পুরের দিকে সেই পথে একদিন তাদের জোর করে নিয়ে গিয়েছিল তার বাবা-, মা-ম্মা। আজ তারা আবার ফিরে আসছে সেই বনরাজ্য থেকে শহরের দিকে।

পথের পাশে দেখা যায় মানা বাটা ক্যাম্প-এর কিছুটা। এখনও সেই টিনের শেড—সেঁড়া তাঁবুর শ্রেণী আর ছেলেমেয়ে লোকদের দেখা যায়। ওরা দণ্ডকারণ্য বসতির আশায়, সেখানের স্বর্গপুরের কল্পনায় এইভাবে পড়ে আছে কতকাল ধরে।

সুরভি বলে—অগোর স্বপ্নও ছুটা যাইব দেখস। কি সুখেই না ছিলাম সেহানে?

যমুনাও বুঝেছে সেটা। তাই বলে সে,

—এর চেয়ে মরাই ছিল ভালো। উঃ শহরে যদি কাজ পাই নোতুন করি বাঁচুম।

ওরা সেই বাঁচার আশা নিয়েই শহরে এসে ঢুকলো।

ট্রাকটা চলেছে শহরের পথে। এর মধ্যেই ঝকঝকে হোটেল গড়ে তুলেছে চৈত সিং। হাইওয়ের ধারে ধাবা থেকেই কোন অন্ধকার পথে সে আজ গড়ে তুলেছে এই হোটেল।

যমুনা-সুরভিরা নেমেছে।

একজন লোক তাদের পিছনদিকের দরজা দিয়ে নিয়ে গেল। যেন সামনের ওই কাঁচের দরজা আঁটা সাজানো ঘরে ঢোকার অধিকার এদের নেই।

পিছনের গলি দিয়ে নিয়ে গিয়ে বড় বাড়ির একতলায় প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে তুললো। সুরভি-যমুনা একটু অবাক হয়েছে।

সুরভি বলে—এ কোথায় আনলা?

লোকটা শোনায়—এখানেই থাকবে। পিছু বাত হবে।

দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে রেখে গেল এদের। যমুনা বলে,

—কি ব্যাপার?

সুরভি তবু ভয় চাপা দেওয়ার জন্য বলে,

—দেখা যাক্ শেষ অবধি। সুধাকান্ত বাবুরে আইতে দে। এত ঘাবড়াস ক্যান্।

যমুনা ওর মত এত সাহসী নয়। সে একটু ভয়ই পেয়েছে।

নেশা ছুটেছে কালু-পটলা-নরেনদের। বেলা হয়ে গেছে। সুধাকান্তবাবু এবার ফেরার জন্য তৈরী হয়েছে। সুধাকান্ত বলে,

—তাহলে এবার কাজ কম্মো শুরু করে দে। কিছু টাকা রাখ। পরে দেখা হবে।

সুধাকান্তবাবু ওদের সঙ্গে কাজ শেষ করে বের হয়ে গেল জিপে করে। তার এখন অনেক কাজ। ওদিকে সেই মাতব্বরা তাগাদা দিচ্ছে, যাতে একটা বিশৃঙ্খলা শুরু করতে পারে এখানে সুধাকান্তের দলবল তারই জন্য।

কালুর নেশা ছুটেছে। এবার খেয়াল হয় তার!

খুঁজছে সে যমুনাকে! এ বাড়ির কোন ঘরেও নেই তারা। কালু বলে—কোথায় গেল তারা?

এরাও অবাক হয়। পটলা বলে—চাকরীর কথা কইছিল সুধাদারে, কাল রাতের ট্রাকে বোধহয় রায়পুর গেছে গিয়া চাকরীর সন্ধানে।

কালু কি ভাবছে।

বলে সে—রায়পুরই যামু!

সে যমুনার জন্যে যেন সবকিছুই করতে পারে আজ। কিন্তু বাধা হয় পটল।

—এহন যাবো? এদিকে সুধাদার কাজ কাম করতে লাগবো। কিছু পয়সা কড়ি জমিয়ে লই তারপর তর লগে আমিও শহরেই যামু!

কালু কি ভাবছে! মনে হয় পটলের কথাটা সত্যি।

নরেন বলে—আর ওগোর খোঁজে যাবি, ওরা যদি শহর দেইখা আবার ফিরি আসে বসতে?

সাতপাঁচ ভাবছে কালু। এও হতে পারে। দুচার দিনের জন্য শহরে গিয়ে ফুর্তি অর্তি করে ওরা ফিরেও আসতে পারে। তাই এখানেই কিছুদিন থেকে সুধাবাবুর কথামত কাজ শেষ করে ওরা শহরে যাবে। পটলা বলে—চল! ফিরতি বাস আর পামু না।

ওরা বের হ'ল, শহরে তখন কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে। লোকজন রয়েছে পথে। ঝকঝকে দোকান পাট—বাস-ট্রাকগুলো যাতায়াত করে। কর্মব্যস্ত জীবন ওদের দূর বনপাহাড়ের কলোনীর মত শুদ্ধ আলস্য নেই। সেখানে আছে নিঃস্বতা আর হতাশার ছায়া নির্জনতা, যেন তিলে তিলে ফুরিয়ে যাবে তারা সেখানে, তাই ওদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সেই জীবনের উপর। তার কাঠামোটাকে তছনছ করে দিতে চায় এই কালু-পটলের দল।

ওরা নোতুন এক জ্বালাভরা মন আর লোভ নিয়ে ফিরছে।

মালকানগিরিং বাজারে এসে নামল তখন বৈকাল হয়ে আসছে। হাটতলা নিঝুম প্রায়। আজ হাটবার নয়, তাই লোকজন বিশেষ আসেনি। দূরে বড় দিঘীর জলে বনঢাকা পাহাড়ের ছায়া নামছে।

ওপাশের উপত্যকায় জোন অফিস—সার্কিট হাউসের সাদা বাড়ি—গাছপালা দেখা যায়। হাসপাতালের ওদিকে কিছু লোকজন যাতায়াত করে।

বাজারের একপাশে কিছু বাঁধা দোকানদার দোকান খুলে রয়েছে, দর্জির দোকানও দুচারটে হয়েছে। সেলাইকলের শব্দ ওঠে।

সারা অঞ্চলে এসেছে অজন্মার আতঙ্ক। বিশেষ করে নোতুন বসত অঞ্চলে। পুরোনো গ্রামবাসীরা এই আবহাওয়া আর এখানের মাটির রকম চেনে। তারা মেস্তাপাট-মকাই-তিল এসবের চাষ করেছে বেশী। রুক্ষ মাটিতে সামান্য বৃষ্টির জলে ওই সব ফসল হয়, তারা কিছুটা সামলে নিয়েছে ক'বছর ওই ফসল পেয়ে।

কিন্তু বিপদে পড়েছে ওই নোতুন বসতের লোকজন। বাজারেও তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাদের বিক্রী বাটাও তাই কম। ওদিকে বড় রাস্তা থেকে একটা পায়ে চলা পথ গেছে, ছায়াঘন টাইটা, সেখানেই একটু বেশী জায়গা নিয়ে হরিশ পালের ধানকল, আটাচাকি, গাছের নীচে দূরদূরান্তের দুচারটে গরুর গাড়িও এসেছে ধান না হয় গম—কেউ এসেছে তিল নিয়ে।

হরিশ পাল কালুদের দেখে চাইল! জানতো ওরা আসবে। সুধাকান্তবাবুই বলে গেছে তাকে। হরিশ বলে,

—চলো, ওদিকের ঘরে বসবে! চা খাবে তো?

চায়ের ফরমাইশ করে হরিশ পাল ওদের নিয়ে গিয়ে ওদিকের ঘরে বসালো। হরিশ জানে ওদের আসার কারণটা। আর তাকে কেন্দ্র করেই এই কাজ কর্ম চালাতে হবে।

হরিশ বলে—সুধাকান্তদা যখন রয়েছে কোন অসুবিধা হবে না। তবে কাজ কম্মগুলান একটু হুঁসিয়ারি করার লাগবো। জানাজানি হলেই মুস্কিল হতে পারে।

কালু বলে—ওনিয়ে ভাববা না। তুমি শুধু একটু দেখে যাও। তয় যেন বখরার হিসাবটা ঠিক রাখবা পাল-মশাই।

হরিশ পাল পরের উপার্জন আর পরের সম্পত্তির উপর বখরা বসিয়েই আজ নিজে গুছিয়ে নিয়েছে। এরমধ্যে সে কলকাতার কাছেই বেশ কিছুটা জায়গা জমি কিনেছে—বাবাকেও সেখানেই পাঠিয়েছে। এবার সেখানে বাড়ি তুলবে, দোকান দেবে বেলঘরিয়ার বাজারে।

হরিশ পাল এখানে পড়ে থাকে শুধুমাত্র শোষণ আর বখরাদারির টাকা তোলার জন্য। হরিশ বলে,

—তার জন্য ভেবো না কালু। লোককে আমি ঠকাই না। জিগাও গিয়া বাজারে!

এরপর হরিশ গলা নামিয়ে বলে—তয় মালপত্র এহানে আনবা না। বনের ওদিকে আমার চাষ বাড়িতেই আনবা রাতের আঁধারে। কেউ জানতি পারবে না।

কৃপাসিন্ধুও এবার উঠে পড়ে লেগেছে।

বৃষ্টি নেই, মাঠের ধান সবুজ থেকে লালচে রং ধরেছে। নিশিকান্ত শরৎ দাস রামানুজরা সকলেই এবার ভাবনায় পড়েছে। বিষ্টু ভটচায-এর বাড়ির উঠোনে বৈকালের পর জমে তারা। নিশিকান্ত বলে—এবার কি হইব ভটচায মশায়?

রামানুজ-এর মুখে-চোখে ভাবনার ছায়া নামে। সুরভি সেই চলে গেছে বিয়ের দিন আর ফেরেনি। সোমত্থ মেয়ে কোথায় গেছে কে জানে।

রামানুজ বলে—অনেক সাধ করি বসত করছি, চাষ করলাম। ফসলও গেল গিয়া। ঘরের মাইয়াডাও ফেরার হই গেল। এ মাটিতে আসি কি উন্নতিটা হইছে আমাগোর কও? তয় বাংলা দ্যাশ ছাড়ি বনবাসে আইলাম ক্যান?

কৃপাসিন্ধুও এখানে এসে ইদানীং এদের সুখদুঃখের সাথী হয়ে রয়েছে। কৃপাসিন্ধু শহরে ফেরার কথা আজও ভোলেনি। তার ভাগে করা আদিবাসীদের জমিগুলো অনেক সরেশ। সেখানে জলের অভাব নেই। ঝর্ণার জল পায়। তার ধানও বেশ ভালো হয়েছে। থোড়গুলো বের হয়েছে, ধান এসেছে।

তবু কৃপাসিন্ধু বলে—হেই কথাডা জিগাই। এখানে কি মরতি আইলাম? না বাংলা মুলুকে মরণের ঠাঁই ছিল না? শহর বাজারে থাকলি কাজ পেতাম—বাংলার মাটিতে অন্য কোথাও ক্যান জমি দিলনা আমাগোর?

বিষ্টু ভটচায এদের মনোভাব কিছুটা বোঝে। সে দেখেছে আগেকার বসতের লোকদের। বিষ্টু ভটচায বলে,

—এক বছরেই এত অধৈর্য হও ক্যান? একটা ফসল যাক্—ভুল করছ। এবার তিল মেস্তাপাট সব্জী লাগাও। পরের বার দেখা যাবে নি।

শরৎ দাস-এর ভাবনার শেষ নেই।

তার ছেলেটাও মানুষ হ'ল না। পটলা কোথায় থাকে, কি করে জানে না সে। চোখেমুখে কি ঔদ্ধত্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। ছেলেও মানুষ হ'ল না এখানে। জমি জায়গা কিছু পেয়েছিল, রক্ত জল করা পরিশ্রমে এ মাটিকে সবুজ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু তাও হয়নি। ঠকে গেছে এরা সবাই।

কৃপাসিন্ধুর কথাটা আজ ক্রমশঃ তাদের মনে ধরছে। মনে হয় এখানে এসে ভুলই করেছে।

তবু বিষ্টু ভটচায-কেদাররা বলে,

—এত অল্পে দিশা হারাইওনা শরৎদা, আগেকার সেটেলার্স ভিলেজে গিয়া জিগাও ওগোর, ওগোরও বহু কষ্টে দিন কাটছে।

বিষ্টু ভটচায বলে—মাটি কহনও বেইমানি করে না নিশিকান্ত, এ জমিই তোমাগোর সুখশান্তি আনবো।

কুন্তি বুড়ি সর্বঘটে কাঁঠালী কলার মত বিরাজ করে। সেও এই আসরে হাজির থাকে। অন্যদিন এখানে রামায়ণ না হয় ভাগবত কথা হয়। সকলে হরিনাম করে। ক্রমশঃ ক'দিন ধরে এখানে ওসব পাটও চুকে গেছে। এদেব মনের ভাবনাগুলো গভীর এক হতাশা আর বিক্ষোভের রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

কুন্তি বলে—ওসব ভাবনা করি আর কি করবা? আইছু—এহানেই মরবা।

গতিলাল আজও ভোলেনি তার মেয়ের নিষ্ঠুর মৃত্যুটার কথা। এখানে যেন তার মন হু হু করে।

এত হতাশার মাঝে গিরিজা-ভুজঙ্গ তবু হাল ছাড়েনি। ওরা নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে দুই ভাই-এ সিনিতে জল তুলছে। টিনের একটা পাত্র, দুদিকে আংটা লাগিয়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে তাই দিয়ে জল তুলছে। কিছুটা ক্ষেতের ধান তাদের এখনও রয়েছে। জল পেয়ে তারা থোড় মেলেছে, ধান এসেছে ক্ষেতে। মঞ্জরী ভারাবনত ধানগুলোয় বাতাসের সুর ওঠে। আর ওদিকের দুটো ক্ষেতে বেগুন ঢেঁড়স—ঝিঙে লাগিয়েছে, ভুজঙ্গই কোত্থেকে পেঁপের অনেক গাছ এনেছিল, সেগুলো ক'মাসেই বেশ বড় গাছ-এ পরিণত হয়েছে। পেঁপেও ধরেছে। গাছগুলোর গলা অবধি বড় বড় নধর পেঁপে ঝুলছে। কিছু পয়সাও পাচ্ছে তারা ফসল থেকে।

কেতকী ক'দিন মাঠে অসতে পারে নি।

সারা দেহে এসেছে মাতৃত্বের পূর্ণতা। গিরিজা দেখেছে তার স্ত্রীকে। মাঠের বুকে এসেছে শূন্যতা। সামনে তাদের অন্তহীন দুঃখের দিন। তার মধ্যে আসছে গিরিজার বংশধর।

এই মাটিতে আসছে নোতুন অতিথি।

ক'দিন ধরে কেতকী মাঠে আসতে পারে নি। চলা ফেরা করতেও কষ্ট হয়।

ভুজঙ্গ বলে—আর মাঠে খাবার নিই যাত্তি হবে না তোমারে বৌদি।

কেতকী বলে—তবে সময় মত আসি খাই লবা কিন্তু।

দুপুরের রোদ সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরায়। চিড় চিড় করছে মাঠের বুকে ফড়িং-এর দল। ওরাও ঝাঁক বেঁধে এবার ধানক্ষেতে নেমেছে। ধানের বুকের কচি পাতাগুলো কেটে ফেলছে।

গিরিজা বলে—সব শেষ হই যাবে ভুজঙ্গ। ধান যা হইছে আমাগোর, রং ধরিছে। কালই কাটি ফেলামু।

হঠাৎ দূর থেকে নিশিকান্তকে ডাকতে দেখে চাইল।

চমকে ওঠে গিরিজা—কে জানে ঘরে কোন বিপদ হয়েছে বোধ হয়। ভুজঙ্গ বলে—কি ব্যাপার? বাবা ডাকতিছে।

ওরা দুজনেই এগিয়ে আসে।

কেতকীর শরীরটা সকাল থেকেই ভালো যাচ্ছিল না।

গিরিজা-ভুজঙ্গ মাঠে এসেছে। নিশিকান্ত বাইরের গোয়ালে বলদ আর নোতুন আনা গাইগরুদের খেতে দিচ্ছে, এমন সময় কেতকীর কাতর আর্তনাদ শুনে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

ঠিক কি করবে বুঝতে পারে না সে। কি ভেবে এগিয়ে গেল শরৎ-এর বাড়ির দিকে। এসময়ে মেয়েদেরই দরকার। তার বাড়িতে বয়স্কা মেয়েও কেউ নেই।

শরৎ-এর স্ত্রী ললিতা মেয়ের খোঁজ খবর নেয়, সেও খবরটা পেয়ে ছুটে আসে। এসে পড়ে কুন্তিও। তখনও কেতকীর আর্তনাদ কানে আসে নিশিকান্তের। কি করবে ভাবতে পারে না সে। তাই দৌড়ে এসেছে মাঠে তার ছেলেদের কাছে।

কেতকীও স্বপ্ন দেখেছে এতদিন, তার স্বামী ঘর সব হয়েছে। এত শূন্যতার মাঝে কেতকীর মনের কোণে তবু আশার আলো জাগে। মা হতে চলেছে সে।

দুঃসহ কি যন্ত্রণা। মনে হয় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার দেহের অণু-পরমাণু দিয়ে সে যাকে তিলে তিলে বড় করেছে সেই নবজাতক আজ যেন তাকে শেষ করে নিজে বাঁচতে চায়।

চেতনা হারিয়ে আসছে তার।

হঠাৎ সব বেদনা যেন শান্ত হয়ে গেছে। দূরে কোথায় বনরাজ্যে প্রশান্তি নামে, কানে আসে একটি নোতুন কণ্ঠস্বর। জন্ম নিয়েছে এক আগামী ভবিষ্যৎ তার দেহকোষ থেকে।

কি গভীর প্রশান্তির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সে ধীরে ধীরে। কাদের কথার শব্দ, শিশুর আর্তনাদ সব মিলিয়ে যায়।

উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে গিরিজা, ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। বুড়ো নিশিকান্ত ধুকছে। কুন্তি বুড়ি বাইরে এসে কলকণ্ঠে ঘোষণা করে।

—খোকা হইছে গো সরকার কাকা। আপনার নাতি হইছে। অ কালী, শাঁখ বাজা লো। জোকার দে।

পড়ন্ত রোদে জ্বলে ওঠা ক্ষেতের শূন্যতা জাগে, মানুষগুলোর মনেও এসেছে নিবিড় হতাশা। মাঠেও আর যায় নি কেউ। সেখানে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নেই।

সেই সীমাহীন শূন্যতা—নিঃস্বতা আর হতাশার মাঝে জন্ম নিয়েছে গিরিজার সন্তান, এই জনবসতের ভবিষ্যৎ এক নাগারিক।

তবু ওরা শাঁখ বাজিয়ে আনন্দহীন উলুধ্বনির মধ্যে তাকে অভ্যর্থনা জানালো ছিন্নমূল মানুষগুলো।

গতিলাল দাওয়ায় বসে হুঁকা টানছিল, সে বের হয়। ওদিকে ভাঙ্গা আম গাছটা এখনও নিষ্ঠুর কোন দৈত্যের মত ভগ্নশাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরই নীচে চাপা পড়েছিল গতিলালের মেয়েটা। এ মাটি রঞ্জিত হয়েছিল তার জমাট রক্তের দাগে, সে দাগ মুছে গেলেও গতিলাল তার বৌ তাদের মন থেকে মোছে নি।

সেই মৃত্যুর জগতে আজ এসেছে নোতুন একটি মানুষ।

গতিলাল তরঙ্গকে বলে—কাঁদিস নি বৌ! কাঁন্দস ক্যান। জনম মরণ সবই ত্যানার হাত রে! একজনেরটা নেয় আবার অন্যদিকে ফিরায়েও দ্যায়। গিরিজার ব্যাটা হইচে।

জীবনডা নদীর মতই। এক কূল ভাঙ্গে—অন্য কূলে তহন চর জাগে!

যে আইচে তারে যেন ভগবান আশীর্বাদ করেন!

ওরা আজ এই নবজাতককে সব নিঃস্বতা, বেদনার মাঝেও কি আশা নিয়ে বরণ করেছে।

রাতের অন্ধকার সবে ফর্সা হয়ে আসছে। পাহাড়ের ওপাশ থেকে সূর্য ওঠার আগে থেকেই আকাশে তাব প্রস্তুতি চলে। পাখীদের কলরব ওঠে।

গিরিজা আর ভুজঙ্গ চলেছে কাস্তে নিয়ে।

ধানগুলো পেকে গেছে। টিয়া পাখীব ঝাঁক নেমেছে ক্ষেতে! গিবিজার মনে কি নোতুন আশ্বাস জাগে। আজ তার ঘরে এসেছে সন্তান। কচি বাচ্চাটা ক'দিনেই অনেক অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছে। কেতকীও সুস্থ হয়েছে কিছুটা।

গিরিজার কিছুটা ভরসা হয়!

ধান তার কিছু হবে। অন্ততঃ তিন মাসেব খোবাক হলে তবু এর পরেই মকাই বুনছে তারা। মকাই তিল কিছু হলেও ঠেকা দিতে পারবে ক'মাস!

ধান মাঠের সামনে এসে ভুজঙ্গ আর্তনাদ করে ওঠে।

—দাদা!

চাইল গিরিজা। মাঠ-এর সোনালী ধানের মঞ্জরী আর নেই। সারা মাঠে কারা নেমে নির্দয়ভাবে সেই ধান-এর শিষগুলোকে কেটে নিয়ে গেছে। আধকাটা মঞ্জরী হীন ধান গাছগুলো রিক্ত শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফসলের পূর্ণতা আর নেই।

ওদিকে পেঁপেগাছে নধর পুরুষ্টু পেঁপেগুলোও নেই। নির্দয়ভাবে কারা ডগাও ভেঙ্গেছে অনেক গাছের। পেঁপেগুলো পেড়ে নিয়ে গেছে, দু-চারটে ছিটিয়ে পড়ে আছে। বেগুন ক্ষেতেও বেশ কিছু বেগুন এসেছিল, বেগুনী রং ফুল সমেত ডালপাতাও ছেঁড়া।

সাবা ক্ষেত তছনছ করেছে।

গিরিজা চমকে ওঠে। তার এতদিনের সব পরিশ্রম-স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। কোথাও আশা নেই। আশ্বাস নেই। মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে কারা।

ভুজঙ্গ গর্জে ওঠে—কোন্ শালা করেছে এ সর্বনাশ!

সর্বনাশই করেছে কেউ! সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে।

খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে! কলোনীর অনেকেই এসে পড়ে। শুধু গিরিজারই নয়—ওদিকের মাঠে রামগতির, শরৎ দাসের কলাবাগানের অনেক কলার কাঁদিও লুট হয়ে গেছে।

হাহাকার পড়ে যায় কলোনীতে।

এমনি করে সবকিছুকে লুট করে নিয়ে কারা চলে গেছে, তাদের চরম সর্বনাশ করে গেছে।

নিশিকান্ত হাহাকার করে ওঠে—এমনি পোড়া বরাত আমাগোর; মুখের গেরাসও হারাই গেল গিয়া।

কৃপাসিন্ধুও এসে পড়েছে। সে গর্জে ওঠে।

—এমনি কইরা আমাগোর সব্বোনাশ কববে, আমাগোর তাড়াইতে চায়, ওরা এহান থনে।

শরৎ দাসও ঘাবড়ে গেছে। বলে সে,

—আইজ জমির ফসল গেছে, কাল যদি আর কুন সব্বোনাশ করে কি হইব?

ভয়টা নিশিকান্তেরও। বলে সে,

—যা কইছ? বনবাসে পইড়া আছি, চলো জোন অপিসে গিয়া খবর দিবার লাগবো।

রামগতি বলে ওঠে—ওগোর কইতে হবে ফসল হয় না, চলবে কি কইরা? এডা বাঁচা মবার কথা! এর মীমাংসা করতি হবে।

কথাটা তাদের সকলেরই কাছে বড় হয়ে ওঠে। ভাবছে তারা সমাধানের পথ কি? এখানে টিকে থাকাটাই আজ যেন একটা প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

গিরিজা ঘরে ফিরে গুম হয়ে বসেছে, নিশিকান্ত নেই বাড়িতে। ভুজঙ্গ এখনও সন্ধান করতে ছাড়ে নি। এখানে ওখানে সে হন্যে হয়ে কুকুরের মত ঘুবছে যদি সেই চোরদের সন্ধান পায়।

কেতকীও সব শুনেছে, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ধানক্ষেতটার ছবি। তখন সবে রং ধরেছে মঞ্জরীতে। আজ সব কারা কেটে নিয়ে গেছে।

কেতকী দেখছে গিরিজাকে।

একদিনেব ঝড়েই যেন উপড়ে পড়া একটা গাছ। ডালপাতা ছিটকে পড়েছে; তেমনি মুখ চোখে কি হতাশ বেদনার ছায়া মাখানো।

বলে কেতকী—কি এত ভাবছো? যা গেছে তার জন্য দুঃখ কইরা লাভ কি?

গিরিজা দেখছে কেতকীকে—তার ছেলেকে।

ছেলে এর মধ্যে হাত পা নাড়ে—হাসে! ওব নরম দেহের স্পর্শটুকু গিরিজার সারা মনে বিচিত্র একটা সাড়া আনে। তার দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা মনে পড়ে। তাই যেন প্রাণ দিয়ে সে ওই জমিতে চাষ করেছিল, অন্ন সংস্থান করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই সব কেড়ে নিয়েছে কোন নিষ্ঠুর বিধাতা।

গিরিজার মনের সব জোবটুকুও যেন চুবি করে নিয়ে গেছে সেই চোরের দল। গিরিজা বলে আর্তকণ্ঠে!

—তোমাদের মুখের গ্রাস আমি জান দিই তৈরী করছিলাম বৌ, তাও চইলা গেল।

কেতকী স্বামীকে দেখছে। মেয়েরা পুরুষের তুলনায় একজায়গায় অনেক কঠিন অনেক বেশী সাহসী। কেতকী জীবনে অনেক দুঃখ সয়েছে, অনেক অনাহারের দিন কাটিয়েছে। তাই সামান্য দুঃখে সে ভেঙ্গে পড়ে নি। বলে কেতকী,

—এত ভাবনার কি আছে? দিন ঠিকই চলে যাবে গিয়া আমাগোর।

গিরিজা এটা মানতে রাজী নয়।

বলে সে—এ মাটিতে বাঁচুম ক্যামন কইরা তাই ভাবছি রে!

পরদিন সকালে আবার তিন নম্বর ভিলেজে রাতের অন্ধকারে কারা এসে দুজোড়া বলদ—কাদের গোয়াল থেকে নিয়ে গেছে।

সকালে উঠে দেখে গোয়ালের দরজা হাট করে খোলা, বলদ দুটো নেই। বাঁধার দড়ি সমেত উধাও।

যার গরু সে প্রথমে ভেবেছিল হয়তো গোঁজ উপড়ে কোথায় চরতে বের হয়ে গেছে গরুগুলো, কিন্তু

ওপাশের গোবিন্দের বাড়ির লোকেদের চীৎকার ওঠে। তাদের দুধেল একটা জার্সি গাইগরুও উধাও হয়ে গেছে। আশপাশের লোকজন এসে পড়ে। গ্রামের এদিক ওদিক, বনের মধ্যেও খোঁজাখুঁজি চলে। কিন্তু গরুর আর কোন পাত্তা মেলেনা।

ওরা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি যে এখানেও এইসব চুরি ডাকাতি হতে পারে। এতদিন এসব কোনো ঘটনাই ঘটেনি। অভাব ছিল কিন্তু এমন আতঙ্কজনক কোন ব্যাপারই ঘটেনি। কয়েকদিন আগেই পাশের গ্রামে পাকাধান—ক্ষেতের ফসল চুরি হয়ে গেছে, তারপরই আবার এইভাবে গরু বলদ চুরি গেল।

সকলেই ভয় পেয়ে গেছে। মনে হয় আরও কি যেন সর্বনাশ ঘটতে পারে এখানে। অজানা ভয়ে মানুষগুলো ভীত হয়ে পড়েছে।

তাই বৈকালে অনেকেই এসে জুটেছে বিষ্টু ভটচাযের বাড়ির সামনের মাঠে। তিন নম্বর ভিলেজের গোবিন্দ-শশীপদ আরও অনেকে এসেছে, এসেছে আশপাশের গ্রামের লোক। চারিদিকে বনের চিহ্ন ছড়ানো। মাঝে মাঝে জমি সাফ করে বসত গড়া হয়েছে। তাই বনপাহাড় ঘেরা এলাকার লোকজন একদিকে খরা-অজন্মার মুখোমুখি হয়ে বিপদে পড়েছে আবার শুরু হয়েছে এই চুরি ডাকাতি।

নিশিকান্ত বলে—এমন করলি বাঁচা যায় কেমনে?

গোবিন্দ তখনও হালের বলদের শোক ভুলতে পারে নি। সে বলে,

—গরু বাছুর সব গেছে গিয়া, ক্যামনে থাকুম এহানে? ক্ষেতে ফসল নাই, প্যাটে দানা পানি নাই এদিকে চুরি ডাকাতি চলছে।

কৃপাসিন্ধু বলে ওঠে—কুনদিন পরাণটাই শ্যাষ কইরা না যায়!

বিষ্টু ভটচায বলে—ওসব কথা থাক। এহানে প্রথম প্রথম কষ্ট-বিপদ কিছু হইবই। তাদের ভয়ে চুপ কইরা থাকুম না। একত্রে বাঁচুম সকলে। জোন অপিসে খবর দিতি হবে। ওগোর জানাতি হবে খরার কথাও।

ভিড় জমে গেছে। কুন্তি বলে—তাই যামু।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালু, পটলের দলও। নরেন শুনছে ওদের কথাগুলো।

ওই মানুষগুলোর বুকের অতলের ঝড়টাকে তারা ঠিক বুঝতে পারে না। অনেক দুঃখ সয়ে—বহুদূর এই বনবাসে এসে বসত গড়তে চায় তারা, সব হারিয়ে আবার নোতুন করে বাঁচতে চায়। এর জন্য বহুমূল্য দিয়ে চলেছে। ঘরের মেয়েদের ইজ্জৎও হারিয়ে অনেকে পলাতক, ছেলেদের মানুষ করতে পারে নি। এ দুঃখ সব বাবা মায়ের বুকে জমাট পাথরের মত চেপে বসে আছে।

তবু এ মাটিতে এসে ঘর বেঁধেছে তারা। কিন্তু অদৃশ্য এই কালোহাতের নিষ্ঠুর খেলায় তারা আজ ভীত, ত্রস্ত। মনে হয়েছে এত চেষ্টার পরও এ মাটি থেকেও কোন নির্মম নিয়তি তাদের হঠিয়ে দেবে। বাঁচতে দেবে না।

বিষ্টু ভটচায তবু আশা হারায়নি। শীর্ণ তেজস্বী মানুষটা বলে—আমরাই দরকার হলে রাতে গ্রাম পাহারার ব্যবস্থা করবো পালা করে। তবু এসব বন্ধ করতেই হইবো।

অনেকেই সেই কথাটা নিয়ে ভাবছে।

হরিশ পাল ভাবেনি যে ছেলেগুলো এত শীঘ্রই এ কাজে নামতে পারবে। সেই দেখা হবার ক'দিন পরই রাতেরবেলায় চাষ বাড়িতে রয়েছে হরিশ, এদিকে এখন ঘন বন রয়ে গেছে। পেছনে বনের পরই পাহাড়ের শুরু, শেষ জনপদের একপ্রান্ত। ওদিকে বসত নেই। ফলে হরিশ পাল আপন খুশীতে বন কেটে তার চাষের জমির এলাকা বাড়িয়ে চলেছে। নিজে খরচা করে একটা পাহাড়ী ঝর্ণাকে বাঁধ দিয়ে বেশ বড়সড় গভীর জলাশয়ের সৃষ্টিও করেছে। বারোমাস জল থাকে, ইদানীং মাছের চাষও করছে। রুই-কাতলা-পাবদা ভালোসাইজের গলদা চিংড়িও হয়। জেপুর শহরে মাছ চালান দিয়ে বছরে কয়েক হাজার টাকা ঘরে তোলে।

রাতেরবেলায় সেদিন কিসের শব্দ শুনে চাইল হরিশ। টর্চের আলোটা বার দুয়েক জ্বলে আবার নিভে গেল। এই সংকেতের অর্থ জানে সে।

এগিয়ে আসে হরিশ—তোমরা?

কয়েক বস্তা ধান এনেছে, তখনও ঠিক পাকে নি। বনের পথ দিয়ে এসেছে ওরা ছোট পাহাড় টপকে, সঙ্গে হরিশের দুচারজন বিশ্বস্ত লোক।

বস্তা দশ বারো ধান। পরিমাণে এমন বেশী কিছু নয়, আর কিছু পেঁপে। কিন্তু হরিশ জানে এই চুরির পর কি প্রতিক্রিয়া হবে। ওই এলাকার মানুষের মনে অনিশ্চয়তার ভাবটাই জাগাতে হবে সুধাকান্তবাবু এই কথাই বলে গেছে।

সেদিক থেকে এরা বেশ কিছুটা এগিয়েছে।

হরিশ শুধোয়—কেউ দেখতে পায়নি তো?

কালু বলে—না। সিধে ধান কেটে ক্ষেত লুট করে বনের পথে আসছি। কাল দেখবা কি কাণ্ডটা বাধে গিয়া।

হরিশ পালও জানে সেটা। বলে —তাহলে কিছু ট্যাকা লই যা। হঁসিয়ার থাকবি, আর হাওয়া বুঝে পরে পালাতে আবার—

ইঙ্গিতটা বোঝে পটলা। বলে সে,

—সে আর কইতে হবে না।

এর কয়েকদিন পরই রাতের অন্ধকারে এসেছে ওরা কয়েকটা বলদ আর গরু নিয়ে। হরিশ পাল এবার দেখে খুশী হয়। কিছু টাকা তার আসবে। তাই ভাগ দিয়েও কিছু থাকবে, তার হাতে। ট্রাকে করে গরুগুলো রাতেই পাচার করে দিয়ে হরিশ বলে,

—কাল ভোরেই বসতে গিয়ে হাজির হবে, তোমাদের না দেখলে কেউ কিছু ভাবতি পারে।

কালুরা ভোরের আগেই বসতিতে ফিরে ক্লাব ঘরে শুয়ে পড়েছে। বিষ্টু ভটচাযের বাড়ির ওদিকে গ্রাম থেকেই ক্লাব ঘরটা তৈরী করা হয়েছিল। ওখানেই গাছের নীচে হরিসভা বসে, ঘরে দুচারখানা মাদুর সতরঞ্চি পাতা। গ্রামের ছেলেরাই ওখানে তাস টাস খেলে।

কালু, পটলরা মাঝে মাঝে ওখানেই রাত কাটায়। আজও রয়েছে। সকালে তারাও উঠেছে দেখেছে, বিষ্টু ভটচায অনেক ভোরে উঠে পুজো আহ্রা করে সূর্যস্তব পাঠ করে বাইরের হরিসভার চাতালে বসে, সেও দেখেছে ছেলেদের।

কালু বলে—ভটচায বুড়োরে একটা পেন্নাম কর গিয়া। যাতে ওরা জানতি পারে রাতভোর এহানেই আছিলাম।

তাই বলদ চুরির পরও কেউ তাদের সন্দেহ করে নি। ওরা দেখেছে এই বসত আশপাশের বসতের লোকদের মুখ চোখে বিপদের ছায়াটা। এবার ঘাবড়ে গেছে রীতিমত এখানের মানুষগুলো।

তাই দলবেঁধে ওরা জোন অপিসে চলেছে।

জোন অফিসার-এর কাছে খবরটা পৌঁচেছে গ্রামসেবকের মারফৎ। এমন ছোট খাটো চুরির ঘটনা যে ঘটেনা তা নয়। কিন্তু ফসল কাটা আর গরু বলদ চুরি, গাড়ির চাকা চুরি এসব ঘটেনি। একটা দল যেন ইচ্ছে করেই এখানের মানুষদের মনে সন্দেহ আর অহেতুক আতঙ্কের সৃষ্টি করতে চায়। জোন অফিসের সামনের মাঠে এসে জমা হয়েছে ক্লান্ত মানুষগুলো।

বিষ্টু ভটচাযও এসেছে।

কৃপাসিন্ধু—এর মধ্যে কালু-পটলাদের নিয়ে পুরানো খবরের কাগজ জোগাড় করে আলতা দিয়ে ধ্যাবড়া অক্ষরে তাদের দাবীর কথা লিখে শাল ডালে জড়িয়ে পোষ্টার ফেষ্টুন বানিয়ে এনেছে।

নোতুন বসতের মানুষদের দাবী মানতে হবে।

কৃপাসিন্ধু মানা রায়পুরে থাকার সময় সব কাজ অনেক করেছে।

হাত তুলে সে চীৎকার করছে—চুরি ডাকাতি বন্ধ করতে হবে।

শান্তিতে থাকতে দাও—নাহলে যেতে দাও।

কালু-নরেন-পটলারাই আর কিছু ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্লোগান দিয়ে চলেছে, পিছনে আসছে নিশিকান্ত-শরৎ-রামানুজ নোতুন তিন নম্বরের গোঁবিন্দ-শশীপদের দল।

ক্ষতিপূরণ—দিতে হবে।

খাদ্য চাই—খাদ্য চাই।

জোন অফিসার মিঃ রায়ও ওদের দেখে বের হয়ে আসেন।

এদের চীৎকার তখন বেড়ে চলেছে। কৃপাসিন্ধু সিংহগর্জন তোলে।

—শান্তিতে থাকতে দাও—নাহলে ফেরৎ যেতে দাও।

অর্থাৎ ওদের মনের অতলে যেন গভীর বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলে এই নোতুন উদ্বাস্তুদের ফেরৎ চলে যেতেই বলবে তারা। তার মানে এতদিনের চেষ্টার নিঃশেষ অপমৃত্যু ঘটাতে চায় তারা।

মিঃ রায় দেখেছেন ওদের। কৃপাসিন্ধুকে এর আগেও দেখেছেন তিনি। লোকটা সর্বদাই একটা স্বার্থ নিয়ে ঘোরে। নিজের জমিতে নিজে চাষ করেনা, নিজে না খেটে অন্যাকে ভাগে দিয়েছে। শুধু তাই নয় আদিবাসীদের বেশ কিছু ভালো জমি নিয়ে অন্যদের দিয়ে চাষ করাচ্ছে আর নিজে মধ্যস্বত্ব ভোগ করছে। চতুর কৌশলী লোক।

সঙ্গে পেয়েছে ওই ছেলেদের। যারা একযুগ ডোল নিয়ে কর্মবিমুখ হয়ে শহরের বিকৃত জীবনে অভ্যস্ত। ওদের মন বসেনি কোনদিন এ মাটিতে। যেন সর্বদাই পালাবার সুযোগ খুঁজেছে—সুযোগ খুঁজেছে শহরে গিয়ে বাস করার।

পিছনের মানুষদের চেনেন মিঃ রায়, নিশিকান্ত তার ছেলে গিরিজাও এসেছে। ওই মাঠে সেইই সেরা ধান ফলিয়েছিল। সব্জীও করেছিল প্রচুর। সে দেখিয়েছিল চেষ্টা করলে এ মাটিতে ফসল ফলানো যায়।

শরৎ দাস-রামানুজ-গোবিন্দরা রয়েছে। বিষ্টু ভটচায বলে মিঃ রায়কে—সব দিলেন, এবার আমরা যাতে ওই মাটিতে শান্তিতে বাস করতি পারি একটু দেখুন। খরায় ফসল গেল।

মিঃ রায় বলেন—আমি থানায় খবর দিয়েছি। আর খরার জন্য ধান মারা গেছে, হেডঅপিসও জানে। আর ছ'মাস রেশন দেওয়া হবে। এরপর আপনারা মকাই-এর চায করুন।

কৃপাসিন্ধু বলে—মকাই আমরা খাই না।

হাসেন এগ্রিকালচারাল অফিসার। তিনি বলেন,

—এ মাটিতে মকাই ভালো হবে। মকাই-এর কুইন্টাল দর একশো কুড়ি-পঁচিশ টাকা, চাল পাবেন একশো চল্লিশ টাকা দরে। মকাই বিক্রী করে চাল কিনেও হাতে কিছু থাকবে। তবে মকাই চাষ কেন করবেন না? তিল-উলসী-মকাই লাগাবেন। বীজ আমরা দেব।

ভুজঙ্গ শুনছে কথাগুলো।

তার মনে হয় এ মাটিতে ধান সর্বত্র হবে না। মকাই হতে পারে। সে দেখবে শেষ অবধি কিছু করা যায় কিনা। গিরিজা কিছুদিনের মধ্যেই যেন কেমন হতাশ হয়ে গেছে। সে শোনায়,

—ওসব কথা পরে কইবেন, এহন চোরদের ধরেন। নালি বাস করতি পারুম না। সব চুরি করবে আবার।

মিঃ রায় দেখছেন গিরিজাকে। সত্যিকার চাষী সে। কি অভিমানে যেন এমনি হয়ে গেছে। ওর বুক দিয়ে করা ধান সব শেষ করেছে কারা।

মিঃ রায় বলেন—নিজেরাও সাবধানে থাকো। আমরাও দেখছি। যা গেছে তার জন্য দুঃখ না করে আবার চাষ করো। পরের ফসল না ওঠা অবধি রেশন পাবে।

কৃপাসিন্ধু গর্জে ওঠে— এহানে বনবাসে আইসা ভিক্ষা নিই বাঁচতে চাইনা, তালি দ্যাশেই ফিরে যামু।

বিষ্টু ভটচায ধমকে ওঠে—থামো কৃপাসিন্ধু। তালি বালি বলবা না। দ্যাশ! দ্যাশে ফেরার পথ নাই! সেখানে তো যুদ্ধ চলছে। থাকতি হবে এই মাটিতেই।

কালু পটল কি বলতে যায়। । যুদ্ধের কথা শুনেছে তারা। দেখেছে মালকানগিরিতে হরিশপালের গদিতে কলকাতায় খবরের কাগজ আসে তাতেও খবর বের হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ চলেছে পাকিস্তানী সৈন্য আর বাংলাদেশের মুক্তি-বাহিনীর সঙ্গে।

সারা দেশে বিরাট ব্যাপার চলেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সৈন্যরা ভারতের উপর চড়াও হবার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু মারের চোটে এখন পিছু হটেছে।

নিশিকান্ত-শরৎ দাস-এর দল ফিরছে। বিষ্টু ভটচায বলে—একটা সমস্যা তো মিটলো নিশিকান্ত। মকাই বোনো—তিল উলসীও লাগাও। ধান গেছে যাক্ গিয়া।

ওরা ভাবছে কথাটা, শরৎ বলে,

—ছাওয়ালদের কও, গাঁ বসতে এবার রাতপালি কইরা পাহারা দিবার লাগবো! ওদিকে গেরাম দুখানাতেও ওরা ডিউটি দিবে, কি রে? কি কস্ তরা?

কালু-পটলরা শুনছে কথাটা। রাত ডিউটি পড়লে ওদের ওই সব কাজ আর চলবে না। গ্রামবাসীদের মনে সাহস বাড়বে। কিন্তু মুখের উপর না বলতে পারেনা। তাই কালু বলে,

—তা কাকা কইছেন চলেন গিয়া কথা হইব।

ওরা একটু আলাদা হয়ে চলে যায় অন্যদিকে।

শশীপদ, নিশিকান্ত শরৎরা বাজারের দিকে চলেছে। শহরে আসা হয় না সব সময়। নিশিকান্ত বলে—নাতিটার জন্যে একখান্ জামা কিনতে হবে শরৎ।

ওরা বাজারে গিয়ে উঠেছে।

খবরের কাগজ দেখছে নিশিকান্ত অনেকদিন পর। তাতেও সারা পাতা জুড়ে লেখা আছে যুদ্ধের খবর। ছবিও ছাপা হয়েছে। নরসিংদি—এদিকে খুলনার অনেক গ্রামে নাকি সৈন্যরা হানা দিয়ে পাইকেরী হত্যা করেছে। আর ভারতবর্ষও এবার পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।

কৃপাসিন্ধু বলে—দেখছো খুড়ো। মনে হয় এবার আমাগোর দ্যাশকে ভারতই উদ্ধার করবে।

চমক ওঠে বিষ্টু ভটচায, ক্রমশঃ কাগজখানা মন দিয়ে পড়তে থাকে সে। ভারতীয় সৈন্য চলেছে যশোর খুলনার দিকে। পিছু হটছে পাকিস্তানী সেনা।

ওদিকে ত্রিপুরার দিক থেকেও আক্রমণ হচ্ছে, আক্রমণ চলছে হিলি দিনাজপুরের দিক থেকেও।

শশীপদ তার বলদ হারানোর দুঃখ ভুলে গেছে। জোন অফিস থেকে বলদ পাবে। আর শশীপদ এখন বলদের কথা ভাবছে না। সে দেখছে তার গ্রামের নাম ছাপা হয়েছে, সেখানে পাকিস্তানী ফৌজকে পরাস্ত করে ভারতের সৈন্য এগিয়ে চলেছে। তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুক্তিফৌজ।

শশীপদ বলে—ঠিক কইছ। দ্যাশ আমাগোর ফিরা পামু মনে লয়।

ওরা নানা ভাবনা আশা নিরাশা নিয়েই ফিরছে বসতের দিকে।

বসত এখন প্রায় জনশূন্য, পুরুষদের অনেকেই শহরে গেছে। গ্রামে রয়ে গেছে মেয়েছেলেরা। কেতকীর এখন কাজ বেড়েছে। ফিরে আসবে ওরা—তার জন্য রান্না করতে ব্যস্ত। ছেলেটা এখন একটু দামাল হয়েছে। দাওয়ায় কাঁথা পেতে শুইয়ে রেখেছে, ছেলেটা অস্পষ্ট স্বরে চীৎকার করে হাত-পা নেড়ে চলেছে, মাঝে মাঝে উপুড় হবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ গিরিজাকে ঢুকতে দেখে চাইল কেতকী।

বিকালের ম্লান আলো নামছে। কেতকী দেখছে গিরিজাকে । ক'দিন ধরে গিরিজার হাসিও মুছে গেছল। আজ যেন কিছুটা খুশী খুশী দেখাচ্ছে তাকে। কেতকী একগ্লাশ জল আর বাটিতে গুড় এগিয়ে দেয়।

গিরিজার তেষ্টাও পেয়েছিল।

জলটা খেয়ে শান্ত হয় সে। কেতকী শুধোয়,

—কি কইলেন সাহেবরা?

গিরিজা বলে—ঠিকই বলেছেন তারা। ধান গেছে যাক গিয়া—মকাই দিমু সারা ক্ষেতজুড়ে, আর তিল লাগামু। আরও ফসল না ওঠা অবধি রেশন দিবেন ওরা।

কেতকীর মুখে হাসি ফোটে। বলে সে,

—ওরা খুব ভালো গো। কইনি? দেখবা দিন ঠিক চলে যাবে।

ভুজঙ্গও এসেছে। সে যেন খুশী হয়নি। বলে সে,

—ভিখারীর দিন কি শ্যাষ হইব না আমাগোর? আর চুরি যে হালায় করছে তাদের ধরতে পারে না ক্যান? আবার চাষ করবা—সেই চোররা আবার আইবো।

ওগোর দেখার লাগবোই। তাই রাতপালি ডিউটি দিমু।

হরিশ পাল-এর ওখানে কালু, পটলার দল ঢুকে একটু অবাক হয়। কৃপাসিন্ধুকে এখানে দেখবে তা ভাবেনি ওরা।

কৃপাসিন্ধুও একটু ঘাবড়ে গেছে। কিন্তু ধূর্ত লোক সে, গভীর জলের মাছ। সে চায় না যে ওরা তার প্রকৃত পরিচয় জানুক।

কৃপাসিন্ধুর হাতে আটার থলি, কৃপাসিন্ধু চীৎকার করে বলে হরশি পালের সামনে—দশ কেজি গম ভাঙ্গাতি দু টাকা! কি কও পাল মশাই। দেড় টাকা লও।

হরিশ পালও গর্জে ওঠে। সে ব্যবসার খাতিরে, গোপনতার খাতিরে অভিনয় করে নিপুণভাবে। বলে ওঠে হরিশ,

—তুমি আর আটাচাকিতে আসবা না। পুরো দাম নিই কাজ দিই। যত্তোসব!

কৃপাসিন্ধু তখন বাইরে চলে এসেছে। হরিশ পাল আট আনার শোকে তখনও বচন ঝাড়ছে।

ওদের দেখে চাইল। বলে সে—পেছনের ঘরে যাও গিয়া।

মেঘ না চাইতেই জল পেয়েছে তারা। সুধাকান্তবাবু এসেছে ওখানে।

সুধাকান্ত বলে—কাজকর্ম ভালোই চলছে তাহলে? গুড বয়। কাজের ছেলে তোরা।

সুধাকান্ত খুশি হয়েছে। এর মধ্যে সারা এলাকায় খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে—যে নোতুন বসতে কারা এসে হানা দিচ্ছে রাতের অন্ধকারে। ক্ষেতের ফসল—গোয়ালের গরুও নিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে আরও দুচারটে খবর ছড়াচ্ছে। কোন বসতে নাকি রাতের বেলায় বর্শা বল্লম নিয়ে কারা হানা দিয়ে গৃহস্থের ঘর থেকে সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে।

দূরে দূরান্তরে ছড়ানো বসতগুলো। ঘরের আঁচিল পাঁচিলও তেমন নেই। ঘরখানাই দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং চোর ডাকাত-এর পক্ষে ডাকাতি করার কোন অসুবিধা নয়।

সুধাকান্ত খুশী হয়েছে। দিনকতক এভাবে ত্রাস সৃষ্টি করতে পারলেই কাজ হবে। আর মানুষের সাহস নামক বস্তুটার সম্বন্ধে তার নিজস্ব একটা ধারণা আছে।

ওটা মনে বেশ জাঁকিয়ে থাকে, কিন্তু দু'একবার ঘা মেরে সেই সাহস নামক বস্তুটাকে টলাতে পারলে সেটা মন থেকে উবে যায়। সারা মন জুড়ে আসে ভয়, আর ভয়টাও সাংঘাতিক ধরনের সংক্রামক। ওটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না। এই অঞ্চলে সেই ভয়টাকে, নিরাপত্তার অভাবকে ছড়িয়ে দিতে পারলে এদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

কালু বলে—কাজ তো করছিলাম, কিন্তু এবার রাতডিউটি দিচ্ছে প্রতি গ্রামে। ওই বিষ্টু ভটচায কিছু লোককে পরামর্শ দেছে, আর দেখছি ভুজঙ্গ, ওই গিরিজার ভাইটাও খুব বাড়ছে।

পটলা বলে—রাতপালি দিলে আমাদেরও বেরুতে হইব। কাজ ত বন্ধ করতি লাগবে!

হরিশ পালও শুনছে কথাগুলো। সুধাকান্ত একটা ভাবনায় পড়ে।

—তাই নাকি! ওরা দেখছি এই মরামাটি কামড়ে থাকবে? কি হে হরিশ? তাহলে কি হবে? এদিকে মাতব্বররাও চাপ দিচ্ছেন, আর পাকিস্তানে যুদ্ধের পর কিছু যদি হয়, তাই ভয়ের ব্যাপারটা জাগিয়ে রাখতেই হবে।

হরিশ পাল কি ভাবছিল। বলে সে,

—হইব। সব ব্যবস্থাই হইব। তয় ওযুধটা একটুন কড়া হইব না?

সুধাকান্ত বলে ওঠে—কড়া ওষুধই চাই হরিশ। রোগটাও ত বেশ কড়া। হরিশ এবার মুখ খোলে—তয় খরচাও বেশী লাগবো।

সুধাকান্ত কি ভাবছে।

কালুদের সামনে এসব কথা আলোচনা করা ঠিক হবে না। ওদের কিছু টাকা দিয়ে বলে—তোরা তৈরী থাক। ফাঁক পেলেই কাজ সারবি। পরে দেখা হবে। পরে এসে পালমশায়ের সঙ্গে দেখা করবি, যা করার ওই বলে দেবে।

ওদের বিদেয় করে সুধাকান্ত এবার হরিশকে নিয়ে বসেছে। রাত্রি নামছে। চোখ জ্বলছে সুধাকান্তের। তাকেও তার মাতব্বরদের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে, কারণ সেই নেতারা শীগগিরই তার দেশবাসীদের দেখাতে চান কতখানি বড় কাজ করেছেন তারা। আর ভোটের আগেই সেটা করে ফেলতে হবে।

তাই সুধাকান্তের মত কিছু লোকদের উপর নানাভাবে চাপ আসছে। হরিশ যেন অভয় দিচ্ছে সুধাকান্তকে। সুধাকান্ত বেশ খুশী হয়েছে।

বলে সে—তা বুদ্ধিটা মন্দ বলো নি। ওদিকে কালুর দল যা করছে করুক। তুমিও এপথেই এগোও। তবে কাজটা একটু গোপনে করতে হবে। টাকার জন্য ভাবনা করবা না।

হরিশ গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে খুশীই হয়েছে।

গ্রামবসতে রাতপালি শুরু হয়েছে। গ্রামবসতের মানুষ ধান নষ্ট হবার পরও দমেনি। বরং নোতুন উদ্যমে আবার চাষ দিয়ে চলেছে সব ক্ষেতে গ্রামের লোকজন।

মকাই বোনার কাজ চলছে!

গিরিজাও নোতুন উদ্যমে লেগেছে। তার ক্ষেতে মকাই-এর চারা মাথা তুলেছে। সবুজ হয়ে এসেছে মাঠ।

নোতুন বসতের গ্রামে গ্রামে রাত জেগে পাহার দিচ্ছে ওরা।

বনের গভীরে আদিবাসীদের গ্রামে এই সতর্কতা নেই। তারা বহুকাল ধরে এই বনজগতে বাস করছে। বাইরের আগত মানুষরা এখানের শান্ত জগতে এনেছে অনেক পরিবর্তন। আলোড়নও। সেই সঙ্গে এসেছে অনেক লোভ আর অশান্তি।

এরা সে সব ব্যাপার থেকে আজও দূরেই রয়েছে নিজেদের জগৎ নিয়ে। এদের জমিতে ধান ভালোই হয়েছে, কারণ জলের অভাব এদের নেই। আগে থেকেই এরা এই এলাকার সরেশ জমিগুলোকে দখল করেছিল।

তাদের বেশ কিছু জমিতে ভাগে চাষ করে হরিশ পাল তার যন্ত্রপাতি দিয়ে। সেই জমির ধান-এ রং ধরেছে। বনের এদিকে বিশেষ কেউ আসে না।

আদিবাসীদের এলাকার সেই মাঠ-এব সব ধান কারা রাতের অন্ধকারে সাফ করে দেয়।

হরিশ পাল অবশ্য ব্যাপারটা সবই জানতো। রাতের অন্ধকারে ট্রাকটা এসেছে বনের পথ দিয়ে। হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে মাঠে নেমেছে লোকজন। নিপুণ হাতে তারা সোনা ধানের মঞ্জরী সব কেটে নিয়ে বস্তাবন্দী করে ট্রাক-এ তুলছে।

কৃপাসিন্ধু আজ বৈকালেই গিয়েছিল আদিবাসীদের গ্রামে। তখন পড়ন্ত বেলায় আদিবাসীদের মহুয়ার আসর বসেছে। কৃপাসিন্ধুও ওদের খুব চেনা। আজ কৃপাসিন্ধু খুশী হয়ে ওদের ভরপেট হাড়িয়া খাইয়েছে।

দু-তিনটে বস্তির সবাই এসে জমে এমন দরাজ হাতে হাড়িয়া বিতরণের খবর পেয়ে। আর সকলেই বট-মহুয়া-তেঁতুল গাছের নীচে গড়াগড়ি দিচ্ছে। দু'একজন তখনও বেতাল্লা ছন্দে মাদলে ঘা মেরে নিজেরাই জড়িত কণ্ঠে গান গাইবার চেষ্টা করছে মাত্র।

রাতের অন্ধকারে তারা জ্বলে পাহাড়ের মাথায়। এই ছায়ামূর্তির দল মাঠে নেমে তখন উদ্দামগতিতে এদের ক্ষেতের ধান কেটে বস্তাবন্দী করে ট্রাকে তুলছে।

ক্ষেতের পর ক্ষেতে এবার প্রচুর ধানই এসেছে। কিন্তু এদের লোভী হাত সব সোনাধানের মঞ্জরীকে নির্দয়ভাবে কেটে তুলছে ট্রাকে।

রাত তখন ভোর হয় হয়।

লুটেরার দল ক্ষান্ত হয়, তাদের কাজ শেষ। তার আগে নরম মাটিতে ট্রাকের চাকার দাগ যাতে না বসে তার জন্য বনের গাছপাতা ভেঙ্গে পুরু করে বিছিয়ে রেখেছিল। ট্রাকটা আবার ফিরে যায়। এরা ছিটিয়ে এদিক ওদিকের বনে ফেলে দেয় পাতাগুলো।

চাকার কোন চিহ্নই থাকে না মাটির বুকে। কৌশলে লুণ্ঠনপর্ব শেষ করে তারা ফিরে গেল রাতের অন্ধকারে।

হরিশ পালও জেগেছিল আজ।

ট্রাকের শব্দ শুনে বের হয়ে আসে। কাটা ধান ভর্তি রয়েছে ট্রাকে। সাবধানে ট্রাক থেকে মাল নামিয়ে হরিশ পাল নিজের ধানকলের ধানেব গাদায় মিশিয়ে দিল সব ধান।

হাসে সে মনে মনে। লাভ তারই হয়েছে সব থেকে বেশী, এই ধানের অর্দ্ধেক দিতে হতো আদিবাসীদের। সেটা আব হবে না। একাই পেয়েছে সব ধান। আর এই মহৎ কাজের জন্য যা খরচা হয়েছে তার তিন গুণ দিয়ে গেছে সুধাকান্ত।

বাকী যা ঘটাতে হবে সেটাও জানে হবিশ পাল। তার মজুরীও আগাম পেয়ে গছে। অঘটনটা ঘটাতে পারলে আরও বেশ কিছু তার হাতে আসবে।

কালু-পটলের দল ট্রাক থেকে নেমে এগিয়ে আসে।

হরিশ পাল ওদের কিছু টাকা দিয়ে বলে—রাতারাতিই ফিরে যা বসতে। আজ তোদের রাতপালি ছিল নাকি?

কালু বলে —না। কেউ জানতি পারবে না!

তবু ভয় হয় ওদের। বলে নরেন—যদি কোন গোলমাল হয়?

হরিশ পাল বলে—না, না! যা গিয়া!

ওরা রাতের অন্ধকারে বনের পথ ধরে এসেছে তাদের বসতের কাছে। দাঁড়ায় নদীর ওপারে এসে। দাঁড়িয়ে সাবধানী নজরে দেখছে চারিদিক।

নাঃ, কেউ কোথাও নেই। পাহারাদারদের দল বসতির ওপাশে রয়েছে। ওরা সাবধানে এসে ঘরে ঢুকলো।

আর কেউ দেখেনি ওদের ফিরতে, দেখেছে শুধু একজন। সে ভুজঙ্গ। ভুজঙ্গের আজ ডিউটি ছিল। ভোর হবার মুখে সে ফিরছে বাড়ির দিকে। তখনও বেশ আঁধার রয়েছে। আকাশে শুকতারা জ্বলছে নীলাভ আভায়। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দে চাইল ভুজঙ্গ।

অন্ধকারে সাবধানে আসছে তিন চারটি মূর্তি। চাদর জড়ানো। তবু মুখগুলো সে দেখেছে তাবার আলোয়। চিনতে পারে কালু, পটল, নরেনকে।

একটু অবাক হয় ভুজঙ্গ। ওরা কোথায় গেছল রাতের অন্ধকারে। গোপনে ফিরছে—ওদের এই চলাফেরার খবর ওরা কাউকে জানাতে চায় না। ভুজঙ্গ একটু অবাক হয়।

ওরা ক্লাবঘরে ঢুকে গেছে।

ভুজঙ্গ এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ওদের ক্লাবঘরের বাইরে দাঁড়ালো। ওদের টুকরো কথাব শব্দ কানে আসে। ভুজঙ্গ শুনছে কথাগুলো। অবাক হয় সে।

কোথায় রাতের অন্ধকারে কি করে এসেছে বোধহয় ওরা, তারই দু'একটা কথা শোনা যায়। কদমগিরি বসতির নামটাও কানে আসে। কদমগিরি একটা আদিবাসী বসত, তাদের পাহাড়ের ওদিকেই পড়ে।

ভুজঙ্গ সরে এল। তবু কথাটা তার মনে গেঁথে থাকে।

খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সারা গ্রামের পাকা ধান লুট করে নিয়ে গেছে কারা রাতের অন্ধকারে। আদিবাসীদের নেশা ছুটে গেছে সকালে, তারা মাঠে এসে দেখেছে ওই দৃশ্যটা। মাঠকে মাঠ ফাঁকা।

সর্দার গর্জে ওঠে—কারা একাজ করেছে খুঁজে দ্যাখ। পেটের দানা পানিও লুট করে নেবে?

আদিবাসীরা জমায়েত হয়। মাঠের ধারে গর্জন করছে তারা। ছেলেমেয়েরাও জুটেছে। চারিদিকে ওরা খুঁজছে যদি লুটকরা ধানের কোন হদিশ পায় তারা।

বনপাহাড়ের সুঁড়ি পথে তারা খুঁজছে সেই ধানের সন্ধানে। হঠাৎ চমকে ওঠে তারা। সবুজ বনের সুঁড়ি পথে কিছু ধান পড়ে চলেছে। বোধহয় চাদরের সঙ্গে বেঁধে নিয়েই চলছিল ধানগুলো সেই চোরের দল. ফুটো চাদর থেকে পড়তে পড়তে গেছে ধানগুলো বনের পথে, বনমুরগী-তিতির-কয়ের পাখীগুলো সেই ধানের সন্ধান পেয়ে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

আদিবাসীদের একজন জোয়ান বলে—ই ধান সর্দার আমাদের মাঠেরই লগিছে। মেঘডম্বুর ধান।

ওরা একমুঠো ধান কুড়িয়ে নিয়ে দেখেছে।

ধান-এর দাগ রয়েছে পাহাড়ের নীচের দিকে—নদীর ধারের বস্তির দিকে চেয়ে থাকে তারা। মনে মনে রাগে ফুলছে আদিবাসীরা। এখানে ধান চুরির কথা তারাও শুনেছে। সেটলার্স ভিলেজে ধান চুরি হচ্ছে, কিন্তু তাদের জমির ফসল এতকাল চুরি হয়নি। তারা চোর নয়। তাদের সমাজে চুরিটা অমার্জনীয় অপরাধ।

কারা চুরি করেছে এ ধান এবার যেন বুঝেছে তারা। এর প্রতিবাদই করবে।

কে বলে—সর্দার এর বিহিত হবে নাই?

সর্দারও রেগে উঠেছে। বলে সে,

—ধামসায় ঘা দে। ডাক সবাইকে। এর বিহিত হবেক এবার। আমরাই ইয়ার বিহিত করবো।

গুর গুরু ধ্বনি ওঠে পাহাড়বনের আদিবাসীগ্রামে। আদিবাসীরা এসে জমা হচ্ছে, ওই ধামসার শব্দটাও স্বতন্ত্র। ও তাদেব কাছে যুদ্ধ যাত্রার সাংকেতিক ভাষাই। আগে এই আদিম অরণ্যচারী লোকগুলোর সমাজে এমন যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল।

আজও দুর্গম অরণ্য জগতে বোন্ডা—মারিয়ারা আছে। তাদের মধ্যে এমনি হানা-হানি ঘটে। এরা কিছুটা সভ্যজগতে মিশে অনেকটা শান্ত হয়েছিল। কিন্তু ওই ধামসার গুর গুরু আহ্বান তাদের রক্তে সেই অতীতের উম্মাদনাকে জাগিয়ে তুলেছে। ওরা তিব ধনুক বল্লম নিয়ে জমায়েত হচ্ছে।

খবরটা পেয়েছে হরিশ পাল।

রাতের সেই লোভী হরিশ পাল এখন অন্যমানুষ। আদিবাসীদের গ্রামে ছুটে এসে হরিশ পাল নিপুণ অভিনয়ে ভেঙ্গে পড়ে। অদিবাসীদের অনেকের কিছু কিছু ধান চুরি হয়েছে, কিন্তু তার তুলনায় হরিশ পালের গেছে অনেক কিছু। সে এই বিস্তীর্ণ ধান মাঠের সব ফসলের অর্দ্ধেকের দাবীদার। আজ সব গেছে।

তাই বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে হরিশ পাল।

—আমার সব্বোনাশ হই গেল সর্দার। তোদের কিছু কিছু ধান গেছে গিয়া, কিন্তু আমার যে আধা ধান সব গেল।

মাথা ঠুকছে হরিশ পাল চোখে জল এনে। রাতের অন্ধকারে এইসব ধান যে তার খামারের ধানের মধ্যে গিয়ে মিশে গুদামজাত হয়ে গেছে এ খবর বিন্দু বিসর্গও জানাতে চায় না।

আর্তনাদ করছে হরিশ—মরে যাবো সর্দার। ইয়ার বিহিত কর।

সর্দার গর্জে ওঠে—তাই হবে হরিশ। দ্যাখ কি করি, আমরা? আমাদের ফসল লিবেক—এইখান থেকে, ইটি সইবনা। সিধা করি দিব উদের।

হরিশ মনে মনে খুশী হয়। তবু শুধোয়,

—কারা নিয়েছে জানবি কি করে?

সর্দার বলে—গুনিন বলেছে সব। আর আমরাও উ-বনে পাহাড়ের পাকদণ্ডিতে ধান পেয়েছি, হে, উরো ওই গাওয়ালা গুলানেরই কাজ।

নিশিকান্ত শরৎরা মকাই ক্ষেতে নিড়োচ্ছে। এর মধ্যে মকাই-এর গাছগুলো সতেজ হয়ে উঠেছে। ওদিকের শুকনো জমিতেও লাঙ্গল দিয়ে তারা তিল বীজ বুনেছে। তিল গাছও ঘন হয়ে উঠেছে। গিরিজা

ক্ষেত থেকে বেগুন আর কয়েকটা কুমড়ো তুলেছে। আজ সাত নম্বর বনতলি ভিলেজের হাট, কয়েকখানা গ্রাম-এর মাঝে বট-অশ্বত্থ-মহুয়া গাছের ছায়াঘন ঠাঁইটা, পাশ দিয়ে গেছে বাস রোড, ওখানে হাট বসে।

কেতকীর কোলে ছেলেটাকে আদর করছে। ছেলেটা ছোট্ট দুটোহাত দিয়ে গিরিজার মুখে থাবড়া মেরে অস্ফুট স্বরে কলকল শব্দ করে চলেছে।

বলে কেতকী—খুব দুরন্ত হইছে খোকন? ওর জন্যে হাট থনে কি আনবা আজ?

গিরিজা বলে—দেহি কি আনি। তবে তর জন্যে শাড়ি একখান্ আনতি লাগবো।

কেতকী বলে ওঠে—না। শাড়ি আমার আছে। খোকনের জন্যে বিস্কুট আনবা।

হঠাৎ কলরবটা কানে আসে। চমকে ওঠে গিরিজা, কেতকীও।

—কিসের শব্দ?

বিষ্টু ভটচায স্নান সেরে পুজোয় বসেছে, হঠাৎ তার কানে আসে ধামসা টিকারার শব্দ আর ওই কলকণ্ঠের চীৎকার। চেয়ে দেখে বনপাহাড় থেকে নেমে আসছে মারমুখী আদিবাসীর দল। ওদের মুখে কি আদিম হিংস্রতা। দণ্ডকারণ্যের আদিম হিংসা যেন ওদের রূপ নিয়ে বনপাহাড় থেকে নামছে জনপদের দিকে।

গ্রামবসতের মানুষ এমন আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না।

মাঠে নিশিকান্ত-শরৎ-রামানুজরা ছুটে আসে। আদিবাসীর দল তখন গ্রামে ঢুকে দু-চারটে বাড়ির আঁচিল-পাঁচিল ভেঙ্গেছে—কারও গোয়াল থেকে গরু বাছুর খুলে তাড়িয়ে দিয়েছে। তছনছ করছে কারও লাউমাচা, ওদিকের কলাবাগানের সতেজ গাছগুলো ওদের টাঙ্গির আঘাতে ছিটকে পড়ে।

কেতকী খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে।

—ওরা আমাগোর মাইরা ফেলতি চায়। আমার খোকনেরেও।

গিরিজাও লাঠি নিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে, কেতকী চীৎকার করছে।

—যাইও না!

গিরিজার ওর আর্তনাদে কান দেবার সময় নেই।

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। হাটতলাতেও বহু লোক সমবেত হয়েছিল মালপত্র নিয়ে। আদিবাসীদের দল এবার হানা দেয় হাটতলাতেই। দু-চারজন বাধা দেবার চেষ্টা করে, তারাও চোট পায়।

এরা দোকানপত্র ভেঙ্গে চুরমার করে, আগুন ধরিয়ে দেয় কিছু ঝুপড়ির দোকানে। ছুটোছুটি কলরব আর্তনাদের শব্দ ওঠে।

হরিশ পাল অবশ্য সাবধানী ব্যক্তি। সাপ হয়ে কাটে আর রোজা হয়ে সেইই বিষ নামাবার চেষ্টা করে। সে জানতো উন্মাদ আদিবাসীরা একটা কাণ্ডই বাধাবে।

আর কিছু কাণ্ড বাধুক এটা হরিশ পালও চায়, কারণ শুধাকান্তদার সেইটাই ছিল গোপন নির্দেশ! হরিশ পাল কৌশলে বেশ ক'দিনের চেষ্টায় বুদ্ধি খাটিয়ে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

সে খবর জানে আদিবাসীরা হানা দেবে নোতুন সেটলার্স ভিলেজগুলোয়। একটু ভয় দেখাবার মত কাণ্ড ঘটতে দিতে হবে।

হরিশ পাল তাই একটু সময় নিয়ে ফিরে এসে জোন অফিসে, থানায় খবরটা দেয়।

—আমার বিবাক ধান রাতারাতি চুরি হয়েছে আদিবাসীদের জমি থেকে। আদিবাসীরাও ক্ষেপে গেছে গিয়া স্যার। মনে হয় ওদিকের বনের মধ্যে ভিলেজ গুলোয় হামলা করতি চায়।

জোন অফিসার মিঃ রায় খবরটা শুনে অবাক হন—আবার ধান চুরি করেছে?

হরিশ পাল কাতরস্বরে বলে—একটা ব্যবস্থা করুন স্যার। নালি সব্বোনাশ হইব।

থানা অফিসারকে আর কিছু ফোর্স নিয়ে মিঃ রায়ও জিপ নিয়ে বের হয়েছেন। এ অঞ্চলে এমন কোন হাঙ্গাম ঘটেনি। এতকাল ছায়াঢাকা বনের গভীরে বিরাজ করেছে গভীর প্রশান্তি। কিন্তু মানুষ আসার সঙ্গে সঙ্গে এখানের সেই প্রশান্তির দিনও ফুরিয়ে গিয়ে এসেছে অনেক যন্ত্রণা আর অভিশাপ।

কোলাহলটা কানে আসে সাত নম্বরের হাটতলার দিক থেকে। বনের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে কিছু ভীত ত্রস্ত মানুষের দল। এদের দেখে তারা বলে—হাটগ্রাম বসত সব জ্বালাই দিচ্ছে স্যার। বাঁচান। ওই আদিবাসীরা এসে লুট করছে, আগুন দিচ্ছে ঘর বসতে।

পুলিশ ফোর্স দেখে এবার আদিবাসীরা থেমেছে, ওদিকে ছত্রভঙ্গ ভীত ত্রস্ত মানুষগুলো দাঁড়িয়েছে। তখনও হাটের দোকান কিছু জ্বলছে, ছিটিয়ে পড়ে আছে মকাই-এর ডালা, কিছু শাক সব্জী কলা অন্য জিনিষপত্র।

সাত নম্বরের লোকজন আর্তনাদ করে।

—দোকান, জিনিষপত্র সব জ্বালাই দিল স্যার। কি করছি আমরা?

নিশিকান্তও কপালে চোট পেয়েছে। হাঁপাচ্ছে সে,

বলে—আমরা ধান চুরি করছি? দেখেন গিয়া ঘরে ঘরে। রেশনের চাল-গম-মকাই ও নাই।

কৃপাসিন্ধু আর্তনাদ করে,

—আমার ঘর ভাঙলো। আগুনই দিত স্যার! হে দেশেও এমনি সর্বস্ব লুট কইরা আগুন জ্বালাই দিচ্ছে। প্রাণটা লই আইছি, এহানেও যদি সর্বস্ব যায়, প্রাণডা যায় ক্যান থাকুম?

আমাগোর পশ্চিম বাংলায় পাঠাই দ্যান। বাঁচি মরি হেই মাটিতেই মরুম।

কথাটার প্রতিধ্বনি তোলে অনেকেই।

বিষ্টু ভটচায চুপ করে কি ভাবছে। তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে ওদের বিগত আট দশ বছরের জীবন। কোনদিনই শান্তি পায় নাই তারা। বাঁচার জন্য লড়াই করেছে।

এ মাটিতেও সেই লড়াই করে চলেছে তারা।

বিষ্টু ভটচায বলে—চলে যাবার জন্যে আসিনি স্যার। যাতে শান্তিতে থাকতি পারি তাই করেন। গরীব হতি পারি কিন্তু চোর আমরা নই। ধান চুরি করেছে অন্য লোক—আর বদনাম দিতেছে আমাদের।

মিঃ রায় শুনছেন ওর কথাগুলো।

প্রাচীন লোকটার কথা সত্যি বলেই মনে হয় তার। তাঁরও মনে হয় একটা কোন কারণ আছে অন্তরালে। তিনি শুধোন,

—কিন্তু আপনাদের এসব বদনাম দিয়ে কারো কোন লাভ হবে কি?

শরৎ দাসও দেখেছে কিছুদিন থেকে তাদের ক্ষতিই করার চেষ্টা চলছে। সে বলে—লাভ তাগোর কি হইব তা জানিনা স্যার, কিন্তু কোন উদ্দেশ্য না থাকলি কিছুদিন ধরি আমাগোর পিছু লাগবো ক্যান?

গিরিজাও ভেবেছে কথাটা। বলে সে,—আমাগোর ক্ষেতের ধান চুরি হয়—

শশীপদ ফুসে ওঠে। তার গোয়াল থেকে গরু চুরির কথাটা সে ভোলেনি। বলে সে—আমার বলদ চুরি করছে।

কৃপাসিন্ধু আবার মুখ খোলে। সে হাওয়া বুঝে বলে,

—আজ অপরে ধান চুরি করছে, আর আমাগোর উপর দলবেঁধে হামলা হয়, বসত জ্বালায়, দোকান লুট করে আমাগোর উৎখাত করতে চায়। তাতে কার লাভ হতি পারে আপনারা বুইঝ্যা লন স্যার। এমন জুলুম করলি থাকি ক্যামনে?

মিঃ রায় ওই অত্যাচারিত মানুষগুলোকে দেখছেন। মনে হয় ওদের অভিযোগ সত্যিই। বার বার তিনিও ডি-ডি-এ কর্তৃপক্ষকে বলেছেন এখানে নদীর ড্যাম তৈরীর কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে, যাতে এসব এলাকার জমিতে জল পায়। চাষ হয় আরও ভালো করে। সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই এই ক'খানা গ্রামের লোকদের এখানে বসতি করা হয়েছিল।

কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক নানা অজুহাত দেখিয়ে ড্যাম-এর বাকী কাজ শেষ করা হয়ে ওঠেনি। কখনও বর্ষাকাল—কখনও সিমেন্টের অভাব, কখনও লেবার প্রবলেম ইত্যাদি নানা ভাবে কাজটাকে শেষ করা হয়ে ওঠেনি।

আর তার জন্য ফলভোগ করছে এই বসতিগুলোর লোকজন। অদৃশ্য কোন দল হয়তো চায় না এদের এই সমস্যাগুলো সহজেই দূর হয়ে যাক।

তাহলে এদের বাস করার সুবিধে হবে। কোথায় অন্ধকারে কলকাঠি নেড়ে তাই এদের নোতুন জীবন এখানে অসহ্য কবে তোলার চক্রান্তই চলেছে একদিকে, আর অন্যদিকে এই উদ্বাস্তুদের এখানের জীবন—এই পরিবেশকে আবও ভয়াবহ করে তুলতে চায়।

মিঃ রায় বলেন— আমি দেখছি।

থানা অফিসারও আশ্বাস দেন—একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মিটমাট করে নিন। সর্দার কি বলো?

আদিবাসীদের সর্দার আর কিছু আদিবাসীদেব খেয়াল হয় রাগের বশে তারা একটা ভুল কাজই করেছে। ধান চুরি এরা করেনি। করেছে অন্য লোকবা।

সর্দার বলে—তা ভুল হয়ে গেল বটে!

নিশিকান্ত, শরৎ, রামানুজরা বলে— এত ক্ষতি করলে আমাদের?

শশীপদ বলে—সব্বোনাশ করলা মামা।

প্রবীণ আদিবাসীদের ওরা ওই সম্পর্ক ধরেই কথা বলে। ওরাও সেটাকে এতদিন মেনে নিয়েছে। আদিবাসীদের ছায়াঘেরা কোন পাথর—বৃক্ষ দেবতাকে এই নোতুন আগত উদ্বাস্তুরাও পুজো করে, প্রথম গরুর দুধ ঢালে সেই পাথরের উপর।

আদিবাসীরও কৌতূহল নিয়ে দেখে তাদেব হাল, চাষ বাষ, সব্জীচাষ, নিজেদের জমিও ভাগে দিয়ে ফসল করাচ্ছে এদের দিয়ে। এই ভাবেই চলছিল মিলেমিশে, পাশাপাশি।

হঠাৎ কোনো অদৃশ্য কালোহাতের খেলায় সেই সম্পর্কটা চুরমার হয়ে গেছে, মুছে গেছে মনেব সব প্রীতি-ভালোবাসার স্পর্শ। সেখানে গড়ে উঠেছে অদৃশ্য একটা ব্যবধান।

ওই সরল আদিবাসীদের মনে জাগিয়ে তুলেছে একটা প্রশ্ন! ওরা এখন ভাবছে ওই বহিবাগত মানুষগুলো এসে তাদের মাটি জমি দখল করেছে।

কিন্তু ওই বহিরাগতদেব জন্যই এখানের আদিম অবণ্য আজ জেগে উঠেছে। অদৃশ্য মৃত্তিকার ঘুম ভেঙ্গেছে। তারাও এতদিন অনাদৃত পড়েছিল, আজ ওদের কারণেই দেখেছে সভ্যতাব আলো।

কিন্তু আলোর চেয়ে অন্ধকাব দিকটাকেই তাদের সামনে বড় করে দেখানো হয়েছে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে।

তবু ব্যাপারটা আপাততঃ চাপা পড়ে।

মিঃ রায়—থানা অফিসার এদিকের গ্রামের কিছু মাতব্বরদের মধ্যস্থতায় মিটমাট হয়। আদিবাসীবা আবার বনের পথে ফিরে যায়। তখনও পড়ে আছে ভাঙ্গা দোকান-পত্র, কিছু অগ্নিদগ্ধ ঘর-বাড়ি—ছড়ানো জিনিষপত্র।

বিষ্টু ভটচায বলে—যাও, সব ঠিক হই যাবে গিয়া। কাজ কাম করগে। আরে হাঁড়ি কলসি পাশাপাশি থাকলে এ্যামন এক আধটু টক্কর লাগেই। এত ঘাবড়াস্ ক্যান?

গিরিজা চুপ করে ভাবছে কথাটা।

কালুদের হাতে এখন ভালোই পয়সা। ইদানীং শহরের বিশেষ মহল্লায় যায় তারা। এখানে মেয়েমানুষ—মদের সব খরচা আসে সুধাকান্তের কাছ থেকে। হরিশ পালও আসে শহরে সুধাকান্তবাবু এলে।

আজ সুধাকান্তবাবু খুব খুশী। সে শুনছে আদিবাসীদের হামলার কথা। সুধাকান্তবাবু বেশ বসিয়ে বলে—তালে মন্দ বাধেনি। তা ওরা কি কয়? গ্রামেই পইড়া থাকবে ঠ্যাঙ্গানি খেয়ে?

হরিশ সব খবর রাখে। বলে সে—এহনই দু'চারজন পালাবার কথা বলছে। তয় ত্যামন জোরদার হয় নি সেই ব্যাপারটা।

সুধাকান্ত বলে—জোরদার করতি হবে আরও, যাতে ওরা চলি যায়।

কালু বলে—ধান মরছে, মকাইও কি হয় কে জানে। তবু পড়ি আছে। কয় ড্যাম-এর জল আসলি সোনা ফলাবো মাটিতে।

হাসে সুধাকান্ত—ড্যামের জল আসবে জমিতে? এ্যাঁ—সোনা ফলবে। ওই আশাতেই রয়েছে তাহলে!

হরিশ বলে—যদি সত্যি জল পায় জমিতে?

সুধাকান্ত বলে—এখনও অনেক দেরী! ড্যাম নে গোলমাল বাধছে। কলকাতা থেকে নেতারা আসছে, যদি এখানে ড্যাম-এর কাজ শেষ না হয় তাহলে আমরা কল্যাণ সমিতি থেকে চাপ দেব—তাইতো মিটিং ডেকেছি।

নোতুন বসতের লোকজনও মিটিং-এর খবর পেয়ে এসেছে। জোন অফিসের ওদিকের মাঠে জমেছে বহু মানুষ। সুধাকান্তবাবু আজ সারা এলাকার মানুষের হিতাকাঙক্ষী হয়ে উদাত্তস্বরে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে, সঙ্গে রয়েছে আরও দু'একজন নেতা।

কৃপাসিন্ধু, নিশিকান্ত, শরৎ—শশীপদদের এনেছে। ওরাও বুঝেছে তাদের দরকার আজ নেতাদের।

সুধাকান্তবাবু বলে,

—আমার ভাই বোনদের উপর এই পরিকল্পিত আক্রমণের জন্য দায়ী করছি এখানের কর্তাদের। তাঁদের প্রশ্ন করবো—কেন ড্যাম-এর কাজ শেষ হচ্ছে না? কেন এরা জল পাবে না এখনও জমিতে? এদের মিথ্যা আশ্বাস কেন দেওয়া হয়েছিল?

হাততালির শব্দ ওঠে।

হরিশ পালও দলবল নিয়ে এসেছে। কালু-পটলা-নরেনের দল আরও কিছু গ্রামের অমনি ছেলেরাও স্লোগান দেয়—আমাদের দাবী মানতে হবে,

সুধাকান্ত ওদের থামিয়ে আবাব বক্তৃতা শুরু করে।

তাঁরা যদি তাদেব কথা রাখতে না পারেন তবে উদ্বাস্তুদের অসহাযেব মত বন্দী করে রাখার কোন দাবী তাদের নেই। আমরা বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করছি। তাঁরা এসে দেখে যাবেন কি আনন্দে আমরা এখানে রয়েছি। এসব অভিযোগের প্রতিবিধান করতে হবে।

ভাইসব—

সুধাকান্ত আজ নিপুণ অভিনেতার মত দরদে ফেটে পড়ে। মুগ্ধ জনতা আজ ভাবে ওকে তাদেরই একান্ত আপনার জন হিসেবে।

জোন অফিসাব মিঃ রায়ও শুনেছেন ওদের বক্তৃতা। সেদিনের আদিবাসীদের অত্যাচারের পর থেকেই এদের আন্দোলন বেড়েছে। হঠাৎ দরদী সেজে অনেকেই আসা যাওয়া শুরু করেছে, গ্রামবাসীদের মনের অতলেও দানা বেঁধেছে অনেক বিক্ষোভ।

পটলা কালুর দল তাদের নেতাকে বিদায় দিয়ে আজ পেটভরে মদ গিলে ফিরছে, জিপের অভাব নেই। বেশ মৌজ করে ফিরছে তারা। হাটতলাব ওদিকে জিপ থেকে নেমে ফিরছে কালুরা।

ভুজঙ্গ ওদের দেখে চাইল।

সেই ভোরের ঘটনা ভোলেনি ভুজঙ্গ! ধান চুরি করার ব্যাপারটা নিয়ে সেইদিনই গোলমাল ঘটেছিল। দেখছে সে ওদেব।

কালু পটলার পরণে দামী প্যান্ট, জামা। মদ খেয়ে মেজাজ নিয়ে নামছে তারা জিপ থেকে। ভুজঙ্গ এসেছিল হাটে কিছু ফসল বিক্রী করে ফিববে।

কালু বলে—কি রে! বলছি আমাদের সঙ্গে চল, এসব মাঠে পড়ে থেকে কি হবে? টাকা-জামা-প্যান্ট সব পাবি। আর চাই তো মদ—

ভুজঙ্গ বলে—ওসব আসে কোত্থেকে তা জানি। ওমনি পাপের পথে আমি নাই।

পটলা চটে ওঠে—কি কস্ রে ঢ্যামনা?

ভুজঙ্গ ফুঁসে ওঠে। —গাল দিবিনা শালা চোর।

—চোর! কালু চটে ওঠে। একটু চমকে উঠেছে ওরা।

ভুজঙ্গ আজ রাগে ফেটে পড়ে। বলে সে—একশোবার কমু তরা চোর-ডাকাত। তগোর জন্যেই আমাগোরও লোকে চোর কয়।

নরেন-এর মেজাজটা চড়া। সে ভুজঙ্গের জামাটা ধরে,

—খবরদার কইছি,

ভুজঙ্গও গায়ে শক্তি রাখে। নরেনকে ছিটকে ফেলে শোনায় সে,

—আমাদের পাকা ধান চুরি করেছিস তোরা, সেইদিন অদিবাসী গাঁয়ের ধান চুরির রাইতে তরা কোথায় গেছলি? ভোরে ওই বনের পথ ধরি ফিরেছিস আমি দেখছি। প্রমাণও পাইছি—কমু সকলকে তোদের কথা।

চমকে ওঠে কালুব দল।

ওদের নেশা ছুটে গেছে। আজ ভাবছে কালু যদি সত্যিই ওই কথা পুলিশে জানতে পায়ে, জানতে পারে গ্রামের লোক, ওই আদিবাসীরা এই পটলা-কালু-নরেনদের ওরা ছাড়বে না, তাদের শেষ করে ফেলবে। আরও ভয়ের কথা সুধাকান্তদা-হরিশ পালও যে এই ব্যাপারে জড়িত তাও বের করবে পুলিশ।

কারণ এত ধান এখনও রয়েছে হরিশ পালের গুদামে। সর্বনাশ হবে। কালু ঠাণ্ডা মাথার ছেলে। পটলাও হিংস্র, তবু এখন চুপ করে থাকতে চায়। কালু নরেনকেই দুটো চড় মেরে গর্জায়,

—ক্যান গায়ে হাত দিবি ওর? ভুজঙ্গ আমাগোর বন্ধু।

ভুজঙ্গকে বলে পটলা—ওসব বাজে কথারে ভুজঙ্গ। সেদিন শহরে সিনেমা দেখতে গেছলাম। আর ওই আদিবাসীদের ঠেকামুই এবার। কোন হালায় চুরি করবে, আমরা হমু চোর। তাই শহরেও যাই দরকাব হলি বোম্ আমদানি কইরা ওগোর ঠেকামু।

কালু বলে—আক কাউরে কথাডা কই নি। তরেই কইলাম।

ভুজঙ্গের মনোভাব অবশ্য ভালো নয়, আদিবাসীদের সেদিনের আক্রমণটাকে ঠেকাতে পারে নি। ভয ছিল আবার যদি হামলা করে।

আজ ওদের কথায় ভরসা পায় ভুজঙ্গ। বলে সে,

—সেদিন চুপ কইরা ওগোর মার খাইছি। ঘর জ্বালাই দিল খামোকাই কিছু করতি পারিনি। তয় তবা যদি সত্যিই কাজ ঠেকানোর জন্য থাকিস—আমিও তগোর লগে আছি।

নরেন গজরাচ্ছে।

কালুর ইশারায় সে চুপ করে। কালু বলে,

—তাই ওগোর রাগ। আসল কথাটা তরে কলাম। মাঝে মাঝে তরে কমু কি করছি। আর আমরাও কর্তাদের কাছে দাবী আদায়ের জন্য যামু। ড্যাম-এর জল দিতি লাগবো।

ভুজঙ্গ স্বপ্ন দেখছে তার জমিগুলোয় ক্যানেলের জল আসছে। সারা মাঠ-এ সবুজ ধান হবে। শান্তিতে থাকবে তারা। ওই ছেলেদের হয়তো ভুলই বুঝেছিল।

ভুজঙ্গ বলে—আমিও ভাবছি তাহলে! যাই গিয়া—

চলে গেল ভুজঙ্গ। অন্ধকার নামছে বনপাহাড়ে।

কালু কি ভাবছে। নরেন বলে—শ্লা সব জানতি পারছে আমাগোর কাজের কথা। এহন কিছু কইল না, যদি কিছু প্রকাশ করে পুলিশ নিই যাই মাইরা সব খবর বাইর করবো। তারপর অদিবাসীরা মারুম—ওদিকে সুধাকান্ত হরিশ পালদেরে চেনস না? ওরাই খতম কইরা দিবে আমাগোর।

ভাবনার কথা।

ওরা ওই ভুজঙ্গকে বিশ্বাস করতে পারে না। ওই ছেলেটাই জেনেছে তাদের গোপন কীর্তির কথা। পটলা বলে,

—ওরে বিশ্বাস করতে পারি না।

—তয় কি করবি? কালু শুধোয়।

নরেন তার মারের বদলার কথা ভোলেনি। বলে সে,

—তুই চুপ কইরা যাক। ওর ব্যবস্থা করুম। তয় কাজও হইব।

ভুজঙ্গ ক'দিন মাঠের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। মকাই-এর গাছগুলো ঠেলে উঠেছে মাঠ ছেয়ে। এবার আশা কিছুটা পেয়েছে গ্রাম বসতেব মানুষ। সবুজ মকাই গাছের গাঁটে গাঁটে এসেছে ফলের ইশারা, মকাইগুলো পুরুষ্টু হচ্ছে।

গিরিজাও মাঠে ব্যস্ত। কিছুদিন ধরে ওদেব এবার মিটিংও চলছে। ডি-ডি-এর কর্তাদের কাছে এবার সমিতি নানা দাবী তুলছে। কৃপাসিন্ধু কালু পটলদের দেখা যায় ফেষ্টুন হাতে হাটতলায় মিটিং করছে।

আদিবাসীদের মাঝেও এবাব একটা সাড়া এসেছে। সেই মারপিটের—হামলার পব পুলিশ দুচারজন আদিবাসীকে ধরেছিল। তাদের বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগ—লুট পাটের চার্জ এনে এবার কোর্টে পাঠিয়েছে আসামীদের।

আদিবাসীরাও সমবেত ভাবে যেন তৈবী হচ্ছে। এই জুলুম তারাও মানবে না। তাবা মাঝে মাঝে তির ধনুক বল্লম ধামসা বাদ্যিবাজনা নিয়ে জোন অপিসেও আসে, শোভাযাত্রা করে এদিক ওদিক ঘোবে।

রাতের অন্ধকারে জিপ হাঁকিয়ে দু'একজন মাতব্বরও আসে। তারাও লেকচার দেয়—ফলে দুপক্ষের মধ্যে একটা বিদ্বেষ বেড়েই চলে।

সেদিন সাত নম্বরেব হাটে একটা গোলমালই হয়ে যায়। ব্যাপারটা সামান্যই। কিছু আদিবাসী লোকজন ওই হাটে আসে আনাজপত্র নিয়ে, কেনা বেচা করে।

কালুর দল বাধা দেয—তোলা দিতি হবে। একটাকা লাগবো। তারাও দেবেনা। এই নিয়েই তাদের সঙ্গে বচসা-কথাকাটাকাটি, দু একজন মারধোবও করে।

ফুঁসে ওঠে আদিবাসীবা, এপক্ষও যুধ্যমান।

কোন রকমে পুলিশ এসে পড়ায তেমন কিছু হয না। ফিরে যায় ওবা।

নিশিকান্ত শবৎ দাস-এব দল বলে,

—বিপদেই পড়ছি এবার। পাশাপাশি বাস কবতি হবে, এসব ক্যান হইব?

শরৎ দাস এবাব কালুকেই ধবে—ক্যান উসব করবি? হারামজাদাদের দল।

পটলাকে দুটো থাপ্পড় মেবে বসে শবৎ দাস।

—ছাওয়াল না শক্রর তুই? মরস্ না

ও ছেলের উপর সব ভবসা হারিয়েছে আজ শরৎ। ওরাই যেন এসব অশান্তি ডেকে এনেছে।

নিশিকান্ত বলে—যা কইছ শবৎ। ওই কালু-পটলা-নবেন মিলে আমাগোব শ্যাষ করবো। কি করস তোরা, শহরে কাদের কাছে যাস্? এই ফুর্তি কবার পয়সা মেলে কোথা থনে?

শবৎ পটলাকে একটা লাথিতে ছিটকে ফেলে গর্জায,

—জবাব দে।

আপাততঃ থামায় অন্যজনরা। তবে সকলেই বুঝেছে আবার একটা গোলমাল পাকাতে পারে ওই আদিবাসীরা। জানেনা কি হবে তাদের।

সন্ধ্যাবেলায বিষ্টু ভটচাযেব ওখানে সকলেই আসে।

রামানুজ বলে—রাতে সতর্ক থাকবা।

নিশিকান্তও ভাবছে। বলে সে—এ মাটিতে কি থাকতি দেবেনা হে?

বিষ্টু ভটচায অনেক আশাবাদী। বলে সে,

—টিকে থাকতে হবে নিশিকান্ত, সব ঠিক হই যাবে। জমিতে জলও আসবে। সেদিনের জন্য বাঁচতেই হবে আমাদের।

ওরা সকলেই ভাবনায় পড়েছে।

রাত্রি নামে। শান্ত স্তব্ধ রাত্রি। ভুজঙ্গ বাইরেব ঘরে শুয়েছিল। সেও জানে অদিবাসীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কিছু ছেলেরা তৈরী হচ্ছে। হঠাৎ কার ডাকে চাইল।

জানলার বাইরে থেকে ডাকছে কে তাকে, বের হয়ে এল ভুজঙ্গ। কালু ইশারায় ডাকে তাকে। একটু দূরে এনে বলে,

—আদিবাসীরা হয়তো রাতে পাহাড় টপকে আসতি পারে।

চমকে ওঠে ভুজঙ্গ—তাই নাকি! গাঁয়ে খবর দিমু?

কালু বলে—না। আমরাই ব্যবস্থা করছি। আয় আমাগোর সাথে।

ভুজঙ্গ চলেছে।

নদীর ধারে এসে থামলো।

প্ল্যানটা ওরা ভেবে বেখেছিল। আজ হাটতলায় পটলা-কালুদের প্ল্যানটা ভেস্তে গেছে। উলটে মনে হয় যেন ওই শরৎ দাস-নিশিকান্তরা জেনে ফেলেছে কিছুটা তাদের কাজ-এর নমুনা। আরও কিছু খবর পেলে তাদের বিপদ হবে। আর খবর দিয়েছে ওই ভুজঙ্গই।

তাই ওরা আজ চরমের পথই নেবে।

আর হরিশ পালও ওদের বলেছে যেভাবে হোক গ্রামের লোকদের মনে ভয় জাগিয়ে তুলতেই হবে। যাতে আদিবাসীরাও চটে ওঠে—একটা গোলমাল দানা বাঁধে।

কালু তাই এই পথ নিয়েছে।

নরেন এসব কাজে বেশ নিপুণ। তারা ভুজঙ্গকে ডেকে এনেছে।

বনেব মধ্যে দিয়ে চলেছে তারা। স্তব্ধ রাত্রি। কোথায় রাতজাগা পাখী ডাকে। আবার স্তব্ধতা নামে। রাতের আবছা অন্ধকারে ওরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে ওপারের দিকে।

ভুজঙ্গ হঠাৎ আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে। নরেনও কাজটা নিপুণভাবে সেরেছে।

একটা তির এসে বিঁধেছে ভুজঙ্গের পিঠে—ছিটকে পড়ে সে। তিরটা আমূল গিঁথে গেছে।

পটলা চমকে ওঠে—কি করলি নরেন?

নরেন শোনায়—ঠিক করছি। ওর মুখ বন্ধ করি দেলাম না হলি আমাগোরও অমনি শেষ হতে হতো!

তখনও নড়ছে ভুজঙ্গের দেহটা, ক্রমশঃ স্থির হয়ে আসে। তিরটা গিয়ে ওর পিঠের পাশ দিয়ে ফুসফুসেই বিঁধেছে গভীরভাবে। রক্ত ঝরছে।

পটলা বলে—কি হইব এহন?

কালু কি ভেবে বলে—অসল খবরটা কেউ কইবি না। চেল্লা—যেন কারা আমাগোর গ্রামবসতে হানা দিতে আসছে। তাগোর তাড়া করছি আমরা।

চীৎকার করছে কারা রাতের অন্ধকারে নদীর দিক থেকে। কিছুটা সজাগ ছিল বসতের লোকজন। কালু চীৎকার করছে—আরও কারা রয়েছে। গ্রাম বসতের লোক জেগে উঠেছে। এ গ্রামের লোকদের চীৎকারে ওদিকের বসতের লোকজনও জেগে উঠেছে। মশাল-টর্চ জ্বেলে লাঠি সড়কি নিয়ে বার হয়ে দৌড়লো ওরা নদীব দিকে।

কাল হাটে গোলমাল হয়েছে। হয়তো তারই জের টেনে আবার হামলা করেছে আদিবাসীর দল। এবার এরাও তৈরী। মরীয়া হয়ে লড়বে। গিরিজাও বের হয়।

কেতকী খোকনকে নিয়ে শুয়েছিল, সে উঠে পড়েছে। বলে কেতকী,

—যাবা না!

গিরিজা খুঁজছে—ভুজঙ্গ কই?

নিশিকান্তও বের হয়েছে। ভুজঙ্গ নেই। নিশিকান্ত বলে,

—সেও বোধহয় গেছে গিয়া।

কেতকী স্বামীকে আটকাতে চায়। আজ তার দায়িত্ব অনেক বেশী। কিন্তু গিরিজা বলে,

—এত লোক গেছে ভুজঙ্গও গেছে গিয়া। কুন ভয় নাই—আমি আসিতেছি।

সেও লাঠি নিয়ে বের হয়ে যায়, পিছু পিছু চলেছে নিশিকান্তও।

নদীর ধারে লোকজন জুটে গেছে। দেখা যায় বনের বাইরেই পড়ে আছে ভুজঙ্গের দেহটা, পিঠে একটা তির বেঁধা। রক্তে মাটি ভিজে গেছে। তেমন কেউ দেখেনি, তবু অনেকেই একমত যে আদিবাসীরা এসে পড়েছিল ওরা দেখেই তাড়া করে তাদের আর ওদেরই তিরে ছিটকে পড়েছে ভুজঙ্গ।

নিশিকান্ত ছুটে এসেছে। হাঁপাচ্ছে বুড়ো।

ভুজঙ্গের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটার উপর ছিটকে পড়ে আর্তনাদ করে সে।

—ই আমার কি সব্বোনাশ হইল রে?

গিরিজা দাঁড়িয়ে আছে বজ্রাহতের মত। তার তরতাজা জোয়ান ভাইটা এত বছর বাঁচার জন্য লড়াই করে আজ রাতের অন্ধকারে এই আদিম আরণ্যক বিভীষিকার শিকার হয়ে গেছে। এই বনপর্বত, এই মাটি—এই পরিবেশ যেন সব কেড়ে নেবে তাদের। এখানে তাদের এই দুঃসহ বাঁচার লড়াই-এ সামিল হবার সব ইচ্ছা মুছে গেছে গিরিজার মন থেকে।

ধান, এত পরিশ্রম, বুকের ঘাম রক্ত দিয়ে বাঁচানো ধানও লুটে নিয়ে গেছে চোরের দল। তবু লড়ছিল তারা। আজ আবার তারই ভাইকেও কারা অন্ধকারে বনের মধ্যে শেষ করেছে।

পদে পদে বাধা অতিক্রম করে এখানে বসত গড়তে চেয়েছিল, কিন্তু একটার পর একটা আঘাত আজ গিরিজা, নিশিকান্তের মনের সব শক্তি, সাহসটুকুকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

নিশিকান্তের সারা মন কি হাহাকারে জীর্ণ হয়ে ওঠে। কবে ছোট্ট ভুজঙ্গকে নিয়ে পথে নেমেছিল। বহু দিনরাত্রি কেটেছিল অনাহার অর্দ্ধাহারের মধ্যে। ছেলেটা সেই দুঃখের দিনেও মানুষ হয়েছিল, বেঁচেছিল। আজ এইখানে এসে হারিয়ে গেল।

সারা গ্রামবসতে স্তব্ধতা নামে। আতঙ্কের স্তব্ধতা।

শশীপদ সাত নম্বরের লোকজনও ভয় পেয়ে গেছে। এই মৃত্যুটা এনেছে এদের সকলের মনে একটা কঠিন ভয়ের কালোছায়া। ওদের মনে হয় ওই আদিম বনপাহাড়ে এখনও রয়ে গেছে কোন বর্বর নিষ্ঠুরতা, রক্ত তৃষ্ণা। যার জন্য আজ এই ভাবে প্রাণ দিয়েছে তাদেরই একজন।

নিশিকান্তের কান্নার শব্দটা এদের মনে এনেছে সেই আতঙ্ক, যে কোনদিন এমনি সর্বনাশ আবার ঘটতে পারে এখানে।

কৃপাসিন্ধু বলে—ক্যান থাকুম এহানে, আমাগোর কি ভরসা আছে?

শশীপদও শোনায়—ক্ষেতের ফসল চুরি হয়, গরু বলদ চুরি হয়—কারা আইসা গ্রাম জ্বালাইল, রাতের অন্ধকারে খুন কইরা যাবে গিয়া, ক্ষেতের মাটি ও কাঁকর। তয় থাকুম ক্যান্!

তাই আরও কিছু গ্রামবসতের লোক জুটেছে, এবার তাদের মনে এসেছে প্রশ্নগুলো। কৃপাসিন্ধু বলে,

—জোন অপিসে খবর তো গেছে গিয়া। আমরা কল্যাণ সমিতির অপিসেও যামু। খবরও দিছি।

সুধাকান্ত খবর পেয়েছে। খুশী হয়েছে মনে মনে। এমনি একটা ঘটনাই ঘটুক সে চেয়েছিল। এবার সুধাকান্ত গ্রাম অঞ্চলে এসে মিটিং করে, সেএ বলে এদের কথাই।

কোন নিরাপত্তা নেই—চুরি-ডাকাতি-খুন সব হচ্ছে, কর্তৃপক্ষই এর জন্য দায়ী। গ্রামবাসীরা আকুতি জানায় সুধাকান্তের কাছে,

—কি হইব? জানডা দিমু? এর চেয়ে দেশেই ফিইরা যামু।

একটা মৃত্যু ঝড় এনেছে এদের মনে। এতদিন ধরে অতৃপ্তি—অক্ষমতা নিয়ে বেশ কিছু মানুষ মনে মনে ফুঁসছিল। শহর থেকে বনবাসে এই কষ্টের জীবনে এসে তারা হাঁপিয়ে উঠেছিল, চেয়েছিল বের হয়ে যাবার পথ।

তাই এই ঘটনাগুলোকেই তারা মূলধন করে আজ তৈরী হয়েছে চরম পথ নেবার জন্য। আর এই সময়ই খবরটা কিভাবে কারা ছড়িয়ে দেয় এই অঞ্চলে।

হাটতলায় লোকের মুখে মুখে সেই কথাই রটেছে। কালু কোথা থেকে দুটো হ্যান্ডবিল এনেছে, শহরে নাকি বিলি করা হচ্ছিল এসব।

অনেকেই পড়ছে সেগুলো।

পশ্চিম বাংলায় সুন্দরবনের ওদিকে কোথায় অনেক জমি তৈরী করা হয়েছে, সেখানেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

এদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। নিশিকান্ত শুনেছে কথাটা। বলে সে.

—ওখানেই যামু।

গিরিজা চমকে ওঠে—বাবা!

নিশিকান্ত বলে—এহানে কি পাইছিস? ওই মরা মাটি—জল কুনদিন আইব না। মিছা কথা। ধান লুট হই যায়, ঘর জ্বালাতি আসে, তাজা ছাওয়ালাটারে হারাইছি—নাঃ ইখানে আর থাকুম না। তরে কই ঘর সংসার করছিস—পোলা হইছে। এহানে থাকলি সব মরবি।

শশীপদও সায় দেয়—ঠিক কইছ নিশিকাকা। আমিও তাই ভাবছিলাম। চইলাই যামু। খুলনার লোক আমি—সোঁদরবনে তবু ঘরের কাছেই থাকুম। মরতি হয় ওখানেই মরুম।

কে বলে—কিন্তু যাতি ত টাকা পয়সা চাই! সেডা কই!

রাতের অন্ধকারে ওরা জমায়েত হয়েছে বিষ্টু ভটচাযের ওখানে। তারাগুলো জ্বলছে দিগন্তপ্রসারী বিস্তীর্ণ আকাশের আঙিনায়। ওদের এখানেই জমেছে অনেকে। তাদের মুখে ওই আলোচনা। এখানের জীবনে ওরা সব আশা যেন হারিয়ে ফেলেছে।

বিষ্টু ভটচার্য বলে— কে কইছে তোমাদের সুন্দরবনে বসতি দেবে? মিছা কথা! সেবার গিয়া প্রথম দিকেই কথা উঠছিল। বিধান রায় তহন মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫৮ সালে তিনিই কইছিলেন—সোন্দরবনের জমি সব নোনা। ও মাটিতে ফসল ফলাতি গেলে দুইডা বছর পার হই যাবে, আর বনের দবকাব। সুন্দববনকে ধ্বংস করা যাবে না। তারপরই সেন্ট্রালের সাথে কথাবার্তা কই দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট-এর কাজ শুরু হয়।

কৃপাসিন্ধু অনেক কিছু জানে। শহরে সে যাতায়াত শুরু করেছে। সে বলে—এহন বিধান রায় নাই। নোতুন মন্ত্রীসভা হইছে, সুধাকান্তদা নিজে কইছেন তিনি কলকাতা যাই সব শুনি এয়েছেন।

বিষ্টু ভটচায চাইল ওর দিকে।

দেখছে সে তারার আবছা আলোয় ওই মানষগুলোকে। ওদের শীর্ণ বুভুক্ষু ক্লান্ত মুখে কি মরীয়া ভাব ফুটে উঠেছে। ওরা বারবার অনাহার—মৃত্যু আর অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে এসে এসে আজ মৃত্যুর মুখোমুখি হতেও ভয় পায় না।

বিষ্টু ভটচায বলে—এ ঠিক করছ না তোমরা! মরণের মুখে আবার যাতি চাও, সেটা যেখানেই যাও, তবু যদি জেতো—এ মাটিতে সুখে থাকবা। তোমাদের ছাওয়ালরা অন্ততঃ সুখে থাকবে।

নিশিকান্ত আজ সব আশা হারিয়েছে। আর্তনাদ করে সে,

—ছাওয়াল, তাদেরও বাঁচতি দেয়নি এ মাটি ঠাকুরমশাই! .....

অনেকেই তৈরী। এখানের বাড়ি ঘর জমির উপর মায়া তাদের নেই। তারা এ মাটির কেউ নয়। চলে যেতেও কোন বাধা নেই। কিন্তু অভাব শুধু টাকার। খরচা তো চাই! এতখানি পথ পার হয়ে যেতে হবে।

সুধাকান্তও ঠিক সময়ে এসে গেছে। আজ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তার উপরের নেতারাও চান জমি ঘর খালি করে এরা চলে যাক। তারপর কৌশলে এইসব কিছু দখল করাবে তাদের লোকদের দিয়ে। তার মধ্যে ড্যাম-এর কাজও শেষ করাবে। এত হাজার হাজার একর জমি তাদের হাতে আসবে। এ এলাকায় সব ভোট পাবে তারাই।

সুধাকান্তের হাতে টাকার অভাব নেই। অন্ধকারে টাকা আসছে। আর রাতের অন্ধকারে সুধাকান্তের জিপে ঘুরছে কালু-পটলের দল। নরেন এখন সুধাকান্তের প্রিয় পাত্র! একটা তির ওর ঠিক লক্ষ্যে বিঁধেছে।

সুধাকান্ত বলে—ট্রাক দিমু যদি যেতে চাও।

বাকীটা সুধাকান্ত বলেনি। বলেছে কালু-পটলের মারফৎ হরিশ পাল। রাতের অন্ধকারেই লেনদেন হতে থাকে। হরিশের লোক আসে ট্রাক নিয়ে। রাতের অন্ধকারেই বলদ-গরু, দরজা-জানলার কপাট, ঘরের টিন, সবকিছুই দরদাম করে বিক্রী হয়ে যায়!

রাতারাতি তারাও গ্রামবসত ছেড়ে ট্রাকে করে উধাও হয়ে যায়। বনের ভিতরের কয়েকটা গ্রামের লোকজন সরে পড়েছে রাতারাতি, এদিকের গ্রামবসতের মানুষজনের মনেও ভয়টা এবার জমিয়ে বসেছে।

সাহস মনের একটা বিশেষ অবস্থা। সেই মানসিক দৃঢ়তা থাকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একে অন্যের ভরসাতে থাকে। যেন পাকাবাড়ির ইট সাজানো দেওয়াল। ইটগুলো সাজানো আছে, নীচের দিকের ইটগুলো সরে গেলে তখন উপরের ইটগুলোর কোন জোরই থাকে না। এক ধাক্কায় ধ্বসে পড়ে।

তেমনি এখানের গ্রাম বসতের মানুষের মনেও সেই ধ্বসে পড়ার অবস্থাটা এসেছে।

জোন অফিসার—অন্য কর্তারা শুনেছেন ব্যাপারটা। হরিশ পাল এবং অন্যান্যরা ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু গোপন থাকেনি, মিঃ রায় জানতে পেরে অবাক হন।

তাদের পুনর্বাসন পদ্ধতির উপরই দোষ আসবে, তাঁরাও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তাছাড়া প্রতিটি পরিবারকে পুনর্বাসন করানোর জন্য প্রচুর টাকা খরচা হয়েছে, ওরা চলে গেল সবটাই অপচয় বলেই ধরা হবে। তাছাড়া মানবিক কারণও আছে।

তাই মিঃ রায় হেডকোয়ার্টারে জরুরী ওয়ারলেস ম্যাসেজ পাঠিয়েছেন সব কথা জানিয়ে। নিজেও ছুটে যান সেই বনের মধ্যেকার গ্রামগুলোয়। অবাক হন দেখে।

এর মধ্যে বেশ কিছু ভিতরের গ্রাম বসতের ঘরগুলো শূন্য, টিন কাঠ, দরজা নেই। মাঠে ফসলও নেই। মরা মকাইগাছ দুচারটে অবহেলায় পড়ে আছে।

বেশ কয়েক ঘর লোক পালিয়েছে।

অন্য যারা পড়ে আছে তাদের মানসিক অবস্থাও শোচনীয়। তারা বলে, —কিসের ভরসায় থাকুম এহানে? সক্কলেই চলি যাতিছে।

মিঃ রায় বলেন—আপনারা যাবেন না। কষ্ট হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে জানি। জল এখনও আসেনি। তবু বলবো একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। দিন বদলাবে। এ জমির চেহারাও বদলাবে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন মিঃ রায়। কোরাপুটের সদর দপ্তর থেকেও লোক এসেছে। তারা হাটতলায় জনতার সামনে জানান,

—আপনারা যাবেন না। বাংলায় পুনর্বাসনের কোন এমন পরিকলল্পনার কথা আমরা জানি না। এখান থেকে চলে গেলে সরকার আপনাদের আর কোন দায়িত্ব নেবেন না।

অন্য সময় ওরা প্রশ্ন করতো। প্রতিবাদ করতো। এর আগেও ওরা দাবী জানিয়েছে। অনেক দাবী। কিন্তু এখন ওই জনতা স্তব্ধ হয়ে শোনে।

শশীপদ বলে—ওরা চলে যাচ্ছে তাদের কি হবে?

কে জানায়—তাদের আমরা বাধা দেব। সরকারের এতটাকা জলে দিয়ে তারা চলে যাবেন এ হতে পারে না।

তাই আপনাদেরও বলছি এমন ভুল করবেন না।

কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাদের লেনদেন হয়ে যাচ্ছে। ট্রাকও আসছে। গ্রামের লোকজন রাতের অন্ধকারে পালাচ্ছে।

নিশিকান্ত-শরৎ দাস-রামানুজরা ভাবনায় পড়েছে।

কেতকী এতদিনে এ মাটিকে ভালোবেসে ছিল, এখানে তার জীবনে এসেছে অনেক আশার সুর। বিয়ে হয়েছিল এখানে, এখানের এই মরা মাটিতে এসেছে তার খোকন।

উঠানের একদিকে দুটো আম-কাঁঠালের গাছ লাগিয়েছিল কেতকী। চাঁপা গাছ এনেছিল গিরিজা পাপড়াহাণ্ডির মন্দির থেকে। ডালটা মাথা তুলেছে। উঠানের তুলসী মঞ্চে গাছটা সবুজ হয়ে রয়েছে। উঠানটা তকতকে করে নিকানো।

উঠানে খোকন এখন হামাগুড়ি দিয়ে ঘোরাফেরা করে, গোয়ালে জার্সি গাইটার বাচ্চা হয়েছে। সুন্দর বাছুরের দিকে নজর খোকনের।

কেতকীর এদের নিয়ে সংসার। কিন্তু ভুজঙ্গ মারা যাবার পর থেকেই বদলে গেছে এই পরিবেশ। সারা বাড়িটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। নিশিকান্ত বলে,

—আর থাকুম না এহানে!

চমকে ওঠে কেতকী—কনে যামু বাবা!

আজ তার ঘর—সন্তান সবকিছু নিয়ে বাঁচতে চায় কেতকী। তার মনে পাবার স্বপ্ন কিন্তু নিশিকান্তের জীবনে শুধু হারাবার পালা। কেতকী এর আগে দেখেছে সেই পথের জীবনকে। কোন আশ্বাস নেই।

আজ সব হারিয়ে আবার পথে নামতে পারে না সে।

—বাবা! কেতকী কি বলতে চায়।

নিশিকান্ত বলে—না মা। ই মাটি আমার সব নেছে। ভুজঙ্গেরে নেছে আর থাকুম না এখানে। গিরিজারে কইছি।

গিরিজাও ভেবেছে কথাটা। এত পরিশ্রমে এসব গড়েছিল সে। এককথায় ছেড়ে চলে যেতে হবে এটা ভাবেনি। কষ্ট আছে, তবু আশা হারায়নি সে।

গিরিজাও জানে কেতকীর বেদনাটা।

তাই বলে সে—বাবা! কথাটা ভেবে দ্যাখো।

নিশিকান্ত বলে—শরৎ-রামানুজ চলি যাবে। কাদের ভরসায় থাকুম! থাকতি হয় তুই থাক বৌরে নিই। আমারে যাতি দে গিরিজা। এ মাটিতে থাকতি ক'সনা!

বৃদ্ধের দুচোখ বেয়ে জল নামে।

সাত নম্বরের ভূষণ মণ্ডল বলে—আমি যামু না।

সে পরিশ্রমী লোক। এর মধ্যে নিজের জমিতে ভালো চাষ করেছে। মকাই-এর ক্ষেতে এসেছে প্রচুর ফসল। ক্ষেতের বাইরে মাচা করে থাকে সে। এবার ফসল উঠলে সে নিজে পাম্পসেট কিনবে।

কালু-পটলদের দল এখন খুবই সক্রিয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। ট্রাক আসছে শহর থেকে, যেন এখানের অধিবাসীদের এই বিপদে উদ্ধার করার ব্রত নিয়েছে তারা।

হরিশ পালের নজর ওই ভূধরের জমির উপরই।

কিন্তু ভূধর গেড়ে বসতে চায়। হরিশ পাল এসেছে রাতের অন্ধকারে। টাকা দিতে চায়। কিন্তু ভূধরের এক কথা,

—যে যায় যাক। আমরা যামু না।

কালু শোনায়—কাজটা ভালো করছ না ভূধর কাকা! একা পড়ে থাকবা, যদি কেউ হামলা করে?

হাসে ভূধর—করুক। পথে আর মরতি পারুম না।

হরিশ চুপ করে যায়। এসব ব্যাপারে সে মুখে জোর করে না। বেশ বুঝেছে ন'নম্বর ভিলেজের ভূধরই তার দলের কিছু লোককে সাহস জোগাচ্ছে।

হরিশ সরে এল।

আজ নিশিকান্ত তার বসতির অনেকেই মনস্থির করে ফেলেছে। হরিশ পালও এসে পড়ে এই সময়।

বলে সে—টাকা যা লাগে লন নিশিবাবু। আপনাগোর বিপদের সময় নায্য দামই দিমু। আর ট্রাকও দেব—সিধে পথে আপনাদের ভিজিয়ানা গ্রামে পৌঁছে দেবে, সেখান থেকে সোজা কলকাতা চলে যাবেন।

কেতকীর চোখ দিয়ে জল নামে।

—বাবা!

কেতকীর চোখের সামনে টাকাগুলো নিচ্ছে নিশিকান্ত হাত পেতে। গিরিজা বাধা দিতে পারে না। বুড়া মানুষটাকে সে ফেলতে পারবে না। কেতকীর সব আশা, স্বপ্ন, ঘর বাঁধার আনন্দ, তার খোকনের ভবিষ্যৎ সব যেন ওই ক'টা টাকার বিনিময়ে ওরা বিক্রী করে দিল আজ।

গোয়াল থেকে জারসী গাই-বাছুর, বলদগুলোকে টেনে নিয়ে চলেছে তারা। কিসের শব্দ শুনে চাইল কেতকী।

ঘরের মাথার উপরের টিনটা খুলে ফেলেছে ওরা। তারা ভরা মুক্ত আকাশ দেখা যায়। আর ঘরের আশ্রয় রইল না তাদের। সব হারিয়ে গেল।

অসহায় কান্নায় দুচোখ ছেয়ে আসে কেতকীর।

গিরিজা স্তব্ধ হয়ে গেছে। মালপত্র সব গোছগাছ হয়ে গেছে, ট্রাক-এ উঠছে তারা। হঠাৎ নিশিকান্ত কি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কেতকী খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাইল ঘরের দিকে। ঘরটা শূন্য, উঠানে দাঁড়িয়ে আছে নীরব সাক্ষীর মত ওর নিজের হাতে লাগানো গাছগুলো, তুলসীমঞ্চের গাছটা যেন কি বেদনার পুঞ্জ হয়ে উঠেছে।

বের হয়ে এল ওরা।

স্তব্ধ রাত্রি, বনপাহাড়ের মাথায় তারা জ্বলছে—কানে আসে বাতাসের হাহাকার। বসতের কিছু ঘরবাড়ি পড়ে আছে যেন পরিত্যক্ত পুরী। ছায়ামূর্তির মত কিছু লোক টিন-কাঠগুলো খুলছে।

ট্রাকটা বের হয়ে এল। মানুষগুলো কি বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

দুদিকে গভীর গহন বন। ট্রাকটা চলেছে বনের পথে। দূরে কোথায় দু'একটা আলোর বিন্দু দেখা যায়। এরপর পাহাড় শুরু।

ট্রাকটা থেমে গেল। আরও দুটো ট্রাক আসছে ওদিক থেকে। এদের দেখে দাঁড়িয়েছে, ওরা বলে-—দণ্ডকারণ্য অথরিটি পুলিশকে খবর দিয়েছে। ওদিকের পথ বন্ধ করেছে পুলিশ। যাওয়া যাবে না।

চমকে ওঠে এরা।

পথ বন্ধ! কৃপাসিন্ধু গর্জে ওঠে—আমাগোর আটকে মারবে নাকি?

নিশিকান্ত অসহায় কণ্ঠে বলে—ওদিকের ঘরবাড়ি-গরু বাছুরও বেচি দিলাম! খাবারও নাই—যামু কই! এইখানেই মরতি হবে?

পুলিশের নাম শুনে ঘাবড়ে গেছে এরা।

কালু বলে—রায়পুরের পথে চল।

বাধা দেয় ড্রাইভার—সে পথও কাল থেকে বন্ধ। দুদিকের পথই বন্ধ। যাবার উপায় নেই। ড্রাইভার বলে।

—একটা পথখোলা আছে। তবে গভীর বনপাহাড়ের পথ। জেপুর হয়ে গেছে বিশাখাপত্তনমের দিকে। সে পথে কেউ যেতে ভরসা করে না।

গিরিজা বলে—যাওয়া যায়?

ড্রাইভার শোনায়—দু'একবার গেছি। নদীতে জল না থাকলে যেতে পারবেন। নাহলে পাহাড়ী নদী, বান নামলে দেরী হতে পারে। পথও প্রায় দেড়শো মাইল।

ভাবছে ওরা। আজ সামনের সব পথই বন্ধ।

বের হতেই হবে তাদের। নিশিকান্ত-শরৎরা ঘাবড়ে গেছে। কালুও বিপদে পড়েছে। ভেবেছিল পৌছে দিয়ে সে ফিরবে হরিশ পালের ওখানে। পটলাও কি ভাবছে।

গিরিজা বলে—তাই চলো ড্রাইভারজী। ওই পাহাড়ী পথেই চলো।

রাতের অন্ধকারে পথের হদিশ ঠিক জানতো না।

ক্লান্ত মানুষগুলোর চোখে ঘুম নেমেছে, এবার জেপুর শহরের বাইরে দিয়ে ট্রাকগুলো অন্যপথে চলেছে। এবার ট্রাকের চালও বদলেছে, গতিবেগও কমেছে। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত মানুষগুলোর মাথায় ঠোকা লাগে—যেন ছিট্‌কে পড়বে। নেহাৎ ট্রাকের ডালাট বন্ধ কবা আছে তাই রক্ষে!

সকাল হয়েছে।

দণ্ডকারণ্যের এই রূপের সাথে তারা পবিচিত নয়। ওরা এসেছিল মানুষের তৈরী করা প্রশস্ত পিচঢালা পথে। তবু শহর-গঞ্জ-বসত কিছু দেখেছে।

কিন্তু এদিকে এখনও রয়ে গেছে সেই আদিম অরণ্য আর ঘন বনে ঢাকা পর্বত। বিশাল শালগাছগুলো তিরের মত ঠেলে উঠেছে, তাদের নিম্নভূমিতে ঘন লতার আবেষ্টনী। ময়াল সাপের মত পেঁচিয়ে উঠেছে লতাগুলো। নীচে রোদের ছায়াও ঠিকমতো পড়েনা।

গভীর অরণ্য আর পাহাড়ের বুক চিরে পথটা উঠে গেছে, নীচে দেখা যায় নদীর রেখা। পাথরগুলো উঠে আছে—পাথরের গা দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণ জলধারা।

ড্রাইভার বলে—বহুৎ খতবনক্ রাস্তা।

ইঞ্জিনটা গর্জন করছে। বনে পাহাড়ে সেই শব্দটা ছড়িয়ে পড়ে।

এতক্ষণ খেয়াল করেনি তারা। কখন আকাশ ছেয়ে যেন মেঘ জমেছে, এখানের পাহাড়ে মেঘের আনাগোনা। সমুদ্র থেকে মেঘের দল উঠে এসে পূর্ব ঘাট পাহাড়ের চূড়ায় আটকে যায়—এদের বেড়া টপকে দণ্ডকারণ্য অধিত্যকায সামান্য মেঘেই পৌঁছায়, তাই সবসময় বৃষ্টি হয় না এখানে।

পাহাড়ের মাথায় মেঘের দল ঘিরে এসেছে। হঠাৎ বৃষ্টি নামে।

খোলা ট্রাক—দুখানা, মাথার উপর কোন ছাদন নেই। বৃষ্টি নেমেছে। ড্রাইভারটা ট্রাক নিয়ে চলেছে ওই বৃষ্টির মধ্যেই।

কেতকী ছেলেটাকে একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে রেখেছে, ওদিকে ভিজছে মানুষগুলো। ট্রাকের গতিও কমে এসেছে। পাহাড়ী চড়াই—বৃষ্টির জলে ওই আঁধকাচা পথও পিছল হয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে চাকা পিছলে যেতে পারে, আর তেমন কিছু ঘটলে ট্রাকটা গোটা কয়েক পাল্‌টি খেয়ে গিয়ে পড়বে একেবাবে নীচের নদীর খাতে।

বৃষ্টির ধাবাস্নানে বনপাহাড় রাজ্য যেন সাদা অস্বচ্ছ যবনিকায় ঢেকে গেছে।

কোনরকমে এসে ওরা নামল নদীর কাছে। ড্রাইভার জানে এ পথের ব্যাপাব। নদী পার হতে না পারলে ঢল নামবে, ঘণ্টা কয়েক পাব হবার উপায় থাকবে না। একটা কজওয়েব মত আছে।

পাহাড়ী নদীতে এর মধ্যেই ঢল নেমেছে। গাঢ় লাল কাদা রং-এর জল প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। পার হবার উপায় নেই।

ওরাও নেমেছে। সামনে দেখছে ছোট নদীর প্রলয়ঙ্কর মূর্তি। বৃষ্টি থেমেছে। ভিজে গেছে লোকগুলো। হিম হিম লাগে। ড্রাইভার বলে,

—বহুৎ মুশকিল হয়ে গেল বাবুজী! ঘণ্টা চার তো লাগবেই! তার আগে নদী পার হওয়া যাবে না।

চমকে ওঠে এরা।

দণ্ডকারণ্য যেন তাদেব প্রহরীর মত ঘিরে রেখেছে, এই মৃত্যুফাঁদ থেকে তাদের কোনমতেই বের হতে দেবে না। যে ভাবে হোক তাদের দল পিয়ে শেষ করে তবে এই আদিম অরণ্যভূমি তৃপ্ত হবে।

গিবিজা বলে—ততক্ষণ নেমে খাওয়া দাওয়া কইরা লও।

ড্রাইভার বলে—সেই ভালো! এর পরও পথ ভালো না। বেশী রাত হলে পথে কোন আদিবাসী বস্তির ধারে রাত কাটিয়ে দিতে হবে। গাড়ি চালানো যাবে না।

রামানুজ বলে—না! সিধে যেতে হবে ড্রাইভারজী। আদিবাসী বস্তির ধারে থাকা চলবে না।

কে অনুনয় করে—যেভাবে হোক রাতের বেলাতেই ওয়ালটেয়ারে পৌঁছে দাও সাহেব, রাতের গাড়িতেই কলকাতা চলে যাবো। এহানে আর থাকুম না।

ওরা যেন নদীর ধারে আটকে পড়ে বিপদে পড়েছে। কে জানে এখানেও যদি পুলিশ এসে পড়ে—তাদের বিপদ হবে। কোনমতে সময়টুকু কাটাতে পারলে বাঁচে।

মুড়ি-চিড়ে গুড়ই সম্বল। আর মকাই-এর ছাতু।

এসব খেতে অভ্যস্ত ছিল না এরা। কিন্তু পেট বড় বালাই। ক'বছর বাংলার বাইরে এসে আর রেশন-ডোল-এর দৌলতে এইসব খাদ্যেই তাদের অভ্যস্ত হতে হয়েছে।

নদীর তুফান কমে আসছে।

ড্রাইভার এর মধ্যে দু'একবার জল দেখে এসে বলে,

—আমাদের নসীব ভালো। উপরের পাহাড়ের বারিষ তেমন জোর হয়নি। পানি কম্‌তি হয়ে আসছে।

বরাত! তাদের বরাত যে কোনদিন ভালো হবে তা জানে না তারা। তবু বৈকাল নাগাদ নদী পার হয়ে তারা এগিয়ে চলেছে আবার পাহাড়ের বুক চিরে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা বৃথাই কেটে গেল তাদের।

এখনও অনেক পথ বাকী।

বৃষ্টির জল গায়ে গায়েই শুকিয়েছে' কেতকী বাচ্চাটাকে ওই চিঁড়েই একটু দিয়েছে। খিদে পেয়েছে বেচারার। কাঁদছে সে। আরও দু'একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ ওঠে। মানুষগুলো চুপ করে গেছে।

ইঞ্জিনের শব্দটা বনে পাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

কেতকীর মনে পড়ে এমনি সন্ধ্যায় সে প্রদীপ জ্বালাত তুলসীতলায়, শাঁখ বাজাত—সন্ধ্যার ছায়া ঘনায় বসতিতে; আজ সেই ঘর—তুলসীমঞ্চ তার হারিয়ে গেছে। শূন্য ভিটেতে আজ প্রদীপও জ্বলবে না—ক'দিনের রুক্ষতায় তুলসীগাছটাও শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাবে।

পড়ে আছে তার লক্ষ্মীর ঘটও,.....আজ সব হারিয়ে গেল!

কান্না অসে বুক ঠেলে। গিরিজা চাইল ওর দিকে।

—বৌ! কান্দ ক্যান্?

কেতকী এই কান্নার কারণটা জানাতে পারে না। গুমরে ওঠে ওর বুক।

রাতের অন্ধকারে কতক্ষণ এসেছিল জানে না। হেডলাইট জ্বেলে ট্রাকটা নামছে এবার পাহাড়ের ঘুর পথ বেয়ে। দূরে দিগন্তে দেখা যায় আলোর আভা।

ড্রাইভার বলে—বিশাখাপত্তনম্ নজদিক এসে গেল। উধার।

....খবরটা রায়পুরের কাছাকাছি মান'কুরুদ ক্যাম্পেও পৌঁছে গেছে। পৌঁছে গেছে অনেক খবর অতিরঞ্জিত হয়েই। দলে দলে উদ্বাস্তুরা আসছে ট্রাকে, দণ্ডকারণ্যের প্রধান পথ বন্ধ। অনেকেই গভীর বনের ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে, গরুব গাড়ীতে আসছে তমসা নদীর ধারে। রামায়ণের সেই তমসা নদী আজও বয়ে চলেছে দণ্ডকারণ্যের বুক চিরে। এখানে বেশ বড়ই। রাতের অন্ধকারে উদ্বাস্তুরা' আসছে তাদের জিনিযপত্র যা পেরেছে তাই নিয়ে।

নৌকায় নদী পার হতে এক টাকা—দু'টাকাই হাঁকছে ওরা। তাই দিয়েই নদীর এপারে মধ্যপ্রদেশের কোটার বন অঞ্চলে এসে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে চলেছে কোটা শহরের দিকে। ট্রাক দু'একটা মিলছে অনেক কষ্টে। সেখান থেকে জগদলপুর পুরো একশো মাইল।

জগদলপুর থেকে রায়পুর প্রায় একশো সত্তর মাইল। খাওয়া দাওয়া নেই—অস্নাত অভুক্ত মানুষগুলো এসে রায়পুর স্টেশনে জমছে, চলে যাবে এখান থেকে।

যমুনা-সুরভি বেশ কিছুদিন আগে এসেছিল শহরে কি নেশার ঘোরে। চাকরী পাবে তারা—শহরে ভালোভাবে বাঁচতে পারবে এই আশা করেই এসেছিল।

সুরভি যমুনার ভুল ভেঙেছে।

চৈত সিং এখন বিরাট রহিস আদমী। শহরের বুকে বিরাট হোটেল করেছে। আর তার নিজের ট্রান্সপোর্ট-এর ব্যবসাও রম রম চলছে।

সুরভি, যমুনাকে সেদিন ওই ঘরে রেখেছিল ওর লোকজন। খাবারও দিয়েছে মাত্র রুটি আর টিন্ডার সব্জী।

...সুরভি বলে—সিংজী কোথায়?

লোকটা চুপ করে থাকে। খাবার দিয়ে চলে গেল।

যমুনা কি ভাবছে। বলে সে—ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে সুরভি।

সন্ধ্যার পর চৈত সিং তার হোটেলের চেম্বারে বসে হিসাবপত্র দেখছে। এসময়টা তার কাছে কেউ আসে না। হিসেব অবশ্য গোপনীয় ব্যাপারই তার কাছে।

হঠাৎ দুজনকে ঢুকতে দেখে চাইল সিংজী।

সুরভি, যমুনার চেহারায় এসেছে মালিন্য। তার তুলনায় সেই ধাবা মালিক চৈত সিং অনেক উপরে উঠেছে। পরণে দামী সফরী স্যুট,

সুরভি বলে—বাঃ খাসা আছো সিংজী।

চৈত সিং দেখছে ওকে। সুরভি বলে—আর আমাগোর নজরে ধরে না দেহি? এখন তো পথের ধাবা থনে খাসা হোটেল বানাইছ? তা সুধাকান্তবাবু কখন আইবেন?

চৈত সিং দেখছে ওদের। এই কার্পেট পাতা চেম্বার—এই গদি মোড়া চেয়ার—এয়ার কুলার বসানো চেম্বারে ওদের বেমানান বোধ হয়। সেদিনের চৈত সিং-এর ওদের মত সস্তা মেয়েদের দরকার ছিল, এখন আর নেই। সুরভি-যমুনা এর মধ্যে চেয়ারে বসেছে।

চৈত সিং চটে ওঠে। সুরভি বলে,

—এসেছি কাজ কাম কিছু দিতি হবে। সুধাকান্তদা কইছে—

চৈত সিং বেশ বুঝেছে ওদের ছেড়ে রাখলে এখানেও আসবে। বিরক্ত করবে তাকে। তার ব্যবসার ক্ষতিও হতে পারে। তাই ওদের মত অতীতের প্রাণীদের নিয়ে কি করতে হবে সেটাও ভেবে ঠিক করে নেয়।

চৈত সিং বলে—ঠিক্ বাত। নোকরী দেগা।

সুরভী খুশীভরে বলে...খাসা লোক তুমি মাইরী, তা একটু আসল বিলাতী খাওয়াবা না? তহন তো দিশিই দিছ। নীচে তো দেখছি ফোয়ারা চালাইছ।

চৈত সিং ঘণ্টা বাজিয়েছে। তার বিশ্বস্ত বাহন সদাশিব ঘরে ঢুকে ওদের দেখে একটু অবাক হয়। চৈত সিং বলে,

—এদের তিন নম্বরে ভেজে দে। ওখানেই থাকবে ওরা।

সুরভি বলে—একটা বোতল দিবে কইলা।

চৈত সিং ওদের কথায় কান দেয় না। সদাশিবকে কঠিন স্বরে বলে—লে যাও!

সদাশিব দু'হাত দিয়ে যমুনা-সুরভিকে ধরে বলে—চলো জী!

শক্ত লোহার সাঁড়াশীর মত দুটো হাত ধরেছে ওদের দুজনকে।

সুরভি কি বলার চেষ্টা করে। ধমকে ওঠে সদাশিব—চলো!

সুরভি যমুনাকে নিয়ে এসেছিল সেদিন শহরের ওদিকের একটা বিরাট ভাঙ্গা বাড়িতে। একদিকের ঘরগুলোয় বেশ কিছু মেয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের মেয়ে এনে জমা করেছে ওরা এখানে। তবে বেশীরভাগ মেয়েই এককালে বাঙ্গালী ছিল। এদের অধিকাংশই এসেছে ওই ঘর হারানোদের ভিড় থেকে।

সুরভি অবাক হয়—এ কোথায় আনছে যমুনা?

যমুনা দেখছে মেয়েদের। একজন বলে—কোথায় এসেছে বুঝতে পারে নি এখনও? নোতুন মনে হয়? পরে বুঝবে।

ক্রমশঃ বুঝেছে সুরভি।

এ যেন এক নরকপুরীর জীবন। এখানের সব ভার যার উপর সেই মেয়েটাও যেমন মোটা তেমনি নিষ্ঠুর। সন্ধ্যার পর থেকেই খদ্দেরপত্র আসতে শুরু হয়। মদের বোতল—আর সস্তা খাবার আসে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে। ক্লান্ত পশুগুলো যখন ফিরে যায় তখন এদের অবস্থাও তেমনি। সুরভি শিউরে ওঠে! যমুনাকে বলে সে—পালাতে হবে।

কিন্তু কোথায় যাবে জানে না। সেই বনবসতের গ্রামেও ফেরার পথ আর নেই। কালুর স্বপ্নও যমুনার মন থেকে মুছে গেছে কি বেদনার গ্লানিতে। সে ভুলই করেছিল।

এই নিষ্ঠুর শহরের অন্ধকারের কদর্য এই রূপটাকে চিনত না। আজ তাই পালাবার কথাই ভাবছে।

সেদিন খবরটা শুনেছে তারা। দণ্ডকারণ্য থেকে রিফুইজীরা অনেকে ফিরে আসছে, তারা ফিরে যাচ্ছে বাংলাদেশে। সেখানে নাকি কিছু লোকদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে,

খবরটা আনে রেলের খালাসী মথুর দুবে। লোকটা এমনিতে ভালোমানুষই। তবে মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় এখানে আসে। আর ইদানীং সুরভিকে একটু প্যায়ার করে। মথুর দুবে বলে।

—প্লাটফর্ম ভর গিয়া! উলোক সব ভাগ্‌কে আতা হ্যায়। কিসি তরসে ট্রেন পাকড় ওয়াপস্ যাতা হ্যায়।

মতলবটা তখনই করেছিল সুরভি।

পালাতেই হবে এই নরক থেকে। চৈত সিং—সুধাকান্ত কেউ আর আসেনি। হাতে পয়সাও নেই। তাই সুরভি সেদিন দুবেজীকে বেশ যুৎ করে মদ গিলিয়েছে প্যার করে, লোকটা সবে মাইনে পেয়েছে, আর দুবেজীর সুদের কারবারও চলে অপিসে। সেই মাইনের দিন তার রোজগার ভালোই হয়। দুবেজী টাকার বাণ্ডিলটা কোমরে পেঁজিয়াতে বেঁধে এনেছিল। খুচরো টাকা কিছু ছিল মাত্র বাইরে।

কিন্তু সুরভি একটা আদর করার ছলে ওর কোমরের টাকাটার সন্ধান পেয়ে হঠাৎ যেন বেশীমাত্রায় ভালোবেসে ফেলে আজ লোকটাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেহুঁশ হয়ে আসে দুবেজী মদের নেশায়, সেই ফাঁকে সুরভি মাল পুরো সাফ্ করেছে! যমুনাও তৈরী ছিল। দুজনে সেই অন্ধকারে দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়ে।

যমুনার ভয় হয়। সুরভিই ওকে টেনে আনে রাস্তায়। তখন লোক চলাচল কমছে। সামনেই একটা স্কুটার ট্যাক্সি দেখে তাতেই উঠে বলে,

—স্টেশন চলো।

যমুনা অবাক হয়—কই যাবি?

সুরভি চাপা স্বরে বলে—চুপ কইরা থাক।

স্টেশনে নেমে ওরা এগিয়ে যায় প্লাটফর্মের দিকে। থমকে দাঁড়ালো সুরভি। ওদিকে প্লাটফর্ম শেডে বসে আছে বেশ কিছু উদ্বাস্তু। । ওদের দূর থেকে দেখেই চেনা যায়। উস্কো-খুস্কো চেহারা। ছেলেমেয়েগুলোর মুখ চোখ বিবর্ণ। ময়লা জামা কাপড়, জিনিষপত্র বলতে চটের বস্তায় পোরা কিছু ছেঁড়া কাঁথা, টিনের কৌটা—এনামেলের থালাবাটি—কালিপড়া ভাতের হাঁড়ি।

একটা নিদারুণ অভিশাপ নিয়ে ওরা ঘরছাড়া হয়ে দূর প্রবাসের রুক্ষ মাটিতে আশ্রয় খুঁজতে এসে ব্যর্থ হয়েছে। হতাশ হয়েছে। মুখ চোখে ফুটে উঠেছে সেই হাতাশার গ্লানি।

সুরভি দূর থেকে দেখছে ওই জনতাকে। ওর মাঝে হয়তো তার বাবা মা-রাও থাকতে পারে। আজ তাদের কালোমুখ দেখাবার সাহসও নেই। তবু মনে হয় জীবনের যে কঠিনতম বেদনার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে তারা সেখানে দেহ বেসাতির দৈন্যও খুব বড় নয়, তার চেয়ে আরও বেদনাময় পরিবেশের মধে পড়ে থেকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে তারা।

এখানে ওই পাপকেও মেনে নিতে হয়তো বাধ্য হবে তারা। তবু সুরভি আজ সেই মানুষগুলোকে বাঁচাতে পারবে। সঙ্গে তার বেশ কিছু টাকা আছে। যমুনাও কোন শেঠজীকে ওই ভাবে বেহাল করে ভালো টাকা আর হীরের আংটি—গলার মফচেন হারও এনেছে।

না! ভিড়ের মধ্যে তাদের চেনা কেউ নেই।

পুলিশ ঘিরে রেখেছে তাদের। ওই মানুষগুলোকে ট্রেনে উঠে চলে যেতে দেবে না। ওদের আবার ফিরে যেতে হবে সেই সব বসতে।

সরে এল যমুনা।

সুরভি দেখছে ওদের। হঠাৎ প্লাটফর্মে সাড়া জাগে—একটা তীব্র আলোর ঝলক এগিয়ে আসে। গুম গুম শব্দে ষ্টেশন কাঁপিয়ে ঢুকছে ট্রেনটা। কলকাতা যাবাব ট্রেন! এর মধ্যে বেশ কিছু লোক মরীয়া হয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছে। পুলিশও বাধা দেবার চেষ্টা কবে। ওরাও মানবে না। ধস্তাধস্তি চলছে।

এই ফাঁকে সুরভি যমুনাও ওদিকের একটা কমপার্টমেন্টে উঠে পড়েছে। মেয়েদের কামরা। আর ওদেব সাজপোষকও একটু ভালো। ওই ছন্নছাড়া উদ্বাস্তুদের মত নয়। তাই পুলিশ—যাত্রীরাও কিছু বলে না। সুরভি আর যমুনা দুজনে ওদিকের বেঞ্চে সিট পেয়ে বসেছে।

ভয় হয় তাদের। যদি এর মধ্যে শেঠজী কিংবা দুবেজীর হুঁস ফেরে তাহলে বিপদ হতে পারে। ওদের লোকজন স্টেশনে এসে হানা দিতে পারে। দুজনের বুক কাঁপছে।

ওদের নিশ্চিন্ত করে বিকট শব্দে বাঁশী বাজে। ইঞ্জিনটা দু'একবার গর্জন করে এবার নড়ে ওঠে। গতিবেগ নিয়েছে ট্রেনখানা। রায়পুর স্টেশন ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। সুরভি যমুনাও নিশ্চিন্ত হয় এবার।

আর তাদের ওই নরকের প্রহরীরা খুঁজে পাবে না। ফিরছে তারা বাংলাদেশে। চেনা-জানা কেউ নেই। না থাক—অনিশ্চিত জীবনের মাঝেই হারিয়ে যাবে তারা বানে ভাসা খড়কুটোর মত। আর কোন অবস্থাতেই ভয় পায় না তারা।

মানুষের যখন অনেক কিছু থাকে তখন হারাবার ভয়টাও বেশী থাকে। পদে পদে হিসাব করে চলে সে। কিন্তু যখন কিছুই থাকে না তখন ভয়টাও থাকে না। বরং মরীযাই হয়ে ওঠে মানুষ। আজ সুরভি, যমুনাবা তাই মবীয়া হয়ে উঠেছে।

চাকার শব্দ তুলে রাতের আঁধার ফুঁড়ে ছুটে চলেছে ট্রেনটা বাংলাদেশের দিকে। অনেকদিন পব যেন মুক্তি পেয়েছে যমুনা, সুরভি। চোখ ছেয়ে তাই ঘুম নামে।

রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে। ওরা ওয়ালটেয়ার এসে পৌছালো। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন মানুষগুলো দেখছে শহরের ঝকঝকে পথ ঘাট। আলো জ্বলছে। মানুষ জন নেই।

ষ্টেশনে কিছু লোকজন রয়েছে।

গিরিজাই খবর আনে—কলকাতার ট্রেন আসতিছে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে।

ওরা জেগে ওঠে সবাই।

কালু-পটলাও রয়েছে। এ ট্রাক আর ফিরে যাবে না দণ্ডকারণ্যে। ওদের ভাবনা বাড়ে, এতদিন ছিল ওরা গ্রামবসতে. বাবার নামে বাড়ি জমি। এখন সেসব জমি-বাড়ি ছেড়ে জিনিযপত্র বিক্রী করে পালাচ্ছে তারা। কালুরাও সেখানেও অবাঞ্ছিত।

হরিশ পাল সাবধানী লোক। সে বলেছিল কথাটা। সুধাকান্তবাবুও এ বিষয়ে সাবধানী লোক। তারই চেনা ট্রাক। ড্রাইভারও বলে কথাটা ওদের।

স্টেশনের বাইরে থেকে ওরা মালপত্র নিয়ে ভিতরে আসছে সাবধানী চাহনি মেলে। গভীর রাত্রি। আর প্লাটফর্মেও ভিড় নেই। দু'একজন পুলিশ রুটিন ডিউটিতে ঘুরছে। এরা নিশ্চিত হয় এখানে তাদের পথ আটকাবার কেউ নেই। এ পথে উদ্বাস্তুরা যাতায়াত করে না।

নেহাৎ এসে পড়েছে তারা।

কালু-পটলা-নরেন ড্রাইভারের ডাকে চাইল। ড্রাইভার বলে,

—ওখানে আর ওয়াপস যাবে না কালুবাবু। সুধাবাবু বলেছেন। কভি মৎ যানা। যানে সে এ্যারেষ্ট হো যায়েগা! মুস্কিল হোগা।

সুধাকান্তবাবু খুবই সাবধানী লোক। ও চায় না কালুরা আর ফিরে আসুক এখানে। ওদের দিয়ে যা

করানোর তা করিয়েছে। এখন আর এখানে থাকলে পুলিশ বা জোন অফিস ওদের ছাড়বে না। পুলিশ হয়তো জেরার চোটে কিছু আসল খবর বের করে সুধাকান্তকেও বিপদে ফেলবে। তাই ড্রাইভারকেই কথাটা জানাতে বলেছিল ওদের।

—ক্যান যামু না? নরেন চটে উঠেছে।

ড্রাইভার বলে—গেলে মুস্কিল হবে। পুলিশ জানে তোমরাই ভুজঙ্গকে খুন করেছিলে। ওই তিরে তোমার হাতের ছাপ ভি রাখা আছে। এবার ওখানে গেলে সাবুদ পেয়ে যাবে। সুধাবাবু তাই যেতে নিষেধ করেছে।

চমকে ওঠে নরেন!

কালু-পটলও বিপদে পড়েছে। আজ তাদের মিথ্যা আশা দিয়ে ওরা কাজ করিয়ে নিয়েছে। হরিশ পালও এই সুযোগে গ্রামের সবকিছু সস্তায় জলের দরে কিনেছে। আজ এদের সেখানেও ঠাঁই নেই। ওদের বখরার পয়সাও আর দেবে না হরিশ পাল।

গর্জে ওঠে কালু—শালা বেইমান! নিজেদের সর্বনাশ করেছি ওগোর কথায়?

পটলা চুপ করে থাকে।

নরেন বলে—তার চেয়ে বাবা মায়ের সাথেই চল্ বাংলাদ্যাশেই যাই গিয়া!

পটলা তার ভুল বুঝতে পেরেছে। বলে সে—ওগোর চিনতি পারিনি!

আজ কালুর দলও হঠাৎ উদ্বাস্তু হয়ে গেছে, তাদের পায়ের নীচ থেকে কৌশলে সব মাটি সরিয়ে নিয়েছে ওই সুধাকান্ত আর হরিশ পালের দল। ওরা সেই পথের মানুষই রয়ে গেল। সারা মনে কি গ্লানি আসে। প্লাটফর্মে ওই ছিন্নমূল সর্বহারা মানুষগুলোর কাছে তারা অপরাধী। ওরা জানে না কি সর্বনাশ করেছে তাদেরই ভবিষ্যৎপুরুষ কালু-পটলার দল।

ওরা এতদিন ন্যায়-নীতি-বিবেক এসব জানতো না। পয়সার লোভে মদের নেশায় প্রতিষ্ঠার মোহে সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েছিল। কিন্তু আজকের দুঃসহ প্রতারণার গ্লানিতে জ্বলে জ্বলে তারা বুঝেছে যে এইসবগুলোকে অস্বীকাব করা যায় না।

কালু বলে—আর ভুল করুম না রে! যদি পায়ের নীচে মাটি পাই ওগোর ঘর বসতের জন্যি জান দিমু, আর ইমান বিকাই দিমু না।

ট্রেনটা আসছে।

ষ্টেশনের ঘুম ভেঙ্গেছে। অসহায় মানুষগুলো মালপত্র নিয়ে কোনরকমে ওঠবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু কেউ তাদের জন্য দরজা খুলতে রাজী নয়। পড়ে থাকবে তারা এখানে? গিরিজা চীৎকার করছে। কোন সাড়া নেই।

হঠাৎ কালু লাফ দিয়ে একটা দরজা গ'লে ভিতরে গিয়ে পথে রাখা মালপত্র সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলে দেয়। বলে সে,

—মাল তোলো!

যাত্রীদের কারা বাধা দেবার চেষ্টা করে। এবার ফেটে পড়ে কালু, পটলের দল। কালু বলে—চুপ কইরা থাকবেন। আমরা উঠুম। একটি কথা কইলে বিপদ হইব।

ওদের রুদ্রমূর্তির সামনে চুপ করে যায় যাত্রীরা। ওরা মালপত্র তুলে সকলেই উঠেছে—ট্রেনও ছেড়ে দেয় এবার। নিশিকান্ত বলে,

—উঠছে সকলেই। উঃ তরা না থাকলি কি হত কে জানে?

কালু দেখেছে সোজা কথায় তাদের কেউ কিছুই দেবে না। সবাই এড়াতে চাইবে তাদের, ঠকাবে। নিজেদের দাবী আদায় করার একটা নোতুন পথের খবর যেন তারা পেয়েছে।

এই ভাবেই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে তাদের। হয়তো ওই নিশিখুড়ো-শরৎ দাস-রামানুজের সেই পথটা পছন্দ হবে না, কিন্তু উপায় নেই।

কেতকীর ঘুম আসে না। একটা বস্তার উপর ছেলেটাকে নিয়ে বসেছে। বাইরে জমাট অন্ধকার ভেদ করে

কোন অজানার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে রাতের রেলগাড়ি। কোথায় যাবে জানে না সে—খোকন?

তার খোকনের জন্য কোথায় এতটুকু ঘরের আশ্রয় আছে কিনা জানে না কেতকী। বার বার মনে পড়ে তাদের ফেলে আসা সেই বাড়িটার কথা। এখন রাত্রি নিস্তব্ধ অন্ধকারে সেখানে তারার ফুলঝুরি ফোটে, রাতজাগা বনটিয়া জাগে। সেই বহুকষ্টের ঘরও তার হারিয়ে গেল।

কলকাতাতেও খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই এখানেও এই ছিন্নমূল সর্বহারা মানুষগুলোর জন্য দুঃখবোধ করে। কিছু মানুষ এগিয়ে আসে, এগিয়ে আসে কিছু প্রতিষ্ঠান। দু'একদিন আগে যারা এসেছে তাদের অনেকেই চলে গেছে হাসনাবাদ। সুন্দরবনে যাবার জন্য চেষ্টা করা হবে সেখান থেকে।

এবার আর কলকাতার জন্য—মোহ নেই; শহরের আশপাশে পড়ে থাকার—ভিক্ষাবৃত্তি করে অন্ন সংস্থানের চেষ্টা তাদের নেই। কলকাতা থেকে ওরা চলেছে সোজা সুন্দরবনের দিকে, তার প্রথম দরজা ওই হাসনাবাদের দিকে। দলবেঁধে তারা আসছে, আর চলে যাচ্ছে ওই দিকে।

ওদের এইভাবে দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে আসার খবরে তখন হৈ চৈ পড়ে গেছে। ওদিকের রাস্তায় কড়া নজর রাখা হচ্ছে যাতে দণ্ডকারণ্য থেকে তারা এভাবে চলে না আসে। রায়পুর—ভিজিয়ানাগ্রাম এই দুটো ষ্টেশন; একটা মধ্যপ্রদেশে অন্যটা এখন অন্ধ্রে। এই দুই ষ্টেশন দিয়ে রাস্তার যোগাযোগ আছে দণ্ডকারণ্যের সঙ্গে।

তাই ওই দুটো ষ্টেশনের উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। কিন্তু মরীয়া হয়ে উঠেছে কিছু উদ্বাস্তু। তারা এসব পথ ছেড়ে দণ্ডকারণ্যের দুর্গম বনপাহাড় ফুঁড়ে অনাহারে অনিদ্রায় ক্লিষ্ট দেহ নিয়ে চলে আসছে। উঠছে অন্য ষ্টেশন থেকে।

বর্ধমানে কিছু উদ্বাস্তুদের আটকানো হয়েছে। আরও অন্যত্র। কিন্তু তবু থামানো যায় না তাদের স্রোত। কি এক আশা নিয়ে তারা আসছে।

সকাল হয় জামসেদপুর ছাড়িয়ে। দেখা যায় ওপাশে নীল পাহাড়শ্রেণী, ছোট ছোট বিন্দুর মত বাড়িগুলো, সুরভির ঘুম আসেনি। যমুনা বলে—কোথায় যামু কলকাতায়? সুরভি বলে—ভাবছিস ক্যান? সেখানে দেখতে পাবি অনেককেই। ওগোর সাথেই যামু।

ট্রেনটা এসে থেমেছে খড়্গপুর ষ্টেশনে। বড় ষ্টেশন! ফেরিওয়ালাদের হাঁকে সরগরম হয়ে ওঠে ষ্টেশন। চা খেতে নেমেছে ওরা দুজনে, হঠাৎ ওদিকের কামরায় কলরব—চেঁচামেচি শুনে চাইল। পুলিশ টেনে টেনে নামাচ্ছে ওপাশের কামরার থেকে সেই উদ্বাস্তুদের। ওরা নামবে না—কাকুতি-মিনতি করছে কিন্তু কে কার কথা শোনে।

ওদের ছেঁড়া বস্তা—মালপত্র—হাঁড়ি-কুঁড়ি টেনে নামিয়েছে ষ্টেশনে। এই ট্রেনে যেতে দেবে না তাদের।

গাড়ি থেকে সুরভি, যমুনা নেমেছে। ঘণ্টা দিচ্ছে ছেড়ে যাবে এই গাড়ি। যমুনা বলে—যাবি না?

সুরভি ষ্টেশনে পড়ে থাকা ওই লোকগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। কাঁদছে অনেকে অসহায়ের মত। ওদের সামনে আজ কোন পথ নেই।

সুরভি দেখছে ওদের। ট্রেনটা বের হয়ে গেল। পড়ে থাকলো এরা।

দুপুরের নিঝুম ভাব নেমেছে প্লাটফর্মে।

দুএকজন পুলিশ এদিক ওদিক ঘুরছে। চাপচাপ বসে আছে লোকগুলো। ওদের কোথাও যাবার ঠাঁই নেই। তিনচারদিন পথে পথে কেটেছে। স্নান খাওয়া নেই। ছেলেমেয়েগুলো ঘেংড়ে কাঁদছে।

দু একমুঠো চিঁড়ে মুড়ি দিয়ে পেট ভরে না। কলের জলই খাচ্ছে। হঠাৎ বুড়ো চাইলো সুরভির দিকে। দুচারজন লোকও এগিয়ে আসে।

সুরভি শুধোয় —কোথা হতি আসছেন?

ওরা জানায় দণ্ডকারণ্যের কথা। বুড়ো বলে—যামু সুন্দরবন। ওখানে তবু বাঁচার চেষ্টা করুম!

দণ্ডকারণ্যে আর না! তয় পথেই আটকাইল—কে জানে সেহানে যাতি পারুম না এখানেই মরতি হবে!

ওদের মুখে কি বেদনার ছায়া নামে।

বুড়ো বলে—এহান থেকে বসিরহাট সিধা গাড়ির রাস্তাও আছে, কিন্তু যামু ক্যামনে! টাকা নাই আমাগোর!

পুলিশের লোকও নজর রেখেছে এদের উপর।

—ক্যা করতা ইধার?

হাসে সুরভি। মেয়েটার পরণে দামী শাড়ি। যমুনার পোষাকও বেশ দামী। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ।

সুরভি বলে—এত চটছো কাহে ইনস্‌পেকটর জী!

ইনস্‌পেকটর বলাতে খুশি হয়েছে সে। সুরভি বলে,

—এইসা পুছতাছ করছিলাম! আখবরেব লোক আমি।

আখবরের লোকজনদের একটু সমীহ করে তারা। তাই বলে কনষ্টেবল,

—নেহি, নেহি! এইসা বলছিলাম।

সুরভি বলে—এদের তো নজরবন্দী করে রেখেছো দেখছি, তা নজরবন্দী করলে খেতে দিতে হয় সেটার ব্যবস্থা কই?

বড় কঠিন প্রশ্ন। কনস্টেবল এসব জানে না। তাদের উপর হুকুম ছিল বিনা টিকিটের যাত্রী, এদের নামিয়ে দিতে ।

কনষ্টেবলটা এসব কতাবার্তা এড়াবার জন্যই সরে যায়। হাসছে সুরভি। বুড়ো সেই লোকটিকে বলে,

—সুন্দরবন আমিও যাবো। দেখছি যদি গাড়ি পাই। তোমরা তৈরী হয়ে থেকো। ট্রাক পেলে খবর দেব সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এসে গাড়িতে উঠবে। দেরী করলে ওরা গোলমাল করতে পারে।

আর তোমাদের কাউকে সঙ্গে দাও দেখি যদি ট্রাক পাই।

বুড়ো বনবিহারী মণ্ডল দেখছে মেয়েটিকে। ওর কথাবার্তায় দেশজ টান রয়েছে। আর তাদের পৌঁছে দেবার কথায় খুশী হয় সে। দেখছে কনষ্টেবলদেরও বেশ কথার তাড়ে সরিয়ে দিয়ে পথমুক্ত করেছে মেয়েদুটো।

বনবিহারী নিজেদের মধ্যে কি জরুরী পরামর্শ করে বলে—যেতে তো চাই মা, কিন্তু এত টাহা তো নাই। শ'খানেক দিতি পারি।

একটা ছেলে এরই মধ্যে ঘুরে এসেছে বাইরে থেকে। সে বলে,

—ট্রাক হাসনাবাদ যাতি তিনশো টাহা চায়।

সুরভি বলে—ঠিক আছে। তুমি এসো আমার সাথে। কত্তা —একশো আপনারা দেবেন. বাকী টাকা দিমু আমি।

ছেলেটিকে বলে —চলো। ট্রাকওয়ালার সাথে কথা পাকা করি লই। ট্রাক পেলে এসে খবর দেবে, চলে আসবেন।

...দুপুরের রোদ তখনও গায়ে পিঠে জ্বালা ধরায়।

কনেষ্টবল দুজন প্লাটফর্মের এদিকে রয়েছে। সুরভি যমুনাদের দেখে চাইল।

সুরভির হাতে দু তিনটে ইংরেজী ম্যাগাজিন। কনেষ্টবল দুজনকে ডেকে শুধোয়—কতদিন আছেন এখানে?

ওরা একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিতে। কারণ তার বাবা-মামাদের তদ্বিরে ওরা খড়্গপুরের ষ্টেশনের মত সোনার খনি এলাকাতে একনাগাড়ে দশ বারো বছর ধরে রয়েছে। দেশে ক্ষেতি-আটাচাকি-ট্রাক ভি কিনেছে। গোলাবাজারের ফড়েদের কাছে চড়া সুদে খাটছে বেশ কিছু টাকা। দিনে টাকায় দশ পয়সা সুদ. এ মধু ছেড়ে যেতে চায় না। একে আখবরের লোক—তায় মেয়েছেলে ওদের জেরার চোটে যেন কাবু হয়ে আসছে তারা।

ওদিকে দেখা যায় প্লাটফর্মের সেই আটকে পড়া উদ্বাস্তুর দল মোট ঘাট নিয়ে প্লাটফর্ম সাফ্ করে বাইরে গিয়ে ট্রাকে উঠেছে। সেই ছেলেটি দূর থেকে গ্রীণ সিগন্যাল দিতে সুরভি বলে—চায়ের দোকান কোথায়?

কনেষ্টবল দুজন সানন্দে তাদের বিদায় করার জন্য বলে—উধার।

সুরভি, যমুনা সরে গেল। এবার তারাও বের হয়ে এসে ওদিকের গাছের নীচে ট্রাকটায় গিয়ে উঠলো।

ট্রাকটা বের হয়ে আসে হাইওয়ের দিকে।

বনবিহারী দেখছে সুরভিকে। ওপাশে তার স্ত্রী অন্যান্য মেয়েরাও দেখেছে ওদের এলেম। ওই মেয়ে দুটি না এসে পড়লে তাদের অদৃষ্টে কি হতো কে জানে।

বনবিহারীর স্ত্রী কাদম্বিনী শুধোয়,

—কনে যাবা মা? কলকাতা?

চাইল যমুনা। ওদের বেশবাস এদের থেকে স্বতন্ত্র। আর টাকাও বেশ কিছু কৌশলে সরিয়ে এনেছে। কাদম্বিনী বলে।

—আমাগোর জন্যে খুব করছো মা! তোমরা লেখাপড়া জানা মাইয়া—বড় দয়ার শরীর। ভগবান তোমাগোর সুখে রাখবেন।

সুরভি অবাক হয়। মনে মনে ভাবছে সুরভি সেই ছবিটা। সত্যিই যদি লেখাপড়া জানতো, অমনি খবরের কাগজে চাকরী করতো এভাবে হয়তো তাদের জন্যে বোধ করতো না। আজ বরাত তাদেরও হতভাগ্য লোকগুলোর সঙ্গে বাঁধা। ওরা তা জানে না। সুরভি ঠিক সেটা জানাতে পারে না।

বলে সে—যামু আপনাগোর লগে হাসনাবাদই।

বুড়ি বলে—বড় দুঃখের জেবনডা মা। হেই সাত আট বছর ধরে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতই ঘুরছি, কোন্ পাপে তা জানি না। মরণডাও হয় না।

সুরভি যমুনার জীবনটা ওদের থেকেই করুণ বেদনায় বিবর্ণ। সেই নরকের বেদনাময় দিনগুলোর কথা ভোলেনি তারা। আজ মনে হয় সুরভির সেই শহরের মোহ তাদের ভেঙ্গেছে। নরকের জীবন থেকে বের হয়ে আজ নোতুন করে বাঁচতে চায়। সেই আশাতেই চলেছে সুন্দরবনের দিকে, তাদের বাবা মায়ের খোঁজে।

যমুনার মনে পড়ে কালুর কথা।

একদিন ভালোবেসেছিল তাকে সেই বিচিত্র নারী। ভালোবাসার সেই পবিত্র মনটিকে এতদিনের নরকের মধ্যেও সাবধানে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রেখেছে যমুনা। আজ সেই নরকের জীবন থেকে বের হয়েছে যেন তাকে খুঁজতে। আজ কালু কেমন আছে, কোথায় আছে জানে না। যমুনা তার দেখা পেলে তাকেও সেই অন্ধকারের পথ থেকে ফেরাবে, আবার ঘর বাঁধবে নোতুন করে এই নোতুন বসতে।

তাই আশাহত হাজারো নরনারী চলেছে তাদের স্বপ্নের ঘরের সন্ধানে এক অরণ্য থেকে অন্য অরণ্যে।

ট্রাকটা ছুটে চলেছে। ড্রাইভার ওর যাত্রা শেষ করতে চায় তাড়াতাড়ি। তাই পথের সংক্ষেপ করার জন্য বলে,

—বালিব্রিজ পার হোকে বি-টি-রোড পাকড় কর সোদপুর হো কর বারাসাতকা আগাড়ি যাকে বসিরহাটকা রোড পাকড়েগা।

পথের ফর্দ এদের দু'একজনের জানা।

কিশোর জানে সেই পথ। ওদের কলকাতায় ঢোকার দরকার নেই।

কিশোর বলে—তাই চল সর্দারজী।

সন্ধ্যা নামছে। ওদের ট্রাকটা বারাসাত ছাড়িয়ে চলেছে হাসনাবাদের দিকে। দুদিকে ছায়াসবুজ আম কাঁঠালের বাগান, সবুজ ধানক্ষেত, ঘর-বাড়ি—কত শান্তির নীড় বেঁধেছে কত মানুষ। আর এই হতভাগার দল সেই ছোট্ট ঘরের ঠিকানা খুঁজে ফিরছে দেশে-দেশান্তরে এক অরণ্য থেকে অন্য অরণ্যে।

এযেন এক অরণ্য! জনারণ্য!

চারিদিকে শুধু মাথা আর মাথা। ষ্টেশন-এর বাইরের মাঠ জলাভূমি এতদিন ধরে পড়েছিল। ওদিকে দূরে বয়ে চলেছে ইছামতী নদী। এই বিস্তীর্ণ জায়গাটা পড়েছিল, সেখানে এসে হাজির হয়েছে দণ্ডকারণ্য থেকে কয়েকহাজার পরিবার।

একটা ট্রেন বারাসাত থেকে যাতায়াত করে এই লাইনে—সেই সময় কিছু যাত্রী থাকে বাকী সময় নিঝঝুম পড়ে থাকে প্লাটফর্মটা, ওদিকে বয়ে চলেছে ইছামতী নদী। বনগাঁয়ের নীচে নদীটা ছোট্ট মনোরম। তারও নীচের দিকে এসে বসিরহাট হয়ে সুন্দরবনের দিকে গেছে, একটা শাখা গেছে কলাগাছিয়া নাম নিয়ে কালীনগর সন্দেশখালি হয়ে সুন্দরবনের দিকে আর এ নদীর প্রধান খাত কালিন্দী নাম নিয়ে হিঙ্গুলগঞ্জ হয়ে গিয়ে বাঘনার আগে রায়মঙ্গল নাম নিয়ে বাংলাদেশের গা ছুঁয়ে সুন্দরবনের ভিতর হয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

নীচে সুন্দরবনের দিকে এর রূপ ভয়াল—ছোট নদীটা সেখানে সমুদ্রের স্বাদ পেয়ে মেতে উঠেছে। নদী নয়—সমুদ্রের উত্তাল খাঁড়িই।

দুদিকে তার গহন বন।

সুন্দরবনের ভূ-প্রকৃতিই আলাদা।

এর চারিদিকে জল—কিন্তু সে জল এতটুকু মুখে দেওয়া যায় না। নোনা, আর চারিদিকে অসংখ্য নদী খাল ওই বনভূমিকে ছোট বড় দ্বীপে পরিণত করেছে। জোয়ারের সময় নোনাজল বেড়ে ওঠে, সেই দ্বীপের অধিকাংশ জমিই ডুবিয়ে দেয়। আবার জল নামে পড়ে থাকে থকথকে নোনা পলি। ওতে ফল-ফসল হয় না, হয় শুধু কেওড়া গরাণ গেঁও বাইন গাছ। আর মাটিতে জেগে ওঠে ওদের তীক্ষ্ণ নাসিক্যমূলগুলো। সে মাটিতে পা দেওয়া যায় না। পায়ে ওই শূলো ফোটে, হড়কে কেউ পড়ে গেলে তার অবস্থা হবে ভীষ্মের শরশয্যার মত।

হাসনাবাদে এসে পড়েছে হাজার হাজার পরিবার। ওই ফাঁকা মাঠে যা পেয়েছে তাই দিয়েই ঝুপড়ি বানিয়েছে। কেউ বানিয়েছে কাঠ কুটো, ছেঁড়া তাঁবু চট দিয়ে আশ্রয়। ওখানেই রয়েছে তারা।

মানুষ নামক কোন জানোয়ারের মত।

খাবার নেই—আশ্রয় নেই—ওদের দেখার কেউ নেই। কোন সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব নেই ওদের জন্য। কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক ওরা নয়, ওরা মানুষের খাতা থেকে বাতিল একটি শ্রেণী।

ছেলেমেয়েগুলো ঘোরে এখানে ওখানে, বাজারে—ষ্টেশনে গিয়ে ভিক্ষে করছে। গৃহস্থের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকে, যদি অসাবধানে কোন কিছু ফেলে রাখে তারা হাতাতেও দ্বিধা করবে না।

পুরুষ, মেয়েদেরও কোন কাজ নেই।

এখানে ওখানে বসে থাকে। যদি চাল জোটে বৈকালের দিকে হাট কুড়োনো আনাজপত্র সেই চালে মিশিয়ে ইট পেতে আগুন জ্বেলে সেদ্ধ করে। সেই তাদের আহার।

নিশিকান্ত, শরৎ দাস, রামানুজ-এর দল এসে যখন পৌছলো এখানে তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বারাসাত থেকে ট্রেনে আসছে তারা। ট্রেনটা গড়িয়ে গড়িয়ে এসে থামলো, নামছে বেশকিছু উদ্বাস্তুর দল।

প্লাটফর্মে আর ঠাঁই নেই । নিশিকান্ত বলে

—কোথায় থাকুম! এযে বিলকুল ভরে গেছে গিয়া।

ওরা ভাবছে। কেতকী —শরৎ-এর স্ত্রী ললিতা —রামানুজের গিন্নীরাও নামছে। বাচ্চাটা কাঁদছে। কেতকীর হুঁস হয় এবার।

এই নোংরা ঘিঞ্জি বসতি--থিক থিকে কাদা ময়লার মাঝে কোনমতে টিকে থাকতে হবে তাদের। সাতবছর আগে প্রথম যেদিন শিয়ালদহে নেমেছিল এত নোংরা দেখেনি।

তারপর গেছে এ ঘাট ও ঘাট ঘুরে মানায়। সাতবছরেও সেই যাযাবরের জীবন ফুরোয়নি। তবু দণ্ডকারণ্যের বনভূমির বসতে কিছুদিন একটু বাঁচার আশ্বাস পেয়েছিল। তাও সইল না। ছেলেটাও যেন

এই ঘৃণ্য যাযাবর জীবনের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে সোচ্চার কান্নায়। কেতকীর খেয়াল হয়। খাবারও পায়নি—দুধও নেই। ক্ষিধেয় তেষ্টায় ছেলেটা কাঁদছে।

—একটু জল দিতি পারো?

গিরিজা মালপত্র নামিয়ে এবার আশ্রয় খুঁজছে। আগে থেকে জায়গা দখল করতে না পারলে মুস্কিল হবে। শশীপদ বলে,

—নদীর ধারে দেখছি ফাঁকা আছে। শীগগীর চল গিয়া।

কালু-পটল-নরেনরাও বলে—তাই চল গিয়া।

কেতকী তাড়া দেয়—বাচ্চাটারে একটু জল দিবানি?

গিরিজা ক'দিনে যেন ক্ষেপে উঠেছে। এমন মেজাজ তার ছিল না। কিন্তু অসহ্য দুঃখ কষ্ট আর অনিশ্চয়তার মাঝে পড়ে আজ তার মাথার ঠিক নেই। গিরিজা ধমকে ওঠে—ছাই দে গিয়া ওরে।

চাইল কেতকী।

কালু শুনেছে কথাটা। বলে সে—তুমি যাও গিয়া মাল লই। আমি বাচ্চাটারে জল আনি দিই।

কালুই একটা পাত্র নিয়ে দৌড়লো জলের সন্ধানে।

এদের জন্য জলের বরাদ্দও নেই। খাদ্য তো দূরের কথা—জলও এখানে না থাকাই। প্লাটফর্মে একটা মাত্র কল এদিকে, আর ওমাথায় একটা কল। হাজার হাজার মানুষ সেখানে জলের জন্য লড়ছে।

কালু বলে—বাচ্চাটার জন্য একটু জল—

কে ফুঁসে ওঠে—বাচ্চা ক্যান হয় ওগোর? আপনে খাইতে পায় না সখ্ কইরা বাচ্চারে আনছে দুনিয়ায়? ভিখারীর আবার বাচ্চা!

কালু চমকে ওঠে!

কথাটা তারও মনে হয় সত্যি। আজ তার ভুলের জন্যই ওই বাচ্চাটাও ভুগছে। এদের অতৃপ্ত মনের অতলে জিইয়েছিল অশান্তির আগুন, আপনা হতেই এরা একদিন প্রতিবাদে ফেটে পড়তো। কিন্তু সেটাকে ওই এলাকায় ত্বরান্বিত করেছিল কালুর মত কিছু প্রাণী।

কোনরকমে একটু জল ঠেলে ঠুলে নিয়ে ফিরে এল কালু।

কেতকী ছেলেটার সামনে জলের পাত্রটা ধরতে ছোট্ট ছেলেটা শীর্ণ দুহাতে পাত্রটা ধরে চোঁ চোঁ করে জলই খাচ্ছে।

রামানুজের গিন্নী বলে—আহারে! কিছু খাবার নাই কেতকী, চিঁড়া—মুড়ি—বিস্কুট।

চাইল কেতকী। কিছুই তেমন নেই। ক'দিন আগেও ছেলেটার খাবারের অভাব হয়নি। দণ্ডকারণ্যের বসতে তার নিজের গরু ছিল। দুধও দিত, খোকনের খাবারের অভাব ছিলনা। আজ ক'দিনেই সেই ঘর গরু বাছুর যেন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বার বার মনে পড়ে নিজের হাতে লাগানো স্বর্ণ চাঁপা—আম কাঁঠাল গাছগুলোর কথা। তুলসীমঞ্চের সবুজ ছোট্ট বনস্পতির মত ঝাঁকড়া ডাল মেলা তুলসী গাছটাও বোধহয় এতদিনে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে গেছে। ঘর! বৃষ্টির জলে গলছে বোধহয় পাঁচিলগুলো।

আজ এই ঘর দেখে হাসি পায়।

কালু-পটলা-গিরিজা কোথা থেকে বাঁশ কঞ্চি কিছু শুকনো গাছ-এর ডাল এনেছে, সেগুলোর বেড়া মত দিয়ে দু'একখানা ছেঁড়া চট চাপিয়ে ঘর বানিয়েছে।

বুড়ো নিশিকান্ত ওই আশ্রয় দেখে গর্জে ওঠে।

—গিরিজা, কোঠা বালাখানা বানানো ছাড়, দুগা খাতি দে যদি কিছু পাস্।

দশাসই মানুষটা ক'দিনেই ধ্বসে পড়েছে, চোখ দুটো যেন কোটরে ঢুকেছে। গালের হাড় ঠেলে এসেছে। তখন হাসিখুশী লোকটা আজ যেন হারিয়ে গেছে।

শরৎ দাস—রামানুজের অবস্থাও তেমনি।

শরৎ বলে—সরকার থেকে কুন ব্যবস্থাও নাই? রেশনও দেবেনা?

গিরিজা চটে উঠেছে।

এখানে আসতে সে চায়নি। তবু জোর করে আসতে হয়েছে বাবাকে—এদের সকলের জন্য। গিরিজা দেখছে বাচ্চা ছেলেটার অবস্থা। তাই সে অসহায় রাগে বলে,

—চিরকাল রেশন আর ডোল খাই বাঁচতি চাও, না? তাই দণ্ডকারণ্যে খাটতিও পারোনি নিজের জমিতে। ছুতোয় নাতায় চলি এলা।

এহন কও রেশন ডোলের কথা? সরকারের কথা শুনছো যে চাইবা এসব? এখন দ্যাখো মজা। সুখে থাকতি ভূতে কিলোয়।

ফেরার পথ আর নেই।

পিছনে ফেলে এসেছে সেই বসতের জমি। ঘর বাড়ির টিন কাঠও বেচে দিয়েছে রাতের অন্ধকারে। গরুর গাড়ি—বলদ গরুও বিক্রী করেছে এখানে পুনর্বাসন পাবার জন্যে। সে টাকাও শেষ হয়ে আসছে অনেকের। এখন মনে হয় বিপদেই পড়েছে তারা।

...সন্ধ্যা নামে বিস্তীর্ণ বসতে, দু'একজায়গায় কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে কোন ভাগ্যবানরা হাড়িতে চাল কুমড়ো সেদ্ধ করছে। আশপাশে বসে আছে বুভুক্ষু ছেলে মেয়েগুলো। একটা সানকিতে নাহয় পাত্রে সজ্জী গরম ভাত ফ্যান—সেই সজ্জী সেদ্ধ পড়তে পায় না, বাচ্চাগুলো জ্বলন্ত ভাত ফ্যান সমেত মুখে পোরার চেষ্টা করছে। খিদের জ্বালা পেটে, আর মুখে আগুনের জ্বালা—চীৎকার করে ওঠে তারা। অনেকের তাও জোটেনি। তারা কাঁদছে খিদের জ্বালায়।

গিরিজা-কালু-পটলের দল ঘুরছে এদিক ওদিকে। শহরের ওদিকে লোকজনের কোলাহল কমে আসে, নাইট শো'র সিনেমা ভেঙ্গেছে, লোকজন বড় রাস্তা দিয়ে ফিরছে। দু'একটা সাইকেল রিক্সা শাড়ি পরা কোন সুখী স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে চলেছে।

রাস্তার এদিকে অন্য জগৎ। এখানে ওই গাদাবন্দী মানুষগুলোর খবর কেউ রাখে না, তাদের মানুষের খাতায় নাম বাতিল হয়ে গেছে। তাদের জন্য আর খাদ্যের বরাদ্দও নেই।

দূরে দেখা যায় নদীটা।

গিরিজার সঙ্গে এর মধ্যে পরিচয় হয়েছে আরও ক'জনের। দণ্ডকারণ্যের ওই বসতের অন্য কোন অঞ্চল থেকে এসেছে ওরা। গোবিন্দ বলে,

—সুন্দরবনে যাবার লাগবো। এহানে পড়ি থাকলি মরতি হবে। কাইল কলকাতা থনে আমাগোর কিছু লোকও আসতি পারে। ওরাই যাবার ব্যবস্থা করবো।

কালু ওই সব নেতাদের খুব চিনেছে। ওদের ভিতরের খবর কিছু জানে পটল, নরেনরাও। পটল বলে—ওরা কচু করবো, যাতি হয় আমরাই যামু। পথতো সিধা। গোবিন্দ জানায়—আমি দেইখা আসছি। এহান থনে লঞ্চও যায় পুইজালি অবধি। ওখানের হাটতলা হতি হাঁটি গেলে ঘণ্টা খানেকের পথ। বাদনার ফরেষ্ট অফিসের নীচেই বাঘনা খাল—তারই ওপারে বিরাট চর। গাছপালা—বন বিবাক নাই। সরকার থনে নারকেল বাগিচা করছে।

অন্যজন শোনায়—মাছও প্রচুর আছে নোনা গাং-এ। বাগদা চিংড়ি-ভেটকি-পারশে-ভাঙ্গুন-সিলেট মাছ হয়।

ওরা স্বপ্ন দেখছে।

কাউখালির ভূষণ বলে —ওহান থেকে রায়মঙ্গল সিধা বাঁক নিছে, দূরে দেহা যায় খুলনা জিলা। আমার ঘরও ছিল সাতক্ষীরায়।

ভূষণ হালদার চেয়ে থাকে ওই নদীর দিকে। ওই নদীর ওপারে কিছু দূরে তার দেশের সীমানা। আজ সেখানে ঢোকার অধিকার তার নেই। কোন অজানা অভিশাপে আজ সে বিতাড়িত। আট ন'বছর আগে এই নদী পার হয়ে এসেছিল ভূষণ হালদার স্ত্রী তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে। মনে ছিল অনেক আশা।

ভূষণ বলে—আট সন আগে এই পথে আইছিলাম হিন্দুস্থানে। কিন্তু গিরিজা—ওই আট বছরে বরাত একটুনও বদলায়নি। লাথি খাই আসি পড়লাম ফের এইখানে! ভগমানেরে কই—একডা জব্বর লাথি কষাও, এক্কেবারে দুনিয়ার বাইরে চলি যাই।

বৌ—একডা মাইয়ারে তো পার করছো, আমারেও করি ফ্যালো। তা শোনে কই!

কালু এখন অন্যমতে বিশ্বাসী।

বলে সে গিরিজাকে—কেউ আমাগোর জন্য কিছুই করবে না গিরিজাদা। যা করার নিজেদেরই করতি হবে। নালি এইখানেই পচে মরতি হবে।

অনেকেই এসে জোটে।

তাদেরও এককথা। ওরা আজ অসহ্য যন্ত্রণার চাপে মরীয়া হয়ে উঠেছে। গর্জে ওঠে তারা—মরার আগে একবার শেষ চেষ্টা করুম। আমরাই যামু সুন্দরবনে। ডিঙ্গিতে-নৌকোয়-লঞ্চে—কিছু না পাই পায়ে হাঁটি নদী খাল পার হই যামু।

ওই ছিন্নমূল মানুষগুলো যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে।

সকালেই কলরব ওঠে। সারা বসতের মানুষ-ছেলেমেয়েরা দৌড়চ্ছে। ষ্টেশনের ওদিকে এর মধ্যে খণ্ড প্রলয় ঘটে গেছে। কয়েকজন ছিটকে পড়ে। দু'তিন খানা গাড়িতে করে কারা কলকাতা থেকে পাউরুটি, গুঁড়োদুধ, কিছু জামাকাপড় এনেছিল, তাকে ঘিরে এই কাণ্ড বেধেছে।

কেতকী বহুদিন এমনি অবস্থা দেখেনি। তাদের আশ্রয়ের সামনে নদীর ধীরে ওই কাণ্ড চলেছে। কালু-গিরিজা-গোবিন্দ-পটলা আরও অনেকে ছুটে আসে।

তারাই ধমকে ওঠে। ঠেলে ঠুলে উন্মত্ত জনতাকে সামলায়।

কালু বলে—লাইন লাগাও। লাইনে দাঁড়াও। যতক্ষণ থাকবে পাবে জিনিষপত্র।

কোন আশ্রম—সেবা প্রতিষ্ঠানও ট্রাক বন্দী চিঁড়ে গুড় এনেছে। ওরা লাইনবন্দী লোকজন-মেয়েদের কিছু দিতে পেরেছে। কালু-পটলা-নরেন-এর দল যেন এই কাজে লেগেছে। গিরিজাও রয়েছে।

ক'দিন পর মানুষগুলোর যৎসামান্য কিছু মিলেছে খাদ্যদ্রব্য। নিশিকান্ত চিঁড়ে গুড় চিবোচ্ছে, শরৎ দাস-এর চোখের কোণে কালি পড়েছে।

রামানুজ বলে—মনে হয় ভুলই করছি শরৎ!

পটলা কোথা থেকে চাট্টি চাল ডাল আলু এনেছে। ইদীনাং ছেলেটা বদলেছে। ললিতা চুপ করে বসেছিল। সে বলে,

—দুগা ভাত আজ পামু।

কিন্তু এভাবে চলবে না। পুলিসও এসে পড়েছে। দণ্ডকারণ্য থেকে একশ্রেণীর মানুষ, ওই পুলিশ তাদের বাধা দিয়ে আসছে।

মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে—আপনারা দণ্ডকারণ্যে ফিরে যান। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সুন্দরবনে বসবাসের ঠাই নেই। সেখানে যাওয়া হবে না।

জনতা স্তব্ধ হয়ে শুনছে।

মাইকে ঘোষণা চলেছে—যদি ফিরে যেতে রাজী থাকেন আপনাদের খাবার দেওয়া হবে।

গর্জে ওঠে জনতা—চাই না খাবার! ফিরে যামুনা সেহানে!

এ যেন ওদের মনের কথা। আজ দীর্ঘ এতদিন সহ্য করে করে ওদের সব সহ্য শক্তি ফুরিয়ে এসেছে। তাই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে তারা।

গর্জে ওঠে জনতা—আমাগোর সুন্দরবনে যেতে দিতি হবে। চলো সুন্দরবন।

ওরা আজ কোন কথাই শুনতে রাজী নয়। অনেক দেখেছে, ঠকেছে তারা। তাই শেষবারের মত নিজেদের ব্যবস্থা করবে তারা নিজেরাই।

সরকারী সাহায্য নেই। সারা জায়গাটা এই কদিনে যেন নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। নিশিকান্ত ভাবনায় পড়ে।

গিরিজা নেই। গোবিন্দ কালুদের নিয়ে কলকাতায় গেছে। দু'একজন মাতব্বর-এর সঙ্গে পরামর্শ করতে। খবরের কাগজের লোকরাও আসছে। গিরিজাই তাদের নিয়ে ঘুরেছে, এদের কাছে এনেছে। দেখিয়েছে চারিদিকের অবস্থা।

গিরিজা বলে—দ্যাখেন ক্যামন নরকবাস করছি!

কৃপাসিন্ধুও এগিয়ে আসে। বলে সে—দণ্ডকারণ্যে জমি যা দিছিল সব মোরাম মোরাম বিছানো। আর তেমনি চোর ডাকাতের উপদ্রব। প্রাণে মারতো ওখানে থাকলি। প্যাটেও খাতি পেতাম না। তাই চলি এলাম বাবু! এহানেও কোন ব্যবস্থা নাই।

নিশিকান্ত বলে—কত্তারা কয় দণ্ডকারণ্যে ফিরি যাতি হবে। ওহানে একডা ছাওয়ালেরে রাখি এলাম, পথে যাতি রাখছি মানা ক্যাম্পে ঘরের বউডারে। দেশ বিদেশে শুধু সক্কলকেই হারাইছি, ইবার মাটিতেই নিজেরে রাখার জন্যি এলাম।

গিরিজা গোবিন্দের সঙ্গে কলকাতায় এসে দু'চারজনের সঙ্গে দেখা করেছে। তারাও আশ্বাস দেন। কালু দেখছে ওদের। সুধাকান্তদাকে হরিশ পালকে চেনার পর থেকে কালু এদের মত লোকদের বিশ্বাস করতে পারে না। যমুনার কথা মনে পড়ে কালুর। দুজনে স্বপ্ন দেখেছিল ঘর বাঁধবে। কিন্তু তাদের স্বপ্ন আজ ব্যর্থ হয়ে গেছে, যমুনাকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে ওদের মতই শক্ত কালো হাত।

মাতব্বর ভদ্রলোক আরও দু তিনজন রয়েছেন। তিনি বলেন,

—সুন্দরবনে গেলে আমরা আপনাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবো, ওখানে কিছু সাহায্য নিশ্চয়ই যাবে।

কালু বলে—আগে সাহায্য কিছু দিলে লোকগুলো খাতি পেতো। বাঁচতি পারতো।

অন্যজন বলেন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে—আপনাদের অন্য নেতাদের সব বলেছি। যত শীঘ্র পারেন চলে আসুন সুন্দরবনে যেভাবে হোক। নাহলে সরকার বাধা দিতে পারে!

গিরিজা বলে—সেটা এখনই পাচ্ছি। খাবার নাই—ওষুধ নাই—আশ্রয়ও মেলেনি। তাই সুন্দরবনে আসতে চাই তাড়াতাড়ি।

ওরাও আশ্বাস দেন—দেখছি এদিকে কি করা যায়। দেশের মানুষের কাছে এই সমস্যার কথাও তুলে ধরেছি।

ওরা সামান্য কিছু সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে ফিরছে। গিরিজা বলে,

—সুন্দরবনে ই যাতি হবে। যত শীগগির হয়।

গোবিন্দ বলে—আজ রাতে গিয়া তাই কমু। কাল থনেই যে যে ভাবে পারে যেতে শুরু করবে।

সারা ছিন্নবসতের মানুষজন দেখছে প্রতিপক্ষের নীরব অবরোধের প্রস্তুতি। এর মধ্যে কিছু মানুষ লঞ্চে উঠতে গেছে, ওদের উঠতে দেয়নি। দু'চারটে পরিবার ভাড়া দিয়ে আগে উঠে বসেছিল পুইজালির লঞ্চে, তাদের ঠিক চিনতে পারেনি। বাকীদের নামিয়ে দিয়েছে। কে বলে,—টিকিট দিমু!

সারেং জানায়—হুকুম নাই। নেমে যান নালে লঞ্চ ছাড়বো না।

ওরাও জেদ ধরে, কিন্তু সারেং অনড়। শেষকালে যাত্রীরাই ওদের নেমে যেতে বলে।

তবু দু'চারজন নৌকোর খোঁজে বের হয়।

শহরের নীচে নদীর ঘাটে ছোট বড় নৌকার অভাব নেই। মালগুজারী হাজার দেড় হাজার মনের নৌকাও অনেক থাকে ঘাটে।

নিশিকান্ত-শরৎ এখানের আরও অনেকে ঘাটে গেছে তাদের কাছে। বলে—বাঘনা যাতি হবে। পুরো নৌকা নেব—কত দিতি হবে? এখান থেকে তিন গোণের পথ! কিন্তু মাঝিরাও জানায়—পারমিট না পেলি যাব না কত্তা।

অবাক হয় পারমিটের কথা শুনে।

বলে তারা—পয়সা দেব যা চাও। তিন চারখানা নৌকা নিমু।

ওরা জানায়—পারবোনি কত্তা। থানাবাবুদেব হুকুম।

অর্থাৎ এদের সুন্দরবনের পথও বন্ধ করতে চায়। ক্ষেপে উঠেছে এবার এই সারা এলাকা। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো গর্জন কবে—আমরা কি মানুষ লই, গরু ভ্যাড়া পাইছে। যাবারও হুকুম থাকবে না?

বন্দী মানুষগুলো এবার বিপদে পড়েছে। সামনে যাবার সব পথ বন্ধ। নিশিকান্ত-শরৎ-আরও অনেক মানুষের মনে এবার হতাশার ছায়া নামে। কেতকী আজ বাজার ঘুরে একটা দুধের কৌটো আর কিছু চাল ডাল এনেছে। দেখেছে কেতকী শহরের জৌলুস। এখানের মানুষ তবু বেঁচে আছে। বেঁচে আছে তাদের মত অনেক উদ্বাস্তু পরিবারও। অনেকে বাজারে দোকান দিয়েছে, পাকাবাড়ি জমি-জমাও করেছে।

কেতকী-ললিতা আর দুএকজন মেয়েরা গেছল।

ললিতা বলে—ওরা এদেশে আছিল, তাই দাঁড়াইছে। সেদিন ই মাটি ছাইড়া ভুল করছি।

কেতকী ভাবছে কথাটা। বলে সে—তয় কি ভাবছো ফিরে আইসা ইবার সুখ পাইবা?

এর জবাব ললিতাও জানে না।

বলে সে—পোড়া কপাল আমাগোর, সুখের লিখন নাই রে!

ওরা ফিরছে ষ্টেশনের ধারে সেই নরকের দিকে।

ওদিকে নদীর ধারে কলরব—সার্চলাইটের আলো—পুলিশ লোকজন দেখে দাঁড়াল। পুলিশও এবার কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে। কোন নৌকা এপারে থাকবে না। যদি এই উদ্বাস্তুরা হামলা করে।

সব ছোট বড় নৌকাকেই ওপারে পাঠাচ্ছে তারা। যাতে এপারে কোন নৌকা না থাকে, এরা চলে যেতে না পারে, কেউ ওই নৌকা নিয়ে। তীরে ভিড় করেছে উদ্বাস্তুরা। বেশ বুঝেছে তাদের যাবার সব পথই রুদ্ধ। ইছামতী নদী এখানে বেশ বড়, গভীর খরস্রোতা। তাছাড়া নোনাগাং একটু নীচেই। জোয়ারভাটার বেগও কমে আসে না, সেই সঙ্গে নদীতে আসে কামটের দল। এরা দেখেছে সেই কামটের বাচ্চা জেলেদের জালে উঠতে।

ছোট সাইজ, তবু ধারালো দাঁতের পাটি করাতের মত বসানো. মানুষের দেহের মাংস বেমালুম খুবলে খেয়ে নেয়,পড়ে থাকে হাড়টা, জলের মধ্যে মানুষ তখন টের পায় না। যখন টের পায় তখন আর কবার কিছু নেই, সেই ক্ষত বিষিয়ে মারা যায়। মারাত্মক এই প্রাণীরা থাকে এই গাং-এ।

মানুষজন কেউ জলে নামে না তাদের ভয়ে।

নৌকাগুলো সব ওপারে চলে গেল।

চোখের সামনে দেখছে ওরা তাদের যেন বেড়াজালে ঘিরে মারবে এবার। নানা গুজব রটে।

কেউ বলে—এই সব ঘর ঝুপড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিবে।

ওরা জেগে আছে কি আতঙ্ক নিয়ে।

গিরিজারা ফিরতে সকলেই ভিড় করে। গোবিন্দ, কালু পটলারাও শোনায় কথাগুলো। গিরিজা বলে,
—সুন্দরবনে সব সাহায্য যাতিছে। আমাগোর সেখানেই যাতি হবে। কালই যামু।

নিশিকান্ত বলে—যামু ক্যামনে? লঞ্চে নেয় না?

—নৌকায় যামু। কালু বলে।

রামানুজ বলে—নৌকাও নাই? সব নৌকারে পুলিশ হুকুম দে—গাং-এর ওপারে বাঁধি রাখছে। এদিকের ঘাট সাফ!

—সেকি! গিরিজাও এবার চমকে ওঠে। বেশ বুঝেছে সে এরা ওদের কোনমতেই সুন্দরবনে যেতে দেবে না। আজ তাদের সামনে জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে উঠেছে। একদিকে শক্তিমান প্রতিপক্ষ, অন্যদিকে এই কয়েকহাজার ভাগ্যাহত অসহায় প্রাণী। এতবড় পৃথিবীতে তাদের ঠাঁই নেই!

কালু-পটল-নরেনরা আজ বেশ বুঝেছে তাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা। সেই দণ্ডকারণ্যে দেখেছে

কালু লোভী সেই অন্ধকারের মানুষগুলোকে। নিজেদের স্বার্থে তারা কি ভুলের বশে নিজেদেরই সর্বনাশ করেছে। এখানেও সেই বাধা!

এই কিছু মানুষের ভাগ্য নিয়ে কিছু দল যেন রাজ্য জুড়ে পাশা খেলার দান পেতেছে, পাশার ছকের ওরা জ্যান্ত হাড়মাংসের গুটি, ওদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।

কালু গর্জে ওঠে—ওগোর কথা মানি না, মানবো না।

পটলা শুধোয়—তয় কি করবি?

কি করবে তা এখুনি ভাবতে পারে না। কালু বলে,

—একডা কিছু করাতিই হইব। ডাক এই বসতের জোয়ানগোর।

গিরিজা চেনে ওদের। বলে সে—কিছু গোলমাল বাধাস না কালু। পুলিশ তাক্ খুঁজিতেছে, ফাঁক পাইলে শ্যাষ করবো। হক্কলকে ডুবাসনি তরা।

কালু-পটলা আজ প্রতিবাদ করে না। মনে হয় এই মানুষগুলোর কাছে দণ্ডকারণ্যের জীবনকে বিকৃত করে তুলতে সাহায্য করেছিল তারাই। তাদের অন্যায় অনেক। এখনও ওদের চোরের সেই অপবাদ এরা জানেনা, জানেনা গিরিজা তার ভাইকে ওরাই খুন করেছিল।

তাদের মনে এসেছিল ওখান থেকে পালিয়ে আসার মত অবস্থা। কালুরা তা জানে। আজ পটলাও দেখেছে তার বাবা মাকে, ভিখারীর পর্যায়ে এসে পড়েছে তারা। রামানুজ কাকার মেয়ে সুরভি কোথায় হারিয়ে গেছে, হয়তো সুরভি যমুনার মত মেয়েরা আজও পচছে রায়পুর না হয় অন্য কোন শহরের নরকে।

অনেক দুর্ভাগ্যই এনেছে কালুর দল এদের জীবনে। আজ আর ওই গোলমাল করে এদের বিপদে ফেলবে না। কালু বলে,

—তুমি ঘাবড়ে যাবা না গিরিজাদা। গোলমাল করুম না, তবে যা করুম তা কইছি। এছাড়া পথ দেহি না। নৌকা আমরা আনুমই—তুমি কলোনীর এগোর খবর দিই রাখো, তার যেন তৈরী থাকে। আজ ভোরেই যা করার করুম—তাতে শ্যাষ হই যাই দুঃখ নাই।

চুপ করে শুনছে গিরিজা ওদের কথাগুলো। ভয় তার হয়।

বলে সে—এ কি করে হবে কালু? পারবি না—বিপদেই পড়বি!

কালুর দলে ততক্ষণ আরও অনেক তরুণই জুটে গেছে। তারাও মরীয়া।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। শহরে নির্জন পথে আলোগুলো জ্বলছে, পূর্ব আকাশে তখন সূর্য ওঠার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পাখীরা কলরব করে। নদীর বুকে চলেছে ভাটার টান—ওপারের দিকে সারবন্দী নৌকা বহরের মাঝিরা তখনও ঘুমুচ্ছে। এদিকের নদীর ধারের রাস্তায় লোকজনও নেই। শুকতারার আলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। এই গিঞ্জি কলোনীর মানুষগুলো জেগে আছে। ওদের চোখে ঘুম নেই। সারা মনে কি নিবিড় উত্তেজনা।

হঠাৎ কালুরা জন পঞ্চাশ তরুণ এগিয়ে আসে—গিরিজাও রয়েছে, এদিকে জেগে উঠেছে মানুষগুলো। নদীর শ্রান্ত জলস্রোতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওই কালুর দল।

আজ তারা মরীয়া। নদীর বিস্তার এখানে কম নয়, ভাটার টান শুরু হয়েছে। খর জলস্রোত নামছে নীচের দিকে। কামটের রাজত্ব—একবার মানুষকে ধরলে তার দেহের সব মাংস তুলে নেবে। মৃত্যু ছাড়া পথ নেই।

ললিতা চীৎকার করে যাসনি—পটল!

কোন অসহায় বৃদ্ধ বাবা তার একমাত্র অবলম্বন সন্তানকে আটকাতে চায়—ওরে এ গাং মরণের ফাঁদ্।

—মরণেরেও আর ডরি না। গর্জে ওঠে কালু—চল। যামু ওপারে। নৌকা আনুম!

সেই পাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে, শব্দ ওঠে গাং-এ।

একটা স্তব্ধতা জাগে, স্রোতে ভেসে চলেছে কালু।

চীৎকার করছে ওর মা—ওগো।

বহু মায়ের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে তখন গাং-এর জলে লাফ দিয়েছে অনেক ছেলে, দুচারজন বয়স্কও কি দুর্বার টানে লাফ দিয়ে সাঁতরে চলেছে ওই গাং। বহুদিন পর আদিম গাং-এর হিংস্র বুকে নেমেছে মরীয়া মানুষগুলো।

কলরব ওঠে।

ওরা স্রোত ঠেলে ভেসে চলেছে গাং-এর বুকে।

ওপারের দু-চারজন মাঝিরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তারাও বিশ্বাস করতে পারে না ব্যাপারটা। এগাং এ তারাও ভয়ে নামে না। কিন্তু এরা হেলায় এই গাং পাড়ি দিয়ে এদিকে আসছে।

কালু-পটলা-নরেন-গোবিন্দ আর প্রায় শতখানেক মানুষ এসে পড়েছে। মাঝিরা কিছু করার আগেই এরা সারবন্দী নৌকোয় উঠে পড়ে। দু'একজন বাধা দিতে এরাও তাদের ফেলেছে গাং-এর পলিতে। প্রাণ ভয়ে দৌড়লো তারা। চীৎকার করছে। ততক্ষণে শ'কয়েক মানুষ ওই ছোট বড় নৌকাগুলোকে দখল করেছে। গেরাপি—নোঙর তুলে নিজেরাই নৌকাগুলোকে এপারের দিকে ভাসিয়েছে। দুচারটে নৌকা এসে ভিড়েছে এদিকের তীরে।

কলরব—জয়ধ্বনি ওঠে।

কালু পটলারা তীরে নেমেছে। এই সময়ের মধ্যে অধিকাংশ উদ্বাস্তুরাই তৈরী হয়ে পড়েছে। সামন্য মাল-পত্র নিয়ে এসে নৌকাগুলোয় উঠে পড়ে।

তখন ভোর হয়ে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিরাট জনবসত প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। ছোট বড় নৌকাগুলোয় উঠেছে তারা। ভাটার স্রোত চলেছে সুন্দরবনের দিকে।

ওরা নদী নালার দেশের মানুষ। এতকাল নির্বাসিত হয়েছিল বনপর্বতের দেশে, আজ যেন নদী—নৌকোর স্পর্শে হারানো দিনগুলোকে ফিরে পেয়েছে তারা।

আজ এতদিন পর মাঠি ছেড়ে তারা নদীতে ভেসেছে। জয়ধ্বনি ওঠে।

নৌকাগুলো গাং-এর বুকে ভেসে চলেছে শহরের সীমা ছাড়িয়ে সুন্দরবনের দিকে । গাং চিল-এর ঝাঁক ওঠে, দূরে দেখা যায় শহরের সীমানা।

তারা কলাগাছিয়ার গাং ধরে চলেছে সোজা পথে সুন্দরবনের দিকে, নদীর ধারে উঠেছে ভেড়ির একটানা রেখা, রুক্ষ কালো মাটির ভেড়ি।

সূর্য উঠছে।

অনেকদিন পর আজ নিশিকান্ত, শরৎ, রামানুজ এই সুন্দর সূর্যোদয় দেখছে, নদীর বুকে জাগে রক্তলাল আভা। যেন জলস্রোতে কে আবীর ঢেলে দিয়েছে।

রাত জেগে বসেছিল কেতকী, কি উত্তেজনায় কেটেছে সারা রাত। নিশিকান্ত বলে—যাস্‌নে গিরিজা। একটারে হারাইছি, তুই যাস্ নে।

কেতকীর দুচোখে জল নামে।

খোকন ঘুমুচ্ছে। এর মধ্যে দুদিন বৃষ্টিতে ভিজে ওর শরীরটা ভালো নাই। কেতকী বলেছিল—যেওনা গাং-এ। খোকন, আমি, বাবা রয়েছি তোমার ভরসায়।

গিরিজা বলে—তাই যামু বৌ তগোর জন্যই। বাঁচার জন্য এ লড়াই।

আজ ওরা লড়াই করেই জয় করেছে তাদের সুন্দরবন যাবার এই অধিকার। কেতকী দেখছে গিরিজাকে। তখনও চুলে পলিকাদা লেগে আছে। খালি গা। পরনের ভিজে কাপড়টা গুটিয়ে পরা—দাঁড় টানছে।

কেতকীর চোখে এ যেন নোতুন এক মানুষের ছবি ফুটে ওঠে।

গিরিজা বলে—কি দেখস্?

কেতকীর চোখে সলজ্জ আভাষ। আজ মনে মনে খুশী হয়েছে সে। কেতকী বলে—অনেকদিন জল দেখিনি। এতজল। এমনি সূর্য ওঠা!

নিশিকান্ত বলে—সূর্যি ঠাকুর উদয় হচ্ছেন। পেন্নাম কর বৌ। আশীর্ব্বাদ চা এই যাত্রা যেন ভালো হয়। বারবার ঘুইরা ফিরছি, এবার সুন্দরবন-এর বসতে যেন সুখ পাইরে। শস্তি পাই।

ওদের হাজারো মানুষের মনের যেন এই একমাত্র কাতর প্রার্থনা। রাজ্যলাভ, গদির লোভ—অনেক পাবার মোহ তাদের নেই, তাদের একমাত্র চাওয়া একটু আশ্রয়, একমুঠো ডাল ভাত। এইটুকুর জন্যই আজ ওরা ভেসে চলেছে আরেক অজানা পথে।

সেই নদীর বুকে তখন রক্তলাল সূর্যের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে, ওদের নৌকাগুলো বয়ে চলেছে যেন দিকযোড়া সেই রক্তপ্লাবনের মধ্য দিয়ে।

ট্রাকটা এসে পৌচেছে সকালের পর। পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেছল। সুরভি-যমুনারাও রয়েছে বনবিহারী, যদুপতিদের দলে। কাদম্বিনী বলে সুরভিকে,

—তোমাগোর এত কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস নাই বাছা।

সুরভির শাড়িটা লাট পাট হয়ে গেছে। মুখে চোখে ফুটে ওঠে পথশ্রমের ক্লান্তি। বলে সে—না মাসীমা, ঠিক আছি গিয়া।

দিনের আলোয় মনকে খুলে দেওয়া যায় না। দিনের বেলায় ট্রাকে আসছে ওরা, তখনও সব কথা বলতে পারেনি সুরভি যমুনারা। জানে তাদের ঘৃণ্য পরিচয়টাকে এরা মেনে নিতে পারবে না। সব হারিয়েও এখনও ওই মানুষগুলো কিছু আদর্শের ধারণাকে আটকে রেখেছে।

চুপ করে থাকে সুরভি, অনুভব করে ওদের সঙ্গে একটা নীরব ব্যবধান। রাত্রি নেমেছে। মানুষগুলোর খাবার তেমন নেই। কাঁদছে বাচ্চাগুলো।

সুরভি বলে—গাড়ি থামান।

ওই গোটা পঁচিশ টাকা বের করে বলে—চিঁড়া—মুড়ি গুড় কিছু নেন। আর বাচ্চাগোর জন্যে দুধও রাখুন। যমুনা—তুইও দে পঁচিশ টাকা!

যমুনাও টাকাটা দেয়।

ওরা অবাক হয়—খাবার দিছ মা?

হাসে সুরভি—কেন দিতিও দোষ?

রাত্রির আঁধারে ওদের মুখে-চোখে তৃপ্তির আভাস জাগে। এরপরই ট্রাকটা থেমে যায়। ইঞ্জিন গোলমাল করছে। ড্রাইভার গাড়িটা নির্জন পথের ধারে একটা জায়গায় দাঁড় করায়। ওদিকে দু'একটা ঘর আছে। একটা টিউবওয়েলও রয়েছে।

ওরা নেমেছে।

ড্রাইভার তার হেল্পারকে একটা ট্রাক ধরে পাঠিয়েছে বারাসাতে কি পার্টস কিনে অনতে হবে। ততক্ষণ এদের এখানেই থাকতে হবে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

বাতাসে ভেসে আসে ধানক্ষেতের সুবাস—কোথায় হাস্‌নু হানা ফুটেছে। রাতের ভিজে বাতাসে তার উদগ্র সুবাস ওঠে। কোথায় একটা রাতজাগা কোকিল ডেকে চলেছে।

বাংলার মাটির এই সুবাস, সুর থেকে তারা অনেকদিন বঞ্চিত ছিল।

সুরভি বলে চলেছে তাদের কথা।

ওদেরই একজন তারাও। বাবা-মা ভাই চলে এসেছে সুন্দরবনে অন্যপথে, তারা রায়পুরে কাজ করতো। তাদের কাজটার কথা আর বলতে পারে না। তবু কি বেদনায় তাদের কণ্ঠস্বর বুজে আসে।

সুরভি বলে—তাগোর খোঁজেই চলেছি মাসীমা। যদি দেখা পাই।

কাদম্বিনী শুনছে ওদের দুঃখের কথা। অন্য মেয়েরাও রয়েছে। স্তব্ধতা জাগে রাত্রির অন্ধকারে। বলে কাদম্বিনী,

—হারানোর কালেই জনম্ নিছ মা আমাগোর বরাতে পাবার কথা শুধু দুঃখেরই। আর কিছু পামুনা। বাবা-মা ঘর-বাড়ি মান-ইজ্জৎ সব হারাই যাবে আমাগোর।

আজ কি একটা ঘূর্ণিঝড়ে তারা ছিটকে পড়েছে কে কোথায় কে জানে না। দুরন্ত প্লাবনে যেন ভেসে চলেছে তারা খড় কুটোর মত । কোথাও তাদের ঠিকানা কিছু নাই।

যমুনার চোখে জল নামে। জানে না কালু কোথায়। সুরভি খোঁজে তার বাবা-মাকে। শান্ত নিরীহ ভালোমানুষ তারা বাবা, আজ কেউ জানে না তারা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে।

ঘুম আসে, ক্লান্তিতে এ ওর গায়ে মাথায় হেলান দিয়ে ঢুলছে। আকাশে তারাগুলো জ্বলছে তখনও।

ওদের চমক ভাঙ্গে ড্রাইভারের ডাকে। ধড়মড়িয়ে উঠছে মানুষগুলো। ক'বছরে মাঠে প্রান্তরেও পড়ে ঘুমানোর অভ্যাস হয়ে গেছে তাদের। আজ তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন সূর্য উঠেছে।

গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে।

সকালের প্রথম সূর্যের আলোয় মাঠ বাঁশবন—আমবাগান ভরে গেছে। পাখীদের কলরব ওঠে। ওরা টিউবওয়েল-এর জলে হাত মুখ ধুয়ে ট্রাকে ওঠে। এমনিতে দেরী হয়ে গেছে।

ড্রাইভার সিধে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে।

অবাক হয়েছে পুলিশও। তারা ভাবতে পারেনি ওই কামট ভরা গাং সাঁতরে পার হয়ে রাতারাতি ওই মানুষগুলো এতসব নৌকা দখল করে সকলে উঠে চলে যাবে।

শহরের লোকও জুটেছে নদীর ধারে। তারাও ভাবতে পারেনি এমন কাণ্ড ঘটতে পারে। পুলিশের অনেকেই ওই উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতি পরায়ণ। অনেকেই ওদেশ থেকে এসেছে। তারা জানে ওই মানুষগুলোর বেদনার কথা।

কিন্তু চাকরী করে, তাই অনেক সময় কর্তব্যের খাতিরে অনেক কিছুই করতে হয় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। আজ ওই মরীয়া মানুষগুলোর এই কাজ দেখে পুলিশও ভাবনায় পড়েছে। এরপর তাদের করণীয় কি তার নির্দেশ-এর জন্য সদর-দপ্তরে খবর পাঠাতে হবে।

খবরের কাগজের লোকজন কিছু সাহায্য নিয়ে অনেকে এসেছে। তারাও অবাক হয়। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ওই মানুষগুলো এগিয়ে গেছে সুন্দরবনের দিকে।

নানা আলোচনা চলছে, এমন সময় দূরে বনবিহারীদের দলকে নিয়ে ট্রাকটা এসে থেমেছে। ক্যাম্প-এর বিস্তীর্ণ এলাকা শূন্য প্রায়। পড়ে আছে পোড়া ছাই-ময়লার স্তূপ। মানুষগুলো নেই।

কে বলে—তারা সব নৌকোয় করে চলে গেছে সুন্দরবনের দিকে। আর কাউকে এখানে পাবে না।

অন্যজন শোনায়—পুলিশ পাহারায় ওদের দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ওরাও যাবে না। তাই রাতের অন্ধকারে নৌকাসব লুট করে নে চেলে গেছে।

পুলিশও ক্ষেপে গেছে।

লোকজন দেখছে ওই ট্রাকের ছেলে মেয়ে লোকদের। কে বলে,

—আপনারাও তো সুন্দরবন যাবেন?

কুঞ্জ, বনবিহারীরা কি ভাবছে।

ওর কথায় বলে—তাই তো যামু।

লোকটা বলে—তাহলে ট্রাক নিয়ে ওদিকে যাবেন না আর, পুলিশ রেগে মেগে আপনাদের এ্যারেষ্ট করতে পারে। তার চেয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে এখান থেকে সোজা ন্যাজাট চলে যান। ন্যাজাট এই গঞ্জের নীচের ভাটিতে সুন্দরবনের দিকে যেতে পড়বে। ওখানের গঞ্জে নৌকা পেয়ে যাবেন, দু ভাটির পথ ওখান থেকে।

পুলিশের কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় এরা। দেখেছে খড়্গপুর ষ্টেশনে তাদের আটকে ছিল, নেহাৎ সুরভি কৌশল করে বের করে এনেছে। এখানে এসে আবার ওদের জালে পা দিতে চায় না।

ভাবছে বনবিহারী, যদুপতিরা।

সুরভি সব শুনেছে। এখনও হয়তো ওদের নৌকা ভাটিতে ভেসে গিয়ে এতখানি পথ পার হতে পারবে না। ট্রাক নিয়ে ডাঙ্গার পথে ওরা তাদের আগে গিয়েই পৌঁছতে পারবে।

সুরভি বলে—তাই চল গিয়া যদুকাকা। এহানে থাকা ঠিক হইব না।

ওরা ট্রাক ঘুরিয়ে ন্যাজাটের গঞ্জের দিকেই চলেছে।

নৌকাগুলো ভেসে চলেছে। মাঝিরাও এতক্ষণ অবধি ভরসা পায়নি। এদের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেছল। এখন ক্রমশঃ তারাও সহজ হয়ে আসে।

গিরিজা বলে—আমাগোর ওখানে নামিয়ে দিয়ে চলে আসবেন। কেউ আটকাবে না। আর ভাড়ার টাকাও দিমু। তবে কমসম করি নিতি হবে।

তবু কিছু পাবে। মাঝিরাও হাত লাগায়। বাতাস চলছে। পাল তুলেছে নৌকাগুলোয়, রকমারি রং-বেরং এর পাল। আর দাঁড়টানার লোকের অভাব নেই। ওরা ভরা পালে ছ'দাঁড় আট দাঁড় ফেলে তীর বেগে চলেছে।

এখনও ভাটার টান থাকবে নিদেন চার পাঁচ ঘণ্টা।

মাঝি বলে—এভাবে গেলে জোয়ার আসার আগেই সন্দেশখালির কাছ বরাবর চলে যাবো। তারপরের ভাটাতেই মনে হয় পৌঁছতি পারা যাবে পুইজালির ট্যাকে।

ওরা যেন উড়ে যেতে চায়।

নৌকা বহর চলেছে, নদীর দুধারের অনেক মানুষ অবাক হয়ে দেখছে ওদের। ন্যাজাটের গঞ্জের এদিকে ন্যাজাট—ওদিকে কালীনগরের হাট। বড় গঞ্জ।

আজ হাটবার—তাই নদীতে নৌকার অভাব নেই। ওরা দেখছে এদের নৌকাগুলোকে ভেসে যেতে। একসঙ্গে এত নৌকা—এত মানুষ জনকে যেতে তারা দেখেনি। আজ দেখছে।

এর কিছুক্ষণ পরই এসে থেমেছে সুরভিদের ট্রাক। এপারেও অনেক লোকজন রয়েছে। তারা দেখছে ওদের।

বনবিহারী শুধোয়।

—অনেক নৌকাকে একসাথে আসতি দেখেছেন কত্তা?

বুড়ো লোকটা দেখছে ওদের। বলে সে,

—হ্যাঁ। এই তো ঘণ্টাখানেক আগেই দেখলাম ভরা পালে যাতিছে। তা আপনারা কোথায় যাবেন?

বনবিহারী বলে—যামু বাঘনা—

—অ! কুমীরমারির হাটে।

লোকটা দেখছে ওদের। সুরভি কথাটা শুনে অবাক হয়।

—ওরা চলে গেছে?

অনেকেই এসে পড়ে। দু-একজন মাঝি বলে,

—আপনারা যেতে চান নে যাতি পারি বাঘনায়। তবে দু ভাটির পথ, ফি নৌকোয় পঞ্চাশ ট্যাকা পড়বো। দুখান নৌকা লাগবে।

....যমুনা ভাবছে কথাটা। যদুপতি বনবিহারীরা কি আলোচনা করছে। এবার তাদের গন্তব্যস্থলের কাছে এসে পড়েছে, আর দেরী করতে চায় না তারা। বলে যদুপতি,

—তাই হবে। তয় দুখান নৌকোয় একশো পারুমনা। ষাট ট্যাকা দিমু।

শেষকালে দরদাম করে নামে পঁচাত্তর টাকায়।

ততক্ষণে জোয়ার এসে গেছে। আর ভাটিতে যাওয়া যাবে না। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পড়ে থাকতে হবে তাদের এখানে।

সুরভি বলে—দুদিন দুরাত নাওয়া খাওয়া নাই। এখানেই সিনান করি দুগা চাল ফুটিয়ে নেন। খাওয়া দাওয়া করি নৌকোয় উঠবেন।

প্রস্তাবটা সকলেরই মনে লাগে।

মাঝি দুজন বলে—আমাদের নৌকোয় উনান কাঠ কুটো আছে ধরিয়ে দিই। পাকসাক করেন। আর চাপা কল আছে ওখানে, চান করি নেন।

ক'দিন পর মানুষগুলো আজ স্নান করে দুমুঠো ভাত পাবার আশ্বাস পেয়েছে। তাদের মনে হয় এবার বিনাবাধাতেই তারা সুন্দরবনের নোতুন বসতে যেতে পারবে।

রায়মঙ্গল নাম নিয়ে এখানে বয়ে এসেছে ইছামতী নদী, যে ইছামতীর দুদিকে বাংলার সবুজ গাছ গাছালি, বাঁশঝাড়, শান্ত জনপদ ও সেই নদী আর এখানে নেই। সমুদ্রের স্বাদ পেয়ে ও মাতাল-দুর্বার। কূল তলহীন এক বিস্তীর্ণ জলরাশি। একটু বাতাসে ওর বুকে ঢেউ ফুঁসছে—ঢেউগুলো শূন্যে লাফিয়ে উঠে ফেটে পড়ে সাদা ফেনায়। বিস্তীর্ণ ওর বুকে কি রুদ্রের সর্বনাশা রূপেরই প্রকাশ।

মাঝে মাঝে তীরের সামান্য সমতলে মাথা তুলেছে সুন্দরবন থেকে ভেসে আসা গরাণ কেওড়া-বাইন গাছের ভিড়। যেন কেউ সাজিয়ে রেখেছে তাদের নদীর তীরভূমিতে।

সবুজ সতেজ গাছগুলো অপরূপ রূপ নিয়ে হলুদ সবুজ বর্ণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এ নদীর জলে তেষ্টা মেটে না, কোন গাছেই কোন ফল ফলে না যা দিয়ে মানুষের ক্ষুধা মেটে! এ নির্মম এক জগৎ! জলে এর কুমীর—কামট। গাছে সাপের রাজত্ব, আরও গহণ বনে আছে হিংস্র বাঘ। এ মৃত্যুর জগৎ, কি শ্যামল স্নিগ্ধ ছদ্মরূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিষ্ঠুর মৃত্যু।

সেই বিস্তীর্ণ রায়মঙ্গল এখানে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে বয়ে গেছে বাংলাদেশের গাঁ ছুঁয়ে আর একটি বিস্তীর্ণ নদীস্রোত বয়ে গেছে সোজা দক্ষিণে—এর নাম ঝিলা, ডানহাতে বনের দিকে ঢুকেছে একটা মাঝারি খাল—একে বলে বাঘনার নদী।

এই বাঘনার নদীই মানুষের বসতের শেষ সীমানা। একদিকে শেষ বসত। আর নদীর ওপারে শুরু হয়েছে সুন্দরবনের অরণ্য সীমা।

বাংলার দক্ষিণাংশের সমুদ্রউপকূলের বেশীরভাগ জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে এই বনের শুরু, চব্বিশ পরগণা ছাড়িয়ে বাংলা দেশের খুলনা, বরিশাল জেলা অবধি এর বিস্তার। আর ঘন বনের বেশীরভাগ পড়েছে বাংলাদেশের এলাকায়।

রায়মঙ্গল-ঝিলার মোহনার বিস্তার সামনে। গিরিজাদের নৌবহর এগিয়ে আসছে। কেতকীর ভয় ভয় করে, নদীর একূল ও কূল দেখা যায় মাত্র একটি রেখায়, ঢেউগুলো ফুঁসছে। নেহাৎ বড় নৌকা তাই ঢেউয়ের আছাড় কমই লাগে, ছোট নৌকায় যারা রয়েছে তাদের নৌকাগুলো ঢেউয়ের মাথায় ওঠে আর ছিট্‌কে পড়ে। গলুই-এ জল ভাঙ্গছে, জল ছিট্‌কে ওঠে।

নিশিকান্ত-শরৎ দাস-এর দল দেখছে ওই নীল জলরেখা মিশেছে দিগন্তে। বলে নিশিকান্ত,

—কোথায় চলেছি রে? এ যে কেবল জলই। আর তেমনি মারমুখী গাং।

শরৎ দাসের মনটা ভালো নেই। দণ্ডকারণ্যে তবু মাটি গাছগাছালি দেখেছিল। পায়ের নীচে ছিল শক্ত মাটি। আর এখানে মাটিরই সন্ধান পায় না তারা।

বলে শরৎ—মৃত্তিকাই নাই গো। তয় ঘর বাঁধুম কোথায়? জমই বা কই? কি শুইনা আইলি এদিকে?

গিরিজা, পটলরা হতাশ হয়েছে। নবীন মাষ্টার এই কিছুদিন ধরে ওদের বোঝানোর চেষ্টা ছেড়েছে। ও আসতে চায়নি, কিন্তু বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে। তাদের গ্রামবসতের অনেকেই চলে এসেছে।

নবীন চুপ করে বসে আছে। নৌকাগুলো ভেসে চলেছে অকূল নদীতে। প্রথম প্রথম নৌকা বহর নদীতে চলেছিল তখন নদীর দুপাশে দেখেছে জমি-বাঁধ-ঘর, হাট-সমৃদ্ধ জনপদ-গঞ্জ। নদীতে দেখেছে নৌকার ভীড়। জিনিষপত্র নিয়ে লোকজন যাতায়াত করে। তাদের দেশের মতই পরিবেশ। নদীমাতৃক জীবন, ক্রমশঃ যত

দক্ষিণে নেমেছে দেখেছে নদীর বিস্তার বেড়ে চলেছে, ক্রমশঃ বিরাট হয়েছে। নদীর মর্জি মেজাজ বদলেছে—এখানে সে নিষ্ঠুর, আদিম হিংস্রতায় ভরা। ভয়ে যেন তাকে লোকজন এড়িয়ে চলে। গ্রামবসত—গঞ্জ ও গাং দেখা যায় না কাছে ভিতে।

নবীনের মনে হয় যেন নাবিক কলম্বাসের মত তারা চলেছে কোন নোতুন দেশের সন্ধানে। সে দেশের ঠিকানা কোনদিন আদৌ খুঁজে পাবে কিনা জানে না।

ঝিলা রায়মঙ্গলের মোহনা ছাড়িয়ে বড় নদীটা নেমে গেছে দক্ষিণের দিকে, তারই দুদিকে শুরু হয়েছে সুন্দরবনের সীমানা। মানুষের জগত আগেই শেষ হয়ে গেছে। বিস্তীর্ণ ভূমিতে মাথা তুলেছে ঘন গেঁও-কেওড়া-বাইন -হেতাল গাছের বন। এ বনের গাছ-গাছালি খুব বড় হয় না। সুন্দরী, কেওড়া গাছই কিছু বড় হয়, অন্য সব গাছের কলেবর ছোট কিন্তু খুবই ঘন। এত ঘন যে মানুষ চলাচল করতে পারে না, দিনের আলোও ঢোকে না সেই বনে। অনেক জায়গার মাটিতে পলিকাদা, নীচু জমিতে জোয়ারের জল ঠেলে আসে।

বড় নদীর সঙ্গমের এক তীরে ফরেস্ট অফিস। ছোট নদীর এদিক বরাবর শেষ বসত। নোনাজলকে ঠেকাবার জন্য ভেড়ি বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এদিকে দুচারঘর জন বসত আর শেষ গ্রাম—ছোট্ট হাটও আছে। ধানমাঠ—কলাগাছ দুচারটে গাছ টিকে আছে কোনমতে। নোনা মাটিতে চাষের অবস্থা আনতে এখানে বেশ ক'বছর কেটেছে।

এখানের লোকজন ক'দিন ধরেই দেখছে ব্যাপারটা।

খবরের কাগজ এখানে আসে মাইল তিনেক দূরে—পুইজালির খাল পেরিয়ে ওপারে মোল্লাখালির হাটে। দু'একটা রেডিও আছে। আর এই মাটির শেষ সীমানায় আছে বাগনা ফরেস্ট অফিস। ওখানের বাবুদের একটা রেডিও আছে মাত্র।

তবে ওসব নিয়ে তারা ভাবে না। দুনিয়ার এত খবরে তাদের দরকার নেই। সারাদিন মাঠে চাষ বাষ করে, নদীতে মাছ ধরে। দরকার হলে পারমিট নিয়ে নৌকা বেয়ে বনের ধারে পাশে গিয়ে কিছু কাঠ কেটে আনে। শান্ত—অলস জীবনযাত্রা।

তাদের চোখে পড়ে ব্যাপারটা।

এর আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বাঘনা নদীর ওপারের একটা বড় ব-দ্বীপের ঘন বন কেটে কয়েকশো হেক্টর জমি উদ্ধার করে সেখানে নারকেল বাগান আর ঝাউগাছ লাগানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য।

বিস্তীর্ণ সেই চরের চারিদিকেই নদী, একদিকে দিগন্তপ্রসারী ঝিলার অতল গাং —অন্যদিকে একটা খাল আর দক্ষিণেও খাল। জোয়ারের সময় ওখানের নীচু জমিতে জল ঠেলে ওঠে। তাই কিছুটা জায়গায় ভেড়ি বাঁধ দিয়ে নারকেল গাছ লাগানো হয়েছিল। বছর চারেক ধরে গাছগুলো রয়েছে।

বনের হনুমানের দল মাঝে মাঝে এসে ওই ছোট নারকেল গাছের মধ্যেকার কচি থোড়পাতাটা তুলে খায়, গাছও মরে। কিছু লোকও রাখা হল গাছ পাহারা দেবার জন্য। বনের ধার, মাচায় বসে টিনপিটিয়ে ক্রাকার ফাটিয়ে তারা বাঁদর তাড়ায় দিন-মানে, বৈকালের আলো ম্লান হবার মুখে ওরা নৌকা নিয়ে চলে আসে এপারে মানুষের বসতে।

এই চলছিল।

হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হয়েছে বেশ কিছু মানুষ সপরিবারে। নৌকায় লঞ্চ-এ পুইজালি এসে বাকী পথ ভেড়ি ধরে পায়ে হেটে আসছে কাতারে কাতারে ওই দ্বীপের দিকে লোকগুলো।

দু'একটা লঞ্চও আসে কি সব নামে।

প্রথমে এরা ঠিক বুঝতে পারে নি। পরে ফরেষ্ট অপিসের লোকজনও গেছে। ততদিনে সেই মানুষগুলো ওই জমির অনেকটা দখল করেছে। বনের কাঠ-গাছের অভাব নেই। তারা কাঠ দিয়ে ঘর বানাচ্ছে। শেডও বানানো হয়েছে। মালপত্তর নামছে লঞ্চ থেকে।

রেঞ্জারবাবু অবাক হন। এই বনের পাশেই দ্বীপ। এ বন মানুষখেকো বাঘের রাজ্য, তারাও এখানে দিন দুপুরে রাইফেল না নিয়ে নামে না, আর আছে সাপ, বনশূয়োর। নদীও মারমুখী, মাটিতে ছড়ানো গরাণ-এর শূলো, নোনা মাটিতে ঘাসও হবে না। এখানে এসেছে মানুষ, ঘর বাঁধছে।

রেঞ্জার সাহেব শুনেছিলেন দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুদের সুন্দরবন আসার খবর। রেডিওতে খবর দিয়েছিল।

তখন মনে হয়েছিল এঁদের সুন্দরবনের লাগোয়া আবাদ অঞ্চলের কোন জায়গায় ওরা জবর দখল করে বসত গড়তে চায়। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই নোনামাটি এই বনরাজ্যের মধ্যে ওরা এসে বাস করার কথা ভাববে, ঘর বাঁধতে চাইবে।

এ এক অসম্ভব ব্যাপারই।

রেঞ্জার সাহেবকে দেখে অনেকেই কাজ ফেলে আসে। রেঞ্জার সাহেব বলেন,—এ কি করছেন আপনারা? এই বনের মধ্যে থাকবেন কি করে? বাঘ, সাপ-এর রাজ্য।

ওরা দেখছে ভদ্রলোককে। তারা শোনায়,

—বাঘ আমাগোর কত মারবে? সাপ-এর দফাও শেষ করুম স্যার। দুনিয়ায় আর জাগা আমাগোর জোটেনি। দণ্ডকের পাহাড় ছেড়ে আইছি এ মাটিতেই ঘর বাধুম।

বন বিভাগের জমি বন বেদখল করেছে এরা। বন কাটার হুকুম নাই। সেই বন কাটতে শুরু করেছে। রেঞ্জারবাবু শোনান,

—এসব ফরেষ্টের জায়গা। সরকারের বন। বন কাটার হুকুম নাই। এ জায়গা থেকে চলে যেতে হবে আপনাদের।

লোকগুলো দেখছে রেঞ্জার সাহেবকে।

আজ তারা মরীয়া হয়ে এখানে এসেছে, এখনও দলে খুব বেশি আসেনি। পথে আসছে আরও অনেক পরিবার। এই খানেই দখল গাড়বে তারা। তাদের দাবী সরকারকে মেনে নিতেই হবে।

গণেশ গোলদার এদের মধ্যে একটু বুঝদার লোক। এদের দলের মাথা। গণেশ গোলদার বলে,

—ওসব কথা ঢের শুনেছি স্যার। দুনিয়ার লাথি খাই আট বছর পথে পথে ঘুরছি, দেহি এহানে কদ্দিন থাকা যায়। তয় থাকার জন্যই আইছি এ মরা মাটিতে।

রেঞ্জার সাহেব বুঝেছেন ওদের থামানো যাবে না এভাবে। বনবিভাগের জমি দখল করেছে বেআইনী ভাবে, বন কাটাই করছে। রিপোর্টটা সদরে পাঠাতে হবে। এছাড়া তাঁর করার কিছুই নেই।

চুপ করে ফিরে আসছেন—হঠাৎ নদীর বিস্তীর্ণ বুকে কলরব জয়ধ্বনি—চীৎকার শুনে চাইলেন, নদীর বুকে ছেয়ে আসছে ছোট বড় বহু নৌকার বহর। নৌকার পাটাতনে শীর্ণ মানুষগুলো দুহাত তুলে চীৎকার করছে।

এই দ্বীপ থেকেও বের হয়ে এসেছে অনেক মানুযজন মেয়েরাও। কারা শাঁখ বাজাচ্ছে—উলুধ্বনির শব্দ ওঠে। দ্বীপের মাটির উলুধ্বনির প্রতিধ্বনি তোলে নৌকার পাটাতনের মেয়েরাও। নৌকাগুলো নোতুন দ্বীপের মাটিতে এসে ভিড়ছে।

গিরিজা—কালু—নবীন মাষ্টাররা চেয়ে দেখছে ওই দ্বীপভূমিকে, ঝিলার বিস্তীর্ণ গাং-এর ধার ঘেসে বনরাজ্য চলে গেছে বহুদূর দক্ষিণ অবধি, কিছুটা মাত্র সাফ হয়েছে বাকী জমিতে এখনও রয়েছে জমাট আদিম অরণ্যভূমি, বহু নীচে দেখা যায় একটা নদী ঝিলা থেকে বের হয়ে ভিতরে ঢুকেছে, ওই নদীই দ্বীপের সীমারেখা, সবুজ অরণ্য, নরম পলিমাটির দ্বীপ। দণ্ডকারণ্যের মত রুক্ষ পাথরের রাজ্য নয়। কেতকী—ললিতা চেয়ে দেখছে ওই দ্বীপটাকে।

নিশিকান্ত—শরৎ-এর মুখে চোখে উত্তেজনা। আবার তারা ফিরছে পলিমাটির জগতে।

নিশিকান্তরা নামছে, কাদা পলির গাং।

নিশিকান্ত নেমে মাটিতে মাথা ছোঁয়ায়। বলে সে কেতকীকে,

—বৌ, গড় কর মা বসুমতীকে। ছাওয়ালেরে গড় করা। এ মাটি থনে যেন আর পথে নামতি না হয় রে।

মানুষগুলো বহু পথ পার হয়ে আজ এই দ্বীপভূমিতে এসেছে ঘরের ঠিকানা খুঁজতে।

গিরিজা, কালু পটলারা মালপত্র নামাচ্ছে।

গণেশ গোলদার আরও কয়েজন আসে। এ দ্বীপে তারা আগেই এসেছে।

গণেশ বলে—আহেন কত্তা। কি নাম তোমার?

গিরিজা তার নাম বলে, এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কালু দেখছে এবার ডাঙ্গায় উঠে অরণ্য ঘেরা দ্বীপটাকে, ওদিকে বেশ কিছুটা নীচু জমিতে নোনা জল রয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। জমির বাকীটা অনেক উঁচু। কিছু নারকেল গাছও মাথা তুলেছে ওদিকে বন বিভাগের কাজের চিহ্ন নিয়ে, আর উঠেছে বেশ কিছু ঝাউগাছও।

গণেশ বলে—এখন চলেন ক্যাম্পে, দেখেশুনে পরে জায়গাপত্র নেবেন। এতডা পথ আইছেন বিশ্রাম করেন। কাদের ডেকে বলে,

—কিছু মাছ ধইরা আন এনাদের জন্যে।

নোতুন অনেক মানুষ নামছে দ্বীপে।

রেঞ্জারবাবু দেখছেন ওদের। তার বোটম্যান সরসী লস্কর বলে,

—ই'কি হচ্ছে বাবু! ওই মানুষগুলান এ দ্বীপ জবর দখল কবে থাকবে নাকি? ঐ জমিতে ঘাস হয় না। নোনাজল ওঠে।

ভেড়ি দিতে হবে, দুবছব তো লাগবেই। ততদিন থাকবে এখানে?

বিশ্বাস করা যায় না। রেঞ্জার অসিত দত্তের মনে হয় এরা মস্ত ভুল করছে। খাবার জলও মিলবে না এপারে, ওপারের বসতে জলের সঞ্চযও কম। এখানে কিভাবে বাঁচবে এত মানুষ তাও জানে না অসিত দত্ত।

কিন্তু মনে হয়েছে তার ওরা এইখানেই থাকবে।

অসিত দত্ত বলে বোটম্যানকে—চল ওপারে। এবার ঝামেলাই বাড়বে সরসী, মানুষ মানেই ঝঞ্ঝাট। এতকাল সুন্দরবনে তবু শান্তিতে ছিলাম বনবাসে, এবাব তাও যাবে। আমার আর কি? রিপোর্ট করে দিই সদরে যা ভালো বোঝে করুক তাঁরা।

কয়েকদিনের মধ্যেই নির্জন দ্বীপটার রূপ বদলে যায়। আসছে নোতুন মানুষের দল। বাইরের সাহায্য কিছু আসছে। এরমধ্যে ওরা বিভিন্ন বৃত্তির লোক এনেছে, দ্বীপের একদিকের উঁচু মাটিতে বসেছে কিছু দোকান পশার, কামারশালাও বসে গেছে। সেখানে তৈরী হচ্ছে লাঙলের ফাল—এটা সেটা। ছুতোর মিস্ত্রী করাতিও এসেছে। তাদের কাজের কামাই নেই।

দ্বীপের ভিতরে একটা ছোট খাল বয়ে গেছে, তার ধারে ওরা বন কেটে গাছ এনে তক্তা ফাড়ছে। কাঠের অভাব নেই। সেখানে তৈরী হচ্ছে ছোট বড় কয়েকটা নৌকা। লোকবসতের দিকে খালটা খুব বেশী চওড়া নয়, সেটা পাবাপার করতে হয় প্রায়ই।

তাই নৌকার দরকার। ওরা দু'একটা পুরানো ডিঙ্গি কিনিছে ওপারের লোকদের কাছে। নিজেরাও ডিঙ্গি বানাচ্ছে।

গিরিজা-কালুরা দ্বীপের মানুষদের কাছে জন হয়ে উঠেছে। একটি বৃহৎ পরিবারের মতই যেন বাঁচতে চায় তারা সকলে।

নিশিকান্ত বলে—নৌকায় জল মালপত্র নে উঠতে কষ্ট হয়।

মেয়েরাও ওপারে যাতায়াত করে।

কেতকী—ললিতারাও গেছে সেদিন ওপারের গ্রামে। ছোট নদী পার হয়ে ভেড়িটা চলে গেছে হাটতলার দিকে। নিশিকান্ত, শরৎ দাসও চলেছে হাটতলায় পুজো দেখতে। দুর্গাপুজো হয় ওখানে।

বড় নদী রায়মঙ্গল চলে গেছে পূবদিকে, জলের বিস্তারের ওদিকে দূর দিগন্তে দেখা যায় গ্রামের রেখা। শরৎ দাস থমকে দাঁড়ালো। বলে সে—হালদার ওই দ্যাহ বাংলাদেশ, আমাগোর খুলনা জিলা দেহা যায়।

পাখীগুলো গাং-এর বিস্তারে ভাসা মেঘের কোল ঘেঁসে উড়ে উড়ে চলেছে ওই দূরছায়াঘেরা দেশের দিকে। পাখীগুলোর যাতায়াতে বাধা নেই। বাধা শুধু তাদের বেলাতেই।

বুড়ো শরৎ দাসের চোখে জল নামে!

নীল আকাশে মেঘগুলো পেঁজা তুলোর মত ভেসে ভেসে চলেছে, ওদের গায়ে লেগেছে পড়ন্ত রোদের জাফরানী রং, নীল জলভরা গাং-এর বুকে বেগুনী রঙের আলো জাগে। ঢাক বাজছে চরের শূন্যতার মাঝে, সবুজ কাশবনের মাথায় সাদা চামর ফুল দুলছে, ঢাকের বাদ্যিটা নদীর জলে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

এমনি ছেলেবেলাতেও শরৎরা রূপসা নদীর ধার দিয়ে যেতো পুজো দেখতে। আজ সব হারিয়ে কোন ভিন্‌মাটিতে ঘুরছে। ঢাক বাজে, কাশ ফুল ফোটে—আকাশের বুকে আসে শরৎকালের সাদা মেঘের ভেলা—গুনগুন মৌমাছি ফেরে, প্রকৃতির সেই রূপ বদলায় নি। সে অপরূপা, সুন্দরী রয়ে গেছে আজও তার নিভৃত জগতের কোণে কোণে।

বদলে গেছে মানুষ।

মানুষের বিশ্বজোড়া পাশাখেলার আসরে তারা পরিণত হয়েছে প্রাণহীন ঘুটিতে, অলক্ষ্য হাতের কারসাজিতে তাদের ভাগ্যের উত্থান পতনের খেলা চলেছে।

—বাবা! কেতকী ডাকছে ওকে। শরত-এর হুস হয়। বলে—চল মা।

খোকনকেও সঙ্গে নিয়েছে কেতকী, কুমীরমারীর হাটে ওর জন্য কিনেছে এতটা নোতুন লাল জামা, কপালে দিয়েছে কাজলের টিপ, চোখে কাজল রেখা। সব হারিয়েছে তাদের, তবু কেতকী ওই শিশুটিকে ঘিরে আবার ঘর বাঁধার, ভালোবাসার স্বপ্ন দেখে।

সুরভি-যমুনাদের নৌকা দুখানা ভেসে আসছে ভাটার টানে।

বনবিহারী-যদুপতিরা দেখছে গাং-এর মারমূর্তি। শেষ শরতের ভরা গাং যেন ফুঁসছে। কাদম্বিনী বসে আছে চুপ করে।

যমুনা শুধোয় মাঝিকে—ঠিক যাচ্ছি তো?

মাঝি বলে—এ গাং আমাদের চেনা মা, হুই যে ট্যাকের মাথায় গাছ দেখছেন, ওডা বাঘনা বন অপিস—ওর ওদিকেই সেই দ্বীপ। ডরান ক্যান—নৌকা পারমুখো পাউড়ি ধরছি ইবার। আসি গেলাম।

ওরা দূর দিগন্তে শুধু রেখার মত গাছ-এর আভাস মাত্র দেখে।

কানে আসে ঢাকের শব্দ।

খেয়াল হল তাদের। কাদম্বিনী বলে—পুজোর দিন আইল না? দুগ্গাপুজা।

ওদের জীবনে কোন উৎসবের আনন্দের অবকাশও নেই। কয়েকদিন ধরে বহু উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরছে পথে পথে। কখন দুর্গাপূজার দিন এসে গেছে জানে না।

মাঝি বলে—কুমীরমারীর হাটতলায় পুজো হয়। তয় পুজোর পরই ঠ্যালা। শেষ ষাড়াষাড়ির বান আসবে। তখন ভেড়ি টিকলে ধান বাঁচবে, গাঁ বাঁচবে। মানুষের মুখে হাসি ফোটে এখানে তখন।

ওদের নৌকাটা এসে ভিড়েছে হাটতলাব ঘাটে।

পুজোয় ঢাক বাজছে। ছিন্নমূল মানুষগুলো নেমেছে। বনবিহারী বলে—মারে প্রণাম করি আয় সব।

লোকজনের ভিড় জমেছে। ওদিকের গাছের নীচে মাঠে দু'চারটে তেলেভাজা টুকটাক মণিহারীর দোকানও বসেছে। কালুও এসেছে ওদের বসতির লোকজনের সঙ্গে।

বহুদিন পর তারা লোকালয়ে এসেছে, সামনে ধানমাঠ। সবুজ থেকে সোনা রং ধরেছে ধানে, কালু গিরিজারা স্বপ্ন দেখে। তাদের দ্বীপেও এমনি ধান হবে একদিন। কেতকী গিরিজা ঘুরছে মেলায়।

কালু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দু'চারটে নৌকায় লোকজন আসছে যাচ্ছে। সামনে গাং-এর বিস্তার। তার জীবনের শূন্যতার কথাই মনে পড়ে।

আজ বহুদূরে এসেছে তারা। যমুনারা বোধহয় জানে না, তারা কোন্ নরকে পড়ে আছে। রায়পুর শহরের কথা মনে পড়ে। কালু তার কোন খোঁজই পায়নি আর।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল।

যেন স্বপ্ন দেখছে সে। ঘাটের ধারে একটা সোনাঝুরি গাছের সবুজ পাতা ছেয়ে এসেছে সোনালী ফুলের রাশি রাশি মঞ্জরী, বাতাসে ওঠে তার মিষ্টি সুবাস।

হঠাৎ তাকে কে ডাকছে, চমকে ওঠে কালু।

যমুনা ঠাকুর দেখে একা উঠে এসেছে এদিকে। কোন গৃহস্থের ঘর-কলাবন দেখা যায়, ধানক্ষেতের মিষ্টি গন্ধ মিশেছে সোনাঝুরি ফুলের সঙ্গে।

যমুনা আজ ফিরেছে তার চেনা মাটিতে। বেঁচে এসেছে নরক থেকে। কিন্তু একা। আজ কালুও হারিয়ে গেছে কোন বিরাট সীমাহীন বিশ্বে।

হঠাৎ ওকে এখানে দেখবে ভাবেনি যমুনা।

—তুমি।

কালুও ছুটে আসে। দেখছে যমুনাকে। মুখে চোখে পথের ক্লান্তি জড়ানো। তবু ডাগর চোখের চাহনিতে কি হারানো আশ্বাস খুঁজে পায় কালু।

—তুই এসেছিস যমুনা?

কালু কি অধীর ব্যাকুলতা নিয়ে ওকে কাছে টেনে নেয়। যমুনার দু'চোখে জল নামে কি খুশীতে।

কালু বলে—কাঁদিস নি যমুনা। সেদিন বুঝিনি, ভুলই করেছি একটার পর একটা। আজ আর সে ভুল করুম না রে।

যমুনা কান্নাভিজে স্বরে অনুযোগ করে,

—একেবারে ভুলে গেলি আমাদের। খোঁজ খবরও নিলিনা। কোথায় ছিলাম—কি করছিলাম! ওরা নরকেই নামিয়েছিল রে।

কালু ওকে কাছে টেনে নেয়। আজ তার মনে অনেক পাবার সুর জাগে। জীবনের বহু বেদনা, বহু বঞ্চনা অপমান আর ব্যর্থতাকে দেখেছে তারা। কালু বলে,

—ওসব কথা ভুলে যা যমুনা। পাপ আমরা করিনি—ওদের লোভকেও ঘেন্না করি। ওসব ভুলে যা।

হঠাৎ কার হাসির শব্দে চাইল। সুরভিও এসে পড়ে।

সে ওদের দেখে বলে—যুগল মিলন হইছে তাহলে? এ্যাঁ—কি বরাত তোর লা যমুনা। আর কালু তোরেও কই, তর জন্যই ছুটে আইছে যমুনা।

যমুনার চোখে সলজ্জ হাসির আবেশ।

ভয়ে ভয়ে যমুনা শুধোয় —বাবা মা ভালো আছে তো?

এদের জীবনের হিসাব নাই। পথে পথে এমন অনেকেই হারিয়ে গেছে। তাই ভয় হয় যমুনার ওদের খবর নিতে। কি দুঃসংবাদ শুনবে কে জানে।

কালু বলে—সবাই ভালো আছে! তোর বাবা মাও পুজো দেখতে এসেছে। ডাকছি তাদের।

যমুনার সারা মনে আজ খুশীর সুর জাগে। হারানো মেয়েকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে। এসেছে ললিতা। বহুদিন পর তারা আবার মিলিত হয়েছে। ললিতার দুচোখ ছেয়ে জল নামে। কাঁদছে রামানুজের স্ত্রী মেয়েকে পাবার আনন্দে।

নিশিকান্ত বলে—এ মাটিতে এসে সবই ফিরি পাবে শরৎ! এ মাটি মনে লয় আমাগোর ফেরাবে না হে।

ভক্তিভরে ওই মানুষগুলো কি ব্যাকুলতা নিয়ে ওই দেবীমূর্তিকে প্রণাম করে।

নিশিকান্ত বলে—চল। ফিরতি হবে।

ওরা আজ খুশী মনে হারানো মানুষদের নিয়ে ফিরছে নোতুন দ্বীপে।

সুরভি বনবিহারী যদুপতিদের পরিচয় করিয়ে দেয় ওদের সঙ্গে। শরৎ দাস বলে—আবাদে এবার নোতুন করে বসত করো সবাই। তবে এখানে খাটতি হবে। গড়তি হবে সবকিছু। ওই মরা নোনা মাটিতে তার আনতি হবে।

সুরভি যমুনারা দ্বীপে এল। নৌকা ভেড়বার জন্য তার মধ্যেই দ্বীপে এরা নিজেরাই বনের কাঠ তক্তা দিয়ে মজবুত করে জেটি বানিয়েছে। দ্বীপের বুকে রাস্তার পত্তন করেছে। সারবন্দী চালা, ওদিকে মাটির বুকে গভীর একটা কুয়ো খুঁড়ছে তারা অনেকখানি জায়গা নিয়ে। ওদের বিশ্বাস মিঠে জল বের হবে এখানে।

গিরিজা বলে—টিউবওয়েলও বসছে। কলকাতার লোকজন অনেকেই সাহায্য করছেন। মিঠে জলও পাবে নিশ্চয় তারা এখানে।

শরৎ দাস-নিশিকান্তরা এখন যেন ক্লান্ত। ওরা ক'দিনেই আরও লোকজন নিয়ে দ্বীপটার চারিদিকে ঘুরছে। এরমধ্যে বাইরের দু'একজন এসেছে। গণেশ-গিরিজারাও ভেবেছে কথাটা। প্রথম ক'দিন কেটেছে উত্তেজনার ঘোরে, এবার ভাবতে হবে তাদের এখানে কিভাবে বাঁচা যায়।

এর মধ্যে লোকজন মিলে বন কাটাই শুরু হয়েছে। দণ্ডকারণ্যের মত বিরাট বনস্পতি এখানে নেই। ছোট মাঝারি গাছই বেশী। ওদের সমবেত কুড়ুলের ঘায়ে তাদের কেটে চলেছে, আর মাটিতে এতকাল ধরে ওই গাছগুলো শিকড় চালিয়েছিল, সেই সব শিকড়ও তুলতে হচ্ছে ওদের।

আশ্বিনের মাঝামাঝি, তবু রোদের তাপ এখানে বেশ চড় চড় করে। লোকগুলো মাটি সাফ করে চলে।

কেতকী-ললিতারা এর মধ্যে ঘর তুলেছে।

ঘর বলতে কাঠ-পাতা দিয়ে আচ্ছাদন, খড় কিছু এনেছে ওপারের আবাদ অঞ্চল থেকে।

এরমধ্যে দ্বীপের মাটিতে গড়ে উঠেছে সার সার ঘর, মানুষগুলো ওই পরিবেশে কোনরকমে মাথা গুঁজে রয়েছে, ওদিকে বন কাটাই চলেছে—খোকনকে নিয়ে কেতকী রয়েছে একটা ঘরে, নিশিকান্ত ক'দিনেই যেন বুড়ো হয়ে গেছে।

ওর শরীরটায় গাছে যেভাবে ঘুণপোকা বাসা বাঁধে বাইরে থেকে দেখা যায় না কিছু, ভিতরে চলে তার অবক্ষয়, একদিন দমকা ঝড়ে তার অন্তঃসারশূন্য কাণ্ডটা ভেঙে পড়ে তেমনি যেন নিশিকান্তের মনেও কি বাসা বেঁধেছে। হাসি খুশী কর্মঠ লোকটা চুপচাপ থাকে। তার ছোট ছেলে ভুজঙ্গ মারা যাবার পর থেকেই নিশিকান্ত বদলে গেছে।

ব্যাপারটা নিশিকান্ত নিজেও বুজেছে। মানুষ প্রথম প্রথম সব প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে সেই বাধাগুলোকে উত্তীর্ণ হয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে, তার সংসারকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। নিশিকান্তও এতদিন, এতগুলো বছর ধরে সেইভাবে লড়াই করেই বাঁচার চেষ্টা করেছিল।

শেষ ভরসা নিয়ে গেছল দণ্ডকারণ্যে।

কিন্তু সেখানেও হেরে গেছে সে, হারিয়ে গেছে তার সবকিছু। লোকটা এবার পরাজিত হয়ে ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে। ক'দিনের ধকলেও দেহমন ভেঙ্গে পড়েছে।

আর এখানে এসে ভয়ই হয় তার।

খোকন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে, সেই নধর নাদুস নুদুস ছেলেটা এখানে এসে শীর্ণ হয়ে গেছে। ঘরের গরুর দুধও পায় না, বার্লি আর সামান্য কৌটোর দুধ; আর ভাত বলতে লাল ফাটা চালের পিণ্ডি।

কেতকী খোকনকে ধরেছে, ছেলেটা নোনা মাটি মুখে পুরে নিজেই থু থু করে ফেলছে। নিশিকান্ত চাইল ওর দিকে।

কেতকী বলে—পান্তা দিই দু'গা?

নিশিকান্তের খেতেও রুচি নাই। জলটাও কেমন বেস্বাদ ঠেকে। নোন্‌তা।

নিশিকান্ত বলে—এহানে ক্যান আইল ওরা? এমাটিতে ফল ফসলও হইব না। জলের জোগানও নাই, দণ্ডকরণ এরচেয়ে ভালো ছিল রে বৌ। এহানে মানুষ বাঁচবো ক্যামনে তাই ভাবি।

কেতকীরও ভালো লাগেনি জায়গাটা।

নিজের ঘর-সংসার, গরু-বলদ, তুলসীমঞ্চ কিছুই নেই। আবার সেই ক্যাম্পের ভিখারীর মত জীবন কাটাতে হচ্ছে তাদের।

ক'দিন থেকেই আকাশে মেঘ জমছে, নদীর রূপও বদলে গেছে। নদী নয়—যেন অকূল সমুদ্র, আর ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে তীরভূমিতে, বাতাসে ওঠে গর্জন।

বড় নদীতে নৌকাও যাচ্ছে না, শরৎ দাস-এর বাড়ি ছিল আগে খুলনার ভাটিতে রূপসা-পশর নদীর এলাকায়। দেখেছে সে আগে নদীর এই রূপ। শরৎ দাস বলে,

—কোটালের ষাড়াষাড়ির বান ডাকতি পারে, হুঁসিয়ার থাকবি সবাই।

চারিদিকেই জল।

সেদিন বিকেল থেকেই মেঘ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে আর মত্ত নদীর গর্জন বেড়ে ওঠে। মানুষগুলো চমকে ওঠে। ঝড় উঠেছে। সুন্দরবনের দিকে ঝড়ের বাতাস রুদ্রমূর্তি ধরে হানা দিয়েছে।

চীৎকার করে কে—ডিঙ্গি গুলান খালের ভিতরে নে যা! বাতাসের বেগে ওদিকে চালা দুখানা বার কতক নাড়া খেয়ে ছিটকে উঠে যায় আকাশে। চীৎকার করছে ভীত ত্রস্ত মানুষগুলো।

ওদিকে ঝুপড়ি থেকে ছুটে বের হয়ে আসে কেতকী।

নিশিকান্ত আর্তনাদ করে, একটা কাঠ ছিটকে এসে পড়েছে তার উপর। গিরিজা বাবাকে টেনে আনছে ঘর থেকে।

অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। চারিদিকের নদীর গর্জন ভেসে আসে। ভীত ত্রস্ত মানুষগুলো এসে জমা হয়েছে দ্বীপের মাঝে। হঠাৎ ওদিক থেকে আর্তনাদ ওঠে অন্ধকারে।

—জল। জল ছাপিয়ে উঠছে।

অবাক হয় তারা। শরৎ চীৎকার করে,

—কোটালের বান আইছে। হুঁসিয়ার!

নদীগুলো দেখা যায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ঢেউ ভাঙ্গছে এসে দ্বীপের মাটিতে, আর জলস্রোত এগিয়ে আসছে। ডুবছে তাদের ঘর বসত—ঝুপড়িগুলো থেকে বের হয়ে পড়েছে মানুষ।

কালু হাঁক পাড়ে—সবাই এদিকে এসে ওঠে গিয়া। হুঁসিয়ার!

এমন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় নি তারা। ঝড়—আবার বৃষ্টি আর বন্যার তোড় সব একসঙ্গে হানা দিয়েছে এই দ্বীপের উপর। আকাশ ফাটিয়ে বিজলির ঝিলিক ওঠে। বনের দিক থেকে ভেসে আসে বাঘের ডাক।

শিউরে ওঠে ভীত ত্রস্ত মানুষগুলো।

নিশিকান্তের হাত পা কাঁপছে, দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই।

—বাবা! কেতকী ধরেছে বুড়োকে একহাতে, অন্যহাতে খোকনকে ধরে জলস্রোত ঠেলে আসার চেষ্টা করছে। ঠাণ্ডা হিমজলের স্রোত ঠেলে ফেলে দেবে তাদের।

আর্তনাদ করে ওঠে সে, হাত ছিটকে খোকন পড়েছে জলের মধ্যে। সুরভিও ছিল পাশে। সে ধরে ফেলেছে ছেলেটাকে, জলও খেয়েছে দু'একঢোক। নোনা জল। ছেলেটা কঁকিয়ে ওঠে।

গিরিজা-গোবিন্দ-কালুরা নীচু জমি থেকে মানুষগুলোকে টেনে আনছে উপরের ডাঙ্গায়, কাদের চীৎকার ওঠে—তীব্র স্রোত নামছে নদীর দিকে।

কে ভেসে চলেছে ওই স্রোতে নদীর দিকেই।

আর অন্ধকারে জল তোলপাড় করে একটা ঝাপটার শব্দ ওঠে। টর্চের আলোয় চমকে ওঠে ওরা।

—হুঁসিয়ার! কুমীর!

একটা বিরাট কুমীরের ল্যাজের ঝাপটায় গতিলাল ছিটকে পড়ে, কুমীরটাও স্রোতের টানে উঠে এসেছিল এদিকে শিকারের সন্ধানে, সামনে মানুষটাকে পেয়েই ধরে নিয়ে চলেছে নদীর দিকে। চীৎকার করছে গতিলাল—ওর বৌ হাঁক পাড়ে!

ছুটে আসে ওরা, কিন্তু ততক্ষণে বুকজল থেকে কুমীরটা ওকে টেনে নিয়ে নদীতে পড়েছে। শূন্যে দুহাত তুলে অন্তিম আর্তনাদ করে তলিয়ে গেল গতিলালের দেহটা। আর দেখা গেল না তাকে।

বাতাসে ওঠে মৃত্যুর পদধ্বনি।

নিশিকান্ত চীৎকার করে—মরবি, হক্কলেই মরবি এইবার! কোথায় আলি তোরা!

বনের দিক থেকে বাঘের গর্জন ওঠে। বনভূমি জলে ডুবে গেছে, সেই ডুবন্ত বনে জলস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঘটা গর্জন করছে। এদিকের উঁচু জমিতে আশ্রয় নিয়েছে হতভাগ্য বিতাড়িত মানুষগুলো। বাঘটা গজরাচ্ছে কি হিংসায়, বনের আড়ালে দেখা যায় ওর চোখদুটো, নীলাভ আভায় জ্বলছে।

ভীত ত্রস্ত মানুষগুলো প্রাণপণে টিন পেটাচ্ছে, কলরব করছে রাতের অন্ধকারে।

গতিলালের বৌটা তখনও বিকটস্বরে চীৎকার করছে। তার মেয়েকে রেখে এসেছে দণ্ডকারণ্যে, আজ স্বামীকেও তুলে দিল কুমীরের মুখে। কামিনী চীৎকার করছে —আয়, আমারেও লই যা! পোড়ার মুখা ভগমান তর মনের সাধ পূর্ণ হউক।

বন্যার জল উপরের মাটির ঢিবিগুলোর কাছাকাছি এসে গেছে, কে অন্ধকারে গরাণ খুটো দিয়ে একটা সাপকে পিটছে, সাপটা ভেসে এসেছে কোথা থেকে। আঘাত পেয়ে গোখরো সাপের পিঠের শিরদাঁড়াটা ভেঙ্গে গেছে। সোজা হয়ে উঠেছে মাঠি থেকে, ফনা তুলে গজরাচ্ছে হিস হিস শব্দে আর ছোবল মারার চেষ্টা করছে।

ওটাকে পিটিয়ে শেষ করে ওরা।

কেতকী শাড়ির আড়াল দিয়ে খোকনকে এই বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। ছাতাটা বাতাসের তোড়ে উড়ে গেছে। কোথায় কোন আশ্রয় নেই। ভিজছে তারা। বাচ্চাটাও ভিজে গেছে, অনেকের বাচ্চারাও অমনি অসহায়ের মত ভিজছে আর কঁকিয়ে কাঁদছে! অসহায় সেই কান্নার সুর।

গর্জে ওঠে নিশিকান্ত—ওটার গলায় পাড়া দিই মাগি ফ্যাল্ বৌ। তহন কই নাই? ক্যান আইলি এই যমপুরীতে! এর চেয়ে দণ্ডকরণ ছিল ঢের ভালো।

জল তখনও বেড়ে চলেছে। বাতাসে ওঠে ঝড়ের দাপট—জলস্রোতের গর্জন—আর মানুষের আর্তনাদ—বাচ্চাদের কান্নার শব্দ। কেতকী ঠায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে। বাচ্চাটা কেঁদে কেঁদে যেন নেতিয়ে পড়েছে হিমে। কেতকী ওকে আদুড় বুকের মধ্যে জড়িয়ে তার দেহের অবিশষ্ট উত্তাপটুকু দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

ভোর হয়ে আসছে। ফিকে হয়ে আসে রাতের জমাট আদিম অন্ধকার। কমে আসছে জলের চাপ, ক্রমশঃ জলটা পিছিয়ে চলেছে, ঝড়ের দাপট কমে আসে, বৃষ্টির ঝাপটাও। সকালের দিকে বৃষ্টিটা থামে, আকাশে মেঘগুলো এইবার ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে।

এক রাতের সর্বনাশে দ্বীপটার চেহারা বদলে গেছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষগুলো ওই ভিজে মাটিতেই বসে আছে, ওর মধ্যে টিকে থাকা চালা দু'একটায় মেয়েছেলেরা মাথা গুঁজেছে। চারিদিকে তখন কালো একপুরু কাদার প্রলেপ। ছড়িয়ে আছে কাঠকুটো, দুচারটে থালাবাসন—ভিজে চট। আর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ঘরগুলো। তবু ওদের খাবার দাবার বাক্স টাক্স তুলে এনেছিল এই উঁচু ডাঙ্গায়।

কালু, গিরিজা, গোবিন্দ, পটলের দল এর মধ্যে হাঁক ডাক করে জড় করেছে ওই লোকগুলোকে।

শশীপদ এখানে এসে অবধি নানা কথাই বলেছে।

কৃপাসিন্ধু ভিজে কাদা মেখে গর্জায়—চলি যামু এহান থনে। এহানে কেউ বাঁচবি না কইলাম।

বাধা দেয় কালু—দণ্ডকারণ্যেই এই কথাই কইছিলা। তহন তুমি কইছিলা সুন্দরবনে চলো, আইজ কইছ থাকুম না এহানে? তয় ক্যান্ তহন সকলেরে কইছিলা সুন্দরবন আসার কথা?

কৃপাসিন্ধু কালুদের চেনে। বৃষ্টিতে ভিজে কাদা জলে ওরা রাতজেগে কাজ করছে, চেষ্টা করেছে এদের বাঁচাবার। দু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। গতিলালকে কুমীরে নিয়ে গেল—নামো কলোনীর দুজন মরেছে সাপের কামড়ে।

মৃত্যুর এমন থাবা তার এই ক'বছরেই দেখেছে বার বার তাদের মাঝে হানা দিতে। গিরিজা বলে,

—বসতের চারিপাশে ভেড়ি বাঁধ দিতে হবে। দেরী নয়—আজ থেকে সবাইকে হাত লাগাতি হবে। বাঁধ ছিল না তাই ডুবেছি। বাঁধ দিতেই হবে!

তাদের বাঁচার জন্য এ করতেই হবে, সামনের পূর্ণিমার জোয়ার আসবে! সেই বান ঠেকাতেই হবে।

শশীপদ শোনায়,

—আর আমাগোর বাঁচার জন্যি খোরাকী চাল কনে পামু?

এ প্রশ্ন সকলেরই।

এতকাল এই সাত আট বছর ধরে তাদের এ ভাবনাটা সরকার ভেবেছে। হয়তো ভালোভাবে পায়নি—তবু কোনমতে টিকে থাকার মত খোরাক, টাকা কিছু পেয়েছে। দণ্ডকারণ্যেও তাদের এ অবস্থা ছিল।

একটা আশা ছিল নিজেদের জমিতে ফসল হবে। কিন্তু এখানে সেই আশ্বাস দেবার মত কেউ নেই।

কালু ফুঁসে ওঠে—চেরকাল তোমারে কে খাতি দেবে? এহানে তোমারডা তোমারে রোজকার করতি হবে। দরকার হলে ওপারের আবাদে যাই জন খাটতিও হবে! স্বাধীন হই বাঁচতি চাও, আর কও খাতি দেবে কেডা?

কঠিন সত্য কথাই।

সুরভি বলে ওঠে—ঠিক কইছস কালু!

ওই স্তব্ধ মূক মানুষগুলোর মনে আজ কথাটা জাগে। এতদিন পর তারা এই মাটিতে এসেছে স্বাধীনভাবে নিজের চেষ্টাতেই বাঁচার জন্য। তারাও এই বিপদ—ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এসেছে। দরকার হয় তারা এখানে থেকেই জন খাটবে, নিজের জমি ঘর বাঁধবে। এ মাটিকে সুরক্ষিত করবে, আর এর মধ্যে তাদের একটা সমস্যার সমাধান হয়েছে কিছুটা। কাঠ-এর দাম অনেক। তারা এখানের বন কেটেই কাঠ বিক্রি করে চালাবে।

শরৎ দাসও আজ এখানেই বাস করতে চায়। জেলের কাজ জানে, অনেকেই সেই সম্প্রদায়ের লোক। তারা এই গাং-খালে পেয়েছে প্রচুর মাছের সন্ধান। জাল কিছু কিনে মাছ ধরে মহাজনদের ভালো দামে বিক্রী করছে।

আজ তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার কথা ভাবে।

এত দুঃখ বিপদ—মৃত্যুকে দেখেও বলে শরৎ দাস,

—কথাটা ভাবি লাও তোমরা? যে যাতি চাও যাও গিয়া। আমরা এহানেই থাকুম। অনেক মরছি—মরণেরে ডরাই না। যে যাতি চাও চলি যাতি পারো।

জনতা চুপ করে থাকে। কৃপাসিন্ধু-শশীপদরাও মুখে ফুটে কিছু বলতে পারে না। এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছা থাকলেও একা-একা চলে যাবার সাহস নাই। যাবার কোন ঠাঁইও নাই। তাই চুপ করে থাকে।

গিরিজা বলে—তাহলে আজ থেকেই বাঁধ দেব। আর নামা খালের জমির মুখে আজ জাল বসাতি হবে এখুনিই, ভাটার জল নামার আগেই।

শরৎ দাস-রামানুজরা বলে,

—শুধু জালই নয়, পরে ওহানের মুখে বাঁধ দিই বাক্স কল বসিয়ে ভেড়ি বানাতি হবে। সারা চরের ওই খালের ধারে দুইটা নোনা জলের ভেড়ি করুম।

মেঘ ভেঙ্গে রোদ উঠছে।

ওরা কাজ করে চলেছে বাঁধে। হাজার খানেক—মায় সোমর্থ মেয়েরাও লেগেছে, সুরভি যমুনাও ঝুড়িতে করে মাটি বইছে। আরও অনেকে।

আর ওদিকে বিস্তীর্ণ জলাভূমির নীচে জাল ঘিরে ওরা মাছ ধরতে নেমেছে। কোটালের গোণে সমুদ্র থেকে রকমারী মাছের ঝাঁক উঠে আসে। পার্শে-ভেটকি-পমফ্রেট-সিলেট-বাগদা চিংড়ি আরও অনেক মাছ।

দুদিকের জলা থেকে ভাটার জল নামছে, চারিপাশে পলিকাদার উপর রূপালী মাছের ঝাঁক এসে আটকে পড়েছে, আর কাদায় ছিটিয়ে আছে ঝাকবন্দী বাগদা চিংড়ির দল।

দ্বীপের ছেলে বুড়ো সবাই নেমেছে সেই মাছ সংগ্রহ করতে। দুদিকের জলা জমির চারিপাশে ভিড় করে ওরা মাছ ধরছে। বিরাট ঝুড়ি-ক্যানস্তারাতেও ধরেনি। কতকগুলো টিন ফেলে খানিকটা জায়গা ঘিরে মাছ গাদা করছে তারা।

শরৎ দাস-গোবিন্দ-গিরিজারা আসা করেনি এত মাছ পাবে তারা। শরৎ দাস বলে,

—জলার মাছ ধরবি না। থাকতি দে। এই দশদিন ধরে বেচবি।

এত মাছ কেনার লোকের অভাব নেই। বাঘনা নদীর ওপারেই ফরেষ্টের ঘাটের কাছে মাছ মহাজনের খুঁটি রয়েছে! এখানের জেলেদের সব মাছ ওরা কিনে বরফ দিয়ে চালান পাঠায় ন্যাজাট না হয় ক্যানিং-এর ঘাটে। সেখান থেকে চলে যায় কলকাতার বাজারে।

মহাজন বিভূতি নস্করও এসে পড়ে। বাগদা চিংড়ির স্তূপ দেখে অবাক হয় সে। কলকাতায় নিদেন পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে বেচবে সে, এসব মাছ বিদেশে চালান যায়, বাজারে পড়তে পারে না।

বিভূতি মহাজন হিসেবী লোক।

এই মাছের কারবার করে সামান্য অবস্থা থেকে নিজের লঞ্চ করেছে, কিছু জেলেদের দাদন দিয়ে মাছ ধরায়, যাতে কলকাতার বাজারে তার বাঁধা আড়ত ঠিকমত চলে।

কালো গোবদা চেহারা। বিভূতি নস্কর এসেছে এই দ্বীপের এ মাথায়। দেখে অবাক হয় সে। এর মধ্যে এই লোকগুলো খালের পাশে বাঁধ দিয়ে বিস্তীর্ণ জলা এলাকা দুটোকে নোনা জলের ভেড়িতে পরিণত করতে চলেছে, এতদিন ধরে বন—এই ডুবো জলা পড়েছিল বনের সম্পত্তি হয়ে। এভাবে এই এলাকাকে ভেড়িতে পরিণত করার কথা ভাবেনি। এরা করতে চলেছে।

আর এই লোনা জলের ভেড়িতে মাছের অভাব হয় না, বাঁধের নীচে বড় মাপের কাঠের তৈরী জল ঢোকার মুখ থাকে। পূর্ণিমা অমাবস্যার জোয়ারের সময় নদীর জল ফুলে ওঠে, তখন জলে মাছেরও আমদানী হয়, মাছের ডিমও থাকে প্রচুর, সেই জল ওই মুখ দিয়ে ঢোকে ভেড়িতে। ভেড়ি ভর্তি হয়ে যায়। আর মুখ বন্ধ করে সেই জল আটকে রাখে। মাছ বড় হয়, মাছ ধরা যায় পনেরো দিন ধরে। মাসাবধি কালও। তারপর এই জল সব বের করে পরের গোণে আবার মাছ সমেত জল ঢুকিয়ে নেয়।

এ হেন দুটো বিরাট ভেড়ি তৈরী করছে তারা। বারোমাস ধরে প্রচুর মাছ হবে, আর মিলবে বাগদা চিংড়িও। বিভূতি নস্কর আজকের মাছ-এর দর দেয় ভালোই।

গিরিজা-কালু-পটলরা আশা করেনি এত দাম পাবে। তবু এর মধ্যে গিরিজা কলকাতায় গিয়ে মাছের দর কিছুটা দেখেছে। বলে সে—তিরিশ টাকা নয়—চল্লিশ টাকা কিলো দিতি হবে মহাজন। বাগদা চিংড়ি দিচ্ছি এক নম্বর। এর দর তো নিদেন ষাট পাবেন।

শেষ অবধি একটা রফা হয়। আজ মাছ বিক্রী করে ওরা নিদেন হাজার ছয়েক টাকা পেয়েছে। আর বিভূতি নস্কর বলে,

—ওই ভেড়ির মাছও আমি নোব। সব মাছ।

শরৎ দাস; রামানুজরা এবার যেন আশ্বাস পায়। ওদেশে মাছের ব্যবসা করতে তো আগে আসে শরৎ। কিন্তু তখন এমন সোনার দর ছিল না।

গিরিজা বলে—তা দিতি পারি। আপনিও এখানের লোক আপনার ভরসাতেও থাকুম।

বিভূতির প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি আছে এই চাকলায়, আর তার বাড়িও নদীর ওপারেই। ভেড়ির ওদিকে বিরাট দোতলা পাকা দালান করেছে, পাশে মন্দির। আর জমি জায়গাও বিভিন্ন নামে মিলিয়ে কয়েকশো বিঘেই রেখেছে, এদিকে ডাকাতির ভয়ও রয়েছে। তার বাড়ির পরেই নদী—ওদিকে ছিল ঘনবন। আজ সেই বনের জমি সাফ করে এসেছে হাজারো মানুষ। ভরসা পেয়েছে বিভূতি নস্করও। আর তাদের মাছেই বিভূতির গদি চলে যাবে। বিভূতি নস্কর বলে—তা সত্যি।

গিরিজা বলে—তাই কইছিলাম কিছু আগাম দিন, ভেড়িটা দুচার দিনেই শেষ করে দিই। আগামী হপ্তা থেকে আপনাকে মাছ দিমু!

কথাটা মনে লাগে বিভূতির।

ক্যানিং-এর জানাদের মেছো লঞ্চও ঘোরাঘুরি করছে মনে হয় বিভূতির তারাও খবর পেয়ে এসেছে। ঘরের সামনের এই দাঁও সে ছাড়তে চায় না। তাই রাজী হয়ে যায় সে।

একদিনের ঝড়—সর্বনাশা বানে তাদের মন ভেঙ্গে পড়েছিল। দেখেছিল নিষ্ঠুর মৃত্যু আর নির্মম ধ্বংসকে। নিশিকান্ত উদাস চোখে চেয়ে আছে। কেতকীও হাত লাগিয়েছে।

পটলা আরও দু-একজন ছেলে এসে তাদের হুমড়ি খাওয়া ঘরখানাকে তুলছে। নোতুন কাঠ—গাছের গুঁড়ি দিয়ে মজবুত করছে। পটলা বলে—দিদি, আর ত্যামন ঝড় বাদল হবো না। কোটালের জোয়ারও চলি গেল! এরপর আরও মজুত করি ঘর বানাই দিমু।

নিশিকান্ত গর্জে ওঠে—ঘর! ঘর বানাবি এহানে?

লোকটার চুলগুলো রুক্ষ, গায়ে খড়ি পড়ছে। ক'দিনেই চাহনিটাও বদলে গেছে যেন একটা অর্দ্ধোন্মাদ মানুষ। পরণের কাপড়টাও কাদা মাখা। ভিজে কাপড়টা গায়েই শুকিয়েছে।

কাল রাতে ভিজে খোকনেরও জ্বর। কেতকী বলে,

—তর জামাইবাবুরে একবার আসতি ক' খোকনের জ্বর।

পটলা বলে—কমু। ও এহন ব্যস্ত। ভেড়ি বাঁধার কাজ চলছে। আর মাছের ভেড়ি বানাইবো। বুঝলা—এহানে মাছ বেচি কমিটি পাইছে একদিনে পেরায় অষ্ট হাজার টাহা!

নিশিকান্ত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েছিল। মাথার সাদাপাকা চুলগুলো বেড়ে কাঁধে পড়েছে। জট পাকানোর মত অবস্থা হয়েছে। হঠাৎ ফুঁসে ওঠে সে—ছাই! ছাই হবো! ভেড়ি করবে? ব্যস সরকার পয়সার নাম শুনলি কাড়ি নেবে। এহানে ওই ভেড়ি কইরাও বাঁচন যাইব না। মাটি! ....

একমুঠো নোনা কাদা তুলে বলে,

—বিষ! বিষ আছে এতে।

কেতকী ওকে থামাবার চেষ্টা করে। মানুষটা যেন বদলে গেছে, কেতকী ডাকছে—বাবা!

হঠাৎ খোকন কেঁদে ওঠে। ছেলেটা জ্বরে হাঁপাচ্ছে। চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। কেতকী অসহায়ের মত ওকে বুকে চেপে ধরে থাকবার চেষ্টা করে।

ললিতাও এসে পড়ে ছেলেটার কান্না শুনে।

বলে সে—একটু মধু তুলসীপাতা আর আদার রস দিতে পারিস?

মধু এখানের বনে মৌচাক ভেঙ্গে কিছু পেয়েছিল, ঘরে আছে। তুলসীপাতার নাম শুনে কেতকীর মনে পড়ে দণ্ডকারণ্যের বসতির সেই বাড়ির কথা। উঠানে নিজে তুলসীমঞ্চ করে গাছটা লাগিয়েছিল, বেড়ে উঠেছিল তুলসীগাছটা।

আজ সেটাও বোধহয় শুকিয়ে মরে গেছে।

—কিরে?

মায়ের ডাকে খেয়াল হয় কেতকীর। বলে সে—নাঃ। কই পামু।

—তুলসীগাছ। নিশিকান্তও যেন স্বপ্ন দেখছে সেই তুলসীমঞ্চের, ফেলে আসা বাড়িটার। নিজের হাতে

সব ভেঙ্গে দিয়ে এসেছে এই শ্মশানে। নিশিকান্ত খ্যান-খেনে স্বরে বলে,

—তুলসীগাছ-ঘর সব ফেলি আইছি ঠাইকরুণ, আবার ও কথা ক্যান কও। এহানে ওসব নাই—হইব না।

বুড়ো শশীকান্ত আজ বদলে গেছে।

একরাত্রির সর্বনাশা ভাঙ্গনের মধ্যেও সেই হতাশ মানুষগুলো আবার কি নোতুন আশা নিয়ে বুক বেঁধেছে। গিরিজা-গোবিন্দ-শরৎ দাস-মুকুন্দ সকলে মিলেই কথাটা বলে।

মাছ বিক্রীর টাকায় ওরা ধান কিনবে এই সময়। বিভূতি নস্করকেই বলেছে—সস্তায় ধান কিছু দেবে সে। তবু কিছুদিনের খোরাক হাতে থাকবে তাদের। সামান্যই—তবু কাজে লাগবে। আর দৈনিক মাছ বিক্রীর টাকাও জমবে কমিটির কাছে। তা দিয়ে ভেড়িটা শেষ করা হবে। লোকদের মজুরিও দেওয়া হবে।

সমিতির একটা বাড়িও উঠেছে। টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরে তক্তা পেতে মজবুত করে সেখানে তোলা হয়েছে রাশিকৃত ধান। আর ভেড়িটাও সারা। দিনরাত খেটে এবার কোটালের আগেই তারা ভেড়ির কাজ শেষ করেছে, যাতে আর বানের জল হানা দিতে না পারে।

কালু বলে—মজবুত করি বাঁধ দিই গিরিদা, হালায় নদী আমাগোর চুবাইবা! দেখুম তরে!

ছোট্ট দ্বীপটাকে এবার নোতুন করে গড়তে চায় তারা।

ঘর বাড়ি আবার মাথা তুলেছে—দোকান পাটও দিয়েছে দু'চারজন। কৃপাসিন্ধু এর মধ্যে ওপারের কুমীরমারীর হাট থেকে আনাজপত্র টুকিটাকি জিনিষ এনে বিক্রী করছে।

লোকটা আদৌ খুশী নয় এদের উপর।

মনে হয় কৃপাসিন্ধুর, ভুলই করেছে সে দণ্ডকারণ্য ছেড়ে এসে। হরিশ পাল সুধাকান্তের দলকে বিশ্বাস করে ভুল করেছিল।

শশীপদ এর মধ্যে তাঁত পেতেছে। গামছা-লুঙ্গি বোনে। হাটে যায় বিক্রী করতে। সেই খবরটা দেয় কৃপাসিন্ধুকে।

—এহানে এসে গিরিজা-কালুরাই লাভ করছে। দেখবা ওই সমিতির নাম কইরা মাছের ভেড়ি করছে, তার লাভ খায় ওরাই। কম ট্যাহা নয় হে।

কৃপাসিন্ধু অবাক হয়—তাই কও। তার জন্যই এত সর্দারি করছে। ওসব ঘুইচা যাইব। বনের কাঠ কাটছো—মাছ মারছো।

কথাটা কৃপাসিন্ধু কুমীরমারির হাটেই শুনেছে, সেদিন হাটে গেছে। লঞ্চ থেকে ওখানের ক্ষেত্রমাষ্টার নামছে। হাতে তার টাটকা খবরের কাগজ। আজই কলকাতা থেকে আনছে।

ক্ষেত্রমাষ্টার এই দিগরের নামী লোক। এখানের পঞ্চায়েতের মাতব্বর।

কৃপাসিন্ধু ওর বাড়িতেও যায় মাঝে মাঝে। ক্ষেত্রমাষ্টার নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। বিরাট চাষবাস। পাম্পসেট আছে নিজের। আর এই এলাকার মানুষের কাজে অকাজে থাকে। কৃপাসিন্ধু ওর কাছে সেই খবরগুলো দেয়।

ক'দিন আগেই ক্ষেত্রমাষ্টারের চায বাড়ি থেকে কিছু ফসল চুরি গেছে। কলাগাছ থেকে কলার কাঁদি, লাউও গেছে অনেক।

এর আগে নটবর বর্দ্ধনের বাড়ির উঠান থেকে গেছে কয়েক বস্তা ধান। এখানে এসব ছিলনা। গ্রামের মাতব্বররাই চটে উঠে বৈঠক ডেকেছে।

ক্ষেত্রমাষ্টারও এসেছে।

হাটবার। কুমীরমারির হাট এই অঞ্চলের শেষ সীমানায়। আর ওই দ্বীপের মানুষজন হপ্তায় দু'দিন এই হাটে আসে। মেয়েরাও আসে অনেকে।

শশীপদ আসে গামছা-লুঙ্গি বেচতে, গোবর্দ্ধন কর্মকার দেখেছে ধান কাটার মরশুম আসছে। তার কামার

শালে সে কাস্তে বানিয়ে আনে। দ্বীপের মাঝে সনাতন দর্জি দোকান দিয়েছে, খদ্দের-এর কাপড় নিতে আসে এখানে, পিরহান পায়জামা বানিয়ে দেয়।

এই গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে এখানের অর্থনীতির সঙ্গে তারা সরিকান হতে চাইছে। তাই হাটে তারাও আসে। আসে দ্বীপের কিছু মাঝবয়সী ছেলেরাও দল বেঁধে। হাটতলায় ঘোরে—চা খায় দু'এককাপ, রকমারি মশলা দেওয়া পান খেয়ে বিড়ি টানতে টানতে ভেড়ি ধরে দ্বীপে ফিরে আসে।

গোবিন্দের ছেলে অরুণ এদের দলপতি।

মাঝে মাঝে এরা টুকটাক কাজের চেষ্টা করে। কিন্তু কাজ কে দেবে তাদের। এখানের লোকই তেমন কাজ পায় না। বর্ষাকালে মাস খানেক ধান চাষের সময় আর শীতের মুখে ধান কাটার সময় কিছু কাজ পায় মাত্র।

অরুণই পথ বাতলায়। বনের কাঠ কেটে আনে হাটে, নাহয় রাতের অন্ধকারে ডিঙ্গি নিয়ে এখানের বসতের দিকে এসে কার ক্ষেতের ফসল—সব্জী তুলে নিয়ে যায়। সেই সব্জীই বিক্রী করে কৃপাসিন্ধু।

সেদিন হাটবারে মজলিস বসেছে।

চুরির সাজা দিতেই হবে। ক্ষেত্রমাষ্টার চুপ করে শুনছে। নটবর বর্দ্ধনের ধান চুরির ব্যাপারটা সাড়া তোলে চারিদিকে। কৃপাসিন্ধুও দেখছে ওদের। সারা এলাকার মানুষ যেন ক্ষেপে উঠেছে।

কে বলে—এতদিন ইসব হয়নি। এখন কেন হচ্ছে?

নটবর বলে—ওই দ্বীপে গেছলাম সেদিন, আমার নামলেখা বস্তা দেখেছি।

ক্ষেত্রমাষ্টার সবই শুনেছে। তবু বলে সে,

—বস্তা বাজারে কেনা যায় নটবর দাদা। ওকথা থাক। ওরা এসেছে, থাকুক। চোর হাতে নাতে ধরার চেষ্টা করো, সাজা হবে।

মিটিং-এ দূর থেকে অরুণের দলও শুনেছে কথাগুলো।

এই দ্বীপের অনেকেই শুনেছে। ক্ষুদিরাম বলে—আমাগোর পিছনে লাগতি চায় শরৎ খুড়ো।

শরৎ দাস-এর মনে পড়ে দণ্ডকারণ্যের কথা। সেখানেও আদিবাসীদের সঙ্গে দু'এক জায়গায় টক্কর হয়েছিল তাদের। এখানে তা হতে দিতে চায় না।

মিটিং-এ দু'একজন বলে,

—ওরা বন কাটলে দোষ নাই, তাহেল আমরাই বনের কাঠ নোবনা কেন?

পুইজালির যুধিষ্ঠির হালদারের মাছের ব্যবসা, সে জেনেছে দ্বীপের মাছের ঘেরির খবর, আর বিভূতি নস্কর এর মধ্যেই ওখানে থানা গেড়েছে। যুধিষ্ঠির বলে,

—ওরা সরকারী জলায় মাছের ঘেরি করবে, আমরা মাছের ঘেরি করবো না কেন? আমাদের বেলায় টেকসো পারিমট চাই কেন?

অনেক সমস্যাই মাথা তুলছে।

ক্ষেত্রমাষ্টার জানে এরাও কাঠ কাটে, কিন্তু বলতে পারে না।

গিরিজা-গোবিন্দরা শুনছে ওদের অভিযোগগুলো।

বেশ একটা কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। ওদের একজন মাতব্বর বলে ওঠে—রাতেরবেলায় শুনি নৌকা যাতায়াত করে বাংলাদেশের গাং-এ, ওখানে ওই দ্বীপের মানুষ টাকা পয়সা পায় কোথায়? ওদের চলছে কি করে?

গিরিজা আর থাকতে পারে না।

এতবড় অভিযোগটার প্রতিবাদ করা দরকার। বাংলাদেশ সীমান্ত এখান থেকে বেশী দূর নয়, কিন্তু বিরাট গাং পাড়ি দিতে হয়, আর বি-এস-এফ্-এর লঞ্চ পেট্রলবোটও ঘোরাফেরা করে। তবু জানে গিরিজা এখানেরই দু-একজন মাতব্বরের নৌকা যাতায়াত করে, বিদেশী মালও আসে।

গিরিজা বলে—আমাদের নামে যা বলেন মানবো বাবুরা, তবে ওই কথাটা সত্যি নয় তাই কই!

সকলেই চাইল ওর দিকে।

দীর্ঘ ঋজু দেহ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ, মুখে রোদ পোড়া কঠিন ভাব। গিরিজা বলে—দণ্ডকারণ্যে থাকতে পারিনি, তাই এসেছি এদেশে, আর আমাদের দিন চলে না খেয়ে। আমাদের ছেলে-পুলেদের মুখে দুধ দিতি পারি না। জ্বরে ভূগছে—ওষুধ নাই, পথ্যি নাই। আপনাগোর ক্ষেতে ঘরে দিন মজুরী করতি হয়, তবে তাগোর এসব দোষ দ্যান ক্যানে?

ওর কণ্ঠস্বরে কি এমন বেদনা মেশানো যেটা এদের মন ছুঁয়েছে। একটা প্রতিবাদের সুরও রয়েছে ওতে।

শরৎ দাসও শুনছে কথাগুলো। সে বলে,

—আর চুরির কথা কন? আমাগোর ছাওয়াল চোর নয় বাবু?

নটবর ফুঁসে ওঠে। তার ধান চুরির দুঃখ যায় নি। ক্ষেত্রমাষ্টারও রেগে উঠেছে। বলে সে—যদি হাতে নাতে ধরতে পারি?

শরৎ বলে—তাগোর শ্যাষ করুম।

বুড়ো বলে—অনেক কষ্টে আইছি বাবুরা। বড় কষ্টে আছি ই মাটিতে, তবু দূর থনে দ্যাশরে দেহি। এ মাটিতে তার স্বাদ পাই তাই রইছি।

ওরা যেন এদের সব কথার নীরব প্রতিবাদই করে গেল।

ক্ষেত্রমাষ্টার শুনেছে ওদের জবর দখলের কথা। কৃপাসিন্ধু বলে,

—ওরা অমনিই। সমিতির নামে নিজেরাই সব খাতিছে। বাইর থনে অনেক রিলিফও আসতিছে।

ক্ষেত্র জানে একটা ব্যবস্থা হবেই।

উপরেও নানা কথা উঠেছে। আর ক্ষেত্রমাষ্টার যুধিষ্ঠির হালদার মায় বিভূতি নস্করও মনে মনে স্বপ্ন দেখছে হাজার দেড়েক বিঘে করে দুটো ঘেরির ইজারা পেলে তারা লাল হয়ে যাবে।

গিরিজা-গোবিন্দ-শরৎরা কাজে ব্যস্ত। এতদিন ওরা খাবার জল আনতো ডিঙ্গি বেয়ে ওপার থেকে। ক'দিনের চেষ্টায় কলকাতার কোন সংস্থা তাদের জন্য এখানে দুটো টিউবওয়েল করেছে। আজ সে দুটোকে চালু করেছে। ভিড় জমেছে সেখানে। জল উঠছে।

সকলেই কাড়াকাড়ি করে সেই জল মুখে দিচ্ছে। খুশিতে উছল হয়ে ওঠে তারা। মেয়েরাও এসেছে। জল তাদেরই আনতে হতো ওপার থেকে।

কেতকী খোকনের জ্বর নিয়ে ব্যস্ত। নিজেই হাটতলায় গেছে ওপারে রমেশ ডাক্তারের কাছে। রমেশ ডাক্তার খোকনের পেট টিপে জিব দেখে পাকা পাশকরা ডাক্তারের মত। রমেশ ডাক্তার এরমধ্যে দু'একবার দ্বীপেও এসেছে।

হাতুড়ে তবু এ অঞ্চলের খ্যাতি আছে। আর নাকি দুই রকম ডাক্তারীই করে চুটিয়ে। পয়সা নাই রোগীর—করো হোমিওপ্যাথি। চার আনাতেই হবে। জোতদার মহাজনদের জন্য এলোপ্যাথী।

রমেশ বলে—বাচ্চাটাকে যত্ন করে খেতে দাও। নোনা জল সইছে না। কি এনেছো?

কেতকী তিনটে টাকা দিতে রমেশ ডাক্তার এলোপ্যাথী ওষুধই দেয়। বলে—জল ফুটিয়ে খাওয়াবে। নালে রোগ সারবে না।

খাবার জলই মেলে না প্রায়। এপারে দু'একটা মিঠে জলের ছোট পুকুর আছে, তারই জল খেতে হয়।

আজ টিউবওয়েল হতে তাই রোগা বাচ্চাটাকে নিশিকান্তের জিম্মায় রেখে ছুটে এসেছে কলসী নিয়ে কেতকী।

এ জলের স্বাদই আলাদা। বেশ মিষ্টি। মাটির বহু নীচে এখানে মিঠে জল মেলে, অতল থেকে সেই জল তুলেছে এরা।

কেতকী বলে—বাচ্চাগোর পেটের অসুখ সারবে এবার।

হঠাৎ দেখা যায় একটা লঞ্চ শব্দ করে বড় গাং থেকে এই দ্বীপের জেটির দিকে আসছে। মাঝে মাঝে

বাইরের লোকজন আসছে। কিছু সাহায্যও আসে, আসে খবরের কাগজের লোকেরা।

গিরিজা-শরৎ-ভূতনাথরা তাদের দ্বীপের এদিক ওদিকে ঘুরিয়ে দেখায়। তারা ছবি তোলে, দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলে—কি যন্ত্র আনে তাতে সেই কথাগুলোই আবার শুনিয়ে দেয়। কালু এমন কাগজও এনেছে দু'একটা। তাদের এই দ্বীপের সংগ্রামী জীবনের কথা লিখেছে সেই কাগজে।

গিরিজারা এগিয়ে যায়, কলকাতা থেকে কোন দল বোধহয় খাবার এনেছে। ছেলেমেয়েগুলো মলিন বেশে ছুটে গিয়ে ভিড় করেছে জেটির সামনে।

বনবিভাগের লঞ্চ, শান্ত জলে তখনও লঞ্চের প্রপেলারের ঢেউ উঠেছে। লঞ্চ থেকে নামছে ডি-এফ-ও সাহেব, সঙ্গে পদস্থ পুলিশের অফিসার আরও দু-তিনজন, আর ক্ষেত্রমাষ্টার আশপাশের গ্রামের দু'একজন মাতব্বর রয়েছে। যুধিষ্ঠির হালদারও নামছে লঞ্চ থেকে।

ডি-এফ-ও সাহেব দেখছেন উঁচু সদ্যনির্মিত ভেড়ি বাঁধটা, বাঁধটা দ্বীপের দূর দক্ষিণ অবধি চেলে গেছে, ওরা সেই ভেড়ি ধরে চলেছেন।

গিরিজা-গোবিন্দ-কালুরাও চলেছে পিছু পিছু।

যুধিষ্ঠির হালদারই দেখায় ডান হাতে বিস্তীর্ণ জলা—ওদিকে বাঁধ—তার পরই ছোট খাল, ওই খালের ওদিকের বনে কারা কাঠ কাটছে। ডিঙ্গিতে তুলছে। ওপাশেও আর একটা জলা—সেখানে মাছ ধরছে ওদের লোকজন।

বিভূতি নস্করের নৌকায় মাছ তোলা হচ্ছে ওজন করে, রূপালী পার্শে ভেটকি আর বাগদা চিংড়ির স্তূপ।

যুধিষ্ঠির-ক্ষেত্রমাষ্টারের চোখ দুটো নীরব লোভে চকচক করে ওঠে।

লোকগুলো এদিকে পুলিশ দেখে কাঠ ফেলে বনের মধ্যে ঢুকে যায়। চীৎকার করছেন পুলিশ অফিসার—থামো।

কিন্তু লোকগুলো ডিঙ্গি নিয়ে অনেকে বনের গভীরে পালিয়ে যায়।

ডি-এফ-ও সাহেব শুধোন—এরা কারা?

ক্ষেত্রমাষ্টার চিনেছে ওদের দু'একজনকে। তারা গ্রামের লোক। তারাও এই দ্বীপের লোকদের দেখাদেখি বনে এসে ফলাও করে কাঠ কাটছে। তবু বলে ক্ষেত্রমাষ্টার—এদের কেউ হবে।

গিরিজা দেখেছে ক্ষেত্রমাষ্টারকে। লোকটাকে ভালো লাগে না তার।

গিরিজা শোনায়—না স্যার। ওরা আমাদের লোক নয়। বাইরের লোক।

ডি-এফ-ও সাহেব ধমকে ওঠেন—আপনারা বন কাটেন না?

গিরিজা বিনীতভাবে জবাব দেয়—কিছু কাটি স্যার। তবে এদিকে নয়। দ্বীপের দক্ষিণটা সাফ করতে চাই, তাই ওদিকেই কাটি।

ডি-এফ-ও সাহেব বলেন—আপনারা কাটেন এদিকে—ওরা কাটেন ওদিকে। ফাঁক থেকে নষ্ট হচ্ছে সরকারের এতবড় বন। নষ্ট হচ্ছে কত টাকার মাল।

যুধিষ্ঠির বলে—ওই বিরাট মেছো ঘেরি থেকে দিন গেলে হাজার হাজার টাকার মাছ বেচে, কি দেয় সরকারকে?

গিরিজা চাইল ওর দিকে। শরৎ দাস বলে,

—বুকের রক্ত দিই এ জলা হাসিল করছি, ভেড়ি বাঁধ দিছি।

ওরা জবাব দেন না।

পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক দেখছেন এদের কলোনী, ঘর বাড়ি। মায় দোকান পাট—তাঁতশালা, কামারশালা বসেছে। কোন কুমোর মাটি আনে ওপার থেকে তাই দিয়ে হাঁড়ি মালসা বানিয়ে পোড়াচ্ছে। কাঠের অভাব নেই। মরা মাটির বুকে আদ্যিকালের শিকড় তুলে মাটিকে চুর চুর করে চলেছে এরা।

ক্ষেত্রমাষ্টার অবাক হয়—টিউবওয়েলও বসিয়েছেন দেখছি। আমরা পারিনি—বুঝলেন স্যার ক'দিনেই দ্বীপের হাল বদলে ফেলেছে। টাকাও আসছে অনেক।

ডি-এফ-ও সাহেব, এ-ডি-এম সাহেব এসেছিলেন সব খবর পেয়ে সরেজমিনে ব্যাপারটা তদন্ত করতে। গিরিজা-গোবিন্দ শরৎ দাসদের বলেন ডি-এফ-ও সাহেব,

—ফরেস্ট-এর অনেক ক্ষতি করেছেন আপনারা। এত হাজার হাজার একর বন শেষ করেছেন—জলার সৃষ্টি করে মেছো ভেড়ি করেছেন—

গিরিজা বলে—বন একা আমরাই কাটিনি স্যার, স্বচক্ষে দেখলেন এখানের লোকও—

ক্ষেত্রমাষ্টার বলে—আপনারা শুরু করেছেন, .

ডি-এফ-ও সাহেব জানান—এখানে জবর দখল করে থাকা বেআইনী. আপনারা এ দ্বীপ ছেড়ে দেবেন।

—কই যামু। শরৎ দাস আর্তনাদ করে ওঠে।

ভদ্রলোক একজন জানান—দণ্ডকারণ্যে আপনাদের বসতির জন্য এতকিছু করা হয়েছিল, সে সব ফেলে এই নোনা মাটিতে কেন এলেন?

এর জবাব তারা জনে জনে দিয়েছে। কি ব্যর্থতা নিয়ে কি আশঙ্কা নিয়ে তারা সব হারিয়ে এখানে এসেছে কত কষ্ট সহ্য করে, কত মৃত্যু সর্বনাশকে এড়িয়ে তা এরাই জানে। হঠাৎ একটা কঠিন বিকৃত কণ্ঠের হাসি শুনে চাইল ওরা।

নিশিকান্তকে আর চেনা যায় না।

কোমরটা নুয়ে পড়েছে, চুলগুলো জটা পাকিয়ে গেছে, কোটরাগত দুচোখ জ্বলে ওঠে তার, নিশিকান্ত বলে,

—ক্যান আইছি? মরণের জন্যি! দ্যাশের মাটিতেই শ্যাষ শয্যা নিমু! নরম পলিমাটিতে। তাই! সব গেছে গিয়া—মান-ইজ্জৎ, ঘর-বাড়ি, পোলা-পান—ইস্ত্রি। জানডা এহনও যায় নাই। তাই দিবার লাইগা আইছি এহানে।

রুক্ষ কঠিন ভীষণ ওর মূর্তি। দুচোখ জ্বলছে কি তীব্র জ্বালায়। চমকে ওঠে ডি-এফ-ও, অন্যরা। ক্ষেত্র মাষ্টার বলে,

—পাগল।

—পাগল হইছি। কথাটা শুনেছে নিশিকান্ত। হাসছে ঠা ঠা করে। ওর নির্মম হাসিটা যেন নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানের মতই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে চারিদিকে।

ওরা লঞ্চে উঠে চলে গেল।

ভাবনায় পড়েছে গিরিজা-গোবিন্দের দল। দ্বীপের অনেকেই জুটেছে।

শশীপদ বলে—ওগোর মতলব ভাল বুঝছি না। এতখান জমি হাসিল করতাছি, মেছোঘেরি বানাইছি ওগোর চক্ষু টাটায়।

গিরিজা বলে—সাহেব বলেন এ জমি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

গোবিন্দ গজরায়—ওই এ-ডি-এম সাহেব কয় দণ্ডকারণ্যেই যাতি হবে আবার।

কালু-পটলার দল কি ভাবছে। সুরভি-যমুনারা কলতলা থেকে এগিয়ে আসে। সুরভির মুখে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। বলে সে—যামু না।

কালু গর্জে ওঠে—ঠিক কইছিস। গিরিজা, আমরা যামু না। ওরা জোর করতি চায় আমরাও ছাড়ুমনা।

শরৎ দাস দেখছে ওদের। নিশিকান্ত চুপ করে মাথার উকুন খুঁজছিল। তার এদের ভাবনায় যেন কোন আগ্রহ নেই। হঠাৎ বলে ওঠে,

—পারবি ওগোর লগে?

এরা চুপ করে কি ভাবছে। নিশিকান্ত আপন মনে বিড়বিড় করে।

—ওগোর কথামতই চলার লাগবো। সাহেব লোক ওরা। আর তোরা! বানে ভাসা খড়কুটো। ভাইসাই মরবি এঘাট থনে ওঘাটে, শ্যাষ ম্যাস গাং-এর টানে সাগরে হারাই যাবি।

—বাবা। কেতকী ডাকছে লোকটাকে।

চাইল নিশিকান্ত—তুমি। তুমি কেডা. বাবা মা ছাওয়াল এই ভাঙ্গনের টানে সব সম্পর্ক বিবাক ধুইয়া যাবে।

—খাবেনা! চলো। কেতকী লোকটাকে খাবার কথা বলতে বুড়োর চোখদুটো চকচক করে ওঠে। এতক্ষণে যেন খিদের জৈবিক অনুভূতিটা টের পায় সে। বলে—খাতি দেবা? চল—ক্ষুধা পাইছে। ওটা এহনও পায়।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমেছে। এখানে ওখানে কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে। শীতের মুখ—ওদিকের বন থেকে দু'একবার বাঘ এসে হানা দিয়েছিল এদিকে। ছাগল নিয়ে গেছে। দু'একটা মানুষকেও মেরেছে, তারপর থেকে ওরা আগুন জ্বালিয়ে রাখে।

কালু কি ভাবছে। খালের এদিকে ছোট ঘাট লা ঘাটা, ওদের ডিঙ্গিগুলো থাকে। যমুনা এসেছে। কালুও একটা ঝুপড়ি বানিয়েছে তার কাকার ঝুপড়ির পাশে। কাকার ওখানেই খায়। যমুনা আর সে খালের এদিকে একটা কেওড়াগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। খালের জলে পড়েছে মরা চাঁদের আলো—ওদিকে উঠে গেছে সারবন্দী বনের সীমানা। খলসে ফুল ফুটেছে—বাতাসে ওঠে মৌমাছির গুঞ্জন।

যমুনা বলে—কথা কওনা ক্যান?

কালু দেখছে যমুনাকে। বলে সে—কথা কইছি তো!

যমুনা বলে—বিহার কথাডা।

হাসে কালু। যমুনাকে কাছে টেনে নেয় সে। কালু বলে,

—বিহা করুম, ঘরও বাঁধুম যমুনা। তয় চোরাবালিতে ঘর যে থাকে না রে। পায়ের নীচে মাটিটা শক্ত হতি দে।

যমুনাও তা জানে। আশা করে সে এখানে তারা থাকতে পারবে। দুজনে ঘর বাঁধবে অনেক যন্ত্রণা পেরিয়ে। যমুনা বলে,

—তা জানি।

কালু বলে—হেই ক'টা দিন সবুর কর। ততদিনে এ জমিতে ফসল হবে। মাছ-এর ব্যবসা করুম নিজেরা।

যমুনা স্বপ্ন দেখছে সেই ঘরের। কালুর দেহের ছোঁয়াটুকু তার মনে কি সাড়া আনে।

সুরভিও একাই ঝুপড়ি বেঁধেছে। তার সঞ্চয়ের টাকাটা সে নষ্ট করেনি। টিনের কৌটোয় পুরে রেখেছে সেই হার—দামী হীরার আংটি আর নোটের তাড়াগুলো সযতনে। ওদিকের বাজারখোলায় সুরভি একটা ছোট মুদিখানার দোকান খুলেছে। নিজেই মাল আনে কুমীরমারির হাটের আগত মহাজনী নৌকা থেকে।

যদুপতিও এসেছে হাটে, হঠাৎ সুরভিকে দেখে চাইল। সুরভির মাতালকরা যৌবনের সাড়া এখনও যদুপতির মনে ঝড় তোলে। যদুপতির বৌটা মারা গেছে দণ্ডকারণ্যের বসতে। ছেলেটাও এখন ঘরে থাকে না।

একাই থাকে যদুপতি, ইদানীং সমিতির দপ্তরে কাজ নিয়েছে। মাছের দরাদরি করে হিসাবপত্তর করে। সুরভির কাজ সারতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যুধিষ্ঠির হালদারের নজর মেয়েটার উপর বেশ ক'দিন থেকেই।

যুধিষ্ঠির ওকে দেখে বলে,

—মালপত্তর একাই নৌকাতে তুলছে?

সুরভি পুরুষের ওই চাহনি চেনে। বলে সে—মুখের দরদই দ্যাখান, কই হাত লাগান না?

যুধিষ্ঠিরের মনে কি সাড়া জাগে। সুরভি খাটো কাপড়টায় তার নিটোল পা-এর ডিমগুলো দেখা যায়। ছোট জামার বাঁধন ছাপিয়ে ঠেলে উঠেছে উন্নত বুক। এখানে এসে নোনা হাওয়ায় ওর রংটা কালচে হয়েছে—তাতে যেন চেকনাই আর ঔদ্ধত্য বেড়েছে।

যুধিষ্ঠির বলে—তুমি বললে এটুকু করবো না?

সেও বস্তাগুলো তুলছে। যুধিষ্ঠির বলে,

—ফি হাটে আসো দেখি, ভাবি আলাপ-সালাপ করবো?

সুরভি হাসলো। ইচ্ছে করেই যেন লোকটার মনে ঝড় তুলতে চায় সে মাতাল করা হাসি দিয়ে। নদীর বুক থেকে মুখোট বাতাস বইছে। উড়ছে মেয়েটার এলোমেলো চুল, শাড়িটা বেবশ হয়ে গেছে—ছোট্ট জামার আড়ালে আধআদুড় বুকের রেখাগুলো যুধিষ্ঠিরের মনে সাড়া আনে।

সুরভি ওর কাছে এগিয়ে আসে।

মরা চাঁদের অলোছায়ার আবেশ এনেছে ওপাশের ঘনসবুজ বাইন গাছগুলো। সুরভি শুধোয়—ক্যান্ কও দিন্ মহাজন?

হাসছে যুধিষ্ঠির—এমনিই। ভালো লাগে তোকে দেখে।

—তাই নাকি! সুরভি ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে—আমারও ভালো লাগে তোমাকে। তাই তো ফি হাটে এখানে আসি।

খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠে যুধিষ্ঠির। সুরভি দেখছে ওকে। সেদিন যুধিষ্ঠিরও গেছল সাহেবদের লঞ্চে। ক্ষেত্রমাষ্টারও ছিল। কি বলছিল সাহেবদের। সুরভি কি ভেবে বলে—তা মহাজন তোমাদের ক্ষেত্তরমাষ্টার ক্যামন লোক গো? আমারে কয়—বাড়িতে আইবি।

যুধিষ্ঠির চটে ওঠে। সুরভিকে ক্ষেত্রমাষ্টারও নজরে রেখেছে।

যুধিষ্ঠির বলে—ও শালা একটা শয়তান। ওকে মাতব্বর বানালাম, এখন আমার পেছনে লেগেছে। তোমাদের বসতেরও সব্বোনাশ করতি চায়, ওর মতলব ভালো না।

সুরভি ঠিক জায়গাতেই টোকা দিয়েছে। ওর গায়ের সঙ্গে মিশেছে ওর গা। যুধিষ্ঠিরের লোভী হাতটা অনেক সাহসী হয়ে উঠেছে। সুরভি তা জানে, ইচ্ছা করেই তাকে খেলাতে চায়।

সুরভি বলে—কে জানে মহাজন। মাষ্টার তো কইছিল তুমি নাকি কত্তাদের কইছ ওই বনের জলকর ইজারা লইবা!

—কোন্ শালা বলে? এ্যাঁ! যুধিষ্ঠিরের মনের কথা এটা। আর বলেছিল ও ক্ষেত্রমাষ্টারকে কথাটা। যদি ও করে দিতে পারে ক্ষেত্রকে সে হাজার ছয়েক টাকাও দেবে। কিন্তু ক্ষেত্র যে এমনি বেইমানী করবে তা ভাবেনি।

যুধিষ্ঠিরের রাগটা ফেটে পড়ে। বলে সে,

—মিথ্যে কথা সুরভি। তোমাদের দুঃখ জানি, যদি তোমরা কিছু পাও যুধিষ্ঠির কোনদিন বাধা দেবে না। ওই শালা ক্ষেত্র মাষ্টারই উপরে যাতায়াত করে কলকাঠি নাড়ছে।

সুরভি বলে—তোমার ভরসাতেই আছি মহাজন। তোমাকে ভরসা করি গো। চলি আজ।

যুধিষ্ঠির বলে —যাবে?

হাসে সুরভি—নাতো কি থাকতি দিবা?

যুধিষ্ঠির বলে—যদি বলি তাই।

হাসছে সুরভি, ওর হাসির ধমকে সারা শরীর কাঁপছে।

বলে সে—চলি গো!

বাঁধের ওদিকে যদুপতিকে দেখে এগিয়ে আসে সুরভি। যদুপতি হাট সেরে ফিরছে। সেও দেখেছে আবছা অন্ধকারে সুরভিকে। সুরভি বলে,

—ফেরবা তো। ওঠো নৌকায়।

যদুপতি নৌকা বাইছে। সুরভি বসে আছে, কি ভাবছে সে। চাঁদের আলোয় দূরে দেখা যায় ওদের বসতটা, স্নিগ্ধ ছায়াঘেরা একটি দ্বীপ। যদুপতি বলে,

—এমনি অকূলেই ভাসবা সুরভি?

সুরভি হেসে ফেলে। অপ্রস্তুত হয় যদুপতি। তার মনের অতলের দুর্বলতাটা ফুটে উঠেছে সুরভির চোখে। সুরভি বলে,

—কূল আর পাই কই যদুপতি। আর নোনা বাদা চারিদিকে। ওই যুধিষ্ঠির মহাজন, হাটের ভূপেন গাঁতিদারও কয় এই কথা। শ্লা চৈত সিংও রোজগার করে নিল আমাদের ভাঙ্গিয়ে। আর কূলের নেশায় মন ভরে না গো, তাই অকূলেই রইলাম।

যদুপতি দেখছে মেয়েটাকে। আবছা আলোয় হঠাৎ ওই দুরন্ত মেয়েটার চোখে যেন জল নামে। যদুপতি বলে, —কাঁদছো?

সুরভি চাইল ওর দিকে। বলে সে,

—নাঃ, চোখের নোনা পানি এ নোনা গাং-এ ফেলে লাভ কি বলো? জীবনটাই বরবাদ হই গেল যদুপতিদা, ঘর নাই, ঠাঁই নাই, ভালোবাসা ঘর বাঁধার ভাগ্যি লই আসিনি। তাই দেখছি ওই শ্যাল শকুনিগোর মনটারে।

এই বসতেও শান্তিতে থাকতি দেবে না মনে লয়।

যদুপতি চমকে ওঠে—ক্যান্?

সুরভি বলে—মানুষের লোভ লালচ বড় খারাপ গো। অপরের সব কিছু লুট করতি চায়, তাতেই তাগোর আনন্দ।

যদুপতি বলে ওঠে—আইন নাই?

—আইন! সুরভির দুচোখ জ্বলে ওঠে। বলে সে—আইন আমাগোর লগে নাই। আমরা মানুষের খাতার বাইরের জীব। এহনও জানো নাই সিডা! দেখবা এইবার।

সুরভিই খবরটা আনে। রাত্রে সমিতি চালায় আবছা অন্ধকারে মানুষগুলো বসে ভাবছে। কালু-পটলা-নরেন—আরও অনেক তরুণও আছে। গিরিজা-গোবিন্দ নাই। কলকাতা গেছে কোন্ বাবুদের কাছে। সেখানে নাকি কর্তাদের কাছে দরবার করতে হবে যাতে তাদের এখানে থাকার অনুমতি মেলে। আর কিছু সাহায্য, ওষুধপত্রের দরকার। তাই গেছে যদি পায়।

কালু সব শুনেছে ওদের ষড়যন্ত্রের কথা। গর্জে ওঠে কালু,

—ওগোর এহানে নামতে দিমু না। ওরা ওই সব বদমতলবে আসে। আর সদাখুড়ো—

সদানন্দ এখানে তার ভাইপো, ছেলেকে নিয়ে দুটো কামারশালা বানিয়েছে। কালু বলে—আমাগোরও তৈরী থাকতি হবে। তুমি যত পারো তিরের ফলা বানাবা দণ্ডকারণ্যের হেই আদিবাসীদের মত।

পটলা শোনায়—বল্লমও চাই।

শরৎ দাস-এর বুড়ো দেহেও সাড়া জাগে। আজকের তরুণরা তৈরী হয়েছে।

শরৎ দাস বলে—ল্যাজাও বানাও। লোহা ইস্পাত দিমু আমরা।

কালু শোনায়—ঠিক কইছ কাকা। আমাগোর নিজেদের বাঁচনের পথ নিজেদেরই করার লাগবো। এ মাটি সহজে ছাড়ুম না। গিরিজারা আসুক, দেখা যাক কি কয় দেশের মানুষ। তারপর আমরা দেখুম।

খবরটা দ্বীপের সকলেই জেনেছে। এতদিন ধরে পরিশ্রম করে তারা বাঁধ দিয়েছে। মাছের ভেড়ি থেকে যা আসে তাতে চালটা হয় কোনমতে, নিজেদের খাবার জলের ব্যবস্থাও করেছে তারা। আর একটা দুটো বছর হাটে জিনিষ বেচে, জনমজুরী করে তারা টিকে থাকতে পারলে এ জমিতে কিছু ফসল পাবে।

কিন্তু এখানে থাকার উপায় তাদের নেই। সারা দেশে সাড়া পড়েছে, তারা নাকি স্বাধীন কোন ভূমি গড়তে চায়। সরকারের সব দাক্ষিণ্যভরা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে আসছে এখানে।

গিরিজা-গোবিন্দ আর নবনী এসেছে কলকাতায়। একদল বলে—আপনাদের ওখানে থাকতে দিতেই হবে।

কারণটা গিরিজার মনে হয় একটাই। কৃপাসিন্ধু এসেছে বেলঘরিয়ায় তার কোন আত্মীয়ের বাড়িতে। সে রয়েছে এদের সঙ্গে।

কৃপাসিন্ধু বলে—এরা আমাগোর কি সাহায্য করবে কে জানে?

—কেন? প্রশ্ন করে গোবিন্দ।

গিরিজাও কথাটা ভেবেছে। বলে সে—ভাবনার কথা গোবিন্দদা, এরা আমাদের উৎসাহ দেয় কারণডা জানো? হেই রাজনীতিই। আজ যারা কন আপনাদের সুন্দরবনে থাকতি দিতি হবে, ওই দলের কত্তারাই সেদিন গদিতে আছিলেন। ত্যানারাই আমাগোর জন্য দণ্ডকারণ্যে বসতি দিয়েছিলেন।

আইজ ত্যানারা গদিতে নাই। আইছেন অন্যদল। আজকের সরকার কন্—ওখানে বসতি করা চলব না। তাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করতে হবে, মান্‌ষেরে দেখাতি হবে কিছু করছি। তাই আজ ওনারা আমাগোর দাবীর সমর্থন করবেন কন্। নিজেদের নাম ডাক করার জন্যি আমাগোর ভাগ্য লইয়া এতকাল ছিনিমিনি খেলছেন, আজও তাই চান।

গোবিন্দ শুনছে কথাগুলো। কৃপাসিন্ধু বলে,

—তাতে যদি আমাগোর লাভ হয় ওগোর দলেই থাকুম।

গিরিজা গর্জে ওঠে—না। আর ওই রাজনীতির দাবাখেলার ঘুঁটি হতি চাইনা। নিজেদের পথ নিজেরাই দেখুম, তাতে বাঁচি মরি ক্ষেতি নাই।

গোবিন্দ বলে—সে তো পরের কথা। একবার কত্তাদের সাথে দরবার করতি হবে।

খবরের কাগজের দু'চার জন ভদ্রলোক তবু সাহায্য করেন এ ব্যাপারে। ওদের সঙ্গেই আসে ডালহৌসীর চত্বরে। গিরিজা-গোবিন্দরা একটু ঘাবড়ে গেছে বিরাট শহরে এসে। তাদের কাছে এসব বিচিত্রই। এই কর্মব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পরিচয় নেই তাদের। এত উপরের তলার জীবন তাদের অচেনা।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে কর্মব্যস্ত জন সমুদ্রের দিকে। ওই অন্ধকার নির্জন দ্বীপের হতদরিদ্র কয়েক হাজার মানুষ, দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত বনবাসীদের জন্য এদের ভাবার কোন প্রয়োজন, সময় কিছুই নেই। তাদের অস্তিত্ব থাকুক না থাকুক তাতে এদের কিছুই যায় আসে না।

এমনি নির্মম মানুষের সমাজের কাছে তারা আজ দাবী জানাতে এসেছে, তাদের দাবীর কি পরিণতি হবে তাও জেনেছে যেন এরা।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাদের নিয়ে যায় কোন কর্তাব্যক্তির ঘরে।

তিনি দেখছেন এদের। গোবিন্দ-গিরিজারা যেন এই পরিবেশে বেমানান। ঘরের মেজেতে কার্পেট পাতা—ঘরটায় ঠাণ্ডা আমেজ। দামী টেবিলের ওদিকে বসে এদের কথাগুলো শুনে ঘণ্টা বাজান তিনি। একজন ভদ্রলোক আসতে বলেন কি ফাইল আনতে।

একটা ফাইলও এল। ওই লাল মোটা ফাইলে সব রিপোর্ট এসে জমেছে এতদিন ধরে। ভদ্রলোক সেগুলোয় চোখ বুলিয়ে বলেন গিরিজাকে—কেন চলে এলেন দণ্ডকারণ্য থেকে? সেখানে সরকারের কত টাকা বরবাদ করেছেন। আবার নিজেদের ইচ্ছায় এসে এখানে সুন্দরবনকে নষ্ট করছেন। এভাবে বাড়তে দিলে দণ্ডকারণ্যের সব কিছু ফেল করবে আর বনসম্পদ টাইগার প্রজেক্ট সব বানচাল হবে।

গোবিন্দ বলে—বাঘকে যদি বাঁচান তয় আমাদেরও বাঁচাতি হবে।

ভদ্রলোক বলেন—দণ্ডকারণ্যে ফিরে যান। এবার সেখানে সব ব্যবস্থা করা হবে।

গিরিজা শুধোয়—এখানে থাকতি চাই। যদি কিছু সাহায্য করেন ওষুধপত্র, কিছু

ভদ্রলোক কঠিন স্বরে জানান, আমাদের উপায় নেই। এখানে থাকার কোন ব্যবস্থা করা যাবে না। আপনাদের ফিরে যেতেই হবে। আর যদি যেতে চান—তখন রিলিফ, যাবার ব্যবস্থা করবো।

গিরিজা শুনছে কথাগুলো। বেশ বুঝেছে সে তাদের জন্য কিছুই করা যাবে না। ওই দ্বীপের দখল নিয়েও থাকা যাবে না সহজে। ওরা উঠে পড়ে। ভদ্রলোক বলেন,

—আপনাদের মতামত জানতে যাবেন আমাদের লোক। তাঁকে জানালেই হবে। আশাকরি—এবারও ভুল করবেন না।

গিরিজারা বের হয়ে এল।

তখন বৈকাল নামছে। বি-বা-দী বাগে লোক চলাচল সমানে চলেছে, কৃপাসিন্ধু ওদিকে ছিল। সে এসে শুধোয়—কি বললেন ওঁরা?

গিরিজা জবাব দিল না। গুম হয়ে আছে সে।

কৃপাসিন্ধু জবাবটা ওতেই পেয়েছে। বলে সে, তা বাপু গোলমাল কইরা লাভ কি। আবার কিছু ট্যাকা কড়ি দিক ফিরে যামু দণ্ডকারণ্যেই।

গোবিন্দ গিরিজা জবাব দিল না। কৃপাসিন্ধু বলে,

—তয় যাই। তোমরা আইজ ফিরবা—আমি ভাইঝির বাড়ি আইছি। দু'একদিন থাকি সিনেমা দেইখা ফিরুম। কলকাতাও দেখুম ক'দিন।

কৃপাসিন্ধু আনন্দে শহর দেখতে চলে গেল। গিরিজা-গোবিন্দের মন থেকে সব খুশী মুছে গেছে। বৈকালের আলো ঢেকে যেন জমাট আঁধার নামছে ওদের সামনে।

সুরভি পুঁইজালির হাটে এসেছে।

ইদানীং হাটে আসে নানা কারণে, শুধু পুঁইজালির হাটেই নয় লঞ্চে উঠে সেদিন গেছল মোল্লাখালির হাটে, বিভূতি নস্করের বাড়িতে। বিভূতি নস্কর এ চাকলার নামী লোক। বিরাট মাছের কারবার। সুরভিদের মেছো ঘেরি থেকে তার লোকজন মাছ আনে, ক্রমশঃ সেখানের কারবারে বিভূতি নস্কর মোটা লাভ পাচ্ছে।

সুরভিকেও চেনে সে। আর এ চাকলার মধ্যে ইদানীং সুরভির চেনা জানা হয়ে গেছে অনেক লোক। বিভূতি নস্করের নদীর ধারে পাকা বাড়ি—সামনে কষ্ট করে নারকেল বাগান, গাছগাছালি করেছে। বাইরের পরমাটি এনে বকুল, কৃষ্ণচূড়া-বেইনট্রি গাছ লাগিয়েছে।

বিভূতি নস্কর সুরভিকে দেখে চাইল হিসাবের খাতা ফেলে, কি গো কি খবর? এসো।

সুরভি এগিয়ে আসে। বলে সে—ইদানীং আর তো বাঘনা আড়তে যান্ না। তাই এদিকে এলাম, ভাবলাম খবর নিই যাই।

বিভূতি নস্কর খুশী হয়ে বলে—মনে আছে আমাকে?

সুরভি হাসে—বাঃ রে। আপনারা এ চাকলার মাথা মাতব্বর, মনে না রাখলি চলে! তা এলাম একটা খপর শুনি—

খবরের কথা শুনে বিভূতি চাইল ওর দিকে। সুরভি খবরের গুরুত্ব আনার জন্য গলা নামিয়ে বলে—পুঁইজালির ক্ষেত্তরমাষ্টার আর আড়তদার যুধিষ্ঠির হালদার দুজনে নাকি সলা করে উপরে চেষ্টা করছে আমাগোর মাছের ভেড়ি দু'খান দখল করার।

চমকে ওঠে বিভূতি নস্কর। ক্ষেত্রমাষ্টার আজকাল খুব বেড়েছে। আর যুধিষ্ঠিরের পয়সা আছে কিছু! তবু বিভূতি নস্করের টিকি বাঁধা আলিপুর সদরে, কলকাতার দপ্তরে। বিভূতি খবরটা শুনে বলে,

—তাই নাকি। ওই ক্ষেত্তরটা ছিল আর্সূলা, এখন পাখী হয়েছে। ক্ষেত্তরটা মনে করে এ চাকলা সব ওর।

সুরভি এবার গলায় কাতর ভাব এনে বলে,

—আপনার কাছে আসি টাসি শুনে যুধিষ্ঠির হালদার কত কি কয়। ক্ষেত্তরবাবু তো সেদিন দ্বীপে সাহেবদের লঞ্চে গে শাসিয়ে এল। বলে—এসব ছাড়ি দিতি হবে।

গরীব মানুষগুলান কই যাই কন্। তাই এলাম আপনার কাছে—আমাদের আর কে আছে কন্? আপনার ভরসাতেই রইছি।

ডাগর দুচোখে জল নামে।

বিভূতি দেখছে ওকে। ক্লান্ত দুপুর—নির্জন চারিদিক। সুরভির ডাগর চোখের জল বিভূতির মত গোবদা লোকটার মন ভিজিয়েছে।

বিভূতি নস্কর বলে—কাঁদিস না সুরভি। আমি দেখছি ও দুটোকে।

সুরভি বের হয়ে ফিরতি লঞ্চে এসে পুঁইজালির হাটে নেমেছে। প্রতি হাটবার যুধিষ্ঠির ওর পথ চেয়ে

থাকে। আজও দেখছে ওকে, সুরভি ওর আড়তে উঠে বলে—একটুন চা খাওয়াও মহাজন, তবে শুধু চা দিও না মাইরি। ক্ষুধা পাইছে।

যুধিষ্ঠির বলে—তোর খিদে মেটাতে কি পারবো রে?

হাসছে সুরভি মাতাল করা চাহনি মেলে। বলে সে—তালে যাই ক্ষেত্তর মাষ্টারের বাড়িতেই।

যুধিষ্ঠির ক্ষুণ্ণ হয়—কি যে বলিস! ওরে গুপী, রাসুর দোকানে দেখলাম গরম চপ ভাজছে, চপ আর রসগোল্লা চারটে করে এনে দে।

ভিতরে বসে চপ আর চা খাচ্ছে, এমন সময় বাইরে এসেছে ক্ষেত্তর মাষ্টার। ওর হাতে একটা টাটকা কাগজ, একটু আগে বসিরহাটের লঞ্চ থেকে নেমেছে সে।

যুধিষ্ঠির এসময় ক্ষেত্রকে আসতে দেখে চাইল। একটু ফাঁকা ছিল, সুরভির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি হতো, এসময় ক্ষেত্রকে আসতে দেখে ঠিক খুশী হয়নি যুধিষ্ঠির। কিন্তু ক্ষেত্রমাষ্টার খুশী ভরে বলে,

—জোর খবর আছে যুধিষ্ঠির। ওই দ্বীপতো এখন দেশের খবর হয়েছে হে। তবে বাছাধনদের তেল এবার মরবে, সরকারও সাফ্ কথা বলে দিয়েছে ওদের।

যুধিষ্ঠির একটু কৌতুহলী স্বরে বলে,

—কি কথা বলছো গো?

ক্ষেত্রমাষ্টার কাগজখানা খুলে বলে—এই যে। বলেছে ওসব দ্বীপ ছেড়ে ফিরে যেতে হবে দণ্ডকারণ্যে। না হলে সরকার ব্যবস্থা নেবে। ওভাবে বন কেটে ক্ষতি করা চলবে না।

যুধিষ্ঠির আরও ব্যাকুল হয়েছে। শুধোয় সে,

—আর মেছো ঘেরির ব্যাপারে কিছু বলেছে নাকি?

ক্ষেত্রমাষ্টার বলে—বলবে এইবার। ওদের তাড়াতে পারলে তখন ওসবের ব্যবস্থা হবে। আর কড়া এস্‌টেপ নিচ্ছে সরকার।

ঘরে ভিতর চপ্ খাচ্ছিল সুরভি।

তার কান সজাগ হয়ে ওঠে। সে শুনছে ক্ষেত্রমাষ্টারের কথাগুলো। কাগজে লিখেছে ওইসব এটা বুঝেছে সুরভি।

ক্ষেত্রমাষ্টার বলে চলেছে যুধিষ্ঠিরকে,

—ওই চরের মাতব্বররা গেছলো কলকাতায় দরবার করতে, তা কর্তারা সাফ্ বলে দিয়েছে চলে যেতে হবে। ওখানে থাকা যাবে না।

সুরভি জানে গিরিজা-গোবিন্দরা গেছে কলকাতায়, তারা এখনও ফেরেনি। খবরটা এসে গেছে এখানে। বেশ বুঝেছে সুরভি, ওরা খুশী হয়েছে।

ক্ষেত্রমাষ্টার বলে—চলি হে যুধিষ্ঠির। পরে দেখা হবে।

যুধিষ্ঠির এবার বলে—তাহলে মাষ্টার কথাটা মনে রাখবা। ওই মেছো ঘেরির ইজারাটা যাতে হয়। তোমারেও খুশি করব। শালা বিভূতি নস্কর তো ওঁৎ পেতে বসে আছে।

ক্ষেত্রমাষ্টার মাতব্বরী ভঙ্গিতে বলে,

—ঠিক আছে। দেখছি কি করা যায়।

যুধিষ্ঠিরের এবার খেয়াল হয় ভিতরে সুরভি বসে আছে। সে নিশ্চয়ই শুনেছে তার ভেড়ি দখলের চেষ্টার কথা। একটু ভুলই করেছে যুধিষ্ঠির। রাগ হয় ক্ষেত্রমাষ্টারের উপর। আর বলাব সময় পেল না।

কি ভেবে যুধিষ্ঠির ভিতরে আসে, সুরভি ওকে দেখে সহজ হয়ে যায়। বলে সে—খাসা চপ বানাইছে মাইরী। তা মহাজন উশালারা যেখানে যায় যাউক গিয়া, আমারে একটুন ঠাঁই দিতি হবে এহানে্।

যুধিষ্ঠির যেন স্বপ্ন দেখছে।

তার জায়গার অভাব নাই। জমিরও। আর সুরভিকে না হয় হাটের ওদিকে একটা দোকানই করে দেবে। সুরভিকে কাছে পাবে সে।

যুধিষ্ঠির বলে—সত্যি বলছিস?

সুরভি ঘাড় নাড়ে—হ্যাঁ গো। তুমি বড় ভালো লোক্, তাই কইলাম। দেহো বাপু কথাড়া আবার পাঁচকান কইরো না। তা সরকার কি করবে ক্ষেত্রমাষ্টার জানতি পারবে নিশ্চয়। তায় কই একটু জানবুঝ কইরা জানাইবা আমারে, ফাঁক বুইঝা সুরুৎ কইরা চইলা আসুম। এহন আইলে কথা উঠতি পারে।

যুধিষ্ঠির খুব খুশী হয়েছে। এই ফাঁকে একটু নিবিড় ভাবে আদর করে সুরভিকে। বলে যুধিষ্ঠির,

—তা সব জানতে পারবো। তুই খবর পাবি। তবে মনে হয় দ্বীপ ঘেরাও করি রাখতি পারে। তয় পেছনের খাল দিই পথ আছে—তুই আসবি। সুরভি মাথা নাড়ে।

আজও যদুপতি দাঁড়িয়ে আছে সুরভির পথ চেয়ে। ও জানে সুরভি কোথায় যায়। দ্বীপের অন্য লোকেরা হাট থিকে ফিরছে। সুরভির কথাটা মনে হয়। তাই মালপত্র আর অনেকই কিনেছে সে।

যদুপতিকে দেখে খুশী হয় সুরভি।

সুরভিও জানে যদুপতি দাঁড়িয়ে থাকবে তার জন্যে। সন্ধ্যার মুখে মালপত্র তুলে ওরা নৌকা ছেড়েছে, ছোট খাল দিয়ে চলেছে বড় নদী এড়িয়ে। খালটা গিয়ে পড়েছে বাঘনার নদীতে। ওপারে তাদের দ্বীপ।

যদুপতি বলে—চুপ কইরা আছো ক্যান?

সুরভি চাইল ওর দিকে। যদুপতির মনে ঝড় উঠেছে। এতদিন সে ভেবেছে কথাটা। আজ বলে যদুপতি—কথাড়া কইতাম সুরভি, তোমারে কইতে পারিনি এতদিন—

সুরভি চমকে ওঠে। দেখছে সে যদুপতিকে।

ওর দাঁড় টানা থেমে গেছে। একখানা হাত সুরভির হাতে। সুরভির কাছে একথা অজানা নয়। যদুপতিকে তারও ভাল লাগে। সুরভির তবু বেদনায় মন ভরে ওঠে। ওরা জানে না ওদের ভবিষ্যৎ-এর কথাটা। জেনেছে সুরভি।

যদুপতি বলে—তোমারে লই ঘর বাঁধুম!

হাসে সুরভি, ম্লান বেদনার্ত হাসি। বলে সে,

—ওসব সাধ এ জেবনে আর সাথক হয় না গো!

—ক্যান! যদুপতি অবাক হয়। বলে সে—ক্যান্ হয় না?

সুরভি বলে—ঘর আমাদের বরাতে নাই। ওই দ্বীপ থনেও উঠাই দিবে সরকার। আজ কাগজে দিছে। সারা দ্যাশ ঘুরছি আর জ্বালায় জ্বলছি আমরা, আমাগোর আবার ঘর বাঁধা? ক্যান্ জনম্ নিছিলাম জানি না যদুদা! পোড়া ভগমানের দ্যাখা পাইলে কথাটা তারে পুছ করতাম।

যদুপতি শুনছে ওর কথাগুলো। বলে সে,

—তবু বাঁচতি চায় মানুষ। যমুনা কালুরে বিহা করবে শুনছি।

সুরভি বলে—ভুল করবে উ! শুধু দুঃখই পাবে আরও। কিছুই পাবার মুখ আমাগোর নাই। তাই মনে হয় জ্বালাই পোড়াই খাঁক কইরা দিই সবারে।

নৌকাখানা ভেসে চলেছে। সুরভি চেয়ে আছে দূর অরণ্যসীমার দিকে। তার মনে হয় এ জগৎও যেন একটা আদিম অরণ্য, মানুষ বাস করেছে তবু হানাহানি, পাশব লোভ—আদিম লালসা তাদের মন থেকে মুছে যায়নি, বনের জানোয়ারও বিনা প্রয়োজনে অপরকে হত্যা করে না। এরা হত্যা করে লোভে—লালসায়—পাবার নেশায়। চৈত সিং-সুধাকান্ত—ওই বিভূতি নস্কর-ক্ষেত্রমাষ্টার-যুধিষ্ঠিররা সবাই একই জাতের। তারা চিরকালই এই সুরভিদের সবকিছু লুট করার দাবী রাখে। তাদের ঘর-জমি-বসত-মান-ইজ্জৎ সবকিছু।

এই নিষ্ঠুর বর্বরতার মাঝে ভালোবাসার মত মানসিক প্রস্তুতি আর নাই। জ্বালাভরা মন নিয়ে ভালোবাসা যায় না; তাই সুরভি ব্যর্থই থেকে যাবে।

যদুপতি দেখছে ওকে।

সুরভির খেয়াল হয়। বলে সে—চলো—রাত হই গেছে। ওগোর যাই সব খবর দিতি হবে। কে জানে গিরিজা-গোবিন্দরা ফিরছে কিনা।

কালু-পটলা-নরেন নামো কলোনীর ছেলেরাও সজাগ দৃষ্টি রেখেছে রাতের অন্ধকারে। ওরাও তৈরী হচ্ছে। রাতের বেলাতেও কামার শালে আগুন জ্বেলে লোহা পিটছে, তৈরী হচ্ছে তিরের ফলা—ল্যাজা—বল্লম। ওরা নদীর দিকেও নজর রেখেছে।

গিরিজারা ফেরেনি। শূন্য গাং-এ শব্দ তুলে ডিঙ্গিটা আসতে দেখে হাঁক পাড়ে কালু,

—কোথাকার নাও?

সুরভি সাড়া দেয়, যদু নৌকাটা খালে এনেছে। মালপত্র বোঝাই নৌকো! কালু এগিয়ে আসে—এত মাল আনছো সুরভি? দোকান জমাবা দেহি।

সুরভি বলে ওদের—বস্তাগুলান তুলে দিই আয়, খবর আছে।

সুরভিই পাকা খবর আনে। দামী খবরই। সুরভি শুধোয়,

—গিরিজারা ফিরছে?

—না। মনে হয় কাল ফিরতি পারে।

খবরটা শুনে চুপ করে যায় অনেকেই।

শরৎ দাস-রামানুজ-শশীপদরা বলে—সে কি! এ বসত ছাড়ি দিতি হবে? কালু গর্জে ওঠে—যামু না! শেষই দেখুম!

সুরভি দেখছে ওই জনতাকে। ওদের উত্তেজিত মুখে চোখে কি কাঠিন্য জাগে। সুরভি বলে—শেষ দেখতি গেলি নিজেদেরও তৈরী রাখতি হবে। শোনলাম ওরা দ্বীপ ঘেরি রাখতি পারে। কারোরেও বার হতি দেবে না। তাই কই খাবার যা পাস্ জমা কর। আসুক গিরিদা—ওরা কি কয় শুনি!

রাত্রি নামে জনবসতে।

ক্লান্ত হতাশ মানুষগুলো মুখবুজে যেন প্রতীক্ষা করছে নির্মম একটি ধ্বংসের। আদিম অরণ্যভূমির বুকে—নদীর বিস্তারে ঘুমন্ত চাঁদের আলো কি নিষ্ঠুর স্বপ্ন আনে। ঝুপড়িতে অনেকের চোখে ঘুম নাই।

শশীপদ বলে তার স্ত্রীকে—আবার কি হইব কে জানে।

শরৎ দাস-এর কলকের তামাকটা কখন পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ঘুম আসেনা বুড়োর, ললিতা বলে—শোও গিয়া! এত ভাবতিছ কি?

শরৎ দাস আজ ভাবনায় পড়েছে। মনে পড়ে দণ্ডকারণ্যের দীর্ঘ পথের কথা। সেই বসত—রুক্ষ মাটি আর জীবনের কথা।

এখানে চলে এসেছিল বহু কষ্ট সয়ে কি আশা নিয়ে। কিন্তু এখানেও থাকা যাবে না বোধ হয়। শরৎ দাস বলে স্ত্রীর কথায়,

—ভাবতিছি জীবনটা কোথায় শেষ হইব! বোঝা হইয়া আর কতদিন ফিরুম! চক্ষের সামনে শুধু অন্ধকারই নামছে বৌ, ঘুম আসে না।

ললিতাও শুনেছে কথাটা। বলে সে—কই যামু? সেই দণ্ডকারণ্যে?

তারায় ভরা আকাশ-এর বিস্তীর্ণ অঙ্গনে দূর প্রসারী দৃষ্টি মেলে যেন তারা অন্য জগতেই আশ্রয়ের সন্ধান করে।

কেতকী স্বপ্ন দেখছে তার হাতে লাগানো চাঁপাগাছে ফুল ফুটেছে। উঠোনে তুলসীমঞ্চে সে সন্ধ্যাদীপ জ্বালছে। খোকন আর নইবাছুরটা দাপাদাপি করছে উঠানে। তাদের ক্ষেতে ক্যানেলের জল আসছে। জলধারা বয়ে চলেছে মাঠে মাঠে। গিরিজা চাষ করেছে—ধান হয়েছে মাঠ জুড়ে। সোনা ধানের মঞ্জরীতে ছেয়ে গেছে মাঠ—

হঠাৎ খোকনের কান্নায় ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। চমকে ওঠে।

শূন্য ঘর। গিরিজা কলকাতায় গেছে। ফেরেনি আজও। খোকনের পেটের অসুখ চলছে ক'দিন ধরে। যদি দু'চারটে লেবু আপেল আনতে পারে খোকনকে দিতে পারবে।

সুন্দর ছেলেটার শিরদাঁড়া বের হয়ে পড়েছে। ওর বুকের পাঁজরগুলোও দেখা যায়। ভুগছেই।

একা তার খোকনই নয়—বসতের অনেক ছেলেদেরই রোগ সারছে না। রমেশ ডাক্তার বলে—এ জল সইছে না। ভালো মন্দ খেতে দাও। ছানা-ফল-মাংসের ঝোল—

ভাত জোটেনা ভরপেট। ওদের কি দেবে।

বুকের কাছে খোকনকে জড়িয়ে ধরে। আদর আর স্নেহে পেট ভরে না, তাই বোধহয় কাঁদছে ছেলেটা। কাঁদে বসতের অনেক ছেলেরাই।

নিশিকান্ত তবু হাসছে ঠা ঠা শব্দে।

মাথায় একটা ছেঁড়া কাপড়ের পগ্গ বেঁধেছে—গায়ে ছেঁড়া ফালাফালা জামাটা। ময়লা কাপড়টাকে সেটে পরে একটা গরাণের খুঁটি হাতে নিয়ে চীৎকার করে,

—হক্কলেরে তাড়াইমু এহান থনে। পালা—নালি ওরা তোগোর শ্যাষ করবে। শ্মশানে থাকিস না। কত কই তা শোনছেনি পরে বুঝবা।

গিরিজা-গোবিন্দরা ফিরেছে। সকলেই ঘিরে ধরেছে তাদের। গিরিজা হতাশ কণ্ঠে বলে—ওরা আমাগোর দণ্ডকারণ্যেই পাঠাতি চায়। সেখানে দেখ ভাল করবে। জমিতে ক্যানেলের জল আসছে এই মরশুমেই সেহানে।

কৃপাসিন্ধুও ফিরেছে।

সে এর মধ্যে তার ভাইপোকে সঙ্গে এনেছে, বেশ খবর পেয়েছে কলকাতায়, জেলা সদরেও এখানে গোলমাল হতে পারে। তার আগেই সে ছেলেমেয়েদের ভাইপোর সঙ্গে বেলঘরিয়ায় কলোনীতে পাঠিয়ে দেবে।

কৃপাসিন্ধুর কথায় ওর স্ত্রী বলে,

—এহানে তুমি থাকবা?

কৃপাসিন্ধু বলে—[illegible] দেখি তেমন বুঝলে চইলা যামু। তোমরা বেলঘরিয়ায় থাকবা, আর যতীন যাউক দণ্ডকারণ্যে, মালখানা[illegible] গঞ্জে থাকবে, যাই বসতের ঘর ফর জমি গুলানও দেখ ভাল করবে।

যতীন একটু অবাক হয়। বলে সে,

—এহানে সকলেই থাকছে?

হাসে কৃপাসিন্ধু —লাভ হইব না। তাই কই দণ্ডকারণ্যও বহাল থাকবো, ইদিকে যদি বসত পাই হেই জমিও থাকবো। আর বেলঘরিয়ায় জায়গা নিচ্ছি—ওখানেও বাড়ি বানাইমু। তাই কই যে যা করছে করুক গিয়া। নিজেরা নিজেদের মতই চলবো।

—আজই যাও গিয়া তোমরা। কই দিও ভাইঝির বিহা তাই যাতিছ।

কৃপাসিন্ধু কথাটা রটিয়েছে। তার ভাইঝির বিয়ে তাই স্ত্রী ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে, তবে সে থাকবে এই মাটিতেই। ওরা ফিরছে সাতদিনের মাথায়।

গিরিজা জবাব দিলনা।

কালু-পটলরা তৈরী হচ্ছে। বসতের চারিদিকে ওরা নজর রেখেছে, আর গিরিজা বলে—সমিতির মাছ বেশী করে ধরতে হবে। টাকা চাই। সেই টাকায় যত পারো চাল-ডাল-লবণ কিনা আনতি হবে।

শরৎ দাস শুধোয়—ক্যান।

সুরভির খবরটাও পেয়েছে গিরিজা। মনে হয় দরকার হলে পুলিশ সেই পথই নেবে। তাই তাদের রসদ চাই। গিরিজা বলে,

—দরকার হবে।

নিশিকান্ত হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে—আর ওষুধ। মড়ক লাগবে—তহন? চমকে ওঠে ওরা। নিশিকান্তের দুচোখ জ্বলছে। চুলগুলো জট পাকিয়ে গেছে। চীৎকার করে সে—কাঠ-এর অভাব নাই। না থাকে মরবে আর গাং-এ ভাসিয়ে দিবি এক একডারে।

—থামবে তুমি। ধমকে ওঠে গিরিজা।

নিশিকান্ত থেমে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কি যে বলছে সে সেটাও মনে করতে পারে না। বিড় বিড় করে আপন মনে। লাঠিটায় ভর দিয়ে চলেছে ওদিকে টলতে টলতে।

গিরিজা দেখছে মানুষটাকে। এককালের মানুষটা আজ কি নিষ্ঠুর আঘাতে যেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সুরভি বহুদিন পর আজ তার গোপন সঞ্চয়ের টাকাগুলো বের করেছে। ওই নিয়েই চলেছে যদুপতির সঙ্গে মোল্লাখালির হাটে।

যদুপতি অবাক হয়, বস্তাবন্দী চাল তুলছে সুরভি, চাল-ডাল-নুন আর হেম ডাক্তারের দোকান থেকে কিছু ওষুধ-পত্রও কিনেছে। যদুপতি অবাক হয়—এতসব কি হবে?

সুরভি বলে—তোলোতো। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যাউক। চলো গিয়া।

সুরভিকে আজও চেনেনি যদুপতি। মেয়েটা মাঝে মাঝে কেমন হেঁয়ালির মত কথা বলে।

বলে যদুপতি—এত টাকা কোথায় পেলি?

হাসে সুরভি। মনে পড়ে সেই নরকের জীবনের কথা। একরাতে সে শেঠজীর সর্বনাশ করেছিল। ওদের অন্ধকারের টাকা অনেক টেনেছিল সে।

সুরভি বলে—যমে দিছে।

যদুপতি ঠিক বুঝতে পারে না কথাটা। বোঝাই নৌকার দাঁড় টেনে চলেছে সে। হঠাৎ পুঁইজালির ট্যাকে এসে দূরের গাং-এ কয়েকটা লঞ্চ দেখে চাইল। রায়মঙ্গলের গাং-এর ওমাথায় আসছে লঞ্চগুলো। সঙ্গে কয়েকটা বোটও বাঁধা আছে ওদের পেছনে, সেগুলোকে কালো বিন্দুর মত দেখায়।

যদুপতি বলে—এত লঞ্চ আসতিছে?

সুরভির মনে কথাটা জাগে। বলে সে—তাড়াতাড়ি নৌকা বাও।

সুরভিও হাল মারতে থাকে। তাদের নৌকাটা ভাটার টানে চলেছে বাঘনা নদী পার হয়ে ওপারের চরের দিকে।

সুরভি গাং থেকে হাঁকতে থাকে—পুলিশের লঞ্চ আইতিছে! পুলিশ!

দ্বীপের এখান ওখানে অনেকে যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল। গিরিজা মাছ ধরিয়ে ফিরছে। ওই নৌকোয় ফিরতি পথে তারা চাল আনবে।

কালু ওদিকের ঘর ক'খানা মেরামত করছিল, কামারশালেও কাজ চলেছে। দু'একটা দোকানে কেনা বেচা চলছিল। হঠাৎ ওই ডাকে সকলেই উৎকর্ণ হয়ে ছুটে আসে।

সুরভি নৌকাটা খালের ঘাটে ভিড়িয়ে শোনায় উত্তেজিত স্বরে,

—তিন চার খান লঞ্চ বোট আসতিছে এই দিকে! হুঁশিয়ার!

গিরিজা-গোবিন্দরাও এসে পড়ে।

দেখা যায় বাঁধের মাথা ছাড়িয়ে তিন খানা লঞ্চ আসছে জল কেটে, সঙ্গে কয়েকটা বোট। ডেকে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ অফিসার, অন্য বোটে ডি-এফ-ও—পুলিশ বাহিনী।

কালু-পটলার দল গর্জে ওঠে—গিরিদা! কও—ওগোর নামতি দিমু না শ্যায করি দিই।

—না! গিরিজা বাধা দেয়। বলে সে,

—ওগোর আইতে দে। কি কয় শুনি। তারপর দেখা যাবে।

দ্বীপের এদিকে বের হয়েছে আবার-বৃদ্ধ-বণিতা। হাজার দুয়েক লোকজন মেয়েছেলে জমায়েত হয়েছে

তীরভূমিতে। লঞ্চগুলো বড় নদীর এদিকে এসে পড়েছে! খালের মুখে বোটগুলোকে খুলে দেয়, তাতে রাইফেলধারী পুলিশ।
সুরভি দেখছে ওদের।
বোটগুলো খালের এ মাথা ওমাথায় ছড়িয়ে পড়ে, বড় গাং-এ রয়েছে একটা লঞ্চ। অন্য দুটো এসে এদের ঘাটে ভিড়েছে।
পুলিশ বাহিনীও তৈরী। যে-কোন মুহূর্তে তারা হয়তো এই অবাধ্য জনতাকে ঠাণ্ডা করে দেবে।
বলেন পুলিশ অফিসার—আপনাদের একদিনের মধ্যে এই দ্বীপ খালি করে দিতে হবে।
—কই যামু? শরৎ দাস শুধোয়।
কোন কর্তাব্যক্তি বলেন—আবার দণ্ডকারণ্যেই ফিরে যেতে হবে। আর সেই ব্যবস্থা আমরা করে দেব। না গেলেও এখান থেকে চলে যেতে হবে নিজের দায়িত্বে।
একদিনের মধ্যেই যেতে হবে।
আজ এদের কোন আবেদন নিবেদনে তাঁরা কান দেন না। কথাগুলো বলে লঞ্চে উঠে চলে গেলেন তারা। লঞ্চটা ওদের নিয়ে নদীর ওপারের ক্যাম্পে চলে গেল।
ভাবনায় পড়েছে এরা। কুন্তিবুড়ি বলে—কি হইব রে?
কৃপাসিন্ধু বলে—মনে হয় চলে যাওয়াই ভালো।
যদুপতি, বনবিহারীরা বহু কষ্টে এসেছে, দণ্ডকারণ্যে আর যাবে না।
বলে তারা—যামু না! মরতি হয় এহানেই মরুম!
কালুরাও তাই ঘোষণা করে।
গিরিজা বলে—পথ বন্ধ করে রয়েছে।
কালু বলে—বনের সুত ধরি ঘুর পথে যাই হরিণভাঙ্গা নদীতে পড়বো। কত পথ আটকাবে?
স্তব্ধতা নামে বসতে। হঠাৎ গাং-এ কলরব ওঠে। ওদের নৌকাটা ফিরছে রসদ নিয়ে। কয়েকটা বোট ঘিরেছে তাদের। ওরাও এদিকে আসতে চায়, তীরে কারা কলরব করে।
কালু-পটলারাও ডিঙ্গি নিয়ে যাবার জন্য গাং-এ নেমেছে। এদিকেও বাধা দেয় ওই বোটের লোকজন। তাদের রসদ-এর নৌকাটাকেও কোনরকমে কালু-পটলের দল গিয়ে ছাড়িয়ে আনে।
লঞ্চ থেকে মাইকে কারা শোনায়—শান্তি ভঙ্গ করলে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো। দ্বীপে শান্তিতে ফিরে যান আপনারা, কেউ বের হতে চেষ্টা করবেন না।
কোনরকমে ফিরেছে তারা। গিরিজা বলে—আর যাতায়াতও করতে দেবেনা?
এদিকের অনেক মানুষ ওপারের আবাদে যায়, যায় কুমীরমারি-পুঁইজালির হাটে, কিন্তু সেপথও বন্ধ করেছে ওরা। এদের রুজি-রোজকারও বন্ধ হয়ে গেছে।
গুপীনাথ, শচীন, কেষ্ট আরও অনেকে এবার গিরিজাকেই ধরে—না খাতি পাই মরবো! তার চেয়ে কও ওদের—
কালু গর্জে ওঠে—না! এইখানে আসতি পারছ—এ মাটির জন্য লড়তি পারবা না? খাবার আমরা দিমু। এইখানেই থাকতি হবে।
খাবারও সীমিত।
তবু কিছু চাল ডাল দেয় ওদের। নিশিকান্ত চীৎকার করে,
—খবরদার। আগু হইছ কি গুলি করুম!
গরাণের লাঠিটা তুলে ধরে বুড়ো শণনুড়ির মত জটপাকানো চুল নিয়ে হাঁকে পাড়ছে খালের ধারে দাঁড়িয়ে লঞ্চটার দিকে।

রাত কাটে ওদের কোন মতে। বিনিদ্র রজনী।

রাতের অন্ধকারে হঠাৎ দেখা যায় ওপারের মানুষগুলো বোট নিয়ে এদিকের গাং-এ এসেছে।

কালু-পটলার দল উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—হুঁশিয়ার।

ওদের চীৎকারে জেগে উঠেছে সারা বসতের মানুষ। ওই লোকগুলো এসে তাদের দ্বীপের সব ডিঙ্গি -নৌকো যা ছিল ঘাটে নিয়ে চলেছে। এরাও চীৎকার করে। পটলারা দুচারটে তির-সড়কিও ছুঁড়েছে। স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কয়েকটা গুলির শব্দ ওঠে।

সচকিত হয়ে ওঠে বনরাজ্য। পাখীগুলো কলরব করে ওঠে ঘুম ভেঙ্গে গেছে তাদের। চীৎকার ওঠে—সইরা আয়। গুলি করছে।

গুলি অবশ্য কাউকে লাগে নি। ভয় দেখাবার জন্য বোধহয় শূন্যে ফাঁকা আওয়াজই করেছে তারা।

দ্বীপের লোকজন পিছিয়ে আসে। ওদের চোখের সামনে দিয়ে প্রায় সব ডিঙ্গি নৌকাগুলো ওপারে সরিয়ে নিয়ে গেল দূরে। এদের যাতায়াতের পথ বন্ধ।

শরৎ দাস ফুঁসে ওঠে—দ্বীপে বন্দী কইরা রাখতি চায়।

সুরভি দেখছে । ওর খববটা সত্যি হতে চলেছে। এরা তাদের বন্দী করে রাখতে চায়। খাবাব, জল সব বন্ধ করে দেবে যতক্ষণ না এরা রাজী হয় চলে যেতে।

গোবিন্দ বলে—যতদিন পারি লড়ুম, না খাই থাকুম, তবু ওগোর আর বিশ্বাস করি না।

অবরুদ্ধ জীবন। বাইরে যাবাব পথ নেই, রুজি রোজকার বন্ধ। হাটবার চলে গেল পুঁইজালির, মোল্লাখালির শশীপদোর গামছা. লুঙি, শীতল কর্মকারের একগাদা কাস্তে পড়ে রইল বসতে, একপয়সাও আসেনি।

ওরা এইবার সরব হয়ে ওঠে।

মাইকে ঘোষণা চলেছে—আপনাদের বাব বার অনুবোধ কব যাচ্ছে আপনাবা চলে আসতে রাজী হোন, সব ব্যবস্থা করা যাবে।

এদিকের মানুষগুলো নীরব। খালের ধাবে নদীর ধারের বনে ঝোপের আড়ালে এবা সাবধানী দৃষ্টি রেখেছে তাদের উপর।

কেতকীর ছেলেটার দু'দিন ধরে পেটের অসুখ, নামো বসতির কয়েকটা ছেলেও ভুগছে। কেতকী বলে—কি হইব খোকনের? ছেলেটা নেতিয়ে পড়েছে।

ললিতার চোখে জল, বলে সে—পেট ফাঁপছে। দম ফেলতি পারে না। যা হয় করো? ডাক্তাব—

গিরিজা বলে—ডাক্তার। ডাক্তার পাবা না। যাবার পথ বন্ধ।

বুড়ো নিশিকান্ত হঠাৎ হেসে ওঠে। বলে সে,

—মরণের পথ তো বন্ধ করতি পারে নি? কুন সমন্ধীও পারে না। এ্যাঁ। সেই দরজা খোলা আছে। ভয় কি। বাঁইচা যাতি দে। মরণ আর বাঁচন একই? এ্যাঁ।

ধমকে ওঠে গিরিজা—বাবা।

কেতকীর দুচোখে জল নামে। হঠাৎ নামো বস্তির থেকে কান্নার তীক্ষ্ণ শব্দ ওঠে। নরুর ব্যাটাটাও মরছে।

নিশিকান্ত গর্জে ওঠে—কে মরছে? এ্যাঁ—শুরু হই গেল গিয়া। কি করবে ডাক্তার বদ্যি!

কেতকী কান্না ভিজে স্বরে বলে—ওনারে যাতি কও। ওগো—ডর লাগে। খোকন—

ছেলেটার সাড়া দেবারও সাধ্য নেই। ধুকছে। এতটুকু বাতাস তার দাবী, সেইটুকুও নেবার সাধ্য নেই। একবার প্রবলবেগে শ্বাস তুলে নেতিয়ে পড়লো ছেলেটা।

চীৎকার করে ওঠে কেতকী।

তার স্বপ্ন সেই ঘর, সবুজ ফসলের দিন—খোকন সব হারিয়ে নেমে এসেছে নিবিড় অন্ধকার। তার কান্নার শব্দে চাইল গিরিজা।

খোকন আর নাই!

নিশিকান্ত হঠাৎ চুপ করে বিস্মিত-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে তার প্রাণহীন ছেলেটাকে। বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে সেই গরাণ কাঠের লাঠিটা শূন্যে তুলে চীৎকার করে,

—হালা ভগবানেরেই গুলি করুম। গুলি কইরা উড়াইয়া দিমু।

মৃত্যুর কালো ছায়া নেমেছে বসতে। অন্তহীন স্তব্ধতার মাঝে নদীর জোয়ারের গর্জন ছাপিয়ে জেগে ওঠে মেয়েদের কান্নার শব্দ।

মাইকে তখনও শোনা যায় নদীর দিক থেকে সেই কথাগুলো।

—আপনাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে—

ওই কথায় কান দেবার প্রযোজনও আজ বোধ করে না গিরিজা। তার সব চিন্তাশক্তি যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কালু-গোবিন্দদের কথায় শূন্য দৃষ্টিতে সে চাইল মাত্র।

দ্বীপের একপ্রান্তে চিতা জ্বলে ওঠে। এদিকে মানুষজন বড় একটা আসে না, আদিম অরণ্যের বুকে জোয়ারের সময় নোনাজল ওঠে, আবার নেমে যায়। সেই জমিতেই ওরা চিতা জ্বেলেছে, ক'দিনেই তাদের বেশ কয়েকজনকে এখানে বেখে গেছে। নামো কলোনীর দুঃখীরাম; হরিহর বাজার কলোনীর সাতকড়ি-গোবর্দ্ধন অনেক নামই মুছে গেছে এইখানে।

গিরিজার ছেলেকেও এতদূর থেকে এনেছিল বুকে করে এই অহল্যা মাটির বুকে, সমুদ্রের স্বাদ পাওয়া গাং-এর ধারের নির্জন বনে রেখে যেতে, আরও দুতিনটা ছেলেই মরেছে।

এ চিতার আগুন যেন নেভেনি। ওদের পথেব জীবনের সব যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটবে এইখানে।

কাঁদছে কেতকী। তার বুকেব একটা দিক শূন্য হয়ে গেছে। স্তব্ধ মানুষগুলো ফিরছে, হঠাৎ চীৎকার ওঠে ওদিক থেকে।

স্তব্ধ বিব্রত মানুষগুলো সতর্কিত হয়ে ওঠে।

ওদিক থেকে কাবা দ্বীপে নামবার চেষ্টা করছে। অনকেগুলো নৌকাও এসেছে লোক বোঝাই হয়ে। কালু-পটল-নরেনটা লাঠি লগি সড়কি নিয়ে বাধা দিচ্ছে।

ওদের শোক করার সময় নেই।

চকিতের মধ্যে বসতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শোকের বেদনাটাকে ক্রুদ্ধ আক্রোশে পরিণত করে ছুটে যায় গাং-এর দিকে।

পুলিশ, অন্য লোকজন চায় দ্বীপে নেমে ওদের সঙ্গে সীমাংসা করতে। কিন্তু আজ মীমাংসা—আলোচনার সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে এরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এ যেন তাদের জীবন পণ লড়াই, এখানে বাঁচা যায় না—অবরুদ্ধ দ্বীপে নেমেছে আহারের জ্বালা—টিউবওয়েলটা বুজে আসছে। মেরামত করার উপায় নেই। জল সীমিত, খাদ্য নেই। আছে অনাহার আর মৃত্যু।

আজ সর্বহারা এই মানুষগুলো উম্মাদ হয়ে সেই মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যায়, তার বাধা দিতে এসেছে ওই পুলিশ, মানুষের দল।

গর্জে ওঠে গিরিজা—ওদের উঠতে দিমুনা এদিকে।

সাঁ সাঁ তির ছুটে চলে আকাশে, নদীর বুকে নৌকার পুলিশ, অন্য লোকজন আশা করে নি এটা। দু'একটা নৌকা ধারে গিয়েছিল সুরভি-যমুনা অন্য মেয়েরাও নেমেছে কাঠ-দা-বটি সম্বল করে। ওই কামটে ভরা নদী—যে-কোন মুহূর্তে কামটের দল বিষাক্ত ধারালো দাঁতে ফালা ফালা মাংস তুলে নেবে ওদের দেহ থেকে। বিষিয়ে পচে মরবে তারা।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওবা মরীয়া হয়ে বুক জলে নেমে সেই আক্রমণ প্রতিহত করছে।

কর্তাদের দু'একজন আশা করেননি যে এমনি বাধা আসবে। গুলি চালালে ওরা সরে যাবে, কিন্তু তা এরা চান না। তাই বাহিনীকে পিছু হটার হুকুমই দেন তারা।

নদীর এদিকে সরে আসছে নৌবহর। ক্লান্ত মানুষগুলো দ্বীপে ওঠে। ওই গোলমালে এসে পড়েছিল নিশিকান্তও। পরণে ফালা ফালা কাপড়, হাতে গরাণ লাঠি। শীর্ণ ন্যুব্জ দেহ, সেও নেমে পড়েছিল জলে।

চীৎকার করে—শ্যাষ করি দিমু!

হঠাৎ তার চীৎকারে চাইল গিরিজা—অন্যরা। জলটা লাল হয়ে গেছে। চীৎকার করে তীরে উঠতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত কামটের দল তাকে ঘিরে ফেলেছে, ধারালো দাঁত দিয়ে তার পা-কোমরের মাংস কুরে নিয়েছে। কুন্তিবুড়ি চীৎকার করে ওঠে,

—কামট।

কালু-পটলারা লাফ দিয়ে নামে জলে, বাঁশের ঘা মারতে থাকে জলে, কোনরকমে টেনে তুলেছে লোকটাকে।

ততক্ষণে কামটের দল তার পা—জানুর মাংস প্রায় শেষ করে হাড় বের করে এনেছে। চীৎকার করছে নিশিকান্ত।

...কাতর চীৎকার। করার কিছুই নেই।

ছটফট করে ক্রমশঃ স্তব্ধ হয়ে আসে শীর্ণ দেহটা। নিশিকান্ত হালদার দীর্ঘ দশবছর ছিন্নমূল জীবনের পথে পথে ঘুরে আজ আদিম অরণ্যের গহনে এসে তার ঘরের ঠিকানা খুঁজে পেল।

সেখানে হয়তো আছে প্রশান্তি।

দ্বীপের সীমান্তের চিতার আগুন ওদের নেভে না। একজন যায়—আসে অন্যজন। বনভূমির নির্জনে ওরা প্রায় পরিচিত জনকে এইখানেই রেখে গেল।

চাল-ডাল যা ছিল শেষ। ফুরিয়ে গেছে সুরভির সঞ্চয়ও। সকাল থেকেই খেতে পায়নি অনেকে। জল তবু ছিল, টিউবওয়েল দুটোও যেন বুজে আসছে। জলে আয়রণের ভাগ বেশী, আর বালি উঠে নীচের পাইপও বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু করার নেই।

সামান্য জল তবু উঠছিল—তাও ফুরিয়ে আসে।

আর্তনাদ করে কালু—জলও নাই গোবিন্দদা।

গিরিজা চেয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে। তার তৃষ্ণাও চলে গেছে। এখন বুক জোড়া শুধু শূন্যতা। খোকন নেই, ছোট ভাই ভুজঙ্গ আগেই গেছে, বাবার সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুটাকে ভুলতে পারেনি সে।

এ মাটিতে এসে সব হারিয়ে গেছে তার।

গিরিজা স্তব্ধ-নির্বাক-নিস্পৃহ হয়ে গেছে। তার কাছে বাঁচা মরা দুইই সমান হয়ে উঠেছে।

কালু-পটলরা তবু থামেনি। খালের ওদিকে দুতিনটে ডিঙ্গি মেরামত করার জন্য ছিল, সেই গুলোর সন্ধান ওরা পায়নি। কালু-পটলরা রাতের অন্ধকারে সেই ডিঙ্গি নিয়েই মোল্লাখালির দিকে যাবে, যদি চাল মেলে আড়তে।

ওরা রাতের অন্ধকারে খালের ধারে গিয়ে দেখে তার আগেই কে একজন চলেছে ডিঙ্গি নিয়ে। দুজনে সেই ডিঙ্গিটাকে ধরার চেষ্টা করে।

কৃপাসিন্ধু ক'দিন দেখেছে, আজ সেও বুঝেছে এখানে থাকা মানে মৃত্যু। সে চলে যাবে কলকাতায়, ওপারে পৌঁছাতে পারলে ক্ষেত্রমাষ্টারকেও খবরটা দিতে পারবে। লোকগুলো এখানে যেন উন্মাদ হয়ে এগিয়ে চলেছে নিষ্ঠুর মৃত্যুর দিকে।

বাঁচার কোন পথই নেই। কৃপাসিন্ধুর বাঁচার সাধ-স্বপ্ন সবই আছে। তার ঘর বাড়ি হবে বেলঘরিয়ার কাছে। জমি জায়গাও করেছে। কৃপাসিন্ধু তাই পালাচ্ছে গোপনে এখান থেকে।

রাতের অন্ধকারে হঠাৎ পেছনে ডিঙ্গিটাকে দেখে চাইল। এগিয়ে আসছে ওরা। তারার আলোয় দেখেছে কৃপাসিন্ধু কালুকে। কালু গর্জে ওঠে—কে যায়? নৌকা থামাও নালি ডুবাই দিমু।

একটা সড়কি উড়ে যায় কৃপাসিন্ধুর মাথার উপর দিয়ে।

চমকে ওঠে কৃপাসিন্ধু। এদিকে মৃত্যু—সামনে বাঁচার আশ্বাস। কৃপাসিন্ধুও মরীয়া হয়ে তার ডিঙ্গির খোল

থেকে সড়কিটা তুলে নেয়। কৃপাসিন্ধু এবার মরীয়া হয়ে সড়কিটা ছোঁড়ে। তীক্ষ্ণধার সড়কিটা গিয়ে বিঁদেছে কালুর বুকে।

অস্ফুট আর্তনাদ ওঠে রাতের অন্ধকারে।

কাঁপছে কালুর দেহ —দম বন্ধ হয়ে আসে, হাতে ঠেকে উষ্ণ রক্তস্রোত, নৌকাটা দুলে ওঠে, গাং-এ ছিটকে পড়ে কালুর রক্তাক্ত আহত দেহটা সড়কী সমেত।

চীৎকার করে পটলা—কালু!

ভাটার টানে দেহটা বারকতক পাক খেয়ে ভেসে গেল অন্ধকার সমুদ্রে ফেরা জলস্রোতের টানে।

কৃপাসিন্ধু প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে চলেছে ওপারের দিকে, দূরে দু'একটা বাতি জ্বলছে, ওই আলোর বিন্দুগুলোর দিকে চলেছে সে।

কালুর দেহটা ভেসে গেল অন্ধকারে আদিম অরণ্যভূমি আর সমুদ্রের দিকে।

পটলা ফিরে আসছে ক্লান্ত বিপর্যস্ত মানুষের শ্মশানভূমির দিকে। যমুনা দেখেছিল ওদের দুজনকে ডিঙ্গিতে যেতে। তার বলে গিয়েছিল—খাবার আনবে।

জলও আনবে যেভাবে হোক।

দ্বীপের অবরুদ্ধ বুভুক্ষু মানুষগুলো ওদের পথ চেয়েছিল। যমুনা ওকে যেতে দিতে চায় নি। তার ভয় হয়।

কালু হাসে—ধ্যাৎ! কি হইব? । যামু আর আইমু। কেউ মালুম পাইব না। বিভূতি নস্কর চাল দিবে নিই আসি।

নৌকাটাকে ফিরতে দেখে এগিয়ে আসে যমুনা। কালুর পথ চেয়েছিল সে। অন্য লোকজনও এসে পড়ে। পটলা ওদের দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

—কালু আর নাই!

চমকে ওঠে যমুনা—কি কস্?

পটলার ডিঙ্গিতে তখনও পাটাতনে পড়ে আছে কালুর দেহের রক্তধারা, চাপ বেঁধে গেছে। পটলা বলে—কে ঠিক মালুম পেলাম না, যাচ্ছিল আমাগোর ডিঙ্গি লই। তাড়া করলাম—সড়কি ছুঁড়লো সে। সেই সড়কি কালুর বুকে লাগছে ছিটকে পড়লো কালু গাং-এ। ভাটির টানে আঁধারে তারে খুঁজি পেলাম না গোবিন্দদা, কালুরে রাখি এলাম ওই গাং-এ, বনের মধ্যি!

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে। আজ তাদের প্রিয়জন হারিয়ে গেল। যমুনার সব স্বপ্ন-সাধও ব্যর্থ হয়ে গেল কি নিষ্ঠুর বিপর্যয়ে।

দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

সুরভি শুনেছে সব। সে এগিয়ে আসে যমুনার কাছে। এমনি কোন সর্বনাশ ঘটবে যেন জেনেছিল সে। ওদের অদৃষ্টে কোন পাবার কিছুই নেই, পাবে দুঃখ—জ্বালা আর হাহাকার।

সুরভি বলে—কান্দিস ক্যান্ যমুনা? চোখের জল আমাগোর পাথর হই গেছে। ওই ঘর বাঁধার স্বপ্ন দ্যাখা ভুলই করছিলি তুই। ঘর আমাগোর বরাতে নাই, ভালোবাসতি আমাগোর ভুলাই দিছে হেই মুখপোড়া ভগমান।

স্তব্ধতা নামে বসতে। আতঙ্ক-অনাহার—আর মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায় জোয়ারে ফুলে ওঠা গাং-এর গর্জনে, বাতাসের আরণ্যক হাহাকারে।

বাধা আর দেয়না ওরা।

বাধা দেবার শক্তি সাহসও নেই। অনেক যন্ত্রণা—রক্তক্ষয় আর মৃত্যু এদের সব শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ইতিহাসে এই রক্তক্ষয়ের—সহ্যের কাহিনী কোনদিন লেখা থাকবে না। হারিয়ে যাবে এদের এই বাঁচার সব কথাই, হয়তো বিকৃত করেই লেখা হবে কোন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে।

কিন্তু চিরন্তন মানুষের জীবনকাহিনীর পাতায় এ রূপ হবে স্বতন্ত্র। এদের প্রেম—ভালবাসা—জীবনের

প্রতি গভীর মমত্ববোধ সেখানে নিজমূল্যে প্রতিভাত হবে না কোনদিনই।

আজ এরা হেরে গেছে। হারিয়ে গেছে এদের সবকিছু। আশা-ভালবাসা-স্বপ্ন আপনজন-মনুষত্ব অনেক কিছুই।

ভোরের আগেই বাইরের লোকজন—কর্তারা পুলিশবাহিনী এসে উঠেছে দ্বীপের মাটিতে। ধসেপড়া ঝুপড়ির সারি—বুভুক্ষু মানুষের স্তব্ধ চাহনি, তৃষ্ণার্ত শিশুর ক্রন্দন ওদের চোখে আনে বিস্ময়।

কতজন এসেছিল—কতজন হারিয়ে গেল এই দ্বীপে তারও কোন খতিয়ান রইল না।

ওদের লঞ্চে নৌকোয় তুলে এপারের ক্যাম্পে আনছে ওবা। গিরিজা-যমুনা—গতিলারের বৌ—কেতকী—শরৎ দাসরা চেয়ে আছে দ্বীপেব দিকে। গিবিজার চোখে জল নামে—তার অতীত —ভবিষ্যৎ সব হারিয়ে গেছে এই নিষ্ঠুর মাটিতে. যমুনার বুক শূন্য হয়ে গেছে। কেতকীর চোখে জল নামে।

কান্না ভিজে স্বরে আর্তনাদ করে সে—ক্যান আনছিলা এহানে?

এর জবাব আজ এরা কেউ দিতে পারে না। কুন্তিবুড়ি বিড় বিড় করছে—মরণডাও হয না!

দূর বিস্তারী নদীর দিগন্তসীমায় কোন মাটির আভাসও দেখা যায় না। জোয়ারের নোনা জল ফুঁসছে রায়মঙ্গল—কালিন্দী—ঝিলার সঙ্গমে।

নৌকাগুলো ভেসে চলেছে জোয়ারের বেগে।

ভেসে চলেছে ছত্রভঙ্গ মানুষের দল। কোথায় ভেসে চলেছে আবাব বানে ভাসা খড়কুটোব মত আশ্রয়ের আশায় তা তারাও জানে না।

দূরদিগন্তে ভেসে ভেসে ওরা হারিয়ে গেল সেই অজানা জগতের সন্ধানে যেখানে আবার ওরা ঘর বাঁধবে।

বনের আঙিনায়

ঘড়ি বলে এখানে কিছু নেই, টাইমটেবিল ওটা শুধু কালির আঁচড় মাত্র, কর্তাও কেউ নেই এ ট্রেনের। এ জগতে এলে মনে হয় না যে ফেয়ারলি প্লেসের বিরাট একটা বাড়িতে হাজারি-দুইহাজারি মনসবদার —হাজার হাজার লোক আছে ট্রেন চালানোর তদারক করতে।

টিকিট কালেকটারের পিতৃ-পুরুষের সাধ্য নেই এখানের অধিকাংশ যাত্রীদের কাছে টিকিটের দাবি জানাতে। ড্রাইভারের সাধ্য নেই ট্রেন চালাতে সময়মতো।

কারণ যাত্রীদের মর্জিতে এদের চলতে হয়।

স্টেশন নামেই আছে, তবে যাত্রীদের বসতি বা টোলার কাছে এলেই চেন টেনে গাড়ি থামানো হল। কাতারে কাতারে তারা দয়া করে নামলেন কেউ বা উঠলেন ,আবার ট্রেন গড়িয়ে চলতে লাগলো। কবে কোন্ সময় কোন্ স্টেশনে পৌঁছাবে তার খবর ঈশ্বরও জানেন না, জনতারাজ-এর মর্জিতে যেতে হবে তাকে। তাই সময়মত চলার হুকুম নেই ট্রেনের।

এ হেন ট্রেনের হদিস পেতে গেলে ডিহ্‌রি অন শোন থেকে স্রেফ ডালটনগঞ্জ অবধি ব্রাঞ্চ লাইনে গেলেই বুঝতে পারবেন মজাটা, আর আমারও বরাত মন্দ এ হেন গাড়িতেই উঠেছি এক শীতের মধ্যদিনে।

সন্ধ্যা ছ'টায় এ ট্রেন ডালটনগঞ্জে পৌঁছাবে টাইমটেবিলে লেখা আছে, আমি পড়ে আছি পথের ধারে কোন ছোট্ট স্টেশনে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, জনমানবহীন মাঠের মধ্যে স্টেশনের ঘর। এদিক ওদিকে ছড়ানো দু-চারটে খাপরার ঝুপড়ি, চারিদিকে সরষে-গহুর ক্ষেত। মাঝে মাঝে ভ্যারাণ্ডাগাছের ঝুপি জঙ্গল, দূরে পাহাড়ের সীমান্ত ঘিরে আঁধার নেমেছে, সেই আঁধারে দেখা যায় পাহাড়ের উপরে মিটিমিটি বাতি জ্বলছে বনঝারি, কোয়ারিতে, শোননদীর ওদিকের পাহাড় থেকে ডিহ্‌রি, রোটাস জাপলার সিমেন্ট কারখানায় চুনা-পাথর আনা হয়।

শোন নদীর ধারে এই পাহাড়ের মধ্যে তাই ছোট বড় কোয়ারি রয়েছে। সেখানে দু-চারটে বাতি জ্বলছে। এদিকের অন্ধকারে ট্রেনখানা আর কিছু মানুষ তখন হারিয়ে গেছে এখানে।

আমার সঙ্গী রঞ্জন কেমন ভয় খেয়ে শুধোয়—কি হবে দাদা?

শঙ্কর পরম দার্শনিকের মত বলে—চুপ করে থাক, ট্রেন চলার হলে চলবে। দেখছিস না ফোকোটিয়ার গাড়ি, তাই এমনিই চলবে। তবু নড়ছে এই ঢের।

এখানে চলছে শুধু মালগাড়ি। হাজারীবাগ, ধানবাদ অঞ্চলের কয়লা আর বনাঞ্চলের বাঁশ চলেছে মালগাড়ি বোঝাই হয়ে। মালগাড়ির আর শেষ নেই। আমাদের গাড়ি পড়ে রইল পথের ধারে।

রঞ্জন বলে—কলকাতায় কয়লার হাহাকার, এদিকে দেখেছো সারা উত্তর ভারতে চলছে কেবল হাজার হাজার ওয়াগন কয়লা।

শঙ্কর বলে—নিতে জানতে হয় বৎস।

অলক জানায়—সারাদিন পেটে দানাপানি নেই, কি ঝাক্কি রে বাবা? এখানে চা-খাবারও নেই। আছে শুধু মোমফালি আর চানামটর, এই চিবিয়ে কখন পৌঁছাবো ডালটনগঞ্জে?

—লানটেনগঞ্জ জানা জী?

ওদিকে কম্বলজড়ানো এক মূর্তির সর্বাঙ্গে যেন সাড়া জাগে। গাড়িতে আলোর বালাই নেই। কোথায় রামধুন-র সুর ওঠে। আবছা আলোয় ওই মূর্তির দিকে চাইলাম। ওর প্রশ্নে জানাই,

—হ্যাঁ!

ডালটনগঞ্জকে এরা দেহাতি ভাষায় ওই বলেই ডাকে।

রঞ্জন জানায়—উসি কারণসে হাতমে লানটেন হো গিয়া। হাতে হ্যারিকেন জানো? তাই হয়েছে এবার।

আবছা অন্ধকারে কার হাসির শব্দে ওঠে। মিষ্টি সুরেলা হাসি, ঊষর মরুভূমির নৈরাশ্যের মাঝে সবুজ

মরুদানের আভাস আনা হাসিটা হঠাৎ থেমে যায় ওই লোকটার ধমকে। মিষ্টি হাসি শুনে মেয়েটাকে ধমকায় সে।

—চুপ রহো।

মেয়েটাকে এর আগেও দেখেছি, শোননগর থেকে ওরা গাড়িতে উঠেছিল। চোখে পড়ার মত স্বাস্থ্য, কালোর ভাব ওর দেহের রঙে, তেবু চোখ দুটোতে ঝিলিক হানার চাহনি ফুটে রয়েছে।

এক নজরে দেখছিলাম ওকে। তখন শঙ্কর, রঞ্জন, অলোক ট্রেনে মালপত্র তুলতে ব্যস্ত। তারপর ওদের দিকে আর খেয়াল করিনি এতক্ষণ। নিজেদের ভাবনাতেই ছিলাম।

মেয়েটা চুপ করে দেখছে আমাদের। ট্রেনের কামরাতে আলোও তেমন নেই। কম্বল জড়ানো লোকটা চুপি চুপি জানায়,

—সামান উমান ঠিক্‌সে দেখনা বাবুজি!

মেয়েটি জানলার দিকে চেয়েছিল, স্টেশনের ধারে পাশে তামাম গাড়ির লোক নেমে একটু নেমে হাত পা ছড়াচ্ছিল, তারাও সব উঠে আসছে। হয়তো গাড়ি ছাড়ার সঙ্কেত এসেছে।

মেয়েটা বলে ওঠে—হিয়া দিল ভি চোরি হো যাতি হ্যায়।

গাড়িটা নড়ে উঠেছে, হয়ত চলবে আবার। আর এভাবে চললে কখন ডালটনগঞ্জে পৌঁছাবো ভগবান জানেন।

তবু পথের এই তিক্ততা দিয়ে মনকে ভরিয়ে তুলতে চাই না। মন বলে পথ চলি আনন্দে। ঘর-পালানো মন নিয়ে ঘর ছেড়েছো, পথের কষ্ট গায়ে মাখলে চলবে কেন বাপু? তাই বাইরের দিকে চেয়ে থাকি।

পূর্ণিমার রাত্রি।

মাঠ প্রান্তরের রূপ বদলাচ্ছে। ওপাশে দেখা যায় কোয়েলের বালুচর তার মাঝে ক্ষীণ জলরেখা, পাহাড়গুলোও কাছে এসে গেছে।

আর যাত্রীদল? তাদের ওঠা-নামা আর মর্জিমাফিক চেন টানাও তখন সমানে চলছে। ট্রেন হোঁচট খাচ্ছে পদে পদে।

ওপাশের যাত্রী রূপ সিংও অনেকটা সহজ হয়ে বলে,

—এ্যাইসাই হাল বাবুজী। কৌন ক্যা করেগা? স্বরাজ মিল গিয়া না?

মেয়েটি এর মধ্যে খাবারের চ্যাঙাড়ি বের করেছে। রঞ্জনকে বলেছিলাম—দূর পথ, কিছুই মিলবে না। যা হয় বৈকালের খাবার সঙ্গে নিও ভিহ্‌রি থেকে।

রঞ্জন বৈকালের খাবার কিছু নিয়েছিল, কিন্তু এখানের জলের এমনি ব্যাপার যে সেই কচুরী জিলাবী কখন জল হয়ে গেছে। আর সঙ্গে খাবারও নেই। তাই চুপচাপ রয়েছি।

—লিজিয়ে।

মেয়েটিই পলাশপাতায় একখানা করে মোটা রুটি জাতীয় কি হাতে তুলে দেয়। সঙ্গে একটু আচার। ছাতু, আমচুর কিছু মসলার পুর দেওয়া লিট্টি। কলকাতায় ওই দ্রব্য আধখানা খেলে আর তামাম দিন কিছু খেতে হবে না, কিন্তু রূপ সিং অভয় দেয়—খা লিজিয়ে, এ গৌরী—পানি বা?

—জল সঙ্গে আছে। ওকে জানাই।

রূপ সিং বলে — ব্যস, এক ঘোঁট পানি পি লিজিয়ে সব ঠিক হো যায়েগা। এখানের জলে পাথর ভি হজম হয়ে যাবে।

গৌরী বলে ওঠে —ঘুমনে আয়া, তব্‌ভি এতনি ডর? মালুম সিরিফ্ হাওয়া খাতে হেঁ কলকাত্তাকা আদমী।

মেয়েটার জিবের ধার একটু বেশী, সেটা হয়তো ওর রূপের দেমাকেই।

তবু খাবারটা নিঃশেষে খেয়ে ফেলি আমরা ক'জনই। অলোক বলে —সত্যি দম ফিরে এল। পেটে খোল কত্তাল বাজছিল এতক্ষণ।

গাড়িখানা আবার চলতে শুরু করেছে।

রূপ সিং বলে —দশবরষ আগাড়ি হিয়া আয়া থা বাবুজী।

পাঞ্জাবের ওদিককার রিফিউজী, ঘুরতে ঘুরতে ডালটনগঞ্জ এসে জঙ্গলে কাজ কারবার শুরু করেছে।

অন্ধকারে বিজলী বাতির মেলা বসেছে, ওদিকে কোয়েলের উপর নোতুন ঝকঝকে রেলব্রিজ, ট্রেনটা বড়সড় স্টেশনে ইন্ করেছে। গারোয়া রোড স্টেশনের নাম।

এখান থেকে লাইন একটা গেছে রেণুকুট হয়ে চৌপান, সেখান থেকে চুনার অবধি গাড়ি যায়। কোয়েলের ওপাশে একটু গেলেই ইউ-পি আর অন্যপাশে শুরু হয়েছে মধ্যপ্রদেশের দুর্গম বনপাহাড়ের রাজ্য। ওই রেণুকুটে এখন হয়েছে বিড়লার হিণ্ডালিয়াম ফ্যাক্টরী, তার অদূরে রয়েছে রিহাণ্ড ড্যাম। তার বিজলীতে এদিকের আলো জ্বলে, কারখানা চলে। নদীর ওপারে ডালটনগঞ্জ জেলার সীমান্ত মহাকুমা শহর গারোয়া।

এখান থেকে দু'একজন যাত্রী উঠল। বাংলা বুলি শুনে চাইলাম, দুটি তরুণ গাড়িতে উঠেছে। ওরাও আমাদের লটবহর সমেত দেখে অবাক হয়ে শুধোয়,

—কোথায় যাবেন?

জানাই —বেতলা ন্যাশনাল পার্ক, পালামৌ-এর জঙ্গলে। আপাততঃ ডালটনগঞ্জ যেতে হবে।

গৌরী চকিতের জন্য চাইল। প্ল্যাটফর্মের আলোর কিছুটা বিনা নোটিশে আমাদের কামরায় ঢুকেছে। তারই একফালি আলোয় দেখি ওর ডাগর চোখে বিস্ময়।

তরুণ ছেলেটি রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করে। সব শুনে বলে—ওই জঙ্গলে দশবারোদিন থাকবেন কি করে?

জঙ্গলে দশবারোদিন থাকার আনন্দ কি ও তা বোধহয় জানে না। সে বলে,

—বনপাহাড়ে বাস করে হাঁপিয়ে উঠেছি আমরা।

সিঙ্গল লাইন এদিকে, সেটাকে মালগাড়ি চলাচল সুগম করে তুলতে ডবল লাইন পাতা হচ্ছে। ওরা রয়েছে সেই কাজে।

কলকাতার ছেলে বসন্ত।

বসন্ত বলে—সাংঘাতিক জঙ্গল, আর হাতির উৎপাতে কাজ করা দায় ওই বনে। আপনারা চললেন সেইখানে?

মেয়েটি বলে ওঠে—তাজ্জব? জঙ্গলে থাকবেন?

রূপ সিং কম্বলটা খুলে ফেলেছে। ও যেন আমাকে নোতুন করে দেখছে। তাই বলে,

—জঙ্গলভি আচ্ছা-হ্যায বাবুজী, ইয়ে শহর—ইস্ আদমীয়োঁকা রাজ্য সে উভি আচ্ছা হ্যায়। যাইয়ে আনন্দমে রহেগা জী।

কথাটা আমিও বিশ্বাস করি। মানুষের জগৎ থেকে জঙ্গল যেন অনেক শান্তির। ওখানে তবু আনন্দের সন্ধান পাই।

গৌরী এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল বাইরের দিকে চেয়ে। জঙ্গল সম্বন্ধে ওই মন্তব্য শুনে বলে ওঠে,

—হ্যাঁ। দিল জ্বল যায়েগা!

গৌরী বেশ জ্বালাভরা সুরেই কথাটা জানিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার চাহনিতে কি জ্বালা ফুটে ওঠে।

ট্রেনটা চড়াই ঠেলে উঠেছে ধীরে ধীরে। ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ আওয়াজটাই কানে আসে, হঠাৎ আলোর রাজ্য ছেড়ে অন্ধকার একটা টানেলে ঢুকে গেল। বসন্ত বলে,

—এবার বনপাহাড়ের মধ্যে আসছেন। দূরে পড়বে লাতেহার রেঞ্জ, পালামৌ, ওদিকে মধ্যপ্রদেশের সোরগুঁজা। এর অন্যদিকে রেণীকূট পার হয়ে বিন্ধ্য পর্বতের রেঞ্জ। এককালে এসব এলাকায় শেরশা-মোঘল-মারাঠাদের আনাগোনা ছিল বেশী।

—এই দুর্গম অঞ্চলে তাদের আনাগোনা? রঞ্জন শুধোয়।

বসন্ত ক'বছর এই এলাকায় ঘুরেছে কাজ নিয়ে। ও বিহার সীমান্ত বরাডি স্টেশন থেকে দুর্গম মধ্যপ্রদেশের দিকে নোতুন রেললাইন বসানোর কাজে ছিল। সেই লাইন হলে এখান থেকে চিরিমিরি হয়ে কাট্‌নি লাইনের অনুপপুর পড়তো মাত্র দুশো মাইলটেক। বসন্ত বলে,

—মধ্যপ্রদেশের গহন অরণ্য পর্বতের রূপ কিছুটা দেখতেন ওপথে, কথা ছিল এম, পি সরকার অর্ধেক টাকা দেবেন, তারা তাই দিয়ে ওদের সীমান্তে জনবসতি অম্বিকাপুর অবধি লাইন করলেন, বিহার সরকার ওই কাজে টাকা দিতে গড়িমসি করায় সেই লাইন ওইদিক থেকে গিয়ে আর মিশল না, ফলে ওইদিকটা দুর্গমই রয়ে গেল। শুধু ডালটনগঞ্জ থেকে অম্বিকাপুর অবধি বাস চলে কোনমতে। ট্রেনের পরিকল্পনা শিকেয় উঠেছে।

এই বনপর্বত রাজ্যে একদিন অশ্বখুরধ্বনি উঠেছিল, এসেছিল শেরশা, এসেছিল আকবরের সেনাপতি মানসিং, জাহাঙ্গীরের সৈন্যদল। এখানকার রাজ্যবিস্তার আর বাংলার সঙ্গে যোগসূত্র রাখার জন্যই এই দুর্গম বনর্পবতে তাদের কেল্লা, রাজ্য কায়েম করা হয়েছিল।

বসন্ত বলে—এলাহাবাদ, রোটাসগড়, এদিকে চুনার তারপর পালামৌ কেল্লা পর পর সাজিয়ে নিন, দেখবেন ওদের পথের হারানো রেখাটা ঠিক মিলে যাবে। আর মারাঠাদের আগমনের পথও ছিল এই দিকে। বেনারসে তাদের প্রতিষ্ঠা আর মোঘলের তাড়া খেয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় এখানেও মারাঠারা হানা দেয়নি এমন নয়। তার প্রমাণও আছে গরওয়ারের কাছেই নগরপাটন-এ, সেখানে ত্রিশ মণ ওজনের সোনার বিষ্ণুমূর্তি এখনও রয়ে গেছে। অনেকেই বলে ওটা মারাঠাদের পরিত্যক্ত দেবতা।

গাড়ি আবার হেঁচকা খেয়ে দাঁড়িয়েছে। জনদেবতা নামছেন, ডালটনগঞ্জের কাছাকাছি এসে গেছি। তবু পথ আর শেষ হয় না, এদিকে কনকনে শীতের রাত্রি, দেরি যতো হচ্ছে ভাবনাও বাড়ছে তত। অজানা জায়গায় এতরাতে কোথায় উঠবো ভাবতে হয়।

সকলেই তাড়াতাড়ি পৌছাতে চায়। তাই ট্রেন থামতেই যাত্রীরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বোধহয় দু-একজন শহরে যাবার যাত্রী ওদের বাধা দিতে সেই চেনটানার যাত্রীদলও প্রতিবাদ জানায় জোর গলায়।

—ঠিক কিয়া! এখানেই নামবো আমরা।

আমরা নীরব দর্শকের মত ওদের ঝগড়াটা শুনছি। কোনরকমে গাড়ি আবার ছাড়ল ওদের নামা হতে।

দেখি একটা ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে সেই চলন্ত গাড়িতে উঠে পড়ল, হয়ত ট্রেনেরই যাত্রী। ট্রেনটা একটু স্পীড নিয়েছে—হঠাৎ আবার চেন টানা হয়েছে।

দেখি সেই ছেলেটিই তাদের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই চেন টেনে গাড়ি আবার দাঁড় করিয়ে বুক ফুলিয়ে নেমে গেল ধীরে সুস্থে বেপরোয়া ভাব নিয়ে।

রূপ সিং বলে—দেখা বাবুজী? মস্তানী দেখেছেন?

বেলা দুটোয় ডিহ্‌রীতে ট্রেনে উঠেছি, ছটা নাগাদ ডালটনগঞ্জ পৌছবার কথা বলা আছে টাইমটেবিলে, রাত্রি এগারোটা হয়ে গেল ট্রেন এবার ডালটনগঞ্জ স্টেশনে ঢুকছে।

রঞ্জন বলে—এত রাতে কোথায় ঠাঁই পাবো হে?

ভাববার কথা। শীতের রাত্রি, অজানা অচেনা ঠাঁই। তবু মুখ চেনা এক ভদ্রলোককে চিঠি দিয়েছিলাম, জানি না এত রাত অবধি তিনি স্টেশনে থাকবেন কি না।

বসন্ত বলে — পাঞ্জাব হোটেলে থাকতে পারেন, স্টেশন থেকে রিকশা নিয়ে চলে যাবেন। বেশী দূর নয়।

পালামৌ জেলার সদর শহর ডালটনগঞ্জ। এখানেই ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিস। পালামৌ ন্যাশনাল পার্ক— রিজার্ভ ফরেস্ট-এ যাবার এবং সেখানে বাংলোয় থাকার অনুমতি নিতে হবে এখান থেকে।

গতরাত্রে হাওড়া থেকে দুন এক্সপ্রেসে উঠেছি রাত্রি নটায়, ডিহরি থেকে নেমে আজ রাত্রি এগারোটায় এসে পৌছলাম এখানে। এরপর সেই ফরেস্ট বাংলোয় যেতে হবে ষোলমাইল দূরে। ডালটনগঞ্জ আসার

অন্যপথ অবশ্য আছে, গোমো থেকে যে ট্রেন ডিহ্‌রি অবধি যায়, তাতেও পাওয়া যায় আর বেশিরভাগ লোক যাতায়াত করেন রাঁচী থেকে বাসে, একশো চার মাইল পথ, সময় লাগে পাঁচ ঘণ্টার মত। ভদ্রভাবে যাতায়াত করার ওইটাই পথ। তাই ওইপথে এখানে লোক বেশী যাতায়াত করেন।

সঞ্জীব চন্দ্র 'পালামৌ' প্রবন্ধে বলেছিলেন প্রবাসী বাঙালী মাত্রে সজ্জন। অনিলবাবুর সঙ্গে চেনা জানাও নেই। কয়েক বৎসর আগে কলকাতার একটি পত্রিকা অফিসে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। ডালটনগঞ্জের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা, বনের কাঠ বাঁশ -এর কারবার করেন, তাঁর সাহিত্যপ্রীতির জন্যই ওখানের বাংলা পত্রপত্রিকার সরবরাহ করেন এই অঞ্চলে। সেই উপলক্ষ্যে কলকাতায় এসেছিলেন। একটা পত্রিকা অফিসে তার সঙ্গে দেখা, তখন ডালটনগঞ্জ-এর অরণ্য অঞ্চলে যাবার ইচ্ছেটা প্রকাশ করেছিলাম তাঁর কাছে। তিনিই সব খবর দিয়েছিলেন। আর সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমাদের এই অরণ্য ভূমিতে।

ক'মাস পর সময় মিলতে সেই পরিচয়ের জের টেনে এবার তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম আমাদের আসার কথা।

আবছা আলো আঁধারি নেমেছে স্টেশনে, লোকজন ট্রেন থেকে নেমে এদিকে ওদিকে চলে গেছে। রঞ্জন তখনও কুলির সঙ্গে রফা নিয়ে ব্যস্ত। তার উত্তর কলকাতার খিচুড়ি হিন্দীতে দর করছে দুজন কুলির সঙ্গে।

—এত্‌না জিয়াদ কাহেকো হোগা? মাল তোলো—পয়সা ঠিক ঠিক মিলবে। হ্যাঁ।

অচেনা জায়গা, প্ল্যাটফর্মে চেনামুখও কেউ নেই। এত রাত্রে স্টেশনের বাইরের দোকানের বাতিও নিভে আসছে। ট্রেন চলে গেলেই সব দোকান পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে। তার আগে বেরুতে হবে এখান থেকে। তাই বলি যা নেয় নিক, মালপত্র বাইবে এনে রিকশা দেখ, কোন ভালো হোটেলে নিয়ে যাক আমাদের।

খিদেয় পেট জ্বলছে, ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। ডিহ্‌রী থেকে ওই রাজকীয় গাড়িতে বেলা একটা থেকে বাত এগারোটা অবধি এসে আর দাঁড়াবার সাধ্য নেই।

এখন বিকশারও অভাব। দু'একটা রিকশা আসছে তাও যাত্রীদের টানে চলে যাচ্ছে, একটা বিকশাকে রাজী করিয়ে আনছি, হঠাৎ একটি তরুণ কোথেকে এসে লাফ দিয়ে উঠে বসে সেটা দখল করে নিয়ে বলে,—উধার চলো।

শঙ্কর তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে —হম্‌লোক্ লিয়া উ রিকশা।

ছেলেটি জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করে না বিদেশীদের কথায়। বেশ মেজাজ ভবে শুধু চাইল—ওই চাহনিতে জানাতে চায় তোমরা আবাব কোন্ মুলুক থেকে রাত- দুপুরে এখানে জ্বালাতে এসেছো চাঁদ? কেটে পড়ো, এ আমার এলাকা।

শঙ্কব কি বলতে যায়, আমিই থামালাম। বিরক্তি ভরে বলি,

—এখানে কোন নীতিব বালাই নেই শঙ্কর। এতটা পথ ওই ট্রেনে এসে মালুম পাওনি তবে? যেতে দাও।

ভাবছি কোথায় কিভাবে আশ্রয় পাবো, হঠাৎ রঞ্জন সঙ্গে করে অনিলবাবুকে নিয়ে আসেন। অনিলবাবু বলেন,

—আপনাকেই খুঁজছিলাম। যাক এসেছেন তাহলে?

ভদ্রলোক এত রাতেও স্টেশনে এসেছেন। আর থাকার খাবার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। মায় খাবারও রেডি রয়েছে সেখানে।

—বাবুজী! রিকশা নেহি মিলা?

দেখি রূপ সিং কোথেকে এসে হাজির। ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। পায়জামা সালোয়ারের উপরে একটা শাল জড়িয়ে নিয়েছে সে।

রূপ সিং তবু খবর নিতে এসেছে। ওদের দেখে বলি — আমাদের বন্ধুও এসে গেছেন। ট্যুরিস্ট লজে থাকার ব্যবস্থা করেছেন।

রূপ সিং আশ্বস্ত হয়—

—ব্যস। কিন্তু রিকশা নেই, যাবেন কি করে মালপত্র নিয়ে সেখানে? রাস্তা একটু দূরই।

রূপ সিং বলে — হামারা ভ্যান আগিয়া, আপ্ লোগ্ কো পৌঁছা দেঙ্গে। ওখান হয়েই যাবো আমরা। অনিলবাবু অবশ্য এর মধ্যে রিকশার ব্যবস্থা করতে গেছেন। তাই বলি— আপনাকে আবার তন্ করবো?

গৌরী জানায়—তব্ রহিয়ে হিঁয়া, হম্‌লোক চলতে হেঁ।

কথাটা একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললো সে। ততক্ষণে রূপ সিং অনিলবাবুকে দেখে ডাক দিয়েছে আরে এ অনিলবাবু! আইয়ে।

তারপর দেখি আমাদের হোল্ডল সুটকেসগুলো গাড়িতে উঠে যায়। গৌরী মুখ বোদা করে গিয়ে ওপাশের সিটে বসেছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুখটা সরিয়ে নিল। ওর কালো চোখে কি একটু নীরব ধারালো হাসির ঝিলিক ফুটে ওঠে। গাড়িটা চলেছে ট্যুরিস্ট-লর্জের দিকে।

ডালটনগঞ্জ শহর হিসেবে ছোটই, সমতলপ্রায় ভূমিতেই শহরের পত্তন, এর একপাশ ছুঁয়ে চলে গেছে কোয়েল নদী।

পালামৌ রাজ্যের রাজাদের সময় ডালটনগঞ্জের প্রতিপত্তি তেমন ছিল না। চেরো রাজাদের রাজধানী ছিল বেতলায়, এখন সেখানে গহন অরণ্য, সেখানে গড়ে উঠেছিল পরে মোঘলদের কেল্লা আর প্রতিষ্ঠাও ছিল সেখানে।

মারাঠাদের হানা হয়েছিল সেখানেই। ডালটনগঞ্জ তখন ছিল সামান্য বস্তি মাত্র।

ইংরেজ শাসনের কালে আর ওই বেতলার কেল্লা বিধ্বস্ত হবার পর সেখানে বনরাজ্য গড়ে ওঠার সময় থেকে ডালটনগঞ্জ-এর বসতি বাড়তে থাকে আর ক্রমশ বেতলা বনে ঢেকে যায় জমে ওঠে এই বিদেশীদের গড়া শহর।

ইংবেজদের আমলে এখানের প্রভাব বাড়ে ।আগে পালামৌ ছিল হাজারিবাগেরই অধীনে, মহাকুমা শহর ছিল লাতেহার। সঞ্জীবচন্দ্রের আমলেও তিনি চাকরি উপলক্ষ্যে হাজারিবাগ থেকে এসেছিলেন লাতেহাব-এ।

বিদেশী ইংরেজের লোভী দৃষ্টি পড়েছিল অরণ্য - পবর্তের অধিকারী চেরো রাজাদের উপর। চেরো রাজবংশের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় মোঘল সম্রাট আকবরের আমল থেকে তাঁবা যুদ্ধ করে আসছেন তাদের সঙ্গে। বহু আঘাতেও তাদের বিপর্যস্ত করতে পারেনি মোঘল মারাঠারা । টিকে ছিলো চেরো রাজবংশ সগৌরবে।

ইংরেজদের কাছেও চেরোরাজা ছত্রপতি রায় মাথা নীচু করেনি, বরং ইংরেজদেরই প্রতিঘাত হেনেছিলেন তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে। আদিবাসী হো, ওরাওঁ, খারওয়ারদের সংহত শক্তিব কেন্দ্র ওই চেরো রাজধানী বেতলাকে তাই বিপর্যস্ত করতে সব শক্তি দিয়ে হানা দিয়েছিল ইংরেজ। তাদের সৈন্য এসেছিল চুনার, বক্সার, পাটনা কেল্লা থেকে।

এই অভিযানের সেনাপতি ছিলেন প্রথমে ক্যাপটেন জেকভ ক্যামেন।

ইংরেজদের সঙ্গেই সংঘাত বাধে চেরো রাজাদের আর এখানের অরণ্য-ভূমির সাধারণ মানুষেব। ইংরেজও বাধা পেয়ে ক্ষেপে ওঠে।

রাজা ছত্রপতি রায়, পবন রায়, বাজা গোপাল রায়— এঁদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ পাকাপাকিভাবে গাড়ে উঠলো বেশ কিছুদিন ধরে। ইংরেজরাও বনপর্বত এলাকায় ঠিকমত তাদের কায়দায় আনতে পারছেনা। ১৭৭০ সালে নোতুন সেনাপতি লেঃ বার্লেগু এলো। সেও হানা দিল বেতলায়।

চেরোরাজারা তাঁকেও বেকাদায় ফেলতে নোতুন সেনাপতি পাঠালো ইংরেজরা। তার নাম ক্যাপটেন ডালটন।

এই ক্যাপটেন ডালটন এখানে ঘাঁটি কায়েম করে চেরোরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাদের এবার কাবু করে আনলো। এখানের মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামকে প্রতিহত করল ডালটন, তাই তার পদমর্যাদা বাড়িয়ে তাকে করা হল কমিশনার। এর মধ্যে আদিবাসী বিদ্রোহ, সিপাই বিদ্রোহের আগুনও পালামৌর অরণ্যে জ্বলে উঠেছে, কিন্তু কঠিন হাতে তাকে নিবারণ করেছিল এই ডালটন সাহেব।

তারই নাম নিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের ডালটনগঞ্জ শহর।

কথাটা বলেছিলাম পরদিন স্থানীয় কিছু ভদ্রজনকে, ওখানকার একটি সিনেমার মালিক তরুণ এক ভদ্রলোক, স্থানীয় ট্যুরিস্ট অফিসার, শহরে আরও কিছু মানুষকে।

—এখানের সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যে পায়ের তলে মাড়িয়ে দিয়েছিল, ইংরেজ শাসনের ধ্বজা তুলেছিল সেই ডালটন সাহেবের ছবি এখনও মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এ যত্ন করে টাঙিয়ে রেখেছেন, তার নামটা এখনও শহরের কপালে লটকে রেখেছেন কেন?

স্বাধীনতার পর এই খোলসটাকে বদলে ফেলা যায় না?

তারাও এককথায় অবাক হন— সাচ্ বাত!

রাতের অন্ধকারে যেন ঘনবনের মধ্য দিয়ে গাড়িটা চলছে। রঞ্জন বলে— শহর না বনরে এটা?

সামনে সুন্দর ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস। শহরের শুরু এখান থেকে । রাস্তার দু-দিকে ঘন সেগুনের আবাদ, গুলমোর অমলতাস ফুলের মিষ্টি গন্ধে রাতের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

অনিলবাবু আমাদের জন্য খাবার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। লাগোয়া বাথরুম,খাট, মশারি, বিছানা মায় র‍্যাগ অবধি দেবার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

সব দেখে শুনে রূপ সিং বলে— আরামসে রহিয়ে বাবুজী।

গৌরীও গাড়ি থেকে নেমেছিল। ও বলে,

— অব বাঙালীবাবুকা ডাল ভাত মিলা, ব্যস। মগর্ মছলি নেই কে! ভাতই পাবেন মাছলি মিলবে না।

রূপ সিং বলে যায় — কাল ভেট হোগা। মোহন হোটেলকা বগল আমার কোঠি। অনিলবাবু ভি পহচন্‌তা হ্যায়। অব চলে' নমস্তে বাবুজী।

ভোরের পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে। ক'ঘণ্টার বিশ্রামে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে। বাংলো থেকে বের হয়ে এলাম রাস্তায়। কলকাতায় শীত এখন অনেক কম, কিন্তু এখানে শীত বেশ জমেছে, সে শীত চামড়ায় শিহরন আনে না— চামড়া ফুঁড়ে হাড়ে বেঁধে, কনকনিয়ে ওঠে।

চাদর সোয়েটার লাগিয়ে নির্জন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। দু-চারটে লরি চলছে। রাস্তার দুদিকে ঘন সেগুনের বন। শহর যেন নেই এখানে, মনে হয় কোন ঘন বনের মধ্য দিয়ে, ভোরের পাখি ডাকা পরিবেশে সব হারিয়ে গেছে। কুয়াশা ঝরছে সেগুনের মঞ্জরী থেকে।

বিহারের শেষ সীমান্ত মধ্যপ্রদেশের শুরু। ডালটনগঞ্জ শহরে তাই বোধহয় এত অবণ্যভূমির ছোঁয়া যা বিহারের অন্য কোন শহরে নেই।

এখানের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস ছোটখাটো হলেও সুন্দর। যাত্রীদের থাকার জন্য কয়েকটা ঘর, বাথরুম, বিছানাপত্র সবই আছে। চৌকিদারই রান্নার সব ব্যবস্থা করে দেয়। বেশ ঝকঝকে, তকতকে। বাংলার ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসের নাম শুনলেই মনে হয় এলাহি ব্যাপার। সেখানে হরিজনের ঠাঁই নেই। আর চার্জও তেমনি উঁচুদরের। সেখানে পৌঁছানোর সাধ্য কম লোকেরই আছে। এখানে ব্যবস্থা অন্য রকম। দর সাধারণের নাগালের বাইরে নয়। সিঙ্গল রুম তিন টাকা, তিন সিটের রুম ছ'টাকা মাত্র। খাবার ব্যবস্থার জন্য চৌকিদারকে বলা যেতে পারে, সেই রেটও সামান্য, বাইরেও খাওয়া যায়। ইচ্ছে হলে এখানেও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বেতলা ন্যাশনাল পার্কের জন্যই এখানে কিছু ট্যুরিস্ট আসেন, তাই এদের নিজেদের সুন্দর জিপ আছে, তাতে স্পটলাইট লাগানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। ওতে করে এখান থেকে ফরেস্ট বাংলোয় যাওয়া যায়।

অনিলবাবু সকালেই এসেছেন। শহরে কিছু কেনাকাটা সেরে ডি-এফ-ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করে জঙ্গলে চলে যাবো ওদের জিপ ভাড়া করে।

রঞ্জন বলে— কোথায় যাচ্ছিলাম, কোথায় এলাম?

উত্তর কলকাতার জিনিস এই রঞ্জনকুমার। গোলগাল চেহারা—রীতিমত হিসেবী আর ততোধিক আয়েসী। এখনও কালকের ধকল সামলে উঠতে পারেনি বোধহয়।

সকালেই উঠে বার তিনেক গালে রেজার ঘসে মাথায় কে হোড়ের ভৃঙ্গল উইথ ওয়াটার দিয়ে প্রাথমিক তেলকালাম পর্ব সেরে চায়ের কাপটি নিয়ে বসেছে। অনিলবাবু ডালটনগঞ্জের ইতিহাস নিয়ে কথা বলছেন। ডালটনগঞ্জকে কেন্দ্র করে গারোয়া রোড হয়ে রেণুকূট রিহান্ড ড্যাম, চৌপান-এর প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগ ওই সাহিত্য পত্রপত্রিকার মারফত। এখানের অরণ্যকে ও চেনেন।

নানা কথা বলেছেন অনিলবাবু সেই সম্বন্ধে।

রঞ্জন চায়ের কাপটিকে আগলে রেখে ঠাণ্ডা করে তবে সিপ্ করবে, হাতে জলন্ত সিগারেট। রঞ্জন বলে ওঠে,

—মাছটাছ মেলে মশাই এখানে?

অনিলবাবু জানাল— কম। সবসময় মেলেও না।

রঞ্জন বলে — দিব্যি যাচ্ছিলাম গোপালপুর অন সি, কোরাপুট দণ্ডকারণ্য, চিল্কায়, ওদিকে মশাই লবস্টার পমফ্রেট— পারসে— সব মেলে।

দণ্ডকারণ্য যাবার ব্যবস্থাই করেছিলাম। পালামৌ ন্যাশনাল পার্ক-এর নাম শোনা ছিল আগেই— হঠাৎ ডেপুটি কনজারভেটার অব ফরেস্ট শ্রী ডি.এন. সিনহা মশায়কে রাঁচিতে চিঠি দিলাম, উনিও পত্রপাঠ সাদর আমন্ত্রণ জানালেন পালামৌ-এর অরণ্যভূমিতে। চিঠি গেল ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসারের দপ্তর থেকে।

মধ্যপ্রদেশের লাগোয়া জঙ্গলের রূপ স্বতন্ত্র। তাই দেখতে একে চেয়েছিলাম।

এর আগে বিহারের সারান্দা—কোলহান—টেবো—বোমিয়াবুরুর অরণ্য ঘুরে গেছি। মন টানে সেই মরুভূমির দিকে, আর হয়ত লোকালয় থেকে এখানে এসে পাই অন্য কি সম্পদ, মন ভরে ওঠে। তাই সুযোগ পেলেই পালাই বনের গভীরে।

তাই এবার পা বাড়িয়েছি এখানেই কোয়েলের ধারের অরণ্যে। আমাদের কানাই বাউলের কথা মনে পড়ে। লোকটা জাত বাউল। তাই ঘরবসতে তার মানা। পথে পথে ঘোরে, তাকে দেখেই যেন মনে ওই পথের রং লেগেছে আমার।

গাঁয়ে গেলে কানাই বলে —বেশ আছ গ। পথ ছেড় না। আনন্দ চাও— আনন্দে থাকো।

বন্ধুরা অবশ্য বলে— যাযাবর হলি?

রঞ্জন বলে— বনটন দেখুন মশাই, আমাকে শেষবেশ কাশীতে নিয়ে যেতে হবে। গিন্নীকে বলে এসেছি কড়িয়াল কিনে আনবো। নাহলে মুখ থাকবে না, এদিকে শালীও বায়না ধরেছে কড়িয়াল শাড়ির।

রঞ্জনের লোহার কারবার। হিসেবী মন— তবু হঠাৎ এমনি বেহিসেবী প্রাণীদের দলে কি করে ভেড়ে জানি না, বললেও শুনবে না। আবার বনে এসে মাঝে মাঝে তন্ময় হয়ে যায়। নেশার ঘোর লেগে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

পরক্ষণেই মনের সব বালাই ঝেড়ে বলে—ধ্যাত্তেরি। কি পান দাদা বনবাসে? ভাল্লাগে না মাইরী এখানে।

তবু পিছু ছাড়বে না সে। আর এলে ম্যানেজারি করবে।

চৌকিদারকে খাবারের ফর্দ দিচ্ছে রঞ্জন আজ দুপুরের জন্য।

— ওই লেটটি ফেটটি খাইয়ো না বাবা, মছলি মিলতা হ্যায় তব মছলিকা ঝোল, আউর নেহি তো ডিমকা কারি আউর ভাত।

কেবল সিং মাথা নাড়ে— জী। মিলেগা।

অলোক আগেই তৈরী হয়ে নিয়েছে। শঙ্কর তাড়া দেয়,

—চলুন রঞ্জনবাবু, খাওয়া পরে হবে একটু ঘুরে আসি।

খাওয়াটা আগে নালে ইঞ্জিন চলবে না।

রঞ্জন সব গোছগাছ করে বেব হলো। ফর্দও করেছে কেনাকাটার।

ডালটনগঞ্জ শহরের প্রধান ব্যব জঙ্গলের কাঠ আর বাঁশ। আর সেগুলো আনানেওয়ার ব্যাপারে ট্রাক চাই, তাছারা ট্রেন লাইন থাকলেও যাত্রীর ব্যাপারে রেলকোম্পানী মাথা ঘামায় না, ওটা নন্ রেভিনিউ আর্নিং লাইন, তাই রেলপথের যাত্রীদের জন্য তারা মাথা ঘামায় না।

যাতায়াতের পথ বাস। রাঁচি থেকে একশো চার মাইল হাজারীবাগ থেকে একশো ছ'মাইল, গয়া শহর থেকে ঔরঙ্গাবাদ শহর হয়ে দূরত্ব পড়ে একশো ষোল মাইল, তাছাড়া বাসলাইন আছে নেতারহাট-এর কাছে মহুয়াচাঁড় অবধি, মধ্যপ্রদেশের শহর অম্বিকাপুর অবধি। ফলে বাস ট্রাক-এর সংখ্যা কিছু বেশী এখানে।

স্বাধীনতার পর এসব হয়েছে, আর সেই ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের বেশীটাই এসে দখল করেছে শরণার্থী পাঞ্জাবীর দল। শহরে এখন তারাও সুপ্রতিষ্ঠিত।

হটে গেছে প্রবাসী বাঙালীর দল। এককালে সরকাবী চাকরি, ডাক্তারী- ওকালতিতে তাদের পেশা ছিল। এখন সেই ঠাঁইটুকুও চলে যাচ্চে। নোতুন বাঙালী সমাজ তাই আজ কোণঠাসা। সামান্য ব্যবসা, না হয় টিমটিমে চাকরি নিয়ে টিকে আছে মাত্র।

ওদিকে শহরের ট্রান্সপোর্ট, হোটেল, জঙ্গলের ব্যবসায় পাঞ্জাবীরা স্থানীয় লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। হোটেলের অধিকাংশই এখানে তাদের হাতে, বেশ বাড়িঘরও করেছে। ভালো আছে তারা এখানে এসে।

বাঙালীবা অতীতে এখানে ভালোই ছিল প্রতিষ্ঠা নিয়ে। এখন হটে যাচ্ছে।

এক দোকানদার বলেন— বাঙালী কোন দোকানদার একটা পুরানো ব্লেড বিক্রি কবলে স্থানীয় লোকে দল বেঁধে এসে শাসাবে। আব কোন পাঞ্জাবী দোকানদার যদি শুধু ব্লেডের কাগজটা বিক্রি করে, ওরা ভয়ে ওদেব কিছু বলে না।

কাল রাত্রে স্টেশনের বিকশা দখল করার কথাটা মনে পড়ে আমরাও। নায্য কারণে বাধা দিতে দ্বিধা কবি।

অবশ্য দোষ ত্রুটি আমাদেরও আছে। রঞ্জনকে দিয়েই তার প্রমাণ পাই।

ওপাশে নদীর পাড়ে বাঙালীদের দুর্গাবাড়ি। ডালটনগঞ্জ যাবার আগে তাদের চিঠি দিয়েছিলাম রিপ্লাই কার্ড, যদি একরাত্রি থাকার ব্যবস্থা করতে পাবেন। শুনেছি থাকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তাঁদের জবাব পাইনি।

শুনলাম দুর্গাবাড়ির আর কোন বিশেষ কৃত্য নেই ওই দুর্গাপুজো করা ছাড়া। গেস্টহাউসও প্রায় বন্ধ থাকে।

রঞ্জন দোকানে মিষ্টি কিনতে গেছে। ভালো প্যাঁড়া মেলে এখানে। মিষ্টি বলতে প্যাঁড়া আর কালাকাঁদ।

কলকাতার কিছু বনেদী বাবুদের দেখেছি বাইরে গিয়ে কথাবার্তা বলার সময় মেজাজ কেমন চড়ে যায়, কণ্ঠস্বরও বদলে যায়, হাবভাবও। কেমন রহিস ভাব এসে যায়।

রঞ্জন সাহেব আঙুল বের করে বেশ চড়া গলায় হুকুম করে ছোকবা দোকানদারকে,

—এ্যাই দু' কিলো প্যাঁড়া দেও তো ?

দোকানদার একবার ওর দিকে চেয়ে নির্বিকাব চিত্তে অন্য খদ্দের সামলাতে থাকে। ফলে রঞ্জনের ডাবল চিন্‌ওয়ালা মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, সে গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে হুকুম করে তাকে,

—শুনতা নেই? দেও না? অ্যাই।

দোকানদার ছোকরা বেশ রহিস আদমী,গলায় সরু মফচেন—গায়ে টেরিলিনের জামা— মিলের ধুতি। সে ওকে এইভাবে কথা বলতে দেখে বলে,

— আপ্ বলিয়ে, তুম্ নেহী জী!

ততক্ষণে আমরাও গিয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা সামলে নিই।

জিনিসপত্র নিয়ে রিকশায় চেপে জানাই রঞ্জনকে,

—দিন বদলেছে রঞ্জন। এখানে কলকাতার ড্যাঞ্চি বাবুদের মেজাজ আর দেখিও না। ওদের সম্মানজ্ঞান আছে—সেটাকে অগ্রাহ্য করার কোন অধিকার তোমার নেই। ভালোভাবে কথা বলো ওদের সঙ্গে।

রঞ্জন মুখ বোদা করে থাকে। তার মিথ্যা কলকাতাইয়া সম্মানজ্ঞানে বোধহয় লেগেছে কথাটা।

পথে লোক চলাচল বেড়েছে। বাস স্ট্যান্ড-এ বাস যাত্রীদের ভিড় জমেছে। আশেপাশে ঘন ছায়াকীর্ণ বাগান, আর দুচারটে সাজানো বাড়ি বেশ বড় এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

পুরোনো আমলের ইংরেজদের কিছুটা পরিচয় এখনও রয়ে গেছে এখানে। রেস্ট হাউসে ফিরে গোছগাছ সেরে ফরেস্ট অফিসে আসতে হবে। তাই দুপুরে খাবার পর্বটা সারতে হবে ওখানে গিয়েই।

বন বিভাগে কাজ করলেই তাকে অরণ্যের সংস্পর্শে আসতে হবে। আর অরণ্যের ছোঁয়ায় মানুষের মনের মূল চেতনাগুলোয় কোথায় অন্য সুর বাজে। তাই এ মানুষগুলোর জগৎ আলাদা, তাদের চিন্তা ধারণাও স্বতন্ত্র। ওদের মনেও অরণ্যের প্রশান্তি কিছুটা এসে যায়। ডালটনগঞ্জ সাউথ-এর ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার মিঃ মিশ্রকে দেখলে সেই ধারণাই হবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে চিঠিতেই আলাপ। আজ চাক্ষুষ পরিচয় হয়ে ভালো লাগল।

তাঁর ঘরে ঢুকে পরিচয় দিতে তিনি সাদর সম্ভাষণ জানালেন বাংলায়— ভালো আছেন? আপনাকে এখানে দেখে খুব খুশী হয়েছি। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো! বলুন।

মৈথিলী ব্রাহ্মণ, আদি বাস দ্বারবঙ্গে। প্রাণ উচ্ছল মাঝবয়সী তরুণ, তার অরণ্য এলাকা সম্বন্ধে তিনি গর্বিত, উচ্ছল। এমনকি তাঁর বনের কর্মচারীদের সম্বন্ধেও খুব ভালো ধারণা।

তিনি বলেন—

এখানে কোনও অসুবিধে হবে না। জঙ্গলে ঘোরা অভ্যাস আছে আপনার, সারান্দা যদি ভালো লাগে বেতলাও ভালো লাগবে। ইউ উইল লাইক্ পালামৌ ফরেস্ট।

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়ে। প্রথম এক শীত শেষের অপরাহ্ণে তার চাল্‌কে গোপালপুরের বাড়িতে গেছি।

খুশীতে উচ্ছল হয়ে বলেন,

—চল, বৈকালের আলোয় তোমাকে ইছামতীর ঘাট, কুঠিবাড়ির মাঠ—নীলকণ্ঠ পাখির বাসা— বাঁওড়-এর ধারগুলো ঘুরিয়ে আনি।

ওই প্রাকৃতিক পরিবেশই তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে বেশী আনন্দসম্পদ, তাই সকলকেই দেখাতে চান সেগুলো ডেকে ডেকে।

মিঃ মিশ্রও তাঁর অরণ্য সম্বন্ধে এমনি উৎসাহী।

মিঃ মিশ্র বলেন— দে আর বিউটিফুল— অ্যান্ড দি ওয়াইল্ড লাইফ - এ সিরিনিটি দ্যার।

ভাঙা বাংলায় বলেন—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিহারে অরণ্য নিয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তার আরণ্যক, সারান্দা-কোলহাণ অরণ্য নিয়ে কিছু লেখা আমি পড়েছি। আর কি জানেন? পালামৌ ন্যাশনাল পার্ক যাঁরা দেখতে আসেন তাঁদের প্রায় নব্বুই ভাগই বাঙালী। ওদের অনেকেই এই অরণ্যকেও ভালোবাসেন।

মিঃ মিশ্র নিজেও আরণ্যক প্রাণীদের সম্বন্ধে আগ্রহী, নিজে হাতির উপর গবেষণা করেছেন। তাই বলেন,

—বেতলায় হাতিও পাবেন প্রচুর, দেখবেন বুনো হাতি তবু তারা কতো শান্ত। দুরন্তপনা কিছু আছে কিন্তু ফেটাল নয়।

কাগজে পড়েছিলাম হাজারিবাগে পাগলা হাতির উপদ্রবের কথা। গ্রামের পর গ্রাম তারা ধ্বংস করেছে, মানুষ মেরেছে। ওই এলাকায় সন্ত্রাসের রাজ্য গড়ে তুলেছিল তারা। অনেক ক্ষয়-ক্ষতি করেছে ।

তাই বলি—

তবে হাজারিবাগের হাতিগুলো ওসব করে কেন? বাড়িঘর গ্রাম তছনছ করেছে। রাস্তায় বাস আক্রমণ করেছে— মানুষ মেরেছে অনেক।

কিছুদিন আগেই খবরের কাগজে এই খবর নিয়ে হৈ চৈ হয়েছিল। একদল হাতি বন ছেড়ে কি রাগে অন্ধ হয়ে বের হয়ে এসে বসতি, ওই এলাকার পথে-ঘাটে এমনি সর্বনাশা উপদ্রব করেছিল, শেষ অবধি তাদের ঘিরে মারতে হয় নিষ্ঠুরভাবে। তবে আবার ওই এলাকায় শান্তি ফিরে আসে।

সেই প্রশ্নটাই করেছি ওকে।

মিঃ মিশ্র আবার কথাগুলো শুনে চুপ করে কি ভাবছেন। ওর মুখ চোখ কেমন টলটলে হয়ে আসে বেদনায়। উনি বলেন,

—দ্যাটস্ এ হিস্ট্রি। স্যাড চ্যাপ্টার অব হিস্ট্রি। আপনারা বাকী খবরটা শোনেননি। শেষে কমিশনার বসানো হল, কি করা হবে ওই হাতিগুলোর জন্য। বাট ইট ওয়াজ টু লেট। আর ছ'মাস আগে হলে ওদের বাগ মানানো যেতো। অন্য কোন জঙ্গলে, ধরুন আমাদের ভিতরের জঙ্গলে পুনর্বাসন করানো যেতো কিন্তু আর সময় নেই। মানুষের সভ্যতা— তার লোভ ওদের তখন উন্মাদ করে দিয়েছে। ফলে এক পাল অর্থাৎ ওই দলে ছোটবড় মিলিয়ে তেরটা হাতি, সব কটাকেই মেরে ফেলতে হয়েছে। দে হ্যাভ বিন্ কিলড্। উপায় ছিল না।

হাতির প্রসঙ্গে তিনি অনেক কথায় শোনালেন। তার নিজের অভিজ্ঞতা আর অধীত বিদ্যা থেকে এই রিপোর্ট তিনি কনিশনকেই দিয়েছিলেন। এই অঞ্চলের হাতিদের চরিত্রও তিনি দেখেছেন।

হাতির পাল গভীর সরান্দা, না হয় বড়সড় - লাত্ মধ্যপ্রদেশের সীমান্তের গহন অরণ্য থেকে বর্ষার সময় অপেক্ষাকৃত কম জঙ্গলের দিকে বের হয়ে আসে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে। তখন বাইরের দিককার বনেও গাছপাতা থাকে, ঘাস থাকে, জল থাকে। তারা ক'টা মাস এদিকে কাটিয়ে আবার বসন্তের আগেই পাতাঝরার দিনে তাদের আদি বাসভূমি সেই গহন অরণ্যে ফিরে যায় ক'মাসের জন্য। বেতলা ফরেস্টেও ওরা নিয়মিত অতিথি! তাই এ সময় তাদের দেখা মেলে। ক-মাস ওরা এখানে থেকে আবার ফিরে চলে যায় গহন অরণ্যে।

এমনি একটা হাতির দল এসে পড়েছিল সুবর্ণরেখার ধারের বনভূমিতে। সেই সময় সুবর্ণরেখার ড্যামের কাজ শুরু হয়ে যায়, সে খবর তারা জানত না। প্রতিবারের মত হাতিগুলো এসেছে সেবারও।

পাথরও ফাটছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে, আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। রাস্তা তৈরী হচ্ছে বনপর্বতের মধ্যে, ট্রাক—জীপ —বুলডোজার চলছে।...সারা স্তব্ধ বন কেঁপে ওঠে প্রচণ্ড নির্ঘোষে। হাতিও হকচকিয়ে যায় ভয়ে। এখানে তারা বিপদের মধ্যে এসে পড়েছে।

অতিথি হাতির দল শিউরে ওঠে, তাদের মূল অরণ্যে ফিরে যাবার পথও বন্ধ, এদিকে মানুষের যন্ত্র - সভ্যতার লোভী হাত এখানে তাদের আশ্রয় অরণ্যকে তছনছ করে দিচ্ছে। ভীত ত্রস্ত হাতির দল ওই এলকা ছেড়ে পালাচ্ছে, হাজারিবাগের জঙ্গল তেমন ঘন নয়, বড়ও নয়। ফলে পাহাড় ডিঙিয়েপালাতে গিয়ে ওরা গ্রামবসত-ক্ষেতের মধ্যে এসে পড়ল। আর কোন দিকে বের হবার পথ নেই। ঘন বন নেই।

সেখানেও বাধা দিল মানুষের দল।

আর পিছনের পথ নেই— অরণ্যের আশ্রয় নেই— ফেরার সময় পথ আটকে দিয়েছে যান্ত্রিক সভ্যতা আর মানুষ, দলের হাতিগুলোর প্রধান কয়েকজন বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে, তাদের মূল অরণ্যে ফেরার পথ বন্ধ। হাজারিবাগের এই পাতলা জঙ্গলও তাদের আশ্রয় দিতে পারলো না। মানুষ্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ওদের সেখান থেকে তাড়াবাড় চেষ্টা করে।

ওই চারপেয়ে জন্তুর দল ক্ষেপে উঠল দুপেয়ে জীবদের উপর। তাদের তাই সব বদ্ধি হারিয়ে গেল. শুধুমাত্র বাঁচার দুর্বার চেষ্টায় তারা গ্রাম-জনপদ ধ্বংস শুরু করলো।

—মিঃ মিশ্র বল্লেন—

— দে হ্যাড টু বি কিলড্। কিছু আগেও সময় পেলে হয়ত বাঁচানো যেতো তাদের। তা হল না। বেলা হয়ে গেছে। জঙ্গলের ট্যুরিস্ট কটেজ আমাদের বুক করাই ছিল, তাই ওসব পর্ব সেরে ট্যুরিস্ট লজে ফিরে এলাম। রঞ্জন অবশ্যি আগেই ফিরে স্নান-টান সেরে নিয়েছিল। ওর স্নো পাউডার মাখাও হয়ে গিয়েছে।

আমাদের দেখে ও বলে—

এত কি কথা মশাই? টাকা দেবেন কটেজ বুক করে আসবেন, তা নয় দুনিয়ার বাঘ হাতির গল্প ফাঁদলেন। চলুন ওদিকে খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে। একটু গড়িয়ে নিয়ে আবার ষোল মাইল পথ ভেঙে জঙ্গলে যেতে হবে। ধ্যাত্তেরি! কখন রেস্ট নেব কে জানে!

অলক বলে — তার চেয়ে বেনারস চলে যান না রঞ্জুদা? ভালো লাগবে। বৌদির কড়িয়াল শাড়িও কেনা হবে।

রঞ্জন ধমকে ওঠে —ডেপোঁ ছেলে কোথাকার! থামো তো! রাঁচি রোড ধরে ধরে কিছু এগোবার পর ডানদিকে বেতলা ন্যাশনাল পার্কের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাহাড়ের মাথা দেখা যায় চারিদিকে, সেগুলো ঘন বনে ঢাকা। সামনেই একটা পাহাড়ী নদী গিয়ে মিশেছে কোয়েলের সঙ্গে, আর সেই সঙ্গমের ধারে ঘন অর্জুন গামার গাছের জঙ্গলে ঘেরা সুন্দর বাংলো দেখা যায়।

ড্রাইভার জানায়— ওহি কেঁচকি বাংলো। ইঁয়াপর সত্যজিৎ বাবু নে সুটিং কিয়া।

গাড়িটা ব্রিজের উপর দিয়ে চলেছে, এ নদী নাম ঔরঙ্গা। বন-পাহাড়ের ঔরঙ্গজেবের নাম নিয়ে আজও এই নদী বয়ে চলেছে, এখান থেকে বেশ কিছু দূরে আছে ঔরঙ্গাবাদ নামে জনপদ।

রঞ্জন হামলে পড়েছে—উধার, উ বাংলোকো পাশ নেহি জায়েগা?

ওখানে যবো না আমরা?

— নহি, উতো উ বাজু রহেগা, হমলোক সিধা চলতে হে, ড্রাইভার বলে। পথ ওদিকে নয়, সোজা। সেটা জেনে রঞ্জনকুমার উদ্বেল হয়ে বলে,

—কেঁচকি বাংলোয় যাবো না? 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সুটিং হয়েছিল, সেই কুয়োটা হ্যায়? আছে কুয়ো, না?

ড্রাইভার মাথা নাড়ে— জী। কুয়ো তো আছে ভি।

শঙ্কর ধমক দেয়— কেন কুয়োতে কি ডুবে মরবে?

রঞ্জন বলে — না মাইরী। ওখানে দুটো ছবি নিতাম। একদিন আসতে হবে মাইরী। এমন ভালো জায়গা ছেড়ে কোথায় যাচ্ছি না বেতলা— ধ্যাত্তেরি! বেশ এনজয় করা য়েত এখানে। রঞ্জন হঠাৎ সিনেমার স্বপ্ন দেখছে তার লোহার কারবার ছেড়ে।

কেঁচকির আশপাশে কিছু জঙ্গল আছে। তাও নানা গাছের জঙ্গল, খয়ের— কেঁদ— বিজা— করম— অর্জুন এই সব গাছই বেশী, একটা জঙ্গলে 'পকেট' মত।

অসল জঙ্গল একটু দূরে। এটাকে ছিট জঙ্গলই বলা যায়। তাই এখানের বন পার হয়ে কিছু উঁচু-নীচু টিলা, গ্রামবসতও চোখে পড়ে। ক্ষেতে রয়েছে সরষে বজরার ফসল। সামনে মাথা তুলেছে বনঢাকা পাহাড় শ্রেণী, ড্রাইভার জানায় — এসে গেছি বেতলার কাছে।

সামনে দিগন্ত জোড়া পাহাড় বনের রাজ্য, এঁকেবেঁকে পথটা সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে। রাস্তার ধারে ছড়ানো কেঁদ মহুয়া পলাশের ছায়া। দিনের পড়ন্ত রোদে হলুদ বৈকালে আমাদের গাড়ি এল বেলতার অরণ্য নিবাসে বেশ কিছুটা পথ পার হয়ে।

পাহাড়ের এদিকে ওদিকে ছোটখাটো টিলা, একটার মাথায় সুন্দর সাজানো বাগান— সেখানে ক্যান্টিন ট্যুরিস্ট লজ কবা হয়েছে। সেগুলো ফেলে রেখে ঢালু রাস্তাটা বাঁয়ে চলে গেছে অন্য একটা টিলার দিকে।

সেখানে ফরেস্ট রেস্ট হাউস, ওদিকে কনফারেন্স রুম, একপাশে জনতা নিবাস— তারও পরে একসারি সেগুনের ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ট্যুরিস্ট কটেজ।

আপাতত আমাদের আস্তানা গড়তে হবে ওখানে। পিছনে ফরেস্টের কর্মচারীদের দু'একটা কোয়ার্টার তার পরই পাহাড়ের ঢালুতে সেগুন বন— ওদিকে সামান্য ধানক্ষেতের সীমানা। সোনা হলুদ রং ধরেছে তাতে— ওর সীমাপারেই জঙ্গলের শুরু। আর জঙ্গল খুব কাছেই।

শান্ত নির্জন পাখি ডাকা বৈকাল, কোন শব্দ কলরব নেই।

শঙ্কর দেখেশুনে বলে — সুন্দর জায়গা। তবে শহরের গন্ধ লাগানো। সারান্দার থলকোবাদ, ছোট নাগরার বাংলোর মত নিরিবিলি নয়।

রঞ্জন বলে ওঠে —

ওই তোমার দোষ, কেন কলেব জল, বিজলী আছে তাতে কি জাত গেল, তালে বনেই গিয়ে টং বেঁধে পড়ে থাকো গে, ল্যাজ গজিযে যাবে। এখানে গোছগাছ করে চলো দিকি ক্যানটিনে চা ফা খেয়ে রাতের খাবার কথা বলে দিতে হবে। কাব্যি টাব্যি পরে কোরো।

রঞ্জন খুব বৈষয়িক ব্যক্তি, এগুলো সে ভালো বোঝে।

অলক এর মধ্যেই ঘরে মালপত্র তুলিয়ে নিয়েছে চৌকিদাবকে দিয়ে।

পাশাপাশি দুটো ঘর— এটাচড্ বাথ। পাইপ ওয়াটার বাথরুমে— বেসিন— বিজলী সবই আছে। গহন বনেব মধ্যেও বিলাসিতার কোন অভাব নেই। খাটে বিছানা মায় গায়েব কম্বল অবধি ওদের রয়েছে। নিজের গায়ের র‍্যাগ, নিজেদের মালপত্র খুলে গুছিয়ে নিলাম। এবার বেশ ভদ্রস্থ হয়ে উঠেছি বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুযে।

ততক্ষণে গেম ওযাডেন মিঃ রায় এসে গেছেন। রিজার্ভেশান-এর চিঠি, তার সঙ্গে ডি-এফ - ও সাহেবেব একটা চিঠি দিতে মিঃ রায বলেন ভাঙা বাংলাতে,

— কোন অসুবিধে হবে না। ইউ আব ওয়েলকাম টু বেতলা।

দীর্ঘ পেটা চেহারা, বযস বেশী নয, ওর চোখেব দৃষ্টি কেমন ঝক-ঝকে। উনি জানান,

—গেম ওযার্ডেন এখন নেই, আমিই অ্যাসিস্ট্যেন্ট গেম ওয়ার্ডেন। আপনাব কথা ডালটনগঞ্জেও শুনেছি। আপনারা এসেছেন খুব খুশী হযেছি।

পালামৌ জেলার বনসম্পদ এবং অবণ্য অঞ্চল খুবই সমৃদ্ধ। তার এলাকা প্রায় দু'হাজার বর্গমাইলেরও বেশী, আর বন এখানে খুবই গভীর। অরণ্য সম্পদও প্রচুব। জ্বালানী কাঠ, কাগজ উৎপন্নের প্রধান উপকরণ বাঁশ। সেটা এখানে প্রচুর হয়।

তাছাড়া আছে সেগুন-ধ, আসান - পিয়াশাল-এর জঙ্গল। আর বিশাল গুঁড়িওয়ালা শালগাছের আছে যথেষ্ট, তবে সেই জঙ্গল বেশ ভিতরে।

আব কিছু অঞ্চল এখন দুগর্ম, সেখানকার বনপাহাড় বনাসম্পদে আরও সমৃদ্ধ। বন্যপ্রাণীও সেখানে বেশী থাকে।

সেই অরণ্যভূমির কিছুটা অংশ নিয়ে গডে উঠেছে এই ন্যাশনাল পার্ক, এর আয়তন প্রায় একশো বর্গমাইলেব মত। ওই লাগোয়া জঙ্গল চলে গেছে মধ্য ভারতের দিকে তাই বন্যপ্রাণীদের চলাচলের কোন বাধা নেই। হাতির দল ওই বনপথেই এখানের অরণ্যে আসে আবার পাকাবার সময় ফিরে যায় গভীরতব বনের মধ্যে। আবার আসে বর্ষার কালো মেঘে ঢাকা বনরাজ্যে। তখন বেতলায় বর্ষা নামে। তার কারণও স্পষ্ট। মিঃ রায় বলেন,

—এখানের জঙ্গলের প্রধান গাছ হচ্ছে কেঁদ— অর্জুন —বিজা— করম— ধং, বেল, শিমুল, আসান, খয়ের এইসব, আর হয় বাঁশ। বেতলার বাঁশবন দুর্ভেদ্য, সেখানে দিনের আলো ঢোকে না। তা-ছাড়া আছে সেগুন গাছ। আরও উঁচু পাহাড়ের দিকে। বড়সাঙ্গা—লাত্ অঞ্চলে তাব রাজ্য। শাল গাছের পাতা যত

তাড়াতাড়ি ঝড়ে — আসেও তত তাড়াতাড়ি। আর সেগুন গাছের পাতা ঝরে নোতুন পাতা আসতে সময় নেয় দু'মাসেরও বেশী। বাঁশবনের পাতা ঝড়ে যায়। জলের সঞ্চয়ও কম হয়ে যায় গ্রীষ্মকালে। ঝোরাগুলো শুকিয়ে যাবার ফলে। ফলে হল, বনের আশ্রয় আর আহার্য কমে যায়।

তাই হাতির দল তখন লাত্‌ — বড়সাঙ্গার গভীর অরণ্যে অঞ্চলে ফিরে যায়। সেখনে শাল, সেগুন, বাঁশবন আরও গভীর, দুর্গম। আর কোয়েলের বুকে মাঝে মাঝে গভীর রাতে প্রচুর জল থাকে। হাতির স্নান খুবই প্রিয়। তাই তখন ওখানেই ফিরে যায় ওরা এই বন ছেড়ে।

অবগাহন স্নান সেরে জলকেলী করে জল থেকে ওঠে কালো পাথরেব ছোটখাটো স্তূপের মত হাতিগুলো বনের ভিতরের নরম লাল মাটি শুঁড়ে করে নিয়ে সর্বাঙ্গে মাখে।

অলক বলে — পাউডার মাখে বোধহয়।

মিঃ রায় বলে—পাউডারও তৈরী হয় প্রধানত চক থেকে সেটাও মাটিরই রূপান্তর। সুতরাং ওরা যদি মাটি মাখে দোষেব কি বলুন?

মিঃ রায়ের বাড়ি বিহারের ডিহ্‌রীর কাছে কোন গ্রামে। রায় ওদের পদবী। উনি বলেন,

—ইসি লিয়ে বহুত ভিজিটার হাম্‌কো বাঙ্গালী সমঝ কব বাংলামে বাত করেন, তা আমি ঠিক বাংলা বলতে পারি না, থোড়া থোড়া পারি, তবে বুঝতে পারি ঠিক।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্যানটিনের ব্যবস্থা আছে। সুন্দর ঝকঝকে তকতকে হল, সান মাইকার টেবিল, খাবার - দাবারও সুন্দর। কফি ষাট পয়সা কাপ, কিন্তু একেবারে খাঁটি দুধের তৈরী।

পাহাড়ের উপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয় ক্যানটিনে। ওটা একটা ছোট পাহাড়ের মাথার উপর। ওরই আশপাশে রয়েছে বিলাস-বহুল ট্যুরিস্ট লজ, যে-কোন ভালো হোটেলের মতই সাজানো ঘর, জানলা থেকে বন্যপ্রাণীও কিছু দেখা যায়। কারণ পাহাড়ের নীচেই গভীর জঙ্গল আর একটা বড় ঝর্নায় জলও থাকে। জন্তুরা ওখানে আসে।

ক্যানটিনের ট্যুবিস্টদের গাড়ি পার্কিং -এব জায়গা। একপাশে নোতুন তৈরী লেকচার হল। সুন্দর মোজাইকের মেজে, গ্রিল বসানো জানলা, জঙ্গলে সেগুন কাঠের অভাব নেই, তাই দেওয়ালে ঝকঝকে উড প্যানেলিং করা। পাহাড়টাকে সুন্দব করে সাজানো।

মিঃ রায় বলেন— এর ছাদ থেকেই মহুয়া ফুলের সময় দেখা যাবে কাতাবে কাতাবে হবিণ। আব হাতিও আসে এখানে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মিঃ রায় বলেন,

— টর্চ এনেছে তো? অব্‌ হম্‌ চলছে। ফরেস্ট নাকাকা বগল রহেগা। আপ্‌ খানা্‌ খাকে আইয়ে। কোই গোলমাল শুনিয়ে তো থোড়া রুক যানা, তব্‌ হুঁশিয়ার সে আইয়ে উধার।

জানোয়ারগুলো মাঝে মাঝে এদিকে আসে তাই ফেরার সময় গোলমাল কিছু শুনলে যেন সাবধানে দেখেশুনে যাই এই কথাই জানিয়ে গেলেন।

অলোক বলে — ব্যাপার কি দাদা?

রঞ্জন গজগজ করে—

ঘোড়ার ডিম। কি জায়গারে বাবা? শীতের চোটে প্রাণ যায়। খেতে আসতে হবে পনেবো মিনিট পাহাড় পর্বত উঠে নেমে? খুব জায়গাতে এসেছি যাহোক, কি করতে যে বনে পাহাড়ে ঘুরিস তোরা জানি না।

শঙ্কর এর আগে আমার সঙ্গে অন্যান্য বনে গেছে। ফরেস্ট বাংলোয় চৌকিদার খাবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এখানে ফরেস্ট রেস্ট হাউস — জনতা লজ বা কটেজে কোথাও রান্নার ব্যবস্থা নেই।

শঙ্কর বলে— ক্যানটিনে চা কফি — লাঞ্চ রাতের খাওয়া নিয়ে প্রায় দশ টাকা পড়বে যে রে?

রঞ্জন হিসেবী ব্যক্তি, তাই বলে—

তবে? এ শ্রা সাহেবদেরই মানায়। এভাবে চল্লে তো ফতুর হয়ে যাবো।

তার হিসেবী মন এবার সজাগ হয়েছে।

অলক জানায়—রাস্তার ধারে একটা দোকানে দেখলাম, ওরাও খাবার ব্যবস্থা রাখে, ওখানে কথা বলবো?

রঞ্জনের আত্মসম্মানে লাগে। তাই বলে,

— শেষ কালে দ্যাট ঝুপড়ি বিজনেস্?

ক্যানট্যিনে বেশ ভিড়ই রয়েছে। নীচে কাব পার্কিং-এ একটা বড় বাস রিজার্ভ করে কোন ট্যুরিস্ট পার্টি এসেছেন কলকাতা থেকে, তাঁদেরও ঠাঁই দেবার মত অব্যস্থা নেই। সব লজ কামরা বুক করা হয়ে গেছে। এখানে কতগুলো লোকজনের থাকার আব কোন আশ্রয় নেই। ওরা হঠাৎ এসে বিপদে পড়েছে।

ওদিকে জনতা লজের কিছু ভদ্রমহিলা, ভদ্রলোককে দেখছি ক্যানটিনে। এই রাতের বেলাতেও গো গো চশমাপরা এক ভদ্রলোক ক্যানটিনে বসে গজগজ করে চলেছে।

— বোগাস! সব হুজুকের ব্যাপাবে কেন আসে এরা? বন দেখতে আসবে তাও এই ভাবে?

ওকেই শুধোলাম — আপনাদের বাস নাকি?

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক জানান — না। আমাদের রিজার্ভেশন রয়েছে বাংলোয়ে।

কথাগুলো বলে ভদ্রলোক আমার দিকে চাইবার প্রয়োজন বোধও করে না। তাচ্ছিল্য ভরে এড়িয়ে গিয়ে সঙ্গের দুই ভদ্রমহিলাব সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

একজন বযস্কা আব একটি মহিলা। তরুণীর মুখে একটু কমনীয়তা ফুটে উঠেছে। ভদ্রলোক বয়স্কা মহিলাকে কি বলেছে। ওবা বোধহয মা-মেয়েই হবে। ভদ্রলোকের বিরক্তিভবা স্বর শোনা যায়,

— বুঝলেন মিসেস কর, এ ভাবে আসা অন্যায়? কি বলো তুমি সীমা? বনে আসবে আগে থেকে থাকাব ব্যবস্থা কবে আসবে। তা নয হুট করে চলে এলো।

ওপাশেব চেয়ারে মেয়েটি বসেছিল। প্রশ্নটা তাব উদ্দেশ্যেই। ওরই নাম বোধ হয় সীমা। শান্ত নম্র চেহাবা, ফর্সা পুতুলেব মত মুখ।

গোলগাল মেয়েটি কি জবাব দিল বুঝতে পাবলাম না, ভদ্রলোক ক্যানটিন বযকে হুকুম করে— জলদি খানা লাও। ইউ বয। কুইক।

ওদিকের লম্বা টেবিলে কযেকজন বিদেশী ভদ্রলোক মহিলা খাচ্ছিলেন, তারাও ভদ্রলোকের ওই মেজাজী হুকুমের শব্দে একটু হকচকিয়ে গেছে।

দেখলাম মেয়েটি চাপাস্বরে চমশাপরা ভদ্রলোককে ধমকাচ্ছে, কি করছেন! আঃ!

ভদ্রলোক মেয়েটির কথায় চাইল। একটু হকচকিয়ে গেছে সে! বিড়বিড় কবে। মেয়েটি বলে,

— কি হচ্ছে সহায়বাবু, এত তাডা কেন?

ভদ্রলোক বিড়বড় করে—

অনেক বন রিজার্ভফবেস্ট ঘুবেছি। সাবা ভারতে এখানে ওখানে। এখানকার নাম শুনেই এলাম, দেখছি নাথিং। অর কস্ট্‌লিও। এব চেয়ে েতাবহাট ভালো ছিলো। দুচারদিন শান্তিতে থাকা যেত সেখানে।

এর মধ্যে খাবার এসে গেছে। ভদ্রলোক হামলে পড়েছে প্লেটের উপর। কাঁটা চামচ ছেড়ে বেশ হাত লাগিয়েই মুবগীর ঠ্যাং চুষছে।

অলক বলে— চলুন দাদা, বাইবে ঘোরা যাক। ভিড় কমলে আসা যাবে। এই তো সন্ধে। এত তাড়া কিসের।

রঞ্জন তখন হিসেব কষছে। এর মধ্যে দু-একবাব ওই মেয়েটির দিকে ও চেয়ে তাকে নিয়ে ভাবনা শুরু করে। সে অলকের ডাকে বের হয়ে এল।

বিস্তৃত বন এলাকায় নানা দিকে ছড়ানো আছে বিভিন্ন ফরেস্ট বাংলো। সেগুলো দূরে দূরে আর নির্জনে। ট্যুরিস্টদেব ভিড় সেখানে নেই।

কেচ্‌কি— ছিপদাহ, কের, মাডু, বড়ষাঁড়, আকাশী, লাত্‌, মারোমাড় এগুলো এই বিস্তৃর্ণ বনাঞ্চলে ফরেস্ট বাংলো। এদের আরও বাংলো রয়েছে দূর নির্জনে। সেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই তেমন। আর গভীরতর বনের মধ্যে বলে সেখানে অনেকেই যান না। অনেক বাংলোয় আশপাশে হাতির দল ঘুরে বেড়ায়, বাঘেরও আনাগোনা আছে। তাই সেই গভীর দুর্গম বনে বড় একটা কেউ যেতে চায় না।

এর মধ্যে নীচে নেমে এসেছি। সেই ট্যুরিস্ট বাসযাত্রীদের অনেকেই কলরব করছে, সঙ্গে মেয়েছেলে বাচ্চাও রয়েছে।

কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছিলেন রাঁচী, হুড্রু, জনা এসব দেখার পর তাই ফাউ হিসাবে পালামৌ ন্যাশানল পার্কের চিড়িয়াখানায় কিছু বাঘ- টাঘ দেখে যেতে চান।

গেম ওয়ার্ডেন মিঃ রায়, বিট অফিসার মিঃ সিং ওদের জানান,—কোন ঠাঁই এখানে নেই। আর ওই বড় বাস নিয়ে পার্কের খুব ভিতরে যাওয়া নিরাপদ নয়, হাতির পালের সামনে ওই গাড়ি ঠিকমত ব্যাক করাও যাবে না, হয়তো মুশকিলে পড়বেন। পার্ক দেখতে হলে সরকারী জীপে যেতে হবে। না হয় ওই গাড়ি নিয়ে সোজা বের হয়ে যান হাইওয়ে ধরে ছ'মাইল দূরে আমাদের 'কের' ফরেস্ট বাংলো আছে সেখানে থাকবেন, অবশ্যি তার কোন গ্যারান্টি দিতে পারছি না। অন্য কারো রিজার্ভেশন না থাকলে সেখানে থাকতে পারেন রাতটা। তবে সাবধানে থাকবেন — রাতে বেরুবেন না। ওদিকে বুনো হাতির উৎপাত আছে। বাংলোতেও যায় তারা। রাতে বেরুবেন না ঘর থেকে।

ড্রাইভারকেও বলেন তারা।

—হুঁশিয়ারে যাবেন, পথে হাতি দেখলে আগেই দাঁড়িয়ে পড়বেন। বাইসনও আসতে পারে। এই বনের রূপ রাতের পর বদলে যায়। বনের জন্তুজানোয়ার সব বের হয় প্রথম রাতেই।

বাসযাত্রী দল হুঙ্কার তোলে,

— ফরেস্ট ঘোরা যাবে না?— বাধা দেন মিঃ রায় —না। যদি আমাদের কথা না মানেন, আপনাদের ডালটনগঞ্জ—রাঁচী যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরতে হবে। আমরা কোন রিস্ক নিতে পারবো না। আপনাদেরও বলবো — অযথা ঝুঁকি নেবেন না। দিস ইজ নট সেফ।

ওরা একটু চুপ করে যায় বিপদের কথা শুনে।

শীতের হাড়কাঁপানো রাত্রি। খাবারও নেই। আশ্রয়ের দরকার এত লোকের।

তাই শেষকালে ওরা 'কের' বাংলোতেই যেতে রাজী হয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

— বুঝলে সীমা, অল গুল। এদের অন্যায় জেদ। এই ফরেস্টের বাবুদের। ওদের ফিরিয়ে দিল।

ওদিকে চাইতে দেখি চশমাপরা ভদ্রলোক মুখে চুরুট ধরিয়ে ব্যাপার দেখে মন্তব্য করে এখানে এসে। ওর কথায় শঙ্কর চাইল।

শঙ্কর একটু কড়াস্বরে বলে ওঠে— ওঁরা অন্যায় কি করেছেন? ভালো কথাই বলেছেন ওঁদের। এখানে তো জায়গা নেই। রাতে থাকবে কোথায় এত লোক?

ভদ্রলোক চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে বলে,

— ওদের হয়ে খুব যে কথা বলছেন স্যার? দেখলাম ওই গেমওয়ার্ডেনও আপনাদের সঙ্গে খুব গল্প করছিলেন, কটেজের দুটো ঘর, হল পুরোপুরি দখল করে জাঁকিয়ে বসেছেন এর মধ্যে, চেনা-জানা বোধহয়? না ম্যানেজ করেছেন? এ্যাঁ!

ভদ্রলোক হাসছে।

শঙ্কর চটে উঠেছে। অলকই জানায়,

—সাত দিনের আগে টি-এম-ও করে টাকা পাঠিয়ে ওটা দশ দিনের জন্য বুক করেছি ডি-এফ-থেকে।

ভদ্রলোক চাইল ওর দিকে। কথাটা ঠিক মানতে চায় না।

কিন্তু একটু থমকে গেল।

শঙ্কর বলে,

—এ বনে বাঘ হাতি সবই আছে, জেনেশুনে ওই ভাবে বনের মধ্যে যেতে না দেওয়াটা কি দোষের হয়েছে? তাছাড়া এখানে সিট নেই তবু অন্য বাংলোতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এঁরা, এদের দোষ কোথায়?

সীমা আমার দিকে চেয়ে থাকে। বয়স্কা মহিলাটি ডাকছেন।— কই, আয় সীমা। যা ঠাণ্ডা পড়েছে বাছা এত রাতে ফাঁকায় থাকিস না।

ওরা যেন আমাদের সংশ্রব এড়াতে চায়।

ভদ্রলোক ঝগড়া তুলে ওই মহিলাকে বলে,

— আমরা একটু ফরেস্টে যাচ্ছি, আপনি বরং লজে চলে যান মাসীমা। চলো সীমা, এদিকটা ঘুরে আসি? কি সুন্দর রাত।

সীমা জানায় আবার জঙ্গলে যাবো কেন?

—হোয়াই নট! প্লিজ সীমা। আমি বরং মাসীমাকে লজে পৌঁছে দিয়ে আসছি। ওয়ান মিনিট! তুমি ক্যানটিনে বসগে। চলুন।

ভদ্রলোক বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে ফরেস্ট কলোনীর ওদিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটি একাই দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় মহুয়াগাছের ছায়া অন্ধকারে আলো জ্বলছে। আমরা ক'জন দাঁড়িয়ে আছি। ক্যানটিনের ভিড় কমেছে, এইবার খেতে যাবার কথা ভাবছি, হঠাৎ সেই মেয়েটিকে এগিয়ে আসতে দেখে চাইলাম, ওর চোখমুখে হালকা হাসির উচ্ছলতা। মেয়েটি আপনাকে বলে কুণ্ঠিত স্বরে

— আপনাকে এখানে দেখবো ভাবিনি। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

ওর দিকে চাইলাম।

সীমা বলে — বনে জঙ্গলে ঘোরেন তা জানি, আপনার লেখারও ভক্ত। সেই থেকেই বনে আসার ইচ্ছেও হয়েছিল। এর জন্য আপনিই দায়ী। এই বনে ঘোরার চেষ্টা করার জন্য।

ওর কথায় একটু অবাক হয়ে জানাই মেয়েটিকে,

— তার জন্য সত্যিই দুঃখিত।

সীমা বলে — দুঃখিত কেন হবেন, সত্যি আমার রাজ্য সম্বন্ধে জানা ছিল না, এসে দেখছি এখানে না এলে একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম। সত্যি খুব ভালো লেগেছে এখানে।

সীমার চোখদুটো খুশীতে চকচকিয়ে ওঠে। আমি দেখছি মেয়েটিকে। নিজের লেখার অচেনা পাঠক আছে সেটা দেখে ভালোই লাগে।

— তাহলে ভুল বলিনি?

হাসছে সীমা। গোলগাল চেহারা, একটু আহ্লাদী পুতুলের মতই। সীমার প্রাথমিক জড়তা কেটে গেছে এই আলাপচারিতে। মেয়েটি বেশ মিশুকে।

সীমা বলে,

— অফিসের ছুটি মেলা ভার, তারপর জানেন তো বনে আসার খরচাপত্ত আছে। সব ঠেলে মন চাইলেও পারি কই? সহায়বাবু তবু বল্লেন- - চলো, রাঁচীতে চেনাজানা কে আছে সেখানেই ওঠা যাবে। সেখান থেকে এখানে এসেছি ক'দিন থাকবো বলে।

আমি শুধোই —ওই ভদ্রলোক খুব ঘোরেন বোধহয়? .. ওই সহায়বাবু?

সীমা আমার দিকে চাইল, কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। আর দেখলাম সহায়বাবুর কথা ওঠায় কি যেন চেপে যেতে চাইছে। ক্ষণিকের সকুণ্ঠ ভাবটাকে মন থেকে দূর করে সীমা বলে ওই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে,

— আপনারা তো দিন দশেক থাকবেন শুনলাম। ক্যানটিনে ওই গেমওয়ার্ডেন ম্যানেজারকে বলছিলেন অপনার কথা, স্বয়ং কনজারভেটার সাহেব, ডি-এফ-ও সাহেব নাকি ওঁদের বলেছেন এ নিয়ে। দেখলাম আপনার সম্বন্ধে ওদেরও খুব শ্রদ্ধা রয়েছে।

সীরার কথায় জানাই— ওঁদের চিঠি দিয়েছিলাম আগেই। তাই হয়ত বলছিলেন। আর সত্যিই ওরা খুবই হেল্পফুল! দেখার মন নিয়ে এলে এরা সাহায্য করেন।

সীমা বলে— সহায়বাবুর কথাবার্তা অমনিই, কটেজ চেয়েও পায়নি বলে ওর যতো রাগ ওই ফরেস্টের উপর, আপনাদের উপরও। কারণ ওটা আপনারা দখল করেছেন।

—এ্যাই যে! কই!

সহায়বাবু ফিরে এসে সীমাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে চোখমুখ কটমট করে চাইল— যেন আমি কি একটা অন্যায় করে ফেলেছি। সহায়বাবু আমার দিকে চেয়ে দেখছে তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি মেলে।

সীমাকে কড়াস্বরে বলে সহায়বাবু।

— চলো । জিপ নিয়েছি ওদের।

হুডখোলা সরকারী জীপে স্পটলাইট নিয়ে গাইড তৈরী, এই বনের রাতেরবেলায়! খাবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা আছে অন্য ন্যাশন্যাল পার্কের মতোই। জলদাপাড়া, দক্ষিণ ভারতে বঙ্গসুর, উত্তর ভারতের জিমকরবেট পার্ক, গিরজাটার মতই সব রকম ব্যবস্থা এখানেও রয়েছে। আর বিহার অরণ্য বিভাগের কর্মীদের কাজও এখানে চোখে পড়ার মত। এরা ভিজিটারস্‌দের অরণ্যে নিয়ে যান জন্তু-জানোয়ারও দেখতে পাওয়া যায় বেশ কিছু। জঙ্গলে ঢুকতে গেলে পাঁচ টাকা এন্‌ট্রি ফি আর দু' টাকা স্পট লাইটের জন্য দিয়ে খাতায় সই সাবুদ করে যেতে হয়, সহায়বাবু ওসব পাট চুকিয়ে সীমাকে ডাকছে।

সীমাও অপ্রস্তুতে পড়েছে সহায়বাবুর ওই রুঢ়তায়। ও বলে—

আবার ওসব করতে গেলেন কেন? বেশ একটু আলাপ সালাপ করছিলাম।

এতেই সহায়বাবুর যত গোঁসা।

সহায়বাবু বলে—ও সব খেজুরে আলাপ পরে করলেও চলবে। চলো— ফাইন বাত একটু ঘুরে আসি।

সীমা এগিয়ে গেল ইতিউতি করে। সহায়বাবু বলে,

— ভিতরে নয়, বাইরে এখানে এসে দাঁড়িয়ে দেখবো, এসো।

নিজেই সীমার হাত ধরে ওকে জীপের পিছনে তুলল।

বলে— ঠাণ্ডা লাগবে যে? উরে বাস্‌।

সহায়বাবু গার্জেনির সুরে জানায়,

—সীমা দ্যাটস্‌ নাথিং! কাম অন্‌! শালটা কসে জড়িয়ে নাও গায়ে মাথায়।

আমাদের দিকে একবার কৃপাদৃষ্টি মেলে দেখে, সে রেডি হয়েছে অভিযানে যাবার জন্য। গাইড বলে ওঠে,

—ওহি চুরুট ফেক্‌ দিজিয়ে সাব্‌। চুরুট নিভিয়ে ফেলুন।

— কাহে? সহায়বাবু কৈফিয়ৎ চাইছে যেন।

গাইড বলে —উস্‌কো স্মেল,গন্‌ধাসে জানোয়ার তফাৎ হো জায়েগা। আর বাতচিৎ মৎ করনা, চুপসে রহিহে।

— হুম্‌! সহায়বাবু চুরুটটা ফেলে দিয়ে বোদা মুখ করে জীপে দাঁড়িয়ে জঙ্গল বনের দিকে চলে গেল।

রঞ্জন বলে ওঠে— ব্যাপারটা কিছু বুঝলে হে?

— এ্যাঁ! ওর দিকে চাইলাম। রঞ্জন এদিকে খুব কড়া করে বলে,

— ইন্টু ইনটু ব্যাপার! শালার মেজাজ ছুটিয়ে দোব না ফের হেঁকড়বাজি করলে? রঞ্জনকে চেনেননি?

অলক বলে— হিংসে হচ্ছে রঞ্জুদা?

রঞ্জন বলে— সাট্‌ আপ্‌! ইয়ার্কি মারিস না।

শঙ্কর বলে— চল, খেয়ে আসি। যে যা করছে করুক না বাবা। তোদের কি? তোদের এত রাগারাগি করার কি হল? বনে এসেছে একটু বন্য ব্যাপার ট্যাপার যদি ঘটে — ঘটুক না! চল।

ক্যানটিনে উঠতে গিয়ে ওদিকে নজর পড়তে থামলাম।

রাত নেমেছে। রাস্তার ধারে জঙ্গলেব এদিকে ওদিকে ঠাঁই ঠাঁই আগুন জ্বলছে। ক্যানটিনের ওদিকে জঙ্গল থেকে একটা জীপের রাস্তা এসে বড় রস্তায় পড়েছে। এখন সেটা কাঁটাওয়ালা গেট দিয়ে আটকানো, দুপাশে গভীর ট্রেঞ্চ মত কাটা । ওগুলো হাতি আসার পথ, তাই বন্ধ করা আছে গর্ত করে।

তারই ওপাশে একটা গাছের গুঁড়ি জ্বলছে, অন্ধকারে লালাভ আলোয় আর গনগনে আংরাব লালাভ পরিবেশে কয়েকজন লোককে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম।

— প্রণাম! ওদের কে একজন প্রণাম জানালো।

বোধহয় পথচারী আগুন পোয়াচ্ছে। তাই শুধালাম—

কাহাঁ যানা জী? এতরাতে কোথায় যাবে এখানে?

লোকগুলো ওই শীতে মাত্র একটা চাদর জড়িয়েছে, মাথায় পাগড়ীর মত বাঁধা, তারা জানায় — নোকরী করতা হ্যায় সাব!

— নোকরী! একটু অবাক হই ওদের কথায়। আগুন পোয়ানোর চাকরিও আছে এই বনে তা জানা ছিল না।

কে বলে — হাতি কুদানেবালা হম্‌লোগ।

বন থেকে বুনো হাতির দল মাঝে মাঝে এদিকে আসে, তাই বাত পাহারার ব্যবস্থা করা হয় বনবিভাগ থেকে।

বুনোহাতি ন্যাশনাল পার্ক-এর বন থেকে বের হয়ে এসে দল-বেঁধে বসতির ধানক্ষেত, মকাই বাজরা ডালের ক্ষেতে নামে। তাই তাদের মশাল জ্বেলে, ক্র্যাকার ফাটিয়ে, টিন পিটিয়ে তাড়িয়ে দিতে হয় জঙ্গলে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাই স্থানীয় লোককে তিন টাকা রোজ দিযে এই কাজে লাগায এই ক' মাসের জন্য। তারা পাহারা দেয়।

হঠাৎ অন্ধকারে কে একজন দৌড়ে এসে জানায,

— নিকালতা হ্যায, ছটো। উধাব।

হাতি বেরিয়েছে।

ওরাও মশাল জ্বালিয়ে বড় বড় টর্চ-এর আলো ফেলে হাঁক পাড়তে শুরু করে। একজন আমাদের বলে,

— ক্যানটিন কা উপর চলা যাইয়ে সাব। হিঁয়া রহনা ঠিক নেহি হোগা, আপলোগ নয়া অদমী, হাতিকা হাল নেহি জানতে হেঁ?

হাতির উপদ্রব দেখেছি শারান্দা, দক্ষিণ ভাবতে বনের লাগোয়া বসতিতে। তারা দল বেঁধে হানা দেয় তবাই-এর চা বাগান অঞ্চলে- পাহাড়ী পথ নদীর খাত ধরে তারা আসে বসতিতে। সেখানে তাদের আগলাবার এসব ব্যবস্থা বিশেষ নেই।

গ্রামের মানুষ জন চীৎকার করে, কেউ কুলোয় করে ধান চাট্রি নামিয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে মাথা নামিয়ে প্রণাম করে।

— গণেশ ঠাকুর। ধান শেষ করো না ঠাকুর। হাতির পাল বেশ কিছু খেয়ে, বাকী ওই ভারী পায়ের চাপে তছনছ করে আপন খেয়ালে ফিরে যায়।

এখানেও সেই ব্যপারও ঘটে. বসতির মানুষও বের হয়েছে। হাতি কুঁদানে ওয়ালার দলও ছুটেছে মশাল, ক্রাকার নিয়ে। ফরেস্টরের জিপও বের হয়ে এদিকে ওদিকে দৌড়াচ্ছে।

জায়গার রূপ বদলে যায়। শান্ত অরণ্য সীমায় হাতিদের ক্রুদ্ধ চীৎকার, ডালপালা ভাঙার শব্দ কানে আসে।

লোকজন ওই দিকে ছুটল, তখন ওপাশের টোলা থেকে আর্তনাদ উঠেছে। আমরা পাহাড়ের উপরে উঠে দেখছি।

কলরব ওঠে, কারা আবছা আলোয় ছোটাছুটি করছে। চাঁদনী রাত নির্মল নির্ধূম আকাশ— শীতের রাতে দেখা যায় হাতিগুলোকে।

একটা জীপ স্পটলাইট ফেলে আবছা অন্ধকারে উলসে তুলে ছুটছে, দেখা যায় কালো পাথরের স্তূপের

মত কয়েকটা হাতি এগিয়ে এসেছে ওই ক'টা ছাড়ানো ঘরের দিকে, ঘরের দু'জন বোধহয় স্বামী-স্ত্রী হবে ঘর ছেড়ে ব্যাকুল চিৎকার করে এদিকে দৌড়ে আসছে।

— দোঠো বাচ্ছা ছোড়কে আয়া, উসকো জরুর মার দেগা জী— হ্যায় রামজী।

প্রাণভয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে।

জীপটা ঠেলে এগিয়ে চলেছে ওই হাতির পাশ দিয়ে, সামনে বাঁশ কঞ্চির বেড়া দিয়ে কিছু শাকসবজী শিমলতা লাগানো হয়েছিল।

বাড়িটায় হাতিদের চিৎকার শোনা যায়। .

জীপটা বেড়া ঠেলে এগিয়ে গিয়েছে, ছোট্ট দুটো বাচ্চা ভয়ে বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, ওদের জ্ঞানহীন দেহ দুটোকে দাওয়া থেকে তুলে নিয়ে জীপটা ওপাশ দিয়ে বের হয়ে গেল, ক্রাকার ফাটছে দুম-দাম শব্দে, অনেক মশালের আলোর মধ্যে স্পটলাইটের তির্যক আলোয় দেখা যায় বিরক্ত হয়ে হাতিগুলো জঙ্গলের দিকে দৌড়চ্ছে, আর বেকায়দায় গিয়ে দুটো হাতি ওই আট- দশ ফিট গভীর ট্রেঞ্চেই ধপধপ্ করে পড়ে যায়, বাকী ক'টা অন্যপথ দিয়ে জঙ্গলের গভীরের ঢুকে গেল।

— হাতি গির গিয়া! ... এ ভাইয়া ট্রেঞ্চ হাতি পড়েছে।

কয়েকটা মশালের আলো — স্পটলাইটের বৃত্ত গিয়ে পড়েছে ওই ট্রেঞ্চের মধ্যে, সেখানে যেন তুলকালাম কাণ্ড চলছে।

আটকে পড়া হাতিগুলো শুঁড় তুলে চিৎকার করে আর থামের মত পা দিয়ে খাদের ওপাশে উঁচু পাহাড়টাকে ধ্বসাচ্ছে। ওই শক্ত গভীর খাদের মধ্যে হাতিদুটো আটকা পড়ে গিয়ে মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

কাছে যাবার উপায় নেই, শুঁড়গুলো আপসাচ্ছে।

— ফোঁস্— ফোঁও স্! নিশ্বাস ছড়াচ্ছে আর হাঁক পাড়ছে।

বনের ওদিক থেকেও গোটা কয়েক হাতি সেখানে এসে পড়েছে। ওদের সমবেত লাঠির চোটে খাদের ওপাশের মাটি ধ্বসে পড়েছে, বুলডোজার যে ভাবে পাহাড়ী পথ সমতল করে সেইভাবে ট্রেঞ্চের ওদিকটাকে ধ্বসিয়ে চালু পথ করে। হাতিগুলো উঠে মন্থর গতিতে এদিকে জনতার দিকে চেয়ে দুবার হুঙ্কার ছেড়ে বনে ঢুকে গেল।

— দেখা সাহেব ক্যায়সী খেল? খেলা দেখলেন ওদের?

দেখি মিঃ রায় জীপ থেকে নেমে এদিকে এসেছেন আমাদের দেখে।

নিজেই গেছলেন জীপ নিয়ে ওই হাতির পাশ দিয়ে, সঙ্গে রয়েছে ফরেস্টের দুজন গার্ড। বাচ্চা দুটোকে তুলে এনেছেন ওরা ওদের সামনে থেকে।

তারাও সুস্থ হয়ে উঠেছে।

সিংজী বলে—

লুকসান কর দিয়া ট্রেঞ্চকো। মেরমত করনা জরুরী হ্যায়।

কালই ওই ট্রেঞ্চ আবার গভীর করে কাটাতে হবে, নইলে ওখানেই রাজপথ বানিয়ে হাতির দল যাতায়াতের পথ করে নেবে মাঠের ধানক্ষেতে।

লোকটা আবার বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ওই বাড়ির দিকেই ফিরে চলেছে। দেখে বলি।

— উ লোক্ ফিন্ যাতা হ্যায় উধার?

মিঃ সিং বললেন— হাতি শের কা সাথ বস্তি করনাই হ্যায় সাব, ঘড় ছোড়কে কাঁহা যায়েগা? বাড়ি ছেড়ে যাবে কোথায়?

ওরা এসব বিপদ আপদে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই ওদের জীবন।

এ নিয়ে ইদানীং বেশ কিছু আন্দোলন করার লোকও তৈরী হয়েছে। শহরের মানুষ তারা। তারা এটাকে রাজনীতির অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের এই সমস্যাটাকে নিয়ে ভোট পাবার জন্যই তারা

দাবী তোলে যে বন্য পশুগুলো মানুষের অনেক ক্ষতি করছে। সব ফসল নষ্ট করে বসতিতে হামলা করছে। তাই এই মানুষগুলো ওদের জন্য দরদ ভরা স্বরে বলে,

অভয়ারণ্য রাখা চলবে না— এসব বাদ দাও।

মানুষের ক্ষতি করা চলবে না।

এই নিয়েই আন্দোলন গড়ে তুলতে চায় এরা।

— ন্যাশন্যাল পার্ক বন্ধ করনে হোগা! আদমীকা জান-মাল-ক্ষেতিকা লোকসান হোতা হ্যায়, ইসব হঠাও।

তাই নিয়ে আন্দোলনও হয়েছে। অভয়ারণ্য তুলে দিতে হবে এখানে।

শুনে শুধালাম মিঃ রাইকে— এসব ন্যাশন্যল পার্ক হবার আগেও তো হাতির উৎপাত হতো এখানে?

তিনি বলেন,

— জরুর! আদমী ভি মরতা, আউর ক্ষেতি কা লুকসান্ হোতা। জানোয়ারের উপদ্রপ তখন আরও বেশী ছিল।

আমি শুধাই,

— তখন এই আন্দোলন হয়নি?

আমার কথায় হাসলেন ওরা।

মিঃ সিং বলেন তখন করার লোক ছিল না। এত সব শেখেনি তখনও।

— করনেকা অদমী নেহি থা। অভি বন গিয়া।

আমি জানাই,

— সারা এলাকায় মাত্র দু'চারটে টিমটিম করছে বসতি। ক্ষেতও তেমন কিছু উর্বর নয়, এই গ্রামবসতির ক'টা মানুষকে সরিয়ে দিয়ে এখানে পার্কের ধারে মাইল তিনেক জায়গা নো ম্যানস্ ল্যান্ড করলে এসব উপদ্রব হবে না। হাতির দল এতটা পথ ভেঙে ফাঁকা ডাঙা পার হয়ে দূরে গিয়ে উপদ্রব করবে না গ্রামে।

আমাব কথায় মিঃ রাই বলেন,

— সাচ্ বাত। লেকিন উবাত আউর দো এক আদমী নে বোলা। একথা অনেকেই বলেন। আমরাও বলি। কিন্তু হচ্ছে কই?

রাজনীতি এমন বিচিত্র জিনিষ যে তার লোভী হাতটা এই অরণ্য গভীবেও এসে পৌঁচেছে।

মানুষের মত অরণ্যচারী প্রাণীদেরও বাঁচার দাবি আছে। তাদেরও হত্যা ঠেকানোর সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিরোধ এরা করছেন। প্রাণীদেরও বাঁচিয়ে রাখতে চান।

তবু রাজনীতিবিদদেব মতে ওই বন্য প্রাণীদের বাঁচার কোন যুক্তি নেই, যেহেতু তারা মানুষের ক্ষতি করছে। তাদের অত্যাচারে মানুষের ফসল — এমনকি প্রাণও যাচ্ছে। এটা সহ্য করা চলবে না।

মানবদরবী ওই রাজনীতিবীদদের বড়ের চালে কতো তরুণ—কত প্রাণ অকারণে নিঃশেষ হয়ে গেল তার হিসাব কেউ রাখে না। আজকের সভ্য সমাজে এই হনন যেন একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মানুষ আজ হিংস্র প্রাণীর চেয়েও নিষ্ঠুর আর রক্ত লোভী হয়ে উঠেছে। দিকে দিকে তারই প্রকাশ সভ্য জগতে বাস করে সেটা দেখছি। তাই মিঃ রায়কে বলি,

— মানুযের ক্ষতি করছে মানুষই সবচেয়ে বেশী। ওরা দরকারে কি করতে পারেন নিজেরাই দেখছি মিঃ রায়। ওরা কখন কাকে ভালোবাসেন তা বুঝি না। তাই এত গোলমাল! আবার বনের প্রাণীদেরও শেষ করতে চান।

মিঃ রায় চুপ করে মাথা নাড়েন।

মিঃ সিং বলে—

হিঁয়াকা আদমী লোক জঙ্গলসে সব কুছ লেতা হ্যায়। কন্দমূল, বাঁশ— লকড়ি— কাঠ সবকুছ। হিয়াই

কাম্ করকে দিন গুজারা করতে হেঁ। জঙ্গলকো বরবাদ করতে হেঁ। তব্ উস্ জঙ্গলকা হাতি আ কর থোড়া কুছ ক্ষেতি খা যায়, ব্যস্ ক্যা বুরা হুয়া জী?

বনের সম্পদ নিয়ে এদের সবকিছু, সুতারং বনের হাতির এই সামান্য উপদ্রপ সইতে হবে বৈকি? সিংজীর এ কথাকে অস্বীকার করতে পারিনা। ওদিকে রাতের অন্ধকারে তাড়া খেয়ে হাতির দল আবার অন্য কোনদিকে ছুটেছে, এযেন লুকোচুরি খেলা। সেখানে হাতি কুঁদানেওয়ালাদের চিৎকার শোনা যায়। মিঃ রায় বলেন — ওদিকে যাচ্ছি।

আমাকে বলেন,

— হুঁশিয়ার হোকে কটেজ মে আনা। কাহাঁ কহি হাঁতি ছিপাকে রহ শক্তা।

তাড়া খেয়ে ওই হাতির সবগুলো বনে ফেরে না, দু'একটা হাতি অন্যদিকে ছিটকে পড়ে, তারা অন্ধকারে কোন ঝোপ ঝাড়ে চুপচাপ লুকিয়ে থাকে, হাতিকুঁদানোর দল সরে গেলে চোরের মত আবার নিঃসাড়ে বের হয়ে এসে ক্ষেতে নামে।

ওরা চলে গেলেন ওদিকে হাতির সন্ধানে।

ক্যান্টিনে খেতে বসেছি, এখন ভিড় নেই। রঞ্জন বলে— ভালো করে খাবো তারও উপায় নেই। কই *আনো বাবা। যা খিদে পেয়েছে। উঃ।*

গরম গরম তন্দুরের রুটি, ছোলার ডাল তাতে বেশ জুৎসই পরিমাণে ঘি দেওয়া, আর আলু ফুলকপির তরকারি।

দুপুরে ডালটনগঞ্জে খেয়ে বের হয়েছি, খিদেটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। এখানে জলহাওয়াও খুব ভালো। পরিশ্রমে আর জলহাওয়ার গুণে খিদেটার গুরুত্ব আর চাহিদা এাবার অনুভব করি।

রাত্রি নেমেছে। পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায় ঘুম নামা রাতের অরণ্য পাহাড় কালো জমাট রেখায় পরিণত হয়েছে। একফালি চাঁদ উঠেছে ভীরু চাহনি মেলে। রঞ্জনের এদিকে খেয়াল নেই। রান্নার গুণে আর বোধহয় জলের জন্যই বেশ কয়েকখানা রুটি খেয়ে ফেললাম।

রঞ্জন টানছে, টম্যাটো সস্‌এ পেঁয়াজ দিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে রুটি চিবুচ্ছে। শঙ্কর বলে,

— গোগ্রাসে গিলছিস্, হাতির তাড়া খেলে দৌড়াতে পারবি তো?

রঞ্জন বলে— নাহয় মরবো হাতির পায়ে, তাই বলে উপোস দিয়ে থাকতে হবে নাকি র‍্যা বনে বেড়াতে এসে?

অলোক বলে—মিটার দেখেছিস, পনেরো পয়সার রুটি দিস্তা পার হয়ে গেছে। তারপর সামান্য আইটেম আছে।

— গুলি মার! রঞ্জন এখন মরিয়া হয়ে খাচ্ছে!

...পথে আছে। তবু সাবধানে পার হয়ে কটেজে এসে উঠবার আগেই কাদের চাপাস্বরের
...জনতা কটেজটা পড়ে রাস্তার ধারে— তারপর পাহাড়ের মাথাটা সমতল করে
...বাংলো। মাঠে টানা ব্যারাকমত লম্বা জনতা কটেজ, সামনে সারিবন্দী
...টা বকুল গাছে ফুল ফুটেছে, তার মিষ্টি গন্ধ ওঠে বাতাসে। জনতা
...ন পার হয়ে আমাদের ক্যানটিনে উঠেছে।
...দাঁড়ালাম। সহায়বাবুর আবছা ছায়ামূর্তিটা দেখা যায় গাছের নীচে।
...সে বলে চলেছে,
... রাত হয়েছে শোওগে।
...কিনা, তাই এত মেজাজ। সীমা বোধহয় রেগে উঠেছে। সে

...ঠিক আছে। সহায়বাবু ওপাশের ঘরে ঢুকে গেল। সীমা

এদিকের কামরার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেখেনি। ওকে দেখা না দিয়েই আমরা পথটা পার হয়ে বাংলোয় এসে উঠলাম।

রঞ্জন বলে ,

—নাটক হচ্ছিল বোধহয়? কত করে বললাম লিলি আসতে চাইছে, নিয়ে আসি। তা তুমি শ্লা পিউরিট্যান— আজও ফাইন জমতো।

রঞ্জনের আপশোষ হয়। ওর কথায় বলি,

— লিলিকে নিয়ে কাশী গেলেই তো পারতিস? পুণ্যি হতো—আবার পাপও ধুয়ে যেতো। এখন শো দিকি?

দুদিন পথে আসার পর আজ থিতু হতে পেরেছি তাই চোখে ঘুম আসে। দূর আবছা চাঁদের আলোঢাকা বনপাহাড়ের লাগোয়া ক্ষেতের দিক থেকে কাদের চিৎকার — ক্রাকারের শব্দ ভেসে আসছে। সব ছাপিয়ে ওঠে হাতির ক্রুদ্ধ বৃংহণ। মানুষে তাড়া খেয়ে ওই পশুরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। দু'দলের বাঁচার লড়াই চলছে রাতের অন্ধকারে।

সোনা রোদ ভরা সকালে, সেগুন গাছের শিশিরজমা পাতাগুলো ঝলমল করে, হরিণের ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। পাখি ডাকছে। একটা বিরাট বনস্পতির মত দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাতাভরা করম গাছ, তাতে ভিড় করেছে সবুজ টিয়া, লম্বা ঠোঁট ধনেশ পাখি আর ঘনসবুজ ব্লু পিজিয়নের দল. একটা বাঁদরও এসে জুটেছে, তাই নিয়ে বোধহয় ওদের মধ্যে ঝগড়াটা বেধেছে। বাঁদরটাও কিচমিচ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

বাতাশের শব্দ ওঠে। প্রতিটি পাতার গায়ে বিভিন্ন এ সুর। সেগুন পাতায় ওঠে ধ্রুপদের লয়তান আর ইউক্যালিপটাস পাতায় সুর ওঠে। সুরবহ ঠুংরীর রেশ জাগে।

বিচিত্র স্বপ্ন গন্ধ বর্ণময় এ জগৎ। তারই মাঝে হরিণ ক'টা ঘুরছে। একটা বড়— সারা গায়ে সাদা বুটি আঁকা, কালো ডাগর চোখ মেলে অপরিচিত লোকটিকে দেখছে আর ছা বাচ্চা মাঝারি হরিণগুলোকে বোধহয় হুঁশিয়ার করছে।

ও ঘরে রঞ্জনের নাক ডাকছে সামনে, শঙ্কর লেপমুড়ি দিয়ে ভোরের মিষ্টি আমেজটা উপভোগ করছে। বের হয়ে এসেছে অলক, একটা ডেক- চেয়ারে ওদিকে সবুজ নির্জনে বসে গুনগুনিয়ে গাইছে।

— অলোকের ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও।

উজ্জ্বল প্রত্যুষ। পাখির ডাকে ভরে উঠেছে বাতাস। আকাশে জাফরানী রঙের বাহার জাগে। শিশিরকণাগুলো ঝকঝক করে। এই শান্ত অপরূপ রাজ্যে হারিয়ে গেছি। সারা দেহ মনে নিবিড় প্রশান্তির পরশ। যেন এ জীবনের অফুরন্ত পাওয়া — এই মহান রূপকেই দেখতে এসেছি বনপাহাড়ের অঙ্গিনায়।

এ দেখার শেষ নেই। প্রকৃতির অফুরাণ সৌন্দর্য যেন কোন দেবতার মহাকাব্য, এরই স্পর্শ পেতে চেয়েছি সুন্দরবনের দূর সমুদ্রে, দ্বীপের বেলাভূমি, এই রূপ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে কত অরণ্য পর্বতে। এই মহাকাব্যে কোন বিকৃতি নেই। জরা মৃত্যু নেই এর।

চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইলাম। কালকের রাতে দেখা মেয়েটি এসেছে সে বলে,

— আপনি!

সীমা কখন ওদিকার টানা ঘরগুলো থেকে এখানকার খোলামেলা সবুজের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। সীমা আমার দিকে চাইল। বলে সে,

—ভোরে ওঠা অভ্যাস, এখানের এই সকালেরও বিচিত্র একটা রূপ আছে। শান্ত— মিষ্টি— সুন্দর রূপ!

সীমার চোখে সেই রঙের প্রতিবিম্ব।

ওর দিকে চাইলাম! ওপাশের বেতের চেয়ারে বসেছে সে। হালকা স্বরে বলে,

— বসে পড়লাম কিন্তু পারমিশান না নিয়ে।

জানাই— তাতে কি! বসুন।

সীমা বলে—

এখানে এসেছি ভুলে গেছি দশটা পাঁচটার যন্ত্রণার কথা। ভাবা যায় না যে কলকাতা বলে একটা শহর আছে তার পথে পথে আমরা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য মাথা খুঁড়ে মরি।

সীমার কথাগুলো শুনছি, ও যেন আমারই কথা। তাই হয়তো পালিয়ে আসি এই অরণ্য গহনে, জীবন যেখানে সহজ হয়তো মাধুর্যময়। সব জটিলতা নিজের চারপাশে জড়িয়ে রেখেছি শুধুমাত্র পাওয়ার জন্যই, সহজ হতে ভুলে গেছি।

সীমা বলে — প্রায়ই বনে আসেন বুঝি?

বলি — মাঝে মাঝে! সহায়বাবু উঠেছেন?

সীমা আমার দিকে চাইল। সকালের আলো পড়েছে ওর মুখে, ঘুমজড়ানো চোখের পাতায়। গায়ে জাম রঙের একটা শাল — ওর পাড়টা সুন্দর মুখ ঘিরে একটা কোমল লাবণ্যকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। সীমা সহজ চাহনি মেলে মাথা নামালো।

ও বলে —সহায়বাবু বেলাতে ঘুম ভাঙে! এখানে ওর ভালো লাগে না। তিনি বলেন — কি ছাই আছে এখানে যে মানুষ ছুটে আসে?

—এটা অনুভবের ব্যাপার! আপনার তো ভালো লেগেছে।

সীমা বলে,

—খুউব সুন্দর লাগছে। কর্মহীন বিশ্রাম— সবুজের এই ছোঁয়া, হরিণগুলোকে দেখছেন?

এক স্বতন্ত্র জগতে হারিয়ে গেছে শহরের কর্মক্লান্ত মন। সীমার মুখে চোখে সলজ্জ ছায়া নামে। ও বলে—ওকে নিয়ে হয়তো কিছু ভেবেছেন?

—মানে? একটু অবাক হই। মেয়েটি বোধহয় রঞ্জনের কথাগুলো শুনছে। রঞ্জনটা অমনি যা তা কথা বলে, ও শুনেছে ভেবে লজ্জা পাই।

সীমা হাসল, ওর হাল্‌কা ঠোঁটের হাসির আভাটা ছড়িয়ে পড়ে সকালের মেঘভাঙা আলোর মতই। সীমা বলে,

— এমনি চেনা জানা মাত্র। সঙ্গে এসেছেন।

কথাটা সীমা যেন নিজের থেকে জানাতে চায়। অবশ্য ওতে আগ্রহ দেখাতে চাই না।

সীমা চুপ করে চেয়ে থাকে, প্রকৃতির এই সুন্দর নির্মল রূপের মাঝে নিজের মনের দৈন্যটাকে হয়তো প্রকাশ করতে গিয়েও পারেনি। আর সহায়বাবুর সঙ্গে পরিচয়টা তেমন গভীর নয় একথাটাও জানিয়ে নিজের দিক থেকে পরিষ্কার থাকতে চায়। সামনের সবুজ শিশির ভিজে মাঠের ঘাসে হরিণগুলো লুটোপুটি খাচ্ছে কখনও ওপাশের সেগুন করম বনে ঢুকছে আবার দৌড়ে আসছে ফাঁকায়। ছোট বাচ্চাটাকে বোধহয় দৌড় শেখাচ্ছে ওরা আমাদের দিকে না চেয়ে। ওদের জগতে ওরা স্বাধীন এখানে। শান্ত পরিবেশে চীৎকার ওঠে।

—চৌকিদার! এ্যা চৌকিদার ! ইধার চা লে আও।

কর্কশ গলায় সকালের সব স্তব্ধতা খান্ খান্ কার সহায়বাবু হুঙ্কার কানে আসে। সীমাও শুনেছে সেটা, ওর মুখে একটু কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

সহায়বাবুও হাঁক পাড়তে পাড়তে ঘর থেকে বাইরে এসে এদিকে চেয়ে একটু থমকে দাঁড়ালো। ওর হাঁক-ডাক বন্ধ হয়ে গেছে। চাহনিও বদলে গেছে হঠাৎ। সে লক্ষ্য করে সীমাকে বলি।

—আপনাকে ডাকছেন বোধহয়?

কথাটা মনে করিয়ে দিতে সীমা জানায় কটু বিরক্তি ভরে।

— আমি চৌকিদার নই। সকালে চা এখানে কোথায় পাবেন, দোকানে না হয় ক্যানটিনে খেতে হবে সেতো উনিও জানেন।

সীমা ওকে এড়াবার জন্যই ওদিকে উঠে গেল।

ফরেস্ট স্টাফের ডিউটি দেখলাম সকাল থেকে শুরু হয়। দিন-রাতই ডিউটি এদের। দুপুরে একবার কোয়ার্টারে খেতে আসেন, আবার বৈকালে বের হয়ে গিয়ে কাজকর্ম সেরে ফেরেন। সন্ধ্যার পর থেকে হাতি খেদাবার ডিউটি দিতে হয়। বাসায় ফেরেন গভীর রাতে। মিঃ রাইকে শুধাই,

—তার জন্য ওভারটাইম নেই? এতক্ষণ ডিউটি করেন।

আমার কথায় মিঃ রাই বলেন—

ওভারটাইম! কৌন্ সে চীজ স্যার? চায় কি সান্‌ডে ভি হম্ লোগ্ কাম্ করতে হেঁ!

ওভারটাইমে-র খবর রাখে না এরা। রবিবারও নেই এদের, বরং শনিবার রবিবার এদের কাজ বেশী, কারণ ট্যুরিস্টদের ভিড়ও হয় ওই দিনগুলোয়, অনেক বাস, গাড়ি আসে রাঁচি, ডালটনগঞ্জ— ধানবাদ বাংলা মুলুক থেকে। সেই দর্শকদের প্রয়োজন হলে থাকা, ক্যানটিনে খাওয়ার সব ব্যবস্থাও করতে হয় গেম ওয়ার্ডেনকে, না হয় বিট অফিসারকে। রকমারী দর্শকদের রকমারী মেজাজ— মর্জি, সে সবও সামলাতে হয়, না হলে রিপোর্ট করে যাবেন তাঁরা।

মিঃ রাই বলেন— দশদিন থাকতে গেলে ক্যানটিনে তো অনেক খরচা পড়বে আপনাদের।

কথাটা তিনিও ভেবেছেন। ওর কথায় রঞ্জন বলে ওঠে— তাইতো দেখছি স্যার?

মিঃ রাই কি ভেবে বলেন—

রেস্ট হাউসের ওদিকে রান্নাঘর আছে, ওরই একটা কামরা আপনাদের রান্নার জন্য খুলে দোব, একটা ছেলেকেও দেখে দিচ্ছি, আপনারা নিজেদের রান্নার ব্যবস্থা করে নিতেন পারেন। তাতে সুবিধে হবে। খরচাও কম পড়বে।

ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে থাকি। এমনি একটা সাহায্য পাবো ভাবিনি। কারণ এতে আমাদের খরচা অনেক কমে যাবে আর দিনে রাতে এই ঠাণ্ডায় আধমাইল পথ ভেঙে পাহাড় ডিঙিয়ে খাবার বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবো।

তাই জানাই— অনেক ধন্যবাদ মিঃ রাই। এখানে মেয়াদ তাহলে বাড়াতে পাড়বো।

রঞ্জনও বলে—

বাঁচালেন স্যার। যা খরচা — এখানে আধপেটা খেয়ে থাকতে হতো এদের পাল্লায় পড়ে। ওই তো কিচেন— ওটুকু গিয়ে খেয়ে নিতে পারবো। আর নিজেদের মত খাবার হবে।

মিঃ রাই বলেন—

এটা একটু ব্যতিক্রমই ঘটালাম। দু-তিন দিনের জন্য যারা আসেন তারা ক্যানটিনেই খাবেন, যারা দশ দিন থাকবেন এখানে, নিশ্চয় জঙ্গলকে তারা ভালোবাসেন— তাঁদের জন্য এটুকু আইন ভঙ্গ না হয় করলাম। লেট ইউ লিভ হিয়ার পিস্‌ফুলি। ক্যা রঞ্জনদা ঠিক বোলেসি না?

রঞ্জন ঘাড় নাড়ে— সেন্ট পার্সেন্ট কারেক্ট।

আমিই জানাই— তাহলে আজ দুপুরে জিপটা বুক করে দেন, ছিপাদহ যেতে হবে— আজ ওখানের হাট, রসদপত্র তো চাই। কিছু কিনে আনি।

সরকারী রেটে জিপ ভাড়াও মেলে এখানে'

মিঃ রাই বলেন— ঠিক আছে। আর চন্দ্রজী আপনাদের সঙ্গে যাবে। বনের পথ, অজানা জায়গা। উস্‌কো সাথমে লিজিয়ে। সুবিধে হবে।

হাট হচ্ছে স্থানীয় সমাজের মিলনক্ষেত্র। কোন বিশেষ এলাকা সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে সেখানকার হাটে গেলেই বেশ খানিকটা খবর জানা যাবে। তাদের জীবনযাত্রার মান, উৎপন্ন জিনিসপত্র, সামাজিক অবস্থা, আচার ব্যবহার অনেক কিছুই। তাই বনে বনান্তরে গেলে সেখানের হাটেও যেতে মন চায়। সহজে সেখানে অনেক কিছু দেখা যায়। হাটকে ঘিরেই এদের সামাজিক জীবন গড়ে উঠেছে।

সারান্দার গহন অরণ্যের হাট দেখেছি, সুন্দরবনের দুর্গম বাদা অঞ্চলের হাটে দেখেছি অন্য এক জীবনযাত্রার পরিচয়। তরাই অঞ্চলের হাটে, আসামের চেরাপুঞ্জীর হাটে দেখেছি সেখানের জীবনযাত্রার বিশিষ্ট রূপ। ভিড় করে বহু মানুষ, তাদের দেখা যায়।

জিপটা চলেছে রিজার্ভ ফরেস্টের ভিতর দিয়ে, ন্যাশনাল পার্কের মধ্য দিয়ে এই একটা বড় রাস্তা গেছে, বাকী যা রাস্তা আছে সেগুলো কাঁচা— কাঁকড় দেওয়া, বনবিভাগ থেকে বনের মধ্যে যাতায়াতের জন্য সেগুলো করা হয়েছে নিজেদের প্রয়োজনে। সাধারণ-এর যাতায়াত নেই সে পথে।

এই বড় পিচ রাস্তা দিয়ে দুটো বাস যায়, একটা যায় নেতার হাটের পাহাড়ের নীচে অবধি, অন্যটা যায় মহুয়াটাড় অবধি। দিনান্তে একখানা করে বাস যায় আর সন্ধ্যায় ফেরে, তাছাড়া এ পথে সবচেয়ে বেশী যাতায়াত করে বাঁশ কাঠ বোঝাই লরি। বাঁশ বোঝাই লরিগুলো যায় ডিহরি অন্ শোনে ডালমিয়ার কাগজকলে না হয় ট্রেনে করে বাইরে চালান যায়। আর কাঠগুলো চালান যায় বিভিন্ন করাত কলে।

ছায়া- আঁধার নেমেছে দুপুরেই। ঘন সেগুন বাঁশ বনে এর মধ্যে যেন আঁধার ঘনাচ্ছে। পাহাড়ী পথ, কোথাও নীচের উপত্যকায় ঘন বাঁশ বনে মড় মড় শব্দ ওঠে। হাতির দল ঘুরছে।

দিনেরবেলায় বনভূমিকে না দেখলে তার গভীরতা বোঝা যায় না, শালবন থাকলে নীচে অন্য কোন আগাছা বিশেষ হয় না, কিন্তু এ অরণ্যে শালগাছ নেই। বুক ভোর বুনো ঘাসের ঘন জঙ্গল, বাঁশ আর তার সঙ্গে মিশেছে গাছগাছালির ঘন জঙ্গল, বিছড় লতার আবেষ্টনী জঙ্গলকে দুর্গম করে তুলেছে, গাছে গাছে জড়াজড়ি করে আছে চীহড় আর লতা পলাশের ঘন আলিঙ্গন।

এ অরণ্য সুন্দরই নয়, যেমন বীভৎস, হয়ত কিছুটা ভীতিজনক।

নির্জন গহনতায় এ যেন আপনাকে নিয়েই তৃপ্ত।

— স্যার ! দেখিয়ে সাব্। চমকে উঠে চাইলাম।

ড্রাইভার চন্দ্রিকা সিং জিপটা ব্রেক করেছে, বড় রাস্তার উপর চারটে বড় বড় সম্বর দাঁড়িয়ে। বেশ বড় সড়। ওদের চেহারায় হরিণের মত সৌন্দর্য বা উচ্ছলতা নেই। রঙের ঔজ্জ্বল্যও অনুপস্থিত, ওরা কেমন বোকা বোকা নাদুস নুদুস জানোয়ার, একটু গাধার মত জড়মার্কা। আমাদের দেখে ওরাও থমকে দাঁড়িয়েছে।

অলোক ক্যামেরাটা বের করার আগেই বড় সম্বরটা চিৎকার করতেই অন্যগুলো রাস্তার ধারে বাঁশবনের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো, তখনও দূরে যায়নি ওরা— চেয়ে চেয়ে দেখছে একটা সম্বর। অন্যটা তাকে কামড়াবার মত ভঙ্গী করে শাসন করতে তবে ওপাশের একটু খালে নেমে গিয়ে গা ঢাকা দিল আমাদের নজরের বাইরে।

একটু পথ এসেই পড়ে 'কের' বাংলো। পিছনে সুন্দর বাগান— তারপর প্রান্তরের শেষে দেখা যায় পর্বতসীমা। নির্জন সুন্দর পরিবেশ, অবশ্য বুনো হাতির উৎপাত এখানে বেশী। তবু বাগানে পেয়ারা লেবুর প্রাচুর্য দেখা যায়। কোনরকমে ওদের হাত এড়িয়ে টিকে আছে।

জিপটা চলেছে, এ বনে বাঁশ ছাড়াও প্রচুর রয়েছে সরল জাতীয় গাছ— বোটানিক্যাল নাম বসেলিয়া সোরাও, দেশলাই তৈরীর কাজে এর খুব চাহিদা, শিমূলও রয়েছে। আরও দেখলাম খয়ের গাছের প্রাচুর্য, এক্কাশিয়া কেট্চ। এই গাছের গুঁড়ির ভিতরের রং খয়েরের মত, এই কাঠ সিদ্ধ করে কাত্ থেকে খয়ের বের হয়। ছিপাদহে এর বড় কারবারও আছে।

ছিপাদহ এই অরণ্যভূমির মধ্যে একটু বড় জায়গা। মিডল স্কুল, ফরেস্ট বাংলো— আর রয়েছে কাঠ ব্যবসায়ীদের ডিপো, গ্যারেজ, পাহাড়ের নীচে রেল স্টেশন আর সপ্তাহে দু'দিন হাটও বসে, তার জন্য হাটতলা আর কিছু বাঁধা দোকান-পশারও আছে। চা মিষ্টিও বিক্রি হয় আর তিরিশ পয়সার চা পুরো মালাই দিয়ে তৈরী, একটু রাখলে তাতেই পুরু সুস্বাদু সর পড়ে।

রঞ্জন এর মধ্যে তাবড় ফর্দ করে ফেলেছে, চাল আটা— হলুদ— তেল— ঘি কোন আইটেম বাদ নেই, অলক কাঁচা বাজারের ফর্দ করে চন্দর সিংহকে নিয়ে হাটে ঢুকেছে।

এদিকে ওদিকে ঘুরছি, বনজসম্পদের বিকিকিনির যে অন্যতম কেন্দ্র ছিপাদহ সেটা দেখলে বোঝা যায়।

ওরা হাটে ব্যস্ত। আমি হাটতলা ছাড়িয়ে লোকালয়ের এদিক ওদিক ঘুরছি। লোকালয়ও সামান্যই। মাঝে মাঝে বাঁশ-লগ্ এর টাল জমা করা। এদিকে ওদিকে কাঠের ঘর, ওপাশে একটা বাংলো মত। সামনে বাগানও রয়েছে। পিছনে শালগাছের জটলা।

এদিকে হাটের কোলাহল কিছুটা কম, বড় রাস্তাটা এসে বনের দিকে চলে গেছে লোকালয় ছুঁয়ে। ওপাশে একটা ডাকবাংলো। বাসটা এসে থামলো, দেখি সহায়বাবু আর সীমা নামছে বাস থেকে। সহায় বাবু ওদিকে চায়ের দোকানে গিয়ে বসছে, বলে চলেছে সে সীমাকে— বনের মধ্যে গঞ্জ মত, না। বন থেকে এদিকে এসে তবু বাঁচা গেল।

হঠাৎ আমাকে দেখে চাইল সহায়বাবু।

সীমা শুধোয়— বাসে এলেন নাকি?

ওর কথায় বলি— জিপ নিয়ে হাটে এসেছি। আপনারা ফিরবেন তো।

সহায়বাবু আমার কথায় জানায় রূঢ় স্বরে।

— আমাদের দেরী হবে। বৈকালের বাসে ফিরবো।

চলো সীমা।

সীমা কি বলতে যায়, সহায়বাবু তাড়া দেয়।

— চলো।

সীমাকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল সে দোকানের দিকে।

পায়ে পায়ে ফিরছি। বনের একটু ফাঁকায় একটা কাঠ বাঁশ- এর গোলা মত। দু'একটা কাঠের ঘরও রয়েছে। সামনে দু'চারটে ফুল গাছ, ঝাউ-এর মাচা। কার ডাক শুনে চাইলাম।

— বাবুজী।

রাস্তার ওদিকে ছোটো বাংলো থেকে কাকে বের হয়ে আসতে দেখে চাইলাম।

সামনের রাস্তার ওপাশে জঙ্গলের শুরু। বন এখানে সর্বত্র। ওদিকে বাঁশ আর কাঠের তৈরী সুন্দর একটা বাংলো, সামনে উর্বর মাটিতে বাগান— তাতে গোলাপ — ডালিয়াও ফুটে রয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে গৌরী, সেই রাত্রে ট্রেনে একসঙ্গে এসেছিলাম ডিহরী থেকে— তারপর ডালটনগঞ্জ থেকে আর দেখা হয়নি। গৌরীকে দেখেই চিনতে পারি। শুধোলাম,

—রূপ সিংজী নেই?

হাসে গৌরী -- ফরেস্ট মে গিয়া হোগা। এসে পড়বে। এতদূর এসেছেন ঘরে যাবেন না? আসুন।

ওর কথায় যেতে হল। বেতের সোফা সেট— হরিণের চামড়া দিয়ে মোড়া। বেশ ছিমছাম করে সাজানো ঘরটা।

গৌরী বলে - শোচলাম আর ভি মোলাকাত্ হবে না, তা বহুৎ জোর নসীব। বরাত জোর আজ দেখা পেলাম।

খুশি হয়েছে সে।

গৌরী বলে — কলকাতায় থাকতম জগুবাজার ভবানীপুর মে! ইস্কুলমে বাংলা পড়েছিল।

হাসতে থাকি— তোমার বাংলা পড়ার যা নমুনা তাতে মনে হয় পাস করতে আর পারোনি।

হাসছে গৌরী, ওর হাসির আড়ালে কি যেন বেদনার ছায়া ফুটে ওঠে। কলকাতার সেই জনকলরব, আলোভরা পরিবেশ থেকে এখানের বনরাজ্যে নির্বাসিত হবে এ বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি সে। তাই কলকাতার মানুষ দেখে হাবানো বেদনাটা জেগে উঠেছে।

ও বলে,

—সবই বিলকুল নসীব বাবুজী। নেহি তো হিয়া কিঁউ রহনে পড়েগী? এখানে বনবাসে আসতে হবে ভাবিনি।

সকলের মনের কোণে কোণেই রয়ে গেছে সুপ্ত নীরব বেদনা। কেউই বোধহয় কঠিন বর্তমান নিয়ে তৃপ্ত নয়, হতে পারে না। গৌরী বলে,

—তখন খুব কষ্টে দিন চলতো আমাদের, রূপসিং-এর ছিল ট্যাক্সি, হঠাৎ কোন দেশওয়ালীর সঙ্গে এখানে এসে কাজ-কারবার শুরু করলো। ডালটনগঞ্জে ভি মকান বানিয়েছে। কোলকাতা ছোড় দিয়া বাবুজী, লেকিন আমাকে ভি যেতে দেবে না আর কলকাতায়।

—কেন বেশ তো আছো ? বাংলো—গাড়ি—পয়সা—

আমার কথায় গৌরী বিস্মিত ডাগর দুচোখ মেলে থাকে। সেই চোখের পাতা জলে ভিজে আসে।

বলে ওঠে সে— হ্যাঁ চিড়িয়া ভি খাঁচামে বহু আরামসে থাকে বাবুজী। লেকিন উস্‌কা দিল দুখায় আসমান আউর হরিয়ালী কে বাস্তে।

খাঁচার বন্দী পাখিটাকে নীল আকাশ সবুজ বন টানে, গৌরীর সারা মনে কি ব্যাকুলতা।

বলে সে— কি পেলাম বাবুজী?

ওর পাবার হিসাব জানি না তাই চুপ করে থাকি। গৌরীর চোখে মুখে থমথমে ভাব ফুটে ওঠে। ওদের মনের অতৃপ্তিই দেখছি। মনে হয় মানুষ জাতটাই বোধহয় সবচেয়ে অসুখী। শান্তি তার জন্য কোথাও নেই। কারণ কি চায় তা সে নিজেই জানে না।

হাটে ফিরতে হবে আমাকে। তাই জানাতে গৌরী বলে—

এখনও দেরী আছে। সিংজীরও ফেরার সময় হয়ে গেছে। দেখা করে যান।

গৌরী চাকরকে দিয়ে চা তৈরী করিয়েছে। এখানে চমচম মেলে, সেই চমচমও দিয়েছে প্লেটে। দেখে অবাক হই।

— এসব কি? এত কি আনিয়েছো?

জিপটা বাইরে থামছে, এগিয়ে আসে রূপসিং। আমাকে দেখে।

— নমস্তে বাবুজী! আইয়ে— গৌরী, চা মালাই দিয়া?

ওসবের অপেক্ষা বাখেনি, এসে গেছে সব। জানাই ওকে । বলিষ্ঠ চেহারা, আজ ওকে ভালো করে দেখি। মাথার চুল দাড়িতে সাদা রঙের ছোপ পড়েছে, তবু চেহারা টোল খায়নি। জিপ থেকে নেমে বারান্দায় এসে বসল।

গৌরীর পাশে ওকে কেমন বেমানান ঠেকে, মনে হয গৌরীর মনে নীরব হাহাকারের মূলে রয়েছে কোথায় একটা বেদনার আর্তি।

রূপ সিং বনে পাহাড়ে বনের ব্যবসা—কাঠের হিসাবে করতে ঘুরে বেড়ায়। বলিষ্ঠ বেপরোয়া একটি মানুষ, তার জগৎ নিয়েই ব্যস্ত। একটি নারী মনের চাওয়া পাওয়ার হিসাব কবার সময় তার নেই।

রূপ সিং হয়ত ওসব কথা ভাবে না, ওর কাছে ব্যবসার খবরই বড়। ও বলে — বাঁশ এখানের প্রধান বনজ সম্পদ।

শ্রেফ 'ব্যামবু' সে রেভিনিউ আতা হ্যায় হিয়াঁ সাত সে দশ লাখ রুপেয়া। আউর কেন্দুপাতা — শাল, সেগুন টিম্বার, জ্বালানী এবাত দুসরা বাবুজী। বহুৎ 'রিচ ফরেস্ট হ্যায়' বড়যাঁড় লাত্‌মে জঙ্গল কাফি হ্যায়! উধার ভি বাংলো বানায়, স' মিল চালু কিয়া। আরও কারবার আছে বড়যাঁড়ে।

লাত্— বড়যাঁড়-এর জঙ্গলের কথা শুনেছি, তাই জানাই।

— ওদিকে যাবার ইচ্ছা আছে, যদি পারি তবে তিন চার দিনেব মধ্যে যাবো।

রূপ সিং কথাটা শুনে আমন্ত্রণ জানায়।

— সচ্। চলা আইয়ে মেরে বাংলোমে।

গৌরী শুনছে কথাগুলো।

রূপ সিং বলে—বহুৎ ডিপ ফরেস্ট, বহুৎ খাতরা জঙ্গল, হাতি— টাইগার কাফি হ্যায়। হুঁশিয়ার সে জানা।

বৈকাল গড়িয়ে আসছে, জঙ্গলের পথ। ওদের বোধহয় হাট করা হয়ে গেছে। তাই বলি — আজ চলি সিংজী! বেতলা ফিরতে হবে।

গৌরী চেয়ে থাকে। ওর নীরব চাহনিতে কি যেন ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। ও বলে—বড়ঝাঁড়মে। ওরও যেন আমন্ত্রণ বয়ে গেল ওই দুর্গম বনপাহাড়ে। তাই জানাই— দেখি, যাবার ইচ্ছে রইল। রূপ সিং বলে— যানেসে ছিপাদহ হো কর যানা, হম্‌কো খবর দিজিয়ে।

হাটের দিকে এগিয়ে আসছি। হাটেব কলরব ওঠে, বড় বড় মাঠে শুধু সাইজমত বাঁশের গাদা, ট্রাকগুলোয় মাল ভর্তি হচ্ছে সেখানে। বৈকালেব আলো কমে আসছে। আমাকে দেখে রঞ্জন বলে—থেকে থেকে কোথায় গায়েব হও বাবা? এখানেও কি তালে ঘুরছো?

হাসলাম ওর কথায়, হাট-এর ব্যাপার চুকিয়ে ফেলেছে ওরা। ওদিকে মুন্ডাদের কলরব চলেছে। বিকিকিনির শেষ পালা চুকিয়ে বনের গভীবে যে যার বসতিতে ফিরতে চায তাড়াতাড়ি। হাঁড়িয়ার মেজাজে কেউ টলছে, কেউ বিকিকিনি করতে আসেনি, এসেছে শুধু হাট দেখতে। তারাও এবার ঘরে ফিরছে।

শঙ্কর বলে—ঘি যা পেয়েছি ফার্স্ট ক্লাস। ষোল টাকা সের।

ঘি তেল খাবারের চার্জ রঞ্জনের। তাই বলি,

— ওসব রঞ্জনকে দেখাও। মাল চেনে ও।

অলক ততক্ষণে বস্তাবন্দী করে আলু পেঁয়াজ— বেগুন— কফি, বরবটি, লম্বা লাউ অবধি কিনে জিপে তুলেছে।

শঙ্কর বলে— বেলা পড়ে আসছে, চা খেয়ে বেরুনো যাক।

এখানে এসে অবধি দেখছি এদের জগতে সামান্যতেই কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়, সেদিন ডালটনগঞ্জ অবধি ট্রেনে আসতেও কারণে অকাবণে লোক জমায়েত দেখেছি, এখানে চায়ের দোকানে অর্ডার দিয়ে ওরা বাইরের চারপাই-এ বসেছে, ভিতরে চা খাবার তৈরী হচ্ছে, বেঞ্চি পাতা।

হঠাৎ সেখানেই দুটি তরুণের মধ্যে দু' একটা কথা কাটকাটির পরই তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল, রীতিমত ফাইট যাকে বলে। এ ঘুঁসি মারে তো অন্যজন কিল বসায়, এ হুঙ্কার ছাড়ে তো অন্যজন গর্জন করে— শির তোড় দেঙ্গে।

চারিপাশে লোকজন জুটে গেছে, ছাড়াবার চেষ্টা নেই মজা দেখছে মুফ্‌তসে আর ওরই চালার নীচে দুই বীর পুরুষ লড়ছে।

হঠাৎ দেখি ঘরের ভিতর থেকে এক দশাসই মহিলা বের হয়ে এসেছে, হাতে ইয়া ঝাঁটা, সেই ঝাঁটার নিপুণ সঞ্চালনে দুই যোদ্ধা ধরাশায়ী, রণক্ষেত্র ছেড়ে বাইরে এসে একজন হাওয়া, অন্যজন নাক টিপে ধরে সামলাচ্ছে ওই আক্রমণের বেগ।

ওই মহিলা এদের গর্ভধারিণী, দুই ভাই- এ বেধেছিল সংঘাতটা, কারণ কার একটা রুমাল/নাকি কে হাতিয়ে নিয়েছিল, তারপরই বাহুযুদ্ধ বাধে দুজনের মধ্যে কথায় কথায়।

আবাব সব শান্ত হয়ে যায়। মহিলা তখনও গর্জাচ্ছে।

— আও উল্লুক কা বেটা তেরা জান নিকাল দেগা। ঘরসে বাহার কর দেগা।

জননী এবার নিজে অবতীর্ণা, ফলে শম্ভু নিশম্ভু দুজনেই রণে ক্ষান্ত দিয়েছে।

এবাড়ির বুড়ো কত্তা কড়াই -এ নিম্‌কিন্ ভাজছিল, সে ওই স্ত্রীর পরিচয়টা স্বীকার করে নিতে রাজী নয়। তাই বাধা দেয়।

আবে চুপ যা গোপীকা মা! বাজে কথা বোলো না।

মেয়েটি গর্জায়— হ! চুপ যায়গা ? কাহে? মিছে কথা বলছি নাকি?

অলক গম্ভীরভাবে বলে— রুমালটার কোন হিস্ট্রি আছে বোধহয়?

শঙ্কর বলে— হ্যাঁ, তোকে যেমন শম্মিতরা রুমাল দেয়, এ তাই।

আর যতো অশান্তি ওই মেয়েদের রুমাল থেকেই। শেকস্‌পীয়ারের নাটক পড়িসনি?

রঞ্জন বলে— লেখককে শুধো না? ফাঁকে কোথায় টহল দিয়ে এল, শুধো? কি হে তুমিও কি রুমাল খুঁজতে গেছলে?

চন্দ্রিকা সিং জানায়— চলিয়ে সাব্।

ওসব রেখে ছিপাদহ থেকে বের হলাম সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, বনে বনে নেমেছ সন্ধ্যার অন্ধকার।

ছিল সে বনের হরিণ

কে তারে বাঁধলো অকারণে।

বনের হরিণকে এরা বাঁধেননি। হরিণগুলোই এখানে কি মায়ায় বাধা পড়ে গেছে। এই বেতলার ফরেস্ট কলোনীতে।

সন্ধ্যার পর মিঃ রাই ফরেস্টের আরও দু-একজন মিঃ তেওয়ারী মিঃ সিংও আসেন। তেওয়ারীর বয়স হয়ে গেছে। বলিষ্ঠ পেটা চেহাবা। মাথার চুলগুলো প্রায় সাদা হয়ে উঠেছে। শুদ্ধাচাবী ব্রাহ্মণ, মুখে মিষ্টি হাসি লেগে আছে সর্বদাই।

তেওয়ারীজী বলেন—

বন থেকে হরিণও মাঝে মাঝে বের হয়ে বাইরের ধান অড়হর মকাই ক্ষেতে চলে যায়। সেবার এখান থেকে কয়েক মাইল দূরের গ্রামে গিয়েছিল কয়েকটা হরিণ। লোকজনের তাড়া খেয়ে পালাতে যায়। ওরাও ঘিরে ফেলে একটা হরিণকে বর্ষা দিয়ে চোট করে। চোট নিয়েই হরিণটা কয়েক মাইল পথ দৌড়ে এসে এখানে পড়ে যায়।

তখন আমরাই ওকে জিপে তুলে ডালটনগঞ্জে ভেটারনারি সার্জেনের কাছে নিয়ে গিয়ে ঠিক করে ওষুধ-পত্র দিয়ে নিয়ে এসে এখানেই রাখি। খেতে দিই। ক্রমশঃ হরিণটা সুস্থ হয়ে এখানেই চলাফেরা করে। কলোনীতেই খাবার- দাবাব দেয় সকলে। এখানের একজন হযে যায় হরিণটা। হঠাৎ কিছুদিন পব উধাও হয়ে যায়। কাছে বন, বনেই চলে গেছে আবার। ভাবলাম আর ফিরবে না।

কয়েকদিন পব আবাব ফিরে আসে কলোনীতে। ওর নামকরণও হয়ে যায়। চিত্রা কিছুদিন পরে মা হল। তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এখানেই আছে। ওই ঝারি জঙ্গলে। এখন তার বাচ্চারও বাচ্চা হযেছে। সব ওই ঝোপ জঙ্গলেই থাকে কলোনীর পাশে।

সীমা কথাগুলো শুনছে। তেওয়ারীজী বলে,

—ভালোবাসা দিয়ে মানুষ বনের পশুকে জয় করতে পারে বাবুজী। বনে বাস করি হাতি-বাঘ- বাইসনের সঙ্গে ঘর করি। এখনও কোন বিপদে পড়িনি।

রাত হয়ে গেছে মিঃ রাই বলেন— হাতিগুলো আজ এদিকে আসেনি। অন্যদিকে গেছে বোধহয়।

অলক জানায়—বোধহয় রেস্ট নিচ্ছে। আজ ওদের সার্কাস বন্ধ। হাসছেন মিঃ রাই। ওরাও উঠে পড়েন। তেওয়ারীজী বলেন,

— জঙ্গলে যাবেন তো? জানোয়ার ভি দেখবেন। ভালোই লাগবে। অব রেস্ট লিজিয়ে।

সীমাও উঠে পড়ে। সহায়বাবু তৈরী হয়ে এসেছেন।

ক্যানটিনে খাওয়া সেরে এসেছেন তারা। সীমা শুধায়।

— আপনারা খেতে যাবেন না ক্যানটিনে?

অলক বলে—ওটাব থেকে বেঁচেছি। আমাদের জন্য ওরা একটা রান্নাঘর ছেড়ে দিয়েছেন। ওখানেই রান্না করছি।

— অ! সহাযবাবু গুম হয়ে চলে যায়।

রঞ্জন দলের অলিখিত ম্যানেজার। এতদিন অবধি হিসেব নিকেশ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এখন নোতুন একটা কাজও চেপেছে তার উপর।

রঞ্জন ওদিকের রান্নাঘরে রসুইদার ভিখনকে নিয়ে জোর ডাইরেকশন দিয়ে খানা বানাচ্ছে। তার হাঁক ডাকের শব্দ শোনা যায়।

সহায়বাবু সন্ধ্যার সময় আমাদের জিপ থেকে নামতে দেখেছিল, আর তার সঙ্গে চাল ডাল তরিতরকারি জিনিষপত্রগুলো দেখে উদাসীন দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল। কিন্তু তারপর আবার এই খবরটা শুনে রীতিমত অবাক হয় সে।

সীমা দেখছে সহায়বাবুকে। সহায়বাবু বারান্দায় উঠে এসে আমাদের কটেজের ঘরগুলো দেখছে। এখানের খাট বিছানাপত্র একটু ভালো, মশারি গুলোও সুন্দর। দরজা খুলে বাথরুমটাও একনজর দেখে সহায়বাবু, বলে— দিব্যি সুন্দর ব্যবস্থা মশায়।

কাঠের অভাব নেই এখানে, আর সস্তাই। শীতের কনকনে রাতে উনুনে কাঠ জ্বলছে, রান্নাঘরটাও বেশ গরম আর প্রশস্থ। বাসনপত্র ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টই দিয়েছেন, আর রান্নার জন্য তাদেরই চেনা কোন কনট্রাকটরের একটা ছেলে ভিখনকে দিয়েছে, সেইটাই গোলমাল বাঁধিয়েছে। সহায়বাবু তবু দেখেশুনে চলেছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে সবকিছু।

রঞ্জন এবার ভিখনকে নিয়ে পড়েছে। রঞ্জন এমনিতে বাবু। সকালে উঠেই গালে ব্লেড ঘসে বোরোলীন মাখবে, চুকচুকে করে মাথায় তেল দেবে কে হোড়ের ভৃঙ্গল উইথ ওয়াটার। এটা দিনে কয়েকবারই করে।

সীমাকে ও রান্নাঘরে দেখে ওই ফাঁকে বার কয়েক রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নেয়। সীমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে দেখি ওর ঠোঁটে হালকা হাসির আভা ফুটে উঠেছে।

রঞ্জন বলে— রান্নার কিছুই জানে না। বনে বাঁশ কাটতো ভিখন তাই দেখাতে হচ্ছে ওকে রান্না-বান্না।

সহায়বাবু গম্ভীর হয়ে দেখেশুনে বাইরে এল।

যেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা এসব খুঁটিয়ে দেখতে এসেছে, এবার সহায়বাবু মুখ খোলে।

—বেশ হাঁড়ি কেড়ে বসেছেন দেখছি। ক'দিন থাকবেন এখানে? ওর কথায় জানাই— দু' দশ দিন থাকবো। তবে এখানে ডেরা থাকবে মাত্র।

এই পালামৌ ফরেস্টের এদিক ওদিকে দূর -জঙ্গলের মধ্যেকার বাংলোগুলোতেও যাবার ইচ্ছে আছে।

সহায়বাবু বলেন—

বেশ জমিয়ে নিয়েছেন মশাই। এদের সঙ্গেও দেখছি বেশ দহরম মহরম করেছেন। এরাই সে সব ব্যবস্থা করে দেবে? ওর কথায় সীমার দিকে চাইলাম। সীমা গম্ভীর হয়ে গেছে।

সহায়বাবু জানায় খরচাও কমে গেল আপনাদের। এই রান্না-বান্নায় আমাদের তিনজনের তো বেশ টাকা লাগছে।

সহায়বাবু গলা নামিয়ে শুধায় চাপাস্বরে —

তা কি করে ম্যানেজ করলেন এসব? কিছু দিতে টিতে হল বোধহয়।

চমকে উঠি ওর কথায়। লোকটার মনের অতলের নোংরা রূপটাকে দেখে অবাক হয়েছি। সীমাও চুপ করে গেছে। সহায়বাবুকে জানাই — এরা ভদ্রলোক। তাই অযাচিত ভাবে সাহায্য করেছেন আমাদের।

সীমা ওদিকে তার ঘরের বারান্দায় চলে গেল, মনে হয় এসব বিশ্রী কথা তারও ভালো লাগেনি।

সহায়বাবু বিজ্ঞের মত বলে— অবশ্যি আপনাদের ব্যাপারই আলাদা, বেশ আছেন মশাই। চলি— ভদ্রলোক উঠে চলে গেল কথাগুলো বলে।

সহায়বাবুর মন্তব্যে অবাক হই। ভদ্রলোক যেন একটা ধারণা মনের মধ্যে পুষে রেখেছে— সেটা যে সর্বৈব মিথ্যা তা বোঝাতে পারি না।

ঠাণ্ডার মধ্যে বের হয়েছি একাই মাঠে বেড়াচ্ছি।

শঙ্কর অলক আজ ক্লান্ত, কাল বেরুবো আর একটা বাংলোতে— সেখানে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসবো এখানে। তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

চাঁদের আবছা অলোয় সরষে ক্ষেতের ফুলগুলো বিন্দুর মত ফুটে উঠেছে। পথের দুপাশের ইউক্যালিপটাস গাছের পাতায় বাতাসের শিহরণ জাগে— দূরে পথের ধারে হাতি কুঁদানোর দল আগুন জ্বেলেছে। আজ বোধহয় হাতিগুলো অন্যত্র কোথাও গেছে তাই ওদের সাড়া নেই।

ফরেস্ট গেটের দিকে চলেছি হঠাৎ সীমার ডাকে চাইলাম। সীমা আমাকে দেখে এগিয়ে আসে।

— খুব ঘুরে এলেন যাহোক একা একা? সহায়বাবুর কথায় কিছু মনে করবেন না। ও অমনিই।

মাথাব চাদরটা ঘোমটার মত দিয়েছে শীতের জন্য, গায়ে কমলা রঙের ফুল শ্লিভ সোয়েটারে ওর দেহের রেখাগুলো নিটোল হয়ে উঠেছে।

আমি বলি— না। না। তবে রেঞ্জার মিঃ রায় শুনলে দুঃখ পাবেন। ছিঃ।

সীমা চুপ করে থাকে।

সীমা বলে — এখানে বসে থেকে ভালো লাগছে না, মনে হয় এদিকে ওদিকে ঘুরে দেখে আসি। দেখলাম আপনারা দিব্যি বন- জঙ্গল ঘুরে হাট দেখে এলেন। কাল কি প্রোগাম?

ওকে জানাই— কাল যাচ্ছি কেঁচকি বাংলোয়। দিনটা ওখানেই থাকবো। সন্ধ্যায় ফিরবো। যেতে পারেন।

সীমা আমার দিকে চাইল, ও যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই বলে — সত্যি বলছেন?

আমি জানাই— কেন এমনকি কঠিন কাজ? অবিশ্যি সহায়বাবুর যদি আপত্তি না থাকে? নইলে জিপ যাচ্ছে যেতে পারেন অনায়াসেই।

সীমার সেই নরম কোমল ভাবটা ক্ষণিকেব জন্য কঠিন হযে ওঠে। ওর চোখেব চাহনিতে দেখছি সেই পরিবর্তন। সহায়বাবুর কথায় ও জানায়,

— অবশ্যি কথাটা আপনাকে আগেই জানিয়েছি, বিশ্বাস করেননি এটা আমারই দুর্ভাগ্য।

— তা বলতে চাইনি। আমি কোনরকমে নিজের দোষ মুক্ত হবার চেষ্টা কবি— অন্য অসুবিধাও তো থাকতে পারে?

সীমা বলে—যাকে এড়াতে চাই সেইই জড়িযে পড়ে বেশী কবে। কি যা তা বলছিল আপনাদের? সত্যি আমিও লজ্জিত ওর জন্যে।

সীমা সহায়বাবুর আসাটা লক্ষ্য করেছিল। জানাই,

—বলছিলেন কটেজ, ওই রান্নার ব্যাপার সম্বন্ধে হঠাৎ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদেব উপর এত সহায় হলেন কি মন্ত্রে? কিন্তু বিশ্বাস করুন— দেখেছি ওরা সতিাই সজ্জন, আব মিশতে পাবলে ওঁবাও এগিযে আসেন, সাহায্যের হাত বাড়ান। কাল ওই বাংলোয় যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন ওঁরাই।

সীমা চুপ করে কি ভাবছে। সীমা বলে,

— মনের যোগ গড়তে জানাটাই মানুষের বড় পরিচয়, তার জন্য বাইরেব খোলসটাকে ছাড়তে হয়, সেটা সকলে পারে না। সহায়বাবুও তাদেরই দলে। এখানে এসে অবধি হেডমাষ্টারি ফলাচ্ছে, উনি যেন মস্ত তাবড় একজন, সবাই ওর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে এই ভাবেন।

সীমার কথায় চাপা বিরক্তিতে হয়তো ঘৃণাটাই আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সীমা যেন দেখাতে চায ওই লোকটাব সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠতা তার নেই।

তাই দুজনে বাংলোর সীমানা ছাড়িয়ে ফরেস্টের গেটের বাড়িটার কাছে এসেছি, আলো জ্বলে ফরেস্ট নাকায়। চারিদিকে নির্জনতা। আজ লোকজনেব ভিড় নেই। দেখি শঙ্কর রঞ্জন অলোকও এসেছে। বোধহয রান্নার দেরী দেখে এখানে চায়ের দোকানে এসে বসেছে তারা। মিঃ রাইও রয়েছেন গেটে, ডিউটি চেক করতে হয় তাঁদের।

রাত্রির নিস্তব্ধতা বেড়ে উঠেছে ঝিঁঝির ডাকে। পূর্ণিমার পরের রাত্রি, তাই দেরী করে চাঁদ উঠেছে। মিঃ রাই বলেন

—ফরেস্ট যাবেন তো? আজই চলুন— কোই ডিসটার্বেন্স নেহি হ্যায় আজ। বন শান্ত জানোয়ারের দেখা পাবেন।

বনের গভীরে দু'একবার ট্যুরিস্ট গাড়ি স্পটলাইট জ্বেলে যাতায়াত করলে প্রাণীদের মধ্যে অকারণ চাঞ্চল্য জাগে, তারাও বিরক্ত হয়ে রাস্তার আশপাশ থেকে ভিতরে চলে যায়। তখন দেখাও মেলেনা তাদের।

আজ তেমন কোন উৎপাত হয়নি, হাতির পালও বন ছেড়ে বেড় হয়নি, তাই আজই বনে ঢোকা যেতে পারে ওদের দর্শনের জন্য।

রঞ্জনও টাকাকড়ি জমা দিয়ে সইসাবুদ করে গাড়িতে এসে উঠল। শঙ্কর আর রঞ্জন জিপের মধ্যে সামনের সিটে বসেছে।

মিঃ রাই বলেন,

— এ রঞ্জনদা বাইরে আসুন না জিপের পিছনে?

রঞ্জন বলে— নেহি স্যার। বহুৎ কোল্ড হ্যায়।

সীমাকে জিপের পিছনে উঠতে দেখে অবাক হয় মাত্র, কি বলতে গিয়ে থেমে গেল মিঃ রাই। সীমা নিজেই এসেছে আজ।

চাঁদের আলোটুকু হেডলাইটের ঝলকে মুছে গেছে, তার উপর আবছা অন্ধকারঢাকা বনরাজ্যে স্পটলাইটের তির্যক রেখাটা ছুরির ফলার মত বিঁধছে। বনের মধ্যে জিপটা চলছে।

হঠাৎ কানে আসে বিকট শব্দ, বনে বনে যেন ঝড় উঠেছে। শোঁ শোঁ গর্জনে বাতাস কাঁপছে, কোথায় গাছের ডাল ভেঙে পড়ল মড় মড় শব্দে, মিঃ রাই-এর চোখমুখ বদলে যায়, জিপটা থেমে গেছে— সামনেই রাস্তার ধারে ঘন বাঁশ বনে বিরাট দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশালাকায় হাতি। সেও জানাচ্ছে আমাদের দেখ।

স্পলাইটের আলোতে দেখা যায় ধুলোমাখা সর্বাঙ্গ, লালাভ দেহ— বিরাট থামের মত পা দুটো কাঁপাচ্ছে— ছুঁড়ছে আর শুঁড় নেড়ে জানায় ধরতে পারলে ওই পায়ের নীচে ফেলে শেষ করে দেবে।

চন্দ্রিকা সিং জানায়— মাক্না স্যাব, সাথমে ছ'ঠো হাতি হ্যায় রোড পর। ওই তো দেখা যাচ্ছে ওদের দলটাকে।

রাস্তার উপর ছটা ছোট বড় হাতির পালকে নিয়ে চলেছে ওই বিশাল গজরাজ। সীমার হাতটা কাঁপছে— সামনে ওই কালো চলমান পাহাড়গুলোকে দেখে জিপও দাঁড়িয়ে গেছে।

জঙ্গলের নিয়মই এই— ওদের পথ দিতে হবে সর্বাগ্রে, বনের রাজা বাঘ নয় যেন হাতিই। বাঘকে বরং বলা যায় জেন্টলম্যান অব্ দি ফরেস্ট। ম্যানইটার নাহলে বাঘ সহজে মানুষের ধারে কাছেও আসেনা, এড়িয়ে যায়। কিন্তু হাতি যেন বনের সম্রাট সাম্রাজ্যে মানুষকে সে দেখতে রাজী নয় তাই প্রতিবাদ করে তীব্র গর্জনে। তার এখানে একছত্র আধিপত্য সেই সম্মান তাকে দিতেই হবে।

ঘন ঘন চিৎকার করেছে, চোখে আলো পড়তে মনে হয় যেন ষাট পাওয়ারের দুটো লাল বাতি জ্বলছে, সেই সঙ্গে বাঁশগাছগুলোর উপরই রাগ ঝাড়ছে। হাতির দলটা রাস্তা থেকে উপরে উঠে গেল— তখনও দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে বড় হাতিটা, স্পটলাইট-এর রেখাটা মাটিতে পড়ে সামনের দিকে এগাচ্ছে কিভাবে হাতিটাও সেই আলোর ইঙ্গিত ধরে ওপাশের দিকে এগিয়ে গেল পথ ছেড়ে। যেন দয়া করে আমাদের ক্ষমা করে গেল এইবারের বেয়াদবি।

কয়েকটি মিনিট যেন অন্য এক জগতে হারিয়ে গেছলাম। মিঃ রাই বলেন—

ইউ আর লাকি, ফার্স্ট চান্স এই মাক্নাকে দেখতে পেয়েছেন। হি ইজ দি চিফ। করিব সাড়ে এগারো ফিট হাইট্ উসকা। উচ্চতায় উনি সাড়ে এগারো ফিট্।

শুধোই— কিন্তু মেল এ্যালিফ্যান্ট, মদ্দাহাতির দাঁত নেই কেন?

মিঃ রাই জানান— সব পুরুষ হাতির দাঁত গজদন্ত থাকে না।

মানুষের মধ্যেও অনেকের দাড়ি গোঁফ তত থাকে না, তাই ওদের বলা হয় মাকনা! দাঁত থাকলে বলা হয় দাঁতালো।

মিঃ রাই শুধালেন চন্দ্রিকাকে—দাঁতাল কাঁহা হ্যায়?

ড্রাইভার চন্দ্রিকা জানায়— বৈকালমে জামুইকা তরফ থে।

উধার চলিয়ে।

মিঃ রাই গজদন্তওয়ালা হাতিই দেখাতে চান।

ন্যাশনাল পার্কের আশপাশেব রাস্তার দুধারে থাম করা তাতে আংটায় চেন লাগানো, অন্যদিকে তালা বন্ধ করা! চাবি নিয়ে এরা তালা খুলে রাস্তা পার হয়ে আবার তালা এঁটে যায়। চোরা শিকারীদের জিপ ঠেকাবার জন্যই এসব করা। আব এ জঙ্গলে পায়ে হেঁটে রাতেরবেলায় শিকার করার দুঃসাহস বিশেষ কারো হবে না। এদের সাবধানী দৃষ্টিও রয়েছে তাই চোরা শিকার এখানে নেই।

জিপটা চলেছে পাহাড়ের নীচের দিকে, জঙ্গল এখানে ঘোরতর। আবও জমাট অন্ধকার নামে এখানে।

সীমা বলে — আবার চলেছি কোন্ দিকে?

মিঃ রাই বলেন— চলিয়ে, মিল যায়েগা তো থোড়া সার্কাস দেখ লেঙ্গে, ডরিয়ে মৎ।

রঞ্জন গাড়ির ভিতরে সেঁটে বসেছে। সে বলে ওঠে,

— আবার হাতি নাকি মিঃ রাই। ও তো দেখলিয়া— দুসরা কুছ দেখাইয়ে।

কথা শেষ হবার আগেই গাড়িব আলোয় দেখা যায় তেলগোল নধর একটা গোলগাল দাঁতওয়ালা হাতিকে, মাকনার মত বড় নয়, তবে সুন্দর। ব্যাটা হঠাৎ গাড়ি দেখেই সোজা দৌড় শুরু কবে গাড়ির দিকে, নধর দেহ মাথাটা দুলছে একবার এদিক একবার ওদিকে আর তেড়ে আসছে সিধে গাড়ির দিকেই।

রঞ্জন, শঙ্কর হাঁক পাড়ে— গাড়ি ব্যাক কবোজী। এ চন্দ্রিকাজী।

আমিও কাঠ হয়ে গেছি। সীমা ভয়ে একসঙ্গে দুটো হাত দিয়ে আমাকে কাছে পেয়েই জড়িযে ধরেছে। সামনে ওই গজদন্ত ওয়ালা হাতিটাকে দেখছি স্পষ্ট লাইটের উজ্জ্বল আলোয়। আব ভযে ওব রূপ দেখে বুক কাঁপছে।

সীমার দেহের প্রকল্প পেলবতাকে অনুভব করার মত মন নেই। সামনে কালো ছায়ার মত ছুটে আসছে হাতিটা, জিপের নড়ার নাম নেই— দাঁড়িয়ে গেছে। হাতিটা এসে যেন এই নিমেষেই প্রচণ্ড ধাক্কায পাহাড়েব নীচে গড়িয়ে দেবে আমাদের। ওই হিমশীতেও গা হাত পা ঘামছে মৃত্যু ভয়ে।

হাতিটা কিছু দূরে এসে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ে এবার শুঁড় আপসাচ্ছে আর ওই মাকনার মত পা ঠুকছে, যেন জিপটাকে চ্যালেঞ্জ করছে এর পরই পাঁয়তাড়া কসে নোতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়বে জিপেব ওপর। তারই জন্য সময় নিচ্ছে।

সীমা কি বলার চেষ্টা করে। শঙ্কবের সাহসের বেলুন ফেটে গেছে। ও বলে—

ব্যাক কর লিজিয়ে মিঃ রাই ক্যা করতে হেঁ চন্দ্রিকাজী?

মিনিট কয়েক ধরে হাতিটার এই লীলা চলছে, চন্দ্রিকা সিং এবার থেমে থাকা জিপটার এক্সিলেটারে চাপ দিতে জিপের ইঞ্জিন গর্জন করে ওঠে গোঁ -গোঁ -গোঁ।

ওমা পিছনের দিকে নয় জীপটা চলছে ওই হাতিটার দিকেই এগিয়ে, শিউরে উঠি— ক্যা করতা হ্যায় জি?

চন্দ্রিকা সিং জিপটার সগর্জনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ওই হাতিটার দিকে, ব্যাটার লাফ ঝাঁপ থেমে গেছে, জিপটাকে গর্জন করে এগিয়ে আসতে দেখে কৌতূহল ভরে চাইল, পর মুহূর্তেই লাফ দিয়ে সোজা অ্যাবউট টার্ন করে যে গতিবেগে ধেয়ে এসেছিল তার চেয়ে বেগে সটান দৌড়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল রণক্ষেত্র ত্যাগ করে।

এতক্ষণ ধরে শরীরের প্রতিটি তন্ত্রী যেন টানটান হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ সেগুলোর সহজ অবস্থা ফিরে আসে প্রচণ্ড হাসির ধমকে, হাসছি সকলেই। মিঃ রাই বলেন,

— সার্কাস দেখা জী? পাঁচ ছ'বরষ উমর উস্‌কো।

সার্কাসই বটে, শুধোই।

এখন না হয় ভয়ে এগোলো না যদি আরও বড় হয়ে ভয় ভেঙ্গে যায়, তাহলে তো আক্রমণই করবে কোনদিন।

মিঃ রাই বলেন — আউর বড়া হোনেসে উস্‌কো দিমাগ্ ঠাণ্ডা হো যায়ে গা, উ ধীর স্থির হোগা। উতো বচপন্‌কা খেল হ্যায়। ছেলেবেলার চ্যাংড়ামিই বলা চলে একে।

গাড়িটা চলছে। মাঝে মাঝে ইঞ্জিন বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি বনের গভীরে। অন্তহীন স্তব্ধতার রাজ্য, আকাশভরা তারার মেলা, সারা দৃষ্টি যেন কোন অব্যক্ত চেতনার গভীরে হারিয়ে গেছে। নিঃসঙ্গ আমি সেই প্রচ্ছন্ন কোন মায়াজগতের পথে নিঃশেষ হয়ে গেছি। চেতনাহীন একটি অনুভূতি সব কিছুকে অভিভূত করেছে।

এই শান্ত সমাহিত ধ্যানলোককে স্পর্শ করার জন্যই যেন হারিয়ে যেতে চাই, ভুলে যেতে চাই নিজেকে। চেতনাতীত কোন নীলাভ আলোর দ্যুতি জাগে, স্তব্ধ বাতাসে শব্দ উঠে খটা - খট্ - খট্ অনেকগুলো পাথর ঠোকার শব্দ, আর ছড়ানো নীল বিন্দুগুলো প্রোজ্জ্বল অস্তিত্ব নিয়ে এগিয়ে আসছে।

স্পটটা জ্বলে ওঠে, মিঃ রাই বলেন — বাইসন!

একদল বাইসন যেতে যেতে হঠাৎ আলোর ঝলকে থেমে দাঁড়িয়েছে। সাদাটে রঙের ছোট বাচ্চাও রয়েছে, বিশাল বুল বাইসনটা ওপাশে দাঁড়িয়ে, পায়ের নীচের দিকটায় সাদা রোঁয়া, আর দু-চোখের ভ্রু ওদের সাদা, এক জোড়া সুগঠিত শিং আর বিশাল দেহগুলো তেল চকচকে মসৃণ আর নধর। পায়ে যেন সাদা মোজা পরা।

অন্য একটা বুল বাইসন সামনের বাস্তার উপব দাঁড়িয়ে আছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখছে আমাদের জীপটাকে, রাস্তার দুপাশে অন্যান্যগুলো চরছে।

যেন শান্ত নিরীহ জীব, কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে শুধু দেখছে আমাদের অবাক হয়ে।

জিপটার হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাটারি থেকে স্পটলাইট জ্বালার ফলে ব্যাটারি বোধহয় ডাউন হয়ে গেছে, সেলফ্ নিচ্ছে না। জিপ অচল হয়ে যেতে মিঃ রাই বলেন—

থোড়া ঠেল দো সিংজী জিপকো।

অর্থাৎ তিনদিক ওই বাইসনের দল তার মাঝে জীপ অচল হয়ে গেছে, নেমে ঠেলতে হবে এইবার। ডি-এফ-ও মিশ্র সাহেবের কথা মনে পড়ে । তিনি বলেছিলেন, বাইসন এমনিতেই খুব হিংস্র জীব, এখানের বনে যা দেখবেন সেগুলো ঠিক বাইসন নয়, গাউর বলা যেতে পারে, বুনো মোষের দিকে নয় এদের স্বভাব কিছুটা গরুর মতই। তবু এরাও অন্য বনে হিংস্র।

কিন্তু কথায় বলে শৃঙ্গী, তায় বুনো। আর জিপটা কিনা এই সময়ই বন্ধ হয়ে গেছে। ওরাও নড়েনি, যেন মহড়া নিয়ে রয়েছে।

সারান্দার জঙ্গলেও দেখেছি এদেরই। সেখানে এরা আরও মারমুখী, জিপ দেখলে ফুঁসে ওঠে। ঘাড় কাৎ করে শিং পেতে তৈরী হয়, পা ঠোকে। পাথরে খুর ঠুকে আগুনের ফিন্‌কি তোলে।

এখানে এদের দেখছি কিছুটা শান্ত, মিঃ মিশ্রের মতে এদের এখানে শান্ত স্বভাবের কারণ একটা আছে।

দেখলাম সিংজী নেমে জিপটা ঠেলতে লাগলো, দেখাদেখি নামতে যাবো, মিঃ রাই বাধা দিয়ে নিজেই নামলেন। একটু চেষ্টার পর আবার ইঞ্জিন স্টার্ট নিল— তখনও সেই বুল বাইসনটা দাঁড়িয়ে আছে, ওর হাবভাব ভালো নয়। অর্থাৎ এপথে এগোতে সে দেবেনা। চার্জ করবে গেলেই। জিপটা ব্যাক করিয়ে আমরা অন্য পথ ধরলাম ওকে সমীহ করে।

মিঃ রায় বলেন —

উ চার্জ করনেকো লিয়ে তৈয়ার থে। উস্‌কো কুছ না বোলো কুছ নেহি বোলেগা, আগর টক্কর দেনে চাহে গা তো উভি টক্‌রায়ে গা জরুর। জঙ্গলকা ইয়ে কানুন হ্যায় জী। হাতি ভি বাঘকো ইজ্জত দেতা হ্যায়,

বাঘভি হাত্তিকা মানতা। এক-দুসরাকো এরিয়াপর নেহি জায়েগা।

কিছুটা তাদের সহ্যের সীমা আছে। তাকে বলা হয় লিমিট অব টলারেন্স। তার সীমা পার হলেই চার্জ করার জন্য সে তৈরী ছিল। বনের প্রাণীরাও সহজে কেউ কাউকে ঘাঁটায় না।

জঙ্গলের এই সহ অবস্থান নীতি বনের পশুরাও মেনে নিয়েছে। এদের জগতে রয়েছে সুষ্ঠ নিয়ম-শৃঙ্খলা বোধ যা আজকের সভ্য জগতে নেই।

তাই মেটিং সিজনে বাইসন জোড়ায় দল থেকে সরে যায়, ছোট বাচ্চা জোয়ানদের সঙ্গে এক দলে থাকে না সেই সময়। ওরা আলাদা থাকে, মেটিং সিজন শেষ হলে আবার দলে ফিরে আসে। এই সময় দলের পাহারায় থাকে এক একটা বুল বাইসন।

প্রাণীজগতেও অলিখিত নিয়মকানুন আছে। মাংসাশী আর তৃণভোজী প্রাণীদের কানুন রীতি-নীতি আবার স্বতন্ত্র। মিঃ রাই দীর্ঘদিন এই প্রাণীজগতকে দেখেছে, আর তার কথাগুলো আমার সামান্য জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী।

জিজ্ঞাসা করি — দলের তো একজন সর্দার, কিন্তু দেখলাম হাতি বাইসনের দলে একাধিক পুরুষ হাতি, বাইসনও রয়েছে।

মিঃ রাই কথাটা শুনে বলেন,

— তাতো থাকবেই। তৃণভোজী প্রাণীরা দল বেঁধেই থাকে আর দলে মেয়ে পুরুষও থাকে। কিন্তু সেখানেই একটি অলিখিত নিয়ম রয়ে গেছে। দলের মধ্যে বিভিন্ন পুরুষ হাতি, কিংবা পুরুষ বাইসনের নিজের নিজের ক্ষমতা অনুসারে এক একটা পজিশন থাকে দলে। সবচেয়ে যে বেশী শক্তিশালী সেই হবে দল নেতা। তারপর শক্তি সামর্থ্য অনুসারে থাকবে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ইত্যাদি। সেটা নিজেদের মধ্যে ওরা ঠিক করে নেয় আর সেটা মেনে নিয়ে থাকে ওরা।

কিন্তু গোল বেঁধে যায়, কেউ যখন দলের নেতা হতে চায়। তখনই ওই দলনেতার সঙ্গে সেই নোতুন নেতার যুদ্ধ বেধে যায়। দুটো বাইসনের মধ্যেও লড়াই বাধে নেতৃত্বের জন্য। আর কেউ তাতে যোগ দেবে না। দুজনে লড়ে যে হেরে যাবে তাকে আর দলে থাকতে দেবে না। তাকে 'হটা বাহার' করে দেবে।

হিংস্র বুড়ো কোন বাইসন বা হাতি এভাবে দলছুট হয়েই 'গুণ্ডা' হয়ে যায়। তখন সে একা একা ঘোরে আর মানুষের ক্ষতি করে। নির্জনেই কোথাও হয়তো নিঃসঙ্গ মৃত্যুবরণ করে।

— আর ছোকরাটা যদি হেরে যায়? শঙ্কর প্রশ্ন করে।

মিঃ রাই বলেন — তাকেও দলের বাইরে চলে যেতে হয়। কিন্তু সে আবার নোতুন তাগদ নিয়ে দলপতির উপর হামলা করে। জিতে গেলে সেই দলপতি হয়।

তবে মাংসাশী প্রাণী বাঘ চিতাবাঘ সিংহদের ব্যাপার আলাদা। তারা স্বতন্ত্র থাকে নিজের নিজের এলাকা নিয়ে। সেখানে অন্য কেউ এলে লড়াই বেধে যায়। বাঘ বাঘিনীও একসঙ্গে থাকে না। কেবল মেটিং সিজনে একত্রে দু'দশদিন থাকে। তারপর আবার সরে যায়।

— আর ভালুক?

মিঃ রাই বলেন— বনের সবচেয়ে ইতর আর হিংস্র জন্তু ওই ভালুক। ওরা শাকপাতা কন্দমূল খায় মাংস খায় না। কিন্তু প্রাণীদের রক্ত খায়। আর বদবুদ্ধি, জেদ ওদের বেশী।

জিপটা চলেছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বোধহয় কোন পাহাড়ের মাথার দিকে রয়েছি। জঙ্গল এখানে অপেক্ষাকৃত পাতলা। ছোট ছোট কিছু বাঁশবন দুচারটে বনজামের গাছ আর চারিদিকে গজিয়েছে বুকভোর ঘাসের জঙ্গল। দু' একটা তিরতিরে ঝর্নাও বয়ে চলেছে।

বনের অন্য একটা অঞ্চল। যথারীতি গেটের তালা খুলে ঢুকতে হয়েছে। এদিকে স্পট লাইটটা ন্যাড়া পাহাড়ের পাথুরে গুহার মুখে আটকে গেল, হলুদ কালো ডোরা কাটা একটি রেখা তির্যক গতিতে সরে গেছে দেখলাম, কানে আসে চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন, মিঃ রাই বলেন ফিসফিসিয়ে — অমর। মেল টাইগার।

দেখা যায় না। ওর চাপা গর্জন কানে আসে।

বনে বাঘ দেখা একটু কঠিন ব্যাপার। ওদের মতো চোখের দৃষ্টি- ঘ্রাণশক্তি আর কোন জাতের নেই। আর আছে সাবধানী চতুর মন। হাতি তার তুলনায় অনেক গোঁয়ার, বাইসন বোকা ধরনের। তাই অন্য সব প্রাণীর দেখা মেলে; বাঘের দেখা মেলা কঠিন।

মিঃ রাই বলেন— পালামৌ ফরেস্ট প্রায় আঠারো বিশঠো টাইগার রহতা হ্যায়।

বাঘ বাঘিনীও মেটিং সিজন ছাড়া একত্রে থাকে না, নিজের নিজের এলাকা বানিয়ে সেই সীমাবৃত্তের মধ্যেই থাকে। পালামৌ -এর অরণ্যে ওদের সংখ্যা সারা বিহারের মধ্যে বেশী, আর প্রধান বাসস্থান বড়ষাড় অরণ্য। লাত অরণ্যে হাতির রাজ্য— বড়ষাড়ও হাতি বিশেষ করে বাঘের রাজ্য, তাই এবার দশ লক্ষ টাকা খরচ করে ওখানে টাইগার প্রজেক্ট গড়ে উঠেছে।

বাংলার বনাঞ্চল এবং বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণের কর্মকাণ্ডের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে মনে হয় বিহার এ বিষয়ে অনেক সচেতন।

আমাদের সুন্দরবন এলাকাতেও ঘুরেছি, কিন্তু সেখানে বাঘের সংখ্যা সঠিক কতো তা আজও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি, অথচ মনে হয় বাঘের প্রাচুর্য সেখানেই বেশী। অথচ টাইগার প্রজেক্ট ট্যুরিস্ট সেণ্টার এসব সেখানে গড়ে তোলার যে তেমন কোন সার্থক প্রচেষ্টা হচ্ছে তা চোখে পড়েনি দু' একটা জায়গা ছাড়া। নিষ্ঠাবান কর্মচারী কিছু দেখছি বাংলার বনাঞ্চলে কিন্তু তারাই যেন বাধ্য হয়ে হাত গুটিয়ে রয়েছেন কর্তৃপক্ষের কর্মনীতির অভাবে।

রাত বাড়ছে। শীতের হিম হাওয়া মাথার বাঁদুরে টুপি ফুঁড়ে কানে মুখে লাগছে ধারালো ছুরির ফলার মত। স্পটের আলোটায় আকাশের অনেক তারার টলটলে চাহনি ধরা পড়েছে।

ঝকঝক করছে চিতল হরিণের চোখ, একপাল হরিণ অবাক বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট-এর বোর্ডে কি লেখা দেখেছি বনের এখানে ওখানে। হেডলাইটের আলোয় লেখাটা ঝকঝক করছে।

Cast not thou greedy look
To my Flesh,
Read the poetry in my eyes.

হিংসা নয় অন্য দৃষ্টি নিয়ে ওদের নীলাভ চোখের তারার নিষ্পাপ চাহনি দেখলে মনে হয়

পশ্য দেবস্য কাব্যম্ ।
ন মমার,
ন জীর্জতি।

দেবতার এই মহাকাব্যের মৃত্যু নেই, জরা নেই। ওদের চোখে নীরব মমতার সন্ধান। সীমা কলকলিয়ে ওঠে,

—দেখেছেন ওদের চোখগুলো?

ওরা নিরাপদ নির্ভয়ে আবার ঘাস খেতে থাকে, কোন একটা বাচ্চা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে জিপের দিকে। মানুষের হিংস্রতার খবর ওরা জানে না, তাই নির্ভয়ে অভয়ারণ্যে ওরা বসতি গড়েছে।

খট্ খট্ খটাস!

আবছা অন্ধকারে শব্দ ওঠে, যেন লাঠিতে ঘা পড়েছে।

— ধ্যাত্তেরি! স্পট পড়তে মিঃ রাই চিৎকার করে ওঠেন।

দুটো শিং-ওয়ালা মদ্দা হরিণ সদাপে লড়ছে, লড়াই-এর অবসরে ছাড়ানো শিংগুলো মাটিতে ঘসে নিয়ে আবার এ ওর শিং-এ সপাটে ঘা মারছে। মদ্দা হরিণগুলো যেন মেতে উঠেছে ওই খেলায়।

মেটিং সিজন শুরু হলে দলের নাগর নির্বাচিত হয় এমনি লড়াই-এর মধ্যে, অবশ্য অন্য হরিণগুলোর

ওদিকে নজর নেই। তারা ঘাস খাচ্ছে, না হয় গাছে ঝোলানো নুনের ব্লক ফর্মাগুলো চাটছে। বন থেকে জন্তুদের জন্য নুন রাখা হয়।

অনেক রাত্রি। জিপটা বের হয়ে এলো বন থেকে, দূরে রাস্তায় হাতি খেদানো পার্টির দু'একটা কাঠের গুঁড়ির লালাভ আগুন জ্বলছে।

এতক্ষণ যেন বন নয় স্বতন্ত্র এক রূপরাজ্যে হারিয়ে গেছলাম। সেই জগতের সঙ্গে মানুষের লোভ হিংসা আর লালসার বিকৃতিভরা পরিবেশের কোন মিল্ নেই। আজ সেখানে ভালোবাসা, মমতা, কর্তব্যবোধ নিয়মানুবর্তিতা যার ধারা আদিমকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে সেটা রয়ে গেছে। মানুষ সভ্যতার নামে আজ তার প্রাণ-প্রবাহকে বিকৃত করেছে, ওই আদিম জীব-জগতে সেই বিকৃতি আজও ঘটেনি। তাই সহাবস্থান নীতিতে তারা বিশ্বাসী। শুধুমাত্র প্রাণধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনে হিংসা সেখানে আছে— কিন্তু অতি লোভ লালসার স্পর্শে সেই হিংসা তাদের জগতকে আতঙ্কময় আর বিকৃত করেনি। প্রবঞ্চনা সেখানে অনুপস্থিত, আছে মুক্তির অবাধ আশ্বাস।

মন বলে—এই ছিল আগেকার মানুষ সমাজ, আজ পুঁজি বাড়াবার নেশায় সব হারালি।

সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। ভাবনার খেই মেলেনা। শান্ত সুন্দর একটি জগতকে দেখে মানুষের জগতের কথাটা মনে পড়ে। সেখানে সব হিসেব আজ গোলমাল হয়ে গেছে ওই পুঁজি বাড়াবার লোভ আর লালসার।

আমার লোভী মনও তাই পাওয়ারপুঁজি বাড়াতে ওই জগতে গিয়ে ভেবেছিল কি পেয়েছি। মন বলে—

হিসাব জুড়িস না, এই অনুভূতির সবটুকুই হারিয়ে ফেলবি। লোভের জগতে সত্যের ঠাঁই নেই। তুইও লোভী তাই নুনের পুতুল সমুদ্রে মাপার ঠকবাজি করতে যাস্‌নে।

— কি? কেমন লাগলো?

মিঃ রাই-এর চোখে-মুখে খুশীর আভাস। এই ওদের নিজেদের সাধনার গড়া জগৎ , তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রয়োগ কতটুকু জানি না, তবু তাঁরা যে একটা অতীতের হৃত সাম্রাজ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন সব সাধনায় সেটা বুঝতে পারি। ওর কথার জবাবে বলি,

— এই জগতকে বাঁচিয়ে রাখার সার্থকতা আছে মিঃ রাই। হিংসা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মানুষ হয়ত একদিন এদের সমাজজীবনকে দেখে নিজেদের হারানো পথের সন্ধান পাবে। এদের দেখে মনে হয় পশু এরা নয়, মানুষ নিজেদের প্রভুত্বের জোরে এদের এদের পশু বলে, আসলে মানুষ নৈতিক দিক থেকে এদের অনেক নীচে নেমেছে। তাই নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে কায়েম রাখতে এদের মেরে শেষ করে দিতে চায়।

— সচ্ বাত। মিঃ রাই কথাটা ভাবেন গভীরভাবে। উনি বলেন,

— রাতে জঙ্গল দেখলেন, দিনে জঙ্গলের রূপ আলাদা। দিনে, বৈকালে, রাতে এর এক এক রূপ। কোই রোজ দিনমে আইয়ে, ফোর্ট কমলদহ ভি দেখনা। একরোজ টাইগার ভি দেখলানে কোশিষ করে গা। বাঘ দেখানোর চেষ্টা করবো।

আমাকে রঞ্জন বলে— ও দেখে আর কাজ নেই। তুমিই যেও প্রভু। বাঘ ফাঘ দেখার সখ আমার নেই বাবা!

বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছি। রঞ্জন অলোক চলে গেছে খাবার ওখানে। সীমা স্তব্ধ নির্বাক হয়ে আসছিল।

ও বলে— এ সব সেদিন দেখিনি। এত ঘুরিনি। সহায়বাবু বলেন। ঘুরলেই টাকা লাগবে, কি দরকার? এসব চিড়িয়াখানাতেই দেখা যায়। কিন্তু আজ সে ভুল ভাঙলো, নোতুন কিছু দেখলাম। নোতুন একটা জগৎকে চিনলাম।

ওর চোখে মুখে খুশীর আবেশ জাগে। আজ রাত্রির এই জগৎ ওর মনেও সাড়া তুলেছে। সীমা বলে,

— কাল সকালে যাচ্ছি কিন্তু ওই কেচ্‌কী বাংলোতে?

অবাক হই— সাহস বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু?

— আমিও অবশ্য কাওয়ার্ড নই! সীমা হালকা স্বরে জানায়,

— তাছাড়া পরাধীনও নই তাই যাবো ঠিক করলাম।

— বীরঙ্গনা? আমি মন্তব্য করি।

হাসি থামিয়ে সীমা বলে— কলকাতার জনারণ্য এই অভয়ারণ্যর মত নিরাপদ নিশ্চয় নয়। সেখানে যখন খেটে খেতে হয় তখন ভাবতে পারেন ভীতু নিশ্চয়ই নই।

অন্ধকারে ওর কালো চোখের তারার প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে। সীমা বলে — আজ আপনাদের সঙ্গে ঘুরে লোভ বেড়ে গেছে সত্যিই। অনেক কিছু দেখার লোভ। তাই কাল যাবো।

দুজনে ফিরছি কটেজের দিকে। দু'একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে। কটেজের কাছে আবছা আলো আঁধারিতে দেখা যায় একটি ছায়ামূর্তি পায়চারী করছে, পরনে ওভাব কোর্ট, টুপি আমাদের দেখে এগিয়ে এল সহায়বাবু। আমাকে দেখে একটু কড়াস্বরে বলে ওঠে সীমাকে,

— এত রাত অবধি কোথায় ছিলে? চারিদিকে গহন বন, হাতি ঘুরছে, আব না বলে না কয়ে হুট করে চলে গেলে? বেশ যা হোক?

সীমা ওর কথায় জবাব দিল না। গম্ভীর হয়ে ওর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সহায়বাবু যেন আমাকেই সালিশী মানার ভঙ্গীতে বলে,

—দেখুন দিকি মশায়, একবার বলে যাবি তো? তা বলতে গেলাম অমনি রাগ হয়ে গেল। ওর মা কত ভাবছে।

আমি জানাই,— তাই নাকি? সত্যি ভুল কবেছিল ও তাহলে।

সহায়বাবু এবার মোচড় দিয়ে ওঠে,

— আর অপনারাও জেনেশুনে ওকে নিয়ে গিযে ঠিক করেন নি। মেয়ে তো অমনিই— আপনারা তো সে খবরটা জেনে নিয়ে যাবেন।

রঞ্জনের হাঁক শোনা যায়— আইয়ে জনাব। খানা ঠাণ্ডা হো জায়গা? জলদি।

এগিয়ে যাই রান্নাঘরের দিকে।

রঞ্জন কাছে যেতে বলে ওঠে— নটবর আর কি? বলি খাওয়া কি সিকেয় উঠবে? জোটেও মাইরি! কেষ্ট ঠাকুরের গোপিণীর অভাব হয় না।

—থামবি রঞ্জন? ওকে ধমক দিই।

— রসুইদার ভিখন রুটি বানিয়েছে, আজ তার রান্নার প্রথম দিন। রুটির সাইজ একেবারে ইয়া ইয়া, আর পুরু প্রায় আধ ইঞ্চিটাক, তৎসহ বেগুনের ঝাল, তা ঝালের গুণে জিবে ঠেকানোর উপায় নেই আর ডাল পড়ে রয়েছে কাপের তলে। উপরে রয়েছে জল। বলি,

— খাবো কি করে ম্যানেজার? এই দেখাশোনা করছো?

রঞ্জনও ঘাবড়ে গেছে। শঙ্কর খায় একটু বেশী। সে বলে,

— এ তো পাথর বাবা, এ খেলে কাল আর নড়তে হবে না।

— ভিখন অবশ্য নির্বাক সলজ্জ নয়নে চেয়ে আছে। অলক বলে,

— আরও পাতলা করবে রুটি, ভাত রাঁধতে জানো তো?

ভিখন ঘার নাড়ে। তবে বুঝেছি ওর রান্না খেতে গেলে নিজেদেরই হাত লাগাতে হবে।

রঞ্জন বলে — আজ খেয়ে নাও বাবা, কাল দেখা যায়েগা।

এখানে এককালে ছিল মোঘলদের প্রতিপত্তি।

তাই ছোট এই নদীর নাম ঔবঙ্গা। বোধহয় বাদশাহ ঔবঙ্গজেবের নামটাকে অমর করার চেষ্টা করেছিল

তার কোন মনসবদার। তাদের মহামান্য বাদশাহের নামটাকে চেয়েছিল কালপ্রবাহ ধারায় মিশিয়ে রাখতে, তাই জনপদ নদীর সঙ্গে তাদের নাম গেঁথে রেখে গেছে এখানেও।

পালামৌ- এর আদি রাজারা ছিল সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। এরা অযোধ্যার রামচন্দ্রের সভায় বংশী বাদন করতেন, সেই সুবাদে রামচন্দ্র তাদের এই অরণ্যভূমিতে রাজ্য প্রদান করেন। এরা তখন থেকে এখানেই বাস করেন।

কথিত আছে এদের অন্য এক গোষ্ঠী ছিল মহাভারতের ভীষ্মের বামপার্শ্বচর।

বৌদ্ধযুগেও পালামৌ রাজাদের উল্লেখ দেখা যায়, পালামৌ জেলার দক্ষিণে প্রায় ষাট মাইল দুরে রাজক্ষেত্র নামে একটি জায়গাকে অনেকেই কপিলাবস্তু বলে উল্লেখ করেন। বৌদ্ধযুগে পালিবোখ্‌রাকেই আজকের পালামৌ বলে অভিহিত করেন অনেকে। মোঘল আমলেও ছিল এই পালামৌ। এখানেও বাধে মোঘলের প্রতিষ্ঠা নিয়ে সংঘাত—

আর মারাঠা আমলেও পালামৌ -এর রাজাদের সঙ্গে সংঘাত হয়েছিল তাদের। বর্তমানে গারোয়ার কাছে মারাঠা বলে এখনও একটা বসতি রয়ে গেছে।

আমাদের জিপটা চলেছে কেচ্‌কী বাংলোর দিকে।

সীমা আজ সকালেই দেখি তৈরী হয়ে এসেছে। সহায়বাবু তখনও বোধহয় ওঠেনি! ওকে তৈরী হয়ে ব্যাগ নিয়ে আসতে দেখে বলি,

যাবে তাহলে সত্যিই কেচ্‌কীতে।

— সীমা জানায়— আপত্তি না থাকলে?

মেয়েটি সহজভাবেই এগিয়ে এসেছে। অলক বলে — রান্না করতে পারবেন তো? সঙ্গে ভিখন রয়েছে। তবে ও রান্নাই করে, খেতে পারবেন কিনা জানি না। কাল আমাদের হাফ নো মিল গেছে রাত্রে।

সীমা হাসছে— চল দেখা যাবে অন্ন জোটে কি না?

রঞ্জন এর মধ্যে মাথায় তেলকালাম সেরে বোরোলীন পেন্ট করে মাঞ্জা দেওয়া বাবু হয়েছে, ভদ্রমহিলার সামনে মেকি ভদ্রতার মুখোসটাকে মুখে যেন টেনে পরেছে, হয় তো নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায় ওই ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়ে।

সীমার মুখ টিপে হাসিটা নজড় এড়ায়নি।

ও কথা বদলাবার প্রসঙ্গে বলে রঞ্জন,

—ঔরঙ্গা নামটা এলো কি করে এখানে?

মোঘল আমলের ইতিহাসে পালামৌ একটা স্থান নিয়েছিল : তখন চেবো রাজবংশের রাজত্ব ছিল এখানে। চেরো রাজারা বলতেন তাঁরা নাকি মহর্ষি চ্যবনের বংশধর। বনজ প্রাণী আর ঔষধির বিশেষজ্ঞ ছিলেন চ্যবন, তাই চেরো রাজবংশেব প্রিয় বাহন ছিল হাতি।

দুর্গম বন পর্বতে তারা দুর্গ -প্রাসাদ গড়েছিলেন, শেরশাহের সেনাপতি খানওবাজ খাঁ ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে চেরো রাজ্য আক্রমণ করে। বহিঃশত্রুর সেই প্রথম আগমন, তারপর এল মোঘল বিপুল সৈন্য-বাহিনী নিয়ে। মানসিংহ নিজে এসে এখানকার স্বাধীন রাজা দুর্জনসালকে পরাজিত ও বন্দী করে নিয়ে যায় গোয়ালিয়র কেল্লায়।

দুর্জনসাল ছিলেন বিরাটদেহী পুরুষ, বিশাল একজোড়া গোঁফ নিয়ে বন্দী অবস্থাতেও রাজকীয় মর্যাদায় চলাফেবা করতেন। কথাটা সম্রাট আকবরের কানে যেতে তিনিও কৌতুহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে দুর্জনসাল জবাব দেন বাদশাহকে,

—রাজা রাজাই, বন্দী হয়ে থাকলেও সে রাজা।

আকবর বলেন— যদি সত্যিই আপনি রাজা তাহলে আমার জহুরীও পারেনি কিছু হীরে যাচাই করতে, কোন্‌টা সত্যিকার খাঁটি হীরে যদি চিনে দিতে পারেন তবে আমিও আপনাকে রাজা বলে মানবো। নইলে আজীবন বন্দী থাকতে হবে মোঘল দুর্গে।

দুর্জনসাল আকবরের কথা শুনে প্রশ্ন করেন,

— সত্যি বলছেন?

— সম্রাট আকবর সত্যি কথাই বলেন।

দুর্জনসাল-এর সামনে কিছু হীরা আনা হল। দুটো ভেড়ার শিঙে এক একটা হীরা বেঁধে তাদের লড়িয়ে দেওয়ার পরই দেখা গেল নকল হীরে দু'-একবার শিং ঠোকাঠুকির পরই ভেঙে গেছে, আসল-গুলোই অক্ষত রয়ে গেল।

সম্রাট আকবর হীরে চেনার এই পদ্ধতি জানতেন না। তিনি দুর্জনসালকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে তাকে তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আজীবন তারা মিত্র হিসাবেই বাস করেছিলেন।

এরপর দুর্জনসালের ছেলে সাহবল রাজা হলেন, মোঘল মসনদে তখন জাহাঙ্গীর। সাহবল ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি, তিনি বাবার মত মোঘলের বন্ধুত্বকে মেনে নিতে চাইলেন না, নজরানা পাঠানো বন্ধ করলেন দিল্লীতে। জাহাঙ্গীরও সসৈন্যে পালামৌ কেল্লা দখল করে সাহবলকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন আগ্রা কেল্লায় তার ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে।

স্বাধীনচেতা রাজা সাহবল সেদিন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বাজিই ধরেছিলেন, মুক্তি না হয় মৃত্যুর বাজি।

নুরজাহান-এর শর্ত — বাঘের সঙ্গে লড়াই করে যদি জিততে পারো তোমাকে সসম্মানে মুক্তি দেব, নয় তো তার হাতেই প্রাণ হারাতে হবে তোমায়।

মুক্তি চাও তো এই পথ বেছে নাও।

রাজা সাহবল সেই পথই বেছে নিয়েছিলেন।

আগ্রার কারাগারে তার মত মানুষ বন্দী থাকার কথা ভাবতেই পারেন নি। তার কাছে মুক্তিই ছিল সবচেয়ে কাম্য। প্রাণের চেয়েও বড়। তাই বাঘের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে মুক্তি চেয়েছিলেন তিনি। সেদিন কেল্লার মিনার থেকে বাদশাহ — বেগম— ওমরাহকুল দেখেছিল এক স্বাধীনচেতা রাজার প্রাণ নিয়ে খেলা, যে প্রাণের চেয়েও বেশী বড় করে দেখেছিল মুক্তিকে, তার জন্য মৃত্যুকেও তুচ্ছজ্ঞান করেছিল।

সেই বাঘের সঙ্গে যুদ্ধে রাজা সহবল বাঘকে নিহত করেছিল, কিন্তু নিজেও আহত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর তাকে বোধহয় রায় উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল। অবশ্য সাহবল তার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল না। তিনি মুক্ত হয়েছিলেন মৃত্যুর পরপারে।

চেরো রাজবংশের পরবর্তী রাজা উত্তরাধিকারীরা মোঘলের শাসন মেনে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেব এখানে নিজস্ব কেল্লাও তৈরী করান ওই পালামৌ অরণ্যে নদীর ধারে, সেই নদীর নামই ঔরঙ্গা। আর কেল্লাও রয়েছে এখনও। তবে সেটা বনে ঢাকা ধ্বংসাবশেষ।

সীমা বলে— কেল্লার দিকে যায় নি।

আমি জানাই,

—আমারও যাওয়া দরকার। একদিন যাবো। শুনেছি আমাদের কটেজ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বনের মধ্যে আছে সেটা।

কাঁচধার টলটলে স্বচ্ছ জল নিয়ে রূপালী বালুচর ভেঙে গিয়ে সামনেই ঔরঙ্গা মিশেছে কোয়েলের সঙ্গে, দুটো পাহাড়ের সবুজ চূড়ার ছায়া পড়েছে কোয়েলের জলে।

ছোটনাগপুর মধ্যপ্রদেশের ঘন বনাঞ্চলে দুটো নদী নেমেছে, দুটোর নামই কোয়েল। একটা গেছে সারান্দা বনের গা ছুঁয়ে দক্ষিণের মহানদীর দিকে, সেটা সাউথ কোয়েল। অন্যটা নেতারহাট যাবার পথ পার হয়ে পালামৌ হয়ে শোন নদীতে মিশেছে— সেটা এই নদী, নাম নর্থ কোয়েল। নর্থ কোয়েল আর ঔরঙ্গা, এই দুটো নদীর সঙ্গমে ঘন বনচ্ছায়ে কেচ্‌কী ফরেস্ট বাংলো। পাশে একটা কুয়ো, পিছনে ঘন অর্জুনগাছের বনের ফাঁকে কোয়েল ঔরঙ্গার বালুচর। এর মধ্যে রঞ্জন গাড়ি থেকে নেমে সৌমিত্র চ্যাটার্জীর পোজে কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে বলে—

একটা ছবি নে অলক। এটা বেশ সিপিয়া কালারে বাঁধিয়ে রাখবো। প্লিজ নে ফটোটা।

অলক বলে — সীমাদি আপনিও দাঁড়ান।

রঞ্জনের ফর্সা মুখ লালচে হয়ে যায়। সীমা ওব অবস্থা দেখে হেসে ওঠে কলকলিয়ে।

— কি হল? অ রঞ্জনবাবু?

— মানে? রঞ্জন ঢোক গিলছে।

অলক বলে— ওই ছবি দেখলে বৌদি তুলো ধোনা করে দেবে না?

— ওমা! তাই নাকি? সীমার খুশির বাঁধ ভেঙেছে। রঞ্জন গজরায় অলকের উদ্দেশ্যে।

— থাম রাস্কেল কোথাকার। ওর কথা শুনবেন না।

সীমা ব্যপারটাকে সহজ করার জন্য বলে— তাহলে সকলে মিলেই তুলি ছবিটা!

রঞ্জন একটু ক্ষুন্ন হয়। তার খুবই বাসনা ছিল ওই লোকেসনে সৌমিত্রবাবুর পোজে একটা ছবি তুলে বন্ধু-বান্ধবদের দেখানোব, কিন্তু অলকের জন্যই তা হল না।

তাই আড়ালে বলে রঞ্জন — দেখ না— অলোকের কথাবার্তা। একটা মেয়ের সামনে অপমান করবে আমায়? এ্যাঁ। ভেরি ব্যাড।

ভিখন ততক্ষণ ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদারেব সঙ্গে উনুনে আগুন দিয়েছে। রঞ্জন ফর্দ করে দেয়—

ভাত, আলু-কপির তরকারি, লেওকিব ঝাল, ডাল আউর মছলি মিলে তো ব্যস! অলক স্যালাড বানাবি বুঝলি।

লেবুর অভাব নেই। বাংলোর পলিমাটির বাগানে পেয়ারা, লেবুও বয়েছে। সীমা কোত্থেকে একটা বিবাট পেঁপে এনেছে ইতিমধ্যে। জানায়,

— জমাদাবের বৌ-এর কাছ থেকে আনলাম। সরো দিকি কি কুটছো? ওমা এননি ডাব ডাব করে লাউ কোটে না কি? আরে ডালে জল দেও এ ভিখন! মরণ! যেমন আপনাবা, তেমন বাঁশকাটা রাঁধুনি এনেছেন দেখছি?

ওখানের আদিবাসীদের অধিকংশই ঠিকাদারের মজুর হয়ে বাঁশ কাটে, ভিখনকে কদিন বাঁশকাটা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন মিঃ রায় আমাদের সাহায্য দিতে।

আমি সার্টিফিকেট দিই,— ভালো রাঁধে ভিখন! ঘবে রাঁধার কেউ নেই তো তাই সবাই ভালো বাঁধে।

সীমা উনুনের ধোঁয়ায় জলভরা চোখ তুলে বলে,

—দুঃখ হচ্ছে তার জন্য? আমি শুনেই সীমাকে.

হাসে সীমা— দুঃখে চোখ জলে ভরে উঠেছে দেখছেন না? ওমা টিফিন বুঝি এ্যাই? হায় ভগবান।

এখানে দোকানপশার কিছুই নেই। মাইল খানেক দূরের ষ্টেশনে পাঠিয়েছিলাম চৌকিদারকে, সেখানে নাকি নিমকিন্ মেলে। তা ওসব কোথায়? ও এনেছে গামছায় বেঁধে দু'টাকার মকাই ভাজা। শঙ্কর, রঞ্জন, অলক বের হয়েছে নদীর বিস্তীর্ণ বালুচর ভেঙে ওদিকে, যদি মাছের সন্ধান মেলে।

সীমা বলে— ওমা ওন্‌লি মকাই ভাজা? এই দল্যাপিণ্ডি ভাত, লাউ-এর কাবাব, গুচ্ছের পেঁয়াজ দিয়ে লাঞ্চ, আর মকাইভাজা টিফিন, জোর পিক্‌নিক্ যা হোক, এইখান বুঝি কলকাতা?

ওর কথায় জানাই,

— এরই জন্যে তো রাঁধার লোক কেউ নেই বাড়িতে।

সীমা হেসে ওঠে— জুটবে তার আশাও নেই।

সীমা নিজেই মকাইভাজা মুখে দিয়ে বলে—

ফার্ষ্টক্লাস! এ্যাঁ খুব টেষ্টফুল তো? একটু সরষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা হলে জমবে দারুণ।

— সেকি! ভালো লেগে গেল যে? বলে উঠি,

—সীমা যেন তার শহুরে বাঁধন খোলসটাকে ফেলে এই বন্য সবুজ রূপালী পরিবেশে সহজ হয়ে ওঠে। বলে,

— ওসব কথায় রাগ করেছেন বোধহয়?

হাসলাম— ইচ্ছে করলেও এখানে আর কিছু পাবে না। তাই একেই মেনে নিতে হবে। আর সভ্য জগত থেকে বাইরে এসেছি এখানে ওই সভ্য জগতের আহার পাবো এটা ভাবলে তো চলবে না।

খিদের মুখে এসব খারাপ লাগবে না। আর এখানের এই সব খাদ্য — খেয়ে দেখো। ভালোই লাগবে এই পরিবেশে।

সীমা ডাগর চোখ নামিয়ে বলে,

— সত্যি, খুব ভালো লাগছে। অপূর্ব জায়গা, খাবার মন এখানে থাকে না, লোভটাও উবে যায়। এখানে ছড়ানো রয়েছে আরও অনেক কিছু যার সন্ধান এর আগে জানতাম না। জীবনটা ছিল শুধু একঘেয়ে আর বৈচিত্র্যহীন।

ওর কথায় জানাই— এই স্বাদটুকু মনের উপব বেদনাই আনবে সীমা।

— কেন? সীমার দুচোখে প্রশ্ন জাগে।

— হয় তো মনে পড়বে কলকাতার সেই দিনগুলোর মাঝে এমনি ছায়ানামা কোয়েলের তীরের বাংলোর কথা।

সীমা চুপ করে ভাবছে। বলে— যদি ভুলতে না পারি সেটা কি দোষের হবে?

জবাব দিলাম না। ওর নিবিড় সান্নিধ্যে এই ঘরোয়া রূপটিকে দেখেছি। ওরা এমনই। নিজেদের বিভিন্ন রূপে যেন মানুষের চিন্তায় ছড়িয়ে রেখেছে যাদেব চেনা যায় না। কাছে থেকেও দূরে রয়ে যায়।

রঞ্জন, অলক, শঙ্কররা ফিরছে শূন্য হাতে নদী থেকে।

— মাছ পেলাম না। পোড়া দেশে মাছ নেই। রঞ্জন বলে।

অলক তেল মেখে স্নান করার জন্য দল বেঁধে নদীর বালিয়াড়ির দিকে চলেছে। রঞ্জনও যাবার মুখে খবরটা দেয়।

সীমা বলে— দরকাব কি? যা হয়েছে তাতেই হবে।

ওরা বালিতে দৌড়াদৌড়ি করছে। ঔরঙ্গার সবুজ বনপাহাড়ের মাঝে যোগসূত্র ওই ব্রিজের উপর গুম গুম শব্দ করে একটা মালগাড়ি চলে গেল।

সীমা-বিহুল দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—ব্রিজ অন্ দি রিভার কোয়াই মনে পড়ে? এ যেন তেমনই জগৎ।

— স্নান করবে না? আমার কথায় সীমা বলে,

— করবো বৈকি।

— তা হলে বলেদি, বাথরুমে চৌকিদার জল তুলে দিক্!

— মানে? নিজেরা চললেন নদীতে আর আমি নাইবো সিনেমা মার্কা কুয়োর জলে ওই বদ্ধ ঘরের মধ্যে?

সীমা কি ভেবে বলে— আপনারা ওদিকে যাচ্ছেন, আমি ওই বনের পাশেই নাইবো।

— অজানা জায়গা! জলে নামবেন।

হাসছে সীমা— ভয় নেই। ডুবন জল সারা নদীতে নেই। আর ডুবে মরার ইচ্ছেও নেই মশাই। যান দিকি— এদিকে আসবেন না। চানটা সেরে নিই ততক্ষণে।

ও তোয়ালে নিয়ে বনের সুঁড়ি পথ বেয়ে নদীর দিকে চলে গেল। ওর কণ্ঠে একটা গুনগুন সুর ওঠে। বদ্ধ প্রাণেব একটা মুহূর্তকে সীমা আজ পূর্ণ করে পেতে চায়। এই অরণ্যময় মনের অনেক দ্বিধা মিথ্যা সংকোচ ঘুচে গিয়ে মনে কি সাড়া জাগে। ব্রিজের কাছেও এই মুহূর্তগুলো কি আবেশ আনে। সারা মন কি অজানা মাধুর্যে ভরে ওঠে। তাই বনভূমির বাতাসে ওর প্রাণের সুরের বর্ণ বিন্যাসে মিশেছে ওর চোখের সজীবতা।

গাছের নীচে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্লেট সসার নিয়ে আমাদের খাবার জায়গা হয়েছে। রঞ্জন বলে—ফাইন।

শঙ্কর জানায়— আপনার ভাত, ডাল, তরকারি আলাদা করে রাখুন মিস্ সেন, রঞ্জন এবার বিলকুল সব টেনে দেবে।

রঞ্জন বলে — নাঃ এবার থেকে বনবাস পার্টিতে আপনাকেই নিতে হবে। মহাপ্রাণী শীতল হবেন। দ্যাখ ভিখন — একটু শিখে নে বাপধন। একটু ভালো হবে? এনাদার রাউন্ড ভাত! ব্যস।

সীমা পরিবেশন করে।

সীমাকে শঙ্কর বলে— ভিখনকেও জাতে তুললেন, এবার বনবাসী ওই সীমাকে একটু জাতে তুলতে পারেন?

অলক গম্ভীর ভাবে সমর্থন করে— করেক্ট! ওতো প্রেম করে আর পালায়। ধরা পড়ার আগেই কেটে পড়ে সমী। বুঝলে সীমাদি।

সীমা হেসে ওঠে—হাতে হাতা রয়েছে, ওটা দিয়ে ঠুকে দোব অলক! খুব বেড়েছো তুমি! আমার সঙ্গেও ইয়ার্কি জুড়েছো?

হাসছি সকলেই। একটি পড়ন্ত বেলায় বনচ্ছায়ার পাখীর কাকলিতে আমাদের দিনটিকে ওই কোয়েলের বালুচরে রেখে এলাম, হয়তো বুনো হাওয়ায় ওই পদচিহ্ন মুছে যাবে— কোন সার্থকতা এর নেই।

তবু একে ভোলা যায় না। সীমার দু'চোখে দেখেছিলাম তেমনি আনন্দ আর বেদনার গভীর ছায়া। ক্ষণিকের জন্য হয়তো তবু একে সেও অস্বীকার করেনি!

বেতলায় ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তখন এদের সার্কাসে হাতির খেলা শুরু হয়ে গেছে। হাতির দল আজ এসেছে বাংলোর পাশের ধানক্ষেতে। সহায়বাবু ফরেস্ট নাকার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, জিপ থেকে সীমাকে নামতে দেখে চেয়ে দেখল মাত্র, ওর মুখে চোখের কাঠিন্য আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।

সীমা এগিয়ে গেল লজের দিকে চুপ করে।

সহায়বাবু চাইল আমাদের দিকে। আজ তেড়ে আসে না।

শঙ্কর বলে —সহায়বাবুকে অসহায় বলে বোধ হচ্ছে।

সহায়বাবু বোধ হয় শুনেছে কথাটা, তাই শুধোলো— কিছু বলছেন?

শঙ্করকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করার আগেই রঞ্জন ব্যাপারটা সামলে নেয়, ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে,

— দেশলাই আছে স্যার? আগুন নেই শীতে যে একটু সিগ্রেট খাবো তার উপায় নেই। দেন স্যার — ধন্যবাদ।

সহায়বাবু শুধোলেন— খুব ঘুরে এলেন বোধ হয়? বুনো মুলুকে যাবার উপায় কোথাও নেই বলেই পড়ে আছি এখানে।

অলক বলে — মন্দ লাগলো না। কাল আবার ফোর্ট দেখতে যাবো। শুনেছি এদিকের বন আরও গভীর।

সহায়বাবু শুনছে ওর কথাগুলো। অলক যেন ওকে রাগাবার জন্যই বলে আমাদেব পরবর্তী প্রোগ্রামটা।

— পরদিন যাচ্ছি মধ্যপ্রদেশের লাগোয়া জঙ্গলে। বড়ঝাঁড় অঞ্চলে। সীমাদিও থাকছেন আমাদের সঙ্গে। আজ সবাই মিলে খুব হৈ চৈ করা গেল।

সহায়বাবু যেন চুপসে যায়। পরক্ষণে একটু সামলে নেয় নিজেই।

সহায়বাবু আগেকার সেই গুমোট গরম ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করে বলে,

— আপনাদের খোদ ফরেস্টের এঁরাই গাইড করেছেন, ভালোই আছেন। শুনেছি ফোর্টও দেখবার জিনিস, আর ওই সব জঙ্গল তো দুর্গম আর খুবই গভীর। যান্— ঘুরে আসুন সেফ্লি।

—চলি। কটেজের দিকে এগোলাম আমরা।

রঞ্জন বলে—বেচারা এবার সারেগুার না করে। যা ঔষুধ দিইছিস সমী, সহায়ের আশার মুখে ছাই কেড়েছিস নটবর! চালিয়ে যা — তা মেয়েটি মন্দ নয় রে।

— যাঃ আমি কি করলাম? প্রতিবাদ করার চেষ্টা করি।

ওদিকে ভিখন যেন রান্না শিখে গেছে। ও বলে,

— কফির জন্য গরম পানি লে যাতা হ্যায়, অর রাত মে ক্যা পাকায়েগা? রোটি তরকারি!

— রুটি পাতলা করবি বাবা! ওকে অনুরোধ জানাই।

ভিখন মাথা নাড়ে— জী। আজ গড়বড় নেহি হোগা।

রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে
তব সৈন্যদল
যাদের চরণ ভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনা কল্লোল- সাথে নহবত মিলায় না তান।
তব পরসুন্দরীর নূপুর নিক্কণ
    ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
মরে গিয়ে ঝিল্লিসনে
    কাঁদায় রে নিশার গগন।

পালামৌ- এর বন- পর্বতে এই বিরাট প্রাসাদ মধ্যযুগীয় মিনার—

দুগর্ম সুউচ্চ পাহাড়ের গায়ে লাল পাথরের গেঁথে তোলা বিরাট দুর্গ দেখবো কল্পনা করিনি। ওখানে গিয়ে ওই কথাগুলোই মনে হয়।

গহন বনের রাস্তা দিয়ে জিপটা চলেছে, দুপুরের রোদে গাছগুলো রাঙ্গা, বাঁশ বনের সুন্দর বাঁশগুলো কারা ভেঙ্গেছে। তির্যব রোদও ঢোকে না। দু-পাশে তাজা সেগুন গাছ মুচড়ে আখের ক্ষেতে শিয়ালের তাণ্ডবের মত করে গেছে।

ড্রাইভার চন্দ্রিকা সিং বলে— হাতি এ সব করতা হ্যায়। জঙ্গল কা বহুৎ লুকসান পৌঁছাতা উ লোক। গাছ ভেঙে তছনছ করে জঙ্গলের ক্ষতিভি করে অনেক।

তব তাজা সেগুনগাছের কাণ্ডটা বোধহয় হাতির দলের যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। না হয় গায়ে লেগেছিল অমনি একটু গা হেলান দিয়ে না হয় পায়ের চাপে ভেঙে দিয়েছে, উপড়ে দিয়েছে গাছটাকেই হাতির দল।

পথের বাঁকে সামনের পাহাড়ের শীর্ষে লাল পাথরের সুন্দর গাঁথুনি উঠে গেছে, কেল্লার মিনারগুলো এখনও বনরাজ্যে সর্বময় প্রভুত্বের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জিপটা পাহাড়ের নীচে দিয়ে গিয়ে থামল পুরোনো কেল্লার বিশাল গম্বুজওয়ালা ফটকের সামনে।

ওপাশে পাহাড়ের মাথায় সমস্ত বিস্তীর্ণ চূড়াকে ঘিরে আর একটা কেল্লা, তার কঠিন সীমা প্রাচীর বরোজ, কিছু ঝরোকা দেখা যায়, বাকী সব কিছু গহন বনে ঢাকা। দুর্ভেদ্য বাঁশ, করম, কেঁদ গাছের ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ লতাপলাশ. চীহড় লতার কঠিন বাধা ভেদ করে এগোবার পথ নেই ওই কেল্লার উপরে। পাহাড়ের মাথায় কেল্লা দুর্গমতর হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রিকা সিং বলে— উপরে কোনমতে ওঠা যায়। ওটা নোতুন ফোর্ট, আর পুরোনো কেল্লা এইটা।

সেটার কিছুটায় পাওয়া যায়, সামনের গেটে মুসলমানী কাজের নমুনা, কার্নিশ গম্বুজ দেখা যায় আগ্রা

ফোর্টের মতই গঠনশৈলী। এটা ছিল চেরো রাজাদের আদি বাসস্থান—ভিতরের চত্বরে মন্দিরের ছাদ-পরে সেটা মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে, পাহাড়েব নীচে সমতল থেকে কেল্লার বিশাল প্রাকার উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়া অবধি, শেষ প্রান্তে মিনার কেল্লার কক্ষগুলো কিছু রয়েছে। জল সরবরাহের জন্য বিরাট বিরাট কুয়োও দেখা যায় কেল্লার মধ্যে।

বৈকালের ম্লান আলোয় অতীতের বিশাল ধ্বংসরাজ্যের নৈঃশব্দের মাঝে কি যেন হাহাকার ওঠে।

কিছুটা এগিয়ে যাই প্রশস্ত প্রাকারেব উপব দিয়ে। চন্দ্রিমা সিং নিচের জিপে রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে ফরেস্ট গার্ড রামচন্দ্রজী। মিঃ রায় এখানে এসে অবধি আমাকে বনের গভীরে গাইড না নিয়ে যেতে দেন নি, তাঁরাই ব্যবস্থা করেছেন গাইডের। রামচন্দ্রজী প্রাকারেব উপরে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখে বলে,

—রুখ যাইয়ে। যাবেন না ওদিকে।

ওদের হুকুমই এখানে বড়।

স্তব্ধ বনরাজ্যে বৈকালেব হলুদ আলো নেমেছে। পাখীর কলরব ওঠে, হর্ণবিল ধনেশ পাখীগুলো চীৎকার করছে ও পাশে কি দেখে।

রামচন্দ্রজী বলে—দেখিয়ে সব্ উধার।

একটা বড় হলুদ কালো ফুটকিওয়ালা বিশাল ময়াল সাপ পাথরের বুক বয়ে চলেছে।

সীমা চমকে ওঠে—ওবে বাস্।

সহায়বাবু পিছনে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়েছিল। ও বলে ওঠে, —তোমার সব তাতেই আগ্ বাড়িয়ে যাওয়া কেন?

সীমা থমকে দাঁড়ালো। আজ আমাদেব ফোর্ট দেখতে যাবাব কথা শুনে সহায়বাবুও একটা জিপ বুক করে আমাদেব সঙ্গী হয়েছে দেখলাম। অলোক বলে—পাহাবা দিতে চলেছে নাকি সীমাদিকে।

ব্যাপারটা সীমাও জানতো না। আমাদের জিপে উঠে ওপাশে সহাযবাবুকে আসতে দেখে একটু অবাক হয়। সহাযবাবু যেন আপোষের চেষ্টা করছে আমাদের সঙ্গে, তাই বলে সহাযবাবু অন্য একটা জিপ থেকে—ও রঞ্জনবাবু, এখানে জায়গা হবে, চলে আসুন।

শঙ্কর জানায়—আমরা যাবো?

—আসুন। সহায়বাবু গুম হয়ে জানায়।

সীমা আঁচল চাপা দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা কবে। আমি বলি—এটা কি হল।

সীমা জবাব দিল না।

....এখানে এসেও সহায়বাবু সীমাকে শাসন করতে শুরু করেছে।

পায়ের শব্দে সাপটা নীচে চলে গেল বনের মধ্যে। দূরে পাহাড়ের মাথায় গম্বুজগুলোয় আলো পড়েছে। সামনের পাহাড়ের নোতুন কেল্লার বুরুজগুলো দেখা যায়, মাঝে মাঝে মিনার কাজ। আলোয় ঝলমল করে এখনও বনের মাঝে।

পনেরো শতাব্দীর সময়ে তৈরী এ দুর্গ, সারা ভারতের অনেক দুর্গ দেখেছি, মনে হয তাদের অনেকের তুলনায় পালামৌ দুর্গ কমতি কিছু নয়। বেশ বিরাট আর মজবুত।

—সত্যি! সীমা বাইরে বিশেষ বের হয়নি। তার কাছে এটাই বিস্ময় নিয়ে হাজির হয়েছে।

মনে হয় পাহাড়ের মাথার দুর্গ শেরশাহের চুণার দুর্গের চেয়েও বড়, গোয়ালিয়র ফোর্ট এর মতই সুরক্ষিত। আর ওর অবস্থান ঠিক চিতোর গড়ের মতই দুর্গমতার মধ্যে।

চিতোরের বিখ্যাত কেল্লাটা উঠে গেছে সোজা পাহাড়ের উপর। চারিদিকে সমতল ভূমি, তার মাঝে দেড় হাজার ফুট উঁচু একটা পাহাড়, তবে সেটা অনেক বড়, লম্বায় পাঁচ মাইল আর চওডায় মাইল খানেক। এই দুর্গের গঠনশৈলী অনেকখানি তেমনই।

মনে হয় অম্বর ফোর্টের মতই পাহাড়কেন্দ্রিক এই দুর্গ, ভিতরে এখনও মাঝে মাঝে পরিষ্কার আছে, তারই কোন প্রাকারের গায়ে উৎকীর্ণ একটা প্রস্তরফলকের দিকে চেয়ে থাকি। লিপি খুব পুরোনো নয়, দেবনাগরী

লিপি, আর ভাষাও সংস্কৃত। মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে কোন এক রাজার নামে এই উৎসর্গপত্র, তার ফটো কপিও দেখেছি বেতলা ন্যাশনাল পার্কের ক্যানটিনে।

রামচন্দ্রজী বলে—অভি শের ভল্লুক সম্ভব কা আস্তানা বন গিয়া সাব। জন্তু-জানোয়ারের বাস, ওখানে মানুষ যায় না।

বৈকালের আলো এখানে পৌছে না, আঁধার ভাব নামছে। রহস্যময় ওই দুর্গের দিকে চেয়ে থাকি। ওপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বনের বুক চিরে ঔরঙ্গা নদী। হয়তো এই দুর্গ সমীপ তখন মুখর হয়ে উঠতো কল-কোলাহলে, দেশ-বিদেশ থেকে আসতো সেনানীর দল। বিদেশী রাজাদের আনাগোনার বিরাম ছিল না। ছিল ঐশ্বর্যের দীপ্ত। কত বৈকালের ম্লান আলোয় কাড়ানাকাড়া বেজে উঠতো সিংদরজায়। নকীব ফুকারে ওঠে, সৈন্যদের তূর্য ধ্বনি ওঠে, আসে পাত্র-মিত্রের দল। আজ সব স্তব্ধ। বনরাজ্যে হারিয়ে গেছে সব কিছু।

এই কেল্লা থেকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল মোঘল সেনাপতি রাজা ছত্রশালকে, রাজা সাহবল রায়কে। রাজা সাহবল আর ফেরেনি সেই কারাগার থেকে।

এসেছে উত্থানপতন। মোঘল, মারাঠা, ইংরেজ হানা দিয়েছে এখানে বন্যার স্রোতের মত। আজ তারা সব কোথায় হারিয়ে গেছে। ঘন বনাবৃত পালামৌ দুর্গ আজ আরণ্যক জগতে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে আছে। কোন পুরাতাত্ত্বিক আসেননি এর বেদনার্ত পরাজয় আর গ্লানির ইতিহাসকে দিনের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে। ইতিহাস কয়েক অধ্যায়ের কাহিনী শেষ করেছে।

শৌর্য, পরাক্রম পরাজয়ের কালিমা বুকে নিয়ে বিশাল পাষাণ প্রাচীর ঘেরা রাজপুরী আজ হারিয়ে গেছে।

সীমার দুচোখে স্তব্ধ বিস্ময় জাগে।

সহায়বাবু বলে—এই রাজ্য দেখতে এতো হাঙ্গামা? ওন্‌লি রুইনস? তার জন্যে বনে আসা এত কষ্ট করে?

সীমা বাধা দেয়—চুপ করে থাকুন না, প্লিজ!

সহায়বাবু ওর দিকে চেয়ে চুপ করে সাবধানে প্রাকার থেকে নেমে একটা ইটের টুকরো দিয়ে প্রাকারের গায়ে নিজের নামটাকে অক্ষয় করে রাখলো। কালের বুকে যেন স্বাক্ষর রেখে গেল সে।

রাজপুরীর রাজকন্যা ও রানীদের স্নান-মহল—কেল্লার জলসরবরাহ ব্যবস্থা হতো এখান থেকে। আজ সেই সুন্দর জলাশয়ের চারিদিকে দুর্গম অরণ্য, হরিণ বাইসন বুনো হাতির দল নামে এর জলে। সেই চাঁদনী রাতে কোন রাজকন্যার নৌকাবিহার তার সুর লহরী আজ ঝিল্লিস্বনে হারিয়ে গেছে।

দুর্গের নীচেই কমলদহ। বিস্তীর্ণ জলাশয়।

এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটাকে কাটিয়ে প্রায় বাইশ ফিট গভীর করা হয়েছে, ওপাশে একটা বিরাট বনস্পতির ডালে তৈরী হয়েছে অবজারভেশন টাওয়ার। ঘন পত্রাবরণের আড়াল থেকে গ্রীষ্মের দিনে এখানে সব প্রাণীদেরই দেখা যায়, জলের সন্ধানে তারা এখানে আসে।

স্তব্ধ বনতল পাখীর কাকলিতে মুখর। পর্বতশীর্ষের কেল্লার লাল মিনারের ছায়া পড়েছে কালো জলে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দে ফিরে চাইলাম।

রামচন্দ্রজী বলে—মগর সাব। কুমীর আছে এখানে।

—কুমীর? এখানে? অবাক হই ওর কথায়।

সীমা জলে হাত মুখ ধুচ্ছিল, লাফ দিয়ে সরে এসেছে। রঞ্জন বলে—হয়তো কমলদহ ছিল বিশাল সরোবর। রাজারা সখ করে কুমীরও পুষতেন তাদেরই কোন বংশধররা এখনও রয়ে গেছে এখানে। রামচন্দ্রজী বলে।

—হ্যাঁ সাব। রহ গিয়া উ লোক্। মছলি ভি হ্যায়, বহুৎ বড়া বড়া মছলি। আধমন যে ভারি হোগা।

এইখানে দেখি তেওয়ারীজীকে। বেঁটে খাটো মানুষটি। মাথার চুলগুলো কদম ছাঁট করে ছাঁটা। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ সুন্দর। মুখে মিষ্টি হাসি লেগে আছে।

ওই কমলদহের ওদিকের জলাভূমিতে পদ্মের শেকড় লাগাচ্ছিল ফরেস্টগার্ড অযোধ্যা তেওয়ারী।

—আপনি? এখানে?

তেওয়ারীজী থাকে আমাদের কটেজের ওদিকের গার্ড কোয়ার্টারে। মাঝে মাঝে বনের গল্প করতে আসে।

তেওয়ারীজী বলে—কাম থা হিয়া। নীলকমলদহ ইস্‌কো নাম। কমল নেহি হ্যায়, ম্যায় দুসরা কাঁহাসে কমল মূল লায়া, উ সব রোপণ করতা থা। পদ্ম ফুটবে এখানে।

ওর দিকে চেয়ে থাকি। স্বল্পবাক, তেওয়ারীজী নিশ্চয়ই রসিকতা করেনি, তাই অবাক হয়ে শুধাই—

এই গভীর জঙ্গলে পদ্ম ফোটাতে চান নাকি?

ও বলে,—জী। যব্‌ ফুল খিলেগা চারো তবফ বহুৎ সুন্দর হোগা না?

পদ্ম ফুলফোটা এই বন নির্জন সরোবরের ছবি দেখে সে।

অরণ্যেও সুন্দরের স্বপ্ন দেখে আরণ্যকের যমুনাপ্রসাদের মত, বিভূতিভূষণেব ও সবস্বতী কুণ্ডুর জন্য বেদনাবোধ ছিল, সেই রূপময় অবণ্যকে তিনি বাঁচাতে পারেন নি। তাঁব আরণ্যকের যমুনাপ্রসাদও পারেনি।

পালামৌ-এর অরণ্য গভীর এই তেওযাবীজী সামান্য একজন ফবেস্ট গার্ড সেই অরণ্যকে বাঁচাবাব সার্থক স্বপ্ন দেখে। তাই দূর থেকে পদ্মপুল এনেছে এই কমলদহে।

তেওয়ারী বলে—ল্যান্টার্ণ গোলগোলি, লতা পলাশ ভি এখানে অনেক ফোটে।

এই দারুণ বনে ওকে একটা ঠ্যাঙ্গা হাতে দেখে অবাক হয়ে শুধাই,

—একা একা এসেছেন এই বনের মধ্যে?

ও বলে—হ্যাঁ পায়ে হেঁটেই আসি।

আর কি এমন দূর? বনেব মধ্যে পাহাড়েব পাকদণ্ডী বেয়ে এলে কাছেই পড়ে।

—জন্তু-জানোয়ার তো আছে?

—ওতো হ্যায়, হাতি ভি দেখা আজ জামুই মে। হঠ্‌ যানা ব্যস্‌ কুছ নেহি বোলে গা। ওদেব কিছু না বললে ওরাও কিছু করে না।

ওরা বনকে ঘর করে নিয়েছে। তাই সহজভাবেই চলাফেবা কবে নির্ভযে। বনের হরিণও ওকে চেনে, পায়ে পায়ে ওকে এগিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা নামছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী এসেছে জলাশযে। শেষ সূর্যের আলো কেল্লাব মিনাব ছুঁযে গেল।

সহায়বাবু গুম হয়ে বসেছিল। ও বলে—

চুপচাপ কি দেখছেন মশাই। সন্ধ্যা হলে হাতি বেব হবে। আর ওই কেল্লার বিরাট এলাকা বাঘের রাজ্য, চলুন ফেরা যাক।

শঙ্কর বলে—আপনার জিপ তো রয়েছে। চলে যান না কে আটকে বেখেছে মশাই?

সহায়বাবু চুপ করলো। সীমা যেন ওই আলোআঁধারির অসীমে কোথায় তলিয়ে গেছে। অলকেব সুবেলা গলায় গুনগুনিয়ে গান জাগে—

জল উঠেছে ছলছলিয়ে ঢেউ উটেছে দুলে—

মর্মরিয়ে ঝরা পাতা বিজন তরুমূলে।

শূন্যমনে কোথায় তাকাস? সকল বাতাস সকল আকাশ

ওই পারের ওই বাঁশির সুরে উঠে শিহরি।

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।

কমলদেহে সন্ধ্যা নেমেছে, বনতলে ওঠে মর্মর ধ্বনি—বনের মাথায় আকাশ কোলে দু'একটা তারা জ্বলে ওঠে। এমনি রাতে হয়তো নহবতের তান উঠত, কেল্লার বুরুজে বোশনী জ্বলতো। অশ্বক্ষুর শব্দে মুখর হতো রাজপথ, আজ কোথায় তারা নিস্তব্ধ বিস্মৃতির গহনে হারায়ে গেছে।

আমাদের একটি দিন এই স্মৃতিভরা অপরাহ্ণ-সন্ধ্যাও হারিয়ে যাবে স্রোতে ভেসে যাওয়া তরুণীর মত। শূন্যতার বেদনা জাগে।

সীমার হাতটা এসে পড়েছে আমার হাতে, এই নীরব উদ্বেল মুহূর্তের স্তব্ধ বেদনাহত চাহনিতে সীমা হয়তো কিছু জানাতে চায়।

সে জানাবার ভাষা তার নেই।

রামচন্দ্রজী বলে—চলিয়ে, সাম হো গিয়া।

তেওয়ারীজীকে তুলেছি আমাদের জিপে। বয়স্ক লোকটি নদীর দিকে ঘরটা দেখিয়ে বলে—ওহি চেকপোস্ট মে হম্ থে? জনমানব নেই, বনের মাঝে ঘরটা দেখা যায়।

—এই গহন বনের মধ্যে একা থাকতেন?

—ক্যা! সুবে হোনেসে হাজারো চিড়িয়াকা বোল—হরিণকা ফুকার সব শুনতে থে। হাথি ভি আতা।

বুড়ো বলে চলেছে—অব্ রিটায়ার করকে গাঁও মে জানা, ফিন্ ক্ষেতি, মামলা, পরেষানি। কভি শোচতা—ইধার এক ঝুপড়ি বানা কর রহ জায়েগা। এখানেই থাকতে চায় সে।

বনের মায়ায় এরা বাঁধা পড়ে গেছে, সংসার ত্যাগ করে যে সন্ন্যাসী অরণ্য গভীরে কোন মহাজীবনের ধ্যান করে এরা সেই জীবনকে কোথায় স্পর্শ করেছে তাই এরা প্রসন্ন। ঘরের বাঁধন এদের বাঁধতে পারে না।

সহায়বাবু বলে—কি দেখলেন মশাই অ সমীরবাবু?

জবাব দিই না। ওকে কি করে বোঝাবো যে যা পেয়েছি তার পরিমাণ আমার জানা নেই। সীমা বলে ওঠে,

—আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়েনি, বরং কিছু খরচাই হয়ে গেল।

রঞ্জন বলে—সত্যিই। দুপুর থেকে সন্ধ্যা অবধি ব্যোম মেরে বনে ঘুরলাম আর দেখলাম ওই পুরোনো কেল্লা। ব্যস কেল্লা ফতে। পুরো লোকসান।

অলক হালকা সুরে গেয়ে ওঠে—বাণিজ্যেতে যাবোই—

সহায়বাবু এগিয়ে গেছে। ওর জিপেও উঠেছে শঙ্কর রঞ্জন। ওরা বের হয়ে গেল আগে। পিছনে যেতে নারাজ।

সীমাকে বলি—সহায়বাবু খুব রেগে গেছেন কিন্তু।

সীমা জানায়—তবে আর কি? ক্যানটিনে গিয়ে বেশী করে ভাত খাবেন। কাল যাচ্ছেন তো ওই যে কোথায় বললেন? ওর দিকে চেয়ে গন্তব্যস্থলের নাম জানাই—বড়ঝাঁড়।

ওর সাহসে এবার ভীত হই। তাই জিজ্ঞাসা করি,

—তুমিও যাবে নাকি?

সীমা চাইল আমার কথায়। তেওয়ারীজী বলে,

—বহুৎ আচ্ছা জায়গা বাবু, জঙ্গলভি বহুৎ হরিয়ালি, ছবির মত মনভোলানো জায়গা বাবুজী। ঘন সবুজ জঙ্গল। পাহাড়ও অনেক বড় আর উঁচু। ফরেস্ট বাংলো রয়েছে দুহাজার ফিট উপরে। যান। খুব ভালো লাগবে। আর জঙ্গলও দেখবেন অনেক গভীর। সুন্দর।

ওর কথা শুনে চলেছে সীমা।

সে বলে—তাহলে যাবোই।

—কিন্তু এভাবে ঘুরবে? আমি বাধা দিই।

সীমা জানায়—আমার ব্যাপারটা আমাকেই ভাবতে দিন। অবশ্য আপনার অসুবিধা থাকলে জোর করবো না।

ওর কণ্ঠে অনুযোগের সুর। হয়ত বা অভিমানেরও। কি ভেবে চুপ করল সে।

আমরা এসে পড়েছি।

ফরেস্ট গেটে তখন বাইরের থেকে আসা যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়েছে। রঞ্জনদের দেখা নেই।

জিপ ছেড়ে ক্যানটিনের দিকে এগিয়ে চলেছি দুজনে।

সীমা বলে—সহায়বাবুর আজকের কাণ্ডে আমি মোটেই খুশী হইনি। লোকটা কেমন ডিসটার্বিং।

—হয়তো একটা দায়িত্ব রয়ে গেছে। তুমি হৈ হৈ করে ঘুরচো বনে পর্বতে। তাই গেছিলেন।

আমার কথায় সীমা চাইল। দূরের একটু আলোর ম্লান আভা ওর চোখে । সীমা বলে—আমার দায় দায়িত্ব একা আমারই। কাউকে তার জন্য বিব্রত করবো না।

ওদের জীবনের মাঝে কোথাও একটা ব্যর্থতা আর বঞ্চনার সুর রয়ে গেছে।

সীমা বলে—হয় তো একদিন অনেক কিছুই আশা করেছিলাম, স্বপ্ন দেখেছিলাম অন্যান্য মেয়েদের মতই। কিন্তু আমার জীবনে তা আসেনি। নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্য পাত্র বয়েই ফিরছি, যদি কোথাও তার জন্য কোন তৃপ্তির আশ্বাস থাকে তাকে পেতে চাওয়া দুর্বলতা তা জানি, কিন্তু সত্য এটাকে অস্বীকার করতে পারি না। তাই মাঝে মাঝে হয়তো বেপরোয়া হয়ে উঠতে মন চায়।

সীমার দিকে চেয়ে থাকি। দূরে পাহাড়ের মাথায় ক্যানটিনেব নিওন লাইটেব আভা পড়েছে ঘন সবুজ মহুয়াগাছের পাতায়। একটা জিপ দূর বনে কোথায় স্পটলাইট ফেলছে, আলোর তীব্র ঝিলিক আঁধারে ঝলসে ওঠে। সীমার দুচোখের ওই আভাস যেন তার অতীতের না পাওযা অন্ধকারটুকু আজ হাতড়ে ফেরে।

হঠাৎ কি পাওয়ার আনন্দে সে উচ্ছল। সীমা বলে,

—চলুন,কফিটা আজ আমিই খাওয়াবো ক্যানটিনে।

—হঠাৎ!

—ঘুষ দিচ্ছি না মশাই! কলকলিয়ে ওঠে সীমা।

—হয় তো ঠকবে শেষ অবধি! আমার কথা সীমা গুনগুনিয়ে ওঠে,

—সুখ দুখ দুটি ভাই

সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

কোনকিছু স্বার্থ নিয়ে ঘুবছি না আপনার মত। শুধু দেখতে চাই দুচোখ ভবে।

সীমার কথায় বলি,

—তাহলে চলো। কিন্তু শেষে আমাকে দোষ দিও না। দুঃখ যদি পাও। সীমা ডাগর চোখ মেলে চাইল। বলে ওঠে—এ দুঃখও আনন্দের হবে। দোষ দোব না।

সীমা তার মনের কোন এক স্বতন্ত্র জগৎকে ছুঁয়েছে। কুয়াশা-ঢাকা রাত্রি রহস্যময়ী ওই মেয়েটি যেন আঁধিয়ার মত অবুঝ হয়ে ওঠে। তাই বলি—তাহলে তো কথাই নেই। চল, কফিটাই জুটে যাক।

ক্যানটিনের দিকে এগিয়ে যাই।

বিহারের সীমান্ত ওদিকে মধ্যপ্রদেশের অরণ্য পর্বতসীমা, তারই লাগোয়া অঞ্চল। তাই এ সব অঞ্চলে যাওয়া অভিমন্যুর ব্যূহে ঢোকার মতই ঢোকার পথ আছে, বেরুবার স্বতন্ত্র আর পথ নেই। একটাই পথ।

এই বনের মধ্যে দিয়ে দুটো বাসরুট চলে, একটা যায় নেতারহাট পাহাড়ের নীচে অবধি, অন্যটা যায় মহুয়াটাঁড়। একই রাস্তা, এখান থেকে প্রায় তিরিশ মাইল বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে গারুতে, গারু থেকে দুটো রাস্তা গেছে দু'দিকে। একটা গেছে নেতারহাটের পাহাড়ের নীচে, অন্যটা গেছে মহুয়াটাঁড়। এই দ্বিতীয় রাস্তায় চোদ্দ মাইল দুর্গম বন পাহাড় পার হয়ে প্রায় দু'হাজার ফুট উপরে বড়ষাঁড় বাংলো।

বড়ষাঁড়ের বনে ব্রিটিশ আমলের গভর্নর জেনারেল লাটবাহাদুরবর্গ বাৎসরিক শিকারে আসতেন। এখানের বনে বর্তমানে দশলাখ টাকার পরিকল্পনা নিয়ে গড়ে উঠছে টাইগার প্রজেক্ট, কারণ বিহারের মধ্যে বাঘের সংখ্যা এখানেই বেশী।

সকালের কুয়াশা ছড়ানো বন, প্রথম আলোর ঝলক দেখা যায় গাছের মাথায়, বাসটা চলেছে ছিপাদহের দিকে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড় কেঁপে ওঠে।

সীমা কমলালেবুর রঙের সোয়েটারের উপর শাল জড়িয়ে বসে আছে। ওর বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ বাইরের

বনের দিকে। সদ্য ঘুম ভাঙা বনানীর এই আচ্ছন্ন রূপকে ও দেখছে। বনরাজ্য রূপময়ী নারীর মতই রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে ভোরের প্রথম আলোয়।

প্রতি প্রহরে এর রূপ বদলায়—আর সেই রূপে নোতুন কি স্বপ্ন আনে। একটানা বনের মধ্যে ছিপাদহ একটু আধুনিক লোকালয়, রেললাইন রয়েছে। এব পরেই শুরু হয় আবার বন।

ডানপাশে মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত, তার জন্য অরণ্যের প্রকৃতি এখানে স্বতন্ত্র। কিছু আদিবাসী আর সামান্য কিছু ভদ্রজন রয়েছে বাসে। আদিবাসী মেয়েদের চোখে কৌতুক, হয় তো বিস্ময়। বাসে করে ওরা চলেছে। কালো মেয়েটা দেখছে সীমাকে। সীমা শুধালো ক্যা দেখতা হ্যায়?

—হোবাং? ....মেয়েটি শুধোয় সীমাকে।

—কি? ক্যা—সীমা কথাটা ঠিক বোঝেনি তাই ওব অর্থ জানতে চায়। নিটোল দেহ নিয়ে আদিবাসী মেয়েটি দেখছে আমাদের। বাসের একটা সিটে বসেছি আমরা দুজনে। মেয়েটির চোখে কি হাসিব সারল্য আর কৌতূহল।

সীমাকে ওর মানে শুধতে দেখে মেয়েটি ওকে বলে—তুম হোবাং দুলহন! সাদী হুয়া! দুলহন কি সাথ চলতা হ্যায়। চমকে উঠি মেয়েটির কথায়। বিব্রত বোধ করি।

অর্থাৎ আমাদের দুজনকে এক সিটে বসে যেতে দেখে ওরা অমনি একটা কিছুই ভেবেছে। কথাটা শুনে সীমাব ফর্সা গালটা লালচে হয়ে ওঠে।

সলজ্জ হেসে বলে ওঠে-—ধ্যাৎ। মবণ দ্যাখ না ছুঁড়ির? রস ঠিক আছে। সাদী কেন হবে?

মেয়েগুলো কলকলিয়ে হেসে ওঠে, ওব সলজ্জ ভাব দেখে। ওদের মধ্যে একজোড়া মেয়েছেলেকে দেখিয়ে বলে,

—এদি হোবাও তান? সাদী—সাদী হোগা।

গান গাইছে তারা। মাথায় বুনো ল্যান্টার্ন ফুলেব স্তবক। ওদের নিটোল দেহ—বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে বাসেব ঝাঁকুনিতে। এপথে পিচ আর নেই দেখলেই বোঝা যায়। কোনোবকমে পথের রেখাটাকে রেখেছে মাত্র বনজ সম্পদ বইবাব পথ হিসেবে।

বনেব মাঝে একটা ফরেস্ট গেট, ডানপাশে চলে গেছে কাঁকর খোয়াব সরু রাস্তা। লাত্ গেছে এই রাস্তা বনেব মধ্য দিয়ে।

-–গেটটার নাম দেখেছো? আমার কথায় সীমা চাইল।

—লাভার্স গেট! নামটা লেখা আছে বোর্ডে।

সীমার মুখে হাসির ঝিলিক জাগে—মরণ, নাম খুঁজে পেল না? বনের মধ্যে এসবও রয়েছে।

গহন বনবাজ্যের মাঝে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সুন্দর বাংলো গড়ে রেখেছে, বসতিব দেখা নেই। জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে দু'এক চিলতে ক্ষেতে হলুদ সবষে ফুলের রাজ্য। মাঝে জোয়ারের ক্ষেতে লম্বা ডাঁটির মাথায় ঝুমকো বেঁধে ফলগুলো দুলছে। খুঁটি পুঁতে মাচানমত করা, সেখানে কুঁড়ে বেঁধে কোন গ্রামবাসী ওই সামান্য ফসল পাহারা দেয়। তার পাশেই ফরেস্ট বাংলো। মান্ডু ফরেস্ট রেস্ট হাউস স্তব্ধ বনানীর গভীরে আপন স্বপ্ন আর নির্জনতায় বিভোর। খোলামেলা নয়—চারিদিকে শুধু বন আর বন, গহন বন।

বাসটা ঝাঁকানি তুলে চলেছে ওই দুর্গম রাজ্যে।

বনের ধারে দেখলাম একটি ওঁরাও পরিবার বিমর্ষ ম্রিয়মান—স্বামীস্ত্রী আর কোলে-কাঁকে দুটো বাচ্চা নিয়ে পথের ধারে বসে আছে। ওদেব যেন করণীয় আর কিছুই নেই।

এখানে কোথায় থাকে—কোথায় বা যাবে ওবা জানি না। বনের মাঝে ওই ক'টি প্রাণীকে দেখে মনে হয় ওরা যেন হিসাবের বাইরের মানুষ। মুখেচোখে মাখানো নিবিড় হতাশার কালো ছায়া, বিরাট গহন অরণ্যের গভীরে হারিয়ে যাওয়া আদিম মানবসত্তা—যাদের পরিচয় সভ্যজগতের কেউ জানে না। রাখে না।

পাহাড় আর পাহাড়ের বুকে ঘন বন। এবার বনের গভীরতা বেড়েছে আর দেখা দিয়েছে শালবন। তবু এই শালবনেও রয়েছে বংশের প্রাচুর্য, একটা পাহাড়ী নদী এঁকেবেঁকে পাহাড়টাকে জড়িয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে রাস্তাটাকে ছুঁয়ে আবার গহন বনে হারিয়ে যায়। বাতাসে ওঠে শনশন শব্দ। বনের গভীরে অন্ধকার তখনও রয়ে গেছে।

অজানা রাজ্য, বিচিত্র জগৎ। বাঘের নেশা ক্রমশ ব্যক্তি সত্ত্বাকেও যেন গ্রাস করে নিয়ে আতঙ্কের ছোঁয়া আনে। ঘন বনের মধ্যে থেকে নদীটা আবার চকিতের মধ্যে বের হয়ে রাস্তার উপর এসেছে। সেটাকে পার হয়ে যায় তিরতিরে জলস্রোত ছড়িয়ে, আবার বনে হারিয়ে যায়, কখন ফের এসে পড়েছে রাস্তার উপর, এ যেন লুকোচুরি খেলা খেলছে।

ড্রাইভার জানায়—সাতনদীয়া এর নাম।

নদীটা নাকি সাতবার রাস্তাকে পার হয়ে গেছে এই ভাবে। শীতের মুখেও জল রয়েছে, মাঝে মাঝে রয়েছে কজওয়ে, বর্ষাকালে এর মাতন কেমন হয় তা অনুমান করতে পারি। তখন বনপাহাড়ের রূপও হয়ে ওঠে বীভৎস।

ড্রাইভার জানায়—তব্ এ রাস্তা মে খাড়া হোনে পড়তা, এক ঘণ্টা-দো ঘণ্টা বাদ পানি হঠ যানেসে তব্ গাড়ি চলতা। রাস্তা দিয়েই তুফান বয়ে যায়, দুচার ঘণ্টা গাড়ি বন্ধ থাকে।

অর্থাৎ এককথায় এ গহন দুর্গম বনরাজ্য, পাহাড়টার গা বেয়ে নামছি, বাঁকের মুখে দেখা যায় চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়, উপত্যকায় ঘন বন আর পাহাড়ের গা ধসিয়ে হাঁসুলীবাঁকের মত বাঁক নিয়ে চলেছে কোয়েল নদী। দুটো পাহাড়কে ছুঁয়ে চলেছে ব্রিজটা, তার উপর দিয়ে গুম্ গুম্ শব্দ তুলে বাসটা এগিয়ে যায় সামনের উপত্যকার দিকে।

শান্ত নিভৃত সবুজের ফুলফোটা একটি ছোট্ট জনপদ। সবে এর ঘুম ভেঙেছে। আমরা এসে পড়লাম গারুতে।

বাসে কলরব ওঠে। মেয়েগুলো কোনো ঠিকাদারের ওখানে শাল-পলাশ পাতা বাঁধার কাজ করে। ওরা কলকলিয়ে নামছে বাস থেকে। হয়তো বনের অন্যত্র যাবে আবার।

জায়গাটার নাম গারু।

সুন্দর পাহাড়ঘেরা শান্ত উপত্যকা, কোয়েল বয়ে গেছে এর বুক চিরে। রূপবতী কোয়েল, পার্বত্যভূমিকে করেছে সুজলা, উর্বরা, সুন্দরী। গারু বসতিতে থানা রয়েছে, সীমান্ত থানা। ব্লক অফিসও দেখলাম ফলে রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছে চায়ের দোকান, নাপিতের সেলুন, হাটও বসে এখানে। আজ হাটবার নয় তাইত ভিড় নেই এখানে।

সীমা উচ্ছলকণ্ঠে বলে—সুন্দর হিল স্টেশনের মত জায়গাটা।

তবে সাজানো নয়, এখানে ফল ফসলও তেমন হয় না। কারণ ওই হাতির উপদ্রব। যখন তখন তারা হানা দেয় এখানে।

ন্যাশনাল পার্ক-এর সীমানা কোয়েলের ওপার অবধি। তারপর সংরক্ষিত বনাঞ্চলমাত্র। এখানে বন্যপ্রাণীদের মোকাবিলা করার কোন ব্যবস্থা নেই বেতলার মত। ফলে হাতি, বনশুয়োর, হরিণ, সম্বরের দল নেমে আসে, সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যায় এদের ক্ষেতের ফল ফসল।

এখান থেকে এই বাস ছেড়ে পিছনের বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম, এই বাস যাবে নেতারহাটের দিকে করবী অবধি। আমাদের যাত্রাপথ অন্যদিকে। তাই বাকী সময়টা গারুকে দেখার একটু অবকাশ পেয়ে গেলাম।

সীমাও জায়গাটার নাম শুনেছে।

শালটা খুলে ফেলেছে, সোয়েটারটা গায়ে চাপানো। সীমা বলে,—জায়গাগুলোর নামে কিন্তু কবিত্ব আছে। করবী! বেশ নাম। ওর কথায় জানাই।

—লাভার্স গেট আর করবী দুটোর মধ্যে মিল রয়ে গেছে। করবীকে বোধহয় অনেকেই ভালোবাসতো।

সীমা হাসছে—তুমি কি তাদের দলে?

—খুব বেড়ে উঠেছো কিন্তু?

সীমা আমার কথার জবাব দিল ভ্রূ নাচিয়ে—বেশ!

ওরা এমনিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে। বদ্ধ জীবন থেকে বিশাল আনন্দময় মুক্তির পরিবেশে এসে সীমার সব বাঁধন খসে পড়েছে। অবাক মুগ্ধ চাহনিতে দেখছে এই জগতকে।

ছায়ানীল পাহাড় বনে পড়েছে দিনের আলো, ওই পাহাড় পার হয়ে এসেছি, যেতে হবে সামনের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়সীমা পার হয়ে। পাহাড়ের ঢেউ, ক্রমশ গিয়ে মিশেছে মধ্যভারতের সীমান্তে। সামনে বড়ঝাঁড়ের পর্বত-বনরাজ্য। পাহাড়গুলো মাথা তুলেছে আকাশে।

এর মধ্যে রঞ্জন চা অর্গানাইজ করে হাঁক পাড়ে।

—চলা আইয়ে। ব্রেকফাস্ট রেডি।

দোকানে তেলেভাজা, পুরী আর জিলাবী, ওই জলখাবার। ব্লক-অফিসের দু-একজন কর্মচারী জলপান সারছে, ওদিকে বসে এক ভদ্রলোক চা খাচ্ছিল। আমাদের দেখছে সে।

শঙ্কর বলে—বাঙালী বোধহয় ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকও দেখছেন আমাদের। পুরীর সঙ্গে আলু আর মূলির ভাজি, কাঁসার বড় বড় দিশী থালায় খাবার দিয়েছে দোকানদার। গরম গরম ভালোই লাগে।

ভদ্রলোক হিন্দীতে উত্তর দেন—হিঁয়া কাম্ করতে হেঁ।

ওর হিন্দীতে কেমন অন্য একটা টান। আমি বাংলায় শুধোলাম ওকে—এখানে কদ্দিন আছেন?

ভদ্রলোক একটু বিব্রত ভাব সামলে জানান—তিন বরষ হো গিয়া।

কোনরকমে কথাগুলো বলে উঠে গেলেন, বোধহয় এড়িয়ে গেলেন আমাদের।

বাসের পাত্তা নেই। এদিক ওদিক ঘুরছি। খাপরার ছাওয়া বস্তি, বনের বাঁশের বেড়া দেওয়া। হঠাৎ সেই বেড়ার ফাঁকে খাঁটি গৌড়ীয় ভাষার ফুলঝুরি শুনে থমকে দাঁড়ালাম। বিশুদ্ধ বাংলায় খেউড় চলছে।

দূর সীমান্ত বিহারের এই দুর্গম বন-পর্বত রাজ্যের গভীরে একটি উপত্যকায় ওই ভাষায় কাকে অভিনিষিক্ত করতে দেখে দাঁড়ালাম। ভিতরে খ্যানখ্যানে গলার শব্দ ওঠে।

—মুখপোড়া হাড়মাস জ্বালিয়ে দিলে? কি কুকম্মোই না করেছি তখন!

সরু পথ। আশপাশে দুচারটে ঘর মত। তারপরই খোলা মাঠ আর বনপাহাড়। গারুর বসতি বলতে এইটুকুই। ভিতরে গালবাক্যি শোনা যায় মহিলার,

—ফেরেব্বাজ মিন্‌শে কোথাকার। ফের চোপা। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব না! মরণ আমার। খুব রং চেপেছিল তাই অমন সোনার সংসার ফেলে এলাম ওই ড্যাকরার সঙ্গে। পিরীত। এমন পিরীতের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিই।

চাপা কণ্ঠে কার প্রতিবাদও শোনা যায়—কি যা তা বলছো পটল! এ্যাই—চুপ করো না, কেউ শুনতে পাবে।

—ঠিক বলছি। আবার ছিনেলীপনা আছে। দোব মুড়োঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে। দেখবি?

আরে—আরে?

চমকে উঠলাম। আড়ালে বোধহয় ওই সম্মার্জনীপর্ব শুরু হয়েছে।

পরের সংসারের গাঁজলায় নাক ডুবিয়ে কাজ কি তাই সরে আসছি, আর ভিতর থেকে ধাবমান মূর্তি এসে একেবারে ঘাড়েই পড়েছে হুড়মুড়িয়ে, পিছনে এক নারী-মূর্তি হাতে সদ্যোত্থিত সম্মার্জনী। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালো।

আলুথালুবেশ আর প্রহরণ সংবরণ করে বলে ওঠে মহিলাটি,

—আপনারা বাঙালী?

ঘাড় নাড়ালাম।

সীমা তফাতে দাঁড়িয়েছিল তাকেই বলে,

—কিছু মনে কোরো না বাছা। জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মন-মেজাজ বিষিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন—ভেতরে এসো।

আর ধাবমান পুরুষটি ততক্ষণে সামলে নিয়েছে, দেখি চায়ের দোকানে দেখা সেই ভদ্রলোক। সেও এবার ধরা পড়ে গিয়ে কাছা কোঁচা ঠিক করতে করতে বলে,

—মনে কিছু করবেন না মশাই। মেয়েছেলের বিত্তেপে কেঁচো হয়ে গেছি। হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেল মশাই।

—কি বললে? ও তরফ ফুঁসে ওঠে।

হয়তো ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। মহিলাই বলে,

—মুখে আগুন বাছা। তখন কত কি বলেছিল। কনট্রাকটারি করি, গাড়ি, জিপ কত কি আছে। আমিও মরলাম। বরাতের লেখন কে খণ্ডাবে বলো। তাই মরতে এলাম এখানে।

অতীতের কোন বেদনার্ত কাহিনী, ভদ্রলোক এক মহিলাকে এনেছে, কার বিবাহিত স্ত্রী। তাকে নিয়ে এই নির্জন নিভৃতে ঘর বেঁধেছিল। আজ সেখানে উঠেছে পুতি গন্ধ। সেই প্রেম ট্রেম উবে গেছে একেবারে।

মহিলা বলে—ফিরে যাবার পথও রাখিনি বাছা। এই বন-পাহাড়েই পচে মরতে হবে।

কি ভেবে বলে—একটু চা খেয়ে যাবেন না?

সীমা জানায়—চা খেলাম এইমাত্র দোকানে।

ইতিমধ্যে ছোট বস্তিতে দুচার জন কৌতূহলী মানুয আমাদের দেখছে। কলকাতা থেকে এই বনপাহাড়ে এসেছে এরা। এখানে তেমন কেউ আসে না। দর্শক-যাত্রী-ট্যুরিস্ট-এর আনাগোনা এখানে নেই। হঠাৎ আমাদের ক'জনকে দেখে তাই অনেকেই উঁকিঝুঁকি মারে।

রাস্তার ধারে চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে আছি। বাসের তখনও দেখা নেই। কোথায় রাস্তায় খারাপ হতেও পারে। লোকজনরাও বলে—জঙ্গলের ট্রাক পেলে তাতেই চলে যান বড়ষাঁড়। অনেকে অবাক হয়ে বলে,

—ইয়ে মুলুক দেখনেকো আয়া? বাঙ্গালীলোগ্ এইসাই হ্যায়। কি দেখার আছে এখানে?

ইতিমধ্যে রঞ্জন একটা ট্রাক জোগাড় করেছে। বড়ষাঁড় হয়ে যাবে ট্রাকটা, কিছু পয়সা নিয়ে সে আমাদের পৌছে দেবে ওখানে। বাসও পিছনে আসছে। ওই একটিই বাস তাই প্রচুর ভিড়। তাই ট্রাকখানাকে দাঁড় করিয়ে রঞ্জন আমায় বলে—কোথায় যাস ঘুর ঘুর করে কেবল ধান্দায়, ওঠ। ওরে বাবা—জায়গাও তো নেই। কাঠ আর বস্তার টাল।

ট্রাকওয়ালা এর মধ্যে রাম দুই তিন করে মাথা গুনছে, জঙ্গলে বাঁশ আনতে যাচ্ছে পথে কিছু বাণিজ্য করার জন্যে মালপত্র নিয়ে চলেছে। পাণ্ডব-বর্জিত দেশ, সবকিছুই নিয়ে যেতে হয় নীচে থেকে, তাই মালের উপর বসার ঠাঁইও নেই। টলে ছিটকে পড়ার ভয়ও আছে।

সীমা বলে—বসবো কোথায়? তাছাড়া ওই ট্রাকে ওঠা—ধ্যাৎ! শাড়ি সায়া নিয়ে বিব্রত বোধ করে সে।

অলক বলে—ধুতি না হয়, প্যান্ট পরে বেরুতে হয় মেমসাহেবের মতো। ওসব জবড়জং পোশাক পরে অ্যাডভেঞ্চার করা যায়?

ট্রাকওয়ালা বলে—আউর নেহি উঠ্না, রাস্তা খারাপ হ্যায়—। কথাটা ঠিকই, ছিটকে পড়ারও ভয় আছে।

পিছনে পাহাড়ের গায়ে বাসটাকে আসতে দেখে জানাই,

—তোরা যা, পিছনের বাসে যাচ্ছি আমরা।

কি নেই বাসে? ছাদের উপর পাটি বোনার জন্য সবুজ বন্য-ঘাসের পাহাড়, ভিতরে কম্বল কাঁথা জড়ানো লাঠি সমেত আদিবাসী, না হয় কারবারী লালাদের দল। আর বুচকি বোঁচকায় ঠাসা। দু'জনের বসার সিটে

তিনজন করে বসেছে বাকী নীচের মেজেতে, মালপত্রের উপর। আর তার জন্য এতটুকু বিরক্তি নেই।

ওই আকণ্ঠ বোঝাই বাস উঠবে: দুর্গম বন পাহাড় ঠেলে, আর রাস্তার যা নমুনা তাতে মনে হয় দু'পশলা জোর বৃষ্টি হলে সেটা পাহাড়ের জল নামার পথই হয়ে যায়।

একজন যাত্রী বলে—বাস ভি বন্‌ধ রহতা হ্যায় পাঁচ ছ মাহিনা। এখানে বাস পাঁচ ছমাস বন্ধ থাকে বর্ষাকালে।

পাহাড়ের পর পাহাড়, এতক্ষণ রাস্তাটা এড়িয়ে চলছিল, এখন আর উপায় নেই তাই টপকাতে হচ্ছে পাহাড়গুলোকে। আর এ অরণ্য মধ্যপ্রদেশের অরণ্যভূমির গন্ধপাওয়া জগৎ, এখানে শালগাছগুলো সোজা উঠে গেছে, বিরাট গুঁড়ি। চার থেকে ছ-ফুট তাদের পরিধি, আর বাঁশবন বেশ জবরদস্ত, ঘন-দুর্ভেদ্য। দিনের আলোও ঢোকে না অনেক জায়গায়।

গারু থেকে মহুয়াটাঁড় মায় সীমান্ত অবধি প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল রাস্তা, অধিকাংশই ঘন বনে ঢাকা আর পাহাড়ের পর পাহাড়। তবু মাঝে মাঝে দু'একটা বসতি আছে। সেখানে লোকজনও আছে সামান্যই। তার মধ্যে নামকরা জায়গা ওই বড়ষাঁড, আকাশী, মহুয়াটাঁড়ও। মহুয়াটাঁড় নাকি ব্যবসার জায়গা, মিশনারী স্কুল আছে. টিচার্স ট্রেনিং স্কুল, ডাক্তারখানা রয়েছে। বাজারও বসে। জয়রাম শেঠের সেখানে চালু কারবার। তাছাড়া ওই অঞ্চলে মহুয়া থেকে তৈরী চোলাই-এর ভাটিখানাও বেশ চালু ব্যবসা।

কিন্তু বর্ষা নামার মুখ থেকেই এই বন-পর্বতের পথ একদম বন্ধ হয়ে যায়। গারু অবধি কোনকরমে টিম টিম করে দু'একটা বাস চলে, তারপর থেকেই বাস ট্রাক অচল, এই বনের পথে কোনরকম যানবাহন চলে না। তাই শুধোই ওদের যাবার ব্যবস্থার কথা।

—তব্ আপ্‌লোক আনা যানা করতে হেঁ ক্যায়সে?

আমাব কথায় লালজী ঠাণ্ডা বুনো হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য কান অবধি ভেড়ি মাফলারটা জড়িয়ে বলে—

—পায়দল! মহুয়াটাঁড়সে দো রোজ লাগতা হ্যায় গারু। একরোজমে বড়ষাঁড আক্‌র রহতা হ্যায়, হুঁয়াসেই খতরা জঙ্গল চৌদা মাইল. আদমীলোগ্ এক্‌কাঠা হোকর শোর মোচাকে এই জঙ্গল পাহাড় পার হোকে গারুমে আতা হ্যায়।

সেই আদিমযুগের ব্যাপাব এখনও এখানে চলেছে। গহন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যপথ মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে ওঠে। বুনো হাতি আর এই বনে বাঘের উৎপাতও আছে, ভালুকও জখম করে মানুষকে, সেই দুর্গম পথ পার হয়ে পায়ে হেঁটে আজও এদের চলাচল করতে হয় দীর্ঘ পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পথ ওই আদিম উপায়ে।

লালাজী বলে—বর্ষাকা আগাড়ি সব চিজ সমান লে'কর রাখতা হ্যায়। তব্‌ভি মুস্কিল হোতা হ্যায় বাবুজী। মালুম ইয়ে রাস্তা পাক্কা হোগা, তব্ সবকুছ ঠিক হো জায়েগা। বর্ষাকাল ওদের আতঙ্কেব সময়।

গাড়িটা চলেছে টপ গিয়ারে। গোঁ গোঁ শব্দে আর্তনাদ করতে করতে উঠছে পাহাড়ে। পাহড়ের পর পাহাড় পার হয়ে চলেছি, একপাশে গভীর খাদ—তার বুকে বিরাট শাল, বাঁশ বনে ভরা' নীচের অরণ্যভূমিতে দিনের আলো পড়েছে। বহু নীচে দেখা যায় একটা পাহাড়ী নদী।

একটু ফাঁকায় সেগুনগাছের ঘন জঙ্গল, আর সেই গাছগুলোকে হাতির পাল ভেঙে ছড়িয়ে রেখেছে। কোনটা তাজা—কোনটাকে বোধহয় সব উলটে দিয়ে হাতির পাল চলে গেছে ভিতরে বাসের শব্দ পেয়ে।

এই জঙ্গলগুলোই হাতির বারোমাসের আস্তানা। বেতলা পার্কে যে হাতির দলকে দেখেছি তারাও আবার শীতের শেষে চৈত্র বৈশাখ মাসে এখানে ফিরে আসে।

মাটির রাস্তা—মাঝেমাঝে খানা খন্দ, একদিকে ওই গভীব খাদ। সেই পথের রেখা বয়ে বাসটা নামছে টলতে টলতে।

অনেকখানি নেমে রাস্তাটা একটা ছোট্ট নদীর কাছে এসেছে, নদীর উপর পাথর ফেলে কজওয়ের মত করা।

বাসটা জলের ধারে পৌঁছতেই কে আর্তনাদ করে ওঠে বাসের মধ্যে।

—রোকিয়ে। রোকিয়ে ড্রাইভার সাব্।

—এই বনের মধ্যে কে নামবে রে বাবা? সীমা অবাক্ হয়। গাড়ির ভিতর কম্বলজড়ানো এক মূর্তি ততক্ষণে হল্‌দে পৈতে ফড় ফড় করে কানে জড়িয়ে ঠেলে উঠে আর্তনাদ করছে।

—খত্‌রা হো যায়েগা, বহুৎ খারাব হো যায়েগা জী। রুখিয়ে—গাড়ি রুখিয়ে।

গাড়িটা থেমে গেল। কে জানে ডাকাতের দল হবে কিনা? এই জঙ্গলে জোর করে গাড়ি থামিয়ে এবার সব লুঠে-পুটে নেবে বোধ হয়। লালাজী ফুঁসে ওঠে।

—মৎ রুখিয়ে।

কিন্তু গাড়িটার স্পীড কমতেই সেই ব্যক্তি লাফ দিয়ে নেমে একটু ঘাসবনের মধ্যে গিয়ে প্রাকৃতিক কর্ম করতে শুরু করলো। তারই তাগিদে সে মরীয়া হয়ে উঠেছিল বোধহয়। রাত্রি থাকতে ডালটনগঞ্জ ছেড়ে এসেছে এত পথ এসে বেচারা আর সামলাতে পারেনি।

গা ছমছম করে। শীতের বাতাসে পাতা ঝরছে, ওই বনমর্মরে যেন কাদের চাপা শব্দ ওঠে, হয়তো হাতির পালই ঘিরে ফেলবে আমাদের, না হয় জলের ধারে বুকভোর ঘাসের বনে কোন হিংস্র বাঘ ওৎ পেতে আছে।

—আর এইখানেই কাণ্ডটা বাধল। পিছনের একটা টায়ার থেকে শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে। ক্লিনার ছেলেটা আর্তনাদ করে ওঠে।

চাকা ফাঁস গিয়া ইহার। হাওয়া নিকলতা হ্যায়।

পাহাড়ী রাস্তা, ঠাসবোঝাই বাসে ওই ফাঁসা চাকা নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। তাই ওরা চাকা বদলাচ্ছে জ্যাকে গাড়ি তুলে।

—ওমা! ওই চাকাতে চলছে গাড়ি? সীমা চমকে ওঠে।

স্টেপনি মাত্র একটাই, সেটাও গ্রাটিস দেওয়া, আর অন্য যে ভালো চাকাটা রইল। জ্যাকে গাড়ি তুলতে তার অবস্থা দেখে চমকে উঠি। সেটার সর্বাঙ্গে কানাই বাউলের আলখাল্লার মত পটি মারা, টায়ারটা মাঝে মাঝে আবের মত ফুলে আছে। ওই অবস্থায় সে এই দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে চলেছে।

কনডাক্টার বলে—টায়ার নেহ মিলতা হ্যায় বাবুজী?

সে খবর তো কাগজেই দেখি, কিছুই মেলে না। আবার টায়ারের জন্য লটারী হয়।

ওরা ওরই মধ্যে নাটবল্টু খুলে কাজ সেরে ফেলে চটপট। গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

সীমা বলে—বনপাহাড় পার হব কখন?

চোদ্দমাইল বন আর পাহাড়। মধ্যে একটা পাহড়ের উপর একটু ফাঁকায় সুন্দর একটা ফরেস্ট রেস্ট হাউস, ইউক্যালিপটাস গাছের প্রহরায় সাদা বাড়িটা রোদে ঝলমল করছে, চারপাশে ফুলের গাছ, জিনিয়া, ডালিয়াও ফুটেছে। বাংলোর এলিভেশন প্রায় দেড় হাজারও ফুটেরও বেশী।

পেছনের পাহাড়ের ঢালু জমিতে ছড়ানো কতকগুলো মাটির বাড়ি, ছাউনি ছিটকে পড়েছে, দেয়ালগুলো ফেটে গেছে, কোনটা ধ্বসে পড়েছে। বাড়ির লাগোয়া বেড়ায় এখনও শিম, লাউ-এর গাছগুলো ছিন্নভিন্ন অবস্থায় দুলছে। দু'চারজন লোককে দেখলাম ওই ভাঙ্গা বাড়ি থেকে ভাঙ্গা চারপাই, তালাই, হাঁড়ি-কুঁড়ি বাঁকে বেঁধে-চলে যাচ্ছে।

ক'দিন আগেও ছিল জনবসত। কিছু আদিবাসী ওঁরাও, মুন্ডাদের বাসছিল পুরুষানুক্রমে, আজ সব ছেড়ে ওদের চলে যেতে হচ্ছে। তাই বোধহয় পিছন ফিরে চায় ওরা সেই ভিটের দিকে। ক্ষেতে ছড়ানো সরষের গাছে ফুল এসেছে। পিতৃপুরুষের পুজা করা করম গাছ ঝোরার জলে ফেলে চলে যতে হয়।

লোকটাকে শুধোলাম—গাঁও ছেড়ে চলে যাচ্ছো কেন?

ফরেস্ট গার্ড বলে—হাতিকা তানসে। সাতরোজ আগাড়ি দো আদমীকো মার দিয়া। হররোজ আতা হ্যায়, বসতি হেলাং দিয়া। হাতির পাল প্রতিরাত্রে এসে ওদের বসতিতে হামলা করছে। মানুষও মেরেছে।

বুনো হাতির দল ওদের বসতিতে হানা দিচ্ছে, ফসলও হবে না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাই ওদের এখান থেকে অন্যত্র, নিরাপদ এলাকায় বসতি গড়ে দিচ্ছে। শুধোই ওদের,

—মাড়োমার বাংলো ভি বন্ধ হো যায়ে গা?

আমার কথায় মাড়োমার বাংলোর গার্ড চৌকিদাররা জানায়, আমাদের ফরেস্ট গেটে থাকতে হবে বাবু। হমলোক্ কো রহনে পড়ে গা। ফরেস্ট নাকা হ্যায় না—চেক পোষ্ট ভি রহেগা। হাতি হম্‌লোগকা নিদ্ হরণ কর লিয়া বাবুজী। হররোজ নাকামে—বাংলোমে আতা হ্যায়। তন্ করতা। হাতি ওদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

হাতির রাজ্য। তাদের মর্জিতে ওদের বাস করতে হয়।

এবার বাস-এর ইঞ্জিন বিগড়েছে। তবু এখানে লোকজনের একটা আশ্রয় আছে, যদিও সেখানে হানা দেয় বুনো হাতির দল, বাঘ এসে হুঙ্কার ছেড়ে দাবাড় মারে।

সীমা বলে—হয়ে গেল। খুব বাসে চড়েছি যাইহোক এখনও সামনে বন আর পাহাড়, এসব ঠেলে যাবো কি করে?

বাসের যাত্রীরা নেমে পড়েছে। হাত পা ছড়াচ্ছে তারা। ড্রাইভার ইঞ্জিনের তারগুলো দেখছে নেড়ে চেড়ে। পাহাড়ের মাথায় বাংলোটা—এদিক ওদিকে ঘুরছি। ট্রাকটা আগে চলে গেছে। এখান থেকে বড়ঝাঁড় পাঁচ মাইল, পথে আবার ঘন বন। যাবারও উপায় নেই হেঁটে। সীমার কথার উত্তর দিই,

—তখনই বলেছিলাম এ পথে দুঃখ বিপদ পদে পদে। না বেরুলেই ভালো করতে।

সীমা জানায়—নিজেব কথা ভাবছি না। ভাবছি তোমার কথা? তোমাকেও তো যেতে হবে। খাবে কি এখানে?

একটু অবাক হই।

যাত্রীবা গাছেব ছায়ায় জিরুচ্ছে, ঝর্নার জলের ধারে কেউ বসে গেছে রুটির তাল খুলে। এসব ঝামেলায় ওরা অভ্যস্ত তাই বিনা প্রতিবাদেই ওরা বসে গেছে যত্র তত্র।

—খাবার কিছু মিলবে না? সীমা চৌকিদারকে শুধোতে সে বেচাবা মাথা নাড়ে। এখানে মানুষ আসেনা—থাকে ওরা ক'জন। তাই বলে—মকাইকা ভাত ও ছাতু পাকাতে হবে।

সামান্য ওদের প্রয়োজন। সীমা হতাশ হয়—তাহলে কি করা যাবে!

—বায়ুসেবন। চুপচাপ বসে থাকো। নড়াচড়া করলে খিদে পাবে। নির্লিপ্তভাবে জবাব দিই সীমাকে। অনিশ্চিতের মাঝে এমনি দুর্গম বনাঞ্চলে হারিয়ে যাওয়ার আনন্দ আছে।

সীমা বলে—তোমাব এতটুকু ভয় ডর নেই? এই জায়গা কত বিপদেব তা শুনলে তো?

বলি—তুমে তো সঙ্গে আছো? ব্যস—নো ফিয়ার।

—ইয়ার্কি রাখো। সীমা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

—সেকি? কবির কথা জানো না?

পাড়ি দিতে নদী
হাল ভাঙ্গে যদি, ছিন্ন পালের কাছি।
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে কহিব
তুমি আছো আমি আছি।

সীমা চুপ করে বসে আছে। এলোমেলো বাতাসে উড়ছে ওর চুলগুলো। এ যেন পথের চিরন্তন সাথী। শহরের শান পালিশ প্রসাধনও নেই, এই পরিবেশে ওর আসল রূপটা ফুটে উঠেছে। সেটা অনেক শান্ত সমাহিত মাধুর্যময়। সীমা কি ভাবছে ওখানে বসে।

ওকে জানাই—জীবনকে দেখতে এসেছো, কিছুটা দেখ। দেখে যাও একজন সাহিত্যিক শুধু চারদেওয়ালের মধ্যে বসেই আকাশ-কুসুম কল্পনা করে সাহিত্য রচনা করে না। তাকেও এসব বিপদে পড়তে হয়।

—তাই মনে হয় তোমাকে এত কাছে থেকেই পুরোপুরি জানতে পারিনি। সীমা ডাগর চোখ তুলে জানায়।

—জেনে লাভ কি বলো?

সীমা হাসল—এড়িয়ে যেতে চাও?

—ওরে ফুরায় যা তা দে ফুরাতে,
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম, ফিরে চাসনেকো কুড়াতে।

যা দুদিনেই বাসি হয়ে যাবে, তার বং হারিয়ে ফেলবে তাকে কাছে টেনে লাভ কি? এই সবুজ বন-পাহাড়, নির্জন কোন অধিত্যকা, ফুলফোটা বাংলো সব মিলিয়ে চোখের নজর বদলে যায়, মনের ভালো লাগাও। এই জগতে যাকে ভালো লাগে শহরের মালিন্যে তাকে আরও কদাকার ঠেকবে।

সীমা জানায়—আমাকেও তেমনি বোধ হবে, না?

এভাবে পথচলতি মানুষকে কাছে চাইনি। জড়াতে গেলে শুধু বাধাই পড়ে। তবু সীমা কাছে এসেছে। এড়াতে পাবিনি তাকে।

দূরে বনপাহাড়ে একটা শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠি, একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ওঠে। ঘুব পাহাড় ঠেলে উঠছে গাড়িটা।

বাস আমাদের স্থানু হয়ে গেছে। ড্রাইভার চেষ্টা কবছে কিন্তু কখন চলবে তার হদিস নেই। যদি ওই গাড়িটাকে থামিয়ে বড়ষাঁড় পৌছাতে পারি তবু আহার আশ্রয় মিলবে, রঞ্জন শঙ্করদেরও ফিরে পাবো। রাত্রিবাস করার র‍্যাগ কম্বলও ওদের সঙ্গে। তাই রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলাম ওই জিপটাকে থামাবাব জন্য।

চারিদিকে ঘন বন, মাঝখানে পাহাড়ের মাথায় মাড়োমাব বাংলো। একটা জিপ পাহাড়-বন থেকে বের হয়ে আসছে।

কাছে আসতে দেখি রূপ সিং বসে, ওদিকে রয়েছে গৌরী। আমাকেও তাবা দেখেছে। রূপ সিং ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করতে গাড়ি থেমে যায়। গৌরী আমাদেব দেখে অবাক হয়, রূপ সিংও।

—আপনি এখানে? তাজ্জব! এখানে আপনি এলেন ক্যায়সে?

জানাই—বাসে যাচ্ছিলাম, বাস বিগড়েছে।

রূপ সিং বলে ওঠে—তামাম্ জঙ্গলমে চক্কর লাগাতে হে? খুব ঘুরছেন। জানাই—বড়ষাঁড় যাবাব পথে আটকে পড়েছি।

রূপ সিং বলে—বড়ষাঁড় যাবেন? সাবাস বাবুজী, আখের বাঙ্গালীবাবু এইসাই হোতা হ্যায়! চলো উধাব, কাহে নেহি মালুম। চলনা—ব্যাস। তব আইয়ে—

রূপ সিংহ হাসছে ঠা ঠা করে। আজ সে যেন অন্য মানুষ। বেশ মেজাজেই আছে।

গৌরী বলে—আসুন। ওখানে কাছেই যাবো আমরা।

—আর একটি সচল লাগেজ আছে যে? এসো সীমা।

সীমা স্কার্ফ, শাল, সোয়েটারের বোঝা নিয়ে এসেছে। গৌরীর দু'চোখে বিস্ময়, আমার দিকে চেয়ে হাসল একটু। পবক্ষণেই সীমাকে বলে সহজভাবে,

—উঠে আসুন গাড়িতে।

আবার বন ঘন-গহন বন এবারের পাহাড় আরও খাড়াই। এ রাস্তা দিয়ে বাস চলে কিভাবে জানি না। জিপই আর্তনাদ কবে চলেছে।

গৌরী গম্ভীর হয়ে গেছে। সেই মুখরা উছল মেয়েটিব মুখেচোখে কি যেন ভাবনার কালো ছায়া। বনের আঁধাব এখানে ঘনতব, দুপুরেও রোদ ঢোকে না। ঘন বনের মাঝে দুটো হরিণ জিপের শব্দে সচকিত হয়ে দাঁড়ালো। একপাল ময়ূব ছটপট করে এ ডাল থেকে ওডালে উড়ে যায়। আমরা ওদের শান্তি ভঙ্গ করেছি।

গৌরী কি ভাবছে, ওর মুখে চিন্তার জমাট ছায়া। রূপ সিং বলে, খুব খারাপ জঙ্গল বাবুজী। হরিণটা দৌড়ে সরে গিয়ে চেয়ে থাকে আমাদের দিকে। ওদের কালো চোখের সঙ্গে গৌরীর চোখের কি যেন মিল রয়ে গেছে।

ড্রাইভারটির বয়েস কম, দেশওয়ালী কোন পাঞ্জাবীই। বলিষ্ঠ চিবুক, নাকটা ধারালো। মাঝে মাঝে বনরাজ্যের জীবনকে দেখছে আর একসিলেটার দেবে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে।

রূপ সিং-এর মুখে ক্লান্তির ছায়া। বয়সের ছাপটা দিনেরবেলায় প্রকট। তবু সে যেন দ্রব্যগুণে উছল হয়ে উঠেছে। বলে চলছে সে,

—বড়ষাঁড় কা পানি বহুৎ আচ্ছা। একঠো ঝোরা হ্যায় পাহাড়সে কাঁহা নিকাল আতি হ্যায় উস্‌কা পানিসে ডিস্‌টিলেশন বহুৎ আচ্ছা বনতা, একদম স্কচকা মাফিক।

রূপ সিং এই বনপাহাড়ে একেবারে স্কচ মহুয়া-চোলাই-এর ফলাও ব্যবসা খুলেছে। সেই দ্রব্য বোতলজাত করে তামাম বিহার-মধ্যপ্রদেশ এলাহাবাদ মায় কলকাতার বাজার মাৎ করেছে। আর গোপনে তার ব্যবসা এইটাই। সেই উপলক্ষে এই বনপর্বতে শিকড় গজিয়েছে রূপ সিং।

স্কটল্যান্ড দেখিনি, সুইজারল্যান্ডও দেখেছি ছবিতে। তবে শিলং-এর পর্বতরাজ্য, কুলুমানালীর পার্বত্য উপত্যকার ছোট জনপদ দেখেছি। সুন্দর-স্বপ্নময়। পর্বত অরণ্যানীর সুন্দরী কন্যা। প্রকৃতি একে মনোমত করে সাজিয়েছে।

বড়ষাঁড় তেমনি একটি রূপবতী কন্যা। বসতি খুবই সামান্য, চারিদিকে একটু ফাঁকা—তারপরই আকাশছোঁয়া পাহাড়ের বৃত্ত। একটা ঝর্নার জলরেখা পার হয়ে উঁচু মালভূমিব উপর বসতি দেখা যায়। পাশে রয়েছে পশু চিকিৎসালয়, অবশ্য তার দরজা বন্ধ। ওপাশে সেগুন আমলকী গাছের বাগানের মধ্যে ছবির মত ফরেস্ট বাংলো, ফুলের রাজ্য। বোধহয় আপনিই হয়, রাস্তার এদিকে ফরেস্ট-এর গার্ড, চৌকিদার বিট অফিসার এর কোয়ার্টার, পাশেই রাস্তাটা বেঁকে গেছে। বনস্পতির মত ক'টা আমগাছের ছায়ায় টানা লম্বা খাপরায় ছাওয়া ঘর, চায়েব দোকান—পেঁড়া, জিলাবীও মেলে। মালভূমিকে ঘিরে রেখেছে ওই ঝর্নাটা। তার কলশব্দ কানে আসে।

শঙ্কর আমাদের দেখে চায়ের দোকানের মাচা থেকে উঠে আসে। আমাদের বলে,

—বাস আসেনি। ভাবনাতে পড়েছিলাম।

রঞ্জন বলে—যাক। এসে গেছিস? বল্লাম একসঙ্গে আয়। । যাক্ গে—অল্ এ্যারেঞ্জমেন্ট রেডি। ফরেস্টের বাংলো ঠিক করে এসে এখানে পথের ধারে চায়ের দোকনে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা।

সুন্দর পাহাড়ঘেরা ছোট্ট জনপদ। ওদিকে কয়েকটা ঘর বাড়িও রয়েছে। রাস্তার ধারে বিশাল আমগাছর নীচে বিনোদকুমারের চায়ের দোকান, ওপাশেই পাহাড়টা বনঢাকা অবস্থায় ঠেলে উঠেছে ঝর্নার পাশ থেকে। সীমাকে গৌরী কি বলছে, দুজনে এরমধ্যেই বেশ ভাবও হয়ে গেছে।

রঞ্জনের ডাকে দোকানদার কাজ ফেলে এগিয়ে আসে। বাস আসেনি আজ বিক্রি তার মন্দা। তবু আমাদের পেয়েছে। গোলগাল হাসিমুখ ছেলেটিকে রঞ্জন বলে,

—আরও দুটো মিল হবে। এনাদার টু টিজ উইথ পকৌড়া লাগাও। সিংজী চা হবে,

—না। এখন থাক। ও খেলনা।

রূপ সিং দেখায় পাহাড়ের নীচে একটা বাংলো ধরনের বাড়ি। ওপাশে লম্বা টালা খাপবার শেড-মাটির দেওয়ালে সাদা রং করা একটা কাঁকুরে রাস্তা চলে গেছে ওদিকে। রূপ সিং বলে,

—ওহি হামারা গরীবখানা। আইয়ে বৈকালমে।

গৌরী সীমাকে কি বলছে। আমার দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। আমাদের নামিয়ে দিয়ে জিপটা এগিয়ে যাচ্ছে ওই টিলার উপরের বাড়ির দিকে। জায়গাটায় স্তব্ধতা নামে এবার।

সীমার চুল ধুলোয় রেঙ্গে উঠেছে। শাড়িতে ধুলোর আস্তরণ। শঙ্কর বলে সীমাকে,

—ভালো মানিয়েছে এইবার।

অলক বলে—যাযাবরের দলে নাম লিখিয়ে এইবার ঠ্যালা বুঝুন। হোটেলমে খানা—মস্‌জিদমে শোনা। ব্যস।

সীমা হাসতে হাসতে বলে—তাই দেখছি। হিপির দল নাকি তোমাদের? দাও, চা দাও। ইস্ যা ফেরে পড়েছিলাম। খিদেতে নাড়ী জ্বলছে।

দোকানের আয়নায় সীমা নিজের ওই ধূলিধূসর মূর্তি দেখে অবাক হয়।

—এ মা! গেরুয়া ধুলোয় একেবারে ভৈরবী হয়ে গেছি, ছি-ছি।

শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ-চুল ঝাড়তে থাকে। বড়ষাঁড় নামের মূলে একটা কারণ বোধ হয় রয়েছে। এখানকার উচ্চতায় আর ঘন সবুজ পার্বত্য পরিবেশে বোধহয় গরুগুলো বড়-সড় হয়। তাই এর নাম বড়ষাঁড।

ছোট জনপদটা প্রায় দু'হাজার ফুট উঁচুতে। দুপুরের হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ ফুটে ওঠে। বাংলোর দিকে এগোলাম।

চৌকিদারই জানায় খববটা। সাজানো বাংলো। সে বলে,

—ঝোরামে নাহা শাক্‌তে? নেহি তো পানি উঠায়েঙ্গে?

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন। বেতলায় কটেজ নিইছি—তবু তারা ফাঁকা থাকলে দূর বনের মধ্যে ছড়ানো যে-কোন ফরেস্ট বাংলোয় থাকার অনুমতি দিয়েছেন। আর এই দূর দুর্গমে বিশেষ কেউ ঠেকায় না পড়লে আসেন না। তাই আমাদেব দখলেই এসে গেছে আজ বাংলোটা। অন্য কোন অতিথি এখানে নেই।

দুপাশে দুটো ঘর—মাঝখানে একটা বড় হল মত, লাগোয়া বাথরুম। স্যানিটিবী পায়খানা, শাওযাব, খাটে গদি, মশারি কোন কিছুরই অভাব নেই।

অলক বলে—ঝোরাতেই স্নান কববো।

সীমা জানায়—চলুন,—তবু জায়গাটা দেখা যাক। না হয় এখানেই স্নান করবো বেশি অসুবিধা হলে, নইলে কেচকির মত ওখানেই নেয়ে নোব।

পথের ধারে এমনি করে মানুষ হারিয়ে যায়। দুপুরের মিষ্টি হলুদ রোদ লেগেছে ঝর্নার ধারের ধান-ক্ষেতে। হলুদ ধানগুলো ওরা কাটছে, ভালো করে পাকতে দেবাব উপায় নেই, হাতিব রাজ্য। তাই ধান কাটছে ওরা।

ক্ষেতের নীচে একটা টিলার গায়ে পাইপ লাগানো তাই দিয়ে বেগে জল নামছে। এই সেই ঝর্না—যার উৎস-মূল কো্ পাহাড়ের অতলে জানা নেই, এখানে এসে বের হয়েছে। স্বচ্ছ কাঁচধার জল এসে আচড়ে পড়ছে নীচের পাহাড়ী নদীটায়।

তেল মেখে ওই জলের ধারে নামছি, হঠাৎ দেখা যায় কয়েকটা ময়ূর এসে পড়েছে, একটা ময়ূর আমাদেব জামাকাপড়ের মধ্যে থেকে অলকের পেনটা বের করে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে নিরীক্ষণ করছে। গোলামির ওই যন্ত্রটা সে ইতিপূর্বে দেখেনি। ব্যাপারটা নজবে পড়তে বলি,

—তোর কলম গেল অলক ওই দ্যাখ।

—হেই। অলক হেঁকে ওঠে—বিল টৌট্যাল দিতে পারবো না বাবা, ওটিকে রাখো।

কে শোনে কার কথা। ময়ূরটা কলম নিয়েই দৌড়ালো। অলক দৌড়চ্ছে, ওদিকে সীমা আঁচল কোমরে জড়িয়ে ময়ূরের উদ্দেশ্যে মাঠময় দাবড়ে ফিরছে। মেয়েরা ধান কাটছিল তারাও মজা দেখছে আর খিলখিল করে হাসছে।

শেষকালে কোনমতে কলম ফেলে দৌড়ল ময়ূরটা বিরক্তি ভরে। ওর ওই দ্রব্যে কোন অকর্ষণ নেই। আবার ধানক্ষেতে নামে দল সমেত ময়ূবগুলো।

রঞ্জন বলে—ন্যাশনাল বার্ডের ইজ্জৎ জ্ঞান আছে।

সীমা শোনায়—হ্যাঁ। আর সেটা তোমার থেকেও বেশী। অরণ্যের দিনরাত্রির পোজে যা দৌড়চ্ছিলে?

রঞ্জন মেয়েদের সামনে নিজেকে ওই বেশে দেখে লজ্জা পেয়ে গায়ে তোয়ালেটা জড়িয়ে ফেলে। আমি বলে উঠি,

—কি রে শাড়ি দোব? যা লজ্জা তোর। সীমাকেও লজ্জা দিলি?

—ধ্যাত্তেরি। রঞ্জন বিব্রত হয়ে জলে নামলো।

সীমা হাসছে বেশ ঝর্নার মত। রঞ্জন চটে উঠেছে তাই মুখ ফিরিয়ে স্নান করতে থাকে।

আমতলায় বিনোদকুমারের রেস্তোরায় নড়বড়ে টেবিলের উপর কাঁচা শালপাতায় সুন্দর চালের ভাত, পলাশপাতার তৈরী বাটির মত করে তাতে অড়হরের ডাল ও আলুর তরকারি, বেগুনের ভর্ত্তা, তৎসহ কাঁচা আমলকীর চাটনি সহযোগে লাঞ্চ সারতে বসেছি। অপূর্ব এর স্বাদ।

সীমা আমলকী চুষতে চুষতে বলে—সুন্দর। চমৎকার টেষ্ট কিন্তু। আর বিনোদ খান্না—

বিনোদকুমার ট্রানজিষ্টার রেডিও মারফৎ ওসব ফিলমী দুনিয়ার খবর জানে, তার দোকানের বেড়ার গায়ে ক্যালেণ্ডারের পাতা—কিছু ফিল্‌মী কাগজের পাতায় ছাপা বোম্বাই-এর সব তাবড় স্টারদের ছবি লটকানো। তাই ওকে বিনোদ খান্না বলে ডাকতে খুশী হয়ে হাসলো। কলকাতার নাম শুনেছে সে। সেখানকার ছেলেমেয়েরা এই বনে তার হোটেলের খদ্দের হবে জানা ছিল না। আজ তাই বেশ খুশী হয়ে খাওযাচ্ছে।

বিনোদ এগিয়ে আসে। সীমা শোনায়—সুন্দর রান্না হয়েছে। রাত্‌মে ক্যা খানা দেনা? কি খেতে দেবে রাতে।

বিনোদ জানায়—রোটি, দাল আর সবজি চাটনী। দুধ ভি আচ্ছা মিলতা হ্যায়। রূপেয়া সের। দুধ নেবেন?

শঙ্কর একটু ভোজন-বিলাসী ও বলে—তবে মিল্ক ভি লাগাও। দুধ খেতে দোষ কি? ঘি দিয়ে চাপাটি হোক।

সীমা হাসে—এই খেল, এখনও আঁচায়নি বলে রাতে কি দেবে? উঃ একটু গড়াতে হবে। চলি।

দুপুর এখানে স্তব্ধ, বাংলোর কাঁকর ঢালা পথের উপর চারা পাইনগাছের ফাঁক দিয়ে হলুদ আলো এসে পড়েছে। ধানক্ষেতে পাহাড়ের কোলে ফিকে আঁধার নামছে—পাহাড়ের মাথায় এসে ঠেকেছে সূর্য, ওদিকে গড়িয়ে পড়লে এই উপত্যকার ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে।

এর মধ্যে বাতাস হিম হিম হয়ে উঠেছে। একদল সবুজ টিয়া পাখী কলরব করছে, রোদে পিঠ দিয়ে ডেক চেয়ারে বসে আছি। সীমার চুলগুলো পিঠময় ছড়ানো—হাল্‌কা আকাশী রঙের শাড়িটা পিঠের রেখাকে মুখর করে তুলেছে, সীমা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চাইল। ওর কালো চোখে অরণ্যের মায়া।

ক'দিনেই ওর কলকাতার মুখোসটা খুলে গিয়ে কঠিন সোজা চাহনি আর সহজ ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। আমাকে শুধোয়,

—গৌরী, ওই সর্দারজীর বৌকে চেনো বুঝি?

ও এই কথাটা যে এমনি নিভৃত অবসরে ভাবছিল জানা ছিল না। ওর কথায় একটু অবাকই লাগে।

—কি জবাব দিচ্ছনা যে? সীমা তাগিদ দেয়।

ওর কথায় জানাই— আসার দিন একসঙ্গে ট্রেনে এসেছি ডিহ্‌রী থেকে, তখনই চেনা-জানা হয়েছিল মাত্র।

সীমার মুখে হাসির তীক্ষ্ণতা জাগে। আসার সময় গৌরীর সঙ্গে ওর কথাও হচ্ছিল দেখেছি। সীমা বলে,

—ও তোমার নাম জানে। কলকাতার মেয়ে—বাংলা পড়েছে। অনেক বন্ধু-বান্ধবও ওর বাঙালী। কিন্তু মেয়েটার হয়েছে জ্বালা—ওই বুড়ো রূপ সিংকে নিয়ে? লেখাপড়া জানা মেয়ে এই বনের মাঝে এই বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে ঘর করতে পারে?

এই সময়টুকুর মধ্যে ওদের মধ্যে অনেক কথাই হয়েছে, আর সীমা এরই মধ্যে গৌরীর হয়ে ওকালতিও শুরু করেছে। সীমা বলে,

—রূপ সিং লোকটা সুবিধের নয়। গৌরীর সত্যি খুব বরাত মন্দ।

উদাসীন স্বরে বলি—ওসব কথা জানার সময় কই বলো? কতটুকুই বা চিনি ওকে। বুঝলাম কখন!

সীমা বলে—বোঝ অনেক কিছুই, এর মধ্যে দু'একবার ওদের বাংলোতেও দেখা হয়েছে শুনলাম।

—অনেক খবরই পেয়েছো। বাঃ। বলে উঠি।

সীমা হাসছে খিলখিলিয়ে। হাসি থামিয়ে বলে,

—অবশ্য অ্যাডভান্স রিপোর্ট কিছুই পাইনি।

—আমার চরিত্র সম্বন্ধে হঠাৎ এতটা ঔৎসুক্যের কারণ কি বলতে পারো? বিশ্বাস করো আমি নিরপরাধ।

সীমা চোখ বুজে মাথা নেড়ে বলে—ভয় পেয়ে গেলে বোধহয়? যাক্‌গে বাপু—কার মনের দৌড় কোথায় খুঁজে লাভ কি? সিনারি দেখছি—তাই দেখি।

চুপ করে বসে আছি। আলো মুছে আসছে দূর পাহাড়েব কোলে কোলে, একক নিঃসঙ্গতাব মাঝে নিজের এই সত্ত্বাকে অনুভব করতে চাই। হঠাৎ সীমার কথায় ফিরে চাইলাম। ওর কণ্ঠস্বর গাঢ়, দু'চোখে পাহাড়কোলের কালো ছায়া। সীমা বলে,

—রাগ করেছো? ওই সব কথা বল্লাম—

—না। না। তবে একটু নিশ্চিন্তবোধ করছি।

—কেন? সীমা ঘাড় ফেরালো।

এতদিন পব একটা গার্জেন জুটলো এই বনে পাহাড়ে এসে। কিছু এদিক ওদিক করবো তাব উপায নেই।

—ধ্যাৎ। অসভ্য—সীমা কৃত্রিম কোপে ধমক দেয়।

—বারে—তুমি বলতে পারোনি, কথাটা আমিই পরিষ্কাব করে দিলাম।

সীমা বলে,—এ্যাই। আমার বয়ে গেছে ওসব দেখতে। করো না, যা খুশী।

সীমা ওপাশ থেকে এগিয়ে এসে আমার চুলগুলোকে ধরে নাড়া দিতে থাকে, পাখী ডাকা বনভূমি, ঝর্নার কলকল্লোলভরা বাতাস—এ যেন সবুজ হলুদ স্বপ্নরাজ্য, সীমার ঝাঁকনিতে আমার সারা শরীবে নিমেষেব মাঝে যেন রোমাঞ্চ জাগে। ওর নিটোল হাত জামার বাঁধনে বাঁধা দেহের পুরুষ্ঠু ডাগর রেখাগুলো মুখব হয়ে সারা শরীরের অণুপরমাণুতে ঝড় তুলেছে। ওকে কাছে টেনে নিই।

ওর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস গালে আগুনের ছোঁয়া বুলোয়। সারা মনের পুঞ্জীভূত কি কামনার আগুনকে সীমার ওই স্পর্শটুকু প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছে। নিজের মনের এই দৈন্য অপরিসীম তৃষ্ণার খবর আমার জানা ছিলনা।

সীমা নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। ওর গালে লালচে ছোপ, দু'চোখে হয়তো তৃপ্তির আশ্বাস। সীমা মনেমনে কোথায় যেন খুশী হযেছে। তাই চাপা খুশীর ঝলমলে আভাস ওর চোখে মুখে।

বিনোদ খান্নার গলা শোনা যায়—চা লায়া দিদি!

সীমা সচকিত হয়ে চাইল আমার দিকে কি লজ্জার রঙীন সুর ওর মনে। বনপাহাড়েব ওদিক থেকে সেই বাসটা এতক্ষণে মেরামত করে এদিকে আসছে।

গুরু গুরু শব্দ ওঠে। এখান থেকে আরও বারো-চোদ্দ মাইল গেলে মহুয়াটাঁড়। বিনোদ বলে—বাসটা কাল বৈকালমে লোটেগা, অব চলে দিদি—মালুম খরিদ্দার কিছু লাগে গা।

রঞ্জন কলকাতাব বাবু, গোলগাল নধব চেহারা, খাওয়ার পর দিবানিদ্রা একটু দিতেই হবে। শঙ্কব ততোধিক আয়েসী—তার আবার নাসিকা গর্জনও শোনা গেছে। চায়ের নামে একে একে শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছে।

অলক বলে—একটা কাজে লাগানো গেছে তোমাকে সীমাদি। এবারে ভাবছি পাকাপাকি ভাবে দলে ভর্তি করে নোব।

সীমা বলে ওঠে—ইস্! বয়ে গেছে এই বাউণ্ডুলে ভবঘুরের দলে ভিড়তে?

একপাল মালাবার হর্ন বিল—লম্বা হলুদ ঠোঁট মেলে কলরব করে, উড়ে চলেছে টিয়ার ঝাঁকে। আমলকী গাছের সাদা ডালে চিরল পাতার আড়ালে গ্রীন পিজিয়নগুলো কলরব করে।

জিপটা হাঁকিয়ে রূপ সিং নিজে এসেছে এখানে।

—কি করবেন বাবুজী বৈঠ-বৈঠকে। চলুন। সীমাকে বলে আপনিও যাবেন।

ওর জিপে বের হলাম। সীমা শুধোয়—গৌরী আসেনি কেন?

রূপ সিং জানায়—তবিয়ৎ ঠিক নেহি মালুম। বৈকালে বন দেখবেন না?

এখানের জঙ্গলে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দূরে বনের পথে চলেছে একজন অধিবাসী, হাতে একটা টাঙ্গির মত ছোট কুড়ুল, লোকটা মাঝে মাঝে পথের ধারের গাছে কুড়ুলের উল্টোপিঠ দিয়ে খট্ খট্ শব্দ করছে আবার চলছে। কিছুটা চলার পর আবার ওমনি শব্দ করে এগোচ্ছে।

রূপ সিং বলে—উ আওয়াজ দেতা হ্যায়, যাতে শের, হাতিভি মালুম পায় কোই আতা হ্যায়। হামেশাই জানোয়ারভি এ্যাটাক নেহি করতা বাবুজী, উলোক্‌ভি শান্তিসে রহনা চাতা হ্যায়।

ঘন বনের নীচে আঁধার নামছে। বেতলা অরণ্যের মত এখানে বন্যপ্রাণী দেখার ব্যবস্থা নেই। টাইগার প্রজেক্ট হলে এখানেও অমনি ব্যবস্থা হবে। রূপ সিং বলে,

—বাহার চলিয়ে বাবুজী, আভি ইস্ টাইম জঙ্গলমে রহনা ঠিক নেহি হ্যায়।

সারা দিনের বিশ্রামের পর বন্য প্রাণীরা প্রথম সন্ধ্যার অন্ধকারে জল খেতে বেব হয়, শিকারের সন্ধান করে। মধ্যরাতে বিশ্রাম নিয়ে আবার ভোরেব দিকে জল খেয়ে যে যার আস্তানায় গিয়ে ঢোকে। জিপটা রূপ সিং-এর বাংলোর দিকে ফিরছে, রূপ সিং পয়সার ধান্দায় অনেক ব্যবসাই করে বোধ হল।

রূপ সিং এইখানেও বেশ ফলাও কারবার শুরু করেছে। চোলাই-এর কারবার ভালোই চলে। বিরাট পাত্রে মহুয়া-গুড় দিয়ে পচানো হচ্ছে। ওদিকে দিশী কায়দায় সেই ফার্মান্টেড বস্তুটাকে জ্বাল দিয়ে চোলাই করে বোতলে পুরে চালান হয় বাঁচীতে।

রূপ সিং বলে—পয়সা তো দরকার বাবুজী।

রঞ্জনের অনুসন্ধিৎসা যেন বেড়ে গেছে। ওদিকে সেই সকালের ড্রাইভারটিকে দেখলাম হিসাব-পত্র রাখতে ব্যস্ত। ড্রাম বোঝাই হচ্ছে মদে। বোতলেও শিল করা হচ্ছে।

রঞ্জন সেই ছোকরার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। অলক দেখে শুনে বলে,

—এখানে এলেই নেশা হয় শঙ্করদা? মস্ত্ হয়ে গেছি।

রূপ সিং হাসছে ব্যস। পিয়ো তো?

শীতের কামড়টা জানা যায় এবার। রঞ্জন ভালো করে শালটাকে জড়িয়ে বলে—ঠাণ্ডায় আর ঘুরবে না, চল শঙ্কর বাংলোয় ফেরা যাক। পাহাড়ী ঠাণ্ডা লেগে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। রঞ্জন ফেরার জন্য তাড়া দেয় ওদের।

রূপ সিং বলে—থোড়া চা হোবে না, চলিয়ে না।

রঞ্জন বলে—ধন্যবাদ। চল শঙ্কর—ফেরা যাক বাংলোয়। ওরা চলে গেল।

সীমা বলে—চলিয়ে, গৌরী কেমন আছে দেখে যাই।

বাংলোটা ছিমছাম। সামনের বাগানে লেবু গাছগুলো ফলে ভরে গেছে। লালচে রঙের ফলগুলো দুলছে। সাইট্রাস গাছেও ফল এসেছে, পেয়ারা গাছগুলোর সবুজ পাতা ছেয়ে বড় বড় পেয়ারা ঝুলছে।

গোলাব ফুলও ফুটে বয়েছে গাছ ছেয়ে। রূপ সিং সীমাকে বলে,

—বাংলো বানালো তব্‌ভি গৌরী বোল্‌তি হিঁয়া রহেগা ক্যায়সে? থোড়া উস্‌কো সমঝাও বহিন।

গৌরীও বের হয়ে এসেছে—আসুন, আসুন।

গৌরীর মুখ-চোখ থমথমে, তবু একটু হাসির আভা ফুটিয়ে তোলে সে।

—বসুন। আপভি ভুল গিয়া, তামাম্ দিন বিত্ গিয়া নেহি আয়া। সারাদিনেও এলেন না একবার।

গৌরী অনুযোগ করছে আমার উদ্দেশ্যে।

কাঁচের জানালা, মেজেতে মির্জাপুরী কার্পেট পাতা, কয়েকটা দিশী মিস্ত্রীর তৈরী সোফার মতো। রূপ সিং এর মধ্যে পাশের ঘরে গেছে। কাকে চড়া স্বরে কি বলছে, বরজার ফাঁক দিয়ে দেখি সেই ড্রাইভার ছোকরাকে বকছে।

—যো বোলা ঠিক্‌সে করো। এক বোতল মে একশো রুপেয়া মুফৎ, ছোড়েগা কৌন বে?

—হম্ নেহি শকেগা। পাকড়ানেসে জেল যানে হোগা। ছোকরা জবাব দেয়। ওর জবাবে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

—হট দেগা! গর্জন করছে রূপ সিং।

কোথায় একটা ব্যাপার নিয়ে ওই তরুণটিকে গর্জাচ্ছে। গৌরীও চুপ কবে শুনছে কথাগুলো। গলা নামিয়ে বলে,

—ও অমনিই। স্রেফ পয়সা চেনে। আর—

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল গৌরী। রূপ সিং একটু পরে ফিরে এসেছে। এর মধ্যেই ওর রূপ বদলে গেছে।

তাজা পানীয়ের অভাব নেই আর ওর সমঝদার যে রূপ সিং তা জানা ছিল না। রূপ সিং বলে,

—লিজিয়ে সাব। খাশ নাম্বার চিজ লায়া। জনি ওয়াকার পিতে হেঁ। উস্‌সে ভি বড়িয়া চীজ হ্যায়। বড়ষাঁড়কা পানি আউর মহুয়ামে যো বনতা হ্যায়, উস্‌কো জনি ওয়াকার কা লেবেল লটকা দিজিয়ে, দেখেগা জনি ওয়াকার আর কোই নিয়ে পিয়েগা।

চমকে উঠি, হয়তো রূপ সিং তাই করেছে। জনি ওয়াকার রেডলেবেল আর ও স্কচ হুইস্কির খালি বোতলে তার চোলাই মাল পুরেই জাল লেবেল লাগিয়ে বোধহয় কারবার করে গোপনে।

এতক্ষণে ওই ছোকরাটির প্রতিবাদের কথা মনে পড়ে। ওকে সেই ভেজালের কারবারে নামাতে চায়। তাই সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বোধহয়।

—পিজিয়ে। গ্লাসে তাজা মদ ঢেলে এগিয়ে দেয় রূপ সিং।

সীমা আর গৌরী দুজনে চেয়ে দেখছে আমাকে। ওই দ্রব্য একেবারে নিষিদ্ধ নয় তবু এই পরিবেশে ওটার প্রয়োজন বোধ করি না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে গৌরী বলে সব কোই তুমহারা মাফিক্ সরাবী নেই হ্যায়। বাবুজী মদ খান না।

রূপ সিং হাসছে—ডর গিয়া বাবুজী? দিল খুশ হো যায়েগা। পিয়ে লিন।

—দিলখুস হয়ে দরকার নেই। তোমার বিষ তুমিই গেল! গৌরী কড়াস্বরে বলে।

—ঠিক হ্যায়। তব্ চায় দেনে বোলতা।

রূপ সিং বোতল নিয়ে চলে গেল ওদিকে।

গৌরী চুপকরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। ওর ডাগর দু'চোখের পাতায় জল নামে। ও বলে,

—অনেক আশা করেছিলাম, কিন্তু এভাবে সব ঝুট হয়ে যাবে ভাবিনি। এখানের এই বন্দীজীবনে হাঁপিয়ে উঠেছি দিদি।

সীমা ওর কথাগুলো শুনছে। গৌরী বলে,

—ঘর বাঁধার সুখ আমার তিলমাত্র নেই। লোকটা শুধু সবকিছু দখল করে নিতে চায়। লোভী জানোয়ারের মত। তোমাদের দেখে মনে হল এখনও বাঁচা যায়।

সীমা ওকে কি বলছে। নারীমনের নিভৃত বেদনার রাজ্য, এখানে পুরুষের ঠাঁই নেই। ওদের মনেব জটিল আলো-আঁধারিতে সব কেমন রহস্যাবৃত। বারান্দায় বের হয়ে এসে দাঁড়ালাম।

নিস্তব্ধ রাত্রি। চারিদিকের পাহাড় বন জমাট আঁধারের বৃত্তে পরিণত হয়েছে। শ্লেট রঙের আকাশে জ্বল জ্বল করছে ক'টা তারা। ম্লান চাঁদের আলো বিষণ্ণতায় ভরা এই আঁধার। গৌরীর জীবনের এই গোপন কথাটা জানতে চাইনি।

আবছা অন্ধকারের বাংলোর ওদিকে ছায়া অন্ধকারে রূপ সিং-এর চাপা গর্জন শোনা যায়। সেই ছোকরা কি বলছে। তাই ওকে শাসাচ্ছে রূপ সিং।

—ই বাত বাহারমে বোলেগা তব জান্ খতম কর দেগা জরুর। চলা যায়েগা? বড়ঝাঁড়কা জঙ্গলমে তেরা লাশ গিরায়া দেগা।

রূপ সিং-এর কণ্ঠস্বর আমার চেনা ছিল না। এখন সেই হাসি খুশী মানুষটাকে দেখছি আমূল বদলে গেছে আর এইটাই তার প্রকৃত হিংস্র লোভী স্বরূপ—যার জন্য গৌরীর মত শান্ত মেয়েটাও আজ বদলে গেছে। মরীয়া হয়ে উঠেছে।

এই অন্ধকারে যেন একটা আহত পশু গর্জে উঠছে।

ধারালো নখ দাঁত মেলে নিরীহ একটা প্রাণীর উপর লাফিয়ে পড়ে ধারাল নখ দাঁতের আঘাতে তাকে খান্ খান্ করে দেবে। অন্ধকারে এই বনভূমির লোভী হিংস্র সত্তাটাকে দেখেছি।

পায়ে পায়ে ভিতরে এলাম। গৌরীর দুচোখের পাতা ভিজে, সীমা তাকে কি বলছে। আমাকে দেখে চুপ করে গেল।

এখানে আর ভালো লাগছে না। রূপ সিং-এর কঠিন লোভী অস্তিত্বটা এখানের সহজ পরিবেশকে কি নিষ্ঠুর কাঠিন্যে ভবে তুলেছে। গৌরী বলে—চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, রাত হয়ে গেছে। ওকে জানাই। তবু ভদ্রতার খাতিবে বলি,

—সিংজী কোথায় গেলেন?

—ওর সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো, রাতের অন্ধকারে ও জানোয়াব হয়ে ওঠে।

সীমা বের হয়ে আসছে। গৌরীকে উঠতে দেখে বলে,

—ঠাণ্ডায় তুমি বেব হয়ো না।

হাসল গৌবী, মলিন বিষণ্ণ হাসি। গৌবী আমাকে বলে,

—কাল হয় তো চলে যাবেন, ভুলে যাবেন আমাদের কথা।

ওকে জানাই—না। ভুলবো না।

—সাচ্! গৌরীর দু'চোখ টলমলো হয়ে ওঠে। ও কি ভেবে বলে,

—হয়তো আর দেখা হবে না, যদি কোনদিন হয় চিনতে পারবেন তো?

—নিশ্চয়ই। ওকে যেন সান্ত্বনা দিই। কেন জানি না অচেনা বিচিত্র মেয়েটিকে ভালো লেগে গেছে। ওর চোখে কলকাতার দিনগুলো আজ স্বপ্ন হয়ে গেছে, এই দূর বনপর্বতের দেশে হারিয়ে গেছে ভবানীপুরের মেয়েটি, ও যেন বন্দী কোন পাখী। আকাশের স্বপ্নে বদ্ধ পিঞ্জরের মধ্যে আছড়ে মরছে, মুক্তির আশ্বাস কোথাও নেই।

সীমা আর আমি ফিরছি। কিছুদিন বনপর্বতের জগতে বাস করে জেনেছি এখানের কোন পথই নিরাপদ নয়। ক'খানা ধানক্ষেত, ওদিকের বড়রাস্তায় বিনোদকুমারেব দোকানে আলো জ্বলছে, এপাশের টোলায় ঢোলক সহযোগে কাজরীর ঠেট গানের কলি ভেসে আসে, ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের আলোয় বনভূমির ছোট্ট এই জগতে ওঠে ঝর্নার সুর।

সীমা বলে—মেয়েটার বরাত মন্দ, এত কিছু থেকেও কিছু পেলো না সে।

—কেন? আমার মনেও প্রশ্নটা জেগেছে। গৌরীর কথা মনে পড়ে। সীমা বলে,

—অমনি একটা বুড়ো শয়তানকে কোন মেয়ে মেনে নিতে পারে? অভাবকে সহ্য করা যায়, কিন্তু ভণ্ডামি আর জবরদখলের সত্ত্ব দিয়ে কোন মনকে ভোলানো যায় না। রূপ সিং গৌরীর উপর শুধু দখলজারী করতে চায়।

সীমা বদলে গেছে। বৈকালের সেই বিচিত্র মেয়েটি কি ভাবছে! বলে উঠি—তাহলে বেঁচে গেলাম মনে হচ্ছে।

—কেন? সীমা চাইল। আমি বলি,

—ও দুটোই আমার আছে, সুতরাং মেয়েরা নিশ্চয়ই দূবে থাকবে। ওই দখলজারী করা আমার স্বভাব।

সীমা চাইল সন্ধানী দৃষ্টিতে। বলে সে,

—নিজের ওপর খুব জোর, না? খুব পুরুষ দেখা আছে। থাক।

ওর কথায় বলি—তুমিও খুব সাহসী নয়?

সীমা আমার দিকে চেয়ে থাকে। কালো চোখে আকাশের তারার বিন্দু ঝলসে ওঠে। নিটোল গালের কমনীয়তা ফুটে রয়েছে।

সীমা চোখ পাকিয়ে বলে,

—সিওর! না হলে বলো এমনি করে ভেসে পড়তে পাবি? হুট করে তোমাদের সঙ্গে?

হঠাৎ কি খেয়ালবশে মাঠ থেকে ঝুরো মাটি তুলে নিয়ে ধানক্ষেতের উপর ছিটিয়ে দিতেই সরসর শব্দ উঠেছে, সীমা লাফ দিয়ে এসে হাতটা ধরে বলে, ভয় জড়ানো স্ববে,

—কিসের শব্দ না? এ্যাই।

হাঁপাচ্ছে সে, ওর দেহটা দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখতে চায় নিবিড় উত্তেজনায়। হাসতে থাকি।

—এই তো সাহস! এক মুঠা ধুলো ছুঁড়তেই—

সীমা হাসতে থাকে—ওমা! আচ্ছা লোক তো? যা ভয় পেয়েছিলাম না?

—বাঘের ভয়?

সীমার দু'চোখের তারায় চাঁদের ঝিকিমিকি জাগে। ঝর্নার জলে তারাগুলো দোল খায। সীমাব চোখে তারই প্রতিচ্ছবি।

সীমা বলে,

—তাই। তবে বনেব বাঘ নয, দেখছি মনের বাঘ।

বলে উঠি—সত্যিই ডেঞ্জারাস মেয়ে তুমি।

বড় রাস্তায় বিনোদের দোকানের আলো দেখা যায়,

অলকের গানের সুর ওঠে। বড়রাস্তার ধাবে আম সেগুন গাছেব ফাঁক দিযে চাঁদেব আলো লুটিযে পড়েছে। উনুনে কাঠের আগুনের আভা ওঠে। দু'একটা বাতি জ্বলছে কোণে। অলকেব সুবেলা গলায যেন জাদু আছে।

—তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন,
  নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।
  যখন তোমার পেলাম দেখা, অন্ধকাবে একা একা
  ফিরতেছিলে বিজন গভীর বন।
  ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে
  নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।

স্তব্ধ তারাকিনী রাত্রি, বনের বুকে আঁধার আলোর মায়া, এই দূর নির্জন রাতে ওর সুর যেন মনের গভীরে একটা সাড়া জাগায়।

সীমা কোলের উপর হাতদুটো আলতো করে ফেলে বসেছে, তন্ময় হয়ে গাইছে অলক।

পাতায় জমা শিশির ঝরে টুপটাপ ছন্দে, ভাষাহীন নির্বাক নিস্তব্ধতায় হারিয়ে গেছি। হয়তো বড়ঝাঁড়-এর এই রাত্রি আর জীবনেও ফিরে আসবে না, পথের চেনা সীমাও হারিয়ে যাবে। এই ধ্যাননিমগ্না উপত্যকার এই সন্ধ্যার স্মৃতি মনে পড়বে কোলকাতার কর্মব্যস্ত ক্লান্ত সন্ধ্যায়, একে ফিরে পাবার যন্ত্রণাই মনকে ব্যথিত করবে।

সীমা চাইল আমার দিকে। দু'চোখে অসহায় আর্তি। একটু আগে অন্ধকার বনের পথ দিয়ে আসার সময় দেখছিলাম দুচোখে কিসের সাড়া। অন্ধকার জীবনের পথে ছিল ক্ষণিক আলোর নিশানা।

সেট স্তিমিত হয়ে গিয়ে একটা বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে ওর মুখে। হয়তো তার মনেও এই বেদনা জাগে, নিজেকে এভাবে ধরাদেবার তৃপ্তি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু আবার নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার গণ্ডীতে, এই একটি সন্ধ্যার স্মৃতি কাউকে আপন করার যন্ত্রণা ওর সামান্য গণ্ডীর জীবনপাত্র উছলে তুলবে।

রঞ্জন বেরসিকের মত এসেছে বাংলো থেকে। এর মধ্যে রাজ্যের পোশাক-পত্র চাপানো হয়ে গেছে। গোটা দুয়েক সোয়েটার, ওভারকোট, মাথায় ইয়া টুপি, গ্লাবস পরে ভালুকের মত এসে দোকানের কবোষ্ণ পরিবেশে ঢুকে বলে,

—বিনোদ খান্না রুটি রেডি? ক্যা বানায়া?

শঙ্কর বলে—দিলি তো গানের পরিবেশটা মাটি করে।

রঞ্জন এর মধ্যে রূপ সিং-এর বিশেষ দ্রব্যের নমুনা বোধহয় পেয়ে গেছে। এতক্ষণ তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অলক শঙ্কর এ পথের পথিক নয়, তাই ওদের এখানে জমতে দেখে রঞ্জন গিয়ে বস্তুটির সদ্বব্যবহার করে এসেছে।

ওর দিকে চাইতে রঞ্জন বলে—একটু টেষ্ট কবতে দিয়েছিল কিনা? যাক্‌গে আজ বিনোদজীকে ফাউল কারি করতে বলেছি। সেটা এই শীতের রাতে ঠাণ্ডা করে কি হবে বল?

খাওয়া সেবে বাংলোয় ফিরেছি। চৌকিদার জানায়—রাতমে বাহার মৎ আনা জী।

—এখানেও গণেশ ঠাকুর আসেন নাকি? সীমা শুধালো।

চৌকিদার বলে—জী। বগলমে ঝোরাকা পানি পিতা হ্যায় শের —ভালু ভি আতা হ্যায়। হাতি ভি হ্যায়।

অর্থাৎ রাতে এই সুন্দর ফরেস্ট বাংলোর দখল চলে যায় ওদের হাতে। রঞ্জন বলে—ঠিক হ্যায়।

তবু দবজা বন্ধ করে খিল-ছিটকিনি ডবল চেক করে বলে—কোন শব্দ হলে আমাকে ডাকবি।

সীমা ওপাশের ঘবে ঢুকে জানায়—কি করবে তুমি?

—ওর নাকেব গর্জনে কেউ আর কাছে আসবে না। আমাব কথায় রঞ্জন চাইলমাত্র। আমি বলি,

—আব আহারও হয়েছে আধ দিস্তেটাক রুটি—আধখানা মুরগী, ওর উইন্ড ট্রাবল আছে, তোপ দাগা শুরু হয়ে যাবে। হাতি বাঘও ধারে কাছে আসবে না।

বঞ্জন বলে চাপাস্বরে—আঃ। কি সব বাজে কথা—মানে অশ্লীল কথাবার্তা বলিস ভদ্রমহিলার সামনে? এটিকেট জানিস না?

সীমা ওঘরে খিলখিল শব্দে হেসে বলে—ওটাও শুনেছি।

রঞ্জন যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছে। গজগজ করে—প্রেস্টিজ পাংচার করবি তোরা।

ভোর হয় পাখীর ডাকে, ঝর্নার কলকল শব্দট, এই নৈঃশব্দের মাঝে আরও সজীব, প্রাণ উছল হয়ে ওঠে। চৌকিদার এর মধ্যে বেড টি দিয়ে গেছে।

সবাই উঠেছে, ওঠেনি শুধু রঞ্জন। দ্রব্যগুণে সে গভীব ঘুমে মগ্ন। সকালের প্রথম আলোর আবির রং লেগেছে পাহাড়ের মাথায়—উপত্যকার সোনা ধানের বুকে। শান্ত সুন্দর উপত্যকা, গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলো রাতের শিশিরে কমনীয় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ কাকে আসতে দেখে চাইলাম। রূপ সিং আসছে পায়ে হেঁটে। চোখমুখ-এর চেহারা বদলে গেছে, এক রাতেই ওরমাথার চুলগুলো বেশী পাকা বলে বোধহয়। ওকে দেখে এগিয়ে যাই।

—সিংজী! কি ব্যাপার?

গৌরীর অসুখ হয়তো বাড়াবাড়ি হয়েছে। সীমা ওকে দেখে বের হয়ে এসে শুধোয়,

—গৌরী ভালো আছো তো?

রূপ সিং-এর রাতজাগা চোখদুটো জ্বলে ওঠে। ও কঠিনস্বরে বলে—উস্‌কো খুন করেঙ্গা।

ওব কথায় চমকে উঠি। লোকটার মুখে কর্কশ কাঠিন্য গলাব স্বরও ভারি আর মোটা। রূপ সিং জানায়,

—কাল রাতমে ভাগ গিয়া ওহি শুয়ার কা বাচ্চে রতন সিং কা সাথ।

চমকে উঠি খবরটা শুনে। গৌরী যে এমন কাজ করবে ভাবিনি। সিংজী বলে,

—ওহি রতনকো খিলায়া পিলায়া, নোকরি দিয়া, হারামজাদা জিপ ভি লে গিয়া আউর দুস্‌রা পিক আপ ভ্যান থে, উস্‌কা ডায়নামো ভি খোল কর লে গিয়া, য্যায়সে উভি চালু নেহি হো। একদম সর্বনাশ কর দিয়া বাবুজী, ওহি বদমাস লেড়কী। সব লেকে চলা গিয়া।

সীমা স্তব্ধ হয়ে শুনছে কথাটা। গৌরীর মুখচোখে দেখেছিলাম একটা থমথমে নীরবতা। তাই যেন *সে বলতে চেয়েছিল কথাটা— পরে যদি দেখা হয় চিনতে পারবেন তো? এই খাঁচা থেকে সে মুক্ত হয়ে গেছে।*

রূপ সিং বলে—কোই ট্রাক পাকড়কে আভি ডালটনগঞ্জ যায়েগা, পাকড়েগা তো দোনো কোই খতম্ কর দেগা। রাগে গর্জাতে গর্জাতে বের হয়ে গেল সে।

চুপ করে বসেছিল সীমা। ও বলে ওঠে—ঠিক করেছে গৌরী!

ওর দিকে চাইলাম। সীমার মুখে কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। বলি—এভাবে চলে গেল মেয়েটা?

সীমা বলে,—না গেলে এখানে বাঁচতো না, —রূপ সিং একটা জানোয়ার। তার কাছ থেকে সরে গিয়ে তবু নোতুন করে বাঁচার চেষ্টা করতে পারবে মেয়েটা।

সীমার কথাগুলো শুনছি। সীমা বলে—মুখের মত জবাব দিয়েছে। ওর গরীব বাবাকে টাকা দিয়ে কিনে এনেছিল গৌবীকে। জানো!

এসব জানতাম না। তবু গৌরীর কথা মনে পড়ে।

ওই রতন সিং মনে হয় রূপ সিং-এর চেয়ে অনেক সৎ, তাই ওর জাল মদেব ব্যবসায় নাম লেখাতে পারেনি।

সীমা বলে—গৌরী ভালোই করেছ।

—হয়তো সত্যি। তবে সুখে থাকুক। মেয়েটা সত্যিই ভালো।

—গ্যাছে ব্যাটা? রঞ্জন চারিদিকে সাবধানী চাহনি মেলে বারান্দায় এসেছে।

রঞ্জন বলে—ব্যাটা পাঁইয়া ছুরিফুরি আনেনি তো? ভাবলাম তোকেই খুঁজতে এসেছে। তাই বলি বিদেশ বিভুঁই জায়গা ওই সব দ্যায়লা ছাড়। বনবাদাড়েব দেশ—মানুষগুলোও বুনো—মেজাজ দেখলি তো। কেন ওর বৌটার সঙ্গে যেচে আলাপ করিস? চা দে।

সীমা চুপ করে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে রঞ্জন চা-টা নিয়ে বসল জুৎ করে। সীমা দেখছে রঞ্জনকে। রঞ্জন চা খেয়ে চলে গেল।

সকালের সোনা রোদ পাখীর ডাক ভবা জগৎ—ওই বন পাহাড়ের পরিবেশ মনের শূন্যতাকে মুছে ফেলতে পারে না মনে হয় এই জগৎ থেকে একজন হারিয়ে গেল, সে আর কোনোদিনই ফিরবে না।

সীমা বসে আছে চুপ করে ঝর্নার ধারে, শিশির বিন্দুগুলো তখনও গাছের পাতা ছেকে মুছে যায়নি। ঝলমল করছে। দূরে দেখা যায় রঞ্জন বিনোদের দোকানে চলেছে।

সীমা চাইল আমার দিকে—ওর নীরব চাহনিতে কি বেদনার আভাস ফুটে ওঠে। ও বলে,

—মেয়েদের হয়তো এমনি ভাবো তোমরা? হাল্‌কা—দায়িত্বজ্ঞানহীন? না?

সীমার কথার জবাব দিলাম না। ও বলে চলেছে,

—গৌরী বাঁচতে চেয়েছে। সব মেয়েই তাই চায়।

আমি জানাই—কিন্তু এক বিপদ থেকে অন্য বিপদে গিয়ে পড়তে পারে তো?

—তবু যাচাই করে দেখতে দোষ কি?

ওর কথায় বলি—তুমিও এতকাল ধরে তাই দেখছো?

সীমার ফর্সা মুখটা লালচে হয়ে ওঠে। কি ভেবে কাছে এগিয়ে এসে বলে,

—আর নিজে? সে দেখার আজও শেষ হল না। কি পেয়েছো বলতে পারো এতদিন দেখে শুনে?

—এ হিসেব কোন দিনই করিনি। জমার ঘরে আমি কি পেলাম—ভবিষ্যতে তার কি স্বাদ আসবে সে অঙ্ক কষার স্বভাব নেই সীমা।

সীমার চোখে শিশিরের ঝলক। চাঁপা কলির মত আঙ্গুলগুলোয় ঘাস ফুলের রঙ্গীন টুকরো। সীমা বলে—তাই পাওনি কিছুই। কিছুই পাবে না।

কানাই বাউলের কথা মনে পড়ে। ঘর পালানো মানুষ—পথে পথে ঘোরে। হাতে তার একতারা আর কাঁধে ঝুলি। তাতেই ঠিকানা—সর্বস্ব সঞ্চয়। মাঝে মাঝে আসে আবার রঙ্গীন মেঘের মত উধাও হয়। কানাই বলে,

—পথের ধুলো গায়ে মেখো না ভাই, সারা গা-মন ধুলো ময়লায় ভরে যাবে। ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাও— দেখবে মজার জগৎ। দুঃখ নেই, ভাবনা নেই। শুনবে পথের সুর। সে শুধু ডাকে আর ডাকে। ঘরে মন রয় না।

সীমাকে সে কথা জানাতে পারি না। তাই ও ভাবে আমার জমার ঘর শূন্য। অথচ ও জানে না বড়ধাঁড়—বেতলা—পালামৌ অরণ্যভূমি আমার মনে কি স্বপ্ন রেখেছে। কি ভালোবাসার স্পর্শে মন ভরিয়ে দিয়েছে। এখানকার কর্মচারীরা, মিঃ রায়, মিঃ সিং আরও অনেকে।

দেখেছি বিভূতিভূষণের আরণ্যকের জীবন্ত চরিত্রের মতই মানুষ ফরেস্ট গার্ড তেওয়ারীকে। ঘন বনরাজ্যকে সুন্দর করার স্বপ্ন দেখে সারা মন দিয়ে, কমলদহকে কমল ফুলে ভরিয়ে দিতে চায়। ডি-এফ-ও মিঃ মিশ্র, পদস্থ অফিসার। তবু জঙ্গলের শুচিস্নাত পরিবেশের মানুষ। ওদের মনে হিংসা নেই। বনের পশুকে ভালোবেসে আপন করে নিতে পেরেছেন। একটা নির্মল আনন্দময় জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন বনের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে। সারা মনে তাই তপোবনের প্রশান্তি।

দেখেছিলাম বিভূতিভূষণকে এ জগতেব মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করেনি। প্রকৃতির শ্যামশোভা—নিবিড় সম্পর্ক তাঁর মনে এনেছিল কি সম্পদের সন্ধান—অক্ষয় প্রশান্তির আশ্বাস। অরণ্য দিয়েছে মানুষকে অনেক। ভারতীয় সভ্যতার মূলে আবণ্যক সংস্কৃতি, বৃহদারণ্যকে ছন্দে তার জীবনের সুর বিধৃত, মৃগদাবের শান্তির প্রসার বৌদ্ধ ধর্মে। হিংসা নয় ভালোবাসা তাই ভারতের মূলমন্ত্র। সৌন্দর্য পিয়াসী মন পায় এই মহাজগতের সন্ধান।

Cash not thy greedy look
Upon my flesh,
Read the poetry in my eyes.

এ হরিণের কথা নয়, গৌরী সীমা সকলেরই মর্মকথা আজকের হিংস্র মানুষের কাছে। গৌরী তাই পলাতকা।

পেয়েছি অনেক। তার তুলনায় সীমার কাছে চাওয়া পাওয়ার হিসাব অনেক তুচ্ছ। আমার মনকে চোখকে সীমিত করে ঠুলি আঁটতে পারিনি। কানাই বাউল তাই ঘর ছাড়া—হয়তো আমিও তাই অর্ধ যাযাবর।

সীমার হাতখানা আমার হাতে।

—কি ভাবছো? জীবনকে মেনে নিতে খুব ভয় করে, না?

ওদের কালো চোখের ইশারায় পথ হারাবার মায়া।

শিলং পাহাড়ের কথা মনে পড়ে। প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক বন্ধুর সঙ্গে গেছি আমার একটা উপন্যাসের আউটডোর সুটি-এ। ওদের অনুবোধ-উপরোধে বিরক্ত হয়ে শেষকালে সেদিন বিদেশী হুইস্কিও গিললাম। তার আগে ওই দ্রব্য গিলিনি। 'ধ্যাত্তেরি' করে ওদের দেখাবার জন্য গিলেছিলাম সেদিন।

ওরা বললেন—একটু খেলে সব কিছু রঙ্গীন লাগবে। সুন্দর একটা পরিবেশে আনন্দ পাবে, উপভোগ করতে পারবে।

সকালে গেছি আলোভরা পর্বতের শীর্ষে। পাইন বন —সাদা পেঁজা মেঘভরা আকাশ, পাখীর ডাকভরা

জগৎ সবকিছু যেন বিকৃত হয়ে গেছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। এই জগতকেও ভালো লাগছে না।

বিরক্তিভরে জানাই—ওইসব ছাইপাঁশের দরকার কি? শুধু চোখে এই সুন্দর জগৎকে উপভোগ করার মন আমার আছে। তোমাদের মত মদের পালিশ তাতে না দিলেও চলবে। চোখের আলো মনেব রং আমার ফুরোয়নি। হঠাও ওই ছাইভস্ম।

সেই থেকে ওই দ্রব্যটাব কোন প্রয়োজন বোধ করি না। খোলা চোখে সাদা মন দিয়ে দেখে পেয়েছি অনেক।

আমার নিঃসঙ্গ নির্জনতার মাঝে নিজেকে দেখেছি, সেই পাওয়ার তুলনা নেই। সীমাকে বোঝাবো কি করে যার সন্ধান তুমি দিয়ে দিতে পারো সেই জগৎকে আমি আরও বড করে পেয়েছি। সেখানে তোমার অস্তিত্বের চেয়ে আরও বেশী কিছু থাকবে।

সীমা চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। ও দেখছে দূরে বহু দূরের নীল আকাশের অধরা মেঘগুলোকে। বাতাসে ওরা ভেসে ভেসে দূরে হারিয়ে যায়, চলে যায় দৃষ্টিপথের বাইরে।

সীমা বলে—তুমি কি চুপ করেই বসে থাকবে?

—তবে!

—কোন কিছুই কি বলার নেই? সীমার কণ্ঠস্বরে কি ব্যাকুলতা, দু'চোখের চাহনিতে নীরব আর্তি ফুটে ওঠে। কি শুনতে চায় সীমা তা জানি—কোন আশ্বাস, হয়তো একটি স্বপ্নেব স্বার্থকতার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সে সাধ্য আমার নেই। তাই জানাই,

—বলা যায় না সীমা, নিজের সম্বন্ধে আমাব বলারও কিছু নেই।

সীমা চাইল আমার দিকে। কঠিনস্ববে বলে,

—তোমাকে চিনিনি। হয়তো ভুলই করেছিলাম। নিজেকে অনেক বড় করে দেখ তাই ভাবো অনেক উপরে, অনেক কিছু পেয়েছি বলে বড়াই করো। তার দাম যে কানাকড়িও নয তা বুঝবে যেদিন, সেদিন দেখবে দেউলিয়া হয়ে গেছ। দেবারও কিছু আর নেই।

চুপ করে থাকি। একথা বার বাব শুনেছি। সুন্দরবনের যাবার পথে সরোজিনী বলেছিল, এমনি কথা বলেছিল অযোধ্যা পাহাড়ের গ্রামসেবিকা মীনা সরকাব। সাবান্দা অবণ্য রাজ্যেব দ্বারপথে বড়জামদার অঞ্জলি।

ওরা এই কথাই বলে। সীমাও আজ পুনরাবৃত্তি করেছে তারই। ওরা অভিশাপ দেয়, ব্যর্থতার জ্বালাভরা মন নিয়ে এই কথাই বলে। জীবনে অনেক পাওযার আনন্দকে দেখেনি—শুধু খোলসটাকেই পেতে চেয়েছে। মনকে ছেড়ে দেখেছে দেহকে।

তাই দেবযানীও কচকে অভিশাপ দিয়েছিল।

......যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

তাই হয়তো পুরুষ আজও কোথায় রিক্ত, শূন্য। বাঁধনের জীবনকে মেনে নিয়ে তৃপ্ত নয়—সে যাযাবব। কিসেব সন্ধানে ঘোরে—হয়তো কিছু পায়, সেদিন দেবারও কিছু থাকে না।

এই তার অভিশাপ।

সীমা উঠে গেছে। পাহাড় বনে সকালের সোনা রোদ হলুদ হয়ে আসে।

রঞ্জন তাড়া দিতে আসে।

—একা একা কি করছিস এখানে? স্নান করে খেয়ে দেয়ে জিরিয়ে নিতে হবে। তারপর বাসে সেই নাচন-কোঁদন আছে। ওঠ।

স্নান করতে গেছি সেই পাহাড়ী ঝর্নার ধারে। শঙ্কর, আলোক, রঞ্জন তখনও রোদ পিঠ করে তেল মাখছে। কোনরকমে স্নান করে ফিরলাম বাংলোর দিকে। ওরা সোজা এখান থেকে বিনোদের দোকানে চলে যাবে। আমি সীমাকে বাংলো থেকে নিয়ে যাবো।

সীমাকে তখনও চুপ করে থাকতে দেখে বললাম,—স্নান করোনি?

সীমা ভাবনার গভীরে হারিয়ে গেছল, আমার ডাকে চমকে উঠে চাইল।

—একি!

সীমার দুচোখ যেন জলে ভরে উঠেছে। কোনরকমে উঠে ভিতরে চলে গেল কোন জবাব না দিয়ে। একটু পরেই বাথরুম থেকে ওর স্নানের শব্দ শোনা যায়।

—চলো।

সীমা তৈরী হয়ে এসেছে স্নান সেরে। কমলালেবু রঙের শাড়িতে ওর রূপের ছ'টা যেন উল্‌সে ওঠে। চমকে উঠে ওর দিকে চাইলাম।

—এ কি, চোখ যে ধাঁধিয়ে যাবে?

সীমা চাইল আমার দিকে দীঘল চাহনি মেলে। বলে ওঠে,—কিন্তু লাভ কি হল? কি যেন বলেছিলাম একটু আগে, না?

ওব দিকে চাইলাম। ছায়া ঢাকা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। সীমা বলে—মাঝে মাঝে কি যে আবোল তাবোল বকি। তুমিও কি ভাবলে।

পাখী ডাকছে গাছের পত্রাবরণে। সীমা বলে,

—আসার আগে অবশ্য তুমিও সাবধান করেছিলে, শেষে দোষ দিও না। অবশ্য দোষটা সবই আমারই। যা পাওয়া যায় না তাকে চাইতে নেই।

কি বলতে গিয়ে থামলাম। রঞ্জন ডাকছে—জল্‌দি। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সময়টুকু কোন্‌দিকে চলে গেল' বাসটা ফিরছে শহরের দিকে। ওই বাসেই ফিরবো আমরা। বড়ঝাঁড়-এর দুটো দিন কি স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেল। আজ বিদায়ের পালা। সীমা আনমনা হয়ে গেছে। দু-একবার চোখাচোখি হতে চোখ নামিয়ে নিল। অকারণে মনটা থমথমে হয়ে ওঠে। বাসটা আসতে উঠে পড়েছি। কনডাকটার ড্রাইভার চা খাচ্ছে। ওদের খাওয়া হলেই যাত্রা শুরু হবে এই বনপাহাড়-এব রাজ্যে।

চৌকিদার হন্তদন্ত হয়ে আসে।

—দিদিমণি! সীমাকে ডাকছে সে।

সীমা জানলার ধারে চুপ করে বসে আছে। চৌকিদারের ডাকে সীমা চাইল।

রঞ্জন চুপি চুপি বলে—বোধহয় দিদিমণির কাছে স্পেশাল বক্‌শিস চাইবে?

অবাক হই ওই চৌকিদারের কথায়। ধারণা বদলে যায় তা ওই আদিবাসী মানুষগুলোর সম্বন্ধেও।

—ইয়ে দুঠো ঐ আপ্‌কা, ছোড়কা আয়া। লিজিয়ে—

চৌকিদার সীমার দিকে এগিয়ে গেল দুটো সোনার বালা। ওগুলো তাঁর ঘরে টেবিলে রেখে এসেছিল।

অলক বলে—ব্যাপার কী সীমাদি? বড়ঝাঁড় এসে সোনার বালা ফেলে যাচ্ছেন, মনটাকে রেখে যাননি তো?

সীমা চকিতের জন্য আমার দিকে চাইল, সেই চাহনিতে হয়তো কাঠিন্য—হয়তো নীরব মিনতি মাখানো ঠিক বুঝি না।

বাসটা চলছে, পিছনে পড়ে রইল বড়ঝাঁড়-এর উপত্যকা। টপগিয়ারে বনের রাজ্যে বাসটা চড়াই ঠেলে উঠছে কঁকিয়ে কঁকিয়ে, বনের গভীরে নামছে অসন্ন অন্ধকারের ছায়া। পাখীর কাকলি জাগে—এ শোনার মত মন আজ নেই। যে মন নিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে এই স্বপ্নজগতে সেই মন তার হারিয়ে গছে।

শূন্য মনে ফিরে চলেছে সীমা।

আমি চেয়ে থাকি আঁধারনামা বনের গভীরে, ওরই রহস্যাবৃত জগতে কোথায় হারিয়ে গেছি। বনে

নয়—আমার মনেও তেমনি আঁধার নেমেছে।

দীর্ঘ পাহাড়ী পথ—বনের গভীরের বুক থেকে বেতলার ফরেস্ট নাকায় ফিরলাম, তখন রাত্রি হয়ে গেছে। বিজলী বাতি জ্বলে এখানে—গেটের সামনে বাঁশ বোঝাই ট্রাক ছাড়পত্রের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ রায় এগিয়ে আসেন, সঙ্গে মিঃ সিং।

—ক্যায়সা লাগা বড়ঝাঁড় ফরেস্ট?

—সুন্দর। ওখানে না গেলে পালামৌ ফরেস্ট সম্বন্ধে অনেক কিছুই না দেখা থাকতো মিঃ রায়।

মিঃ রায় বলেন—অব্ লাত্ যাইয়ে একরোজ।

—দেখা যাক্!

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীর। রঞ্জন অলকের দল বাস থেকে নেমে কটেজের দিকে এগিয়ে গেছে, ভিখনকে বলা আছে রাতের খানা তৈরী করবে। তারই তদারকি সেরে ওরা কটেজে যাবে।

আবছা অন্ধকারে কাকে দেখে দাঁড়ালাম। ওদিকে রাস্তার ধারে ঝুপড়িতে চায়ের দোকান। সামনে কয়েকটা বেঞ্চ নড়বড়ে চেয়ার পাতা। ওখানে বসেছিল সহায়বাবু, সীমাকে দেখে উঠে এগিয়ে এসে নীরবে তার ব্যাগখানা হাতে নিয়ে পিছু পিছু চলতে থাকে।

সীমা কথাও বললো না, তবু দেখি সহায়বাবুর ধৈর্য। পরম তৃপ্তির সঙ্গে সে চলেছে। ওর মুখচোখের সেই উৎকণ্ঠা আর নেই। আপনমনে বলে চলেছে সহায়বাবু—জায়গাটা কেমন? শুনেছি খুব সুন্দর। ঠাণ্ডা লেগে গেল নইলে যেতুম।

সীমা কোনো কথার জবাব দিল না, অন্ধকার পথ ধরে টিলার দিকে এগিয়ে চলেছে।

চুপ করে দাঁড়ালাম, ওদের এগিয়ে যেতে দিই। অন্ধকারে ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা কাঁপছে, নীরব দীর্ঘশ্বাসের মত মনে হয় ওই শব্দটাকে।

হয়তো আমারই দীর্ঘশ্বাস—বাতাসে শুক্নো মরা বিবর্ণ পাতাগুলো ঝড়ে পড়ছে।

ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখনও চোখে বড়ঝাঁড়-এর সবুজের স্বপ্ন—সেই ঝর্নার কলশব্দ ওঠে। হলুদ ধানক্ষেতের পরই সবুজ পাহাড়ের সীমানা ঘেরা আলোভরা উপত্যকায় সীমার সেই উদ্বেল মুহূর্তগুলোকে ফিরে পাই, ওর চোখেমুখে কি নিবিড় উত্তেজনা ফুটে উঠেছে।

—কে!

দরজায় কার পায়ের শব্দ শুনে বাইরে এলাম। শালজড়ানো মূর্তিটাকে দেখে চাইলাম—তুমি! সীমা!

ভোরের তারাগুলো তখনও সবাই বিদায় নেয়নি। দু'একটা তারা সেগুন বনের পাতার ফাঁকে জেগে আছে, এদের হরিণগুলো তখনও চরছে সামনের মাঠে, বড় হরিণটা দীঘল চাহনি মেলে দেখছে আমাদের।

সীমা বলে—চলে যাচ্ছি আজই ভোরে। বরাডিতে গিয়ে ট্রেনে উঠবো। ভাবলাম যাবার আগে দেখা করে যাই।

শুধু ওইটুকু মাত্র কথা, সীমার কালো চোখ দুটোয় ভোরের ভিজে শিশিরের আর্দ্রতা। সীমা বলে—ক'দিন বেশ কাটলো। হয়তো এসব ভুলে যাবে—তবু আমার মনে থাকবে দিনগুলোর কথা।

ওদিকে জিপে মালপত্র তুলছে সহায়বাবু, ভোরের শেষ তারার মত বেদনা ওর চোখে, দিনের প্রথম আলোয় অবসন্ন বেদনাবিধুর যোগিয়া রাগিণীর একটি করুণ সুররেশ বাতাসে হারিয়ে গেল।

সীমা বলে—কোন ক্ষোভ আমার নেই। এখানে এসে অনেক কিছু নিয়ে গেলাম।

সীমা হাসবার চেষ্টা করে।

বিষণ্ণ একটু হাসির আভা ওর মুখখানাকে মাধুর্য্যময় করে তোলে। সেই মুহূর্তটুকুর রেশ রেখে গেল আমার মনে।

কোন অনুযোগ নেই—তাই হয়তো ওকে মনে থাকবে।

চোখ পড়তে দেখি হরিণটা স্তব্ধ চাহনি মেলে চেয়ে আছে, ওর কালো ডাগর চোখে কি নীরব মিনতি। গৌরী, সীমা ওরা সবাই যেন ওই নির্বাক নিষ্পাপ চাহনির অতলে মিশিয়ে আছে।

লুব্ধ দৃষ্টি দেহের দিকে নয়, চোখের নীরব -ভাষার কবিতা পড়া—আমাকে দেখো অন্য দৃষ্টিতে—ভালোবাসার চোখে।

আজ সকালের আরক্তিম প্রত্যুষের উষালগ্নে সীমাকে নোতুন করে দেখলাম।

যাঃ বাব্বা, চিড়িয়া ভাগ্ গিয়া আর তুমি শ্লা কাওয়ার্ড জুলজুল করে দেখলে?

রঞ্জনের কথায় চাইলাম। লজ-এর ঘরটা শূন্য, সীমা চলে গেছে। ওর কলকাতার ঠিকানাও নিইনি। কোন সূত্রও রাখিনি।

রঞ্জন বলে—অকর্মার ধাড়ি। কাব্যি করেই গেলি। ধ্যাত্তেরি।

—চুপ করবি?

রঞ্জন আমার কথায় সরে গেল। হরিণটাও রঞ্জনেব হাঁকডাকে সরে গেছে।

চিঠিখানা ঠিক সময়েই এসেছে মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরি থেকে। অম্বিকাপুর হয়ে বাসে যাওয়া যায়।

শঙ্কর বলে— সেই ভালো। এখান থেকে ডেরা তুলে চলো চিরিমিরি হয়ে অমরকন্টক।

দুর্গম পথ। যাবার ব্যবস্থাও তেমন নেই। রাজপথ নয়—খিড়কীর পথ ধরে যাওয়া। তবু পথ টানে।

বেতালা ন্যাশন্যাল পার্কে তাই আজ শেষ রাত্রি।

ক'দিনেই এই বন—এখানের প্রাণিজগৎ আর বনের মানুষদের ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

মিঃ রায় বলেন—আবার আসবেন। ফিন্ আইয়ে।

তেওয়ারী স্বভাবসুলভ হাতিসে মুখ উজ্জ্বল করে জানায়,

—পুনরাগমনায় চ। তব্ দেখেগা কমলদ তামাম ফুলোসে ভর যাইয়ে গা। সারা বন ফুলসে উজালা হোগা, লতা পলাশ—গোলগোলি—ল্যান্টার্ন সব ফুলোসে বাহার আয়েগা। আসবেন সেদিন।

বিহারের সরকারের বনবিভাগকে ধন্যবাদ জানাই। বনবাসের ক'টা দিন কি সম্পদে ভরিয়ে নিতে সাহায্য কবেছেন। রূপবতী অরণ্যকে এরা সুন্দরতর করেছেন।

সেই সুন্দরের রাজ্যে ওরা আমন্ত্রণ রেখেছে বারবার।

গৌবীর কথা জানি না, রূপ সিং-কেও আর দেখিনি। সীমাকে হারিয়ে ফেলেছি। ওদের থাকার লগ্নটা বড় কম, তাই তার প্রতি মুহূর্ত যেন আনন্দ স্বপ্নে বিভোর—বর্ণময়।

ডালটনগঞ্জ থেকে কো'য়ল পার হয়ে গারোয়া—পিছনে পড়ে রইল পালামৌ, ওদিকে ফেলে গেলাম উত্তর প্রদেশের রেণুকূট—রিহ্যাণ্ড ড্যাম। আমাদের বাস চলেছে বন-পর্বতের রাজ্য ধরে সরগুঁজার পর্বতবন পেরিয় মধ্যপ্রদেশের অম্বিকাপুরের দিকে।

কে একজন যাত্রী বলে ওই নীল পাহাড়গুলোকে দেখিয়ে,

—লাত্ উধার। কোয়েল কা কিনারামে—

বেতলা, পালামৌ, ন্যাশন্যাল পার্ক —বড়ষাঁড়—লাত্-এর অরণ্যভূমিকে পিছনে ফেলে চলেছি আবও দূর দুর্গমে।

গৌরী—মিঃ রায়—তেওয়ারী—সীমা ওদের থেকে এই দূরত্বটা ক্রমশঃ বেড়ে গেছে।

মনে হয় নিঃসঙ্গ যাযাবর আমি শুধু ঘুরেছি আর ঘুরছি কি পাবার নেশায়। পথের ডাকে সব হারিয়ে ঝুলি কাঁধে শুধু দৌড়েছি।

কি পেয়েছি—কি পাইনি তার হিসাবও জানি না।

বন—পথ—পর্বত ডাকে—সেই ডাকে ঘর পালাই। হয়তো কোন্দিন কোন্ ছায়াচ্ছন্য বনরাজ্যে এই পথ এসে হারিয়ে যাবে, পিছনে পড়ে থাকবে সরোজিনী, ইলা, সীমা, অঞ্জলি—গৌরী আরও কতজন। সবাই ঘরে ফিরবে—ফিরবে না শুধু একজন। তার কথাও একদিন সবাই ভুলে যাবে।

নীল ধূসর পাংশু অরণ্যসমাবৃত পথ দিয়ে গোঙানি তুলে বাসটা চলেছে। আমি তার যাত্রী।

কুমারী মন

রাত্রির নিথর নীরবতা ভেদ করে গর্জনটা স্পষ্টতর হতে স্পষ্টতর হয়ে এগিয়ে আসছে এইদিকে। বিছানায় উঠে বসলো কৃষ্ণা, আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গে গেছে, ঘেমে নেয়ে উঠেছে সর্বাঙ্গ। দরজা জানালাগুলো টর্চের আলোয় দেখে নেয় —হ্যাঁ, সব বন্ধ করা হয়েছে।

আবার সেই স্তব্ধতা নেমে আসে। বনভূমির শান্ত সমাধিস্থ ধ্যানগম্ভীর রূপ ফুটে ওঠে। সেই হিংস্র গর্জনের প্রতিধ্বনিটুকু মিলিয়ে যায়। মনে মনে নিশ্চিন্ত হয কৃষ্ণা। হঠাৎ জানালার নীচে দিয়ে কি একটা জন্তু বেগে অন্ধকার ভেদ করে ছুটে যায়। পরমুহূর্তেই কাঠের ঘরখানা কেঁপে ওঠে থর থর করে —যেন প্রবল বেগে ভূমিকম্প হচ্ছে। জানালার কাঠ কপাটগুলো নড়ে ওঠে। থালা বাসনগুলো কাঁপছে ঝন ঝন শব্দে। আতঙ্কিত অন্ধকারে মনে পড়ে কলকাতার জাপানী বোমা পড়ার রাতগুলোকে। জানালা কপাটের পাল্লাগুলো এমনি ভাবেই কাঁপতো। এমনি করেই মৃত্যুদূত ডাক দিয়ে ফিরতো রাতের অন্ধকারে।

বাতাসে জেগে ওঠে বিশ্রী বোটকা গন্ধ! নিজের দেহটাকেও টেনে তুলবার সামর্থ্য তার নেই। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয় কৃষ্ণার। কথা কইতেও পারে না যেন। ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

—শুনছো? ফিস্ ফিস্ শব্দে ডাকলো অসীমকে। ওকে ঠেলা দিয়েও জাগাতে পারে না, তখনও নাক ডাকছে তার নিশ্চিন্ত ঘুমে। ঘুম জড়ানো গলায় বলে ওঠে— ও কিছু নয়। ঘুমোও।

আবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলো, বাইরের তাণ্ডবে কান দেবার মত অবস্থা তার নেই। নির্বিকার অসীম।

সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে কৃষ্ণার। সুন্দরবনেব আদিম অরণ্য থেকে রাত্রির তমসায় বের হয়ে এসেছে ওই মৃত্যুদূত। দু'চোখের দৃষ্টিতে ওর হিংসাব আগুন, নখদন্তে ওর মৃত্যুর পরোয়ানা। মানুষের উপনিবেশে হানা দিয়েছে আদিম অরণ্য তাব সমস্ত হিংসার বিভীষিকা নিয়ে লুণ্ঠনকারী মানুষকে সে নির্মূল করতে চায় এই অরণ্যভূমি থেকে। উৎখাত করে আবার ফিরিয়ে আনবে সেই আরণ্যক পরিবেশ।

তখনও কাঁপছে কৃষ্ণা। এক অসহায়া নারী।

বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে ওই অশরীরী হিংসার বীভৎস ছায়া, যেন, যমদূত ঘুবে বেড়াচ্ছে চারিপাশে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে কৃষ্ণা। ঘুম নেই— [illegible] নির্বিকতার অরণ্যানী।

স্বামীর নিস্পৃহতায় কাঠ হয়ে গেছে। এখানে এসে অবধি লক্ষ্য করছে সে, এখানকার রীতিনীতিই আলাদা। বহু চেষ্টা করেও নিজেকে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। ব্যর্থ হয়েছে বার বার তার সব প্রচেষ্টা। এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি।

গর্জনটা শোনা যায় আবার—বহুদূর থেকে ভেসে আসছে।

দত্তবখালের ওপারে চলে গেছে। আবার ফিরে গেছে বাঘটা বনের গভীরে।

মাঝে মাঝে আসে ওরা—গর্জনধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ওরা জানিয়ে যায় প্রতিবাদ, তাদের রাজত্বে মানুষ অনধিকার প্রবেশ কবেছে। তাই প্রতিশোধ নিতে আসে।

অসীম তেমনি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল তাতে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। একাই জেগে বসে আছে কৃষ্ণা। সারা মনে তার ঝড় বয়ে চলেছে। মনে হয় আদিম অরণ্যভূমিতে সে একা—পরিত্যক্ত অসহায় কোন নারী, যখনই ভয়ে আপনহারা হয়ে অসীমের পাশে এসে দাঁড়াতে চায়, সেই চরম মুহূর্তে যেন অসীম ওর কাছ থেকে সরে যায় অনেক দূরে। কৃষ্ণা তাই নিঃসঙ্গ একাকীই রয়ে গেছে।

এমনি করেই গড়ে উঠেছে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দুস্তর ব্যবধান। কৃষ্ণা ওকে আপন করে পায়নি। তার ব্যাকুল ভয়চকিত মন সবিয়ে নিয়ে গেছে কৃষ্ণাকে অসীমের নিবিড় সান্নিধ্য থেকে বহুদূরে, একাকী তার নিজের জগতে।

একথা বার বার অনুভব করেছে কৃষ্ণা। এই নিষ্ঠুরতম উপলব্ধি তার সারা মন মুষড়ে দিয়েছে। অবশ্য ওর

জন্য নিজেও সে দায়ী। কিন্তু এছাড়া তার পথও ছিল না। তাই তার অবসর মুহূর্তগুলো ভরে থাকে অতীতের স্মৃতি জগতে। এই অরণ্য আর মাত্র ক'টি মানুষ—এই ছোট্ট উপনিবেশ তাকে বাঁধতে পারেনি।

সুন্দরবনের নতুন উপনিবেশ অরণ্য-পরিবৃত ঠাঁই থেকে রাতে গহন তমসা ভেদ করে বার বার একটি মন ছুটে যায় আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর ফেলে আসা পথে। স্মৃতির এই রোমন্থন কৃষ্ণাকে তীব্র নেশার মত পেয়ে বসছে। সে গড়ে নিয়েছে তার পৃথক মনোজগত এই বিপরীতধর্মী পরিবেশের মধ্যে। এইখানেই সে তার দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করে, হতাশ মনকে এই কল্পজগতের স্বপ্ন-মদিরায় নেশাগ্রস্ত করে তোলবার প্রয়াস পায়। তাই সে এ জগতে বাস করেও এই আরণ্যক পরিবেশকে মেনে নিতে পারেনি। স্বীকার করতে পারেনি অসীমকে। ওই মালি কাশেম শেখ, বাওয়ালি সর্দার নিতাই বুনো, মৌ-ব্যাপারী ইরফান শেখ আর তার তিসরাবিবি মরিয়মকেও। ফেলে আসা মহানগরীর ইলা, মমতা, প্রণব বোস— সেই আলোমাখা রাজপথ, সন্ধ্যার গঙ্গাতীরটুকুই তার মনকে গ্রাস করে রেখেছে। ব্যাকুল নিঃসঙ্গ মন সেই ফেলে আসা জগতে বার বার ফিরে যেতে চায়।

বাবা কৃষ্ণার অবাধ গতিতে কোনদিনই বাধা দেননি। গানের চর্চা করবার সব সুযোগও দিয়েছিল। কৃষ্ণা ছেলেবেলা হতেই তার মনকে নিজের ইচ্ছা এবং রুচিমাফিক পথে এগিয়ে যাবার রাশ আলগা করে দিয়েছিল বিনা বাধায়।

এ যেন অন্য এক জগৎ। কিশোরী-মন খুশির হালকা হাওয়ায় রঙ্গীন প্রজাপতির মত রঙ-বেরঙের ডানা মেলে মুক্ত হাওয়ায় উড়েছিল আজ স্কুলের জলসা, কাল ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটে কবিদের মুশায়েরা, কোনদিন দল বেঁধে বোটনিক্‌সে পিক্‌নিক করতে যাওয়া। সারাদিন তার নানা কাজ।

মা গজগজ করে। তার সাবেকী মন মেয়ের এই অবাধ স্বাধীনতায় সায় দিতে পারে না। এত বড় মেয়ে দিনরাত হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে। মা গো মা। বয়স হয়েছে এ কথাটা মেয়েরও স্মরণ হয় না।

এ বাড়ির সবই যেন অসহ্য ঠেকে মায়েব কাছে। মেয়ে দলবেঁধে ছেলেদের সঙ্গে থিয়েটার করবে—এটা কেমনতর কথা, সাবেকী বুদ্ধি নিয়ে মা তা বুঝতে পারে না।

—এসব ভালো নয়।

মা গজগজ করে।

একরাশ চুল খোঁপা করে ঘাড়ের কাছে বাঁধতে বাঁধতে ফিতেটা দাঁতে চেপে মায়েব দিকে ফিরে চাইল কৃষ্ণা। কালো ডাগর দুটো চোখ মেলে বললে— কি করতে হবে তা হলে?

মেয়ের এই কথায় মা যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে— জানি না বাছা, তুমি আর তোমার বাবাই জানো। আমি তোমাদেব সংসারেব কে? দু'মুঠো খাই আর পরি, ব্যস। যার যা খুশি করোগে।

হাসে কৃষ্ণা।

স্বামীর কাছেও এই চাপা প্রতিবাদ করে কৃষ্ণার মা, অবশ্য মেয়ের অসাক্ষাতে।

—মেয়েটার মতিগতি আমাব ভালো লাগে না বাবু। বড়সড় হচ্ছে, এইবার দেখে শুনে বিদেয় করবার জোগাড় করা। গলার কাঁটা নামলে বাঁচি।

হাসেন বৈকুণ্ঠবাবু। হাতের কাগজখানা নামিয়ে প্রশ্ন করেন, —কেন? তোমার কি সম্পত্তির ভাগ কেড়ে নিচ্ছে?

—মরণ আমার! কি বলতে এলাম — কি হ'ল তার জবাব। চোখে দেখতে পারি না তাই মাঝে মাঝে বলি।

বাবার ঘর থেকে মাকে বের হয়ে আসতে দেখে দাঁড়াল কৃষ্ণা। আজ তার রেডিওতে 'অডিশন' আছে। কি ভেবে মাকে প্রণামই করে বসলো সিঁড়ির মাথায়।

মা রীতিমত বিস্মিত হয়ে উঠে, মেয়ের হঠাৎ যেন সুমতি হয়েছে। সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেয়ের দিকে। সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

কৃষ্ণা বলে— আজ একটা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি কিনা! বলতে বলতে জুতোর শব্দ তুলে বের হয়ে গেল কৃষ্ণা।

কি যেন আশা করেছিল মা, কিন্তু সব আশা তার ব্যর্থ হতে চলেছে। ও মেয়ের কোনদিনই সুমতি হবে না, মায়ের সায় দেয় না মেয়ের এই উদ্ধত ভাবভঙ্গীতে।'কিন্তু স্বামীকেও কোন কথা বলে লাভ নেই, তিনি এসবের উর্দ্ধে।

বড় ছোট, ভাইরাও কৃষ্ণাকে কিছু বলে না বাবার জন্যেই। কৃষ্ণা যেন বাড়ির মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী। কারণে অকারণে মেজাজ দেখায়।

তার হাঁক-ডাকে বাড়ি মুখর হয়ে ওঠে।

বৌদিরাও এড়িয়ে চলে তাকে।

—আমার কলম কেন নিয়েছিস তুই? কৃষ্ণা বাড়ি ফিরেই গোলমাল বাধিয়েছে। ছোটভাই মন্টু তার কলম নিয়ে গিয়েছিল স্কুলে, তাই নিয়ে বেধেছে। মন্টু দিদির ধমকে বেশ অপমানিত বোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মা বলে ওঠে—একবার নিয়েছে, নিলেই কি ক্ষয়ে গেল জিনিষটা! চুপ কর না কৃষ্ণা।

মায়ের আস্কারা পেয়ে মন্টু কি যেন বলবার চেষ্টা করতেই কৃষ্ণা কলমটা হাতে নিয়েই সজোরে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দামী পার্কার কলম নিবটা ছিটকে পড়ে তুবড়ে গেল। যাক্।

মা হাঁ হাঁ করে উঠে—করলি কি!

—বেশ করেছি। আমাব জিনিষ রাখি—ভাঙ্গি তাতে কারও কিছু যায় আসে না। উদ্ধত কাঠখোট্টা ভঙ্গীতে বলে উঠলো সে।

মা গজগজ করতে থাকে— মেয়ের এত বাড় ভালো নয়। পরের ঘরে গেলে এই নিয়ে ঝাঁটা লাথিও খেতে হবে। তোমার বাপের খাতির ও তারা রাখবে না। বুঝবে তখন।

—মা! চিৎকার করে ওঠে কৃষ্ণা। টকটকে ফর্সা রঙ লাল হয়ে উঠেছে। রেগে উঠলে দু'চোখ তার ফুলে ওঠে। নিটোল লাবণ্য ভেদ করে ফুটে ওঠে সারা দেহ-মনে ওর কঠিন কাঠিন্য! এ যেন অন্য কোন মেয়ে। থেমে যায় মা। গুম হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় বসে পড়ে কৃষ্ণা।

ওর নিজের অন্তরে এমনই কোন এক বিভিন্ন সত্তা আছে— যাকে নিজেই চিনতে পারে না কৃষ্ণা— বার বার চেষ্টা করেও। এ যেন সম্পূর্ণ অন্য কেউ। মাঝে মাঝে এমন তার হয়। দু' একদিন চুপচাপ পড়ে থাকে ঘরে, জল গণ্ডুষটুকু পর্যন্ত গ্রহণ করে না। কেউ শত চেষ্টা করেও ওঠাতে বা খাওয়াতে পারে না তাকে। সবকিছুর উপরই তার বিদ্রোহ।

আস্তে আস্তে রাগের চোট কমলে দু'একদিন পরে নিজেই ওঠে, আবার তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করে। কৃষ্ণার এই মনকে সবাই ভয় করে। এরই সুযোগ নিয়েছে সে।

তাই বাড়ীতে তার একাধিপত্য, রূপ আর যৌবন তার সেই প্রকাশকে সার্থক করে তুলেছে।

বন্ধুবান্ধব মহলে তার সুখ্যাতির শেষ নেই। এমন হাসিখুশি মিশুকে সহজ সরল মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। ছেলেদের সঙ্গেও নিঃশঙ্কোচে মিশতে পারে সে। কোন বাধা ঠেকে না। ক্লাসে হৈ চৈ করে সমানে। ছাত্র ইউনিয়নের একজন পান্ডা।

মমতা ঠাট্টা করে—প্রণবকে দেখছি জমিয়ে তুলেছিস।

হাসে কৃষ্ণা—ইস্, বয়েই গেছে আমার। ওই তো হ্যাংলার মত আসে গায়ে পড়ে আলাপ করতে।

—বেচারার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল দেখছি। ভালো ছেলে, পড়াশোনা তো প্রায় বন্ধই করেছে।

কথাটা শুনে কৃষ্ণা গায়েই মাখলো না। কে কোথায় কি করছে তাতে তার কি এসে গেল। বাধামুক্ত ঝরনার মত নিজের গতিতেই আপনহারা সে। নিস্পৃহের মত জবাব দেয়— তা আমাকে কি করতে হবে বল?

কলেজে ওর চালচলন, বুদ্ধিদৃপ্ত ভঙ্গী, বেপরোয়া উদ্ধত ভাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেয়ে তো নয়—ও যেন চুম্বক। নিজের ধর্মের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়ে কি এক প্রবল আকর্ষণী শক্তিতে সকলকেই কাছে টেনে নেয়। বিভ্রান্ত করে তোলে।

কলেজে সেদিন মেয়েমহলে একটা গুঞ্জনধ্বনি ওঠে। থার্ড ইয়ারের বসন্ত সেন নাকি মেয়েদের কমনরুমে গিয়ে ওদেরই পাড়া ইলার সঙ্গে কি সব অপমানজনক ভাবে কথাবার্তা বলেছে। তাই নিয়ে বারান্দার এখানে ওখানে আলোচনা চলেছে। চটে উঠেছে মেয়েরা। এ যেন তাদের সকলের অপমান।

ইলার চোখ মুখ লজ্জায় অপমানে রাঙা হয়ে ওঠে। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকেছে বই খাতা হাতে করে। বসন্ত সেন তখনও ওদের কামনরুমে ঢুকেই কথাগুলো শুনিয়ে চলেছে বেশ তেজদৃপ্ত কণ্ঠে। একঘর মেয়ে, কেউ বসন্তের কথার প্রতিবাদ করে না।

বসন্ত বলে ওঠে— সকলে কলেজে আসেন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াবার জন্যে।

এগিয়ে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল কৃষ্ণা। ফর্সা টকটকে রঙ উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে। কপালের উপর এসে পড়েছে দু'একাগাছি চূর্ণ কুন্তল। ঘামে ভিজে গেছে। বসন্ত ওর উদ্ধত দৃপ্ত ভঙ্গীতে একটু ঘাবড়ে গেছে। থমকে চেয়ে থাকে ওর দিকে। কৃষ্ণা কঠিন স্বরে বলে ওঠে,

—কি বললেন? ওর মুখের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করে কৃষ্ণা।

বসন্ত আমতা আমতা করে—মানে, বলছিলাম ওঁকে—

—থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমি বলছি শুনুন— ওকে বিশেষ কিছু বলবার থাকে, একান্তে বিশেষ জায়গায় বলতে পারেন। এখানে মেয়েদের সকলের সম্বন্ধে এইসব মন্তব্য যদি কোনদিন শুনি —দরকার হলে—

পায়ের স্লিপারের দিকে আঙুল দিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করে কৃষ্ণা।

বসন্ত সে ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বলে ওঠে— আপনি ওভাবে কথা বলবেন না।

বেশ চটে উঠেছে সে। কৃষ্ণা সহজ ভাবেই জবাব দেয়।

—সেটা আমার ইচ্ছে। আপনি এখন বেরিয়ে যান। মেয়েদের কমনরুমে ঢোকবার অনুমতি নিয়েছিলেন কি? যান বলছি। গলা বেশ চড়িয়ে কথাগুলো বলে কৃষ্ণা। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠেছে।

বসন্ত সেন ফণা নামিয়ে নিস্তেজ সাপের মত বেরিয়ে গেল। মেয়েদের দিকে ফিরে চাইল কৃষ্ণা। ওরাও বিস্মিত হয়ে গেছে কৃষ্ণার এই ব্যবহারে।

ছেলেমহলে সকলেই ওকে চিনে ফেলেছে এবং রীতিমত সমীহ করেই চলে কৃষ্ণাকে। অন্তরালে মন্তব্য করে—গেছো মেয়ে।

হাসে কৃষ্ণ ইলার দিকে চেয়ে—প্রেম! ওসব ন্যাকামি করিস কি করে বলতো ওই বসন্তের মত মেনিমুখো ছেলের সঙ্গে? তোদের আস্কারা পেয়েই তো ওরা মাথায় উঠেছে।

মমতা ফোড়ন দেয়—তুই কি প্রেম করিস না— ওকেই কেবল দুষছিস কেন?

—থাম মমতা।

কথাটা উড়িয়ে দেয় কৃষ্ণা। উড়িয়ে দেবার মত কথাই বটে। বার বার ভেবেও সমাধান করতে পারেনি সমস্যার—কি করে মেয়েরা এই ন্যাকামি করে। তার সচল গতিবেগের সামনে প্রেমের নীরব স্তব্ধতা অসহ্য। কৃষ্ণা বেশ কঠিন ভাবেই জবাব দেয়।

প্রেম! ফুঃ! কখনো কাউকে বলতে পারবো না— তোমাকে বড্ড ভা-লো-বা-সি! ওসব ন্যাকামি আমার কাছে অসহ্য।

জীবনের সব কিছুর ওপর কৃষ্ণা একচ্ছত্রাধিপত্য করতে চায়। তার মনের স্বাভাবিক স্বচ্ছ গতিছন্দকে বাধা দিক কেউ কোনভাবে, এটা সে চায় না। তাই বোধহয় তার ঋজু স্বাতন্ত্র্যকে প্রেমের কমনীয়তায় নুইয়ে কোন শিকল পরাতে পারেনি।

কলেজের রবীন্দ্রজয়ন্তীর ব্যাপারেও কৃষ্ণা অন্যতম উদ্যোক্তা। নিজেই খেটে খুটে 'শ্যামা' নাটক করবার চেষ্টা করছে।

ছেলেদের অনেকেই এগিয়ে আসে।

শ্যামা করবার মত আর কেউই নেই। বাধ্য হয়েই কৃষ্ণাকেই নামতে হয়েছে। প্রণব বজ্রসেন।

এই নিয়ে মমতা —ইলা অনেকেই রসিকতা করে —দেখিস যেন সত্যিই ফেলে যাসনা।

হাসে কৃষ্ণা—এতই সোজা?

— কে জানে!

কৃষ্ণার মন যেন হাঁসের পালকঢাকা গা, জল তাতে লাগে না। ঝরে পড়ে আপনা থেকেই অনায়াসে।

শ্যামার পার্টে কলেজময় নাম ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েদের অনেকের মনেই চাপা হিংসা। কেউ কেউ বলে আড়ালে।

রূপের দেমাকেই গেল, তার উপর আবার ওই সব। মাটিতে আর পা পড়বে না দেখিস।

কিন্তু কৃষ্ণা আগেকার মতই রয়ে গেছে।

একটা অবাক হয় প্রণবকে দেখে। হঠাৎ কেমন যেন একটু সাহসই পেয়ে গেছে সে ওই ক'দিনের রিহার্সেলের ঘনিষ্ঠতায়। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। চুপ করে থাকে।

ওর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয় কৃষ্ণা।

প্রণব যেন কি সব বলতে চায়।

হাসছে কৃষ্ণা, খিলখিল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে।

বেদনাহত চাহনিতে প্রণব চেয়ে থাকে ওর দিকে।

অনেক আশা নিয়েই সে আজ এসেছিল বেড়াতে। এ যেন সেই নাটকের দৃশ্য বাস্তবে পরিণত করার প্রয়াস।

কেমন সুন্দর একটি অপরাহ্ণ বেলা।

পাখিডাকা নদীতীর।

সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

কৃষ্ণা হাসি থামিয়ে দু'চোখের তারায় কৌতুকের আভাস ফুটিয়ে ওঠে,

—কি সব ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করেন বলুন তো? ছেলেরা বুঝি এমন করে?

কৃষ্ণা ক্লান্তি আর আলস্যে ঘাসের উপর সুন্দর সুঠাম পা দুটো বিছিয়ে বসেছে। বাতাসে উড়ছে তার দু-একগাছি চুল।

দু'চোখে কৌতুকের হাসি।

ওই কঠিন মনের রুদ্ধ প্রাচীরে কোথায় অতর্কিত আঘাত পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে প্রণব।

দু'চোখে তার স্তব্ধ বেদনাভরা দৃষ্টি।

কত আশা, কত স্বপ্ন সে দেখেছিল এতদিন কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে। আজ সব সৌন্দর্য- সুষমাব সেই স্বপ্ন যেন তার ধুলোয় মিলিয়ে গেল। নীরবে তার মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে প্রণব।

হাসছে কৃষ্ণা—পুরুষ না হয়ে মেয়ে হলেই আপনাদের মানাতো।

প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে থাকে কৃষ্ণা। বৈকালের রক্তসূর্য গঙ্গার ঘোলাটে জলের বুকে রক্তাভা এনেছে। গাছের মাথায় মাথায় শোনা যায় পাখির ডানার ঝাপটানি। নদীর জলে ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছে বাদামী-পালে মালগুজারী নৌকা দু'একটা —যেন নিরুদ্দেশের যাত্রী। দিনের আবিরমাখা রোদ কেমন নিস্তেজ হয়ে উঠেছে।

প্রণব কথা বলে না, চেয়ে থাকে ওর দিকে। হেসে ফেলে কৃষ্ণা, জয়েব হাসি। বিজয়িনী নারী যেন টেনে বের করেছে ওর রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড নিজের দুই হাতের মধ্যে। ওকে যেন নিঃশেষে টিপে হত্যা করবে সে। মনে হয় কৃষ্ণার— সে যেন কোন স্বপ্নপুরীর রাজকন্যা— বিরাট এক দৈত্যের প্রাণভোমরা রয়েছে তার হাতে স্বর্ণকৌটায় বন্দী হয়ে। ইচ্ছে করলেই অনায়াসে তাকে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

গঙ্গার বুকে নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। অন্ধকার নামে প্রণবেরও মনে।

উঠে পড়েছে কৃষ্ণা। একটু কঠিন সুরেই বলে ওঠে,

—চলুন, সন্ধে হয়ে গেল। বাড়ি গিয়ে পড়াশোনা করুন গে। ভালো ছেলে আপনি, যদি রেজাল্টখারাপ হয় কলেজ শুদ্ধ সব্বাই আমাকেই দুষবে।

অসহায় প্রণব মাথা নীচু করে ওর সঙ্গে এসে ট্রামে উঠে পড়লো নীরবে।

কৃষ্ণা সেদিনের কথা ভুলতে পারে না। বনহংসীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি মেয়ে—জলেই বাস করে সে, কিন্তু ওর দেহে বিন্দুমাত্র জলও স্পর্শ করতে পারেনি।

ভালবাসার হিসাব-নিকাশ করতে মন রাজী হয়নি সেদিন। চিরকালই গোত্রছাড়া সে।

খবরটা কোন রন্ধ্র পথে ছড়িয়ে পড়ে কলেজে।

ওদের দুজনের এই কাল্পনিক ঘনিষ্ঠতার খবর। গঙ্গার ধারে বোটানিক্সে ওদের অভিযান, সিনেমায় যাওয়া, আরও অনেক মুখরোচক সংবাদ কলেজে এসে যায়।

কমনরুমে সেদিন মমতা প্রশ্ন করে কৃষ্ণাকে— হ্যাঁরে কতদূর এগুলো?

কৃষ্ণা বেশ অবাক হয়—ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—কিসের?

—ন্যাকা মেয়ে! হাসে ইলা।

মমতা সুর করে গেয়ে ওঠে সদ্যশোনা শ্যামাব গান।

—জীবনের পরম লগন করোনা হেলা,
হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা
সাঙ্গ হবে যে খেলা,
সুধাব হাটে ফুরাবে বিকিকিনি।।

—যতো সব বাজে কথা তোদেব।

কৃষ্ণা হাসে।

চমকে ওঠে কৃষ্ণা।

আজ সেইসব কথা—স্মৃতি এই গহিন গাং আর গহন বনে ঘেবা পরিবেশে মনে পড়ে।

সেই পবম লগন যেন হেলা ফেলাতেই কাটিযেছে কোন গববিনী। আজ খেলা শেষে—বিকিকিনীর হাটে কি সে সংগ্রহ করেছে?

জানে না।

আকাশেব তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে কি দুঃসহ বেদনায়। রাত শেষ হয়ে আসছে।

কেটে গেল একটি বিনিদ্র রাত।

একটি নয়— আরও অনেক এমনি রাত কেটেছে। বেদনায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছে কত সুন্দর সকাল।

তারই মাঝে দেখছে কৃষ্ণা নিজের সত্তার তিল তিল অপমৃত্যু। দুঃসহ ব্যথার ব্যর্থতায় গুমরে উঠেছে তার মন। কোথায় যেন মস্ত ভুল করেছে সে।

জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় রাত ভোর হয়ে আসছে। সুন্দরবনের বুকে দেখা দেয় দিনের প্রথম জাগরণী আলো। কেওড়া-সুন্দরী-গরাণ গাছের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে চুপিসারে। ঘুম ভেঙে যায় পাখিদের, দলে দলে ওরা ডানার নীচে থেকে একপা নামিয়ে ডানা থেকে রাতের শিশির ঝেড়ে ফেলে নিস্তব্ধ আকাশ-সীমায় ওদের প্রথম অস্তিত্ব ঘোষণা করে সুরেলা কণ্ঠে। বাঁদরদল এসে জমেছে কেওড়া গাছের সবুজ পত্রাচ্ছাদিত ডালে। দলবদ্ধভাবে লাফ ঝাঁপ শুরু করেছে। যেন ঝড় নেমেছে বনে। নীচে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রল শৃঙ্গের হরিণপাল। গাছ থেকে ঝরা শিশির মাখা পাতা চিবুচ্ছে আর অকারণেই চারিদিকে কালো কালো ডাগর চোখের সন্তপর্ণী দৃষ্টি মেলে কি দেখছে। বাতাসে ঘ্রাণ নিচ্ছে ঘন ঘন। বনের বুকে এসে পড়েছে দিনের প্রথম রক্তরৌদ্র।

কৃষ্ণা বাংলো থেকে বের হয়ে পাটাতনে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। নিস্তরঙ্গ হরিণগাড়া নদীর বুকের কালো জলে এসেছে শীতের স্পর্শ। রক্ত-লাল হয়ে উঠেছে থৈ থৈ জল। সমুদ্রের স্বাদে বিভোর হয়ে রয়েছে লাল আবিরগোলা জল। মাঝে মাঝে জোয়ারের বেগে ঘুরপাক খেয়ে আবার চলেছে সমুদ্রকন্যা মানুষের দেশের দিকে থৈ থৈ কলহাস্যে চারিদিক ভরিয়ে তুলে।

হাসে কৃষ্ণা—এতই সোজা?

— কে জানে!

কৃষ্ণার মন যেন হাঁসের পালকঢাকা গা, জল তাতে লাগে না। ঝরে পড়ে আপনা থেকেই অনায়াসে!

শ্যামার পার্টে কলেজময় নাম ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েদের অনেকের মনেই চাপা হিংসা। কেউ কেউ বলে আড়ালে।

রূপের দেমাকেই গেল, তার উপর আবার ওই সব। মাটিতে আর পা পড়বে না দেখিস।

কিন্তু কৃষ্ণা আগেকার মতই রয়ে গেছে।

একটা অবাক হয় প্রণবকে দেখে। হঠাৎ কেমন যেন একটু সাহসই পেয়ে গেছে সে ওই ক'দিনের রিহার্সেলের ঘনিষ্ঠতায়। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। চুপ করে থাকে।

ওর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয় কৃষ্ণা।

প্রণব যেন কি সব বলতে চায়।

হাসছে কৃষ্ণা, খিলখিল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে।

বেদনাহত চাহনিতে প্রণব চেয়ে থাকে ওর দিকে।

অনেক আশা নিয়েই সে আজ এসেছিল বেড়াতে। এ যেন সেই নাটকের দৃশ্য বাস্তবে পরিণত করার প্রয়াস।

কেমন সুন্দর একটি অপরাহ্ণ বেলা।

পাখিডাকা নদীতীর।

সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

কৃষ্ণা হাসি থামিয়ে দু'চোখের তারায় কৌতুকের আভাস ফুটিয়ে ওঠে,

—কি সব ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করেন বলুন তো? ছেলেরা বুঝি এমন করে?

কৃষ্ণা ক্লান্তি আর আলস্যে ঘাসের উপর সুন্দর সুঠাম পা দুটো বিছিয়ে বসেছে। বাতাসে উড়ছে তার দু-একগাছি চুল।

দু'চোখে কৌতুকের হাসি।

ওই কঠিন মনের রুদ্ধ প্রাচীরে কোথায় অতর্কিত আঘাত পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে প্রণব।

দু'চোখে তার স্তব্ধ বেদনাভরা দৃষ্টি।

কত আশা, কত স্বপ্ন সে দেখেছিল এতদিন কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে। আজ সব সৌন্দর্য- সুষমার সেই স্বপ্ন যেন তার ধুলোয় মিলিয়ে গেল। নীরবে তার মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে প্রণব।

হাসছে কৃষ্ণা—পুরুষ না হয়ে মেয়ে হলেই আপনাদের মানাতো।

প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে থাকে কৃষ্ণা। বৈকালের রক্তসূর্য গঙ্গার ঘোলাটে জলের বুকে রক্তাভা এনেছে। গাছের মাথায় মাথায় শোনা যায় পাখির ডানার ঝাপটানি। নদীর জলে ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছে বাদামী-পালে মালগুজারী নৌকা দু'একটা —যেন নিরুদ্দেশের যাত্রী। দিনের আবিরমাখা রোদ কেমন নিস্তেজ হয়ে উঠেছে।

প্রণব কথা বলে না, চেয়ে থাকে ওর দিকে। হেসে ফেলে কৃষ্ণা, জয়ের হাসি। বিজয়িনী নারী যেন টেনে বের করেছে ওর রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড নিজের দুই হাতের মধ্যে। ওকে যেন নিঃশেষে টিপে হত্যা করবে সে। মনে হয় কৃষ্ণার— সে যেন কোন স্বপ্নপুরীর রাজকন্যা— বিরাট এক দৈত্যের প্রাণভোমরা রয়েছে তার হাতে স্বর্ণকৌটায় বন্দী হয়ে। ইচ্ছে করলেই অনায়াসে তাকে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

গঙ্গার বুকে নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। অন্ধকার নামে প্রণবেরও মনে।

উঠে পড়েছে কৃষ্ণা। একটু কঠিন সুরেই বলে ওঠে,

—চলুন, সন্ধে হয়ে গেল। বাড়ি গিয়ে পড়াশোনা করুন গে। ভালো ছেলে আপনি, যদি রেজাল্টখারাপ হয় কলেজ শুদ্ধ সব্বাই আমাকেই দুষবে।

অসহায় প্রণব মাথা নীচু করে ওর সঙ্গে এসে ট্রামে উঠে পড়লো নীরবে।

কৃষ্ণা সেদিনের কথা ভুলতে পারে না। বনহংসীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি মেয়ে—জলেই বাস করে সে, কিন্তু ওর দেহে বিন্দুমাত্র জলও স্পর্শ করতে পারেনি।

ভালবাসার হিসাব-নিকাশ করতে মন রাজী হয়নি সেদিন। চিরকালই গোত্রছাড়া সে।

খবরটা কোন রন্ধ্র পথে ছড়িয়ে পড়ে কলেজে।

ওদের দুজনের এই কাল্পনিক ঘনিষ্ঠতার খবব। গঙ্গার ধারে বোটানিক্সে ওদের অভিযান, সিনেমায় যাওয়া, আরও অনেক মুখরোচক সংবাদ কলেজে এসে যায়।

কমনরুমে সেদিন মমতা প্রশ্ন কবে কৃষ্ণাকে— হ্যাঁরে কতদূর এগুলো?

কৃষ্ণা বেশ অবাক হয়—ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—কিসের?

—ন্যাকা মেয়ে! হাসে ইলা।

মমতা সুর করে গেয়ে ওঠে সদ্যশোনা শ্যামার গান।

—জীবনেব পরম লগন করোনা হেলা,
হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা
সাঙ্গ হবে যে খেলা,
সুধাব হাটে ফুবাবে বিকিকিনি।।

—যতো সব বাজে কথা তোদেব।

কৃষ্ণা হাসে।

চমকে ওঠে কৃষ্ণা।

আজ সেইসব কথা—স্মৃতি এই গহিন গাং আর গহন বনে ঘেবা পরিবেশে মনে পড়ে।

সেই পবম লগন যেন হেলা ফেলাতেই কাটিযেছে কোন গববিনী। আজ খেলা শেযে—বিকিকিনীর হাটে কি সে সংগ্রহ করেছে?

জানে না।

আকাশেব তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে কি দুঃসহ বেদনায। রাত শেষ হয়ে আসছে।

কেটে গেল একটি বিনিদ্র রাত।

একটি নয়— আবও অনেক এমনি রাত কেটেছে। বেদনায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছে কত সুন্দর সকাল।

তারই মাঝে দেখছে কৃষ্ণা নিজেব সত্তার তিল তিল অপমৃত্যু। দুঃসহ ব্যথার ব্যর্থতায় গুমরে উঠেছে তার মন। কোথায যেন মস্ত ভুল কবেছে সে।

জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় রাত ভোর হয়ে আসছে। সুন্দরবনের বুকে দেখা দেয় দিনের প্রথম জাগরণী আলো। কেওড়া-সুন্দবী-গরাণ গাছের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে চুপিসাবে। ঘুম ভেঙে যায় পাখিদের, দলে দলে ওরা ডানার নীচে থেকে একপা নামিযে ডানা থেকে রাতের শিশির ঝেড়ে ফেলে নিস্তব্ধ আকাশ-সীমায় ওদের প্রথম অস্তিত্ব ঘোষণা করে সুরেলা কণ্ঠে। বাঁদরদল এসে জমেছে কেওড়া গাছের সবুজ পত্রাচ্ছাদিত ডালে। দলবদ্ধভাবে লাফ ঝাঁপ শুরু করেছে। যেন ঝড় নেমেছে বনে। নীচে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রল শৃঙ্গের হরিণপাল। গাছ থেকে ঝরা শিশির মাখা পাতা চিবুচ্ছে আর অকারণেই চারিদিকে কালো কালো ডাগর চোখেব সন্তর্পণী দৃষ্টি মেলে কি দেখছে। বাতাসে ঘ্রাণ নিচ্ছে ঘন ঘন। বনের বুকে এসে পড়েছে দিনের প্রথম রক্তরৌদ্র।

কৃষ্ণা বাংলো থেকে বের হয়ে পাটাতনে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। নিস্তরঙ্গ হরিণগাড়া নদীর বুকের কালো জলে এসেছে শীতের স্পর্শ। রক্ত-লাল হয়ে উঠেছে থৈ থৈ জল। সমুদ্রের স্বাদে বিভোর হয়ে রয়েছে লাল আবিরগোলা জল। মাঝে মাঝে জোয়ারের বেগে ঘুরপাক খেয়ে আবার চলেছে সমুদ্রকন্যা মানুষের দেশের দিকে থৈ থৈ কলহাস্যে চারিদিক ভরিয়ে তুলে।

মাটির ওপর মোটা মোটা সুন্দরী কাঠের খুঁটি পুঁতে বেশ হাত কয়েক উঁচু করে শক্ত পাটাতন দেওয়া। তার উপর কাঠের মোটা তক্তা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বাংলো। সাপ আর বন্যার জল থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায়। ওপাশে মালি, মাঝি-মাল্লা, চাষীদের ঘরগুলো অপেক্ষাকৃত নীচু পাটাতনের উপর তৈরি। সামনে প্রশস্ত মাঠের পরই উঁচু ভেড়ি বা বাঁধ দিয়ে দুরন্ত নদীর জোয়ারে লোনা জলের গতিরোধ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভেড়ির নীচেই দিগন্তপ্রসারী হরিণগাড়া নদী। এ-পাশে খাল, তারও বিস্তার নেহাৎ কম নয়। মানুষের বসতিকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। যতদুর চোখ যায় জল আর জল ওপারে বন—আকাশ ছোঁয়া ঘন।

খাল আর নদীর ওপারেই আদিম অরণ্য। তিনদিকে ঘিরে রয়েছে অরণ্যসীমা। একদিকে অন্তরীপের মত সরু মাইল কয়েক জমি কয়েক বৎসর আগেও এখানে ছিল গহন বন। অসীম সেই হাজার কয়েক একর জমি ইজারা নিয়ে শুরু করেছে এই পরীক্ষা—পত্তন করেছে নতুন উপনিবেশ।

প্রাণহীন লবণাক্ত মৃত্তিকা, চারিপাশে ওর অরণ্য আর অতলস্পর্শী নদীর বিভীষিকা। তার মাঝে এসে পত্তন করেছে অসীম মানব সভ্যতার অঙ্কুর, ফুটিয়ে তুলতে চায় সোনা ফসলের সার্থক স্বপ্ন। এই প্রাণহীন দেশে বিধাতার ভূমিকা নিতে চায় সে।

কৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে দূর বনসীমার দিকে। স্তরে স্তরে নদীর জলরেখার বুক থেকে উঠে গেছে সবুজের আস্তরণ, গাঢ় হলদের ছোপ লাগানো। সব শ্যামলিমা—প্রভাতের স্বর্ণরৌদ্রে যেন স্বপ্ন দেখে অরণ্যের অপরিসীম মাধুরিমায়। রাতের সেই হিংস্র মৃত্যুর রূপ মিলিয়ে গেছে আর সেখানে দিগদিগন্ত জুড়ে বসেছে সুন্দরের মেলা। মৃত্যুর স্পর্শও সেখানে অফুরন্ত সৌন্দর্য।

হঠাৎ নীচের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে কৃষ্ণা। তার পায়ের কাছেই নরম মাটিতে আঁকা রয়েছে গত রাত্রির সেই হিংস্র শ্বাপদের পদচিহ্ন। কঠিন সত্যের মত স্পষ্ট হয়েছে ওই সৌন্দর্যের আবরণে লুক্কায়িত আরণ্যক হিংস্রতার অস্তিত্ব। এঁকে বেঁকে পায়ের ছাপটা চলে গেছে খালের দিকে, মৃত্যুদূতের পদচিহ্ন।

এখানের মাটিও কৃপণ, রুক্ষ। মানুষের জীবনধারণের জন্য বিন্দুমাত্র সঞ্চয় এখানে নেই।

গাছ হয় অসংখ্য—অজস্র গাছ। ফলও ফলে। কিন্তু সে ফলে মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।

এ জলও মানুষের অপেয়। চারিদিকে এর জল আর জল। গভীর অতল স্পর্শী নদী।

শুধু নদীই নয়, ভূ-ভাগকে আক্রমণ করতে এসেছে সমুদ্র তার তীক্ষ্ণ নখদন্ত বিস্তার করে। বাংলার শেষ সীমান্তে লোভী সমুদ্র তার হিংসালোলুপ হাতের নখ বসিয়েছে। ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এই সামান্য মৃত্তিকাটুকুকে, যে-কোন মুহূর্তে তার অতল উদরে গ্রাস করে নেবে। এত জল— কিন্তু ওর এক বিন্দুও মানুষের পিপাসায় শান্তি আনে না। নিঃশেষে তাকে ডুবিয়ে মারতেই জানে। ফসলের প্রাণ বাঁচাতে জানে না। তীক্ষ্ণ ধারালো জিব দিয়ে এক লহমায় সবুজ ধানশিশুর প্রাণশক্তিটুকুকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করেই তৃপ্ত হয় ওরা।

এ জগতে আকাশে বাতাসে মৃত্যু। জীবন এখানে কঠিন কঠোর। প্রতি পদে পদে সংগ্রাম— মানুষও তাই সংগ্রামী হয়ে উঠেছে এই পরিবেশে। হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা দুর্বলতাকে বিসর্জন দিয়ে সেও এই আরণ্যক মূল সত্যটুকুকে তার সত্তার মধ্যে গ্রহণ করে তবেই এখানে বাঁচবার অনুপ্রেরণা পেয়েছে। এই দুরন্ত জীবনের নেশায় সে মত্ত হয়েছে। এ এক দুর্বার নেশা—এর স্বাদ অসীমকে পেয়ে বসেছে।

—কি করছো?

স্বামীর ডাকে কৃষ্ণা ফিরে চাইল। ভোরবেলাতেই অসীমের ঘুম ভাঙ্গে চা-পর্ব সেরে সে বের হয়ে এসেছে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা ওর। প্রতি পদক্ষেপে ফুটে ওঠে বলিষ্ঠ দৃপ্ত ভঙ্গী। চোখের চাহনিতে সারল্য। সদ্যস্নাত দেহ থেকে বের হচ্ছে সুগন্ধি সাবানের মৃদু সুবাস। প্রশস্ত বুকের লোমকূপে লেগে রয়েছে দু'এক বিন্দু জলকণা। মাঝে মাঝে অসীমের দিকে চেয়ে আজও নিষ্ঠুর পরিবেশে যৌবনের সেই বিস্ময় করা স্বপ্নের সন্ধান পায় কৃষ্ণা। এ এক মুগ্ধ বিহ্বল নারী, বর্তমানের সব অস্তিত্ব ছাড়িয়ে ফিরে আসে সে আজও এই নিভৃত বনসীমায়।

—ওই দেখ। আঙুল দিয়ে কৃষ্ণা বালির উপর পায়ের ছাপগুলো দেখিয়ে দেয়।

নিবিষ্ট মনে একটু দেখেই বলে ওঠে অসীম— বা চমৎকার। ফুল্ গ্রোন বলেই মনে হয়। একদিন চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। এ গুড সট। নেমে গিয়ে 'পাগমার্ক' দেখে হিসাব করে বলে ওঠে—নাইস, বারো ফিট তো হবেই। ক্লিয়ার টুয়েলভ ফিট ফ্রম হেড টু টেল।

লোভী শিকারীর দৃষ্টি মেলে বনের দিকে চেয়ে থাকে অসীম।

চমকে ওঠে কৃষ্ণা।

ভীত হওয়া তো দূরের কথা— যেন খুশিই হয় অসীম। কি এক আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে সে। কৃষ্ণা ওর দিকে চেয়ে রয়েছে স্তব্ধ দৃষ্টিতে। তার কথাও যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

—চা খাবে না? সেই-ই ডাক দিল কৃষ্ণাকে।

নীরবে কৃষ্ণা ফিরে চলল ঘরের দিকে।

অতুল বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছে। দরজা খোলা পেয়ে ওপাশের ঘরখানা থেকে মুরগী দুটো বের হয়ে পড়েছে। রুটির টুকরো পাবার আশায় টেবিলের নীচে ঘুর ঘুর করছে 'রোড আইল্যান্ড' মুরগী এক জোড়া। কৃষ্ণার কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো তারা। কিছুদিনেই ওরা মানুষ ঘেঁসা হয়ে উঠেছে।

তাজা টকটকে গায়ের রং, মাথার ফুলটা ওর রাজকীয় মর্যাদা এনেছে। কৃষ্ণার নিঃসঙ্গ জীবনের ওরাও সঙ্গী। অনেক চেষ্টা করে ফরেষ্ট রেঞ্জারকে বলে ক'য়ে আনিয়েছে একজোড়া বাচ্চা। এইটুকু থেকে বড় করে তুলেছে।

অসীম চা-পর্ব শেষ করেই কাজে বেরুবার আয়োজন করে।

—ট্রাকটার নিয়ে বেরুতে বল্ অতুল, দক্ষিণের মাঠে যেতে হবে। সেই সঙ্গে দশজন বুনোও যাবে— বলে দে।

চা খেতে খেতেই কাজের ফিরিস্তি নিয়ে বসে। অনেক কাজ তার। সামান্য সময়টুকুও নষ্ট করবার মত অবকাশ তার নেই।

বন কেটে নতুন আবাদের পত্তন হচ্ছে। মাটির লবণাক্ত স্বাদ এখনও ঘোচেনি। সুন্দরী-কেওড়া-গরাণ গাছের পিতৃপুরুষ নির্মূল হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও মাটির নীচে রয়ে গেছে তাদের মূল শিকড়। কবর-খোঁড়া-দেহের মত মাটির নীচে থেকে এখনও বের হয়ে আসছে কালো সেই মূল শিকড়গুলো। আষ্টেপৃষ্ঠে এখনও জড়িয়ে রয়েছে এই মৃত্তিকার অতীতের আরণ্যক জীবনছন্দ। তাকে ধ্বংস করতে চায় অসীম নিষ্ঠুর হাতে। মানবের বসত গড়বে বন ধ্বংস করে।

কৃষ্ণা চুপ করে বসে থাকে। অসীম কাজে বের হয়ে যায়।

হাফশার্ট গায়ে, সোলাহ্যাট মাথায়, হাতে একটা লোহার নাল বাঁধানো লাঠি। ওটার এখানে খুবই প্রয়োজন। কে জানে ভেড়ির ধারে সকালের শিশিরগলা রোদে সটান শুয়ে রয়েছে হিংস্র কেউটে না হয় গোখরো। না হয় ফাটলের মধ্যে থেকে মুখ বের করে রয়েছে শিকারের আশায়, কুতকুতে গোল চোখে তীব্র হিংস্র চাহনি, চিড় খাওয়া শাণিত জিভের অন্তরালে রয়েছে মৃত্যু নীল বিষ। অসীম মাঝে মাঝে ওদের সামনে পড়েছে। ওরা কেউবা ওকে দেখে বেঁচেছে, কেউ বা শেষ হয়ে গেছে, লোহার ডাণ্ডার আঘাতে।

অসীমের চলিষ্ণু মূর্তিটা মিলিয়ে গেল কেওড়া ঝোপের অন্তরালে। সারা জায়গাতে নেমে এসেছে স্তব্ধ নির্জনতা। মোরগের ডাক শোনা যায় নীচে থেকে, ওদিকে বাওয়ালি বস্তি থেকে ধোঁয়া উঠছে—মানুষের নীরব অস্তিত্বের সাক্ষ্য হিসাবে। চোখে কোথাও জীবন্ত মানুষ পড়ে না। যারা আছে তারা কেউ গেছে মাঠে নতুন আবাদের জমি সাফ করতে, না হয় খালপারের বনে চোরা কাঠের সন্ধানে। একাই এই প্রাণহীন পুরীকে কৃষ্ণা যেন পাহারা দিচ্ছে। সে আর ওই অ্যালশেসিয়ান কুকুর নিরো, জিভ বের করে হাঁপাচ্চে সে এক-মনে। কৃষ্ণার ডাকে একবার মুখ তুলে চেয়ে আবার মাথা নামিয়ে নিল নিরো।

ওদিকে অতুল রান্নার জোগাড় করছে। কোনদিন খেয়াল হ'লে কৃষ্ণাও হাত লাগায়। ওসব বিশেষ তার আসে না। কলকাতার বাড়িতেও করেনি। মা-বৌদিরাই বাধা দিতো।

অকারণে সেই দিনগুলোই ভেসে ওঠে তার চোখেব উপর। হয়তো সেদিন বোঝেনি আজ অনুভব করে, অতীতের স্মৃতিই ছিল মধুর। আজও আনমনা করে তোলে তাকে।

বাড়িতে সকলেই তাঁর জন্য সন্ত্রস্ত।

—হাঁ হাঁ ঠাকুরঝি! উনুনের তাপে অমন রং পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে যে!

বৌদি কথাটা ঠিক আন্তরিকতার সুবেই বললো, না তাতে ঠাট্টার সুব রয়েছে তা বুঝতে ঠিক পারতো সে। তবু বলতো— কেন রাঁধতে নেই না কি?

হাসে বৌদি—আমার মত তোমাকে, আর হাত পুড়িয়ে খেতে হবে না ভাই।

— কেন আমি কি?—প্রশ্ন করে কৃষ্ণা।

মা বলে ওঠে—যা দিকি, রান্নাঘবে আর ভিড় বাড়াসনি, অনেক কাজ বাকি এখনও।

কৃষ্ণাকে এসবের মধ্যে ওবা টানতে চায় না। সমাজ সংস্কাবের সাধারণ দৈনন্দিন কাজেব ভিড় থেকে ওরা তাকে রেহাই দিয়েছে। তারা ধরেই নিয়েছে সে এ সবের উর্ধ্বে।

কৃষ্ণাও এমনি করে নিজেকে একটু বেশিই ভাবতে শুরু করেছিল।

প্রণব সেই সন্ধ্যার ঘটনার পরও ভুলতে পারে না কৃষ্ণাকে। প্রথম যৌবনের বেদীমূলে যে নারী অজ্ঞাতসারে সাড়া জাগিয়েছে, সে ওই কৃষ্ণা। তাকে কেন্দ্র করে প্রণবেব নীরব ব্যাকুল মন রচনা কবেছে স্বপ্নসৌধ। সেইদিনের সন্ধ্যায় ওর কথাগুলোতে ব্যথা পেয়েছিল প্রণব। ফেল করুক আর পাশই করুক তাতে যে কৃষ্ণারই সুনাম জড়িত আছে—এ সত্যটা সেদিন অনুভব করতে পারে সে!

তবুও কথা বলতে কোথায় বাধে। পবে দেখা হয়েছে, কৃষ্ণা ভুলে গেছে সেই সন্ধ্যাব কথা। ওটা তাব কাছে নেহাৎ ছেলে-খেলাই, চলিষ্ণু মনের পাতায় কোন ছাপই কাটেনি ঘটনাটা।

কৃষ্ণার সম্পদভরা মনে কাউকে ওই আঘাত দেওযাব কথাও মনে থাকে না। তাব নিজেব খববই নিজেব কাছে অজানা, অপরের খবর সে বাখবে কোথায়?

হঠাৎ অনুভব করে, প্রণব একটা ব্যবধান বজায় বেখে চলেছে। আগে ক্লাবে, করিডোরে, ছুটির পর বাড়ি ফিরবার সময়েও যেমন করে হোক কথা বলার অবসব করে নিতো, খানিকটা পথ একসঙ্গেও আসতো। ছায়া ঘন পথে নামতো বৈকালের আবছা আলো। কেমন একটু তৃপ্তি পেত মনের কোণে। এখন প্রণব মুখ নিচু করেই চলে যায়। ইচ্ছা কবেই এড়িয়ে যায় তাকে। কলেজে আড্ডা না মেরে এখন লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করে সেই সময়টুকু। এই ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া কৃষ্ণার মনে ঠেকে।

মেয়েরা বলে—প্রণবের সঙ্গে তোর কি হয়েছে রে কৃষ্ণা?

হাসে কৃষ্ণা— কে জানে! ছিলই বা কি তেমন হবার প্রশ্ন উঠছে?

কৃষ্ণা সহজ হবার চেষ্টা করে। বান্ধবীবা প্রশ্ন করে।

—কিছু বলেছিস নাকি? তুইতো একটা কাঠ। তবু তোর পিছনেই যে কেন ছেলেরা লাইন দেয়, কে জানে?

কৃষ্ণা জবাব দেয়— ওদেরকেই জিজ্ঞাসা করিস কারণটা। আমি তো ওসব কিছুই বুঝি না।

ঠাট্টা করে মমতা—ন্যাকা। কিছু বোঝ না!

এ এক ধরনের স্তাবকতা। তার রূপ আছে, গুণও যে না আছে এমন নয়, সুতরাং ছেলেরা তার জন্য ব্যাকুল হবে, আনমনা হবে—এ আর অস্বাভাবিক কি! এই পরিহাস তাই সহজভাবেই নিয়েছে কৃষ্ণা। পুরুষদের কাছ থেকে এই সার্থকতা পাবার দাবী তার স্বাভাবিক। তাই পুরুষকে আঘাত দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে।

লিলি এমনিতে নিকষ কালো, প্রেম করতে গিয়ে ঠকেই এসেছে বার বার। সে-বলে ওঠে— তোর নাম কৃষ্ণা না রেখে শুক্লা রাখাই উচিত ছিল, বুঝলি?

—তোর নাম তো লিলি!

—হ্যাঁ ব্ল্যাক লিলি! লিলি হাসে।

মনে মনে খুশি হয় কৃষ্ণা। গায়ের বর্ণ তার কাঁচা সোনার মতই সুগৌর। দু'চোখের দীঘল চাহনীতে কি যেন নেশা আছে—নিজেরই চমক লাগে।

হঠাৎ তবু কোথায় যেন কি হয়ে যায়। মমতার সেই গানটাই মনে পড়ে।

—জীবনের পরম লগন করো না হেলা।

প্রণবকে সেদিন লেকের ধারে গোলমোহরের গাছের নীচে দেখেছিল। হলুদফুলে ঢাকা গাছটা। এগিয়ে যায় তার দিকে কি যেন আশা নিয়ে। সেই বৈকালের কথার জন্য বেদনা বোধ করে সে।

কিন্তু প্রণব তবু কথা বলে না, ওকে দেখলে এড়িয়েই চলে যাবার চেষ্টা করে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণা। অসহায় অপমানে মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে।

তারপর পরীক্ষার ফল বের হ'লে বন্ধুরা সকলেই অবাক হয়ে যায়।

—এ কি করেছিস কৃষ্ণা! তোর মত ভালো মেয়ে ইংরেজিতে মোটে বেয়াল্লিশ পেলো ফার্স্ট পেপারে!

মমতা শুনিয়ে দেয় প্রণব ফার্ষ্ট হয়েছে।

কোন কথা বলে না কৃষ্ণা। সেই হয়তো প্রথম হতো, কিন্তু কি যেন তাকে পেয়ে বসেছে কয়েকমাস থেকে। আনমনে কি ভাবে। সেই তেজ যেন মিইয়ে আসছে। সেদিন বসন্ত সেনই মন্তব্য করে তার সম্বন্ধে ছেলেদের বৈঠকে— রূপ আর দেমাকেই গেল, পড়বে কখন।

কথাটা তারও কানে এসেছিল। অন্য সময় হ'লে কৃষ্ণা গাছকোমর করে ঝগড়া বাধাতো, আজ সে ওর কথার কোন জবাবই দিল না। দেবার স্পৃহাও যেন হারিয়ে ফেলেছে। কোথায় মনে মনে ঘনিয়ে এসেছে কি এক ক্লান্তি। জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া যেন অতৃপ্ত থেকে যাবে—এই অহেতুক আতঙ্ক তাকে দমিয়ে দিয়েছে। এই অজানা হতাশায় কালো ছায়া তার সমস্ত চাঞ্চল্যময় যৌবনকে স্থির করে এনেছে। এই চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পায়নি কৃষ্ণা।

কলেজ থেকে ফিরছে সেদিন কৃষ্ণা। ছায়াঘন পথে লোক চলাচল বিশেষ নেই। মেহগিনী গাছের পাতায় এসেছে শীত শেষের ধূসব পাণ্ডুরতা। দমকা বাতাসে রাস্তার ধুলোর উপর উড়ে পড়ছে দু'চারটে শুকনো পাতা—বাতাসে বসন্তের আগমনী। আনমনে হেঁটে আসছে কৃষ্ণা। সত্যিই কোথায় যেন অপমানিত হয়েছে সে।

—শুনছেন? কার ডাকে দাঁড়াল কৃষ্ণা।

পেছন ফিরে দেখতে পায় প্রণবকে। হাই পাওয়ারের চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে চেয়ে রয়েছে প্রণব। আজ ওই চাহনির সামনে কেমন হয়ে ওঠে কৃষ্ণা। সেই সহজ সারল্য, চপলতা কোথায় হারিয়ে ফেলে যেন। নীরবে ওর দিকে চেয়ে থাকে সে। এগিয়ে এসে প্রণবই কথাটা শোনায়।

—পরীক্ষার রেজাল্ট সম্বন্ধে এইবার আপনার এত ঔদাসীন্য কেন? অথচ এই নিয়ে অন্যকে হিতোপদেশ দিতে সেদিন তো আটকায়নি?

সেই গঙ্গাতীরে তারাজ্বলা সন্ধ্যার কথা, এক স্বপ্নমাখা সান্নিধ্যের কথা মনে পড়ে কৃষ্ণার। কেমন যেন অসহায় চাহনি মেলে অসহায় ক্লান্ত একটি কুমারী প্রণবের দিকে চেয়ে থাকে।

বাতাসে ঝরে পড়ে কয়েকটা হলদে বিবর্ণ পাতা।

বেশ কর্তৃত্বের সুরেই বলে প্রণব— নিজে তো রীতিমতো ভালো ছিলেন পড়াশোনায়, এ আবার কি হলো? আমার না হয় দুর্বলতা ছিল—কিন্তু আপনার সরল মনেও দুর্বলতা এলো নাকি?

ফিরে দাঁড়ালো কৃষ্ণা। আগেকার সেই চপল কিশোরীকে আজ আর খুঁজে পায় না বরং পোড়া মুখে হাসিই ফুটে ওঠে।

—ওই নিয়ে নানা কিছু ভাবেন আর আনন্দ পান! বেশ আছেন। শরীর খারাপ, পড়াশোনা করতে পারিনি। দেখা যাক, ফাইনালে কি হয়। আচ্ছা. চলি।

জবাব দিয়ে এসে ট্রামে উঠলো কৃষ্ণা। যেন কোথাও কিছু ঘটেনি, তবু মন থেকে দুর্বলতাকে তাড়াতে *পারে না। প্রণবকে সেদিন যে অনুকম্পার দৃষ্টিতে সে দেখেছিল,* আজ প্রণবই যেন সেই দৃষ্টিতে দেখে গেল তাকে। ঠাট্টাই করে গেল হয়তো।

ট্রামটা চলেছে দক্ষিণের দিকে, বাতাসে কি সুরের কানাকানি।

কি এত স্মৃতি-রোমন্থন, অন্য জগতে আজ এমনি করে হারিয়ে যায় কৃষ্ণা। দুচোখ মেলে ওপারের আদিম অরণ্যের দিকে চেয়ে খোঁজে তার হারানো দিনগুলোকে।

মূর্তিমান ছন্দপতনের মত এসে দাঁড়াল অতুল বুনো।

— কি রান্না হবে মা? কদমছাট করা খুদে চুলে হাত বোলাতে থাকে সে। মাথার জমাট গোবরটুকুকে ঘেঁটে কিছু বুদ্ধি বের করতে চায়।

অতুল বুনোর পূর্বপুরুষ; এসেছিল বাদাবনের অন্য অঞ্চল থেকে প্রথম পত্তনের সময়। ছোটনাগপুরের পার্বত্য বন্য অঞ্চল থেকে আড়কাঠি লাগিয়ে দল থেকে আনানো হয়েছিল তাদের। জমিদারের দল প্রথম জঙ্গল কেটে আবাদ তৈরির সময় ওদের প্রয়োজন বোধ করেছিল। তাই কবুল হয়েছিল— তোদের ঘর-বাড়ি, জমি-জারাত, গরু-লাঙল দেওয়া হবে; এখানের মত পাথুরে মাটি সেখানে নয়— নরম ভুসভুসে পলিমাটি। নদীতে বারো মাস জল বয়, সোনা ফলবে সেখানে।

সেই আশাতেই ওরা এসেছিল পার্বত্য ডুংরি ছেড়ে নতুন এই উপনিবেশে। এ মাটি নরম, কিন্তু ফসল হবে না। নদীতে জল বয় সত্যি কিন্তু এই জল প্রাণ বাঁচাতে জানে না— নিতেই কেবল জানে। পদে পদে মৃত্যু।

— এ কোথায় নিয়ে এলি বাবু।

নায়েবমশায় উত্তর দিয়েছিল— দেখ না, জমি বের কর, সোনার ফসল ফলবে তোদের জমিতে।

আশায় বুক বেঁধে ওদের পূর্বপুরষ জমি উদ্ধার করেছে অরণ্যের কোল থেকে। বাঁধ দিয়েছে ওরা ক্ষুরধার নদীর করাল গ্রাস থেকে জমিকে রক্ষা করতে। ফসল হোক। শরঝোপের মত দীর্ঘ বলিষ্ঠ শীষ সমেত ধানেব মঞ্জরী। কিন্তু সে ধান ওদের হাতে পৌঁছায়নি। জমিদারের গোলায় উঠেছে।

আজও সেই রীতির পরিবর্তন ঘটেনি।

আজও তারা সেই যাযাবর। ঘর তাদের মেলেনি! আশ্রয় তারা পায়নি।

কঠিন মৃত্তিকা— হিংস্র অরণ্যানী আর সর্বনাশা নদীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য ওরাও হিংস্র কঠিন হয়ে উঠেছে। সাঁওতালদের সহজাত সারল্য, সৌন্দর্যবোধ, রুচি কোনদিকে হারিয়ে ফেলে, নতুন পরিবেশের সমস্ত জীবন ধর্মকে মেনে নিয়ে রুক্ষ, কঠিন-স্বভাব, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। নিতাই বুনোকে দেখলেই তাই মনে হয়।

ওই জাতের মধ্যে অতুল একটু অন্য ধরনের। ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে মিশে অপেক্ষাকৃত মার্জিত ভদ্র হয়েছে। বাওয়ালীর কঠিন কাজ থেকে অসীম তাকে নিষ্কৃতি দিয়ে এনে রেখেছে নিজের বাংলোতে। কৃষ্ণাকে ভাবতে দেখে বলে ওঠে অতুল— ভেটকি মাছ ধরেছি মা।

বাংলোর নীচেই খানিকটা জায়গা খাল করে কাটা। ভেড়ির নীচেই নদী, বাঁধের মুখে একটা বাক্সকল বসানো আছে। অমাবস্যা পূর্ণিমার জোয়ারে জল, ফেঁপে-ফুলে উঠে ভেড়িয়া নালা দিয়ে খালে এসে ঢোকে। থই থই করে জল, বাংলোর নীচে অবধি এসে পৌঁছায় সে জল। কোমরভোর নোনা জল চারিদিকে। কেমন ভয় করে।

প্রথম প্রথম চমকে উঠেছিল কৃষ্ণা। চারিদিকে জল আর জল। ঢেউ-এর মাথায় মাণিকজ্বালা আলো; দূরে কে নৌকা বেয়ে চলেছে, দেখে মনে হয় রুপোর জ্বলন্ত ফুলকি ছিটকে উঠেছে দাঁড়ের আঘাতে। সমুদ্রের কাছাকাছি নদী, এর জলেও সমুদ্রের স্বাদ; সেই হিংস্রতা।

—সব যে জলে ডুবে গেল! ওমা! পুকুর ছাপিয়ে জল কি ঘরবাড়িও ডুবিয়ে দেবে না কি!

হাসে অসীম কৃষ্ণার অজ্ঞতায়—না না, কোটালের জোয়ার, তাই জল ফুলে উঠেছে। ঘণ্টা কয়েক পরেই চলে যাবে।

রাতের বাতাসে উঠেছে জলস্রোতের ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনি, আকাশে বাতাসে বন্য প্রকৃতির নিষ্ফল আক্রোশ। বারান্দায় বসে অজানা ভয়ে শিউরে উঠে কৃষ্ণা।

—দেখে যাও। এসো না নেবে এসো। না না, জুতো সমেত নয়, কাদা মাটি। জুতো খুলে এসো। অসীম নীচে থেকে হাঁক পাড়ে।

কোটালের জল নেমে গেছে। মরা পলিমাটির উপর অসংখ্য রুপোর পাতের মত পড়ে আছে পারশে, ভেটকির বাচ্চা, ভাঙন, সিলেট মাছ। দাপাচ্ছে তারা।

—ওমা! কতো মাছ!

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে কৃষ্ণা। দু'হাতে যত পারে কুড়িয়ে কানাস্তারার টিনে ভর্তি করে সে। শিল কুড়োনোর মত উল্লাস ফুটে ওঠে ওর চোখে। কাদায় ভরে উঠেছে শাড়িটা, খেয়াল নেই কৃষ্ণার।

কাসেম শেখ সাবধান করে— ভেটকি মাছের কানকোর খুরের ধার মা, হাতে লাগলি আঙ্গুল দুফাঁক হই যাতি পারে!

আগেকার সেই চঞ্চল কিশোরী আবার যেন সব বাধা-বন্ধন ছিঁড়ে বার হয়ে এসেছে এই জ্যোৎস্নাঢাকা অরণ্যসীমায় রাত্রির নির্জনতায়। হাসিতে উপছে পড়ে। অনেক মাছ বন্দী হয়েছে ওই ছোট্ট খালের লোনা জলের আবেষ্টনীতে। পনেরো দিন পর্যন্ত ওই ভাবে চলবে—আবার নতুন জোয়ার আসবে অমাবস্যার কোটালে।

হঠাৎ কৃষ্ণা অসীমের ডাকে ফিরে চাইল।

নিস্তব্ধ রাত্রি।

বনমর্মর জাগে বাতাসে। চাঁদের আলো ফুটেছে।

—কি! কৃষ্ণার দুচোখে কি যেন মদির আমন্ত্রণ।

— দেখছো? আঙ্গুল দিয়ে অসীম খালের ওপারে কি দেখালো।

বনভূমির বাইরে নির্মল জ্যোৎস্নায় বেশ স্পষ্টই দেখা যায় দৃশ্যটা। প্রথমে স্তব্ধ হয়ে থাকে কৃষ্ণা, যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না। একটা বিরাট বাঘ নিবিষ্ট মনে পলির উপর ঘুরে ঘুরে জোয়ারের পর আটকানো মাছ খেয়ে বেড়াচ্ছে বিশালাকায় একটা বেড়ালের মত। দুচোখ জ্বলছে শ্বাপদ লালসায়।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করেই কৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে যায় সেই দৃশ্য দেখে। তার জ্ঞানহীন দেহটাকে নিমেষের মধ্যে ধরে ফেলে অসীম। বাঘ নিরাপদ দূরত্বেই আছে। সেখান থেকে এই কোটালের দুরন্ত ভাঁটার স্রোত পাড়ি দিয়ে এ সময় আসবে না, তাই একটু রসিকতা করতে গিয়েই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে অসীম। কৃষ্ণার অচেতন দেহটাকে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে মাথায় মুখে জল দিতে থাকে সে।

জ্ঞান ফিরতে ধড়মড় করে উঠে বসেই আর্তনাদ করে ওঠে— জানালা দরজা বন্ধ করে দাও।

—কোন ভয় নেই, চুপ করে শুয়ে থাকো! সান্ত্বনা দেয় অসীম।

উত্তেজনায় ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে কৃষ্ণা। চোখের সামনে তখনও ভেসে ওঠে জ্যোৎস্নাঢাকা সুন্দর অরণ্যানীর মাঝে মূর্তিমান মৃত্যুদণ্ডের জ্বলন্ত ভাঁটার মত দুটো চোখ, ছেঁকে ধরেছে সর্বাঙ্গে জোনাকি পোকার দল। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্রী বিকট গন্ধ। কৃষ্ণার মনের সব সৌন্দর্যবোধ, বনজগতের স্তব্ধ ধ্যানগম্ভীর রূপের ধারণাই বদলে দিয়েছে। বাতাসে নদীর হু হু গর্জন জেগে আছে।

ক্রমশঃ সেই সত্যটাই বদ্ধমূল হয়েছে তার মনে। জীবনের কোন দামই এ জগতে নেই, মৃত্যুই এখানে সত্য। আকাশ বাতাস অরণ্যে তারই নিঃশব্দ পদধ্বনি জেগে রয়েছে অহরহ। প্রথম দিনের সেই আতঙ্ক আজও ভুলতে পারেনি কৃষ্ণা। মনের মধ্যে পাথরের মত চেপে বসে আছে।

—মাছই রান্না করি, কি বলেন মা?

অতুলের কথায় ফিরে এল সে এই জগতে। চিন্তার জাল ছিঁড়ে নিজের মুক্তি সে ফিরে পায়। দুপুরের অভ্ররোদ গাছের পাতায় হলদে ছোপ এনেছে। উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল হয়ে উঠেছে ওর বুক, দু'একটা জেলেডিঙ্গি বনের ধার ঘেঁষে চলেছে, বেপরোয়া দুরন্ত ছেলের মত একবার ঢেউএর মাথায় উঠছে—আবার আছড়ে পড়ছে নীচে।

তাই কর। জবাব দিল আনমনে। এখানের সবকিছুর উপর এসেছে চরম নিস্পৃহতা। দিনগুলো পাথরের মত অচল। কৃষ্ণা হাঁপিয়ে উঠেছে তার গুরুভারে।

বেলা হয়েছে। স্নান করতে যায় কৃষ্ণা। অসীমের তখনও দেখা নেই। মাঠ থেকে কখন ফিরবে কে জানে।

বাঁওয়ালি সর্দার নিতাই বুনো আপন মনে গজরাতে থাকে। বয়স পঞ্চাসের কাছাকাছি হলেও এখনও তার শরীরে দুর্দম শক্তি। কুঞ্চিত ললাটে বয়স আর অভিজ্ঞতার ছাপ, কণ্ঠস্বর বনের বাঘকেও হার মানায়। প্রকৃতি গহন অন্তরালে গাছের বৎসরান্তের ছাপ আঁকে কাণ্ডের গভীরে, এক একটি বৎসর আঁকা থাকে বিভিন্ন বৃত্তাকারে। নিতাই বুনোর সারা দেহেও তেম্‌নি আঁকা আছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা—আর বয়সের ছাপ।

নৌকোর হালে বসলে সে তখন অন্য মানুষ। ঢেউ-এর তালে আছে মহান সঙ্গীতের ছন্দ। সেও জীবন্ত—মহাজীবনের এক একটি ছন্দোবদ্ধ নিশ্বাস। হাল ধরে নৌকোকে প্রকৃতির সেই রুদ্র তালে তুলে দেয় নিতাই। নৌকো তখন ঢেউ-এর সোয়ার। বেপরোয়া তার গতি।

আকাশের দিকে চেয়ে রোদের তেজ আর বাতাসের গতিতে সে সন্ধান পায় সুন্দরবনের আগামী বিপদের—আসমানের মেজাজ তার জানা। জীবনের বহু বৎসর কেটেছে এই জল আর বনে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে গড়ে উঠেছে সে—প্রকৃতিরই সন্তান। বনের মতই হিংস্র আর রহস্যময়। তাই বোধ হয় বিশাল প্রকৃতি তার রহস্যপুরীর চাবিকাঠি তুলে দিয়েছে ওদের হাতে। নিতাই বুনোরও চোখের জ্বালায় তার হদিস।

অসীমদের জঙ্গলের অকৃত্রিম বন্ধু সে। কাঠের ব্যবসা করবার সময় থেকেই নিতাই তার সঙ্গে রয়েছে। বিশ্বাসী প্রভুভক্ত নিতাই আজ কয়েকখানা নৌকোর সর্বেসর্বা। অসীমের উপনিবেশের তরবারিহীন সেনাপতি। তার হুকুম রদ করবার মত মরদ এ আবাদে কেউ নেই। কঠিন কঠোর একটি মানুষ। চারদিকে তার নজর।

এহেন নিতাই গজগজ করছে— তোকে রাখবোনা আর, যেখানে ছিলি সেইখানেই যা। খপরদার!

তার তর্জন গর্জনে ইরফান কাকুতি মিনতি করে— কথি যাবো চাচা? কসম খাইছি, আর মধুর লায়ে যাবো না। এক বাত।

ফ্যাচ করে ওঠে নিতাই বুনো—থাম ব্যাটা বেইমান। তোর কথার দাম দিতি আছে? কুত্তার মত বেসরমী তুই, ছুঁড়িটাকে ফেলে পালাবি আবার। এখানে চাকরি তো হবেই না, কাজকর্ম তো দূরের কথা—বসত করতি দিতিও 'না' করি দোব বাবুকে।

ইরফান একা আসেনি দরবার করতে; সঙ্গে কাকে এনেছে। পিছনে মরিয়মকে দেখে কি যেন কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল নিতাই। কাঁচা বয়সী ওই মেয়েটাকে অজান্তেই কেমন যেন ভালো লেগে গেছে নিতাইয়ের। মেয়েটা এগিয়ে আসে। সহজ মিষ্টি সুরে মরিয়ম বলে ওঠে— উ আর যাবে না গো। পালাবে না।

নিতাই ইরফানকে দেখছে। তবু মানতে চায় না নিতাই, ওদের স্বভাব ভালো করেই জানে। বলে ওঠে,

—মৈরাম, —তুকে ও মিছে কথা বলেছে। ও সব করতি পারে। কি সুখে যে ওই সোয়ামীর ঘর করিস ভগবান জানে। ওটা বেলুচ্চা।

কথাটা মিথ্যে নয়। নির্মম সত্য তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে মরিয়ম, নিজের জীবনেই সে কথাটা বার বার সত্য হয়ে উঠেছে। মরিয়ম তাকে বাঁধবার চেষ্টা করেও পারেনি।

একেবারে বেবশ। বনের ডাক যেন ওকে মাতাল করে তোলে। মদের চেয়েও সে নেশায় আকর্ষণ বেশি। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বনে বনে আসে কেওড়া গরান সুন্দরী ধুধুল গাছে ফুলের পশরা। বিশাল বিস্তৃত অরণ্য ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে যায়। গাছে গাছে মৌচাক বাঁধে মৌমাছির দল। নানা রকমের মৌমাছি। কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কেউ হলদে। তাদের চাক আর মধুও তেমনি নানান আকারের নানান স্বাদের। বহু-মধু-মহাজন সরকারী পাস করিয়ে নৌকো নিয়ে মধুর ব্যবসা করতে বের হয়। তার চেয়ে বেশি নৌকো যায় চুরি করে মধু কাটতে। মধু কাটতে পারলেই পয়সা। আর মৌচাকও অজস্র। চাকও তেমনি প্রকাণ্ড আর তেমনি মধুর সঞ্চয় তাতে তার চেয়ে আরও আকর্ষণ ওই মধুর— মদের চেয়েও বেশি।

তাই মানুষ ছোটে মৌমাছির মত গুনগুনিয়ে মৌচাকের জন্য মধুর নেশায়।

কিন্তু দুর্গম দুস্তর বন—হুঁশিয়ার জানাশোনা লোকেরও দরকার। এ তল্লাটে ওই কাজে ইরফানের জুড়ি নেই। পথ-খাল নদী সবই তার জানা। মধুর ব্যাপারে হুঁশিয়ার মধু-মহাজনরা একে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু সেই কথা কেউ প্রায় রাখে না। অবশ্য ইরফান এই তিন মাস কিছুতেই মানুষের বসতির মধ্যে টিকতে পারে না। যেতে তাকে হবেই।

কি এক নেশার ঘোরেই সে বের হয়ে পড়ে মধু মহাজনদের নৌকাতে। মরিয়মের ডাগর কালো চোখের জল তাকে ব্যথা দিতে পারে না। বার বার চেষ্টা করেও মরিয়ম হার মেনেছে। বেশি পেড়াপেড়ি করলে না বলেই পালায়। এমনও ঘটেছে কয়েকবার। অভাব-অনটন-দুশ্চিন্তায় ক'মাস যে কি করে কাটায় মরিয়ম, রাতে ঘুম থাকে না চোখে—দুষ্ট লোকে এসে শিষ দেয়, ইশারা করে। কি কষ্টের দিন তা একমাত্র আল্লাই জানেন। কিন্তু তবুও ওকে ছেড়ে দিতে পারে না। ফিরে এলেই আবার সব ভুলে মরিয়ম তাকেই বুকে টেনে নেয়। আজও তাই হয়েছে।

ইরফান বলে— ঠিক বলছি সর্দার! বান্দা আর ওমুখো হবে না। মধুলায়ে আর যাচ্ছি না। উ কাজ আর কোরতিছি না। কসম খেছি।

কথাটা নিতাই সর্দার ইরফানকে জিজ্ঞাসা না করে মরিয়মকেই প্রশ্ন করে — কিরে, ঠিক তো? দেখ বাপু।

—হ্যাঁ। মাথা নামাল মরিয়ম, মুখে তার সলজ্জ মধুর হাসি।

নিতাই বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। বুকের মাঝে একটা শিহরণ জাগে দুর্দম বুনোর। কেমন ঝড় ওঠে বুনোর বুকে। নিতাই কি ভাবছে। বলে ওঠে,

—আচ্ছা দেখি, তবে এই শেষ কিন্তু। এর তঞ্চকতা হলে উৎখাত করে দোব নির্ঘাৎ। মরিয়মের দিকে চেয়ে বলে ওঠে নিতাই—গাছে মেলা ধন্দুল পড়েছে, নিয়ে যা গোটাকতক।

— আচ্ছা! হেসে মাথা নামাল মরিয়ম।

কয়েক বৎসর আগেকার কথা। অসীম তখন সয়েল-সায়েন্স ডিগ্রী নিয়ে রিসার্চ করছে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে। দেশবিদেশের জার্নাল থেকেও নানা কাটিং সংগ্রহ করতে হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে লোনা মাটিতে ফসল ফলাবার উপযোগী করবার পথই সে বেছে নেয়। এখানে ওই পরীক্ষার ক্ষেত্রও আছে অনেক। মনের কোণে একটা পরিকল্পনা তার অনেকদিন থেকেই উঁকি মারছিল— হল্যান্ডের মত এইটুকু দেশে সমুদ্রের চেয়ে নিচু জমিতে চাষ বাস সম্ভব হলে আমাদের এখানেও সেটা সম্ভব হবে না কেন? আবাদ অঞ্চলে ইতিমধ্যে বার কয়েক ঘুরে এসেছে। জমির অবস্থা দেখে-শুনে অপেক্ষাকৃত বন্য মাটির নমুনা নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ব্যস্ত সে।

অধ্যাপকরাও প্রথমে বিশেষ আশার আলো দেখিতে পাননি ওর গবেষণার বিষয়বস্তুতে, কিন্তু ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে অসীম তার কাজ করে চলছে। কেমিক্যাল প্রসেসে যদি ভূমিতে ওই সঞ্চিত লবণভাব অন্য কোন সল্ট বা অ্যাসিড বেস দিয়ে ডিজল্‌ভ করানো সম্ভব হয়, তাহলে ওই সঞ্চিত লবণই সারের কাজ করবে। দ্বিগুণ উর্বরা এবং শস্যশ্যামলা হবে ওই বন্ধ্যা মৃত্তিকা। ফসল ফললেই বসতি হবে— সে যত দুর্গম ঠাই হোক না কেন। মানুষের আবাস গড়ে উঠবে। রূপ বদলাবে বনভূমির।

কলকাতায় বাস করে অসীম, কিন্তু সেখানে বেশিক্ষণ সময় কাটে না তার। হয়তো বাইরে আবাদ অঞ্চলে নৌকা বা লঞ্চে করে ঘুরতে বের হয়েছে— নয়তো ল্যাবরেটরি ঘরে নিজের টেবিলে বুনসেন বার্নারের জ্বলন্ত লালাভ শিখায় টেস্ট টিউব মাইক্রোসকোপ নিয়েই মত্ত! তার জগৎ বলতে এই অরণ্যসীমা, আর তার নিকট আত্মীয় নদীর গর্ভজাত মৃত্তিকা, না হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। নিজের স্বপ্নে নিজেই সে বিভোর। এর বাইরে যে বহুবিস্তৃত জগৎ— অনেক কিছুর আকর্ষণ আছে, সে সংবাদ তার কাছে অগোচরই রয়ে গেছে। অন্য কোনদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ নেই; অন্য কোন সুর তার কানে যায়নি।

কৃষ্ণার যৌবনমদির মন আজ কিসের আশায় পথ চেয়ে ব্যাকুল হয়েছে। কিসের— কার জন্য এই

প্রতীক্ষা, তা একদিনও অনুভব করেনি সে; কিন্তু তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সে অনুভব করেছে কোন পূর্ণতার সংবাদ। বৈশাখের শীর্ণ প্রায় নদীর বুকে বাতাসের ঢেউতোলা তুফান মিলিয়ে গেছে। এসেছে তার দেহ-মনে ভাদ্রের থৈ থৈ জল ভরা নদীর উপছে পড়া শান্ত নিটোল ভাব। দুকূলে তার সবুজ শ্যাম উপবনের নেশা। ভাঙ্গনের নয়—গড়ার। ভালোবাসাব কামনায় ভরা একটি মন আজ নীরবে কি যেন অন্বেষণ করে চলেছে। এ যেন কোন বল্লরীর বনস্পতি অন্বেষণ।

অকারণে সুর জাগে মনে। কৃষ্ণা যেন বদলে গেছে। সেই হৈ হৈ ভাবও আর নেই।

মা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে।

বৌদি ঠাট্টা করে— কি ভাই ঠাকুরঝি, সে ঝাঁঝ গেল কোথায়? এখন যে 'ইওর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট' হব হব ভাবখানা!

প্রণবকে কোথায় নিবিড়ভাবে যেন ভালো লাগে তার। নীরস নিস্পৃহ মনে সেই-ই প্রথম জাগিয়েছে সাড়া— অন্য জগতের স্বপ্নসাধ। কলেজ পালিয়ে দুজন বসে আছে বোটানিক্যাল গার্ডেনসের ছায়াঘন গাছের নীচে। কৃষ্ণার কালো চোখের তারায় কি যেন স্বপ্নের কল্পনা করছে প্রণব।

কৃষ্ণা আনমনে দাঁত দিয়ে একটা ঘাস টুকরো করছে। হঠাৎ নদীর দিকে চেয়ে হাসিতে লুটিয়ে পড়ে সে।

—কি হল? প্রণব প্রশ্ন করে।

— ওই যে, দেখ না মজাটা। কৃষ্ণার হাসির ঘোর তখনও কাটেনি।

প্রণব অবাক হয়ে যায়। এখানে ওকে এইভাবে দেখবে কল্পনাও করেনি। প্যান্টে লেগেছে পলি—জল কাদা। প্যান্টটা রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। হাতে একটা পাত্রে খানিকটা সদ্যবসা নরম পলি। মুখচোখ রোদের তাপে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার, আপন মনে হন হন করে উপরের দিকে উঠে এসে রাস্তায় পার্ক করা ছোট গাড়িখানার কাছে দাঁড়ালো।

—ওকে চেন? কৃষ্ণা প্রণবের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে!

—নাম শুনেছি। আমাদের হোটেলের পাশেই থাকেন। ভদ্রলোক সয়েল-সায়েন্স নিয়ে কি রিসার্চ করছেন। ব্রিলিয়ন্ট বয়।

কৃষ্ণা ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, সত্যই সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, চুলগুলো গঙ্গার জলো হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছে মুখে চোখে। গায়ের গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে চেপে বসেছে বলিষ্ঠ দেহে; দু' চোখের দৃষ্টি যেন স্বপ্নময়—ও যেন এ-জগতের কেউ নয়; ভুল করে এসে পড়েছে এইখানে। গাড়িখানা স্টার্ট দিয়ে বের হয়ে গেল। কৃষ্ণা তখনও অবাক হয়ে ওই অদ্ভুত লোকটির দিকে চেয়ে রয়েছে।

কেমন বলিষ্ঠ দৃপ্ত চেহারা—এই পরিবেশে বেমানান।

এ সবের উর্ধ্বে সে।

আজ মনে ওর যেন এক বিচিত্র কল্পনা দেখা দেয়। প্রণব বলে চলেছে— সুন্দরবনে জমি নিয়ে কি যেন এক্সপেরিমেন্ট করছেন। পয়সা রেখে গেছেন বাবা, উনি তার সদ্ব্যয় করেছেন। স্কলার একজন। অনেক বড় অফার ছেড়ে দিয়ে ওই নিয়েই মেতে উঠেছেন।

কৃষ্ণার চোখের সামনে তখনও ভদ্রলোকের সেই চেহারা ভেসে ওঠে— কি বিচিত্র অনুভূতি। অত্যন্ত সাধারণের গণ্ডীছাড়া একটি স্বতন্ত্র ব্যাক্তির স্বাতন্ত্র্য তার চালচলন হাবভাবে ফুটে ওঠে।

—চল। কৃষ্ণার কথায় ওর মুখের দিকে চাইল প্রণব।

অন্যদিন সূর্য অস্ত না গেলে তারা ওঠে না। বেশ লাগে, সন্ধ্যার আগত অন্ধকারে জ্বলে ওঠে তারার টিপ। কৃষ্ণার কালো চোখের চাহনি অমনি কোন সুদূরের আহ্বান আনে। কৃষ্ণার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নেয় প্রণব — যেন এক মুঠো জুঁইফুল। তার স্পর্শ সৌরভ সারা মনকে ব্যাকুল করে তোলে। কৃষ্ণার মন অন্য কোন জগতে। যা সে চায় তা এ নয়, এটা কৃষ্ণাও জানে। মন ভরে না তার।

— কি এত ভাবো বল তো? প্রণব অনেক আশাই গড়ে তুলেছে ওকে কেন্দ্র করে।

কৃষ্ণার স্তব্ধ রূপের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে প্রণব। বার বার দেখেছে ওই চঞ্চলা নারী ওর নিবিড়তম

সান্নিধ্যে এসে স্তব্ধতার আবরণে নিজেকে আবৃত রহস্যময়ী করে তোলে। এ অনুভূতি কৃষ্ণাও পেয়েছে। সব কথাই তো বলা হয়ে গেছে। এ আবেদনের প্রকাশ তার ভাষায় নেই। ভাষা সেখানে স্তব্ধ। তবু আজ নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়, এ অভিজ্ঞতা পানসে ঠেকে তার কাছে। কোন আলোড়নই নেই ওতে এ নিয়ে কৃষ্ণা তৃপ্ত হতে পারে না। সেই আদিম বিদ্রোহী কৃষ্ণার মনে তাই স্তব্ধতা।

প্রণবের কথায় তার মুখের দিকে চাইল গভীর দৃষ্টিতে। কাছে টেনে নেয় তাকে প্রণব। অন্ধকার তমসার আবরণে আবৃত হয়ে গেছে ধরিত্রী, রাতের বাতাস কানে কানে শিহরণ আনে। মৃদু প্রতিবাদ করে ওঠে কৃষ্ণা— আঃ, কেউ এসে পড়বে। ওঠো দিকি।

প্রণবকে সেই-ই হাতে ধরে টেনে তুলে বাড়ির পথ ধরে।

প্রণব মুগ্ধ হয়।

কৃষ্ণা আগে আগে চলেছে। সঙ্গে আর কেউ আছে এটা যেন ভুলেই গেছে কৃষ্ণা।

নিজের ব্যক্তিত্ব তার অনেক বেশি প্রণবের চেয়ে।

কৃষ্ণা নিজেকে কোনদিনই হারায়নি, সে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে, আজও।

আজ সেই কৃষ্ণা যেন কেমন হয়ে গেছে। প্রণব বলে ওঠে— সন্ধ্যা হোক না, এত বেলাবেলি উঠে যাবো কোথায়?

—আমার একটু কাজ আছে। বাড়ি যেতে হবে—চল!

কৃষ্ণা জোর করেই আজ সন্ধ্যার সেই নিবিড়তম মুহূর্তটুকু উপেক্ষা করে চলে এল। প্রণব কথা বলে না— নীরবে সেও বের হয়ে এল বাগানের নির্জনতা হতে কোলাহলমুখর ধূলিধূসর পথে।

কৃষ্ণার সঙ্গে প্রথম পবিচয়ে একটু বিস্মিত হয়ে যায় অসীম।

তার বাড়িময় একটা বিশৃঙ্খলা, এখানে ওখানে স্তূপাকার মাটি— টবে টবে নানা দেশীয় গাছগাছড়া, বস্তা, টিন বোঝাই নানা জাতীয় বস্তু, আর মেঝেময় ছড়ানো বই। বিছানাটা কোনরকমে জেগে আছে— ভাসছে বইয়ের সমুদ্র। এই পরিবেশে ওই রকম একটি আধুনিকাকে বসাবে কোথায়! ব্যস্ত হয়ে ওঠে অসীম।

—ওই বস্তার ওপরেই বসুন।

মাঝে মাঝে তাকে দেখেছে অসীম, বই-খাতা বগলে করে কলেজে যেতে। এইদিকে কোথায় যেন থাকে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। একদিনও ফিরে চাইবার অবসর বা ইচ্ছা হয়নি তার। কৃষ্ণা কি যেন এক খেয়ালবশেই সেদিন যেতে যেতে ওর বাড়িতে পা দিয়েছে। দিয়েই আরও বেকুফ বনে গেছে।

সামনাসামনি পড়ে যেতেই কিছু একটা আলাপ করায় ছুতোনাতা খুঁজে বলে ওঠে—

আপনি সয়েল-সায়েন্স নিয়ে রিসার্চ করছেন, আমার সাবজেক্ট জিওলজি, অনার্স নেবো। ভাবলাম যদি কোন সাহায্য পাওয়া যায় আপনার কাছে.

বেশ তো। তবে আমি তার কি জানি, আমার ইচ্ছে আছে এখান থেকে দূরে চলে গিয়ে হাতে কলমে কাজ করবার। বই নয়— প্রাক্‌টিক্যাল কিছু করে দেখতে হবে। বই তো সবাই পড়ে, আসল কাজের দরকার।

কৃষ্ণার স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। শ্যামবর্ণ, বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ, হাত দুটো কর্মঠ, দু'চোখের মধ্যে যেন জ্বলছে একটা বেপরোয়া বন্য কর্মক্ষমতা, দমবার মত কিছু সহজে ওর জীবনে আসে না।

কৃষ্ণার সম্বন্ধে খুব কৌতূহলও তার নেই। কে— কোথায় থাকে তা সে প্রশ্নও করে না। আপন মনে কাজই করে চলেছে। মাইক্রোস্‌কোপের ভিউ ফাইন্ডারটা ঠিক করতে করতে বলে— যখন সময় পাবেন আসবেন। এখন একটু ব্যস্ত রয়েছি। চাকরটাও নেই, এক কাপ চাও পেলেন না। আচ্ছা।

অর্থাৎ এখন আপনি আসতে পারেন আর কি!

কৃষ্ণার নিজের উপর বিশ্বাস যেন হারিয়ে যাচ্ছে। রূপ-যৌবন-শিক্ষার অভিমান তার আছে। উপযাচক হয়ে এসে পড়েছে বলে এত অপদার্থ সে নয়। কিছু না বলেই বের হয়ে এল।

আসবার সময় ফিরে চেয়ে দেখল কৃষ্ণা— অসীম তখন একচোখ বন্ধ করে ভিউ ফাইন্ডারের মধ্যের বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের নেশায় মত্ত। তাকে কোন প্রাধান্যই দিল না সে, অতি সাধারণভাবেই নিয়েছে। মরা মাটিই তার কাছে বেশি আকর্ষণীয় কৃষ্ণার চেয়ে।

যেখানেই আঘাত পেয়েছে সেইখানেই দৃঢ়তর হয়ে দাঁড়ানো কৃষ্ণার সহজাত ধর্ম। প্রণবকে সে জয় করেছে। প্রণব তার কাছে পঠিত একখানি বই। প্রতিটা পৃষ্ঠা পড়া জানা হয়ে গেছে। কোন আকর্ষণই নেই। সহজ স্বাভাবিক মানুষের ভালোবাসা তার পক্ষে যেন অবাস্তব। ওর সব অভিসন্ধি জানা।

অসীমকে দেখে চমকে উঠেছে সে। ওব দু'চোখে সমুদ্রের লবণাক্ত স্বাদ-ভরা বিশাল আকাশের কল্পনা, আদিম আরণ্যক জীবনের সঞ্চিত অমিত সামর্থ্য। এই মাজাঘসা পালিশ করা শহর-জীবনের ও কেউ নয়, ওর দেহমনে রয়েছে আদিম শক্তি—সুদূরের আহ্বান—সবুজ দিগন্ত-সীমার মত উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। কৃষ্ণার কল্পনা প্রবণ স্বপ্নময় মনে কি এক আলোড়ন জাগিয়েছে। সেই মানুষটির কাছে কৃষ্ণা প্রমাণ করতে চায়—সেও নেহাৎ অপদার্থ নয়। তারও পৃথক সত্তা আছে— মর্যাদা আছে, স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা আছে। তারই সাধনায় যেন মেতে উঠেছে কৃষ্ণা।

তার প্রতিযোগিতা— এতে জয়লাভ করতেই হবে তাকে। কঠিন সংঘাতময় কুমারী মন তাই সচেষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রণব ক'দিন ক্লাসে তাকে দেখতে পায় না। যদিও বা আসে কৃষ্ণা, যেন তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কথাবার্তাও বলে কম। ওই বৈচিত্র্যময়ী নারীর দিকে চেয়ে বিস্মিতই হয় প্রণব। বহুবার দেখেছে— এমনি করে সরে গেছে কৃষ্ণা তার জীবন থেকে; সরে থাকবার ভান করেছে। কিন্তু অতর্কিতে বেপরোয়া বাঁধভাঙ্গা নদীর মতই হুড়মুড় করে প্রবল বন্যায় আবার ছিটকে এসে পড়েছে তার উপরে এতদিনের সঞ্চিত প্রীতির প্লাবন প্রবলতার হয়ে তাকে আপ্লুত করেছে।

কিন্তু আজ যেন কোথায় একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তার। তার কোন কারণ খুঁজে পায় না। কৃষ্ণা দূবে সরে গেছে— অনেক দূরে।

নিজে তাই পড়াশোনায় মন দিয়েছে প্রণব। কৃষ্ণা তার কাছে আজও যেন একটা রহস্যই হয়ে থাকে। কেনই বা এসেছিল— কেনই বা দূরে সরে গেল কে জানে।

সেদিন একা একাই বেড়িয়ে ফিরছে প্রণব, আকাশে নেমেছে বৃষ্টির ধারাপাত। তেড়ে ফুড়ে এসেছে দমকা বৃষ্টি। সামনেই একটা বাড়ির রকে আশ্রয় নিল প্রণব। আকাশে কালো মেঘ বিন্দুমাত্র হালকা হবাব আভাস রাখেনি। বৃষ্টি ঝরারও বিরাম নেই। একাই জনহীন পথে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ গ্যাসপোস্টের নীচেই একটা গাড়ি থামতে নজর যায়।

নেমে আসছে অসীমবাবু আর সঙ্গে তার কলহাস্যময়ী একটি নারী। বৃষ্টির অঝোরেও কলকণ্ঠে হাসির শব্দ শোনা যায়— যেন জলভরা পুকুরে লাখো কণায় বৃষ্টি নূপুর পায়ে।

চমকে উঠে প্রণব। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারে না। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে হাল্কা সিফন শাড়ি, নিটোল পুরুষ্ট দেহের ভাঁজে ভাঁজে চেপে বসেছে শাড়িখানা, মাথার চুল বেয়ে সুন্দর কপালে জমেছে দু'একবিন্দু বৃষ্টিধারা। কৃষ্ণাকে ওর সঙ্গে ঘুরতে দেখবে কল্পনাই করেনি সে। গুরু গুরু ডাকছে মেঘ, বৃষ্টি পড়ছে— বৃষ্টির মধ্যেই নেমে পড়লো প্রণব। বাড়ির ভিতর থেকে টুকরো গানের সুর শোনা যায়।

কৃষ্ণা গুনগুন করে গাইছে— খুশিতে উপছে পড়া পাখির মত ওর কণ্ঠে আজ সুর ফুটেছে।

প্রণব নীরবে পথে নামলো—গায়ে মাথায় পট পট করে বৃষ্টির ধারা বাজছে তিরের ফলার মত। তবুও চলেছে সে—প্রণব পালাচ্ছে যেন কিসের আতঙ্কে।

আজ শিউরে উঠেছে প্রণব—জীবনে এতবড় আঘাত কোনদিনই পায়নি সে। সে আঘাত এসেছে কৃষ্ণার দিক থেকেই।

কৃষ্ণা সেই আসার পর থেকেই মাঝে মাঝে আসে এখানে। অসীমকে সেও যেন ঠিক চিনতে পারে না। ক্রমশ সহজ হয়ে আসে প্রত্যহের স্পর্শে।

কৃষ্ণাকেও অগ্রাহ্য করতে পারেনি অসীম। পরিচয় বের হয়ে পড়ে, অসীমের বাবার সহকর্মী ছিলেন কৃষ্ণার বাবা। পিতৃবন্ধুর আমন্ত্রণে আজ অসীম ওঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরছে। কৃষ্ণা আজ অসীমের চোখে এই বাদল রাতে কি যেন দুর্বলতার সন্ধান পেয়েছে। তার অভিমানিনী মন আজ তৃপ্ত। প্রথম দিন যে অসীম

বিদায় করে দিতে চেয়েছিল কৃষ্ণাকে— আজ সেই অসীম আর নেই। কৃষ্ণা যেন জয় করতে পেরেছে।

অসীমও জীবনে এত নিবিড়ভাবে কোনো মেয়ের সান্নিধ্যে আসেনি, মনের সুপ্ত মানবটি আজ কোন্ সোনার কাঠির পরশে জেগে উঠেছে। সে চায় শান্তি, তৃপ্তি। যে মন কঠিন বিজ্ঞানের সাধনায় মত্ত ছিল তার ল্যাবরেটরির অন্তরালে— এ সেই নীরস কর্তব্যপরায়ণ মন নয়। একটি বিচিত্র অনুভূতি তার সমস্ত কর্মপন্থাকে সুন্দরতম, সার্থকতম করে তোলবার প্রতিশ্রুতি আনে। পাশে একজনকে সে নিবিড় করে পেতে চায় তার সঙ্গী হিসাবে।

— কি যে করেন দিন রাত। বাব্বা! মাটিতে কি এত রস পান? কৃষ্ণা বলে।

হাসে অসীম—নিজে তো জিওলজি নিয়েছেন, দেখবেন পাথরেও রস আছে!

কৃষ্ণা বলে ওঠে— তাই দেখছি।

অসীমও যেন আজ হাসতে শিখেছে, অন্যভাবে কথা বলতে শিখেছে। বেশ সহজ সরল হয়ে ওঠে তার অজানতেই।

বাইরে আকাশের বৃষ্টির ডাক শার্শি গড়িয়ে নেমে আসছে জলধারা— মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠে কালো মেঘঢাকা আকাশ বিদ্যুতের আভায়।

দমকা বাতাসে কাঁপছে গাছের পাতা। অসীম স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবছে। পাশে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণা। আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি নেমেছে, কয়েক ঘণ্টা ধরে চলেছে!

এ বৃষ্টি ছাড়বার নাম নেই, পথে জল জমেছে। হঠাৎ হুঁশ হয় অসীমের।

—অনেক রাত্রি হোল, যাবার কি হবে।

—তাই তো? কৃষ্ণাও চিন্তায় পড়ে যায়।

—কয়েক ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে সামনে। গাড়িও বন্ধ। জল জমে গেছে। অসীম বলে ওঠে।

কৃষ্ণা অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে।

—আসছি।

বৃষ্টির মধ্যেই কোনরকমে রেন কোটটা চাপিয়ে বের হয়ে গেল অসীম।

পথে গাড়ি, ট্যাক্সির সন্ধান মেলে না। আকাশ ফুড়ে বিজলী রেখা নাচছে। ফিরে এল ভিজে নেয়ে... নাঃ সব বন্ধ।

কৃষ্ণাই বলে ওঠে— এত ব্যস্ত হবেন না আপনি।

—তাই তো। কথায় কথায় রাত করে দিলাম। এখন?

অসীমের ভাবনায় হাসে কৃষ্ণা—ঠিক আছে, আপনার লাইব্রেরীতেই না হয় কাটিয়ে দেব রাতটা।

—বাড়িতে ভাববে, না?

—তা একটু ভাববে, কিন্তু কি আর করা যায়!

কৃষ্ণা সহজ হবার চেষ্টা করে।

রাত কত জানে না কৃষ্ণা। কোনরকমে সোফাটার ধুলো ঝেড়ে শোয়ার ব্যবস্থা করছে। অবাক হয়ে গেছে অসীমের ব্যবহার। আপনভোলা মানুষ —কোথায় কি আছে সে খবর রাখে না। একরাশ কাগজ আর পরিকল্পনা নিয়েই ডুবে আছে যন্ত্রপাতির মধ্যে।

হঠাৎ দরজায় শব্দ শুনে এগিয়ে আসে কৃষ্ণা।

—আপনি? ঘুমোন নি? প্রশ্ন করে কৃষ্ণা।

—উহুঁ। ঘুম আসছে না। সব কথা বলা হয়নি আমার; ওই ক্যালসিয়াম টেস্টারটার কথা বলছিলাম, সেটা এবার হল্যান্ডের সয়েলে—

বাধা দেয় কৃষ্ণা—কাল শুনবো।

—কাল! আশাভরে চেয়ে থাকে অসীম। পরক্ষণেই ভুল বুঝতে পারে— কাল তো চলে যাবেন। তা এক কাজ করুন না?

—কি? কৃষ্ণার ঘুমে চোখ বুজে আসছে। তবু প্রশ্ন করে।

—আপনিও আসুন; সত্যি আপনাকে পাশে পেলে—

হঠাৎ ওর দিকে চেয়ে নেমে গেল অসীম। কৃষ্ণার ঘুম ছুটে গেছে ওর কথায়। অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে অসীম, —মানে, অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে— বড্ড একা কিনা!

কৃষ্ণা ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। সহজ দৃপ্ত মানুষটি আজ নিদ্রাহীন রাতে কি যেন শোনাতে চায়।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে কৃষ্ণা ওর দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন ভাবছে কৃষ্ণা। বৃষ্টি থেমে গেছে। বর্ষণক্লান্ত আকাশ আর সুপ্তিমগ্ন নগরীর রাতনির্জনে জেগে ওঠে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আভা।

আকাশ মৃত্তিকার কামনার ভাষা ওর ঝলকে।

নীরব স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে অসীম বাইরের দিকে। কৃষ্ণার চোখে কি এক না বলা ভাষা—অপরিসীম ব্যাকুলতা।

অসীম ওর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

খোলা জানালা দিয়ে আসছে জলো হাওয়ার ঝাপটা, উতরোল গহিন রাতে আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে। স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল—যেন এরই প্রতীক্ষায় কেটেছে তার ব্যর্থ কত স্বপ্নভাঙ্গা রাত।

কয়েকদিন পরই প্রণবের সঙ্গে দেখা। কলেজে যায়নি ক'দিন।

—কি হয়েছে?

প্রণবের প্রশ্নে ফিরে চাইল কৃষ্ণা।

প্রণব ওর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। ক'দিনেই ওর সৌন্দর্য যেন দ্বিগুণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গালের লালিমা গাঢ়তর হয়েছে। চোখে কি এক খুশির আভা। সকালের বৃষ্টিধোয়া গাছে গিনিগোলা রোদের স্বপ্ন। এ যেন অন্য কোন কৃষ্ণা। প্রণব চুপ করে থাকে।

বিয়ে করছি। কৃষ্ণা সংবাদটা দিল সহজভাবেই।

অবাক হয় প্রণব। ওর মত মেয়ে যে এত সহজে এই বাঁধন মেনে নেবে কল্পনাই করতে পারেনি। কিন্তু সেই ধারণা আজ চুরমার হয়ে গেছে তার। ওরা সব পারে।

বিয়ে! প্রণব এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, বোধহয় রহস্য করছে সে।

—অবাক হচ্ছো যে! কেন, বিয়ে করা কি মহাপাপ?

—না। এ তো সুসংবাদ। নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয় প্রণব।

—কাকে বেছে নিলাম—তা জিজ্ঞাসা করছো না?

হাসে প্রণব। ম্লান ক্লিষ্ট হাসি। বলে—আমাকে নিশ্চয়ই নয়। সুতরাং আর ঔৎসুক্যও নেই।

হাসিতে ফেটে পড়ে কৃষ্ণা, বাঁধভাঙ্গা জলের মত ছিটিয়ে পড়ে খুশির তুফান। দমকা বাতাসে সোঁদাল ফুলের পাপড়িগুলো ঝর-ঝরিয়ে খসে পড়ে।

চৈত্রের হাওয়ায় ধুলোর বুকে ঘূর্ণি জাগে! কৃষ্ণা হাসি থামিয়ে বলে ওঠে,

—তোমাকে বিয়ে করতে হবে! কেন, সে-রকম কিছু কথা ছিল না কি? তোমরা বড় স্বপ্ন দেখ। সেই যে দুর্বলতার কথা বলেছিলাম, সেই রোগ এখনও সারেনি তোমার। হেসে কথা কইলেই ভাব— প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। সিলি—

প্রণবকে স্রেফ জবাবই দিয়ে আসে কৃষ্ণা। তার মনে আজ অন্য এক জগতের স্বপ্ন। সারা মন জুড়ে রয়েছে অসীম। অন এক বলিষ্ঠ দৃষ্টি নিয়ে পুরুষের প্রতীক! তার আহ্বান উপেক্ষা করবার মত শক্তি নেই কৃষ্ণার। নেশায় যেন মেতে উঠেছে সে। আজ ক্ষান্ত হতে চায়। ক্লান্ত মন আজ ঘর বেঁধে স্তব্ধতার অসীমে অবগাহন করতে চায়। জীবনের পরম লগন হেলায় হারাতে চায় না কৃষ্ণা।

বাবা-মা অমত করেননি মেয়ের মতে। পাত্র হিসাবে অসীম খারাপ নয়। শিক্ষিত— কোন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা পেয়ে যাবে নিশ্চয়— ডক্টরেটও পাবে শীগ্‌গির। জীবনে খ্যাতি অর্থ দুইই মিলবে তার।

কৃষ্ণা এই স্বামী নির্বাচনেও কোথাও একটুকু গলদ রাখেনি। অখুশিও হয়নি তারা। বাবা মা সানন্দেই রাজী হন। চেনা ছেলে তাঁদের।

বৌদি ঠাট্টা করে— শেষকালে সেই ধরা দিলে ঠাকুরঝি। ঢেঁকি যতই মাথা নাড়ুক না কেন— গর্তেই আসে। জানো তো, মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি!

হাসে কৃষ্ণা—আমার সৌভাগ্যে দেখছি তোমরা খুশি নও।

বৌদি মন্তব্য করে—মেয়েরা কিছুতেই খুশি হয় না ভাই, তাদের খুশি করা যায় না। আকাশ ছোঁয়া চাওয়া তাদের।

—তাই নাকি! কৃষ্ণা হাসে বৌদির কথায়।

সেদিন বৌদির কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি কৃষ্ণা, পরবর্তী জীবনে হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিল ওই কথার মর্মার্থ। আজও সেই স্মৃতির কণ্টক অহরহ তাকে বিঁধে আসছে। তার জীবনের সমস্ত শান্তি হরণ করেছে। ছিনিয়ে নিয়েছে তাব জীবন হতে মধুস্বপ্নে ভরসা সব আশার মুকুল দল।

মনে হয় কি যেন চেয়েছিল সে ভুল করেই। আজ সেই ভুল ভেঙ্গে যেতে চারিদিকে চেয়ে দেখছে অপরিসীম শূন্যতা।

মন নিঃস্বতায় ভরে ওঠে।

এক এক করে জীবনে এসেছে আশার ব্যর্থতা। স্তব্ধ হাহাকারে মন ভরে উঠেছে। কিন্তু অভিযোগ করবার কেউ নেই। এ যে নিজের হাতে সে তুলে নিয়েছে গরলভরা পাত্র তার তৃষিত ওষ্ঠে। কাঞ্চন বলে আঁচলে যাকে পবম সমাদরে কুড়িয়ে নিয়ে বেঁধেছে- - সে যে তার কাছে কাঁচ. সেই নিদারুণ সত্য ক্রমশ উপলব্ধি করেছে কৃষ্ণা। পবাজিত হয়েছে সে। এর জন্য সে নিজেই দায়ী, আর কেউ নয়।

অসীমের বাঁধনহাবা বেপরোয়া মন তার স্বাভাবিক বৃত্তিকে কোনদিনই ভুলতে পারেনি। ওরা আলাদা ধাতুতে তৈরি ওদেব ভেঙ্গে আব গডা যায না। কৃষ্ণা তাই হার মেনেছে— কাঁদে সেই পরাজয়ের জ্বালায়। কয়েক মাসেই যে ভুলটা বুঝতে পেরেছে।

মহানগরীতে রাত নেমেছে।

গহিন রাত। বিছানায় একা বয়েছে কৃষ্ণা। ঘুম ভেঙ্গে গেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ছে এক ঝলক চাঁদের আলো। মৃত্যুপাণ্ডুর আভা আনে নীল ডিস্টেম্পার করা ঘরখানায়। ট্রাম বাসের শব্দ থেমে গেছে। বাতাসে জেগে ওঠে টবে রাখা রজনীগন্ধার ফুলের ম্লান সুবাসে। একাই কাটে তার নির্জন রাত্রি। সারা মন গুমরে ওঠে এই অবহেলায়।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। ওদিকে ল্যাবরেটরিতে তখনও আলো জ্বলছে। দরজার কাছে এসে দেখে অসীম একতাল মাটি নিয়ে টবে ছড়াচ্ছে ওপাশের টবে সবুজ হয়ে উঠেছে কতকগুলো চারা গাছ। ওর দিকে ফিরেও চাইল না অসীম। একটা প্রাণী ঘরে ঢুকছে সেদিকে অসীমের খেয়াল নেই।

—রাত অনেক হয়ে গেল। কৃষ্ণা নিজেই এগিয়ে এসে নির্লজ্জের মত বলে ওঠে কথাটা।

অসীম মুখ তুলে চাইল।

হঠাৎ বাধা পেয়ে যেন বিরক্ত হয়েছে সে। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে— এখন আমার সময় নেই, তুমি শোও গে। পরে যাচ্ছি।

আবার কাজে মন দিল সে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণা। এই নীরব অবহেলা তাকে এই ক'মাসেই তিলে তিলে যেন দগ্ধাতে শুরু করেছে। এই অবহেলা কোনদিনই সহ্য করেনি কৃষ্ণা। চিরদিনই সে পুরুষের দেওয়া সম্মান আর সমীহই পেয়ে এসেছে, এই রূঢ় বাস্তবের সামনে এসে আজ চমকে উঠেছে কৃষ্ণা। আহত অপমানে বের হয়ে এল ঘব থেকে। কোথায় ডাকছে রাতজাগা ঘুমভাঙ্গা কোন পাখি। ওর ব্যাকুল আর্তনাদ, নিরাশার হাহাকার প্রকট করে তোলে কৃষ্ণার সারা মনে। আজ পরাজিত হয়েছে সে। যাকে জয় করেছি বলে আনন্দিত হয়েছিল,

আজও তেমনিই সুদূরেই রয়ে গেছে সে। অপরাজেয় হয়েই রইল।

মা-বাবা সকলেই অবাক হয়ে যায় কৃষ্ণার কথায়। ওরা অনুভব করেছে, কৃষ্ণার জীবনে কোথায় একটা হতাশায় বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। আজ অসীমের মতবাদটা শুনে তারাও বিস্মিত হল। অসীম সরকারী চাকরি নিল না— ডক্টবেটের থিসিস্ সাবমিট কবতেও নারাজ। সময় নেই তার। সে আবাদ অঞ্চলে বিস্তৃত বনকাটা জমি ইজারা নিয়ে চলেছে সেইখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে— তার সাধনা সার্থক করে তুলতে।

কথাটা শুনে মা চমকে ওঠে— সে কি রে! বাঘ সাপের রাজত্বে যাবে সে। তুই মত দিলি কি করে?

—যেখানে খুশি যাক না। আমি বাধা দেব কেন?

হাসে কৃষ্ণা। মলিন ক্লিষ্ট হাসি, মুখে তার ফুটে ওঠে পরাজয়ের কালিমা।

—না, বাছা, তুই বুঝিয়ে বল। মায়ের কণ্ঠে ব্যাকুলতার সুর!

মাকে কি করে বোঝাবে, অসীমের ব্যক্তিত্বের কাছে কত অসহায় সে! তার রূপ-যৌবনের চেয়ে আকর্ষণীয় মহৎ কিছুর সন্ধান সে পেয়েছে। তাই বেপরোয়া সে। না হলে আজীবন যে-পরিবেশে মানুষ হল— যে-জীবনধারা তার রক্ত মাংসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সেই পরিবেশে, সেই জগত থেকে নির্বাসিত হ'তে হতো না কৃষ্ণাকে।

বৌদির কাছে ধরা পড়ে গেছে কৃষ্ণার এই দুঃখ। বৌদি পরামর্শ দেয়— তুমি দিনকতক ও-বাড়ি যাওয়া বন্ধ কর। বেশ রাগ করে চলে এসো এখানে। দেখবে সুড় সুড় করে আবার তিনি মাথা নুইয়েছেন। ওসব পুরুষের হুমকির মুরোদ কত জানা আছে আমার।

কৃষ্ণা কথার জবাব দিল না।

দুপুরের রোদ নেমেছে নারিকেল গাছের পাতায়। একটা পাখি ডাকছে। একক উদাস সেই কণ্ঠস্বর।

বৌদির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কৃষ্ণা। আজ সকলের কাছে সে করুণার পাত্রী। ওরা নিছক দয়া করেছে তাকে। সেই দুর্দান্ত বেপরোয়া মেয়েটি স্তব্ধ হযে গেছে নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে। বৌদি আশ্বাস দেয়— দেখ না তাই করে, ঠিক হয়ে যাবেন মশায়।

রয়েই গেল এ বাড়িতে কৃষ্ণা। একদিন —দুদিন।

মা প্রশ্ন করে— সে কি রে, সত্যিই ঝগড়া করে এসেছিস? অসীম কি ভাবছে বল দিকি?

মুখ কালো করে জবাব দেয় কৃষ্ণা—ভাবুক গে যা ভাববাব, কি এল গেল আমার।

মা বিপদে পড়ে। আজ-কালকার ছেলে-মেয়েদের ব্যাপার ঠিক যেন বুঝতে পারে না। স্বামীকে কথাটা না জানিয়ে পারে না। তাইত! বাবা এতে বেশ যেন খুশি হতে পারেন না।

মা বাবাকেই দোষ দেয়—আদর দিয়ে মেয়েকে মাথায় তুলেছে।

বাবা চুপ করে শোনেন।

সেদিন দুপুরে কৃষ্ণা পাশের ঘরে কি করছে। ঘুম আসে না চোখে। সেই শান্তিপূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি আজ তার হারিয়ে গেছে। বাবার কথা কানে আসতেই বিছানায় উঠে বসলো। মা বলে চলেছে— দেখ দিকি, ঝগড়া করে এসে বসে রইল বাড়িতে। একবার খোঁজও নিল না। ছিঃ ছিঃ লোকে বলবে কি?

কৃষ্ণা পাশের ঘরে বাবা-মায়ের কথাটা শোনে কান দিয়ে।

বাবা বলে ওঠেন— সত্যি, কৃষ্ণার এ অন্যায় আমি মেনে নিতে পারছি না। স্বামী যেখানে যাবে স্ত্রীব ঠাই সেইখানে। তাই বলে তাকে ফেলে চলে আসার মত কিছু ঘটেনি। আমি নিজেই তাকে বলবো এবার।

মা ফোড়ন দেয়— বোঝ, এইবার, তখন যে মেয়েকে নাই দিয়ে মাথায় তুলেছিলে! বার বার বলেছি— ওগো, এত বাড় বাড়তে দিও না—দিও না। তা সেকথা কি কোনদিন কানে তুললে! ভোগ এখন।

কৃষ্ণা চুপ করে কি ভাবছে। আজ সবার উপরই রাগ হয়।

মা-বাবা কেউ তার এই মনোভাব স্বীকার করে নিতে পারে না। আজ মনে হয়, বিয়ে দিয়েই তাকে পর করে দিয়েছে। সমস্ত দায়িত্বই ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়েছে তাকে পরের হাতে তুলে দিয়ে। আজ তাদের দোষ

দিতে পারে না কৃষ্ণা। সব কিছুরই জন্য দায়ী সে—তার এ মন্দ ভাগ্যের জন্য অন্য কাউকেও আজ দোষী করতে পারে না।

এবাড়ির ওপর ওর জোর কমে গেছে। মনে হয় এ বাড়ির সে কোন অবাঞ্ছিত অতিথি। দয়া করে ওরা ঠাঁই দিয়েছে।

তার ভুলের জন্যও কোথাও ওদের মনে তিলমাত্র বেদনা বোধ নাই। এ ভুল সে নিজেই করেছে, ভালো-মন্দ, খ্যাতি-অখ্যাতি সব তার নিজের। অত্যন্ত অসহায় একা মনে হয় আজ।

বিশেষ কোন জনকে মনে পড়ে না। প্রণবও যেন জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেছে। আজ মনে হয়—তার নিজের পৃথিবী থেকে সকলেই যেন মরে গেছে। আজ অনন্ত বিশ্বে একা সে। একাই তাকে পথ চিনে চলতে হবে। তার সাহায্যে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ এগিয়ে আসবে না। এত একাকী বোধ কোনদিনই করেনি কৃষ্ণা। মায়ের কথাগুলো মনে পড়ে। এ বাড়িতে ঠাঁই যেন তার নেই।

কি ভেবে বেরিয়ে পড়ল পথে। দুপুরের স্তব্ধতা তখনও কাটেনি ঝাঁঝাঁ করছে রোদ। পিচ গলে উঠেছে।

রাস্তায় দু'একজন লোক চলেছে কোনমতে দুপুরের খর রোদের তাপে। কুকুরগুলো পর্যন্ত একটু আশ্রয় সন্ধান করে নিয়ে ল্যাজে-মাথায় এক হয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

এ পথে বার বার এসেছে প্রণবের সঙ্গে। সে দিনগুলো ছিলো ভালো—বাধা-বন্ধহীন জীবন। আজকের মত কর্তব্য, পতিভক্তির শিকল পায়ে জড়িয়ে তার পথ রুদ্ধ করে তোলেনি। নিজের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেবার শাসন আসেনি। সব আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

অসীমের বাড়ির কাছে এসে থামলো কৃষ্ণা। কি ভেবে নিজেই এগিয়ে গিয়ে কড়া নাড়ালো দরজার। কোন সাড়াশব্দ নেই। দুপুরের নিস্তব্ধ রোদে বাড়িটা প্রাণহীন হয়ে রয়েছে। আবাবও কড়া নাড়লো। এবার একটু জোবে বেশ ঝাঁঝালো মেজাজে।

বুড়ো চাকর এসে দরজা খুলে ঘুমচোখে মাজীকে দেখে সরে দাঁড়ালো এক পাশে।

—আপনি!

বাড়িতে পা দিয়েই প্রশ্ন করে কৃষ্ণা—বাবু কোথায়? এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে থাকে সে।

অসীমের ঘরে তালা লাগানো, ল্যাবরেটরিও বন্ধ! চাকরটা বলে—বাবু তো চলে গেছেন।

খাঁ খাঁ করছে সারা বাড়ি। চারিদিকে ছাত্রাকার হয়ে পড়ে আছে অগোছালো জিনিসপত্র।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় কৃষ্ণা অপমানের কালো ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মুখে।

চাকরটা এনে দিল তার হাতে চাবির গোছা। কি ভেবে ঘর খুলে ভিতরে ঢুকলো। তখনও ঘরে একজনের সব চিহ্ন লেগে রয়েছে। কৃষ্ণা যেন এখান থেকে মুছে গেছে একেবারে। চারিদিকে দেখতে থাকে।

অসীম চলে গেছে অবাধে। টেবিলের উপর রাখা কয়েকখানা চিঠি কি যেন অস্পষ্ট এক ডাকঘরের ছাপ লাগানো। নামটা পড়তে পারে না। অবাদে পৌঁছবার পথে কোন ডাকঘরে ফেলে দিয়ে গেছেন নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই। কৃষ্ণার ওপরে কোনদিনই কোন আশা-ভরসা সে করেনি—এটা স্পষ্ট হয়ে ঠেকে কৃষ্ণার চোখে।

স্তব্ধ হয়ে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে কৃষ্ণা। এই তার স্বামী! জীবনের সব কিছু মত এবং পথের আমূল পরিবর্তন করে ফেললো, সেই রদবদলে স্ত্রীর মত বা পরামর্শের কোন দামও দেবার প্রয়োজন বোধ করলো না। এতে কি কৃষ্ণার কোন কথাই বলবার থাকতে পারে না? তবু পতিভক্তির অভিধানে এই প্রতিবাদকেই অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। সেইজন্য বাবা-মাও তার অসহযোগীতাকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। সবাই দোষ দিয়েছে তাকে—কিন্তু তার প্রতি এই অবিচারের কথা কেউ মানলো না।

অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কৃষ্ণা। এ কি সর্বনাশ হল তার! এমনি করে সাজানো সংসার—সব আশা-আকাঙক্ষা যে নির্মূল হয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি। আজ সে একান্ত অসহায়। অসীম তার একবিন্দুও মূল্য স্বীকার করে নেয়নি।

—মাজী। চাকরটা একটু অবাক হয়ে গেছে।

চাকরটার ডাকে উঠে বসলো কৃষ্ণা। চাবিগুলো তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল বাইরের দিকে, স্ত্রীর

অধিকার শুধু চাবি আগলানোই নয়। সে যখন এমনি করে ফেলে যেতে পেরেছে—তার এই শূন্য ঘর-সংসার আগলানোর মত কাজটাই শুধু তার করণীয় নয়।

—আপনি ও-বাড়ি যাচ্ছেন? বাবু যদি ফেরেন?

কি ভাবছে কৃষ্ণা। চাকরের কথায় জবাব দেয়—খবর দিও। চাকরটা ওর দিকে চেয়ে থাকে। কৃষ্ণারই লজ্জা করে। ও বোধ হয় বুঝতে পেরেছে তার অবস্থাটা।

ওর সামনে থেকে তাই যেন সরে এল কৃষ্ণা।

নীচে নেমে এল সে রাস্তায়। পিছন পানে চাইবার মত সাহস নেই তার। ওই স্তব্ধ বাড়িখানা যেন আকাশজোড়া মুখ 'হাঁ' করে তাকে গিলে ফেলতে আসছে। ওখানে তার থাকবার অধিকারও যেন নীরব অস্বীকৃতিতে প্রকাশ করে দিয়ে গেছে অসীম।

বৈকালের পড়ন্ত রোদে লোকজনের ভিড় কাটিয়ে নীরবে এসে বাড়ি ঢুকলো কৃষ্ণা। মাকেও-জানাতে পারল না তার এই অপমানের কথা। চুপ করে চলে যাচ্ছিল, মায়ের ডাকে দাঁড়াল।

মা প্রশ্ন করে—কোথায় গিয়েছিলি কৃষ্ণা?

—সিনেমা দেখতে। মিথ্যা কথাটাই বললো মাকে।

মা অবাক হয়ে ওঠে—ধন্যি মেয়ে যা হোক বাবা। ও বাড়ির খবরও নিস নি? দিব্যি নেচে বেড়াচ্ছিস?

—যাদের দরকার থাকে নিয়ে আসুক। আমার কোন দরকার নেই। কৃষ্ণা সটান ওপরে উঠে গেল নিজের ঘরে।

অসীম ক'দিন ঝড়ের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। এক মুহূর্তও সময় করে উঠতে পারেনি। রেলি কোম্পানি থেকে ট্রাক্টর কিনে পাঠানো, আরও টুকিটাকি মালপত্র, বাংলোর জন্য উপকরণ, সেখানের আবাদে নতুন লোকজন লাগানো, ভেড়ি মেরামত করানো— এইসব কাজ চুকোতে মাসখানেক কোন্‌দিক দিয়ে চলে গেল ভাবতেই পারে না। কলকাতার পাট চুকিয়ে দেবে, এইবার এইখানেই সব নতুন করে শুরু করবে তার কাজ। নিদারুণ কর্মদক্ষতা তাকে যেন মাতিয়ে তুলেছে। তার স্বপ্ন সার্থক হল। ক্রমশ তার বসন আবাদের সীমানা বেড়ে যাবে সমুদ্রতীর পর্যন্ত। সুন্দরবনের অন্তপ্রত্যন্তে আবার গড়ে উঠবে নয়া কোন হ্যামিলটন-গঞ্জ। সে আশার স্বপ্নে সবকিছু ভুলে যেতে বসেছে অসীম। কলকাতা ফিরেও মহা আনন্দে কোন আশার স্বপ্ন দেখে।

কৃষ্ণা হঠাৎ অসীমকে এই বাড়িতে দেখে চমকে ওঠে। বাবা মাও নেমে আসেন! নতুন জামাইকে অভ্যর্থনার আয়োজন পড়ে যায় বাড়িতে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওঠে সবাই।

—এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? মা অনুযোগ করে।

হাসে অসীম— নোনা জলহাওয়ায় একটু রঙটা ময়লা হয়। তবে স্বাস্থ্য ভালোই থাকে। তা ছাড়া মাছ-মাংস প্রচুর। বাতাসও 'ওজন'—গ্যাসে ভরা।

কৃষ্ণা নীরবে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। চোখ মুখে ওর যৌবনের দুর্বার গতিছন্দ। অফুরান প্রাণসম্পদে সে ভরপুর কি যেন এক সৃষ্টির নেশায় বেপরোয়া ভাব।

একটু একলা পেয়ে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে আসে অসীম। বলে ওঠে অনুনয়ের সুরে।

—সময় পাইনি মোটেই কৃষ্ণা। নিজে চলো, গিয়ে দেখবে কি কাণ্ড করবার সাধনা করছি। এ সময় তুমি দূরে দূরে থাকলে একা আমার পক্ষে কি সম্ভব হয়। এত দায়িত্ব-ভাবনা একা বইতে ভাবতে পারি না।

এ যেন প্রথমদিনের দেখা সেই আপনভোলা মানুষটি।

ওর কথা যেন বিশ্বাসই করতে পারে না কৃষ্ণা। এই মূল্যবোধ কি কোনদিন ছিল অসীমের, না চাপে পড়ে ঠেকে শিখেছে। কণ্ঠস্বরে কৃত্রিমতা নেই, এটুকু বুঝতে পারে কৃষ্ণা। কিন্তু সেই পরিবেশে থাকবে কি করে সে। কৃষ্ণা ভাবনার পড়ে। অসীম যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

বলে ওঠে অসীম— চমৎকার ঠাঁই। একবার গেলে আর আসতে চাইবে না। ভালো লাগবে তোমার।

সন্ধ্যার একফালি ম্লান আলো আঁধারে ডুবে গেছে। সামনের গোলমহর ফুলগুলো ঝরছে দমকা বাতাসে।

কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কৃষ্ণা।

কৃষ্ণার হাতখানা তুলে নেয় কি আশাভবে। কৃষ্ণা স্বামীর দিকে চেয়ে আছে। মনে তার অভিমানের ঝড় উঠেছে। অসীমের এই আহ্বান কি উপেক্ষা করবে কৃষ্ণা? বাবা-মার কথাগুলো মনে পড়ে তার।

মাকে কথাটা না বলে পারে না যাবার সময়। —বড় কাঁটা হয়ে ঠেকেছিলাম তোমাদের গলায়। আজ দুর হলাম। যদি কোনদিন ফিরেও আসতে হয় সেখান থেকে তোমাদের ভরসা করে আসবো না। মিথ্যে স্বপ্ন আমার কেটে গেছে।

মা চোখ মোছেন। বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্তব্ধ হয়ে। মেয়েকে সান্ত্বনা দেন না তিনি। তিনিও বুঝতে পারেন তাঁর অসহায় অবস্থার কথা। কৃষ্ণার জীবনে এমনি বসবাস ঘটবে তা কোনদিনই ভাবেননি তিনি।

কৃষ্ণা মতই দিয়েছে। অসীমের আহ্বান উপেক্ষা কবতে পারেনি সে। এখানের হাওয়া যেন বিষিয়ে উঠেছে।

বাবা-মা আত্মীয়বর্গের কথা সহ্য করতে না পেরেই চলে যাচ্ছে কৃষ্ণা; স্বামীকে ভালোবাসে কিনা জানে না, তবে একবার চেষ্টা করে দেখবে সে—ওই জীবনকে, ওই মানুষটাকে আপন করতে পারে কিনা। জীবনের কঠিন বাধার রূপ আজ তার চোখে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাকে অতিক্রম করবার চেষ্টাই করবে সে।

—মানিয়ে নিতে চেষ্টা করিস মা, জীবন বড় কঠিন বস্তু—বড় নির্মম সে।

বাবা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। আজ ব্যথায় ভরে ওঠে তাঁর মন। বাবার কথার জবাব দেয় না কৃষ্ণা।

আজ পঁচিশ বছরের পরিচিত মৃত্তিকা —এই মহানগরের পরিবেশ থেকে নির্বাসিত হতে হলো তাকে। জানে না, এর পরেও কি অপেক্ষা করছে তার ভাগ্যে। এমনি করে শিকল পরতে হবে—একথা কি সে জানতো? আজ মনে পড়ে নিখিল, প্রণব, বসন্ত সেন, মমতা, ইলা আরও অপরিচিত মুখ। কলেজের স্বপ্নবঙীন দিনগুলো— প্রণবেব একটু স্পর্শ। কি নিদারুণ উপহাসই না করেছিল প্রণবকে রূপ অন্ধ এই কৃষ্ণা। আজ তাব সেই রূপের কোন মূল্যই সে পেলো না। না পেয়েছে ভালোবাসা— না পেল সম্মান, মিললো না কোন স্বীকৃতি। আজ সাধারণ স্ত্রীর মতই চলেছে সে স্বামীর সহগামিনী হয়ে সেই রামায়ণী যুগের সীতার মত। এ যেন তার বনবাস যাত্রা। জানে না, কোন্ স্বর্ণমারীচ ওৎ পেতে রয়েছে সেই আরণ্যক জীবনে অশান্তির ছায়ায় তার সব আলো নিভিয়ে দিতে।

লঞ্চ চলেছে। অসীম নিজেই বসেছে ষ্টিয়ারিং-এ। এইট সিলিন্ডার নতুন লঞ্চটা কুপগাছি নদীর বিশাল বিস্তীর্ণ বুক চিরে চলেছে দ্রুতগামী হাঁসের মত। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে কৃষ্ণা বাইরের দিকে চেয়ে। দুই তীর ভেড়ির সীমানা, জনহীন রুক্ষ প্রান্তর সূর্যের তাপে খাঁ খাঁ করছে। বড় গাছ বলতেও বিশেষ কিছুই নেই। সবে আবাদ পত্তন হয়েছে, বাস গড়ে উঠেছে মুষ্টিমেয় মানুষের। লবণভাব এখনও কাটেনি, মাটিতে রঙ বসেনি, এখনও সাদা আঁশ রয়েছে মাটির বুকে; ভেড়ির বাঁধন টপকে লোনা জল গ্রাস করে ফসলের স্বপ্ন।

—কতক্ষণ লাগবে আর? অধৈর্য হয়ে উঠেছে কৃষ্ণা।

কেমন যেন বিশ্রী লাগে, ভগ্ন লাগে।

অসীম ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে ওঠে— ঠিকমত চললে আরও ঘণ্টা চারেক।

—ঘণ্টা চারেক! শিউরে ওঠে কৃষ্ণা।

অর্থাৎ এখনও ষাট মাইল পথ! কান্না আসে যেন কৃষ্ণার। জনহীন নদীর কালে কালো আলকাতরা রঙের পলি জমেছে। দূরে দু'একটা নুয়েপড়া ছাপড়ার ছাউনি বাস, আবার সেই নিষ্করুণ শূন্যতা। নদীর বুকে দূর দূরান্তে চলেছে দু'একটা নৌকা, কাঠ বোঝাই করে চলেছে কলকাতার দিকে। ওর ফেলে আসা শহরের পানে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে শ্যামবাজার— সেই ছোট্ট খালটা। ও চলেছে নিরুদ্দেশের পথে। পিছনে পড়ে রইল তার যৌবনের দিনগুলো।

একটানা শব্দ করে ছুটেছে সাদা লঞ্চটা। জল থেকে হাত দুয়েক জেগে আছে, পিছনে সাদা সফেন জলধারা মাতামাতি করে যেন তেড়ে আসছে তাকে ধরে নাকানি চোবানি খাইয়ে দিতে। প্রাণভয়ে পালাচ্ছে

লঞ্চটা। একদৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে যেন ঘুরপাক দিচ্ছে স্রোতের বেগে।

নিতাই বুনোকে সেদিনই প্রথম দেখে কৃষ্ণা। স্তব্ধ হয়ে পিছনে বসে আছে বিশ্বাসী প্রভুভক্ত কুকুরের মত। ওর দিকে চাইতেও যেন ভয় হয় তার! কালো মুষকো চেহারার এমন মানুষ শহরে দেখা যায় না!

বলে ওঠে— মোল্লাখানি পার হই গেলাম বাবু, সামনেই সাহেবখালির ঘোল। বাঁ-হাতি চালান লঞ্চ। হুঁশিয়ার।

কথা বেশি বলে না, চোখে মুখে বন্য আদিম ভাব। মনের কোন ভাবেই ফুটে ওঠে না তাতে। চোখ দুটো মাঝে মাঝে জ্বলছে।

বিস্তৃত নদীর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে কৃষ্ণা। গহন কালো নদীর জলে যেন প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়েছে, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে তীব্র বেগে জল পাক দিচ্ছে। মধ্যিখানে তলিয়ে যাচ্ছে জলেভাসা কাঠ— গাছের ডালপালা। কোন একটা দৈত্য যেন আকাশজোড়া হাঁ করে বসে রয়েছে নীচে। যা কিছু যাচ্ছে তুলে অতল গহ্বরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কলকল শব্দ ওঠে বাতাসে।

কৃষ্ণা ভীত চাহনি মেলে ঠাঁইটার দিকে চেয়ে থাকে।

নিতাই বলে— নৌকা, লঞ্চ যাই হোক না কেন, একবার ওর মধ্যি গেলি— সটান সেঁদিয়ে যাবে। কেউ উঠি আসতে পারেনি।

বিস্তীর্ণ নদীর বুকে সূর্যের আলো ঢেউ-মাথায় হাজার মাণিক জ্বেলে দিয়েছে। একদিকে অল্প উঁচু ভেড়ি দেখা যায়, অন্যদিকে আদিম অরণ্য। সুন্দরবনের বুক থেকে মানুষ জোর করে কেড়ে নিয়েছে ওই জমি। এপারে ক্রুদ্ধ অরণ্যসীমা আকাশপানে ডালপালার বিভীষিকা বিস্তার করে আক্রমণোদ্যত হয়ে রয়েছে।

ভাঁটার সময় নদীর জল নীচে নেমে এসেছে, বের হয়ে পড়েছে বিশাল কালো পলি-ঢাকা নদীগহ্বর— জীবন্ত দৈত্যে মুখবিস্তার করে পড়ে আছে। তারই গহ্বরে চলেছে তারা। এত বড় নদীর মাঝখানে এইটুকু লঞ্চ মোচার খোলার মত ভাসছে— যে-কোন মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। বনের গাছে গাছে বসে রয়েছে অসংখ্য বাঁদর পাল—অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে তারা লঞ্চের দিকে। কেউ বা দাঁত বের করে কৃষ্ণাকে সম্বর্ধনা জানায়।

কৃষ্ণা যেন স্বপ্ন দেখছে। কলকাতার দোতলার ঘরে নিজের বিছানাতেই রয়েছে সে, নিদ্রাঘোরে কি নিদারুণ দুঃস্বপ্ন দেখছে। ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে আসবে সেই জগৎ। কিন্তু তা হবার নয়। কঠিন বাস্তব —রুঢ় জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে। হঠাৎ চমকে ওঠে অসীমের ডাকে।

—দেখ, দেখ! অসীম কৌতুহলী দৃষ্টিতে কৃষ্ণাকে বনের দিকে দেখাল। কৃষ্ণা চেয়ে থাকে বনভূমির দিকে, রোদমাখা বনানী।

কেওড়া গাছের ওপরে বসেছিল একপাল বাঁদর, নীচের পাতা খেতে এসে জুটেছে কয়েকটা হরিণ। একটা বাঁদর ডাল থেকে লাফ দিয়ে তার পিঠে চেপে বসেছে। সওয়ার পিঠে নিয়ে লঞ্চের শব্দে বেপরোয়া ছুটেছে হরিণ। সওয়ার সমেত বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল হরিণটা।

কৃষ্ণার ওদিকে যেন নজর নেই।

—কত দূর আর?

কৃষ্ণা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে অজানা আতঙ্কে। নদীর বিস্তার বেড়ে চলেছে। এপাশে ছায়াঘন আদিম অরণ্য দিগন্তজোড়া স্তব্ধতা বুকে নিয়ে রহস্যময় হয়ে রয়েছে। দূরে অস্পষ্ট নীলাভ রেখার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় নিতাই— উই যে ট্যাঁকের মাথা দেখা যায়, সেইখানে যাতি হবে।

নিরুদ্দেশের ইশারাই করে বসে লোকটা।

কৃষ্ণা আজ তার সব কিছু হারিয়ে বসেছে। এখানের কিছুই সে জানে না, তার ব্যক্তিত্বও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। নিতাই বুনোই এ জগতের প্রধান ব্যক্তি, অসীমও নিঃশেষে ওদের সঙ্গে মিশে গেছে।

অলস কর্মহীন মধ্যাহ্নে এমনি করে অতীতের স্মৃতির পাতা উলটে দিন কাটে কৃষ্ণার। অসীম তখনও মাঠ থেকে ফেরেনি।

দুপুরের অলস রৌদ্র বাংলোর চালে এসে লুটিয়ে পড়েছে। কৃষ্ণার নিজের হাতে বসানো কৃষ্ণচূড়ার গাছে এসেছে প্রথম মঞ্জরী, স্নান সেরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। প্রসাধন-পর্বের বিশেষ প্রয়োজন এখানে নেই। নিজের মনোমত একটু মেজে-ঘসে নিলেই যথেষ্ট। গালে বা ঠোঁটে লালিমা ফুটিয়ে তোলবার জন্য রুজ লিপস্টিক এখানে অচল। দেখবার—তারিফ করবার কেউ নেই। সাদামাটা জামা-কাপড়ই যথেষ্ট। পুরুষের দরবারে আবেদন জানাবার কোন দরকার নেই। কেউ নেই— যার রুচি অজ্ঞাতসারেই এসে প্রভাবান্বিত করবে তার রুচিকে। সমাজে আর পাঁচজনের সঙ্গে রূপ-আভিজাত্যের পাল্লা দেবার মত কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। গায়ে মুখে একটু পাউডার ছিটিয়ে এসে বসেছে বারান্দার একটা ডেক চেয়ারে। সাবান মাখার সার্থকতা এখানে নেই। নোনা জলে সাবানের ফেনা হয় না। ফেনার কোমল স্পর্শ না পাওয়া গেলে সাবান মাখার সার্থকতা কি! তেল-তেল খানিকটা পদার্থের সৃষ্টি হয় মাত্র। সাবান মাখা ছাড়তে হয়েছে প্রায়।

রান্নাঘর থেকে অতুলের হাতাখুন্তির শব্দ পাওয়া যায়। অসীমের তখনও ফেরবার নাম নেই। সিঁড়িতে কাকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল কৃষ্ণা। একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই চিনতে পারে— মরিয়ম। সবুজ সতেজ বন্যলতার মত প্রাণবন্ত একটি মেয়ে। হাসছে। ওরই মধ্যে একটু সাজগোজ করা হয়েছে।

—কি রে?

—সেলাম মনিবান!

মনটা অকারণেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কৃষ্ণার। আশে-পাশের বসতির মধ্যে ওকে যেন সত্যই কেমন ভালো লাগে তার। কালো নিটোল গড়ন, কার্যক্ষম বলিষ্ঠ দেহে যৌবনের বান উপছে পড়ছে। কথা বলে কম। প্রশ্ন করলেই হাসে। লাবণ্য যেন ঝরে পড়ে ওর মিষ্টি হাসিতে। শুকনো নীরস মাটিতে মনের সবুজকে সেই বাঁচিয়ে রেখেছে।

খুব যে খুশি রে। কি হ'ল? কৃষ্ণা ওকে প্রশ্ন করে।

—ফিরে এসেছে মনিবান— সে আবার ফিরে এসেছে।

মবিয়ম কাঠের মেঝেতে ওর পায়ের কাছেই বসে পড়ে। ইরফানের কাহিনী সেও শুনেছে। পালানো স্বভাব তার। আর বেকুব মেয়েটা তারই জন্য কেবল কাঁদবে, পথ চেয়ে বসে থাকবে, শত অভাব-অভিযোগ সহ্য করে কথাটা শুনে উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণা।

—ঝাঁটা মারগে তার মুখে। এত সোহাগ কেন রে?

কৃষ্ণা ওর হাসি-কান্নার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত। একটু রসিকতাই করে।

হাসে মরিয়ম—বড় ভালো মনিবান, উ বড় ভালো।

—তাই বুঝি! দাঁড়া মুখপুড়ি!

কি ভেবে উঠে গিয়ে ঘর থেকে বের করে আনলো একখানা শাড়ি। রঙচঙে নতুন শাড়ি। রঙটা পছন্দমত হয়নি বলেই ওটা বড় একটা পরে না কৃষ্ণা।

—নিয়ে যা, পরবি। শাড়িখানা হাতে তুলে দেয়।

—সত্যি!

মরিয়মের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খুশিতে। প্রজাপতির মত সাজবার সখ ওর। মনের কোণে গোপন কামনা— ইরফান তার জৌলুষে মজে থাকুক। তাই এত কাজকর্মের মধ্যেও সেজেগুজে থাকতে চায়। ইরফানের পয়সা কড়ি কোথায়? সখ থাকতেও সাধ্য তার নেই। মরিয়ম নিজেই ও কাজটুকু সেরে নেয়। হাসিভরা চাহনিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। বলে ওঠে কৃষ্ণা,

—বেশ মানাবে তোকে।

হাসে মরিয়ম। সলজ্জ মিষ্টি হাসি। কপালে কাঁচপোকার টিপটা মানিয়েছে বেশ।

বলে ওঠে কৃষ্ণা— এবার যদি ও চলে যায় আবার কাঁদতে বসবি তো?

হাসে মরিয়ম—ইস, যাক্ দিকি, এবার গেলেই ছোড়ছাড় করে দোব।

আর কুন সম্বন্ধই রাখবো না। আমাকে যে দেখতি পারে না, খাতি দিতি পারে না, সে আমার কসম কুন্ কানুনে মনিবান? বলেন সত্যি কিনা?

—হুঁ!

একথা আগেও শুনেছে কৃষ্ণা ওর কাছে। কিন্তু কি যে বাঁধনে বাঁধা আছে মরিয়ম ওই বাউণ্ডুলের সঙ্গে জানে না সে। চোখের দেখা দেখতে পেলেই মেয়েটা গলে যায়!

বাঁধের মাথায় দেখা যায় অসীম ফিরছে কলেবরে। খাঁকি শার্ট, প্যান্ট, ঘামে ভিজে নেয়ে উঠেছে— পা অবধি ধুলো উঠেছে জুতো ঢেকে গিয়ে। মরিয়ম চলে গেল মাথার কাপড়খানা টেনে দিয়ে।

—হাত পা ধুয়ে গেল। ওসব পোশাক ছাড় দিকি। কৃষ্ণা বলে ওঠে— অতুল!

অতুল এক পায়ে খাড়া। কোন সময়ে কি দরকার সব তার নখদর্পণে। এ সংসারে ও যে নীরব সাক্ষী। কাজকর্ম, সেবার আয়োজন অতুলই নিখুঁত ভাবে করে। কৃষ্ণা তদারক করে, না হয় দর্শকের ভূমিকা নিয়েই ক্ষান্ত থাকে।

দত্তচক থেকে নিকটতম হাট ছ'মাইল অন্তরে। সপ্তাহে একদিন হাট বসে সাতজেলেতে। লোকালয়ের শেষ হাটতলা। দোকান পসার কিছুই নেই। মাত্র কয়েক ঘর লোকের বাস। অধিকাংশ জেলে, মালো! কয়েকখানা ছন খাপরা টিনের ঘর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ক্লান্ত রোদে যেন হাঁফাচ্ছে এখানে ওখানে দু'একটা কলাগাছ না হয় কৃষ্ণচূড়া গাছ। নৌকায় করে এসেছে পসারী দোকানীর দল। হাটবারে দু-চারজন লোকের সমাগম হয়, বাকী কটাদিন নিঝঝুম হয়ে পড়ে থাকে নদীর মজা তীরে। ছাই-এর মধ্যেই মালপত্র থাকে, সপ্তাহের দিন হিসাব করেও এ-হাটে ও-হাটে বেসাতি করে বেড়ায় তারা। শুকনো তোবড়ানো আলু, বাওয়ালি তরকারি বলতে পাকা কুমড়ো, কচু, পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি। আর ওপাশে জমেছে হাঁড়িপাতিলের নৌকা, ছিটকে রয়েছে দু'একটা পানের দোকানদার। বত্রিশ খোপওয়ালা ডালায় কি যেন সব মশলা ছড়ান। দু'পয়সায় বত্রিশ মশলা গুনে গুনে না পেলে বাওয়ালির দল ক্ষেপে উঠবে।

—ঠগাতি আসছ?

দু'একদিন ওখানে গিয়েছে কৃষ্ণা। তবু কিছু লোকের মুখ দেখা যায়। ওপাশেই ফরেস্ট অফিসারের বাংলো। দু'চারজন ভদ্র শিক্ষিতও পড়ে আছে এই বনবাসে চাকরির দায়ে। প্রথম প্রথম এই পরিবেশটাকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল কৃষ্ণা। তাই সাগ্রহে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। দেখে এই অঞ্চলটাকে।

সাতজেলের হাট দেখতে এসে হতাশ হয়েছিল।

নিতাই সর্দার বলে ওঠে—ডাকাতের দেশ মা। নৌকা হলে আপনাকে আনতি পারতাম না। নেহাৎ লঞ্চ বলেই ভরসা। মাঝ গাং-এ নৌকো চড়াও হয়ে লুট করে নিয়ে উধাও হয় ওরা! হামেশার ঘটনা।

মানুষের দেশ এ নয়। চারিদিকে এর বিপদ আর বিপদ। কৃষ্ণা ক্রমশ ওই কঠিন সত্যটাই বুঝতে পেরেছে। শিউরে উঠেছে অজানা আতঙ্কে।

হাটতলায় দুচার জন লোক জমেছে। বেচা কেনা সেরে বেলাবেলি চলে যাবে তারা। পথে বিপদ।

ভেড়ির ওপারে টিনের ঘরগুলোর সামনে হাটতলা। চাষী-বাসী আর বাওয়ালি নৌকোর মাঝি, না হয় সুন্দরবনের দিকে যাবার মুখে মাল্লাদের ভিড় জমে। সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। এই পরিবেশ কৃষ্ণা নিজেকেই বেমানান মনে করে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। দোকানে জ্বলছে গ্যাসের বাতি, না হয় কেরোসিনের আলো। অদূরেই মুক্ত প্রান্তরে দ্বিগুণতর হয়ে ওঠে অন্ধকার। এ যেন স্বপ্নে দেখা তমসাচ্ছন্ন দেশ। নিজের মধ্যে নিজেই সম্পূর্ণ—বাইরের কোন সভ্যতার স্পর্শ, সভ্য জগতের মানুষকে ওরা আহ্বান করে না তাদের স্বাতন্ত্র্যের ব্যাঘাত ঘটাতে।

লঞ্চ ফিরছে দত্তচকের বাংলোর দিকে। চাকর-মাঝিদের রসদপত্র নিয়ে নৌকা আগেই বের হয়ে গেছে দিন বেলাবেলি। সন্ধ্যার পর মালপত্র নিয়ে এই পথে নৌকা চলে না। দু'চারজন জোয়ান ছোট এমশমনি ডিঙ্গি বেয়ে হাট থেকে ফিরছে; তাদের দু'একটা কথার শব্দ শোনা যায়। ওপরের আদিম অরণ্যে নেমেছে সুচিভেদ্য অন্ধকার। স্থির জলে তারার আলো ছিটকে পড়েছে-কাঁপছে। লঞ্চের তীব্র আঘাতে ফেঁপে ফুলে

ওঠে জলরাশি। ওদের সুখস্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। বিক্ষোভ জেগে ওঠে নদীর জলে; ফসফরাসের ঝিলিক ওঠে— রুপোর ফিনকি দিয়ে।

ঘাটে এসে পৌঁছেছে কৃষ্ণা। অসীম দাঁড়িয়ে রয়েছে মাচানের উপর। কাঠের তক্তা পেড়ে নদীর জল থেকে ওপরে উঠবার ব্যবস্থা আছে। জোয়ারের জল নেমে গেছে। পলি ঢাকা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল কৃষ্ণা।

—কেমন দেখলে হাট? হাত ধরে ওকে তুলতে তুলতে প্রশ্ন করে অসীম।

নতুন কয়েকদিন এসেছে সবে, নতুন চোখে ভালোই লেগেছে হাটের নিঃস্বতা।

বলে ওঠে—ভালই। যেমন দেশ তার হাট-বাজারও তেমনি।

দূরে বনের মাথায় চাঁদ উঠেছে। লাল আভায় ভরে উঠেছে গাঢ় কাল বনের সীমান্ত—হরিণগাড়া নদীর রহস্যময় জলরাশি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণা। মহানগরীতে এমন স্বপ্নময় চাঁদ সে দেখেনি কখনও। কৃষ্ণা মন বসাবার চেষ্টা করে। বলে ওঠে,—মন্দ কি!

অসীমকে, এই জগৎকে ভালো লেগেছে আজ।

কিন্তু ভুল তার ভেঙেছে ক্রমশ।

কয়েকদিন পরই অসীমের কাজকর্মের চাপ একটু কমে এসেছে। ট্রাক্টর দিয়ে জমি তৈরি পর্ব শেষ হয়েছে প্রায়। বৈকালের পড়ন্ত রোদে ঝিমিয়ে পড়ছে ছোট খালটা। ওপারের অরণ্যে অসংখ্য পাখির নীরবতাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তোলে। কৃষ্ণা অসীমের ডাকে ফিরে চাইল।

—চল একটু বেড়িয়ে আসি ডিঙ্গিতে।

ঘাবড়ে যায় কৃষ্ণা। খোলা ওই ডিঙ্গিতে এই গহন গাঙে পাড়ি জমাতে বাজি নয় সে।

অভয় দেয় অসীম— ছোট খালে যাবে। নিতাই থাকবে সঙ্গে। কোন ভয় নেই।

—বেশ! কৃষ্ণা অসীমের হাতটা ধরে।

চারখানা দাঁড় খাটিয়ে বের হল তারা। ঝিকেব টানে টানে ডিঙ্গি চলেছে দুলকি চালে।

দু'পাশেই শুরু হয়েছে বন। এখানে বন তবু একটু হালকা! শীতের শেষ বসন্তের প্রারম্ভ। বনে বনে এসেছে নতুন কচি হলদে পাতার আস্তরণ। কেওড়া ধুন্দুল গাছের পাতায় রং-বাহার খুলেছে— মেলা বসতে শুরু হয়েছে মৌমাছির। অবাক বিস্ময়ে সবুজের সমুদ্রে চোখ মেলে বসে আছে কৃষ্ণা। অপরূপ এক রূপের নেশায় সে মেতে উঠেছে। চোখে ওই গাঢ় সবুজের প্রলেপ শান্তিস্পর্শ আনে। তার নিজের ক্ষুদ্র চাওয়া, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি এই মধুমেলার অতল আনন্দস্রোতে হারিয়ে ফেলেছে সে।

—বাঃ!

হঠাৎ একটা শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে।

অসীমের হাতটা চেপে ধরে।

হাসছে নিতাই। কুৎসিত বীভৎস হাসি।

চমকে ওঠে কৃষ্ণা ভয়ে। কাঁপছে সে।

অদূরে খালের ধারে পড়েছিল কালো কাঠের গুঁড়ির মত একটা কিছু। ওদের ডিঙ্গির শব্দ পেয়ে চকিতের মধ্যে ওটা সজীব হয়ে উঠল। প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে ডিঙ্গির ধারেই এসে পড়ল। মুহূর্তের জন্য দেখতে পায় কৃষ্ণা—বিরাট একটা হাঁ, কুতকুতে চোখগুলোতে বীভৎস হিংস্রতার ছায়া, লেজটা জলে ঝাপটা মেরে তলিয়ে গেল। ডিঙ্গিটা কেঁপে ওঠে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে কৃষ্ণা।

নিতাই সর্দারের বিরাট মুখখানার দিকে চাইতে ভয় করে। যেন এমনিই কুশ্রী।

নিতাই সর্দার বলে ওঠে—ও কিছু নয়, বুড়ো কুমির। এই খালেই মাঝে মাঝে ওকে দেখা যায়। ও আমাদিকে চেনে।

চিড়িয়াখানায় কুমির দেখেছে কৃষ্ণা, কিন্তু এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু। যেমনি কদাকার কুৎসিত, তেমনি বীভৎস। কাঁপছে যেন সারা দেহ।

ফিরে চলো। কৃষ্ণা ভীতিজড়িত কণ্ঠে অনুনয় করে অসীমকে।

—কি হলো? সহজভাবে প্রশ্ন করে অসীম।

কোন উত্তর না পেয়ে অগত্যা অসীম ফিরতে বাধ্য হয়। কৃষ্ণার বেড়ানোর সখ মিটে গেছে। এই জগতকে বহুবার আপন করে পাবার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু তার মনের সুর ছিঁড়ে গেছে।

কাছিম যেমন একবার গলা বের করে বাইরের জগতকে দেখে নেয়, কোন বাধা না পেলে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যায় সে, বাধা পেলেই কঠিন আশ্রয়ে আত্মগোপন করে নিরাপদ হতে চায়, কৃষ্ণাও প্রথম সেদিন খালে চোখের উপর নিশ্চিত মৃত্যুকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে।

নিতাই-এর বীভৎস হাসিটা মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কৃষ্ণার।

সকাল বেলাতেই অসীম তৈরি হয়ে বলে ওঠে—কই চল, বেরুবে না?

অসীমের কাছে কালকের ব্যাপারটার কোন দামই নেই। তার নিজের কাজেই ব্যস্ত সে। এখানের ওসব সহজ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। কৃষ্ণা কিন্তু ভুলতে পারেনি। গভীরভাবে রেখাপাত করেছে তার মনে কালকের ঘটনাটা।

কৃষ্ণাকে নিয়ে অসীম বের হতে চায় তার নিজের গড়া জগতের মাঝে। মনে মনে আশা রাখে, কৃষ্ণা তার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে, উৎসাহ অনুপ্রেরণা জোগাবে। অসীম কৃষ্ণার দিকে চেয়ে থাকে।

কৃষ্ণা বলে ওঠে— উরে বাব্বাঃ যা কুমির!

—ডাঙ্গায় কোন ভয় নেই। অভয় দেয় অসীম।

—ভরসাও নেই। কৃষ্ণার মনে তবুও সাধ যায় বাইরে বের হতে। কি ভেবে শাড়িখানা বদলাতে যায়। বাধা দেয় অসীম।

—থাক, ওই কাপড়েই হবে। রকমারি শাড়ি ম্যাচ-করা ব্লাউজ দেখবার কেউ নেই এখানে।

লজ্জা বোধ করে কৃষ্ণা— না গো মশায়, তা নয়। চল।

চলে এল তারা মাঠের বুকে।

চারিদিকে সবুজের ছোঁয়া লেগেছে। মানুষের গড়া সবুজ স্বপ্ন জেগেছে প্রান্তরে।

অসীমের সঙ্গে প্রথম প্রথম সেও যেতো বাইরের মাঠে। অসীম ঘরের কোণ থেকে বাইরে পা দিয়েই বদলে যায়। মুক্ত উদার পৃথিবী তাকে যেন অপরিসীম সৌন্দর্যের সন্ধান দিয়েছে। একতাল মাটি জুতোর ঠোক্কর দিয়ে তুলে নিয়ে হাতে গুঁড়িয়ে কি যেন আঘ্রাণ নিতে থাকে। মুখে-চোখে ফুটে ওঠে বিজয়ের চিহ্ন।

—দেখছো ক্যালসিয়াম ফসফেটের গন্ধ! মাটির জাত এসেছে, দেখো কি চমৎকার ফলন হবে। অসীম নিবিষ্ট মনে মাটির উপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। দেখছে মাটির দিকে চেয়ে কি যেন ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে।

ওদিকে মাটির বুকে উঠেছে সবুজ ধানের চারাবীজ। ছোট্ট ট্রেলার পাম্পটায় জল উঠছে অনবরত। এক আঁচলা জল মুখে দিয়ে পরখ করে অসীম— লবণাক্ত স্বাদ নেই, মিষ্টি জল। মাটির নীচে অমৃতের সঞ্চয় এখানেও আছে।

কৃষ্ণা ওর চোখে মুখে দেখতে পায় ঐকান্তিক সাধনার সফলতার সংবাদ। আপন আনন্দেই সে অধীর।

—আরে দাঁড়াও একটু!

কৃষ্ণা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে চলতে চলতে।

—ও!

অসীমের যেন এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না কৃষ্ণার কথা।

ফাঁকা মাঠে গিয়ে দাঁড়াল তারা, ট্রাক্টর দিয়ে প্রথম চাষ দেওয়া হচ্ছে। কুমারী মৃত্তিকা অসহ্য বেদনায় যেন মোচড় দিয়ে উঠেছে। এক পাশে উঁচু ঢিপির উপর রয়েছে একটা ছোট কেওড়া গাছ। ওটাকে আর কাটেনি— অতীতের বন-শ্যামলিমার শেষ চিহ্ন হিসাবে ওটা নেহাৎ গোত্রছাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শূন্য প্রান্তরে। কিন্তু বসন্ত ঋতু তাকে ভোলেনি। অসীম নিঃসঙ্গ জীবনেও পেয়েছে কুসুমের স্বপ্ন। ডাল ছেয়ে ফুটে আছে গুঁড়ি গুঁড়ি ফুল, চন্দনের মত সৌরভে বাতাস ভরিয়ে তুলেছে। মাটিতে ঝরে পড়া ফুলের আস্তরণ। কৃষ্ণা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—বাঃ।

চঞ্চল বালিকার মত দু'হাতে তুলে আঁচলে রাখছে ফুলগুলো দমকা বাতাসে ঝরে পড়ে চূর্ণ ফুলদল।

হঠাৎ একটা বাওয়ালির চিৎকারে থমকে দাঁড়াল কৃষ্ণা।

অসীম চিৎকার করছে— এক পাও নড়বে না কৃষ্ণা।

বাতাসে কিসের শব্দ শুনে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে কৃষ্ণা কালো ফণা মেলে লেজটা ডালে পাক দিয়ে নীচের দিকে দোল খাচ্ছে একটা সাপ, ওর উষ্ণ নিঃশ্বাসের শব্দ বাতাসে ভরিয়ে তুলেছে কদর্য হিংস্রতায়, চোখে ওর মৃত্যুনীল বিষের ইঙ্গিত। সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে গেছে, সামনেই সাক্ষাৎ মৃত্যু উদ্যত ফণা ধরে তাকে গ্রাস করতে আসছে।

চিৎকার করে উঠে আতঙ্কে।

চোখের সামনে সব একাকার হয়ে যায়, দুর থেকে ভেসে আসছে কাদের কোলাহল, ছায়াঘন অন্ধকার ঢেকে আসছে তার চোখের সামনে।

হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়ে উদ্যতফণা বিষধর সাপটা, দ্বিখণ্ডিত ফণা থেকে কালো রক্ত ঝরছে। আহত হয়েছে, নিষ্ফল গর্জনে ভরিয়ে তুলছে বাতাস, ক্ষতবিক্ষত ঠোঁট দিয়ে আঘাত করেছে ঘুরপাক খাওয়া ডালে জড়ানো নিজের লেজের উপর। এ দৃশ্য জীবনে দেখেনি কৃষ্ণা। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে একটি মুহূর্ত! সব অনুভূতি, চেতনা সেখানে স্তব্ধ! এই অপরূপ সৌন্দর্যের অন্তরালে এখানে ওৎ পেতে আছে আরণ্যক বীভৎসতা, মানুষকে অতি সহজে অধিকার দেবে না এই মৃত্তিকা। চারিদিকে তাই দুরন্ত বাধা।

—কৃষ্ণা!

কোথায় যেন আবার ফিরে এসেছে সে, কোন দূব দেশ থেকে। বাতাসে কাঁপছে তার ফুলগুলো। কার ডাক শুনতে পায।

অসীম তাকে ডাকছে বারবাব। ধীরে ধীবে আবার চেতনা ফিরে আসছে। অদূরে পড়ে আছে কালো সাপটার প্রাণহীন দেহ। ওরা আবাব কাজে মন দিয়েছে। এসব এখানকার অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু কৃষ্ণার মনে রেখাপাত করে গভীরভাবে। তাকে যেন পদে পদে কোন অদৃশ্য শক্তি বাধা দিয়ে আসছে— বার বার মৃত্যুর রূপ ধরে আসছে তার ঘটনা। ওদের ডাকে সাড়া দিতে ভয় করে।

আজও ক্লান্ত অলস মধ্যাহ্ন তার অতীতের সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথাই ভিড় করে আসে মনে। তার দিক থেকে কোন দোষ নেই। অসীমকে, এই পরিবেশকে আপন করে নিতে সে চেষ্টাব ত্রুটি করেনি।

মাঠ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরছে কৃষ্ণা। সারা দেহ মনে একটা নিদারুণ ঝড় বয়ে গেছে। অবসন্ন হয়ে বিছানায় পড়ে আছে।

— কেমন আছ? অসীম ওর দিকে এগিয়ে আসে।

কথা কইল না কৃষ্ণা। চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

অসীম বলে ওঠে— একেবারে ভীতু তুমি। সাপ-কুমির এখানে সর্বত্রই আছে, একটু সাবধান হলেই আর কোন ভয় থাকে না।

কৃষ্ণার চোখে ফুটে ওঠে আতঙ্কের ছাপ।

—এখানেও আছে, এই বাংলোর নীচে?

—এক জায়গায় কি থাকে? ঘোরাফেরা করে তারা।

কৃষ্ণা নীরবে উঠে বসে বিছানার উপর। হেসে ফেলে অসীম। —এই দেখ! কি হল আবার?

—সত্যি এখানে থাকতে ভয় করে আমার। কলকাতাই ভালো।

—কলকাতা! অসীম কথার জবাব দিল না। স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে কোনদিনই কৃষ্ণা এই মাটিকে স্বীকার করতে পারেনি। বারবার ভালোবাসার ভান করেছে মাত্র, সামান্য আঘাতে সেই ঠুনকো মুখোস খসে পড়েছে। ফুটে উঠেছে এ মাটির উপর তীব্র বিক্ষোভ।

ওপাশে নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিল অসীম।

— শোন! কৃষ্ণার ডাকে ফিরে চাইল অসীম।

একা ফেলে যাবে না তো কখনও।

—না। না। চুপ করে শোও। কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

—না, বসো একটু।

অসীম ওর ছেলেমানুষিতে অবাক হয়! চলে যাচ্ছিল। কি ভেবে বসল ওর বিছানায়।

কৃষ্ণার চুলে বিলি কাটতে থাকে অসীম সান্ত্বনার ভঙ্গীতে, চুপ করে শুয়ে থাকে কৃষ্ণা। ওর নিবিড় সান্নিধ্যে এই দুরন্ত বনের বিভীষিকা ভোলবার চেষ্টা করে।

ক্লান্তি আর উত্তেজনায় চোখ বুজে আসে কৃষ্ণার। কেমন আবছা অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার দৃষ্টি।

—কৃষ্ণা।

অসীমের ডাকে সাড়া দেবার সামর্থ্যটুকুও যেন তার নেই।

বর্ষার আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে বনানীর বুকে। হরিণগাড়ার প্রশস্ত জলরাশি ক্ষেপে উঠেছে। ছোট্ট খালটা ছাপিয়ে উঠেছে কানায় কানায়। ছিঁচ কাঁদুনে মেয়ের মত আকাশ কান্না জুড়েছে ঘ্যান ঘ্যান করে। একবার থামে, আবার পাগলা বাতাসের ঠেলায় মেতে ওঠে। জানালার বাইরে চেয়ে থাকে খালের দিকে। কেওড়াগাছের একটা ডাল নুয়ে এসেছে জলের সীমানায়। একপাল বাঁদর ভিজে ডালে বসে দাপাদাপি করছে। একটা মাদী বাঁদর তার ছোট বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ডালে ডালে কচি পাতার সন্ধানে। বাচ্চাটাও লাফ ঝাঁপ দিয়ে ফিরছে এডাল ওডালে।

হঠাৎ একটা আর্তনাদে বানরপাল সচকিত হয়ে ওঠে। মাদী বাঁদরটা নীচু ডালে বসে পাতা খাচ্ছিল, ডালটা নুয়ে পড়ে, জল ছুঁই ছুঁই করছে। জলের উপর জেগে ওঠে কালো বীভৎস সেই কুমিরটা।

জানলা থেকে চিৎকার করে ওঠে কৃষ্ণা।

একটি মুহূর্ত। কুমিরের তীক্ষ্ণ লেজ আশমানে সাপটে উঠেছে পৈশাচিক হিংস্রতায়! বাঁদরটা অতর্কিত আঘাতে ছিটকে পড়ল জলে— আবর্তে পড়ে হাত পা ছুঁড়ছে। কিন্তু সব চেষ্টার নিবৃত্তি ঘটিয়ে দিল কুমিরটা—অতলে টেনে নিয়ে চলে গেল নিমেষের মধ্যে।

বাঁদরপাল অসহায়ের মত কিচমিচ করে।

কৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে গেছে মৃত্যুর সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে। বাচ্চাটা তখন নদীর থৈ থৈ জলের দিকে চেয়ে অস্ফুট আর্তনাদে তার হারানো মাকে ডাকছে। সে বেচারা জানে না কোথায় গেছে তার মা। ছোট বাচ্চাটা ডালে বসে কাতর স্বরে ডাকছে তখনও।

কৃষ্ণা জানালাটা বন্ধ করে দিল। বার বার এই দৃশ্য সে দেখতে পারছে না, অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশ। হিংস্র পরিবেশে—জীবন আর মৃত্যুর চেহারা এখানে এক হয়ে গেছে।

কয়েক মাস কেটে গেছে তারপরও। সব মিথ্যা মোহ স্বপ্ন কেটে গেছে কৃষ্ণার।

অসীম প্রথম বছরে বিশেষ কিছু ফসল পায়নি, এবার তাই উঠে পড়ে লেগেছে এখন থেকেই। সমস্ত জমিতে অন্ততঃ চারবার চাষ দেবে—উলটে পালটে হাওয়া আর রোদে তাতিয়ে তুলবে মাটিকে। উন্নত ধরনের বীজধানেরও ব্যবস্থা করেছে, এইবার তাকে যেমন করেই হোক ফসল তুলতেই হবে। নইলে তার সামর্থ্যও নিঃশেষ হয়ে যাবে। সারা মনে দিন রাত ওই সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একদিকে তার ভবিষ্যৎ, অন্যদিকে তার সুনাম সুখ্যাতি। সবকিছুই রক্ষা করতে হবে তাকে। ব্যর্থ সে হবে না—আপ্রাণ যুঝছে তার জন্যই!

মাঠে সবুজ ধানবীজগুলো জেগে উঠেছে। কয়েকটা পাম্প বসিয়ে জল তুলছে। অন্যান্য ফসল লাগানো হবে। দু'বছরেই কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় এসেছে ফুলের সমারোহ! লাল থোকা থোকা ফুল বাতাসে মাথা নাড়ছে।

—কৃষ্ণা!

একরাশি উল দিয়ে একটা স্কার্ফ তৈরি করছিল কৃষ্ণা, অসীমের ডাকে মুখ তুলে চাইল।

—চল ঘুরে আসি একটু।

—বাইরে! কৃষ্ণা চমকে ওঠে।

ওই মাঠের দিকে; তোমার কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল এসেছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে কৃষ্ণা। ফুলভারে ভরে ওঠা গাছের নীচে সেদিনের ঘটনাটা মনে আগুন জ্বালাবার মত ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

—না, বাইরে যেতে ইচ্ছে নেই।

— কেন? অসীম প্রশ্ন করে।

—বনেবাদাবে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতে রাজি নই আমি। মাগো মা-কি মুলুক। কিসের নেশায় যে পড়ে আছো এখানে জানি না। ধান হবে—ফুল ফুটবে। দরকার নেই আমার!

—কৃষ্ণা! অসীম ওর কথাগুলো শুনে মর্মাহত হয়েছে।

না, যাবো না। যেতে হয় তুমিই যাও।

কৃষ্ণা আজ প্রতিবাদ করছে। কঠিন প্রতিবাদের চিহ্ন ফুটে উঠেছে ওর মুখ চোখে। এতদিন মনে-প্রাণে এই শক্তি সে আহরণ করেছে। আজ ঘটেছে তারই প্রকাশ। যাবে না কৃষ্ণা।

অসীম সেই কাঠিন্যের ছাপ দেখেছে ওর মুখে। একটু থমকে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে।

কথা কইল না অসীম, কৃষ্ণা আবার হাতের বোনাটা তুলে নেয়, ধীরে ধীবে একাই বের হয়ে আসে অসীম। কৃষ্ণা যেন এ মাটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ইচ্ছে করেই।

কয়েকদিন আগে পাঁচ মাইল দূবে সাতজেলে পোষ্ট অফিস থেকে কয়েকখানা চিঠি এসেছে, টেবিলের নীচেই ফেলে রেখেছে অসীম। দেখবার খেয়াল হয়নি। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকে এটা-সেটা গোছাতে গিয়ে তার নামে চিঠিখানা দেখে তুলে নেয়। মায়ের চিঠি। সাতদিন আগে এসে পড়ে আছে। অসীম তাকে হয়তো ইচ্ছে করেই দেয়নি। কলকাতার সঙ্গে কোন যোগাযোগই রাখতে দিতে নারাজ। রাগে গা জ্বলে ওঠে কৃষ্ণার। অসীম যেন তাকে এই বনবাসে বন্দী করে রাখতে চায়।

চিঠিখানা এনেছে বাইরের কোন সুন্দব জগতের স্বপ্ন। মহানগরীর স্বাদ।

ব্যর্থ বঞ্চিত কৃষ্ণা আজ সাগ্রহে তাই ওখানকে হাতে তুলে নেয়। মা— বাবা—দাদা— বৌদি, কত আরও আপনজনের ছবি ফুটে ওঠে।

কতই না আনন্দ সেখানে।

তার হারানো দিনগুলো ফিরে আসে অজানতেই।

লেকের ধারে বৈকালের পড়ন্ত আলোয় গাছগাছালি ভরে যায়। টাকা— গোলমহরের ঘন সবুজ পাতাব আড়ালে পাখিগুলো কলরব করে ফেরে। জলে নামে ছায়াকালো অন্ধকার।

প্রণবের কথা মনে পড়ে।

সেইদিনের নৃত্যনাট্যের কথা।

মমতা ইলা—আরও কতজনের মুখ।

কলকাতা যেন শত সহস্র বাহু মেলে পরম স্নেহভরে আজও ডাক দেয় বহু দূরের বনরাজ্যে নির্বাসিত কোন প্রাণীকে।

বাড়িতে ভাইপোর অন্নপ্রাশন, তারিখটা দেখে। এখানে সন তাবিখ কি বার, কোন কিছুরই দরকার নেই। ক্যালেন্ডার নামেই আছে।

হিসাব করে দেখে অন্নপ্রাশন চুকে গেছে দুদিন আগে। সবাই এসেছিল— সব আত্মীয়ই।

যেতে পারেনি শুধু কৃষ্ণা।

অসহায় ক্ষোভে আর রাগে মন ভরে ওঠে।

তার স্বাধীনতায় পর্যন্ত অসীম হাত দিয়েছে। নিষ্ঠুর একটি মানুষ। যেমন করে এই বনরাজ্য দখল করে নিতে চায় তেমনি করে সবকিছু যেন জবর দখল করে তৃপ্ত হতে চায় সে।

বিদ্রোহী সেই অতীতের চাপা পড়া মন আজ জেগে ওঠে।

কৃষ্ণা চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

অন্ধকার নেমেছে বনরাজ্যে।

কোন আলো নেই, মানুষ নেই।

আছে শুধু উর্ধ্বাকাশে কয়েকটা তারার আলো, মিটিমিটি জ্বলছে। বাতাসে ওঠে মত্ত নদীর প্রবল গর্জনধ্বনি।

তারই মাঝে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে আছে একা— রুদ্ধমুখে আগ্নেয়গিরির মত ফুঁসছে মনে মনে অসহায় বন্দিনী একটি নাবী।

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে চাইল।

দীর্ঘ ছায়া ফেলে অসীমের মূর্তিটা এগিয়ে এসে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে। মেঝেতে পড়েছে ওর ছায়াটা; বাইরের আলোটুকু প্রবেশ পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

কৃষ্ণার মুখে পড়েছে একফালি আলোর ঝিলিক।

কৃষ্ণা আজ কঠিন হয়ে উঠেছে। এমনি চুপ করে আর সে সহ্য করবে না সব কিছু।

ওকে দেখেই এগিয়ে গেল কৃষ্ণা। দু'চোখের দৃষ্টিতে তার অবিশ্বাসের ছায়া।

— কেন দাওনি এ চিঠি?

—চিঠি।

অসীমের খেয়াল নেই।

—হ্যাঁ, এই যে! এগিয়ে দেয় চিঠিখানা।

লজ্জিত হয়ে পড়ে অসীম— সত্যি, একেবারেই খেয়াল ছিল না আমার। খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

—ইচ্ছে করেই দাওনি এ চিঠি। কেন? বিদ্রোহ করে ওঠে কৃষ্ণা।

—সত্যি। বিশ্বাস করো কৃষ্ণা।

থাক্! আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। ছিঃ!

কণ্ঠস্বরে গরল জ্বালা ফুটিয়ে তুলে সরে গেল বাইরে।

লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসীম। ভাবতে থাকে, কৃষ্ণাকে বোঝাবে কি করে তার ভুল! এ তার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। কাজের চাপে ভুলে গেছে একেবারে।

চুপ করে গিয়ে তার ছোট্ট লাইব্রেরিতে ঢুকলো অসীম; ওদিকে কৃষ্ণা আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েছে।

দু'জনের মাঝে এমনি করেই বেড়ে ওঠে ভুল বোঝাবুঝির দুস্তর ব্যবধান। কেউ কাউকে চেনবার চেষ্টা করতে নারাজ। কৃষ্ণা মনস্থির করে নিয়েছে—

অসীম নানা ভাবনায় ব্যস্ত। স্ত্রীর দিকে নজর দিতে সময় কোথায় তার।

সরে গেছে দূরে কৃষ্ণা, কোথায় গড়ে উঠেছে একটা মৌনতার ব্যবধান। কৃষ্ণা কোনদিনও প্রশ্ন করেনি তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। অসীম এই অবজ্ঞা ভোলার জন্যই কাজে ডুবে থাকে। চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে বিপদ, অভাব। কিন্তু জানাবে কাকে। কৃষ্ণাও জানতে চায়নি কোনদিন। একাই বইছে অসীম সব চিন্তার বোঝা।

মরিয়ম আবার উঠে পড়ে লেগেছে তার সংসার নিয়ে। কৃষ্ণার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছে একটা হাসনুহানার গাছ; উঠোনে বসিয়েছিল গাছটা। জল দিয়ে, মাটি বদলে তাকে ফুলে ভরিয়ে তুলেছে। ছোট্ট চালাঘরখানা নিকিয়ে সাফ-সুতরো করে তুলেছে। নোনা মাটিতে সবুজ স্বপ্ন এনেছে সে, ইরফান ঘরবাসী হয়েছে— এ গর্ব তার রাখবার ঠাঁই নেই। প্রজাপতির মত রঙ্গীন ডানা মেলে ফিরছে বুনো হাওয়া।

বৈকালের পড়ন্ত রোদে নেয়ে ধুয়ে এসেছে মরিয়ম, সেজেছে আজ মনোমত করে। কুলিবস্তির বাইরে

বাংলার সীমান্তের বাড়িখানায় কি যেন শ্রী নেমেছে। চালে উঠেছে কুমড়োর লতা— বেলা শেষের শেষ আলোয় গাঢ় হলুদ ফুলগুলো সাজিয়ে তুলেছে অঙ্গন। মরিয়ম মুরগী দুটোকে আদর করছে। মাঝে মাঝে হাসিতে ভেঙে পড়ে খিলখিলিয়ে।

ইরফান চেয়ে থাকে মরিয়মের দিকে। হ্যাঁ চাইবার মত চেহারা। দেহে ওর নিটোল অফুরন্ত যৌবন— দু'চোখে গহন গাঙের স্থির নিথব চাহনি। মরিয়ম ইরফানের ভাবখানা টের পেয়েছে। ধমকে ওঠে কৃত্রিম রাগত স্বরে।

—হাঁ করে দেখছিস কি? হাসে মরিয়ম।

বলে উঠে ইরফান—তুকে। এত সুন্দর তুই?

ইরফানের দুচোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। পথচলতি মানুষটা হঠাৎ যেন বদলে গেছে কি অপরূপ পথের বাহার দেখে। দুচোখে তার সেই ভালোলাগার নেশা। ইরফান চমকে উঠেছে দেখছে।

মরিয়ম জানে তার রূপেব খবর। দুচোখে তাই ওর সঙ্গীন নেশা। কাপড়টা গায়ে অকারণেই জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে আসে ইরফানের কাছে। ওর বিবশ মনটাকে আজও যেন চেনেনি। বলে মরিয়ম,

—তাই তো তোকে বাঁধতেও পারলাম না। কিসের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ছুটিস, তোর মনই জানে।

চুপ করে থাকে ইরফান।

আবাব কাজে মন দিয়েছে সে। আর সে সত্যিই যাবে না ওই মৃত্যুর দেশে। নতুন আবাদে নতুন উৎসাহে কাজে লেগেছে সে আব মরিয়ম। আজ ভালোবেসে এ মাটিতেই বাঁধা পড়েছে ইরফান।

মরিযম তাকে ভুলিয়ে দিক, নিজের বিবশ মন ওর হাতের মুঠোয় তুলে দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে চায় সে।

মবিয়ম কাছে এসে দাঁড়িয়েছে— কৃষ্ণার দেওয়া রক্ত রঙের শাড়িখানা। বাতাসে ভেসে আসে সদ্যফোঁটা কেওড়া গরানের গন্ধময় বন্য বাতাস। ইরফান চেয়ে রয়েছে তার দিকে। ওর হাতখানা মরিয়মের হাতে। টেনে নেয় মবিযমকে নিজের দিকে।

বাধা দেয না মরিয়ম। এইটুকুর প্রতীক্ষায় সে কাটিয়েছে এত দিন— এতগুলো প্রহর। ওর মিষ্টি স্পর্শে মবিযমেব চোখ বুজে আসে।

মধুর স্বপ্নময় হয়ে ওঠে পাখিডাকা আলোনামা বৈকাল বেলা।

হঠাৎ দরজার কাছে ছায়া পড়তেই সরে গেল ইরফান। মবিয়ম লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যায়। এ যেন বিশ্বাসই কবতে পারে না সে। দাওয়া থেকে ছুটে নেমে আসে।

মনিবান! আপনি!—উঠে এগিয়ে এল পরম উৎসাহে।

কৃষ্ণা বেড়াতে বেরিয়ে কি মনে করে ওর বাড়িতে পা দিয়েই ওদের এইভাবে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে যায়, ফিবে আসতে গিয়েই ধরা পড়ে যায়। নিজেরই লজ্জাবোধ হয় তার।

—আসেন মনিবান। এগিয়ে গেল মরিযম। একটা মোড়া বের করে আনে।

—বসেন। হাসছে মরিযম।

ইরফান হঠাৎ মনিবানকে দেখে কেমন হকচকিয়ে যায়। কি করবে দিশে-বিশে পায় না। মরিয়মই ধমকে ওঠে।

—কামে যাবে না মরদ?

যেন করবার মত একটা কাজের সন্ধান পায় ইরফান।

আল্না থেকে গামছাটা কাঁধে ফেলে বার হয়ে গেল মাঠে। কাজ বাকি আছে অনেক। একা দাঁড়িয়ে আছে মরিয়ম কৃষ্ণার দিকে সলজ্জ ভাবে তাকিয়ে।

—কি রে? কৃষ্ণা কৌতুকভরা চাহনিতে চেয়ে আছে মরিয়মের দিকে।

মরিয়মের দুচোখে মুখে কি একটু মধুর স্বপ্নাবেশ। নীড় বাঁধার আশা ওর চোখে। ভালোবাসতে চায়— ঘব বাঁধতে চায় নারী, পুরুষের ঘর। মরিয়ম তাদেরই একজন।

হাসছে মরিয়ম—সলজ্জ হাসি।

কৃষ্ণার মনে যেন কি এক অদৃশ্য কামনা ফুটে ওঠে মরিয়মের দু'চোখে ওই অফুরন্ত খুশির ঝলক দেখে। ওর মত আনন্দের সন্ধান কিছুই সে পায়নি।

কৃষ্ণা বলে ওঠে—বাঃ, বেশ মানিয়েছে তো তোকে শাড়িখানা।

—ও বলছিল কথাটা। আবার ফুটে ওঠে সেই হাসি।

—আর কি বলছিল রে? খুব যে সোহাগ হচ্ছিল!

কৃষ্ণার কথায় সলজ্জ মুখ নামিয়ে নিল মরিয়ম। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। কৃষ্ণা সাগ্রহে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। মরিয়ম গৌরবে প্রেমে আজ অন্য নারীতে পরিণত হয়েছে, ওর অন্তরে সঞ্চিত হয়েছে কি এক অমূল্য সম্পদ— এত কাছে থেকেও কৃষ্ণা সেই পরম বস্তুটির সন্ধান পায়নি একবারও। ওকে আজ মনে মনে যেন হিংসা করে। সামান্য পাওয়া নিয়েই পরম তৃপ্ত হয়েছে সে। তাই মরিয়ম খুশিতে ফেটে পড়ে অহরহ।

—মনিবান! মরিয়মের ডাকে চাইল কৃষ্ণা।

চালের আড়বাঁশ থেকে ঝুলছে কড়ির তৈরী লাল সুতোর বাঁধুনি দেওয়া একটা সিকে। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুক বা না করুক— যে করেছে তার ঘর সাজাবার নিদারুণ আগ্রহ ফুটে উঠেছে ওর পাকে পাকে। পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রচুর।

তারিফ করে কৃষ্ণা—বাঃ বেশ হয়েছে তো। চমৎকার করেছিস।

—একটা পাটি বুনছি, ইবার কিন্তু নিতেই হবে মনিবান।

মরিয়ম সাগ্রহে চেয়ে আছে মানিবানের মুখের দিকে। ছোট সংসার তার নিজের সেবা-যত্ন সাধনা দিয়ে ভরিয়ে তুলতে চায়। ও চায় বন্ধন।

আর কৃষ্ণা জীবনে এই বন্ধনকেই এড়াবার চেষ্টা করে এসেছে। যতই নিবিড় হয়েছে তার এই প্রচেষ্টা, ততই নিবিড়তম হয়ে উঠেছে বাঁধন। আষ্টেপৃষ্ঠে পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে ধরে প্রবল নিষ্পেষণে নিঃশেষ করে দিতে চাইছে।

উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণা। সারা মনে কেমন অসহায় একটা নীরব বেদনা।

—মনিবান!

মরিয়ম এগিয়ে আসে। কৃষ্ণা কথার জবাব দিল না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনই বের হয়ে গেল ওর বাড়ি থেকে।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মরিয়ম।

দিন শেষ হয়ে আসছে। গেরুয়া রোদ বনভূমির বুকে কি এক স্তব্ধ বেদনার রঙ এনেছে। নিঝুম পাংশু আকাশের অসীম শূন্যতার মাঝে দু'চোখ মেলে কিসের সন্ধান করে কৃষ্ণা।

জনহীন বাংলোর সামনের মাঠটায় এসেছে প্রাণের সঙ্কেত। বহু কষ্টে এবং পরিশ্রমে লাগিয়েছিল কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া-পাতাবাহার-রজনীগন্ধার ঝাড়। বসন্ত এসেছে—তারাও এই আমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়েনি। মড়া ডালের বুকে এসেছে নতুন পাতার সমারোহ। উঁকি মেরেছে দু'একটা কুঁড়ি সৌরভমদির ফুলের সম্ভাবনা নিয়ে। সারা বনভূমির পত্রপুষ্পে কি এক নিবিড় ব্যাকুলতার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। সেই মিলন পিয়াসা বনভূমির পত্রমর্মরে।

দেখা যায় একটা সুন্দরী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মাদী হরিণ। হলুদ গায়ে কালো ছোপ— কি যেন দেখছে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে। কৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে। দু'জনেই যেন অতৃপ্ত চিত্তে বসন্ত-ব্যাকুল বনভূমিতে কার মিলন কামনা করছে ব্যর্থ বাসর-সজ্জিকার সাজে।

একটা চাপা খসখস শব্দ।

ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে বের হয়ে এল একটা বড় শৃঙ্গের হরিণ। সরু সুঁচালো মুখ দিয়ে প্রিয়ার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাদী হরিণটা। কিসের শব্দ দু'জনেই সরে গেল বনের অন্তরালে।

কৃষ্ণার কাছে কি এক স্তব্ধ আবেদন রেখে গেল ওরা। বনভূমির বুকে চলেছে পিয়াসন্দের পালাভিনয়। মাতাল করা বসন্ত— সব ভোলানো বসন্ত এসেছে বনে বনে।

আয়নায় নিজের দিকে চেয়ে আজ নিজেই আশ্চর্য হয় কৃষ্ণা। এখনও রূপ নিঃশেষ হয়নি তার। দু'চোখের কোণে আজ সে পরেছে কাজলরেখা। কচি কলাপাতা রঙের শাড়িখানায় মানিয়েছে বসন্তের কোন বনদেবীর মত। একরাশ চুল আজ সংযত করে খোঁপা বেঁধেছে— তার প্রথম কুসমিত রজনীগন্ধার গুচ্ছ ঠাঁই পেয়েছে সেখানে। অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে আজ নিজেকে রহস্যময়ী করে তুলেছে কৃষ্ণা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কামনা ব্যাকুল মরিয়মের দু'টি চোখ— সদ্যজাগর দেহের কোষে কোষে অতৃপ্ত কামনার জোয়ার। সন্ত্র-ব্যাকুল বনতলে হরিণ-দম্পতির প্রেমালাপ। পাতায় পাতায় ফুলগন্ধভারে আমন্থর বাতাসে জেগে উঠেছে আজ মিলন রাগিণী!

কি ভেবে বহুদিন পর অবার তানপুরাটা নামালো কৃষ্ণা। জীবনে একদিন ছিল সে পরম প্রিয়—কত সুখ-দুঃখের সঙ্গী। কত রাত্রের আকাশে সে ছড়িয়ে রেখেছে কামনাব্যাকুল মনের আর্তি, পাণ্ডুর বেদনার রঙে রঙীন করা কত দীর্ঘশ্বাস। আজ আবাব নামালো তানপুরাটা।

তারে জং পড়েছে নোনা হাওয়ায়। সুর বেঁধে নিতেও সময় লাগে।

জীবনের সব সুর ছন্দ এখানে সে হারিয়ে ফেলেছিল—অনেক চেষ্টা করে কৃষ্ণা সেই হারানো সুরের রেশ খুঁজে নিত। ম্লান আলোয় রহস্যময়ী আজ আবার সুরের ঝরনাধাবায় অবগাহন স্নান করতে বসে। এ কোন্ অতীতের কৃষ্ণা বর্তমানের বুকে জেগে উঠেছে।

হঠাৎ সুব শুনে অসীম একটু বিস্মিত হয়।

কাজ সেরে ফিরছে বাংলোয়, এই পরিবেশে সুরটা আজ যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। চাঁদের আলোয় ঢাকা বনভূমির বুক থেকে ভেসে আসছে রাতজাগা পাখির ডাক, কোকিলগুলো পাল্লা দিয়ে ডেকে চলেছে, বাতাসে অজানা ফুলের সৌরভ, মন তার ভরে ওঠে অপূর্ব বোমাঞ্চে। সুবের নাম ধাম জানে না অসীম। তবু মনে হয়, বসন্তেব বাতাসে বনভূমি যে বাণী ফুটিয়ে তোলে গাছে গাছে, পত্রমর্মরে কৃষ্ণার সুরে সেই আর্তি, সেই বার্তাই প্রকাশ পায়।

নীববে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল অসীম। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কৃষ্ণার দিকে। ওকে যেন চেনাই যায় না। অপরূপ সাজে সেজেছে সবুজেব আবরণে সুরে সুরে বসন্তেব প্রকাশ। জানালার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে বাসন্তী চাঁদের এক ঝলক আলো। সমস্ত পরিবেশটা এক বিচিত্র মাদকতায় ভরে উঠেছে। ও যেন সে কৃষ্ণা নয় অন্য কোন জগতের এক স্বপ্ন-পশারিণী।

মুগ্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে অসীম। কৃষ্ণা আজ তার কাছে দূর আকাশের তারা—ধরা তাকে যায় না। মনের গহন গোপনে তার আনাগোনা।

হঠাৎ চমকে ওঠে অসীম। খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে কি যেন চকচকে একটা বস্তু উঁকি মারছে, এগিয়ে আসছে—আবার থামছে। আবার এগিয়ে আসছে ধীর শান্ত গতিতে। চোখে আলো পড়তেই নীল মুক্তার মত জ্যোতি বের হয়। চমকে ওঠে অসীম। বিষধর 'কিরেত' সাপ। তীব্র বিষ ওর। কুটিল হিংস্র গতিতে ধীরে ধীরে জানালা দিয়ে ঢুকছে, বন থেকে কোনরকমে এসে পড়েছে এখানে।

এ সময় কৃষ্ণাকে ডাকলে হকচকিয়ে গিয়ে একটা কাণ্ডই বাধিয়ে বসবে। নীরবে ইতিকর্তব্য স্থির করে নেয় অসীম।

কৃষ্ণা এ জগতের অনেক উর্ধ্বে কোন কল্পলোকের গহিনে ডুবে গেছে। সেখানে নেই দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়ার ব্যর্থতার বেদনা। সুরের বর্ণালীতে স্বর্গীয় সুষমায় সে জগৎ ভরা।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে চমকে ওঠে সে।

হাত থেকে ছিটকে পড়ে খাটের নীচে শক্ত কাঠের মেঝেতে তানপুরাটা—ঝন ঝন করে ছিঁড়ে গেল উদারার তার, আর্তনাদ করে উঠে কৃষ্ণা। কচি কলাপাতার রঙে শাড়িতে ছিটকে এসে লেগেছে রক্তের দাগ। মেঝের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে! মৃত্যুনীল সাপটা আর কিছু না পেয়ে আহত অবস্থাতেই তানপুরাটার লাউ-

এ ঠোকর মারছে—তীব্র উপশচিক সে আস্ফালন, শব্দ উঠছে ঠক্‌ঠক্‌।

অসীমের গুলিতে পড়ে গেছে সাপটা। নিতাই বুনোর সড়কির ঘায়ে স্তব্ধ হয়ে গেল তারপর। তানপুরাটার খোলে ঢুকে গেছে সড়কির ডগা, সাপটাকে গেঁথে ফেলেছে সে। তখনও নড়ছে, দেহটা মুচড়ে উঠছে।

কৃষ্ণা ভয়ে কাঠ হয়ে দরজার সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে— পা দুটো কাঁপছে তার। কি বিপর্যয় ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। ব্যর্থ হয়ে গেছে আজকের এই অভিসার সাজ। তার সব আবেদন নিবেদন নিষ্ঠুর হাতে কে যেন প্রত্যাখ্যান করেছে। মেঝেতে পড়ে আছে তানপুরাটা দু'টুকরো হয়ে—ছিটানো রয়েছে রক্তরেখা। নিষ্ঠুরভাবে কোন দেবতা তার সমস্ত পূজা উপচার দলিত মথিত করে দিয়েছে—ব্যর্থ বঞ্চিত করেছে তাকে বার বার।

অসীম ওর দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে কাছে টেনে নিতে যায়। কৃষ্ণা বাধা দেয়। ওর মনের সব সুর কেটে গেছে— ঘুচে গেছে মিলন পিয়াসার মোহ। সামনে রূপ ধরে এসেছে সেই করাল মৃত্যু যে তাকে বার বার বাধা দিয়েছে এই নিভৃত নীড় রচনায়। হাতটা সরিয়ে নিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।

—কৃষ্ণা! অসীম যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে ওর অপরূপ রূপের সামনে। তার কি মহান সৌন্দর্য ফুটে উঠেছিল কয়েকটি মুহূর্ত পূর্বেই। সেই অধরার জন্য এই জ্যোৎস্নামাতাল চৈতী রাতে তার মনও বভুক্ষু হয়ে ওঠে।

কিন্তু সাড়া দেবে কে? বার বার যে দূর থেকে ডাক দেবার জন্য, ধরা দিয়ে নিশ্চিহ্ন হবার জন্য অভিসারিকা সেজেছে— সেই মন আজ আর নেই।

ছিন্নতন্ত্রী বীণার মত সে আজ ব্যর্থ, বঞ্চিত হয়েছে সেই অপরূপ মিলন রাগিণীর স্বাদ হতে। কাঁপছে কৃষ্ণা থর থর করে। আর্তনাদ করে ওঠে।

এখান থেকে নিয়ে চলো আমাকে।

—ভয় কি! অসীম ওকে কাছে টেনে নেয়। এ স্পর্শ অনুভব করবার মত মানসিক অবস্থা আর নেই কৃষ্ণার।

কুকুরটা গর গর করছে, মাঝে মাঝে চিৎকার করছে রুদ্ধ আক্রোশে। নীরবে বের হয়ে গেল কৃষ্ণা এ ঘর থেকে।

মরিয়মের ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়ে এসেছে চাঁদের আলো! লুকোচুরি খেলছে নির্লজ্জ চাঁদ ভাঙা ঘরের মাঝে— ছাউনির ছনের ফাঁক দিয়ে ওদের দিকে চেয়ে আছে।

জীর্ণ শয্যা আজ সার্থক হয়েছে। ইরফানের বলিষ্ঠ পেশীবহুল বুকের ভাঁজে মরিয়ম লুকিয়ে আছে। তার ঘুমন্ত কচি মুখে অপূর্ব প্রশান্তির ছায়া। নরম হাত দুটো দিয়ে বলিষ্ঠ ওই যাযাবরকে বেঁধে ফেলতে চায় মরিয়ম, নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে সার্থক হতে চায় সে ওর মধ্যে। ইরফান চাপা সুরে বলে ওঠে—ঘুমিয়ে গেলি নাকি?

—উঁহু! চোখ মটকে মাথা নাড়ে মরিয়ম। এত তৃপ্তি, শান্তির স্বাদ সে ঘুমিয়ে পড়ে হারাতে চায় না। ইরফান চেয়ে থাকে ওর ডাগর দু'চোখের দিকে।

হাসে মরিয়ম—হাঁ করে কি দেখছিস কি?

— তোকে দেখে দেখে আশ মেটে না যে! আশমানের চাঁদ নামছে আমার ঘরে।

ওর গালে চিমটি কাটে মরিয়ম—বড্ড ঝুট্‌ কথা কস্‌ তুই।

আরও নিবিড় করে তাকে কাছে টেনে নেয় ইরফান।

চাঁদের আলোয়, আকাশে বাতাসে কি যেন এক সুরের প্লাবন বয়ে চলেছে।

—রাতে ঘুম আসে না কৃষ্ণার। অতৃপ্ত কামনা, পুঞ্জীভূত ব্যথা। প্রতিবাদের রূপ ধরে গুমরে ওঠে তার

মনে। রাগটা পড়ে অসীমের উপরই। প্রতি মুহূর্তেই এমনি বঞ্চনা, এই ব্যর্থতা তা অসহ্য হয়ে ওঠে। এই মৃত্যু-ফাঁদ থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে চায়।

অসীমের কাজের চাপ বেড়েছে। তার সীমানার তিনদিকেই নদী খাল। সমস্ত জমি উঁচু ভেড়ির বাঁধ দিয়ে লোনা জলের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করা আছে। ভিতরের জল বের হয়ে যাবার জন্য গেঁথে তুলেছে লক্‌গেট। সমস্ত ভেড়ির বাঁধ এই সময়ই মেরামত করে রাখতে হবে, বৃষ্টির জল পড়লে আর বাঁধ দেওয়া সম্ভব নয়। তার উপর আকাশে ছিটে ছিটে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে।

বৈশাখের আগমনী। বাতাসে এসেছে গ্রীষ্মের খররৌদ্রের তাপ। মাঠে দাঁড়ানো যায় না। গরমে ঘেমে নেয়ে ওঠে। তবু কামাই নেই—ছুটি নেই অসীমের। এই তার শেষ প্রচেষ্টা। সার্থকতা—না হয় সর্বনাশ। নতুন উদ্যমে লেগেছে অসীম। সমস্ত জমি চারবার করে উল্টে পাল্টে ম্যানিওর দিয়ে তৈরি করে ফেলতে হবে। ওদিকে অপেক্ষাকৃত ভালো জমিতে ছিটোন হচ্ছে ধান। বীজ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বীজধান বেছে রেখেছে অসীম নিজে। সামান্য লোনা জলের স্পর্শ সহ্য করতে পারবে সেগুলো। এর পরমায়ু সাধারণ ধান থেকে বেশি আর কষ্টসহিষ্ণুও। বাড়-বাড়ন্ত বেশি।

সারাদিন তার সময় নেই। ট্রাক্টার চলছে পুরোদমে। অসীম ল্যাবরেটরির কাজ, মাঠ আর বাঁধ মেরামত করতে করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে, তবু পরিশ্রম করে যাচ্ছে সে। এই তার শেষ প্রচেষ্টা। হয় ভাগ্য ফিরবে, না হয় সেও ভেসে যাবে জীবনের কুটিল আবর্তে।

তবু সেই দুশ্চিন্তার কালোছায়া কৃষ্ণা কোনদিনও তার মুখে দেখতে পায় নি। অসীমও কোনদিন প্রকাশ করেনি এই জীবনপণ-ব্রতের কথা।

কৃষ্ণা নিজের জগৎ, নিজের চাওয়া-পাওয়া-ব্যর্থতা নিয়েই মশগুল। উর্ণ-নাভের মত নিজের চারিপাশে সেই কাল্পনিক মনোবেদনার জল যতই বুনে চলেছে, পাকে পাকে ততই জড়িয়ে পড়েছে নিজের অজ্ঞাতসারে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের দুটো আলাদা জগৎ—পরস্পব সেখানে তারা নিতান্ত অপরিচিত। ব্যবধানও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে দু'জনের।

খুব সকালে কৃষ্ণাকে উঠে আসতে দেখে অসীম অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। সারারাত ঘুমোয়নি কৃষ্ণা, ঘুমোতে পারেনি। বার বার চোখের সামনে জেগে উঠেছে এখানের আতঙ্কর ছবিগুলো। বিষাক্ত সাপটা যেন যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছে। এই পরিবেশে উন্মাদ হয়ে যাবে সে।

আজ তৈরিই হয়েছে কৃষ্ণা। সে বাঁচতে চায়—সরে যেতে চায় এখন হতে।

পোশাক পরে নামতে যাবে, —কৃষ্ণা বলে ওঠে—আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও।

দুচোখে ওর ক্লান্তির ছাপ। পথ আটকে দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণা।

—কেন?

বাধা পেয়ে একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে অসীম। কি যেন ন্যাকামি করছে কৃষ্ণা।

বলে ওঠে অসীম— কলকাতা যাবে! কেন! তার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

কৃষ্ণার দিকে চেয়ে থাকে, ও চলে যেতে চায়। বার বার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেও পারেনি অসীম। গত রাত্রের সেই সুরজগতের অধরা নারীই তার সম্মুখে সকালের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে— যাকে ধরে রাখার সামর্থ্য তার নেই।

—এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠছি। দৃঢ়তা ফুটে বের হয় কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে। অসীম কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,

—এখন কি করে সম্ভব। চারিদিকে কাজের চাপ, এক মুহূর্তও সময় নেই আমার।

তবে কি বন্দী হয়ে থাকতে হবে আমাকে! কৃষ্ণা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কি যেন কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল অসীম। এদিকের সর্বনাশ ঘটতে দিতে পারবে না সে। সমস্ত শক্তি দিয়ে এ বৎসর কাজ করবে সে— শেষ চেষ্টা। কিন্তু কৃষ্ণা ওসব বুঝবে না।

বেদনাহত ব্যর্থ দৃষ্টিতে অসীম ওর দিকে চেয়ে থাকে। যাকে পাশে চেয়েছিল সঙ্গী হিসাবে, আজ সেই-ই যে তার বোঝা হয়ে উঠবে তা ভেবে দুঃখই পেয়েছে অসীম। আপাততঃ প্রসঙ্গটা চেপে যায়।

—আচ্ছা, দেখি ভেবে। জুতোর শব্দ তুলে নেমে গেল নীচে। কৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রুদ্ধ আক্রোশে মনে মনে ফুলতে থাকে সে। অসীম ইচ্ছা করেই তাকে এড়িয়ে গেল। সহজে যেতে না দেয়— জোর করেই যাবে সে। এখানে থাকলে বাঁচবে না, এই নিঃসঙ্গ একক জীবন তার সমস্ত দেহ-মন-চিন্তাকে কুরে কুরে ধ্বংস করে দেবে। সেও বাঁচতে চায়। মানুষের সমাজে— মানুষের মাঝে আশ্রয় চায়।

দুপুরের ক্লান্ত নির্জনতায় ফুঁসছে কৃষ্ণা। হঠাৎ কিসের শব্দ।

নিতাই বুনোকে সামনে দেখে বিস্মিত হয় কৃষ্ণা। এ সময় কুলি কামিনরা সবাই গেছে মাঠে। বাংলোতে এক অতুলই ব্যস্ত থাকে কাজকর্ম নিয়ে। ওপাশে বাওয়ালিদের ছাপড়িতে ছেলেমেয়েগুলো কলরব করছে। নিতাই বুনো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে দাঁড়ালো। কৃষ্ণার সারা শরীরে অজানা শিহরণ খেলে যায়। লোকটার দু'চোখে কি এক পাশব হিংস্রতা। নদীতে সেদিন বিশ্রী কুমিরটার চোখেও ঠিক এমনি লালসা দেখেছিল কৃষ্ণা।

সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ঘুরে দাঁড়ালো কৃষ্ণা— কি চাই?

চেয়ে রয়েছে নিতাই ওর দিকে। একটি মুহূর্ত।

তরুণ যৌবনের সেই বিদ্রোহিনী যেন অজ্ঞাতসারেই বের হয়ে আসে অতীতের ধ্বংসস্তূপ ঠেলে সরিয়ে।

নিতাই বলে ওঠে—বাবু আছেন? একটু দরকারে এসেছিলাম।

হাসছে জানোয়ারটা। ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

— নেই। মাঠে গেছেন। কৃষ্ণা জবাব দেয়।

কি ভেবে নিতাই নেমে গেল নীচে।

তার ধূলি-ধূসর বলিষ্ঠ দেহটা মিলিয়ে গেল বাঁকের মাথায়। বেশ ভালো করেই দেখল কৃষ্ণা—নিতাই মাঝে মাঝে পিছন ফিরে কি যেন লক্ষ্য করছে এই দিকে। ঘরে-বাইরে চারিদিকে এখানে পশুর প্রাধান্য। নিতাই বুনোও বাদ যায় না। বন্যজানোয়ারদেরও সমগোত্রীয় ও।

অসীম যেন ওকে পাহারায় রেখে গেছে। তার উপর সতর্ক নজর। অপমানিত কৃষ্ণা বারান্দায় পায়চারী করে নিষ্ফল আক্রোশে। দিন আর শেষ হয় না।

বৈকালের পড়ন্ত বেলায় বারান্দায় বসে আছে। হঠাৎ নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেদ করে কানে আসে একটানা ইঞ্জিনের শব্দ। আদিম আরণ্যক নির্জনতা মানুষের আধুনিকতম বিজ্ঞান শক্তির মত্ত গর্জনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। দূরে দেখা যায় ছোট্ট একটা লঞ্চ। দ্রুতগতিতে হরিণগাড়া নদীর দিগন্ত-প্রসারী জলরাশির বুক চিরে এগিয়ে আসছে। এই দিকে এগিয়ে আসছে স্বচ্ছন্দ গতিতে। নদীর বুকে সফেন তুফান তুলে।

নেহাৎ কৌতূহলবশেই চেয়ে থাকে কৃষ্ণা ওই দিকে।

মাঝে মাঝে দু'চারজন আসে, পথ-ঘাটের নদীর হদিস নিতে। না হয় এসে বলবে, খাবার জল ফুরিয়ে গেছে, জল দাও। বিপদে পড়েই আসে এরা। তবুও ক্ষণিকের জন্য দেখতে পায় বিদেশী মানুষকে। দূর জগতের সংবাদ নিয়ে আসে ওরা এই প্রাণহীন দেশে। সভ্য মানুষের কথা জানতে পায়, চাই কি টাটকা খবরের কাগজও মিলতে পারে।

আশাভরে চেয়ে থাকে ঘাটের দিকে! লঞ্চটা তাদের ঘাটেই এসে থেমেছে।

লঞ্চ থেকে নেমে হ্যাটপরা একজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। পিছনে রয়েছে সরকারী পোশাকপরা একজন সারেঙ্গ। বোধহয় ফরেস্ট রেঞ্জারই হবেন উনি। ভেড়ির এপারে বসে তাদের বাংলোর সীমানায় ঢুকলেন। হ্যাটপরা দীর্ঘ লোকটি এগিয়ে আসছেন বাংলোর দিকে।

কৃষ্ণা চমকে ওঠে।

সারা দেহ মনে বয়ে যায় বিচিত্র এক অনুভূতি। চোখের সামনে যেন কি এক অসম্ভাব্য অঘটন ঘটতে দেখছে কৃষ্ণা।

এক মুহূর্ত! বনে বনে ঝড় উঠেছে। ক্ষেপে উঠেছে নদী—কৃষ্ণার মনে তারই উতরোল সুর।

—তুমি! কাঠের সিঁড়িগুলো বেগে টপকে নেমে এসে নবাগতের পাশে দাঁড়াল কৃষ্ণা। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। সুগৌর মুখে ফুটে উঠেছে স্বেদরোগ। খুশিতে উপচে পড়ছে কৃষ্ণা কচি খুকীর মত।

—তুমি আবার বনবাসে এসেছো কোন্ দুঃখে?

স্তব্ধ হতচকিত হয়ে উঠেছে প্রণব। সেও এই গহন অরণ্যসীমায় কৃষ্ণার মত মেয়েকে দেখবে— স্বপ্নেও ভাবেনি।

দু'জনেরই বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ সময় যায়। কৃষ্ণার চোখে আজ বনভূমির দিগন্ত প্রসারী নদীর রূপ বদলে গেছে। প্রণবের দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। প্রণবও বিস্মিত হয়ে উঠেছে।

—বসবে চলো, দাঁড়িয়ে রয়েছো যে হাঁ করে!

—হ্যাঁ! যাই।

প্রণব সারেঙ্গকে লঞ্চে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করে ওপরে উঠে এল।

—বাঃ, বারান্দাটি তো চমৎকার, যতদূর চোখ মেলে চাও নীল জল আর সবুজ বন। প্রণব দূর দিগন্তেব দিকে খুশি ভরা চোখে চেয়ে থাকে।

কৃষ্ণাও মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রণবের দিকে চেয়ে রয়েছে।

ছেলেদের বয়স যৌবনের সঙ্গে হাত মিলিয়েই চলে। অতর্কিতে বিনা পরোয়ানার বয়স ওদের দেউলের খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য করায় না। ওদেব যৌবন মৌসুমী ফুল নয়। কিছু স্থায়িত্ব তার আছে— সেই সঙ্গে থেকে যায় কিছু সৌরভও।

প্রণবের দেহমনে আজ যৌবনের প্রবাহ। কৃষ্ণা নিজের দেহের দিকে চেয়ে সেই অনুভূতির স্বাদ পায়নি, মনে মনে যেন অনুভব করছে— সেই স্বপ্ন-দেখা মন সে হারিয়ে ফেলেছে কোন্ অতীতের বুকে। একটু চেষ্টা করে তবে তার সন্ধান মেলে।

প্রণব ওর দিকে চেয়ে আছে ধীর স্থির পলকহীন চাহনিতে। হারানো কৃষ্ণা — সেইদিনের নর্ম সহচরী কৃষ্ণা আজ এমনি অসীম নির্জনতার মাঝেও তার জন্য ক্ষণিকের স্মরণীয় জগৎ গড়ে রেখেছে। সেই সত্য আজ অনুভব করে মনে মনে।

—হঠাৎ এখানে? প্রশ্ন করে কৃষ্ণা।

প্রণব বলে ওঠে— হঠাৎ নয়, বর্তমানে এই রেঞ্জের ইন্‌চার্জ হয়ে এসেছি। বনবাসে থাকতে হবে। সরকারের বন পাহারাদার— ইজারাদার যা হয় বলতে পারো। ঘুরতে বেরিয়েছি আজ।

প্রণব কথাটা বলে হাসতে থাকে।

কৃষ্ণার কথাটা যেন মনঃপূত হয় না। সবাই যেন বনরাজ্যেই এসে পড়েছে। কণ্ঠস্বরে হতাশা ফুটে ওঠে তার। শেষকালে এই চাকরিই নিলে? প্রফেসারি—অফিসারি মানুষের জগতে কোন কিছুই জুটলো না।

—কই আর জুটলো? তাই বনবাসীই হলাম। জবাব দেয় প্রণব।

—তবে শুনেছি, বনের চাকরিতে যথেষ্ট মধু আছে। রেঞ্জ অফিসারবা তো বেশ গুছিয়ে নিয়ে যান।

কৃষ্ণা হাসতে থাকে প্রাণখুলে অনেকদিন পর।

প্রণব ও কথার উত্তর দিল না কিছু। অসীমবাবু যে এখানে আবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সে জানতো না। আজ সব কিছু দেখেশুনে বিস্মিত না হয়ে পারে না। বিরাট কাণ্ড -করবার আয়োজন করে বসেছেন তিনি। একটা বৎসর যদি নির্বিবাদে ফসল তুলতে পারেন— বেশ কিছু টাকা মুনাফাই হবে। শুধু তাই নয়, একটা স্মরণীয় কীর্তিই রাখবেন তিনি।

—কেমন আছো? প্রণব প্রশ্ন করে।

মুখ তুলে চাইল কৃষ্ণা। দীর্ঘ আয়ত চোখে ফুটে ওঠে ক্লান্তিময় চাহনি, পাণ্ডুর বেদনার আভা। হতাশায় ভরা সে চোখ। মুখে চোখে তার অসহায় ভাব। সেই না-বলা ভাবা জানবার ইচ্ছা কি প্রণবের কোনদিনই হবে না?

একটু নীরব থেকে বলে ওঠে কৃষ্ণা—ভালোই, কেটে যাচ্ছে কোনরকমে।

প্রণব ওর দিকে চেয়ে আছে, কেমন যেন দূরের মানুষ মনে হয় আজ কৃষ্ণাকে। বিশাল নদী-অরণ্যানীর বুকে ম্লান আলো জেগেছে। ওই আলোয় আজ নতুন করে কৃষ্ণাকে দেখে। বেদনাহত দুচোখ মেলে চাইল কৃষ্ণা ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে যেন আর্তনাদ করে ওঠে সে।

—বড্ড একা প্রণব।

বিশাল বিশ্বে হারিয়ে গেছে তার কৃষ্ণা।

আর্তি ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠে। প্রণব চমকে ওঠে— সেই ডাক! কত বিস্মৃত স্বর্ণসন্ধ্যা ওই সুরে সুরে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। প্রণবের তরুণ কিশোর মনে সুরস্পর্শ এনেছিল অজানা লোকের আহ্বান। কৃষ্ণাকে সে ভোলেনি— ভুলতে পারেনি।

মনের সৌরভমদির জগতের প্রধান, প্রথম একক নায়িকা সেই। চুপ করে বসে কি যেন ভাবছে প্রণব। সারা মনে তার তুফান উঠেছে।

কৃষ্ণা নীরবে বসে আছে। পড়ন্ত রোদ বনসীমা রাঙ্গিয়ে তুলেছে বর্ষা শেষের করুণ রাগে। বিদায়ী ব্যর্থ বসন্তের কান্নায় আকাশ বাতাস রোদনময়।

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল।

— কোথায় যাচ্ছ?

হাসে কৃষ্ণা— আসছি।

ইতিমধ্যে অতুল চা খাবার তৈরি করে ফেলেছে। ডিমের মামলেট, চিঁড়ে ভাজা আর চা। প্রণব হাসবার চেষ্টা করে।

—জঙ্গলের মধ্যেও এসব জোগাড় করলে এরই মধ্যে।

হাসে কৃষ্ণা—এই জঙ্গলেই যে আমাকে বাস করতে হয়। নাও—চা বোধ হয় জুড়িয়ে গেল।

অসীম তখনও ফেরেনি। আজ দূর মাঠে কাজ হচ্ছে। নিজে দাঁড়িয়ে না থাকলেই বুনো কুলির দল ফাঁকি দেবে। ভেড়ির বাঁধ পোক্ত না হলে নিজেরাই লোনা জলে নাকানিচুবানি খেয়ে অপঘাতে মরবে সেও ভালো, তবু ঠিকমত কাজ করে আত্মরক্ষার উপায় করে রাখাটাও তাদের স্বভাবের বাইরে। এমন বুনো জাত নিয়ে অসীম হাঁপিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। তাই সর্বদাই নিজে তদারক করে প্রতিটি কাজের।

প্রণব বলে ওঠে—কই, তিনি কোথায়?

কৃষ্ণা জবাব দেয়—মাঠে কাজ হচ্ছে, তিনি সেখানেই রয়েছেন।

— বেশ আছো দেখছি।

প্রণবের কথায় ওর দিকে চাইল কৃষ্ণা। প্রণব যেন এইবার কিছুটা টের পেয়েছে তার জীবনযাত্রাব ধারার। দুজনের পথ মত আলাদা— এই সত্যটা যেন প্রকাশ পেয়েছে।

—ও কি! গানও খতম করেছো?

মেঝের নীচে এক জায়গায় গাদা করা আছে তানপুরার ছিন্নভিন্ন খোল, তারগুলো। ওগুলো সারাবার আর প্রয়োজন হয়নি। কৃষ্ণা প্রণবের কথায় জবাব দিল না।

ওর দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করল মাত্র। পাণ্ডুর মলিন একটু হাসি, সব সুর ছিঁড়ে গেছে তার, সব আনন্দ প্রশান্তি যেন নিঃশেষে বিদায় নিয়েছে তার জীবন হতে।

অস্পষ্টতর হয়ে আসে দিনের আলো। পশ্চিম প্রান্তে মুঠো মুঠো আবীর ছিটিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছে কোন দামাল ছেলে—মুখ, গাল, কপাল। পাখির দল শূন্য আকাশ কলরবে ভরিয়ে তোলে। আলোর দিন শেষ হয়ে এল।

উঠে দাঁড়াল প্রণব—আজ চলি কৃষ্ণা।

—আবার আসবে কিন্তু। একদৃষ্টে প্রণবের দিকে চেয়ে থাকে স্থির নিষ্কম্প চাহনিতে।

—আসবো। আমিও তো বনবাসে।

এগিয়ে এল কৃষ্ণা নদীর তীর অবধি। ওরা চলে গেল। স্থির লাল জলে তুফান তুলে এগিয়ে চলেছে লঞ্চটা মানুষের বসতি পানে। একা পড়ে রইল সে।

ওপারের দিগন্তপ্রসারী স্তব্ধ বনসীমায় নেমেছে সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার— এপারের লতাকুঞ্জে তারই স্পর্শ। ভিজে বাতাস আর রজনীগন্ধার সুবাসে ভরে উঠেছে চতুর্দিক। প্রণবের মুখখানা ভেসে ওঠে কৃষ্ণার মনে—অকারণে। নিবিড় তৃপ্তির ইশারা দেখে কৃষ্ণা। এই জীবন সহ্য করতে পারবে সে, পাশাপাশি আর একজন যেন তার রয়েছে—এই ভাবনাই তাকে নির্ভরতা এনে দেয়।

অসীম ফিরছে মাঠ থেকে। সন্ধ্যার আগেই এসে বাংলোয় পৌছতে হবে। হাতে সেই নাল বাঁধানো লাঠিই সম্বল। অন্য কোন অস্ত্র আনেনি!

মরা ভাটিতে গাং-এর গভীর খাদ বের হয়ে পড়েছে।

এই সময় দু'একটা বাঘ মরা ভাটিতে খাল পার হয়ে এপারের ক্ষুদ্র বসতির দিকে আসা-যাওয়া করে— যদি কিছু শিকার মেলে তারই আশায়। সারাদিন আগুন তাপের মত রোদে ঝল্‌সে ওঠা মাটির গহ্বরে লুকিয়ে থেকে রাতের হিমেল বাতাসে দম নিতে উঠে আসে গোখরো কেউটে, কিরেত সাপগুলো।

দিন আর রাতের মোহনা—বনবাজ্যেব এ সময় রূপান্তর ঘটে। জেগে ওঠে তার শ্বাপদরূপ।

দ্রুতবেগে আসছে অসীম।

হঠাৎ বুড়ো পুবন্দবকে দেখে থমকে দাঁড়াল সে। একলা এই অন্ধকারে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে বিস্মিত হয়, একটু মাথার গোলমাল আছে ওর—সবাই জানে। এককালে বনর্বিধির দেওয়াসী ছিল। সাঁইদার— মাঝি মাল্লারা আসত। মুখবন্ধন—গাবন্ধন করে দিত। নদীর ধারে ঘনবনের সাঁইদার ওই পুরন্দর।

আজ বনে গেছে—পুবন্দরও এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

ইচ্ছে হল গরু বাছুব দেখাশোনা কবল গোয়ালে, নযতো কিছুই কবল না, সাবাদিন! আপন খেযালেই ঘুরে ঘুরে ক'টাল নদীব ধাবে গজিয়ে ওঠা শিশু-কেওড়া-গরান বনে। আপনাব মনেই বিড় বিড় করে কি বলে, আব হাসে হা হা কবে।

কৃষ্ণা একদিন ওই হাসিতে বিবক্ত হয়ে ওকে দূব করে দিয়েছিল বাংলো থেকে। নিতাই বুনোর দূর সম্পর্কের কি যেন কাকা হয়। সেই-ই বলে কয়ে রেখেছে আবার।

অসীম একটু বিস্মিত হয় এ সময তাকে এখানে দেখে।

—কি হচ্ছে এখানে? অসীম ওকে দেখে এগিযে এসে প্রশ্ন করে।

পুবন্দব চমকে ওঠে। দাড়ি গোঁফের আড়ালে জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ।

বীজধান ফেলবার জন্য জমি চায দিয়ে রেখেছে। কিছু জমিতে ছড়ানো হয়েছে বীজধান। সেই ক্ষেতের ধাবে ধারে আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুড়ো। অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখা যায়— জলো হাওয়ায় উড়ছে শননুড়ির মত চুল, দাঁত একটাও নেই, লাল মাড়িতে হাসির বিশ্রী রূপ ফুটে ওঠে। অসীমকে দেখে কাপড় ঢাকা কি যেন লুকোবাব চেষ্টা করে বুড়ো। পায়ে পায়ে সরে যাবার চেষ্টা করতে থাকে।

—কি করছিস? অসীম সামনে এসে দাঁড়াল।

হাসছে বুড়ো—বড় গরম বস্তিতে, তাই হাওয়া খাতি এয়েলাম। বনের বসন্তের হাওয়া—বড় মিঠে সাহেববাবু।

—হুঁ! এদিকে বাঘে খাবে যে তোকে?

বিস্মিত হয়ে ওঠে বুড়ো—আমাকে! আমাকে ধরুতি পারবে বড় শিয়ালে? ধ্যাৎ! হাসতে থাকে আপন মনে আর মাথা নাড়ে। হুঁ, হুঁ বাবা, এই বাদাবনে জন্মতক ঘুরছি—সাঁইবাবা দক্ষিণ রায়ের পুজো করি কি অমাবস্যা পূর্ণিমার কোটালে, ওসব আমাব বশ— বুঝলা সাহেববাবু! দেহ বন্ধন, মুখ বন্ধন—

হাসছে অদ্ভুতভাবে। বিরক্ত হয়ে চলতে থাকে অসীম।

বাংলোর বারান্দায় আলো দেখে একটু বিস্মিত হয়। এতদিন এই সময় কৃষ্ণা ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেয়। আজ অপেক্ষা করছে বারান্দায়—হয়তো তাব পথ চেয়েই বসে আছে।

শোঁ শোঁ হাওয়া কাঁপে বনে বনে।

নদীব বুকে তারই আলোড়ন। সাবা ধবিত্রী নির্জন রাতে আঁধারে কোথায় হারিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে

একা অসীম। মনের সব কমনীয়তা এমনি একলার মাঝে জেগে ওঠে। আজ কৃষ্ণার জন্য দুঃখ বোধ করে সে। নিজেই এর জন্য দায়ী!

কি এক সমবেদনায় ভরে ওঠে আজ অসীমের মন। সত্যি, কৃষ্ণা বড় একা এখানে; তাই হয়তো হাঁপিয়ে উঠেছে। বন্দীই করে রেখেছে সে তাকে—ওর মুক্ত অবাধ মনকে।

এগিয়ে এসে বাংলোয় উঠলো। কৃষ্ণা চেয়ে থাকে ওর দিকে।

—একাই বসে আছো? অসীম ওর হাতখানা তুলে নেয় নিজের হাতে। ওর দিকে চেয়ে থেকে আজকের কথাটা চেপে যায় কৃষ্ণা।

—এত দেরী হল যে? কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে মাধুর্য এসেছে।

—একটু কাজ সারতে হল কিনা! কৃষ্ণার দিকে চেয়ে থাকে অসীম। আজ ওর মুখে চোখে কি এক আনন্দের আভাস ফুটে উঠেছে। অতীতের সেই চঞ্চলা কৃষ্ণা যেন আবার ফিরে এসেছে তার সামনে।

কাছে টেনে নেয় তাকে অসীম। আজ আর বাধা দেয় না কৃষ্ণা। মনে তখনও বৈকালের সেই অতৃপ্ত কামনার রেশটুকু করুণ সুরের মূর্ছনার মত লেগে রয়েছে। কেমন যেন ভালো লাগে এই স্পর্শটুকু।

—বড় একা মনে হয়, না? ওর চুলে বিলি কাটছে অসীম।

ওর প্রশ্নে মুখ তুলে চাইল কৃষ্ণা, নীরব চাহনিতে চেয়ে থাকে তার দিকে।

কথা বলে না, সারা মন দিয়ে ওই তৃপ্তিটুকু অনুভব করে।

অসীম বলে—কলকাতা যেতে ইচ্ছে হয় ঘুরে এসো মাসখানেক এই সময়। বর্ষা নামলে আর পারবে না।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কৃষ্ণা তার দিকে। সকালে কথাটা কৃষ্ণাই পেড়েছিল। কিন্তু এ বেলায় সেই কৃষ্ণা আর নেই।

বর্ষার করাল রূপ এখানে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিকে দুস্তর নদীর প্রহরা পার হয়ে মানুষ যাতায়াত করতে পারে না। অন্যদিকে ফুটে ওঠে প্রণবের হাসিমাখা মুখখানা—কি এক বনজ্যোৎস্নার মাদকতাময় চাহনি। জীবনের সব অতৃপ্ত দৈন্য ভুলিয়ে দিতে পারে সে। বনভূমি নদী—সব কিছু আজ সুন্দর হয়ে ওঠে কৃষ্ণার কাছে।

—আচ্ছা পরে দেখা যাবে। কৃষ্ণা স্বামীকে বলে ওঠে।

অসীম ওর দিকে চেয়ে থাকে। মুগ্ধ বিস্মিত চাহনিতে।

কৃষ্ণাকে আজ সুন্দর লাগে— অপরূপা সে। কেমন যেন মধুর স্বপ্নবিহ্বল ওই দৃষ্টি। অসীমের মন ভরে ওঠে।

—চল, হাত মুখ ধুয়ে নাও।

কৃষ্ণা যেন অসীমের ওই চাহনি সহ্য করতে পারছে না আজ।

অসীম খুশিই হয় এই মত পরিবর্তনে। অজানা মনের কোন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। তার এই কঠিন দুস্তর সাধনায় কৃষ্ণাকে পাশে চায় সে। উষর মৃত্তিকায় জীবনের অঙ্কুর গড়ে তুলতে চলেছে সে। বন্ধ্যা প্রকৃতির বুকে ফসলের সম্ভাবনা আনবে পুরুষ, পাশে চাই নারী সহকর্মিনী রূপে।

অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে অসীমের দৃষ্টিতে।

কৃষ্ণা নিজের কাছে নিজেই আজ সঙ্কোচ বোধ করে। কোথায় কি যেন এক অপরাধের প্রথম সূত্রপাত হল তার মনে।

নিদারুণ ভুল। তবুও এ ভুলের মধুর অনুভূতিটুকু তার বঞ্চিত ব্যর্থ অন্তরদেশ গোপন অনুরাগে অনুরঞ্জিত করে তোলে। কৃষ্ণা তবু এইটুকু ছাড়াতে সাহস পায় না। আজকের প্রণবের খবরটা চেপে গেল ওর কাছে। সহজ কণ্ঠে বলে —

—চল, রাত্রি হয়ে গেছে অনেক।

—হ্যাঁ, যাই।

অসীম পোশাক ছেড়ে স্নান করতে যায়।

অতুল ওদিকে রান্নার আয়োজন সেরে ফেলেছে।

ওরা যদিও বা ডাঙ্গায় বাস করে, প্রণবের বর্তমান আস্তানা একটা নৌকায়।

বনবিভাগের নৌকা; দু'কুঠুরি ঘর তার দখলে, একটা অপিস, অন্যটায় তার শয্যা। পাশেই একটা ঝোলান পায়খানা।

নৌকার ওদিকটায় মাঝি মাল্লা, বেয়ারাদের থাকবার মত একটু ঘেরা জায়গা, মাঝখানে রান্নার উনোন।

বাওয়া যায় না—গাধাবোটের মত টেনে নিয়ে চলতে হয় নৌকাকে। ঝড় উঠলেই বিপদ, একাৎ ওকাৎ হয়— যে-কোন সময়েই উলটে যেতে পারে। পাশেই ক্যাপ অফিসারের নৌকো।

জায়গাটা একটা ছোট খাল, রায়মঙ্গল থেকে বের হয়ে এসে এদিকে দুস্তর হরিণগাড়া নদীতে পড়েছে। বড় গাং-এ নৌকা রাখা নিরাপদ নয়, তাই খালেই বসেছে দুদিনের নৌকা বসত। দুপাশে গভীর গহন বন। তারই বুক চিরে খালটা চলে গেছে। বন কাটাই হচ্ছে এখানে।

নদীর বুকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে কতকগুলো কাঠ, মহাজনের হাজার দেড় হাজারমণি নৌকা; তাতেই যে ক'জন বাওলিয়া আছে তারাই একমাত্র প্রতিবেশী। কাঠ কাটা ও বোঝাই হলে তারাও চলে যাবে, নতুন নৌকা আসবে আবার; বর্ষার মুখে নদী থেকে অপিস বোট চলে যাবে অপেক্ষাকৃত কাছের বনে। সেখানে আবার কাঠ কাটাই শুরু হবে।

ফরেস্ট অফিসারের মেজাজ আজ খুব ভালো। কয়েকজন বাওলিয়াকে ধরে এনেছে ক্যাপ অফিসার। বে-আইনী ভাবে সুন্দরী গাছ কেটেছে তারা।

ক্যাপ অফিসার শাসায়— জরিমানা দিতে হবে ব্যাটাদের।

অবশ্য সে জরিমানার টাকা কোনদিনই জমা পড়বে না সরকারী খাতায়। বালিশের মধ্যে, তোশকের মধ্যে টাকা গোঁজা থাকে। চোরের ভয়ে বাইরে অঢেল কাঁচা টাকা তারা রাখে না। প্রণব প্রথম প্রথম এইখানে এসে শিউরে উঠেছিল।

আজ বাধা দেয়—ছেড়ে দাও ওদের।

—সে কি স্যার? ক্যাপ ইনচার্জ একটু বিস্মিত হয়।

—গরীব মানুষ পেটের দায়ে এসেছে, ওদের আর জুলুম করো না।

প্রণবের কথায় অবাক হয়ে যায় ইনচার্জ।

হাত থেকে শিকার ফসকে গেল—বিরক্তই হয় সে।

আব কোন কথার অপেক্ষা না রেখে নিজের বোটে এসে রেডিওটা খুলে দিল প্রণব।

—আকাশবাণী কলকাতা। ব্যাটারি সেট রেডিওটা রাতের নির্জন অন্ধকারে বেজে ওঠে; কলকাতা কোথায় শ্বাপদ অরণ্যের গভীরে হারিয়ে গেছে।

কেমন যেন হাল্কা মনে হয় প্রণবের আজ। এই বনবাসে আসা তার সার্থক হয়েছে। কলকাতা বহুদূর; বহু নদী, বনের ওপারে কলকাতা; তা হোক— তবু এ নির্বাসন আজ মধুময় হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণাব মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রণবের।

ভাগ্যিস আজ খেয়ালবসেই লঞ্চ থামিয়েছিল, নইলে বোধ হয় অজানাই থেকে যেত এই সৌভাগ্য।

নৌকার ছাদে উঠে দাঁড়াল। থমথমে বনরাজ্য। হরিণের কর্কশ ডাক শোনা যায়। নিশুতি হয়ে গেছে চারিদিকে। মানুষগুলো যেন ভয়ে নৌকার খোলে ঢুকে পড়েছে।

জেগে ওঠে সুন্দরবনের আদিম আরণ্যক রূপ। তারা জ্বলছে আকাশে। বনে-বনে রাতের আঁধার, প্রণব একা যেন জেগে আছে এখানে। খুশির আভাস তার মনে।

ইরফান সত্যিই বাঁধা পড়েছে আজ মরিয়মের বাঁধনে। মরিয়ম নিজেও কাজ করে অসুরের মত অমিত শক্তিতে। গোলাঘরে সব ধান একা সিদ্ধ করে। একজন ঢেঁকিতে পা দেয় আর সে নিপুণ হাতে ধানগুলো

এগিয়ে দিতে থাকে। সারাদিনের কাজে যা রোজগার করে তাতে দু'জনের বেশ চলে যায়। ইরফানের রোজকার সে বাঁশের একটা খুঁটি ফাঁপা করে জমিয়ে তুলেছে গোপনে। মরিয়ম ঘর তোলার স্বপ্ন দেখে। নিজের ঘর। ইরফানকে কথাটা বলেনি, হেসেই উড়িয়ে দেবে কথাটা।

রাতের আবছা অন্ধকারে মরিয়ম নিজেকে লুটিয়ে দেয় ইরফানের বুকে। বাতাসে ভেসে আসছে রাতজাগা হাসনুহানার সুবাস। চালের উপর ফুটেছে কুমড়ো লাউফুল। ফলও ফলেছে অনেক।

ইরফান আদর করে তাকে। চুপ করে সেই স্পর্শটুকু অনুভব করে মরিয়ম।

—এত খাটিস কেন বল দিকি? আমি কি তোকে খাওয়াতে পারি না?

হাসে মরিয়ম—শুধু দুটো পেটের কথাই ভাবলি চলে?

—তবে আর কি? প্রশ্ন করে ইরফান।

এর বেশি কিছু তার মগজে ঢোকে না।

হাসে মরিয়ম— কেনে, আমার কি সাধ-আহ্লাদ নাই? নতুন ঘর তুলতি হবে না? চিরকালই কি পরঘরী হই থাকতি হবে!

কথাটা আজ না বলে পারে না মরিয়ম! চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

ইরফান ভেবেছে কথাটা। এই বর্ষার পরই ঘর তুলবে ওর রোজগারের টাকা জমিয়ে।

দুজনের চোখের তারায় সেই আগামী ভবিষ্যৎ-এর স্বপ্ন।

— বেশ তো কেমন ঘর বানাবো। ইরফানও মত দেয়।

—মিএগা, ও মিএগা, ঘরে আছো?

বাইরে থেকে কার ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে মরিয়ম। কে যেন ডাকছে। সোজা উঠোনে এগিয়ে এসেছে লোকটা। কেরোসিন কুপির ম্লান আলোয় চিনতে পারে ইরফান। সন্দেশখালির লালু শেখ—নাম করা মধু-মহাজন।

চমকে ওঠে ইরফান! মরিয়মও।

ওই লালু শেখই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে কতবার ইরফানকে তার বুক থেকে, কি এক মধুর নেশার মাতন দেখিয়ে। আজ আবার এসেছে লোকটা।

স্তব্ধ হয়ে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মরিয়ম। আজ তার মনে নতুন করে ঝড় উঠেছে।

—এসো মিএগা!

কুপির আলোয় মিএগা সাহেব এসে বসলো দাওয়ায়।

ইরফান ওর দিকে চেয়ে থাকে। কেমন যেন ঝড় ওঠে ওর সারা মনে।

আবার এলাম। সেবার বলেছিলি যাবো। হাঁরে?

জবাব দেয় না ইরফান।

লালু শেখকে দেখে ইরফানের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি সুন্দর ছবি।

গোসাবা, মায়াদ্বীপের চর রায়মঙ্গল, খরস্রোতা ছায়াক্রুপার তীরে ঘন সবুজ বনে বনে এসেছে বসন্তের ফুলভার। কোকিল দোয়েল পাপিয়ার ডাক মিশেছে মৌমাছির গুঞ্জনে। পথের ধারে চেয়ে থাকে কামপদ মৃগী কার সন্ধানে। গুঁড়ি গুঁড়ি চন্দনফুল ভেসে চলেছে জোয়ারের জলে। আকাশ বাতাস ওরই সুবাসে ভরপুর।

বুকের কলিজা ভরে ওঠে ওই সুবাসে। বুক ভরে টেনে নাও ফুলগন্ধময় বাতাস। গায়ে মাখো হলুদগোলা বসন্ত রৌদ্র। মুক্ত অবাধ স্বাধীন জীবন আর টাটকা মধুর কবোষ্ণ স্বাদস্পর্শ। চাঁদনী রাতে শিরায় শিরায় মাতন জাগে। নেশা লাগায় ছুটে চলা শ্যামল বনময় পথ, আকাশজোড়া গুন্‌গুন্‌ সুরে ডাক দেয় তাদের।

—যাবি ইরফান? নৌকা ঘাটেই আনছি। এইবার আগাম দশ টাকা দিচ্ছি, মাসে তিরিশ টাকা মাইনে—খোরাকী। কুন অসুবিধা হবে না। ঘর সংসার পেতেছিস টাকার লাগ তো হবেই। চল।

ডাকছে মধুমহাজন, ডাকছে তাকে ফুলভরা বনতল।

ইরফান চেয়ে থাকে ওর দিকে।

মধু মৌপাগল বনসীমা! সারা মনে জেগে ওঠে প্রথম উষ্ণ চাকভাঙ্গা মধুর উন্মাদনা। শিরায় শিরায় শিহরণ আনে তাব। বিচিত্র একটা অনুভূতি।

—না। হঠাৎ এগিয়ে আসে মরিয়ম।

লালু শেখের নোটখানা ফেরৎ দিয়ে বলে ওঠে মরিয়ম— ও যাবে না মিঞা। সাহেববাবুর আবাদে কাজ করিছে। কর্জ লিখে, যাতি পারবে না। উযারে ছাড়ান দাও।

—হ্যারে? লালু শেখ একটু অবাক হয়।

ইরফান কথা বলে না, মরিয়মের দিকে চেযে থাকে।

মনে তার ঝড় উঠেছে। ঘর ভাঙ্গার ঝড়, বাঁধন ছেঁড়াব মাতন। কিন্তু মরিয়মের ডাগর দুটো চোখের কাতর মিনতি তাকে ব্যাকুল করে তোলে। কি ভেবে ইরফান দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে।

—যাতি পারলে তোমার লায়েই যেতাম শেখজী। তুমি আমার পুরনো মহাজন। কিন্তু যাবার পথ রাখিনি ইবার।

—যাবি না?

—না।

মরিয়মই জিতলো। বনের মাদকতা থেকে হিংস্র বাঘের কবল থেকে মৌপাগলরা ফেরে না। মারণটানে তাকে মধুর নেশায় মাতাল করে। ফি বছরই দশ-বিশ পঞ্চাশটা মৌপাগল মারা পড়ে। ইরফানকে তাদের সামিল হতে দেবে না মবিযম, কিছুতেই না। মবিযম আজ এগিযে এসেছে।

—আচ্ছা, চলি ভাই। বিবিসাহেবের কথা ফেলতে পারবে না দেখছি আদাব ভাই।

শেখজী হতাশ হয়েই বেব হয়ে গেল।

ইবফান স্তব্ধ হয়ে বসে আছে দাওয়ায়। চোখের সামনে উঁকি মারে সেই মধুগন্ধময়, বন্য পরিবেশ, মাতাল কবা মধুর স্বাদ, উদ্দাম গতিময জীবন। কিন্তু সে বাঁধা পড়ে গেছে আজ।

—কি ভাবছিস? মবিযম নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে ইবফানকে। আজ তাব জন্যই সে নীড় রচনার স্বপ্ন দেখে। বেপরোয়া জীবন থেকে সরিয়ে এনে মুক্ত বনের পাখির পায়ে জঞ্জীর পরিয়েছে মরিয়ম।

ইরফান টেনে নেয় তাকে নিজেব কাছে।

—আমাকেও ঘরবাসী কবে তুললি বিবি?

—নয়তো কি! মবিয়ম আদবে গলে পড়ে।

ইরফান তাকে কাছে টেনে নেয়।

চাঁদ ডোবা আবছা তারার আলোয় চিক চিক করে মরিযমেব দুই চোখ। খুশিতে কাঁদছে মরিয়ম।

রাতেব অন্ধকারে বুকভবা জ্বালা নিয়ে বেড়াব আড়ালে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে দাঁড়িয়েছে নিতাই বুনো। প্রায়ই সে আসে মরিয়মের ঘরের আশেপাশে এমনি সঙ্গোপনে।

মহাজনকে আসতে দেখে খুশি হযেছিল সে। শ্বাপদ লালসায তার দুটো চোখ জ্বলছে। হিংসায় জ্বলে উঠেছে চোখ দুটো, মুখে চোখে ফুটে উঠেছে বীভৎস পৈশাচিক ভাব। ভেবেছিল ইরফান বিদায় হবে লালু শেখের নৌকায় পালাবে আবার হতভাগা। কিন্তু তা হল না। গেড়ে বসলো ও এই মাটিতে, মরিয়মের উপর দখল কায়েম রাখতে।

মনে মনে আগুন জ্বলছে। ওই হতভাগাটাই এবার সব বববাদ করে দিল বরবাদ করে দিল ওই মরিয়মটাই।

দপ দপ করে তারাগুলো জ্বলছে।

নিঃশব্দে সরে এল সেখান থেকে নিতাই বুনো।

অন্ধকারে ফিরে চলে আস্তানার দিকে।

রাত কত জানে না।

হু হু বাতাস বইছে ব্যর্থ কান্নার মত। তারাগুলো জ্বলছে।

গুদোম ঘরের এক পাশে শূন্য নিঃশব্দ খড়ের শয্যায় জানোয়ারের মত পড়ে থাকে নিতাই বুনো!

ওই তার একমাত্র আশ্রয়। ঘর—বৌ! তার কাছে স্বপ্ন। কেমন যেন জ্বলছে সারা মন অন্ধকার বিষিয়ে ওঠে ওর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে। বলিষ্ঠ দেহটা উত্তেজনায়, ব্যর্থতার আক্রোশে ফেঁপে ফুলে উঠেছে। কপাল গালের কুঞ্চন রেখাগুলোর স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে আদিম বন্য হিংস্রতা। একাই ঘুরে বেড়ায় রাত্রির অন্ধকারে। ঘুম আসে না! সমস্ত শরীরে কি এক অসহ্য দুর্নিবার জ্বালা উঠেছে তার।

নিতাই বুনো জেগে আছে—জোয়ার এসেছে। বাতাসে শনশন হাওয়া কাঁপে।

আর জেগে আছে বুড়ো পুরন্দর।

নীলাভ দুটো চোখ তার জ্বলছে। নদীর জল জোয়ারের বেগে টইটম্বর হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তীরে তীরে ভেসে আসে নীচের গহন অরণ্য থেকে ঝরে পড়া গরান কেওড়াফল্ল। বনের রক্তবীজ ওরা, নোনাজলেও মরে না। জীবনের অঙ্কুর ওদের অবিনশ্বর। ভাসতে ভাসতে গিয়ে সরস তীরভূমিতে ঠেকে যায় পলির মধ্যে। লবণময় কর্দমাক্ত জলেই জন্ম নেয় অরণ্য আবার নতুন করে সেই বীজ থেকে।

রাতের অন্ধকারে কুড়ুচ্ছে সেই বীজগুলো পুরন্দর বুড়ো— আঁচলে তুলছে। আর এদিক ওদিক চেয়ে গোটা গোটা ফলগুলো ছিটিয়ে চলেছে সার দেওয়া নরম উর্বর মৃত্তিকার চারিদিকে।

গজ গজ করে বুড়ো—লে গজিয়ে ওঠ তোরা। কেটে কেটে তোদের ঝাড় বংশ নির্মূল করে ধানজমি করেছে লোক। আবার হ, আবার গজিয়ে ওঠ তোরা। বনে বনে ছেয়ে দে সব ক্ষেত। আয় মা বনবিবি! পাঠা তোর চ্যালা চামুণ্ডাদের।

পায়ে নরম কালো পলি, ছেঁড়া কাপড়খানা ভিজে গেছে জলে, ঘুরে বেড়াচ্ছে বুড়ো মাঠময়। আরণ্যক জীবনের যেন ওই একমাত্র প্রতিনিধি।

মানুষের অভিযানের বিরুদ্ধে তার এই নীরব বিদ্রোহ ঘোষণা করে চলেছে রাত্রির আদিম অন্ধকারে এই অরণ্যানীর বাহিরে।

গ্রীষ্মের দাবদাহে জ্বালায় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কালবৈশাখীর কালো মেঘ আর উধাও হয়নি। বর্ষার ঘন পুঞ্জমেঘের রূপে বনভূমির বুকে কালো ছায়া মেলেছে। গাছগাছালির বুকে এসেছে ঘন সবুজ স্পর্শ।

বৃষ্টি নামে অঝোর ধারায়।

বর্ষা এসেছে।

দামাল ছেলের মত অস্থির হয়ে উঠেছে নদী, আর ক্ষেপে উঠেছে অরণ্যানী বাদল হাওয়ায়। স্রোত বেড়েছে নদীর, খরস্রোতে কেঁপে উঠেছে জলরাশি! জোয়ারের সময় মাটি আর দেখা যায় না— কেবল জল আর জল। বনের মাটির অন্ধি-সন্ধিতে চিহ্নমাত্র নেই। গরান-কেওড়া গাছের কাণ্ড ডুবে রয়েছে জলে।

ডালের ফাঁকে হরিণশিশু মাথা আটকে স্রোতের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে—জলের বুকে শব্দ ওঠে ছপ্‌ছপ্।

বাঁদরগুলো নীচু করে ডালে বসে ভিজছে। বিরক্ত মেজাজে চলেছে বিতাড়িত রয়েল টাইগার বন থেকে বনান্তরে অপেক্ষাকৃত উঁচু জমির সন্ধানে। কালো আকাশ ছেয়ে ফেলে বনানী—নদীর বুকে তারই প্রতিবিম্ব।

হরিণগাড়া নদী ক্ষেপে উঠেছে। ছোট খালটার জলসীমা উঠে গেছে ভেড়ির ধার অবধি! গরান কেওড়া গাছের বুকে গিয়ে জল ঠেকেছে। মাটির বাঁধের ওপাশে ধান জমি।

অসীম সব শক্তি নিয়োজিত করেছে। ফসল ফলাতে হবে। চারিদিকে ওর ওই খরধার সোনা নদীর শত-সহস্র তীক্ষ্ণ জিহ্বা বিস্তার করে ভেড়িতে এসে হানা দেবার চেষ্টা করছে— চেঁছে পুছে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। হয়তো সব শেষ করে দেবে।

বাধা দেবার জন্য মানুষ গড়ে তুলেছে পোক্ত বাঁধটা।

পুরোদমে বুনো কুলি মজুরের দল বীজধান তুলে পুঁতেছে জমিতে।

যতদুর দৃষ্টি যায় বেড়ে উঠেছে ওই ধানগাছ, জলো বাতাসে মাথা নাড়ছে শির শির করে, শিহরণ বয়ে চলে যায় নতুন প্রাণের। অক্লান্ত পরিশ্রমে অসীম কাজ তদারক করে চলেছে। বীজধানের ক্ষেতে মাঝেমাঝে বর্ষার জল পেয়ে গজিয়ে উঠেছে কেওড়া সুন্দরীর চারা মূর্তিমান শত্রুর মত। দেখে অবাক হয়— দু'একটা নয়। অনেক চারাই আবার গজিয়ে উঠেছে। আশপাশের ধান গাছগুলোর বাড় কমে গেছে।

—এসব কোত্থেকে এল রে? প্রশ্ন করে অসীম।

—তাই তো হুজুর।

কুলিরাও বিস্মিত হয়েছে। বীজধানের সঙ্গে যদি এমনি বীজতলায় কেওড়া গরান চারা জন্মায়, আবার যে বনই উঠবে ঠাঁইটা। সাংঘাতিক বাড় বাড়ন্ত ওদের।

—কি করে এ বীজ এসে জুটলো এখানে? একটা আধটা নয়, অনেক গাজ গজাচ্ছে যে? অসীম চারিদিকে সন্ধানী চোখ মেলে দেখছে।

নিতাই বুনো কোদাল থামিয়ে জমির বুকে নামে। দেখছে চারিদিক। অসীমের কথায় হকচকিয়ে যায়। সত্যিই তো ভাববার কথা।

মজুরদের অনেকেই দেখছে গাছগুলোকে।

বীজধানের সীমানা ছাড়িয়ে উঠেছে, এরই মধ্যে তারা ডালপালাও মেলতে শুরু করেছে।

নিতাই একটু অবাক হয়েছে। জবাব দেয়,

— দেখছি বাবু, যা দু'চারটে গাছ তুলে ফেলছি।

—হ্যাঁ। অসীম সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চাবিদিকে কি খোঁজ করছে।

ওদিকে নীরবে ইরফান কাজ করে চলেছে। বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ। মুখ বন্ধ করে কাজ করছে নিপুণ হাতে।

অসীম বলে ওঠে— গাছগুলো তুলে ফেল। শিকড় রাখছিস কেন? সব সমেত তুলে ফেল।

ইরফান জল কাদায় নেমে গাছ তুলতে থাকে।

নিতাই বুনো বলে ওঠে— ওর কাজের কথা ছাড়ান দেন বাবু। তিন মাস কাজ করবে, আবার যেদিন মন হবে বিবাক হাওয়া দিবে কুন পানে। কাজেরও ওই ছিরি। ওদের জন্যই ত এমনি সব কাম নাশ হয়।

গজ গজ করছে নিতাই বুনো, ইরফানকে কেমন সহ্য করতে পারে না সে।

ইরফান কথার জবাব দিল না, ওর দিকে মুখ তুলে চাইল মাত্র। চোখের চাহনিতে ফুটে ওঠে নীরব আক্রোশ।

নিতাই বুনোর এই ব্যবহারের কোন অর্থ খুজে পায় না সে। ইদানীং নিতাই বুনো তাকে কেমন বিদ্বেষ চোখে দেখতে শুরু করেছে। হাতের কাজ বন্ধ করে ইরফান ওর দিকে চেয়ে থাকে—মনের রাগ ফুটে ওঠে ওর দুচোখের চাহনিতে।

বুনোর রাগ তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলে।

নিতাই বলে ওঠে—হাঁ করে দেখছিস কি, মোটে ন'গণ্ডা বীজ তুলেছিস! এখনও অনেক বাকি কাজের। এক পহর হোল আর ব্যাটা ভাবতি লাগলো, নাস্তা আনবে বিবি! ভ্যালা বিবি পাইছিস তুই। তল্লাটে আর বিবি কারুর নেইরে? এ্যা?

হাসছে অন্যান্য কুলি মজুর সকলেই। ইরফানের কেমন গা জ্বালা করে ওর কথায়। জানোয়ারের মত বলিষ্ঠ লোকটা, কেমন দুর্মদ চেহারা। চোখ দুটো করমচার মত লাল। দেখতে ইচ্ছা করে না ওকে।

ইরফান কথার জবাব দিল না। আপন মনেই কাজ করতে শুরু করল। আকাশ ছেয়ে আবার নেমেছে বৃষ্টি অঝোর ধারায়।

বর্ষাতির উপর আবার ছাতা মেলে বসলো অসীম আলের মাথায়। জমিতে এমোনিয়াম সালফেট দেওয়া হচ্ছে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিমাণ না দেখিয়ে দিলে ধানগাছগুলো সব খতম করে দেবে ওরা যেমন তেমন ভাবে সার দিয়ে।

—আলগুলো আটকে দাও, জল যাতে না বের হয়ে যায়; ব্যস চার ভাগের বেশি দেতি হবে না। জ্বলে যাবে।

অসীম নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের নির্দেশ দেয়।

ঘোলাজলে সারগুলো ছিটিয়ে চলেছে মজুররা। পিছনে অন্যদল সারগুলো জলে গুলে দিচ্ছে পা দিয়ে হাঁটকিয়ে।

কৃষ্ণা চেয়ে থাকে হরিণগাড়া নদীর প্রশস্ত বুকের দিকে। জলের নীল রং বদলে গেছে! মসীকষ্ণ হয়ে উঠেছে থৈ থৈ জলরাশি। কালো মেঘের দিকে চেয়ে হাজার হাত মেলে ফুঁসছে ওরা। ছল ছল করে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে সাদা ফেনায়।

ক'দিন আসেনি প্রণব। আসতে পাবেনি এই দুর্যোগে। পথ চেয়ে বসে আছে কৃষ্ণা। আকাশ ছেয়ে নেমেছে বৃষ্টি। সেই সঙ্গে দামাল বাতাস কেঁপে উঠছে। দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন হয়ে যায় বৃষ্টির ধারায়। চার পাঁচদিন যাতায়াত বন্ধ।

জল জমেছে মাঠে। ভেড়ির এদিকে জমেছে বৃষ্টির জল, ওদিকে অপেক্ষা করছে সীমাহীন লবণাক্ত জলরাশি। মাঝে কেবলমাত্র জেগে আছে ভেড়িটা। একটা পরিত্যক্ত দ্বীপে আদিম মানব জীবনে তারা ফিরে গেছে। একাই বসে কি আকাশ পাতাল ভাবছে কৃষ্ণা। চারিদিকে তাদের আদিম অরণ্য বর্ষণমুখর দিন আর দুর্দাম নদী।

প্রণব কয়েকদিন আগে এসেছিল। কৃষ্ণার অবসর মুহূর্তগুলো চলে সেই স্মৃতির রোমন্থন করে। নিজের মনে এত কাঙাল হয়েছিল, বুঝতে পারেনি সে। অনুভব করছে প্রণবের সান্নিধ্যে এসে। যা চেয়েছিল কোনদিনই সে পায় নি, যেটুকু পেয়েছে তা ভুল করেই চেয়েছিল।

কয়েকদিন আগেও সে ঘুরে এসেছে সাতজেলের ফরেস্ট আপিস থেকে ওদের লঞ্চে। প্রণবকে এত নিবিড় করে বহুদিন পায়নি কৃষ্ণা। আগেকার সেই কলেজ পালানো মেয়ের মতই বলে ওঠে সে,

—চীনে বাদাম আর ঝাল চানা না হলে কি ভালো লাগে? অতীতের দিনগুলো যেন ফিরে এসেছে আবার।

লঞ্চ চলেছে বেগে।

হাসে প্রণব—এ সুন্দরবনে ওসব আর কোথায় পাবো! তাহলে আবার আউটরাম ঘাটে ফিরে যেতে হয়।

—শ্যামা নাটকের কথা মনে পড়ে? প্রণব বলে ওঠে।

চমকে ওর দিকে চাইল কৃষ্ণা। শ্যামা বজ্রসেনকে [illegible] চলেছে। গানটা মনে পড়ে।

প্রেমের জোয়ারে ভাসাতে দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও।

সে দিনগুলো আজও ভোলেনি প্রণব। সুখের আশা তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণার বিয়ে হয়ে যাবার পর।

কৃষ্ণা যেন নিজের হাতেই সব বাঁধন ছিঁড়ে দিয়েছিল। মুহূর্তে ধ্বংস করে দিয়েছে তার নিজের গড়া তাসের প্রাসাদ।

কলেজেও বন্ধুবান্ধবেরা ঠাট্টা করেছে প্রণবকে—নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিল তোকে? বাজে মেয়ে ওটা।

প্রণব জবাব দেয়নি ওদের কথার।

কৃষ্ণার বান্ধবী দু'চার জন তখনও পড়ছে, আড়ালে তারা হাসাহাসি করে ব্যাপারটা নিয়ে মমতা সেন বেশ শুনিয়েই বলে— একেবারে চুপসে গেছে বেচারা।

চারিদিক থেকে প্রণবকে শুনতে হয়েছে নানা মন্তব্য আর উপদেশ। বন্ধু-বান্ধবদের যতটা পারে এড়িয়ে চলে।

কোন দিকেই কান দেয়নি সে। ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে তাকে। কোনরকমে বছর কয়েক পার করে চোখ-কান বুজে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিল। কলকাতা তার ভালো লাগে না আর।

পথে একদিন কৃষ্ণাকে দেখেছিল, কিন্তু ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গিয়েছিল সেদিন। ওই কৃষ্ণাকে সে চেনে না। সিঁথিতে সিঁদুর—শ্রীও বেড়েছে। ওরা থাক মহানগরীর সমাজ আলো করে, প্রণবই চলে যাবে দূরে। শহরের জীবনে কেমন বিতৃষ্ণা এসে যায় তার।

কি যেন জেদের বশেই বনবিভাগে চাকরি নিল সে। কঠিন জীবন।

—বনে বনে ঘুরতে হবে, কোন সোসাইটি পাবেন না। কথাটা ডি-এফ-ও সাহেব স্মরণ করিয়ে দেন।

প্রণব মরিয়া। এ সমাজের উপর ঘৃণা ধরে গেছে। কৃষ্ণার শ্রেণীর আরও অনেকেই আছে— আর ঠক্‌তে রাজি নয় সে। তাই মনস্থিরই করে ফেলে জবাব দেয়—

—তা হোক। প্রণব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিয়ে করবার সময়, অবকাশ বা আগ্রহও হয়নি। শহরকে ভোলবার জন্যই বনে এসেছে।

আজ দেখে, কৃষ্ণা বনে থেকেও শহরকেই পেতে চায়। অতীতকে সে ভোলেনি।

—আগে দেখেছিলে, ডেকে কথা বলনি কেন? কৃষ্ণা প্রশ্ন করে।

—যদি চিনতে না পারতে? প্রণব আজ সহজভাবেই প্রকাশ করে কথাটা।

বলে ওঠে প্রণব— তুমি তখন সুখেই রয়েছো; কলেজের দুদিনের চেনা প্রণব রায়কে তাই তখন চেনা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। অন্ততঃ সেদিন ছিল না।

— কেন? সুখে ছিলাম?

প্রণব বাইরের বনভূমির দিকে চেয়ে থাকে। বৃষ্টিনামার পূর্বাভাষ আকাশে আকাশে। স্তরে স্তরে সাদা মেঘগুলো ছিটিয়ে পড়েছে একরাশ তুলোর মত আকাশের অঙ্গনে।

শূন্যমনে ওর দিকে চেয়ে থাকে কৃষ্ণা। অতীতেও অমনি মেঘসাজ পরতো এই আকাশে।

কৃষ্ণা সেদিনের কথাগুলো ভাবছে। অসীম নিদারুণ অবহেলায় তাকে না বলেই এসেছিল এইখানে। কৃষ্ণাকে সে ডাকেনি। নিজেই যেচে এসেছে কৃষ্ণা।

বিয়ের পর থেকেই সুখের নমুনা তাই এই! বোধ হয় প্রণবের সঙ্গের সেই কলেজ-পালানো দিনগুলো এত স্মরণীয় হয়ে আছে।

দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে কৃষ্ণার বুক চিরে।

— সেই দিনগুলোই বোধ হয় ছিল ভালো। এ জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে প্রণবের! হাঁপিয়ে উঠেছি আমি।

প্রণব স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

নদীতে এসেছে বর্ষার সমারোহ, ঢেউ-এর উপর সবেগে আছড়ে পড়ছে লঞ্চটা, গতিবেগে থরথর করে কাঁপছে ওর সর্বাঙ্গ।

বলে চলেছে কৃষ্ণা— এক এক সময় মনে হয়, চলেই যাই। কিন্তু যাবো কোথায়? একা একা পৃথিবীতে দাঁড়াবার ভরসা পাই না যে। এই নদী, গহিন বন— ওই বনজসভ্যতার ধারক তোমাদের অসীমবাবু—অসহ্য হয়ে উঠেছে সবকিছু।

বনের নীচে দিয়ে লঞ্চটা চলেছে আদিম অন্ধকার ভেদ করে। হঠাৎ প্রশ্ন করে ওঠে কৃষ্ণা—বিয়ে করোনি কেন বলো তো? আবার প্রেমে-ট্রেমে পড়েছো না কি?

প্রণব চিন্তিত মনে জবাব দেয়— কই আর সময় হল!

কৃষ্ণা বলে ওঠে— বাজে কথা। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাও।

এ যেন অন্য কোন কৌতুহলী নারী। কৃষ্ণার মনে এও এক সুপ্ত গৌরব বোধ। তার জন্যে আজও কেউ দুঃখ সইছে, বঞ্চিত করে রেখেছে নিজেকে পৃথিবীর রস বৈভব থেকে — এ যেন তারই সম্মান। অতীতের হারানো কৃষ্ণা যেন ফিরে এসেছে প্রণবের কাছে। ওর দিকে চেয়ে থাকে, ওর চোখের তারায় হারানো নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়।

কৃষ্ণার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নেয় প্রণব। বাধা দিল না কৃষ্ণা। স্থির নিষ্কম্প দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

—দত্তচকে ফিরে এলাম কৃষ্ণা।

—দত্তচক!

কৃষ্ণার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বনের মধ্যে টিনের বাংলোর ছাদ। ধোঁয়া ওঠা একটু আকাশ। কুকুরটা ডাকছে। তার সেই বন্দিনিবাস।

—ও!

কৃষ্ণার যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। বিচিত্র এক অনুভূতির বর্ণরঙ্গীন দেশ থেকে সে ফিরে এল রূঢ় কঠিন বাস্তব জগতে। তার মধুস্বর্গ মিশিয়ে গেল পথের ধুলোয়। আবার সেই একঘেয়ে পরিবেশ!

লঞ্চটা এসে ঘাটে ভিড়ল।

কৃষ্ণা চুপ করে নেমে এল তীরে, পিছু পিছু প্রণবও।

অসীম দেখেছে ভদ্রলোককে। বয়স তার থেকে কিছু কম। প্রথম পরিচয়ে বিশেষ কথাবার্তা বলে না অসীম। সেদিন ভেড়ির কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বাঁধে মজুর লেগেছে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ দেখছিল। ওদের এগিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল মাত্র।

ক'দিন থেকেই দেখেছে অসীম প্রণবকে।

ঝকঝকে পোশাক, গামবুট পায়ে, হাতে বিলেতি ষ্টিক; কাঁধে ক্যামেরা, সঙ্গে দুজন ফরেস্ট গার্ড। ভদ্রলোক ডিউটি করতে এসে এইখানেই কয়েক ঘণ্টা সময় কাটিয়ে যান।

সেদিন সামনাসামনি পড়ে যেতেই পরিচয় করিয়ে দেয় কৃষ্ণা—আমার কলেজের সহপাঠী, বর্তমানে এখানকার রেঞ্জার।

—নমস্কার। অসীম এগিয়ে যায়।

এই প্রথম পরিচয়। এতদিন দু'চার বার ওকে দেখেছে প্রণব দূর থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে। কেমন রহস্যময়ী লোক একটি। আজ কৃষ্ণার কাছে ওর খানিকটা পরিচয় সে পেয়েছে।

ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে প্রণবের চাহনিতে।

প্রণব ওর দিকে চেয়ে থাকে। বলিষ্ঠ চেহারা, রোদের তাপে তামাটে হয়ে গেছে শ্যামবর্ণ। চোখে মুখে এক দৃঢ় কাঠিন্য।

প্রণব যেন ওর সামনে কেমন অস্বস্তি বোধ করে। আলাপ করবার চেষ্টা করছে সে।

শুনলাম, ফার্মিং করছেন আপনি এখানে?

—হ্যাঁ। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ঘড়ির দিকে চাইতে থাকে অসীম। ওদিকে মাঠে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোককে এমনি ফেলে যেতেও কেমন অশোভনে ঠেকে। তবু যেতে হবে। এগিয়ে যায়।

প্রণব বলে ওঠে— কিছু হবে এ মাটিতে?

ওর কথা শুনে দাঁড়াল অসীম। একটু বিশ্বাসের সুরেই বলে ওঠে,

— কেন হবে না! ঠিকমত জমি তৈরি করলেই হবে।

কে জানে? এক জোড়া গরান ছাড়া কিছুই হবে না, আপনি যত চেষ্টাই করুন।

প্রণব বিজ্ঞের মত কথাটা বলে।

কৃষ্ণাও স্বামীর দিকে চেয়ে বলে ওঠে বিজয়ীর কণ্ঠে—শুনলে তো, প্রণব ফরেস্টার, অনেক কিছুই জানে, আমার কথা ফললো তো?

অসীম কথা বললো না, ওদের দু'জনের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

প্রণব ওর চাহনির সামনে বিব্রত বোধ করে; হঠাৎ ফস করে কথাটা বলে ফেলে ভালো করেনি সে; শোধরাবার চেষ্টা করে।

—অবশ্য অনেক জায়গায় হচ্ছে ফসল।

প্রণব কি যেন বলতে যাচ্ছিল। অসীমের ওর কথাগুলো কেমন ভালো লাগে না! চুপ করেই পেয়ালার চুমুক দিতে থাকে।

প্রণব বলে চলে— আমার মনে হয়—

এতক্ষণ চুপ করেই ছিল অসীম। আর যেন সহ্য না করতে পেরে বলে ওঠে—

—দ্যাটস মাই লাইন। আপনার ফরেস্ট রেঞ্জারের লাইন এ-নয়।

প্রণব থেমে গেছে, যেন মুখের উপর কে চড়ই মেরেছে তাকে।

কৃষ্ণা চমকে ওঠে অসীমের রূঢ়তায়। প্রণবের মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

অসীম চায়ের টেবিল থেকে আধ-খাওয়া অবস্থাতেই উঠে পড়ল। এখানে বসতেও ইচ্ছা করে না অসীমের। প্রণবের এই অসার মন্তব্যে চড়ে উঠেছে অসীম। এড়িয়ে যাবার জন্যে বলে—

—আমার কাজ আছে জরুরী, আপনি বসুন, কথাবার্তা বলুন। র‍্যাক থেকে রোদেপোড়া সোলা হ্যাটটা নিয়ে নেমে গেল নীচে।

পিছন থেকে শুনতে পায় প্রণবের কথাগুলো; গরম সিসের মত কানে আসে সেই কথাগুলো। প্রণব হাসছে আর বলছে, এতবড় পণ্ডিত লোক এমনি করে একটা মিথ্যে বাতিকের জন্য রট্ করেছেন, তুমি বাধা দাও না কেন? এ স্রেফ পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। পাগলামি।

থমকে দাঁড়াল অসীম। তারই বাড়িতে বসে তার স্ত্রীর সামনে এমনি অযাচিত উপদেশ দেওয়াটা পছন্দ করে না সে। কি ভেবে সামনের দিকেই চলে গেল মাঠের কাজ তদারক করতে।

কৃষ্ণা এর কোন জবাব দেয়নি। প্রণবের দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল মাত্র— ক্লান্ত অসহায় সে চাহনি। জানালার বাইরে দেখা যায় অসীম হন্‌হন্ করে চলেছে।

তারপর থেকে ক'দিন প্রণব আর আসেনি। বোধহয় অপমানিত হয়েই গেছে। আবার একাই পথ চেয়ে আছে কৃষ্ণা।

বর্ষার দীর্ঘ দিনগুলি কাটতে চায় না।

অসহ্য হয়ে ওঠে। পাখিগুলোও যেন কোথায় পালিয়েছে এই বর্ষার ভয়ে বনরাজ্য থেকে।

চা জুড়িয়ে আসছে লোনা জলো হাওয়ার ঝাপটায়। বৃষ্টি নেমেছে আবার। ছিঁচ কাঁদুনে আকাশ কেবলই কাঁদছে।

একা একা বসে দিনগুলো আর কাটে না।

মরিয়মকে আসতে দেখে ফিরে চাইল কৃষ্ণা। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে ওর সর্বাঙ্গ। শাড়িখানা চেপে বসেছে ওর নিটোল দেহের ভাঁজে ভাঁজে। আঁচল থেকে বের করে মরিয়ম কয়েকটা মুরগীর ডিম।

ভিজেছে—তবু হাসছে। বেশ লাগে ওকে সতেজ গাছের মত কমনীয়।

—এত বৃষ্টিতে এলি কি করে?

হাসছে মরিয়ম। ভিজে চুলের গোছা থেকে ঝরে পড়ছে দু'একদিন চূর্ণ জলকণা।

—কি আর বাদলা মনিবান! ওরা তো ক্ষেতে এরই মধ্যে কাজ করছে। একটু না হয় ভেজলাম।

অর্থাৎ ইরফান যদি ভিজতে পারে তবে সেই বা ভিজবে না কেন? কৃষ্ণা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

নতুন করে ঘর পেতেছে মরিয়ম। আমাদের প্রথম সংসার ওর। কৃষ্ণার সংসার কাকের বাসা। কোন স্নেহ-মমতা ভালোবাসার স্পর্শও সেখানে নেই। কর্তব্যই বড় হয়ে রয়েছে সব কিছু জুড়ে।

আর বেবশ ইরফানকে সত্যিই বেঁধেছে ওই মরিয়ম। নিঃশেষে ভালোবাসা উজাড় করে দিলে বনের পশুও বোধ হয় বশ হয়। সেই অফুরান ভালোবাসার সন্ধান পায়নি কৃষ্ণা। নিজেকে ভুলতে পারেনি। নিজের চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্নই তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে— সে ভালোবাসবে কি করে?

কৃষ্ণা তাই হয়তো দুঃখ পায়—অসহ্য এই দুঃখ!

আবছা আলো-আঁধারি রাত।

বেশ লাগে মরিয়মের। খোঁপায় গুঁজেছে হাসনুহানার স্তবক। রাতের বাতাসে ভাসছে ওর সৌরভ।

গুন গুন গান আসে মনে।

সেজেছে। সাজতে ভালো লাগে তার।

বহুদিনের সাধ একটা রঙ্গীন পাথরের মালা পরবে গলায়, সেবার রামপুরের হাটে দেখেছিল। কিন্তু কিনতে পয়সা ছিল না।

ইরফান। সে তো ফকিরই। পাবে কোথায় পয়সা!

গুনগুনিয়ে ওঠে মন।

ইরফান এখনও মাঠ থেকে ফেরেনি।

বাড়ি ফিরেই আবার উনুন জ্বালাতে হবে। সাহেবের দুবেলা গরম ভাত না হলে চলবে না।

এসব খাটুনি তার গায়ে লাগে না।

জলোহাওয়ায় উড়ছে তার এলোমেলো চুপ, উতলা আঁচল। হঠাৎ একটা খস্‌খস্ শব্দ শুনে দাঁড়াল।

সাঁঝবেলা। বাদাবন! কে জানে অন্যকিছু বা।

হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ে।

—ওমা! তুই! ভেবেছিলাম আর কিছু হবে।

নিতাই গেঁও চারার ভিড় ঠেলে বের হয়ে আসে। এদিক ওদিক কি যেন দেখছে।

ওর হাসিভরা মুখের দিকে চেয়ে থাকে স্তব্ধ নির্বাক চাহনিতে।

— কেন আমাকে কি নজরে ধরে না! হ্যাঁরে?

মরিয়ম ওর দিকে চেয়ে থাকে।

আঁধারে মিশে গেছে মিশ কালো চেহারা। এই বনভূমি— ওই মৃত্যুমুখী গাং-এর মত নিবিড় নিষ্ঠুরতা মাখানো ওর সর্বাঙ্গে। দুচোখের চাহনিতে।

আঁধার ঘন রাতে কেমন ভয় লাগে ওকে।

এগিয়ে আসছে কালো মুয়্কো ঐ নিতাই বুনো। গায়েব মাটির গন্ধ ফুটে ওঠে বাতাসে।

ট্যাঁক থেকে বের করে একছড়া লাল পাথরের মালা।

হাসবার চেষ্টা করে নিতাই। কর্কশ মুখে ফুটে ওঠে কুশ্রী বীভৎস হাসি।

— দেখ দিকি কেমন মানায় তোরে? পছন্দ হয়?

ওর দিকে চেয়ে থাকে মরিয়ম। নিতাই বলে চলেছে।

— সেদিন হাটে গেলাম, কত বাহারের জিনিসই আসছিল। তোর কথা মনে পড়লো। কিনলাম এটা।

বাতাসে মত্ত নদীর সোঁ সোঁ গর্জন মিশেছে বনের হাওয়ার সঙ্গে। দূরে কোথায় অস্পষ্ট একটা গর্জন শোনা যায়।

বন্য পরিবেশে ওর দিকে চাইতেও ভয় লাগে মরিয়মের।

ইরফানের কথা মনে পড়ে।

— নে।

মালাটা ওর হাতে দেবার সময় অকারণেই হাতটা জোরে ধরে ফেলে নিতাই।

—সর!

হাঁপাচ্ছে মরিয়ম।

বনের অন্তরালে হরিণীর মত বেগে উধাও হয়ে গেল। অন্ধকারে নিতাইকেই ফেলে রেখে।

একদৌড়ে এতখানি পথ পার হয়ে এসে দাঁড়াল।

বুক কাঁপছে দুরদুর কি এক অজানা আতঙ্কে।

হঠাৎ ওই ঝোপের মধ্যে যেন রক্তলোভী কোন বন্য জানোয়ারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে শিউরে উঠেছে।

হাতের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়।

মালাটা তখনও রয়েছে তার হাতেই। কেমন যেন জ্বালা করছে সারা মন।

ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটাকে খালের জলে।

একটা শব্দ করে তলিয়ে গেল।

হাঁপাচ্ছে মরিয়ম।

তখনও হাঁপচ্ছে। বুক কাঁপছে ভয়ে।

কোথায় গিইছিলি?

ইরফান মাঠ থেকে ফিরেছে একটু আগেই। মরিয়ম বাড়িতে নাই।

নিজেই তামাক একছিলিম সেজে নিয়ে দাওয়ায় বসে টানছে। ওর প্রশ্নে মরিয়ম জবাব দিল না।

জবাব দেবার মত অবস্থা তার নেই।

কোনরকমে উনুনের ধারে গিয়ে কাঠকুটো টেনে উনুন ধরাতে থাকে।

রাত হয়ে গেছে, খিদেও পেয়েছে ইরফানের!

নিজেরই কেমন লজ্জা করে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিতাই বুনোর জ্বলন্ত চোখ দুটো।

—কথা কইছিস না যে?

মরিয়ম কাজ করে চলেছে। কোনবকমে জবাব দেয়—

—এমনিই। কাজ করছি।

ছাই!

এগিয়ে আসে ইরফান।

কেমন যেন ভালো লেগে গেছে তার এই মাটি, এই ঘরবসত।

বলে ওঠে—আব মধুলায়ে যাবো না রে। ভাবছি ঘর বসতই করবো। ঘব বাঁধাই ভালো। আর তোকে ছেড়েও যাবো না।

ওদিকে সাড়া পেয়ে এগিয়ে যায় ইরফান।

উনুনের আবছা লালাভ আলো পড়ছে মরিয়মেব নিটোল পুরুষ্ট মুখে গালে।

—কাঁদছিস তুই?

জবাব দেয় না মরিয়ম।

ইরফানের বুকে মাথা রেখে হু হু কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কোন নিদারুণ দুঃখ-বেদনা আর আগামী কোন সর্বনাশের ভয়ে শিউরে উঠেছে মরিয়ম।

অসহায়েব মত কাঁদছে।

—তবু কাঁদে? হ্যারে কি হয়েছে?

—কিছু না।

নিজেকে সামলে নেয়। হাসবার চেষ্টা করে মরিয়ম মিষ্টি এক ঝিলিক হাসি। বলে ওঠে—

—ভিজে কাঠকুটো। চোখ দিয়ে এমনিতে পানি পড়ে। গাং-এব নোনা পানি।

—ইরফান ওর দিকে চেয়ে থাকে।

মরিয়মের হাসিটুকুই তাকে বেঁধে ফেলেছে এ মাটির সঙ্গে।

মরিয়ম কথাটা চেপে গেল।

রাত নামে।

নিশাচরের মতো ঘুরে বেড়ায় পুরন্দর বুড়ো। কাদা জলেও তার গতি রুদ্ধ হয় না। সাগ্রহে চেয়ে থাকে দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে।

এইখানে সে পা দিয়ে আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে বাওয়ালি নৌকা হতে নামে। বনে ঢাকা ছিল এর সব কিছু। আকাশছোঁয়া সুন্দরী কেওড়া বন। নীরবে ঘুরে বেড়াত হিংস্র শ্বাপদের দল লালসা ভরা চাহনিতে।

বাঁহাতি শকুনখালির বনে ছিল সাঁখবাবা দক্ষিণ রায়ের থান— বনবিবির তলা। বনে ঢোকবার মুখে মাথা নুইয়ে সেলাম জানাত বাওলিয়ার দল সেইখানে। মানুষ তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে কেটে, আর বানিয়েছে ধানজমি, বনবিবি আজও ঘুরে বেড়ায়। আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় তার ক্রন্দন। দেবমাহাত্ম্য সব ঘুচে গেছে।

কান পেতে কি শুনছে বুড়ো। নীলাভ চোখদুটো মেলে চেয়ে রয়েছে— কোথাও কেওড়া গরানের চারার সন্ধান নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সবুজ ধানের মাঝে অন্বেষণ করে ফিরছে। অনেক অনেক বীজ পুঁতেছিল সে—ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু একটাও চারা দেখা যায় না।

সুন্দরবনের মাটিতে আর সুন্দরী গরানও গজায় না।

সব লোপাট হয়ে গেছে ওদের কোদালের মুখে। সব মুলুক জুড়ে উঠেছে সবুজ লকলকে ধানের চারা। বর্ষণক্লান্ত আকাশের নীচে দমকা হাওয়ার কাঁপছে গোছা গোছা ধান গাছ। আদিম অরণ্যকে পরাজিত করেছে মানুষ, গড়ে তুলেছে তার আবাদ ভূমি—সভ্যতার ঢল নেমেছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে বুড়ো।

হ্যাঁ, রয়েছে। ওই যে। জলকাদা ভেঙ্গে এগিয়ে যায় বুড়ো।

সাগ্রহে চেয়ে রয়েছে তাদের দিকে। একটা, দুটো, অনেকগুলো। কচি চারাগুলো এরই মধ্যে ধান গাছের সীমানা ছাড়িয়ে উঠেছে। কচি পাতা মেলে দিয়ে অরণ্যের স্বপ্ন দেখছে বনদেবীর ভবিষ্যৎ সন্তান। হা-হা হাসতে থাকে বুড়ো, শীর্ণ নীলাভ দু'চোখের তারায় ফুটে ওঠে পৈশাচিক আনন্দ।

হ্যাঁ, বড় হ। ছেয়ে ফেল, ঢেকে ফেল সব জমি। ধান হবে— আবাদ গড়তি আসছেন সাহেববাবু। হাঃ-হাঃ-হঃ! অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বুড়ো। তার চোখের সামনে অতীতের অরণ্যভূমির কথা ভেসে ওঠে—

দূর মাঠে লোকজন কাজ করছিল। ওর হাসির শব্দে ওর দিকে ফিরে চাইল। বুড়ো সযত্নে গাছগুলোতে হাত বোলাচ্ছে। একটা নয়, বীজধানের মাথা ফুঁড়ে অনেক গাছই উঠেছে। তাজা সমুদ্রে ভাসা কেওড়া ফল—ওদের বাড়-বাড়ন্ত প্রচুর। ওরা মরে না।

ওর হাসির শব্দে অসীম এসে দাঁড়ালো জমির মাথায়।

বুড়োকে সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বীজ আঁচলে করে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল। আজ তার অর্থটা পরিষ্কার হয়ে ফুঠে ওঠে পাগল না হলে আর কি? পাগলামির বাতিকে কোনদিন কি অপরিসীম ক্ষতি করে বসবে নিজের অজ্ঞাতেই।

ওকে সামলানো দরকার।

—ধরে আন্, ওকে! হুকুম করে অসীম।

একজন কুলি গিয়ে ধরে আনলো বুড়োকে। আসতে কি চায়! বুড়ো বুনো শুয়োরের মত আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। বন্দী জানোয়ারের মত দাপাচ্ছে জলকাদায়। সর্বাঙ্গে লেগেছে কালো কাদা। কাপড়খানা ন্যাতার মত হয়ে উঠেছে। কাঠি কাঠি হাতগুলো আপন মনে ছুঁড়ছে পুরন্দর বুড়ো।

গর্জন করছে।

— ছেড়ে দে শালারা।

টেনে নিয়ে আসে ওকে। মাথায় শণের মত সাদা চুলে লেগেছে জল কাদার ছাপ। অসীমকে দেখে শান্ত হলে একটু।

— সেলাম সাহেববাবু!

অসীম অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করে।

ও গাছ তুমি লাগিয়েছো? এত কষ্ট করে গাছ কাটছি আমরা, আর তুমি কিনা জঙ্গল গড়ছো এইখানে!

হেসে ফেলে বুড়ো খিক্ খিক্ করে— এককালে ছিল এখানে সাঙ্গীন জঙ্গল। বড় শিয়ালের আড্ডা, দক্ষিণ রায়ের থান। মহিমে যাবে কতি?

পাগলের প্রলাপে কান দিলে মুস্কিল। দাবড়ে ওঠে অসীম— ফের যদি তোমাকে দেখি এই কাজ করতে, দূর করে দোব এখান থেকে। তুলে ফেল ওগুলো।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পুরন্দর। ওর কথায় যেন কানই দেয়নি।

একজন মুনিষ গাছগুলো তুলে ফেলে।

বুড়ো আর্তনাদ করছে, গর্জন করছে আলের মাথায় দাঁড়িয়ে।

—মরবি, মরবি তুই বনবিবির কোপে। খুব মজা করে গাছ ছিঁড়ছিস—চারা গাছ।

নিতাই বুনো ধারাল কোদালটা তুলতেই দৌড়ে পালাল বুড়ো নিরাপদ দূরত্বে।

দূর থেকে চেয়ে থাকে সবুজ মাঠের দিকে। যেন বাদাবনের বাঘ ওপারের বনসীমা থেকে মানুষের জগতের দিকে চেয়ে রয়েছে।

অসীমের স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে।

মাটির ঘুম ভেঙ্গেছে, জেগে উঠেছে কুমারী মৃত্তিকা। ওর সঞ্চিত বুকের অমৃতস্পর্শ দিয়ে আগামী পূর্ণতার সম্ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছে।

কাজল কালো মেঘের দল হুমড়ি খেয়ে নেমে এসেছে অরণ্যসীমায়, অস্পষ্ট আলোয় দিনশেষের সুর বেজে ওঠে। জেগে উঠেছে সুপ্ত প্রকৃতি। মেঘেব ফাঁক দিয়ে একটা তারাও দেখা যায় না। আকাশ বাতাস ছাপিয়ে উঠেছে নদীর মত্ত গর্জন—বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। থৈ থৈ নদীর জল এসে ছলকে পড়ে তীরভূমিতে— অতৃপ্ত লালসা নিয়ে। ব্যাঙের ডাকও থেমে গেছে কি এক অজানা আতঙ্কে।

বৃষ্টিতে চারিদিক জলমগ্ন হয়ে উঠেছে।

বাদাবনের বৃষ্টি।

এইটুকু খড়ের চালে ছাউনির বাইবে চারিদিক জলে ডুবে যায়, বৃষ্টির ধারাপাতে ঝাপসা হয়ে ওঠে।

দিনের আলো নিভে আসে।

রাতের বেলাতেও থামে না বৃষ্টি।

নদীর ডাক বেড়েছে।

চারিদিকে ওই গাং—জল—আর বনসীমা। তারই মাঝে এই ক'টি মানুষ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে।

তবু কাজের বিরাম নেই।

ভেড়িতে সাবধানী প্রহরা কোথাও যেন এতটুকু নোনা জল না লাগে। মুনিষজন মাঠে ব্যস্ত ধানগাছের তদারকে। অবসর নেই।

ইরফান ঘরে ফেরে সেই সন্ধ্যার পর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে!

এসময় গরম চাট্টি ভাত না হলে মুখের সামনে দিতে পারে না মরিয়ম।

কাঠকুটো জোগাড় করা একটা সমস্যা।

সব ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে উঠেছে।

তাই সন্ধ্যাবেলাতে উপায়ান্তর না দেখে গোলাঘরেই গিয়েছে কাঠ খড় আনতে!

টিনের মস্ত চালাটা কেমন শুকনো—উষ্ণতায় ভরা। বৃষ্টির উৎপাত এখানে আসে না।

অন্ধকারে মরিয়ম খড় আর কাঠকুঠোগুলো কুড়িয়ে বাঁধতে থাকে। মাঝে তুলে দেখে নিয়ে যেতে পারবে কিনা।

বেশ ছোটোখাটো একটা বোঝা বেঁধে মাথায় তুলে বের হয়ে আসে।

বৃষ্টির ছাট কমে এসেছে। ফিন ফিন বৃষ্টি পড়ছে।

আঁধারে এসে ছোট পথটায় নামল মরিয়ম। কেউ কোথাও নেই। বসতের দু'একটা আলোও নিভে গেছে। ওপাশে জঙ্গলের আড়ালে সাহেববাবুর বাংলোর ক্ষীণ আলোটা জেগে রয়েছে মাত্র।

ঝড়ো বাতাসে নদীর বুকে তুফান তুলেছে।

পথের উপর কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে। জন্তু-জানোয়ার নয় তো!

বাতাস বইতে থাকে। না, কোন বোটকা গন্ধ নেই।

আবছা অন্ধকারে নিতাই বুনোকে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল মরিয়ম। অন্ধকারে ওর চোখ দুটো নীল আভাময় হয়ে উঠেছে নিশাচর প্রাণীর মত অন্ধ লালসায়।

শোন্। নিতাই বুনো এগিয়ে এসে ওর হাতটা তুলে নিজের হাতে নেয়।

চিৎকার করতে গিয়ে থেমে যায় মরিময়। কোন ফল হবে না তাতে, মুখ টিপে ধরবে বুনো। হয়তো গলাটিপেই দম বন্ধ করে দেবে।

মরিয়ম অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে।

শক্ত হাতে নিতাই ধরে ফেলেছে মরিয়মের হাতখানা। বলিষ্ঠ নিষ্পেষণে তাকে টেনে নিতে চায় কাছে। ওর কঠিন হাতের চাপ অনুভব করে মরিয়ম নিজের কোমল হাতের উপর। পট করে কাঁচের চুড়িটা ভেঙ্গে গিয়ে একটা টুকরো কেটে বসে যায় তার হাতে।

—উঃ! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে মরিয়ম।

এক ঝট্‌কায় ছিটকে পড়ে মাথার বোঝাটা নিতাইয়ের ঘাড়েই। অতর্কিত ঝাঁকানি খেয়ে আলগা হয়ে যায় ওর বজ্রমুষ্টি।

এই সুযোগে মরিয়ম ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে নিতাই। সারা শরীরে বন্য আদিম উন্মাদনা জেগেছে দুর্নিবার বেগে। অতৃপ্ত কোন জানোয়ারের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে নিষ্ফল রোষে। দাঁত কিড়মিড় করে গর্জাতে থাকে মনে মনে।

উন্মত্ত প্রকৃতির বুকে অতৃপ্ত কোন শ্বাপদলালসায় গর্জাচ্ছে নিতাই বুনো।

বর্ষার মুখে আপিসবোর্ট সরে এসেছে অপেক্ষাকৃত ছোট নদীতে, নৌকার ভিড়ও কমে গেছে। বনে গাছ চেক করার কাজও বন্ধ। দিনরাতই পঁচিশ হাত লম্বা বোটের উপরই কাটে প্রণবের। বনে নামবার ঠাঁই নেই। সব জলে ডুবে গেছে। অন্যত্র যাবার উপায়ও নেই। তুফান উঠেছে গং-এ!

বন্দী হয়ে রয়েছে বনবাসে তারা।

লোকজন নৌকাও আসে না। ক'টি প্রাণী মুখ বুজে জলে ভাসছে।

ক্যাপ ইনচার্জ গজ গজ করে—ধুত্তোর! শালার বনে চাকরি মানুষে করে?

অর্থাৎ কাঠ-মহাজনদের নৌকার আমদানী নেই; পয়সা না পেলেই মেজাজ বিগড়ে যায় তার।

বাদলা বাতাসে কাঁপছে ডিঙ্গিবোট। কাছি ছিঁড়ে অথৈ জলে যেতে পারে; সময় অসময় হাঁক ডাক করে ক্যাপবাবু।

—কাছি, ছিট নোঙর ভালো করে দেখ ব্যাটারা। কাজ তো নাই, খাবি আর ঘুমোবি; এদিকেও যদি না দেখিস যাবি একদিন ভাটার টানে সমুদ্রে ভেসে, বুঝবি তখন!

প্রণব ক'দিন বের হতে পারেনি; বড় নদীতে তুফান উঠেছে; লঞ্চের সারেং বলে—পাউড়ি দিতি পারব না হুজুর। ভর তুফান।

অধৈর্য হয়ে ওঠে প্রণব। কি যেন আকর্ষণে টানছে তাকে অলক্ষ্য থেকে। পায়চারি করে বোটের উপরই ওই চার হাত পাটাতনে। বন কেঁপে ওঠে বৃষ্টি অর তুফানের হাঁকে।

ইনচার্জ আজালে বলে—দত্তচকে কি মধু আছে রে এমতাজ?

বুড়ো সারেং দাড়ি চুলকিয়ে জবাব দেয়—কি করি কই বলেন?

জবাবটা ক্যাপবাবুর মনোমত হয় না। কিছু যেন চেপে যাচ্ছে বুড়ো সারেং।

—ব্যাটা পয়গম্বর রে?

বর্ষার কালো আকাশের দিকে চেয়ে প্রণব কি যেন দেখছে। তুফান বাড়ছে। এই সময় ভেড়ি ভেঙ্গে মানুষের আবাদ নষ্ট হয়ে যায়; ভেসে যায় ঘর-বাড়ি, জান-মাল সব। বৃষ্টির অঝোর ধারাপাতে একা বসে আজ আকাশ-পাতাল ভাবে প্রণব।

ও যেন বনের অন্তরে বন্দী হয়ে পড়েছে। মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণার দুঃখ আজ খানিকটা অনুভব করতে পারে প্রণব। বনরাজ্যে এমনি বন্দী নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোর অভিশাপ কৃষ্ণা সহ্য করে চলেছে।

আকাশের দিকে চায়, তামাটে আকাশ যেন জমাট হয়ে চেপে বসেছে। বৃষ্টি নেমেছে বিরামহীন গতিতে। অবিশ্রান্ত।

বাওয়ালি-নৌকা কোথাও দেখা যায় না। এ সময়ে কেউ আসে না ভয়ে। আতঙ্কিতভাবে বনের গভীরে সরু খালের মধ্যে তাদের রাত্রির প্রহর গুনে কাটে। এমনি বিপদের মাঝেও কৃষ্ণার কথা ভোলেনি প্রণব। ওই একজনই যা তার জীবনে মধুসঞ্চয় এনেছে।

এমতাজ সারেং আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে ওঠে,

—তারা দেখা দিয়েছে হুজুব। বাউড়ি কাটবি ইবার।

সাতদিন পর তারা উঠেছে। মেঘ পরিষ্কার হয়ে আসে।

প্রণব এসেছে। এই দুর্যোগেও আসতে ভোলেনি। তুফান কাটিয়ে লঞ্চ পাড়ি জমিয়েছে হরিণগাড়া নদীর বুকে।

কৃষ্ণা মুখ ভাব করে বলে ওঠে— মনে পড়লো তাহলে? আছি জঙ্গলের মধ্যে তোমরা শহরের মানুষ, আমাদেব কথা কি মনে পড়ে?

নদীব গোঁ তখনও থামেনি। মাঝে মাঝে ক্ষ্যাপা বাতাস তখন বনভূমি কাঁপিয়ে তোলে।

—যা তুফান! ভিজে বর্ষাতি খুলে ফেলে গা থেকে প্রণব।

হ্যারিকেনেব লাল আভায় কৃষ্ণাকে আজ অপরূপ দেখায়। ভিজে বাতাস ভেসে আসে রজনীগন্ধার সুবাস।

অসীম ওদেব এই আসবে অনুপস্থিত। ওপাশেব আপিস ঘরে বসে বসে হিসাব-নিকাশ করছে সে। বৎসব জুড়ে খরচই করে এসেছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছে, আয় ব্যয় করেছে। জমার ঘরে শূন্য। কমতে কমতে অঙ্কটা এমন একটা জায়গায় দাঁড়াবে, তা কল্পনাই করতে পারেনি।

সামনে তার আকাশজোড়া মুখগহুর ব্যাদান করে দাঁড়িয়েছে, হরিণগাড়ার চেয়ে অতল এক গহুব, এতদিনের পরিশ্রম, অর্থ সব গ্রাস করেছে। এই তার শেষ সুযোগ! এবার যদি ফসল না তুলতে পারে—আবাদ, পরীক্ষা সবই চলে যাবে। আবার ফিরে যেতে হবে মানুষের জগতে দুমুঠো অন্নের সন্ধানে। খ্যাতি সম্ভাবনার উচ্চ চূড়া থেকে অপমান পরাজয়ের অন্তহীন গহুরে বিলীন হয়ে যেতে হবে। একক নিঃসঙ্গ সংগ্রাম করে চলেছে। আজ যেন আর পারছে না অসীম।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অসহায় সে। কোথাও আর কোন সম্বল অবশেষ নেই।

জানালা দিয়ে দেখেছে প্রণবকে আসতে। উঠে যাবার স্পৃহা তার নেই।

কানে আসে ওদের তীক্ষ্ণ শব্দ, বিরক্তি বোধ করে।

উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

হিসাবের কাগজগুলো সামনে পড়ে আছে টেবিলে।

মাথায় হাত দিয়ে কি ভাবছে, আকাশ-পাতাল নেই সে ভাবনার। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অসীমের—এক উমেদার ঘুরছে কলেজে চাকরীর আশায়, না হয় সরকারী দপ্তরখানায় ঘুরছে, যদি কিছু জোটে অন্নসংস্থানের উপায়। এই তার হয়তো শেষ বিধিলিপি। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাবে সে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে বাইরে। আকাশে বাতাসে নদীর কলকল্লোল-ধ্বনি জেগে ওঠে। ওই সামগ্রিক বীভৎসতা যেন তাকে অট্টহাসি দিয়ে উপহাস করেছে— পরাজিত করে তোলবার শপথ আনছে। কিন্তু সহজে দমে যাবে না অসীম। ওঘর থেকে চাবুকের মত কৃষ্ণার হাসির শব্দ কানে আসে। ওরা যেন বিদ্রুপ করছে। নিষ্ঠুর বিদ্রুপ!

প্রণবের দিকে চেয়ে রয়েছে কৃষ্ণা। হাসির আবেগে ফুলে উঠেছে তার দেহ— টোল পড়ছে সুন্দর গালে।

প্রণব সিগারেট ধরিয়ে বেশ আরাম করেই বসেছে। বাতির আলো পড়েছে ওর সুন্দর মুখে—ভিজে একরাশ চুলে।

বলে ওঠে,

— তোমার মরিয়মের উপাখ্যান তো শুনলাম। লাগলোও মন্দ নয়। তোমার ঠিক উল্টো। অথচ এই বিপরীত মনোভাবকেও সমর্থন করা মানুষের পক্ষে অনেক সময় সহজ।

—কথাটা ঠিক বুঝলাম না প্রণব। তুমি কি ঠাট্টা করছো?

উঁহ!

কৃষ্ণার মনে কি একটা খচ খচ করে বেজে ওঠে।

প্রণব হাসিতে তরল করে আনে পরিবেশটা।

না, ঠাট্টা করছি না। একজন চায় পুরুষকে নিজের বন্ধনে এনে ঘর গড়তে! আর তুমি তা চাও না। অবশ্য মেয়েদের সেইটাই স্বাভাবিক ধর্ম। পুরুষ ভালোবেসে ঘর ভাঙ্গে, শেকল ছেঁড়ে। মেয়েরা ভালোবেসে শেকল পরে।

হাসে কৃষ্ণা—তাই কি তুমি শেকল ছিঁড়ে উধাও হয়ে শেষতক বনে-বাদায় নোনা গাঙে এসে ঠেকেছো?

—হয়তো তাই। কথাটা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। মরিয়ম ঘর বাঁধলো, আর তুমি ঠিক যেন তার বিপরীত। ঘর তোমাকে বাঁধতে পারলো না। তাই প্রতিবাদ।

কৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবছে। ও-কথা বহুবারই ভেবেছে। ভেবে কোন পথই পাইনি।

ব্যাথাভরা কণ্ঠে বলে ওঠে কৃষ্ণা—দোষটা আমাকেই দিচ্ছ প্রণব? আমার কথাটা ভেবে দেখো, এ ধারণা তোমার বদলে যাবে সেদিন।

ব্যাথা টলোটলো অশ্রু ছাপিয়ে এসেছে তার দু'চোখে ভরা নদীর মত।

বলে চলেছে কৃষ্ণা—এ ব্যর্থতার কথা কেউ জানবে না প্রণব। যদি জীবনে কোনদিন ভুল করি, জেনো, সে ভুল আমার না করে আজ কোনও পথ ছিল না। সমাজ আঙ্গুল তুলে দেখাবে, আমি পাপী। কিন্তু আমার কৈফিয়ৎ কেউ সমবেদনার সঙ্গে ভেবে দেখবে না প্রণব।

প্রণবও ভেবেছে বার বার এই কথা। বলে ওঠে,

—দুজনের মত দুদিকে বেঁকে গেছে, তাই এই গরমিল, অশান্তি।

কৃষ্ণার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। চুপ করে কি যেন ভাবছে সে।

এ ভাবনার কূল তল নাই।

বহু চেষ্টা করেও এই পরিবেশকে আপোস করে নিতে পারেনি। অসীমও সেই দূরেই রয়ে গেছে। দোষ কি তার একার! আর কারও কি কোন কর্তব্য নেই?

অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে কৃষ্ণা— মেয়েরা স্বভাবতই নির্দোষ। দোষ, পাপ—তথাকথিত অপরাধ যখন তারা করে, তার পিছনে মস্ত বড় আঘাত, বহু সঞ্চিত অপমান অবহেলাই বড় হয়ে থাকে? পুরুষ বিচারক কোনদিনই তা দেখেন না। একতরফাই রায় দেন তাঁরা।

প্রণব নীরবে সিগারেট টানতে থাকে। রাত্রি ঘনিয়ে আসছে। অন্ধকারে খাবের ঘাটে মোচার খোলার মত দুলছে লঞ্চটা। টিম টিম করে মাথায় জ্বলচে আলো।

আলোচনাটা কেমন মন ভারি করে তোলে। উঠে দাঁড়াল প্রণব।

—রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, আজ চলি কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা কথা কইল না, চোখ তুলে চাইল মাত্র।

স্তব্ধতা কাটিয়ে বলে ওঠে প্রণব—আমাকে ভুল বুঝো না, কৃষ্ণা, এমনি বলছিলাম কথাগুলো।

ক্লান্তস্বরে জবাব দেয় কৃষ্ণা—না। নিজেকে নিয়েই ভেবে উঠতে পারি না, ওসব ভাববো কখন। তোমাকে ভুল বুঝবার কিছু নেই, আমার পরিচয়ও তোমার অজানা নয়। রাত্রি হলো— এখন এসো।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল প্রণব। কৃষ্ণা একাই বসে থাকে স্তব্ধ হয়ে! পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল। অসীম ঢুকেছে ঘরে।

কেমন যেন সন্দিগ্ধ চাহনি ওর। কৃষ্ণা চটে ওঠে। কে জানে এতক্ষণ যেন আড়াল থেকে দেখছিল তাদের।

—সাড়া দিয়ে আসতে নেই?

অসীম বলে ওঠে—ব্যাঘাত ঘটাতে সাহস করিনি।

চাবুক খাওয়া জানোয়ারের মত উঠে বসলো কৃষ্ণা।—মানে? গোয়েন্দা-গিরি করাও অভ্যেস আছে না কি? ছিঃ ছিঃ!

চারিদিকে যেন দুর্বার মেঘ ঘনিয়ে আসছে অসীমের। ক্লান্তি হতাশা দুশ্চিন্তা তাকে ঘিরে ধরেছে। আর পারছে না সেই বোঝা টানতে। কৃষ্ণা কোনদিনই সে সংবাদ রাখবার প্রয়োজন বোধ করে না। শুধু নিজেকে নিয়েই তৃপ্ত থাকবার বাসনা তার। তাতে সামান্য অসুবিধার আভাস পেলেই ক্ষেপে ওঠে ওরা।

অসীম ওর হীন কথাবার্তায় যেন শিউরে ওঠে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

এগিয়ে এসেছে কৃষ্ণা। স্বামীর দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে— থামলে কেন? বলেই ফেল কথাটা। নোংরা মন নিয়ে সমাজে বাস না করে বনবাসে এসে ভালোই করেছো।

চলে যাচ্ছিল অসীম।

হঠাৎ যেন তীব্র চাবুকের আঘাত খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

আবছা আলো পড়েছে কৃষ্ণার মুখে। মনের কালো আর জ্বালা ফুটে উঠেছে ওর চাহনিতে।

অসীমের ধৈর্যের বাধ আজ ভেঙ্গে গেছে। কঠিন কণ্ঠেই প্রতিবাদ জানায় সে ওর কথায়।

—সমাজের নোংরামি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই এসেছি এখানে, তাও দেখছি রেহাই নেই।

—কি বললে?

মুখে চোখে আগুনের জ্বালা ফুটে ওঠে কৃষ্ণার। মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। কি যেন অপরিষ্কার ইঙ্গিত করতে চায় অসীম। ঘৃণায় রি রি করে ওঠে মন ওর উপর।

অসীম কথা বাড়াতে চায়নি। তবু না বলে পারেনি কথাটা স্ত্রীর কাছে আর কিছু নাহোক অপমানিত হতে সে চায়নি। তারই প্রতিবাদ করেছে মাত্র।

গম্ভীর ভাবে বের হয়ে এল কৃষ্ণার প্রশ্নের জবাব না দিয়েই।

নিষ্ফল ব্যর্থতায় নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় আছড়ে পড়লো কৃষ্ণা। সবই ঘটেছে তার ভাগ্যে, শেষকালে এও জুটলো। মনে যেন ঝড় উঠেছে বাইরের বাদল বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

কথাটা বলে অসীম নিজেও অনুশোচনা পায়। নানা দুশ্চিন্তায় তার মাথার ঠিক নেই। ফস্ করে কথাটা বলে ফেলেছে উত্তেজনার বশে। রাত্রিতে ঘুম আসে না। চারিদিক থেকে অশান্তির আগুন জ্বেলে নিজে পুড়ে থাকতে সেও নারাজ। ধীরভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে থাকে।

কৃষ্ণার দিক থেকেও বলবার অনেক কিছুই আছে। শহরের জীবনে সে মানুষ। তার কাছে এই জনহীন আরণ্যক পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠবে—তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। জানালার বাইরে এসে হানা দিচ্ছে উন্মত্ত বাতাস। সামনে অমাবস্যার কোটালের বান ডাকবে। প্রচণ্ড হয়ে উঠবে জলের চাপ। অজানা কোন সর্বনাশের আতঙ্কে শিউরে ওঠে অসীম।

তন্দ্রা নামে চোখের পাতায়। ক্লান্তি আসে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। হঠাৎ কাদের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যায়। কে যেন ডাকাডাকি করছে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো অসীম। ভোর হয়ে আসছে, তখনও সূর্যের দেখা নেই। মেঘে ঢাকা রয়েছে আকাশ।

হাঁপাচ্ছে কাশেম বাওয়ালি— ভেড়ির দক্ষিণ কোণে নোনা জল লেগেছে বাবু।

নোনা জল! শিউরে ওঠে অসীম।

ক্ষুরধার জিহ্বা ওই নদীর। এক লহমায় গ্রাস করে ফেলবে, ওর স্পর্শে নিঃশেষ করে দেবে দিগন্তপ্রসারী ওই সবুজের স্বপ্ন। ব্যর্থ করে দেবে অসীমের প্রাণঢালা পরিশ্রম—সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ। সমস্ত শক্তি যেন একত্রিত পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে তার দেহ মনে।

—কুলিদিকে খবর দে, বাঁধে যেতে বল। নিতাই বুনোকে খবর দে এখুনি। আমি আসছি।

লাফ দিয়ে উঠল অসীম বিছানা থেকে। তৈরি হয়ে বের হয়ে উঠল ভোরবেলাতেই।

এ বাড়িতে তখনও কেউ জাগেনি।

অমাবস্যার কোটাল শুরু হয়েছে। ফেঁপে ফুলে উঠেছে জলধারা। পিঠেন বাতাসে দূর বাঁকের মাথা থেকে সফেন নোনা জল এসে আছড়ে পড়ছে লাখো-ঢেউ এর মাথায়। ঢেউ ফাটছে— সাদা ফেনা ছিটকে ওঠে চারিদিকে।

আথাল পাথাল ঢেউ। থৈ থৈ নদী। খরস্রোতা নোনা জল মাটিকে গলিয়ে দিচ্ছে তিলে তিলে, কুলিরা দলবদ্ধ ভাবে লেগেছে বাঁধে মাটি ফেলতে। অসীম দাঁড়িয়ে রয়েছে রেন্‌কোট গায়ে চাপিয়ে। হাঁটু অবধি উঠেছে কাদা! বৃষ্টির ঝাপটা মুখে বেঁধে তিরের মত।

দলে দলে ভাগ করে চলেছে ওরা ভেড়ি পাহারা দিতে! চারিদিকেই খাল। খোলা ডিঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। মাঝে মাঝে উঠছে বাঁধে। চারিদিকে সন্তর্পণী দৃষ্টি মেলে চলেছে ওরা। কোথাও যেন ফাটল না দেখা যায়। হানা-মুখের সামনে কাজ করাচ্ছে অসীম নিজে। ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি চলেছে। নরম পাঁক মাটি তাও জিবের ধারাল ডগায় সাপটে নিচ্ছে অকুল নদী। তবুও ঢালার বিরাম নেই ওদের।

—ফেল মাটি।

মাটি নেই যেন। সব জল আর জল।

বসতের কাছে উঁচু ডাঙ্গা থেকে মাটি আনছে ওরা।

সোনার চেয়ে দামী ও মাটি।

হানামুখে ফেলছে।

খোলা ডিঙিতে নিতাই বুনো বসে আছে—দাঁড় বাইছে ইরফান। মাটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওপাশের ভেড়িতে। ঢেউ-এর মাথায় টপকে চলেছে ডিঙি। মোচার খোলার মত এপাশ ওপাশ করছে প্রচণ্ড ঢেউ-এ। বৃষ্টি নেমেছে—আঁধার করা বৃষ্টি। নজর চলে না সামনে।

নিতাই বুনো কি যেন ভাবছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বহুদিনের কামনার ব্যর্থ জ্বালা। তমসাচ্ছন্ন রাতে কার নরম হাতের উষ্ণ স্পর্শ, অস্ফুট একটু আর্তনাদ। সারা দেহমন উন্মাদনাময় হয়ে ওঠে। দুটো কালো ডাগর চোখের চাহনি!

মরিয়ম! মরিয়মের যৌবন তাকে বেহুঁশ করে দিয়েছে। নিতাই বুনোর বিশ্রী চোখে কি এক হিংস্র পাশবিকতা। ডিঙির পাশে চাইতেই নজরে পড়ে নদীর জলে কালো কালো কয়েকটা কুৎসিত জানোয়ার কিলবিল করে নড়ে বেড়াচ্ছে।

কামট। ঝাঁকবন্দী সমুদ্রের জলের সঙ্গে আক্রমণ হানতে এসেছে লোকালয়ে। সাপের চেয়েও ক্রুর, বাঘের চেয়েও হিংস্র ওরা। ধারাল ন'পাটি দাঁত দিয়ে নিমেষের মধ্যে কুরে কুরে খেয়ে ফেলবে মাংস। শ্বাপদ লালসায় বর্ষার জলে ওরা মেতে উঠেছে। দাপাচ্ছে ডিঙির আশেপাশে।

হঠাৎ চমকে ওঠে ইরফান। নিতাই বুনোর চোখ মুখে কি এক বীভৎসতা ফুটে উঠেছে। এগিয়ে আসছে বুনো হাল ছেড়ে তার দিকে। টলমল করছে বেহালে বোঝাই নৌকা।

—সর্দার! অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে ইরফান।

— চোপ! নিতাই ক্ষিপ্ত উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে ইরফানকে ছিটকে ফেলে দিল মাঝ নদীতে তুফানের মাঝে। প্রাণপণে হাত বাড়িয়ে সাঁতার দিয়ে ডিঙিটা ধরবার চেষ্টা করে ইরফান।

হালে মোচড় দিয়ে নৌকা পাওড়িতে তুলে দিল নিতাই, নিপুণ বেগে ওর নাগালের বাইরে চলে গেল।

ছিটকে পড়ল ইরফান অথৈ জলে। নোনা জলের মাতনে ওঠানামা করছে সে।

আর্তনাদ করে ওঠে অসহ্য বেদনায়। মুখে চোখে ফুটে ওঠে মৃত্যুভয়। কামটের ঝাঁক তাড়া করে আসছে, জলে চিক চিক করছে ওদের শাণিত দাঁতগুলো। কালো জল ইরফানের তাজা রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ক্ষীণ অসহায় কণ্ঠে দিগন্তে চিৎকার করে ওঠে সে।

নিতাই বুনো দেখেছে। মুখে ওর হাসির আভা। হাসছে ঠা ঠা করে সে। ইরফানের আর্তনাদ শোনবার মত কেউ নেই ধারে কাছে।

পাগলা বাতাস আর মত্ত নদীর হুঙ্কারে ডুবে গেল তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। কামটের ঝাঁক ঘিরে ফেলেছে তাকে। আর রেহাই নেই। জ্বালা করছে সর্বাঙ্গ তীব্র বিষে। একটা কামটা পা ধরে জলের নীচে টেনে নিয়ে চলেছে তাকে। বার বার নিষ্ফল চেষ্টা করেও জলের উপরে থাকতে পারে না ইরফান। তলিয়ে গেল অতলে। হাত দুটো দিয়ে শূন্যে কি যেন ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেল শেষবারের মত।

নিতাই বুনো স্থির হয়ে হালে বসে আছে। ইরফানকে তার ডিঙিতে উঠতে কেউ দেখেনি। সে ইরফানের বিষয় কিছু জানে না। বাদাবনের কানুন তার গায়ে হাত দিতেও পারবে না। খুশিতে মন ভরে ওঠে নিতাইয়ের। এতদিনে পথ পরিষ্কার হলো তার। নিশ্চিত মনে ফিরে চললো নিতাই বুনো।

ল্যাল করমচার মত চোখ দুটো আরও লাল হয়ে উঠেছে ইরফানের, পোড়ানো লোহার মত লাল হয়ে উঠেছে।

হানামুখ বন্ধ করেছে অসীম সমস্ত শক্তি দিয়ে। বাধা পেয়ে জলধারা রুদ্ধ আক্রোশে ফিরে যায়। বাঁধে বাঁধে মোতায়ন করে দেয় লোকজন, পাহারা।

দূরে বুড়ো পুরন্দর দাঁড়িয়ে বাঁধের মাথায়। হাওয়ায় উড়ছে তাব শণ-সাদা চুল, ছেঁড়া কাপড়খানা। দু'হাত শূন্যেব দিকে তুলে চিৎকার করছে সে।

—আয় আয়, ছুটে আয়। তোরও তেজ কমে গেছে বনবিবি! তুইও মার মত বুড়ো হয়েছিস। নে, মজা দেখ এইবার।

কাশেম বাওয়ালি ঘর্মাক্ত কলেবরে কাদামাখা কোদাল তুলে ছুটে যায় ওর দিকে।

— দোবনি এক কোপে দুআধখানা করে! নোলা জল আসলি খাতি পাবি যে চার হাত বার করি, শালা হারামী।

হাসে বুড়ো হাঃ হাঃ করে, লাল মাড়ি বের হয়ে পড়েছে, ঝুলে পড়েছে মুখের চামড়া।

হাওয়া খাবো, বনের হাওয়া। দক্ষিণা রায়ের দরগায় পড়ে থাকবো, বুঝলি?

এগিয়ে এসে বুড়োকে ধরে ফেলে একজন। লাফ দিয়ে এসে ওর কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে কাশেম।

বাধা দেয় অসীম।

—ছেড়ে দে ওকে। নজর রাখিস, যেন কোদাল টাঙ্গ্না হাতে না পায়, বাঁধে কোপ না দিতে পাবে কোনখানে। ওকে বিশ্বাস নেই; নজরে রাখবি।

—শ্যাষ করি নোনা জলে ভাসাই দিমুনে। গজরায় কাশেম বাওয়ালি।

যুদ্ধ জয় করেছে তারা। আজকের কোটালের বান বাধা পেয়েছে। জোয়ারের জল আবার কল কল শব্দে ফিরে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

আবার মাটি জেগে ওঠে। নরম মিঠে মাটি।

মেঘে ঢাকা আকাশ ফেটে একফালি রোদ নেমেছে শস্য শ্যামল মাঠে।

বাতাসে দুলছে ঘন সবুজ মোটা মোটা গাছগুলো, তৃপ্তিতে আনন্দে মাথা আন্দোলিত করছে।

অসীম হালকা মনে ফিরছে বাড়ির দিকে। কৃষ্ণার সঙ্গে গতরাত্রির অপ্রিয় ঘটনাটা আবার তার মনে ফিরে আসে। নিজের কাছেই লজ্জা বোধ হয়। কি ইতর অসভ্যের মত কুশ্রী একটা ইঙ্গিত করেছিল সে। ঘৃণায়

তার মন ভরে ওঠে। নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়। সত্যই একজনের দিকে চাইবারও অবকাশ হয়নি।

মাঠে সবুজ ধানের ক্ষেতে উঠেছে বাতাসের সুর।

দিক প্রসারী সবুজ মাঠের বুকে বাঁচার আশ্বাস জেগেছে।

ফিন ফিন ধারায় নামে বৃষ্টি।

সকালের বিছানা থেকে উঠে কৃষ্ণা অবাক হয়ে যায়। অসীম নেই, কোথায় সে গেছে। গতরাত্রির ঘটনাটা কৃষ্ণা ভুলতে পারেনি তখনও। অপরিসীম ঘৃণায় শিউরে ওঠে সে। কোথাও আলোর এতটুকু নিশানা নেই। মেঘ আর ঝড় চলেছে অনবরত। এ-রাজ্যের সব আলো মুছে গেছে। মানুষের হাসি, আনন্দের স্পর্শ এখানে নেই। আকাশ-বাতাস জুড়ে জেগে উঠেছে আরণ্যক জীবনের বীভৎসতা।

কি একটা জরুরী কাজে বের হয়েছিল প্রণব। দুটো ফরেস্ট আউটপোস্টে ওদের রিপোর্ট পাঠাবার কাজ ছিল। তাছাড়া ক্যাপে জরুরী দরকারও ছিল, ফিরতি পথে একবার থেমে যায় দত্তচকে।

কৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বারান্দায়। ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল মাত্র। যেন সাধারণভাবেই ওর পথ চেয়েছিল।

উঠে আসে প্রণব।

—অসীমবাবু কোথায়? তাঁকে দেখছি না!

— কে জানে, মাঠে গেছেন, না হয় অন্য কোথাও।

—এই দুর্যোগে?

কথা বলে না কৃষ্ণা। মুখ চোখ থমথমে আকাশের মতই মেঘাবৃত, গম্ভীর। কি সর্বনাশের মৌনতায় আবৃত করে রেখেছে নিজেকে। প্রণব বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে।

সোঁ সোঁ গর্জন ভেদ করে শোনা যায় জল-কল্লোল। ধেয়ে আসছে কোটালের জোয়ার। সকাল থেকেই তুফান উঠেছে। বৃষ্টিও ছাড়বার নাম নেই। কৃষ্ণার কথায় তার দিকে চেয়ে থাকে প্রণব। এ যেন অন্য এক অপরিচিত নারী, যাকে প্রণব কোনদিনই চেনেনি। নিজের প্রতিজ্ঞায় আজ দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে সে।

হঠাৎ কৃষ্ণা প্রণবের দিকে চেয়ে থাকে।

ওর দুচোখে কি যেন নীরব জ্বালা। এই কৃষ্ণাকে বহু অতীতে একবার দেখেছিল প্রণব। যেদিন তাকে শেষ বিদায় জানিয়েছিল।

আজ!

কৃষ্ণা গম্ভীর সুরে বলে ওঠে—

—আমাকে ক্যানিং কিংবা হাসনাবাদে পৌঁছে দিতে পারো প্রণব আজই? চমকে ওঠে প্রণব। আজই সেই ঝড় উঠেছে।

—কেন? প্রণব বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে। সবটাই যেন হেঁয়ালি বলে বোধ হয় তার। আজ কাকে চরম আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে কৃষ্ণার বিদ্রোহী নারী মন।

অসহায় কণ্ঠে বলে উঠে কৃষ্ণা— এ অপমান আর সহ্য করে থাকতে পারছি না প্রণব। সব হারিয়েছি, তবু চেষ্টা করেছিলাম এখানে থাকবার। কিন্তু আমার আত্মসম্মানটুকুকেও নিঃশেষ করে পড়ে থাকবার মত দুদিন মানতে রাজি নই। আমার পথ আমি করে নিতে পারবো। আর্তি ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরে।

কাল রাত্রে হয়তো কিছু ঘটেছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। একটা অনুমান করে প্রণব।

বেদনাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলে ওঠে—

—আমার জন্যই তোমার এই অপমান।

দুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ক্লান্ত উদাস কণ্ঠে বলে কৃষ্ণা—

—ঠিক তা নয়, তুমি একটা অজুহাত মাত্র। এদিন আমার আসতোই। দুদিন আগে না হয় পরে।

প্রণবের মনেও কোথায় হাহাকার করে ওঠে এমনি এক বাদল দিনে। আজ প্রণবের মনেও হারানো

দিনগুলো ভিড় করে আসে। সেই স্বপ্নে-দেখা কত স্বর্ণসন্ধ্যা, মনের কোণে তার ঔজ্জ্বল্য বিন্দুমাত্রও বিলীন হয়নি এখনও। ভালো সে একজনকেই বেসেছিল, তারপর আর জীবনে প্রেম আসেনি।

আজ সে বিশ্বাস করে, প্রেম জীবনে একবারই আসে প্রত্যেকের জীবনে। শতদলের মত তিলে তিলে হৃদয় কমল একবারই প্রেমের স্পর্শ সৌরভসঞ্জীবিত হয়ে ওঠে—তার পরই আসে তার পাপড়ি খসার পালা। একে একে ঝরে যায় জীবনকমল।

প্রণবের জীবনেও কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করেই প্রেমের সেই প্রথম উন্মেষ হয়েছিল। পরবর্তী জীবন সেই হারানো স্মৃতি-সৌরভে ভরা।

ওর হাতখানা তুলে নেয় প্রণব নিজের হাতে। দু'চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে সেই সন্ধ্যার আকুতি।

—কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা চেয়ে থাকে ওর দিকে।

আকাশে বৃষ্টির ধারাপাত নেমেছে। থমথম করছে গাং। কৃষ্ণার চোখে তেমনি টলমল হতাশার বেদনা।

—আশ্রয় তুমি আমাকে দিতে পারো না প্রণব। আমাকে নিয়ে চল এখান থেকে। এ কারাগার থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও, তোমার ঋণ জীবনে ভুলবো না। এইটুকুর বেশী দাবী তোমার কাছে আজ নেই।

নিঃশেষে সমর্পণ করেছে কৃষ্ণা প্রণবের হাতে নিজেকে। দু'চোখে জল ভেসে আসে। অসীমের নিদারুণ অবহেলা—নিরাসক্তি তাকে আজ নিঃস্ব করে তুলেছে।

প্রণব কি ভাবছে। বলে ওঠে—

—কিন্তু গেলে ফেরার পথ থাকবে না কৃষ্ণা, সেটা ভেবে দেখেছো?

—সব ভেবেই যাচ্ছি আমি। এর সমস্ত দায়িত্ব আমার। আমাকেই লোপ কবেছে, এ-বদনাম তোমায় পোহাতে হবে না।

—না, তা বলছি না।

প্রণবের পৌরুষে কোথায় যেন আঘাত লাগে, এ-দায়িত্ব সে পরম আনন্দেই নিত। এর জন্যই পথ চেয়ে বসেছিল কত বছর। কিন্তু কৃষ্ণাই তাকে সেদিন বঞ্চিত করেছিল।

কি ভেবে প্রণব বলে ওঠে—বেশ, চলো, আমার লঞ্চে সোজা ক্যানিং-এ তুলে দিয়ে আসবো।

—যাবে? কৃষ্ণা ওর দিকে চাইল।

ভুলে গেছে কৃষ্ণা তার বর্তমান। প্রণবের হাতে তার একখানা হাত। নিবিড় চাহনিতে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। হঠাৎ সামনেই নজর পড়তে বিস্মিত হয়ে যায়।

অসীম এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁটু অবধি কালো কাদা—জামা-প্যান্ট ভিজে গেছে নোনা জলে; মূর্তিমান বিশৃঙ্খলার মত এসে দাঁড়িয়েছে নীরবে। দু'চোখে তার ক্লান্ত চাহনি ভেদ করে ফুটে উঠেছে অনল-জ্বালা। সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠেছে তার চেহারায়। সে পৌরুষে এই আদিম অরণ্যের গাছপালা কেটে মানুষের উপনিবেশ গড়ে তুলেছে, বন্ধ্যা মৃত্তিকায় এনেছে সোনা-ফসলের ইঙ্গিত, আদিম আরণ্যক জীবনের সমস্ত বিভীষিকা হিংস্রতাকে অগ্রাহ্য করেছে —সেই সুপ্ত পৌরুষত্ব, মানবত্ব আজ মাথা তুলে দাঁড়িযেছে তার সামনে। কৃষ্ণা তাকে চেনেনি।

আজ অতর্কিতে সেই মানুষটিকে দেখে চমকে ওঠে কৃষ্ণা। ওর বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে তুচ্ছ বলে মনে হয় আজ। ওর ইচ্ছার সামনে নিজেকে প্রকাশ করবার সাহস নেই।

চুপ করে কৃষ্ণা, নিমেষের মধ্যেই বদলে গেছে।

প্রণব চমকে উঠেছে ওকে দেখে। অসীমের দু'চোখে ফুটে উঠেছে অপরিসীম ঘৃণা। এগিয়ে আসে অসীম তাদের কাছে দীর্ঘ পদক্ষেপে।

কৃষ্ণা মুখ তুলে চাইল। সে দৃপ্ত ভঙ্গী আর নেই। প্রতিবাদ করবার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে।

বলে ওঠে অসীম— যেতে হয় আমার লঞ্চেই যেতে পারো— যে-কোন সময়, যখন তোমার খুশি। প্রণবের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে কৃষ্ণার দিকে এগিয়ে গেল অসীম। প্রণবের অস্তিত্বটুকুকেও অগ্রাহ্য করছে অসীম।

প্রণব উঠে দাঁড়াল। থমথমে আবহাওয়া। ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে স্তব্ধতা। ওদের কাছে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির কোন দাম নেই। প্রণব নিজেকে এখানে নেহাৎ অবাঞ্ছিত বলে মনে করে। এই স্বল্পবাক্ লোকটিকে আজ সে এড়াতে চায়; বনের মাঝে অমনি ব্যক্তিত্ব না থাকলে সে উপনিবেশ গড়তে পারতো না। প্রণব সেই ব্যক্তিত্বের সামনে আজ নিজেকে অনেক ছোট মনে করে।

কৃষ্ণা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

বের হয়ে গেল প্রণব। অসীমের নীরব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করে চলেছে। প্রণব বেশ অনুভব করে, স্থির গম্ভীর ওই লোকটির দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সামনে মাথা তোলবার সামর্থ্য তার নেই।

অসীম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি এক নাটকীয় মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে জীবন-নাট্যের সমস্ত ধারাকেই ওলট-পালট করে দিল এক মুহূর্তে।

এরপর প্রণবও সাবধান হবে ওর ব্যবহারে। কৃষ্ণাও তার ক্ষণিকের দুর্বলতার মূল্যহীনতা বুঝতে পারবে।

নীরবতা ভঙ্গ হয়ে যায় অসীমের কণ্ঠস্বরে—অতুল, স্নানের জল দে।

একাই দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণা। অসীম ভিতরে চলে গেছে। বাতাসে ঝড়ের গর্জন থেমে গেছে। চারিদিকে জোয়ারের জল নেমে গিয়ে জেগে উঠেছে কালো মাটি।

কৃষ্ণা চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।

স্তব্ধতা ভেদ করে কানে আসে কার কান্নার শব্দ। মরিয়ম কাঁদছে। জলো হাওয়ায় দমকা বাতাসে বিস্তৃত নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে তার কান্নার সুর। চমকে ওঠে কৃষ্ণা—এ-জগতের মাঝে ওর হাসিই ছিল এতটুকু প্রাণের সম্পদে ভরপুর, সেও না কি হারিয়ে গেল। ইরফান ঘরে ফেরেনি। সে আবার ফেরারি হয়েছে বনের ডাকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণা বারান্দায়। সারা আবহাওয়া ভরে উঠেছে মরিয়মের কান্নার সুরে। মরিয়মের ঘর বাঁধার আনন্দ দেখেছিল সে। দুর্বার সে আনন্দ। সবুজ বনের বুকে প্রথম রাঙ্গানো রোদের মত রাঙ্গিয়ে তুলেছিল তাকে সেই ভালো লাগা।

আজ আবার সে সব হারিয়েছে। ফেরারি মানুষ আবার সমুদ্রের ডাকে বনের মাঝে, বিস্মৃতির আবরণে তলিয়ে গেছে।

নিতাই বুনো ঘরের মধ্যে ছেঁড়া চারপাই-এ শুয়ে শুয়ে হাসছে। পৈশাচিক বীভৎস সে হাসি।

মরিয়মের সেই কান্না তার মনে ধীরে ধীরে অদম্য এক পাশব প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছে।

বদলে তুলেছে সেই লালসার আগুন ওই বনের জানোয়ারটাকেও।

বারান্দার ওদিকে এসে থমকে দাঁড়ালো কৃষ্ণা। মুখ থেকে বের হয়ে আসে অস্ফুট আর্তনাদ। অসীম ওপাশে কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে কৃষ্ণার প্রিয় লাল রেড-আইল্যান্ড মোরগটার। ঝটপট করে ডানা ঝাপটাচ্ছে তাজা প্রাণীটা আত্মরক্ষার নিষ্ফল প্রচেষ্টায়।

—কি করছো? আর্তনাদ করে ছুটে গেল কৃষ্ণা।

ফিরে চাইল অসীম। চোখে মুখে তার কঠোর কাঠিন্য। এ যেন অন্য কোন এক মানুষ।

কোন কথা না বলে অভ্যস্ত নিপুণ হাতে বসিয়ে দেয় ছুরিটা মোরগটার কণ্ঠনালীতে। ঝলকে ওঠে রক্ত, ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। অসীমের বলিষ্ঠ হাতের মুঠি চুঁইয়ে পড়ছে বিন্দু বিন্দু তাজা রক্ত। অসহ্য বেদনায় ঝটপট করছে অর্ধমৃত মোরগটা।

কৃষ্ণার কথার জবাব দেয় অসীম।

—ক'দিন মাছ ডিম প্রায় কিছুই জোটেনি। খেতে হবে তো, তাই একেই শেষ করলাম।

আছাড়ে ফেলে দিল রক্তাক্ত দেহটাকে মেঝের উপর, দু'হাতে তখনও রক্তের দাগ।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কৃষ্ণা ওর দিকে নিস্পন্দ নির্বাক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে। নিজেও আদর করতো

অসীম, খেতে দিত মোরগটাকে। আজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করলো না। এ কোন্ মানুষ!

অসীমের দিকে চেয়ে সারা মন যেন স্তব্ধ হয়ে আসে। ওর এই সুপ্ত পৌরুষ, এই নিষ্ঠুরতা কৃষ্ণার মনে নতুন এক অনুভূতির সাড়া জাগায়।

এ অসীম যেন নোতুন কোন মানুষ।

—জল দিয়েছি বাবু: অতুল এসে দাঁড়াল।

—যাই। হাতের রক্তাক্ত ছুরিটা ফেলে দিয়ে গেল ঐখানেই। যাবার সময় বলে ওঠে অসীম,

—মাংসটা বানিয়ে নে অতুল।

কৃষ্ণা চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঠের পুতুলের মত। সব স্বপ্ন তার রুঢ় কঠোর বাস্তবের সম্মুখে আজ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে।

সোঁ সোঁ ডাকছে নদী— ঝড় উঠেছে বনে বনে।

আবার জোয়ার আসে।

রাত্রি নেমে আসে। অমাবস্যার রাত্রি।

কোথাও তারার কণামাত্রও ভুল কবে জ্বলে ওঠে না। দূরে বাতাসের গর্জন ভেদ করে ভেসে আসে নদীর মত্ত রোল, লাখো হাতে করতালি দিয়ে চলেছে সাগরের সৈন্যদল মানুষের বসতির দিকে হানা দিতে। পূর্ণগর্ভা রমণীর মত স্তিমিত নদী মুখ বুঁজে কি এক দুর্বার শক্তি, মদমত্ত অনুপ্রবেশের অসীম যন্ত্রণা পরমানন্দে সহ্য করে চলেছে।

মরিয়ম কাঁদে।

রাতের অন্ধকারে কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে চুপ করেছে। সারা মনে তার আহত নারীর অপমানবোধ। কি সে দেয়নি ওই ইরফানকে ? ইরফান বেইমান! তাকে এমনি করেই ফেলে পালালো!

বার বার পালিয়েছে সে। বাঁধতে তাকে পারেনি মরিয়ম। এত চেষ্টা করেও পারেনি।

আজ চুপ করে কি ভাবছে মরিয়ম; বেদনাটা লেগেছে মনে, হতাশার বেদনা। ইরফান এই দরদী দিলের কদর বুঝল না!

রাত কত জানে না। চারিদিকে জেগে উঠেছে আদিম আরণ্যক জীবনের স্পন্দন। দূরে বনভূমির বুক থেকে, জলে-ডোবা অরণ্য থেকে ভেসে আসছে বাঘের গর্জন। নদীর জল কাঁপছে থর থর করে কি এক অজানা আতঙ্কে।

ঘরের বেড়াটা ঠেলে কাকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠলো মরিয়ম।

জীর্ণ বিছানায় চকিতের মধ্যে সোজা হয়ে বসল!

বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তিটা। কালো দীর্ঘ দেহ, লাল চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, কেঁপে ওঠে প্রতিটি অঙ্গ অজানা আতঙ্কে। কেরোসিনের কুপীর লালচে আলো পড়েছে নিতাই বুনোর মুখে চোখে। কুটিল হিংস্র চাহনিতে ফুটে ওঠে পাশব লালসা। বহুদিনের সঞ্চিত কামনা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে তাতে।

ভয়ে আঁতকে ওঠে মরিয়ম। পালাবার পথ নেই।

চীৎকার করে কোন ফল নেই। মরিয়ম যেন স্বপ্ন দেখছে। কুশ্রী একটা স্বপ্ন।

—মরিয়ম!

বলিষ্ঠ দুটো বাহু দিয়ে নিবিড় নিষ্পেষণে চেপে ধরে তাকে বুনো নিতাই। শিরায় শিরায় মেতে উঠেছে আদিম বন্য রক্ত।

মরিয়ম ওর বলিষ্ঠ বন্ধন থেকে প্রাণপণে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার সামান্য শক্তিটুকু অসুরের

মত্ত শক্তিমান ওই বুনোর কাছে কোন কাজেই লাগলো না। সমস্ত দেহমন জুড়ে নেমে আসছে ওর কঠিন স্পর্শ। মরিয়ম আজ ক্লান্ত, অবহেলিত, কোন নির্ভর আজ তার নেই। আত্মরক্ষা করার শক্তিটুকুও সে হারিয়েছে।

নিতাই বুনোর কণ্ঠস্বর কাঁপছে উত্তেজনায়।

—চল্ এখান থেকে। ফিস্ ফিস্ করে বলে নিতাই, —পয়সার অভাব আমার নেই, গতরও আছে। চল, অন্য আবাদে চলে যাই।

বৃষ্টি থেমেছে।

নীরব হয়ে আসে গাছ-গাছালির বুকের আলোড়ন।

নিশুতি রাত।

তারা জ্বলা রাত।

সমস্ত পরিবেশে কি যেন একটা নিবিড় শান্তির আশ্বাস জেগে ওঠে। বাঁচবার — নোতুন করে ঘর বাঁধার আশ্বাস।

চরম ধ্বংসের পরও পৃথিবী বেঁচে থাকে।

মানুষ বেঁচে থাকে আবার ঘর বাঁধে।

ভাঙ্গা ঘর নোতুন করে বাঁধে।

—মরিয়ম!

নিতাই বুনো ডাকছে তাকে।

কাঁপছে মরিয়ম। হাওয়া কাঁপা বেতবনের মত কাঁপছে।

সারা মনে আজ ব্যর্থতার জ্বালা।

ব্যর্থ অপমানিত হয়েছে মরিয়ম।

সে চেয়েছিল এতটুকু ঘর, এতটুকু ভালোবাসা।

একজনকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চেয়েছিল, সব সাধনা তার সেই সামান্যতম একটুকু চাওয়াকে ঘিরে।

ইরফান তার সেই সাধনা ব্যর্থ করে দিয়েছে। সব আশায় এনেছে হতাশার অন্ধকার।

পুরুষ ব্যর্থ করেছে চিরন্তন কোন নারীকে।

এতদিনের ভালো লাগার স্বাদ তবু ভুলতে পারে না মরিয়ম।

এই ঘর, এই পরিবেশে ইরফানকে ভোলা যায় না। নিতাই বুনো আজ যেন আরও দুর্মদ হয়ে উঠেছে,— নিষ্ঠুর এই মৃত্তিকা, এই আরণ্যক রহস্যময় পরিবেশের মতই অজেয় সে।

মরিয়ম বলে ওঠে— ইরফান যদি ফেরে?

হাসছে নিতাই বুনো। হিংস্র পশুর মত সেই অট্টহাসি আঁধারে কেঁপে ওঠে। জ্বলছে দুচোখ।

মরিয়ম ভয় পেয়েছে। ভীত চকিত চাহনি মেলে চেয়ে থাকে ওর দিকে! নিতাই বলে ওঠে,

— সে আবার উধাও হয়েছে, মৈরাম। আর ফিরবে না। ফিরতে পারবে না।

—হাসির কুশ্রী শব্দটা আবার জেগে ওঠে।

—এ্যাই!

মরিয়ম যেন কেঁপে উঠেছে ওর ওই বিশ্রী হাসিতে। রুখে দাঁড়িয়েছে সে!

—যা এখান থেকে! যা বলছি!

নিতাই এগিয়ে আসে। স্থির কণ্ঠে বলে ওঠে,

—ইরফান আর ফিরে আসবে না।

মরিয়মের হাতটা শক্ত করে ধরেছে নিতাই। আজ সে ফিরে যাবে না শূন্য হাতে। জোর করেই দখল করবে সব কিছু সে।

—আবার ঘর পাতবি মৈরাম, চল! এ মাটিতে শাপ লেগেছে। মরা মাটি। নোতুন করে বসত গড়বো

তোকে নিয়ে অন্য ঘরে। রানী করে রাখবো তোকে মৈরাম।

—নিতাই? হাঁপাচ্ছে মরিয়ম, সব চিন্তা তার গোলমাল হয়ে গেছে। ইরফান নেই। হয়তো ফিরবে আবার। তাকে ফেলে চলে যাবে মরিয়ম।

একদিকে নিতাই-এর আমন্ত্রণ—পুরুষের কামনার মত্ত প্রকাশ—আরণ্যক পরিবেশে নিবিড় উষ্ণতাময় একটি আমন্ত্রণ—অন্যদিকে ইরফানের বিবাগী মৌ-পাগল মন। তবু যেতে মন চায় না।

—না। মরিয়ম যাবে না।

— চোপ! সব তৈবি করে ফেলেছি। না যাস, জোর করে তোকে নিয়ে গিয়ে তুলবো নৌকায়! যে চিরকালই তোকে ফেলে পালালো সেই হল আপন, আর আমি? কেবল জ্বালাই বাড়িয়ে দিয়েছিস আমার। মৈরাম তোকে রানী করে রাখবো আমি।

প্রবল বেগে আকর্ষণ করে মরিয়মকে নিজের দিকে। তাকে ছিনিয়ে কেড়ে নিতে চায় নিতাই। মত্ত বিক্রমে সে প্রতিষ্ঠা করতে চায় নারীর উপর পুরুষের দাবী।

এ এক পিশাচের নিঃশেষ করা ভালোবাসা। ভাবনা-চিন্তা সব নিঃশেষ হয়ে গেছে মৈরামের।

ইরফান বিদায় নিয়েছে। আজ সামনে তার বাঁচার সমস্যা। অকুল পাথারে কুটোর মত ভাসছে সে। আশ্রয় তার চাই। স্তব্ধ হয়ে গেছে মরিয়ম। বাধা দেবার ক্ষমতাটুকুও যেন তার নেই। এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে।

চারিদিকে নেমেছে রাতের জমাট অন্ধকার।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ছল ছল ডাকছে জল। ক্ষেপে রয়েছে বাতাস। ঘাটের নীচে অল্প অন্ধকারে দেখা যায় একমাল্লাই নৌকাখান আছাড়ি বিছাড়ি খাচ্ছে স্রোত। নিতাই বুনো এসে উঠেছে নৌকায়, সঙ্গে জোর করে টেনে এনেছে মরিয়মকে। পাঁজাকোলা করে তুলে এনে নামিয়েছে তাকে নৌকার খোলে।

হাঁফাচ্ছে নিতাই উত্তেজনায়। নোঙর তুলে দিয়ে এসে নৌকায় উঠলো, জোয়ারের বেগে নৌকা চলেছে নদীর দিকে। হালে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে নিতাই।

— কোথায় যাবো? মরিয়মের কণ্ঠে যেন আর্তসুর।

—রায়মঙ্গলের পারে। নতুন আবাদ বসেছে সেইখানে, আমরাও গিয়ে নতুন ঘর পাতবো। নিতাইয়ের বন্য স্বভাব মুছে যাচ্ছে, কোমল হয়ে আসে তার কঠিন কণ্ঠস্বর। আবছা অন্ধকারে নিতাই বুনো ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

মরিয়ম ওর দিকে চেয়ে থাকে।

মরিযমও ভাবছে। ইবফান গেছে—কিন্তু তাকেও বাঁচতে হবে। সে আজ ঘরবাসী হতে চায়, একজনের সান্নিধ্য পেতে চায়। আজ অকুলে ভেসে নিতাইকে তাই যেন নতুন করে চেনে মরিয়ম।

মবিয়ম উঠে বসেছে। দু'চোখে তার ফিরে আসে স্বাভাবিক হাসির আভা। চিকচিকে অন্ধকারে সরে গিয়ে নিতাই কাছ ঘেঁসে বসলো। নিতাইয়ের সারা মনে আজ পূর্ণতার জোয়ার। এই স্পর্শ, চাহনি ওর জন্যই বোধ হয় ব্যর্থ হতে বসেছিল তার জীবন। বিফল হতে চলেছিল পৌরুষ। বন্য উদ্দাম জীবনধারা আবার মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

—তোর জন্যই পাগল হয়েছিলাম মৈরাম।

—সত্যি? মরিয়ম স্বপ্ন দেখছে যেন।

মরিয়মকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয় নিতাই বুনো—হ্যাঁরে হ্যাঁ! নয়ত কেনে আনলাম কেন!

মরিয়ম আজ আর এক নতুন জগতের স্বপ্ন দেখে। এ এক অন্য স্বাদময় চেতনার আনাগোনা। বনের সতেজ গাছ—এক পাতা ঝরে, আবার অন্য পাতার সাজ পরতে দেরী হয় না। মরিয়মের মনেও তারই স্পর্শ। নিতাই বুনোর দিকে সে চেয়ে থাকে পরম আশাভরে। নিজেকে নিতাইয়ের কাছে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় মরিয়ম।

রাত্রি নেমেছে দত্তচকের বাংলোয়। কৃষ্ণা আজ অসীমকে নতুন রূপে দেখেছে। এ অন্য কোন অসীম, যে জানে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে।

অস্পষ্ট আলোতে ওর দিকে চেয়ে থাকে কৃষ্ণা। বাইরে চলেছে ঝড়ের আনাগোনা, কোটালের গোণ। বহির্মুখী মন আজ অন্তর্মুখী হয়েছে। বাইরের বিশাল বিস্তৃত আকাশ-বাতাসে কোথাও তার নিমন্ত্রণ নেই। সে আশ্রয় নিয়েছে ঘরের কোণে— একজনের অতি নিকট সান্নিধ্যে।

অসীম এগিয়ে আসে তার দিকে। কৃষ্ণার চেতনার মূলে আজ বিপ্লব ঘটেছে। ওই বলদৃপ্ত পুরুষের সামনে সে আজ চিরন্তনী নারী। অসীমের নিবিড় স্পর্শে সে বাধা দেয় না।

শরীরের ঠাণ্ডা হিমরক্তে উষ্ণতা জেগেছে ফিরে এসেছে প্রথম যৌবনের হারানো সুর—সেই প্রথম ভালো লাগার বিচিত্র রোমাঞ্চকর অনুভূতি। আজ নিঃশেষে নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে কৃষ্ণা অনুভব করতে চায় পরম আনন্দ। সুপ্ত মনে এই ব্যর্থ কামনা এতদিন নীরবে আত্মগোপন করেই তার মন বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

অবজ্ঞা আর অবহেলায় আঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল তার মন।

আদিম নারী এই বাদল হাওয়ায় আরণ্যক জীবনের সন্ধান পেয়েছে।

বিচিত্র এক সাড়া জেগেছে মনে। বাইরে বাতাসের গর্জন আর নদীর অট্টহাসি সব মুছে গেছে। তাদের গড়ে তোলা রোমাঞ্চকর জগতে এই পৃথিবীর নিঃশেষে অবলুপ্তি ঘটেছে।

অসীমকে আজ নোতুন রূপে আবিষ্কার করে। কৃষ্ণার-এ যেন নব চেতনার প্রদোষ কাল।

সকালের রোদ লুটিয়ে পড়েছে বনসীমায়—স্তব্ধ নদীর বিস্তীর্ণ বুকে। দু'একটা ডিঙ্গি বের হয়েছে মাছ ধরতে। আকাশকোল থেকে মেঘের দল বিদায় নিয়েছে, মেঘমুক্ত আকাশে ফুটে উঠেছে আগামী শরতের গিনিগলা রোদ। দিগন্তপ্রসারী সবুজ ধানক্ষেতে এসেছে ফলনের সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত। ধানের গাছগুলো মঞ্জরী ভারাবনত হয়ে নুইয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণা নতুন চোখে আজ দত্তচককে দেখলো। কলাগাছগুলো বর্ষার জলে ঘন সবুজ হয়ে উঠেছে। তার বন্ধ্যা গোলাপ গাছে প্রথম এসেছে কুঁড়ি। জীবনের আনন্দ নিবিড়তম বেদনায় রাঙ্গা হয়ে ওর বুকে জন্ম নিয়েছে পুঞ্জিত সৌরভের। বাতাসে ঘোষণা করে তার অস্তিত্ব—আনন্দবার্তা।

বিপদ কেটে গেছে। বর্ষার হাত থেকে বন্যাপ্লাবনের হাত থেকে অসীম বাঁচাতে পেরেছে তার সাধনাকে—স্বপ্নকে।

অসীম মনে মনে আজ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। নিতাই বুনোর ঠাঁই নিয়েছে কাশেম শেখ। এ-মাটিতে ফসলও ফলে— কাজ করবার লোকও আসে যায়। কাজ আটকে থাকে না।

কৃষ্ণা হতচকিত হয়ে ওঠে খবরটা শুনে। ইরফানকে মরিয়ম ভালবাসতো প্রাণ দিয়ে—কিন্তু একদিনেই কবরের মাটি শুকোতো না শুকোতে সেই মহব্বতও মিলিয়ে গেল আশমানে।

পড়ে আছে মরিয়মের নিজের হাতে গড়া ঘর, সবুজ হয়ে উঠেছে ঘন লতার আবেষ্টন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ব্যাকুল সুরভি ছড়ায় ওর বসানো হাসনাহানার ফুলদল।

মরিয়ম পালিয়েছে— পালিয়েছে নিতাই বুনোর সঙ্গে।

এ যেন বিচিত্র এক কাহিনী।

তবে কি মনে মনে মরিয়ম অভিনয়ই করে গেছে— না বিশেষ কোন কারণে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, কে জানে? মরিয়ম একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালিই রয়ে গেল কৃষ্ণার কাছে। প্রেম! মরিয়মের প্রেমের ব্যাখ্যা সভ্য জগতের সংস্কারের বেড়াঘেরা নয়, বনের মতই রহস্যময় সেই প্রেম।

পুরন্দর বুড়ো পিশাচের মত জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সবুজ ধানক্ষেতের দিকে।

যতদূর চোখ যায় মঞ্জরী ভারাবনত ধানের ক্ষেত বাতাসে দুলছে। দু'একটা প্রজাপতি ঘোরে ধান ফুলের সন্ধানে।

ওপারে হাহাকারভরা অরণ্য স্তব্ধ পরাজিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এদিকে তার থাবা থেকে মাটি ছিনিয়ে

নিয়ে মানুষ সার্থক উপনিবেশ গড়তে চলেছে। মাঠের মাঝে মাঝে খোঁজে বুড়ো, তার লাগানো কেওড়া গরান চারার দু'একটাও আছে কিনা। কিন্তু হতাশই হয়। গজ গজ করে আপন মনে!

— তোরা মরবিই, যে ক'টা আছিস টিঁকে, তাও যাবি কুড়লের ঘায়ে। তোদের আর তাগদ নাই, বুঝলি! বনবিবিও বাতিল হয়ে গেছে।

আবার মাথা নামিয়ে কি খোঁজে মাঠে মাঠে। এক একবার দাঁড়িয়ে দূর অরণ্যসীমার দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে বন্যা, প্লাবন, সব ফাঁড়া কেটে গেল এবার। এবার আর ওদের পায় কে। লুট করবে ধানের সম্পদ।

শীতের উত্তরে হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে মাঠে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আনমনে চলেছে পুরন্দর বুড়ো বিড় বিড় করে। হঠাৎ নির্জন ভেড়ির পাশে সবুজ ধুন্দুল গাছের নীচে জ্বলতে দেখে দুটো নীলাভ চোখে, সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য জোনাকি। পুরন্দরকে দেখেই জানোয়ারটা উবু হয়ে পড়ল। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে বোটকা গন্ধ, স্থির হয়ে বসেছে বাঘটা। সমস্ত একাগ্রতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ওর মৃত্যুনীল দু'চোখে। মাঝে মাঝে লেজটা সাপটাচ্ছে কাদামাটির উপর।

একটা খস খস শব্দ। থমকে দাঁড়াল পুরন্দর।

কোন্‌দিকে কি হয়ে গেল বোঝবার আগেই কানে আসে মত্ত গর্জনধ্বনি, আশমান থেকে লাফ দিয়ে তার জীর্ণ দেহের উপর এসে নামলো মৃত্যুদূত। কণ্ঠনালী রোধ করে দিয়েছে, কোন শব্দই আর বেরুলো না।

পবদিন সকালে নিশ্চিন্ত হয় কাশের আলি ও আরও অনেক। বলে ওঠে কাশেম—ও এমনি করেই শাপের না হয় বাঘের মুখে যাবে, তাই জানতাম।

ওরা বনের স্তব্ধ রৌদ্রভরা রূপের দিকে চেয়ে থাকে।

অসীম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধানক্ষেতের বুকে আলের নরম মাটিতে আঁকা রয়েছে ক্ষুধিত শ্বাপদের থাবার দাগ। পুরন্দর বুড়োকে আরণ্যক জীবনই তার নিভৃতে নিয়ে গেছে। পাগল এ জগতে বাস করেও স্বপ্ন দেখতো অতীতের বনসীমার। মৃত্যুর পর গেছে তার দেহাবশেষ।

দুশ্চিন্তায় পড়ে অসীম। বুড়ো ওদের সামনে সমূহ বিপদ সৃষ্টি করে গেছে। এ বিপদের গুরুত্ব কতখানি তা বুঝেছে সে।

—সাবধানে থাকিস একটু। একবার মানুষের স্বাদ পেয়েছে। ওই বাঘ আবার আসবে। ওকে মারতে না পারলে শান্তি নেই।

তাই মনে হচ্ছে হুজুর। কাশেম শেখ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে!

পূর্ণগর্ভা নারীর মত ধানের বুকে এসেছে ফসলের মঞ্জরীভাব, নুয়ে পড়েছে ওদের মাথা। সকালের শিশিরস্নাত মঞ্জরীগুলোর বুকে দিকহারা বাতাস স্পর্শ জাগায়, শির শির করে ওঠে ওরা জীবনের প্রাণপ্রাচুর্যে। ক্ষেতের কালো জলে শেওলার অন্তরালে লুকোচুরি খেলে মাছের দল। যতদূর চোখ যায় সবুজ আর সবুজ। কোথাও কোথাও লেগেছে সোনা রং-এর ছাপ। আউশ ধান পেকে উঠেছে।

অসীম মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। বুক ভরে ওঠে আশার সংবাদে, চোখের সামনে ভাসে দত্তচকের আগামী রঙীন দিনগুলো।

কৃষ্ণার দেহেও এসেছে পরিবর্তন। মুখের লাবণ্য ভেদ করে চোখের কোণে ক্লান্তির ছায়া। মন অজানা আনন্দে ভরে উঠেছে। তার নারীজীবনের সার্থকতার দিন আসছে। এ অনুভূতির স্বাদ সে পায়নি। যে জীবন সম্বন্ধে সে হতাশ হয়েছিল, যাকে পরিত্যাগ করে অনিশ্চতার পথে পা বাড়াতেই চেয়েছিল, সেই জীবন

যে পথের বাঁকে তার ক্ষুধিত মনের জন্য এই অমৃত সঞ্চয় করে রেখেছিল, তা জানতো না! আজ তৃপ্ত—সার্থক হয়েছে সে।

অসীম আসছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। দূর থেকে দেখে কৃষ্ণা।

অনেক লজ্জা—অনেক আনন্দ।

তবু কথাটা না জানিয়ে পারে না।

অসীম যেন বিশ্বাসই করতে পারে না, স্তব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে একটি মুহূর্তে; নিবিড় আলিঙ্গনে কৃষ্ণাকে কাছে টেনে নেয়। ললাটে এঁকে দেয় চুম্বন রেখা।

বাতাসে শির শিরিয়ে উঠেছে বনভূমি শরৎ শেষের আলোয়!

কৃষ্ণা কচি খুকীর মত উপভোগ করে স্বামীর সে স্পর্শসুখ।

—তাহলে কলকাতাতেই যেতে হবে তোমাকে। এখানে থাকা ঠিক হবে না এ অবস্থায়। অসীম বলে ওঠে।

—কিন্তু তুমি!

আজ ওকে ফেলে যেতে সত্যিই কোথায় ব্যাথা পায় কৃষ্ণা। ক'দিনের মধ্যেই কয়েক বৎসরের সঞ্চিত অভিমান, ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ হয়ে গেছে তার। আগামী মাতৃত্বের গৌরবে কৃষ্ণা আজ সব কিছুই মধুর করে নিতে পেরেছে।

তার দু'চোখে এই দিগন্ত প্রসারী সবুজ ধানক্ষেত অজানা আনন্দের শিহরণ এনেছে। দূরে রৌদ্রস্নাত বনানী, নিরুদ্দেশে ভেসে যাওয়া জেলেডিঙ্গিগুলো। তাকে হাতছানি দেয় অবগুণ্ঠনবতী অরণ্যের সৌন্দর্যের মধুমেলায়। জগতকে আজ সে ভালোবেসে ফেলেছে তার অজ্ঞাতসারে অনামনে। চারিদিকে একটি নিবিড় শান্তি স্পর্শ মাখানো এখানও— সমস্ত ভয়ঙ্করের অতুল সুপ্ত সেই মহান সৌন্দর্যের স্পর্শ পায় সে।

মাথা নীচু করে ফিরে এসেছে প্রণব দত্তচক থেকে। সারা মনের সেই অসহায় বেদনার পুঞ্জীভূত প্রকাশ ব্যাকুল করে তুলেছে তাকে।

বোটে ফিরে আজ অসহ্য মনে হয়। অসীমবাবুর ব্যক্তিত্বের সামনে হতে আজ ভীরুর মত পালিয়ে এসেছে প্রণব। এক মুহূর্ত আগেও সে স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণার ডাকে তাকে উদ্ধার করতে, কিন্তু প্রকৃত বিপদের সময় কোন কাজেই আসেনি সে। কৃষ্ণার উপরে সব দাবী সে অজ্ঞাতসারেই হারিয়ে এসেছে।

—স্যার!

ইনচার্জ ভদ্রলোকের ডাকে মুখ তুলে চাইল প্রণব। হাড়গিলের মত টিং টিং-এ চেহারায় খাকি হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট, বগলে দোনলা বন্দুক, বিশ্রী বেমানান ঠেকে।

প্রণবের চোখের সামনে ফুটে ওঠে অসীমের সেই তেজদৃপ্ত মূর্তি।

আজ তা ভুলতে পরে না প্রণব। তাকে কঠিন নীরবতা আর অবজ্ঞা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল এ মাটিতে তার দাবী নেই। কৃষ্ণার সঙ্গে কোন সম্পর্কও থাকতে পারে না।

—স্যার!

লোকটার ডাকে মুখ তুলে চাইল প্রণব।

— কি হয়েছে?

একটা ম্যান্ইটার বড্ড জ্বালাতন শুরু করেছে স্যার ক্যাপে।

বিরক্ত হয়ে ওঠে প্রণব—আপনি কি মারতে যাচ্ছেন তাকে?

চমকে ওঠে ইনচার্জ। এতাবৎ এসব ঝামেলায় সে যায়নি। জবাব দেয়,

—না স্যার, যদি নৌকায় এসে ওঠে, তাই একটু তৈরি হয়েই আছি।

—যান তাই দেখুন গে।

—সরে গেল ইনচার্জ। প্রণব ভাবছে আজকের এই বনভূমি—এই পরিবেশ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কোথাও কোন সান্ত্বনা এখানে নেই।

জলের নৌকা এসেছে—খাবার চাল, ডাল, জল পৌঁছে আবার সন্দেশখালিতে ফিরে যাবে; তাদের হাতেই চিঠিখানা তুলে দেয় প্রণব।

—আপিসে পৌঁছেই দিবি গিয়ে।

—জী হ্যাঁ! মাঝি চিঠিখানা নিয়ে থলেতে পুরলো।

নির্জন বনসীমার বুকে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমেছে। কানে আসে গর্জন। দূরে বাঘ ডাকছে।

—স্যার! ইনচার্জ ঘরের ভিতরে ঢুকে খিল দিচ্ছে। হাতের বন্দুকটা ধরবার সামর্থ্য তার নেই।

প্রণবও ভয় পেয়ে গেছে। বিরক্তি ধরে গেছে এই ছন্নছাড়া বনভূমিতে। লোকালয়ের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। গর্জনটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে বনে।

—একটু জল দেবেন স্যার! ইনচার্জের গলা শুকিয়ে আসছে ভয়ে।

পুরন্দর বুড়োকে নিয়ে গিয়েই বাঘটা খান্ত হয়নি। আরও অমনি শিকারের সন্ধানে শুরু হয়েছে তার নিত্য আনাগোনা! বসতির আশেপাশেও যাতায়াত ঘটছে তার। সেদিন একটা বাছুর নিয়ে গেছে। প্রায়ই ওর গর্জন ভেসে ওঠে ধারে কাছে।

কালো ছায়ার মত ভয়ের ছাপ নেমেছে বসতের বুকে।

রাতের অন্ধকারে বাঘটা ঘুরে বেড়ায়।

অসীম ওর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

বাদাবনের বাঘ। স্বভাবতই ধূর্ত। পায়ের শব্দটুকুও ওঠে না তার।

কাশেম বাওয়ালি অনেকদিনের মানুয। সে ঠিক হদিস পায় না। কখন আসে, কোন্‌দিকে ঢোকে আবাদে তাও জানা যায় না। বলে,

—বাঘের উপর বুনো পুবন্দরেব ভূত ভর করেছে হুজুর, এ মুলুক থেকে ও যাবে না। কালই দেখেছি।

হদিশ দেয় কাশেম শেখ। সুন্দরবনের বুনো মাঝি সে, ওদেব হালফিল খবর রাখে। অসীমও দেখেছে ওই জানোয়ারদের অনেককে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসছে— ভেড়ির নীচে পড়ে আছে অর্ধভুক্ত বলদের দেহটা। গতরাত্রে টেনে এনে ফেলে চলে গেছে। দু'একটা ম্লান তারার আলো ফুটে উঠেছে দিগন্তসীমায়। স্তব্ধ নির্জন অরণ্যরাত্রি। মাচানের উপর বসে আছে কাশেম শেখ, দাড়ির আড়ালে ঢেকে গেছে দুটো চোখ। অসীম স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে খালের দিকে।

স্থির নিষ্কম্প জলে কি যেন একটা শব্দ ওঠে। কাশেম শেখ ওর হাতটায় নাড়া দেয়। শব্দটা এগিয়ে আসছে এই দিকেই।

অসীম দেখতে পেয়েছে। নিপুণ সাঁতারুর মত আসছে বাঘটা। বন থেকে বের হয়ে খালে নেমেছে। ল্যাজ মাথা জেগে আছে, স্রোতের গতিকে বেপরোয়াভাবে কেটে আসছে ক্ষুধিত শ্বাপদটা মানুষের বসতির পানে।

কাশেম শেখ আল্লার নাম জপছে।

সাধারণ বাঘ এ নয়; বুড়ো পুরন্দরের আত্মা ওই বাঘের সঙ্গ নিয়েছে। সেই-ই ওকে পথ দেখিয়ে আনে আবাদে— মানুষকে উৎপাত করতে। বনবিবির দেয়াসী ছিল পুরন্দর। সে বাঘ নয়।

—হুজুর! কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে তার!

অসীম ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দেয়।

গা থেকে জল ঝাড়তে বাঘটা তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে। ভুর যোয়ান বাঘ! তারার আলোতে দেখা যায় বলিষ্ঠ পেশীবহুল সুন্দর দেহটা। রাতের অন্ধকারে ধ্বক ধ্বক করছে দুটো চোখ। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে আসছে চারিদিকে সন্তর্পণী দৃষ্টি মেলে। মাঝে মাঝে থেমে বাতাসে কি যেন শুঁকছে। আবার চলতে থাকে।

শুধু বাঘ নয়, সাক্ষাৎ দক্ষিণা রায় এসেছে বাদায় পুজো নিতে, তার দখল কায়েম রাখতে।

বনবিবির বাহন।

বাতাসে বিশ্রী বোটকা গন্ধ ভেসে আসছে।

একটি মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দু'চোখ তুলে গাছের দিকে দেখলে। সামনে অসীমের ভেসে ওঠে দুটো পাশাপাশি হিংস্র চোখ। সঙ্গে সঙ্গে অসীমের হেভি রাইফেল গর্জে ওঠে—কড়-কড় গুড়ুম।

নিস্তব্ধ অরণ্য, নদীর জল কেঁপে ওঠে রাইফেলের শব্দে। কাদায় লুটিয়ে পড়ে জানোয়ারটা— শূন্যে একবার লাফ দিয়ে আততায়ীকে ধরবার বৃথা চেষ্টা করে। দুই চোখের মধ্যেই গুলি বিঁধেছে ওর। একটা গুলিই ওর মাথা চুরমার করে দিয়েছে। টর্চের আলোয় দেখা যায়, জমাট রক্ত বের হয়ে পড়েছে নরম পলির উপর। পা-গুলো বার কতক নাড়া দিয়েই স্তব্ধ হয়ে যায় বাঘটা।

কাশেম আলি তখনও আল্লার দোয়া পাড়ছে মনে। বুড়ো পুরন্দরের আত্মা তফাৎ যাক।

বসত জেগে উঠেছে রাতের অন্ধকারেই।

জ্বলছে অনেকগুলো মশাল। একদল লোক যেন আদিম আরণ্যক জীবনের সুরে সুর মিলিয়েছে আনন্দ কলরবে।

বেশ কিছুদিন প্রণব এদিকে আর আসেনি সেই ঘটনার পর। কি যেন লজ্জা তাকে পেয়ে বসেছে। হরিণগাড়া নদী দিয়ে ইনস্পেকশনে গেছে বহুবার, লঞ্চের ছাদ থেকে দূরে নদীর বাঁকে বাংলোটার দিকে চেয়ে দেখেছে— মনে পড়েছে কৃষ্ণার কথা। অতীতের কর্মসঙ্গিনী কাজের ফাঁকে মিলিয়ে গিয়েছিল। আবাব যদিও বা দেখা হল, তার পরিণতি এমনি নিদারুণ বেদনাদায়ক হবে ভাবতেই পারেনি। অকারণেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে মন, হাহাকারে করে উঠেছে গভীর ব্যাথায়।

বনে বনে এসেছে শবতের স্বর্ণরৌদ্রতা। বর্ষার করাল ভীষণতা মিলিয়ে গেছে। যেদিন বাইরের জগৎ ভরে উঠলো সুন্দরের স্পর্শে; সেদিন প্রণব হারালো তার অন্তরের প্রসাদ—কুড়িয়ে পাওয়া ক্ষণিকের মধুস্পর্শ।

পথের বাঁকে, বনের আড়ালে দত্তচকে বাংলো ঢাকা পড়ে যায়। অন্তহীন জলরাশি খল খল কবে এসে আঘাত করছে লঞ্চে, মাথার উপরে উড়ে যায় বকের দল, থরে থবে উঠে গেছে ঘন সবুজ হলুদের রং মাখানো বনসীমা। ওর সবুজের অন্তরালে কৃষ্ণা রয়ে গেল— মনের গহনে সুমধুর স্মৃতির মতই সজীব— মধুময়। এমনি কেটেছে বহুদিন।

হঠাৎ সেদিন এসে পড়েছে প্রণব। যেন কোন অপরিচিত অতিথি।

আজ কৃষ্ণা প্রণবকে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না। বিস্ময় চেপে জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছিল এতদিন?

জবাব দিল না প্রণব, নীরবে চেয়ে থাকে কৃষ্ণার দিকে। ওকে দেখছে। ওর দেহমনে এসেছে শান্তশ্রী, অপরূপ হয়ে উঠেছে কৃষ্ণা। দিন দিন রূপ বেড়েই চলেছে। কোন্ অপূর্ব রূপে মহিয়সী নারী আজ তাব সামনে দাঁড়িয়েছে, প্রণবের না-পাওয়া জীবনের ব্যর্থতার হাহাকার দ্বিগুণ করে তুলতে। অবাক হয়ে যায় কৃষ্ণার এই অদ্ভুত পরিবর্তনে।

—বসো। কৃষ্ণা সহজভাবেই অভ্যর্থনা করে তাকে।

হাসছে কৃষ্ণা, মধুর একটু হাসি।

সেই সন্ধ্যায় কৃষ্ণাকে আর খুঁজে পায় না প্রণব, যে নীরবে আত্মসমর্পণ করেছিল, চেয়েছিল একটু নির্ভর, বৃষ্টিভরা রাতের অন্ধকারের সেই কৃষ্ণা আজ দিনের আলোয় কোথায় হারিয়ে গেছে।

এই পরিবর্তনই সহজ স্বাভাবিক, তবু মেনে নিতে পারেনি প্রণব। তার জন্য নিজেকে এতদিন তৈরি করেছিল।

—আমি বদলি হয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। প্রণব শোনাল কথাটা।

কৃষ্ণা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তার দিকে। আজ অনুভব করে কৃষ্ণা মরিয়ম কেন স্বীকার করেছিল নিতাই

হয়েছিল পুরুষের বলিষ্ঠ অস্তিত্বের মাঝে।

কৃষ্ণা আজ প্রণবকে অনুকম্পা করে। প্রণব ভীরুর মতই সেদিন সরে গিয়েছিল— নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। চিরকালই কাপুরুষ ভীরু সে। ওই প্রেমিককে ভালোবাসতে আজ তাই মন আর সায় দেয় না। প্রণব চেয়ে রয়েছে তার দিকে মিনতি ভরা চাহনিতে! দাবীর লেশমাত্র স্পর্শ নেই তাতে।

ওরা দাবী জানাতে পারে না—পারেনি কোনদিন।

কৃষ্ণা তবুও ভুলতে পবে না অতীতের দিনগুলো। আজ মনে হয় ভুললেই ভালো ছিল। মিথ্যে স্মৃতি নিয়ে দিন কাটাতে চায় না সে।

নিজের পথের সন্ধান আজ পেয়েছে কৃষ্ণা।

সে তৃপ্ত—সার্থক।

একটু থেমে ওর দিকে চেয়ে বলে ওঠে,

—সেই হয়তো ভালো প্রণব। চলেই যাও তুমি।

কৃষ্ণাব কণ্ঠে কোথাও জড়তা নেই।

—তাই চলে যাচ্ছি।

মুখ তুলে চাইল প্রণব রহস্যময়ী নাবীর দিকে। বর্ষামুখর রাতে যে কৃষ্ণাকে দেখেছিল প্রণব, দিনেব আলোব অবগাহনে সে শুদ্ধ শুচি হয়ে উঠেছে।

বাতাসে গোলাপ ফুলের শুকনো পাপড়িগুলো ঝরে যায়।

ক্লান্তস্বরে বলে কৃষ্ণা—বিয়ে থা করে সুখী হও, এমনি করে নিজের দুঃখ বাড়িয়ো না। কোনদিনই শান্তি পাবে না।

ব্যথাভবা কণ্ঠে বলে ওঠে প্রণব— প্রেমের দাম তোমাদের কাছে নেই, প্রেম তোমাদেব কাছে শাড়ির মত, নিত্য নতুন পববে, দবকাব হলে ধুইযে তুলে বেখে দেবে।

হাসে কৃষ্ণা—পুরুষের দাবী নাবীব কাছে প্রেম। সে দাবী কোনদিনই জানতে পারেনি। অভিমান করেই সবে গেছ চিবকাল। নিজেকে চেনোনি, অপরকে ভালোবাসবে কি কবে?

চুপ কবে গেল প্রণব। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য।

সরে গিযেই ভুলতে চায় সে, কৃষ্ণাকে আর দেখতে আসবে না, দত্তচক তার স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। ইচ্ছা কবেই বদলিব ব্যবস্থা কবেছে সে এখানে থেকে।

চুপ কবে বসে আছে। কথা বলবারও কিছুই নেই ওদের।

এমন সময বাইরে কিসের শব্দ শুনে বের হয়ে এল তারা।

কযেকটা লোক কাঁধে বাঁশ বেঁধে কি একটা বিরাটকায বস্তু আনছে ঝুলিয়ে। পিছনে আসছে অসীম আর কাশেম শেখ। বস্তিব কুলি-কামিনরা বেব হয়ে এসেছে। কৃষ্ণা স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে মৃত জানোয়ারটার দিকে। ল্যাজটা মাটিতে লুটিয়ে রয়েছে। প্রায় বারো ফুট তেজী মাদী বাঘটা। গাঢ় হলুদ গায়ে কালো ডোরা দাগ। মৃতদেহ থেকে বোটকা গন্ধ বের হয়ে ভরে উঠেছে বাতাসে। ঘিরে ধবেছে মরা জানোয়ারটাকে সকলে ভিড় করে।

—ওমা! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে কৃষ্ণা।

স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে নবম তুলতুলে দেহটা। অসীম এগিয়ে আসে —পা দিয়ে দেখ না, ভেলভেটের মত নরম।

বাঘটা তখনও যেন চেয়ে আছে।

অসীম বাঘটাকে নাড়া দেয়।

সারা মনে বিজয়ীর উল্লাস।

—উঁহু! যদি বেঁচে ওঠে। কৌতুকভরা চাহনিতে কৃষ্ণা কথাটা বলে হাসতে থাকে খুশির আবেগে।

অসীমের দিকে চেয়ে থাকে বিস্মিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণা। দেহে ওর রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি, চুলগুলো উস্কো খুস্কো হয়ে—পায়ের জুতোয় কাদার ছাপ, জামা প্যান্টের ইস্ত্রি মিলিয়ে গেছে। সব কিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে ওর দেহ মনে পৌরুষ —বিজয়ী বীরের মত দৃপ্ত ভঙ্গী।

ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে প্রণব ধোপদুরস্ত পোশাকে। পায়ের জুতো অবধি চকচক করছে নতুন পালিশে। কিন্তু সেই প্রাণপ্রাচুর্য তার নেই, যেন গিল্‌টি করা সোনা; আসল জৌলুস কোথাও নেই।

অসীমের মনে অরণ্যের নিবিড় স্পর্শ। তার অজ্ঞাতেই আজ এই আরণ্যক জীবনকে নিবিড়তর করে ভালোবেসেছে কৃষ্ণাও। আপন করে নিয়েছে নিজের সত্তার মাঝে। তাই আজ আর বিরোধ নেই, কোনো সংঘাত ওঠেনি মনের মাঝে।

অসীম এতক্ষণ প্রণবকে দেখেত পায়নি, চোখাচোখি হতে এগিয়ে যায়।

—বড্ড উৎপাত করছিল, বাধ্য হয়েই মেরে ফেললাম এটাকে। কতক্ষণ এসেছেন?

—একটু আগে। চলে যাচ্ছি বদলি হয়ে, ভাবলাম দেখা করে যাই।

প্রণব যেন কৈফিযৎ দিচ্ছে অসীমকে। আজ আবার ফিরে আসার কৈফিয়ৎ।

সহজভাবেই জবাব দেয় অসীম,

—ওঃ।

কুলিগুলোকে অসীম বলে ওঠে— চামড়াটা ছাড়িয়ে ফেল, নইলে পচে যাবে।

হুকুম দিয়ে উঠে গেল বাংলোর ভিতরে।

প্রণবের চোখের সামনে ভেসে ওঠে শূন্যতা। এই অরণ্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। নইলে চলেই বা যাবে না কেন। আজ তার থাকবার কোন দাবী নেই। কৃষ্ণা, অসীম আজ এই অরণ্য-উপনিবেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ওদের সুখ দুঃখ জড়িয়ে রয়েছে এই মাটিতেই।

সে আজ বিদায় নিল, বাইরের মানুষ—ফিরে গেল বাইরের জগতে।

প্রণব চলে গেল।

নীল জলের বুকে ভেসে চলেছে সাদা লঞ্চটা, বাঁকের পর আর দেখা যায় না সেটাকে। কৃষ্ণার অতীতের দিন আবার হারিয়ে গেল আরণ্যক জীবনের ভিড়ে, বনানীর সবুজ শ্যামল গহনে। একটু স্মৃতি কণ্টকের মত স্মরণতলে ব্যথা আনে— কি এক মধুর অনুরণন, তাকে ভুলতে পারে না—কিন্তু ভোলবার চেষ্টা করবে কৃষ্ণা।

কুলিদের মাদলের শব্দ কানে আসছে। বিভীষিকা দূর হয়েছে তাদের জীবন থেকে। রাতে ঘুম আসবে এইবার নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে। মদের সঙ্গে মাদল আজও ভোলেনি বুনোর দল, গানের নেশা আর হাঁড়িয়া আজ বুনো রক্তে মাতন আনে। মেয়ে-মদ্দ ওরা মেতে উঠেছে, হাঁড়ি হাঁড়ি ভিজিয়েছে নতুন আউশ-ধানের মদ। সদ্য ওঠা ফসল ওরা নিবেদন করে বনদেবীর কাছে —দক্ষিণ বোঙার থানে।

বন কেটে গড়া উপনিবেশ তোমার প্রসাদে সফল হোক, সার্থক হোক। সব অকল্যাণ তুমি দূর করো।

ওদের গানের সুর শোনা যায়। আকাশ ছাপিয়ে, অরণ্যের বনমর্মর ভেদ করে উঠেছে মানুষের জয়গান। হৈমন্তী ধানের দিকজোড়া ক্ষেতে এসেছে সোনা রঙের বাহার। মঞ্জরী ভারাবনত ধানগুলো মাটিতে নুইয়ে পড়েছে।

কুমারী মৃত্তিকায় এসেছে ফলনের পূর্ণতা। আনন্দস্বপ্নে ধরিত্রী আজ বিভোর।

কৃষ্ণা চেয়ে রয়েছে অসীমের দিকে। বনরাজ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে মানুষ তার দখল। বন্ধ্যা মৃত্তিকাকায় কল্যাণস্পর্শে জেগে উঠেছে, প্রাণ পেয়েছে। শত শত বৎসর পাষাণ করার মৌনতা ছেদ করে জেগেছে ওদের অতলে নোতৃন প্রাণের অঙ্কুর।

কৃষ্ণার চেতনায় আজ এসেছে সেই জাগরণের স্পর্শ। নিজের ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-আনন্দের হিসাব

নিকাশেই সে ছিল মত্ত। না-পাওয়ার বেদনায় গুমরে উঠেছিল সারা মন। কিন্তু পরম পাওয়ার অমৃত সন্ধান সে জানেনি। ব্যর্থতা আর বঞ্চনাই বড় হয়ে উঠেছিল তার জীবনে।

অসীম তাকে সেই বঞ্চনা থেকে বাঁচিয়েছে। সন্ধান দিয়েছে স্বপ্নময় সেই জগতের। তার অন্তরের বাইরে আজ পূর্ণতার নবজন্মের সঙ্কেত। সব অমঙ্গল, সব ভুল তার মুছে গেছে। অন্তরের নবজাগ্রত শুভচেতনায় সে খুঁজে পেয়েছে তৃপ্তি। শূন্য মন পূর্ণ হয়ে উঠেছে প্রশান্তিতে। বনে বনে আজ সেই সুন্দরের আবির্ভাব।

—কি দেখছো?

অসীমের কথায় তার দিকে চাইল কৃষ্ণা। জবাব দিল না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মাত্র। কাছে টেনে নেয় তাকে অসীম। কৃষ্ণা আজ সারা মন দিয়ে অনুভব করে সেই স্পর্শটুকু।

শরতেব সোনাগলা রোদ ওপারের আদিম বনসীমায় এনেছে শ্যামল প্রশান্তি।

স্তব্ধ বিশাল জগতের এককোণে আজ নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে— সত্যকাব আনন্দের স্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছে কৃষ্ণা।

নীল নির্জন

সকাল হবার আগেই ঘুম ভেঙ্গেছে। কন্‌কনে হাড় কাঁপানো শীত। এই শীত মাংস ভেদ কের যেন হাড়কে ছুঁয়ে যায়। পূব দিকে কালো জমাট পাহাড়ের পাঁচিল—ঘন বনে ঢাকা সেই পাহাড়গুলো দিনের প্রথম আলোয় জেগে উঠছে। বাংলোর সামনে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, যেন হলুদ রং ধরেছে। শিশির ঝল্‌মল্‌ করে পাইন, ইউকালিপটাস গাছের পাতায়—ধানক্ষেতের বুকে।

মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। নিটোল পাথরকুঁদো চেহারা—খারে কাচা কাপড়খানা ওর বলিষ্ঠ দেহের রেখাগুলোকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। দু'চোখে ওর হাসির ঝিলিক। সকালেই এব মধ্যে খোঁপায় এক থোকা লাল বুনকরবী ফুলও গুঁজে নিয়েছে। সামনের উষর ডাঙ্গায় গাঢ় হলুদ সরষের ফুলগুলো মাথা নাড়ছে।

মেয়েটা বলে—কাম করি দুব, ঘর দুয়ার সাফ করি দুব।

ওর নিটোল দেহের দিকে চেয়ে থাকি। অজানা পাহাড় বনরাজ্য, ক'দিনের জন্য ফরেস্টবাংলোয় এসে উঠেছি স্রেফ যাযাবরের মতো। কিন্তু এমনি একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে ভাবিনি।

মেয়েটা হেসে ওঠে। ও বোধ হয বুঝেছে আমার ভয়ের কারণটা, ভাবনার ব্যাপারটাকেও। বাঁধ ভাঙ্গা ঝর্নার মত কলকলিয়ে ওঠে।

রাজু চিনেক গ' আমাকে। অ—

রাজু বাংলোর চৌকিদাব। কাল বাতেই ওকে দেখেছিলাম, সপাটে স্যালুট করে দাঁড়িয়েছিল প্রথম দর্শনেই। তারপর থেকেই দেখেছি লোকটিব নজর চাবিদিকে।

ভোরবেলাতেই বেড-টি এনে হাজিব করেছে। র‍্যাগ মুড়ি দিয়ে খোলা জানালার বাইরে মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে পাখীর কলকাকলি মুখর জগতের দিকে চেয়ে থাকি। এখানে আসাব সেই দুর্গম বন পাহাড়ের পথ পার হবার আতঙ্কটা মুছে গেছে এই আলোয়।

মেয়েটা শুধায় —কোলকাতা থেকে আসছিস তুবা, বাবুরা বললেক। বাবুদের উখানেও কাজ কাম কবি বটে।

কোলকাতার লোকদেব ও দেখছে কি কৌতূহলী চাহনিতে। বলে সে,

—ট্যাকা মন হয় দিবি—নাই দিবি। সর দিকি, যা ধুলা জমাইছে ইবো।

মতামতের অপেক্ষা বাখে না। নিজেই লেগে যায় একটা ঝাঁটা নিয়ে মেঝের ম্যাটিংগুলো সাফ করতে।

রাজুও দেখছে। দেবু উঠে বের হয়ে এসেছে, রোদে ঝলমল করছে সামনের পোর্টিকো। পাইন বনের পাতাগুলোয় কুয়াসা তখনও যেন মাকড়সার জাল বুনেছে আলোয় আলোয়।

এই স্বপ্নজগতের সন্ধানে ফিরেছি বার বার। সুন্দরবনের গহনে --তরাই-এর বনে বনান্তরে, এসেছি পুরুলিয়া বিহার সীমান্তেব এই বনপর্বতরাজ্যে।

মনের সেই নীরব জ্বালাটাকে তবু হয়তো ভুলতে পারিনি। সীমার কথা মনে পড়ে। কলকাতার ঘিঞ্জি মধুবদ্যির গলিতে এখন কেরানীবাবুদের খোপে ঘরের থেকে ধোঁয়া উঠছে। বাজারের থলি হাতে ওবা চলেছে। তারপরই শুরু হবে জীবন-যুদ্ধ।

নাকে মুখে যাহোক কিছু গুঁজে ওরা দৌড়বে অফিসের দিকে। মেয়েদেরও সেজেগুজে স্কুল কলেজ, বেরনোর পালা শুরু হবে। কর্মব্যস্ত নিষ্ঠুর কলকাতা।

মেসেও এতক্ষণ হৈ চৈ লেগেছে। বাবুদের স্নান-এর জন্য লাইন পড়েছে চৌবাচ্চার ধারে।

সেই কলরব কর্মব্যস্ততা এখানে নেই। অলস সুন্দর রোদভরা এই সকালে তাই যেন সীমার কথাটা মনে আসে।

একটি অতীত স্বপ্ন, ঝরাপাতার মত ঝরে গেছে জীবন থেকে, তবুও কোথাও সেই ম্লান সুরভি সারা মনকে নেশার মত আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

অনেক আশাই করেছিলাম।

সুন্দর গোলগাল চেহারা, ওর হাসিটুকু যেন অন্ধকারেও উলসে উঠতো। সারা মনের অতলে কি সাড়া জাগে!

সীমার হাসির ঝিলিক ওঠে।

—এতো দেরী!

প্রতিটি সন্ধ্যায় অফিসফেরতা এই মধুবদ্যির গলির একতলার বাড়িটায় একবার যেতেই হয়। ওটা আমার মনে যেন দুর্নিবার আকর্ষণের মতই হয়ে উঠেছিল।

তবু মনে হয়েছিল কোথায় যেন একটা বেসুর বাজে।

—এখানে আসি তোমার মা বোধ হয় পছন্দ করেন না?

সীমার ডাগর দু'চোখে কি ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

—কেন?

তাকালাম। তার জবাব আমার জানা নেই। শুনেছি ওর বাবা গুপীনাথবাবু নাকি মেয়ের বিয়েরও জোগাড় করছেন। কারা এসে দেখেও গেছে। পাত্র ভালো চাকরী করে দূরে কোথায়।

সীমাকে হারাবার ভয়টা যে আমার মনের গভীরে এমনি করে বেড়ে উঠবে তা ভাবিনি।

কোথায় বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে? সীমা চুপ করে কি ভাবছে।

ওর চোখে মুখে বিশেষ কোন খুশীর সাড়া নেই। কেমন স্তব্ধ বিবর্ণতাই ফোটে। সেটা ওর মনের হতাশ না অভিনয় ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সীমা জানায় —যা খুশী তাই করবে ওরা, আর আমাকে তাই মেনে নিতে হবে?

ওর তেজদৃপ্ত সেই ভঙ্গীটায় বিস্মিত হই।

সীমার কথার স্বরে কি এক কাঠিন্য ফোটে।

—তুমি কিছু করতে পারো না?

চমকে উঠি। ওর কণ্ঠস্বরে কি এক ফুলফোটা জগতের আহ্বান, কোন্ দূর আকাশের পাখীর সুর মিশছে তাতে।

চকিতের জন্য মধুবদ্যির সেই গলির অন্ধকার ঘরে এসেছিল মুক্তির আশ্বাস—কোন রৌদ্রভরা দিনের আনন্দরূপ।

মুগ্ধবিস্ময়ে আজকের ওই আলোভরা উপত্যকা—এদিকের ঘন শালবনের পানে চেয়ে থাকি। পুঞ্জ পুঞ্জ সবুজ নিয়ে পাইনবনের বাতাসে কি হাহাকার জাগে। সেই স্বপ্নটুকু কোন অতীতে হারিয়ে গেছে। সীমার সেই আহ্বান দূর আকাশে মিলিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সীমা।

তার গানের চকিত সুরগুলো ঝরে পড়া ফুলের পাপড়ির মত টুকরো টুকরো হয়ে খসে গেছে, হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির বুকে।

কয়েকটা বছর কেটে গেছে। সেই শূন্যতাকে তবু ভুলতে পারিনি। মধুবদ্যির গলির পথ হারিয়ে গেছে।

মন বলে তাই ঘর পালাই।

ফাঁক পেলেই কলকাতায় হটকারের কঠিন পরিবেশ থেকে মুক্তির জগতে হারিয়ে যাই।

—রেডি হয়েছেন?

এগিয়ে আসে তরুণ বিট অফিসার নিশীথ দাস। কাল রাতের বেলাতে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়। আমিই বলেছিলাম তাকে যে পাহাড়ে একটু বের হবো তাদের সঙ্গে। তাই এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে।

ওদিকে সকালের খাবার তৈরী হয়ে গেছে। বাজরারা পরোটা—ডিমসেদ্ধ, আলুভাজা আর কালকের আনা কিছু পেঁড়া। ওকেও আমন্ত্রণ জানাই।

—কিছু খেয়ে নিন। তারপর বের হবো।

দেবুও তৈরী হয়েছে।

ওপাশে বাংলোর পিছনে বেশ কিছুটা জায়গায় কমলালেবুর গাছ। এই উচ্চতায় কমলালেবু, আঙ্গুর—এসবের ক্ষেত করা হয়েছে বনবিভাগ থেকে—ওপাশে কয়েকটা চন্দন গাছও বেশ বড় হয়ে উঠেছে। সেই বাগান পার হয়ে ওদের কোয়ার্টার। ইউক্যালিপটাস গাছগুলো বাতাসে শন্ শনিয়ে ওঠে।

কয়েকটা সাদা রং করা একতলা ঘর, কয়েকটা চালা—টিনের শেড ঘেরা খানিকটা জনবসত। তার ওদিকে কিছু ক্ষেত-এর সীমানা পার হয়ে আবার গহন বন শুরু হয়েছে। এইটুকু মানুষের জগৎ—তারপরই বনরাজ্য।

সেই অফিসার ভদ্রলোক ইতস্ততঃ করেন।

বাংলোয় সাধারণতঃ যারা আসেন এখানে তাঁদের অধিকাংশই কোন বিভাগের কর্তা ব্যক্তি, না হয় অন্য কোন জগতের প্রধান সারির লোক। এই ছোটখাটো ব্যক্তিদের সঙ্গে চা পানে সামাজিক বাধা আছে বলে তাঁদের অনেকেই মেনে নেন।

ব্যবহারেরও রকম ফের হয়ে থাকে। সেই কারণেই বোধ হয় ওঁদের দু'চারজন তরুণকে দেখেছি এড়িয়ে যেতে; এদিকে আসেন নি। বিট অফিসার এসে পড়ে একটু অবাক হয়েছেন।

উনি বোধহয় আমাকেও কেষ্ট বিষ্টু ঠাওরেছেন। নইলে এই পঞ্চাশ মাইল জিপ হাঁকিয়ে কেউ এই পাহাড় পর্বতে আসে বেড়াতে? তাছাড়া অরুণবাবুও ছিলেন ওঁদের সঙ্গে। তামাম পুরুলিয়া জেলায় ওঁরা সুপরিচিত সম্মানীয় জন।

আমিই বলি—বসে পড়ুন। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে?

দেবু চা-এর বন্দোবস্ত করে ফেলেছে রাজুকে দিয়ে। বিট অফিসার কি ভেবে খেতে থাকেন।

ক্রমশঃ কথাবার্তায় ওর সেই জড়তা কেটে আসছে। ওর সঙ্গেই বের হয়ে এলাম আমরা বনের পথে, সঙ্গী হয়েছেন আরও দুজন তরুণ! ওরা পাইন—আঙ্গুর—কমলালেবু এই সব গাছে এখানের পরিবেশে হয় কিনা দেখছেন রিসার্চ করে।

কালকের কথাটা মনে পড়ে। কাল এতক্ষণে আমরা পুরুলিয়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। খেয়ে দেয়ে বের হবো অযোধ্যা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। অযোধ্যা পাহাড়ের নাম শুনেছিলাম মাত্র। দু'একজন যাযাবর ব্যক্তিই বলেছিলেন এর শান্ত সুন্দর রূপের কথা। হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল। ঝুলি নিয়ে বের হলাম। পলাতক হলাম কলকাতা থেকে।

জিপটা ছুটে চলেছে পুরুলিয়া শহর ছাড়িয়ে টাটানগর রোড ধরে। শহরের বাড়ি-ঘর, পাকা রাস্তা, জনকোলাহল পিছেনে পড়ে রইল। আমি চলেছি, —গন্তব্যস্থলের নিশানা জানি না। পথের ডানদিকে নীল ছায়ারেখার মত আকাশছোঁয়া পাহাড়-শ্রেণী মাথা তুলেছে—মাঝে মাঝে ওর দু-একটা চূড়া সেই সীমা ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে ঠেলে উঠেছে।

অরুণবাবুই প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন—'ওই-ই অযোধ্যা রেঞ্জ'। ওরই কয়েকটা ঘাট পার হয়ে তবে অযোধ্যা ফরেস্ট বাংলো।

পুরুলিয়া শহর থেকে বনপাহাড় ঠেলে উপরে উঠতে হবে, প্রায় আড়াই হাজার ফিট উপরে সেই বাংলো—পুরুলিয়া শহর হতে গাড়িতে যেতে তাব দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল।

যাকে বলে হঠাৎ বেরিয়ে পড়া।

কলকাতার মানুষের কাছে এই যাযাবর বৃত্তি খানিকটা বিচিত্রই বোধ হবে। আসলে আমি ওই লালমাটি শালবনের দেশের লোক। যতই শহুরে সাজবার চেষ্টা করি—মন টানে ওই পথে। বাউলের একতারার সুর শুনে মন-বাউল ঘর পালায়, পথের টানে বেরিয়ে পড়ে।

অযোধ্যা পাহাড়ের কথা শুনেছিলাম। কিন্তু পথঘাট জানা ছিল না। যাবার ব্যবস্থাও সেখানে কি, জানি না। তবে শুনেছিলাম খুব সুন্দর জায়গা।

বাংলাদেশের মধ্যে কলকাতার কাছে এমন জায়গা আর নেই, আছে অনের দূরে বিহারের মধ্যে, সেটা হচ্ছে নেতারহাট। নেতারহাট থেকে সেবার ফেরার পথে তাই মনে হয়েছিল অযোধ্যা পাহাড়ের কথা। আজ চলেছি সেই অজানা পার্বত্য পরিবেশে।

উৎসাহ দিয়েছিলেন পুরুলিয়ার লোকসেবক সংঘের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষ মশায়।

পুরুলিয়ার কথা মনে হতেই প্রথমে মনে আসে লোকসেবক সংঘের কথা। তাই তাঁকেই মনের বাসনাটা

জানিয়েছিলাম। দূর-দূরান্তরের অনেক শৈলশিখর দেখতে গেছি। দক্ষিণের কোদাইকানাল, উতকামণ্ড—এদিকের শিলং-দার্জিলিং-সিমলা-মাউন্ট আবু-মহাবালেশ্বর-খান্ডালা মায় নেতারহাট অবধি, ঘরের পাশে অযোধ্যা পাহাড় দেখার বাসনা তাই উদগ্র হয়ে ওঠে। আজ চলেছি সেখানে তাঁর ভরসা পেয়ে।

গহন পার্বত্য অঞ্চল, কিছুই মেলেনা সেখানে। নীচের বড় বসতি বলতে বাঘমুন্ডি। থানা-ব্লক অফিস আছে সেখানে। হাটও বসে। তাও সেই ফরেস্ট রেঞ্জ হাউস থেকে পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে ছ'মাইল নামতে হবে। অরণ্যসঙ্কুল ভয়াবহ সেই পথ। জন্তু জানোয়ারও বের হয়।

শ্রদ্ধেয়া লাবণ্যপ্রভা দেবী নিজে জোর করে গাড়িতে তুলে দিয়েছেন দু-একদিনের রসদের মত কিছু চাল-ডাল, তাঁর নিজের বাগানের ফুলকপি, আলু ইত্যাদি।

বলেন—বাবা, কিছু নিয়ে যাও, কাজে লাগবে।

মসৃণ বন্ধুর উৎরাই চড়াই-এর পথ। এপাশে মাথা তুলেছে অযোধ্যা পর্বত সীমা, ওদিকে পাল্লা দিয়ে বৈকালের পড়ন্ত রোদে মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে দলমা রেঞ্জ। পাহাড়ের রাজত্ব। পার্বত্য-উষর-বন্ধ্যা এ মৃত্তিকা।

নীচের সোল জমিতে কিছু ধানক্ষেতে সোনালী রং লেগেছে। বাকী সব জমিকেই বলা যেতে পারে বন্ধ্যা প্রান্তর। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কুল-পলাশ-মহুয়া গাছ।

কাঁসাই-কুমারী—আরও দু-একটা পাহাড়ী নদী পার হয়ে গেলাম। তির-তিরে জলধারা বালুচরে প্রাণের ক্ষীণ সাড়া জাগিয়ে চলেছে এখন, বর্ষাকালে ওরা উদ্দাম-দুর্বার হয়ে ওঠে।

এখানে সেই জল-ধাবাকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখায় জলাধারও নেই কোথাও। মাটির নীচের স্তরে আছে জমাট পাথর, ডিপ টিউবওয়েলও হয়নি—তাই পাথরের স্তরের নীচে বন্দী জলধারা কুমারী মৃত্তিকার বন্ধ্যাত্ব ঘোচায় নি এখানে। দিগন্তজোড়া পাড়ে আছে কুমারী মৃত্তিকা—মানুষ এখানে হতদরিদ্র, ধরিত্রী—এখানে রিক্তা, শূন্যা। কংসাবতীকে অবশ্য বাঁধা হয়েছে তা অনেক নীচের দিকে।

কথাটা বলছিলেন মাতৃসমা লাবণ্যপ্রভা দেবী। এখনও সেই কথাগুলো মনে পড়ে।

পুরুলিয়া জেলার সংগ্রামের কাহিনী, স্বাধীনতার জন্য কতকগুলি সর্বত্যাগী মহামানবের সংগ্রামের সঙ্গে তা জড়িয়ে আছে। সেই ইতিহাস মিশিয়ে আছে পুরুলিয়ার লোকসেবক সংঘের শিলাগ্রাম আশ্রমের মৃত্তিকায়, পুরুলিয়ার পল্লী অঞ্চলের মানুষের মনে, এখানকার আকাশ-বাতাসে।

পুরুলিয়া তখন বিহারের অধীনে। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেতে উঠেছে সারা দেশ। বন-পর্বত পরিবেষ্টিত এই পুরুলিয়ার শান্ত জীবনেও সেই চেষ্টা এসে পৌঁছাল।

এগিয়ে এলো বহু মানুষ প্রদীপ্ত শপথ নিয়ে, তাদের পুরোধা হলেন দুটি নেতা। একজন অতুলচন্দ্র ঘোষ, অন্যজন স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত—আজকের জননেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী বিভূতি দাশগুপ্ত মহাশয়ের পিতৃদেব।

নিবারণবাবু ছিলেন স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অতুলবাবু ছিলেন এ্যাডভোকেট। দু'জনে তাঁদের সেই কাজ ছেড়ে একত্রে এগিয়ে এলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। প্রতিষ্ঠিত হ'ল লোকসেবক সংঘের আশ্রম।

বন্য পার্বত্য এলাকা, শহরের বাইরে ঢেউখেলানো মাটির বুকে বাঁকুড়া যাবার সদর রাস্তা চলে গেছে, আশপাশে কুল-পলাশের বন। খাদ আর নির্জনতা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের বোধহয় এমনই পরিবেশেরই প্রয়োজন ছিল সেদিন। এর কিছু দূরে জননায়ক চিত্তরঞ্জন দাশ মশায়ের একটা বাগানঘেরা বাড়ি। আজ সেখানে গড়ে উঠেছে নিস্তারিণী কলেজ।

অতুলবাবুর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া লাবণ্যপ্রভা দেবীও এগিয়ে এলেন। স্থানীয় কর্মীদলও এক নবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উঠলেন, দুঃখবরণ-কারাবাস-অভাব-সংগ্রাম তাঁদের জীবনে হয়ে উঠেছিল নিত্যকার ঘটনা।

নিবারণবাবু মারা যান একটি কুঁড়ে ঘরে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে। তবুও সেই সংগ্রাম কমে নি—বলিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল। কথাটা অতি সহজভাবেই বলেছিলেন লাবণ্যপ্রভা দেবী—বাবা, ওসব জেল-নির্যাতন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। যে-কোনদিন পুলিশ এসে আমাদের ধরে নিয়ে যেতো। ভাগলপুর,

হাজারীবাগ, জেলে আমার হাঁড়ি-কড়াই ছিল। কখন বছর-দু'বছর ঘুরে যেতো। ছাড়া পেয়ে আবার যখন সবাই ফিরতাম, তখন আশ্রমের মাটির দেওয়াল —সব ভেঙ্গে পড়েছে। খড় নেই, ছাউনি নেই। জিনিসপত্রও সব উধাও হয়ে গেছে।

ভাঙ্গাঘরে তালাই—না হয় তালপাতার ছাউনি দিয়ে আবার আশ্রম গড়ে উঠতো নোতুন শপথ নিয়ে। কর্মীরাও দমেনি এসব আঘাতে।

বাংলার তথা সারা ভারতের জন-নেতারা অনেকেই এসেছেন এখানে। এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র। চিত্তরঞ্জন দাশ মশায়ের পরিবারের সঙ্গে এখনও তাঁদের যোগাযোগ আছে। তখনকার দিনে বিহারের জনপ্রিয় নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদও ছেঁড়া তাঁবুর নীচে এসে বাস করে গেছেন। পুরুলিয়া এলে এখানেই উঠতেন।

অতীতের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোর ছবি মনে পড়ে। আজ সেগুলো একালের মানুষের কাছে যেন অর্থহীন শূন্য বলেই মনে হয়েছে। ঐতিহ্যময় অতীত ছাড়া গৌরবময় বর্তমান্ আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ কাল আসতে পারে, এ কথাটা তাঁরা অনেকেই মানতে চান না।

জিপটা কাঁটাডি-উর্মা ছাড়িয়ে চলেছে। রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছে আজ জনপদ, স্কুলও আছে। পথের ধারে ঘন সবুজ অমলতাস গাছের ডাল ছেয়ে এসেছে সাদা রজনীগন্ধার মত ফুলগুলো, বাতাসে তাদের উদগ্র সুবাস ছড়িয়ে পড়ে শূন্য আকাশে। কোথায় গরু-মোষের পাল চরছে, ঊষর প্রান্তরে মুখ নীচু করে ওরা কি খুঁজছে, কে জানে। পাহাড়-শ্রেণী স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। পাশে সামনে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়-শ্রেণী, একদিকে অযোধ্যা রেঞ্জ, অন্যদিকে দলমা পর্বতসীমা, ওর ওদিকে ইস্পাত-নগরী জামসেদপুর।

লাবণ্যপ্রভা দেবীর কথাগুলো মনে পড়ে। তাঁকে শুধিয়েছিলাম —গান্ধীজীও কি এই আশ্রমে এসেছিলেন?

তিনি হেসে জবাব দেন—না। সেবার জেল থেকে ফিরে শুনলাম, আমাদের আশ্রমই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। ইংরেজ সরকার বার-তিনেক আমাদের উৎখাত করবার জন্য আশ্রম বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, সেবারও সেই অবস্থা। আমরা একটা ভাঙ্গা বাড়িতে মাথা গুঁজে রয়েছি, গান্ধীজী তখন এসেছিলেন। এ আশ্রমে তাঁকে আমরা পাই নি। সেখানে এসেছিলেন তিনি।

আজও সেই আশ্রম চলেছে সকলেরই জন্যই অবারিত দ্বার। দেখেছিলাম বহু মানুষ আসছে-যাচ্ছে তাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে। সারা জেলার মানুষের কাছে ওই আশ্রম যেন কি অভয় আর আশ্বাস নিয়ে এসেছে। ওরা জানে, এখানে মিলবে সেই নির্ভর —যা তাদের একান্ত প্রয়োজন।

পুরুলিয়ার বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের কয়েকটা আশ্রম কার্যালয় রয়েছে। পুরুলিয়া যখন বিহারে ছিল, তখন মানভূম জেলার লাগোয়া কয়েকটি অঞ্চলেও ওদের প্রতিষ্ঠান ছিল, আজ পুরুলিয়া জেলা আংশিকভাবে বাংলায় এসেছে—বাকীটা পড়েছে বিহারে।

ওদের সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আজও বিহারে রয়ে গেছে। সেখানেও তাঁদের সংঘের কাজ চলছে। জন-সেবার ব্রতে কোন ভৌগোলিক ব্যবধান নেই।

পতঙ্গার আরও দু'টি থানা বাংলায় এলো, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক টাটা-কোম্পানী আপত্তি তুললো এই বলে যে, তাদের কারখানায়, শহরে জলসরবরাহ হয়ে থাকে মূলতঃ দলমা পর্বতশ্রেণী থেকে যার অনেকখানিই ওই বাংলাদেশে পড়েছে নতুন হিসাব মত। বাংলা যদি সেই জলসরবরাহে বাধা দেয় তাদের অসুবিধা হবে। তাই সেই তিনটি থানা আবার বিহারকেই ফিরিয়ে দেওয়া হলো টাটানগরের কল্যাণে।

স্থানীয় লোকেরা আজও বাংলা ভাষাভাষী, মনে প্রাণে তাঁরা একদিন এখানেই আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি। নইলে ডিমলা লেকের এ-প্রান্ত অবধি বাংলাদেশের সীমানা হতো।

সামনে চড়াই-এর উপর বলরামপুর। আধা শহরই বলা যেতে পারে। বাজার-থানা-ব্লক অফিস, ফরেস্ট অফিস, ছোটখাট লাক্ষার কারখানাও আছে। পাশেই বরাভূমি রেলস্টেশন। পোস্টাফিস। বেশ ব্যবসার জায়গা বলেই বোধ হ'ল। দুপুরের ম্লান রোদে লুটিয়ে পড়েছে গাছ-গাছালির মাথায়। এইখান থেকে রেললাইন পার হয়ে ডান হাতে আমাদের ভেঙ্গে যেতে হবে।

তার আগে এঁদের কি জরুরী কাজ আছে পতঙ্গার কাছে কোন আশ্রমে, তাই ওদিকটা ঘুরে এসে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। ডানদিকে বাঘমুরি, অযোধ্যা হিলস্-এর যাবার রাস্তা।

আর বাঁ দিকে চলে গেছে বরাবাজার হয়ে দলমা রেঞ্জের নীচে বানদোয়ান যাবার রাস্তা। ঠিক বিপরীত দিকেই আমরা চলেছি। বরাবাজার ছাড়িয়ে ওরা যাবে পতঙ্গায়।

বেলা বেড়ে উঠেছে। বিট অফিসার আর দুজন সহকর্মী ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে চলেছেন, সামনে দু-চার ঘর বস্তি, মাটির ঘর, বোধহয় পরিত্যক্ত, ওদিকেই ঘনবন শুরু হয়েছে, মাটির দেওয়ালগুলো ফেটে হাঁ হয়ে আছে।

অবাক হই। শুধোলাম,—এগুলো কেন হয়েছে?

হাসলেন বিট অফিসার।

—বুনো হাতির কীর্তি, এরা তাই এখানকার বসত ছেড়ে পালিয়েছে, কারণ দুটো বনের মধ্যে এইটাই যাতায়াত পথ। হাতির দল এই পথে একবার যখন যাতায়াত শুরু করেছে তখন এখানে এইগুলো ওরা রাখবে না।

অবাক হয়ে দেখছি, ভয়ও বোধ করি, ওই তো বাংলোটা রোদে ঝকমক করছে, হাতির দল এখানে গা ঘসতে না এসে ওখানে গেলেই তো পারে, কোনো বাধা নেই। তাহলে ওই বাড়ির হালও খুব বহাল থাকবে না।

—চলুন।

ওবা এসবে অভ্যস্ত। দুবেলাই দেখেছেন তাই এসবে কোনো ভয় ভিত তাদের নেই।

ওদের সঙ্গে চলেছি দুরু দুরু বুকে।

কথাটা বলেছিলেন মিঃ রায়, বরাবাজারের তরুণ ব্লক অফিসার। কালই তাঁর ওখানে গিয়েছিলাম।

গিয়েছিলাম হঠাৎ আর যাবার সুযোগও মিলে গেল। নইলে উজিয়ে উলটো্পথে বরাবাজারে যাবো কেন? অরুণবাবুদের মিটিং আছে পতঙ্গায়।

বরাবাজাব হয়ে যেতে হবে, হঠাৎ মিঃ রায়ের কথা মনে পড়ে।

রুক্ষ বন্ধ্যাপ্রান্তর, সামনে দলমা পাহাড়ের সবুজ সীমারেখা। এই নির্জনে বরাবাজারে যেন নিজের আসন পেতেছে, নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে ছোট পাহাড়ী নদীর ধারে। শীতে এখন নদী শুকনো। ওদিকে বনের সীমা উঠেছে নদীর বুক থেকে, বর্ষায় এর রূপ বদলে যায়। এখন এ উন্মত্ত। নদীর নামটাও বিচিত্র—বোধ হয় নাম ওর ল্যাঙ্কানসা।

ছায়াঘেরা গাছ-গাছালি, তারই মধ্যে বাজার—থানা, দুটো স্কুল, ব্লক-অফিস আরও কি সব আছে, পর্বতসানুসীমান্তে যেন স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি বসত।

ধূলিধূসর রাস্তা পার হয়ে সেগুন বনের শুরু, ঘন হয়ে উঠেছে বন, তারই ধারে বাগানঘেরা একটা বাড়িতে ওর অফিস। বৈকালের পড়ন্ত রোদে কেমন নির্মম প্রাণহীন এই জগত।

এইখানে এই তরুণ মিঃ রায় যেন নির্বাসনে রয়েছেন। আমাদের দেখে চমকে ওঠেন।

—আসুন!

জিপ্‌টা আমাদের দুজনকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল পতঙ্গার দিকে, ওরা সেখানকার কাজ সেরে ফিরে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন অযোধ্যা পাহাড়ের শীর্ষে।

মিঃ রায় চমকে ওঠেন।

—সেখানে যেতে রাত্রি অনেক হয়ে যাবে? রাতেরবেলায় এই পাহাড়ের পথ দুর্গম —বিপদ-আপদও আছে, জন্তু জানোয়ারও রয়েছে। কি করে যাবেন তখন সেখানে?

সমস্যা সত্যিই। আমি তবু জানাই।

—ওঁরা ওপথের হদিশ জানেন, ওঁরাই তো ভরসা দিয়েছেন।

তবু খুশী হতে পারেন না মিঃ রায়।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে নির্জন গ্রামপ্রান্তে, সেগুন বনে পাখী ডাকে। এই বনবাসে ওই তরুণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছেন, তবু বলেন।

—জানিই তো আমাদের গ্রামে এমনি সব জায়গায় ঘুরতে হবে, তবু এর মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। কাজ আর কাজ, তাছাড়া এইখানকার মানুষদের সঙ্গেও মিশে গেছি, খারাপ লাগে না।

অজ পাড়াগাঁ হলেও দেখি দৈনিক বাজার বসে আর রসগোল্লার সাইজ চার আনায় যা দেখলাম ঈর্ষা করার মতই।

মিঃ রায় একাই থাকেন! কাজটাজ করার লোক একজন আছে, সেই তাঁর গৃহিণী, সচিব, সখা। একাধারে সব। সে-ই জলযোগের ব্যবস্থা করেছে ইতিমধ্যে। মামলেট, পরোটা, বেশ কতকগুলো করে ওই সাইজের রসগোল্লা, তাছাড়া স্পেশাল মেনু হয়েছে আপেল।

—এসব!

হাসেন মিঃ রায়—আমরা যে অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে নেই ও তাই প্রমাণ করতে চেয়েছে। আপেলও মেলে এখানের দোকানে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তারাগুলো জ্বলে ওঠে, তিতির পাখীর ডাক ভেসে আসে বনের দিক থেকে, তখনও অরুণবাবুরা গাড়ি নিয়ে ফেরেন নি। ফিরলে এখান থেকে বলরামপুর হয়ে আর দীর্ঘ বন পাহাড়ের পথ পার হয়ে যেতে হবে।

মিঃ রায় বললেন থেকে যান আজকের রাতটা। কাল সকালে যে ভাবে হোক অযোধ্যা হিলস্-এ যাবার বন্দোবস্ত করা যাবে।

ওর সচিবও একবাক্যে খাড়া। বলে,

—সেই-ই ভালো স্যার, মুরগীও রয়েছে, তাহলে দিই লাগিয়ে। নিজের রান্নার এলেম দেখাবার জন্য সে বলে।

—ফাস্ কেলাস রেঁধে দিব বাবু কারি বলেন—কাটলেট বলেন—বানাই দিব।

মিঃ রায়ও নিঃসঙ্গ। কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষ। এই নির্জনতার মাঝে আমাদের নিয়ে গল্পে মেতে ওঠেন। ওদিকে রাত হচ্ছে।

মিঃ রায় যেন মনে মনে তাই খুশী হন, আমাদের থেকে যেতে হবে এখানে এই ভেবে। একটা রাত তবু হৈ চৈ কবে কাটানো যাবে।

কিন্তু অরুণবাবুকে দেখেছি একেবারে ইস্পাতের মতো কঠিন মানুষ। ছকেবাঁধা নিয়মমাফিক কাজ তাঁর। একেবারে প্রোগ্রাম আর ডিসিপ্লিন মেনে চলেন।

মিঃ রায়-এর ওখানে থাকা হয় নি।

বেরুতে হয়েছিল সেই রাতের অন্ধকারে তারা-জ্বলা পথে। সেই নির্জন সেগুনবনের ধারে দেখেছিলাম একটি তরুণকে। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—যদি এপথে কখনও আসেন একবার থেকে যেতেই হবে।

এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করার সুযোগ আসেনি আর। পথের টানে ছিটকে পড়েছিলাম।

আঁধার জড়ানো গ্রাম পথ ধরে আসছি। দুটো বড় বাড়ি—ওগুলো ওখানের স্কুল, বিহারের একটি জিলা ছিল এই পুরুলিয়া—সেইসময় কয়েকমাসের মধ্যে বিহার সরকার সেই সব স্কুল গড়েছিলেন। বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন লোকসেবক সঙ্ঘ।

এই স্কুলগুলোর পরিচালনার ভার তারপর তাঁদেরই নিতে হয়। শুনেছিলাম শিক্ষার ব্যাপারে বিহার সরকারের বদান্যতার তুলনায় পশ্চিমবাংলার সরকারের মনোযোগ বেশ কমই। অনুন্নত অঞ্চল, শিক্ষার যে সুযোগ এঁদের পাওয়া উচিত তা থেকে এরা বঞ্চিত হয়েছিল বলে এদের অনেকে অনুযোগ করেন।

অন্ধকারে জিপটা চলেছে! চারিদিকের আঁধারমাখা উষর বন্ধুর পথে। মাঝে মাঝে দু-চার ঘর আদিবাসীদের বাস—আবার প্রান্তর।

দূরে বলরামপুরের আলো দেখা যায়। বিজলী বাতি জ্বলছে, ক্রমশঃ শহরের দিকে এগিয়ে আসছি আমরা। বলরামপুর থেকে আবার অন্য রাস্তায় যেতে হবে আমাদের।

কিসের বিশ্রী গন্ধ উঠছে শীতের কুয়াশাঢাকা বাতাসে। বিজলীবাতি জ্বলা শহর থেকে দেহাতের দিকে সাঁওতাল কামিনরা কাজ সেরে ফিবছে। ওরা লাক্ষা কারখানায় কাজ করে। কাজের শেষে গান গাইতে গাইতে ফিরছে ওদের বসতিতে।

একদিন পুরুলিয়ার অর্থনীতিতে লাক্ষাই ছিল প্রধান। কুল-পলাশ আর কুসুম গাছের ডালে লাক্ষার চাষ হতো। কাঁচা লাক্ষা বিক্রী হতো প্রায় তিন টাকা সের দরে। প্রতি গৃহস্থের নিদেন পনেরো-বিশটা করে গাছ থাকতো, আর প্রতি গাছে গড়ে দশ মণ লাক্ষা পেতো তারা। চালু ব্যবসা, সারা পৃথিবীর বাজারে ছিল তার চাহিদা। তাই থেকে এদের বেশ কিছু আমদানী হতো।

কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লাক্ষার মত বস্তু বের করে কতকটা সেই বাজাবকে নষ্ট করেছে এখন। তারপরও বেশ কিছু লাক্ষার চাহিদা ছিল, কিন্তু লোভী ব্যবসাযীর দল ভেজাল এবং নিম্নমানের মাল পাঠিয়েছে বাইরের বাজারে শুধুমাত্র মুনাফার জন্যই। তাই বিদেশের ক্রেতারা সেই মাল কেনা বন্ধ করে দিযেছে যার ফলে এদের অবস্থাই খারাপ হয়েছে।

—হাঁস মেরে ডিম খাওয়ার মতই কাজ করেছে দেখছি।

অরুণবাবুর মুখেচোখে বেদনার ছায়া। কঠিন-সতেজ মানুষটি এ ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখেন— পুরুলিয়ার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধসে গেল। মাটিত ফসল হয় না—কোন শিল্পও নেই বললেই হয়। কল-কাবখানাও নেই। বিহাবের কাছ থেকে এরা কি পেয়েছে, তার পরিচযও পেয়েছেন, বাংলায় এসে কি অবস্থায় এরা বাস করে সেটাও দেখে যান।

বলরামপুরে এখনও টিমটিম করে লাক্ষাব কারখানা টিকে আছে। ওরা রাজস্থান-গুজরাটে কাঁচা মাল চালান দেয়, কোন কুটিবশিল্পও লাক্ষাকে কেন্দ্র করে এখানে নেই বললেই চলে।

বলরামপুর বাজারে সামান্য কেনাকাটা করে নিই। টাটানগর এখান থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল। ধানবাদ থেকে টাটা যাবার রাস্তা এই পুরুলিয়া-বলরামপুর হয়ে গেছে।

আর ভালো পেঁড়ার কিলো সাত টাকা।

শহরের অনেক দোকানদারই বলে—এই রাতে অযোধ্যা পাহাড়ে উঠবেন কি করে? রাস্তা ভালো নয়—তাছাড়া জন্তু-জানোয়ারের উৎপাতও আছে। গভীর বন—দিনের বেলায় ওঠা যায় জিপ নিয়ে কোন মতে। কিন্তু এই রাতে যাবেন?

আমাদের ড্রাইভার ভক্তি কিন্তু ওসবে আদৌ ভয় পায় না। বলে সে—দিনের বেলায় যদি গাড়ি ওঠে, রাতেও উঠবে।

বিস্কুট, কলা, মাখন-এব প্যাকিং সবই মিললো এখানে, মায চা নেবু অবধি সবই কেনাকাটা করে নিলাম এই অবকাশে, পথের দুর্গমতা সম্বন্ধে খানিকটা আভাস নিই। কিন্তু বলতে কিছুই নেই, পথে বের হয়ে এগিয়ে যেতেই হবে, সব জেনেই তো এসেছি।

তাই চুপ করে থাকি। মিঃ রায়ও বলেছিলেন কথাটা, এঁরাও জানেন বন-পাহাড়ের সেই দুর্গম পথের কথা, কেমন ভয় হয়। কিন্তু অরুণবাবু নির্বিকার। যেতে হবে, সুতরাং যাবোই, এই তার মনোভাব। পৌছতে রাত হয়ে যাবে, তাই তিনিও এরই মধ্যে পাউরুটি-কলা সন্দেশ ইত্যাদি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দেখলাম। বাড়তি জিনিসপত্রগুলো কেনা শেষ করে আরও কিছু পেট্রোল নিয়ে এইবার আমাদের যাত্রা শুরু হল।

রাত্রি তখন আটটা। সামনে প্রায় তিরিশ মাইল পথ, চড়াই-উৎবাই বন তো আছেই, শেষের পথ—ঘন অরণ্য-সমাবৃত পাহাড়ের কার্ট রোড। সেটাও সাত মাইলের বেশী।

এতক্ষণ তবু প্রধান রাস্তার উপরেই ছিলাম, সেটা ছাড়িয়ে রেল লাইন পার হয়ে আমরা চলেছি ছোট রাস্তা ধরে। লেভেল ক্রশিং-এর লাল আলোটা অন্ধকারে জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে যেন নিষেধের কাঠিন্য নিয়ে, সে চেয়ে আছে আমাদের দিকে সাবধানী ইঙ্গিতে।

কিন্তু আমরা বেপরোয়ার মত তার নিষেধ তুচ্ছ করে ওপথ পার হয়ে চললাম আবার। দু'দিকে ঘন শালবন, একফালি চাঁদ উঠেছে। সেই আলোয় স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। আবছা রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে ঘুমঢাকা দিগন্ত বনসীমা আর পাহাড়গুলো।

এই পাহাড়সীমা এতক্ষণ দূরে দূরেই ছিল। এইবার কাছে, খুব কাছে এসে গেছে। পথের উপরেই বাধা যেন প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে সেই পাহাড়গুলো। পথটাও এঁকেবেঁকে তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে আক্রমণের ভঙ্গীতে ও তার মাঝে কোনও দুর্বল ঠাঁই-এর সন্ধান করছে যেখান থেকে আক্রমণ চালানো যাবে তার উপর।

শালবনের ফাঁকে দু-একটা বসতি দেখা যায়। দু-চারটে মাটির ঘর, দেওয়ালগুলো গিরি রং—এলা রং আর কাল্‌চে রং দিয়ে নিকানো, তকতকে।

আর কিন্তু লোকজন কেউ বাইরে নেই—সারা বসতি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, আর দু-একটা কুকুর বিজাতীয় হিংসা নিয়ে তেড়ে আসছে চীৎকার করে, রাতের অবাঞ্ছিত এই অতিথিদের তারা তাড়িয়ে গ্রাম সীমা পার করে আবার বনের গহনে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

পাহাড়ের কালো ছায়াগুলো চাঁদের আলোয় দৈত্যের মত চারিদিকে মাথা তুলেছে, পথটা বোধ হয় কোন রহস্যময়ীর মত হাতছানি দিয়ে আমাদের পার্বত্য বন্দীভূমিতে নিয়ে এসেছে, বন্দী করে ফেলেছে।

হেডলাইটের জোরালো আলোয় বন-পাহাড় ঝল্‌সে উঠে। কন্‌কনে হাওয়ার ধারালো দাঁত বসেছে হাত পায়ে অনাবৃত অংশে, মুখে। হাওয়ার রকম বদলে গেছে। বাতাসে ওঠে শন্‌-শন্‌ শব্দ। নির্জন-বন্ধুর ঘুমঢাকা পথ, আমরা ক'জন যাত্রী এই ঘুমের রাজ্যে কি চাঞ্চল্য বুকে নিয়ে ছুটে চলেছি।

কেন চলেছি, তা জানি না—কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে অযোধ্যা-পাহাড়ে উঠে, তাও জানা নেই। তবে যেতে হবে। মনবাউল-এর সেই একতারার সুর শোনা—আর ঘর পালানোর সঙ্গে নিবিড় সাযুজ্য রয়ে গেছে। এমনি করে পালিয়েছি বহুবার।

সাগরতীর্থের মৃত্যুমেলায়—গেছি গহন সুন্দরবনের বুকে বাওয়ালিদের সঙ্গে। পথ হারিয়েছিলাম যশলমীরের মরুপ্রান্তরে—দু'ধারে মুগ্ধ-বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখেছি নীলগিরির ডোডা-বেট্টা গিরিশৃঙ্গে মেঘের খেলা—হিমালয়ের তুষার রেখা। এ পথ তবু ফুরোয়নি, মনবাউল শুধু পালায়—পালাতে চায়।

জিপটা ডানহাতে বাঁক নিয়ে গেট পার হয়ে কয়েকটা বিরাট সেগুন-শালগাছের নীচে একটা বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। পিছনেই জমাট অন্ধকারের মত পাহাড়গুলো ঠেলে উঠেছে। দু-একটা ছোট ঘরও রয়েছে। হঠাৎ ঝট্‌পট্‌ শব্দ শুনে চাইলাম।

হেডলাইটের আলোয় দেখা যায় কয়েকটা ময়ূর-ময়ূরী আমাদের এই অতর্কিত প্রবেশে বিরক্ত হয়ে ডানা মেলে এদিক-ওদিক উড়ে ঝোপের আড়ালে সরে গেল। একটা ময়ূর বিরাট রঙিন লেজটাকে টানতে টানতে দৃপ্ত ভঙ্গীতে সরে গিয়ে শালগাছের ডালে বসে ঘাড় কাৎ করে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। স্বপ্নময় বনরাজ্যে রাতের নিস্তব্ধতা নেমেছিল—সেই প্রশান্তিকে আমরা বিঘ্নিত করেছি।

হতাশ হই। এই না-কি অযোধ্যা পাহাড়ের বাংলো? এতো প্রায় লোকালয়ের কাছেই, সামনে পিচের রাস্তা—ওদিকে মাইল তিনেক দূরে বাঘমুণ্ডি গ্রাম, পাহাড় তো শুরু হয়েছে পিছনে। ঠিক মন ভরে না এ দেখে।

জানলাম ওটা মাঠা রেঞ্জ অফিস। এখান থেকে অযোধ্যা আরও দশ-এগারো মাইল পথ—পাহাড়ের মাথায় যেতে হবে। রাতের বনপথ—একজন ফরেস্ট গার্ড যদি গাড়িতে সঙ্গে যান, তাহলে সুবিধা হয়—ফেরার পথে তাঁকে আবার এখানে পৌছে দিয়ে পুরুলিয়া যাবেন অরুণবাবু।

অযোধ্যা পাহাড়ের ফরেস্ট বাংলো রিজার্ভেশনের ব্যাপারে ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার আমাদের পাশ দিয়েছিলেন, সেই চিঠির অনুলিপিও পাঠানো হয়েছিল মাঠা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসারকে। তাতে আমাদের ওখানে যাবার দিনও নির্দিষ্ট করা ছিল।

রাত হয়ে গেছে। মাঠার রেঞ্জ অফিসার বোধহয় ভেবেছেন আমরা চলে গেছি পাহাড়ের উপরে। এই গভীর রাতে ওই বন পাহাড় টপকে কেউ স্রেফ বেড়াতে যাবার জন্য আসতে পারে সেটা তার হিসাবেই ছিল না।

তাই হঠাৎ ওই স্তব্ধ রাতের নির্জনতা ভঙ্গ করে আমাদের হাজির হতে দেখে তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না।

তাছাড়া এই হিমজমা শীতের রাতে আমাদের সেই দুর্গম পাহাড় বাংলোয় পৌঁছে দেবার কোন দায়িত্বও তার নেই।

সেটা বুঝেছিলাম ওর হাবেভাবেই।

জিপটা থেকে নেমে আমিই এগিয়ে যাই। চারিদিকে গাছ-গাছালি পেছনে কালো জমাট আকাশ ছোঁয়া মাঠা পাহাড়ের পাঁচিল, উঁচু দাওয়ার উপরে ফরেস্ট বাংলো লাগোয়া অফিস ঘরে আলো জ্বলছে।

মোটা গোলমত বেশ চকচকে টাকওয়ালা ভদ্রলোক বের হয়ে এসেছেন, আমার পরিচয় দিতে তিনি জানান।

—এই রাতে যাবেন কি করে? এতো দেরী করে আসেন, পথ-ঘাট ভালো নয়। বুঝলেন মশায়—এ কলকাতা নয় যে যখন তখন বেরুবেন।

—তাহলে যাবার কি উপায় হবে?

ভদ্রলোক জানান—রিস্ক না নিয়ে আজকের রাতটা থেকে যান ওপাশের বাংলোয়, সকালে উঠবেন পাহাড়ে।

ওদিকে বোধহয় ওঁর কোয়াটার, কাকে বের হয়ে আসতে দেখি। আবছা আলোয় ঠিক দেখা যায় না একটি মুহূর্ত! ওই নবাগত মহিলাকে দেখছি। তাকে ঘিরে একটু আলোর বৃত্ত, আমি দাঁড়িয়ে আছি বাংলোর নীচে সেগুন গাছের জমাট পাতায় নামা অন্ধকারের মাঝে।

বেশ বিপদে পড়েছি। ওপাশে কোয়াটার থেকে মেয়েটিকে বের হয়ে আসতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে রেঞ্জ অফিসারের টনক নড়ে ওঠে। বেশ কড়া স্বরে জানায় তাকে,

—তোমার শরীর ভালো নেই, আবার ঠাণ্ডা লাগাচ্ছো। যাও ভিতরে যাও।

আমি অনুনয় করি ওকে।

—একজন গার্ড যদি সঙ্গে দেন, গাড়ি রয়েছে। ফেরার পথে তাকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন এরা; নইলে এই রাতে আবার থাকা খাওয়ার ঝামেলায় পড়বো।

ভদ্রলোক জবাব দেন—

ক্যানট হেলপ অর্থাৎ বুঝে নাও গে।

ওই মহিলা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর চোখে মুখে কি একটা ব্যাকুলতা। চাদর জড়ানো মূর্তিটা যেন কি জানতে চায়। ভদ্রলোক বেশ কড়া স্বরেই দাবড়ে ওঠেন—

তুমি ভেতরে যাও।

—এই যে স্যার, আপনি! নমস্কার স্যার!

ব্যাপারটা দেখে অবাক হই। সাপের ফণায় যেন রোজার ধুলোপড়া পড়েছে। অরুণবাবুকে ওই জিপ্ থেকে নামতে দেখে ভদ্রলোকের মুখের হাবভাব মায় কণ্ঠস্বর অবধি বদলে গেছে।

গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি।

—আপনি যাচ্ছেন স্যার? ঠিক আছে আমিই আপনাদের ওই বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে আসছি।

সব মেজাজ এক মুহূর্তে গলে জল হয়ে গেছে। ভদ্রলোক দৌড়লেন ভিতরের দিকে, ভদ্রমহিলা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন, ওর তাড়া খেয়ে ভিতরে গেলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক বের হয়ে এসেছেন গরম একটা ঢোলা প্যান্ট আর কোট চাপিয়ে, টাকে জড়ানো একটা ভেঁড়ি মাফলার, এখানকার বনপাহাড়ের শীতে ওই সব বস্তুই কাজের। এসে বললেন, —চলুন স্যার।

ওপাশে একটা ভুটকম্বল জড়ানো শীর্ণ নাক উঁচু লোক বারান্দায় বসেছিল, পোড়া বিড়ি টানছে আর খক্ খক্ করে কাসছে।

লোকটা উঠে এসেছে, কম্বল জড়ানো ভালুকের মত মূর্তিটাকে দেখে একটু অবাক হই। দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢাকা মুখটা, চোখদুটো জ্বলছে কি অস্বাভাবিক দীপ্তিতে! লোকটা বলে—একটা সিগ্রেট দেবেন? যা শ্লা শীত, হাড়পাঁজরায় ঝাঁঝর কত্তাল বাজছে।

সিগ্রেট দিতে লোকটা চাইল। মহা অন্যায় করে ফেলেছি বলে সে।

—ধরিয়ে দ্যান।

অরুণবাবু ওদিকে কার সঙ্গে কথা বলছেন। লোকটাকে সিগ্রেট ধরিয়ে দিতে গাঁজাটানার মত সজোরে দমফাটা কয়েকটা টান দিয়ে ওই গরম ধোঁয়ার সবটা গিলতে গিলতে বলে,

—এ মুলুকে বেড়াতে এসেছেন? ওই অযোধ্যা পাহাড়ে যাবেন শুনলাম?

মাথা নাড়লাম। লোকটা নিজেই গলগল করে বকে চলে।

—আমার নাম ফণী, ফণী নায়েক। বুঝলেন? এককালে তামাম বাঘমুন্ডী চকের কাক পক্ষীতেও চিনত। সবই বরাত। গুণের কদর কুন শালা দেয় মশাই? সব শ্লাই বেইমান।

শীর্ণ লোকটার কি গুণ তা জানি না। তবে ওর তেজ আর জ্বালাটা খানিক অনুমোদন করতে পারি। দম নিয়ে ফণী নায়েক বলে,

—একটা টাকা দেবেন? সারাদিন খাওয়া জেটেনি।

ওর দিকে চাইলাম। ফণী নায়েক বলে,

—রেঞ্জ অফিসারের গিন্নী খুব ভালো, খেতে-টেতে দেয়। ব্যাটা ওই রেঞ্জ অফিসারই মহা ঠাঁটা। মক্ষিচুষ মশাই।

নিজেই বলে চলেছে সে।

— হবে না? তিনকাল গিয়ে স্রেফ টাকার জোরে গরীবের ঘরের মেয়েকে এনেছেন মশাই। লাইফ তার 'হেল' করে দিলে ওই মক্ষিচুষ ব্যাটা। এন্তার কামাচ্ছ কিন্তু ওয়ান পাইস ফাদার মাদার।

পরে ঠিক সোমে এসে ভিড়ে যাওয়ার মত বলে—দ্যান না স্যার কিছু।

লোকটার মুখচোখে কি একটা ব্যাকুলতা। কি ভেবে ওকে একটা টাকা দিয়ে এগিয়ে এলাম। ওরা জিপে উঠে বসেছেন।

রেঞ্জ অফিসার বলেন,

—ওটাও ধরেছিল নাকি হতচ্ছাড়াকে তাড়াতে পারলে বাঁচি।

ঠিক ওর পরিচয়টাও জানলাম না। তবে লোকটার চাহনি আর ওর কথাগুলো ভুলিনি। রাতের নির্জন অন্ধকারে এই বন পর্বতের রাজ্যে ওই ধ্বংসপ্রায় মানুষটা যেন বিচিত্র একটা ভবিষ্যৎ রচনা করেছে।

জিপটা হেডলাইট জ্বেলে চলেছে। সামনে, দুপাশে শুরু হয়েছে পাহাড়ের সীমা প্রাচীর।

রেঞ্জ অফিসার ভদ্রলোক বলেন,

—ওখানে ভালোই লাগবে। সুন্দর জায়গা। নিজে গিয়ে বিট অফিসারকেও বলে আসবো।

ভদ্রলোক এই বন পাহাড় সম্বন্ধে নানা তথ্য শুনিয়ে চলেছেন। আমাকে যেন এই রাতেই ওই বন পাহাড়ে পাচার করতে পারলে নিশ্চিন্ত হন, সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আর অরুণবাবুকে 'ওবলাইজ' করার জন্য সাহসে ভর করে বের হয়েছেন আমাদের সঙ্গে।

গাড়িটা অন্ধকার সমুদ্রে যেন পথ হাতড়ে চলেছে শালবনের বুক চিরে।

এইবার আমাদের যাত্রার আসল পর্ব শুরু হল। সামনে এইবার আকাশ-ছোঁয়া প্রাচীরের মত কালো ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়-রাজ্য। ও যেন স্তব্ধ জনহীন মৃতের জগৎ। আধখানা চাঁদের আলোয় চারিদিকে পাণ্ডুর, বিবর্ণতার ম্লান আধো দেখা না-দেখার রহস্যে সে স্বপ্নময়।

রেঞ্জ অফিসার ভদ্রলোক এখানকার ছৌ-নাচের কথা বলে চলেছেন। বেশ কিছুদিন এখানে আছেন। বাঘমুণ্ডির কাছেই একটা গ্রামের ছৌ-নাচের দল ইতিমধ্যে কলকাতায় বঙ্গ-সংস্কৃতির আসর মাৎ করে এসেছেন। দিল্লীতেও গেছেন তারা। তিনি বলেন—ছৌ-নাচ পুরুলিয়ার এই অঞ্চলের লোকনৃত্য। সত্যি দেখবার মত জিনিস।

—ছৌ-নাচ কলকাতায় যা দেখেছি তাতে ওর সম্বন্ধে জানা যায় সামান্যই। ওতে নাচ-গান-এর মাধ্যমে রামায়ণের কাহিনীর রূপায়ণ করা হয়। নৃত্যশিল্পীরা মুখোস বা অন্যান্য সাজপোষাক পরে মুদ্রা হাবভাবের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত ভাবটাকে প্রকাশ করেন।

অযোধ্য পাহাড়, রামায়ণের ভাব নিয়ে নৃত্যকলা—সব কিছু মিলিয়ে কোথায় যেন একটা ক্ষীণ হারানো সূত্র রয়ে গেছে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এ জিনিস-এর উদ্ভব আর চর্চা অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

জিপটা মসৃণগতিতে ছুটে চলেছে। ঘুমভরা স্তব্ধতার রাজ্যে আমরা কোথায় হারিয়ে গেছি। এখানকার জীবনে ওই চলাটাই যেন সত্যি। একটা পাহাড়ী নদীর ব্রিজ পার হয়ে এলাম। বালির বুকে ক্ষীণ রূপালী রেখাগুলো ধারাণির মত বয়ে গেছে। কালো ফিতের মত পিচের রাস্তা গেছে বাঘমুণ্ডি অবধি, তার আগেই ডানহাতের খোয়াপাথর ঢালা রাস্তায় নেমে গেলাম আমরা।

ডাঙ্গার উপর তৈরী হচ্ছে হাসপাতাল, পথটা এগিয়ে চলেছে, জমাট কালো সীমাপ্রাচীরের দিকে। এত দীর্ঘ পথ পার হয়ে পাহাড়ের সেই দুর্বলতম স্থানটার সন্ধান পেয়ে সে যেন লাফ দিয়ে ওর গা বেয়ে উঠেছে। একদিকে শুরু হয়েছে খাদ, অন্য দিকে উঁচু পাহাড়।

পথটা ঘুরে ঘুরে উঠেছে, দু'পাশেই ঘন-গাছগাছালির জঙ্গল। গাছগুলো নীচের দিকে ছিল ঝোপমত। ছোটো ছেটো গাছ। এইবার অরণ্যের আসল রূপের পরিচয় পাচ্ছি ক্রমশঃ। হেডলাইটের আলোয় দেখা যায় দীর্ঘ কাণ্ডগুলো সোজা উঠেছে। ঘন আর বেশ সতেজ বলেই বোধহয়।

স্তব্ধতার রাজ্য, সেখানে আমাদের জিপের গুরু-গুরু গর্জন সেই নিস্তব্ধতাকে ভরিয়ে তুলেছে। শাল-মহুয়া আসান মুর্গার বন, ঝোপে ঝোপে সাদা ফুলগুলোর আলো পড়ে ঝল্সে ওঠে।

হিমেল বাতাসে বনের ফুলের তীব্র সুবাস মিশেছে ব্যাকুল মিনতির মত। হঠাৎ কোন গাছের বুকে বসে থাকা পাখীটা হেডলাইটের আলোয় চমকে উঠে উড়তে থাকে দিশাহারার মত গাড়ির সামনেই।

মানুষের এই আকস্মিক আবির্ভাবে বনরাজ্যে যেন সাড়া পড়ে গেছে—পাখীটা পথ হারিয়ে উইন্ডস্ক্রিনের উপর এসে আছড়ে পড়ে। ভক্তি তার আগেই গাড়িটা থামিয়ে ফেলেছে। সরু রাস্তা, একদিকে গভীর খাদ। পাখীটা ওই দিকেই ছিটকে পড়েছে।

আবার চলেছি আমরা। জিপটা কঁকিয়ে উঠছে, হাওয়ায় ওঠে শন্‌শন্ শব্দ। এ রাজ্য মানুষের দখলে নয়, এসব প্রকৃতির অধিকারে। রাতের অন্ধকারে বনভূমির বুকে কোন বিদেহী আত্মা ছায়ামূর্তি ধরে জেগে উঠেছে এই আবছা চাঁদের আলোভবা রাজ্যে।

প্রকৃতির এই সুন্দরী রূপকে দেখেছি সুন্দরবনের গহনে। অরণ্য জগতেব অসীমে মানুষ হারিয়ে যায়, তার স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় থাকে না। হরিণেব নীলচোখের দীপ্তি জাগে, বাতাসে ওঠে ওদের ডাক। সুন্দরবনের রাতের রূপরাজ্যে আমি হারিয়ে গেছলাম।

মহীশূরের বন্দীপুর—কাঁকনকোটের জঙ্গলে—মাদ্রাজের মধুমল্লাই বনরাজ্যে এই রূপ দেখেছিলাম। তরাই-এর রাজাভাতখাওয়ার অরণ্যেও দেখেছি একই রূপ। তা শাশ্বত চিরন্তন সুন্দর। সর্বত্রই দেখেছি নির্জনতার মাঝে আদিম সেই আরণ্যক রূপ। এ রূপ চিরন্তন, চিরঅধরা, রহস্যময়ী।

হঠাৎ গাড়িটা দুলে ওঠে। ড্রাইভাব বলে—একটা ময়াল সাপকেই চাপা দিয়েছি ল্যাজের দিকে।

আলোয় চকচক করে সেটা ভারি দেহকে টেনে নিয়ে সরে গেল জঙ্গলের মধ্যে, মাঝারি সাইজের ময়াল সাপই হবে বারো-চোদ্দ ফিট। পাহাড় থেকে নেমে আসছিল আলোয় হকচকিয়ে গিয়ে একেবারে চাকার নীচে এসে পড়েছে। জিপটা দুলে ওঠে। একদিকে খাদ, যেন জিপটা ঢলে পড়বে সেই দিকেই। কোনো রকমে গাড়ির নীচে থেকে সাপটা বের হয়ে যেতে স্বস্তি পাই। রাতের আদিম অরণ্যে তাই বোধ হয় ওরা নিষেধ করছিল ঢুকতে।

রেঞ্জ অফিসার ভদ্রলোক চুপ করে বসেছিলেন। রাতের অন্ধকারে কি খেয়াল বশেই তিনি এ বনে এসে পড়েছেন বোধহয়।

এখানকার বীভৎসতা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল। আমাদের এই হঠকারিতা বোধ হয় তার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে বোধ হয়নি। শীতের কন্‌কনে হাওয়া এসে লাগছে মুখে-চোখে। রেঞ্জার ভদ্রলোক চকিত আলোভরা ঘন বনের দিকে চেয়ে কিসের সন্ধান করছেন।

বলেন—হাতিও আছে এ বনে। দলবন্দী থাকলে তারা রাস্তার দিকে আসে না। একটা দলছুট মাক্‌না

এদিক-ওদিক ঘুরছে। বরাত মন্দ হলে তার সামনেই পড়ে যাবো কিনা কে জানে?

—বলেন কি মশাই, হাতির পালও আছে এখানে? আবার হাতিও?

বনেরই লোক তিনি। এ সংবাদ সত্য বলেই বোধ হয় বনের ঘনত্ব আর বিস্তার দেখে মনে হয় বাঘ-ভালুক নেকড়ে-বনশূয়ার থাকবেই। হরিণও আছে। কিন্তু হাতি বাস করে এখানে, তা জানতাম না।

শুনেছি পাশের দলমা পাহাড়ে হাতি আছে। তার ওদিকে সারান্দা ফরেস্টে হাতি এমনকি বাইসনও আছে। কিন্তু এখানে হাতির কথা শুনে একটু ঘাবড়ে যাই। জমাট অন্ধকার ভরা বনের দিকে চেয়ে থাকি।

জিপটার গর্জন উঠছে, খোয়া-আস্ত পাথরগুলো বের হয়ে পড়েছে, রাস্তার উপর দিয়ে কোথাও কোথাও পাহাড় থেকে জলস্রোত নামে। সেই প্রবাহ বয়ে যায় পথের উপর দিয়ে। পাহাড় কেটে পথটা এঁকে বেঁকে উঠেছে।

হঠাৎ ড্রাইভার দেখায়—দেখছেন? ওই যে সামনে।

পথের উপর যেন কোন হিংস্র জানোয়ারই হবে, দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দেখি তা নয়। রাস্তার উপর দিকে বনের কয়েকটা শালগাছ দাঁতনের মত ভাঙ্গা পড়ে আছে, বোধ হয় একটু আগেই কে ভেঙ্গেছে ওগুলোকে, রাস্তার উপর পড়ে আছে দুটো স্তূপের মত নাদ। তখনও ধোঁয়া উঠছে। ওই-ই বলে।

—হাতির লাদ স্যার। টাটকা বলেই বোধ হয়।

অর্থাৎ একটু আগেই এই পথ দিয়ে মলত্যাগ করে পাহাড়ের গা বেয়ে গাছ ভেঙ্গে পথ করে নীচের দিকে নেমেছে। ভক্তি জিপের গিয়ার চেঞ্জ করে একটু গতি বাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু দাঁত বের করা পাহাড়ি সরু পথ, তায় বেশ চড়াই আর বাঁক। খাদ তো রয়েছেই। কখনও এদিক, কখনও ওদিকে।

গতিবেগ বাড়ানো যায় না। জিপটা থর্‌থরিয়ে কি আতঙ্কে যেন ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে এখান থেকে। ভিতরে আমরা ক'টি প্রাণী চুপ করে বসে আছি। এতক্ষণ শীতে আর ঠাণ্ডা পাহাড়ী হাওয়ায় কাঁপছিলাম, এইবার যেন আতঙ্কে জমাট বেঁধে গেছি। মনে হয় শালবনের ফাঁক থেকে পথের বাঁকে এখুনি বের হয়ে আসবে কালো বিরাট পাথরের 'মূর্তির' মত হাতিটা। শুঁড় দুলিয়ে এগিয়ে আসবে আমাদের দিকে। জিপটা তার কাছে টিনের খেলনার মতই, ওকে ঠেলে গড়িয়ে ফেলে দেবে পাহাড়ের অতল কোন খাদে।

কিন্তু তা হয় নি। গাড়িটা কঁকিয়ে গর্জন করে সারা বনরাজ্যে আলোড়ন তুলে জোরালো আলোর ধমক হেনে এগিয়ে চলেছে।

ড্রাইভার ভক্তির শীর্ণ বলিষ্ঠ মুখে পড়েছে ড্যাসবোর্ডের নীলাভ আলোর রেখা, কঠিনতর হয়ে উঠেছে ওর মুখ। ওই পাহাড়ি পথে টপ গিয়ারে চলেছে গাড়িটা।

বাঁ দিকের অন্ধকার চাঁদের আলোয় ভরে উঠেছে। পাহাড়ের মাথা ডিঙ্গিয়ে ওই শূন্যতার মাঝে চাঁদের আলো পড়েছে। ওই ঘুমঘুম আলোয় দেখা যায় রূপালী জলরেখার প্রবাহটাকে, খুব উঁচু থেকে কালো পাথরের উপর লাফ দিয়ে পড়েছে।

বাতাসে ওঠে একটানা ঝরঝর শব্দ। প্রকৃতির এই নির্জন রাজ্যে কোন রূপবতী কন্যা রূপালী সাজে সেজে নাচের মুশায়েরা বসিয়েছে। মানুষ নেই—চাঁদের আলোয় থম্‌থমে গাছের সারি—আর বিদেহী কোন ছায়া অপ্সরার দল সেই মহফিলের সামিল হয়ে তারিফ করছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে চাঁদের আলোমাখা ওই রূপালী জলধারার দিকে চেয়ে থাকি।

রেঞ্জ অফিসার জানান,

—তুর্গা ফল্‌স। এখন জল কমে গেছে। বর্ষায় টেরিফিক হয়ে ওঠে।

জিপটা থেমেছে। চারিদিকে থম্‌থমে ভাব, পাহাড়ের উঁচু মাথাগুলো দেখা যায় না। বনপাহাড়ে সেই অন্ধকারেই অজান্তে নেমে পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। ভয় ভুলে গেছি ওর বিরাট অপরূপ সুন্দরের জগতে আমিও যেন হারিয়ে যাই।

মনে হয়, এই ধ্যানগম্ভীরতার মাঝে ওই প্রাণের অনির্বাণ সাড়াটুকুর সঙ্গে জীবনের কোথায়ও একটা নিবিড় সাযুজ্য আছে। কঠিন-কঠোর আদিম হিংস্রতার মাঝেও সে বেঁচে থাকে—হাসি-গান আর সুর নিয়ে। তাকে

কঠিন পাথরের শাসন দিয়ে বাঁধা যায় না—সে আনে জীবনের সাড়া আর প্রাণের স্পন্দন। বনরাজ্যে তুর্গাও সেই সুর এনেছে।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি এই রূপালী বর্ণভরা জলরাশির দিকে। বনে বনে বাতাসের সুর ওঠে—তীব্র শুবাসভরা বনবাতার—তাতে মিশেছে তুর্গার ওই সুর। পাখী ডাকছে কোথায়। অন্তহীন নিঃস্তব্ধতার রাজ্যে আমার যেন স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, ওই অসীমের রাজ্যে হারিয়ে গেছি।

এই রূপের কিছুটা দেখেছিলাম সুন্দরবনে। গহন অরণ্যে আর গহিন বনের পারে। জীবনের স্পন্দন নেই, মৃত্যুই সেখানে পরম সত্য কথা। আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেছলাম। সেই ভয়ের কালোছায়াটা মনের সব আলোটুকুকে গ্রাস করেছিল। খেতেও ভুলে গেছলাম। ফেরার পথ নেই। বনের অনেক ভিতর এসে গেছি দুস্তর গাঙ্ পাড়ি দিয়ে।

হঠাৎ যেন সেই ভয়টা মন থেকে মুছে গেল। মনে হয়েছিল মৃত্যুই পরম সত্য, সেইটাকে যখন মেনে নিতে পারলাম, তখনই সুন্দরবনের অধরা সুন্দর রূপটা আমার কাছে অপরূপ বলে বোধ হল, নোতুন ভালোলাগার চোখে দেখেছিলাম আলোভরা সুন্দরবনকে, রাতের রহস্যময় বনরাজ্যকে।

এখানেও সেই মুগ্ধ-বিস্মিত চাহনিতে চকিতের জন্য অযোধ্যা পাহাড়ের মহান্ গুরুগম্ভীর প্রাণময়ী রূপ অধরাকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ওদের ডাকে চমক ভাঙ্গে।

—গাড়িতে আসুন। এখনও অনেক পথ বাকী।

দিনের আলোয় আবার দেখতে আসব একে। রাতের রূপটাকেও দেখে গেলাম।

রেঞ্জ অফিসার বলে চলেছেন।

পথের ধারে আর একটা ফল্‌স্ আছে, বামনী ফল্‌স্। সেখানে ওয়াচ টাওয়ারও করে রেখেছি। সুন্দর দৃশ্য। তা ছাড়াও তুর্গার থেকেও বড় ফল্‌স্ আছে, ঠিক জোনার মতই। তবে সেটা খুব, দুর্গম আর বনও সেখানে খুব গভীর। ডেন্স ফরেস্ট। বাঘ-হাতি-ভালুকের এলাকাই বলা চলে।

হাতির নামটা এখানে খুবই ভীতিকব। স্থানীয় লোকেরা তো ওই জানোয়ারটিকে বলে—গণেশ ঠাকুর। তবে নিরীহ গণপতি যে মাঝে মাঝে প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে তা জানা ছিল না। বড়বাজারের গদিতে যাকে নিয়ে ওলট-পালট চলেছে সর্বদাই, তিনি যে এদের কেউ নন্ তা নিশ্চয়ই সত্যি।

জিপ সমানে চলেছে। তবে মনে হয়, এতক্ষণ ধরে শুধু উপরেই উঠেছে। এবার পথের 'এলিভেশন' কিছুটা কম। বোধহয় সারা পাহাড়ই ঘন বনে ঢাকা, মাঝে মাঝে উপরের চূড়ায় ওই অরণ্যের বাঁকে দু-দশ ঘর বসতি, কোথাও এতটুকু ঠাঁই। তাতেই ধান ক্ষেত, মকাই বজরার চাষও হয়। হাতির পালও এই সব খেতে এসে নামে। আর ভালুক আসে মহুয়া পাকলে। এসব এদের বিহার ক্ষেত্রে পরিণত হয় রাতের অন্ধকারে।

ফুট হিলস থেকে পাহাড়ের এই শিখর অবধি পথের দূরত্ব সাত মাইলের বেশী। সারা পথ বনে ঢাকা। বন বিভাগ এই কার্ট রোডটা তৈরী করেছেন; এই পথটা বাঘমুণ্ডি থেকে পাহাড়ে উঠে পাহাড়-শ্রেণীকে টপ্‌কে পুরুলিয়ার কাছাকাছি অঞ্চল শির্কাবাদের কাছে পাহাড়ে-শ্রেণী থেকে বের হয়ে সমতলে নেমেছে।

সবটা মিলিয়ে পথের দূরত্ব পনেরো-ষোল মাইল। এই পথটা এখন বন-বিভাগকে কোন রকমে টিকিয়ে রাখতে হয়, পিচের প্রলেপ নেই। কোন রকমে টিকে আছে মাত্র। এই পথটা যদি বাস-চলাচলের উপযোগী করা যায়, তাহলে পুরুলিয়া থেকে অযোধ্যা বাংলোর দূরত্ব হবে বাহান্ন মাইলের জায়গায় মাত্র ছাব্বিশ মাইল, আর এ পথের দৃশ্য এই পাহাড়বনের জন্যে হয়ে উঠবে অপরূপ। ভ্রমণকারীদের যাতায়াতও বাড়বে।

আজ এতো সৌন্দর্য, এতো আকর্ষণ বুকে নিয়ে এই পাহাড়সীমা লোকচক্ষুর বাইরেই রয়ে গেছে। বিশেষ কেউই এখানে আসেন না, এর খবরও জানেন না। তাঁরা হিলস্-এ যেতে হলে দার্জিলিং, নিদেন রাঁচী-নেতারহাট যান।

এক ঝাঁক ময়ূর রাস্তার পাশে ধানক্ষেত থেকে সরে গেল এলোমেলো ভাবে, তারা বিরক্তই হয়েছে। জিপটা বন ছাড়িয়ে মকাই ক্ষেত, দু-একটা বসতির পাশ দিয়ে চলেছে। দু'পাশে শুরু হয়েছে ইউক্যালিপটাস-এর বন, সাদা কাণ্ডগুলো আলোয় ঝলসে ওঠে।

হিমেল বাতাসে ওদের পাতাগুলোয় সর-সর শব্দ ওঠে। ওপাশে মাথা তুলেছে পুঞ্জ পুঞ্জ আঁধারের স্তূপ-এর মত কয়েকটা পাইন গাছ। সামনেই কাঁটাতারের বেড়াঘেরা সুন্দর বাড়িটা, গেট পার হয়ে কাঁকর-ঢালা পথ দিয়ে জিপটা এসে ফরেস্ট বাংলোর সামনে দাঁড়ালো।

সমতলের মধ্য থেকে অযোধ্যা-পাহাড় রেঞ্জ মাথা তুলেছে। একদিকে বলরামপুর, টাটানগর রোড, অন্যদিকে ঝালদা, আড়সা, এদিকে বাঘমুণ্ডি অন্যদিকে শির্কাবাদ।

এই মাঝখানের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই পাহাড়-শ্রেণী। বৃত্তাকারে পাহাড়গুলো যেন এই বিস্তীর্ণ এলাকাকে কি রহস্যে ঢেকে রেখেছে। আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘন বন, ওদিকে দলমা রেঞ্জের লাগোয়া। তাই বুনোহাতির দলও এখানে বাসা বেঁধেছে। তাছাড়া ভালুক, বন-শূয়োরও আছে। বাঘ-চিতাবাঘও রয়েছে।

রেঞ্জ অফিসার এতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিলেন, ওই ঘন বনের দিকটা পার হয়ে এসেছি উপরে, ভদ্রলোক একটু সাহস পেয়ে এইবার মুখ খুলেছেন।

—এই বনে ভালো গাছও রয়েছে। মেহগনী, আবলুস, সেগুন তো আছেই। তাছাড়া সবচেয়ে সেরা কাঠ আছে ওই 'রোজ উড', তার দাম অনেক। বুঝলেন মশাই—এতবড় এলাকা কারা পাহারা দেবে? তাই বেশ কিছু কাঠ চোরা কাটাই হয়ে চলে যায় পুরুলিয়া, টাটানগরে। আর ইল্‌লিগ্যাল পোচিং-এর কথা বলবেন না, হরিণ বন-শূয়োর তো এরাই পেলে খতম্ করে দেয়।

ভদ্রলোক নিজের কথাই বলে চলেছেন।

এই বন অঞ্চলকে সমৃদ্ধতর করে তোলার নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল বিধান রায়মশাই-এর সময়ে। উনি জানান,

—কিছু কিছু কাজও হয়েছে। তবে আরও হওয়া দরকার।

হাওয়ায় শন্ শন্ সুর ওঠে। চাঁদের আলো ভরা চারিদিক। স্বপ্ন জড়ানো বনরাজ্য থেকে বের হয়েই নজরে পড়ে সাদা ঝকঝকে সুন্দর বাড়িটা। চারিদিকে ইউক্যালিপটাস গাছের দীঘল ভিড়, পাইন-এর পুঞ্জ পুঞ্জ আঁধার আলোর মাখামাখি।

ভদ্রলোক যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

—ওই যে ফরেস্ট বাংলো। আর দূর নয়, প্রায় এসে গেছি আমরা।

ইঞ্জিনের শব্দটা প্রকৃতির স্তব্ধতাকে বিব্রত করে না। একটা টিলার মত উঁচু ঠাঁই, তার উপর বাংলোটা। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে, সামনে উঁচু, বেশ খানিকটা চাতাল, পোর্টিকো। ওখান থেকে বিরাট বিস্তৃতির আভাস মেলে।

চাঁদের আলো-ঢাকা ঘুমভরা বনরাজ্য—কালো পাহাড়সীমার দিকে চেয়ে থাকি। স্তব্ধতার অতলে সব হারিয়ে গেছে! আমাদের কয়েক দিনের বাসস্থানটাকে প্রথম নজরেই ভালো লাগে।

ইতিমধ্যে ফরেস্ট কলোনী থেকে তরুণ বিট অফিসার মিঃ দাসও এসেছেন। সঙ্গে কয়েকজন ইউনিফর্ম-পরা ফরেস্ট গার্ড। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে বেঁটেখাটো পোক্ত চেহারার একটি খাকি পোষাকপরা যুবক, স্যালুট করার ভঙ্গীতে।

ওদের স্যালুট দেবার কায়দা দেখে মনে হয় কর্তাব্যক্তিরাই এখানে আসেন হয় কাজে, নয় ভ্রমণে। এই বন-পাহাড়ের রাজ্যেও তাঁরা এটা পেতে চান—তাই ওরা এটাকে এখানেও রপ্ত করে নিতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য আমাদের বাংলোর চৌকিদার রাজু এমন স্যালুট দিয়েছে বহু বিচিত্র ঠাঁই-এ বারবার, সেকথা পরে জানলাম তার কাছ থেকেই।

বাংলোটায় ইতিমধ্যে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে। মৃদু আলোয় নীল ডিসটেম্পার-করা ঘরখানা মিষ্টি কবোষ্ণ আমেজে ভরে ওঠে।

বড় ঘরটা বসবার ঘর—মাঝে খাবার টেবিল, কয়েকটা সোফা-ডেকচেয়ার রাখা। দু'পাশে দুটো বেডরুম, নেওয়ারের খাট—ড্রেসিং টেবিল, মেঝেতে কার্পেট পাতা। এটাচ্‌ড্ বাথ। তাতে শাওয়ার-কমোড-বেসিন ইত্যাদি সবই আছে।

বন পাহাড়ের বুকেও বিলাসের এই প্রাথমিক উপকরণগুলোর অভাব নেই। গোবর দিয়ে গ্যাস তৈরী করে ট্যাঙ্কে রাখা হয়। সেই গ্যাসে বাতি জ্বলে, হিটারেব আগুনে চা-টা গুলো হয়ে যায়।

ওপাশে একটা স্টোররুম মত। ছোটখাটো রেস্ট হাউসটা মোটামুটি সুন্দরভাবে সাজানো। এদিকে বন বিভাগের কর্মীদের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে।

অরুণবাবুদের পুরুলিয়ায় ফিরতে হবে এতখানি পাহাড়-বনের পাথ পার হয়ে, ঠাণ্ডাও পড়েছে। পথে ওরা রেঞ্জ অফিসারকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। তাই ওঁদের ছেড়ে দিতে হল।

রেঞ্জ অফিসার ভদ্রলোক এখানকার কর্মীদের বলেন—যান, ওদের অতিথির যেন কোন অসুবিধা না হয়। অরুণবাবু নানা কাজের মানুষ, সারা পুরুলিয়ার নানা সমস্যা তাঁর মাথার উপর। কলকাতাও যেতে হয় প্রায়ই। তবু স্মরণ করিয়ে যান।

—পাঁচদিন পর সকালে গাড়ি আসবে, এ ক'দিন আপনাদের বনবাসে রেখে গেলাম।

শীতের মাঝামাঝি সময়। বনে বনে শাল সেগুনের পাতা হলুদ হয়ে এসেছে, মুর্গা আসান গাছের পাতায় আসে কচি সোনার রং। কিছু কিছু পাতা ঝরে গেছে। কোনটায় বা এর মধ্যেই নোতুন পাতার সাজ এসেছে।

আমলকি গাছ এ বনে প্রচুর, সাদা সাদা ডালে আর বিরলপাতার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য আমলকি ফল ধরেছে, কতক ছিটিযে পড়ে আছে। কুড়োবার লোক নেই, বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, দূরে একটা পাহাড়ের উঁচু শিখরদেশ আকাশে ঠেলে উঠেছে। চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

বিট অফিসার নিশীথবাবু বলেন—জায়গাটার প্রকৃতিই এমনি। আর অযোধ্যা দেখেছেন, ওইটাই যেন বিরাট এই বৃত্তের কেন্দ্র।

পাহাড়ের উচ্চতা ওখানে প্রায় আঠাশশো ফিট, ওর চেয়ে উঁচু পাহাড এই রেঞ্জে আছে, তবে সেখানে বসবাসেব আর আসা যাওয়াব কোন সুবিধে বিশেষ নেই।

প্রায তিন হাজার ফিট উপরে একটা সুন্দর অধিত্যকা। তাব এদিক ওদিক ছড়ানো কিছু ধানক্ষেত, বসতি। জলসেচের জন্য দু'একটা বাঁধও আছে। তাছাড়া ওই উচ্চতায় ঝর্নারও অভাব নেই।

নীচের পাহাড় অঞ্চল ঘন বনে ঢাকা, সেদিকে বসতি অপেক্ষাকৃত কম, ঘন বনের মধ্যে দিয়ে রোদ মাঝে মাঝে আটকে যায়। প্রবেশ পথ পায় না।

হঠাৎ কলকল শব্দে দাঁড়ালাম।

নিশীথবাবু মিঃ ভট্টাচার্যও আমাদের দেখছেন, বলেন—

একটা ঝর্না খানিকটা নীচের পাথরে পড়ছে। ওকে ফল্‌স্‌ও বলতে পারেন, আমরা ঘুর পথে বাংলোর দিকে চলেছি।

পাহাড় ভেঙ্গে তৃষ্ণাও পেয়েছে, ঠাণ্ডা কাঁচধার জল তরতরিয়ে পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে বয়ে চলেছে, মুখে মাথায় দিতে যেন ক্লান্তি মুছে যায়। স্তব্ধ বনভূমি, হঠাৎ খশখশানির শব্দে চমকে উঠি।

বিট অফিসার নিশীথবাবুও সাবধানী চাহনিতে এদিকে ওদিকে দেখছেন। এখানে বন অনেক গভীরে, বড় বড় শাল গাছ না থাকুক—ছোট ঝুপি গাছের ঘন জঙ্গল । তাছাড়া জলের ধারেই জন্তুদের আনাগোনা বেশী হয।

তার আগেই ফরেস্ট গার্ড একটা পাথর তুলে ছুঁড়ে দিতে বিরাট একটা হনুমান সরে গিয়ে আকর্ণ দন্ত বিস্তার করে গর্জে ওঠে খ্যাঁক খ্যাঁক কোরে।

উনিই এতক্ষণ এদিকে কিসের সন্ধানে ঘুরছিলেন। নিশীথবাবু বলেন,

—এখানে জন্তু জানোয়ার থাকাই স্বাভাবিক, চলুন ফেরা যাক। খালি হাতে এগোনো ঠিক হবে না।

বনভূমির এই রূপকে আমিও দেখেছি বার বার। এই রূপরাজ্যের কি যাদু আছে। এ রূপবতী অপরূপ অরণ্যের অন্তরে নিহিত রয়েছে কি এক দুর্বার মৃত্যু আর ধ্বংসের রূপ।

সুন্দরবনের গহনে দেখেছি সেই বিচিত্র রূপকে বিশাল অরণ্য আদিম কুমারী অরণ্য। বসন্তেব প্রথম ফুলে

ফুলে এর বুক আচ্ছন্ন, কুমারী কন্যার কপালে যেন চন্দন টিপ, অকূল নোনা গাং এই ঝরাফুলের বর্ণে চন্দন রং ধরেছে।

কিন্তু ওরই অন্তরে রয়েছে মৃত্যুর পদধ্বনি। বনে বনে ফেরে হিংস্র বাঘ ডালে ঝুলছে কোথাও বিষধর সাপ—আর ওই কালো জল ভরা গাং-এ গিশগিশ করছে কাসট আর কুমির।

বনের রূপেই তাই। জীবনের মতই সর্বদাই এর সঙ্গ নিয়ে আছে চরম একটি মুহূর্ত তবুও এ সুন্দর এ রূপময়।

এখানে কালরাত্রে এসেও সেই রূপটিকে দেখেছিলাম।

জিপ থেকে নামতেই রেঞ্জ অফিসার হাক ডাক শুরু করেন। এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর তার বীরত্ব আর প্রাধান্য দেখাবার মৌকা পেয়ে তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন।

বিট অফিসার নিশীথবাবুও এসেছেন। তাঁর কোয়াটার থেকে আরও দু'চারজন ফরেস্ট গার্ড এসে হাজির হয়ে তাকে স্যালুট করে। আর বাংলোর চৌকিদার রামুতো এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রেঞ্জ অফিসার বলেন—এরা থাকবেন নিশীথবাবু, দেখবেন আর গার্ডদেরও বলে দেবেন যেন নজর রাখে সবদিকে।

নিশীথবাবু ঘাড় নাড়েন। রেঞ্জ অফিসার এই সুযোগে ইন্সপেকশন খাতাতেও একটা গুড়ি মেরে গেলেন, অর্থাৎ একদিন ডিউটি দিয়েছেন এখানে এসে। বলেন গার্ডদের,

—শুনলাম দক্ষিণের ডিহিতে কিছু চোরা কাটাই হচ্ছে ভালো গাছ। সদরেও খবর গেছে। নিশীথবাবু আপনিও দেখবেন। বলেছি তো নেক্সট প্রমোশন সবকিছু নির্ভর করছে এর উপরই।

রামু ততক্ষণে বাংলোয় গ্যাসের বাতি জ্বেলেছে, মৃদু আলোয় আলো হয়ে ওঠে ঘরখানা। সামনের পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে আছি।

অরুণবাবু ফিরে চলেছেন। রেঞ্জ অফিসারও গাড়িতে উঠে বিদায় নিলেন।

ঘন বনের আড়ালে ওদের গাড়ির টেল ল্যাম্পটাও হারিয়ে গেল। এতক্ষণ জায়গাটা ওদের ভিড়ে—আর সাহবের চীৎকারে ভরেছিল, হঠাৎ সব থেমে যেতে একটা স্তব্ধতা নামে সেখানে, চাঁদের আলোয় ভরা ঘন বনসীমা পাহাড় আর ধানক্ষেতের বিস্তারের দিকে চেয়ে থাকি। পাহাড় আর পাহাড়, শান্ত স্তব্ধ সমাহিত।

অন্তহীন স্তব্ধতা নামে আকাশে-বাতাসে। কোথায় রাতজাগা পাখী ডাকে—কলরব করে তারা, জ্যোৎস্না যেন হিম হয়ে গলে গলে পড়ছে পাইনের পুঞ্জ পুঞ্জ পাতায়।

চৌকিদার বলে—ভিতরে আসুন স্যার। দরজাটা বন্ধ করে দিই। অর্থাৎ আমরা যে বাইরে থাকি এটা সে পছন্দ করে না। দরজাটা খোলা রাখার ইচ্ছেও তার নেই।

আমার সঙ্গী দেবু এতক্ষণ ঘরের ফটোগুলো দেখছিল। বসবার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে বনের কয়েকটা ফলস্ আরও অন্য দৃশ্যাবলীর ছবি। তাদেরই একটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেবু। চোখেমুখে তার ভয়ের ছায়া।

বনের মধ্যে ছ'সাতটা বিরাট হাতি দাঁড়িয়ে আছে। নীচে লেখা রয়েছে—পুরুলিয়ার অরণ্যে বুনোহাতির দল। দেবু বলে,

—তাহলে হাতির কথা সত্যিই? ওরা রয়েছে এই সব বনে?

সায় দিই—না থাকাটাই বিচিত্র, আজ তাদের লাদ তো দেখে এসেছো।

চৌকিদার জানায়,

—হ্যাঁ স্যার। বাংলোর পাশেই ওই জঙ্গল দেখছেন, এর নামই হাতিনাদার জঙ্গল। কিছুদিন আগে আমার মকাই ক্ষেতের সব কিছু খেয়ে চলে গেল। জঙ্গলের একধারে বস্তির বাইরে আমার বাড়ি—এ জঙ্গল থেকে বের হয়ে ওই জঙ্গলে ঢোকবার পথের ধারে। গণেশ-ঠাকুরদের যাবার পথ ওটা। তাই ও-বাড়ি ছেড়ে বসতির এদিকে চলে এসেছি, স্যার। মাঝে মাঝে আসেন গণেশঠাকুরের দল।

চুপ করে শুনছি। দেবুও ভয় পেয়েছে। রাজু তাই বোধহয় অভয় দেয়।

—বাংলোতে আসে না তারা।

দেবু বলে—জানালাগুলো ভালো করে বন্ধ করো বাপু।

ও জানে না জানালা বন্ধ করে হাতিকে ঠেকানো যায় না। ঘষলেই ও জানালা খুলে পড়বে, শুঁড় দিয়ে টানলে তো কথাই নেই।

রাজু চৌকিদার মিটি মিটি হাসছে। আশ্বাস দেয়—এদিকে না, স্যার।

রাত হয়ে গেছে। খিদেও লেগেছে। পাঁউরুটি, সন্দেশ, ডিমসিদ্ধ আর গরম দুধ দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছিলাম। দুধ ওরাই রেখেছিল, হিটারে গরম করে দেয়। এত সুন্দর দুধ অনেকদিন খাইনি। কন্‌কনে শীতের মাঝে বেশ লাগে।

গতরাত্রে ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ভোর হয়েছে—ঘুম ভেঙ্গে গেল পাখীর ডাকে। অযোধ্যা পাহাড়ের সব পাখীগুলো যেন খুশীতে কলরব করছে।

জানালা দিয়ে দেখা যায় আকাশের অসীমে আঁধার-মেশা লালচে রং জেগে উঠছে। কালো পাহাড়ের মাথার উপরের আকাশটুকু আলোয় ভরে ওঠে—কোন নতুন দিনের পূর্বাভাষ নিয়ে। শাল-মহুয়ার বনে-প্রান্তরে ধানক্ষেতের সোনা রং-এ সেই ঘুম ভাঙ্গানি আলোর সাড়া জেগেছে।

ছাঁয়া ছায়া গাছগুলো—মুক্ত উপত্যকা—গভীর গিরিখাদ যা অন্ধকারের অতলে ডুবেছিল এখন তা আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠছে। বিচিত্র অবিস্মরণীয় একটি সংযতসুন্দর রূপকে দু'চোখ ভরে প্রত্যক্ষ করি, এই রূপ দেখেছিলাম, কোদাই কানালের পর্বতসীমায়। দেখেছিলাম মহীশূরের বন-পর্বত রাজ্যে।

বনরাজ্যের এমনি সকালের শান্ত স্তব্ধতা দেখেছিলাম তরাই-এর বনভূমিতে, সুন্দরবনের গহনে। সে রূপ স্বতন্ত্র। নেতারহাটের পালামৌ ডাকবাংলো থেকে এমনি সূর্যোদয় দেখেছিলাম।

নীচের পাহাড়ের অন্ধকারে ছিটকে এসে পড়েছে একফালি আলো। পাখীগুলো কলরব করছে, যেন সামস্তোত্রমুখর কোন অরণ্যাশ্রম, এখানে প্রত্যহের গ্লানি নেই, মালিন্য মুক্ত কোন পৃথিবী।

অরণ্যের গভীরে যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁদের মধ্যে দু-চারজন বনবিভাগের কর্মী বা কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি থাকেন, তাঁরাই এই সুন্দর জায়গাগুলোকে খুঁজে বের করেন, লোকের সামনে প্রচার করেন, সেই ঠাঁই- গুলোকে আরও সুন্দর করে তোলেন। সারাঙ্গা বনভূমি চাঁইবাসার কাছে। সেই অরণ্যে রাজ্যের একজন ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার ছিলেন, তাঁর নাম বোধহয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিং, হিন্দী সাহিত্যে বেশ কিছু গল্পও লিখেছিলেন। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধুস্থানীয় এই ব্যক্তি বনকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন। তিনিই বিভূতিবাবুকে এই অঞ্চলের গহন দুর্গম অরণ্যপর্বতে নিয়ে যেতেন, সেই পরিচয় মিশে আছে তাঁর বহু সার্থক সৃষ্টি সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে।

বোয় হয় তাঁর আরণ্যকের যমুনাপ্রসাদের চরিত্রেরই বাস্তব রূপায়ণ দেখেছিলেন তিনি ওই যোগেনবাবুর মধ্যে—যিনি বনকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতেন—এর সৌন্দর্যকে মনে মনে গ্রহণ করেছিলেন। যমুনাপ্রসাদও তাই করতো, সরস্বতী কুণ্ডীকে সে সাজিয়ে তুলেছিল—ভালোবেসেছিল লবটুলিয়া-নাড়াবহইয়ার বনরাজ্যকে।

কিন্তু ট্রাজেডি এই যে, সেই পরিবেশ হারিয়ে গিয়েছিল মানুষের লোভের সামনে। আরণ্যকের সেই বনভূমি শান্ত-সুন্দর জীবনযাত্রা—সেই রাঙ্গাসর্দার আর বসতির মানুষগুলোকে হঠাৎ যেন বহু বছর পর ফিরে পেলাম এই অযোধ্যা পর্বতের নিভৃতে।

ভোরের আলো ফুটে উঠছে। জেগে উঠছে বনরাজ্য। দু'চার-ঘর ছিটানো বস্তির মানুষগুলো। পাখীর দল কলরব করছে। খঞ্জন-টিয়া, চন্দনা-বুলবুল, বনতিতির, ফিঙে ময়ূরের দলও বের হয়েছে। বাংলোর খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় পাইনগাছের সার। পার হয়ে ঢালু উপত্যকার বুকে শাল মহুয়ার গাছগুলো পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। তারপর মাথা তুলেছে কালো গিরিশিরা।

প্রথম সূর্যের লাল আভায় ওখানে যেন আগুন লেগেছে। কোন কলরব নেই। কলকাতার জীবনের কর্মব্যস্ততা ভুলে গেছি। সারা দেহ-মন ঘিরে রয়েছে ওই শান্তি স্পর্শ—এই শান্তভাবটাই বোধহয় মানুষকে হাত ধরে প্রকৃতির লীলানিকেতনে পৌঁছে দেয়। সেও এই বিস্মৃতির অসীমে হারিয়ে যায়।

সকালের রোদে বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে কাল রাতের অন্ধকারঢাকা পৃথিবীর ঘোমটাখোলা রূপকে দেখছি। উপত্যকার ধাপে ধাপে নেমে গেছে সোনা রঙের ধানের ক্ষেত। মকাইয়ের ক্ষেতে সবুজ গাছগুলোর মাথায় ঝুরিবন্দী মুক্তোর মত ফলগুলো মাথা নুইয়ে ঝুলছে। বাগানের পাইন গাছের পাতায় সকালের শিশির জমে ঝক্‌ঝক করছে। বনবিভাগের কলোনীটাকে এইবার ভালো করে দেখতে পাই!

বাংলোর পিছনে বেশ খানিকটা জায়গায় আঙুর ক্ষেত, তখনও বেড়াঘেরা ঠাঁই-এ ঘন লতা থেকে আঙুরের থোকাগুলো ঝুলছে, কোনটার থলি বাঁধা। ওপাশে সারবন্দী কমলালেবুর গাছ, ইউক্যালিপটাসের লম্বা সারির ওদিকে একতলা কয়েকটা ঘর। বিট অফিসার—সিলভিকালচার-এর বাবুদের আস্তানা—ওপাশে গার্ডদের কোয়ার্টার। সব জায়গাটার চারিদিকে পোক্ত করে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া।

ইতিমধ্যে রাজু হিটারে চা করে এনেছে। নীচে থেকে আনা বিস্কুট দিয়ে চা-পর্ব সারছি। এর পর সকালে কিছু খাওয়া সেরে ঘুরতে বের হবো। কিন্তু ভয় হয়, চারিদিকে শুধু বন আর পাহাড়। মাঝে এই বিস্তীর্ণ জায়গাটুকু ফাঁকা—ধান বাজরার ক্ষেত, ওদিকে একটু রাস্তার মত দেখা যায়—গরু চরছে, বোধ হয় বসত আছে। কিন্তু সবই অজানা ঠাঁই। স্থানীয় কাউকে না পেলে এসব জায়গায় ঘোরাও সম্ভব নয়।

এখানে আসার পর সেই প্রয়োজনটা বোধ করেছিলাম। চারিদিকে ওই বন-পাহাড়। মাঝে এই অধিত্যকাটুকুই কিছুটা ফাঁকা, ধানক্ষেত আর ওই বসতিটুকুর পরই শুরু হয়েছে গভীর বন। নীচের পাহাড়ের উপত্যকার দিকে নেমে গেছে।

সে বনে একা ঢোকা উচিত নয়।

লোকজনও নেই।

এই বাংলোকে ওই বনকলোনীর বাবুরাও যেন তফাতে সরিয়ে রেখেছেন ইচ্ছে করেই।

কারণটা এঁরাই জানেন।

বেলা হয়ে গেছে। বন থেকে বের হয়ে বাজরার ক্ষেতের পাশ দিয়ে আসছি, এই নিভৃত অরণ্যের ছোঁয়াটুকু সারা মনে কী মুক্তির আশ্বাস আনে।

জানাই—প্রথমে তো সকালবেলায় এড়িয়েই গেছলেন মিঃ ভট্টাচার্য। ভেবেছিলেন কি বিচিত্র এক জীব বুঝি আমরা?

ভদ্রলোক চাইলেন আমার দিকে। ওকেও আজ সকালেই ধরে এনেছিলাম ওর কোয়ার্টারের কাছ থেকে।

—চলুন, আপনাদের জায়গাগুলো একটু দেখাবেন না?

আমার প্রথম কথা শুনে উনি একটু থমকে দাঁড়ালেন, শুধোলেন—আপনিই কাল রাতে বাংলোয় এসেছেন?

—হ্যাঁ। জানাই আমি। বলে চলেছি ওকে ডেকে এনে।

—আপনাদের এখানে এলাম, দেখছি আপনারা কেমন এড়িয়ে চলেছেন। ব্যাপার কি বলুন তো মশাই? এই জঙ্গল পাহাড়ে আপনারা ছাড়া আর কাকে ডাকবো?

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

ক্রমশঃ জেনেছি উনি বি. এস. সি. পাশ করে দেরাদুন ফিরেই রিসার্চ ষ্টেশনে ট্রেনিং নিয়ে এখানে এসেছেন। উনি জানান।

—ওখানে যারা আসেন তাদের বেশীরভাগই আমাদের সযত্নে দূরে পরিহার করেন। তাছাড়া কর্তা- ব্যক্তির দল তারা, আমাদের সঙ্গে দহরম মহরম করলে হয়তো অসুবিধা হয়।

হাসতে থাকি।

—ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। যাযাবর মানুষ মশাই, মঝে মাঝে কলম বাজি করার চেষ্টা করি। আমাকে সেফ্‌লি নিতে পারেন।

ওদিকের কোয়ার্টারে তখনও কার নাক ডাকার শ ব্দ শুনি। ভটচায বলেন।

—প্রদীপ। বেলাতেই ওর ঘুম ভাঙ্গে।

ওপাশের কোয়ার্টার থেকে কার গীতা পাঠের শব্দ আসছে। এই বনবাসে এসেও ভদ্রলোক বোধহয় ওই গীতা পাঠ-এর অভ্যাসটা ছাড়েন নি।

ভটচায-এর সঙ্গে এসে হাজির হয়েছিল নিশীথবাবু। দেবুও এতক্ষণ চুপ করেছিল। শহরের মানুষ, দশটা পাঁচটার বেড়াটপকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়ে আর বিশমাইল ঠেঙ্গিয়ে কোন মফঃস্বলে ফিরে আসে?

তবু মনের দিক থেকে সে বাউলই। মাঝে মাঝে ফাঁক পেলেই ঘর পালায়। আর এমনি বন পাহাড়ের দিকেই তার নজর বেশী।

এই প্রথম তেমনি বনের রাজ্যে এসেছে, মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখে চারিদিক। নিশীথবাবু মিঃ ভটচাযও সঙ্গী হয়ে গেছে আমাদের।

ফিরছি প্রথম বন পরিক্রমা সেরে।

ক্ষেতের ধারে লাল টেঁড়সের মত ছোট ছোট কি ফল গাছে ধরে আছে। একরকম শণ জাতীয় গাছ ওগুলো। নিশীথবাবু কতকগুলো লাল ফল তুলে বলেন,

—চৌকিদারকে বলবেন রেঁধে দেবে। ভালো চাটনী হয় এতে।

ওই জিনিসটা আমি চিনেছি। সেবাব শুশুনিয়া পাহাড় থেকে হেঁটে আসছি ঝাঁটি পাহাড়ীর দিকে। বাস সার্ভিস নেই বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। তাই হেঁটে আসতে হচ্ছে দীর্ঘ বার মাইল পথ-রাস্তা ধরে।

একটা ডাঙ্গায় সন্ধ্যার আবছা অন্ধকাবে দু-একটা সাঁওতাল মাঝিব বসতির গাযে দেখেছিলাম ওই লাল ফলগুলোকে। গেরুয়া ডাঙ্গার বুকে লাল গাছে লাল ফলগুলো দুলছে; সেই ফল তুলে এনেছিলাম; সেদিন ওই যাতায়াতের মাইল কুড়ি পথ ভাঙ্গা আব পাহাড়ে ওঠাব ধকলে সারা গায়ের টাটানো ব্যাথাটা যেন ঠেলে উঠেছে।

মাংসেব কারি আব ভাত সঙ্গে ওই লাল পদার্থের চাটানি খেয়ে সটান ঘুমিয়েছিলাম, পরদিন সকালে দেখি কোন গ্লানি নেই।

ওরা বলে—এই ফলগুলোর নাকি অনেক গুণ, আর খেতেও অপূর্ব। ভ্যানিলার মত সুগন্ধি বের হয়, আর গলে একেবারে জেলির মত হয়ে যায়, তবে রাম টক। মিষ্টির পরিমাণ খুব বেশী দিতে হয়।

বাংলোয় ফিরে দেখি রামু ইতিমধ্যে পোর্টিকোতে ডেক চেয়ারগুলো বের করে রেখেছে।

—কফি না চা বানাবো?

রামুর এদিকে সাবধানী দৃষ্টি। রান্না বান্নাও তৈরী।

ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে দেবুই জানায়,

—কফি বানাও। বসুন মিঃ ভটচায—এই নিশীথবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

ওরা বলেন—বেলা হয়ে গেছে।

অবাক হই—এখানেও ঘড়ি ঘণ্টা ধরে চলেন নাকি? কলকাতায় নাজেহাল হয়ে গেলাম ওই ঘণ্টা বাবাজী গুঁতোয়, দোহাই মশায় এখানে ওটার নাম করবেন না।

এমনি অখণ্ড সময়ের প্রহরগুলো একাকার হয়ে গেছল সুন্দরবনে নৌকায় বসে থাকার সময়। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামতো, রাত বেড়ে চলেছে। রসুইওলা হামিদ তাগাদা দিয়েছে।

—খাবার পাকাইছি!

নৌকার ছই থেকে মুখ বের করে ওই আঁধার নামা অরণ্যের দিক চেয়ে থাকি।

হরিণের চোখ জ্বলছে খালের দু'পাশে, সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসে—আদিম প্রাগৈতিহাসিক এই রাত্রিকে যেন আমি চিনি, সেই তমসার অতলে তলিয়ে গেছে।

তারাগুলো জ্বলছে, নৌকাটা ঢেউ-এ মৃদু মৃদু দুলছে, ওর গায়ে ঢেউ ভাঙ্গার তাল। খেয়াল হয় রাত দুটো বেজে গেছে।

খাবারও ইচ্ছে নেই, কি যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে ওই তারাজ্বলা রহস্যময়ী অরণ্যে গভীরের দিকে চেয়ে আছি। সময়ও এখানে তাল রাখতে পারে নি।

তাই জানাই—ওসব থাক!

কফি এসে গেছে। হঠাৎ একটা এনামেলের থালায় চামচা দিয়ে ঘা মারার আওয়াজে ফিরে চাইলাম।

ওদের কোয়ার্টারগুলোর দিক থেকে শব্দটা আসছে। সেই সঙ্গে ভারি গলার স্বর ওঠে।

—মিল রেডি। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। টু ডেজ মেনু স্যুপ দ্যা মুসৌরী, প্যাপিস্ ঝিঙিয়া সাল্যাদ দ্যা অনিয়ন ক্যাকাম্‌বাব গ্রীণ চিলিজ, অ্যান্ড টোক্ বেলান্টি।

ভবাটি দরাজ গলায় একটা তোয়ালে গায়ে চাপিয়ে ও হাঁকছে, আর থালা পিটছে:

ভটচায বলে—মেসে বান্না হয়ে গেছে। আজ প্রদীপের ডিউটি ছিল তাই হাঁক ডাক করছে।

মেস কথাটা শহরের। ওই শহরের জীবনের সেই এ সমাজ ব্যবস্থার কথা এখানে শুনে একটু অবাক হই।

—মেস!

হাসে নিশীথবাবু।

—হ্যাঁ। এক একদিন এক এক জনের পালা করে রান্না বান্না করতে হয়।

ইতিমধ্যে প্রদীপ এসে পড়েছে। ও-ই জানায়,

—অবশ্য রান্না খারাপ হয় না স্যার। একদিন এই অধমের রান্নাও খাওয়াবো। তবে নট নাও। বাঘমুন্ডিব হাটবাব কাল, পরশু ট্রাই কবা যাবে। কাল অবধি মেনু ওই স্যুপ দ্যা মুসৌবী অ্যান্ড প্যাপিস্ ঝিঙিয়া পটাটো, মানে মসুরীর ডাল আর ঝিঙে আলু পোস্ত—আব বিলাতী বেগুনের চাট্‌নী।

শুধোই—কপি টফি নেই?

—কপি! এখানে পুজোর মুখেই একবার হয়ে যায়। তারপর আর কেউ লাগায় না। আর ওই মাঝিদেব কথা ছাড়ান দ্যান। স্রেফ ভাত আর নুন উইথ হাঁড়িয়া—নট কিচ্ছু। এনাফ। প্রদীপ এসে জাঁকিয়ে বসেছে। এ আমন্ত্রণেব অপেক্ষা রাখে নি।

কফিতে চুমুক দিয়ে চলেছে, দেখি মোটা গোলগাল এক ভদ্রলোক কি যেন এক কৌতূহল বশে পা পা কবে কলমালেবুর গাছগুলো পাব হয়ে এই দিকে আসছে। বেশ একগোছা গোঁফও রয়েছে, ভুঁড়িব উপব সাদা পৈতাটাও দেখা যায়। সাত্বিক চেহারা।

প্রদীপ বলে—অ মুখুয্যে দাদা, আসুন আসুন আস্তেজ্ঞা হোক।

নিজেই পরিচয় করিয়ে দেয় প্রদীপ।

—উনিই মুখুয্যে দাদা—দি গ্রেট পৌত্তলিক আর এই নিশীথ—মানে বিট অফিসার একে চেনেন তো?

ওর দিকে চাইলাম। বলি,

—কালই পরিচয় হয়েছে,

—কাঁচকলা হয়েছে। কতটুকু ওকে চিনেছেন, স্যার? দেখেছেন শুধু বাইরেটা ভেতরের—

নিশীথ যেন লজ্জা বোধ করে। তাই বাধা দেয়।

—এ্যাই প্রদীপ!

প্রদীপ বলে ওঠে,

—না না। ওসব কথা বলে লাভ কি ভাই। কি বলুন স্যার। কে কোথায় লভ টভ করছে, প্রমোশনের ড্রিম দেখছে, প্রিয়া টিয়াকে নিয়ে ঘর পাতার স্বপ্ন দেখছে, ওসব খবর জানিয়ে কি দরকার বলুন?

মুহূর্তের মধ্যে জায়গার রূপ বদলে যায়। একটি সহজ পরিবেশ গড়ে ওঠে।

নিশীথ ধমকায়—এক ঘুঁসি মারবো রাসকেল? যতো সব বাজে কথা ওর।

হাসছি।

প্রদীপ বলে,

—অবশ্য মুখার্জি দাদার ওসব ভাবনা নেই। পুতুল বৌদির চিঠির আশায় দিনগুণেই সময় কাটিয়ে দেন।

প্রদীপ! মুখার্জিবাবু ধমকে ওঠে—

ইয়ার্কি ঘুচিয়ে দিব।

প্রদীপ হাসছে। হঠাৎ একটা কুকুরকে মেসঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বাংলোর বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে থালা বাজাতে বাজাতে প্রদীপ এগিয়ে যায়। আর চীৎকার করে।

এ্যাই ব্যাটা, বামুন ভোজন হয়নি, এখুনি চলে এসেছিস, এ্যাই কুকুর!

ঝড়ের মত ওর আনাগোনায় বুকচাপা পরিবেশটা সহজ হয়ে ওঠে।

মুখার্জিবাবু গজগজ করেন।

—ভয়ানক ফক্কোড় ওটা। কি করে দেরাদুন কলেজ থেকে পাশ করেছে কে জানে?

বেলা হয়ে গেছে।

নিশীথ বলে—স্নান-টান করে খাওয়া দাওয়া সেরে একটু রেস্ট নিন। বৈকালে দেখা হবে।

ওরা এগিয়ে গেল ওদের কলোনীর দিকে।

এতক্ষণ বুঝতে পারি নি, এবার অনুভব করি খিদেটা চাগিয়ে উঠেছে। আর বন-পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে খিদের তোড় বেড়েই যায়।

দেবু ততক্ষণে তেল মাখতে বসেছে। শীতের মিষ্টি হাওয়ায় তেল যেন গায় ঢুকে চলেছে, আর রোদের কবোষ্ণও উত্তাপ শরীরের কোষে কোষে কি তৃপ্তির আমেজ আনে।

বাথরুমের জলটা যেন হিমগলা। গায়ে ঢালতে কনকনিয়ে ওঠে।

রামু জানায়,

—জলের দরকার হলে জানাবেন।

বুধিয়া ক' বালতি জল তুলে গেছে।

জলের ব্যবস্থা বলতে কুয়ো। বনের এদিকে ওদিকে ঝর্না অবশ্য আছে। বসতির অনেকে স্নান সারে জঙ্গলের ধারের বাঁধে। তবে গ্রীষ্মকালে এখানে ওই সব জলের সঞ্চয় শেষ হয়ে যায়, অবলম্বন বলতে ওই কুয়োটা।

পাহাড়ের মাথায় এই অধিত্যকার সারা বসতির লোকদের ভরসা ওইটুকুই।

...খিদের মুখে ওই খাদ্যই ভালো লাগে। চাল এখানে যা হয় তা মোটা আর ভাতগুলো হয় ফাটাফাটা। কিন্তু তার স্বাদ চমৎকার। আর মেলে ঘি, দুধ—কিছু ডিম। সবজী বলতে টম্যাটো সিল। বাকী সবই আনতে হয় নীচেকার বাঘমুন্ডির হাট থেকে।

খিদের মুখে ওই খাবারই সটান টেনে চলেছি।

দুপুরের বিশ্রামটাও মনোরম। প্রশস্ত চাতালে ডেকচেয়ার টেনে চাদর মুড়ি দিয়ে রোদে পড়ে আছি। কবোষ্ণ উত্তাপে যেন দেহের প্রতিটি কোষ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। চোখ বুজে আসে আবেশে। দেখলাম নির্বাসনে থেকে সবুজ সতেজ ক'টি তরুণ কোনো বাইরের লোকের দু-চারদিনের সঙ্গের জন্যই উৎসুক হয়ে থাকেন। মানুষ যে সমাজবদ্ধ জীব—সাহচর্য, মত-বিনিময় তার প্রয়োজন—এটা বারবার আমি বিভিন্ন বন-পর্বতে গিয়ে অনুভব করেছি।

এখানের প্রত্যেকটি যুবকই শিক্ষিত। বনের সম্বন্ধে গাছ-গাছালির সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান প্রচুর।

তাঁদের এলাকার দুর্গম বন-পর্বত সবকিছু তাঁদের নখদর্পণে। নিজেরাই বনে বনে ঘোরেন—অবশ্য তাতে দরকার হয় জুওলজিক্যাল সার্ভের তৈরী করা ম্যাপ। এতে পথ, ঝোরা পাহাড় সবকিছুর পরিচয় দেওয়া থাকে।

মিঃ মুখার্জির ওপর বনের স্টকটেকিং-এর ভার। কোথায় কোন বনে কী দামী গাছ আছে, কতখানি এই বনসম্পদের পরিমাণ সেটা জানতে হয়। তার জন্য বনে ঘুরতে হয় যত্রতত্র, এঁদের সেটা অভ্যাস আছে।

মিঃ দাশের ওপর রক্ষণা-বেক্ষণের ভার। চোরাকাটাই করে অনেক গাছ-গুঁড়ি বাইরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি

করে, সেইসব দলকে সামলাতে হয়। এই কাজটাই সবচেয়ে বিশ্রী আর বিপজ্জনক। দলবেঁধে কুড়ুল-অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওরা আসে বনে ডাকাতি করতে—তারাও মাঝে মাঝে ফরেস্টগার্ড বিট অফিসারদের ওপর চড়াও হয় বনের গভীরে।

মাঝে মাঝে তাই বিপদ এঁদের লেগেই থাকে। তাই চোরাকাটাই-এর দৌলতে দেখা গেছে বনকে-বন সাফ হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। তবু এঁদের সাবধানী দৃষ্টি রয়েছে—তাই অযোধ্যা পাহাড়ের বন আজও নিম্ন বাংলার অন্যতম গভীর বন-অরণ্যসম্পদে সম্পদশালী।

বৈকাল হয়ে আসছে।

সকালের সেই ঘটনার পর দেখেছি ওই বনবাসী ক'টি মানুষ হঠাৎ যেন আপনজনকে পেয়েছে তাদের মধ্যে বননির্জনে! তাই সঙ্কোচ-এর প্রশ্ন আর নেই।

সকলে মিলে বের হয়েছি মাঠের দিকে।

নিশীথ বলে—বৈকালে বনে ঢুকে কাজ নেই। চলুন অযোধ্যার দিকেই ঘুরে আসি।

প্রদীপও বের হয়েছে। মাঠে সরষে বাজরার ফসল উঠছে। দু-একটা নিকানো রং করা মাটির ঘর—খড় পুড়িয়ে সেই ছাইয়ের সঙ্গে গোবর আর এলামাটি দিয়ে রং করা হয়েছে। সৌখীন শিল্পীমন ওদের। ঘরের আশপাশ অবধি তক্‌তকে করে নিকোনো। নিজেদের কাপড়টাও খারে কাচা ধপ্‌দপে সাদা।

সামনেই দুটো পাহাড়ের মধ্যে বাঁধ। সেখানে পাহাড় আর বন-গড়ানি জল এসে জমে। নীচের স্তরের ধানক্ষেতে হলুদ রং লেগেছে।

আমরা বসতির দিকে এগিয়ে চলছি।

গুরু গুরু শব্দ ওঠে।

বনের দিক থেকে শব্দটা এখানের স্তব্ধ শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে। একটা ট্রাক টপগিয়াবে পাহাড় ঠেলে উঠছে।

ওপাশেই বসতির পাশে সেই মেয়েটিকে দেখে দাঁড়ালাম।

বুধিয়া বের হয়ে আসছে।

কি বুলতে বেরইছিস?

সকালে বিকালে বিনা নিমন্ত্রণেই ও বাংলোর কাজও দেখে দেয়। দুধ দোয়াচ্ছিল; দুধ নিয়ে বাবুদের ওখানে দিতে চলেছে।

হঠাৎ ট্রাকের শব্দ শুনে আর ট্রাকটাকে বন থেকে ওই পথ ধরে বের হয়ে আসতে দেখে চাইল। ওর হাসিভরা মুখখানায় ফুটে ওঠে একটা কাঠিন্য।

গজগজ করে—আইছে জানোয়ারটা।

বুধির দিকে চাইলাম, মেয়েটা দুধ নিয়ে মাঠের পথ ধরে চলে গেল। মনে হয়, ওই ট্রাকের আসাটা ও মোটেই পছন্দ করেনি।

ততক্ষণে গাড়িটা ফাঁকা মাঠ দিয়ে এই পথে আসছে। ট্রাকের লালধুলো উড়ছে। মাঠের দিক থেকে কৌতূহলী চাউনি মেলে দু'চারজন লোক দেখছে ব্যাপারটা।

ট্রাক-এর ভিতর ড্রাইভার ছাড়াও আর একজনকে দেখলাম। গোলগাল চেহারা, মাথায় একটা টুপি, পরনে সাদা পাঞ্জাবী। প্রদীপ বলে—কামতাপ্রসাদ এলো-যে হে?

নিশীথ দেখছে ওকে। লোকটা গাড়ি থেকেই হাত তুলে রাম রাম জানালো। ট্রাকটা বের হয়ে গেল ধুলো উড়িয়ে ওপাশের পাহাড় বনের ধারের বসতির দিকে।

প্রদীপ বলে—দ্যাখ, শ্যাটা আবার কি মতলবে এলো।

ভটচায বলে।

—চিনেবাদাম, ধান-টান এর ব্যাপারে অ্যাডভ্যান্স দেবে, তারপর গলায় দড়ি আটকে সবকিছু টেনে নেবে ব্যাটা। মকাই-বাজরা এখনও আছে বোধহয়।

কামতাপ্রসাদ যে এই বসতিতে আসে নানা মতলবে তা এরাও জানে।

শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশা নামছে, বনের দিকে জমে উঠেছে কুয়াশার আবছা পর্দা। কোথায় মাদল বাঁশীর সুর ওঠে।

পাখীগুলো কলরব করছে।

বসতির ওপাশের একটা চালাঘরে এসে ডেরা নিয়েছে কামতাপ্রসাদ। এখানে প্রায়ই আসে সে। এই বনপাহাড় অঞ্চলের বিভিন্ন চাষীর ঘরের ধান-মকাই বাজরা সব কিছুতেই তার যেন দাবী হয়ে গেছে।

চালাঘরটায় হেসাক জ্বালা হয়েছে। এর মধ্যেই বসতির কিছু লোকজন এসে জুটেছে।

কামতাপ্রসাদ সিগ্রেট-এর প্যাকেট আর বিড়ির তাড়া বের করে একে-ওকে বিলোচ্ছে। রতন মাঝিও এসে হাজির হয়।

—রাম-রাম রতনবাবু।

রতন যেন কৃতার্থ বোধ করে, কামতাপ্রসাদজীর শহরে করাতকল, ধানকল রয়েছে। তাছাড়া, চালু কারবার রতনকে সে এমনিতেই পেয়ার করে।

কামতাপ্রসাদ বলে,

—খানাপিনার কুচ্ছু বন্দোবস্ত করো রতন। কাজ কারবার কাল সকালে শুরু হবে।

রতন জানে এসব ব্যাপার। কামতাপ্রসাদজী এলেই এমন খানা-পিনার বন্দোবস্ত হয়। কামতাপ্রসাদজী উপস্থিত সকলকেই জানায়।

খানাপিনা করো ভাইসব, নাচগান ভি লাগাবে।

হাড়িয়ার অভাব এখানে হয় না। তবু কামতাপ্রসাদ ট্রাকে করে একটা ড্রাম বোঝাই হাড়িয়া এনেছে, আর নিজে নিরামিশাষী হলেও অন্যের জন্য প্রাণীহত্যায় তার অপরাধ নেই।

সেইজন্য সে একটা ছাগলও এনেছে। সেটা ট্রাকের উপর তখনও চীৎকার করছে।

খানাপিনা হয়ে গেলে—তবে কাল সকালে ওদের ধান-মকাই-বাজরা কেনা হবে। এটা তার এদের খুশী করার আগাম দাদনই বলা যেতে পারে। কামতাপ্রসাদ অবশ্য এবিষয়ে খুবই হিসেবী।

অন্ধকার ডুংরীতে ওই হেসাকের আলোর রোশনী উঠেছে। গানের সুর উঠেছে।

আমরা ফিরছি বনবাংলোর দিকে। আবছা অন্ধকার মুছে চাঁদের আলো উঠছে কি স্বপ্নের মত। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনও তিথি। পাইনবন, ইউক্যালিপটাস বনে হাওয়ার শিহরণ জাগে।

নিশীথ বলে।

—ওই কামতাপ্রসাদ সাঙ্ঘাতিক লোক। সবকিছুই ঠিক এসে জুটেছে গন্ধ পেয়ে।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ জানতে পারি।

এই গভীর বনের এদিক-সেদিকে অনেক দামী শাল-সেগুন গাছ চুরি করে কাটা হয়। এরজন্য বিশেষ একশ্রেণীর লোক আছে, সেইসব গাছকাঠ লুকিয়ে পাহাড়-বন থেকে বের করে এবং শহরের করাতকলে পৌঁছে যায়।

কামতাপ্রসাদের করাতকলে এমন কাঠের অভাব নেই। প্রায় বিনামূল্যেই দামী কাঠ জুটে যায়। কিন্তু ধরাছোঁয়ার কোনো ব্যাপারই নেই।

কিছু চোরাকাটাই করা কাঠ এদের হাতে ধরা পড়ে প্রায়ই। সেই লট-কি-লট সরকার থেকে নীলামে বিক্রী করা হয়। কামতাপ্রসাদও ঠিক সেসব খবর রাখে, এসে হাজির হয়। যে-কোন দামে যে-কোন উপায়ে ওইসব কাঠও সে কেনে।

ওগুলো ওই চুরি বাঁচাবারই ফন্দী।

নিশীথ বলে—ঠিক খবর পেয়েই এসেছে। কাল নাকি কিছু কাঠ নীলাম হবে।

হঠাৎ মাঠের দিক থেকে মুখার্জিবাবুকে আসতে দেখে প্রদীপ এগিয়ে যায়। মুখার্জিবাবুও একা আবছা অন্ধকারে বেশ গলা খুলে গান ধরেছে।

'প্রেমের পূজায়,
এই তো "লভিলি ফল"
উষর মরুতে কেন দিলি আঁখিজল'।

হঠাৎ প্রদীপ এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল। বলে ওঠে,

বলিহারি, বলিহারি দাদা! চিটি এসেছে তাহলে? এ্যাঁ! বগ বগ খুশী যে।

মুখার্জিবাবু ওকে মাটিফুঁড়ে এমনি করে পথ আগলে দাঁড়াতে দেখে চমকে ওঠে। হাতে সত্যিই একখানা চিঠি।

ওই মাঠের ওদিককার বসতির দিক থেকে ফিরছিল বোধহয়, পোস্টাপিস ওখানেই। বিকালে ডাক আসে, তাই গিয়েছিল লোকটা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে।

কিন্তু এমনি হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবে ভাবেনি। চিঠিখানা মুঠো করে ধরা, প্রদীপ ছোঁ মেরেছে ওরই দিকে।

—বৌদি কি লিখেছে দাদা? নইলে এমন প্রেমের পুজোটুজোর গান গাইছেন, তা নাকি নোটিশ হয়ে গেছে?

ধমকে ওঠে মুখার্জি।

খবরদার। পরের বৌ-এর চিঠির দিকে নজর দিবি না। যদি পারিস তবে নিজের বৌ জুটিয়ে নিয়ে চিঠি পড়বি। কি বলেন স্যার?

অকাট্য যুক্তি। প্রদীপবাবু এ আপনার অন্যায়! কথাটা জানাই।

প্রদীপ বলে ওঠে,

—দিলেন তো ফস্‌কে! এদিকে মুখার্জিদা বৌদির চিঠি বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবে, ওদিকে নিশীথ, কিরে? তোর চিঠির সময় হ'ল নাকি? সবাই যে যার তালে আছে। আর স্যার ওই বিয়ের কথা বললেন? বাবাও ট্রাই করেছিলেন, দু-এক জায়গায় দেখা সাক্ষাৎও হ'ল। কিন্তু একেবারে হোপলেস কেস। যাই শুনলো, ছেলে বনে-বাদাড়ে ঘোরে—বলবো কি দাদা, মেয়ের বাবা কিছু কথা বলবার আগে মেয়েই ফুঁসিয়ে উঠলো।

নেহি করেঙ্গা। ব্যাস! বলুন দোষটা কোনখানে।

হাসছি ওর কথায়।

দেবু অবশ্য কন্‌ফার্মড ব্যাচিলার। সে বলে—ভালো আছেন প্রদীপবাবু। ওসব বিয়ে ফিয়ে একটা সোশ্যাল ক্রাইম।

প্রদীপ তেহাই দিয়ে ওঠে।

—হাতে হাত মেলান দাদা। আপনিই দেখছি ভরসা, আপনি শহরে বাস করেও সিঙ্গল রয়ে গেলেন। —তা'হলে বনবাসে সিঙ্গল থাকতে আর এতটুকু সরি নই আমি।

বাতাসে লেবু ফুলের মিষ্টি গন্ধ উঠছে। চন্দন গাছগুলোর বুক থেকে চাপা একটা গন্ধ মিশেছে ইউক্যালিপটাস গাছের পাতার গন্ধে।

চাঁদটা বড় একটা গোল থালার মত পাহাড়ের সীমাপ্রাচীর ছাড়িয়ে উঠেছে। তার আলোয় বনভূমি, ধান মাঠ সব ছেয়ে গেছে।

নিশীথবাবুদের কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আবছা অন্ধকারে ওপাশে গার্ডদের ঘরগুলোর বারান্দায় কে দাঁড়িয়ে আছে।

—কে!

সাড়া নেই। ওরাও একটু অবাক হয়। গার্ডদের কারো বাড়ির বৌ-ছেলেমেয়েরাও বের হয়ে আসে। তারাই বলে—মেয়েটাকে চিনতে পারি বুধি!

কাজ-কর্ম করে, দুধ দেয়, তরিতরকারী দিতে আসে বাংলোয়, বুধিয়া আমাদের ওখানেও কাজ-কম্মো করে দেয়। ওকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হই।

একটু আগেও দুধ দিতে এসেছিল এখানে। মেয়েটা এগিয়ে আসে। ওর চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া। ও বলল।

—আজ রাতে এখানে থাকবো বাবু। না করিস না! ওই মেয়েগুলোকে বলে দে উদের কারো ঘরের বারান্দায় থাকবো।

একটু অবাক হই।

মুখার্জিবাবু বলে ওঠে—ঘব ফেলে এখানে থাকবি কেন?

মেয়েটা চাইল আমার দিকে।

বলে সে—এই শয়তানটা আইছে গো! ওই লুকটা। রাতভোর মদ গিলবেক আর যতো বদলুক গুলানকে লেলাই দিবেক।

কামতাপ্রসাদের এই গুণও আছে তা জানতাম না। মাদলের শব্দ আসে। কারা গান গাইছে ক্রমশঃ বোঝা যায়, সেই কণ্ঠস্বরে নেশার জড়তা ফুটে উঠেছে। সেটা আরও বাড়বে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

বুধির কণ্ঠস্বরে কি যেন ভয় ফুটে ওঠে। মেয়েটা বলে।

—উয়ার লেগেই সিতাইটো চলে গেল বাবু। উকে ওরা তাড়াই দিলেক। ওই রতনা শয়তানটার বদমতলবেই চলে গেল সে।

পিছনেব সব ইতিহাস আমার জানা নেই, কিন্তু মনে হয় সবকিছুর মূলেই সেই একটা বেদনা. লোভ আর লালসা মিশিয়ে আছে। যা মানুষকে পশুতে পরিণত করে তোলে।

নিশীথ বলে—ঠিক আছে গদাই-এর বৌকে বলে দিচ্ছি ও এখানেই থাকবে।

মেয়েটা কৃতজ্ঞতা ভবা চাহনিতে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। তার জাত-পাতের অনেকেই তাকে আশ্রয় দিতে পারে নি।

এই বাবুরা তবু তাকে আশ্রয় দিয়েছে। তার ঘরে যতো দুধ, ফল, তরিতরকারী হয়, সেগুলো এরাই কিনে নেয়। এখানে কাজ-কম্মো করে তবু নগদ কিছু টাকা সে হাতে পায়।

বুধিয়া চুপ করে রইল।

গদাই-এর বৌ ওকে ডাক দেয়।

মেয়েটা চলে গেল ওদিকে।

অন্ধকার ডুৎরীর অঞ্চলের জীবনের একটি বেদনা আর বঞ্চনার ছবিটা আমার সামনে ফুটে ওঠে। ও যেন এখানের জীবনের একটি ব্যর্থ হাহাকার।

ওদের গান—মদ খেয়ে হৈ চৈ-এর মধ্যে এ অঞ্চলের হতাশ একটি সুর। এই সুরকে আমি তারপরও অনুভব করেছি। দেখেছি ওদের লোভী হাতটাকে যেটা ওই পাহাড়ের সীমানা পার হয়েও এই বন-রাজ্যের শান্তিকেও বিঘ্নিত করেছে।

এগিয়ে চলেছি বাংলোর দিকে।

বাংলোয় বাতি জ্বালার জন্য কেরোসিন তেলও কাল এনেছি কিন্তু তার দরকার হয় নি। বাগানের পাশে একটা কুয়োমত করা রয়েছে। তাতে রয়েছে বেশ মাঝারি একটা গ্যাস রিজার্ভার। ওইতে গোবর দিয়ে তার থেকে গ্যাস তৈরী হয়! এক ক্যানস্তারা গোবর দিলে বেশ কয়েক ঘণ্টা আলো জ্বলে—হিটারেও টুকিটাকি রান্না হয়ে যায়।

গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে। নিশিথবাবুর কয়েকটা জরুরী কাজ আছে। অফিসের ওদিকে গাদাবন্দী কতকগুলো লগ, কাঠ পড়ে আছে।

প্রদীপ বলে—ওর মধ্যে সেগুন, শ্বেতশাল, আরলুস সবই আছে। সেগুনের দাম বাজারে তিরিশ টাকা সি. এফ্‌টি। শ্বেতশাল রোজউড মেহগিনির দর প্রায় সত্তর টাকা পার 'সি এফ্‌টি'। শালও আছে।

ওই চোরাই কাঠ এঁরা বনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এনেছেন। ওইসব কাঠের হিসাবগুলো তৈরী করতে হবে। নিশীথবাবু রয়ে গেল অফিসে।

বাংলোয় ফিরে চলেছি।

বারান্দায় আলোর একটু আভাস এসে পড়েছে। সেই আলোব ফাঁকে ঘাসের পাশে গুঁড়ি মেরে বসে বিড়ি টানতে দেখে অবাক হই।

—এখানে আবার কে এসে জুটল দাদা? দেবু শুধোয়।

—কে জানে! জবাব দিই একটু বিস্মিত কণ্ঠে।

অন্ধকারে বাজখাই গলায় সাড়া আসে।

—আজ্ঞে আমি, স্যার। পেন্নাম হই। চিনতে পারলেন না? আমি?

রামুও এসে হাজির হয়। লোকটা বোধহয় বৈকালেই এসে উপস্থিত হয়েছে। রামু বেশ কড়া লোক। ও লোকটাকে ঢুকতে দেয়নি ভিতরে, তাড়াতেই চেয়েছে, কিন্তু সেও বোধহয় নাছোড়বান্দা। যায়নি, এঁটুলির মতো এইখানে সেপ্‌টে কামড়ে রয়েছে।

রামু এসে বলে—তখন থেকে খুঁজছিল আপনাদের।

বল্লে জানাশুনা লোক। আপনি নাকি ওকে এখানে আসতে বলেছেন?

অবাক হই—এখানে কাকে আসতে বলবো?

লোকটা লাফ দিয়ে ওঠে।

—আমি ফণী—ফণী নায়েক স্যার! কাল মাঠো রেঞ্জ অপিসে দেখা হল, আলাপ পরিচয় হল।

সেই কথা বলার দাম যে এখানে এসে দিতে হবে, তা ভাবিনি। লোকটা বলে।

—চলে এলাম স্যার। রেঞ্জ অফিসারও বলেছেন—বিশেষ করে ওখানের মা জননী, তিনিই বললেন বাবুকে গিয়ে ধর। কলকাতার মত জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাবেন। মস্ত লোক উনি।

অবাক হই।

রেঞ্জ অফিসার তাঁর গিন্নীব কাছে কোন অপরাধ করিনি। কিন্তু তারা ফণী নায়েকের মত জীবকে কেন আমার ঘাড়ে চালান করেছেন জানি না। লোকটার কি গুণ তাও জানা নেই, তবু আশ্চর্য হই—কি এক মোহ করা মন নিয়ে সে এই সাতমাইল বন-পাহাড়ের মাথায় ঠেলে এসেছে তিনহাজার ফিট উপরে—ওই বিপজ্জনক পথ ভেঙ্গে।

শীতের কন্‌কনে হাওয়া শুরু হয়েছে। পাহাড়ের পাঁচিল থেকে শীতের জমাট দৈত্যটা যেন হানা দিয়েছে।

লোকটার গায়ে সেই ময়লা ধোকড় আর গায়ে কার দেওয়া বাতিল একটা কাল্‌চে ছেঁড়া সোয়েটার।

ফণী নায়েক চাদর-এর তল থেকে একটা জীর্ণ খাতা বের করে বলে ওঠে,

—এই কিছু মালপত্র এনেছি স্যার। দেখে নিন্। খাঁটি জিনিস, বহুকষ্টে, বহু বৎসরের চেষ্টায় এসব জোগাড় করেছি।

একটা খাতায় টুক্‌টাক কিসব লেখা, গান কিছু নাটকের মত লেখা। সে লেখায় পদে পদে বানান ভুল, মাথামুণ্ডু খানিকটা হাবিজাবি নিয়ে পাগলামী শুরু করেছে।

ফণী নায়েক বলে—মাস্টারি করতাম স্যার। গাঁয়ের পাঠশালে ছেলে পড়াই। তখন থেকেই গান লিখি, নাটক লিখি। গান গাইতামও সুন্দর।

নিজেই সুর করে হেঁড়ে গলায় গাইতে থাকে।

—এ গিরিকুমারী-ই-ই পর্বতকন্দরে —ভূধরে জনপদে—তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবী-ই-ই।

প্রদীপ ওই গানের ধমক শুনে চমকে ওঠে। মুখুয্যে মশায় চোখ বুজে এর কালোয়াতি গান শুনে চলেছে। প্রদীপ বলে,

—একটু থামবে বাবা! খাসা গলা তোমার। তা লেখাও কি এমনি? তাই বলছিলাম—এসব ছেড়ে দিয়ে মাস্টারি পণ্ডিতি করে কিছু ছেলের পরকাল ঝর্‌ঝরে করে ন্যাশনাল সার্ভিসে লেগে যাও।

হতদরিদ্র লোকটার মুখের দিকে চাইলাম। দুচোখে ওর বেদনার ছায়া। বলে সে,

—হবে না, স্যার? একবার ছাপিয়ে বের করলে দেখবেন, কি জিনিস! রঘুনাথপুরের হেডপণ্ডিতকে দেখিয়েছিলাম, তিনি-তো থ'। বলেন—এতো অলঙ্কার তুমি পেলে কোথায়?

প্রদীপ ফোড়ন কাটে—সব গিল্‌টী করা ঝুটো।

মুখুয্যে বলে ওঠে,

—থাম দিকি প্রদীপ। সব তাতেই তোর মাস্টারি? তা নায়েক মশাই, থাকা হবে কোথায়?

নায়েক মশাই-এর কাছে থাকা-খাওয়াটা যেন কোন প্রশ্নই নয়, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারও সে বোধ করে না। বলে,

—সে যা-হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ওর সেই এককথা—গিন্নীমাও বললেন আপনাকে ধরতে।

দেবু শুনছিল কথাগুলো। এই বন-পাহাড়ে এরকম পাগলের পাল্লায় পড়বো তা ভাবিনি। মনে মনে রাগ হয়, সেই অচেনা রেঞ্জ অফিসার গিন্নীর উপর। তিনি যে কেন এই রসিকতা করলেন বুঝতে পারি না।

ওকে জানাই—দেখুন, করা কিছু সম্ভব নয়। তা'ছাড়া এখানে কিছু বলা যাবে না। আমি বরং কলকাতায় গিয়ে চেষ্টা করবো।

কৃতার্থ হয়ে সে জানায়,

—চেষ্টা করলেই হবে, স্যাব।

—রাতেরবেলায় আর কোথায় যাবে, এইখানেই থেকে যাও। যা হয় চাট্টি এইখানেই খাবে। লোকটা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে। ও বোধহয স্বপ্ন দেখছে, তার নাটক ছাপা হবে—কোথাও অভিনয় হবে।

বলি —কাজ-কম্মো ছাড়লে কেন?

—ছাড়িনি তো স্যাব। করছি। মাঝে মাঝে হাজিরাও দিতে হয়। তবে মাইনে দেয় না কেউ। চাল, অড়হর ডাল, বাজবা কিছু দেয়।

ওব শিক্ষকতা এই বন অঞ্চলে। কোন বসতিতে কারা বসিয়েছে ওকে। কিন্তু লোকটার তাতে খেতে জোটেনা। বলে, মাইনের কাগজে সই করি বটে—তা রতনমাঝিই আজ্ঞা যা দেয় তাই নিতে হয়।

এখানেও সেই রতন মাঝির নাম। লোকটা বোধহয়, এই অরণ্য জগতের মধ্যে একটা খ্যাতনামা ব্যক্তি।

মুখার্জি বলে—তুমিই তা'হলে ওদের ডুরীর মাস্টার?

লোকটা হাসল।

—তাহলে এখানেই খেয়ে যাও।

ফণী নায়েক কি ভাবছে। বলে ওঠে,

—আজ থাক বাবু, ওই কামতাপ্রসাদজী এসেছেন। উনিই নেওতা দিয়েছেন—ওখানেই যেতে হবে।

নিশ্চিন্ত হই। লোকটা ময়লা ধোকড়টা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ইতিউতি করে বলে,

—একটা সিগ্রেট দেবেন স্যার।

সিগ্রেটে টান দিয়ে বলে—পরে আসবো। যদি বলেন, দু'একটা সিন পড়ে শোনাবো। বলেন, এক্‌টো করেই দেখাতে পারি। পাট সব আমার মুখস্থ।

প্রদীপ উত্তর দেয়—পরে শোনা যাবে। তা'হলে এসো এখন। কামতাপ্রসাদ-এর সঙ্গে দুটো খাসিও এসেছে, আজ তাহলে জোর মাংস ভাত হবে—কেমন?

সেই মাংস ভাত্তের নাম শুনেই ফণী নায়েক চনমনিয়ে উঠে বসল। বলে,

—তাহলে চলি স্যার। নমস্কার, পরে দেখা হবে।

বের হয়ে গেল সে।

হাফ ছেড়ে বাঁচি, ওদের গল্পের আসর বসেছে এইবার।

পাহাড়ের আড়াই হাজার ফিট ওপরে জলবায়ুর তারতম্য ঘটে, এ অঞ্চলের আবহাওয়ার সেই বৈশিষ্ট্য

আছে। শীতকালে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা, কিন্তু গ্রীষ্মকালের খর রৌদ্রে যখন পুরুলিয়ার প্রান্তরে অগ্নিবর্ষণ শুরু হয়—এ পাহাড়ের শীর্ষে তখনও আবহাওয়া মনোরম—নাতিশীতোষ্ণ।

তাই, সিলভিকালচারিষ্টরা বনবিভাগের সঙ্গে এখানে কাজ করছেন। কমলালেবুর গাছের চাষ করা হচ্ছে। সবুজ গাছগুলো বেড়ে উঠেছে। বেশ কয়েকটা জায়গায় আঙুরের ক্ষেত হয়েছে। লতাগুলো বেড়ে চলেছে। শীতকাল ওদের ডেড সিজন, তবু লতায় ঝুলছে আঙুরের থোকা, বেগুনী রং-এর থলো থলো আঙুর ধরেছে। ওর নাম ব্যাঙ্গালোর পার্পল। তিনবছরের গাছ হলেই তাতে ফল ধরে। আর এখানের ফলনও চমৎকার।

এছাড়াও, এই আবহাওয়ার উপযোগী বলে চন্দনগাছও লাগানো হচ্ছে। কয়েকটা চন্দনগাছ দু'বছরে বেশ বেড়ে উঠেছে। ওদের ইচ্ছে এখানে চন্দন ফরেস্টও করবেন।

চন্দনগাছ লাগাবার সময় প্রতিটি গাছের সঙ্গে ওঁরা আকন্দ বা ভূতমাধবী নামে একরকম গুল্ম লাগান। চন্দনগাছ নাকি স্বয়ং জন্মাতে পারে না ; ওই দু-রকম গাছের কোন একটিকে অবলম্বন করে সে বড় হয়। ক্রমশঃ বড় হলে, ওই সরকারী গুল্ম গাছগুলো মরে যায়। চন্দনগাছটা তখন স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে।

মহীশূর থেকে নীলগিরি হয়ে উটকামণ্ড যাবার পথে সরকারী চন্দনবন দেখেছিলাম পাহাড়ে। এমনিই তাব উচ্চতা, হয়তো-বা কিছু কমই হবে—আবহাওয়াও এমনি। সুতরাং চন্দন হতে পারে, এতদিন সে চেষ্টা হযনি. দেখা যাচ্ছে এখানে হওয়া সম্ভব।

সিল্‌ভিকালচারের মিঃ ভট্টাচার্য বলেন।

পাইনও মন্দ হয় নি। চার বছরের পাইনগাছ এগুলো। তবে, সবই মেক্সিকান পাইন। আমাদের দরকার পেপার পাল্‌পের জন্য গাছের। পাইন আর ইউক্যালিপ্টাস মিশিয়ে সেটা তৈরি হতে পারে। তাই আমরা এর সঙ্গে ইউক্যালিপ্টাসও লাগাচ্ছি।

আদিম শাল-মহুয়ার বনসমাকীর্ণ পর্বত-রাজ্যের রূপ বদলাচ্ছে ; নতুন সাজে সেজে উঠবে অযোধ্যা পাহাড। তার জন্য সরকারী চেষ্টারও ত্রুটি নেই। দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন এঁদেব অনেকে। ফরেস্ট সায়েন্স, সয়েল সায়েন্স; এমনকি রোড কনষ্ট্রাক্‌শন-বিলডিং সম্বন্ধেও এদের পডতে হয়।

বনবিভাগের ওই বাঘমুন্ডি থেকে এদিকে শির্কাবাদ অবধি প্রায় ষোলমাইল পাহাড়ী রাস্তা তাঁরা তৈবী করেছেন—নিজেরাই তৈরী কবছেন রেস্টহাউস; গ্যাস-প্ল্যান্ট সবকিছু। আর, সেসব কোন অংশেই খারাপ নয়।

বরং অবাক হলাম শুনে, সাতমাইল পাহাড়ী রাস্তা তাঁরা নতুনের মত মেরামত করেছেন মাত্র আড়াই হাজার টাকায়।

মিঃ দাশ বললেন,

—হবে না কেন? আমরা নিজেরাই দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাই। অবশ্য এখানে মজুরি এক টাকা, আর ওরা কাজ করে। কাজে ফাঁকি দেয় না। কাজ করার শক্তিও এদের অপরিসীম।

সকালের সোনারোদ গেরুয়া হয়ে আসছে। সারা বনে লেগেছে হলুদ আভা।

রাজু এরই মধ্যে ব্রেকফাস্ট তৈরী করেছে। ঘি কিনেছিলাম চৌদ্দ টাকা পয়েলী, অর্থাৎ এক কে-জি হবে। খাঁটি ঘি—এতটুকু ভেজাল নেই তাতে। খাঁটি মোষের দুধ মেলে চৌদ্দ আনা সের। এক ফোঁটা জল নেই তাতে। পুরু সর পড়ে—গোলাপী হয়ে ওঠে দুধের রং। কিন্তু আটায় দেখলাম গমের চেয়ে মকাইয়ের পরিমাণই বেশি। টাট্‌কা পরটা. আলুভাজা আর মুরগীর ডিম সেই সঙ্গে আধসেরটাক দুধ—এই হল ব্রেকফাস্ট।

—এতো খাবো?

রাজু বলে—এ-তো সামান্যই স্যার। একবার ঘুরে এলেই সব হজম হয়ে যাবে।

বাংলোর বারান্দায় বুধিয়াকে দেখেছিলাম বোধ হয় এখানে কাজ করে। নিটোল সুন্দর স্বাস্থ্য, কালো পাথর কুঁদে যেন দেহটা সুঠাম ছন্দে কে গড়ে তুলছে।

ক্ষারে-কাচা একটা পরিষ্কার শাড়ি ওই দেহের মাংসল রেখায় যেন বেশ চেপে বসেছে; বাইরে আসতে ওর ডাকে ফিরে চাইলাম।

—বাবু!

একটি ঝুড়িতে করে সে টম্যাটো-বেগুন আর মুড়ি বিক্রি করতে এসেছে এইদিকে। সতেজ বিরাট সাইজের টম্যাটো কুড়ি পয়সা কে-জি। বেগুনও তাই। সিম কিছু রয়েছে। তার থেকে এক মুঠো সিম এমনিই দিয়ে দেয় সে ফাউ হিসাবে। রাজু জিনিষগুলো নিয়ে গেল।

দাম দিয়ে দেবার পরও সে দাঁড়িয়ে থাকে। কি যেন বলবে সে। কলকাতায় দেড় টাকা টম্যাটো, পাঁচ সিকে, বেগুন, সিমও দেড়টাকা। কম দামের সম্বন্ধে কিছু বলবে হয়তো মেয়েটা।

—কি রে?

মেয়েটির মুখে-চোখে সলজ্জভাব ফুটে ওঠে,

—কলকাতায় থাকিস?

ওর দিকে চাইলাম—হ্যাঁ।

মেয়েটি নখ দিয়ে ঝুড়িটাকে খুঁটতে থাকে একমনে। ওর মনের অতলে কি যেন সংশয় জাগে।

বলে সে,

—আমাদের ডুংরির সিতাই কলকাতায় গেল, কত-কি বলে গেল। আর নাই এলো। কলকাতা জাগা ভালো লয়—লোণা জল, বন নাই—পাহাড়—নাই—ঝোরা নাই। লুকটা কোথাকে রইল বাবু জানিস তু?

কলকাতার জনারণ্যে সিতাই কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য বনপর্বত রাজ্যে আজও কে পথ চেয়ে আছে, সে খবরও রাখে না। ওর মুখে-চোখে কি বেদনার নিবিড় ছায়া।

হঠাৎ ওদিক থেকে বনবিভাগেব ছেলেদের আসতে দেখে সে সংযত হয়ে ওঠে। তরকারীর ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে চলে গেল কাঁকব-ঢালা পথ দিয়ে। ও যেন ওই বাবুদের এড়াতে চায়। ঠিক ব্যাপারটা বুঝলাম না।

সকালে দেখি বুধিয়া বাংলোব বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে আর গুনগুন করে গান গাইছে। আমাকে দেখে চুপ করে গেল।

কাল রাতে ওকে দেখেছিলাম ও বসতি থেকে সরে এসেছিল কি ভয়ে। ওর মনের অতলের সেই ভীরু নারীটিকে এখন চেনা যায় না।

ওর জীবনের গভীরে কোথায় সেই সিতাই রয়ে গেছে।

হঠাৎ বনের ওদিক থেকে বসতির সামনের মাঠ পার হয়ে মোটা মত লোকটাকে আসতে দেখে চাইলাম। কালকের দেখা কামতাপ্রসাদই আসছে এদিকে। পিছনে একটা লোকের মাথায় ঝুড়িতে ফুলকপি, কমলালেবু আরও কিসব। ওরা এসে বিট অফিসার ঘরের দাওয়ায় উঠল।

কামতাপ্রসাদ এসেছে নিজের দরকারেই। ফরেস্ট অফিসে ঢোকার বাইরে গাদা করা কাঠগুলোকে দেখছে সন্ধানী দৃষ্টিতে। এদিক-ওদিক চাইতে বুধিয়াকে সামনে দেখে দাঁড়ালো!

—তুম ভালো আছে তো বুধিয়া? বলে সে।

বুধিয়া তরকারির ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর মুখ-চোখের ভাব কঠিন হয়ে উঠেছে। বুনো আদিম কোনো মেয়ে যেন চোট খাওয়া সাপের মত রুখে দাঁড়িয়েছে।

কামতাপ্রসাদ হাসছে। বলে সে।

—কাল শোনলাম তুমি আসবে! লেকিন পাত্তাই মিললো না। এত্নি নারাজ হোয়েসে—

বুধিয়া চলে গেল ওদিকে।

পিছনের মানুষগুলো চুপ করে দেখছিল ওই রসিকতা, হঠাৎ কার কথায় ফিরে চাইলাম, লোকটা এইদিকেই আসছিল, হাতে একটা ছোট ডালিতে কয়েকটা ডিম। বাংলোর বাবুরা এসেছেন শুনে কয়েক মাইল বন পার হয়ে ডিম বিক্রীর চেষ্টায় এসেছিল।

পনেরো পয়সা দর, বেশ কয়েকটা ডিম নিতে কিছু সস্তাই করে দিয়েছে। লোকটার একটা হাত কনুই থেকে নেই। কোন দুর্ঘটনার বোধহয় কাটা গেছে।

এই লোকটা কামতাপ্রসাদের বুধনির সঙ্গে ওই রসিকতাটা দেখেছে। শীর্ণ মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে তার।

বলে সে—ডুংরির মেয়েগুলানের মান-ইজ্জৎও কি থাকবে নাই রে মদনা? এ্যাঁ!

পিছনে দাঁড়িয়েছিল মদন, এই কামতপ্রসাদের ঝুড়িটা মাথায় করে এনেছিল, সে চুপ করে থাকে।

নুলো লোকটা বলে,

—তুরাই হাড় বদমাইস! বোঙা ইযরে করবেক। এ কামটি ভালো করলি নাই কিন্তুক। রতনাও ভালো করছে নাই হে—

লোকটা চলে গেল।

কামতাপ্রসাদও শুনেছে কথাটা, তার এসবে বোধহয় কিছু যায় আসে না, ও এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় উঠল।

নিশীথ বোধহয় জানতো যে, ওই লোকটা আসেব। ওকে দাঁড়িয়ে ওই কাঠগুলোকে নিরীখ করতে দেখে সেও বুঝেছে ওর মতলব।

—রাম রাম বাবুজী! কামতাপ্রসাদ ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে সিগ্রেট বের করে বলে।

—পিজিয়ে। আরে এ মদনা লিয়ে আন উসব চিজ।

নিশীথ ওদের দিকে চাইল। ঝুড়িতে কয়েকটা ফুলকপি, কমলালেবু, কড়াইসুটি, টাটকা বেগুন আর বেশকিছু মিষ্টি।

—এসব কি হবে শেঠজী?

—এমনি লিয়ে এলম বাবুজী! কাঠকা নীলাম যে হোগা, হামি তো ডাকবে। তাই বলছিলাম—শোচেন, গরীব আদমী, যদি মেহেরবাণী করে করিয়ে দেন ডাকটা—গুলাম হয়ে থাকবে।

নিশীথ ওর বিনয়ের সীমা কোথায় তাই দেখছে। বিরাট ধনী লোক তবু কথায় কথায় ওর দারিদ্র্য ফুটে উঠছে।

নিশীথ জানে ওর স্বরূপ। বলে ওঠে সে,

—কাঠের অভাব আপনার কোনদিন হেয়নি শেঠজী!

চমকে উঠেছে লোকটা। ওই ছোকরার কথাবার্তা কেমন ত্যাড়াবাঁকা। ঠিক সিদে বাত-চিত ও করে না। কামতাপ্রসাদ জানে, ও কত টাকা মাইনে পায়। অমন অনেক নোকর তার আছে। তবু ওদের কথা শুনতে হয় নানা কারণে।

কামতাপ্রসাদের অন্ধকারের কারবার-এর খবর ওরা জানে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক এরা বাধা দিতে পারেনি এতদিন।

নিশীথ দাসও শুনেছে-জেনেছে সেটা। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পিছনে ফেলে আসা সেই শান্ত ডাগর দুচোখের চাহনি। তার বাড়ির বেশী দূরে নয়—কাছেই ইলাদের বাড়ি।

এরপরই প্রমোশন পাবে সে। রেঞ্জ অফিসার হলে কোন শহর-বাজার-এর কাছে পোস্টিং হবে, বাংলো পাবে। ইলা আর সে ঘর বাঁধবে দুজনে।

কামতাপ্রসাদ বলে,

—আপনাদের ভি খুশী করবো বাবুজী। বলেন-তো দুশো রূপেয়া—

এই কথা বলে ফতুয়ার ভিতরের পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে।

নিশীথ-এর মনে হয় ইলা যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুস নিয়ে নিজের নগদ লাভ হয়তো হবে, কিন্তু ভবিষ্যৎকে সে অন্ধকারে ঢাকতে চায় না। এই ঘৃণ্য কাজে ওকে নামাতে চায় ওই শয়তানটা।

নিশীথ চাবুক খাওয়া জানোয়ারের মত চমকে উঠে বলে,

—ওসব আমার দ্বারা হবে না কামতাপ্রসাদজী।

কামতাপ্রসাদ ওকে দেখছে। ওর গোল-গাল হাসি-হাসি মুখখানা নিমেষের মধ্যে কঠিন হয়ে ওঠে। কুতকুতে দুটো চোখ জ্বলে ওঠে, তবু কামতাপ্রসাদ সহজ হবার চেষ্টা করে।

—আরে এ নিশীথবাবু; শোচিয়ে দুশো চাই—চার শো চাই।

নিশীথ যেন ইলার ব্যঙ্গের হাসিটা শুনছে। ওই বলেছিল ইলাকে—পাপের পয়সায় আমরা ঘর বাঁধবো না

ইলা, পরিশ্রম করে সৎভাবে চাকরী করবো, প্রমোশন হলেই দুজনে সেদিন ঘর বাঁধবো।

ইলার ডাগর চোখে কি ব্যাকুলতা। এমনি নিভৃত একটি নীড়ের স্বপ্ন দেখছে সে বার বার। নিশীথ জানায় কঠিন স্বরে,

—আপনি যান শেঠজী। ডাক দেবার সময় কর্তারা আসবেন। তাঁরাই যাকে দিতে চাইবেন দেবেন।

কামতাপ্রসাদ যেন গালে চড় খেয়েছে। উঠে পড়ল সে। বলে,

—চল্ বে মদন! রাম-রাম বাবুজী। লেকিন এইসা জমানা, দিনকালভি এইসা বাবুজী। কাম-ঠো বিলকুল গলতি করলেন।

নিখিল কঠিন স্বরে বলে,

—সে আমি বুঝবো। আপনি যান।

কামতাপ্রসাদ মালপত্র উঠিয়ে হন্ হন্ করে ফিরে গেল। ওর মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে রাগে।

নিশীথ বের হয়ে এসেছে। মুখ-চোখ থম্থমে। তরুণ কঠিন একটি সত্তা। বলে ওঠে আমাকে দেখে,

—একটা বাস্তুঘুঘু। এসেছিল প্রণামী দিয়ে কাজ আদায় করতে। তাই ওকে তাড়িয়ে দিলাম। একটু বেরুবো বনের দিকে, যাবে নাকি?

ভটচাযও এসে হাজির হয়েছে, ওদের সঙ্গেই বের হবার জন্য তৈরী হচ্ছি।

দেবু ইতিমধ্যে পায়জামা-পাঞ্জাবী আর বেশ ঘুন্টিদার দামী স্লিপার পরে বের হয়ে আসে। ফরেস্টের ওঁরা পরেছেন খাঁকি ফুলপ্যান্ট-সার্ট আর হিল-সু।

বলে উঠি দেবু—বনে যাচ্ছো, স্যান্ডেল বদলে জুতো পরো। এ তোমার কলকাতার পার্ক নয়। জঙ্গলের কতকগুলো অলিখিত নিয়ম আছে। সেখানে স্লিপার পরা চলে না।

দেবু হাসে—চলুন তো। এমন কি ব্যাপার।

বনের মধ্যে কোথায় কতকগুলো চোরা কাঠ কেটে ছাল ছাড়িয়ে কাঠুবের দল ফেলে গেছে। এরা সেই কাঠগুলোকে তুলে আনবে। কয়েকজন কুলি-গার্ড আর নিশীথ চলেছে বনের মধ্যে। আমরাও ওঁদের সঙ্গে চললাম বনের গভীরে।

বসতি বলতে দু'চার ঘব ছড়ানো-ছিটানো, জঙ্গলের মুখেই ক্ষেতগুলোয় মকাই ধান হয়েছে। দু-একটা ক্ষেতের ধান কারা যেন গোড়া থেকে উপড়ে নিয়েছে।

গার্ড বলে—বুনো হাতির কাণ্ড— স্যার। ধানক্ষেতে নেমে এমনি করে শেষ করে দেয়। তাছাড়া এইটাই হাতির চলার পথ, এ-বন থেকে বের হয়ে সামনের পাহাড়ের বনে তারা যাতায়াত করে। এর মধ্যে দু-একবার ওই মাটির ঘরটাকে নাড়াচাড়া দিয়েও গেছে। তাই ওই সাঁওতালটা এ-ঘর ছেড়ে দিয়ে বসতির মধ্যে চলে গেছে।

দেখলাম পরিত্যক্ত ঘরটা দু-এক জায়গায় মাটির দেওয়ালে ফাট ধরেছে। ওদের বিশাল দেহের চাপে যে-কোন দিন ওকে ধূলিস্মাৎ করে দেবে। দেবুর মুখি শুকিয়ে আসে। সামনেই একটা ভাইনইয়ার্ড আর পাইন প্ল্যানটেশন, তারপর শুরু হয়েছে ঘন শালবন।

ওরই মধ্যে পায়ে-চলা সুঁড়িপথ ধরে আমরা নেমে চলেছি। বেশ বুঝতে পারি বনটা পাহাড়ের গায়ে গজিয়েছে, আমরা নামছি নীচের দিকে। যতই নীচের দিকে চলেছি এ-বন গভীর হচ্ছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে লালমাটি স্যাঁৎস্যাত করছে। শালবনের গায়ে জন্মেছে দু-চারটি ফার্ন-অর্কিডও। দেখে মনে হয়, এ-বনে বৃষ্টিপাত খুবই বেশি। আলো ঢোকে না—ঘন গাছগুলোর কাণ্ড সোজা আকাশের দিকে একটুকু আলো হাওয়ার সন্ধানে মাথা তুলেছে।

এ অরণ্য যেন অসীম-গহন। হঠাৎ ঝর্ঝর শব্দে চাইলাম—গাছগুলো একটু ফাঁকা হয়ে এসেছে। সামনেই একটা পাহাড়ী নদীর সরু জলস্রোত পাথরে পাথরে লাফ দিয়ে ছুটে চলেছে—একপাশে একটু বেশি জল, সেখানে স্নান করছে দু-একজন আদিবাসী। বোধ হয় বসতি কাছেই আছে।

নদীর ধারে নরম মাটিতে কারা যেন গভীরভাবে লাঙল দিয়েছে। সাঁওতালটা বলে,

—বনশুয়ার বটে গো। মুথা ঘাষ খাইছে মাটিগুলান খুঁড়ে। বনবরার আড়ত এটা গো।

ফরেস্ট-এর লোকজনদের এরা চেনে। ওরা বনের মধ্যে কোথায় চোরাকাটাই করা গাছগুলো আছে তার সন্ধান করে। ওদের দু-একজন বলে,

—মজুরি পাবি, ওদের সঙ্গে কাঠগুলো অপিসে বয়ে দে।

নদীর ওপারে চড়াই আবার ঠেলে উঠেছে—তার বুকে ঘন শালবন। আমরা সেই চড়াই ঠেলে ওদের বসতির দিকে চললাম।

একটু চড়াই-এ উঠতেই দেখা যায়, বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা—গিরিশিরাই বলা যায়। তারই ওপর ওদের গাঁ-বসতি, ধান-বাজরা সরষের ক্ষেত। মাঠের ওপর দু-চারটে বড় বড় শালগাছ অতীতের বনময় অস্তিত্বের পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপারেই আবার অন্য একটা পাহাড়।

পাহাড়ের পর পাহাড় চলে গেছে কোন সমুদ্র স্তব্ধ ঢেউগুলোর মত। ওরা বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে রৌদ্রদগ্ধ আকাশের নীচে। বুকে ওদের ঘন অরণ্যের স্নিগ্ধতা—আর অজানা বিভীষিকার ছায়া।

নিকানো রং-করা ঘর—তক্‌তকে উঠান, আঁচিল-পাঁচিল নেই। চারিদিকে গহন আদিম অরণ্য—ওরা এই ফাঁকাতেই খাটিয়া নিয়ে পড়ে থাকে। অবাক হয়ে শুধোই,

—জন্তু-জানোয়ার আসে না? বনের মধ্যে থাকো এইভাবে?

লোকটা নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয়,

—আসেক্ বটে। ভালু-বাঘ মাঠে সাড়া করে। কাছাই আসে গণেশঠাকুর আসেক, মকাই ধোন খেতে, ইদিকে নাই এলো।

এ সম্বন্ধে ভয় যেন নেই। হতদরিদ্র অবস্থা। খাবার সম্পর্কে তারা উদাসীন।

লোকটা কাজে যাবার আগে স্নান করে খেয়ে নেয়। মাড়ভাত আর শাকভাজা তাই দিয়ে। তাইতেই ওরা খুশি। সঙ্গে একটু মাড়ি। এর বেশি চাওয়া নেই।

ওরা বলে—বেশ তো আছি বাবু।

মুখেচোখে খুশির প্রসন্নতা ঝলমল করে।

ওপাশের ঘরে একটা পাল্লায় দেখলাম রঙীন কাঠ দিয়ে নক্সা করা হয়েছে। লাল-হলুদ-কালো-চকোলেট রং-এর কাঠ দিয়ে এতো সুন্দর নক্সার কাজ সাধারণতঃ দেখা যায় না।

লোকটা বলে,—করলাম বাবু, বনের কাঠ দিয়ে করে দিলাম।

নিশীথবাবু কাঠগুলো চিনিয়ে দেয়।

মুর্গার রং গাঢ় হলুদ, কেঁদকাঠ-এর রং কুচ্‌কুচে কালো—আমরা বলি আবলুসকাঠ, আর চকোলেট রং-এর কাঠ থেকে তখনও সুন্দর গোলাবী গন্ধ উঠছে। ওটা হচ্ছে রোজউড বা শ্বেতশাল, খুব দামী কাঠ। এ-বনে কিছু কিছু ও-গাছ আছে। ওর কাঠ থেকে তৈরী গ্লাসে জল খেলে নাকি কোনরকম পেটের রোগ হয় না।

সব মিলিয়ে পাল্লাটা করেছে অপূর্ব। এই গহন বনের একজন সাধারণ সাঁওতালের এই শিল্পসৌকর্য শহরের শিল্পীদেরও লজ্জা দেয়।

বাংলোর দিকে ফিরছি। ঘন বনে ছায়া নেমেছে, পাখীগুলো কলরব করে। বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছি। ঘণ্টার শব্দ ওঠে নির্জন বনে। টুং টং টন।

রানার চলেছে ডাক নিয়ে নীচের সেই বাঘমুণ্ডির দিকে। বনের মধ্যে ঘন শালগাছগুলো কেটে পথ একটা চওড়া করা হয়েছে, যাতে বনের ভিতর সামনে কিছুদূর অবধি নজর চলে। ঝুন্ ঝুন্ ঘণ্টা বাজিয়ে বনের মধ্য দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে ডাক চলেছে। সুকান্তের রানার কবিতার কথা মনে পড়ে। এ বনকন্দরের রানারকে সে দেখেনি—তবু তাদের কথা সে বলে গেছে।

অযোধ্যা পাহাড়ের আদিম বনরাজ্যের খবর ও নিয়ে যায়, এখানে পাহাড়-বন ডিঙিয়ে আসে বাইরের জগতের একটু আলো।

বন থেকে বার হয়ে দুচারটে বসতির কাছে হঠাৎ সেই বুধিয়াকে দেখে দাঁড়ালাম। কাছেই ওদের বসত বনের বাইরে। সামনে সেই পরিত্যক্ত হাতির পথের ওপর বাড়িটা, কয়েকটা মোষ চরছে। ওদের গলায় কাঠের ঘণ্টা বাজে—ঠর-র-র,।

সরষে ক্ষেতের হলুদ ফুলগুলোর উজ্জ্বল আলো পড়েছে। দূরে অযাধ্যা বাংলোর নীচের উপত্যকায় গরু চরছে—ধানক্ষেতে ওরা ধান কাটতে নেমেছে—বাতাসে ওঠে অলস বাঁশীর সুর।

শান্ত নিভৃত বন-পাহাড়ের অন্ধকারে আমি যেন অতীতের হারানো সেই নাড়াবহয়াইয়া—লুবটুলিয়ার জঙ্গলকে খুঁজে পাই। সে বন আজ হয়তো নেই। বিভূতিবাবুর আরণ্যকের দিন তবু মোছেনি, সেই পরিবেশ এখানে তার সব শ্রী-সৌন্দর্য নিয়ে বেঁচে আছে।

—বাবু! বুধিয়া আমাদের চিনতে পেরেছে।

—এখানেই তোর ঘর? ওকে শুধোলাম।

বুধিয়া মাথা নেড়ে ছাত দিয়ে দেখালো দূরে চক্চকে সবুজ তামাক গাছে-ঘেরা একটা রঙীন বাড়িকে।

রানারের সঙ্গে কি কথা বলছিল। সে চলে গেল বনের মধ্যে, বুধিয়া আমাদের দিকে চেয়ে থাকে ডাগর দু'চোখ মেলে।

—বুর্তিতে যেই ছিলি বনে বনে?

—হ্যাঁ রে। তোদের দেশে এলাম একটু ঘুরে দেখবো না?

ওকে দেখছি।

বুধিয়া কি ভাবছে। হরীতকী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ও।

ওর সতেজ মুখে দু-একফালি রোদের আভা পড়েছে। কি যেন বেদনার ছায়া ফুটে উঠেছে ওর চোখের চাহনিতে। বলে সে,

—আমাদের পাহাড়টা অনেক ভালো তুদের শহরের থেকে। মানুষকে সিখানে সব ভুলাই দেয়। বদ লুক করে দেয়। তুদের গাঁগুলোন ভালো লয় গো।

বুধিয়াব এই অভিজ্ঞতার মূলে কোন সত্য আছে কি না জানি না। তবে তার কথাটা মনে রেখাপাত করে। শুধোই ওকে।

—গিয়েছিস্ কখনও সেখানে?

—না। মাথা নাড়ে বুধিয়া—নাই যাব। সিতাই এলো নাই।

কথাটা সেদিনও শুনেছিলাম। এই অলস মধ্যাহ্নে পাখী-ডাকা বনসীমায় নীল পাহাড়ের কোলে একটি মেয়ের এই গোপন বেদনাটা আমার মনেও সাড়া তুলেছিল। বলি—আসবে সে।

মাথা নাড়ে মেয়েটা। ওর ডাগর চোখদুটো জলে ভরে আসে। হঠাৎ সামলে নেবার চেষ্টা করে ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায় হাল্কা বনহরিণীর মত ছন্দে। আমরাও এগোলাম।

আমরা সেখানে পৌঁছবার আগেই সে ওপাশের ক্ষেত থেকে লাল কয়েকটা টম্যাটো তুলে এগিয়ে দেয়।

—লিয়ে যা। এমনিই চিবাই খাবি, ভালো লাগবেক। তিয়াশ লেগেছে—খা কেন্নে।

অতিথি আমরা, ওদের বসতিতে এসেছি। যা হোক কিছু দিতে পারলে ওরা খুশি হয়। এছাড়া আর দেবেই-বা কি, তার জন্য কোনো দামও নেবে না।

মেয়েটা তখনও চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে।

নিশীথ বলে—মেয়েটা সত্যিই ভালো। তবু কি জানেন, জীবনে ও নিদারুণভাবে ঠকেছে, এখনও ঠকে চলেছে।

নিশীথের দিকে চেয়ে থাকি।

দুপুরের রোদ শালবনের বুকে আলোর তুফান তুলেছে। এক দল টিয়া পাখী কলকলিয়ে উড়ে গেল বনের দিকে।

নিশীথ ওই উধাও পাখীর ঝাঁকের দিকে চেয়ে থাকে—উর্ধ্বাকাশে দেখা যায়, একটা বাজপাখী উড়ছে।

যে-কোন মুহূর্তে ওই হিংস্র-পাখীটা তীক্ষ্ণ নখ-দাঁত নিয়ে ওই শান্ত সুন্দর পাখীগুলোর উপর লাফিয়ে পড়বে। দু'একটা পাখীর কল-কাকলি চিরদিনের জন্য থেমে যাবে।

নিশীথ বলে চলেছে।

—শান্তিকে, স্বপ্নকে এমনি করে একদল জীব শেষ করে দেবার জন্য তৈরী হয়ে আছে।

কথাটাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। বুধিয়াকে কাল রাতে দেখেছিলাম, অমনি ভয়ার্ত একটি পাখীর মতই।

হটাৎ কয়েকটা পাখীর আর্ত চীৎকারে শান্ত বনভূমি ভরে ওঠে, বাজটা বিজলীর ঝলকের মত লাফ দিয়ে নেমে এসেছে একটা পাখীর উপর; শূন্যে প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা ছিটকে পড়ল সরষে ক্ষেতের উপর, দু-একবার ঝট্‌পট করে স্তব্ধ হয়ে গেল।

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। মৃত্যুর স্তব্ধতা, আর নিষ্ঠুর আরণ্যক হিংস্রতা যেন ক্ষণিকের জন্য এই বনভূমির সব রূপকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে।

বাজটা শূন্যে তখনও চীৎকার করছে তীক্ষ্ণ স্বরে। বাতাসের শনশন সুরে তার চীৎকার মিশেছে।

কাদের টুকরো কথার শব্দে ফিরে চাইলাম। বনের ওদিক থেকে দু-একখানা গরুর গাড়িতে ধান বাজরার বস্তা, চিনেবাদামের পশরা নিয়ে ওরা চলেছে বসতির দিকে। কামতাপ্রসাদ ওখানের সেই চালার সামনে কাঁটাপাল্লা টাঙ্গিয়ে মালপত্র কেনার অস্থায়ী আড়ৎ খুলেছে। পাহাড়-বন অঞ্চলে রতন মাঝিই তার লোকজনকে পাঠিয়ে মালপত্র জুটিয়ে আনছে।

একটু আগে বনের মধ্যেকার সেই বসতির লোকদের কথাগুলো মনে পড়ে। ওরা নাকি কামতাপ্রসাদের দাদন নেবে না। লোকটা ওজনে ঠকিয়ে নেয়। তাদের বলে—ধান নয় বিলকুল ভূষি আর আক্‌ড়া আছে।

সঙ্গে লোকটা ওই গাড়োয়ানদের বোঝাচ্ছে।

ঘরে বসে টাকা পাবি। কাজ কি বলরামপুর-বাঘমুন্ডি যেয়ে? এ্যাঁ। খা কেন্নে আজ দাকা ভাত। গায়েন হবেক রাতভোর। হাড়িয়া খাবি। কামতাপ্রসাদ-এর চালায়, ভাত হাড়িয়ার অভাব নেই। আজও নাচ-গানের আয়োজন চলছে।

নিশীথ ও আমরা এগিয়ে আসি বাংলোর দিকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে একটা চাদর চাপিয়ে বসে আছি। ঘুম নয়—সব চিন্তা-ভাবনাগুলো কেমন খেই হারিয়ে ছত্রাকার হয়ে যায়।

কলকাতার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। সীমা আজ কোথায় জানি না। তাদের অনুপস্থিতিটা মনকে শুধু শূন্যতায় ভরে তোলে। হঠাৎ নিশীথবাবুকে দেখে চাইলাম।

এসে ও একটা চেয়ার টেনে বসলো। আজ সকালে ওকে নোতুন করে চিনেছি। মনে হয়, এখনও সৎভাবে মন দিয়ে চাকরী করার কথাটা ওরা ভোলেনি। বনবাসে নির্বাসিত হয়েও মানুষের সহজ ধর্মটাকে ওরা মনে রেখেছে।

নিশীথবাবু বলে। এখানে হাঁপিয়ে উঠেছি।

স্বাভাবিকই। সমাজ নেই বননির্জনে, পদে পদে ভয়, বিপদ জেনেও পড়ে আছে ওরা। নিশীথ বলে,

—যদি একটা প্রমোশন হয়তো বাঁচোয়া। এই বন থেকে বের হতে পারবো।

প্রদীপের কথা মনে পড়ে। নিশীথের জীবনে কোথায় একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে। তাই জানাই—ঘর বাঁধতে পারবেন তাহলে?

আমার দিকে চাইল সে। এই বননির্জনে যার স্বপ্ন নিয়ে সে রয়েছে তার কথা জানাতে পারলে বোধহয় তৃপ্তি পাবে সে। সেই সোচ্চার স্মৃতিচারণ তার কাছে তাই অনুভবের —আনন্দের।

হাসল নিশীথ, জানায় সে,

—তা বলতে পারেন।

মাঝে মাঝে বারান্দার চারিপাশে সিজন ফ্লাওয়ার বেডে রকমারি রং-এর ফুলের ভিড়ে প্রজাপতিগুলো উড়ে বেড়ায়। ঝাঁক বেঁধে ছিটোনো ফুলের পাপড়ির মত তারা আসে। ফুলের উপর বসে; আবার উড়ে

যায়, ছিটিয়ে পড়ে বাতাসে। সেই রঙের তুফানের দিকে চেয়ে থাকি। নিশীথ বলে,

—ইলা কিন্তু সত্যি ভালো মেয়ে।

চুচড়ার বুড়োশিবতলার ইলাকে আমি চিনি না। সেখানের গঙ্গার ধারে কোন পড়ন্ত বেলায় দুটি তরুণ-তরুণীর অভিসারের ছবিটা তবু চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ওদের চোখে নিবিড় একটি স্বপ্ন, ভালোবাসার আশ্বাস।

নিশীথের চোখে-মুখে দেখেছিলাম দূর বনবাসের কোন অপরাহ্ন বেলায় সেই ব্যাকুলতা।

ও জানায় ইলা সেই পথ চেয়ে আছে। মনে হয়, প্রমোশন হয়ে যাবে। কোথাও পোস্টিং হবে।

চুপ করে সেই বিরহী মনের বেদনাকে অনুভব করি। এই যন্ত্রণাকে আমিও অনুভব করেছি বহুবার।

সীমা যে এমনিভাবে হারিয়ে যাবে আমার জীবন থেকে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

সীমার বাবা-মা যেন আমার আসা-যাওয়াটাকে ভালো-চোখে দেখেন না। ওর মা আভাস ইঙ্গিতে সেই কথাই জানিয়েছিল।

তবু সীমার ব্যাকুল আবেদন ভুলিনি।

ও বলে—তুমি আসবে কিন্তু। নইলে তোমার মেসে গিয়েও হানা দেবো।

দিয়েছিলও। ছোট মেসবাড়িটায় ওর আসা-যাওয়া নিয়েই কথা উঠেছিল। অনেকেই সন্দেহ করেছিল অনেক কিছু।

ব্রজবিলাসবাবুর বয়স হয়েছে, রিটায়ার করে দেশে যাবেন। সেই ব্যক্তিটি রাতেরবেলায় এখনও এখানে-ওখানে যান। তিনিই হঠাৎ মেসের ব্যক্তিদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে খুব সচেতন হয়ে পড়লেন।

সীমা তবুও আসে মাঝে-সাঝে। দুজনে বিকালে পড়ন্ত সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে বসে থাকি।

সীমাই বলে—এভাবে সত্যি ভালো লাগছে না।

এমনি দিনে হঠাৎ প্রমোশনটা এসে গেল অফিসে। তা শুনে সীমা খুশী হয়। এবার সেও ভরসা পায়। আমার মত লোককে নিয়ে হয়তো ঘর বাঁধা যায়।

শোনাই—তিনমাস জব্বলপুরে ট্রেনিং-এ যেতে হবে। ফিরে এসে তখন ওটা এইবার ভাববো সীমা।

—সত্যি! সীমাও যেন এই প্রতিশ্রুতি চেয়েছিল, আর তা পেয়ে খুশী হয়েছে।

জব্বলপুরে যাবার দিন সীমাও বোম্বে মেলে তুলে দিতে এসেছিল, এর দু'চোখের চাহনিতে কি নীরব ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। ওর হাতখানা আমার হাতে নামানো, নীরব সেই স্পর্শটুকু আমার সারা মনে কি চাঞ্চল্য আনে।

বলি—তিনটে মাসে তোমার পথ চেয়ে থাকবো সীমা।

সীমা জবাব দিল না। তার চোখের ভাষায় সেই সমর্থন । ট্রেনখানা বের হয়ে গেল প্লাটফর্ম থেকে।

অন্ধকার অতলে হারিয়ে গেল—আর সেই অন্ধকারে জেগে অছে ধ্রুবতারার মত একটি মুখ, দুটি চোখের সজল উজ্জ্বল চাহনি।

চিঠিও পেয়েছিলাম তার। তিনটে মাস মনে হয়, অনেক দীর্ঘ—অনেক শূন্য। সেই উজ্জ্বল একটি আশার আলোয় আমার মনকে উদ্ভাসিত করে রেখেছিল।

শেষের দিকে বেশ কিছুদিন চিঠি পাইনি সীমার। হয়তো অভিমানই করেছে। ওদের বাড়িতে চিঠি দিতে পারিনি। যেখানে চিঠি দিতাম—সেই বান্ধবীও কলকাতায় নেই—কোথায় বাইরে গেছে। চিঠি দেবার ইচ্ছে থাকলেও চিঠি দিতে পারিনি।

কলকাতা ফিরে পুরোনো মেসে উঠেছি। পোস্টিং হয়ে গেছে নতুন চাকরীতে। সুখবরটা নিয়ে গেছি সন্ধ্যার মুখে সীমাদের বাড়িতে।

যে মানুষটা এখান থেকে গেছিল তিন মাস আগে—সেই মানুষটা আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আজ আমার নিজের মধ্যেই একটা স্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে।

সীমা এখুনি ছুটে এসে দরজা খুলবে।

হাসিমুখে দাঁড়াবে, চেয়ে দেখবে আপাদ-মস্তক।

হয়তো অনুযোগ করবে—চিঠি দাওনি কেন?

আজ মনে মনে তৈরী হয়েছি। ওর মাকে এতোদিনের না-বলা কথাটা জানাবো, সীমার উপর দাবী আছে আমার।

কড়া নাড়লাম। কোনো সাড়া নেই। বাড়িটা যেন নিস্তব্ধ। মানুষজন কেউই নেই।

একটুঅবাক হই। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠে। হয়তো কারো অসুখ—কঠিন! কে জানে, সীমা ভালো আছে কিনা।

দরজা খুলে বের হয়ে এলো ওর বাবাই। আমাকে দেখে অবাক হয় ভদ্রলোক। আসা করেনি আমি ওদের বাড়ি আসবো।

জানায়—তুমি বাইরে ছিলে বোধহয়? সীমার বিয়ে হয়ে গেল। ভালো পাত্র পেলাম, দিয়ে দিলাম। তুমি ছিলে না—তাই নিমন্ত্রণ করতে পারিনি।

পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। ভদ্রলোক বলে,—যাক্ শুভকাজ চুকে গেল।

আমাকে ভিতরে ডাকার তেমন প্রয়োজন বা ইচ্ছা কোনটাই সে বোধ করে না। আমারও তেমন কোন তাগিদ নেই। কল্পনা করতে পারি না সীমা এখানে নেই। আজ সে অনেক দূরে—অন্যের ঘরে আজ সে চলে গেছে।

জীবনের একটা অধ্যায়ের এমনি পরিসমাপ্তি ঘটবে তা জানি না।

আজও সেই বেদনাটা মন থেকে মুছে যায়নি। আমার নিঃসঙ্গতার মাঝে সেই নির্জন একাকীত্ব মাঝে মাঝে পীড়া দেয়, দুঃসহ হয়ে ওঠে।

নিশীথ বলে চলেছে।

—ইলার চিঠিপত্র আসে, কিন্তু তবু এই বনবাসে সেই নিঃসঙ্গতাকে ভোলা যায় না। অন্যায়ভাবে কোনদিনই কিছু পেতে চাইনি, পেতে চেয়েছি —যোগ্যতা দিয়ে, সম্মানের সঙ্গে। তাই বলেছি ইলাকে, দিন এলেই সেই স্বপ্ন সার্থক হবে।

কিন্তু নিজের তীব্র বেদনাময় অনুভূতি দিয়ে মেয়েদের যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, নিশীথ যেন না ঠকে।

ও বনবাসে। মানুষের সমাজের বাইরে বাস করে, ও জানে না শহরজীবনের সেই হাহাকার আর মরিচীকাকে, তা র ইশারায় যদি কেউ পথ ভোলে তার দোষ কি?

কিন্তু নিশীথ তার নিজের স্বপ্ন নিয়েই রয়ে গেছে।

নিশীথ শুধোয়,

—কই, আপনি কোন কথা কইছেন না যে?

হাসলাম, মলিন বিষণ্ন এতটুকু হাসি। ও জানে না আমার জীবনের চরম পরাজয়ের কথাটা! শুনলে ও বোধহয় বেদনা বোধ করবে, ইলার সম্বন্ধেও অন্যরকম কিছু ভাবতে পারে! কঠিন বাস্তবের মুখোমুখী হতে দিতে চাইনা।

আমার বেদনার পুনরাবৃত্তি যেন ওর জীবনে না ঘটে। ইলা হয়তো সত্যিই ভালোবাসে ওকে, ওরা ঘর বাঁধুক, সুখী হোক।

জানাই—কি আর বলবো?

—আপনারা লেখক মানুষ। মনের অন্ধি-সন্ধির খবর আপনাদের জানা।

হাসলাম। জবাব দিই।

—মনের বাইরেও বিরাট একটা জগৎ আছে নিশীথবাবু; সেটা বাস্তব। সেখানে অনেক কিছুই ঘটা সম্ভব। হিসাবের সঙ্গে তাই মেলে না। যুক্তি দিয়ে হৃদয়কে বোঝানো যায় না—যেমন ছুরি দিয়ে জলকে কাটা অসম্ভব। তাই মনে হয়, আপনার কথাই ঠিক। ভালোবাসাই বড় কথা।

নিশীথ কথাগুলো চুপ করে শুনছে।

প্রদীপ সিঁড়ির মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বিকালে একটা ফাঁকা পাহাড়ের ধাব দিয়ে বেড়াতে যাই। তাই এসেছিল আজও।

দেখি ও নেমে বাগানের দিকে চলেছে। ডাক দিতেই দাঁড়ালো সে। শুধোই—চলে যাচ্ছেন যে বড়?

প্রদীপ শোনায় —থাকি আর কি করে বলুন? প্রেমকীর্তন শুরু হয়েছে নিশীথের। আপনিও মশাই বেশ লোক যা-হোক?

—কেন?

প্রদীপ বলে—আবার কেন? দিব্যি দোহারকি দিচ্ছেন। বলি ওটাকে, এ্যাদ্দিন তা দিয়েছিস খরচা পত্তরও করেছিস। আর কেন? এইবার ঝুলে পড় দুগগা বলে, না হলে তুই তো বনবাসে, কোথায় কোন দাদা-ফাদা তার জুটে যাবে। বাড়া ভাতে ছাই দেবে তোর।

নিশীথ ওর দিকে চাইল।

প্রদীপের থামার কোনো লক্ষ্মণ নেই। ও বলে চলেছে,

—ভালো কথা কেন নেবে স্যার? দেখুন না মুখার্জিদা এই চিঠি বুকে করেই বনে বনে গাছ-এর স্টক টেকিং করছে। আরে সরকারের বনে কি গাছ রইল-না -রইল তার হিসাব নিয়েই মরলি, ওদিকে তোর বাগানে কুসুম ফুটে ঝরে গেল—পাগলা মন তার হিসাব রাখলি কই?

হাসতে থাকি ওর কথায়।

সেই পরিবেশ অনেক সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

বামুও কফি-বিস্কুট এনে হাজির কবে।

এদিকের আনা স্টক ফুরিয়ে আসছে। পাহাড় বনে কিছুই মেলে না। তাই জানাই,

—কাল থেকে তরিতবকাবী কিছু জিনিসপত্রের দরকার।

নিশীথ জানায়,

—কাল হাটবাব। এখান থেকে চৌকিদার আবও দু'একজন লোক যাবে বাঘমুণ্ডিব হাটে। ওকে ফর্দ করে টাকা দেবেন, সব জিনিসপত্র এনে দেবে।

অবাক হই—জিনিসপত্রের জন্য বাঘমুণ্ডি যেতে হবে? অনেক পথ, এই দুর্গম বন-পাহাড় ভেঙ্গে নামতে হবে।

নিশীথ বলে—এই তো এখানের রেওয়াজ। হাটে ওরা যাবেই। সকালে নামবে আর ঘুরে ফিরে মালপত্র নিয়ে কিছু হাঁড়িয়া গিলে উঠে আসবে সন্ধ্যার মুখে। ওরা অবশ্য যাবে পাহাড়ের পাকদণ্ডী দিয়ে, ওই জিপের রাস্তায় নয়।

বুধিয়া যথারীতি কাজে এসেছে। টান করে খোঁপা বাঁধা—তাতে গুঁজেছে লাল পুটস ফুল, নিটোল দেহের রেখাগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে।

আপন মনে গুনগুনিয়ে গান গাইছে আর ঝাঁট দিচ্ছে। এরপর ভারি বালতি নিয়ে অবলীলাক্রমে কুয়োর ওই পাতাল থেকে জল তুলে আনবে।

রামুর সঙ্গে বোধহয় বচসা হচ্ছে।

—এতো চিনিগুলান ফেলাই দিলি? চালগুলান যে পাখ পকুড়িতে খেলেক, সিটার খেয়াল নাই? হাঁড়িয়া খেয়েই তুই মরবি, যমটা কোথাকার।

মাঠের মধ্য দিয়ে পাইনবন ছাড়িয়ে মুখার্জিবাবু হনহনিয়ে চলেছে সামনে মাঠের ওদিকে দু'চার ঘর বসতি রয়েছে সেইদিকে।

প্রদীপও দেখেছে তাকে যেতে। ডাকবার চেষ্টা করতে প্রদীপ বাধা দেয়।

—উঁহু। এখন পাঞ্জাব মেল চলেছে। চলুন দেখবেন কোথায় যায় ও। থামবে গিয়ে সটান ওই জি-পি-ওর সামনে।

হাসছে ওরা। প্রদীপ বলে।

—সঙ্গে মাল ছিল, সারা দুপুর বুকে বালিশ দিয়ে লিখেছে রামপট, হাতাতে চেষ্টা করলাম, তা এমন তেড়ি-মেড়ি করে এল এগোয় কার সাধ্যি।

নিশীথ কি ভাবছে।

বিকালের ছায়া ছায়া রোদ নামছে, পাখীগুলো কলরব করে।

আমরা বের হলাম। মাঠের উপর দিয়ে চলেছি। ধানের চাষ কিছু হয় এইখানে। মাটি বেশ নরম আর তখনও ঝর্নার মত জল ফুটছে, উর্বর জমি। সোনা রঙের ছোঁয়া লেগেছে ধানক্ষেতে। মাঝে মাঝে দু'একটা বড় গাছের উপর কাঠ-বাঁশ দিয়ে কুঁড়ে মত করা, ওখানে রাতের বেলায় উঠে থাকে ধান পাহারা দেয় এরা। তবু বন শুয়োরের দল, মাঝে মাঝে বুনো হাতির দল এসে নামে।

ক্রমশঃ চিনছি এই নতুন পরিবেশকে। ভালো লাগছে। বাংলোর উঁচু টিলার ওপর থেকে চোখ মেলে দেখেছিলাম ক্রমনিম্ন ধান-মকাইয়ের ক্ষেত, ওদিকে সবুজ ঘাসঢাকা খানিকটা উপত্যকা তার মাঝে দু-একটি সবুজ পাতার ভিড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুসুম পিয়াশাল-হরীতকী-আম-কাঁঠালগাছ।

নীচে দিয়ে পথের রেখা চলে গেছে। সামনেই মাথা তুলেছে নীল পাহাড় মনে হয়, ছবির মত একটু জগৎ। এই ছবি দেখেছিলাম শিলং-এর গল্‌ফ লিংকে নীলগিরির উটকামন্ড শহরের আশেপাশে।

সামনে রয়েছে গ্রামবসত। গরুর পাল যায় ধুলো উড়িয়ে—দুএকটা বস্তীর ঘর চোখে পড়ে। এই পথ দিয়ে চলেছি।

শান্ত স্তব্ধ দিগন্ত—নীচেই শুরু হয়েছে গভীর কালো বন। সারা আকাশ ঘেরা পাহাড় আর পাহাড়। সামনে অযোধ্যা বসতি। পাহাড়ের অধিত্যকায়—নীচের জঙ্গলের মধ্যেও ছাড়ানে-ছিটোনো গ্রামবসত আছে। সর্বসাকুল্যে এখানের বসতি প্রায় ছ'হাজার হবে।

বাঘমুন্ডি ব্লকের এ-ও একটা অঞ্চল। সরকারী কেতার একটু ছায়াও এখানে আজ এসেছে। অযোধ্যাতেই পোস্টাপিস। পোস্টাপিসই এমন একটি বস্তু—যার গতিবিধি সর্বত্র। দুর্গম তুষার রাজ্যে কেদারতীর্থ —সেখানেও এঁরা গেছেন, এঁদের দেখছি তিনদিনের জন্য গড়ে ওঠা গঙ্গাসাগর মেলায়—টেলিফোনও যায় সেখানে। সুন্দরবনের বাদাবনের ভেতরেও এঁদের গতিবিধি, তাই এই বন-পর্বতেও পোস্টাপিস—রানার থাকবে জানতাম।

দাশ বলে—অযোধ্যার জি-পি-ও দেখবেন না সে কি রকম ব্যাপার?

কাঁকরঢালা পথ, একটা বাঁধও রয়েছে, পাহাড় গড়ানী জল এসে জমেছে, তার নীচে থেকে শুরু হয়েছে ধানক্ষেত। পথে কাদের গানের সুর শোনা যায়।

পূর্ণিমা তিথি। কোথায় বনের পাখী ডাকছে। শীতের সন্ধ্যায় বিষণ্নতা ফুটে উঠেছে শান্ত বনভূমির মাঝে ওই ডাকে—আর স্তব্ধতায়। বাতাসে ওঠে কাঁঠাল ফুলের তীব্র সুবাস। বনপাহাড়ে এখন কাঁঠাল ধরেছে; কাঁঠাল দেখেছিলাম এই সময় কোদাইকাসালে। এর পরিবেশের সঙ্গে সেই সুন্দর জগতের অনেক মিল আছে।

ক'টা লোক আমাদের দেখে বেসুরো কণ্ঠে গান থামিয়ে যেন কৈফিয়ৎ-এর সুরে বলার চেষ্টা করে—গায়েন করছিলাম।

সৌজন্যতার খাতিরে বাবুদের দেখে দুহাত জোড় করে নমস্কার করবার চেষ্টাও করে, কিন্তু নেহাৎ দুর্ভাগ্য আমাদের সেই নমস্কার পেলাম না।

অর্থাৎ অনেক চেষ্টা করেও তারা দুটো হাত এক করতে পারল না। টলছে বেদম নেশায় পথের এদিক থেকে ওদিকে। একটু পার হয়ে গিয়েই আবার জড়ানো সুরে গান গাইবার চেষ্টা করে।

পথটার দু'দিকে কয়েকটা ঘর। একদিকে ধানক্ষেত অন্য দিকে ঢালু বন আর অন্ধকারে পাহারাদার সেই পাহাড়গুলো কালো ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় সরষের ক্ষেতের ধারে লকলকে লাউ মাচায় সবুজ লাউগুলো ঝুলছে।

মাটির দেওয়াল—আর খড়ের ছাউনি দেওযা নিচু নিচু ঘরগুলো, সামনেই কয়েকটা ঘর—তারপর পাশে

চলার পথ গিয়ে আবার হারিয়ে গেছে বনে। চারিদিকেই এর বন। কোথায় মাদল বাজছে—গানের সুর শোনা যায়। কালী পরবের জের চলেছে তখনও।

নীচের দিকে কয়েক ঘর বসতির ওখানে হেসাকের আলো জ্বলছে। কাদের গান-এর জড়ানো সুর শোনা যায়। ওই মাতাল লোকগুলো ওইদিক থেকেই এসেছে।

নিশীথ বলে—কামতাপ্রসাদ ওই বসতিতে এসে ডেরা নিয়েছে। ওই-ই এদের শেষ করবে।

অন্ধকারে লোকটা আসছিল আমাদের কথাগুলো শুনেছে। লোকটা এগিয়ে আসে।

বলে ওঠে—ঠিক বলেছিস বনবাবু! ওই রতনাই উয়ার ইয়ার-শাকরেদ হইছে। শহরে বাজারে যায় আর বদবুদ্ধিগুলান নিয়ে এসে নিজের কাজ গুছাইছে।

নুলো লোকটাকে আগেও দেখেছিলাম বাংলোয়। মাধাই মাঝিকে দেখেছি। এখানের কিছু লোক-ও ওই আবহাওয়াটাকে সহ্য করতে পারছে না! কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদ করারও শক্তি নেই।

—লয়-ছয় করে মাল কিনছেক হে! চিনাবাদাম-মকাই-এর দর দিছে ঢের কম। বলে—দাদন দিছি আকালের সুময়, এখন দর কমাতে হবেক হে! গিছিলাম সর্দারের কাছে! সাতাশীর ওই মুশায় সর্দার বললেক। মাল আমরা কিনবো, ন্যায্য দরটি দিল। তু বলগা উদের। কথাটি শুনে রতনা ফুসে লিলেক। ভারি আমার সর্দার হইছে।

মাধাই এই অপমানে ব্যথা পেয়েছে।

তবু বলে—সিং বোঙাও ইদের বাঁচাতে লারবেক। রতনা ওই শেঠজীই ইয়াদের মাথাগুলান্ ঘুরাই দিছে।

মাধাই তবু ডুংরিতে খবর দিয়ে ফিরছে ওই নুলো হাতখানা নিয়ে, ওদের এই প্রতারণার হাত থেকে বাঁচাতে চায় সাতাশীর মুশায় সর্দার। লোকটা অন্ধকারে বনের পথ দিয়ে আর কোন বসতির দিকে চলে গেল। মনে হয়, এই বিকৃতির প্রচণ্ড ধাক্কা থেকে মুশায় সর্দারও তার জাত জ্ঞিয়াতকে বাঁচাতে পারবে না।

অন্ধকারে ওদিক থেকে হিন্দী গানের সুর উঠছে। কামতাপ্রসাদ বোধহয় দামী ট্রান্‌জিস্‌টার এনেছে। তারই সুর উঠেছে। শান্ত বন-পাহাড়ের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে ওই সুরটা একটা বিকৃতি আনে—এই পরিবেশের পবিত্রতাকে ও যেন নষ্ট করেছে।

এদিকে সরু পথটা ধবে বসতির দিকে এগিয়ে গেলাম।

সামনেই চালাঘর, ওদিকে সরষের ক্ষেতে হলুদ উজ্জ্বল বিন্দুর ছড়াছড়ি। চালার নীচে মুখার্জিবাবু একটা চিঠি ফেলতে যাবেন, প্রদীপ পিছন থেকে গিয়ে একটানে চিঠিখানা ফস্ করে কেড়ে নিয়েছে, মুখার্জিবাবু-ও ছাড়বার পাত্র নন, ওকে তাড়া করে সটান সরষেক্ষেতে ঢুকিয়েছে। চীৎকার করছে মুখার্জিবাবু।

—খবরদার! খবরদার প্রদীপ, একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাবে 'টেরিফিক্' কাণ্ড বাধাবো কিন্তু।

প্রদীপ বলে দূর থেকে—যে চিঠিখানা আজ এসেছে সেটা দেখাবে তো?

—পরের চিঠি দেখতে লজ্জা করে না রাস্কেল?

মুখার্জিবাবুর ঝুলেপড়া গোঁফ সোজা হয়ে উঠেছে। মুখার্জিবাবু বলে,

—তোমাকে বলি মাস্টার, নিশ্চয় খপর দিয়েছো তুমি, যে, চিঠি এসেছে। নইলে ওই রাস্কেলটা এখানে এসে জুটলো কি করে? তোমার নামই রিপোর্ট করবো এইবার।

পোস্টমাস্টার ছোকরা হাসছে। প্রদীপ তখনও সরষেক্ষেতে দাঁড়িয়ে অফার দেয়।

—কাল হাট থেকে দু'কিলো মাংস আনা হবে, তার দাম দেবে মুখার্জিদা, এই শর্তে চিঠি ফেরৎ দেব এবং আজকে আসা বৌদির চিঠিও পড়বো না কথা দিচ্ছি।

শেষ অবধি এমনি একটা রফা হোল।

সন্ধ্যা নেমেছে। ঝক্‌ঝকে চাঁদের আলোর তুফান জেগেছে ওই মাঠে—বনে বনে। কুয়াসা যেন রূপালী হিমকণা হয়ে গলে গলে পড়ছে। শান্ত নিভৃত পরিবেশে এই আবণাক জ্যোৎস্নামাখা সন্ধ্যার একটি বিশেষ রূপ আছে।

ক'টি সভ্যজগতের তরুণ এই বনবাসের নির্জনে এসে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। ওদের মনের নিঃসঙ্গতাকে আমার নিঃসঙ্গতার বেদনা দিয়ে অনুভব করেছি।

বিচিত্র এই বসতির এই পাহাড় রাজ্যের মানুষ তাদের শান্ত স্তিমিত জীবন-যাত্রাকেও কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছি।

পোস্টমাস্টার ভদ্রলোকের দাওয়ায় বসে গল্প করছি। সামনেই মাঠে কয়েকটা ময়ুর বের হয়ে এসে চরছে। চাঁদের আলোয় ওদের রঙীন মসৃণ পেখমগুলো চিক্‌চিক্ করে।

লেখাপড়া কিছু লিখেছেন ভদ্রলোক। ওঁর বাড়ি পাহাড়ের ওপাশের বনে।

এখানে পোস্টাপিস আর প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারি নিয়ে আছেন। অবশ্য ছাত্ররা বিশেষ কেউ আসতে চায় না। কারণ একটা ছেলেকে পড়তে পাঠানো মানে একটি বাড়তি মুখের খাদ্য জোগান দেওয়া, না হলে তারা নিজেই খেটেখুটে বনের ফলপাকড়-শিকার তুলে নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে; মানে পড়ানো মানে তাকেও খেতে দেবার ব্যবস্থা করা। এটা কঠিন।

পোস্টমাস্টার বলেন—তবু অভাব এমন কিছু নেই।

অবাক হই ওঁর কথায়।

মনে হয়, আমরা এঁদের দারিদ্র্যকে খুঁজে বের করেছি আমাদের শহুরে চোখ দিয়ে। ভালো কাপড়-জামা নেই, খালি গা, খাবারও তেমনি। শিক্ষা নেই। ওদের কাছে অভাববোধটা অনেক কম। আর, দারিদ্র্যের মাপকাঠিও ভিন্ন ধরনের।

মাস্টারবাবু বলে চলেছেন।

—ধান কিছু হয়। তারপর হবে মকাই-বাজরা-গুদলু একরকম গোল গোল সাদা চালের মত।

চালের অভাবের সময় শিয়ালদহের বাজারেও ওটা দেখিছি, শহুরে মানুষ-ও সিদ্ধ করে পালো করে খেয়েছে।

—কিছু তরিতরকারী, লাউ-কুমড়োও হয়। বনে বনে বিভিন্ন ঋতুর ফল-পাকুড়ও হয়। কেঁদ-পিয়াল-ভালাই-ভুঁড়র—আর আছে পাহাড়ী কন্দ আলু, তাই দিয়েই খাবার ভাবনা মিটে যায়। আর কি চাই বলুন?

এদের চাওয়া অতি সামান্য। তাতেই এরা খুশি। বনের ফল—ঝর্নার জল আর লজ্জা নিবারণের জন্য সামান্য একটু কাপড়। আজ এই আকাশজোড়া অভাব—অর্থনৈতিক বিপ্লব আর হাহাকারের দিনে এভাবে কেউ ভাবতে পারে, এটা জানতাম না।

বলি—কিন্তু মানুষের মত বাঁচার অধিকার তো সকলেরই আছে? এই অভাব-কষ্ট সয়ে আজও এরা কেন থাকবে?

হাসেন মাস্টারবাবু।

—অভাব কি শহরের লোকের মিটেছে? এখানের দু-চারজনও বাইরে গেছে, কেউ ফিরে আসে—কেউ ফেরেনি আর। কিন্তু তারা বলে—এর চেয়ে এখানেই তারা ছিল ভালো। সমাজের নানা শাসনের ভয়ে তারা সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। বাইরে গিয়ে পয়সা রোজকার করে, কিন্তু সুখ-শান্তি—এসব কি পেয়েছে তারা? বোধ হয় পায় নি।

জবাব দেবার কিছু নেই। চুপ করে থাকি।

আজও দু-চারজন লোক এসে জুটেছে। কন্‌কনে পাহাড়ী ঠাণ্ডা। ওদের শীতও সহ্য হয়ে গেছে। একটা কাপড় না-হয় চাদরমত কি একটা জড়িয়েছে; সামনের ঘরটা দোকান গোছের।

মুখার্জি বলে, অযোধ্যা হিল্‌স্-এর এই হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। সামান্য দু-এক প্যাকেট চা, কিছু বিড়ি-দেশলাই, চুটি আর কাঠের খোপে নুন ও কিছু ডাল-তেল রয়েছে। আলু-পেঁয়াজ ইত্যাদি এ-পাহাড়ে পাই নি। এরা লাল আলুর চাষ করে, সেটা সহজেই ফলে আর পেটও ভরে।

ওদিকে কালী-পরবের মাদল বাজছে, পরবের ঠাকুরমূর্তির দরকার নেই। একটা গাছই দেবতা ওদের। এক

গ্রামের সাঁওতালদের আত্মীয়-স্বজন বাইরে থেকে মদ নিয়ে এল কয়েক হাঁড়ি—এরাও মদ বানালো।

ভাত জুটলো ভালোই, না-হলেও ক্ষতি নেই। মদ গিলবে আর গান গাইবে, মাংস জুটলো তো কথাই নেই। দু-একদিন পরব চলার পর মদ ফুরোলো—পরবও শেষ হলো।

বাইরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে যারা এসেছিল, তারা নেওতা দিয়ে গেল। আবার এরা যাবে। এমনি করে পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে চলবে পরব। সেই ধানকাটার আগে পর্যন্ত। শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনকে ওরা এমনি করে ভরিয়ে রেখেছে গানে গানে।

মাস্টারবাবু বলেন,

—বড় পরব হয় মাঠা পাহাড়ে, মাঠাবুরুর থানে পৌষ সংক্রান্তির দিন। সেদিন এখানের শিকার। রাজপুতদের আহেরিয়া শিকার উৎসবের মতন। বনঝোপে হাজার হাজার সাঁওতাল শিকারে বের হয়। ও পরব শেষ হলে মকাই বুনে এখানে শুরু হবে বৌদ্ধপূর্ণিমার শিকার পরব।

এ পর্ব শুধু অযোধ্যা পাহাড়েরই পর্ব।

এর মূলে কোন ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র রয়ে গেছে। মানভূম-সিংভূম-বীরভূম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের বহু সাঁওতাল আসে এই অযোধ্যা-তীর্থে। এটা তাদের কাছে তীর্থস্থান। মাঠের ধারে পাহাড়েব নীচে আজও সাঁওতালদের গড়ের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে, আর আছে পবিত্র ঝর্না। এখানে ওরা স্নান করে পুজো দেয়।

তারপর শুরু হয় ভোর থেকে ওদের শিকারপর্ব। হাজার হাজার সাঁওতাল আসে ঢাক-ঢোল-জগঝম্প-মাদল নিয়ে, সঙ্গে থাকে তির-ধনুক-বল্লম-সড়কি। গভীর গহন বনপর্বতে সেদিন ওদের অধিকার।

স্পেশ্যাল পুলিশ ফোর্স—বনবিভাগের বড় কর্তারা আসেন, কিন্তু ওদের সেই আরণ্যক বিভীষিকার মাতনে মেতে ওঠা আদিম প্রবৃত্তিকে কোন শক্তিই বাধা দিতে পারেনি।

ওরা জানিয়ে যায়, একদিনের জন্য এই বন-পর্বতরাজ্যের তারাই প্রকৃত মালিক। বিচারসভা বসে, এ-রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব তখন তাদের হাতে। রাতে বনপর্বতে জ্বলে ওঠে আগুনের আভা—কেউ কোন সামাজিক অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। কঠিন শাস্তি।

দোকানপাটও আসে। আর আসে মদের ব্যাপারীরা। দূর আসানসোল থেকে পাঁচ-সাত ট্রাক-এ বড় বড় ট্যাঙ্ক বসিয়ে মদ আমদানীও করা হয়। উৎসবের মূল কারণ কি—সেটা ঠিক বোঝাতে পারলেন না তিনি।

তবু বলেন—এরা যখন দেশে ফিরে যায় তীর্থ সেরে সেদিন বন থেকে অনেক কাঠই চলে যায়। কিন্তু করার কিছু নেই। আর তারা ঘরে ফিরলে বাড়ির লোক হলুদ-জল দিয়ে পা ধুইয়ে দেয়—নতুন কাপড় দেয়। ও নাকি তীর্থ সেরে এল।

অযোধ্যার এই পাহাড় অঞ্চলেই ওই কয়েক হাজার সাঁওতাল রয়ে গেছে। সমতলের গ্রাম্য-উপত্যকায় তারা বিশেষ নেই। সেখানে বাস করে অন্য জাতের মানুষ। এই সাঁওতালদের জগৎ এই দুর্দম পাহাড়বনের মধ্যেই সীমিত। কারণ একটা কিছু রয়েছে। যেটা এখনও সঠিক জানা যায়নি।

সেটা বোধ হয়, সাঁওতাল-বিদ্রোহ কিংবা বীরসামুন্ডার বিপ্লবের কাল থেকেই সূচিত হয়েছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যাবার পর, তাদের ওপর শুরু হয়েছিল অমানুষিক অত্যাচার। তাদেরই কিছু পূর্বপুরুষ তখন ওই সব এলাকা ছেড়ে বসবাস করার জন্যই এই দুর্গম পর্বত গহন বন-পাহাড়ে এসে পৌছেছিল—গড় তৈরী করে সুরক্ষিত এই পর্বতরাজ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

কোন সংগ্রামও হয়েছিল তাদের ইংরেজদের সঙ্গে। রক্তাক্ত সংগ্রাম। সে সংগ্রামেই যোগ দিতে এসেছিল তেলপত্রের ইশারা পেয়ে দূর-দূরান্তের বহু সাঁওতাল। আজকের বৌদ্ধ-পূর্ণিমার অযোধ্যা পর্বতের এই শিকারপর্ব তেমনি একটি পবিত্র স্মৃতিকেই স্মরণ করায়।

ইতিহাসে এসব কথা নেই। এ-কথা ছড়িয়ে রয়েছে নির্জন অযোধ্যা পাহাড়ের বনে-পর্বতে; শিলাখণ্ডে আর ওদের মনে, রক্তে। আজকের নিরীহ শান্তিপ্রিয় সুখী মানুষগুলো সেদিন তাই মেতে ওঠে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাদল আর বাঁশীর সুর উঠেছে চাঁদের আলোভরা আকাশে, পাহাড়ের মাথায় চাঁদের উজ্জ্বল অস্তিত্ব—নীচের বনভূমি দূরের পাহাড়ে কি অন্তহীন স্তব্ধতার ইঙ্গিত আনে। আমরা বনের পাশ দিয়ে ফিরছি বনবিভাগের কলোনীর দিকে।

শান্ত-স্তব্ধ বসতি। সাঁওতালপাড়ার মানুষগুলো এরই মধ্যে শুয়ে পড়েছে।

হাতিনাদার জঙ্গলের কালো শালবনে নেমেছে রাতের তমসা; ঝিঁঝিপোকা ডাকছে, আকাশে কে যেন মুঠো মুঠো তারাফুল ছিটিয়ে দিয়েছে। পাইনের চামর পাতায় জমেছে বিন্দুবিন্দু শিশিরকণা, চাঁদের আলোয় ওগুলো ঝল্‌মল্‌ করছে। বাতাসে উঠছে, ভিজে ভারী কমলালেবু ফুলের উদগ্র সুবাস। কোথায় একটা বোরার ঝর ঝর শব্দ তোলে,—তার সঙ্গে মিলছে গার্ডদের কলোনী থেকে ভেসে আসা নির্বাসিত একটি ছেলের কচি গলার পড়ার শব্দ।

পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে গিয়েছিলেন। রাজা দশরথ-এর কাহিনী, পুরাণের কথা। রামেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে কৌতূহল নেই, রামের বনবাসের দিনগুলোর ছবি মনের সামনে ভেসে ওঠে। সত্যজগতের মানুষের-লোভ লালসার বাইরে শান্ত তমসার তীরে কোন বনচ্ছায়ে এমনি রাত্রি নামতো।

সেই গিরি-প্রস্রবণকলমুখর কোন স্তব্ধ রাত্রে আমার কাছে বোধ হয় এই প্রশান্তির প্রয়োজন ছিল মানুষের মনে অন্তহীন কাল থেকে। রামায়ণ সেই চাওয়ার সার্থক রূপায়ণ।

বুধিয়ার সেই বেদনাও চিরন্তন। সব দুঃখ-নির্জনতা-বেদনা আর প্রকৃতির অফুরান দানে অযোধ্যা পাহাড় সমৃদ্ধ। তপোবনের প্রশান্তি তার বুকজোড়া সম্পদ।

এই শান্তিকে বিঘ্নিত করে একটা শব্দ উঠছে। জঙ্গলের ভিতর দেখা যায় একফালি আলোর ধারালো ঝলক, আঁধার ফুঁড়ে যেন খানখান করে দিয়েছে।

একটা জিপ ছুটে আসছে বনের দিক থেকে।

নিশীথ বলে— রাতেরবেলায় আবার কে এল?

কোন কর্তাব্যক্তিই হবে, দু'একদিনের মধ্যে কাঠের নীলাম হবে। কোন অফিসারের আসার কথা, তিনিই বোধহয় এলেন।

আমিও ভাবনায় পড়ি। বাংলোটা পুরোই দখল করেছিলাম আমরা দু'জনে। ঘর অবশ্য বাড়তি আছে, তবু সেখানে আর একজন এসে উঠবেন—কেমন যেন গোলমাল বাড়বে, এদের নিয়ে সুন্দর আস্তানাটাও জমবে না তেমন খোলামেলা ভাবে!

জিপটা কাছে এসে দাঁড়াল।

—রাম-রাম বাবুজী। কামতাপ্রসাদের গলা শোনা যায়। বোধহয় নীচে কোন কাজে গিয়েছিল, আবার ফিরে আসছে।

ও-ই একটা চিঠি নিশীথকে দিয়ে বলে,

—বন অপিসের বগল হয়ে আসলো, স্যার ওই চিঠি দিয়েছেন, অব চলি বাবুজী।

জিপটা দাঁড়ালো না। চলে গেল মাঠের ওই পথের রেখা ধরে পাহাড়ের ধারে সেই বস্তির দিকে।

কঠিন গোলমত মুখখানায় কামতাপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠেছে। যেন শয়তানির পিট্‌পিটে হাসি। যাবার আগে কামতাপ্রসাদ বলে,

—বনের ভিতর দুটো ভাল্লুক দেখলাম বাবুজী, একটা খুব বিরাট এইসা। আউর মাক্‌না হাতিভি কাল চড়াই বস্তিমে যাকে দুটো ঘর টুটালো। কাজ-কাম কইসে চলবে বাবুজী?

ওরই যেন ভাবনা।

ওই খবরগুলো দিয়ে কামতাপ্রসাদ চলে গেল। প্রদীপ বলে,

—ওটাকে ভালুকে ধরবে না, ওই-তো চাদর জড়িয়ে বুড়ো ভালুক সেজেছে।

বনে বনে এসব উপদ্রব মাঝ মাঝে থাকেই। এখানের মানুষ তাদের মেনে নিয়েই বাস করে, কাজ-কম্মো চালায়।

কেন জানিনা মাধাই মাঝির কথা মনে পড়ে। মুশাই সর্দার এখনও এই বন অঞ্চলের প্রধান। ওরা নাকি অতীতের কোন আদিবাসী রাজার বংশধর। পাহাড়ের নীচে ওর বসতি।

আর, পাহাড়ের ঘন বনে এখনও রয়ে গেছে গড়ের ধ্বংসাবশেষ। বহু পাথর দিয়ে সেই কেল্লা বানানো হয়েছিল। কিন্তু কালের ছোঁয়ায় কিংবা বিদেশীদের আক্রমণে সেই প্রাচীন কেল্লা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে। এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

এই মুশাই সর্দারের কথা শুনেছিলাম পুরুলিয়াতেও! এই অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বেশ কিছু বিপ্লবী এই দুর্গম গহন অরণ্য-পর্বতে এসে আশ্রয় নিতো।

আর তাদের আশ্রয়দাতা ছিল এই মুশাই সর্দার। নিজেও সেই আন্দোলনের সামিল হয়ে জেলে বাস করেছে।

সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে থেকেই পুরুলিয়ার মানুষের কাছে ও একটি পরিচিত, শ্রদ্ধেয় নাম। গহন অরণ্যের মাঝে আজও রয়ে গেছে তার নিজের ডুংরীতে। এখনও এই এলাকার সেই-ই পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট।

আজকের প্যাঁচালো রাজনীতির কিছু ঢেউ এসে পৌচেছে এই শান্ত পাহাড়বনের মধ্যে, তারও পরিচয় পেয়েছি। রতনমাঝি এখন এখানের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আর তার পরামর্শদাতা সাহায্যকারী ওই কামতাপ্রসাদের মত স্বার্থপর মানুষ।

তাই মুশাই সর্দারের সঙ্গে রতনের মতের মিল হবে না তা অনুমান করতে পারি। এই পরিবেশের গাম্ভীর্য আর শুচিতার সঙ্গে ওই মুশাই সর্দারের কেমন মিল আছে।

তাই জানাই—মুশাই সর্দারের ওখানে একদিন যেতে পারলে ভালো হতো।

নিশীথ আমার দিকে চাইল। ক'দিনেই দেখেছে আমাকে অক্লান্তভাবে অকারণে বনে-পাহাড়ে ওদের সঙ্গে ঘুরতে। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা বাংলোর মধ্যেই দিনরাত কাটান—বড়জোব বাগানে, পাইন বনে পায়চারী করেন।

নিশীথ বলে—শুনলেন তো ওদিকেব পাহাড়ে বুনো হাতির উৎপাত শুরু হয়েছে, আর বন ওদিকে বেশ গভীর। দেখি খবর নিয়ে কি ব্যাপার। তারপব যাওয়া যাবে একদিন।

বাংলোয় এসে উঠেছি। ততক্ষণে রাজু কফির ব্যবস্থা করেছে। হ্যারিকেনের আলোয় নিশীথবাবু হাতের চিঠিখানা পড়ে একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

প্রদীপ ওকে দেখছিল। গম্ভীর হয়ে প্রদীপ শুধোলো।

—কি রে বোবা মেরে গেলি যে? কি ব্যাপার?

নিশীথ জানায়—কাঠগুলো নীলাম হবে, অফিসার আসবেন। পরশুই দিন পড়েছে নীলামের।

প্রদীপ বলে—ভালোই তো। ওইসব মালপত্র সাফ হয়ে যাক্।

—তা যাবে। আর কার কাছে যাবে বুঝেছিস?

প্রদীপ ব্যাপারটাকে হালকা করে দেখার চেষ্টা করে। ও কোন কিছুকেই গুরুত্ব দিতে চায় না। যখন যা ঘটে সেটাকে সহজভাবেই দিতে চায়। জানায় সে,

—যেখানে যায় যাক্ না। তোর তাতে কি? কর্তারা এলো নিজে যা ভালো বুঝলো করে গেল। তোরও দায় খালাস।

নিশীথ হাসে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে চলেছে মুখুয্যে মশায়। তার মনটা আজ বেশ হালকা রয়েছে। টেবিল বাজিয়ে মাঝে মাঝে গুনগুনিয়ে ওঠে,

—আনা দের। আনা দের দের তানা দের দের —না দের দ্রেতুম না দের তানি!

হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে হাসতে বলে,

—রেওয়াজ করছি মশাই। বুঝলেন, এককালে এসব কোলায়াতি গানটান গাইতাম। কিন্তু বলে না, অন্নচিন্তা চমৎকারি, এই যাঁতাকলে পড়ে সব বিলকুল ফৌত হয়ে গেল।

প্রদীপ বলে,

—এখন হালে পানি পাচ্ছি না, কি বলো দাদা? একজন নীতি— প্রমোশন—আর প্রেমের চিন্তায় ডুবে রইল, আর একজন ওই করছে। বুঝলি ভটচার্য, তুইও এইবার একটা কিছু কর—আমি শ্লা আসেদ্ধ আলুর মত তোদের ঝোলের পাত্রে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকি।

নিশীথ হয়তো নিজের কথাই ভাবছিল।

ও জেনেছে অন্ধকারের অতলে একটা অদৃশ্য হাত কোথাও রয়েছে, যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অনেক কাণ্ড বাঁধিয়ে চলেছে।

কামতাপ্রসাদ যে এই চাল চালবে, তা অনুমান করেছিল। ওর হাত অনেক দূর অবধি এগিয়ে যায় আর বুদ্ধিও তেমনি ধারালো।

তবু তার কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু রেঞ্জ অফিসার নিজে এসে যা করবেন করুন। কিন্তু বনের মধ্যে এই ক'দিনেই বেশ কিছু দামী কাঠ চোরাকাটাই-এর দলের হাতে কাটা পড়েছে। ওদের এই অভিযান অনেক সংগঠিত, তাকে বাধা দিতে পারছে না তারা। কারণটা কিছু অনুমান করেছে নিশীথ।

তার ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়ানো রয়েছে এই সঙ্গে। আর একজন ব্যাকুলভাবে তার পথ চেয়ে আছে—ইলার কথা মনে পড়ে। ডাগর কালো চোখে। কি ছায়া ফুটে ওঠে। অন্ধকার আকাশের প্রদীপ্ততারার রোশনী ওর চোখে, বহু দূর আকাশের যেন অধরা কোন তারা। তবু তাঁর দীপ্তি ওর মনের আঁধার মুছে দেয়।

প্রদীপ ওর কথাগুলো শুনছে। কোনো জবাব দিল না সে।

চুপ করে ভাবছে সেই দূর শহরের মেয়েটির কথা।

যে ভাবে হোক এই চোরাকাটাই তাকে বন্ধ করতেই হবে। কারণ তারই উপর নির্ভর কবছে তাব নিজের ভবিষ্যৎ।

বুধিয়াকে এর মধ্যে দু'একবার এদিকে ঘুরে যেতে দেখেছি। মেয়েটার চোখে-মুখে কি নীবব ব্যাকুলতা। কামতাপ্রসাদের দলবলের ভয়েই বোধহয় মেয়েটা রাতেরবেলায় মাঝে মাঝে এই বনকলোনীর মেয়েদের কাছে চলে আসে।

নিশীথ-প্রদীপরা ফিরে গেছে ওদের কোয়ার্টারে। চাঁদের আলোভরা পাইনবনের দিকে চেয়ে থাকি! হঠাৎ বুধিয়াকে দেখে বললাম,

—কি রে?

বুধিয়া এগিয়ে আসে। ও শুধালো।

তুদের কলকাতায় এইসব আছে? এই বন-পাহাড়—শালবন? মহুয়া ফোটে সিখানে?

ওর দিকে চেয়ে থাকি। ও জানে না প্রাণহীন ইটকাঠের সেই রাজ্যের কথা। এই স্পর্শটুকু পেতেই ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসি আমরা তৃষিতমন নিয়ে।

জানাই—না। এসব কিছুই নেই রে!

—নাই! অবাক হয় সে। ডাগর কালো চোখে কি যেন হতাশার ছায়া! শুধোয় সে,

—তবে সিখানে কি আছে রে? সিতাই-এর মন তাই দেখে সব ভুলে গেছে? এ্যাঁ?

সিতাই কি দেখে এই মহানগরীর জীবনের পাঁকে তলিয়ে গেছে, তা জানি না। সেই কারণে, ওর কথায় জবাবও দিতে পারি না।

বুধিয়া বলে—উ বলেছিল, ফিরে চলে আসবো। থাকবো নাই সিখানে—

ওর চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। ভারি গলায় জানায়—এলে নাই আর। কেনে এলে নাই গ'?

হঠাৎ রাজুর পায়ের শব্দ পেয়ে মেয়েটা চুপ করে গেল। ওদিক থেকে রাজু শুধোয় খাবার দেবে কিনা।

মেয়েটা উঠে পড়ল। ও যেন আমাকে এ সময় আর বিরক্ত করতে চায় না। রাজুর সামনে ধরা পড়তেও চায় না। জানায়,

—মুশায় সর্দারকে বলেছি, উ বলেছে তার খোঁজটি লিবেক। ভাল লুক উ, বড্ড ভালো লুক গ'!

মুশাই সর্দারকে এরা সকলেই মানে। এই বন-পাহাড়ের মানুষের ও আপন জন। তার সম্বন্ধে একটা ধারণাও আমার মনে গড়ে নিইছি।

আর এই মানুষটির সঙ্গেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পরদিন।

এই পাহাড়ের এ-মানুষটিকে না দেখলে অ্যযাধ্যা পাহাড়ের অনেকটাই অদেখা থেকে যেতো, যাবার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু চার মাইল দুর্গম পথ। একটা উঁচু পাহাড়কে টপকে যেতে হবে। ও-বনে কয়েকদিন ধরে হাতি আর ভালুকের উৎপাত চলেছে। কয়েকজন লোককে তাড়া করেছিল।

আর, আমাদের চৌকিদার রামুও বেঁচে এসেছে অল্পেব জন্য বুনো হাতির সামনে থেকে।

রামু অবিশ্যি মেজাজেই থাকে। দিনরাত কাজ করছে, ছুটছে, একপায়ে খাড়া হুকুম তামিল করবার জন্য। আর অশেষ গুণ—মুখবুজে থাকে। কিন্তু কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু দোষ ওই একটি। সুযোগ পেলেই হাঁড়িয়া গিলবে আকণ্ঠ। চোখ বুজে বুঁদ হয়ে থাকবে। নেশা ও দিনরাতই করে।

সেদিন বনের মধ্য দিয়ে কোত্থেকে হাঁড়িয়া গিলে বুঁদ হয়ে ফিরছে। ঘন বন সুঁড়িপথ দিয়ে আসছে। হঠাৎ সামনেই দেখে শুঁড় দুলিয়ে বেশ মেজাজে আসছে হাতিটা।

রাজু ভেবে নিয়েছে বনবিভাগের কোন কর্তাব্যক্তিই হবে।

ইনস্পেক্সনে এসেছেন বনে। সেইখানে দাঁড়িয়ে আধবোজা চোখ খোলবার চেষ্টা করে রাজু এ্যাটেনশন হয়ে পা ঠুকে স্যালুট্ করে। স্যালুট্ করতে অবশ্য তার ভালো লাগে।

সেই হাতিও এগিয়ে আসছে। একটু কাছে আসতে রাজুর চোখ যায় ওপরের দিকে।

এ হাতির পিঠে মাহুত নেই—হাওদা নেই, সাওয়ারীও নেই। গা-ময়-কাদা-মাটি মাখা। গতিক দেখে ওর নেশা ছুটে গেছে। বুঝতে পারে, দলছুট্ মাকনা হাতির সামনে পড়েছে। এখুনি শুঁড়ে জড়িয়ে আচড়ে তাকে শেষ কবে দেবে।

বাজু গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে এদিক-ওদিকে দৌড়ে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে।

বলে সে,

—দেলা বেঁ! বাকি নিশাটা কিন্তুক ছুটে গেল বাবু।

প্রাণে বেঁচে এসেছে তার জন্য খুশি নয়—দামী নেশাটা ছুটে গেছে, এইটাই তার আফশোষ। এর জন্য ওর দুঃখের শেষ নেই।

সব শুনে ওই বন-পাহাড় পার হয়ে ও-পথে যাবার ইচ্ছা থাকলেও সাহস ছিল না।

দেবু বলে—নাই-বা গেলেন ওদিকে।

সাত-পাঁচ ভেবে ওই মুশাই সর্দারের ডুংরিতে যাওয়াটা হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু মুশাই সর্দারের কাছে ওসব ভয় ছিল না। নিজেই এদিকে এসেছিলেন তাই একটু এগিয়ে বাংলোয় এসে হাজির হয়েছিলেন।

আগেই একজন এসে জানিয়ে যায় যে, মুশাই সর্দার আসছেন, এটা বোধহয় ওর মর্যাদারই চিহ্ন। তবু ভাবিনি যে বৃদ্ধ সর্দার আমাব মত সামান্য একজনের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আমিও এগিয়ে গেলাম ওকে অভ্যর্থনা করে আনতে। ওর বয়স প্রায় সত্তরের ওপর, ক্ষয়ে-যাওয়া শরীর শালগাছের মত এখনও কঠিন আর ঋজু রয়েছে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ সন্ধানী। এককালে ওর স্বাস্থ্য যে কতো সুন্দর ছিল এখনও এই কাঠামো দেখলে বোঝা যায়।

দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে এল মুশাই মাঝি। পিছনে আসছে মুশাই সর্দার, আগে একটি তরুণ।

অযোধ্যা পাহাড়ের সাঁওতাল-গোষ্ঠীর শিব্‌সর্দার ওই লোকটি, আজকের কালেও সে এখানের অঞ্চল-প্রধান। সারা পাহাড়ের মানুষগুলো তার অমতে কিছু করে না। অন্তর দিয়ে তাকে ভালোবাসে।

সর্দারের বাঁ হাতে দুমড়ে ধরেছে, আঙুলগুলোয় কিসের দাগ।

নিজেই বলেন মুশাই সর্দার—ভালুক মেরেছিলাম একটো, সিটাই ঘায়েল করেছিল আমাকে। তারই দাগ ইসব বাবু।

সেই ভালুক মারার ঘটনাটা সত্যিই লোমহর্ষক।

বনের মধ্যে ভালুকটাকে ঘায়েল করেছিলেন—একটি মাত্র তির ছিল সম্বল, তাই দিয়ে। ঘায়েল ভালুকটাও তাড়া করেছে, আর তির নেই। একটা গাছের ওপর উঠে পড়েন সর্দার।

কিন্তু ভালুকও ছাড়বার পাত্র নয়। মরীয়া হয়ে সে ওর একটা হাত ধরে ফেলেছে, টানছে তারে নীচের দিকে। সর্দার ডানহাতে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়েছে।

একদিকে টানছে ভালুক তার প্রবল শক্তিতে, তবু তার ডান হাতের মুষ্টি থেকে ডাল খুলতে পারে নি, ভালুকটা বাঁ হাতের মাংস সমেত নিয়ে পড়ল—সেইখানেই শেষ হয়ে গেল ভালুকটা।

সর্দার বলেন—এ-সব বনে হয় বাবু। ওসবে ডরাই না, ডর লাগে ওই গণেশঠাকুরকে, ওখানে করার কিছুই নাই।

হাতিকে এরা সবাই ভয় করে—এড়িয়ে চলে ওই জীবটিকে। দল বেঁধে ওরা থাকে, আর বুদ্ধিও ওদের বেশী।

বলেন সর্দার—সবই কমে গেইছে বাবু। বনও যাবেক—ওঁনারাও যাবেন। মানুষ লুভী হয়ে উঠ্‌ছে। ছা গুলান কথা শুনে না। আজকাল যেন বদলে গেছে উরো। মাথা ঠাড়ো হইছে।

ওঁর কথায় বেদনার সুর জাগে। একালের অস্থিরতা আর লালসার ছায়া পড়েছে এই বনের গভীরেও। বলেন সর্দার,

—এককালে ইসব ছিল আমাদের। বনের কাঠ-মধু-মোম-ফল-পাকড়, মায় জমিজারাতও। লাক্ষা হতো—ধান হতো, দুধ পেতাম। আজ আকাল আইছে। তবু যদি লুকজন আসে—রাস্তা-ঘাট হয়, এখানের লুক দুটা পসা পাবেক। খেতে পাবেক—কাজ-কাম পাবেক। পড়ালিকা শিখবেক—

ওরা চায় এখানে মানুষ আসুক। এই সভ্যতার ছোঁয়া এড়িয়ে আর থাকা যাবে না। একে গ্রহণ কবতেই হবে। বলি ঃ তাতে খারাপও হবে সর্দার।

—সি-তো হবেকই বাবু। তবে, তার সাথে সাথে ইরাও বাঁচবেক। তাই বলেছিলাম শহরের বাবুদিকে, তুরা রাস্তা বানাই দে—লে কেম্নে কতো দুধ—কতো তরকারী-ফসল লিবি। তা আমাদের কথা কে শুনছে? মনে ছিল আমাদের দিন-তো কাটলো—ইবার নোতুন জোয়ানগুলান ইসব কথা ভাববেক। কিন্তু, তা কই হল?

নিজের নিজের লাভের জন্যেই সব মেতে উঠলেক। বাইরে যেয়ে নিজেদের জাত-এর ভালো করার কথা ভাবলেক নাই, মানুষ হল নাই, পাপগুলোকেই নিয়ে এল ইখানে। আর, আমরা যেই কষ্টের মধ্যে ছিলাম— তাই থাকতে হবেক। জল নাই—খাবারও নাই।

ওদের মনে একটা হতাশা আজও রয়ে গেছে। ওরা যা পাবার তার কিছুই পায়নি। জলের খুব অভাব, অথচ বনে বনে—পাহাড়ে অনেক ঝর্না আছে। সেগুলোকে জোড়-বাঁধ দিলে সারাবছর জল থাকবে। আর, জল পেলেই ও মাটিতে সোনার ফসল ফলবে। এর বেশি কিছু চাওয়া নেই।

আজকের সর্দার অতীতের কাহিনী শোনান, এই বন-পাহাড়ের কাহিনী। পুরুলিয়ার অতুলবাবু-নিবারণবাবুদের মুক্তি-সংগ্রামের কথাও জানেন তিনি। তিনিও সামিল হয়েছিলেন সেই সংগ্রামে কতো বিপ্লবীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এই বন-পাহাড়ে। বুড়ো বলে,

—হেঁটে গেইছিলাম বটে—শহরে হুই কলকাতাকে। আমরা বাংলাদেশে এলাম। ভালো হল বটে—আগে উরো—ওই সরকারী লুক আসতো—কোথায় খাসিটো—চাল-ঘি আছে দে ভোজ হবেক। এমনিই লিয়ে যেতো। এখানকার বাবুছেলেরা ভালো বটেক, যায়-আসে। খপর লেয়। জিনিসিপত্র লুটে আনতে জানে না. দাম দিয়ে কিনে আনে; নীচে ওষুধখানা হইছে—ভালো হইছে ইদের।

বুড়ো খুশি হয়েছে। তবু আরও কিছু তাদের চাওয়া রয়েছে। সে সামান্যই। ওই জল আর পথ। নিঃস্বার্থভাবে আজও তারা সমাজের মঙ্গল চায়।

ঠিক বাংলা বলতে পারেন না। নিজের ভাষাতেই কথা বলেন। সঙ্গের ছেলেটি বুঝিয়ে দেয়। নিজের সম্প্রদায়ের জন্য কত দরদ—তা বুঝলাম ওঁর কথায়, আর আন্তরিকতায়। বলেন সর্দার,

—ইখানে এসেছিস, বন-পাহাড়—গাঁ-বসতি বুলে যা। দেখা যা—আমাদের কথা বলবি।

কোন রাজনীতির কাঠিন্য নেই—দাবীর চীৎকার নেই। এই বন-রাজ্যের মতই হৃদয়বেদনার সবুজ-শ্যামল স্নিগ্ধতায় ভরা ওর মন। এই পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে ওরা বাঁচতে চায়, ভালোবাসতে চায় তার ওই দেশসীমাটুকুকে, অতি সামান্য নিয়ে সে তৃপ্ত।

মুশাই সর্দার চুপ করে কি ভাবছেন, ওর চোখেমুখে বেদনার ছায়া। এককালে এই বন-পাহাড়ের হাজার হাজার লোকের কথা ভাবতো ওর পূর্বপুরুষ। তাদের বাঁচার প্রশ্ন এত জটিল ছিল না। বন-পাহাড়ের সবকিছুই ছিল তাদের দখলে।

বনের সব সম্পদই ছিল তাদের।

আজ এখানের কোন কিছুতেই তাদের দখল নেই। বাইরে লোক এসে বন কেটে নিয়ে যায়। শিকার করাও বারণ।

তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যও রয়ে গেছে; এই দারিদ্র্যবোধটা সাধারণ আদিবাসীদের কাছে তত প্রকট নয়, কিন্তু তাদের সর্দার তো এসব জানে। অথচ করারও কিছু নেই। তাই হয়তো এই বেদনা। বলেন সর্দার,

—এরা তবু সৎ বাবু! চোর এরা লয়। বাইরে শহরে যেয়ে যেয়ে এরা উসব শিখেছে, তারা ছাড়াও ডুংরীতে মানুষ এখনও আছে, তাদের বাঁচার মত কাজ-কাম দিতে হবেক, চাষ করার জল দিতে হবেক।

নিশীথবাবু এসে বসেছেন, আরও দু'একজন আছে। দুপুরে রোদ ফিকে-হলুদ হয়ে আসছে বনে-পাহাড়ে। ওই দিগন্ত প্রসারী পাহাড়-বনরাজ্যের দিকে চেয়ে থাকি।

এই মানুষটির সঙ্গে এই অসীম নিঃসঙ্গতার কোথায় যেন একটি নিবিড় সাযুজ্য আছে।

রাজু এর মধ্যে আমার ইঙ্গিতে চা বানিয়ে এনেছে। আমাদের সঙ্গেই ছিল বিস্কুট-কলা আর কিছু সন্দেশ, তাই দিয়ে ওদের চা এগিয়ে দিলাম।

মুশাই সর্দার এসব দেখে একটু অপ্রস্তুত বোধ করেন। জানাই,

—সঙ্গে যা ছিল তাই একটু খেতে হবে সর্দার।

সর্দারেব মুখেচোখে কেমন অপ্রতিভ একটা ভাব ফুটে ওঠে। কি যেন ভাবছেন তিনি। ঠিক ওর মনোভাবটা বুঝতে পারিনা। মনে হয়, রাজার বংশ; বাইরে কোথাও হয়ত কিছু খান না ওরা। অথচ বিদেশীকে প্রত্যাখ্যান করতেও দ্বিধা বোধ করছেন।

রাজু এবং আরও দু'একজন আদিবাসী ওদের ভাষায় কি বলতে সর্দার তখন খেতে শুরু করেন। পরিবেশটা সহজ হয়ে ওঠে।

কোথাও কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, নালিশ নেই, তার কথাবার্তায় সেই পরিচ্ছন্ন রুচির বিস্ময়কর ছাপ ফুটে ওঠে।

বিকেল হয়ে আসছে। শীতের বিকেল। হলুদ হয়ে উঠেছে রোদের আভায় পাইনবন। প্রজাপতির ঝাঁক উড়ছে ফুলের ওপর।

সর্দাব হাতজোড় করে বলেন,—একদিন আসবি ঘরে।

আমন্ত্রণ জানান তিনি।

দূর বন-পাহাড় পার হয়ে যেতে হবে, বৃদ্ধকে বিদায় দিলাম। যাবার আগে বৃদ্ধ আমার হাত দুটো তাঁর কঠিন প্রীতিভরা হাতে ধরে নেন। বলেন,

—দেখে যা ইসব। অযোধ্যা পাহাড়, বন ভালো লাগবে তুদের। বড় ভালো জাগা, ভালো লাগলে আবার আসবি কিন্তুক—হ্যাঁ?

পাহাড় বনরাজ্যের অতীতের অধীশ্বর আজ আমার মত ইতিজনকেও যেন এই রূপরাজ্যের প্রঙ্গণে সাদর আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ মাথা উঁচু করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে চলে গেলেন। বনের গভীরে মিশিয়ে গেল সেই বনের মানুষটা। এ-মাটির সঙ্গে—এই বনের নাড়ীর সঙ্গে যারা অতীতের বাতাসে মিশিয়ে আছে বর্তমানের বুকে—ও

তাদেরই একজন। আজ ওদের সব গেছে, তবু অন্তরের বিশালতা হারায়নি।

বিভূতিবাবুর আরণ্যকের কথা মনে পড়ে। রাঙ্গা সর্দারের বংশধররা আজও যেন ইতিহাসের রাজ্য এড়িয়ে —এখানের বনে-পর্বতে বেঁচে আছে।

ওরা চলে গেছে।

একাই বসে আছি বাংলোর বারান্দায়, এদিক ওদিকে ছড়ানো ডেক চেয়ারগুলো। অতীতের আড্ডার নীরব সাক্ষী ওরা।

দেবু আর নিশীথ ভট্টাচার্যবাবুদের সঙ্গে মিশে ওদিকে আঙ্গুরের জাল ঘেরা ক্ষেতে ঢুকে এদিক-ওদিকে ঘুরছে। আঙ্গুর লতার ঘন সবুজ পাতার ঝোপে ওদের দেখা যায় না, মাঝে মাঝে ওদের হাসি ঠাট্টার না হয় গানের দু'একটা কলি ভেসে আসে।

টিয়াপাখীর ঝাঁক কলরব করে বনে বনে ফিরছে। একা এই শান্ত নির্মলনীল নির্জনে ভাবনার অতলে হারিয়ে যাই। এসব ভাবনাগুলোকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাই। কিন্তু আমার নির্জন একাকীত্বের সুযোগ থেকে মনের অতল বঞ্চনার তীব্র জ্বালাটা ঠেলে ওঠে।

সীমার কথা মনে পড়ে।

সেও স্বপ্ন দেখতো কলকাতার বদ্ধ পরিবেশে, মধু বদ্যির একতলার ঘরে আপপাশের বাড়ির উনুনের ধোঁয়া এসে জমতো, আলো নেই। অন্ধকার পরিবেশে আমিও স্বপ্ন দেখেছিলাম তার চোখের আলোয়।

সীমা বলতো—মনে হয়, কোথায় পাহাড়-বনের গভীরে হারিয়ে যাই।

—তুমি পাহাড় দেখেছো? বন? শুধোতাম তাকে।

ওর কালো চোখে কি বেদনার ছায়া। ম্লানমুখে জানাতো সে—না। বাবা বলেছিলেন, একবার দেওঘর যাবো আমরা। সেখানে নাকি পাহাড়-বন সব আছে।

পরক্ষণেই গলা নামিয়ে সঙ্গোপণে বলে ওঠে,

—এ্যাই! তুমিও চলো না তখন? বেশ মজা হবে,পাহাড়-বনে বেড়াতে যাবো?

আজকের এই বন-পাহাড়ের মাঝে অমিও যেন হারানো সেই মেয়েটির সন্ধান করি। তার কথা মনে হয়।

কতোদিন সীমাকে দেখিনি। তার খবরও জানি না। হয়তো কার ঘরে এখন গিন্নী-বান্নী হয়ে রয়েছে। বাচ্চা-টাচ্চার সংসার। সেই যৌবনের ছোঁয়া লাগা উপছে পড়া দেহে এসেছে ভাটার টান। কোন কেরানীবাবুর ঘরে অভাব-যন্ত্রণা আর ছেলেমেয়ের ভার নিয়ে জোয়াল টানছে।

তবু মনে পড়ে তাকে। একটা জায়গায় চিরতরুণে মন থমকে দাঁড়ায়, একই ভাবনার বৃত্তে সে ঘুরপাক খেয়ে নিজের চারিদিকে মাকড়সার মত জাল বোনে, কল্পনার রঙ্গীন জাল। কিন্তু সীমা তবু থাকেনি—তাকে হারিয়ে যেতে হয়েছে।

—বাবু! এ্যাই বাবু!

তন্ময় হয়ে নিজের ভাবনা ভাবছিলাম। কে ডাকছে! হঠাৎ ওর ডাকে আমার ভাবনার জাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।

—কে! চম্‌কে উঠি ওর ডাকে। কালো ডাগর দুটো চোখের চাহনিতে কি একটা মিল খুঁজে পেয়েছি। দেখছি একটা নীরব ব্যাকুলতাকেই।

মেয়েটা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। শাড়ির বাঁধন বাঁধা দুরন্ত যৌবন কেঁপে কেঁপে ওঠে, বুনোঝর্নায় যেন বর্ষার ঢল নেমেছে। বুধিয়া কখন এসে দাঁড়িয়েছে। বুধিয়া বলে ওঠে,

—এতো কি ভাবছিলি বাবু? বহুর কথা? এ্যাঁ।—তা এতই যদি ভাবনা, তবে সাথে আনলি নাই কেনে?

মেয়েটার কথায় বিচিত্র একটা আনন্দের সুর।

জানাই ওসব কেউ নাই।

—নাই। ও যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

কারো জন্য এত নিবিড় করে ভাবতে পারে মানুষ এটা ওর কাছে অজানা নেই। এই ব্যাকুলতার স্পর্শ ওর

সারা মনে। তাই নিজের বেদনা দিয়ে ও বোধহয় আমার অনিচ্ছসত্ত্বেও ফুটে ওঠা নিঃসঙ্গ বেদনার ছায়াটুকুকে প্রত্যক্ষ করছে।

ওর চোখকে আমি এড়াতে পারিনি। ও গম্ভীরভাবে বলে,

—মিছা কথা বলছিস তু! তবে কার লেগে এতো ভাবছিলি?

চুপ করে রইলাম। আমার সেই পরাজয় আর বেদনার কথা ওকে জানিয়ে লাভ কি!

মেয়েটাও ও প্রসঙ্গ তুলল না। ও থামের নীচে বসে কলকাতার গল্পই শুনতে চায়। সেই বিচিত্র কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গেছে ওর সিতাই। সারা মন—সব স্বপ্ন তাকে ঘিরেই। সেই হাসি ভরা মেয়েটির চোখে-মুখে ফুটে এঠে কি বেদনার আভাস।

দু-একটা ময়ূর বন থেকে বের হয়ে ভীরু সাবধানী চাহনিতে এদিক-ওদিকে চেয়ে বাংলোর আশপাশে ঘুরছে। একটা ভীরু খরগোস কান তুলে লাফাতে লাফাতে হারিয়ে গেল ঘাসের বনে।

শান্ত স্তব্ধ রূপময় একটি জগত।

সিতাই মাঝির কথা মনে পড়ে। লোকটাকে দেখিনি—শুনেছি তার কথা। এই সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে, বুধিয়াকে ছেড়ে সে কোন্ নরকে বাস করছে—কি শাস্তিতে জানি না।

বিকেল নামছে। শির্‌শির্ শিহরণ জাগে পাইনবনে, ইউক্যালিপ্টাস পাতার বুক থেকে তীব্র গন্ধ উঠছে, আঙুরের সবুজ লতাগুলো গুঁড়ি মেরে ছেয়ে চলেছে মাচার মত ঠাঁইগুলোকে।

বুধিয়ার কথাগুলো শুনছি।

রাজু নেই—তেল-নুন আনতে গেছে মাইলখানেক মাঠ পার হয়ে অযোধ্যার বস্তিতে। বুধিয়া বলে চলেছে সিতাই-এর কথা।

লোকটাকে আমি দেখিনি, তবু একটা তার ছবি অনুমান করে নিতে পারি। সুন্দর বলিষ্ঠ ছেলেটা—সতেজ শালগাছের মত ঋজু আর প্রাণময়। বাঁশী বাজাতো সুন্দর। তার বাঁশীর লাগ্‌ড়ে সিড়িং-এর সুরেই বোধ হয় বুধিয়ার মন টলেছিল।

পাকদণ্ডী বেয়ে—বনপাহাড় পার হয়ে ওরা যেতো বাঘমুণ্ডির হাটে। সিতাই-এর বাঁশীর সুর উঠতো বাম্‌ণীর ঝর্নার জলের কলস্বরে।

বনে বনে তখন পলাশ ফুটতো, মহুয়া ঝরতো টুপ্‌টাপ্ ছন্দে।

সিতাই-এর সঙ্গে বিয়ের কথায় ওর বাবাই আপত্তি তোলে। বুধিয়ার বাবা বলে,

—সি হবেক নাই। চাল নাই—চুলো নাই উটোর। কাজ-কাম না করবেক। শুধু ছৌ নাচলেই হবে কি? উটা আবার বিহা করবেক।

সিতাই মনে মনে ছিল শিল্পী। বাতাসের সুর, ঝর্নার শব্দ সব মিলিয়ে এই বিশাল পর্বতরাজ্যের প্রাণে সাড়া তুলতো ওর বাঁশীর সুর। বুধিয়ার মনে ভেসে উঠতো ওই সুরের রেশ।

বাঁশীর সুর শুনলেই সে হয়ে উঠতো উৎকর্ণ, মেঘ-দেখা ময়ূরের মত মনে জাগতো সাড়া, মনে হতো তার অন্তরের সব চাওয়াগুলো পেখমের মত মেলে মেলে ফুটে উঠতো ওই বলিষ্ঠ সিতাই-এর সামনে।

তাই বাবার অমতে ও বিয়ে করেছিল। আর সিতাই-এর কুঁড়ে-ঘরখানা যেন ভরে উঠেছিল কি এক পরম পাওয়ায়।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে, দূর পাহাড়ে পড়েছে কালো আঁধার, জমাট বাঁধে। পাখীগুলো কলরব করছে—কুয়াসার ফিকে সাদাটে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব জমেছে উপত্যকার ধানক্ষেতের বুকে।

চুপ করে বসে শুনছি ওর কথাগুলো।

মেয়েটার চোখে অতীতের সেই সুখ-সমৃদ্ধ স্বপ্নসার্থক দিনের ছবি ভেসে ওঠে।

বাঁশীর হারানো সুর ভেসে ওঠে তার সারা মনে, ও যেন কান পেতে সেই সুর শুনছে, বাতাসে চোখ মেলে থাকে। এখুনি যেন বনের ছায়া-অন্ধকার নামা সীমা পার হয়ে বেরিয়ে আসবে একটি বলিষ্ঠ তরুণ।

কিন্তু তা হয়নি।

ওর মনের বেদনাটাকে আমিও অনুভব করতে পারি, আমার মনে পড়ে সীমার কথা, যে অনেকদিন আগে হারিয়ে গেছে। নিজের অর্থহীন ব্যাকুলতায় আজ বিস্মিত হই!

কি এর সার্থকতা, জানি না।

বুধিয়া বলে চলেছে।

—বড় ভালো লুক ছিল সিতাই, বাবাটো কিছু দিলেক নাই, নাই দিল। তবু সবই পেয়েছিলাম বাবু, সিতাই আর আমি ঘর বাঁধলাম। গায়ে-গতরে খেটে সিতাই জমি বানালেক, চাষ বাস করলেক—ত অকালে সবই গেল। মাটি শুখাই গেল সিবার কোঁয়ার জল শুখাই গেল—

ওদের ভালোবাসার জগতের সব সবুজ ফুরিয়ে গেছে সেদিন। তবু দুটি প্রাণী বাঁচতে চেয়েছিল দুজনকে কেন্দ্র করে।

—এই ভালোবাসার স্বাদ আমি জানি না, সীমা তার কোনও মর্যাদা দেয় নি। সে হয়তো অন্য কোন লোভনীয় প্রস্তাবে সব ভালোবাসার অধ্যায়-এর পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে চলে গেল তার স্বপ্নে দেখা অন্য কোন জগতে।

সিতাইও এই সবুজ ডুংরীর পথ ভুলে গেছে। মহানগরীর জীবনের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়েছে। নয়তো কোথায় চা বাগানে না হয় কোন কোলিয়ারীর অতল অন্ধকারে তার পথ হারিয়ে গেছে।

ও জানে না কি ব্যাকুল স্বপ্ন নিয়ে একটি মেয়ে তার পথ চেয়ে আছে।

বুধিয়া বলে—কষ্ট-দুঃখকেও সইতে চাইলাম বাবু। কিন্তু ওই রতনাই সিতাইকে বলে—কাজ পাবি, টাকা পাবি, ঘরকে টাকা পাঠাইবি—থোক কামাই করে নিয়ে আসবি। চলে যা কেন্নে।

উই রতনাটাই শয়তান—বদ লুক বাবু।

মেয়েটার বুক দীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে, ওর চোখ দুটো ছল্-ছল্ করে ওঠে কি এক বেদনায়, পরাজয়ে আর অপমানে।

আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। হাতিনাদার শালবনে পাখীগুলো কলরব করছে। ঘরে ফিরে চলেছে মাঠ থেকে গরু-মোষের দল। ছাগল-ভেড়াগুলো চীৎকার করছে। প্রতিটি শব্দ এখানে স্বতন্ত্র, স্পষ্ট। বাতাসের শব্দটা এখানে মুখর। বুধিয়ার জীবনেও যেন এমনি আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছিল তারা।

সিতাই-এর সংসারে তবু অভাব মেটে নি। তাদের একঘরে করে রেখেছিল—কাজকর্মও ছিল না।

বুধিয়া বলে—মানুষটো কাজ করতে গেলো, তখন না করছিলম। বলছিলম আমিও সাথে যাই। কিন্তু সি বললেক—তু থাক ইখানে বুধনি, আমি আবার তাহলেই ঐ বনে-পাহাড়ে ফিরে আসবো! খপরও দিইছিল—টাকা পাঠাইত হুই ডাকের বাবুর কাছে; কিন্তু তারপর আর খবর এলো নাই। লুকটো কি জানি কুথায় হারাই গেল—

শূন্য উদাস চাহনিতে সে দূর আঁধার নামা দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে। দু'চোখের কোলে জল নামে। এখনও সে সেই হারানো মানুষটার সন্ধান করে। বিশ্বাস করে কোন দিন সে ফিরে আসবে আবার।

শাড়ির ভাঁজ থেকে বের করে জীর্ণ মলিন একটা পোস্ট কার্ড, তার ছাপও বোঝা যায় না। বারাসাতের কাছে একটা ইটখোলার নাম রয়েছে।

—একটো চিঠি লিখে দিবি ইখানে? কলকাতায় ঘর তুদের—সিতাইকে চিনতে পারবি গেলেই, সরেস বাঁশী বাজায়—মাদল বাজায়। দগ্ড়ে সিড়িং লাগ্ সিড়িং, বহা সিড়িং, সব জানে উ।

সহজ-সরল মেয়েটার থমথমে মুখের দিকে চেয়ে থাকি। এখন সিতাই তার মনের প্রধান পুরুষ। কিন্তু কলকাতায় সিতাই-এর এসব কিছুর কি দাম!

ও জানে না সভ্যজগতের মানুষের কাছে সিতাই একজন মাটিকাটা কুলি মাত্র। ওই বিভিন্ন সিড়িং-এর সুরের কোন মর্যাদা নেই সেখানে। সিতাই সেখানে ইতিজ্জন মাত্র।

সেখানের মানুষ সুর ভুলেছে, তারা হৃদয়হীন পাথর হয়ে গেছে, কোন সবুজ স্নিগ্ধতার স্পর্শ সেখানে নেই।

তারই ছোঁয়ায় সিতাইও পাথর হয়ে গেছে, নইলে সে ফিরে আসতো বুধনীর কাছে, এই বনের শ্যাম ছায়ায়; এপথ সে ভুলে গছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে, পাহাড়ের মাথার আড়াল থেকে রূপালী থালার মত চাঁদ জেগে ওঠে, শিশির-ভেজা বাতাসে ওঠে মিষ্টি সুবাস। বনের ফুল—চন্দনের গাছগুলোর হালকা গন্ধ—ইউক্যালিপ্টাস পাতার তীব্র সুবাস, সব মিশে একটি গন্ধময় আবেশ জাগে—পাখী ডাকে। বৌ কথা কও, চন্দনা, বাজবৌরী, বনতিতির-এর ডাক আলাদা হয়ে ফুটে ওঠে। দু'একটা ময়ুর ডাকছে। শব্দ-গন্ধ-বর্ণময় এই শান্ত জগৎ।

ওকে বলি—কাল আসিস, চিঠি লিখে দোব।

মেয়েটা খুশী হয়ে চলে গেল। একাই অন্ধকারে যেন হারিয়ে যাই।

শীতও পড়েছে। কনকনে পাহাড়ে শীত। ফরেস্টের ক'জন ছেলেও এই সময় এসে জোটে, বসবার ঘরে আড্ডা জমে, গ্যাস-এর মৃদু আলো ডিসটেম্পার করা ঘরখানায় কি ছায়া আনে। বনের রহস্যময় জীবনের সঙ্গে এঁরা পরিচিত। এঁদের কেউ কাটিয়েছেন সুন্দরবনের গহনে, কেউ বেশ কয়েক বছর বাস করে এসেছেন তরাই শুক্নার বনে। সিল্‌ভিকালচারিষ্ট মিঃ ভট্টাচার্য তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন,

—এ বনরাজ্যকে সুন্দর করে তোলা যায়। ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা জায়গায় এঁরা এ বনের যত রকম সিজন ফুলের গাছ আছে এনে লাগিয়েছেন—ফুলের সেই গাছগুলোকে দেখেছি। মনে পড়ে আরণ্যকের বিভূতিবাবুর সৃষ্ট চরিত্র যমুনাপ্রসাদের কথা, সেও চেয়েছিল সরস্বতী কুন্তীকে মনের মত করে সাজিয়ে তুলতে। পাখীরা আসবে—ক্ষণিকের জন্য আসবে বনহরিণীর দল, ডাগর কালো চোখ মেলে তারা চাইবে। মানুষের চোখে সুন্দরতর হয়ে উঠবে প্রকৃতির রাজ্য।

নিশীথেব কথাগুলো মনে পড়ে।

মুখার্জিবাবু অনেক বাস্তববাদী লোক। সে বলে চলেছে তার জীবনের দু-একটা ঘটনা। বন-নির্জনে বন্দী এই মানুষগুলি বান্ধবহীন পরিবেশে দিন কাটায়। হঠাৎ তারা সন্ধ্যার আসর জমাতে পেরে যেন খুশী হয়েছে মনে মনে।

মুখার্জিবাবুর বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরে, বদলির চাকরী। নর্থ-বেঙ্গলের বন ছেড়ে তাই আসতে হয়েছে বাংলার দূরতম অঞ্চলের এই পুরুলিয়ার বনে-পর্বতে।

মুখার্জিবাবু বলে চলেছে,

—বান-তো হুড়মুড়িয়ে এল মশায়, চড়-চড়িয়ে জল বাড়ছে, পালা পালা ব্যাপার।

—বৌদি তখন কোথায় দাদা, প্রদীপ ফোড়ন কাটে।

ধমকে ওঠে মুখার্জিবাবু—চোপ। বৌদির খপরে দরকার কি বাবা। গিন্নী তখন স্কুলবাড়ির দোতলায়। যা পেয়েছি মালপত্র তুলেছি সেখানে। সোঁ সোঁ শব্দ উঠছে, সারা তিস্তা যেন ঘরে ঢুকবে এসে।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল গিন্নীর —ওগো, হাঁসগুলোকে আনো! ঘরের মধ্যেই রয়েছে তারা। কি করি, নামলাম আবার; জল তখন হাঁটু ছাড়িয়ে কোমব পার হয়েছে আর তেমনি স্রোত, যেন টেনে নিয়ে গিয়ে করলা নদীতেই ফেলবে।

তবু এগোলেন? শুধোই।

প্রদীপ মন্তব্য করে।

গুরুবাক্য শুনতেই হবে। বৌদি বলেছেন সুতরাং না মেনে উপায় আছে?

ভট্টাচার্য হাসছে। মুখার্জিবাবু ওর দিকে কট্‌মটিয়ে চাইল। তবু গল্প ঠিকই চলেছে।

—আরে মশাই, জল ঠেলে গিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছি, জাম হয়ে গেছে। কোন রকমে ধাক্কা-ধুক্কি দিয়ে খুললাম দরজা, হাঁসগুলো মুখিয়ে ছিল, স্রোতের টানে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে বেরিয়ে এল মশাই। অন্ধকারে নিমেষের মধ্যে হাওয়া, ধর ধর! প্যাঁক প্যাঁক করে ভেসে গেল মশাই।

অন্ধকারে সেই স্রোতে হাঁস ধবার দৃশ্যটা কল্পনা করি, তুচ্ছ ব্যাপার তবু নির্জন বনবাসে সেই স্মৃতিই ওদের কাছে অক্ষয় হয়ে আছে।

প্রদীপ বলে—ফিবে এসে বৌদির কাছে ধ্যাতানিটা কেমন হ'ল বলুন?

—থামবি তুই? ফাজিল কোথাকার।

প্রদীপ বলে ওঠে—ভালো করে শোন নিশীথ, তোব এবার ঘর বাঁধার পালা। এইসব করতে হবে—হাঁস-মুরগী এইসেট্রা।

নিশীথ হাসছে।

বাইরে জ্যোৎস্নার ঝলমলে আলো। হাতিনাদার বনে বনে জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকার একটানা শব্দ ওঠে। দেখা যায় কালো মত একটা লোমশ মূর্তি দু'পায়ে টলমল করতে করতে ঘন পাইন বনের আড়ালে চলে গেল বাংলোর বারান্দা থেকে নেমে।

ছায়ামূর্তিটার পিছন দিকটা দেখেছি। একটা ভালুক। বনের কর্মচারীরা বলে—ওরা মাঝে মাঝে খাবার-এর সন্ধানে আসে। তবে ভয়ের কিছুই নেই।

ভালুক এসে এইভাবে হানা দেবে জানতাম না।

চুপ করে থাকি। ভরসারই বা কি আছে তা জানি না। দাশ বলেন খাঁকিকে ওরাও ভয় করে। তাই উৎপাত কবে না এখানে। খাবারের সন্ধানে আসে মাত্র।

রাতের অন্ধকারে ওদের যে এসব চারণভূমিতে পরিণত হয় সেটা ভেবেই নিয়েছিলাম।

তবু জ্যোৎস্নায় মাখামাখি ওই বন-পর্বতের অপরূপ রূপরাজ্যের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। কোথাও কোন সাড়া নেই—ঝিঁ ঝিঁ-র একটানা ডাক ভেসে আসে, তাতে মিশেছে রাতেব বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ।

চাঁদের আলো যেন গলে গলে পডছে ওই হিমজমা রাত্রির অন্ধকারে। দু'একটা ঘুমভাঙ্গা পাখী হঠাৎ ডেকে উঠে আবার থেমে যায়।

পাহাড়ের নীচেকার ডুংরীতে কামতাপ্রসাদের ডেরার আলো নিভে গেছে, তবু ওদিক থেকে মদ্যপানজড়িত কণ্ঠের সুর শোনা যায়। বেতালা মাদলেব শব্দ ওঠে। হঠাৎ কানে আসে কঠিন একটা শব্দ।

—ঠাস্-ঠা-স্-ঠাস্।

বন-পাহাড়ের স্তব্ধতা ছাপিয়ে ওই কর্কশ শব্দটা তালে তালে উঠছে। ওরা চমকে ওঠে। বনবিভাগের তরুণদের কাছে ওই শব্দের একটা গূঢ় অর্থ আছে। ওরা চেনে ওই শব্দটাকে। জানে এই শব্দটার একটি বিশেষ অর্থ আছে।

নিশীথ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। ওর চোখে-মুখের ভাব বদলে গেছে। বলে ওঠে সে,

—শুনছিস প্রদীপ?

প্রদীপও শুনেছে শব্দটা। নিশীথ বলে,

—মুর্গাবানির ডুংরীর দিক থেকে শব্দটা আসছে। বড় বড় অনেক মুর্গা গাছ আছে ওখানে। দামী কাঠ, সেগুনের মতই কাঠ, আর দরও তেমনি। এক একটা গাছের দাম প্রায় দুশো টাকার মত। সেই গাছই চোরাকাটাই করছে কারা এই রাতের গহনে—সেই দুর্গম বনে। মুখার্জিবাবু বলে—ব্যাটারা ঠিক এসেছে তাল বুঝে, ট্রাকও এনেছে, বোধহয়।

নিশীথের দু'চোখে জ্বলছে। ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে সে।

—চল, দেখে আসি ব্যাটাদের! গার্ডকজনকে নিয়ে চল, ওই ঝর্নাতর পথ দিয়ে বনের মধ্যে এগোবো। প্রদীপ কি ভাবছে। এসব কাজে বিপদ আছে, ওই চোরাকাটাই-এর দলও তৈরী হয়ে আসে। তির-ধনুক-বল্লাম-তো ওদের সঙ্গে থাকেই—কুড়ুলও চালিয়ে দেবে এ সময় বাধা পেলে।

ওরাও সজাগ দৃষ্টি রেখে এসব কাজ করে। নিশীথ কি ভাবছে।

ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইলার সেই চাহনি, কি বেদনায় ভরা মুখখানা। ও তাকে বলেছিল।

—আর কতোদিন এভাবে চলবে।

নিশীথ তাকে কথা দিয়েছে—প্রমোশন এবার হবেই। আর, তখনই তারা ঘর বাঁধবে। নোতুন বাসা পাবে—বনের বাইরে কোন লোকালয়ে।

ওই চোরাকাটাই-এর দলকে ধরতে পারলে তার জীবনে সেই চরম লগ্ন এগিয়ে আসবে। তারা সুখী হবে। ইলার চোখে ফুটবে হাসির আলো, নিশীথের সামনে ওই একটি ভাবনা তাকে আরও দুর্বার আর সাহসী করে তোলে।

নিশীথ বলে—তাহলে চল, বন্দুক নিয়েই যাবো।

মুখার্জিবাবু এসব গোলমাল পছন্দ করে না, নিরীহ আলুভাতে মার্কা লোক। ওই তাজা জোয়ানদের মত তার রক্ত হুট করে গরম হয় না। তাই বলে সে,

—রাতেরবেলায় যে যা করে করুক, গাছটা কেটে রাখবে কাল সকালে গিয়ে আমরা তুলে আনবো।

প্রদীপ হাসছে। ও শোনায়,

—তারপর আবার ওই চোরাকাটাই দলের বাপ-জ্যাঠাকে অফিসিয়ালি দুশো টাকার কাঠ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করে দোব ঘাড়ে করে এনে।

নিশীথ দৃঢ়স্বরে জানায়।

—কখনো না। চল প্রদীপ।

গার্ডরা কয়েকজন তৈরী হয়ে এসেছে। নিশীথও এর মধ্যেই প্যান্ট-সার্ট-সোয়েটার পরে ডবল ব্যারেল বন্দুক নিয়ে কার্টুজের বেল্ট লাগিয়ে তৈরী। প্রদীপ আর ভট্টাচার্যও রয়েছে বন্দুক নিয়ে।

আমারও ইচ্ছে হয় ওদের সঙ্গে যেতে। রাতের অন্ধকারে বনরাজ্যে এভাবে কখনও যাইনি, মনে হয় এ-বনে শুধু হিংস্র জানোয়ারই নয়—তার চেয়েও হিংস্র জীবদেরও আনাগোনা আছে।

বলি—আমরাও যাবো।

নিশীথবাবুই বাধা দেয়—না। এ অবস্থায় এ্যাকসনে আপনার যাওয়া ঠিক হবে না।

ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। এপাশের হাতিনাদার গভীর জঙ্গলে ওদের ছায়ামূর্তিগুলো হারিয়ে যায়।

স্তব্ধতা নেমে আসে বাংলোয়। এতক্ষণ জায়গাটা গমগম করছিল। সেখানে এখন থম্‌থমে ভাব নেমেছে।

ওপাশের বারান্দায় চাঁদের আলো নেই, ওদিকটা অন্ধকার। সামনেই একটা ঘনপাতা ঢাকা ভালাই গাছের প্রহরা। ওদিকটায় আমরা বড় একটা যাই না। হঠাৎ এখানে খস্ খস্ শব্দ হতেই চমকে উঠি। আমি আর দেবু দাঁড়িয়ে আছি, রাজু চৌকিদারও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কে জানে, একটু আগে যে ভালুকটা এসেছিল সেইটাই ফিরে এসেছে বোধহয়।

চাইতেই দেখি, একটা ছায়ামূর্তি বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ঘন পাইনবনের মধ্য দিয়ে দৌড়াল।

রাজু চৌকিদারও তৈরী ছিল, সেও দৌড়েছে ওর পিছু পিছু। একটা ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা যায়। আমরা প্রথমটা ভেবে উঠতে পারিনি, কি আমাদের কর্তব্য। রাজুকে ওর পিছেনে দেখে ভরসা পেয়ে আমরাও দৌড়ালাম ওইদিকে।

ততক্ষণে কাজ সারা হয়ে গেছে।

রাজুর হাতে একটা ময়লা চাদরের মত কি খানিকটা, সেইটা হাতে নিয়ে গজরাচ্ছে সে। তার হাতেই লোকটা সটান কামড়ে রক্ত বের করে দিয়েছিল ধরা পড়তে। রাজুও ছেড়ে দিয়েছে প্রথমে ওই অতর্কিত আক্রমণে। সেই সুযোগে লোকটা ছাড়া পেয়ে সটান বনের মধ্যে দিয়ে দৌড়েছে—গায়ের চাদরটা সামলাতে পারেনি। ওটা রয়ে গেছে রাজুর দখলে।

—রক্ত পড়ছে যে রে? দেবু ওর হাতটা দেখে বলে।

রাজুর ওর জন্য আপশোষ নেই। ও গজরাচ্ছে।

—ধরতে পারলাম না বাবু লুকটাকে। ফিচ্‌কে, পালাই গেল।

ওকে বাংলোয় নিয়ে এসে দেবুই ডেটল দিয়ে মুছে দিল জায়গাটা। চাদরটা ময়লা চিটকেনি, খদ্দরের মোটা

চাদর, তাতে কলকার বাহারী কাজ করা, ওটাকে দেখে চিনতে পারি তবু ওর মালিককে হাতেনাতে ধরতে পারলাম না।

লোকটা নিশ্চয়ই কোন চুরি-টুরির মতলবে এখানে এসেছিল।

বলি—চাদরটা রেখে দাও। কাল দেখা যাবে।

রাত হয়ে গেছে।

ওই নিশীথবাবুর দল তখনও ফেরেনি। এতক্ষণ এইসব ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এইবার ওদের কথা মনে পড়ে।

কান পেতে শুনি, গাছ কাটার শব্দটাও আর উঠছে না। সারা বনভূমিতে স্তব্ধতা নেমেছে। ঘুমুতে পারি না। ওই ছেলেদের মধ্যে ক'দিন এসে মনে হয়েছে ওরাও আপনজন। ওদের এই দুঃসাহসিক অভিযানের আমিও সাথী। প্রাণ হাতে নিয়ে ওরা সেই ডাকাতদলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেছে।

সিগারেট টানছি ওই চাঁদের আলোঢাকা বনের দিকে চেয়ে। হঠাৎ ওদের গলার শব্দ শুনতে পাই বনের মধ্যে, টর্চের আলোর আভা ঝল্‌সে ওঠে।

ওরা বের হয়ে আসছে বন থেকে। চোরাকাটাই-এর দল আগেই সরে গেছে। ওরা সেখানে গিয়ে কাউকেই দেখতে পায়নি, দেখেছে বিরাট একটা আধকাটা গাছ তখনও কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে।

মুখার্জিবাবু বলে—পালিয়ে গেছে ব্যাটারা।

নিশীথ গজগজ করে—গুলি করেই মারতাম দু'একটাকে। ধরা পড়তো দলটা নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যাডলাক। শুয়ে পড়ুন দাদা—রাত হয়ে গছে।

ওরা চলে গেল ওদের কোয়াটারের দিকে। রাত তখন প্রায় একটা বাজে।

তবু ঘুম আসতে দেরী হয় না। সারাদিন বনে- পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করায় ক্লান্তি সারা দেহে, ঠাণ্ডাও জমে রাতের সঙ্গে সঙ্গে।

একটা লেপের ওপর র‍্যাগ চাপিয়ে আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছি। মনে হয় কলকাতার কথা। সেখানেব পথে পথে এখনও লোক চলছে। ইভনিং শো-এর পর লোকজন কলরব করে ট্রামেবাসে উঠছে—শ্যামবাজারের মোড়ে পানের দোকানগুলোয় ঝলমলে আলো জ্বলে, ট্রাকগুলো পাহাড় প্রমাণ মাল নিয়ে ছুটে চলেছে।

আর এখানে কর্মব্যস্ততা নেই, আছে শুধু অন্তহীন স্তব্ধতার জগৎ। পাখী ডাকে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে চাঁদের আলোয়, এ জগৎ স্বপ্নের অসীমে হারিয়ে যায়। মানুষের চাওয়া-পাওয়ার হাহাকার এখানে পৌঁছে না—কি সম্পদে এব অন্তর পূর্ণ—সমৃদ্ধ।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভেদ করে কলরব ওঠে, কতকগুলো মানুষের ক্ষীণ কলরব। মাদল-ক্যানস্তারা টিন পেটার শব্দ ওঠে—মশাল জ্বেলে ওরা চীৎকার করছে।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠেছে রাজু চৌকিদারও। মুখে-চোখে ওর জমাট আতঙ্ক। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বলে।

গণেশঠাকুর বটে স্যার। ধান খেতে আইছে হাতি।

বুনো-হাতির পাল মাঝে মাঝে ওদের ধান-মকাই ক্ষেতে হানা দেয়। ভালুক আসে মহুয়া আর কুল পাকলে। লোকালয়েও ওরা হানা দেয়।

বনপর্বতে ওদের অব্যক্ত আতঙ্ক জড়ানো চীৎকার ধ্বনি- প্রতিধ্বনি তোলে, মশালের আলোর আভা উঠছে, ওপাশের কোন গাছের টং থেকে কারা চীৎকার করছে, পাহাড়-বস্তীর আদিম মানুষগুলো যেন অসহায় আতঙ্কে চীৎকার করছে প্রাণপণে।

খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় - -কালো ছায়ামূর্তির দল এগিয়ে আসছে ধানক্ষেতের দিক থেকে। চাঁদের আলোয় হাতিগুলোর বলিষ্ঠ সুন্দর সুঠাম দেহগুলো দেখা যায়। সঙ্গে একটা বাচ্চাও রয়েছে, বিস্মিত চাওনিতে আমরা চেয়ে আছি ওই বন্যযুথের দিকে। রাজকীয় ভঙ্গীতে ওরা আসছে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে। ভয় আর

জমাট আতঙ্ক সারা মনকে ভরে তোলে।

ওরা যদি এদিকে আসে তাহলেই বিপদ, জানালার গরাদগুলো শুঁড় দিয়ে টানলে দাঁতন কাঠির মত ওগুলো উঠে যাবে, শুঁড় বাড়ালেই বিপদ।

গা ঘসে গেলে খসে পড়বে জানালাগুলো। আমার ওদের দিকে চেয়ে থাকি, মৃত্যুর কালোছায়ার মত এগিয়ে আসছে ওরা। মাত্র কয়েক শো গজ দূরে এসে পড়েছে।

সামনেই গেট। কাঠের গেটটা ওদের লাথিতে ছিটকে পড়বে এইবার। ওরা এসে পড়বে বাংলোয়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তারা। শুঁড় তুলে বাতাসে কিসের গন্ধ শুঁকছে।

কি ভেবে ওরা ওপাশেব হাতিনাদার বনের ঢালু পথে নেমে গেল, হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

বনের সেই স্তব্ধতা আবার ফিরে আসে—কোথাও কোন অশান্তির লেশমাত্র নেই। চাঁদের আলোভরা পর্বতসীমার রাজ্যে এ বোধহয় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এখানের মানুষগুলোর সঙ্গে তারাও বেঁচে আছে এই বনের অংশ হয়ে।

—তবু এখানেও পরিবর্তন আসছে। এ পরিবর্তন কালের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে আসে। এ পালাবদল দিনবদল ঘটে বেদনার সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই।

সকাল হয়েছে।

সোনালী মিষ্টি সকাল, পাখীগুলোর পালা গান-এর প্রথম পর্ব চুকে গেছে, এবারে আসরে এসে জমেছে রঙ্গীন প্রজাপতির দল। ফ্লাওয়ার বেডের নানা রঙের ফুলের সঙ্গে ওদের রং মিলিয়ে গেছে।

শিশির ভেজা পাইন-এর পাতায় বিন্দু বিন্দু মুক্তা যেন ঝলমল করে আলোয়।

বাইরের পোর্টিকোয় চায়েব আসব জমেছে।

সেই সঙ্গে কালকের রাতের অভিযানের কথাও ওঠে। গতরাতে লোকটার পালানোর বিষয় নিয়ে আমার মনেও সন্দেহ হয়েছিল। নিশীথও বলে,

—বোধহয় ওই লোকটা চোরাই কাঠ কাটাইওয়ালাদেরই কেউ। এখানে আগে থেকেই এসে ওই কোণে আশ্রয় নিয়েছিল, নজর রাখছিল আমাদের উপর।

কিন্তু ওই চাদর দেখে তেমন কাউকে শনাক্ত করা চলে না। প্রদীপও সায় দেয়,

—তা হবে বোধহয়, তাই বলেছিলাম নিশীথ রাতে ওভাবে বনে ওই সময় যাস নে। ভেরি রিস্কি।

নিশীথ চুপ করে থাকে। মুখার্জিবাবুও বলে,

—সত্যিই। এত গোয়ার্তুমী ঠিক নয়।

নিশীথ ওদের কথায় কোন মন্তব্য করলো না। চুপ করে কি ভাবছে। হঠাৎ সেই-ই বলে।

—চলুন, আজ নামো ডুংরীর দিকে একটু ঘুরে আসি। ওখানে তরিতরকারীর চাষ কিছু হয়। বেগুন, সিম, মূলো, টম্যাটোও কিনে আনা যাবে। মুরগীও মিলবে।

আমিও রাজী হয়ে যাই। ওসবের দরকার—তাছাড়া একটু ঘোরও হবে।

নিশীথ বলে চলেছে,

—ওখানে যদি দেখা পান—আর একজনকেও দেখবেন। মুশাই সর্দারকেও দেখেছেন। একেও দেখে আসবেন। অবশ্য দর্শন যদি মেলে, এর দর্শন সব সময় পাবেন না। ইনি সত্যিই 'বিজি'।

প্রদীপ হাসছে, বলে ওঠে নিশীথের কথায়।

—তা যা বলেছিস! একখানি জিনিস।

একটু অবাক হই অদৃশ্য সেই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে এমনি মন্তব্য শুনে। তাই আমারও কৌতূহল বাড়ে, বলি,

—তাহলে চলুন, দেখেই আসি তাকে।

পাইনবনের পর ধানক্ষেত কিছুটা, সেই শিশির ভেজা ধানক্ষেত পার হয়ে সোজা পথ ধরে চলেছি আমরা। সামনে বস্তির ওখানে বড় চালাঘরটার সামনে গরুর গাড়িতে ধান, মকাই, চিনেবাদাম এসেছে।

কামতাপ্রসাদজী একটা টুলে বসে যুৎ করে দাঁতন করছে। ওদিকে লোকজন মালপত্র গোছ করছিল—আমাদের এইসময় ওর অস্থায়ী ওই ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যেতে দেখে একটু অবাক হয়ে সে।

—রাম রাম বাবুজী!

কামতাপ্রসাদ শুধোয়—এদিকে চলিয়েছেন কোথায়? থোড়া চা তো পিয়ে যান। এ দৈতরী! বাবুলোক এলেন—থোড়া মালাই চা তো বানাও ।

লোকটা হাসছে। প্রদীপই বলে।

—এখন একটু কাজ আছে শেঠজী। চলি।

ওই কোনরকমে এই যাত্রা আমাদের ওর খপ্পর থেকে বের করে আনে। কামতাপ্রসাদ বোদা মুখ করে চেয়ে থাকে। ও যেন কি মতলব ভাঁজছে।

মুখার্জিবাবু বলে। লোকটাকে কেন চটালি বাপু?

—তাহলে তুমি মালাই খাও দাদা। রঞ্জনবাবুরাও শুনেছি আসেন ওখানে চা খেতে।

মুখার্জিবাবু নিশীথের কথায় যেন খুশী হল না। বলে সে। বনে-পাহাড়ে চাকরী, লাভ কি-যাকে-তাকে চটিয়ে বল? যদি একটু চা খাইয়ে খুশী হয়।

—তারপর নিজের কাজ হাসিল করার তাল খুঁজবে। ওরা কানে জল দেয় কানের জল বের করতে। বুঝলে?

—কামতাপ্রসাদ সম্বন্ধে নিশীথের ধারণা একটা রয়ে গেছে। সেই ধারণাটা অনেক স্পষ্ট, আর হয়তো সত্যি।

বসতির দু'-একটা ঘর শেষ হয়ে গেছে। তারপর, খানিকটা ডাঙ্গায় সরষের ক্ষেত। নীচের পাহাড় উপত্যকা ঘন বনে ঢাকা। পায়ে চলা পথ ধরে আমরা ওই বনের দিকে চলেছি। প্রদীপ আর মুখুয্যেবাবু বনের ওদিকে কোথায় কাজে চলে গেল। অসময়ে আমাদের দেখে দু'-একটা বন-ময়ূর মাঠে চরছিল ডানা মেলে দৌড়ে সরে যায়।

কামতাপ্রসাদ যেন এই বনরাজ্যে বেমানান একটি জীব।

চলেছি আর কার সন্ধানে। মুশাই সর্দারের কথা মনে পড়ে। ও নিজে থেকে এসেছিল, এই প্রাণীটি কিন্তু ওই বাংলোর দিকে হাঁটে নি, দেখাও করতে যায় নি।

বনবাজ্যের মানুষদের অনেককেই দেখেছি, এই প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একটি নিবিড় সাযুজ্য রয়ে গছে। এই মাটি, পাহাড়, বনকে তারা ভালোবাসে। এর জীবনের সঙ্গে তাদের অজান্তেই জড়িয়ে ফেলেছে।

সিতাই মাঝির কথা মনে পড়ে। বুধনী যেন এই পাহাড় বন-রাজ্যের ভেসে যাওয়া সুর, সিতাই তাকে ভুলে গেছে। বুধনী কিন্তু আজও তাকে ভোলে নি।

সিতাই মাঝির কথা ভাবলে মনে হয়, ওরাই এখানের আগামীকালের মানুষ, যারা এই প্রকৃতির ভালোবাসার সৌন্দর্যের দামটাকে অস্বীকার করে সরে যায়।

বুধনীরা এ মাটির অসহায় রূপ—ওরা বাতাসে বাতাসে কান্নার সুর মিশোয়। বুকচাপা সে কান্নার প্রকাশ এর ফুলগন্ধে—ভ্রমরের কানাকানিতে —রাতজাগা পাখীর কলকাকলিতে।

অযোধ্যার বসতির পরই মালভূমি বেশ কিছুটা নেমে গেছে। ফাঁকা সবুজ একটু জায়গা, সেখান থেকে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমেছে, সামনে বিশাল বনরাজ্য, চারিপাশে তার উঁচু উঁচু আকাশছোঁয়া পাহাড়।

একদিকে জিপের রাস্তাটা এঁকেবেঁকে বনের মধ্যে ঢুকেছে, দু'দিকে শাল, হরিতকী, বহেড়া আর কুসুম গাছের ঘন ছায়া-প্রহরীর দল, নির্জনতার মাঝে পথটা স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে, নিশীথ বলে,

—ওইটা শির্কাবাদ যাবার পথ।

বনের মধ্যেকার পথ বেশ শক্ত আর মজবুত। শির্কাবাদ দেখা যাচ্ছে দূরে, পাহাড়ের পাদদেশে সেই জনবসতি—তার কিছু দূরেই পাহাড় সীমা শেষ হয়ে শুরু হয়েছে উষরপ্রান্তর, মাঝে মাঝে ছড়ানো-ছিটোনো বস্তি। পুরুলিয়ার দূরত্ব শির্কাবাদ থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল, এখান থেকে শির্কাবাদ সাত মাইল।

এই পাহাড়-বনের সাত মাইল পার হয়ে সমতলে পিচঢালা পঁচিশ মাইল রাস্তা পার হলে পুরুলিয়া। যদি এই রাস্তাটায় জিপ বা বাস চলে তাহলে পুরুলিয়ার দূরত্ব অনেক কমে যায়। আমরা পঞ্চাশ মাইলের উপর ঘুরে এসেছি বাংলোয় আসতে।

দাশ বলেন—তাহলে এদের অনেকখানি ভালো হয়, কিন্তু একথা কেউ ভাবেন না।

ওই রাস্তা ছেড়ে আমরা ঢালু পাকদণ্ডী বেয়ে নামছি জঙ্গলে, এগুলো পায়ে-চলার পথ। বনগড়ানি জল যায় সহজ পথ ধরে। এগুলোও তাইতে তৈরী। বর্ষাকালে এর বুক বয়ে স্রোত নামে। এখন শুকনো। শুধু পাথরগুলো দাঁত বের করে আছে।

বনভূমির ঘনত্ব এখানে অনেক বেশী। বড় বড় শালগাছ সোজা হয়ে আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। মাটিও স্যাঁতসেঁতে আর নীচেও আগাছার জঙ্গল। বেশ কিছু লতা গাছে গাছে জড়িয়ে জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছে। নিম্ন-ভূমির অরণ্যে ঠাঁই ঠাঁই জন্মেছে ফার্ণ, গাছে অর্কিড, পরগাছাও ভিড় করেছে।

এ অরণ্য অনেক গভীর, বেশ ঠাণ্ডা আর প্রায়ান্ধকার। সরু রাস্তা নীচের দিকে নেমে চলেছে, আরও নীচে। কোথায় ঝিরঝির শব্দ ওঠে। গাছের ফাঁক দিয়ে বহু নীচে একফালি জলের চিকন রেখা ফুটে রয়েছে—স্তব্ধ বনরাজ্যে। আমাদের পা ফেলার শব্দ ওঠে। আবার সব নিস্তব্ধ। প্রকৃতির গভীর গহনে আমরা চারটি প্রাণী যেন চোরের মত প্রবেশ করেছি।

শর্-র. . . র. . .একটা শব্দ ওঠে। গভীর বনের মধ্যে ওই ঘন গাছ-গাছালির ফাঁকে কি যেন সরে গেল, থম্‌কে দাঁড়ালাম।

অজানা আতঙ্কে সারা শরীরের লোমকূপ অবধি খাড়া হয়ে ওঠে। নিশীথও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, গার্ড মিশিরজী এদিক-ওদিকে সাবধানী দৃষ্টি মেলে কি সন্ধান করছে।

আমাদের হাতে একটা করে লাঠি। ওটা পাহাড়ী পথ উঠতে নামতে সাহায্য করে মাত্র। ওতে আত্মরক্ষা করা যায় না। আর যে গভীর বন, তাতে বাঘ, ভালুক, বনশুয়োর যে-কোন মুহূর্তেই বের হতে পারে। হাতিও আছে আশেপাশে, একটা হাতি নাকি দলছুট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে জানে সেইটাই হবে কিনা। কাল রাতেই সেটাকে দেখেছিলাম।

হঠাৎ আমার সঙ্গী দেবশঙ্কর কি যেন দেখে শিউরে উঠে একটু এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই ওর পায়ের কলকাতাইয়া বাহারি স্লিপার পিছলে গেছে, ঢালু পাথুরে পাহাড়ের গায়ে দেবুর গোলগাল শরীর গড়ান দিচ্ছে। কাঁচি ধুতি আর গিলেকরা পাঞ্জাবীতে লেগেছে ছাপ ছাপ কাদার দাগ।

গোলমালে একটা ময়ূর বন থেকে ঝট্‌পট্ করে উড়ে গেল, লাফ দিয়ে ঝর্নাটা পার হয়ে গেল একটা হরিণ। ওর হলুদ-কালো ছোপানো দেহটাকেই দেখেছিলাম আমরা। দেবু ততক্ষণে উঠেছে গার্ড মিশিরজীর হাত ধরে। নইলে আরও কয়েকটা গড়ান দিয়ে ঝোরার ঠাণ্ডা পাথুরে জলেই গিয়ে পড়তো।

দেবুর ক্যামেরা ছিটকে পড়েছে। দেবু বলে—ইস্ এমন সুন্দর ছবিটা নিতে পারলাম না।

অর্থাৎ ময়ূর আর হরিণ দুটোকে ও নাকি আগেই দেখেছিল। মোটেই ভয় পায়নি আমাদের মত।

দেবু পড়ে গিয়েও হার স্বীকার করতে রাজী নয়।

ঝোরা পার হয়ে আবার উঠছি চড়াই ঠেলে। বুকভাঙ্গা চড়াই। এঁকেবেঁকে সরু পথটা উঠছে। উৎরাই-এর এই নিয়ম। তারপরই আবার শুরু হবে চড়াই। ক্রমশঃ বন পাতলা হয়ে আসছে। দূরে মানুষের গলার শব্দ পাই। গরু-মোষের গলায় কাঠের ঘণ্টা বাজছে ঘড়-ড়-ড়...

পথটা এইবার বন থেকে ফাঁকায় বের হয়ে আসে। সামনে মুক্ত, বেশ খানিকটা সমতল মত। ঢালু হয়ে সেই উপত্যকা নেমে গেছে। সব দিকেই এমনি গভীর বন আর তারপরই আকাশঘেরা পাহাড়।

শিকাবাদ যাবার সেই গাড়ির রাস্তায় অস্তিত্বটুকুও বন থেকে ঢালু পাহাড় ও গা বেয়ে এইখানে নেমে এসে গ্রামবসতির দিকে এগিয়ে গেছে। মাঠের এদিক-ওদিকে সরষের ক্ষেত। মকাই কাটা হয়ে গেছে। গরু-মোষগুলো শূন্য মকাই ক্ষেতের এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সামনেই রাস্তাটার দু'দিকে কয়েকখানা ঘর। তেমনি নিকোনো আর তক্‌তকে। রাস্তার এক পাশে শাল খুঁটির

মাথায় কাঁচ বসানো চৌখুপি, বাতিদান আগেকার দিনের মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় অমনি বাতিদান দেখেছি।

হঠাৎ এই বনপর্বতের মাঝে সাঁওতাল বস্তিতে ওই সভ্য-জগতের আলোর অস্তিত্বটুকু কেমন বেমানান ঠেকে। ওই একটুকু আলো যেন সব অন্ধকারকে দূর করে দেবে।

এদের ব্যাপারটা এমনিই। এর মধ্যে গ্রামে বসতিতে গিয়ে দেখেছি বাইরের লোক দেখলে পুরুষরা প্রথমে বের হতে চায় না।

বাড়ির মেয়েরাই জবাব দেয়—ঘরকে নাই বটেক।

এবারও প্রথমে সেই জবাবই মিলেছে।

বাকী দু'চারজন সকালের রোদে পিঠ তাতাচ্ছিল, তারা দেখছে আমাদের দিকে কৌতূহলী বিচিত্র চাহনিতে, সঙ্গে রয়েছে ফরেস্টের খাঁকি পোষাকপরা মানুষগুলো আর আমরা শহরের বিচিত্র জীব, রীতিমত অবিশ্বাস করারই কথা।

দু'একজন চেনামুখ বের হতে তারাই খবর দেয়—রতন মাঝিকে খুঁজছিস? দাঁড়া ডেকে দিই।

কে একজন ডাকতে গেল তাকে।

সামান্য কয়েকঘর বসতি, তবু মনে হয় এখানে কিছু সমৃদ্ধি আছে। ফল-ফসল হয়। একটা চালায় রাশিকৃত মকাই-এর স্তূপ পড়ে আছে, গাছে উঠেছে শিমের লতা, বেগুন গাছগুলোও সবুজ সতেজ লকলকে।

ইতিমধ্যে রতন মাঝি আরও দু'একজন এসে পড়েছে। লোকটার দিকে চেয়ে থাকি। লম্বা পাকানো চেহারা, বয়সের তুলনায় ওর মুখের রেখাগুলো অনেক স্পষ্ট, কেমন যেন কুটিল বলেই বোধহয় ওকে।

ওর পরনে পরিষ্কার একটা ধুতি, গায়ে সাবান কাচা গেঞ্জি। পায়ে টায়ারকাটা একটা স্যান্ডেল। এখানে বিশেষ কারও পায়ে স্যান্ডেল দেখিনি; ওকে তাই স্যান্ডেল পরতে দেখে একটু অবাক হই।

মুশাই সর্দারের মুখখানা মনে পড়ে। সারা পাহাড়বস্তীর প্রধান সর্দার সে, তার পোষাকেও এই শহুরেপনা দেখিনি। রতন মাঝি একটু স্বতন্ত্র সব দিক থেকেই। ও বলে,

—কলকাতা থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ।

রতন শোনায়—এই সাল ক'বারই কলকাতা গেছি। মনুমেন্ট, হাওড়ার ব্রিজ, কালীঘাট সব দেখেছি।

—তাহলে কলকাতা যাও মাঝে মাঝে?

লোকটাকে দেখছি। চোখদুটো ওর যেন ঘুরছে। ও আমাদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। ওই লোকটাকে এর আগে বাংলোয় কামতাপ্রসাদের সঙ্গেই সেদিন দেখেছিলাম।

রতনও দেখছে আমাদের। ওর মুখে একটা ছাপ ফুটে ওঠে। ও যেন দেখাতে চায়, নিজে সে কেউকেটা—কলকাতার বন্ধুরাই তার কাছে এসেছে।

সঙ্গের লোকেরা অবাক হয়ে রতনের এলেম দেখছে।

তারা যে রতনের বংশবদ চেলা তা দেখেই অনুমান করা যায়। রতন সায় দেয়।

—তা যেতে হয় প্রায়ই। ওরা এসে ধরে। এবার তো তিন দলের সঙ্গে তিনবার গেলম শহরে লুকজন লিয়ে। এক একবার এক এক দলের লুকরা যা বলে আমরা তাই ধুয়ো ধরি। বিনভাড়ায় কলকাতা গেলম—গঙ্গা সিনাল্‌ম্—

রতন যে বিশেষ একটি এলেমদার বস্তু তা বুঝতে পারি এরই মধ্যে। যেইই ডাকে তার হয়েই দলবৃদ্ধি করতে চলে যায়; নিজে যে কার দলের, সে খবর সেও রাখে না। তার পাওনা ওই সর্দারি আর বিনাভাড়ায় ভ্রমণ আর খাওয়া। পরের স্বার্থও নিশ্চয়ই কিছুটা আছে। ওরই বাড়ির সামনে ওই অঞ্চলের পথ আলোকিত করার চেষ্টা দেখে এমনি ব্যাপার আগেই অনুমান করেছিলাম।

রতন বলে, আমরা সদরের কত্তাদের বলেছি—একটু জল আর রাস্তার আমাদের ব্যবস্থা করে দেন। তা ইবার ভাবছি, এম-এল-এ'র সঙ্গেই কলকাতা যাবো ইসব বলতে। বনের লুকদের কাছে চাঁদাও তাই তুলছি—

এর মধ্যে একটা বাবুই দড়ি বোনা খাটিয়া কে এনে দিয়েছে। বন-পাহড়ের চড়াই ভেঙ্গে হাত-পাগুলো টনটন করছিল, এবারে একটু বসে জিরোতে থাকি।

রতন শুনিয়ে চলেছে তার কথা।

লক্ষ্য করি কিছু লোকজন এর মধ্যে জুটেছে, খুব কাছে এগিয়ে এসেছে তারা। ওদের মধ্যে অনেকে দেখছে আমাদের, আর সেই চাহনিতে ঠিক কৌতূহল ছাড়াও অন্য কিছু রয়েছে।

একজন রতনকে এসে কি বলে।

উৎকর্ণ হয়ে ওঠে রতন মাঝি, বলে,

—আপনারা বসেন, এখুনিই আসছি।

রতন ওই বাড়ির পিছেনের দিকে চলে গেল। সঙ্গে আরও দু'একজন লোকও চলেছে। কি যেন জরুরী শলাপরামর্শ করতে গেল তারা।

পরিবেশটা খুব ভালো লাগলো না। আমরা মাত্র কয়েকজন লোক। এদের রাজ্যে এসে ঢুকেছি, আমাদের আসতে দেখে রতন যে খুব খুশী হয়নি, তা ওর আপ্যায়নের বহর দেখেই বুঝেছি।

আবার কোন ষড়যন্ত্র করতে গেল কি না ঠিক বুঝি না। লোকটা যে ধূর্ত তা ওর চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায়। আর কথাবার্তাগুলোও কেমন বাঁকা বাঁকা।

ঘরের ভাঙ্গা পাঁচিলের ওদিকে নজর দিতে চেষ্টা করি। ওদিকে পাহড়ের শিরাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। নীচে বোধহয় কোন ঝর্না আছে। দু-একজন মেয়ে মাথায় কলসী নিয়ে জল তুলে আনছে।

ওপারে উঠে গেছে পাহাড়—ঘনবনে ঢাকা তার বুক, সকালের আলো সেই বনে যেন হারিয়ে গেছে। হঠাৎ দেখি ভাঙ্গা পাঁচিলের আড়ালের কয়েকজন লোক-এর সঙ্গে রতন কথা বলছে, লোকগুলোর চেহারাও কালো গাঁট্টাগোট্টা। মুষকো চেহারা। গায়ে কাপড় জড়ানো। কাঁচা শালপাতার চুটি টানছে—বাতাসে বিশ্রী চিমসে গন্ধ ওঠে, ওদের মনের অতলে আদিম হিংস্রতা যেন ওই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওরা আমাদের দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে কি কথা বলাবলি করেছে। গায়ের চাদরের নীচে কুড়ুলও রয়েছে দু-একজনের সঙ্গে সেটাও দেখতে পাই। নিশীথবাবুও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। ও দেখছে তাঁদের। ওর মুখচোখ কঠিন হয়ে উঠেছে। তবু বলে সে—ওদের জানতে দেবেন না আমরা ওদের দেখেছি।

লোকগুলো বেশীক্ষণ দাঁড়ালো না।

দেখতে পাই রতনের সঙ্গে বিড় বিড় করে কি কথাবার্তা বলে তারা পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে নেমে গেল—বোধহয় ঝর্না পার হয়ে ওপাশের বনে ঢুকে গেল তারা।

ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো ঠেকে না। ওরা যেন একটা কি ষড়যন্ত্র করছে।

হঠাৎ খিক্ খিক্ করে হাসির শব্দে চাইলাম, লোকটাকে এখানে দেখবো ভাবিনি!

—নমস্কার স্যার, প্রাতঃ পেন্নাম! কতক্ষণ আসা হয়েছে? এদিকে বেড়াতে এসেছেন বুঝি? এ্যা!

লোকটাকে দেখে অবাক হই। ফণী লায়েক এখানে একটা ঝুপড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে এসে ওর দাড়ি ভরা শীর্ণ মুখখানা নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। ওকে শুধাই।

—তুমি। এখানে?

ফণী নায়েক বোধহয় কোন খড়ের গাদার উপরই শুয়েছিল। মাথায় খড়ের জুটি লেগে আছে।

ফণী নায়েক জানায় —ইখানেই থাকি। মাঝে-মাঝে, মানে—মাস্টারী করতে হয় কি না—

এখানে এই জঙ্গল-সাগরে এই সামান্য বস্তির ছেলেপুলেদের জন্য মাস্টার থাকে, তা জেনে খুশী হই।

ফণী নায়েক দেখায়—ওই-তো ইস্কুল বাড়ি।

ততক্ষণে রতন এসে হাজির হয়েছে ওদিককার জরুরী আলোচনা সভা ছেড়ে। রতনকে দেখে ফণী নায়েক কেমন ভয়ে কুকড়ে চুপ করে গেল।

হঠাৎ ওকে দেখে অবাক হই। এর আগেও দু'তিন দিন ফণী নায়েককে দেখেছি। বাংলোতেও গিয়েছিল সে, কিন্তু তার গায়ে খোলসের মত লেগে থাকে একটা চাদর। এই হাড়-কাঁপানো কনকনে শীতে চাদরটা আজ এর গায়ে নেই। কাঁপছে সে ছেঁড়া একটা জামা জড়িয়ে।

কালকে রাতের কুড়িয়ে পাওয়া চাদরটার কথা মনে পড়ে। চাদরের মালিক কে তা অনুমান করে একটু অবাক হই।

রতন তখন আবার আসর নিয়েছে। ওদিকে রোদপিঠ করে দাঁড়িয়ে ফণী নায়েক একটা পোড়া বিড়ি টান্‌ছে ফুক ফুক করে।

ঝোরার ওপারে সুড়ি পথ দিয়ে সেই লোকগুলো বনের গভীরে ঢুকে যাচ্ছে।

নিশীথ দাশ আর গার্ড মিশিরের মধ্যে কি চোখে চোখে ইসারা হয়ে যায়। দাশ হাসছে।

রতন তৎক্ষণে আবার হারানো কথার খেই ধরে শুরু করে তার কৃতিত্বের কথাগুলো।

—আমাদের কথা শুনতেই হবে বাবু। সরকার আমাদের বন কেড়ে নিলেক—জলের ব্যবস্থা নাই, রাস্তাঘাট নাই।

রতন মাঝি বলে চলেছে ওর কথাগুলো।

ইতিমধ্যে আমাদের কিছু তরিতরকারীর দরকার, টম্যাটো বেগুনও কিনলাম ক্ষেত থেকে। কুড়ি পয়সা সের দরে।

দুটো মুরগীও কিনতে হলো। খুব বড় মিললো না—ছোট আকারের দুটো মুরগীর জন্য দাম নিল দু'টাকা। নিজেরই অবিশ্বাস্য ঠেকে। তাই তাকে আর একটা টাকা দিতে যাই। লোকটা ঘাড় নাড়ে। বলে— নাই লিব। নাই লিব। ঢের লিইছি।

টাকাটা সে নিল না। ফেরৎ দেবার জন্য তার তরফ থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষোভও নেই। লোকটা বলে, আর নাই লিব।

রতন মাঝি ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখে না। সে লোকটাকে কি যেন বোঝাতে চাইছে ইসারায়। কিন্তু লোকটা ওর দিকে চাইল না। সে আমাদের সঙ্গে কথা বলে চলেছে—আলি ইখানে দেখে যা আমাদের বন-পাহাড়। খুব ভাল বটে হে।

রতনের এই সৌজন্যতাটুকু ভালো চোখে দেখে না! তার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি।

লোকটাকে আর দু'একটা মুরগীর কথা বলতে রতন আগ বাড়িয়ে বলে—আমি দেখছি মুরগী মেলে কি না।

নিজেদের মধ্যে ওদের ভাষায় কি কথা বলতে বলতে ওরা ফিরে আসে। রতন জানায়,

—না, হ'ল নাই। সিমিগুলোন উড়ে বেড়াচ্ছে, ধরা দিলেক নাই।

মুরগীগুলো নাকি ফাঁকায় চরছে।

অর্থাৎ রতনও যে ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিল না তা বুঝলাম।

একটা প্রাইমারী স্কুলও রয়েছে। মাটির দোচালা ঘর। সামনে কয়েকটা ছায়া ঘন গাছগাছালির ভিড়। ওপাশে মাটির দেওয়ালে কে কচি আঙ্গুলের ডগে নাম লিখে রেখেছে। শ্রীকালীপদবাবু, ছেলেরা আজকাল পড়াশোনা করছে।

ওকে শুধোই—কালিপদ কোথায় গো?

—পড়তে গেছে শিকাবাদে।

অর্থাৎ নিদেন মাইল পাঁচেক পথ বন-পর্বত পার হয়ে ওরা যাতায়াত করে।

—এখানের স্কুলে পড়ে না?

রতন একটু হকচকিয়ে যায় আমার প্রশ্নে।

স্কুলবাড়িও রয়েছে। আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য সরকার থেকে এসব ব্যবস্থাও আজকাল হচ্ছে। সুতরাং প্রাইমারী ক্লাশের ছেলেকে এই বন-পর্বত পার হয়ে শিক্ষার জন্য দূরে যেতে হবে না।

ফণী নায়েক মৌকা খুঁজছিল। সে এগিয়ে এসে বলে।

—ইস্কুল তো আছে, মাস্টারও রয়েছে। কিন্তুক—

রতন ওকে মুখ খুলতে দেখে একটু কটমট করে ওর দিকে চাইল। সাপের মাথায় যেন ধুলোপড়া পড়েছে। ফণী নায়েক সুড় সুড় করে মাথা নামালো।

রতন বললে—ওখানের ইস্কুলে পড়ে কাকার কাছে থাকে-টাকে কিনা। এখানের ইস্কুল ঠিকই চলে আজ্ঞে! ক'দিন কালীপরবের ছুটি হইছে ইখানে।

কালীপুজোর জের যে মাসাধিকাল চলে তা জানা ছিল না। এখানে পুজোর কি মহোৎসব হয় তাও বুঝতে পারি না।

স্কুলবাড়িও রয়েছে, সেটায় আপাততঃ গরু-ছাগল বাঁধা হয়, তা অনুমান করতে পারি। আর মাস্টার ফণী নায়েক, তার হালও স্বচক্ষে দেখেছি। ইস্কুল মাস্টার সবই রয়েছে খাতা-কলমে, মাইনেও আসে। কিন্তু সেই আমদানীর ব্যাপারে কতটা কি কারসাজী আছে রতন মাঝির তা বুঝতে পারি না।

তবে ব্যাপারটা যে খানিকটা গোলমেলে তা বুঝেছি।

লোকটাকে দেখে তুলনামূলক ভাবে মুশাই সর্দারের কথা মনে পড়ে । ও অতীত ঐতিহ্য—আর বর্তমান ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎ এই রতন মাঝি। ও আমাদের সিগ্রেট দিব্যি টেনে চলেছে। আর শোনায় শুধু দাবী আর কাল্পনিক অবিচারের কথা।

ফণী নায়েক কোনমতে শুধোয়,

—আমারে সেই কাগজগুলো পড়েছেন বাবু?

রতন মাঝি ওর দিকে চেয়ে থাকে। সে অবাক হয়েছে ওর সঙ্গে আমার আগেকার পরিচয়ের কথা শুনে।

তাই শুধোয় সে—খাতা কি হে মাস্টার?

আমিই ব্যাপারটা জানাই। রতন খুব খুশী হয় না। চুপ করে সিগ্রেট টানতে থাকে। বলে সে,

—ওসব পাগলামী ছাড়ান দাও মাস্টার। কাজ-কাম মন দিয়ে করো। ছাত্তর পড়াও—নালে অন্য মাস্টার দেখতে হবেক।

ফণী নায়েক আবার কুঁকড়ে গেল। পায়ে পায়ে সে সরে গেল এখান থেকে।

বেলা হয়ে আসছে। আমরা উঠে পড়লাম।

—চলি রতন।

রতন জবাব দিল না। উঠে দাঁড়াল।

রতন বোধহয় এড়াবার চেষ্টা করে। ও চায় না এই সব অযথা প্রশ্নে তাকে আমরা বিব্রত করি।

এতক্ষণ ধরে এদিক-ওদিকে ঘুরে এসব দেখেছি। কথাবার্তা হয়েছে। বেলা হয়ে আসছে। পাহাড়-বন পার হতে হবে। সকালের সেই ভুরিভোজ কোন্‌দিকে নস্যি হয়ে গেছে। এ জলে পাথর হজম হয়। খানচারেক খাঁটি ভইসা ঘিয়ের পরটা, আলুভাজা, দুটো ডিম সিদ্ধ আর আধ সের মোষের দুধ—এই ছিল আজকের ব্রেকফাস্ট। তা হজম হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং এইবার ফিরছি আমরা, মাইল তিনেক বনপথ পার হতে হবে। অনুমানে বোঝা যায়, রতন মাঝিই এ গ্রামের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোক, বেশ গুছিয়ে নিয়েছে সে। এদিক থেকে ওদিক অবধি তার ক্ষেত-খামার। সরষের ক্ষেতই অনেক। গরু-মোষগুলো চরছে।

নিশীথবাবু বলে,

—ফরেস্টের জমি দখলের রীতিটা দেখেছেন রতনের?

বেশ খানিকটা জায়গায় শাল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। নীচের মাটিতে চাষ দিয়ে সরষে বুনেছে।

নিশীথ বলে, শাল গাছগুলো এখন কাটব না। দু'এক বছর চাষ দিয়ে জমি হাসিল করে নেবো। গাছগুলোও দাঁড়িয়ে থাকবে। বলার তেমন কিছুই নেই। দেখুন না?

দেখছি ব্যাপারটা। শালবনের অনেক দূর অবধি সরষে, তিসি বুনেছে চাষ দিয়ে। সব চক-চকে ওই রতনের দখলে। নিশীথ দাশ শোনায়,

—হঠাৎ রাতারাতি গাছ কেটে এ মাথায় আল দিয়ে জমি দখল কেরে নেবে। এমনি করে বনকে বন অনেক জায়গাকে ওরা শেষ করেছে। তাছাড়া বনতো যেন ওদেরই দখলে। আগে এ-সব ছিল না—এখন রতনের মত কিছু রতন আছে, যারা এখানের অনেকের মনে ঢুকিয়েছে দরকার হলে বনে গিয়ে গোটা দু'চার

রোলা কেটে হাটে বেচে আসবি, বিশ টাকা হবে। অবশ্য রতনের মত লোকদের একটা বখরা এতে থাকে। আগে ওরা ভাবতো বনের কাঠ কাটা মানেই চুরি করা—সেটাকে ওরা ঘৃণা করতো। এখন অনেকেই ওটা মানে না।

ঘন হয়ে এসেছে এখানে বনটা। নীচে নামছি আমরা। হঠাৎ ওই বনের মধ্যে ফণী নায়েককে কোদাল দিয়ে কি খুঁড়তে দেখে দাঁড়ালাম।

নরম মাটিতে হাঁটুভোর গর্ত করে একটা লতার গোড়া থেকে পাহাড়ি কন্দমূল তুলছে। ফণী নায়েক বলে,

—কন্দ তুলছি বাবু, সেদ্ধ করে নুন দিয়ে খেতে ভালোই লাগে।

বন পাহাড়ে ওই পাহাড়ী আলুর অভাব নেই। তাই দিয়ে ওরা ক্ষিদে মেটায়! ফণী নায়েকের অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। কি সুখে এই বন-পাহাড়ে পড়ে আছে জানিনা। বাইরের জগতের ও যেন বিতাড়িত একটি জীব। রতনের লাথি খেয়ে এখানে রয়েছে।

ফণী নায়েক বলে—মাস্টারির কথাটা সব বললে না বাবু। রতনাই ঠকাচ্ছে স্যার! সই করে টাকাটা আনি মাসে মাসে, তা ওই লিয়ে লেয়। দু-পাঁচ টাকা দেয় মাত্তর। তাতে কি চলে? বলুন! বনের কন্দমূল কেঁদ এই সব দিয়ে পেট চালাই।

—ওখানে পড়ে আছো কেন?

কথাটা ওকে শাসনের ভঙ্গীতেই বলি। ওই রতনের অনেক নীচতারই সাক্ষী ও। ফণী নায়েক চুপ করে থাকে।

ওকে বললাম—কাল রাতে ত বাংলোয় গিয়েছিলে?

চমকে ওঠে সে। চোখ দুটো চক চক করে।

নিশীথবাবু বলে—ওই রতনাকেই খবর দিয়েছিলে কাল তুমিই। ওরা বনে গিয়েছিল গাছ কাটতে আর তুমি ছিলে ওখানে খবর নিতে?

ফণী নায়েক জোড়হাত করে কঁকিয়ে ওঠে।

—দোহাই ধম্মো। বিশ্বস করুন বাবু—গেছলাম সত্যি। তবে ওসব জানতাম না। এসব কথা শুনলে রতনা আমাকেই মেরে ফেল দেবে। ও সব পারে বাবু।

গলা নামিয়ে ফণী নায়েক বলে,

—রতনা লয় স্যার, ওই শেঠজীও জানে এসব ব্যাপার। অমি তো স্যার স্রেফ ছারপোকা।

লোকটা কাচু-মাচু করে বলে,

—চাদরটা ফেরৎ দেবেন স্যার? শীতে বড্ড কষ্ট পাইছি। রতনাও দেবে না কিছু।

লোকটার দিকে চেয়ে থাকি।

নিশীথ কি ভাবছে। বলে,

—ঠিক আছে, যেও। তবে এই রতনের সঙ্গে থাকলে তুমিও বিপদে পড়বে কিন্তু। দুঃখের আর শেষ থাকবে না।

ফণী নায়েকের দাড়ি-ঢাকা মুখখানায় কি বেদনা ফুটে ওঠে। ওর চকচকে চোখ দুটোয় জল যেন চলকে ওঠে। জানায় সে,

—দুঃখু! দুঃখের আর কিছু বাকী আছে স্যার? ঘর-বাড়িও নাই, বনে বাদাড়ে ঘুরছি জানোয়ারের মত। বৌটা কবে না খেতে পেয়ে মরে গেল, আর মেয়েটা? ওটাকে শেষ করে দেব পেলে। ঐ কামতাপ্রসাদ শয়তানের লালচে হারামজাদী বিগড়ে গেল। ট্যাকা—তোর ট্যাকায় পেচ্ছাব করি। না-খেয়ে মরবো—তবু ওখানে যাবো নাই।

ফণী নায়েকের চোখ দুটো জ্বলছে, শীর্ণ লোকটার আজ ঠাঁই নেই, বনে-পর্বতে জানোয়ারের মত ঘুরছে, খাবার সংগ্রহ করছে এই কন্দ, আলু, বনের ফল।

ওর দিকে চেয়ে থাকি!

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে ওঠে ফণী নায়েক। ও যেন এড়িয়ে যেতে চায় আমাদের। এখানে বনের মধ্যে

আমাদের এসব কথা বলছে সেটা আর কেউ দেখুক—এটা তার পক্ষে হয়তো নিরাপদ হবে না। তাই সরে গেল সে।

আবার আলু খুঁড়তে থাকে সে।

লোকটাকে ঘিরে কি একটা রহস্য রয়ে গেছে। এগিয়ে চলেছি। বনের মধ্যে কয়েকটা গরু-মোষ চরছে। তাদের গলায় বাঁধা কাঠের ঘণ্টা বাজে ঠর. . . ঠর।

উদাস একটা শব্দ ওঠে! বনের গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে বেলা বেড়ে ওঠা রোদ ছিটিয়ে পড়েছে। বাতাসের হিম হিম ভাব কমে গেছে—এখানে রোদে রোদে ফুটে উঠেছে কবোষ্ণ একটি উত্তাপ।

বলে উঠি—রতন বেশ ঘিরে জাল পেতে বসে আছে। ওর জুড়িদারও জুটেছে ভালো।

হঠাৎ লোকটাকে দেখে চাইলাম। মাধাই মাঝি বনে গরু চরাচ্ছিল। আমাদের কথাগুলোও শুনেছে সে। এর আগেও লোকটাকে দেখেছিলাম। মুশাই সর্দারের নাম করেছিল ওই-ই।

আজ এখানে তাকে দেখে চাইলাম।

আমাদের দেখে সে এগিয়ে আসে। ফণী নায়েককেও বোধহয় দেখেছে সে।

—মাধাই যে হে! গার্ড মিশিরজী ওকে ডাকল।

লোকটা গাছতলায় বসেছিল, বয়েস হয়ে গেছে। ডান হাতটা তার নেই। কনুই-এর ওপর থেকে কাটা, বাঁ হাতে একটা গরু তাড়াবার পাঁচন। লোকটার চোখমুখ বসে গেছে। বলে সে। রতনের কথা বলছিলি তুরা?

ওর দিকে চাইলাম। লোকটার শীর্ণ মুখে, ওই কোটরাগত দু'চোখে কী তীব্র জ্বালা।

সে বলে—উটো এক শয়তান আছে বাবু। লুককে ভুলাইছে, মিছা কথা বলে ঠকাইছে, পথে বসাইছে উদের। আমারও সব গেইছে বাবু উয়ার চালে পড়ে। জমি গ্যালো—জারাত গ্যালো—সব কুন দিকে হারই গেলো।

মাধাই মাঝির এই মর্মবেদনার কথা সেদিন আমার সামনেও জানিয়েছিল সে।

এ যেন বুধিয়ার বিপরীত সত্তা। ওরা শুধু ঠকে আর চোখের জল ফেলে অসহায়ের মত। ও কান্নার শেষ নেই। ফণী নায়েকও এদেরই দলে।

রতন মাঝির বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ অনেকদিন থেকেই। পুরুলিয়া-বলরামপুর ছাড়িয়ে ধানবাদ চিনকুঠির লোকদের সঙ্গেও যোগাযোগ, জানাচেনা ছিল তার।

মাধাই আরও অনেককে সে বলে-কয়ে কিছু টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে কয়লা কুঠিতে না হয় চা-বাগানে কাজ করতে পাঠিয়েছিল আড়-কাঠির মারফৎ।

সেবার পাহাড়েও খুব আকাল—ধান-মকাই-বাজরাও হয়নি। বনের ফলপাকড়ও ছিল না, ছিল না ঝর্নার জল। সেদিন বন-সবুজেও হাহাকার উঠেছিল।

মাধাই বলে—সিদিন ওই রতনই ডুংরীর ঢেক লুককে পাঠালেক চিনকুঠিতে। বললেক, সিখানে কাম পাবি। কয়লা কাটার কাজ—পয়সা পাবি। থাকতে পাবি—খেতে পাবি—কতো ট্যাকা লিয়ে আসবি ঘরকে। বৌটো কিন্তুক না করেছিল। বলেছিল—নাই যাবি উখানে। কিন্তুক ডুংরীতে থাকতে নারলাম,—সোনারপারা বৌটো উপোস দিবেক গতর থাকতে? তাই গেলম কয়লা কাটতে উই ধানবাদ পার হয়ে কুন মুলুকে।

দুপুরের রোদ নেমেছে গাছ-গাছালিতে। বন সবুজ পাতাগুলো তরল রোদের আভা মেখে মসৃণ চকচকে হয়ে উঠেছে, যেন সবুজ পত্রসার চুঁইয়ে পড়বে ওদের গা বেয়ে। দূরে কোন্ বনের ধারে রাখাল তার বাঁশীতে উদাস সুর তোলে। দিন বয়ে যাওয়া বেদনার সুর।

লোকটার শীর্ণ মুখে কি বেদনার ছায়া ফুটেছে। করুণ বিষণ্ণতার ছায়া।

মাধাই বলে—কিন্তু কি হ'ল তাতে? কয়লার চাংগড় ধ্বসে পড়ল ডান হাতটোর ওপর। পরাণ লিয়ে বেঁচে এলম, গতর গেল—মুরোদ গেল ট্যাকার জন্যে। ফিরে এলম ডুংরীতে, ভাবলাম তবু ঘরে এসে চাষবাস করবো। দুঃখ-ধান্দা লিয়ে থাকবো।

মাধাই-এর গলাটা বুজে আসেক বেদনায়, ওর চোখে তার ছায়া। বলে সে।

—কিন্তুক এসে দেখলম ঘরটো নাই। বর্ষার জলে চালাগুলোন পড়ে গেইছে, পাঁচিলও নাই ঘরের। আর বৌটো? সিও কার সাথে পীরিত করে উই রতনের চালে পড়ে ডুংরী ছেড়ে কুন মুলুকে পালাইছে।

জমি জাঘা সব দখল লিয়েছে ওই রতনা। আমার সব কেড়ে লিলেক উ। আমার কেনে? এখানে সব ডুংরীতে খপর লে—উ কতো লুকের কি করেছে। এখনও করছে, সাঁওতালদের উ চোর বানাইছে—মনগুলানকে বিষিয়ে দিইছে। উদের পথে বসাইছে।

চুপ করে কথাগুলো শুনছি, কি বেদনার কথা। বঞ্চনার কথা। এই শান্ত সুন্দর পার্বত্য জীবনের আড়ালেও করুণ জীবন-ইতিহাস রয়ে গেছে। মানুষের এই লোভের আগুনে পুড়েছে অনেক ঘর, অনেক মন।

এমনি ইঙ্গিত দিয়েছিল মুশাই সর্দারও, নিজের চোখেও দেখেছি এই বনরাজ্যের প্রশান্তির অতলে নিবিড় হাহাকারের বেদনাকে, সেই হাহাকার ফুটে ওঠে শীতের সরলতার বনমর্মরে। এখানেও মানুষের লোভী হাত সব শ্রীকে বিকৃতি করেছে, কলুষিত করেছে।

মাধাই মাঝি বলে—বৌটো আর এলো নাই বাবু—উ হারাই গেল। আর সব হারিয়ে আমি পড়ে রইলাম এ ডুংরীতে, রতনারই মোষ চরিয়ে বাগালি করে আর লাথি খেয়ে পড়ে রইছি। পরাণটা তবু বাইরোয় না। শুধু ধুঁকছি আর ধুঁকছি।

বনের মধ্যেকার সরু পায়ে চলা পথ ধরে চড়াই ঠেলে উঠছি। বেলা হয়ে গেছে।

ফরেস্ট বাংলো এখান থেকে বেশ খানিকটা পথ। তেষ্টা পেয়েছে। দুপুরের রোদে আর চড়াই-এ ওঠার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছি। ফরেস্টগার্ড সামনের একটা আমলকী গাছ থেকে আমলকী পেড়ে বলে— মুখে দিন, ভালো লাগবে। বেশ টক টক মিষ্টি মিষ্টি ফলগুলো।

তাই চিবুতে চিবুতে ফিরছি বাংলোর দিকে।

মাধাই মাঝির সেই করুণ ইতিহাসটা এখনও মনে পড়ে। লোকটা আজ শোষণের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্য জগতের এই লোভ বন-পাহাড় পার হয়ে এখানেও তার কঠিন থাবাটা মেলে ধরেছে।

বুধিয়ার কথা মনে পড়ে। মেয়েটাও এমনি কোন চক্রে পড়ে তার প্রিয়জনকে হারিয়েছে। সিতাই আর ঘরে ফেরেনি, আজও মেয়েটার সারা মনে ওকে হারানোর দুঃসহ জ্বালা। শবরীর মত অন্তহীন প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে সে—কবে তার শূন্য মন, শূন্য ঘর পূর্ণ হবে।

বুধিয়ার দেহে মনে এখনও যৌবনের উত্তাল সাড়া, আজও সে অন্য কাউকে ভালোবেসে ঘর বাঁধতে পারে। সুখী হতে পারে সব ভুলে। কিন্তু কেন সে এই চাওয়াটুকু পূর্ণ করেনি তা বুঝতে পারিনি। ভালোবাসারও একটা প্রতিদান থাকে, শূন্য নিঃস্ব হয়ে কোন হারানো মনের ভালোবাসার জিম্মাদার হয়ে জীবন কাটে না। সে পাত্র বদলায়, রূপ বদলায়, বেঁচে থাকে অন্য কিছুকে কেন্দ্র করে।

চলমান জীবনের এইটাই প্রতীক। সে শত পরিবর্তনের মাঝে রূপ বদলায় সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে। ভালোবাসার গতি-প্রকৃতিও বদলায়।

কিন্তু জীবন এখানে স্থির । সেই চিরন্তন শাশ্বত সুরে বাঁধা। তাই ভালোবাসার বস্তুও বদলায়নি বুধিয়ার সামনে।

বনভূমির নিস্তব্ধতার মাঝে একটা শব্দ ওঠে। দূর বনের দিক থেকে শব্দটা উঠছে, পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে এগিয়ে আসছে সেই একটানা ভারী শব্দটা। ঠক্ ঠক্ ঠক্।

গার্ড আর দাশ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। ওই শব্দ তারা চেনে।

কোথায় বনের গভীরে চোরাই গাছ কাটাই হচ্ছে।

গার্ড বলে,

—শুনেছেন স্যার। আমরা ঐ দিকে ফিরবো জেনে রতনার লোকজন গেছে করমার জঙ্গলের দিকে। সেইখানেই চোরাকাটাই হচ্ছে। ব্যাটা রতনারই লোক ওরা।

রতনের ওখানে কয়েকজন লোককেও পাশের বনে ঢুকতে দেখেছিলাম, ফিস্‌ফাস করে কি সব কথা বলে গেল তারা রতনের সঙ্গে সেই পাঁচিলের আড়ালে। আমরা যে ওদিকে যাবো না সে খবরটা জেনেই রতন লোকজনদের পাঠিয়েছে সে দিককার বনে এই পূণ্য একটি সমাধা করতে।

কাল রাতে ওরা বাধা পেয়ে পালিয়েছিল, আজ হয়তো তৈরী হয়ে এসেছে। নিশীথের মুখ চোখ কঠিন হয়ে ওঠে। হয়তো এই অবস্থাতেই এগিয়ে যেতো সে। কোনমতে থামলো। বলে—ব্যাটা শয়তান।

রতন তার বশংবদ কিছু লোককে এই বিদ্যাটা শিখিয়েছে। তারা গাছ কাটাই করে নীচের ওদিকে হাটে, গঞ্জে নিয়ে গিয়ে বেচে আসে, আর রতনকে তার জিন্য কিছু দালালি দেয়। দায় ধাক্কা হলে, কোর্টঘর করতে হলে ওসব ঝক্কি কেই-ই পোয়াবে। দাশ বলেন,

—বৈকালেই উদ্দিককার বনে একবার যেতে হবে।

ওরা বনের মধ্যে একটা বিপদ নিয়েই বাস করে। জঙ্গলের বাঘ-ভালুককে তাদের ভয় তত নেই, ভয় রয়েছে যত এই মানুষ জন্তুদের।

চোরাকাটাই -এর দল মাঝে মাঝে বাধা পেয়ে কুড়ুল নিয়ে তেড়ে আসে। তারাও মরীয়া হয়ে যায়। ওদের ধরে কোর্ট কাছারিতে নিয়ে গেলে অনেকেই বলেন,—মাত্র দু'চারটে, গাছ কেটেছে, তাতেই এই?

আর বাধা পেয়ে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে যদি গুলিই চালাতে হয় তাহলে তো চাকরী নিয়ে টানাটানি। বলবেন, ট্যাক্টলেস। আর সুযোগ পেলে ওরাই জখম করে যাবে, মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। বনের বিট অফিসার, গার্ড কর্মীদের তাই চিরন্তন বিপদের মধ্যেই বাস করতে হয় নানা ঝক্কি নিয়ে। বিপদ আপদও ঘটে।

নিশীথও বলে,

—বনের জন্তু-জানোয়ারদের ভয় করি না। কতবার বাঘ-ভালুক-হাতির সামনেও পড়েছি। কিন্তু ভয় করি এই সব মানুষ নামক জীবদের।

এ ধারণা আমারও আছে। বনে বনে ঘুরেছি।

সুন্দরবনের গহন গাঙ্ গহিন বনেও দেখেছি—তখন কোনো নৌকা দেখলেই প্রথমেই মনে হতো ডাকাতের নৌকা, ওরা এই নির্জন দূর বনে নোনা গাঙ্-এ চড়াও হয়ে আমাদের সব কেড়ে নিয়ে যাবে, প্রতিবাদ করলে গাঙ্-এর জলে ভাসিয়ে দেবে। কামট, কুমিরের খাদ্য হয়ে উঠবো।

তাই চাইতাম যেন কোন নৌকা আর মানুষ না চোখে পড়ে। বনে মানুষের দেখা পেয়ে কাজ নেই। ওরাও বনের গভীরে সেই মানুষদের এড়িয়ে চলে। বিপদও আসে অতর্কিতে।

তবু বনের মায়ায় সীমাহীন নির্জনতার রাজ্যে কোথায় এরা বন্দী হয়ে গেছে। বনের কানুনেই আছে—মানুষকে এ টানে।

প্রবাদ আছে—সুন্দরবন এত যে ভীষণ, তবু একবার যে সুন্দরবনে গেছে, সে আবার যাবে। অযোধ্যার বন-পাহাড়ের মায়ায় যে একবার জড়িয়ে যায়, সে আবার যাবে ওখানে। ওই বন ছেড়ে আসতে তার মন কেমন করবে। যারা এ মাটির মানুষ—তারা তো পারবেই না।

তাই সাঁওতালরা বাইরে বড় একটা আসে না, যদিও হাটে নামে, পাহাড় থেকে দিনান্তের শেষে আলো নামবার আগেই, আবার তাদের ছায়ান্ধকার নামা ডুংরীতে ফিরে যায়। আকাশের তারাগুলো তখন জ্বলে ওঠে শালবনের ওপরের আকাশে। বাতাসে ওঠে মিষ্টি একটু সুবাস। কনকনে হাওয়া বয়—পাহাড়ী কোন ডুংরীতে দু'একটা বাতি জ্বলে, মনে হয় কে যেন আকাশ প্রদীপ জ্বেলেছে।

ওরা এই জগতের মাথায় বাঁধা পড়ে গেছে।

মুশাই সর্দার বলে—রাঙ্গা ডুংরী।

সকালের প্রথম রোদে চারিদিক রাঙ্গা হয়ে ওঠে তাই ওই নাম।

বুধিয়া আটকে রয়েছে এই মাটিতে, এখানেই শেষ আশ্রয়ের মোহে ফিরেছে ওই মাধাই মাঝি, ফণী নায়েক—যারা সভ্য জগতে সব হারিয়ে এই বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওর সারা মনে কি বিজাতীয় ঘৃণা।

এদের মাঝে আসে লোভী মন নিয়ে কামতাপ্রসাদ। সব কেড়ে নিতে চায় এদের। বিষিয়ে তুলেছে এই পরিবেশ।

ঝোরাটা বনের গভীরে বয়ে চলেছে, বাঁশীর সুর ওঠে, হঠাৎ কাকে বের হয়ে আসতে দেখি। দেখি বুধিয়াই। ও বোধহয় গরু মোষ গুলোকে ডুংরী থেকে এখানে এনেছিল জল খাওয়াতে, হঠাৎ ওই বাঁশীর সুর শুনে উৎকর্ণ

হয়ে এগিয়ে এসেছে। চোখে মুখে ওর কি উৎকণ্ঠা। বোধহয় ও ভেবেছে হারানো সিতাই ফিরে আসছে আবার। কিন্তু অন্য একটা ছেলে মোষের পিঠে চেপে আপনমনে বাঁশী বাজাচ্ছে।

বুধিয়া ধমকে ওঠে ছেলেটাকে—এ্যাই নেমে যা মোষের পিঠ থেকে।

হাসছে ছোঁড়াটা। ও জানে না বুধিয়ার রাগের কারণটা। হঠাৎ বনের মধ্যে আমাদের দেখে বুধিয়া চুপ করে গেল।

আমরা এগিয়ে চলেছি চড়াই ঠেলে বাংলোর দিকে। হাতিনাদার ঘন জঙ্গলের বাইরে এসে পড়েছি। সামনে টিলার উপর আলো পড়েছে ইউক্যালিপ্টাস বনে, বাংলোটা ঝক ঝক করছে।

গা-গতর টাটিয়ে গেছে এতখানি পথ ভেঙ্গে। বাংলোর কাছে এসে অবাক হই। বাংলোর ওদিকে বেড়ার ধারে একটা রঙীন শাড়ি শুকুচ্ছে।

রেঞ্জ অফিসার ভদ্রলোককে দেখে অবাক হই। একটা লুঙ্গি পরে রোমশ দেহে আর চকচকে টাকে ভদ্রলোক দম্‌সে সরষের তেল রগড়ে চলেছেন। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

—নমস্কার।

আবার কুলোর মত থ্যাবড়া হাতের চেটো দিয়ে চটাস চটাস করে তেল মাখতে মাখতে ভদ্রলোক জানান।

অফিসের কাজে এলাম একটু। দু-একদিন বুঝলেন থাকতে হবে। আপনাদের মত লোকের সঙ্গ পাওয়ায় তা ভালোই হল।

আমি নির্বাক হয়ে ওর খুশীর খবর শুনছি। কিন্তু খুব ভালো লাগেনা! এই ক'দিন সারা বাংলোটা আমরাই দখল করেছিলাম। এবার ভাগীদার এসেছেন, আর একা আসেননি তা শাড়ি দেখেই বুঝেছি। ভদ্রলোক বলেন,

—তা বন টন ঘুরে দেখছেন? শুনলাম ডুংরীতে যাচ্ছেন। আরে মশাই, এতো দেখার কি আছে এখানে? দিন কয়েক এসেছেন—খান দান, মুরগী কাটুন—রেস্ট নিন। তা নয়, কি দেখছেন এতো বনে বাদাড়ে? মানুষ তো নয়—এরা সবাই এক একটি চীজ।

ভদ্রালোক সিগ্রেট ধরিয়ে দীর্ঘ টান দিয়ে হাঁক দেয়,

—গরম জল দে বাথরুমে।

এই ক'দিন আমরা এখানে স্নান করছি ঠাণ্ডা জলেই। গরম জলের ফরমাইস করিনি। চৌকিদারের এতো ফরমাইসেও এতটুকু ক্লান্তি নেই।

হাসিমুখে এসে দাঁড়ায়।

বাড়তি কাজের জন্য দেখলাম রান্নাঘরে বোধহয় আর একজন কাউকে এনেছে। রাজু জানায়,

—আপনাদের কাজগুলো ওই দেখবে। ও তো সবই জানে স্যার। আমার এদিকে—

অর্থাৎ সাহেবের জন্য তাকেই থাকতে হয়েছে। জবাব দিই। ঠিক আছে।

সাহেব তখন নিশীথবাবুকে নিয়ে পড়েছেন।

সব কাগজপত্র ঠিক আছে তো? খাতাপত্তর রেডি রাখুন, ইনসপেকশন হবে। আর কালই ওই চোরাই কাঠগুলো সেল করে দিচ্ছি।

নিশীথ ওর কথা শুনছে। ভদ্রলোক বলে চলেছেন,

—আপনি নাকি বিক্রী করতে আপত্তি করেছিলেন, নিশীথ অবাক হয়, বোঝে খবরটা অন্যভাবে গিয়ে পৌঁচেছে ওঁর কাছে।

. সে জানায়, নায্য দাম না পেলে ছাড়ি কি করে?

রেঞ্জ অফিসার ঠিক খুশী হননি। তাই গোমরা মুখ করে শোনান,

—প্রায়ই খবর পাচ্ছি এ বনে চোরাকাটাই খুবই হচ্ছে, সেবার তো শুনলাম মেহগিনী রোজউড গাছও বের হয়ে গেছে চোরাপথে।

নিশীথ জবাব দেয়—বাধাও দিচ্ছি আমরা।

—নামেই। ভদ্রলোক অফিসারী মেজাজে মন্তব্য করেন।

ব্যাপারটা ভালো লাগে না। এতদিন যেভাবে ওই ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে ছিলাম সেই সুন্দর আবহাওয়াটাকে ইনি যে ভারী করে তুলবেন তা বুঝেছি।

প্রদীপও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ওদিকে রান্নাঘরে মাংস রান্নার মিষ্টি খোসবু উঠছে। ভদ্রলোক জানান ওদের,

—খেয়ে দেয়ে একটু রেস্ট নিয়েই খাতাপত্র রেডি করুন। অপিসে যাবো। যান।

ওদের যেন জানিয়ে দিতে চান বাংলোয় এখন ওদের থাকার কোনো দরকার নেই। ওরা চলে গেল। অন্যদিন আমাদের আড্ডা এখনও চলতো। এক রাউন্ড কফি হয়ে গেলে তবে স্নান করতাম। আজ সেই মেজাজটাও নষ্ট হয়ে গেছে।

দেবু বলে। গুড় যে খাট্টা করে দিবে দাদা এই মালটি।

—তাই দেখছি।

ভদ্রলোক স্নানের ঘরে ঢুকে গরম জল ঢালেন আর শীত ধরা কম্পিত গলায় তারস্বরে কি যেন অং বং করে ধর্ম টর্মের পথ করছেন গুরুবন্দনার স্তোত্র আওড়ে।

দেবু গজরায়। গুণ্ডামিও রয়েছে ষোল আনা। দ্যান দরজাটা বন্ধ করে।

আলাদা স্যুট আমাদের, এদিকের এক প্রান্তে, কোনো যোগাযোগও নেই, তবু পাশাপাশি ওর সঙ্গে বাস করতে হবে এই সুন্দর সবুজ শান্ত পরিবেশে এটা ভাবতেই বিশ্রী লাগে।

আমার স্বপ্নদেখা বিচিত্র এই পরিবেশে নিজেকে মেলে ধরেছিলাম। এবার সেই রূপটাকে নিজের মধ্যেই সংযত করতে চাই।

খাওয়া দাওয়ার পর ক্লান্তিতে দু'চোখ বুজে আসে। বেশ কিছুক্ষণ কোনো কাজ কর্ম্ম আর নেই। তাই ঘুমিয়ে নিই।

এখানের দেখা বিচিত্র মানুষদের কথা মনে পড়ে। সবই যেন একসুরে বাঁধা। ওই ব্যাকুল বঞ্চিত মানুষগুলোর সঙ্গে আমিও যেন একটি হারানো সূত্রে বাঁধা পড়ে গেছি।

সীমার কথা মনে পড়ে।

কতো পড়ন্ত বেলায় ইডেনের ঝিলের ধারে হলুদ সোনালী সূর্যের আলো নামতো, ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় গঙ্গার রূপালী বিস্তার।

সীমা বলেছিল।

—একদিন সব কিছু নোতুন করে গড়বো, বাবা মা যাই বলুকনা কেন—আমার মতামতের কি কোন দাম নেই?

ও আশ্বাস দিয়েছিল আমাকে। ওর হাতখানা তখন আমার হাতে। সেই স্পর্শটুকুতে জেগেছিল কাঁপন লাগা কিশলয়ের শিহরণ।

—সত্যি! দুচোখে আমার কি আশ্বাস ফুটে ওঠে।

ব্যাকুল সেই মনটিকে আজ এখানে এদের মাঝে এসে নোতুন করে অনুভব করছি, ফিরে পেয়েছি সেই চেতনাকে যে চেতনার জগৎ আচ্ছন্ন ছিল সীমার অনুভবে!

আমিও তাই আজ সব হারিয়ে পথে পথে কিসের অন্বেষণ করে ফিরছি। কিন্তু কি পেয়েছি? শান্তি? সান্ত্বনা? ওসব হারিয়ে গেছে। চারিদিকে নীরব বেদনায় নিজের নিঃস্বতাকে ছড়িয়ে দিয়েছি।

ঘুম আজ আসে না। একটু ঝিমানির মতই এসেছিল, দেবু লেপ মুড়ি দিয়ে আরাম করে ঘুমুচ্ছে। আমি ওপাশের দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল তখনও নামেনি। মিষ্টি সোনালী পাইন বনে রং এনেছে। প্রজাপতিগুলো রঙ্গীন ফুলের পাপড়ির মত বাতাসে ছিটিয়ে ভেসে চলেছে। সামনের লিলি পন্ডে সবুজ পদ্মপাতাগুলোও এই শিশির বাঁচিয়ে কোনমতে টিকে আছে।

ওদিককার বন্ধ ঘর থেকে তখন বেশ বিকট সুরে নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসে—গরবিশাল দেহী সেই ভদ্রলোক-এর এখনও বোধ হয় দিবানিদ্রা ভঙ্গ হয় নি। কাঁকর বিছানো সানমের পথটুকু পার হয়ে পাইনবনের ছায়া আলোর রাজ্যে গিয়ে ঢুকেছি।

বাতাসে এখানে শীত শীত ভাব, হঠাৎ সামনেই পাইন ঝোপের ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দেখি একটি ভদ্রমহিলাকে। তাঁর লাল শাড়ির রং পাইন বনে যেন আগুন লাগিয়েছে। হেঁট হয়ে একমনে পাইনের ঝরে পড়া কাঁটা কাঁটা ফলগুলো কুড়োচ্ছেন।

বিনুনিটা সামনের দিকে হেলে পড়েছে, পিছনের ব্লাউজের উর্দ্ধাংশে অনাবৃত মসৃণ নিটোল ঘাড়ের আভাষ, গায়ের কাপড়টাও ঢিলে-ঢালা, কিছুটা অসাবধানী, হয়তো গা থেকে খসে পড়েছে। লীলায়িত ছন্দে একটি মনোরম রেখার প্রকাশ।

এই বনভূমিতে এখানে এইভাবে মেয়েটিকে দেখে ফিরে আসবার চেষ্টা করি। হঠাও আমার পায়ের শব্দ বোধহয় ওর কানে গেছে।

সেই অবস্থাতেই মেয়েটি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে।

—তুমি! এখানে!

আমিও চমকে উঠি। মনে হয় আগেকার তন্দ্রার ঘোরে দেখা স্বপ্নের সঙ্গে এর যেন নিবিড় একটা মিল রয়ে গেছে। এও বোধহয় স্বপ্নই, কঠিন বাস্তবের সঙ্গে এর যেন কোন মিল নেই।

এতদিন, যার স্বপ্ন নিয়ে ঘুরেছি, যার কথা ভেবেছি, ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, সেই সীমাকে এখানে পরিবেশে দেখবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

সীমা এগিয়ে আসে, ও দেখছে আমাকে, ওর দুচোখে সেই আবিষ্কারের ব্যাকুলতা। আমার মুখ থেকেও ওই একই প্রশ্ন ধ্বনিত হয়। —এখানে তোমাকে দেখবো তা ভাবিনি সীমা।

সীমা হাসল। ওর দুচোখে এখনও হাসির ঝিলিক তেমনি সাড়া আনে। সীমা জবাব দিল না। অজান্তেই শাড়িটাকে জড়িয়ে নিতে থাকে। এই সচেতনতা নারীর সহজাত অভ্যাস। নিটোল সুন্দর হাতখানায় একটা লাস্য জাগে।

ওকে দেখছি। মুখের আদল তেমনই আছে। শুধু দেহের সেই ছন্দটুকু আর সহজে ধরা পড়ে না। ভারী হয়ে উঠেছে, আয়াসেই আছে বোধ হয়। তবু হাসলে গালের টোল এখনও জেগে ওঠে। বললাম—খুব বিশেষ বদলাও নি।

সীমা ঘাড় তুলে আলগা খোঁপাটাকে একটু টাইট করছিল, চোখের কোলে তেমনি আগেকার সেই ঝিলিক হেনে বলে,

—খোসামুদী করা হচ্ছে? ওই অভ্যাসটা এখনও যায়নি দেখছি।

হাসতে থাকি। দীর্ঘ ক'বছরের অদেখার পাথরটা যেন হৃদয়ের উত্তাপে উষ্ণ হয়ে উঠছে। প্রথম দেখার সংকোচটাকে সকালের কুয়াসার মত মিলিয়ে যাচ্ছে—সেখানে জেগে ওঠে দিনের প্রথম রঙীন আলোর ঝলকানি। জবাব দিই—সব গেলে কি নিয়ে থাকবো বলতে পারো? বিনা পুঁজির কারবারী—আমার তো হালসাকিনও নেই, মোটা মাইনের চাকরীর হাঁক ডাকও নেই। একটা কিছু না থাকলে যে আশ্রয়ও জুটবে না। তাই ওই চাটুকার বৃত্তিই সম্বল করে ভবের হাটে লড়ে চলেছি।

চমৎকার—চমকে ওঠে চাইল আমার দিকে।

কথাটা আমিও জানতে চাইনি, অতীতে যা ঘটে গেছে তার জন্য আজ দুঃখ করে লাভ নেই। ওকে বরং জানাতে চেয়েছিলাম যে সে চলে গেছে তবু কোথাও কোন পরিবর্তন হয় নি। আমার জগতে সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে। তার সেই অবহেলা আর এমনি করে অজ্ঞাতে হারিয়ে যাওয়ার জন্য আমার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই। কিন্তু সে ব্যাপারটা জানাবার আগেই নিজের মনের চাপাপড়া ক্ষোভটা ফুটে বের হয়ে পড়ে।

সীমা বেদনাহত চাহনিতে আমার দিকে চাইল।

দীর্ঘ আয়তচোখের পাতায় একটুকু কাঁপন লাগে শীতের বাতাসে কেঁপে ওঠা পাতার মতই। সীমা জানায়,

—একথা যে তুমি একদিন বলবে আমাকে তা জানতাম।

চুপ করে রইলাম।

সীমা বলে,

—এমন অনেক কিছু ঘটনা ঘটে যার পিছনে কারো হাত থাকে না। অথচ বাকী জীবন ধরে মাত্র একজনকেই সেই ফল ভোগ করতে হয়। ভুলের সব মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় তাকেই মিটিয়ে যেতে হয়।

ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে। শূন্যদৃষ্টি মেলে ওই দূর পাহাড়ের কালো ছায়াপ্রাচীরের দিকে চেয়ে থাকে। ওর সারা মনের শূন্যতার বেদনাটা অনুভব করতে পারি।

ওর জীবনের হিসাবে কোথায় একটা ভুল হয়ে গেছে।

সীমা বলে। অনেক কিছুই আশা করেছিলাম। মোহ লোভ এ সবই বলতে পারো, কিন্তু কঠিন বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে সেই মোহ ঘুচে গেছে। আজ হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে দেখি সবই আমার হারিয়ে গেছে। তোমার কাছেও আমি চিরদিনের জন্য ছোট হয়ে গেছি।

ওই প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাই। তাই জানাই,

—ওভাবে কথাটা বলিনি সীমা, যা অতীত তা অতীতই থাক। কি হবে তার জের টেনে?

মাটির বুকে একটু সবুজ ঘাসের উপর পাইনের পুঞ্জ পুঞ্জ সবুজপাতা পচে নরম হয়ে উঠেছে জায়গাটা, সেই এক ফাঁকে দু'একটা বুনো পিটুনিয়া ফুল লাল-হলদে আভা নিয়ে মাথা তুলেছে!

সীমার হাতে একটা ফুল। সেটাকে সে আঙুলের ডগা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে, ওর সব রঙীন স্বপ্নগুলোকে যেমন করে সে ছিঁড়ে ফেলেছে। সীমা জানায়-ওর কথাটা আমিও ভাবি তবু মনে হয় নিজেও খানিকটা ভুল করেছি, এ দোষ আমারও।

ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করার জন্য শুধোই,

—এখানে হঠাৎ আসার কারণটা?

সীমা হেসে ফেলে। হাসি থামিয়ে বলে—শুনতে পাচ্ছো?

—কি?

—ওই নাসিকাধ্বনি! ওরই জন্যে আমাব এখানে শুভাগমন। অবশ্য আমি আগেই জানতাম যে তুমি এখানে আছো। এখন তো নামকরা লোক। এই বাংলোয় রয়েছ, কি খেয়াল হ'ল ওর সঙ্গেই চলে এলাম।

সীমার মনের তলের সেই ব্যাকুলতাকে আমিও দেখেছি। সেটাকে চেপে ও সহজ হতে চায়।

—তা একাই এসেছো যে বেড়াতে?

জানাই। ওই ভদ্রলোকের মত সৌভাগ্যবান আমি নই, সীমা যে আর কেউ জুটে যাবেন আমার সঙ্গে। তাই একাই ঘুরতে হয় এমনি পথে বিপদে।

সীমা চাইল আমার দিকে।

সত্যি।

সীমার দুচোখে বিস্ময়, কণ্ঠে সমবেদনা আর সেই বিস্ময়ের ঘোর।

—মিথ্যা বলে লাভ কি? সব শূন্যতার মাঝেও মনকে মিথ্যা প্রবোধ দিতে চাইনি।

সীমা দেখছে আমাকে। ওর চোখে কি অজানা একটা মায়া। হয়তো আমারই চোখের তারায় নিজের হারানো কুমারী মনকে সে দেখছে ফিরে ফিরে, যাকে সে অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ সেই নাক ডাকার শব্দ থেমে গেছে। সীমার কান ছিল বোধহয় ওই দিকে। সেই বিকট গর্জনটা থামতে সীমা বলে।

তুমি এসো, আমি চলছি।

ও একটু বেগেই এগিয়ে গেল বাংলোর ওই দিককার ঘরের দিকে। ওর এমনিভাবে চলে যাওয়ার কারণটা ঠিক বুঝতে পারি না।

একাই পাইনবনে দাঁড়িয়ে আছি। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ঢালু পাহাড়ের বুকে ধানক্ষেতে দু'একজন লোক কাজ করছে। ফাঁকা জায়গায় দীর্ঘ শালগাছ দু'চারটে ছড়নো ছিটানো, সবুজ পাহাড় পিছনে আকাশপানে ঠেলে উঠেছে। সীমাকে এখানে দেখবো এমনি নির্জনবেলায় ভাবিনি। বিকালের রোদ নামছে—পাহাড়ের গায়ে গায়ে

ছায়া ঘনিয়ে আসে। দিন শেষের ইঙ্গিতময় সেই ছায়া-আলো বনের গাছের শেষ চূড়াগুলোকে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে।

বাংলোয় ফিরে এসে দেখি দেবু তার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে নতুন লোকটাকে নিয়ে কফি বানাচ্ছে। ওই লোকটা কাজ-কম্মের তেমন কিছুই বোঝে না। তাছাড়া কথাবার্তাও ঠিক বুঝতে পারে না। ঘাড় নাড়ে—তারপর আর এক কম্মো করে আনে।

দেবু বলে—ভালো ফ্যাসাদ হ'ল দাদা একে নিয়ে। কম্মের ঢেঁকি।

ছেলেটা শুধু হাসতে জানে।

—রুটি বানাতে পারবি তো? মাংস বানাবি?

ও মাথা নাড়ে আর গুনগুনিয়ে গান গায়। রাজু যাচ্ছিল ওপাশে সাহেবদের ওখানে। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেটাকে ধমকিয়ে বলে—যখন তখন গান গাইবিনা।

কফি খেয়ে বের হয়েছি। ওদিকের পেটিকোতে খানকয়েক চেয়ার পেতে সাহেব বহাল তবিয়তে বসে সিগ্রেট ফুঁকছেন। আমাকে দেখে আপ্যায়ন করে বসালেন। তারপরই হাঁক পাড়তে থাকেন।

—কই গো? শোনো—কে এসেছেন দেখে যাও। মস্ত লোক।

ভিতরে যার উদ্দেশ্যে হাঁক-ডাক তার তরফ থেকে বিশেষ কোন ব্যস্ততা দেখা যায় না মস্ত লোকটির জন্য। ঘরের ভেতর থেকে সাড়া দেন তিনি।—আসছি। প্লিজ—

দত্ত সাহেব বললেন,

—বুঝলেন আমার ওয়াইফ আবার কলকাতার মেয়ে কি না। গীত ভবনের ছাত্রী। রবীন্দ্র সঙ্গীত যা যা গান শুনবেন স্যার, এই বনে পাহাড়ে এসেও ওসব চর্চা এখনও করেন। সেবার আমাদেরও সাহেব তো ওর গান শুনে অবাক। বলেন ডিস্ট্রিক্ট কম্‌পিটিশনে নাম দেন। ঝুলোঝুলি যাকে বলে—

ভদ্রলোক গদ্‌গদ্‌ হয়ে স্ত্রীর কথাই বলে চলেছেন। সীমার-চোখে মুখে এখন সম্পূর্ণ অন্য ভাব। ও যেন নির্বিকার আমাকে চেনে না—দেখেওনি এর আগে।

হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে শীতল নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে,

—আপনার নাম শুনেছি। লেখাও পড়েছি।

ওসব কথা আমার বহু দিন ধরে শোনা অভ্যাস আছে। আর আধুনিকার দল ঠিক ওই একই কথাগুলো আওড়ে যান শান পালিশ করা ঠোঁটে, কাজল মাখানো চোখে ওদের ভেসে ওঠে সেই একই রকম নিস্পন্দ চাহনি।

সীমাও যে এমনি নিখুঁত অভিনয় করতে পারে, তা জানা ছিল না। বলে সে। —উনি বলেছিলেন আপনার কথা। বনে-পাহাড়ে এসেছেন—যাক, তবু এসব নিয়ে লিখবেন তো?

দত্তসাহেব হা-হা করে হাসতে হাসতে বলেন—লিখবেন বৈকি। তবে, দেখো আবার আমাদের চরিত্রও যেন না আসে। তবে স্যার সীমাকে নিয়ে লিখতে পারেন।

সীমাও হাসছে।

দত্ত সাহেব বলেন। —চা একটু হোক। আর সীমা তোমার গান কিন্তু ওকে শোনাতে হবে। বুঝলেন এই পরিবেশে দেখবেন ওই—যে গানটা-জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে—কি গো? কি-যে গানটা, সেখানা কিন্তু চার্মিং লাগবে আপনার। আমার আবার গান-টান-এ একটু বেশী শখ মশাই, কয় না 'মিউজিক ইজ লাইফ' হেইটো এক্কেবারে খাঁটি সত্য কথা।

ভদ্রলোক ভাবের আতিশয্যে একেবারে দেশজ ভাষাও ব্যবহার করে ফেলে ক্লান্ত হয়ে টাকে হাত বোলাতে থাকেন।

নিশীথবাবুকে এখানে দেখে বদলে যান দত্ত সাহেব। বেশ স্বরটাও বদলে যায়। শুধোন—ওদিকের সব রেডি করেছেন?

নিশীথ চুপ করে এসে দাঁড়িয়েছিল। বুঝতে পারি, কেন ওরা এই বাংলোকে এড়িয়ে চলে। এখানকার মানুষগুলোর মেজাজ-মর্জি স্বতন্ত্র ধরনের।

নিশীথ জানায়—হ্যাঁ।

দত্ত সাহেবের বিশ্রান্তালাপে যেন বাধা দিয়েছে সে। দত্ত সাহেব বলেন—যান, আমি আসছি।

নিশীথ যাবার মুখে থমকে দাঁড়ালো। একটা জিপ এসে থেমেছে বাংলোর সামনে। বোধহয় অন্য কোন অফিসারই হবেন।

কিন্তু অবাক হই। দেখি জিপ থেকে নামছে কামতাপ্রসাদ, সঙ্গে রয়েছে রতন মাঝি। পিছনে একটা নোতুন ঝুড়িতে কি-সব ঢাকা দেওয়া, বাইরে দুটো তাজা মুরগী ঠ্যাং-এ দড়ি বাঁধা অবস্থায়। ঝুড়ি থেকে উঁকি মারে তাজা ফুলকপি—লালচে বেশ গোল সাইজের কমলালেবু, আপেল—পুরুষ্টু কলা ইত্যাদি।

কামতাপ্রসাদ এদের চেনা বলেই মনে হল।

—রাম রাম দত্ত সাহেব। খবর আচ্ছা হ্যায় তো?

দত্ত সাহেব ওকে অভ্যর্থনা জানায়।

—আসুন শেঠজী। শুনেছিলাম বটে আপনি এসেছেন।

কামতাপ্রসাদ বলে ঃ

—ভাবলুম, মিসেস ভি এসেছেন একবার নমস্কার দিয়ে যাই।

সীমাও হাত তুলে নমস্কার জানালো, তার পালিশ করা ঠোঁটে হালকা হাসির আভাস ফুটে ওঠে। চুড়িগুলোয় যেন অকারণ একটু সাড়াও জাগে।

কামতাপ্রসাদ পকেট থেকে আস্ত সিগ্রেটের টিন বের করে নামালো। দামী ষ্টেট এক্সপ্রেসের টিন—খাস আমদানী করা মাল।

বন-পর্বতেও ওসব জিনিসের বোধহয় অভাব নেই ওদের কাছে।

কামতাপ্রসাদ কাঁদুনী গাইতে থাকে।

—কাজ কারবাব আর চলবে না স্যর, সব কুছ মাঙ্গা। ধান, মকাই, বাজরা, চিনাবাদাম বহুৎ জ্যাদা দর চড়িয়ে গেল।

রতন মাঝি দাওযায় বসে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে, নিশীথকেও দেখছে সে। লোকটার ওখানে গিযেছিলাম সকালে, ও যেন অন্য মানুয। বেশ দফরফ নিয়েই কথা বলেছিল। আর এখানে এসে দেখি মুখ বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে আছে গরু চোরের মত।

ও জানে কোথায় কোন্ মূর্তি ধরতে হয।

কামতাপ্রসাদকে আসতে দেখে উঠে এসেছিলাম। ওদের কোনো আলোচনা থাকতে পারে তাই কথাটা ঠিক হবে না।

বাংলোর এদিকে আমাদেব বারান্দার নীচে কাকে দেখে দাঁড়ালাম। বুধিয়া এসেছে। ওদিকে কাজ-কম্মো করে আজ তার ওপাশে মেমসাহেবের কাছেও কাজ পড়েছে। এই কাজের ফাঁকে আমাকে দেখে দাঁড়ালো। বুধিয়া আমাকে দেখছে। বলে সে ঃ—চিঠিখানা নিখে দিব নাই?

—চিঠি!

ওর স্বপ্নজগৎ থেকে আমি যেন সরে গেছি নিজের ভাবনার অসীমে। সীমা হঠাৎ এসে কি প্রশ্নের অবতারণা করেছে।

বুধিয়া চেয়ে দেখছে আমাকে—ভুলে গেলি বাবু!

—ও, সিতাইকে চিঠি লেখার কথা বলছিলি? কাল লিখে দেবো।

মেয়েটা কি ভাবছে। হঠাৎ বলে।—সাহেব-বৌ বটে উ-না?

ওর প্রশ্নে অবাক হই। সীমার কথা বলছে ও!

শুধোই। কেন রে?

হাসছে বুধিয়া। বলে এমনিই শুধাইছি গ'। বৌটা যেন ক্যামন ক্যামন। সাহেবটা তো বুড়া রে!

দত্তসাহেবকে দেখলাম কামতাপ্রসাদকে জিপে তুলে দিয়ে অফিসের দিকে এগিয়ে গেল। কামতাপ্রসাদও মাথা নেড়ে ওর কথাগুলো শুনে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। রাজু বাংলোয় গ্যাসের আলো জ্বেলেছে। মৃদু নীলাভ আলোটা ঘরে একটা স্বপ্নের আভাস আনে। বারান্দায় কন্‌কনে ঠাণ্ডা, শাল জড়িয়ে বসে আছি। দেবু প্রদীপের সঙ্গে কোথায় বের হয়েছে। বোধহয় ফরেস্ট কলোনীর ওদের ঘরে, তাসের আড্ডায় মেতেছে। নিশীথ ব্যস্ত রয়েছে সাহেবকে নিয়ে।

ওর ইনস্‌পেকশনের রিপোর্টের উপরও তার প্রমোশন—জীবনের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে।

আজ দেখেছিলাম একটু আগে ওর মুখের অবস্থা। সে কামতাপ্রসাদকে বিশ্বাস করে না, বনের অনেক অনর্থের মূলে সেই লোকটা। ওকেই অফিসারের সঙ্গে বসে কথা বলতে দেখে নিশীথ খুব খুশী হয়নি।

রতনও এসেছিল।

নিশীথের কথাই ভাবছি। ওর স্বপ্নটুকু—সেই প্রতীক্ষা কবে সার্থক হবে জানি না। ভয় হয়, এই বেদনাভরা জগতে সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মানুষ শুধু সেই ব্যর্থতার বোঝা বয়েই চলেছে।

—স্যার।

—কে!

অন্ধকারে লোকটাকে ঠিক দেখতে পাই না। দেখি আমার ডাকে ভয়ে ভয়ে উঠে এল ফণী লায়েক। ঝড়োকাকের মত চেহারা।

কুণ্ঠিত স্বরে বলে—বাবু চারদটা দেবেন বলেছিলেন। শীতে কালিয়ে গেছি—যদি দয়া করে ওটা দ্যান, বেঁচে যাই।

লোকটার জন্য দুঃখ হয়। ঘরের মেজেতে এক কোণে ওটা পড়েছিল। ওই চুরি-ফুরির তদন্তের কোন দরকার নেই। হয়তো তাতে ওসবে কোন ফলই হবে না। তাই ওকে ওটা দিয়ে দিতে চাই। বললাম,

—ওই-যে পড়ে আছে, নিয়ে এসো।

ফণী লায়েক চাদরটা পেয়ে গায়ে জড়িয়ে খুশী হয়ে বলে ওঠে—কথাটা মনে রাখবেন স্যার। ওই লেখাগুলোর কথা। এখানে এই বনে-বাদাড়ে পড়ে আছি—যাবার আর ঠাঁই নাই, তবু যদি ওগুলো কোন কাজে আসে।

লোকটা চা এনেছিল। ওকেই এককাপ দিই ফণী লায়েক ইতি-উতি করে বলে—রুটি-ফুটি আছে স্যার?

যা ছিল তা দিতে লোকটা গোগ্রাসে গিলতে থাকে। বলে ওঠে গলা নামিয়ে ফণী লায়েক। —এখানে থাকলে মারা যাবো স্যার। আপনার তো জানাশোনা রয়েছে সদরে। একটু বলে-কয়ে দ্যান না, এই বন তরফ থেকে অন্য কোনও ইস্কুলে যদি কাজ-কম্মো পাই। আমাকে ইখান থেকে বেরোতে দেবে না ওই শেঠজী—আর রতনও তাই চায়। আর কি বলবো স্যার, নিজের মেয়েই যদি শত্তুর হয়, কে কি করবেক? আমি আটকে না থাকলে ওদের লাটলি জমবেক কি করে?

ফণী লায়েক খানিকটা জল গলায় কঁক্ কঁক্ করে ঢেলে একটু দম নিয়ে বলে—যে যা করছে করুক গে। আমি ওসবে চোখ-কান দোব না স্যার। যে-দিকে দু'চোখ যায় পলাই যাবো। সবই অদেষ্ট।

ফণী লায়েক অন্ধকারে একটা বেদনাহত ছায়ার মত সরে গেল। জীবনের গভীর একটা বেদনাকে বয়ে বয়ে ফিরছে, সেই বেদনার সুর খানিক ছায়া ফেলেছে আমার মনেও।

হঠাৎ আবছা আলোয় সীমাকে দেখে দাঁড়ালাম।

—বসে বসে কি করছো?

—এমনিই।

সীমা দেখেছে বোধহয় বুধিয়াকে এখানে আসতে, দেখেছে ওই ফণী লায়েককে বসে চা খাবার খাওয়াতে।

শুধোয় সে—এই বিচিত্র বুনো জীবগুলোর সঙ্গে তোমার বেশ ভাবসাব দেখছি। ওই লোকটা কে?

হাসলাম।

প্রাচুর্যের জগতের মানুষ এখন সীমা। ও জানে না—খবর রাখে না আশপাশের অপরিসীম দৈন্য আর হাহাকারের বেদনার কথা। তাই বলি—ওরা এখানেরই জীব, জীবনের যুদ্ধে হার মেনে হারিয়ে যাওয়া

হতভাগার দল। নিজেকেও ওদের দলের বলেই ভাবি সীমা; তাই হয়তো ওরা আসে। ওদের কথা বলে।

সীমা চুপ করে শুনছে কথাগুলো।

বাইরে জ্যোৎস্নার আলোয় দুধের শুভ্রতা মাখানো। ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলোর মসৃণ গা বেয়ে যেন দুধের ধারা নেমেছে, ওদের ফুলের মিষ্টি গন্ধটা কুয়াসা মাখা ভারি বাতাসে জমে জমে আছে।

সীমা বলে,—ওই বেদনার কথা ভুলে থাকতে চাই, শান্ত। দিন-রাত শুধু অভিনয় করে চলেছি। দেখলে তো মানুষটাকে, তখন ভাবিনি কাঞ্চন ফেলে এমনিভাবে কাঁচকে কুড়িয়ে নেব।

বাগানের ঘাসগুলো কুয়াসায় ভিজে ভিজে হয়ে উঠেছে। শিশিরের উপর চাঁদের আলোর প্লাবননামা পাইন বনের পাতা চক্‌চকিয়ে ওঠে।

সীমা বলে—এই জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ভেবেছিলাম কলকাতার নোংরামি থেকে সরে এসে বাঁচলাম, কিন্তু দেখছি মহা ভুল করেছি।

পাইন ইউক্যালিপ্টাস বনের হাওয়ার শিহরণ জাগে।

জিপটা এ সময় আসছে এই দিকে। অফিস ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো জিপখানা। একটু পরেই আবার চলে গেল ওই বনের সীমানার ধারে ডুংরীর দিকে।

সীমাও দেখছিল ব্যাপারটা।

ওর মুখ-চোখ থম্‌থমে হয়ে ওঠে। বলে সে —মনে হয় দরকার নেই এসবের। ফিরে যাবো কলকাতায়। একটা কাজ-কম্মো যদি পাই জুটিয়ে নিয়ে কোনমতে দিন কাটাবো।

সীমা চাইল আমার দিকে।

—অবাক হচ্ছো? ভাবছো এই বেদনাটাকে এতদিন সয়ে চলেছি কিভাবে? নয়তো ভাবছো এসবই অভিনয় করছি।

—না তোমাকে বিশ্বাস করি, সীমা।

সীমা হাসল,বলে সে। —আজ পুরুষদের আমি ঘৃণা করি, ভয়ও করি। তোমাকেও সে দলের থেকে বাদ দিই না। তুমি, তুমিও সেদিন জোর করো নি কেন? নিজের দাবীর কথা জানাতে ভয় পেয়েছিলে তুমি।

সেই দিনের ক্ষণিক স্মৃতিগুলো এম্‌নি আলোর ঝর্না বেয়ে স্মরণে আসে। সীমা হারিয়ে গেছল, আর দেখা পাইনি।

বলি। সেদিন ভাবিনি সীমা; যে এত তাড়াতাড়ি সব ফুরিয়ে যাবে, দিল্লী থেকে ফিরে অনেক আশা নিয়ে তোমাদের ওখানে গেলাম। সেদিন আমি তৈরী—

কিন্তু শুনলাম তার আগেই আমার অজান্তে আমার সবকিছু হারিয়ে গেছে। এরজন্য তুমিও কম দায়ী নও।

কান্নাভারি কণ্ঠে সীমা জানায়।—বাবা আমাকে বোধহয় বিক্রী করে দিয়েছিল, শান্ত। সেদিন আমিও বুঝিনে। তুমি তো ঘর-সংসার পাততে পারো। নিজেকে এমনিভাবে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

জানাই। দুনিয়ার চারপাশেই দেখেছি ওই দুঃখটাকে। ওটার বোঝা আর বাড়াতে চাই না সীমা। বেশতো, দিন কেটে চলেছে।

সীমা বলে,—অবশ্য মেয়েরা তাতে খুশীই হয়। কারণ কি জানো? তোমার মাঝে আমার হারানো অতীতের দিনগুলোকে যেন ফিরে পাই, শান্ত। তবু মনে হয় একজনের স্মৃতি-তে আমি বেঁচে আছি।

সীমার ডাগর কালো চোখের তারায় আলোর ঝিকিমিকি। ওর কথার স্বরে কি গাঢ়তা ফুটে ওঠে।

নির্জন সীমাহীন এই অরণ্যপর্বতের গহনে আমরা দুজনে যেন হারিয়ে গেছি। সীমা আর আমি—অতীতের অনেক বছরের এই ব্যবধান পার হয়ে ফিরে গেছি সেই নদীর সন্ধে-নামা ক্ষণটিতে ওর চোখে দেখে ছিলাম কি আশ্বাস।

—সীমা।

আজ সীমা সেই স্বপ্ন ভুলে গেছে। স্তব্ধ নির্বাক্‌ হয়ে সেই মুহূর্তগুলোর অসীমে হারিয়ে গেছে সে। এমনি করে নিজের বেদনার গহনে হারিয়ে যাবার দৈন্যকে সে এর আগে প্রত্যক্ষ করেনি।

ওর হাতখানা আমার হাতে। এমনি করেই পাশাপাশি আমরা বসতাম। ওর কবোষ্ণ নিটোল দেহের উত্তাপ আমাকে সঞ্জীবিত করে তুলতো। চুলের মিষ্টি সুবাস এখনও সেই গন্ধমদির স্মৃতিকে স্মরণে আনে। সীমার সারা দেহ-মনে কি দুর্বার কাঁপন জাগে, ওর সারা দেহ-মনে পাহাড়ী ঢল নেমেছে—হাতখানা কাঁপছে।

হঠাৎ চম্‌কে উঠি।

সীমা উঠে দাঁড়িয়েছে। কি ভেবে চলে গেল বাংলোর দিকে। পিছন ফিরেও চাইল না।

অতীতের সেই স্বপ্নজাল —বাস্তবের কঠিন আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে।

আমি একা পড়ে আছি এই আলোকবন্যার কূলে—সীমাহীন ঘুমনামা দিগন্তের এক কোণে।

কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইলাম।

বুধিয়া কি কাজ করছিল, আমার দিকে চাইল। ওর মুখ-চোখে কোনো ভাবান্তর নেই। ভাবলেশহীন কঠিন শীতল চাহনি।

মেয়েটার চোখে এই জড় চাহনি আমি দেখিনি, যখনই দেখেছি হাসি-খুশী ভাব। মেয়েটা হঠাৎ যেন কেমন বদলে গেছে।

চলে গেল সে ওদিকে। দাঁড়াল না।

একটু অবাক হই ওর এই কঠিন ব্যবহারে।

সীমার ওই চলে আসাটা বোধহয় ওর নজরে পড়েছে। মেয়েটা আমার দিকে স্থির সন্ধানী চাহনি মেলে কি দেখছিল।

আজ বাংলোয় আসর জমেনি। ওদিকে ওরা আসেনি—বোধহয় এড়িয়ে গেছে। তাই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম ওদের কোয়ার্টারগুলোর দিকে।

ওদের জগৎ নিয়েই ওরা রয়েছে।

সামনে কয়েকটা চন্দন গাছের প্রহরা, ঘন সবুজ পাতা নিয়ে গাছগুলো সজীব। কমলালেবু গাছে সবুজ ফলগুলোয় হলুদ রং ধরছে।

নিশীথের ঘরে আলো জ্বলছে।

আমাকে দেখে বের হয়ে এল সে। একাই কি করছিল।

—আসুন। আজ আর ওদিকে যাইনি। দত্তসাহেব কোথায় বের হয়েছেন ওই জিপে। বলে গেছেন নাকি বনে একটু ঘুরবেন।

নিশীথ বলে—ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে। দেখছেন তো ব্যাপার। এই চাকুরীতে প্রমোশন না হওয়া অবধি এই বনবাস আর বিড়ম্বনা আছে।

—চিঠিপত্র পেয়েছেন?

আমার কথায় হাসল নিশীথ। জানায় সে—সেইখানে কোনো ভুল করিনি আমি। বুঝলেন মেয়েদের মধ্যে একটা জিনিসকে আমি শ্রদ্ধা করি। নিষ্ঠা। ওটা ওদের আছে। শবরীও প্রতীক্ষা করেছিল চিরকাল। এতটা যন্ত্রণার মাঝে ওইটুকুই সান্ত্বনা আমার।

ওই স্বপ্ন নিয়ে ও থাকুক। ওর কাছে জীবনের এই সত্যটা সুন্দর হয়ে উঠুক। আমার কাছে যেটা মিথ্যা হয়ে গেছে—সেটা চিরন্তন মিথ্যা নয়। এটাও আশ্বাসের কথা।

সীমার গ্লানি—অনুশোচনা আমার কাছে ওটা নোতুন রূপে ফুটে উঠেছে।

নিশীথ এই আশা নিয়েই জীবনের সব দুঃখকে সহজ করেছে।

—থ্রি হার্টস্! হুঙ্কার ওঠে ওপাশের ঘরে।

প্রদীপ হুঙ্কার ছাড়ছে। দেবুও জমেছে ওখানে। ভটচায, প্রদীপ, মুখুয্যেমশায় আর দেবু। একজন গার্ডও জুটেছে ওখানে।

প্রদীপরা জিতছে। প্রদীপ আমাকে ওখানে আসতে দেখে অবাক হয়। বলে আপনি এখানে?

—কেন আসতে নেই? আপনারা তো ওপাড়া ছেড়ে দিয়েছেন দেখছি। একা-একা ভালো লাগলো না, তাই চলে এলাম।

প্রদীপ গর্জন করে। মথরো। চা হোক এক রাউণ্ড। জলদি, মুখার্জিদা বিস্কুট-ফিস্কুট আছে? অবকোর্স ইণ্ডিয়ান বিস্কুট।

বাধা দিই। চা-ই হোক। ওসব দরকার নেই।

প্রদীপ বলে। দত্তসাহেব যদি দ্যাখেন এখানে আমাদের ঝুপড়িতে আড্ডা দিচ্ছেন—আপনার সঙ্গে দেখবেন কথাই বলবেন না আর। প্রেস্‌টিস্‌ পাংচার করে দিয়েছেন ভাববেন উনি।

হাসছি ওর কথায়। জানাই,

—দত্তসাহেবের সাহায্য আমার নাহলেও চলবে ভাই। ওরা মাথায় থাকুন।

রাত হয়ে গেছে। তখনও দত্তসাহেব ফেরেন নি। সীমা বারান্দায় পায়চারি করছিল। আমার দিকে চাইল।

গম্ভীর থম্‌থমে চাহনি—যেন এড়াতেই চায় আমাকে। সেই নীরব দুর্বলতম মুহূর্তগুলোকে ও বোধহয় ভুলতে চায়।

খাওয়া-দাওয়া করে শোবার আয়োজন করছি। হঠাৎ জিপ-এর আলোর ঝলক ওঠে। গাড়িটা এসে থেমেছে ওপাশে।

কার মত্তকণ্ঠের গর্জন ভেসে আসে।

—অ্যাই স্যাল স্যাক্‌ দেম্‌, অল ফুলস্‌!

বের হয়ে আসি। দেখে অবাক হই। জিপ থেকে কোনমতে নেমে টলছে লোকটা—আর হাঁপাচ্ছে। সীমা ওকে থামাবার চেষ্টা করে।

—কি হচ্ছে! চুপ করো। ওরা রয়েছেন—

ড্যাম। অল্‌ বট্‌! কাউকে পরোয়া করিনা আমি। ইউ ডার্টি ডগ্‌!

সীমা ওকে কোনমতে ধরে সামলাবার চেষ্টা করে। ওর ভারি দেহটা টলছে—ছিটকে পড়ল বারান্দায় রাখা একটা চেয়ারের হাতলে লেগে।

সীমা ওকে টেনে তোলবার চেষ্টা করছে। আর সামলাবার জন্য কোনমতে ঘরে ঢোকানোর চেষ্টা করছে।

বারান্দায় বিরাট দেহটা পড়ে আছে আর গর্জন করছে।

একা অসহায় অবস্থায় সীমাকে টানাটানি করতে দেখে এগিয়ে গেলাম।

সীমা আমাকে দেখে চম্‌কে উঠেছে।

—তুমি। তুমি আবার কেন এলে?

—একটু সাহায্য করতে এলাম।

সীমা কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে।

এসব নোংরা ঘাঁটা আমার অভ্যাস আছে। এই পাঁকেই পচে মরছি, শান্ত।

দত্তসাহেব তখনও বিড় বিড় করে বলছে।

—হঠ্‌ যাও। এসব নোংরামি আমি বরদাস্ত করবো না। সিং কিং সিং কিং ড্রিং কিং ওয়াটার।

—কি বলছো এসব? সীমা ওকে থামাবার চেষ্টা করে।

এই বনজঙ্গলে কোথায় গিয়ে এসব গিলে এসেছেন তা খানিকটা অনুমান করতে পারি।

মিঃ দত্তকে সীমা তোলবার চেষ্টা করছে। দত্তসাহেব ধমকে ওঠেন,

—স্টপ ইট। এখন দরদ দেখানো হচ্ছে? ভালোবাসা! ছেনালি অমি ঘুচিয়ে দোব। কিক্‌ ইউ আউট।

সীমার দিকে চেয়ে থাকি।

সীমার সম্বন্ধেই ওই মন্তব্যগুলো করে চলেছে ওই বিশ্রী লোকটা এই মত্ত অবস্থাতেই। সীমা আমার দিকে চাইল। কান্নাভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে সে,

—আরও দেখতে চাও, কি গৌরব আর আনন্দ নিয়ে ধন্য হয়ে বেঁচে আছি? খুব খুশী হয়েছো না?

দত্তসাহেব বিড় বিড় করে।

—এগেন দ্যাট নন্‌সেন্স। সাট্‌ আপ। কি খারাপ আছো। এ্যাঁ। ভিখেরীর রাজ্যলাভ হয়েছে—এগেন কম্‌প্লেন? ইউ সোয়াইন।

সীমা যেন আর্তনাদ করে ওঠে আমার উদ্দেশ্যে।

—দোহাই তোমার, শান্ত। যাও—যাও এখান থেকে, প্লিজ।

—সীমা ! ব্যাপারটাই নিজে সইতে চায়। সে বলে চলেছে,

—এই নরকের জীবনে আমি তলিয়ে গেছি, শান্ত। দয়া করো, এরই মাঝে শেষ হতে দাও। এই আমার প্রায়শ্চিত্ত। তুমি যাও, যাও।

সরে এলাম। মত্ত লোকটাকে কোনরকমে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে। তখনও চীৎকার শোনা যায়।

বাইরে শান্ত নির্বিকার বনরাজ্য, আলোর বান ডেকেছে সেখানে।

সীমার ওই কান্না-ভেজা মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

তার জীবনের দুঃসহ বেদনাকে দেখিনি। আজ আবিষ্কার করেছি। এতদিন ভেবেছিলাম সীমা সুখে আছে, শান্তিতে আছে।

কিন্তু কোথাও সেই আশ্বাস নেই।

সব কিছু বেদনাতে নীল বিবর্ণ হয়ে গেছে।

প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের পশরাকে বিকিকিনির আসরে বাহবা দেয় ওই মানুষই। কিন্তু তাদের জীবন বেদনায় নীল। সেই যন্ত্রণার মাঝে এই অসীমে বোধহয় কি মুক্তির আশ্বাস আছে। ক্ষণিকের জন্য সেই অপরূপ প্রশান্তিকে প্রত্যক্ষ করেছি বহু বেদনায়—অনেক স্বস্তির আশ্বাসভরা মন নিয়ে।

—দাদা! দেবুর ডাকে ফিরে চাইলাম। ও জানায়—রাত হয়ে গেছে। ঠাণ্ডায় বাইরে থাকবেন না। তা ছাড়া বন-পাহাড়—কালই তো ভালুক এসেছিল।

শুধু ভালুক নয়, বুনো হাতির পালও দেখেছিলাম বাংলোর ওপাশের জঙ্গলে, বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। তাই ভিতরে এলাম।

মনটা বিষিয়ে গেছে। এই বন-পাহাড়ের ক'দিনের থাকার আনন্দটা কেমন বিকৃত বোধহয়। আরও দু- একটা দিন থাকার কথা রয়েছে কিন্তু মনে হয় বাইরের জীবনের অতীতের সেই দুঃখগুলো এখানেও ভিড় করেছে।

সীমাকে কেন্দ্র করে যে উজ্জ্বল স্মৃতির আকাশটুকু ছিল সেটা কালো মেঘে যেন ছেয়ে গেছে, তারার সব আলো নিভে গেছে সেখানে। এতখানি দৈন্য সেখানে যে কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে সেটা সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

ঘুমিয়ে পড়েছি কখন জানি না।

পাখীর কলরবে ঘুম ভাঙ্গে। পূবের আধখোলা জানলা দিয়ে দেখা যায়, শেষ চাঁদের আলো মুছে মুছে গিয়ে দিনের আলোর ইশারা এসেছে, পাখীগুলো তাই কলরব করছে।

কথাগুলো ভাবছিলাম। চাঁদ তখনও ওঠেনি। পূর্ণিমার কয়েক দিন পরের রাত্রি। চাঁদ একটু দেরীতে উঠবে। তার অস্তিত্বটুকু পাহাড়ের মাথায় সবে প্রকাশ পাচ্ছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, জোনাকী জ্বলে বনরাজ্যের জমাট অন্ধকারে। বুধিয়ার ডাকে ফিরে চাইলাম।

রাজু হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেছে। ম্লান আলোয় ওর দিকে চাইলাম।

হাতের পোষ্টকার্ডটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে বুধিয়া—সিতাইকে একটো চিঠি লিখে দে কেন্নে?

মেয়েটার মুখে-চোখে কি বেদনার ছায়া। দুপুরের দেখা সেই মাধাই মাঝির কথা মনে পড়ে। সেও এমনি অসহায় অন্তহীন প্রতীক্ষায় রয়েছে তার সব হারিয়ে।

কিন্তু তার তুলনায় বুধিয়ার অনেক কিছু আছে জমি-জারাত ঘর, যৌবন, তার জন্য অনেক পুরুষই তার কাছে আসবে। তার কাছে আসার চেষ্টাও করছে। ওর নিটোল পুরুষ্ট সুন্দর দেহটাকে ঘিরে অরণ্যের শ্যাম সঞ্জীবতা উন্নত বুকের রেখায় যৌবনের উম্মাদনা, ও চায় সেই সিতাইকে। কিন্তু সে চাওয়ার মধ্যে কোনো সত্য আজ নেই, এই কথাটাই সে বুঝতে পারেনি।

জবাব দিই—সে পালিয়ে গেছে, তবু তার জন্যই এত কাঁদিস কেন? সে কি তোর কথা মনে রেখেছে?

বুধিয়া আমার দিকে চাইল। কালো ডাগর দু'চোখে শাওন মেঘের কালো ছায়া নেমেছে, ওই রাতের অন্ধকারে থমথমে পাহাড়ের নির্জনতার ছায়া ওর মনে।

বলে চলেছি।—ও সব পাগলামী ছেড়ে দিয়ে আবার বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার কর। কতো ভালো ছেলে আছে, তোদের মধ্যে, তাদেরই একজনকে দেখে-শুনে বিয়ে কর।

হঠাৎ শান্ত কালো পাহাড় বনের মাথায় যেন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, গুরু গুরু কাঁপছে আকাশ-বাতাস। ঝড় উঠেছে কোথায়।

অস্ফুট কণ্ঠে বুধিয়া আর্তনাদ করে ওঠে—বাবু!

ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ওর দিকে চাইলাম। সেই কমনীয়তার আড়ালে এমনি কঠিন একটি সত্ত্বা লুকানো ছিল তা জানতাম না, মেয়েটি বলে,

—সাঁওতালদের মধ্যে কুন মেয়ে একপুরুষ থেকে অন্য পুরুষে গেলে তাকে সাতাশীর মজলিসে গায়ের বসতির বাইরে করে দেয়। তাকে বলে লষ্টা। বংহা-বুরু কেউই তাকে বাঁচাতে পারে না। শুনেছি বটে পড়ালিখা জানা মেয়েগুলান ইসব করে। সাঁওতালরা করে না। উ কথা কাখুকেই বলিস না কুনদিন। হ্যাঁ—

বুধিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। সতেজ বলিষ্ঠ দেহটা কঠিন হয়ে ওঠে। অজানতেই ওকে বোধহয় চরম অপমান করেছি।

সকালে বাংলোর ওই দিকে যাইনি।

নিশীথ আজ ব্যস্ত থাকবে, সাহেব নাকি ওসব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে চান।

সকালেই চা ও সামান্য কিছু খাবার খেয়ে আজ প্রদীপকে নিয়ে রাঙ্গা বস্তিতেই যাবার জন্য বের হয়ে পড়লাম।

মুশাই সর্দার নিজে এসেছিলেন একবার তার ওখানে যাওয়া উচিত, এইটা নাকি এখানের ভদ্রতা। ভটচার্যও সঙ্গী হয়েছে।

বাংলোর পরিবেশ একদিনে বিষিয়ে উঠেছে। সীমার সেই কথাগুলো এখনও ভুলি নি। ওর দুঃখ বেদনা ওরই থাক, আমার জগৎ নিয়ে শান্তিতে থাকতে চাই।

সীমা হারিয়ে গেছে অনেকদিন আগে। তাকে আর না দেখতে পেলেই খুশী হতাম। কাল রাতের সেই মুহূর্তগুলো ভুলিনি, বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের আবেগ নিয়ে আছড়ে পড়েছিল—কী বেদনায়, হতাশায়!

কিন্তু কি এর সার্থকতা!

মুশাই সর্দারের ওখানে গিয়ে ভালোই করেছিলাম। গভীব বন পার হয়ে উঁচু পাহাড়ের কোলে একটু তাকের মত সমভূমি, চারিদিকে তার গহন বন। ঝর্না পাহাড়ের বুকে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে কলকলিয়ে নামছে।

নির্জন ছন্দমুখর একটি সবুজ জগৎ।

মুশাই সর্দারের আতিথেয়তা মুগ্ধ করেছে আমাকে, বুড়ো নিজে তদারক করে গরুর টাটকা দুধ দুইয়ে আনালো, চিঁড়ে গুড় আর পাকাকলা। সঙ্গে সেই দুধ ঢেলে দেয়।

—জল খাই খাবে মাই?

—এতো!

হাসছে বুড়ো। সহজ শিশুর মত সেই হাসি। আমরা নাকি খেতেই পাই না। পেট মরে গেছে। এর তিন গুণ চিঁড়ে বুড়ো সর্দার এখনও চিবিয়ে খেতে পারে।

রতন মাঝির কথা মনে পড়ে। তার কাছে পেয়েছি অন্য ধরনের ব্যবহার। সে করেছে সন্দহ হয়তো ঘৃণা আর মুশাই সর্দার বুকে টেনে নিয়েছে আমাদের।

ঘুরে ঘুরে দেখালো বুড়ো ওদের ধর্মগোলা, সমবায় সমিতির কাজকম্মো। ইস্কুল বাড়িতে ক্লাশ হচ্ছে—মাস্টার ছেলেপুলেরাও বের হয়ে এল। এই ডুংরীর কয়েকজন ছেলে পুরুলিয়াতে পাশ করে ভালো চাকরী করছে।

এ গ্রামের ঘর বাড়িও অনেক ডুংরীর তুলনায় ছিমছাম। বসতিতে সমৃদ্ধির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। বেশ কিছু জারসী ধরনের গাই গরুও রয়েছে। ওরা সমবায় সমিতি থেকে দুধ বাই চালান দেয় বাঁকবন্দী করে। ঘি-ও তৈরী করে বাইরে পাঠায়। ঝর্নার জলে আড়বাঁধ দিয়ে তরিতরকারীও উৎপন্ন করে। ফুলকপি টম্যাটো— বেগুন সবকিছুরই গাছে সবুজ হয়ে আছে বিস্তীর্ণ ক্ষেত।

বুড়ো নতুন উদ্যমে তার জনপদকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, বলে সে,

—কেনে হবেক নাই গ! মানুষটিকে আসলে ভালো হতে হবেক। ফুলটিতেই পোকায় ধরলো তালে?

বুড়ো হাসতে থাকে।

বৈকাল হয়ে গেছে বাংলোয় ফিরতে। বনের মধ্যেও কিছু মানুষের অক্লান্ত চেষ্টা, নতুনকে মেনে নেবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম দেখলুম।

অযোধ্যা ব্লকের বি,ডি,ও-সাহেবও একদিন এসেছিলেন। তরুণ ভটাচার্য-এর বয়স বেশী নয়—তবু অভিজ্ঞতা প্রচুর। সঙ্গে ছিলেন এগ্রিকালচারাল অফিসার। ওরা এই বনপর্বতে রকমারি চাষের কথা তুলেছিলেন।

ওরা জানিয়েছিলেন—এই আদিবাসীরা আলু কপি টম্যাটো এ-সব চাষ পছন্দ করে না। আলুবীজ লাগাতে দিয়েছিলেন তারা, ওরা নাকি রাতারাতি সেই সব আলুবীজ তুলে খেয়ে নিয়েছে। বলে বাবাটো ইখানে সরষো লাগাইছিল, বাজরা বুনেছিল বটে, আমিও তাই বুনছি হে। কাজ কি হবেক উসব আল্লু-থালুক চাষ করে?

ওরা চিরাচরিত পথ ছাড়তে চায় না।

কিন্তু এদিকে যা দেখে এলাম তাতে ওদের কথাটা যে সর্বত্র সত্যি নয় তাই মনে হল। অবশ্য এই পরিবতন এনেছে ওই বুড়ো মুশাই মাঝি, এদিকে রতন ওসব কথা ভাবে না। কারণ এদের অভাব ঘুচলে তার কৃতিত্ব—ওই শোষণ চলবে না।

বাংলোর কাছে এসে দেখি লগ-কাঠের রোলাগুলো ট্রাকে উঠছে! কামতাপ্রসাদই ওইসব মাল কিনেছে। ওকে দেখলাম সাহেবের সঙ্গে জিপের সামনে কথা বলছে। দত্তসাহেব এখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, সিগ্রেট টানছেন আর কি হাসি মশকরা করছেন কামতাপ্রসাদের সঙ্গে।

রতন তদারক করছে ওই মালগুলো তোলার। ভেবেছিলাম ওরা চলে গেছেন, শূন্য স্তব্ধ বাংলোয় গিয়ে ঢুকলো, কিন্তু যাবার মুখেই যে দেখা করতে হবে আবার তা ভাবিনি।

দত্তসাহেব বলেন—কোত্থেকে ঘুরে এলেন মশাই?

—রাঙ্গা বস্তিতে গিয়েছিলাম, মুশাই সর্দারের ওখানে। অবাক হন তিনি।

—এই ডেঞ্জারাস বন পার হয়ে সেখানে গেছলেন? একটা হাতি মাক্না হয়ে ঘুরছে, ভালুকও রয়েছে ওদিকে। তবুও বনে বনে ঘুরে একটা বিপদ বাঁধান—শেষকালে বিপদে পড়বো আমরা? প্লিজ্ ওসব রিস্ক নেবেন না।

উপদেশ নয়, যেন আমাকেও আদেশ করছেন তিনি। ধন্যবাদ দিই ওঁকে। এই ভাবেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভিতরে গেলাম।

হঠাৎ চমকে উঠলাম সীমাকে দেখে।

সেই রাতের দেখা মেয়েটির সেই বেদনা—ওর মুখে আর নেই। নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে—দামী শাড়ি, গহনা আর প্রসাধনেব অভাব ওর নেই।

আমাকে দেখে বলে—দেখা না করেই এড়িয়ে থাকার জন্য সরে গেছলে তা জানি।

ওর দিকে চেয়ে থাকি। সীমা কাছে এগিয়ে এসেছে ওর হাতখানা আমার হাতে, চোখের তারায় কি উজ্জ্বলতা। ওর নরম কবোষ্ণ দেহের জোয়ার আজ সারা শরীর যেন জ্বলে যাচ্ছে।

সীমা বলে—হয়তো আমাকে ঘৃণা করবে। কিন্তু মনে হয় কি জানো? এ ছাড়া পথ কই? সবাই এই আদিম অরণ্যে হারিয়ে গেছি।

—দেখা না হলেই ভালো ছিল সীমা।

সীমা চাইল টল্‌টলে চাহনি মেলে। জবাব দিল না।

একটু চুপ করে থেকে সে বলে—চললাম। বললেও আমার ওখানে তুমি যাবে না, তবুও আমন্ত্রণ করে গেলাম।

হঠাৎ দরজার সামনে বুধিয়াকে দেখে সরে দাঁড়াই। সীমার চোখে মুখে সেই বেদনার আভাস। বুধিয়া দেখছে আমাদের দুজনকে। হঠাৎ জানায়—সাহেব ডাকছে।

সীমা বের হয়ে গেল, হারিয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই, হঠাৎ অন্ধকার আকাশে বিজলীর ঝলক তুলে এসেছিল একটি দিন, আবার হারিয়ে গেল সেই অন্ধকারে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি শূন্য মনে। বাইরে জিপটার ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। ওরা চলে গেল, গাড়িটা বাংলোর বাগান পার হয়ে হাতিনাদার জঙ্গলের ঘন শালবনের মাঝে ঢুকে গেল।

ফিরে চাইলাম, বুধিয়া নেই, মেয়েটা বের হয়ে গেছে।

দেবুও বোধ হয় ব্যাপারটা কিছু অনুমান করেছিল। ওর একটা গুণ যা সে দেখে আর তার অতীতকে খুঁজতে যায় না। বর্তমানের 'ফেস্-ভ্যালু' দিয়েই তার মূল্যমান করে।

তাই কোনো প্রশ্ন তোলে নি।

নিশীথ এসেছে বৈকালে। সারাটা দিন যেন ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর। বাংলোটাও শান্ত। আগেকার সেই প্রশান্তি ফিরে এসেছে চারিদিকে। আমিও ভুলে যেতে চাই সীমার কথা। এতদিন যেটুকু ক্ষীণ স্মৃতির আলো টিকেছিল তাকে শেষ করে মুছে দিতে চাই।

সীমা ওই নরকের জীবনকে ঘৃণা করবে, আরও নিবিড়ভাবে মেনে নেবে সেই জীবনকে, ওই পথ থেকে তার মুক্তির পথ জানা নেই। জ্বালা আর হতাশাকে ভোলার জন্য আরও তলিয়ে যাবে।

নিশীথ বলে,

—এসব হবে তা জানতাম।

কামতাপ্রসাদ একা নয়—অনেকেই আছে যারা চায় ওদের হাতে রাখতে, আমরাই শুধু নিমিত্তের ভাগী হই।

কি ভাবছে সে?

তবু বলে নিশীথ,

—দিন একদিন বদলাবেই দেখবেন। এসব রীতি-নীতিকে দূর করে সত্যিকার পথ খুঁজে নিতেই হবে।

চুপ করে কথাগুলো শুনছি। ওরা যৌবন—আগামী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এর স্বপ্ন দেখে, অনেক বেদনায় আর পরিশ্রমে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

নিশীথ বলে—তবু ওই রতন মাঝিদের এই উৎপাত আমি ঠাণ্ডা করবই। বুঝলেন, সাহেবের থেকে মেমসাহেবটি আর এক ডিগ্রী চড়া।—ওকে মেমসাহেবই নাকি বাঁদর নাচ নাচান।

ওসব প্রসঙ্গ শুনতে চাই না। সীমা যে তলিয়ে যাবে তা জেনেছি তাই ওসব ভাবতে চাই না।

—চিঠি। মুখার্জিবাবু এসে উঠলো দাওয়ায়। ও রোজই ডাকঘরের সেই চালায় যায়, নিশীথের হাতে তুলে দেয় একটা খাম। নিশীথ ঠিকানা নিয়ে উঠে পড়ল।

মুখার্জি বলে—খাইয়ে দিবি কিন্তু।

ওরা ওদের এই ক্ষুদ্র জগৎ নিয়ে বেশ আছে। দেবুও গিয়ে ভিড়েছে ওদের তাসের আড্ডায়। চুপ করে বসে আছি একা আলোভরা বনরাজ্যে।

নিশীথ চলে গেছে তার ঘরে। ওর মনে একটা আশার সুর। ওকে শুধিয়েছিলাম,

—কলকাতায় যাবে এর মধ্যে?

নিশীথ জানায়,

—যেতে হবে চুঁচুড়ায়। তখন নিশ্চয়ই কলকাতায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। তখন চিনতে পারবেন তো?

হাসলাম। শুধাই।

—কেন পারবো না?

নিশীথ বলে—না, আপনি পারবেন জানি। তবু নানা কাজের মানুষ। তবু একট অনুরোধ করব, তখন কিন্তু আসতেই হবে। ইলাকেও চিঠি দিয়েছি আপনি এখানে এসেছেন। ইলাও খুব অবাক হয়েছে। আমাদের বেড়ানোব কথাও লিখেছিলাম। ওতো ভাবতেই পারে না এই গহন বনে আপনিও ঘুরবেন আমাদের সঙ্গে।

ও কিন্তু আপনার অনেক বই পড়েছে। কী খুশীই না হবে আপনাকে দেখলে।

ওরা স্বপ্ন দেখছে। সেই আনন্দের মুহূর্তে ওদের মিলন আসরে আমিও যাবো। তাই জানাই,

—নিশ্চয়ই যাবো তোমাদের বিয়েতে।

—কথা দিচ্ছেন তো?

—দিলাম।

ও খুশী হয়। ওর কাছে সব বাধা যেন দূর হয়ে গেছে। ও জানে একদিন তাদের সব প্রতীক্ষার শেষ হবে।

নিশীথ ফিরে গেছে ওর ঘরে। আমার চোখের সামনে ওদের মিলন আসরের সেই কাল্পনিক ছবিটা সত্যি হয়ে ওঠে।

আমার অন্ধকারের মন সেখানের আলোতেও যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সীমা সেই অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তুলেছে।

হঠাৎ কাকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইলাম। বুধিয়ার সঙ্গে ক'দিন বেশী কথা বলতে পারিনি। ওর চিঠিও লেখা হয়নি।

মেয়েটা তাই বোধহয় আবার এসেছে সেই অনুরোধ নিয়ে। ব্যাকুলতাকে অনুভব করি।

বুধিয়ার এই প্রতীক্ষার ফলশ্রুতি জেনেছি আমি আমার সেই প্রতীক্ষার মধ্যে। সীমাকে বহুদিন পর হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলাম, কিন্তু এ কোন্ সীমাকে দেখলাম?

সেই শুচিতা পবিত্রতার প্রতীক কুমারীর একটা কঙ্কালকে দেখেছি, সব বদলে গেছে নতুন জগতের নেশায়। হারানো সীমাকে আর খুঁজে পাবো না কোনোদিন।

তার অপমৃত্যু ঘটেছে।

সিতাই-এর তেমনি অপমৃত্যু ঘটেছে। হয়তো সেই ইটখোলার কোন ঝুপড়িতে কোন একটা দেহ-পসারিণীর ফাঁদে সে হারিয়ে গেছে। মদ গিলে মত্ত অবস্থায় খিস্তী করে ফেরে—সেই সহজ-সরল মানুষটির অপমৃত্যু ঘটেছে সেখানে।

মেয়েটাকে এই কঠিন সত্য কথাটা বলতে পারি না। তবু মনে হয় এ ভুল ওর একদিন ভাঙ্গবেই। বুধিয়া দাঁড়িয়েছিল, আমাকে দেখে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

ওদিকে রেডিওতে কি একটা চেনা সুর ভেসে আসে। এমনি চাঁদের আলো ভরা রাতে আমার সামনে সব মানুষগুলোর মুখই ভেসে ওঠে। ফণী নায়েকের কথা মনে পড়ে, রতন মাঝির কালো হাতখানা যেন ওই চাঁদের আলোটুকুকে ঢেকে দিতে চায়।

সীমাও হারিয়ে গেছে, এলোমেলো ভাবনার জাল বুনে চলেছি। সব ঘটনাগুলো যেন অদৃশ্য কোন সুতোয় গাঁথা, নিশীথ তারই একটি চরিত্র।

ওরা ভালোবাসে—কিন্তু জানে না এ পৃথিবী শুধু বেদনায় নীল। এখানে ভালোবাসার কোনো দাম নেই।

সেই ভালোবাসার রঙীন পাপড়িগুলো হতাশার স্তব্ধতায় বার বার ঝরে যায়।

—বাবু!

বুধিয়ার চোখে কি জ্বালা ফুটে ওঠে।

বলে সে—ওই সাহেবের বৌটার মত সবাই, না? তাই ভাবিস।

ওর দিকে চাইলাম। অবাক হয়ে গেছি ওর কথায়।

সীমার সেই সান্নিধ্য আর সেই মেলামেশাটা ওর নজন এড়ায় নি। সেটাকে ওরা ভালো চেখে দেখে নি। সেই সঙ্গে ওর কাছে আমার মূল্যবোধও অনেকখানি নেমে গেছে।

ওকে বলি,

—কি বলছিস যা তা?

বুধিয়া বলে,

—তোমার মত লোককেও ভুলাইছিল। আর সাহেবটা মাতাল—নাহলে কামতাপ্রসাদের ঘরে যায়?

ছোটলোক কোথাকার? বৌটাও অমনি। তাই তু ভাবিস সব মেয়েছেলেগুলানই অমনিই। বেসরম-বদজাত?

ওর কথায় জবাব দিলাম না! ওকে বোঝাতেও পারবো না আমার সেই সর্বহারার বেদনা। যে প্রতীক্ষা নিয়ে ও বসে আছে—আমার কাছে সেই প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

মেয়েটা দাঁড়ালো না।

আদিবাসী একটি নিষ্পাপ মেয়ের চোখে সীমা যে বিকৃতির পরিচয় দিয়ে গেছে, আমাকেও তার কালিমা অনেকখানি স্পর্শ করেছে।

—দাদা।

দেবুর ডাকে ফিরে চাইলাম! ও শোনায়,

—অদ্য শেষ রজনী। এতদিন বেশ কাটলো এখানে। আবার সেই কলকাতায় ফিরে গিয়ে শুধু দিন কাটানোর লড়াই-এ নামতে হবে।

ওর কথায় মনে হয় সেই বিড়ম্বনার দিনগুলো। অনেককিছু হারিয়ে, খানিক সঞ্চয় নিয়ে ফিরে যাবো, হারিয়ে যাবে সীমা।

কোনদিনই তার পথ চেয়ে আর থাকবে না।

এই নীল নির্জন স্মৃতিটুকু তবু থাকবে।

রাজু জানায়—খাবার তৈরী।

দেবু বলে—দাও। আবার কাল ভোর থেকেই গোছগাছ করতে হবে।

খেতে গেলাম। বাংলোটা কেমন শূন্য হয়ে গেছে। এই শূন্যতা আমার মনের মধ্যেই জেগেছে। এখানে এসে পেয়েছি অনেক, হারালামও অনেক। লাভ ক্ষতিব হিসাব খতিয়ে দেখি না।

এখানের আদিম মানুষগুলোর কথাও মনে হয়।

অন্যায়কে ওরা অন্যায় বলে। আপোয করে না তার সঙ্গে।

পাথরের মত কঠিন ওরা—সবুজের অন্তরালে একটা কাঠিন্য ওদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। বুধিয়ার মনেব অতলেও সেই ঋজু বলিষ্ঠতা আমি দেখেছিলাম।

শহুরে মন নিয়ে ওর স্বার্থের দিকে চেয়েই ওই কথাটা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে যারা অভাবটাকে আমল দেয় না—অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না, তাদের কাছে এই প্রয়োজন অতি সামান্যই। তার জন্য নীতিকে বিসর্জন দিতে তারা পারে না।

শহরের মানুষ তা পারে। ওদের কাছে সত্য আর নীতির দাম বোধহয় কানাকড়িরই সমান। অথচ এদের কাছে সেইটাই অনেক বেশী মূল্যবান।

বুধিয়াও সেই সত্যটাকে আমার সামনে প্রকাশিত করে গেল। নিজেকে তাই অনেক ছোট বলেই বোধহয় ওর সামনে।

দেবু ঘুমিয়ে পড়েছে।

অযোধ্যা পাহাড়ে আজকের রাত্রিই আমাদের কাছে শেষ রাত্রি। কয়েক দিন-রাত্রি কাটিয়েছি এই বন নির্জনে, পার্বত্য ভূমিতে। শান্ত স্তব্ধ এ রাত্রি—কাল ফিরে যাবো আবার সেই বাতিজ্বালা চোখ ঝলসানো কর্মব্যস্ত জগতে। সেখানকার মানুষগুলো শুধু শুধু দৌড়ায় আর সামান্যতম স্বার্থহানিতেই উন্মাদ পশুর মত ঝগড়া করে।

এখানে ট্রাম নেই, বাস নেই, পয়সাও ছড়ানো নেই, যার বখরার জন্য মানুষ দিন-রাত পশু হয়ে থাকবে। সবচেয়ে বড় মানুষ নেই, তাই এ জগৎ শান্তির মধ্যে ডুবে আছে সেই আদিম ন্যায়-অন্যায়ের বোধ নিয়ে, আর অন্তরের ভালোবাসা প্রেমটুকুকে পাথেয় করে।

এদের সর্দার মুশাই মাঝিকে —দেখেছি ভগ্নপ্রায় অবস্থা। রাজ্য গেছে, সম্পদ গেছে, বন গেছে, তবু কোনো

দুঃখ নেই, অভিযোগ নেই। যা পেয়েছি তাই ঢের, এই মেনে সে শান্ত তৃপ্ত। পাহাড়ের মানুষগুলোর জন্য তার বেদনা, তাদের ভালোর জন্য, তাদের সুখ দেখার জন্য সে ব্যাকুল।

দেখেছি আমাদের চৌকিদার রাজুকে। দিন-রাত দৌড়ে দৌড়ে কাজ করছে। কোনো দাবী নেই—চাওয়া নেই।

বুধিয়াকেও দেখেছি, তার কথায় আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। ভালোবাসার এই মূল্যবোধ আজকের সভ্য মানুষের কাছে নিছক পরিহাসের বস্তু, কিন্তু এদের কাছে তার মূল্যবোধ স্বতন্ত্র।

ওর দুঃখ-বেদনা নিয়ে সে স্বপ্ন দেখবে। বনে বনে পাতা ঝরবে, শীতের শেষে রং বদলাবে বন-পাহাড়ের। বাতাসে জাগবে মহুয়া কুরুবকের মদির গন্ধ, ভ্রমর, মৌমাছির দল গুনগুন করবে; বর্ষায় কালো মেঘের দল বন-পাহাড়ের গায়ে ক্লান্ত চোখের জলে শাওনধারা আনবে, ডেকে উঠবে ময়ূরের দল—ওই মেয়েটা তখনও কার পথ চেয়ে থাকে ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়ে।

ওর চিঠি লিখে দিতে পারিনি, মনে হয় অপরাধই করেছি।

ফণী নায়েকের কথা মনে হয়। সব হারিয়ে কি যন্ত্রণা বয়ে বয়ে সে ফিরছে। রতনমাঝির লোভী হাতটাকে এরা মুচড়ে দিতে পারবে না। মুশাই সর্দারের পর ওই হবে এখানের প্রথম মানুষ, ভবিষ্যৎ। কামতাপ্রসাদও থাকবে, এদের শোষণ করবে। নিশীথের প্রতীক্ষা কবে শেষ হবে জানি না। তবু বলবো ওরা সুখী হোক।

রাত কতো জানি না। আজকের রাতটা যেন খুব ভালো লাগে। এদের এই জগৎকে নোতুন চোখে দেখি।

বন-বিভাগের বন্দী এই ছেলেদের কথা মনে পড়ে। সভ্য জগৎ থেকে এসেছে ওরা—এখানে তাদের সভ্য জগতের সম্পর্ক বলতে ওই তিনদিনের বাসি সংবাদপত্র আর ট্রানজিস্টার রেডিও।

ওরা বলে আমরা সভ্য জগতের খাতায় বাতিল হওয়া কয়েকটি প্রাণী। অবশ্য তার জন্য তাদের দুঃখ নেই। যদিও বা থাকে, সেটা সাময়িক।

বলে—কলকাতায় গেলে হাঁপিয়ে উঠি লোকজনদের ভিড়, আর ওই কারণে-অকারণে বোমা, ছুরি-মারামারির কথা শুনে। ট্রামে-বাসে উঠতেও পারি না। মনে হয় এই বনই ভালো—এখানেই ফিরে এসে ভাবি বহু দিন যেন এ জগৎ থেকে বাইরে ছিলাম। কি যেন হারিয়েছিলাম সেখানে, এখানে এসে আবার সেটা ফিরে পাই।

তবু ওদের মনে এই সঙ্গকামনার সাধ মুছে যায় নি। ওরা বলে, থেকে যাননা আরও দু-চারদিন।

কিন্তু আমাদের উপায় নেই। নাগপাশে জড়িয়ে আছি, মুক্তির স্বপ্ন আমাদের কাছে অর্থহীন।

রাতের অন্ধকারে জেগে উঠেছে বনরাজ্য। পাখীগুলো ডাকছে—একদল হরিণের চোখ জ্বলে বনের অন্ধকারে—হরিণ ডাকে, ময়ূর করলব করে।

পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে চাঁদটা কখন আপন মনে এই বনরাজ্যের আতিথ্য গ্রহণ করেছে—ভালোবেসেছে এই বন-পাহাড়, পাইন, শালবনকে। তার সেই ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়েছে রংবাহার নিয়ে। শির-শির্ শিহরণ জাগে ইউক্যালিপ্টাস বনে।

ভোরের আলো এসে পড়েছে জানালার ফাঁক দিয়ে—লাল আবীরের আভায় পাহাড়-সীমার ললাট রঞ্জিত।

ওখানে এই ফাগ্ খেলা চলবে প্রতিদিন, পাখীগুলো কলরব করবে—বাতাসে উঠবে ভিজে বনভূমির স্বাদ; গরু-মোষের গলায় কাঠের ঘণ্টা বাজবে অলস মন্থর সুরে।

সবুজ ক্ষেতে ফুটে থাকবে ঘন হলুদ সরষে ফুলগুলো, এ রাজ্যে আমি ক'দিনের জন্য এসেছিলাম! শূন্য মন নিয়ে, ফিরে গেলাম কি পূর্ণতার স্বাদে তৃপ্ত হয়ে।

মনে হয় দেবতার মহাকাব্যের দেশে এসেছিলাম হঠাৎ পথভুলে। মানুষগুলো এখনও সৎ, তাদের ভালোবাসার কথাও মনে থাকবে।

হঠাৎ উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে আরণ্যক-এর লবটুলিয়া নাড়াবইহারের দিনগুলো ফিরে এসেছিল, আর তাকে চোখে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম সেই সৃষ্টির মধ্যে।

তাই অযোধ্যায় এই বনরাজ্য তার বিভীষিকা, অসুবিধা আর আদিম বন্য-জীবনের দুঃখের মধ্যেও সুন্দর হয়ে আছে। সভ্য মানুষের জন্য এরা আমন্ত্রণ জানায়—যাতে আজকের আদর্শে গড়ে ওঠা লোভী মানুষ ক'দিনের জন্য এসেও জীবনের প্রকৃত চাওয়া আর শান্তির স্বরূপটাকে চিনতে পারে।

এ মন নিয়ে গেলে মনে হবে অযোধ্যা পর্বত, বন অপরূপ সুন্দর, সত্য।

জিনিসপত্র বাঁধা হয়ে গেছে। আজই ফিরে যাবো পুরুলিয়া শহরে এই পাহাড় থেকে নেমে। তারপর হারিয়ে যাবো জনারণ্যে ছায়ানিবিড় বনসমাকীর্ণ এই পাহাড় পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে খুশীতে উপছে পড়া এর টুর্গা জলপ্রপাত বামনি ধারা তেমনই বয়ে চলবে, দিন কেটে যাবেএই উপত্যকায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে। পাখী ডাকবে—বন্যজানোয়ার-এর দল বের হবে ধান-মকাই-এর ক্ষেতে, আরক্তিম সকাল, অপরূপ সন্ধ্যা, রহস্যময়ী রাত্রি নামবে এর বুকে।

আমরা তখন বহু দূরে। এ রাজ্য ভুলে যাবে দুদিনের যাত্রীকে। সে তখনও মহানগরীর পথে পথে কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে এতটুকু স্নিগ্ধতার অনুসন্ধান করবে—মনে পড়বে এই বনভূমির কথা।

জিপটা এসে গেছে—আমাদের ফেরার বাহন।

দেখি জিপ থেকে নামছেন স্বয়ং লাবণ্যপ্রভা দেবী। বৃদ্ধা এই বয়সেও ভোর থেকে উঠে এই শীতের ঠাণ্ডায় পাড়ি দিয়ে উঠে এসেছেন পঞ্চাশ মাইল পথ ঠেলে, এই আড়াই ফিট পাহড়ের মাথায়।

বলেন—ছেলেদিকে বনবাসে রেখে গেছলাম—নিতে এলাম বাবা।

নিশীথবাবুও এসেছেন ওর মুখে কি বিদায় বেদনার ছায়া। বলেন,

—আবার আসবেন কিন্তু। আর কলকাতায় গিয়ে দেখা করবো। আমার সেই দিনের কথাটা মনে রাখবেন কিন্তু। আসতেই হবে চুঁচুড়ায়।

হাসলাম—হ্যাঁ! নিশ্চয়ই যাবো।

প্রদীপ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কথা বন্ধ করে।

আলোভরা সকাল। শিশির ঝলমলে চাদর দোলানো পাইন বনে—শাল-মহুয়ার মাথায় পাহাড়ে পাহাড়ে জেগেছে দিনের আলো।

সভ্য জগতের মানুষের জন্যও কোথাও বোধহয় ঠাঁই ঠাঁই। নিঃস্বর্থ ভালোবাসার সবুজ স্মৃতি রয়ে গেছে। তাই মানুষ আজও মরে নি।

বন-বিভাগের ছেলেরা, গার্ড —অনেকেই এসেছে বিদায় জানাতে। ওদের মুখগুলো ভেসে ওঠে। ক'দিন বেশ ছিলাম। জিপটা বের হয়ে আসছে।

বাজরা ক্ষেতের ধারে দেখি দাঁড়িয়ে আছে বুধিয়া—কালো নিটোল মেয়েটা, দীঘল চাহনি মেলে চেয়ে দেখছে। ওর দু'চোখে এই বন-রাজ্যের প্রাণময় শ্যামলতা।

আজও বোধহয় সে সিতাই-এর পথ চেয়ে আছে। সিতাই আজও ফেরার, সে ফেরেনি সেই সবুজের জগতে।

আমরা সেই বন-জগৎ থেকে ফেরার হয়ে গেলাম। জিপটার আর্তনাদে বনভূমির নিস্তব্ধতা খান খান্ হয়ে যায়। নীচের সমতলের দিকে নামছি আমরা—পিছনে পড়ে রইল সেই ছায়া-তীর আর তার মানুষগুলো।

শেষের এই ঘটনাটুকু না বললে বোধহয় একটা সত্যকে প্রকাশ করা যাবে না। তাই এর অবতারণা। বছর খানেক কেটে গেছে বন-পাহাড় থেকে নেমে এসেছি। তবু মনে পড়ে সেই পাহাড় বনের কথা। মনে হয় চলে যাই আবার সেখানে।

সেবার যাবারও ঠিক করেছি, হঠাৎ ডাক এল সারান্দার বনপর্বত থেকে। তাই যাওয়া হ'ল না। নিশীথবাবুও লিখেছিলো, কিন্তু যেতে পারিনি।

কলকাতার কর্মব্যস্ততা এমনি সব ভুলিয়ে দেয়। তবু বন-পাহাড়ের স্মৃতিটুকু ভুলিনি।

পুজোর মুখ। বাইরে যাচ্ছি।

ভোরের কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে ওঠার জন্য গেছি। আলো জ্বলছে হাওড়া স্টেশনে। চায়ের স্টলে কাকে দেখে দাঁড়ালাম।

চেনা চেনা মুখ, গায়ে একটা আধময়লা চাদর জড়ানো। রাত্রি জাগরণের ফলে চুলগুলো উস্কোখুস্কো।

—চিনতে পাচ্ছেন?

—প্রদীপবাবু না?

বন-পাহাড়,পাইনবন, দুধনামা ইউক্যালিপ্টাসের গাছগুলো—পাহাড় রেখা আমার চোখে ফুটে ওঠে। মনে পড়ে ওদের কথা, সেই দিনগুলো, নিশীথ-এর চিঠি পেতাম মাঝে মাঝে—বেশ কিছু দিন পাই নি।

শুধোই—ওদের খবর কি? মুখুয্যেবাবু, ভটচাজ, নিশীথবাবু।

প্রদীপ আমার দিকে চাইল বিস্মিত বেদনাহত চাহনিতে, বলে সে।

—শোনেন নি নিশীথের কথা?

অবাক হই—বিয়ে থা হয়ে গেছে তাহলে? প্রমোশান পেয়ে বদলি হয়ে গেছে ওখান থেকে? আমাকে ও খবর দিল না? বলেছিল ওর বিয়েতে যেতে হবে।

প্রদীপ ধীর কণ্ঠে শোনায়,

—নিশীথ মারা গেছে।

চমকে ওঠি। সুন্দর হাসিতে উচ্ছল সেই তরুণটি আর নেই। সব আলো যেন এক ফুৎকারে কে নিভিয়ে দিয়েছে।

—কি বলছেন?

প্রদীপ শোনায় সেই ঘটনাটা। করুণ একটা কাহিনী, একটি আশাভরা জীবনের সব আশ্বাসকে ঢেকে দিয়েছে যেন একটা কালো মেঘ তার সব কালিমা দিয়ে। বলে চলেছে প্রদীপ,

—এই চোরাকাটাই-এর দলকে বাধা দিতে গিয়েছিল। বিরাট একটা দল যার পিছনে থাকে অনেক বড় বড় মানুষ। আমরাও নিষেধ করেছিলাম নিশীথকে। কিন্তু ও শুনল না। সেই অ্যাকসনে একটা বল্লম লেগে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে আসার পথে সব শেষ হয়ে যায়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রদীপের চোখদুটো ছলছল করে ওঠে। ও দেখেছে সেই আশার সমাপ্তিকে, স্বপ্নের অপমৃত্যুকে।

জানায় প্রদীপ, ট্রেন ছেড়ে দেবে। আমি যাই। এই ট্রেনে গিয়ে রাতেরবেলায় বলরামপুরে থেকে কাল সকালে অযোধ্যা হিলস্-এ পৌঁছাবো, নমস্কার!

বনের মানুষ ভিড়ে হারিয়ে গেল।

হাওড়ার এই কর্মব্যস্ততার মাঝেও কেমন নিঃসঙ্গ বোধ করি। বলেছিলাম দেখা করবে। তার বিয়ের রাতে যেতে হবে চুঁচুড়ায়, আর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে। তাকে দেখিনি।

সব ছাপিয়ে ভেসে ওঠে এমনি সকালের আলোকস্নাত সেই পর্বত শিখর আর বনরাজ্যকে, সেখানে এখনও সুর ওঠে। বুধিয়ারা কার পথ চেয়ে থাকে, নিশীথও থাকতো।

সেই জগতে সে আর নেই। কোথায় ফেরার হয়ে গেছে। বন-পাহাড়ের ছবিটা প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওখানকার সেই রূপকে ঘিরে জেগে ওঠে বিরহের সুর—বিচ্ছেদের করুণ পরিবেশ!

তাই যেন ওকে রূপময়ী, রহস্যময়ী বলে বোধ হয়!

নোনা গাঙ

এ রাজ্যে মানুষ আসে ভুল করে। মানুষের জগৎ এ নয়। কোথাও কোনোখানে মানুষের জন্য খাদ্যের কোনো সংস্থান নেই। গহন সীমাহীন বন, রাত্রির তমসা ভেদ করে কানে আসে হিংস্র শ্বাপদের মত্ত গর্জনধ্বনি, চোখের তারায় তারায় প্রজ্বলিত দৃষ্টি নিয়ে ফেরে জীবন্ত মৃত্যুর দূত। গাছে কোথাও মানুষের খাবার মতো ফল জন্মে না, নোনা মাটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বিশ্বাসঘাতকের মতো, ফল ফলানোর স্বপ্ন —ধানের মঞ্জরির মিনতিভরা চাহনি এর দিকে কখনও পড়েনি। জল। জল—আর জল। কিন্তু গহিন কাজল-কালো তৃষ্ণাহারি পানীয় এ নয়। পঙ্কিল লবণাক্ত সমুদ্রের ভীষণতামাখা এর প্রতিটি বিন্দু, মাঝে মাঝে কোথাও এর বুকে ভেসে রয়েছে ততধিক কুৎসিত শেওলাপড়া কুমিরের দলছাড়া কোনো বৃদ্ধ পিতামহ, চলতি নৌকার ধার ঘেঁসে চলছে কমটের ঝাঁক, যদি কোনো খাদ্য ছিটকে পড়ে সেই আশায় এক একবার লেজ ঝাপটা দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। জীবনের সঙ্গে সন্ধিপত্রে কোথাও এই পরিবেশের স্বাক্ষর পড়েনি, অদৃশ্য অচ্ছেদ্য সম্পকমাত্র একটিই বর্তমান তা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে বিদ্রোহের — ধ্বংসের।

তিন্দিন তিন রাত্রি ধরে চলেছি ভাটার টানে—সমুদ্রের দিকে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে। এখনও একভাটি গেলে তবে পৌঁছব 'লোথিয়ান আইল্যান্ডে'। সেই একই দৃশ্য, নদীর প্রসার বেড়ে চলেছে, অন্যপারের বনানী পরিষ্কারভাবে চোখে পড়ে না, একটা ক্ষীণ কালো রেখা কে যেন দিগন্তের কোলে টেনে রেখেছে।

সুরমান বাওয়ালি হালে বসেছে, সাড়ে তিনশো মনের নতুন নৌকাখানা চার দাঁড়ে বেশ এগিয়ে চলেছে, নদীর দোলানিতে সারা শরীর দুলছে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছি নিঃসঙ্গ আমি—শূন্য দৃষ্টিতে এপাশের কেওড়া-গর্জন-পশুর গাছের ঘন সবুজ বনানীর দিকে; তিনদিন-তিনরাত্রি লোকালয় ছেড়ে এসেছি, মানুষের কণ্ঠস্বর শুনছি ওই বাওয়ালি পাঁচজনের, কুকুরের ডাক, পাখির ডাক—আজ তিনদিন কানে আসেনি, সমাজ আমাকে তার শান্ত নিবিড় আলিঙ্গন থেকে নির্বাসন দিয়ে বনবাসে পাঠিয়েছে।

—কই রে, গান গাইছিলি যে, থামলি কেন?

ছোকবা মাঝি ইয়াকুব ওদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সি, মাঝে মাঝে কারণ-অকারণে গুনগুন করে সারি গানের একটা কলি গেয়ে বসে। বুড়ো মাঝি সুরমান ধমক দেয়—চুপ কর, গান! এ জিনপরির বনে গান করতে নাই। চ্যাঙড়া ছাওয়াল কোথাকার।

ছেলেটা চুপ করে যায়। মানুষ এখানে তার সমস্ত কিছু সৌন্দর্য—সুকুমার বৃত্তিকে পিছনে ফেলে আসে এই মৃত্যুপুরীতে, সুর এখানে স্তব্ধ, হাসি এখানে জোর করে ফুটিয়ে তুলতে হয়—সে হাসিও যা রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়—তাকে আর যাই হোক কিছু বলা যেতে পারে—হাসি সে নয়।

আমার কথায় ইয়াকুব মুখ তুলে চাইল মাত্র। কোনো কথা না বলে দাঁড়ের টানে টানে আগুপিছু হটতে থাকে। একটা শব্দ কানে দিনরাত বাজতে শুরু হয়েছে, তা ওই দাঁড়ের ঝপঝপ ছন্দ।

বৈকাল নেমে এসেছে। ভাটার টানে মন্দীভূত হয়ে আসছে। আঙুল দিয়ে দেখাল একজন দাঁড়ি—এই সে কেওড়াসুঁত।

চেয়ে দেখি, বড় নদী থেকে বার হয়ে গেছে দূরে বাঁকের মাথায় একটা প্রশস্ত খাল—দুপাশে বিশাল কয়েকটা কেওড়াগাছ ঘন কালো ছায়ার অন্তরালে কী এক গোপন রহস্য আবৃত করে রেখেছে।

হালের মাচানের উপর থেকে সুরমান আলি সামনের দিকে চেয়ে আছে, মাঝিদের কথা স্তব্ধ হয়ে গেল, কী যেন একটা নিবিড় স্তব্ধতা নেমে এসেছে ওদের মুখে।

কথা কইল সুরমান—ভাঁটার টান কমি আসতিছে, জোরে যাতি হবে, নালি কেওড়াসুঁতে পৌচতি পারবা নি ...।

শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ওরা বাইছে নিরাপদ আশ্রয়টুকুর দিকে।

কোথাও জনমনুষ্যি নাই, এও বন—ওখানে বরং নিবিড়তর বনানী, তবু কেন ওরা ওখানে পৌঁছতে চায় জানি না। নীরবে বসে আছি।

ঘন কালো গাছের মাথায় মাথায় এসেছে আবছা অন্ধকারের স্পর্শ, বাতাসে ভেসে আসে দূরসমুদ্রের গর্জনধ্বনি, পশ্চিম আকাশের বুকে রঙের শেষ খেলা তখনও মুছে যায়নি। কোনো অধরা চিত্রকর আকাশজোড়া ইজেলের বুকে একরাশ লাল রং ছড়িয়ে নীচের দিক থেকে কালো কালিতে ঢেকে দিচ্ছে—নির্ধূম নীল আকাশের প্রশান্তি মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল ভীরু শঙ্কিত চাহনিভরা দু-একটা ছিটকে পড়া তারার ফুল, অঙ্গনে অযত্নে বেড়ে ওঠা সন্ধ্যামালতীর মতো।

—লা ইলাহা ইল্লালাহ্ মহম্মদ রসুল্লাহ—

সুরমান বাওলিয়া নেওয়াজ পড়ছে, আরও চার জন রয়েছে তার সঙ্গে। দিন শেষ হেয়ে গেল—এল সন্ধ্যা। নিবিড় প্রশান্তিভরা রহস্যাবৃত অন্ধকার। হঠাৎ গাছের ডালের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। বাঁধা রয়েছে একটা জীর্ণ বিবর্ণ লুঙ্গি—একটা ছেঁড়া মাদুর—আর একটা পুঁটলিমতো কী। গহন বনে—লোকালয় থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে—শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম বনের মধ্যে মানুষের স্পর্শমাখা কী এক রহস্য বাসা বেঁধেছে গাছের ডালে!

—ওটা কি সুরমান?

তামাক খাচ্ছিল সে নৌকার খোলে বসে, কল্কের লাল আভা পড়েছে গোঁফ-দাড়িভরা মুখের এক পাশে, চোখের দৃষ্টি ওর সুদূরপ্রসারী আগত অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—মজিদ বাওয়ালির কবর।

অকারণে যেন আধপাকা চুলভর্তি মাথাটা ও নোয়াল একটু।

কবর! বিস্মিত হয়ে উঠি। মাটি বলতে জোয়ারেব পলিমাখা নোনা কালো কাদা, সমস্ত সুন্দরবনই প্রায় জোয়ারের সময় জলের তলে থাকে। এখানে কবর!

—বড় সাচ্চা মানুষ ছিল বাবু, ওরই দোয়ায় আজ বনে বনে কাজ কাম করতিছি।

কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুক চিরে বার হয়ে আসে।

চুপ করে আবার তামাকে মন দিল, কী যেন রহস্য—একটা অব্যক্ত ইতিহাস চাপা রয়ে গেল ওর স্তব্ধতায়।

ঢেউয়ের দোলায় নৌকাখানি দুলছে। অন্ধকারের বুক চিরে একফালি চাঁদ চেয়ে রয়েছে থমথমে বনানীর দিকে, কাছেই ডাকছে হরিণের দল।

বনের মর্মরে জেগে ওঠে অবণ্যানীব জীবনস্পন্দন, ছইযের ভিতর বসে আছি র‍্যাগখানা মুড়ি দিয়ে। ওপাশে বসে সুরমান। হ্যারিকেনের পলতেটা নামানো, ক্ষীণ আলোটাও আড়াল করা হয়েছে।

—জল-জঙ্গলের কথা বাবু, কে জানে ডাকাতের ছিপও ঘুরি বেড়ায়, জন্তু জানোয়ার তো আছিই, বাতির নিশানা রাখতি নাই।

আবছা অন্ধকারে চেয়ে রয়েছি সুরমানের দিকে। ওর দৃষ্টি অতীতের জীর্ণ পাতাভরা ইতিহাসের ছিন্ন মলিন পুঁথি হাতড়াচ্ছে। জোলো হাওয়া রাতের হিমেল স্পর্শ নিয়ে আসে, মৃদু মৃদু দুলছে নৌকাটা—স্বপ্ন দেখি মা যেন দোলনার সামনে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান গেয়ে দামাল ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে বনের বুক থেকে অনেক দূরে কোথায় একটি গ্রাম। জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হয় এর ধমনিতে, এর মাটিতে ফসল ফলে সোনাধানের শিষে, গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদ আবির ছড়ায় মুঠো মুঠো করে দিগন্তপ্রসারী খেতের বুকে।

সুরমান তখন জোয়ান, নতুন গজানো কেওড়াগাছের মতো পুরুষ্টু সতেজ গড়ন; খালের ধারেই মজিদ আলির বাড়ি, কয়েক বৎসর থেকেই বাওয়ালির কাজ ধরেছে—দুপয়সা রোজগার করে মন্দ নয়, ছনের বেড়ার ওপরে টিনের ছাদন দিয়ে ঘর ফেঁদেছে দুখানা।

কাজকাম নাই। ধান পোঁতা আর ধান রোওয়ার সময় কাজ কিছু পায়—বছরের বাকি দিনগুলো খোদার

মর্জির দিকে চেয়ে থাকে, তাগড়া জোয়ান মরদ সুরমান, বিনি কাজে দিন গুজরান করতে মেজাজ চায় না। বুড়ি মা মাঝে মাঝে মুখঝাপটা দেয়।

গান করি, আর বাবরি চুল রাখলিই খাতি পাবি? কাজ কাম করতি হবে না? গিইছিলি আড়তদারের কাছে?

আড়তদারের ওখানে জনমজুরির কাজ মাঝে মাঝে মেলে, তাও ওই খোদার মর্জি অর্থাৎ কালেভদ্রে—বসে বসে তামাক খাও, ফুট ফরমাস খাটো, দুচার বস্তা ধান তুলে দিয়ে ডিঙি বেয়ে ওঘাটের হাটখোলায় যাও, ব্যস ওই পর্যন্তই, পয়সা চাইলেই আড়তদার সাদা খাঁকের কলমের উল্টোপিঠ দিয়ে গা চুলকে বলে—পয়সার কি কাম করলি রে সুরমান? লে একছিলিম তামাক নিয়ে যা।

সুরমান মায়ের বকুনি নীরবে হজম করে, যেমন করে হোক একপালি চাল ও জোটাবে; সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, হাটখোলার ওপাশে গণি মিঞার দলিজে বসে জারি গানের আসর, বাঁশের বাঁশিটা ছনের আড়া থেকে বার করে গামছাখানা গায়ে চাপিয়ে বার হয়ে যায়। ছিরু সাহাব দোকানে চৌদ্দ বাতির আলো জ্বলছে, ভুষোর মতো নরম পলিমাটির রাস্তাটা ধরে চলে সে, কোথায় জলাতে কে পাট জাঁক দিয়েছে তারই টকটক গন্ধ বাতাসে ভাসছে, বাঁশিটায় ফুঁ দেয় সে দলিজের কাছে এসে, সুরটা সকলেরই পরিচিত।

এত দেরি কেন রে?

সুরমান গিয়ে ঢুকল সেখানে।

গানবাজনার পর বাড়িমুখো হল যখন রাত কত জানে না, একফালি চাঁদ সে-ও ডুবে গেছে।

সন্তর্পণে বেড়াটা ঠেলে বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাড়ি ঢুকল, একটু শব্দ হলেই বুড়ির ঘুম ভেঙে যায়, বুড়ি মায়ের চেয়েও সাবধানী ওই সুরমান।

বেশ কাটছিল দিনগুলো, অভাব-অভিযোগ থাকুক তবুও সকালের স্বর্ণরৌদ্র তার মনে সুর আনত, সন্ধ্যার স্থির নীববতা প্রশস্ত কুলগাছি নদীর বুকে শয়ন বিছাত—বাতাসে বাতাসে কোথায় কদম ফুলের সৌরভ কাজলকালো বর্ষার আকাশ তার অন্তবেব সেই সুরপাগল মানুষটিকে ডাক দিত বার বার।

এমনি দিনে হঠাৎ চোখে পড়ল তার মরিয়মকে, কাশেম গাজির মেয়ে মরিয়ম। সতেজ বাড়ন্ত গড়ন, চোখ দুটোতে বর্ষার সজল আকাশের হাতছানি, মাথার একরাশ চুলের ফাঁকে গোঁজা একটা হলুদ রঙের কদম ফুল।

তুষখালির ছোট খালটার ধারে ডিঙি বেঁধে মাছ ধরছে সুরমান, মাছ দু-চারটে পেয়েছে—ছিপ সুতো পড়ে আছে জলে, ডিঙিতে বসে সুরমান বাঁশিতে ফুঁ দেয় সময় কাটাবার জন্য।

হঠাৎ পিছনে হাসির শব্দে ফিরে চাইল, কলাগাছ-সুপারিগাছের ঘন কালো ঘাটটাকে ঢেকে রেখেছে সবুজের আবরণে, নুইয়ে পড়েছে খালের জলে কয়েকঝাড় বাঁশ, নারকেল গাছের গুঁড়িপাতা ঘাটে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসছে খিলখিল করে।

ভালো বর্শেল তুমি, বাঁশি শুনিয়ে কি চারে মাছ ডাকতিছ?

মরিয়ম ওর বাঁশি এর আগেও জারি গানের দলে শুনেছে; তবে আজ খালের বুকে এমনি সবুজ শ্যামল বর্ষার মাঝে সুরটা যেন কী এক মায়ায় তাকে ডাক দেয়, বাবরি চুলগুলো সামলিয়ে বলে ওঠে সুরমান—মাছ না আসতে পারে, কিন্তু মানুষ যে আসিতেছে তা মালুম পেলাম।

মরিয়ম হেসে ফেলে—এ মানুষ তোমাব মনের মানুষ না হয়ে, দুশমন যে নয়, তা ই বা জানতেছ ক্যামনে?

সাপের হাঁচি বেদে চিনতে পারে বিবি!

মরিয়ম কথার জবাব দিতে গিয়েও আর পারে না, কী একটা দুর্বার লজ্জা শান্ত শ্রীতে তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলেছে। সুরমান এগিয়ে এসে ওর হাতে তুলে দিল একটা ভেটকি মাছের বড় বাচ্চা।

লও।

কী যেন বলবার চেষ্টা করে মরিয়ম, কিন্তু ঠিক প্রত্যাখ্যান করতে পারে না ওর মাছ।

এর পর থেকে কাজ আর একটা বাড়ল সুরমানের। বাড়তি কাজটা কাজই নয়, একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের নেশায় তাকে মশগুল করে রাখে।

দুপুরের নির্জনতা ঢেকে রেখেছে ছোট ছায়াভরা খালটাকে, নইয়ে পড়া বাঁশ গাছে বসে রয়েছে মাছরাঙা পাখি অর্ধনিমীলিত নেত্রে, দুপুরের হলদে রোদ কলাগাছের বুকে আলপনা কেটেছে আলোছায়ার, নারকেল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে মরিয়ম, ডিঙিটা গাছের নীচে খালধারে বাঁধা।

একটু ঘুরে আসবি চল মইরাম?

মরিয়ম ডাগর দুটো চোখের তারায় লহর তুলে বলে, বাপজি জানতি পারলি পিঠের চামড়া তুলি নেবানি?

বাবরি চুল নেড়ে জবাব দেয় সুরমান—নেক, তোর জন্যি 'জান'ই দিয়া দিমু।

ইস্।

ওর হাতটা সুরমানের হাতে, দুজনের চোখের দৃষ্টি কী একটা নিবিড় নেশার মাদকতায় ভরে উঠেছে। সুরমান আজ বাঁচতে শিখেছে—সব কিছু আজ সে দেখতে শিখেছে কী যেন স্বপ্নভরা দৃষ্টিতে। আরও কাছে টেনে নেয় মরিয়মকে, উছল হাসিতে তার উদ্যত হাতখানাকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে মরিয়ম।

আঃ দিনদুপুরে কী করতিছ ? সাহস তো ধন্যি তোমার?

সুরমান অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে, মরিয়মের সারা মনে জেগে উঠেছে কোনো নারী, যে চায় ভোগ করতে, জীবনের পরম-তৃষ্ণার অমৃতধারা পান করতে, নিজেকে সামলে বলে ওঠে মরিয়ম।—যাও, বেলা পড়ে গেছে, কেউ আসতি পারে।

সুরমানের মনে ধীরে ধীরে প্রথম প্রেমের স্বপ্নঘোর কেটে যায়, গেলাসে সদ্য ঢালা পানীয়ের ওপব বুদবুদ শেষ হয়ে গিয়ে বাস্তবরূপে দাঁড়িয়েছে সে।

কাশেম গাজির অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়, ছেলেমেয়ে বেচারার অনেক কটিই, রোজগারপাতি সে তুলনায় তেমন কিছু নয়, কোনোরকমে দিন আনে দিন খায়। ঈদের সময় হঠাৎ সুরমান আবিষ্কার করে, মরিয়মকে একখানা কাপড় যদি দিতে পারত সত্যি বড় খুশি হত সে, আব নিজেরও সাধ ওকে নিজের মনমতো করে সাজাতে।

কয়েকটা টাকার দরকার, সেদিন হাটখোলায় দেখেছিল নীলডুরে শাড়ির দাম চার টাকা, সারা নশীপুর চিনখালিতে সে চার পাঁচদিন জনমজুরের কাজে ঘুরে বেড়িয়েছে, কে দেবে কাজ? যার যার কাজ নিজেরাই গায়ে গতরে তুলে নিচ্ছে। আড়তদার ওর কথা শুনে একটু চুপ করে থাকে, খাঁকের কলম দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলে চার টাকা?

সুরমান চেয়ে রয়েছে ওর দিকে আশাভরা চাহনিতে, চোখের সামনে ভেসে ওঠা মরিয়ামের মুখখানা, শাড়িখানা হাতে দিলে কেমন করে ফুটে উঠবে মিঠে একটু হাসি ওর দুটো চোখের তারায়, কাছে টেনে নেবে সে।

স্বপ্ন ভেঙে যায় আড়তদারের কথায়—টাকা কই নামু? চাইর টাকা! আটগণ্ডায় হবেনি? লে বস্তাটা তুলে দে ডিঙিতে।

আড়তদারের দিকে চেয়ে থাকে সে স্থির দৃষ্টিতে, সব আশা-স্বপ্ন তার মিলিয়ে গেল কোন অসীম শূন্যে। নীরবে বার হয়ে এল সে। দিনের আলো সব যেন ম্লান হয়ে গেছে, বাতাসে বাতাসে কনকচাঁপা ফুল আজ গন্ধ মাতাল ইশারা আনে না।

কাজ করতে না পরেলে চলবে না, পয়সা চাই—রোজগারপাতি যার নাই মোহব্বৎ তার সাজে না। বুড়ি মা গজগজ করে, কী হল তোর, মুখে রা শব্দ নাই, এমন চুপ মেরে আছিস ক্যান?

বিরক্ত হয়ে মুখ খিঁচিয়ে ওঠে সুরমান—তবে কি চিল্লিয়ে হাট বানামু?

বৈকাল বেলায় মরিয়মদের বাড়ির দিকে চলেছে সে ক্ষুণ্ণমনে, হাতে একটা পুঁটলিতে রয়েছে কয়েক পালি বালাম চাল, ক্ষীর খেতে তাই দিয়ে আসবে, বাড়ির কাছে আমগাছটার নীচে এসে থমকে দাঁড়াল সে, মজিদ মিএগ্র ওদের বাড়ি থেকে বার হয়ে আসছে, মজিদকে আজ চেনা যায় না, নতুন লুঙ্গি, গায়ে পপলিনের কামিজ, তাতে রুপোর বোতাম বসানো, চুলও কেটেছে 'ফ্যাশন' করে, পান মুখে বেশ হাসি গল্প করতে করতে আসছে সে, কাশেম গাজি তাকে এগিতে দিতে চলেছে। মজিদ মিএগ্রর সারা মুখে-চোখে উপচে পড়ছে খুশির আভা, টাকের ওপর ফুরফুরে দু-এক গাছা চুলও নাচছে খুশির আবেগে।

গাছের আড়ালে দাঁড়াল সে, ওরা আপন মনে কথা কইতে কইতে পার হয়ে গেল।

মনটা আগে থেকেই বিগড়ে ছিল, হঠাৎ ওদের বাড়িতে মজিদ মিএগ্রর আসা-যাওয়া মনখাতির দেখে সারা মন জ্বালা করে ওঠে। বাড়িতে ঢুকেই মরিয়মকে সামনেই পেল, তার দিকে চেয়ে থাকে সুরমান। হঠাৎ সাজবেশের অর্থ ও কিছু বোঝে না। পরেছে চাঁপা রঙের চুমকি বসানো শাড়ি, হাতে গায়ে গোলাপী আভা ধরিয়েছে মেহেদি পাতার রঙে, চোখে টেনেছে সুর্মা।

কার জন্য এ অভিসার সাজ। ওকে দেখে মরিয়ম নীরবে মুখ তুলে চাইল মাত্র, অন্যদিনের মতো হাসির ঝরনা ফুটে উঠল না তার মুখে-চোখে। থমথমে বর্ষামেঘের মতো গম্ভীর নীরবতা লেগে রয়েছে তাতে।

...! শোন—

এগিয়ে এল মরিয়ম তার কাছে, হঠাৎ টলটলে দুটো চোখে নামল প্লাবন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মরিয়ম,—আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকবার চেষ্টা করে সরে গেল তার সামনে থেকে। আর এল না।

উঠোনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বার হয়ে এল সুরমান নীরবে। বৈকালের রোদ ম্লান হয়ে গেছে। খালের বুকে বেয়ে চলেছে অচেনা কত নৌকা বালাম তুলে, আকাশের বুকে চলেছে অমনি টুকরো সাদা মেঘের দল। সারাটা দিন কী এক দুঃস্বপ্নে কাটল তার।

সন্ধ্যার সময় গণি মিএগ্রর দলিজেও গেল না, বাঁশিটা নিয়ে বসে রইল খালধারে নির্জন অশ্বত্থগাছের নীচে। থমথমে অন্ধকারে শোনা যায় নদীর শব্দ আর রাতজাগা পাখির ডাক।

সারা মন তার শূন্য, হাহাকারে ভরে উঠেছে। এই দুঃখ বেদনার স্বাদ সে এর আগে পায়নি, সারা অন্তর অসহ্য বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে।

ঝরনা বয়ে যায় নীরবে, নীচে যখন নুড়িপাথর ঠেকে গতিরোধ করে তার, তখনই সেখানে জাগে ছন্দ, জন্ম নেয় 'সুর'। ভালো লাগার মূল সন্ধান করতে পারেনি, দুজনেই আজ দেখে তাদের অজ্ঞাতেই দুজনের মনের গোপনতম ঠাঁইয়ে রয়েছে তারা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে।

ছায়াঘেরা ঠাঁইটাতে বসে আছে মরিয়ম, সুরমানের বুকে তার মাথা। কান্নার বেগ তখনও থামেনি।

মজিদ মিএগ্র অনেক টাকা দিয়েছে বাপজানেক, সাত কুড়ি টাকা।

মরিয়মকে বিক্রি করবে তার বাবা। কাশেম গাজি সব পারে। অভাবের সংসার, ঈদের সময় মজিদই দিয়েছে পোশাক-আশাক। সাঁঝসকালে সেও ওঠ-বস করছে কাশেম গাজির সঙ্গে।

মজিদের ইতিপূর্বে তিনটে বিবিও রয়েছে, বিবিরাও বসে খায় না, মরিয়ম হলে চারটে হবে। শিউরে ওঠে মরিয়ম। বুড়ো টাক-পড়া ওই লোকটা, ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে, নাতি. বিবির দল, আবার তার দিকেও নজর দিতে ছাড়েনি। বিবিদিকে কারণ-অকারণে ধরে ঠেঙাতেও কসুর করে না। বনে কাঠের কাজ করে—যখনই বাড়ি আসে, বিবিমহলে প্রায় কান্নাকাটি পড়ে যায় তখন।

ওখানে যাবার আগে গাঙে ডুবে মরব আমি।

মরিয়মের গালে লেগে রয়েছে কয়েক ফোঁটা অশ্রু, সুর্মা মুছে গেছে চোখের জলে, সারা রাত সে কেঁদেছে, সুরমান তাকে কাছে টেনে নেয় নিবিড় করে—অশ্রুধোয়া গালে এঁকে দেয় চুম্বনরেখা। কী এক নিশ্চিন্ত নির্ভর নেমে আসে মরিয়মের সারা মনে, অদেখা প্রেমের স্পর্শ তাকে দুঃখ জয় করবার সাহস এনে দেয়।

কোথাও চলে যাই আমরা দুজনে।

মরিয়মের দিকে চেয়ে থাকে সুরমান। ওকে নিয়ে এই অনিশ্চিতের মধ্যে পা বাড়াতে সাহস হয় না।

অন্তরালে একটু ছোট্ট নাটকের অভিনয় হয়ে গেল। এদের অলক্ষে দুজনেই স্বপ্নবিভোর, কোনোদিকে খেয়াল নেই। মজিদ মিঞা ডিঙি বেয়ে যাচ্ছিল—খালে, কী যেন কৌতূহলবশেই ওদিকে নজর দিতে দেখতে পায় ওদের দুজনকে ওই অবস্থায়, ঘন গাছের আড়ালে চলেছে ওদের গোপন অভিসার।

টাকের ওপর রোদ চিনচিন করছে—তার ওপর ওই দৃশ্য, ভাবী বিবিসাহেবার কেচ্ছা, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু সামলে গেল। আগে ঘরে আসুক ওই খুবসুরত বিবি—তারপর পয়জার আছে। দুদিনেই ঠাণ্ডা করে দেবে ওই হাড়বজ্জাত মেয়েকে।

সুরমান ভাবছে, মরিয়ম আজ আশ্রয় চায় তার কাছে। কাশেম গাজিকে ঠাণ্ডা করে নিরস্ত করতে হবে কিছু টাকা দিয়ে, না হয় দুজনের পালানো দরকার। সেটা মন মানে না। টাকা ! যেমন করে হোক, যেভাবেই হোক, টাকা রোজগার করতেই হবে তাকে। মরিয়মকে সুখী করবে সে, ঘর বাঁধবে তারা দুজনে। বেড়ার ধারে ফুটবে বুনো জুঁই, সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বসবে বাঁশি নিয়ে। পাশে থাকবে আজকের এই মরিয়ম।

কী ভাবছ? মরিয়মের ডাকে মুখ তুলে চাইল সুরমান।

কিছুদিন সবুর কর, দেখি একটা কিনারা পাবই।

সুপ্ত পৌরুষ ভেসে উঠেছে সুরমানের দেহ মনে। বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে আর গালগল্প করে যে সুরমান দিন কাটাত সে উঠেপড়ে লেগেছে, রুজি রোজগার করতে হবে তাকে। বুড়ি ছেলের দিকে চেয়ে মনে মনে খুশি হয়। হঠাৎ একদিন মাকে বলে বসে সুরমান—চাকরি পেয়ে গেছি মা, খোরাকি আর মাসিক তিরিশ টাকা বেতন।

খোদার মরজি, বুড়িব চোখে মুখে ফুটে ওঠে আনন্দের আভা।

কিন্তু বাদাবনে যাতি হবে। বাওলিয়ার কাম। সুরমান বলে ওঠে।

বাদাবনে? কথাটা বুড়ির মনঃপুত হয় না। বাদাবনে শুধু জল—আর বন। বিপদ-আপদ সেখানে পদে পদে। যে মানুষের এখানে কিছু হয় না—পেট চলে না সেইই যায় বাধ্য হয়ে ওই কঠিন বিপদের মুখে। তার দিন তো কেটে যাচ্ছে. তবে সে কেন যাবে ওখানে?

বাধা দেয় মরিয়মও—না তোমাকে যাতি হবে না।

মরিয়মের দুচোখে নামে প্লাবন। দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধবেছে সুরমানকে কী নিবিড় বন্ধনে। সেখানে গেলে মানুষ ফেরে না।

তোকে আমার চাই মরিয়ম। সাত কুড়ি টাকা দিতে হবে তোর বাপজনকে, তারপরই চলি আসব, তখন দেখিস তোরে ছাড়ি যদি যাই—

মরিয়মের মন মানে না। এ কি এক বিচ্ছেদের জ্বালা। দিন কাটবে তার একা একা ওর পথ চেয়ে চেয়ে। এই ভালোবাসার এত জ্বালা সে যদি জানত জীবনে এ ভুল সে করত না কখনও, আজ নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছে সে তার অজ্ঞাতে।

অতীতের তীর হতে মধুগন্ধভরা বাতাস কি এক-না-জানা ফুলের সৌরভ নিয়ে আসে সারা মনে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুটো বিদায়ব্যথাতুর জলভরা চোখের চাহনি—বেদনার ভারে টলমল। আজকের সুরমানের চোখেও সে দৃষ্টি কী এক মধুর আবেশ আনে। দিন বদলে গেছে, বদলে গেছে পরিবেশ, বয়সের চিহ্ন পা ফেলে ফেলে তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে, জীবনের শেষ সীমান্তের দিকে, তবু সেই দুটো চোখের চাহনি আজও তাকে অনুসরণ করে চলেছে অহরহ, সে অসীম বেদনা ক্ষণিকের সীমা পার হয়ে অনন্ত যৌবনে মিশে গেছে।

অন্ধকার বনে বনে কাদের পায়ের শব্দ শোনা যায়, ছপ্ ছপ্ ছপ্। শিউরে উঠি—ডাকাতের ছিপের দাঁড়ের শব্দ কিনা কে জানে! হঠাৎ একটা মত্ত হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে বনতল—নদীর জলধারা। গর্জনধ্বনি

দূর নদীর ওপারের আকাশে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে। নৌকার বাসনগুলো ঝনঝন করে কেঁপে ওঠে। সারা শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেছে।

সুরমান বসে রয়েছে গুড়িসুড়ি মেরে, ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একটু দূরে নদীর উপবেই কেওড়া গাছের নীচে জ্বলছে দুটো চোখ—প্রজ্বলিত আগুনের ভাঁটার মতো। বাতাসে বোঁটকা বিশ্রী গন্ধ।

কোথায় গেল মরিয়ম—সেই সজল শ্যামল পরিবেশের স্মৃতি—যৌবনের কামনামদির দুটি মন সামনে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে মৃত্যু। জীবনেব সব সৌন্দর্য—কামনা—সৌরভকে নিঃশেষ কবে এই বনরাজ্যে ধ্বংসের দেবতা পেতেছে তার সিংহাসন।

আবাব ফিরে আসে প্রশান্তি বনের বুকে। নিবিড় নীরবতা মুখ বুজে রয়েছে অন্ধকারের আলিঙ্গনে। মাঘমাসের রাত্রি—আঁধারের সঙ্গে শীতের কুহেলি হাত মিলিয়ে নেমেছে বনভ্রমণে। কোন অশরীরীর ছায়া ঘিরে রয়েছে নৌকাটা! মধ্যরাত্রে বনভূমি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে—কান পেতে শোনা যায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ স্তব্ধ বনমর্মরে। আকাশজোড়া এক দেবতা পা ফেলে ফেলে চলেছে ওর বুকে।

পিছনে পড়ে রইল মরিয়ম, ছায়াঢাকা নশীপুরের খাল—ওদের স্মৃতি বুকে নিয়ে জোয়ান সুরমান বাওলিয়া এল এই রাজ্যে। মহাজনের নৌকাতেই থাকে-খায়, বনে কাজ করতে শিখছে।

বনের জীবন আর গ্রামের জীবন আশমান-জমিন ফারাক বাবু, এখানের আইন-কানুন আলাদা। প্রথম পা দিয়ে ভয়েই শুকিয়ে যাতি লাগলাম। সুরমান সেদিনের স্মৃতিগুলো ভোলেনি।

খালের বুকে জমেছে কয়েকটা নৌকা, এইখানেই বন কাটাই হবে। খাবারদাবার নৌকাতেই। মজিদ মিঞা ও সেই মহাজনের কয়েকখানা নৌকার হেড মাঝি অর্থাৎ সর্দার গোছের। তার হাঁক-ডাকে সকলেই অস্থির। সুরমান লোকটাকে সহ্য করতে পারেনি।

গোসল কবে নাস্তাপানি করে বনে ঢুকবি ভাত নিয়ে। খুব হুঁশিয়ার!

বনে স্নান না করে কোনো বাওলিয়াই পা দেয় না। বনবিবির পুজো দিয়ে তবে নামে তারা প্রথম বনে। সুরমান অবাক হয়ে চেয়ে থাকে এ পুজোর কোনো মন্তর-মোল্লা লাগে না। একটা গাছের ডালে চাঁদমালা ঝুলিয়ে দিল—খানিকটা সিন্দূর লাগিয়ে দিল গাছে, সবাই মিলে চিৎকার করে উঠল—বনবিবির, দোয়া লাগে। একটা মুরগিকে ছেড়ে দেওয়া হল বনবিবির নামে।

নৌকায় উঠে আসবে হঠাৎ দেখে লোকালয় থেকে আনা মুরগিটা বনের স্তব্ধ নির্জনতায় কেমন ভয় পেয়ে গেছে, করুণ আর্তনাদ করে ওদের পিছু পিছু এসে হাজির হয়—সেও নৌকাতে উঠে আসবে। ভাষাহীন দুটো চোখ দিয়ে সে অনুনয় করছে—এই গহন বনে আমাকে নির্বাসন দিয়ে যেয়ো না, নিয়ে যাও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের কাছে। আজীবন মানুষের সমাজে বাস করে বন্য পরিবেশ সে ভুলে গেছে। বড্ড মায়া হয় সুরমানের, মুরগিটাকে ধরে কোলে তুলে নেয়, আহা বেচারা! হঠাৎ মজিদের ধমকানি শুনতে পায়, বনবিবির মুরগি নৌকায় তুলবি! খবরদার, ছেড়ে দে—বেকুফ কোথাকার। বাদাবনের কানুন জানিস না?

পিছনে ফেলে এল তাকে। মুরগিটা তখনও খালের ধারে ধারে ছুটছে ওদের নৌকার সঙ্গে, ডাক পাড়ছে প্রাণপণে। নির্জন নীরবে বনে ধ্বনিত হয় ওর ডাক। সুরমানের দুচোখ জলে ভরে আসে—মরিয়মের কথা মনে পড়ে, আসবার সময় খালের ধারে ধারে সে এমনি বেদনাতুর দৃষ্টিতে তাকে অনুসরণ করেছিল কতদূর!

খেতে বসেছে সুরমান মাঝিদের সঙ্গে। থালা বলতে মাটির সরা—তাতে লাল ফাটা-ফাটা চালের ভাত আর তরকারি বলতে খানিকটা পেঁয়াজ কুঁচি, দু-এক টুকরো আলুর ভগ্নাংশ দিয়ে হাতা কয়েক লঙ্কার টকটকে ঝোল। ডাল আর তরকারি সব কিছুই ওই পদার্থটিই। সকালের নাস্তা। ভাতগুলো মুখে তুলতে পারে না। এ খাওয়া তার অভ্যাস নাই। চোখ ফেটে জল বার হয়ে আসে। চেয়ে দেখে অন্যান্য বাওলিয়ারা তাই খেয়ে চলেছে গোগ্রাসে অমৃত মনে করে।

দু-এক গ্রাস খেয়ে বাকিগুলো জলে ফেলে দেয় সুরমান, খাবার জলও মাপ করা। জলে বাস করছে

কিন্তু তা এক বিন্দু মুখে দেওয়া যায় না, তিনদিনের পথ পার হয়ে জালায় জালায় ভর্তি খাব'র জল নিয়ে যেতে হয়।

প্রথমে যেদিন বনে নামল সে, সেই স্মৃতি আজও ভোলেনি। ঘন বন, নিচু হয়ে পথ চলতে হয়, নোনা কাদামাটিতে উঠে রয়েছে গরানের শুলো, অসাবধানে পা পড়লে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে, হাতে হাতিয়ার বলতে একটা কুড়ুল আর কোমরে গোঁজা ছোট দা। সারা দেহমন অজানা আতঙ্কে ভরে ওঠে, কোথাও একটু শব্দ শুনলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে, কে জানে মৃত্যু কী বেশে অপেক্ষা করছে এখানে। গাছের ডালে ঝুলছে কোথাও বিষধর গোখরো সাপ উদ্যত ফণা বিস্তার করে—একটি মুহূর্ত—ধীরে ধীরে নেমে আসবে মৃত্যুর যবনিকা।

দুজনে গাছে কোপ মারছে, ছিটকে পড়ে কাঠের টুকরো। একজন নজর রাখে চারিদিকে। কোথাও কিছু দেখা যায় কিনা, অন্য জন গাছটাকে ফেলবার চেষ্টা করে।

বনে লুণ্ঠন করতে এসেছে মানুষ, বনদেবীর বাহনের দল সজাগ দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো অসতর্ক মুহূর্তে লুণ্ঠনকারীদের ঘাড়ে এসে পড়বে, পড়েও মাঝে মাঝে। তাই ওরা এইভাবে কাজ করে। হাত বুক টনটন করে সারাদিন কোপ দিয়ে। দুপুরের সময় সুরমান ওদের মতোই সেই ঠাণ্ডা ভাত আর লঙ্কার ঝোল ভরপেট খেল, দিনান্তে ফিরে আসছে নৌকায়। ক্লান্তি স্তব্ধ আতঙ্কে সারা মন ভরে উঠেছে। এ কোন্ জীবনে এসেছে সে।

সন্ধ্যাবেলায় আবার ফিরে আসে তার মনে নশীপুরের জীবন, গণি মিঞার দলিজে বসেছে জাবি গানের আসর, সে নাই। বাঁশি আর বাজবে না সেখানে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে মরিয়মের মুখ— সেই বিদায় বেলায় সজল চাহনি। বাঁশিটা বার করল সে। ফুঁ দিতে যাবে, কী ভেবে মুখ থেকে নামাল। এখানে বাঁশি সে বাজাবে না, সুর আসবে না, আর তাকে পিছনে ফেলে এসেছে ছায়াঢাকা সেই অতীত জীবনে। মরিয়ম এখানে স্মৃতি তবুও সব দুঃখকষ্ট জয় করবার সাহস আনে সেইই তার মনে।

পাশের নৌকায় টেমির আলোতে মজিদ সত্যপীরের দোয়া পড়ছে।

আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার
নবীর দোয়ায় হবে ভবনদী পার।

সুরটা ভেসে যায় কোন অসীম আঁধার ঘেরা বনরাজ্যে, ছইয়ের ফাঁক দিয়ে খালের জলে পড়েছে এক চিলতে লালাভ প্রকম্প আলো; বনের ভিতর হরিণের ডাক শোনা যায়। মনটা হু হু করে ওঠে সুরমানের—মরিয়ম! নীচের মানুষ অন্ধকার আকাশের বুকে মধ্যরাত্রে জেগে ওঠা ধ্রুবতারার সন্ধান করে—তেমনই ওর বেদনাহত সারা মন উন্মুখ হয়ে চেয়ে রয়েছে মরিয়মের স্মৃতির পানে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল জানে না, হঠাৎ কার ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল।

গণি মিঞার দলিজে বাঁশির সুরে যবনিকা পড়ল মজিদের ডাকে—ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে খাওয়াতে হবে? *মেহমান এসেছিস নাকি? ওঠ—কাজের বেলায় ঢু ঢু কেবল খাতি পারব।*

ফোঁস করে ওঠে সুরমান—খামু না।

হেসে ফেলে মজিদ—ওর ছেলেমানুষি দেখে। মায়া হয়—কেন ও এই কঠিন জীবনে এসেছে, সেই সত্যটা তার অজানা নাই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীত একটি দুপুরের ছবি, ছায়াঘেরা খালধারে ওর নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ দেখেছিল মরিয়মকে। সেই ক্ষণিক স্বপ্ননীড়কে ও পাকাপাকি করে গড়ে তুলতে চায়—তাই এই জীবনপণ সংগ্রাম।

বলে ওঠে—বাড়ি এটা নয়। মইরাম এখানে নাই যে গোসা ভাঙাবে। ওঠ—

সারা শরীরের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে মজিদের এই মন্তব্যে, সোজা হয়ে উঠেছে সুরমান, বাজে কাজিয়া করব না মিঞা। উ কোন কথা কও?

ঠিক কথাই কইছি রে জোয়ান। যা খা ল। তোর থনে উঠতি হবে।

কথা বাড়াল না মজিদ, সুরমান কোনো রকমে চাট্টি ভাত মুখে পুরে উঠে এল।

কয়েক দিন ধরে লক্ষ করছে মজিদ সুরমানের পরিবর্তনটা। কী এক অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাজ করে চলেছে। বাবরি চুল কেটে ফেলেছে তেল অভাবে, গায়ে নোনা গাঙের পানির দাগ, সারা দেহে কঠিন পরিশ্রমের ফলে পেশিগুলি ফুলে উঠেছে—চোখের সেই গ্রাম্য সহজ সরল হাসিমাখা দৃষ্টি মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে বন্য সন্ধানী সাবধানী দৃষ্টি—আর একটা ইন্দ্রিয় বন্য জীবনে স্বাভাবিকভাবে প্রবল হয়ে ওঠে তার ঘ্রাণশক্তি।

বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে আগামী বিপদের সন্ধান পায় সে।

মনে মনে মজিদ বাহবা না দিয়ে পারে না। মরিয়মই তাকে ধ্রুবতারার মতো পথ দেখিয়ে চলেছে বহু দূরে অদেখা জগতে থেকে। মোহাব্বতের গল্প শুনছিল সে, কিন্তু চোখের ওপর দেখছে তার দৃষ্টান্ত।

মজিদ বাড়ি যাচ্ছে। কথাটা শোনা অবধি কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে সুরমান। মজিদ বাড়ি গিয়ে এইবার মরিয়মকে ঘরে তুলবে। তার জীবনের এই কষ্ট—এই বিপদবরণ সব আশা স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মরিয়ম উঠবে তার ঘরে নয়—ওই আধবয়সি টেকো বৃদ্ধ শয়তানের ঘরে। কয়েক মাস চাকরি হয়ে গেছে তার—শ-দেড়েক টাকাও জমেছে, সেও বাড়ি যাবে। মজিদের সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়া হবে সেইখানেই। এখানে আর নয়।

মহাজনের নৌকায় গিয়ে উঠল সন্ধ্যাবেলাতে। তামাক টানছিল মহাজন, ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল। কিছুদিন থেকে লক্ষ করেছে সে সুরমানকে, কাজের ছেলে, কাজ বোঝে, হুঁশিয়ার।

কী রে?

বাড়ি যাব বাবু, বেতন মিটিয়ে দেন। এই চালানেই দেশে ফিরব।

তাই তো রে মজিদও যাব বলছে, তুই গেলে চলবে কী করে?

কথা কয় না সুরমান, গোঁ ধরে বসে আছে, আমারে যাতিই হবে। মায়ের শরীর খারাপ বুড়িরে শ্যায দেখা দেখতি পারমু না।

মিথ্যাকথাই বলল।

কথাটা মজিদের কানে যায়। হাসে মজিদ। জোয়ানটা বুঝতে পেরেছে তার মনের ভাব। এখানে এ বনে মানুষে মানুষে কোনো শত্রুতা করতে নাই, বনবিবির কোপে পড়বে।

মহাজনকে টিপে দেয় মজিদ—ওকে ছাড়লে আর আসবে না বাবু, কাজের লোক।

মহাজন শেষ পর্যন্ত আটকে ফেলল সুরমানকে। দেশ-গাঁ নয় যে পায়ে হেঁটে চলে যাবে, দেশে ফেরাও অনেক হাঙ্গামা এখানে। লোকালয় চারদিনের পথ—মাঝে দুর্গম বন—দুস্তর নদী সুরমানের সারা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কাম করমু না বাবু।

মহাজন বলে ওঠে, তোকে চল্লিশ টাকা করে দেব মাসে।

চটে ওঠে সুরমান, চল্লিশ কেন একশো দিলেও নয়।

মরিয়ম চলে যাবে তার জীবন থেকে অন্যকার ঘরে — সব আলো নিভে যাবে তার। কী এক অসীম নিঃস্ব হাহাকারভরা জীবন সে বয়ে বেড়াবে কল্পনা করতে পারে না।

তবু ছুটি সে পেল না। কাজকর্মে যায়নি দুদিন। কাল মজিদ মিঞা চলে যাচ্ছে দেশে। সুরমান ওর দিকে চাইতে পারে না—চোখে ভেসে ওঠে চর নশীপুরের জীবন, গানের সুর ছায়াঘেরা খালের পারে অশ্রুসজল মরিয়মের দুটো চোখ, সারা মন হাহাকার করে ওঠে। জীবন আজ অর্থহীন বলে মনে হয়।

থামল সুরমান। আজ থেকে কুড়ি বৎসর আগে ঠিক এই কেওড়াসুঁত্রের মুখেই সেদিন বন কাটাই হচ্ছিল। নৌকা বোঝাই হয়ে গেছে, আর কয়েকখানা বড় বড় গরান কিংবা সুন্দরী গুঁড়ি চাই নৌকার দুপাশে ঝুলিয়ে

দেবে ভারসাম্য বজায় রাখতে। ওই নৌকাতেই ফিরবে মজিদ, পড়ে থাকবে সুরমান এই বনরাজ্যে নির্বাসিত জীবনের বোঝা বইতে।

কয়েকজন বাওয়ালিকে নিয়ে নিজেই নেমেছে মজিদ দেখেশুনে। ঝলকাঠ কাটতে হবে মাপজোপ করে। কী ভেবে সুরমানও নীরবে গিয়ে তাদের ডিঙিতে উঠে বসল।

খালের ভিতর দিয়ে বনে ঢুকে নেমেছে তারা গাছের সন্ধানে।

গভীর গহন বন। সোজা উঠে গেছে পশুর সুন্দীর কেওড়াগাছের গুঁড়িগুলো, নীচে জন্মেছে গেঁওগাছের ঘন বুকভোর জঙ্গল, ঠেলে পথ করে যেতে হয়। সূর্যের আলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে কেওড়াগাছের বন, মানুষের পায়ের ছাপ এখানে পড়েনি।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস বয়ে যায়, থমকে দাঁড়াল সুরমান—সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চারপাশ চাইতে থাকে। নীরব নিস্তব্ধ বনভূমি। গাছের শুকনো পাতা কোথায় হাওয়ার বেগে ঘুরতে ঘুরতে নীচে পড়ছে। অন্তহীন বিশাল স্তব্ধতার মুখোশ পরে মৃত্যু হানা দিয়েছে ওদের উপর।

—ছায়াটা নড়ছে।

—সুরমান! হুঁশিয়ার!

মজিদ চিৎকার করে ওঠে। স্তব্ধ হয়ে গেছে সুরমান। সামনে অদূরে দাঁড়িয়ে মৃত্যু। পিঙ্গল ডোরাকাটা তার বিশাল দেহ, চোখ দুটোতে ঝলসে উঠছে অগ্নি-আভা, লেজটা নড়ছে মাঝে মাঝে।

যে যেখানে পেরেছে গাছে উঠে পড়েছে। সুরমানের সামনে গাছটা, ইচ্ছে করলে বাঁচতে পারত সে, কিন্তু নড়েনি এক পা-ও। চোখের সামনে ভেসে ওঠে চর নশীপুরের দিনগুলো—সেখানে নেমেছে অন্ধকার, মরিয়মের মুখখানা মুছে যায় তার চোখ থেকে—কে আর সে তার, সম্পর্ক তার সঙ্গে মুছে গেছে—সে হবে মজিদের বিবি। জীবনের সব আশা-আলো নিভে গেছে, দুঃসহ হয়ে উঠেছে জীবনের বোঝা। স্তব্ধ হয়ে যাক কোলাহল, নেমে আসুক মৃত্যুনিবিড় শান্তি।

সামনের পা দুটো ভেঙে বসেছে বাঘটা। চোখের দৃষ্টি রয়েছে ওর দিকে, মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে শ্বাপদ লালসার বিষাক্ত লালা। দাঁত দুটো দিনের আলোতে ঝলসে ওঠে।

মজিদ অবাক হয়ে গেছে—সুরমান মরছে। ঠিক মরছে নয়, নিজেকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর হাতে তুলে দেবার জন্য তৈরি হয়েছে। চমকে ওঠে মজিদ।

হঠাৎ কোন্ দিকে কী হয়ে যায় টের পায় না, প্রচণ্ড ধাক্কায় দূরে ছিটকে পড়েছে সুরমান, কে যেন তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল সেখান থেকে। বনের উপর একটা ঝড় বয়ে গেল, ক্রুদ্ধ গর্জন মিলিয়ে গেছে। বনভূমিতে নেমে এসেছে স্তব্ধ প্রশান্তি। সুরমানকে বাঁচিয়ে গেল সে নিজের জান দিয়ে।

—কু উ উ উ—

বনভূমি মানুষের ব্যাকুল আর্তনাদে ভরে ওঠে। এখানে নাম ধরে কেউ কাউকে ডাকে না। জন্তুজানোয়ারের ভয়ে--তারাও বন্য জন্তুর মতো এমন বিচিত্র সুরে বিপদ জ্ঞাপন করে। দলের অন্যান্য সকলে নেমে এসে দেখে সুরমান দাঁড়িয়ে রয়েছে, মজিদ মিঞা নাই। নরম কাদামাটিতে আঁকা রয়েছে কয়েকটা পায়ের চিহ্ন—খানিকটা তাজা রক্ত ছিটিয়ে আছে কর্দমাক্ত নোনা মাটিতে, মজিদের শেষ চিহ্ন ওইটুকুই। বাড়ি তার যাওয়া আর ঘটেনি জীবনে। প্রিয়জনের হাতে জীবনের শেষ শয্যাও রচিত হয়নি, যে মাটিতে জন্মেছিল—মানুষ হয়েছিল—সে মাটির বুকেও ঠাঁই তার হয়নি।

অবশিষ্ট হাড় দু-এক টুকরো এই গহন বনের নির্জনতায় সমাধিস্থ করেছিল তারা, এমনি এক তারকিনী রাত্রে বন্ধুবিহীন বনতলে রেখে গিয়েছিল তাকে ..... গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে পরিধেয় বস্ত্র এক টুকরো--একমুঠো চাল—আর ছিন্ন মাদুর।

আজও যাবার আসার পথে তারা এইখানে নমাজ পড়ে যায়—তার আত্মার শান্তি কামনায়, 'চেরাগ' এ বনে জ্বলে না, রেখে যায় ওই আহার্য আর পরিধেয়।

সেই কেওড়াসুঁতের ধারে বসে আছি আমরা। চুপ করল সুরমান বাওলিয়া, অস্পষ্ট আলোকে দেখি, তার কোটরাগত চোখ দুটো চকচক করছে—গড়িয়ে পড়েছে দু-এক বিন্দু অশ্রু দাড়ির প্রান্তে—তখনও মিলিয়ে যায়নি। বাইরে রাত্রির নিবিড় স্তব্ধতা ভেদ করে কানে আসে হরিণ, বনমুরগির ডাক। আমার কথায় মুখ তুলে চাইল বৃদ্ধ—মরিয়মের কথাটা তো বললে না। সে এখন—আমার কথাটা শেষ হল না, বৃদ্ধের চোখেমুখে ফুটে ওঠে বিষণ্ণ হাসির ম্লান আভা কান্নার করুণতা নিয়ে—ওর বাপ ছিল একটা কসাই। বেশি টাকার লোভে মেয়েকে ইরসাদ গাঁতিদারের সঙ্গে নিকেয় বসিয়েছিল, ইরসাদ তাকে বাড়ি নিয়ে যেতেও পারেনি—নদীতে যাবার সময় নৌকা ডুবে মরিয়ম মারা যায়। খোদা তাকে মুক্তি দিয়েছে, তার কসুর মাপ করেছে।

চুপ করল বৃদ্ধ। সেই থেকেই বন্যজীবনই মেনে নিয়েছে সে। বনের আহ্বান সে শুনেছে, সে দেখেছে নিভৃত রাত্রে প্রকৃতির স্তব্ধ রূপের মহান সৌন্দর্য। ভালোবেসে ফেলেছে এই কালো নদী, সবুজ বন। এই মোহ থেকে তার নিস্তার নেই। বলে ওঠে—নদীর বাঁকে বাঁকে এখানে কবর, বনে বনে ছড়ানো মরণ, আমার জন্যেও রয়েছে এমনি শেষ দিন, তবুও ঘরসংসার ছেড়ে এর মোহব্বতে আটকে রয়েছি বাবু, চোখের জলে গাঙের পানি লোনা হয়ে গেল—তবুও মায়া কাটল না।

তারকিনী রাত্রির গহন নীরবতার মধ্যে বসে রয়েছে সুরমান—সুন্দরবনের গহনে স্তব্ধ রহস্যের মতোই একটা অধরা রহস্য ঘনিয়ে রয়েছে ওর মনে।

জোয়ার শেষ হয়ে—ভাটার বান পড়েছে। এইবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে আরও দক্ষিণে—কানে আসে দূর সমুদ্রের গর্জনধ্বনি কোনো সুদূরের আহ্বান।

ধর্মসাক্ষী

মানসীর আজ জন্মদিন।

সারা বাড়িখানাতে তাই আনন্দের সাজ। বাগানটা ভরে উঠেছে আলোয়। সন্ধ্যা থেকেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে চাকরবাকরের দল।

বিশ্বদেববাবু মেয়ের জন্মতিথি উৎসবের কোন আয়োজনই বাকী রাখেননি। নিজের চেষ্টায় পরিশ্রমে বড় হয়েছেন তিনি। সামান্য কমিশন এজেন্ট বিশ্বদেববাবু যুদ্ধের সময় থেকেই ব্যবসার তাকবাকগুলো বুঝে নিতে পেরেছিলেন, তাই বোধহয় ক'বছরেই সামান্য কমিশন এজেন্সী থেকে তার কারবার শেয়ার মার্কেটের অন্যতম চালু প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

তার বড় মেয়ে মানসী।

স্ত্রী মনোরমা মাঝে মাঝে আপশোশ করে।

—বড় ছেলে হলে এতদিন কাজে লাগত। তা হলো কি না মেয়ে।

বিশ্বদেববাবু স্ত্রীর কথায় হাসেন।

—হোক না, লেখাপড়া গানবাজনার বৃহত্তম সমাজের মধ্যে মানসী পরিচিত হয়ে উঠবেই। ও-ই তোমার বড় ছেলে। দীপু-কণিকার দায়িত্ব ও নিতে পারবে।

—কি রে মানসী?

বাবার কথায় হাসে মানসী। মা কথা বলে না। গজগজ করে।

—ছাই, এগারো হাত কাপড়ে যাদের কাছা জোটে না, তারা নেবে সংসারের ভার। থাক—আব ও কথায় কাজ নেই বাপু।

—মাকে রাগালে ভারি সুন্দর দেখায়। মানসীও হাসে।

—ঠিক বলেছ মা।

বিশ্বদেববাবু কথা বলেন না, টেবিলল্যাম্পের আলোটা 'অন' করে দেশ-বিদেশের শেয়ার মার্কেট রিভিয়্যুগুলো নিয়ে দেখতে থাকেন।

লাল-নীল পেন্সিলে টিক দিচ্ছেন তিনি।

সারা দেশ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা—শুধু এদেশ কেন? লণ্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়ালস্ট্রীট—সর্বত্রই বাজার যুদ্ধের পর যে ফেঁপে উঠেছিল, সেই চড়া ভাব থেকে ক্রমশ নেমে আসছে।

শুধু নেমে আসছে নয়—বিপজ্জনক ভাবে নামছে।

অন্যদিকে কোথায় হঠাৎ বাড়তে থাকে; মালয়ের রবারের বাজার নামছে, নামছে বার্মার সোনার খনির শেয়ারের দর।

কিন্তু এই নামাই চূড়ান্ত নয়, একদিন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার বাড়তে থাকবে—হু হু করে বাড়বে।

এ তিনি জানেন।

এখানের তামার বাজার—লোহার বাজারও বাড়বে।

লাল পেন্সিল দিয়ে নোট করে চলেছেন।

অনেক রাত অবধি ওই চলবে। রাতে ফোন-এর লাইন অপেক্ষাকৃত ফাঁকা থাকে, আসে লং ডিস্ট্যান্স 'কল'গুলো। ঝনঝন শব্দে ফোন বাজে।

—হ্যালো!

কত আশা নিরাশার খবর থাকে ওতে।

—বাপি সারাদিন অফিসে খেটেও বাড়িতে বিশ্রাম পাবে না একটু? মেয়ের ডাকে বিশ্বদেববাবু মুখ তুলে চাইলেন। মানসী বাবাকে ডাকতে আসে।

—রাত্রি হয়েছে বাপি।

বিশ্বদেববাবু একটা বড় ফাইল থেকে কি নোট নিয়ে চলেছেন। নোট নিচ্ছে নীলেশ। মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে।

এরই মাঝে ঢুকছে মানসী।

নীলেশ মুখ তুলল। দুজনের মধ্যে একটু পরিচিতির হাসি বিনিময় হয়ে যায়।

সবে আইন পাশ করে প্র্যাক্‌টিস করছে নীলেশ।

বিশ্বদেববাবুর মুখ থমথমে। চিন্তাক্লিষ্ট।

মেয়েকে দেখে সহজ হবার চেষ্টা করেন।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি মা। নীলেশও এখানে আজ খাবে রাতে।

নীলেশ বলবার চেষ্টা করে—আমি ফিরে গিয়েই খাব।

—দেবি হয়ে যাবে। ডিনারের পরেও একটু কাজে বসতে হবে নীলেশ।

নীলেশ অগত্যা চুপ করল। মানসীর দিকে চেয়ে থাকে অসহায় চাহনিতে।

মানসী যেন খুশিই হয়—ভয় নেই, বেশি কিছু আয়োজন করিনি। বাবুর্চির রান্নাও নয়। নিজেই রেঁধেছি আজ।

নীলেশ একটা রক্ষণশীল ঘরের পরিবেশে মানুষ। বিশ্বদেববাবুর বন্ধুর ছেলে। ওদের বাড়িতে এখনও সেই ছোঁয়াছুঁয়ি, জাত বিচারের কড়াকড়িটা আছে। মানসী তাই নিয়ে মন্তব্য করতেও ছাড়ে না মাঝে সাঝে।

—বামুন হয়ে কায়েতের সঙ্গে মিশছেন?

—কেন? দোষ কী?

—পৈতা নিয়ে কায়েতের হাতেব জল খেলে কি হয় জানেন?

নীলেশ ওরই কথায় যেন খানিকটা সচেতন হয়েছে। একটু লিবারেলও হতে হয়েছে। সংস্কৃত পণ্ডিতের ঘরে বিগ্রহসেবা এখনও ধুমধাম করে হয়। সেই বাড়ির ছেলে নীলেশ।

বাইরে মিশে খানিকটা সংস্কারমুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে।

মানসীর কথায় আজ জবাব দেয় নীলেশ। না-না, তা বলছিলাম না।

—খাবার দিই গে।

মানসী চলে গেল।

বিশ্বদেববাবু আবার যেন ফাইলের মধ্যে ডুবে যান। নীলেশও। তরুণ বুদ্ধিমান সে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উকিলে সে পরিণত হয়েছে ইতিমধ্যেই। বিচিত্র একটা কেস। বেশ কয়েক লক্ষ টাকার লেনদেন। আইনের ফাঁদে আটকে গেছে! বিশ্বদেববাবু শুধোন।

—মামলাই করতে হবে শেষ পর্যন্ত কি বলো?

—তাই তো মনে হচ্ছে। ব্রিচ অব কনট্রাক্ট। নীলেশ জানায়।

—কিন্তু মস্ত বড় কোম্পানি। হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্ট অবধি লড়বে।

নীলেশ জবাব দেয়—কিন্তু আমাদের গ্রাউন্ড ফেভারেবল, মোস্ট ফেভারেবল।

মানসীর ডাকাডাকিতে তাদের চমক ভাঙে।

—উঃ! যাচ্ছি মা। চল নীলেশ।

রাত্রি নামে।

মা সারাদিনের পর বিশ্রাম নিচ্ছে। বাড়ির সবাই।

অন্ধকার নেমেছে সারা বাড়িতে। মাত্র একটা ঘরে আলো জ্বলছে তখনও।

নীলেশ বাড়ি ফিরে গেছে।

মানসীর মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়।

বারান্দায় এসে পড়েছে বাবার ঘর থেকে ওই আলোটা। একটু অবাক হয়। এত রাত্রি অবধি বাবা ঘুমোননি!

এগিয়ে আসে মানসী।

—বাপি!

বিশ্বদেববাবু ওর দিকে মুখ তুলে চাইলেন। তখনও কাগজপত্রগুলো খোলা; বিরাট একটা অঙ্ক যোগ দিতে ব্যস্ত। মেয়েকে দেখে তিনিও অবাক হয়েছেন।

এখনও ঘুমোওনি?

—এই উঠছি মা!

—রাত কত জানো? ডাক্তার তোমায় নিষেধ করেছে রাত্রি জাগতে।

সহজ হবার চেষ্টা করেন বিশ্বদেববাবু। মানসী বাবার দিকে চেয়ে রয়েছে। কি যেন নিবিড় চিন্তার কালো ছায়া ওর সুগৌর মুখে। মানসীর নজর এড়ায়নি।

—বাপি!

—কি মা?

শরীর খারাপ?

—কই না তো!

—তবে কি যেন ভাবছ। ক'দিন থেকেই দেখছি।

মাথা নাড়েন বিশ্বদেববাবু—ব্যবসায় একটা গোলমাল বেঁধেছে পার্টনারের সঙ্গে।

কথাটা না বলে যেন থাকতে পারেন না তিনি। ওই একমাত্র মনসীই যে এ বাড়িতে হয়তো বুঝতে পারে। বিশ্বদেববাবু কথাটা হাল্কা করবার চেষ্টা করেন।

—ওসব ঠিক হয়ে যাবে। দরকার হয় আলাদা বিজনেস্ করব। গুড্উইল তো আমারই।—হ্যাঁ, চল মা রাত্রি হয়ে গেছে।

শুয়ে পড়েন বিশ্বদেববাবু।

রাত হয়েছে। অন্ধকারের মাঝে দূরের কোনো চার্চের ক্লক টাওয়ারে বাজছে ঘণ্টাটা। রাত্রি দুটো বাজছে।

অতন্দ্র গভীর রাত্রিতে ওর গুরুগম্ভীর শব্দটা যেন মহাকালের নীরব পদধ্বনির মতো শোনা যায়।

মানসী বাবার ছায়ানামা মুখের দিকে চেয়ে থাকে। চিন্তায় পড়ে মানসী।

আঁধার রাত্রির মতো একটা কালো ছায়া যেন তার মনের মধ্যে উঁকি মারে আগামী কোনো ঝড়ের সঙ্কেত নিয়ে।

আজ মায়ের কথা মনে পড়ে। ছেলে হলে সত্যিকারের কাজে লাগত। কিন্তু সে মেয়ে।

জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়া একটি সত্তা।

তারা জ্বলছে আকাশে। কি যেন অসহ্য জ্বালায় জ্বলছে ওরা রাত্রি জাগার প্রহরে।

বিশ্বদেববাবুকে বাধা দিয়েছিল মানসীই।

—নাই বা হল এত উৎসব। ভারি তো আমি—তার জন্মদিনে এত ঘটা কেন?

হাসেন বিশ্বদেববাবু—আমার কাছে মানসীর দাম অনেক। যা করবার আমি করছি। তুই বাধা দিস না।

বিশ্বদেববাবু কার্ড-প্রোগ্রাম সবই করেছেন নিজে। নেমন্তন্ন পত্রও চলে গেছে।

—মধ্যে আর দুটো দিন। সব আয়োজন করতে হবে।

মনোরমা, ছোট মেয়ে, দীপু মাণিকও উৎসবের আয়োজনে মেতে উঠেছে। ফোন আসছে ঘন ঘন।

দীপুরা ওদের বন্ধুদের নিয়ে একটা ছোট নৃত্যনাট্য করবে রিহার্সাল দিচ্ছে। মনসীই তার নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিচালনা করছে।

বাড়িতে একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে।

বিশ্বদেববাবু এই আলো আর আনন্দ উৎসবের মধ্যে যেন মুখ লুকিয়ে বাড়ি ফেরেন। বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের আনন্দ-উল্লাসে আজ সাড়া দেবার সাহস তার নেই।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দেন বিশ্বদেববাবু।

আজ ওদের জন্মদিনের উৎসব। বাইরে থেকে ওদের কলরব-কোলাহল ঘুঙুরের শব্দ কানে আসে। বড় হলঘরটায় পর্দা টাঙ্গিয়ে অডিটোরিয়ামের মতো করা হয়েছে। এক দিকে স্টেজ, সামনে চেয়ার-সোফা দিয়ে অতিথিদের বসবার জায়গা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দু'চারজন এসে পড়েছেন।

গাড়িগুলো আসছে। মনোরমা অভ্যর্থনা করে তাদের।

মানসীও।

আজ সে যেন অপরূপ সাজে সেজেছে। সুন্দর-সুঠাম দেহ, ওই সাজে রূপবতী হয়ে উঠেছে।

নীলেশ দাঁড়িয়ে পড়ে। চেয়ে রয়েছে মানসীর দিকে।

—আসুন, দেরি হল যে৷

—একটা জরুরি কেস ছিল।

নীলেশ আরও কি যেন বলতে গিয়েও পারে না। বাতাসে রজনীগন্ধা আর বেলফুলেব সুবাস। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বাইরে।

সদ্য ধোয়া গাছে-পাতায় যৌবনের উপছে-পড়া প্রাচুর্য।

মানসীকে দেখে হঠাৎ চমকে উঠেছে নীলেশ।

কেমন একটা স্বপ্ন দেখে সে।

নীলেশ একটু থেমেই এগিয়ে গেল উপরেব দিকে চিন্তিত মনে। সিঁড়ি থেকে দেখা যায় হলঘরে ওদেব উৎসবেব আয়োজন চলছে। পিয়ানোর সুর উঠেছে।

দবজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়াল নীলেশ।

—ও!

—অবাক হন বিশ্বদেববাবু।

—এসো।

পকেট থেকে কেবল আরও চিঠি দুখানা বের করে দেয়। হাসছেন তিনি।

নীলেশ চিঠিগুলো-টেলিগ্রামটায় চোখ বুলিয়েই যেন অস্পষ্ট আর্তনাদ করে ওঠে।

—অসম্ভব!

—হাসছেন বিশ্বদেববাবু—There are much more things in heaven and earth Harotio.

নীলেশ অবাক-বিস্মিত দৃষ্টিতে বিশ্বদেববাবুর দিকে চেয়ে থাকে। তিনিই নীলেশকে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

—Leave it. চল। ওদের function শুরু হবে।

নেমে গেলেন তিনি নীলেশকে নিয়ে।

নীলেশ বিশ্বদেববাবুর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মাঝে মাঝে।

কি যেন রুদ্ধমুখ-আগ্নেয়গিরির মতো ভিতরে একটা অসম্ভাব্য অগ্ন্যুৎপাত চেপে রেখে চলেছেন তিনি।

মানসীকেই গাইতে হয়।

জমে উঠেছে ওদের উৎসব। হালকা নীল আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে। .... বেহালার করুণ সুরে মিশেছে মানসীর গলা।

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে উঠে গেলেন বিশ্বদেববাবু সিঁড়ি দিয়ে। আর সবটাই অন্ধকার, আবছা আলোয়

দেখা যায়—উঠে চলেছেন তিনি। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ধ্বসে পড়া একটা মানুষ। এ জীবনের বোঝা বইবার সামর্থ্যটুকুও যেন আর নেই।

আনন্দধ্বনি ওঠে—হঠাৎ সেই সুরের রেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় একটা আওয়াজে! ....উপরের ঘর থেকে ভেসে আসে শব্দটা।

চমকে ওঠে সবাই। নীলেশও!

আবিষ্কার করে যে পাশের চেয়ারটায় বিশ্বদেববাবু বসেছিলেন—সেটা খালি।

মানসীও উঠে তরতরিয়ে এগিয়ে চলে সিঁড়ি দিয়ে।

নীলেশ বন্ধ দরজায় লাথি মারছে।

—বাপি! মানসী ডাকছে। শব্দটা ওই ঘব থেকেই এসেছে।

কোনো সাড়া নেই।

রুদ্ধ দরজাটা ভেঙে ঢুকেছে ওরা।

—বাপি।

আর্তনাদ করে ওঠে মানসী।

বিশ্বদেববাবু আত্মহত্যা করেছেন। মোজাইক করা মেজে ভরে উঠেছে রক্তে। টেবিলের ওপর রাখা সেই চিঠি—'কেবল্' গুলো। সেই সঙ্গে তাঁব চিঠিখানাও পাওয়া যায়।

এত বড় ব্যবসা একদিনের শেয়ার বেচাকেনার ফাঁক দিয়ে কোন্ অতলতলে তলিয়ে গেছে, এত দেনা মেটাবার সামর্থ্য তাঁর নেই। তাই সব হিসাব নিজেব রক্ত দিয়েই চুকিয়ে গেছেন তিনি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বয়েছে মানসী সে যেন স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ চেতনা ফেরে।

মা কাঁদছে।

...মানসী ধীরে ধীরে খুলে ফেলে তার ফুলসাজ—খোঁপায় জড়ানো রজনীগন্ধার মালা।

কঠিন কর্তব্যমুখর এই পৃথিবীর পথে আজ যেন সে দাঁড়িয়েছে একা। একক একটি মেয়ে।

বাবার কথা মনে পড়ে—মানসীই আমার বড় ছেলে। ছেলের চেয়ে সে কম কিসে!

কাঁদে না সে!

সমস্ত চোখের জল যেন জমে বরফ হযে গেছে—দুঃখেব মাঝে আজ সে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

পুলিশ, লোকজন জমে গেছে।

নানা খবরাদি—তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করছে অনেকে।

জবাব দিচ্ছে মানসীই। কেমন যেন স্বপ্নের ঘোরে বলে চলেছে কথাগুলো!

নীলেশ দাঁড়িয়ে আছে পাশে।

রাত কত হয়েছে জানে না।

ওরা ডেড্বডিটা নিয়ে গেছে। কলরব থেমেছে বাড়ির।

অন্ধকারে মায়ের ক্ষীণ কান্নার সুর ওঠে। রাতেব আঁধারে গুমরে ওঠে ওই শব্দটা।

থমকে দাঁড়াল মানসী।

হলঘরে উৎসবের শেষ চিহ্ন তখনও পড়ে আছে। এদিকে-ওদিকে পড়ে আছে ছেঁড়া মালা। দলিত-পিষ্ট রজনীগন্ধা ফুলগুলো—কেমন মলিন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

মঞ্চ খালি—সব নাটক, আনন্দ উৎসব থেমে গেছে।

...মানসী চমকে ওঠে। তার জীবনেও যেন এমনি অসীম শূন্যতা আর ব্যর্থতার জ্বালা।

নীলেশ বের হয়ে যাচ্ছে।

মানসীর দিকে চাইল।

আবছা অন্ধকারে দেখে এতক্ষণ যে মেয়েটি সমস্ত বিপদের মাঝেও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ইতিকর্তব্য করে

গেছে—নীরব রাত্রির গহনে অপরিসীম ব্যর্থতা আর হতাশায় ভেঙে পড়েছে সে আর্ত কান্নায়।

কাঁদছে মানসী—সব হারানোর কান্না।

নীলেশ ওকে বাধা দিল না।

রাতের আঁধারে সরে এল, চারদিকে জমাট অন্ধকার নেমেছে। দুঃখের অন্ধকার।

ঝড়ের পর কি হয় তা সকলেই জানে। মানসীও জানতো।

জানতো—খানিকটা শুনেছিল নীলেশের কাছে এরপর কি হবে। তার জন্য নিজেকে তৈরিও করেছিল। কিন্তু চোখের সামনে সেই চরম নিষ্ঠুব ঘটনাগুলো ঘটতে দেখে ঠিক সহ্য করতে পারবে না।

অক্‌সনে উঠে গেল মালপত্র। বাবাব সখের ফার্নিচার অন্যান্য জিনিসপত্র সব কিছু। বাড়িখানা নিজেই সখ করে করেছিলেন বিশ্বদেববাবু। মোজাইক করা মেজে, নীচের বারান্দা—দেওয়ালের নীচের দিকে বসিয়েছিলেন মার্বেল পাথর। বেশ দামি দামি কয়েকটা ছবিও কিনেছিলেন বড় বড় শিল্পীর।

মানসীর নিজের আঁকা ক'খানা ছবিও ছিল সেই সঙ্গে। সব—এ বাড়ির সব কিছুই দেনার দায়ে চলে গেল।

লরীতে তুলছে ওবা খাট-দেরাজ-আলমারি। মনোরমা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মানসীও। ছোট ভাই দীপু কথা বলে না। দেখছে ডাগর দুচোখ মেলে।

ঠিক বুঝতে পারে না। বলে ওঠে—ওরা সব নিয়ে চলে যাবে? আমার টেবিল-খাট?

—চুপ কর দীপু। মানসী থামায ওকে।

মা থামাবার চেষ্টা কবেন।

বিশ্বদেববাবুর চেয়ারখানাও নিয়ে যাচ্ছে।

—ওখানাও নিয়ে যাবে?

মনোরমা এগিয়ে যায়। স্বামীর শেষ চিহ্ন ওইটুকুই। ছেড়ে দিতে মন কেমন করে।

কুলিগুলো কোনো দিকে চায় না। জবাব দেয় না। ওরা কি করে জানবে কত স্মৃতি কত প্রীতির চিহ্ন ভরা ওই মেহগিনী কাঠের চেয়ারখানা।

কত মূল্যবান!

মানসী বাধা দেয় মাকে—যেতে দাও মা। সব যখন গেছে ওটাও যাক।

—কোনো চিহ্নই থাকবে না?

—নাইবা রইল। মানসী বলে।

মা বেদনাহত দৃষ্টিতে মানসীর দিকে চেয়ে থাকে।

মানসীই বলে—কালই এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে মা।

—ওরা একমাসও সময় দেবে না?

—না। মানসী মাথা নাড়ে।

দীপুর কথায় মানসী ওকে কাছে টেনে নেয়। ওর ছলছল চোখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে।

—এর চেয়ে ভাল একটা বাড়িতে যাব। কেমন পুকুর আছে—মস্ত পুকুর।

—বাগান। এমনি গোলাপ আছে? ওই রজনীগন্ধার গাছ?

মানসী সামলাবার চেষ্টা করে নিজেকে। ওকে ভোলাতে গিয়ে আবার নিজের চোখেই জল আসে। মাথা নাড়ে।

—সব আমরা লাগিয়ে নেব আবার।

—আবার নতুন করে লাগাবে? তা মন্দ হবে না। দীপুও যেন দিদির কথায় বিশ্বাস ফিরে পায়।

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ একটা শব্দে ওদের নিভৃত আলাপের স্তব্ধতাশান্তিটুকু খানখান হয়ে যায়।

চমকে ওঠে মানসী।

বাবার নতুন ফোটোখানা টাঙিয়েছিল ক'দিন আগে। ঠিকাদারের মিস্ত্রিরা অসাবধানে কাজ করতে গিয়ে দেওয়াল থেকে ছিটকে ফেলেছে ছবিটা। চুরমার হয়ে গেছে কাচখানা।

ছিটকে পড়েছে চুণ-জলের উপর ছবিখানা।

—দেখতে পাও না।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে। মিস্ত্রীগুলো কথা বলে না।

ইতিমধ্যেই নতুন করে আবার নতুন বাড়ির মালিক চুনকাম শুরু করেছে। এবাড়ির সব দাগ-চিহ্ন তারা নিষ্ঠুর হাতে মুছে দেবে। দিয়েছেও।

চুপ করে সরে এল মানসী ছবিখানা সযত্নে বুকে নিয়ে।

নীলেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের সামনে এতবড় সর্বনাশটা ঘটে গেল। এই নাটকের সে যেন নীরব দর্শক।

বিশ্বদেববাবুই তাকে আজ প্রথম শ্রেণীর এ্যাডভোকেটের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। অনেক বড় বড় কেস দিয়েছেন।

নীলেশ জিতেছে, নাম করেছে! তবু বিশ্বদেববাবুর কাছে তার ঋণ অপরিসীম। আজও তা অস্বীকার করবার মতো ধৃষ্টতা তার নেই।

—মানসী!

নির্জন ফাঁকা বারান্দায় ওর ডাকে দাঁড়াল মানসী।

নীলেশ এগিয়ে আসে। স্তব্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে।

—এখান থেকে চলে যাচ্ছি কালই। কথাটা বলে মানসী।

—শুনেছি।

—বেলেঘাটার দিকে একটা বস্তিতে।

—বস্তিতে যাবে! চমকে ওঠে নীলেশ।

হাসবার চেষ্টা করে মানসী—এখন তো অনেক ভদ্রলোক বস্তিতে বাস করছে।

— তা করুক। কিন্তু তুমি!

—নিজের পায়েই দাঁড়াতে চেষ্টা করব নীলেশ।

—আমার কি কোনো দাবীই নেই? নীলেশ বলে ওঠে।

মানসী কোনো কথা বলল না।

নীলেশ বলে—তোমার বাবার কাছে আমার অনেক ঋণই রয়ে গেছে।

—বাবাও অনেকের কাছে ঋণী রয়ে গেছেন।

নীলেশ শুধোয়—মানসী! ...আজ এড়িয়ে যেতে চাইছ তুমি?

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামছে। গাছগাছালির বুকে জেগে উঠেছে নীড়ফেরা পাখীর কাকলী। মানসী শেষ সূর্যের আভায় উদ্ভাসিত ডাগর দু'চোখের চাহনি মেলে চাইল ওর দিকে।

—তোমার সাহায্য আমার শেষ ভরসা নীলেশ। আজ থেকে নাই বা নিলাম।

নীলেশ কথা বলে না। মানসীর ছলছল দুই চোখের নীরব চাহনিতে কি যেন গভীর একটু আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়েছে নীলেশ। চুপ করে গেল। কি ভেবে নীলেশ জানায়।

—বাবাও আজ কাগজে সব খবর দেখেছেন।

বিশ্বদেববাবুর ওপর কোথায় যেন একটা উষ্মা ছিল নীলেশের বাবার। কারণটা বোঝে নীলেশ। তার বাবা বিশ্বদেববাবুর ফলাও কারবার—নীলেশের ওপর তার প্রভাবটা ঠিক সহ্য করতে পারতেন না।

তাই বলেন—বিশ্ব বড় জাল ফেলেছিল; নিজের জালেই আটকে পড়েছে।

নীলেশ কথাটা ঠিক সহ্য করতে পারেনি। সরে গিয়েছিল। লক্ষ করেছিল তার মাও চেয়ে রয়েছেন নীলেশের দিকে।

—কোথায় যাচ্ছিস্?

নীলেশ জবাব দেয় না। জবাব দেয় তার বাবা।

পিছন থেকে তীক্ষ্ণ মন্তব্যটা শুনে চমকে উঠেছিল নীরব বেদনায় নীলেশ। বাবা পরিষ্কারই বলেন—বিশ্বদেবের বাড়িতে! এখন তো শুনেছি ওবাড়ির ও-ই নাকি গার্জেন। ছিঃ!

মানসীকে চেনে না ওরা।

তাহলে বুঝত তাদের অনুমান সন্দেহ কতখানি ভিত্তিহীন, মিথ্যা।

দীপু ইতিমধ্যে বাগান থেকে কতকগুলো গাছের চারা-কলম ডালিয়ার কাটিং সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। নীলেশকে দেখে এগিয়ে আসে। নীলেশ শুধোয়।

—কি হবে ওতে?

দীপু জবাব দেয়—নোতুন বাড়ির বাগানে লাগাব। না দিদি?

মানসী আর নীলেশের চোখে চোখে যেন কি বেদনাব ভাষা খেলে যায়, মানসী মুখ নামিয়ে নেয়। দীপু বলে চলেছে।

—মস্ত পুকুর আছে। এর চেয়ে নাকি অনেক বড় সেই বাড়ি।

—বাঃ! বেশ হবে তা'হলে।

নীলেশ ওকে সমর্থন করবার চেষ্টা করে।

দীপু নোতুন বাড়ির সম্বন্ধে একটা সুন্দর কল্পনাই কবে বসেছে মনে মনে। এর চেয়ে ভালোই হবে। বাড়িটাকে নিজের মনের মতো করেই সাজাবে।

মানসীও যেন গা ঢাকা দেবার জন্য এই ধনী সমাজ থেকে দূরে সরে যাবাব জন্যই এই দিকে এসেছে। তবু কিছুদিন বুঝতে পারবে।

নিজের মনের মধ্যে সুপ্ত কোনো কঠিন সংগ্রামী মন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—যার অস্তিত্ব নিজেই সে জানত না।

নোতুন বাড়িতে এসে পড়ে তাই মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে মানসী।

মালগাড়ি যাবার রেললাইন থেকে দুপাশে যতদূর চোখ যায় খোলা টালি আর টিনের বস্তি, সার সার চলেছে। পিঠে পিঠে ঘাড়ের ওপর ঘাড় দিয়ে পড়ে আছে বাড়িগুলো।

একটুকু ফাঁকা জায়গা রয়েছে তো সেখানে গিশ্‌গিশ্ করছে লোকজন। মাঝখানে পুকুর একটা আছে; তার জল ঘন নীল—তাতেই ডুব মারছে বেওয়ারিশ ছেলেমেয়েরা, স্নান করে সারা বস্তির বাসিন্দারা।

খাবার জল!

কল দু'একটা করে আছে। তাতে লাইন পড়ে—সারিবন্দী লাইন। সেখান থেকে জল বের করে আনতে সকাল বেলা কারও সাধ্যি নেই। মাঝে মাঝে ফৌজদারী বেধে যায়।

কারও বাড়িতে যদি কল থাকে তো পরম ভাগ্যবান বলতেই হবে তাকে। সকালে কান পেতে থাকো—কখন শোনা যাবে কর্পোরেশনের জলের গাড়ির শব্দ। বালতি নিয়ে ছুটতে হবে। তাদের ট্রাকের পিছনে পাইপ লাগানো রয়েছে যদি কিছু পানীয় জল মেলে।

মানসী চুপ করে থাকে।

মনোরমা দেখছে বাড়িখানা। এপাড়ার তুলনায় ভালোই বলতে হবে। লম্বা টানা বারান্দা। আশপাশে ইটের ঘর—মাথায় টিনের ছাউনি। উঠোনের ওদিকে খোপ খোপ করা টালির ছাউনি দেওয়া রান্নাঘর।

—বাগান কোথায় দিদি?

দীপু দিদিকে প্রশ্ন করে। ওর হাতে সেই গাছগুলো।

—এগুলো কোথায় লাগাব?

তাদের বাগানের শেষ চিহ্ন। ...কেমন যেন মন কেমন করে মানসীর। ঝুরঝুরে মাটি তখনও লেগে আছে। ওই গাছগুলোর মতই যেন ওদেরও কেউ তুলে এনেছে—রোদের তাপে বিবর্ণ কোঁকড়ানো। মাটির স্পর্শ বঞ্চিত।

মানসী বলে ওঠে—টব এনে দেব তোকে দীপু। টবেই লাগাবি ওগুলোকে।

বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটিয়ারা এগিয়ে আসে। কেউবা দূর থেকে দেখছে ওদের কৌতূহলী-সন্ধানী দৃষ্টিতে। ওদের নবাগতদের চেহারায়—হাবভাবে পোশাক-পরিচ্ছদে তখনও আগেকার সেই সম্পদের পরিচয়।

মানসী পরেছে তাঁতের হাল্কা রং-এর একটা শাড়ি—তবু তার ওই সামান্য পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্য দিয়েও কেমন একটা ব্যক্তিত্ব, অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। যা ওদের এই কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাত্যহিক দুঃখ জীবনের-দুশ্চিন্তায় হারিয়ে গেছে।

বাড়িওয়ালার স্ত্রীই ওদের সব দেখিয়ে দেয়।

কলঘর বলতে জীর্ণ চটের পর্দা টাঙানো একটু জায়গা—তার ওদিকে টিনের ঘেরা দেওয়া পায়খানা।

ভদ্রমহিলা বলেন—কোনো রকমে মিলেমিশে থাকলে সব সয়ে যাবে দিদি।

মনোরমা যেন সহ্য করতে শিখেছে তাই বলে—তাই নিতে হবে।

দূর থেকে যাদেব সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় ধারণা ছিল তাদের মধ্যে এসে মানসী যেন নতুন করে চিনতে পারে তাদের!

এ ধারণা তার ছিল না।

এ বাড়িতে ইতিমধ্যে কণিকার বনানীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

ওপাশের বাড়িতে থাকেন কোনো এক স্কুল মাস্টার। পড়াশোনার রেওয়াজ এদের মধ্যে অনেক বেশি, বহু কষ্টে সংসার চালিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ানো। তাই বোধহয় মন দিয়েই পড়ে ওরা।

—কণিকা গান শিখছে।

কোনো এক বিখ্যাত ওস্তাদের প্রিয় ছাত্রী। সন্ধ্যার অন্ধকারে বস্তির পরিবেশ ওর সুরের মাধুর্যে ভরে ওঠে।

মানসী এই ক্ষুদ্র পরিবেশের মধ্যে অতীতকে ভুলে নতুন করে আবার বাঁচবার চেষ্টা করছে।

মনোরমা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। কত প্রাচুর্য আর শান্তির দিন ছিল সেগুলো। এমনি কদর্য পরিস্থিতির সামনে পড়েনি তারা।

ঝি-চাকর-কর্মচারীর অভাব নেই তখন।

ঠাকুর-বাবুর্চিতে কাজ করছে রান্না ঘরে।

আজ সেই মানসীই সহজভাবে মিশে গেছে এই পরিবেশেও।

ছোট্ট চটঘেরা জায়গাটুকুতে থপ্ থপ্ করে সাবান কাচছে—শাড়িতে ইস্ত্রি করাটা শিখে নিয়েছে মানসী।

বনানী কোন্ ছোট্ট অপিসে চাকরি করে।

সেও বলে চাকরির যা বাজার।

তা মানসীও জানে—তবু না খুঁজে উপায় কি বল!

কণিকা গান গায়—ছোটখাট দু' একটা ট্যুশানী করে গানের।

গানের ট্যুশানি করবে?

Any post in the storm. হাসে মানসী।

মনোরমা চেয়ে থাকে মানসীর দিকে। কোনো কোনো দিন বের হয় খেয়ে-দেয়ে—এখান-সেখান ঘুরে ফিরতে বেলা পড়ে যায়; ঘেমে নেয়ে ওঠে—সুগোল ফর্সা মুখখানা টকটকে সিঁদুর হয়ে যায়।

মা মেয়ের দিকে অসহায় চাহনিতে চেয়ে থাকে।

ঘরে কাচা ইস্ত্রি করা শাড়িখানাও যেন কেমন বিবর্ণ ঠেকে।

—হল কিছু? মা শুধোয়।

হাসে মানসী—হয়ে যাবে। দেখা যাক।

—হ্যাঁরে, কাল দীপুর জন্মদিন।

মানসী মায়ের দিকে চাইল। একটা জন্মদিনের কথা মনে পড়ে। বেদনাময় সে স্মৃতি; সব হারিয়েছে সেই তিথিতেই।

জীবনে তার সব হারানোর ক্ষণই বেশি। জন্মদিনটা তাই যেন তার কাছে সবচেয়ে অশুভ।

মনোরমা মেয়ের দিকে চেয়ে সরে গেল। কথা বলে না।

কণিকার গান ভেসে আসে। অন্ধকার—আবছা আঁধার ঘেরা বস্তী। চারদিকে মৃত্যু আর হতাশার অন্ধকার। তারই মাঝে প্রেমের ওই সুর জাগে।

গভীর অনুভূতিময় একটি সুর। জীবনের ব্যর্থতা উপছে উঠেছে আলোক শিখার মতো।

—তুমি!

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নীলেশ।

নীলেশও অবাক হয়েছে; এমনি পরিবেশ—এই দারিদ্র্যের মধ্যে মানসীকে দেখবে এটা সে কল্পনাও করেনি।

অনেক সন্ধান করে খুঁজে-পেতে বের করেছে বস্তীটা। রাস্তাও সরু কর্দমাক্ত। এক পাশে খোলা নর্দমার ময়লা জলে ঠেলে উঠে দখল করেছে রাস্তার খানিকটা।

গাড়ির চাকা বসে যাবে।

গাড়ি দূরে রেখে এসেছে।

তবু বস্তীর মাঝে ঝকঝকে গাড়ি ঢোকার শব্দ অনেকেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। নীলেশ ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করতেই দু'একজন উৎসাহী ছেলে এগিয়ে আসে—চলুন নিয়ে যাচ্ছি।

...অনেক খোঁজপাতের পর এখানে এসে পৌঁছেছে নীলেশ।

কিন্তু এই দৃশ্য দেখবে কল্পনা করেনি সে।

দীপুর পরণে একটা ময়লা প্যান্ট, চেহারাও বিবর্ণ হয়ে গেছে। খাটে বসে পড়ছিল—ওকে দেখে উঠে আসে।

—আপনি!

হাসে নীলেশ—তোমার বাগান কেমন হয়েছে?

—বাগান? ওই যে।

নীলেশকে টিনের বারান্দার নীচেই একফালি জায়গায় রাখা টবগুলোর দিকে নিয়ে যায়। আবছা আলোয় দেখে তার মতই ফ্যাকাশে বিবর্ণ আধমরা ক'টা ডালিয়া-গোলাপ গাছ কোনোমতে রোদ-হাওয়া পাবার আশায় ধুঁকছে।

—ওঃ।

দীপুই বলে চলেছে—ওগুলোতে ফুল ফুটবে দেখবেন।

নীলেশ চেয়ে থাকে মানসীর দিকে।

মাথা নামাল মানসীই।

চা আর খানকয়েক বিস্কুট এনেছে, টেবিলের ওপর রেখে বলে ওঠে মানসী চা খাবে না?

—ও।

নীলেশ পেয়ালাটা হাতে তুলে নেয়।

দড়ির আলনায় ঝুলছে কয়েকখানা শাড়ি, ওদিকে ছোট আয়নার সামনে একটা পাউডারের

কৌটা—পুরোনো পণ্ডস্‌ক্রীমের কৌটা, একখানা চিরুনি। ওই তার প্রসাধনের জায়গা।

ড্রেসিং টেবিলের বদভ্যাস ছেড়েছে মানসী।

—কি দেখছ?

—কিছু না। নীলেশ জবাব দেয়।

জানে মানসী কোনোদিনই তার কাছে কিছু চাইবে না, ওর উঁচু মাথা নীচু করবে না কোনোদিনই; তাই ওদিকের কোনো কথাতেই যায় না নীলেশ; বলে ওঠে—একটা চাকরির সন্ধান ছিল, অবশ্য তুমি যদি করো!

মানসী ওর দিকে চাইল ডাগর চোখ মেলে।

নীলেশ বলে ওঠে—আমারই এক ক্লায়েন্ট: ভদ্রলোক থাকেন নিউ আলিপুরের দিকে। বিরাট পণ্ডিত লোক; তারই বাড়িতে!

বিজ্ঞাপনের একটা কাটিং বের করে ব্যাগ থেকে।

—এই যে!

মানসীর হাতে তুলে দেয়।

মানসী বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলে থাকে।

একটা গভর্নেসের চাকরি; একমাত্র ছেলেকে পড়াতে হবে; থাকা-খাওয়া—মাইনে প্রায় আড়াইশো টাকার মতো। শিক্ষিতা, মার্জিতরুচি—ইত্যাদি ইত্যাদি দাবী করা হয়েছে।

মানসী হাসে—এত গুণটুণ তো আমার নেই।

—ওতে আটকাবে না। যা আছে তাই ঢের।

নীলেশের কথায় মানসী যেন চমকে ওঠে। আবছা আলোয় কেমন রহস্যময় মনে হয় এই পরিবেশ। নীলেশ কোন দূর-জগতের বাসিন্দা—যার স্বপ্ন নীরব স্মৃতি আর রঙিন বেদনায় মিশে তার মনের গহনে রয়ে গেছে।

মানসী দু'চোখ নামাল। বলে ওঠে—তাতেও কিন্তু দিন বদলায়নি।

—বদলাতে চাওনি; দিন বদলাতে চাওনা তোমরা মানসী, চাও যুগ বদলাতে।

মানসী চুপ করে থাকে। কণিকার গানের সুর তখনও জেগে আছে। স্বপ্নময় করে তুলেছে রাতের আকাশ। একফালি আকাশে তারা ছিটিয়ে পড়েছে।

নীলেশ একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে—একটা দরখাস্ত করে দাও।

—কোন্‌খানে?

—ওই ঠিকানায়।

—তারপর?

—ইন্টারভিউ-এর চিঠি আসবে। দেখা যাক কতদূর কি হয়?

চুপ করে কি ভাবছ মানসী।

নীলেশই সান্ত্বনা দেয়—যেন অভয় দিচ্ছে।

—ভালো লোক। সম্মান নিয়ে বাস করতে পারবে সেখানে। এটা বিশ্বাস করছি বলেই তোমাকে বললাম।

মানসী ক্লান্ত স্বরে জবাব দেয়—বেশ, দিচ্ছি দরখাস্ত।

...নীলেশ উঠে গেছে। চুপ করে বসে আছে মানসী।

রাত্রি নামে।

নিস্তব্ধ হয়ে আসে বস্তি এলাকা। মাস্টার মশাই-এর মেয়ে বনানী এসে ডাকল রেওয়াজ শেষ করে। কনিষ্ঠ সাধিকা সে।

ক'দিনেই দেখেছে কেমন গম্ভীর ও সংযত ধরনের মেয়ে। জীবনের দুঃখ-কষ্টকে সহে নেবার মতো করেই মনটাকে একটা আবরণে ঘিরে রেখেছে ওরা। বনানীকে তাই ভালো লাগে মানসীর।

ইতিমধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তারা।

—আয়!

মানসী অভ্যর্থনা জানায় তাকে।

বনানীর কণ্ঠে একটু চাপা ঔৎসুক্যের সুর—কে এসেছিল?

—আমাদের চেনা এক ভদ্রলোক।

—গাড়ির শব্দ শুনলাম।

—গাড়ি বাড়ি আছে। মানসী জবাব দেয়।

—আমাদের মতো উড়ো খই নয় কি বল? বনানী হাসে।

মানসী জবাব দেয় না, হাসে। মলিন বিষাদ হাসি। মানসী বলে—ওদের ফেরাতেও পারা যায় না, গ্রহণ করতেও মন চায় না। তবু সইতে হয় জ্বালা!

মানসী চমকে ওঠে। বনানীর দিকে চেয়ে সামলে নেয়।

হালকা হবার চেষ্টা করে মানসী।

—কেন রে জ্বালায় পড়ছিস নাকি? বনানী শুধোয়।

—পড়িনি বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে কাটিয়ে গেছি। বনানী শুধোয় ভদ্রলোক কি করেন?

—ওকালতি।

—খবরদার মানসী এগোসনি, মিছে কথা শুনতে শুনতে মরে যাবি!

—নারে, হাসছে মানসী বনানীর কথায়।

নীলেশকে ঘিরে কেমন যেন একটা মধুর স্মৃতি ওর কথায় ফুটে ওঠে। কণ্ঠস্বর—চোখের দৃষ্টি বদলে যায়।

সব জ্বালা ভুলে যায় সে নীলেশের দিকে চাইলে।

ঠিক কি যেন একটা মধুর ভালোবাসা অনুভূতি রোমাঞ্চিত জাগে।

প্রেম ভালোবাসা। ...তার কোনো সংজ্ঞা জানে না আজও মানসী।

—যাই।

বনানী বের হয়ে গেল।

রাত হয়েছে।

মানসী ছোট টাইমপিস্‌টার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। ইস্ কথায় কথায় এগারোটা বাজে।

—মা!

মনোরমা পাশের ঘরে জেগে বসেছিল। ঘুম আসে না। ...... মেয়েকে শুধোয়।

—নীলেশ চাকরির কথা কি বলছিল?

মনোরমা আজ বাঁচবার আশ্বাস খোঁজে ওই চাকরি তল্লাসে। মানসীও মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। আবছা আলোর রাত্রির অন্ধকারে দেখে মানসী জীবনের কঠিন বুভুক্ষা যেন মানুষকে আজ বদলে দিয়েছে। তার মাকে জবাব দেয়।

—হ্যাঁ, দেখি দরখাস্ত করে দিই। অপ্রিয় প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যই বলে ওঠে মানসী।

—চল রাত হয়েছে খেয়ে নিই গে।

—হ্যাঁ চল।

মানসী শেষ পর্যন্ত দরখাস্তটা পাঠিয়ে দিল অনেক ভেবেচিন্তেই।

বনানীও বলে—মেয়েদের মাস্টারি চাকরি তবু ভালো।

—কেন রে? মানসী প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, অফিসের চাকরি থেকে মাস্টারিই ভালো।

—বুঝেছ! বনানী মাথা নাড়ে।

মানসী হাসছে।

বনানী বলে ওঠে — হাসিস না। পুরুষদের সঙ্গে দশটা পাঁচটা কাজ করা নয় তো মনে হয় একপাল বাঘের সামনে ভেড়া দু'চারটে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—তাহলে অনেক স্তাবক জোটে বল? মানসী বলে ওঠে।

বনানী বলে—হ্যাঁ, একবার অমন চাকরি করে দেখ না। তার চেয়ে মাস্টারিই ভালো।

মানসী সাতপাঁচ ভেবে দরখাস্তটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেদিন বাড়িতে গাছ-কোমর করে ঝাঁট দিচ্ছিল মানসী।

ঝি রাখবার মতো সামর্থ্য নেই। মাত্র ক'টা প্রাণী আর দু'খানা তো এইটুকু ঘর, একফালি বারান্দা। মানসীই বলেছিল ....

—আমিই হাতে হাতে করে নেব। ঝিয়ের দরকার হবে না মা। তাছাড়া এ বাড়ির পাঁচসাত ঘর ভাড়াটের মধ্যে ঝি রাখবার মতো বিলাসিতা কারো নেই।

—তবু সময় খানিকটা কাটে কাজ নিয়ে।

এরই মাঝে এ বাড়ির মেয়েদের আনন্দ উল্লাস। কণিকা মাথার চুলগুলো নুড়ো করে বেঁধে কাপড় থাবড়াচ্ছে। বনানী নমিতা বেসুরা কণ্ঠে গান গাইছে আর বারান্দা ধুচ্ছে। খোলামেলা মুক্ত মেলা-মেশার জীবন।

—কী রাঁধছিস নমি?

—ইলিশের ঝোল।

—ঘটি কিনা তাই ইলিশের ঝোল রাঁধিস। ঝাল করিস না? কাঁচালঙ্কা দিয়া ঝাল?

কণিকারা এককালে ঢাকার লোক ছিল। এখনও তাই ঘটি বলে এদের অনেকেই রসিকতা করে।

হাসে মানসী। কণিকার স্মরণ হয়।

—ও তুই তো কলকাতার লোক। 'আমা'রে কবি 'আঁব'। ম' কে 'ব'। ক' দেখি 'রামা' 'মামা' 'মামা' 'ক' পষ্ট কইরা 'ক'।

হাসে মানসীও।

পুরুষরা অপিস— দোকানে বের হয়ে গেছে। এ সময় প্রমীলার রাজ্য এ বাড়ি।

এই সময়টুকু ভাল লাগে মানসীর।

—'চিঠি' এমন সময় আসে পিয়নের ডাক।

—বের হয়ে আসে দীপু।

মানসী আশা ভরে এগিয়ে আসে।

অপরিচিত হাতের ঠিকানা লেখা একটা চিঠি এসেছে। ... তার দরখাস্তের জবাব।

মা ও কণিকা এগিয়ে আসে।

—কি রে?

চিঠিখানা মায়ের দিকে এগিয়ে দেয় মানসী।

—দরখাস্তের জবাব এসেছে।

—কি লিখেছে? হ্যাঁরে? মায়ের কণ্ঠে ব্যগ্রতার সুর।

স্থির কণ্ঠে জবাব দেয় মানসী।

—দেখা করতে লিখেছেন।

—বেশ তো, যা।

—ভাবছি।

—ভাবাভাবির কিছু নেই বাছা, আমি তো বলি দেখা করে আয়।

—বেশ।

মানসী ছোট করে জবাব দেয়।

মা চলে গেল ওদিকে। কণিকা চেয়ে থাকে ওর দিকে। মানসীর চোখে মুখে কি যেন পরিবর্তন ফুটে ওঠে।

—হ্যাঁরে! কণিকার ডাকে ফিরে চাইল।

—ওঁর কি অমত, তোর নীলেশবাবুর?

চমকে ওঠে মানসী। ...একটু স্থির কণ্ঠে জবাব দেয়।

—না, তার এতে বলবার কিছু নেই। কারো কিছু নেই, বুঝলি।

কণিকা চুপ করে থাকে।

মানসীকে মাঝে মাঝে বুঝতে পারে না। কেমন কঠিন একটি মেয়ে। এত রূপ-গুণ থাকা সত্ত্বেও কেমন যেন মানুষ সে।

এখনও চিনতে পারেনি।

দীপু খবরটা শুনে ছুটে আসে—তোর চাকরি হয়েছে দিদি?

মানসী ঘাড় নাড়ে।

—তাহলে সেই বইগুলো কিনে দিতে হবে। ক্লাসের পড়া কতদূর এগিয়ে গেছে। আর একটা ম্যাপ।

—আচ্ছা! মানসী জবাব দেয়।

—মানসী চাকরিই নেবে। এছাড়া তার পথ নেই। মুক্ত নেই।

দরখাস্তের জবাব পেয়ে ইতি-কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে সে। যা হয় হোক—পথ তার সামনের দিকেই।

—আর ভাববার কিছু নেই।

বেলা হয়ে গেছে, প্রখর রোদ ছড়িয়ে পড়ে টিনের চালে।

তীব্র রোদ—তেমনি গরম।

নির্জন নিস্তব্ধ দুপুর নেমেছে বস্তি-রাজ্যে। ক্লান্তিকর দুঃসহ উত্তাপ উঠেছে চারদিকে।

বাস থেকে নেমে বেশ খানিকটা হেঁটে আসতে হয়।

নির্জন নিস্তব্ধ এলাকা! পাঁচিল ঘেরা বড় বড় বাড়ি—ঘিরে রয়েছে বহুকালের পুরোনো শিরীষ-রেইন্টি গাছগুলো। রেলিং দেওয়ালের ঘন হয়ে জমাট বেঁধেছে লতাগুলো; সবুজ আবেষ্টনী গড়েছে।

পাখী ডাকছে আকাশ ছোঁয়া ঝাউগাছের মাথায়।

শনশন কাঁপছে হাওয়ায়।

শহরের কর্ম কোলাহল, ওদের বস্তি এলাকার নোংরা—ঘিঞ্জী পরিবেশ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখানে যাঁরা থাকেন বা আসা যাওয়া করেন পায়ে হাঁটার দলে কেউ তারা নয়।

ছায়াঘন এ রাস্তায় লোক চলে না। —চলে গাড়ি।

দামী গাড়ি।

মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসে রেডিওর সুর, না হয় অ্যাল্‌সেসিয়ান বা খাঁটি কুলীন রক্তসঞ্জাত বিদেশী কুকুরের গলার আওয়াজ।

এগিয়ে চলেছে মানসী।

আজ নোতুন কোনো মন নিয়ে চলেছে সে।

ঠিকানাটা মিলিয়ে নেয়। হ্যাঁ এই নম্বরই।

গেটের দারোয়ানও বাধা দিল না।

রাস্তা ছেড়ে বাড়ির এলাকায় ঢুকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

একদিকে ছায়াঘন সবুজ ঘাস ছাঁটা সবুজ ময়দান, থরে থরে উঠে গেছে টবের গাছগুলো। সারিবন্দী

পুরোনো ক'টা দেওদাব গাছ সকালের রোদে আকাশে মাথা তুলেছে।

ওদিকে বাগানে ফুটে রয়েছে গোলাপ-রজনীগন্ধা থেকে বিদেশী পিটুনিয়া মেরীগোল্ড পার্শিয়ান লিলাকসবোগেন ভিলা নানা ফুল; সাদা মার্বেল পাথরে বাঁধানো ছায়াঘন সুইমিং পুল।

...বেশ সহজ সাবলীল ভঙ্গীতেই এগিয়ে চলে মানসী ছায়াঘন কাঁকর ঢালা পথ দিয়ে। পাখী ডাকছে...

বেশ খানিকটা গিয়ে বাড়িটা।

মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ড্রইং রুমের দিকে।

একজন চাকর তোয়ালে দিয়ে অগোছাল জিনিসপত্রগুলো ঝাড়ছিল। ঠিক ঝাড়ছিল না। বেশ আমেজ করে সিগ্রেট টানছিল একটা সোফায় বসে, মানসীকে হকচকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মানসীও একটু অবাক হয়েছে। এ বাড়ির চাকরদের মাথার ওপর শাসন বা দেখাশোনা করার কেউ যে নেই এটা বুঝতে পারে।

—কাকে চাই?

—মিঃ বসুকে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—আসুন।

খানিকটা নিয়ে গিয়ে বারান্দার ওপাশে রুদ্ধদ্বারের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়—ওই ঘরে যান। উনি লাইব্রেরীতে আছেন।

—আচ্ছা।

মানসী পিছন ফিরে দেখে চাকর বাবাজীবন ইতিমধ্যে পকেট থেকে আধপোড়া সিগারেট বের করে ধরিয়ে ফেলেছে। মানসী এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দরজা খোলাই ছিল।

—ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখে চারিদিকে বই আর বই। রকমারী বই।

—দেয়ালভর্তি র‍্যাকে-আলমারিতে টেবিলে সাজানো। বাকী কতকগুলো মেজেতে রাখা। ওপাশে খোলা টাইপ রাইটারটা পড়ে আছে। দেখাশোনা করার যেন কেউ নেই।

একগাদা নুড়ি-পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া কাগজ, প্রুফ সিট।

হঠাৎ দ্যাখে মানসী টেবিলের কাছে ধোঁয়া উঠছে।

একটু চমকে ওঠে।

একরাশ বই মেঝেতে বিছিয়ে বসে টেবিলের নীচেই ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে কি নোট করছেন। পাশে পাইপ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

—ও! তা আপনি?

চমকে ওঠেন ভদ্রলোক। আধাবয়সী—মাথার চুল সবে দু'চার গাছি পাক ধরেছে। বলিষ্ঠ চেহারা। চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকেন।

অপ্রতিভের মতো বলেন—কোথায় যে বসতে দিই। ওই খানে—হ্যাঁ নামিয়ে নিন বইগুলো। ওরে ও বনমালী!

মানসীই নামিয়ে নেয় বইগুলো। বলে সে।

—থাক, থাক। নামিয়ে নিচ্ছি।

—তাই নিন।

তিনি আবার বই নিয়ে বসে পড়েন। ডুবে যান গভীরে।

মানসী ঠিক কথাটা পাড়তে পারে না। অবকাশও পায় না।

নীরব নিস্তব্ধ লাইব্রেরিতে শুধু ঘড়িটার শব্দ শোনা যায়—টিক টিক টিক!

হঠাৎ সব নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে শব্দ ওঠে।

ঝন ঝন ঝন!

...একটা কাচের পুতুল ভেঙে গেল শক্ত মেঝেতে ছিটকে পড়ে। দরজা খুলে কে এগিয়ে আসে। মানসী ওর দিকে চেয়ে থাকে।

একটি ভদ্র মহিলা। দেহে প্রাচুর্য আর বিলাসের জন্য ঈষৎ মেদসঞ্চিত। পরণে দামী শাড়ি গহনা। সব কিছু ঘিরে একটা সম্পদ আর রূপের বিকৃত গর্ব প্রকাশ পায়।

পিছনে ঢুকছে একটি ছোট ছেলে ফুটফুটে সুন্দর। কিন্তু তার পোশাকে দেহে অযত্ন আর অবহেলার ছোঁয়া। কাঁদছে—আমি যাব তোমার সঙ্গে।

রাগেই বোধ হয় হাতের ডলটা আছড়ে ভেঙেছে। পিছু পিছু আসছে আব একটি বড় মেয়ে। বোধহয় দিদিই হবে। ছোট ভাইকে সামলাবার চেষ্টা করে।

—পুতুল! মা এক্ষুনি ফিরবে।

বুড়ো চাকরটা অসহায়ের মতো আসছে ওই শোভাযাত্রার পিছনে।

মহিলা ধমকে ওঠেন—নিধে, ছেলেটাকে সামলাতে পারিস না?

--কিছুতেই থাকছে না মা, সকাল থেকে খায় না।

ছেলেটাও কথা শুনবে না—আমি মায়ের সঙ্গে যাব।

তারপরই যেন ব্যাপারটা সপ্তমে ওঠে। ভদ্রমহিলা একেবারে ছেলেটাকে কসে দেন কয়েকটি চড়।

.. আর্তনাদ করে ওঠে! এগিয়ে আসেন মিঃ বসু।

—ওকি হচ্ছে নীলা।

—খুন করে ফেলব অবাধ্য ছেলেকে।

—ওর দোষ কি? সকাল থেকে নাওয়া খাওয়া হয়নি।

—মরুকগে। জানো মিঃ সেনের পার্টি! নিজে তো সব ভদ্রতা সামাজিকতা ছেড়েছ। আমি যাব...তারও উপায় নেই।

আবার পুতুলের কান ধরে কাঁদছে ছেলেটি।

অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে ওর ছোট্ট দিদি আর চাকরটা।

লাইব্রেরী ঘরের শান্তি কোন দিকে ছারখারে গেছে।

বইটা সশব্দে ফেলে এগিয়ে আসে মিঃ বসু।

—মেরে ফেলবে ওকে? সবে অসুখ থেকে উঠেছে—

এগিয়ে আসে মানসী। খোকনকে কাছে টেনে নেয়।

—এসো খোকন।

.. সে দেখতে পারেনি ব্যাপারটা। খোকনও অপরিচিত ওকে দেখে কেমন চুপ করে যায়।

অবাক হয় নীলা—প্রদীপ বসুও।

স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নীলা। প্রদীপের যেন এতক্ষণে খেয়াল হয়।

মানসী তখন পুতুলের ভাঙা হাতীর টুকরোগুলো কুড়িয়ে সাজিয়ে হাতীই তৈরি করেছে। কান্না ভুলে পুতুল চেয়ে আছে ওই দিকে!

—আপনি! মানে পরিচয়টা জানা হয়নি তো?

প্রদীপের কথায় ফিরে চাইল মানসী।

—ও! ব্যাগ থেকে দরখাস্তের জবাবটা বের করে ওর হাতে দেয়। দেখতে থাকে প্রদীপ। নীলাও।

প্রদীপ একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে।

—দেখে মনে হচ্ছে আপনি পারবেন।

—চেষ্টা করতে পারি।

মিঃ বসুই বলেন।

...পুতুলের নোতুন গভর্নেস মানসী রায়।

তাকে আর স্ত্রী নীলাকে নমস্কার করে মানসী, নীলা যেন ইচ্ছা করেই হাতে বাঁধা দামী জড়োয়া বসানো ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে ওঠে।

—তাহলে কাজকর্ম বুঝিয়ে দাও। ওদিকে দেরি হয়ে গেল। লতিকাদি কি ভাববেন। টা টা—

ভড়ং দেখাবার ভাণ করে পুতুলের মাথায় আলতো করে চুমু খেয়ে বের হয়ে গেল নীলা ঘর থেকে।

আবার যেন শান্তি ফিরে আসে লাইব্রেরীতে। বাতাসে তখনও মিশে রয়েছে ওর দেহের দামী সেন্টের সৌরভ।

এখানে পরিবেশে ওটা একেবারেই বেমানান। মিঃ বসু বলেন।

—নিধু, এঁকে ঘরটর দেখিয়ে দে। এই আপনার ছাত্র পুতুল আর ছাত্রী মায়া।

মায়া সেই দিদিটি, হাত তুলে নমস্কার করে মানসীকে।

দেখাদেখি পুতুলও ছোট দুটো হাত তুলে নমস্কার করার চেষ্টা করে।

হাসছে মানসী।

প্রদীপবাবু হঠাৎ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

সুন্দর সহজ হাসিটুকুও যেন অনেকদিন দেখেননি তিনি।

...এক মুহূর্ত। আবার বইয়ের সমুদ্রে ডুবে যান।

যেন অন্য মানুষ--এদের কাউকে চেনেন না। নিধু বলে ওঠে, —চলুন দিদিমণি।

—হ্যাঁ! পুতুল আর মায়াকে নিয়ে চলে গেল সে।

প্রদীপ বসু দর্শনের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রত্ন। এখানকার সব পরীক্ষাগুলোই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশের অনেক সম্মান কুড়িয়ে এনেছেন।

দেশ-বিদেশে তাঁর নাম-ডাক। তাঁর পেপার ওদেশের জার্নালে সমাদৃত হয়। এখন কয়েকখানা বই নিয়ে ব্যস্ত।

দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারার ওপর একটা প্রামাণ্য বই তিনি লিখেছেন। তাতেই সময় পায় না। তার উপর আছে এখান-ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেকচারের আমন্ত্রণ।

...কিন্তু এত কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে বিব্রত হয়ে পড়েন বাড়ির নানা ঝামেলায়। নীলাকে এনেছিল দেখেশুনেই।

প্রদীপের বাবার অর্থের অভাব ছিল না। তবু প্রদীপ স্বাধীনতা পায়নি। ও জানতো তাদের শ্রেণীর মেয়েদের পরিচয়।

গিল্টিকরা সোনার-উপরে ঝকঝকে পালিশ। ভিতরে একেবারে রাং পিতল। কোনো দামই নেই। নীলার বেলাতেও সেই হিসাবের ব্যতিক্রম হয়নি।

পোশাক-আশাক পার্টি আর শাড়ি গহনার একজিবিশন নিয়েই ব্যস্ত নীলা। বাড়িতে তার আর কোনো কাজ আছে—দায়িত্ব আছে তা মানতেই চায় না। মক্ষীরাণীর দল ওরা। মৌচাকের বাহার হয়ে থাকে।

কান পেতে শোনে প্রদীপ কাজ বন্ধ করে। না।

কান্নাকাটির শব্দ নয়। হাসছে। হাসছে পুতুল আর মায়া। তাতে মিশেছে নতুন আর একটি সতেজ কণ্ঠস্বরের সুরেলা হাসি। এ বাড়ির রূপ যেন বদলে গেছে।

আবার কাজে মন দেয় মিঃ বসু।

এলাহাবাদ সম্মেলন তাঁকে আমন্ত্রণ করেছে। যেতে হবে—অন্তত যাক বা না যাক, তার পরবর্তী কাজ ওই দর্শনের ধারা বিকাশের উপর একটা প্রাথমিক ভাষণও তৈরি করতে হবে।

নিধুকে দেখে মুখ তুলে চাইল।

—খাবার দেব?

একটু অবাক হয় প্রদীপ।

—ছেলেদের খাওয়া হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—দেগে, যাচ্ছি।

—কেমন যেন মন্থর গতিতে কাজটা চলেছে।

খাবার টেবিলে মানসীকে দেখে চিনতেই পারে না প্রদীপ। তখনও ওপেন হাওয়ার আর নীট্‌সের দর্শনের মূল-তত্ত্বের মধ্যে নিরির পার্থক্য আর মতদ্বৈধতার তর্ক নিয়ে ব্যস্ত।

খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। মানুষের চিত্তবৃত্তির দুটো বিভিন্ন দিক। এক জীবনের গোপনতম মনের অসহায় জ্বালা হতাশা কেমন করে তার সমস্ত চিন্তামানসকে অব্যবস্থিত করে তুলতে পারে তারই প্রকাশ। অন্যদিকে নীট্‌সের সুপার ম্যান—মনের সব প্রতিবাদের বলিষ্ঠ নির্মম অভিব্যক্তি। এই নিয়ে তার আলোচনার বিষয়।

—মানসীও অবাক হয়ে গেছে ওকে দেখে, এ যেন অন্য মানুষ।

...চুপ করে খেয়ে চলেছে; যেন চেনেই না তাকে। হঠাৎ বলে ওঠে প্রদীপ—মিস সেন?

জবাব দেয় মানসী—মিস্ রায়।

—ও, আই অ্যাম সরি!

কি যেন বলতে যাচ্ছিল প্রদীপ, আবার ভুলে গেছে। চুপ করে খেয়ে চলেছে আপন মনে। মানসীই বলে।

—কারি,একটু ভাত দিই?

—থ্যাঙ্ক ইউ!

—কোনোরকমে খেয়েদেয়ে উঠে গেল প্রদীপ। আবার লাইব্রেরী ঘরেই ফিরে গেল। যাবার সময় থমকে দাঁড়াল প্রদীপ।

কি ভেবে এগিয়ে আসে মানসীর কাছে। হঠাৎ যেন একটা করণীয় কাজ মনে পড়েছে তার।

—অসুবিধা হচ্ছে না তো?

অতিথির খোঁজ খবর নেবার যেন এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে তাঁর। হাসবার চেষ্টা করে মানসী —না-না।

প্রদীপ সোজা গিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকল আর কোনো কথা না বলে।

অনেক রাত অবধি চলছে তার কাজ, এ কাজের শেষ নেই।

রাতের বেলায় কাজে মন দিয়েছে প্রদীপ। নিস্তব্ধ বাড়ি।

...কোনো গোলমাল নেই। স্তব্ধ পরিবেশে যেন ঝড় তুলে বাড়ি ঢুকল গাড়িটা। সশব্দে থামল—সিঁড়িতে জুতোর শব্দ ওঠে।

প্রদীপের কাজে বাধা পড়ে। নীলা ফিরছে কলরব করতে করতে।

ঝলমল করছে পোশাক —জমকালো জব্বর রং পোশাক আর গহনা। জুতোর শব্দ আর ন্যাকামি ভরা সুরে কথা ছড়িয়ে এগিয়ে আসে।

—ইস্। কি 'এনজয়'টাই না করা গেল সারাদিন। তুমি গেলে না, কত দুঃখ করছিলেন লতিকাদি, মিস কারফরমা—ডঃ গুঞ্জারকর।

প্রদীপ স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। আলোয় ওকে দেখে মনে হয় যেন কাচের একটা দম দেওয়া পুতুল। যেমনি চকচকে দেখতে আর তেমনি বক বক করে অনবরত। শান্তি স্তব্ধতা ওদের ধাতে নেই। চারিপাশে যেন ঝড় তোলে— ঝড় তোলাই ওদের স্বভাব।

—বুঝলে মিসেস গুঞ্জারকরের জড়োয়া একটা ব্রেসলেট দেখলাম কোনো প্রিন্সেস-এর জুয়েলারী থেকে কেনা

প্রদীপ হাল ছেড়েই যেন চেয়ার থেকে উঠে কাজ ফেলে জানালার ওদিকে বাইরের দিক চেয়ে থাকে। চাঁদনি রাত। বাগানের গাছগাছালিতে বইছে রাতের হিমেল হাওয়া। তারা জ্বলা রাত্রি, সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। কান পেতে শোনে—আকাশ বাতাস কেমন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে।

—শুনছ! এগিয়ে আসে নীলা।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাগানের বাতাস ঢুকছিল। সৌরভস্নাত হিমেল বাতাস। সেই শুচিস্নাত বাতাসটা গিয়ে মেশে নীলার দেহের কৃত্রিম তীব্র সৌরভে! বিলাতি সেন্টের উগ্র গন্ধ।

—কি? বিরক্তভাবে চেয়ে থাকে প্রদীপ।

—বারে, তোমার তো মনেই নেই সেজদির মেয়ের বিয়েতে যেতে হবে না?

—কবে? ও সব ভুলেই যায় প্রদীপ।

—এই আসছে সোমবার। পাটনা থেকে কালই তো চিঠি পেয়েছ আবার।

আমি লিখে দিলাম, শনিবার আমরা যাচ্ছি।

নীলা বক বক করে চলেছে। ভাবছে প্রদীপ। বলে ওঠে।

—আমার যাওয়া হবে না।

—সে কি? অবাক হয় নীলা!

—হ্যাঁ, সোমবার এলাহাবাদ কনফারেন্সে লেকচার আছে।

নীলা চুপ করে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। প্রদীপ কৈফিয়তের সুরে বলে ওঠে।

—কি করব বলো, কথা দিয়েছি ওদের।

অভিমান ভরে বলে নীলা—আমার বোনেদের ব্যাপারে যাবে কেন?

—আচ্ছা, তবু তো যাবার সময় এক সঙ্গে যেতে পারব।

—থাক।

নীলা বের হয়ে গেল একটু রাগত ভাবেই। জানালার বাইরে চেয়ে থাকে প্রদীপ।

বাগানের ঘাসে লুটিয়ে পড়েছে চাঁদের আলো। কোথায় পাখি ডাকছে, রাতজাগা কোনো পাখি।

মানসীও চেয়ে ছিল দোতলার ঘর থেকে বাইরের ওই চাঁদের আলোর দিকে। অনেকদিন যেন এই আলো দেখেনি সে। উপছে পড়া আলো। দেওদার-নারকেল গাছের পাতায় ঝিকিমিকি ওই আলোর নাচন সারা মনকে আজ নীরব সুরে ভরে তুলেছে।

...মন্দ লাগে না এই চাকরি।

বাড়িতে মা-দীপুর ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা করতে পারবে। দীপুকে পড়াবার জন্য চাই একজন মাস্টার; চিরকাল প্রাইভেট মাস্টার রাখার ফলে এখন ওটা আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে।

...কেমন একটা নির্ভরতা সে খুঁজে পেয়েছে এই চাকরিতে। নীলেশকে মনে পড়ে। রাতের নিভৃত আঁধারে ভিড় করে আসে তার কথাগুলো—নীরব চাহনি। কেমন বেদনাতুর একটা স্মৃতি। কণিকাকে মনে পড়ে। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সুর সাধনা—জীবনে সুন্দরের সাধনায় তার ছেদ পড়েনি।

কত অভাব— বাড়িতে কত কথা শুনতে হয় বেচারাকে।

ওই বয়সের মেয়েদের ঘরে বসে কেউ খায় না; হয় বিয়ে হয়ে যায়—সংসারের কাজকর্ম দেখে। না হয় যে যার বিদ্যে অনুযায়ী কাজ-চাকরি-বাকরি করে। কিন্তু কণিকা তাদের দলে নয়।

সে শুধু গানই করে—এই তার জীবনের সাধনা।

...বাড়িতে মা বকাবকি করলে হাসে। মানসীও অবাক হয় ওর ধৈর্য দেখে।

কণিকাই বলে—বকুক না। একবার দাঁড়াতে পারলে দেখবি ওরাই ল্যাজ নাড়বে।

মানসীও যেন তেমনি সব সইবার ক্ষমতা অর্জন করেছে তার দায়িত্বের কথা ভেবে। এখন কোনোদিকে চাইবার অবকাশ তার নেই।

নিজের দিকেও না।

নীলেশকে তাই ব'স বার ফিরিয়ে দিয়েছে। মা-দীপু ওদের কথা না ভেবে নিজের ভবিষ্যৎ সে ভাবতে পারবে না।

রাত্রি হয়েছে। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পায় রাত্রি গভীরেও প্রদীপ বসুর ঘুম নেই।

লাইব্রেরি ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। টাইপরাইটাবের শব্দ আসে খট-খট-খট। নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে জেগে আছে শব্দটা।

নীলার ঘুম ভাঙে একটু বেলাতেই। কিন্তু ঘুমুতে কি আর পায় শান্তিতে, পুতুল উঠে এসে কান্নাকাটি—বায়না ধরে। মায়ার স্কুলে যাবার ব্যবস্থা আছে।

কাঁচা ঘুম ভেঙে ওঠে তাই বিরক্তিতে ফেটে পড়ে।

আজ যেন সব বদলে গেছে।

নিশ্চিন্তে ঘুম সেরে বেলা করে উঠে দেখে বাড়ির কাজ যথারীতি শুরু হয়ে গেছে। মায়া স্কুলে চলে গেছে। ওদের খাওয়া হয়ে গেছে।

নীলা ঝিকে প্রশ্ন করে। মানদা ঝি বৌরাণীর চা ব্রেকফাস্ট এনেছিল। যত্ন করে রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে বলে।

—হ্যাঁ। ওকি আব খাচ্ছ না যে?

—উ হু!

মানদাই জোর করে। বাপের বাড়ি থেকে আনা ঝি। তাই তার নজব নীলার উপরই। এ বাড়ির ঝি চাকরদের কর্ত্রী যেন সে। বলে ওঠে মানদা।

—অসুখ শরীর নিয়ে রাত জাগাজাগি ভালো নয়। হার্টের ব্যামো—নেই তো নেই। হল যদি একবার—তা যমে মানুষে টানা-টানি। ওদিকে আহার তো পাখির আহার হয়েছে। নাও—এইটুকু অন্তত খেয়ে নাও। চা নয়—হর্লিক্স দিতে বলেছে ডাক্তার।

—দে বাপু, যা দিবি।

নীলাও ওকে বেশ সমীহ করে। এখুনি আবাব ব্যাখ্যা না শুরু করবে।

মানদা ঝি-ই বলে ওঠে—নোতুন ও মাস্টারণীকে দেখেছ?

—কে রে? নীলার কণ্ঠে কৌতূহলী প্রশ্ন।

—এমনিই! তার বিয়ে থা তো হয়নি দেখছি।

—না, শুনছি তো বি-এ পাশ। পড়ায় ভালো।

—ওসবের কিছু বুঝি না বাপু!

মানদা বাসন-টিপটগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল। নীলা ওর দিকে চেয়ে থাকে কি যেন আরও বলতে চেয়েছিল সে!

বারান্দায় বাসন কোসন টিপটগুলো নিয়ে গিয়ে মানদা জানালায় রেখে বাকী চা-মাখন টোস্ট সন্দেশগুলো শেষ করছে একে একে। এদিক ওদিক চায় আর মুখে পোরে।

মানসী যাচ্ছিল বারান্দা দিয়ে কি একটা বই নিয়ে—দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে সরে গেল অন্যদিকে। সামনে এল না।

...নিধু বুড়োর এসব দিকে নজর নেই। এঘর ওঘর মুছে তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে আসছিল, মানদাকে দেখেনি। মানদাই ওকে দেখে কোনোরকমে মুখের মধ্যেকার ডিমটা কোঁৎ করে গিলে কণ্ঠস্বর বেশ কঠিন

করে বলে ওঠে—ঘর ঝাড়া মোছা হল? ধুলো যে থিক থিক করে।

--চোখের নজর কমেছে দিদি। নিধু বলবার চেষ্টা করে।

—নজর কমেছে তো ছুটিই নাও।

নিধু চুপ করে সরে গেল। মানদা এদিক ওদিক দেখে আবার সন্দেশে কামড় দেয়।

বাইরে যাবার আয়োজন করছে নীলা। সারাদিন বাজার করেছে গাড়ি নিয়ে। শাড়ি-গহনা-কসমেটিক—এটা সেটার স্তূপ। ট্রাঙ্ক বোঝাই হচ্ছে। যেন কোনো এক্‌জিবিশন দোকান নিয়ে চলেছে। মানদার বিশ্রাম নেই। সেও ফাই ফরমাস খাটছে। ওদিকে সরকার মশাইকে পাঠানো হয়েছে ইস্টিশনে। সিট রিজার্ভ করতে।

হিমসিম খেয়ে যায় প্রদীপ। নোট নেওয়া হয়েছে রাজ্য শুদ্ধ লিখতে হবে, দিনরাত লিখেও পারে না। পায়চারী করছে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত একটি লোক যেন একক কোনো সংগ্রামে ক্লান্ত।

লিখবার চেষ্টা করে—একবার গিয়ে টাইপ করতে থাকে। দু'চার সিট টাইপ করে আবার লিখতে থাকে!

মানসী দেখছে। পুতুলের জন্য লাইব্রেরীতে গেছে ছবির বই আনতে, ওঁকে দেখে থমকে দাঁড়াল। প্রদীপের কোনো খেয়াল নেই, সে যেন চেনেই না ওকে। মানসী শুধায়।

—টাইপ করে দিতে হবে?

—টাইপ জানেন? দেখুন দিকি কেমন বিপদে পড়েছি। এদিকে প্রেসের কপি—প্রুফ, ওদিকে কনফারেন্সের লেকচার। মাত্র আর একটা দিন মাঝে।

মানসী টাইপ মেসিনের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে খাতা নিয়ে।

প্রদীপ বলে।

—কি হবে? কই টাইপ-এ বসুন, ওই তো কপি রয়েছে। লিখে ফেলছি।

—আপনি বলে যান, নোট নিচ্ছি। অবাক হয়ে যায় প্রদীপ—স্টেনোগ্রাফিও জানে তা হলে? good God : নিন শুরু করুন।

প্রদীপ খুশিতে যেন উপছে পড়ে।

প্রদীপ পায়চারী করছে আর বলে যাচ্ছে গড় গড় করে।

...নীলা বার বার করে মানদা আর নিধুকে বুঝিয়ে দেয় কাজ কর্ম। বাড়ির অনেক ঝামেলা। পুতুল দাঁড়িয়ে আছে মানসীর শাড়ির আঁচল ধরে, পাশে মায়া। মাকে ওরা দূর থেকেই দেখছে।

প্রদীপও বাইরে যাবার পোশাকে তৈরি। নীলাকে সেই কথা দেয় একদিন মাত্র এলাহাবাদে থাকব, তার পরই তো পাটনায় ফিরছি।

—দেখো আমি কিন্তু সেজদিকে তাই বলব।

—হ্যাঁ।

প্রদীপ পুতুলকে আদর করে।

—কই তুমি যাবে না মায়ের সঙ্গে?

নীলার দিক থেকে ছেলেদের নিয়ে যাবার আগ্রহ নেই, কিছু বলবার আগে পুতুলই বলে ওঠে--

—উঁ হু! আমি মাসীমণির কাছেই থাকব। কত ভালো গল্প বলে...

নীলা একবার মানসীর দিকে চাইল। গাড়িতে উঠতে যাবে তারা, মানসীই বলে—মাকে প্রণাম করো পুতুল।

পুতুল যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাসীমণির কথায় নীলাকে প্রণাম করে।

এই ব্যাপারটা নীলা'ও নজর এড়ায় না। চুপচাপ গাড়িতে উঠল তারা।

...সারা বাড়িতে মানসী আর ওই মায়া, পুতুল। কি যেন আনন্দে বান ডেকেছে ওদের শিশু মনে। সারা বাড়ির মুক্ত অবাধ পরিবেশে বাগানে রঙিন ফুলে বসা প্রজাপতির দল বাতাসে ডানা মেলে ঘুরে বেড়ায়, তাদের সঙ্গেই ওরা ছুটোছুটি করে বাগানে।

গানের সুর শোনা যায়। মায়া পুতুলের কাঁচা গলায় মিশেছে মানসীর সুরেলা কণ্ঠস্বর।

—আজ আমাদের ছুটি রে ভাই

আজ আমাদের ছুটি।।

সুইমিং পুলটা এতদিন এমনিই পড়েছিল। কেউ নামতো না ওতে। বাগানের শোভা হয়েছিল মাত্র। মার্বেল পাথরে বাঁধানো চাতালটায় ওদের আসর বসে।

মানসী বসে আছে। মায়া, পুতুল স্নান করছে।

ছোট ডাইভিং বোর্ড থেকে মায়া লাফ দেয়, চারিদিকে ছিটকে ওঠে জল। দুজনে জল ছিটোচ্ছে।

—এাই! মানসী বাধা দেবার চেষ্টা করে।

কে কার কথা শোনে।

বিকেলের সোনা রোদ লেগেছে ছায়াঘন গাছগাছালির মাথায়। দু'একটা পাখি ডাকছে।

ওতে মিশেছে ওদের হাসি আর গানের সুর। মানসীও এতক্ষণে গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করেও পারেনি। জলে নেমেছে ওদের সঙ্গে।

প্রদীপ এলাহাবাদের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে।

অভিনন্দিত হয়েছে তার বক্তৃতা। বিলাতের জার্নালে ছাপবার জন্য সেইখান থেকে নিয়ে গেছেন কোনো বিদেশী পণ্ডিত।

...ভারতের দর্শনধারায় ওপর এমন বিশদ তত্ত্ব গভীর আলোচনা আর কেউ নাকি বিশেষ করেনি। প্রদীপবাবুও কল্পনা করেনি তার লেখা দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণীদের কাছে এতটা সমাদৃত হবে।

ভাবছে সে নানা কাজের ভাবনা। কলকাতা ফিরে গিয়েই এই খসড়ার ওপর পূর্ণাঙ্গ লেখা শুরু করবে। এই হবে তার অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ।

...দূরে রোদ-ছায়া মাখা বিন্ধ্য-পর্বতের নীল আভাস—দু'একটা গাছ-গাছালির দেখা যায়, ট্রেনটা উষর পথ দিয়ে ছুটে আসছে। বাঁ দিকে পাহাড়ের মাথায় চুনার দুর্গ দেখা যায়—তারও পাশে ঝিকিমিকি করে গঙ্গার জলরাশি।

নিজের ভাবনায় ডুবে গেছে প্রদীপবাবু। সারা ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টে সে একা।

খসড়াটা পড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দাগ দিচ্ছে বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব গ্রীক পরবর্তী কালে জার্মানীতেও কি নিবিড় ভাবে পড়েছিল সেই যোগাযোগের সূত্রও আবিষ্কার করবার চেষ্টা করবে সে। যাজ্ঞবল্ক্য আর গার্গীর তর্কের মধ্যে একটা ক্রোধ আর অক্ষমতারই প্রকাশ। তবু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সে দেখবার চেষ্টা করবে।

—সর্বনাশ!

এতক্ষণ খেয়াল করেনি প্রদীপ।

আবিষ্কার করে বিহারের সমতল এলাকা—উর্বর গঙ্গার তীরভূমির স্বপ্ন ছেড়ে গাড়ি এসে পড়েছে ঝাঁঝার লাল পাহাড় সীমার কাছাকাছি।

চমকে উঠে প্রদীপ! এতক্ষণ একেবারে ভুলে গিয়েছিল পাটনায় নামতে হবে—নীলাকে কথা দিয়েছে সে।

গাড়িখানা জোরে ছুটে চলেছে কলকাতার দিকে।

একগাদা লাজ। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। নতুন বইয়ের বহু কাজ বাকি।

নীলার আহ্বানে সেই উত্তরোল সম্ভাবনায় ভবিষ্যতের তুলনায় অনেক ম্লান। মন সেখানে যেতে সাড়া দেয়নি। তাই বোধহয় ভুলেই গেছে সে একেবারে।

ভালোই হয়েছে।

বৈকালের আলো নামবার আগেই ট্রেনখানা কলকাতা পৌঁছেছে। বলা নেই বাড়িতে। নিজেই ট্যাক্সি

নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল প্রদীপ, নীলাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিল—কাজেব জন্য ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে কলকাতায়।

অত্যন্ত দুঃখিত কিন্তু নিরুপায়। নীলা যেন রাগ না করে।

...জয় করে ফিরেছে প্রদীপ। সব পরিবেশটাই কেমন বদলে গেছে। ইডেন গার্ডেনের বৃষ্টি ধোয়া ঘন সবুজ গাছগাছালির বুকে এসেছে গাঢ় সবুজের নিবিড় রং—গড়ের মাঠ আজ হাওয়ার মাতামাতি। গোলমোহর গাছের পাতা ছেয়ে এসেছে গাঢ় হলুদ ফুলের স্তবকগুলো।

বাড়ি ঢুকেই থমকে দাঁড়াল প্রদীপ।

—ছায়া ঘেরা সুইমিং পুলের ওপাশ থেকে উঠেছে কলরব আর গানের সুর; হৈ চৈ করছে কারা।

এ বাড়ির স্তব্ধ গাম্ভীর্যের মাঝে যেন নোতুন শুনল এই সুর।

পাষাণ পুরীতে সাড়া জেগেছে।

চমকে দাঁড়াল প্রদীপ।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে কি কৌতূহল বশেই।

বোগেনভিলার অজস্র ফুল আজ যেন অকারণেই ফুটেছে সবুজ লতার বুক ঢেকে শুধু লাল ফুল—বাতাসে বকুল ফুলের উগ্র সৌরভ জাগে।

ছায়াঘন রঙিন ফুলের পাতায় ঢাকা গাছের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল প্রদীপ।

মায়া, পুতুল খুশিতে ফেটে পড়েছে। মানসীও ওদের সঙ্গে নেমেছে স্নান করতে। সেই স্তব্ধ নীবব গম্ভীর মানসী আজ চঞ্চল কিশোরীদের মতো বদলে গেছে।

মানসীর মনের অতলে আগেকার সেই ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির দিনগুলো মনে পড়ে। আজ এমন মিষ্টি আলো মাখা বৈকালে হারিয়ে ফেলেছে মানসী খুশির জোয়ারে।

বুড়ো নিধু বাবুকে দেখে এগিয়ে আসে। একটু আশ্চর্য হয়েছে। প্রদীপ চলে গেল বাড়ির দিকে, ওদেব বিবক্ত করতে চায় না।

নিজের কর্মব্যস্ত মন যেন আজ প্রাণেব অফুরাণ এই প্রকাশে খুশিই হয়েছে।

—ডাকব দিদিমণিকে! নিধু বলে ওঠে।

নিধুর দিকে চেয়ে বলে ওঠে প্রদীপ—না।

...ক'দিনেই মানসী যেন একেবারে মিশে গেছে মায়া আর পুতুলেব সঙ্গে। দেখেছে একটা জায়গাতে মায়া আব পুতুল কোথায় নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হয়েছে।

মাতৃস্নেহ—ভালোবাসার স্বাদ পায়নি বলেই বোধ হয় মানসীর ক'দিনের ভালোবাসার স্পর্শ পেয়েই কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছে ওরা।

অসহায় পুতুল পেয়েছে মানসীকে তার অবলম্বন হিসেবে।

সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসে তাবা।

এটাও যেন ওদের কাছে একটা আনন্দময় মুহূর্ত।

মানসীও ভুলে গেছে যেন তার অতীত।

একা একা থাকলেই মনে পড়ে বেলেঘাটার বস্তির সেই মা দীপুর কথা।

কণিকা-বনানীকে ভোলেনি।

সব ছাপিয়ে মনে আসে আর একজনকে —সে নীলেশ। ক'দিনই তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—গল্প মাসীমণি! মায়া জেদ ধরে।

—উঁহু গান; ছড়া আর গান। সেই সাত শেয়ালের ছড়া। টোপর মাথায় বিয়ে। পুতুল মানসীর হাত ধরে ওকে যেন আরও কাছে টেনে নেয়।

...মানসী হাসছে।

কেমন যেন একটা সব হারিয়ে যাওয়া সব ভুলে যাবার মতোই স্বপ্ন।

শীতের আমেজ পড়েছে। চাঁদের আবছা আলোয় গুঁড়ি গুড়ি হিম ঝরে বাইরে।

সুরটা উঠছে মিষ্টি, কেমন যেন আবেশ আনা সুর।

মানসী ঘরের ভিতর আবছা নীল আলোয় গান গাইছে।

কোনো পল্লী কবির মাটির স্পর্শে মাখানো ছড়া—কোনো কোকিল ডাকছে। রাত নিঝুম তারই মাঝে কোনো শিশু বীর চলেছে। মাথায় আম পাতার মুকুট। হাতে তালপাতার তরোয়াল।

চাঁদ উঠেছে।

প্রদীপ জানালার বাইরে চেয়েছিল। ওই মানসীর সহজ সুন্দর সুরটা এই চাঁদের আলো ঢাকা রাত নির্জনে যেন তাকেও নাড়া দেয়। মনের অতলে কোনো সহজ সুন্দর শিশুমন বহু অতীতের কঠিন পথের পরিক্রমা সেরে ফিরে যায় সেই দিনগুলোয়।

হাতে কাজ ফেলে এগিয়ে আসে বারান্দার দিকে।

আইভিলতার ঘন পাতাভরা পরিবেশ বারান্দার বাইরে কেমন আলোছায়ার আভাস এনেছে।

...এ কোন যেন স্বতন্ত্র জগৎ।

ওই ঘরের মধ্যে সুরতীর্থে যাবার অধিকার তার নেই।

বাইরে ইজিচেয়ারেই বসে পড়ে, সুরটা ভেসে আসছে। কেমন শান্তি নিবিড় তৃপ্তি আনে প্রদীপের সারা দেহ-মনে।

জীবনের খ্যাতি আর আনন্দ যেন এক হয়ে মিশেছে গঙ্গা যমুনা ধারার মতো। প্রদীপ স্বপ্ন দেখছে।

ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে, মানসী বেব হয়ে এসেই একটু অবাক হয়।

ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে প্রদীপ। ঘুমুচ্ছে, মুখে পড়েছে একঝলক আলো।

এত কাছে থেকে কোনোদিনই দেখেনি ওকে মানসী। শিশুর মতোই সহজ সরল ভাব—পুতুলের কথা মনে পড়ে। তেমনি একটি সহজ মানুষ—শিশুর মতো সারল্য তারুণ্য আর প্রাণসম্পদ নিয়ে এসেছে।

শীত পড়ছে।

ঠান্ডাও লাগছে। মানসী জাগাতে পারে না ওকে। ...কি ভেবে ভিতর থেকে একটা র‍্যাগ এনে ইতস্তত করে ওর গায়ে আলতোভাবে চাপা দিতে থাকে। কি যেন একটা গর্হিত কাজই করছে সে লুকিয়ে।

..প্রদীপ বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিল। সারাদিনের কাজকর্মের ক্লান্তির পর শবীর যেন এলিয়ে পড়ে। এলাহাবাদ থেকে ফিরে এই দু'তিন দিন একমুহূর্তও সময় পায়নি।

কাজ ...কাজ আর কাজ।

—হঠাৎ নিবিড় ঘুমের মাঝে কার হাতের ছোঁয়া—র‍্যাগের সেই মৃদু উষ্ণ স্পর্শে কেমন চমকে জেগে ওঠে।

কি যেন একটা স্বপ্ন দেখছিল সে।

মানসীও যেন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।

একটি মুহূর্ত!

চাঁদের একঝলক আলো আইভিলতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে ঠাঁইটাতে।

পায়েব শব্দে চমকে ওঠে দুজনেই। নীলা কখন ফিরছে জানে না প্রদীপ।

—নীলা! ওকে এখানে এসময় দেখে অবাক হয়েছে তারা।

...প্রদীপের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

আবছা অন্ধকার থেকে এগিয়ে এসে দাঁড়াল নীলা। আলোয় দেখা যায় তার দুই চোখের চাহনিতে কি যেন নিবিড় ঘৃণা আর সন্দেহের কালো ছায়া ফুটে উঠেছে।

মানসী—প্রদীপ দু'জনেই চমকে উঠেছে।

মাথা নামাল মানসী। কি যেন অপরাধ করেছে সে। নীলাকে প্রদীপ বলে ওঠে—কাজের চাপে পাটনায়

ামতেই পারিনি।

—থাক, কাজের নমুনা খানিকটা টের পেয়েছি।

নীলা যেন প্রদীপের মুখে একটা সজোরে আঘাত করেছে। সেই যন্ত্রণায় বোধহয় আর্তনাদ করে ওঠে প্রদীপ।

—নীলা!

নীলা দাঁড়াল না। জুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে গেল ওর ঘরের দিকে।

প্রদীপ কি করবে ভেবে পায় না। অসহায় অপমানে চঞ্চল হয়ে ওঠে সে।

মানসীর দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

কি যেন নিবিড় একটা কালোছায়া মানসীর সুন্দর মুখে নেমে এসেছে।

প্রাণপণে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে সরে গেল মানসী ওর সামনে থেকে।

প্রদীপ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে একাই।

...কোনো কিছুই যেন বুঝতে পারে না সে কি করে কি ঘটে গেল।

.. অথচ করার তার কিছুই নেই।

আলো জ্বলছে লাইব্রেরীতে, প্রদীপ বইগুলো টেনে নিয়ে বসে পড়ে। চুরুটের ধোঁয়া আর বই-এর ্তূপের আড়ালে যেন আত্মগোপন করেই বাঁচতে চায় সে।

রাত্রি নামে। মানসী কি ভাববে?

কোথায় যেন কি একটা গোলমাল ঘটে গেছে। এতে তার কোনো হাতই ছিল না।

মিঃ বসুর অসহায় বেদনাকাতর চাহনি মনে পড়ে। নীলার ঘুম আসে না।

অধীর কি এক দুর্বার অসহায় রাগে ঘরময় পায়চারী করছে নীলা। চোখের সামনে দেখছে কি এক ়াগামী সর্বনাশের কালো ছায়া।

নীলা ক'দিনেই দেখেছে মায়া ও পুতুল যেন তার পর হয়ে গেছে।

পুতুলও মাকে এড়িয়ে চলেছে। রাত্রে সেদিন শোবার কথা উঠতেই প্রতিবাদ করে ওঠে পুতুল। কচি ণ্ঠস্বরও যেন সতেজ অনমনীয় হয়ে ওঠে। পুতুল বলে।

—না, আমি দিদিমণির কাছেই শোব।

-কেন? নীলা বাধা দেয়।

—উহুঁ, পুতুলের সেই এক গোঁ।

মায়াও নীরবে যেন মাকে এড়িয়ে চলে।

প্রদীপও এলাহাবাদ থেকে ফিরেছে অনেক আগেই এবং ইচ্ছা করেই পাটনাতে নামেনি। নীলার মনে য় এড়িয়ে গেছে তাকে।

—দিদিমণি!

মানদা ঝিয়ের ডাকে ফিরে চাইল নীলা!

—ওষুধটা খাও।

—ভাল লাগে না।

—তা বললে কি চলে? ডাক্তারবাবু পই-পই করে বলে সময় মতো খেতে শুতে। রাতজাগা একেবারেই ানা। তা কথা যদি শোন কানে?

—থামবি মানদা? নীলা ধমকে ওঠে।

—না বাছা, শরীরের অযত্ন সইতে পারি না। একে বুকের ব্যামো —এই ভালো তো এই গেল। তাদের ানিয়ম করা ভালো নয়।

মানদার কথায় নীলা যেন সমবেদনার সুর খুঁজে পায়।

ছোট্ট মেয়ের মতো সায় দেয়।

—তুই যা বুঝিস তা কি তোর দাদাবাবু বোঝে মানদা?

মানদা ওষুধটা এগিয়ে দিয়ে খুশিতে গদগদ হয়ে বলে ওঠে!

—কি যে বল দিদি আমরা বোকা-সোকা মানুষ।

কথাটা বোধহয় কানে যায় না নীলার। ওষুধ খেয়ে জলের গ্লাস খোঁজে। এক মুহূর্তে তা হাতের কাছে না পেয়ে ধমকে ওঠে।

—মুখপুড়ীর একটু জ্ঞান আক্কেল আছে? জল দিতে হয় তাও জানিস না? মানদা বেলুনের মতো চুপসে যায় এক নিমিষের মধ্যে। জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেয় এই যে।

ঘুমুবার চেষ্টা করে নীলা; ঘুম আসে না, উঠে বসে। বাইরের আলো একফালি এসে পড়ে ঘরে। উত্তেজিত কণ্ঠে নীলা প্রশ্ন করে।

মাস্টারণী মেয়েটা কেমন রে?

মানদা যেন এইবার বলবার মতো কিছু পায়।

ঘুম ছাড়াবার জন্যই মুখে একমুঠো দোক্তা চালান করে মানদা বলে ওঠে :

—আমাকে কেন আর শুধোচ্ছ দিদি, খুকির মা ও পটলি ওদের শুধোও।

গলা নামিয়ে বলে মানদা—যেন ওর কথা শোনবার জন্য চারিদিকে কারা ওৎ পেতে আছে। বলে ওঠে।

—স্বভাব চরিত্তির যেন কেমন এক ধরনের।

নীলা কথা বলে না। কি যেন কালো ছায়ার মতো আঁধার ঘনিয়ে আসে ঘরে। মুছে গেছে চাঁদের আলো।

একটা ভাসমান মেঘ এসে ছেয়ে ফেলেছে চাঁদের আলোটুকু।

—সকাল বেলায় নীলাকে ঘরে আসতে দেখে মানসী একটু অবাকই হয়, মায়া ও পুতুলকে পড়াচ্ছিল।

—পুতুল, ক'সপ্তাহের মধ্যেই কেমন যেন আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। লাজুক-মুখচোরা ছেলেটিও মুখর হয়ে ওঠে ওর কাছে এসে।

জোরে জোরে পড়ছে।

মানসী একমনে টাইপ করে চলেছে, একরাশ লেখা নোটগুলো থেকে টাইপ করছে।

হঠাৎ নীলাকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

চুপ করে চেয়ে থাকে মায়া ওর দিকে, পুতুলও।

পুতুল চেয়ার থেকে নেমে যেন, মায়ের হাতের অকারণ মারধোর এড়াবার জন্যই মানসীর শাড়ির আঁচলটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

মানসীব দিকে চেয়ে আছে নীলা।

সকালেই স্নান সেরেছে। বলিষ্ঠ সুন্দর সুঠাম চেহারা। চোখের কোলে সহজ সুন্দর হাসির আভা। তার সামনে নিজেকে কেমন যেন অসহায়, অনেক নীচের মানুষ বলেই মনে করে নীলা।

তবু সতেজ হবারই চেষ্টা করে।

—মানদা ওদের একটু বাইরে নিয়ে যা।

পুতুলকে এসে ধরে মানদা। পুতুলও মাথা সোজা করে জবাব দেয়।

—উহুঁ!

—পুতুল, নীলা ছেলের অবাধ্যতায় এগিয়ে গিয়ে ওর কান ধরেই টেনে সরিয়ে আনে। উত্তেজিত অবস্থাতেই ওর পিঠে বসিয়ে দেয় কয়েকটা চাপড়।

বাধা দেয় মানসী—আহা।

—নিয়ে যা ওকে মানদা, বাঁদর ছেলে কোথাকার।

টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল মানদা, মানসী এগিয়ে গিয়েও বাধা দিতে পারল না। তার আর পুতুলের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ নীলা। তার দাবীই বেশি।

মানদা যাবার সময় একবার চেয়ে দেখে মানসীকে। তাকে যেন নীরব চাহনির ওই জ্বালায় বুঝিয়ে দিতে চায় এ বাড়ির কর্ত্রী ওই নীলাই, আর মানদা তার পার্শ্বচারিণী। কেউকেটা বিশেষই।

মানসী অবাক হয়ে চেয়ে আছে নীলার দিকে।

দুচোখে ওর কি যেন নীচ কুটিল চাহনি, সমস্ত নকল আভিজাত্যের মুখোস খুলে পড়েছে চকিতের মধ্যে।

নীলাদের জাতকে চেনে মানসী।

অতীতে বহু সম্পদ সেও দেখেছে, দেখেছে প্রাচুর্য আর প্রভাবের কি অসূয়া।

আজ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে আজ চাকরি করতে বাধ্য হয়েছে।

—কিছু বলবেন?

নীলা চেয়ে থাকে ওর দিকে। তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে :

—আরও বলতে হবে? ভেবেছিলাম বুঝতে পারবে।

—যদি ভুল বোঝেন—

—ভুল বোঝেন! ভেবেছিলাম—যারা এইভাবে বাঁচতে চায় তুমি তাদের দলের নও। কিন্তু দেখছি ভুল বুঝেছিলাম। লজ্জা হওয়া উচিত তোমার।

নীলার কণ্ঠে যেন গরল ঝরছে। তীব্র বেদনা আর অপমানে বিবর্ণ হয়ে ওঠে মানসী।

ভুলে যায় চাকরি করতে এসেছে। ভুলে যায় মা-দীপুর কথা, তার অভাবের তাড়না।

নারীত্বের সম্মানে চরম আঘাত খেয়ে মানসী জ্বলে ওঠে। সংযত কণ্ঠে জবাব দেয় মানসী।

—আপনার ধারণা যে কতদূর মিথ্যা বোঝার মতো মানসিক অবস্থা আপনার নেই।

—কি বলতে চাও তুমি?

—বলতে কিছুই চাই না। শুধু জানিয়ে দিই—প্রশ্ন যখন একবার মনে উঠেছে, তখন আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই সঙ্গত, আমি চলে যাচ্ছি।

মানসী আজ তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। যেমন করেই হোক বাঁচবে তবু এভাবে শেষ-অবশেষে ওই সম্মানটুকু বিসর্জন দিয়ে নয়।

...নীলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অসহ্য উত্তেজনার ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে সে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে মানসী তেজোদীপ্ত ভঙিতে তার ব্যাগটা নিয়ে সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

একবার পিছন ফিরেও চাইল না।

নীলার সব তেজ নিভে গেছে ওর সামনে।

নীলা হেরে গেছে।

...ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে, কোনরকমে পরাজিত নীলা, ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে বের হয়ে গেল নিজের ঘরের দিকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল নিধু।

সে ব্যাপারটা কিছুটা দেখেছে—শুনেছেও।

বৌরাণীকে বের হয়ে যেতে দেখে এগিয়ে আসে। দোতলার জানালা থেকে দেখা যায় চলেছে মানসী। বাগানের খোয়া ঢাকা পথ দিয়ে।

সাইকামোর গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল—আর দেখা যায় না তাকে।

নিধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওর ঝাপসা চোখের কোণে কেমন যেন টলটল করে অশ্রু। এ বাড়িতে দীর্ঘদিন আছে। প্রদীপকে মানুষ করেছে।

এত বয়সে যে দু'চারজনকে ভাল লেগেছিল—ওই মানসীও তাদের একজন। আজ তাকে এ বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে বের হয়ে যেতে দেখে বুড়োও চটে উঠেছে।

কিন্তু নিষ্ফল সেই উষ্মা।

বাতাসে উড়ছে কাগজপত্র। টাইপ মেসিনটা পড়ে আছে।

...হঠাৎ প্রদীপকে ঢুকতে দেখে এগিয়ে যায়।

—টাইপ হলো?

...কোনো জবাব নেই। নিধু কাগজগুলো কুড়িয়ে চলেছে।

প্রদীপ এগিয়ে আসে। কাগজপত্রগুলোকে এই অবস্থায় দেখে দপ করে জ্বলে ওঠে!

—এসব কি হচ্ছে?

নিধু জবাব দেয় না। কাগজগুলো চাপা দিয়ে রাখে। টাইপ অনেক বাকি; চটে ওঠে প্রদীপ।

—এদিকে সমস্ত ছত্রাকার করে ছড়ানো। এবাড়ির সবাই কি ফাঁকি দিতেই আছে। তিনি কোথায়?

—চলে গেছে! স্থির কণ্ঠে জবাব দেয় নিধু।

—চলে গেছে! ব্যাস! আবদার; চাকরি করে তা জানে না?

চাকরি ছেড়ে দিয়ে গেছে মানসীদিদি।

চমকে ওঠে যেন প্রদীপ; নিধু সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

—কেন?

—জানি না।

নিধু বের হয়ে যাবে, প্রদীপের বাধা পেয়ে দাঁড়ায়।

—কেন গেল?

—বললাম তো জানি না। এইবার আমাকেও ছুটি দাও; ঢের হয়েছে। নাহলে বুড়ো বয়সে বৌদিই কেন তাড়াবে। সে করতে যেন না হয়। তাই কথাটা বললাম।

বুড়ো বের হয়ে গেল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে প্রদীপ।

বাতাসে উড়ছে কাগজগুলো। সর্টহ্যান্ড নোট নেওয়া স্লিপগুলো। কত কি লেখা রয়েছে সবই তার কাছে দুর্বোধ্য।

তবু কুড়িয়ে রাখে; হঠাৎ পায়ের শব্দে ফিরে চাইল। নীলা বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল ওকে সযত্নে কাগজগুলো কুড়োতে দেখে ফিরে এসেছে।

প্রদীপের দিকে চেয়ে থাকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। প্রদীপ চাইল নীলার দিকে।

—কিছু বলবে? নীলাই এগিয়ে আসে। সে যেন মুখোমুখি আজ বোঝাপড়া করতে চায়।

প্রদীপ কাগজগুলো নিয়ে বের হয়ে গেল কোনো দিকে না চেয়ে।

প্রেসের থেকে ফোন এসেছে।

লাইব্রেরী ঘরে ফোনটা বাজছে। প্রদীপ ঢুকেই শব্দটা শুনে বিরক্ত ভরে এগিয়ে যায়।

—হ্যালো? কপি দিতে হবে? ম্যাটার?

ওপার থেকে তারই তাগাদা আসছে। কাজ বন্ধ থাকবে নইলে।

প্রদীপ ধৈর্যহারা কণ্ঠে জবাব দেয়।

—ম্যাটার রেডি নেই। হ'লে পাঠাব।

ওদিকে পড়ে আছে অন্য একটা বইয়ের গ্যালি-প্রুফ, সেগুলোও দেখা হয়নি। ছত্রাকারে ছড়ানো।

...প্রেসকে কড়া জবাব দিয়ে ফোনটা নামিয়ে রেখে পায়চারী করছে প্রদীপ।

হঠাৎ আবিষ্কার করে মনসী এই মাসখানেকের মধ্যে অজান্তেই তার কাজের অগ্রগতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। হঠাৎ নীলার এই কাজের মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না।

একজন থমকে এসে ঘরে দাঁড়াল।

শূন্য ঘর। কেউ কোথাও নেই।

—মাসীমণি! মাসীমণি।

কোনো সাড়া নেই। চিহ্ন নেই। পুতুল এদিকে ওদিক দেখছে। খাটের নীচে পর্যন্ত।

পড়ে আছে তার কাঠের ঘোড়ায় বইপত্র।

—মাসীমণি!

কোন সাড়া নেই। বেলা বেড়ে চলে; গাছের পাতায় সোনা রঙের রোদ অভ্রবরণ হয়ে ওঠে। পুতুল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। ওই নীচেকার গাছের পথ দিয়ে মাসীমণি কোথায় চলে গেছে।

—মাসীমণি!

...পুতুল নেমে চলেছে। বাগানের ছায়া আর লম্বা নেই, বেঁটে খাটো হয়ে গেছে। গেটের দারোয়ানও খেয়াল করে না। সে কোন দেশওয়ালী ভাই-এর সঙ্গে গল্প জুড়েছে গুমটি ঘরের চারপাই-এ বসে।

পথে বের হয়ে চলেছে পুতুল মাসীমণিকে খুঁজে আনতে।

—কোনোদিকে নজর নেই।

চলেছে সে। মাসীমণি কোথায় যেন কোন্ রাজ্যে হারিয়ে গেছে। রূপকথার সেই রাজ্যে। রাস্তায় চলেছে গাড়ি-লোকজন কোনোদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, চলেছে পুতুল সেই অজানা অচেনা রাস্তা দিয়ে।

নীলার এতক্ষণে যেন হুঁশ হয়।

নিজের স্নান প্রসাধন সারা হবার পর তবে তার অন্য কথা। মানদা ঝি সরকারবাবুর সঙ্গে গল্প করছিল।

এ বাড়ির নাড়ীনক্ষত্র জানে মানদা। জহর সরকার মাথার আকাশজোড়া টাকে হাত বোলাতে থাকে। সামনের খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতায় তেরিজ কষতেও ভুলে যায়।

—হ্যাঁরে! তাহলে বল বেশ রগড়ই বেঁধেছে।

হাসছে মানদা। বেশ সাজবেশও বদলেছে তার । পাতা কেটেছে, কানে ঝুলছে মাকড়ী, দামী হারটা—হাতের পাঁচ ভরি সোনার অনন্তগুলো দেখাবার জন্য ওর সাগ্রহ ব্যাকুলতা।

তার চেয়ে নির্লজ্জ প্রকাশ ওর দুচোখের চাহনিতে।

জহর সরকার লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

মানদা জানে ওর চোখের নেশা।

ভাল লাগে।

পড়ন্ত রোদের শেষ নিস্তেজ আভাব মতো কারুণ্যে ওর মনের নীরব বেদনায়।

—মানু!

—উঁ!

.... এমন সময় নিধু বুড়োকে আসতে দেখে মানদা নিমেষের মধ্যে বদলে যায়। তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে মানদা।

—ওসব বুজরুকী চলবে না সরকারমশাই, দিদিরাণী বলেছে সব হিসাব ঠিক ঠিক চাই। এক নয়াপয়সাও এদিক ওদিক হলে চলবে না?

—খোকাবাবুকে দেখেছ? নিধু হাঁপাচ্ছে।

—কে জানে? মানদা বিরক্তিকণ্ঠে কথাটা শেষ করে—দেখ গে কোথায় আছে।

—সারা বাড়িতে নেই।

—তবে কি উবে যাবে কর্পূরের মতো?

দিদিমণি খুঁজছে তোমাকে।

—মরণ!

উঠে গেল মানদা বাধ্য হয়েই, সরকার হুলোবেড়ালের মতো মুখ করে নিধুর দিকে না চেয়েই তেরিজে মন দেয় জাবেদা খাতায়।

নিধু খুঁজতে বের হয়। রোদের তাপে হাঁপাচ্ছে বুড়ো।

মানসী বাড়ি ফিরেছে।

দীপুরও আজ স্কুলের ছুটি। দিদিকে বাড়িতে দেখে খুশিতে উপছে পড়ে। টবের গাছগুলোর পাতা গজাচ্ছে। আবার নোতুন চেষ্টায়—নোতুন মাটিতে তারা শিকড় গেড়েছে। বেলফুলের গাছে এসেছে কুঁড়ি—সাদা সাদা ফুলগুলো সদ্য চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে বাইরের দিকে।

—বাঃ !

মানসী হাসার চেষ্টা করে।

মা বলে ওঠে—হঠাৎ এলি যে?

—এমনি ছুটি নিয়ে এলাম, একদিনও আসব না?

—না! না! সে কি কথা! তা হাত মুখ ধুয়ে নে বাছা। চা খাবার করি।

—মাকে আসল কথাটা জানাতে পারে না মানসী।

এখুনি সব হাসি আনন্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে।

ম্লান হয়ে যাবে খুশির আলো ওদের হতাশার অন্ধকারে।

মানসীর মনটা কেমন ভাব হয়ে রয়েছে।

এই পরিবেশের সঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ে। এই দারিদ্র্য আর সংগ্রামের সঙ্গে সেও জড়িয়ে আছে।

সেই নীলেশকে যেন ভুলে গিয়েছিল সে ওই জীবনের মাঝে।

দীপুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

চা নিয়ে এসেছে মা। প্লেটে খানিকটা হালুয়া।

হাসবার চেষ্টা করে মানসী—এ যে খাতির শুরু করলে মা!

—না বাছা, বাড়িতে আসবার সময় নেই তোর। এলে তো ভাল লাগে আমাদের।

মাকে কথাটা বলতে গিয়েও পারল না মানসী।

আদরটুকুও যেন ভাল লাগে।

মুছে ফেলতে—হারাতে চায় না সে।

কিন্তু এই পথ না নিয়ে উপায় ছিল না তার।

—কখন এলি।

কণিকা গানের ট্যুইশনি করতে গিয়েছিল, ফিরে এসে জড়িয়ে ধরে ওকে।

—একেবারে ভুলেই গেছিস?

—না!

—এদিকে তিনি তো মাটি খাল করে দিলেন রে?

—কে? মানসীর চোখে প্রশ্নের ইঙ্গিত।

হাসে কণিকা—আবার কে? ওই নীলেশবাবু রে? আহা বেচারার জন্য কষ্ট হয়, সত্যি।

—কেন?

—এমনি করে পথ চেয়ে থাকা অসম্ভব। আমি হলে তো সোজা কেটে পড়তাম।

—ধরে আছি কোন্‌খানে যে কেটে পড়তে হবে!

মানসী হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। কণিকা গুনগুন করে গানের কলি আওড়ায়। কণিকা বলে ওঠে—ভাগ্যি বটে তোর? হিংসা হয়।

জবাব দিল না মানসী।

মন কেমন করে ওঠে। একজনের কথা ব্যাকুল করে তোলে তাকে।

কি ভাবছে।

এ ভাবনার যেন শেষ নেই।

হঠাৎ দরজায় কার ডাক শুনে চমকে ওঠে মানসী...

...কে?

একজন বুড়োর মতো কে তোকে ডাকছে দিদি।

...মানসী চমকে ওঠে।

একটি মুহূর্ত।

মনে হয় যেন ওবাড়ি থেকে এসেছে তাকে ডাকতে।

চাপা রাগটা ফুটে বের হবে। সেই অপমানের জ্বালা যেন এখনও ভুলতে পারে না।

—বলে দে এখন দেখা হবে না।

—কিছুতেই যাবে না। বলছে খুব জরুরি দরকার।

—শরীর ভাল নেই বলে দে। মানসী দেখাই করল না ওর সঙ্গে।

মা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কোনো কথা বলে না। হতাশ হয়ে নিধু বের হয়ে এল। কিন্তু যাবে কোথায়?

বিরাট শহর—বিশাল এর বিস্তার, কত মানুষ কোথায় নিঃশেষে হারিয়ে যায়, ভেসে যায় এর প্রবহমান মহা জীবনের স্রোতের আবর্তে।

নিখোঁজ—বেপাত্তা হয়ে যায়।

তাদের তুলনায় পুতুল তো দুধের বাচ্চা।

এদিক ওদিক খুঁজে ফেরে ব্যাকুলভাবে নিধু।

সন্ধ্যা নামছে।

ক্লান্ত রোদটুকু এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। লেকের মাঠে লোকজনের ভিড় কমে এসেছে। আলোগুলো জ্বলছে আঁধারে একচোখা প্রেতের মতো। থমথমে আঁধারে উড়ে গেল একঝাঁক পাখি হারানো কোনো নীড়ের সন্ধানে। মানসী চুপ করে বসে আছে।

নীলেশ যেন খুশিই হয়েছে ওকে দেখে। দুজনে অনেকদিন পর বের হয়েছে বাড়ি থেকে বেড়াতে।

নীলেশের বাবা মা খবরটা রাখে।

ইদানীং সন্ধ্যা বেলাতে নীলেশ চেম্বারেই কাজকর্ম নিয়ে থাকে। বাবা মা খুশিই হয়।

মা বাবার মধ্যে কি যেন শলাপরামর্শ চলে তাও দেখেছে।

অচেনা লোকজন আসা যাওয়া করছে। কি যেন দেনা-পাওনার কথাও কানে আসে।

নীলেশ নিজের গায়ে আঁচড় না লাগা পর্যন্ত কিছু বলেনি।

আজ মানসীকে দেখে কেমন যেন অতীতের কথা মনে পড়ে।

চুপ করে বসে আছে মানসী। তারা-জ্বলা রাত্রি।

বাতাসে কি যেন ফুলের গন্ধ জাগে।

মানসীর দিকে চেয়ে থাকে নীলেশ। মনে হয় জীবনের সব পরিশ্রম যুদ্ধের সার্থকতা আসতে পারে যদি পাশে থাকে অমনি কেউ।

মানসী এতক্ষণে নিজেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করছিল। মানসীর হাতখানা নীলেশের হাতে। মানসী যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

—বাঁচবার পথটুকুও হারিয়ে ফেলেছে নীলেশ।

—কেন? মানসীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠেছে নীলেশ।

—চাকরিটা চলে গেল।

বাঁচার প্রয়োজনে আজ ওইটুকুরই দরকার!

মানসীই বলে চলেছে—দুঃখ, কষ্ট অভাব সইতে পারি, কিন্তু মিথ্যা সন্দেহ অপমান কখনও সইনি। চাকরি করতে বের হয় যারা তাদের কি ওসব থাকতে নেই? থাকতে দেবে না ওরা?

নীলেশ ওর দিকে চেয়ে আছে। অসহায় আবেগে মানসী যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। সান্ত্বনার সুরে নীলেশ বলে ওঠে।

—আমার ডাকে কোনোদিনই সাড়া দাওনি তুমি!

—কি করে দিই? মা—দীপু তাদের কথা ছেড়ে নিজের কথা কোনোদিনই ভাবতে পারিনি নীলে । প্রেম-ভালোবাসা আজ অর্থহীন হয়ে উঠেছে।

ওর দিকে চাইল মানসী, রাতের তারার আলোয় দেখা যায় টলটল করছে দু'চোখ। বেদনাহত কণ্ঠে মানসী বলে ওঠে।

—একটা চাকরি, শুধু বেঁচে থাকার আশ্বাসটুকুই আমি চাই নীলেশ। অন্য চিন্তার সময় কই।

একা মানসীর আর্তনাদ এ নয়, চারিদিকে অনেক ব্যর্থ বঞ্চিত মেয়েকে দেখেছে নীলেশ এ যেন তাদেরই কথা।

—চল বাড়ি ফেরা যাক। রাত হয়েছে।

মানসী নিজেকে সংযত করে উঠে পড়ে। এ প্রসঙ্গ যেন এড়িয়ে যেতে চায় সে।

—মানসী।

কথা কইল না মানসী, ওব দিকে চেয়ে থাকে।

—আসল কথার কোনো জবাবই পাইনি।

—কি?

—আমাকে এড়িয়ে যেতে চাও। নীলেশ বলে ওঠে।

—আমার জন্য আর কেউ কষ্ট পাক এ আমি চাই না নীলেশ। তোমার মা-বাবা বাড়ির শান্তি সব বজায় থাকুক।

মানসী জানে নীলেশের বাবাকে; ওদের গোঁড়া সংরক্ষণশীল পরিবারকে। কোনোদিনই তারা মানসীকে স্বীকৃতি দিতে পারবে না।

নীলেশ বেদনাহত চাহনিতে চেয়ে থাকে।

গাড়ির একঝলক আলো ওদের মুখে পড়েছে।

মানসী সংযত হয়ে বসল।

কাদের হাসির শব্দ কানে ধারাল ছুরির মতো বেঁধে।

চেনা গলার শব্দ। গাড়িটাও!

—নীলা বৈকালবেলায় বের হয়ে যাবে। ঘুম থেকে উঠেই শুনছে পুতুলকে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রদীপের কাজ কর্ম মাথায় উঠেছে।

—লেখাপড়া চুলোয় গেছে। ফোন করছে থানায়—লালবাজারে। যদি কোনো পাত্তা মেলে পুতুলের।

নীলার বের হতে আটকায় না।

তাদের নারীত্রাণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন। মিঃ দত্ত রায় আসবেন। আরও মেয়েরা আসবে। চকমকে সাজে সেজে উঠেছে নোতুন কনের মতো।

প্রদীপ ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল। ছেলের জন্য কৌতূহল উৎকণ্ঠার কোনো বিশেষ চিহ্ন তার মুখে-চোখে নেই।

খবর পেলে?

—না! খুঁজছে ওরা।

—আমি বেরুচ্ছি।

—অসুস্থ শরীর নিয়ে বেরুবে? প্রদীপ বাধা দেবার চেষ্টা করে। নীলা দাঁড়াল না। বের হয়ে গেল। যাবার মুখে বলে যায়।

—খবর থাকলে নমিদির বাড়িতে ফোন করে জানাবে।

—বৈকাল আর সন্ধ্যা কাটলো আনন্দেই। সব যেন ভুলে যায় নীলা এই পরিবেশে এসে। মিঃ দত্তরায়-এর কথাবার্তা বেশ চমৎকার। প্রৌঢ় ভদ্রলোক—সানন্দে তিনি এদের আসরের মালাকরের পদ নিয়েছেন।

—কর্তাদের এখানে বিশেষ কেউ আসে না। সন্ধ্যাবেলায় ফিরেছে নীলা। গাড়িতে শান্তিদি, মিস সেন ও দত্তরায় আছে, ওদের নামিয়ে দিয়ে ফিরবে।

পথে লেকের আবছা অন্ধকারে মানসীকে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখে চমকে উঠেছে নীলা। দুজনে পাশাপাশি বসে আছে।

মিস সেনই বলে —আহা মানিক জোড়।

দত্তরায় সংশোধন করে দেয়—উহুঁ, চখা-চখী। সারাদিন দুটিতে একঠাঁই থাকে রাত্রি নামলেই ছোড়ছাড়। এ থাকে নদীর এপারে অন্যজন ওপারে। ইনি শ্যামবাজার—উনি বালিগঞ্জ।

হাসির রোল পড়ে যায় গাড়িতে।

মিস সেন বয়স আর মেদের ভারে স্তূপের মতো হয়ে উঠেছে। চোখের কোলে তবু কাজলেব কালো আভা মিলোয়নি।

হাসছে মিঃ দত্তরায়ের দিকে চেয়ে নীলাও।

ছায়া অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটেছে গাড়িটা গোলপার্কের দিকে।

—পথের দুপাশের লোকজন—পথযাত্রীদের দিকে চাইবার অবকাশ তাদের নেই।

—পুতুল আনমনে এসে পড়েছে এই দিকেই।

তার পাশ দিয়ে গাড়িটা বের হয়ে গেল।

বাইরের দিকে চাইবার সময় তাদের নেই। নীলা তখনও হাসছে।

মিঃ দত্তরায়ের এই মন্তব্যে। মিস সেনের বুকের শাড়িটা যেন অকারণেই হাসির দমকে গড়িয়ে পড়েছে।

একটা আলোর ঝলক তুলে গাড়িটা বের হয়ে গেল।

পুতুলের ডাক ওরা কেউ শুনতে পায়নি।

রাত্রি নামছে। ছায়ান্ধকার রাত্রি। পথটা জনহীন হয়ে আসছে।

এতক্ষণ পর যেন কেমন ভয় পেয়েছে পুতুল। গাছের আড়ালে আলোগুলো এক একটা জ্বলছে একচোখা দৈত্যের মতো।

কেমন আকাশে বিশাল হাত মেলে — প্রকাণ্ড হাঁ করে কোনো দৈত্য এগিয়ে আসছে। তাকে ধরে মুখে পুরে ফেলবে।

লেকের কালো জলেব অসীম ঝকমকে চোখের জ্বালা!

একচোখা দৈত্যের দল গল্প রাজ্য থেকে বের হয়ে পড়েছে সবাই; রাতের আঁধারে। ঘন বনে কোথায় হারিয়ে গেছে সে।

—মাসীমাণ।

কণ্ঠস্বর ভীত জড়িত।

কোনো সাড়া নেই; কোথায় কাঁদছে তালগাছের মাথায় একটা শকুন তীক্ষ্ণ কর্কশ কান্নার সুরে।

—বাপ্! বা—প্!

কার কণ্ঠরোধ করে ধরেছে। যেন তক্ষকটা আর্তনাদ করছে মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে।

চমকে দাঁড়াল মানসী।

কে যেন কাঁদছে রাতের আঁধারে। নীলার হাসির প্রতিধ্বনি ওঠে। সেই জ্বালা তখনও মন থেকে মিলোয় নি।

হঠাৎ ওই কান্নাভরা আকুল ডাক শুনে চমকে ওঠে মানসী।

মাসীমণি!

—কি হল? নীলেশও অবাক হয়ে গেছে।

মানসী এগিয়ে যায় ঘাসের ওপর গাছতলায় অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে পুতুল।

ওকে দেখে চমকে ওঠে!—তুমি।

—তোমাকে খুঁজতে এসেছিলাম। সেই দুপুর থেকে খুঁজছি। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে মানসী।

নিধু কেন এসেছিল মনে পড়ে; রাগ করেই তার সঙ্গে দেখা করেনি মানসী। তাই খবরটা শোনেনি।

কি যেন একটা ভুলই করেছে মানসী।

নীলা বাড়ি ফিরে গলা সপ্তমে তোলে।

এখনও পুতুলের কোনো খবর নেই। পুলিশ গাড়ি টহল দিচ্ছে—থানায় থানায় খবরও চলে গেছে।

প্রদীপ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে—যেমন করে হোক বের করবেই তাকে।

—কারো কোনো দিকে নজর নেই এবাড়ির। নীলা কড়া কথা শোনাতে ছাড়ে না। প্রদীপ জবাব দিল না। পায়চারী করে।

রাত্রি বাড়ছে।

হঠাৎ পায়েব শব্দ শুনে চমকে ওঠে নীলা, প্রদীপও।

ঢুকছে পুতুল, ক্লান্ত বিবর্ণ পরিশ্রান্ত চেহারা।

—দেখ কাকে ধরে এনেছি। পুতুল হাসবাব চেষ্টা কবে।

নীলা ব্যাকুলভাবে ছেলেকে কাছে টেনে নেবাব চেষ্টা করে। কিন্তু ছেলের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। পায়ে জুতো-জামায় কাদা, ধুলো।

নিজের দামী শাড়িটার কথা ভেবে বোধ হয় নিরস্ত হল। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে—কোথায় ছিলি?

নীলার কথার জবাব দিল না, মানদা পুতুলকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পুতুল বলে।

—তুমি যেও না মাসীমণি!

নীলার ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগে না।

প্রদীপও বলে ওঠে—আচ্ছা, আচ্ছা তুমি স্নান করে এসো।

নীলা ওকে নিয়ে চলে গেল।

মানসী আর প্রদীপ সামনা সামনি দাঁড়িয়ে।

মানসী বলবার চেষ্টা করে—আমি যাচ্ছি।

কথা কইল না প্রদীপ। চঞ্চলভাবে পায়চারী করছে।

ছড়িয়ে আছে কপিগুলো।

কি যেন বলতে গিয়েও পারে না। একটি মুহূর্ত।

—হঠাৎ অন্ধকার নিস্তব্ধতার মাঝে ওঠে পুতুলের কান্নার শব্দ।

চমকে ওঠে প্রদীপ। নীলা হয়তো মারছে ওকে। প্রদীপ বলে। —ছেলেটাকে ওরা বাঁচাতে দেবে না। ছেলেটাও বেয়াড়া—একরোখা।

মানসী বের হয়ে আসছিল, কি ভেবে উপরের দিকে উঠে গেল।

প্রদীপ চেয়ে থাকে।

কান্নার শব্দ থেমে যায়।

রাত্রি নেমে আসে।

প্রদীপ কাজে মন দিতে পারে আবার নির্জন নিস্তব্ধতার মাঝে।

গ্যালি প্রুফগুলো দেখছে। মানসী আবার কাজে মন দিয়েছে।

টাইপ করে চলেছে। রাত্রি বেড়ে চলে।

সারাদিনের ক্লান্তি পরিশ্রম—উৎকণ্ঠার পর ঠাণ্ডায় স্নান করানোর ফলে পুতুলের জ্বরই দেখা যায়; রাত্রির শেষ দিকে বেশ জ্বর উঠেছে। ছটফট করে, মাঝে মাঝে অচৈতন্য অবস্থাতেই বিড়বিড় করছে।

—যেও না মাসীমণি?

চিন্তায় পড়ে প্রদীপ।

ওদিকে কাজকর্ম অনেক। মানসীই ভরসা দেয়।

—আপনি কাজ করুন গে। আমি রইলাম।

নীলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে পুতুল বিবর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মায়ের দিকে। রাত্রের সেই প্রহরটা আতঙ্কের মতো তার মন জুড়ে রয়েছে।

শিউরে ওঠে ভয়ে পুতুল।

—আর করব না মা!

ডাক্তারবাবু ইন্‌জেকশন দিচ্ছিলেন, ওর কথায় নীলার দিক চেয়ে থাকে। নীলা দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে!

ডাক্তার মানসীকেই বুঝিয়ে দেয়—কোন্ ওষুধটা কেমন করে ক'বার দিতে হবে।

—হটবাথ করাবেন টেম্পারেচার ১০৩-এর বেশি উঠলেই।

প্রদীপকে বললে—যদি কোনো নার্স পান ভালো হয়।

মানসীই বাধা দেয়—নার্স কেন? আমিই সামলাতে পারব।

নীলা বের হয়ে গেল ঘর থেকে। এ সব ব্যাপারে তার যেন কোনো কথা বলবার দাবীই নেই। মানসীই হাতে তুলে নিয়েছে সব।

নিপুণ হাতে সেবাযত্ন করে চলেছে।

ছটফট করছে ছোট্ট ছেলেটা—প্রদীপ ওর দিকে চেয়ে আছে। মানসীব নজর এড়ায় না। বাবা ছেলে দু'জনের চোখেই যেন সেই একই বেদনাকাতর ছাপ দেখেছে সে।

—আপনি সময় নষ্ট করছেন কেন? মানসী বলে।

—হ্যাঁ। প্রদীপ চলে গেল ধীর পায়ে।

নীলা তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। মানসীর চোখে চোখ পড়তে সেও চলে গেল সেখান থেকে।

শীতের শেষ ঝরাপাতার ভিড়ে বাতাস মাটি ভরে উঠেছে, পাখি ডাকছে।

নীলার শরীরটাও ক'দিন ভাল যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে তার এমন হয়। হার্টের অসুখ।

নিয়ম—বিধি-নিষেধ মেনে চলা তার পক্ষে অসম্ভব।

তাই ঘুরে ফিরেই অসুখে পড়ে। প্রদীপ সাবধান করে।

—বার বার বলি তোমায় নীলা সাবধান হও?

—আমার জন্য এত নাই না ভাবলে?

...প্রদীপ কথা বাড়াতে চায় না। সারাদিন কাজ—অধ্যাপনা আর লেখাপড়ায় ডুবে থাকে। এই করে একটা গুণ সে অর্জন করেছে—সে এই সহ্যক্ষমতা।

মাঝে মাঝে যেন চাপা পড়ে থাকা সেই জ্বালা সহস্রধারে ফেটে বেরুতে চায়। কিন্তু আবার সামলে নেয় নিজেকে। নীলা বলে।

—দিনকতক চল কার্সিয়াং-এ ঘুরে আসি চেঞ্জ থেকে। ওখানের বাড়ি ফাঁকাই পড়ে আছে। প্রদীপ আমতা আমতা করে।

—কাজগুলো সারতে দিন দশেক লাগবে অন্তত।

—সেরে নাও। সেই সঙ্গে বাবার সঙ্গে দেখা করে আসব।

নীলার দিকে চেয়ে থাকে প্রদীপ।

ও যেন বদ্ধ প্রাণীর মতো আটকে আছে। তবু দিন কতক বাইরে গেলে পুতুলও সেরে উঠবে চেঞ্জে। তাই মত দেয়।

—বেশ ত। খবর দাও সেখানে।

আবার গানের সুর শোনা যায় বাড়িতে।

...মানসী গাইছে।

মায়ার গলা মিশেছে তার সঙ্গে। প্রদীপ থমকে দাঁড়াল।

খোলা জানালা দিয়ে লাইব্রেরী ঘরে এসে নুইয়ে পড়া বোগেনভিলার সবুজ লতা! বসন্তের সাড়া জেগেছে তার বুকে ফুলের সাজে।

পাখি ডাকছে বাগানে।

গোলমোহর গাছে ফুল ঝরছে। অজস্র ফুল।

আকাশ বাতাসে মিশেছে ওই সুরটা।

পুতুলেব মুখে হাসি ফুটেছে। গানটা উঠছে!

আকাশ ভরা সূর্য তারা
বিশ্বভরা প্রাণ

মানসী ওই গানের সুরে বসন্তবেলার মিষ্টি সকালে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে বাঁচবার আনন্দে।

সব আনন্দ আর খ্যাতি যেন এতদিন পর আসতে শুরু করেছে প্রদীপের সামনে। আজকের বসন্তবেলার দিনটি স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

কাগজে বের হয়েছে তার নোতুন বই-এর সমালোচনা।

সারাদেশের গুণী-জ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেছে, দেশবিদেশ থেকে আসছে টেলিগ্রাম।

নোতুন বইগুলো নিয়ে এসেছে প্রেস থেকে।

আজকের খবরের কাগজেই বের হয়েছে ফলাও করে সেই খ্যাতির সংবাদ।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানিত করা হবে।

এ বছরের শ্রেষ্ঠ গুণীর সম্মানে ভূষিত করা হবে প্রদীপ বসুকে।

এই আনন্দের সংবাদে অধীর হয়ে পড়ে প্রদীপ।

একজনকে এ সংবাদটা না জানিয়ে পারে না—সে ওই মানসী।

তার চেষ্টা, উৎসাহ আর সহযোগিতা না পেলে এতবড় কাজ শেষ করতে পারত না সে।

দিনরাত্রি পরিশ্রম করেছে মানসী তার সঙ্গে।

মানসীও সব হারিয়ে আবার বাঁচার সন্ধান পেয়েছে। এই শিশুদের মধ্যে—কাজের মধ্যে। তাই আলো ঝলমল সকালে তার কণ্ঠে জাগে গানের সুর।

—প্রদীপকে আসতে দেখে থেমে গেল।

—বাপি।

পুতুল এগিয়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। মায়াও।

...মানীসর হাতে তুলে দেয় নোতুন বইখানা।

তাকেই উৎসর্গ করা। খবরের কাগজ—টেলিগ্রাফগুলোর দিকে নজর পড়তে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে মানসী।

—বাঃ!

—এর জন্য আপনার কাছে ঋণী মিস ঘোষ!

মানসী কথা বলে না। দেখছে সংবাদটা। প্রদীপের ছবিও ছাপা হয়েছে।

—যাচ্ছেন তো এলাহাবাদে?

—ভাবছি!

—ভাবছি নয়, যাবেন।

মানসী সহজভাবেই কথাটা বলে।

প্রদীপ ওর দিকে চেয়ে রয়েছে।

—বিদেশেও যেতে হতে পারে!

—বেশ ত।

আনমনে পিয়ানোতে বসে রিডের ওপর আঙুলগুলো বোলাচ্ছে মানসী। সুর উঠেছে থেকে থেকে। যেন প্রাণের আবেগ সুরের প্রকাশে ভরপুর।

নীলা চুপ করে বসে আছে। সামনে মেঝেতে ছড়ানো কাগজখানা। প্রদীপের ছবিটা ছাপা রয়েছে, ওর দিকে তার কোনো নজর নেই।

কি ভাবছে।

...সুরটা কানে আসে বাইরে থেকে। মানসীর গানের সুর।

—মানদা!

বিরক্ত হয়ে ডাক দেয়। অসুস্থ শরীরে ক্লান্ত দেহ মন; সুরটা তাকে ব্যঙ্গ করছে।

—বিশ্বভরা আলোছায়া—

..মন বিষিয়ে ওঠে, গান শুনে।

—জানালাটা বন্ধ করে দে মানদা!

একটু হাওয়া আলো আসুক! মানদা বলবার চেষ্টা করে!

—দরকার নেই। বন্ধ করে দে তুই।

সুরটা তবু যেন আসে। মন বিষিয়ে তোলে।

আজ মনে হয় এবাড়ি থেকে তাকে যেন নীরবেই সরে যেতে বলে গেল; প্রদীপ ওই চেঞ্জে পাঠাবার নাম করে। এ বাড়িতে যেন অবাঞ্ছিত সে। নিজের স্বামী ছেলেমেয়েরাও তাকে এড়িয়ে চলে।

ওরা এবাড়ির আনন্দময় স্বপ্ন—নীলা যেন এবাড়ির দুঃখ-বিষাদের ঘনকালো মেঘ সব আলো ঢেকে দিতে চায়।

অসুস্থ শরীরে, পা টলছে।

...জানালা দিয়ে দেখে প্রদীপ কি যেন খুশির আবেগে ভরপুর হয়ে মানসীদের ওই ঘরে ঢুকলো।

...একদৃষ্টে বুভুক্ষু চাহনি মেলে চেয়ে থাকে নীলা।

—উঠছ যে!

নীলার দু'চোখের সামনে কেমন যেন জ্বালাকর একটা তীব্র আলোর অনুভূতি।

—বৌরাণী।

..মানদার কথায় সাড়া দিল না, বের হয়ে গেল ঘর থেকে। বারান্দা দিয়ে চলেছে ওদের ঘরের দিকে।

সুরটা উঠেছে বাতাসে রঙিন প্রজাপতির মতো পাখা মেলে। বাতাসে বকুল ফুলের সৌরভ।

পাখি ডাকছে। হাঁসগুলো নেমেছে পুকুরে।

কোথাও কোনো দুঃখ-বেদনা মালিন্যের ছায়া নেই। সব বাসা বেঁধেছে তার হতাশ মনের গভীরে।

...দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল নীলা।

...মেঘ—একটা কালো মেঘ যেন দমকা ঝড়ো বাতাসে আলোটুকু নিঃশেষে ঢেকে দিয়েছে। বাজ পড়ছে যেন কড় কড় শব্দে।

—নীলা!

প্রদীপ চমকে ওঠে ওকে এখানে দেখে। মানসীও চাইল ওর দিকে।

ক'দিন রোগে ভুগে ওর সাজসজ্জা সব খসে পড়েছে।

পালিশ করা নকল চেহারার আড়ালে সেই কুৎসিত রূপই প্রকট হয়ে উঠেছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো—দু'চোখের চাহনিতে অপরিসীম কি জ্বালা।

...দেখছে মানসীকে নিবিড় তীক্ষ্ণ চাহনি মেলে।

শিউরে ওঠে মানসী।

নীলা হিসাব কষে দেখছে।

হ্যাঁ, তার অনুমান ঠিকই। ওই রূপের আলোয় নীলাকে সে তফাতে সরিয়ে দিয়েছে। হাসি দিয়ে ভুলিয়েছে সবাইকে।

পুতুল--মায়াও কাছে আসে না।

ঝড়ের পূর্বাভাস। তারই সঙ্কেত পেয়ে শিউরে উঠেছে তারাও!

—ঘরে যাও নীলা! প্রদীপ এগিয়ে আসে।

ওকে ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। নীলা যেন দু'চোখে আজ সারা পৃথিবীকে ঘৃণা করে। ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে রুখে দাঁড়াল।

না!

আজ এর বোঝাপড়া করতে চায় সে।

বেশ অনুমান করেছে এই বাড়িতে তারই বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলেছে।

ঘোর ষড়যন্ত্র।

ওই মানসীই তার নেতা। আজ প্রদীপও সেই দলে যোগ দিয়েছে। তাকে বাইরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

এগিয়ে আসে নীলা ঘরের মধ্যে।

মানসী আর প্রদীপের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

—নীলা! প্রদীপ থামাবার চেষ্টা করে নীলাকে।

অসহায় রাগে—ব্যর্থতায় কাঁপছে অসুস্থ নীলা। ...দুচোখে ফুটে উঠেছে তীব্র জ্বালা। বলে ওঠে—চিরকালই কি সব মেনে নিতে হবে আমায়?

—কি বলছ এসব? প্রদীপ যেন চটে উঠেছে।

—ঠিকই বলছি।

মায়া আর পুতুল যেন কি এক অজানা ভয়ে সরে গেছে পাশের ঘরে। একা মানসীই দাঁড়িয়ে আছে, সে চলে যাচ্ছিল, নীলার ডাকেই দাঁড়াল। নীলা শোনায়।

—সেদিন ভেবেছিলাম আর এ বাড়িতে আসবে না। কিন্তু দেখলাম নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবার ফিরে এসেছ।

মানসী চমকে ওঠে।

তার সেবাযত্ন ছেলেদের ভালোবাসা সবই মিথ্যা ওই নীলার কাছে।

নিষ্ফল অপমানই সহ্য করতে হবে তাকে। মানসী বলে।

—কি বলছেন এসব?

—পুরুষ চরানো যাদের পেশা তাদের কাছে এটা নোতুন কিছু নয়।

মানসী আর্তনাদ করে ওঠে।

নীলা ওর কালো মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কোণঠাসা করেছে যেন ওকে? খুশিতে মন ভরে ওঠে।

তূণের শাণিত অস্ত্রগুলো একে একে বের করতে থাকে নীলা।

—সেই রাত্রে লেকের ধারে সঙ্গের ভদ্রলোকের গায়ে হেলান দিয়ে—

মানসী বেদনাহত দৃষ্টিতে চাইল প্রদীপের দিকে। নিষ্ফল অপমানে থরথর করে কাঁপছে তার নীরব ঠোঁট দুটো। নিজেকে সামলে রেখেছে বহু কষ্টে।

ডাগর চোখের কোল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু। মানসী বলে।

—আমি চলে যাচ্ছি। ওসব কথার কোনো জবাব দিতে চাই না।

মানসী সেই তেজটুকু যেন হারিয়েছে—আগেকার সেই তেজ। নীলা আজ জিতেছে।

দাঁড়াও।

প্রদীপের দিকে চেয়ে নীলা বলে চলে!

...ওঁর চরিত্রটা তোমার জানা দরকার। রাত্রির অন্ধকারে লেকের ধারে—

প্রদীপের দিকে চাইল মানসী। প্রদীপও।

মানসী ভাবেনি এইভাবে অপমানিত হতে হবে তাকে। প্রদীপ অবাক হয়ে যায়—মানসীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বেদনা আর অপমানের অশ্রু।

তারই বাড়িতে এভাবে অপমানিত হতে হবে কাউকে প্রদীপ তা চায় না। বাধা দিয়ে ওঠে—নীলা।

নীলা কাঁপছে অসহ্য রাগে, জিব দিয়ে তীব্র গরল ছড়াচ্ছে। বাধা পেয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে।

—মারবে নাকি? অধ্যাপক মানুষ—দেশবিদেশে তার নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান।

প্রদীপ নিষ্ফল রাগে নীলার মুখটা চেপে ধরেছে।

—থামো তুমি? বন্ধ কর ওই সব নোংরা কথা।

নীলার দুচোখে বিস্ফারিত চাহনি ফুটে ওঠে। অকস্মাৎ বাধা পেয়ে কেমন যেন আর্তনাদ কবে ওঠে। জিবের গরল—রুদ্ধ হয়ে দু'চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে।

কাঁপছে সারা দেহ। যেন ছিটকে পড়বে মেঝেতে।

চমকে ওঠে প্রদীপ।

...নীলার কোনো সাড়া নেই। ও ছেড়ে দিতেই স্তব্ধ নির্বাক দেহটা সশব্দে মেঝেতে পড়ে যায়।

—অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে প্রদীপ—নীলা!

কোনো সাড়া নেই।

—কি করলেন? ডাক্তারকে খবর দেন, এক্ষুনি।

এগিয়ে আসে মানসী। নাড়াচাড়া করেও কোনো সাড়া মেলে না।

প্রাণহীন দেহটা তখন বিস্ফারিত স্তব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে—দুচোখে তার অপরিসীম ঘৃণা আর অসহায় জ্বালা।

—সরে যান আপনি! মানসী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে।

প্রদীপ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অসহায় নিস্পন্দ লোকটির দিকে চেয়ে থাকে মানসী। খবরের কাগজটা বাতাসে উড়ছে। উল্টে চলছে পাতাগুলো। ...ওর সম্বর্ধনার ছবিটাও ফুটে ওঠে চোখের সামনে।

মানসী ইতিকর্তব্য স্থির করে নিয়েছে।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রদীপ।

তার খ্যাতিময় ভবিষ্যৎ!—তার তুলনায় মানসীর দাম কি সমাজের চোখে, তাই পথ তার বেছে নিয়েছে মানসী।

প্রদীপ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে! সব ব্যাপারটা যেন তার কাছে একটা স্বপ্নের মতো আবছা—সব যেন কেমন ঝাপসা ঠেকে।

পুলিশ অফিসারের সামনে বলে মানসী।

—আমিই দোষী। আমিই ওকে অপ্রিয় কথা বলা বন্ধ করার জন্য গলা টিপে ধরেছিলাম।

—অপ্রিয় কথার কারণ কী?

—ব্যক্তিগত।

—আপনাকে থানায় যেতে হবে।

—চলুন।

ওকে গাড়িতে তুলছে। প্রদীপ স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে।

মানসী হঠাৎ পিছনে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

পুতুল। সেই ওকে আঁচল ধরে টানছে।

—যাবে না মাসীমণি!

হাসে মানসী, ম্লান হাসি।

বাপিও কেমন বদলে গেছে—বাড়ির সবাই কাঁদছে।

মানসীকে ওরা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখে পুতুল—হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

তার কান্না থামাবার জন্য কেউই আজ এগিয়ে আসে না।

কাগজে খবরটা ছাপা হয়েছে—সেই সঙ্গে কোথা থেকে ওরা সংগ্রহ করেছে মানসীর ছবিও। অধ্যাপক প্রদীপ বসুর স্ত্রীকে হত্যা করেছে মানসী ঘোষ নামে একজন মহিলা।

তারপরও সংবাদদাতা আরো অনেক কাহিনীই জুড়েছে।

প্রদীপ চুপ করে বসে আছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় মানসীর এই স্বীকৃতি পুলিশ সহজেই বিশ্বাস করেছে। করাই স্বাভাবিক।

মানসীর এইভাবে এগিয়ে আসার কারণ খানিকটা বুঝতে পেরে আজ প্রদীপ শিউরে উঠছে।

দেশ বিদেশ থেকে আসছে সমবেদনার টেলিগ্রাম। প্রদীপের বন্ধু-বান্ধব আসছে খবর নিতে।

কারো সামনে যাবার সাহস নেই প্রদীপের।

নিজের উপরই আসে দুরন্ত ঘৃণা। হত্যাকারী সে—তারই হাতে আজও নীলার রক্ত যেন লেগে আছে।

অথচ তাকেই সম্বর্ধনা জানাচ্ছে সবাই।

নিরাপরাধ—নির্দোষ একটি মেয়েকে আজ কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। সব খ্যাতি প্রীতি-সম্মান আজ মানসীই তাকে দয়া করে দিয়ে গেছে। দুঃখের সমুদ্রমন্থনে উঠেছে গরল। একালের অমৃত উঠেছে দানবের ভাগ্যে—দেবতারা নিয়েছে তীব্র গরল জ্বালা।

মানসী আজ তাই হত্যাকারীর কাঠগড়ায়।

কিন্তু একজন একথাটা বিশ্বাস করে না।

সে নীলেশ। মানসীকে সে জানে—চেনে নিবিড় ভাবেই।

সকালে খবরটা পেয়েই ওর বাবা চমকে ওঠে। হাঁক-ডাক শুরু করেন—এই যে দেখ!

নীলেশ চায়ের কাপটা মুখে তুলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ হাত থেকে যেন কাপটাই পড়ে যায়!

নীলেশ উঠে দাঁড়াল। ...অজানতেই প্রতিবাদ করে ওঠে।

—মিথ্যা কথা।—এ হতে পারে না।

বাবা বলে—তবে কি কাগজে সব মিছে কথাই লেখে?

—কাগজে বল্লেই খুনী সাব্যস্ত হয় না। প্রমাণ চাই। ওকালতির সুরে কথা বলে নীলেশ।

—যাচ্ছিস কোথায়?

—আসছি। বের হয়ে গেল নীলেশ।

বস্তিবাড়িতে আজ জোয়ার নেমেছে। সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে খবরটা, তাদেরই এলাকার কোনো মেয়ে যে এমন একটা কাজ করতে পারে কল্পনাও করেনি।

কণিকা—বনানীও অবাক হয়ে গেছে।

কাঁদছে মনোরমা, নীলেশকে আসতে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মা।

—কি হবে নীলেশ। আমাব মানসী এসব কখনই করতে পারে না। সব মিথ্যা।

মায়ের কথা আইনের ধোপে টেকে না। এ জানে নীলেশ।

সে জবাব দেয়—দেখা যাক্ চেষ্টা করে। আইনের চোখে প্রমাণ না হলে কিছুই সত্যি নয়।

আজ তার উপরই যেন অজ্ঞাতসারেই একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে।

মানসীকে সে বিপদের মাঝে ফেলে যেতে পারে না।

তাই এগিয়ে এসেছে নীলেশ।

জেল হাজতে ওকে দেখে মানসী একটু অবাক হয়।

নীলেশ চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। ক'দিনেই যেন বদলে গেছে মানসী। সুন্দর সুগৌর চেহারা মলিন বিবর্ণ হয়ে গেছে। দু'চোখে তার মলিন কান্নার দাগ।

নীলেশ চুপ করে চেয়ে আছে।

কি যেন সন্ধান করছে নীলেশ ওর চোখের চাহনিতে।

মানসী এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

—মা, দীপূ ভাল আছে?

—মিথ্যা এই কলঙ্ক কেন মাথায় তুলে নিলে মানসী।

জবাব দিল না মানসী। চমকে ওঠে এর কথায়। নীলেশ বলে।

—তুমি খুন করোনি। করতে পারো না। মানসী বলে —স্বপক্ষে কোনো প্রমাণও নেই।

—হয়তো জোগাড় করা যাবে।

মানসী কথা কইল না।

দু'চোখে অকাবণেই জল ভরে আসে। পুলিশ অফিসার জানান —সময় হয়ে গেছে।

সরে এল নীলেশ।

নীলেশ এটা বুঝেছে যে মানসী সবটাই চেপে গেল তার কাছে। কি যেন অভিমানেই সে সরে যেতে চায় সকলের থেকে অনেক দূরে। বোধহয় ব্যর্থতার জ্বালাই তাকে আজ আনমনা করে তুলেছে। তাই জবাব দেয় মানসী—বলবার কিছুই নেই। জবাবও দেব না তোমার ওই প্রশ্নের। ....সবটাই নীলেশের মনে ঠেকে হেঁয়ালীর মতো। কেমন যেন রহস্যই বলে মনে হয়!

আদালতে প্রথম দিন উঠে মানসী স্বীকারোক্তিই করে। সবই করেছে সে প্রদীপ-সাক্ষী আর কেউ সেখানে ছিল না।

নীলেশ মানসীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনারণ্য কোর্টে তিলধারণের স্থান নেই। কাগজওয়ালারাও এসেছে।

নারী হত্যাকারিণীর তদন্ত হোক।

...শাস্তি দিতে হবে। নইলে সমজের বুকে আবার নোতুন শ্রেণীর পাপ গজাবে একটার পর একটা।

মানসী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ওদের সামনে।

প্রদীপের দিকে চাইল।

প্রদীপ শিউরে উঠেছে ওর কথায়!

আজ সব সম্মান সহানুভূতি যে কত মূল্যহীন, একজনের অশেষ দয়া আর দুঃখে তা অর্জিত এই কথাটাই স্মরণ করে প্রদীপ শিউরে উঠেছে।

মনে হয় উচ্চ কণ্ঠে চরম সত্যটাই প্রকাশ করবে সে।

জীবনে এতবড় দয়া কুড়িয়ে বাঁচতে চায় না প্রদীপ।

অসহ্য হয়ে উঠেছে এসব তার কাছে। তার অপরাধের বিচার হোক। জীবনে শাস্তি পাবে সে।

...কিন্তু সব কিছুই যেন মিথ্যা হয়ে গেল।

পুলিশ মর্গ থেকে রিপোর্ট এসেছে ন্যচারাল ডেথ। নীলার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। দীর্ঘদিন হার্ট-এর অসুখে ভোগার পর সামান্য উত্তেজনার জন্য হার্টফেল করেছে নীলা। হত্যা কেউ তাকে করেনি।

কেস ডিসমিস হয়ে গেল। আসামীও খালাস পেয়ে যায়।

জনারণ্য কোর্ট, অনেকেই যেন খুশি হতে পারে না।

মানুষের নিষ্ঠুর প্রবৃত্তিকে ঠিক শাস্তি দিতে না পেরে অতৃপ্তই রয়ে গেল গুঞ্জন করে বের হচ্ছে তারা।

মানসীও এগিয়ে আসে।

কিন্তু যাবে কোথায়!

এই অপবাদ আর কলঙ্কের পর সমাজে তার ঠাঁই কোথাও নেই। মানুষের প্রকৃতরূপ সে খানিকটা চিনেছে এই দুঃখভোগের মধ্য দিয়েই। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দেখেছে ওদের অন্তরের পশু প্রকৃতির স্বরূপ।

সব ধারণা তার বদলে গেছে। কোনও ঘর—কারো জীবনে আর ঠাঁই তার নেই।

তার নিশ্বাসে আছে তীব্র গরল। সবার জীবনের-সংসারের শান্তি পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

তাই ঘর ছেড়ে—সমাজ ছেড়েই যাবে মানসী।

নীলেশ দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে আছে প্রদীপ। আজ মনের দিক দিয়ে নিঃস্ব সে।

জীবনে সবচেয়ে ঋণী রয়ে গেল ওই মানসীর কাছে।

এসেছে মায়া—পুতুল।

জনতা চলে গেছে। আবছা আলো নেমেছে দিনের শেষে।

ছায়াঘন অশ্বত্থগাছের মাথায় সোনারোদের স্বপ্ন—আকাশে কোনো অসীম নিঃস্বতা রিক্ততার বেদনা।

বের হয়ে আসছে মানসী।

—স্তব্ধ গম্ভীর একটি নারী।

দুঃখ বেদনা আর সহনীয়তার নীরব জয়টিকা তার ললাটে দু'চোখের দৃষ্টিতে শূন্য বেদনাতুর চাহনি। কোনোদিকে যেন দৃষ্টি নেই তার, দৃষ্টি রয়েছে সামনের অন্তবিহীন পথ আর আকাশের পাশে।

—মানসী!

ওদের ডাক পৌঁছে না সেখানে।

এগিয়ে গেল মানসী—হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

পিছন ফিরে দেখে পুতুল তার আঁচলটা ধরেছে।

—মাসীমণি!

একটি ছোট্ট ডাক, দু'চোখের ছল-ছল চাহনি ফুটে ওঠে। ছোট দুটো হাতও।

মানসীকে আটকাতে পারেনি সেদিন।

...বাইরের দিকে চেয়ে থাকে মানসী।

অনেকদিন আগেকার কথা। আজ দীর্ঘ পথ—দীর্ঘদিন পরও স্মৃতির প্রদীপের ম্লান আলোয় তা সমুজ্জ্বল। বাইরের পাইন বনের পুঞ্জ পুঞ্জ সবুজে বেদনার রং নিয়ে মিশেছে দিনের আলো। ঝোরার ঝর ঝর শব্দ শোনা যায়।

শন শন হাওয়া হাঁকে পাইন বনে।

নীল আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে রোদের আভা। দূর পাহাড় সানুতে শুরু হয়েছে মেঘ আর রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা।

কলকণ্ঠে গানের সুর ওঠে। স্কুলের মেয়েরা গান গাইছে।

আজ আমাদের ছুটি রে ভাই
আজ আমাদের ছুটি।

এখানে মিশে আছে মানসীর স্মৃতিতে একটি এমনি রৌদ্র উজ্জল দিন, পাখি ডাকা সকাল। শিলং-এর স্কুলে কি করে এসেছিল মানসী তার খবর অনেকেই রাখে না। মানসীও ভুলে গেছে অতীতের সেই দিনগুলো। ভুলতে চায় সে।

বৃষ্টি নেমেছে পাহাড়ে।

একখানা ধোঁয়ার স্তূপের মতো সাদা মেঘ বাতাসে ভর করে এসে পাহাড়ের বুকে লুটিয়ে পড়ে অদূরে মেয়ের মতো কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

ঝর ঝর কান্না!

ঝোরার ডাক বাড়ে। মাথা নাড়ে ঘন সবুজ পাইন বার্চ বন।

মনটা যেন অমনি চাপা কান্নায গুমরে ওঠে। ব্যর্থ কান্না; হারানো অতীতের কথা ভুলেই গিয়েছিল মানসী।

আজ সুদূর কলকাতা থেকে চিঠিখানা এসেছে। নীলেশ বিয়ের নিমন্ত্রন্ন করতে ভোলেনি।

অকারণেই যেন মন ফিরে যায় হারানো অতীতের দিনে।

আজ ওই দূর নীল পাহাড়ের বুকে রোদের স্পর্শের মতোই অধরা রয়ে গেল সেই স্বপ্নমধুর জীবন।

মন তাই হাহাকার করে।

হু হু বৃষ্টি নামে। ঝাপসা হয়ে ওঠে গাছপালা।

শিলং পাহাড়ে বৃষ্টি নেমেছে।

পাছে বন কাঁপছে ঝড়ো হাওয়ায়। মানসী তারই দিকে চেয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে।

কঠিন ঠাঁই

ভবতারিণী ঠাকরুনকে নেপাল দত্ত লেনের কেন, ওই এলাকার সবাই একডাকে চেনে। ওই এলাকার অনেক বাড়ি, বস্তি, খালধারে বিরাট করাতকল, ওদিকে সুরকিমিল, বারাসাতের কয়েকটা ইটভাটার মালিক।

ভবতারিণী ভটচাযের পতিদেবতা নিজের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে এই বিশাল সম্পত্তি, জায়গাজমি, কারখানা সব গড়ে তুলেছিলেন।

রামগতি ভটচাযের ছেলেপুলে নেই। স্ত্রী ভবতারিণী অবশ্য সন্তানলাভের জন্য মানসিক-পুজো-কবচ এসবের কোনো ত্রুটিই রাখেনি। এত বড় সম্পত্তি, অঢেল দুনম্বরী টাকা, এসব কে ভোগ করবে!

অবশ্য রামগতির বড়দাদাও ব্যবসাতে খেটে ভাইকে আজ কোটিপতি করে দিয়েছে। তার একমাত্র সন্তান দিব্যগতি দশ বছর বয়সেই সংসার ত্যাগ করে কোনো গুরুর একান্ত সেবক হয়ে চলে যায়। শোনা যায় গুরুজীর সঙ্গে হিমালয়ের কোনো গুহায় রয়ে গেছে। সংসারে ফেরার বাসনা তার নেই।

সেই একমাত্র সন্তান হারানোর দুঃখেই রামগতির দাদা দেবগতি শয্যা নিল। তার স্ত্রী আগেই গত হয়েছে, ভবতারিণী তখন সবে এ বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছে। ভাসুরের সেবাযত্ন করে খুবই, ভাসুরের নামেও মালকড়ি, বিষয়-আশয় কম নেই। সুতরাং তাকে সেবা তো করবেই।

মৃত্যুকালে ভাসুরঠাকুর ছোটবৌমা অর্থাৎ ভবতারিণীকে তার সর্বস্ব দানপত্র করে যান। শুধু একটি অনুরোধ করে যান—বৌমা, আমার ছেলে যদি কোনোদিন সংসারে ফিরে আসে, তাকে এসব দেবে। তাকে সংসারী করার চেষ্টা করো। স্বর্গ থেকে আমি তোমায় আশীর্বাদ করব।

দেবগতি পরমগতি প্রাপ্ত হবা'র পর—এবার ছোটভাই রামগতি দাদার বিষয় ছাড়াও নিজের চেষ্টাতেই রামচন্দ্রের মতো বহু যুদ্ধ করে, স্বর্ণলঙ্কা জয় করে অর্থাৎ বেশ টুপাইস কামায়।

কিন্তু টাকাই আসছে রামগতির সংসারে—তোদের সন্তানও আসে না। আর বড়দার সেই সন্তানও ফেরে না।

ভবতারিণীরও মনে পড়ে ভাসুরের ছেলে দিব্যগতির কথা। বড়জা মারা যেতে ওই বাচ্চাটাকে ভবতারিণীই মানুষ করেছিল। ক'বছর তাকে নিয়েই নিজের ছেলে না হবার দুঃখটাকে ভুলেছিল। কিন্তু সে তো কোথায় হারিয়ে গেছে। দেবুর আর কোনো খবরই পায়নি।

তবু সময় বসে থাকে না।

রামগতি দু-হাতে টাকা কামাতে কামাতে ক্লান্ত। সংসারে আপনজনের দরকার। এমনি দিনে ভবতারিণীর এক ভাইপো কার্তিকচন্দ্র এসে হাজির হল। কলকাতা দেখতে এসেছে সে মফঃস্বলের গ্রাম থেকে। বেশ দেখতেও সুন্দর ছেলেটা। ভবতারিণী বলে রামগতিকে—এত বড় বাড়ি খালিই রয়েছে। ছেলেটাকে এখানেই রাখি, এখানেই পড়াশোনা করুক, তোমার কাজ-কারবারও দেখতে পারবে।

রামগতি দু-হাতে টাকা রোজগার করে সত্যি, ধুলোমুঠো ধরে সোনামুঠো হয়। কিন্তু সেই টাকাকে দু-হাতে বুক দিয়ে আগলে রাখে। তার টাকার একটা টাকা অকাজে, অকারণে খরচা হোক তা চায় না সে। তাই স্ত্রীর কথায় বলে রামগতি—তোমার দাদার তো শুনি আড়াইগণ্ডা ছেলেমেয়ে। তার থেকে একটাকে দান-খয়রাত করতে তার বাধবে না, কিন্তু আমার কষ্টের টাকা জলে দিতে বাধবে। ওসব পরগাছা পুষতে পারব না।

ভবতারিণীও এমনিতে বেশ দড়সড়। কথার জোর আর বুদ্ধির জোর তারও কম নয়। তাছাড়া এই সম্পত্তিতে বড়ভাইয়ের পুরো অংশ তার। সেই রোজগারও সবটাই রামগতি হাতিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্কজাত করে।

ভবতারিণী বলে—তোমার টাকায় সে খাবে না। সে খাবে আমার টাকায়। থাকবে আমার অংশের বাড়িতে।

চমকে ওঠে রামগতি—মানে?

ভবতারিণী জানায় বড়তরফের সবকিছু আমার, এবাড়ির অর্ধেক ভাগ অবধি। এবার সেসব বুঝিয়ে

দাও। একা একা এতবড় বাড়িতে থাকতে পারব না। একটা ছেলে থাকলে তবু পিসিমা বলে ডাকবে।

রামগতির ওর মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার কথা ভাবার মতো মন নেই। তবে বেশ বুঝেছে ছেলেটাকে তাড়াতে গেলে বিষয়-আশয় টাকা, এসবের ভাগই চাইবে তার যোগ্য পত্নী। একটা ছেলের খরচাই বা কি—তাই আপাতত ওটাকে রাখার ব্যাপারে মত দিয়ে বিষয়-আশয় বাঁচাতে চায়। তাই রামগতি বলে — ঠিক আছে, থাক ছেলেটা। তবে আমার আদর্শমতো চলতে হবে ওকে। বিষয়-আশয় দেখতে হবে। কাঁচা টাকার কারবার, নির্লোভ, সৎ আর সংযমী করে তুলব ওকে।

ভবতারিণী তাতেই মত দেয়।

কার্তিকচন্দ্র এতদিন কোনো অজ পাড়াগ্রামে দুঃখকষ্টে অযত্নে পড়েছিল। এবার এই কলকাতার ধনীর প্রাসাদে সুঁচ হয়ে ঢুকবার সুযোগ পেল।

এমনিতে কার্তিকচন্দ্র দেবসেনাপতি কার্তিকের মতোই শৌখিন ধরনের। পাড়াগাঁয়ে ওর দেখনধারী রূপের জন্য গাঁয়ের যাত্রার দলে 'প্রবীর পতনে' প্রবীরের পার্ট করত। গানটানও গাইত। লম্বা বাবরি চুল-বেশ বাহারের ধুতি, পাঞ্জাবিও জুটিয়ে নিত কোনোমতে।

সেদিন পিসেমশাইকে দেখে অবাক হয় কার্তিক। রামগতি তস্য স্ত্রীর নতুন রিক্রুট এই ভাবী পোষ্যপুত্রটিকে আগাপাশতলা কঠোর সন্ধানী দৃষ্টিতে জরিপ করে ক্যাশবাক্সটা দুম করে বন্ধ করে বলে—চলবে না, এসব একেবারেই চলবে না।

কার্তিক চুপসে যায়। ভেবেছিল বেশ আরামেই থাকবে পিসিমার আদর খেয়ে, কিন্তু পিসেমশাই নামক বস্তুটি যে এমনি চীজ তা ভাবেনি।

ভবতারিণীও অবাক হয়—চলবে না মানে? তুমি তো বললে—

রামগতি নিকেলের চশমাটা কানে দড়ি দিয়ে টাইট করতে করতে বলে—ফর্মা বদলাতে হবে। ভোগ ত্যাগ করে সংযমী নির্লোভ হতে হবে। সরকার—এ্যাই সরকার—

গুপী সরকার তার ছিপছিপে দেহযষ্টি কর্তার সামনে বাঁকিয়ে বিনয়াবনত হয়ে বলে—ডাকছেন?

রামগতি বলে—এটাকে মেরামত করে আনো, নুটুকে ডেকে আমার মতো ফর্মা বানিয়ে দাও। একেবারে আমার মতো। ওকে তালিম দিতে হবে যাতে আমার আদর্শ মেনে চলে। যাও—

কার্তিক ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। চুপ করে ভালো ছেলের মতো ঘাড় নিচু করে গুপী সরকারের সঙ্গে চলে গেল।

শুধোয় ভবতারিণী—কোথায় পাঠালে ওকে?

রামগতি জাবেদা খাতায় জমা খরচ লিখতে লিখতে বলে —পরে দেখবে।

দেখার মতোই দৃশ্যটা ঘটেছে।

শ্রীমান কার্তিকচন্দ্র ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জলে বুক ভাসায়। আর ভবতারিণী আর্তনাদ করে—ও মা! একি হাল করেছো কার্তিকের!

কার্তিকের মাথার বাবরি চুল একেবারে নির্মূল করে কেটে সারা মাথায় ক্লিপ চালিয়ে মাথাটাকে কালো কদম ফুলে পরিণত করেছে। গুপী সরকার কর্তাবাবুর কথা বর্ণে বর্ণে পালন করেছে। বাহারি ধুতি ছাড়িয়ে হাঁটুর নিচু অবধি ঝুলদার মোটা ক্যাটকেটে ধুতি। ওর পাঞ্জাবিও অন্তর্হিত। শ্রীঅঙ্গে ঝুলছে হাফহাতা তিন-চারটে পকেটওয়ালা রামগতিমার্কা মার্কিনের পাঞ্জাবি, আর পায়ে সস্তা হাফ কেডস-এর জুতো। এ যেন মিনি রামগতিই বানিয়েছে তাকে। শুধু ঈশ্বরভক্ত রামগতির মতো কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠিটাই বাদ রয়ে গেছে।

ভবতারিণী বলে—একি হাল করেছ ছেলেটার? কপালে তেলক আর গলায় কণ্ঠিটা বাদ দিলে কেন?

রামগতি বলে—গুরুদেব এলেই দীক্ষা দিয়ে দেব। তার আগে আমিই তালিম দেব ওকে। কাজকর্ম শিখুক।

এ যেন, কার্তিকের অগ্নিপরীক্ষাই শুরু হল। এর মধ্যে কার্তিক কয়েকদিনের মধ্যেই তার স্বভাব গুণে এপাড়ার হোঁৎকা, কেষ্টচরণ, চঞ্চল, আরও দু-চারটে করিতকর্মা ছেলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে। পিসির দেওয়া হাতখরচের টাকায় ওদের নেপাল কেবিনে চা-চপ-সিগ্রেট খাইয়েছে। ওরা খোঁজ-খবর নিয়ে জানে ওই নবাগত মাল কার্তিককুমার অপুত্রক রামগতির অঢেল পয়সার ভাবী মালিক হতে পারে।

সুতরাং তারাও কার্তিককে বেশ সমাদর করে। হোঁৎকা তো প্ল্যানই করেছে এবার কার্তিককে সেক্রেটারি করে একটা ক্লাব চালু করবে। কার্তিককে দোহন করে ফুটবল টিম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে।

কিন্তু ক'দিন কার্তিকের আর দেখাই মেলে না। কোথায় গেল ছেলেটা। কেষ্ট বলে—রামগতি যা কেপ্পন, দ্যাখগে আউটই করে দিয়েছে বোধহয় কার্তিককে।

কার্তিকের তখন সময় নেই। বেলা অবধি ঘুমানো অভ্যাস কার্তিকের। এখানে নিজের ঘর, বেশ খাট-গদি, মাথায় ফ্যান পেয়ে কার্তিক ক'দিন বেলা আটটায় উঠছিল।

সেদিন সবে ভোর হয়েছে।

রামগতির দাদা যখন এই নেপাল দত্ত লেনে বাড়ি করেছিল তখন শিয়াল ডাকত এদিকে। আশপাশে ছিল জলা, হোগলাবন, বাঁশবন।

সেই সময় নগদ চল্লিশ টাকা বিঘা দরে একলপ্তে চার বিঘা জলা বাঁশবন কিনেছিল। পুকুর কেটে মাটি ভরাট করে বাড়ি হয়েছিল, আশপাশে প্রায় এখন তিন বিঘে বাগান, সাজানো পুকুর।

আর সি-আই-টির দৌলতে এখন এ পাড়ায় চার-পাঁচতলা বাড়ি, বিশাল রাস্তা, আর ওদিকেই সল্টলেক সিটি। বাড়ি-জমির দামই কোটি টাকা।

কার্তিক সেই কোটিপতির ঘরে সুখনিদ্রায় মগ্ন—হঠাৎ একঝলক ঠান্ডা কনকনে জল এসে তার মুখে চোখে লাগে—তারপর আবার সেই হিমজলের ছিটে।

ধড়মড় করে উঠে বসে কার্তিক।

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে জলের ঘটি হাতে স্বয়ং রামগতি—জয়গুরু! জয়গুরু! উঠে পড়ো—ঠাকুর প্রণাম করতে হবে।

বাড়ির লাগোয়াই নিজেদের মন্দির। মার্বেলপাথর গাঁথা। ওই ভোরেই কার্তিককে হাতমুখ ধুয়ে সেখানে গিয়ে বসতে হয়। আরও দু-চারজন লোক, গুপী সরকার, রামগতি জোটে। তারস্বরে খোল পিটিয়ে নামগানের পর সকলে পায় ওনলি তুলসী আর গঙ্গাজল, ওই প্রসাদ।

তারপরই কার্তিককে বলির পাঁঠার মতো তুলে এনে রামগতি ওকে চাট্টি ভিজে ছোলা আর দুটো বাতাসা প্রসাদ দিয়ে, এবার খেরো খাতা ধরিয়ে বলে—চলে যাও তাগাদায়।

অর্থাৎ পার্টিদের দোকানে, বিভিন্ন অফিসে ঘুরতে হবে। টাকা কালেকশন করে সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে, বাসে, না হয় হেঁটে ঘুরে আসতে প্রায় বেলা দুটো বাজে। ক্যাশে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে তারপর ছুটি।

বাড়ি ফিরে খেতে বসে। রামগতিও ততক্ষণে ইটভাটা,করাতকল, আড়ত ঘুরে আসে।

ভাত, ডাল, সব্জি আর টক। ব্যাস!

রামগতি বলে—আমিষ ভক্ষণে চিত্তবৈকল্য হয়। তাই গুরুদেব বলেন নিরামিষ খাও। শান্তি পাবে।

বৈকালে বসে হিসাব-নিকাশ; খাতা লেখা নিয়ে। দু-তিনজন লোক দু-তিনটে খাতায় দু-তিন রকম হিসাব লেখে। কার্তিকচন্দ্রের মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম।

সন্ধ্যায় সেই কীর্তন।

কার্তিকচন্দ্রের কলকাতাবাসের শখ মিটে গেছে।

ভবতারিণীও দেখে ছেলেটার অবস্থা। বলে স্বামীকে—এত খাটুনি সইবে বেচারার!

—পুরুষ মানুষ। এই তো খাটার বয়স। খাটুক!

ভবতারিণী বলে—ছেলেটা টিকলে বাঁচি।

সেদিন সকালে চলেছে কার্তিক তাগাদায়। কুলেপাড়ার মোড়ে হঠাৎ কেষ্ট, হোঁৎকাদের নজরে পড়ে যায়।

হোঁৎকা বলে ওঠে—একি রে কার্তিককে যে মিনি রামগতি বানিয়ে দিয়েছে। এ্যাঁ—কদমছাঁট চুল, মাথায় টিকি–হাঁটুতক ধুতি–কি হাল করেছে তোর!

কার্তিক যেন এবার কান্নায় ভেঙে পড়বে। বলে সে—পিসীমা এসব চায়নি, ওই পিসেমশাই জোর করে টাইট দিচ্ছে।

কেষ্ট বলে তুইও মুখ বুজে সইছিস এসব! তুই কি র‍্যা—

বলে ওঠে ফড়িং—যে সয় সে রয়। '

হোঁৎকা বলে —তা ক্যাশকড়ি কিছু দেয়? না পেটভাতেই খাটছিস? কিছু ম্যানেজ কর।

কার্তিক বলে—তার উপায় আছে? বুড়ো পাইপয়সার হিসেব মিলিয়ে নেয়। দিনে জলপানি পাঁচ টাকা আর গাড়িভাড়া, তাও হিসাব করে। আব পারছি না রে!

কেষ্ট বলে—না পারারই কথা। দেখা যাক কি করা যায়।

—নাহলে সেই অজ গাঁয়েই পালাতে হবে। পেন্নাম কলকাতা।

যদু হিসাবি ছেলে। বলে—মুখ বুইজা পইড়া থাক। বুড়োর মেলাই টাকা। মা কালীকে মানসিক কর—যেন তোর দুঃখ ঘোচে।

হোঁৎকা বলে—সামনেই তো মায়েব মন্দির। চল—

কার্তিক বলে—তাগাদায় যাচ্ছি।

—তাব আগে মায়ের মন্দিরে মাথা ঠুকে যা। মায়ের দয়ায় দেখবি সব প্রবলেম সল্‌ভ হয়ে যাবে। বের কর আজকের জলপানির পাঁচ টাকা—

দশচক্রে ভগবানও ভূত হয়, কার্তিক তো কোন্ ছার। মাকে পেন্নাম করে পাঁচ টাকাব চা-টোস্ট প্রসাদ পেয়ে এবার বের হল কার্তিক।

জীবনে ঘেন্না এসে গেছে। টাকার দবকার নেই। আর কয়েকদিন দেখে সে তার গ্রামেই ফিরে যাবে।

কিন্তু মায়ের অসীম দয়ার জন্যই হোক আর রামগতির নিয়তিই হোক—ক'দিনের মধ্যেই রামগতির কঠিন হৃদয়ও এক নিমেষেই টালমাটাল খেয়ে গেল। একেবারে যাকে বলে ম্যাসিভ স্ট্রোক। —ডাক্তার, বদ্যি ডাকার খরচাও করতে হল না। রামগতি পরমগতি প্রাপ্তি হয়ে গেল।

নদীর একুল গড়ে ওকুল ভাঙে, প্রকৃতির এই লীলা। এখানেও তার ব্যতিক্রম কিছু হল না। ক'দিন স্বামীর শোকে চুপচাপ থাকে ভবতারিণী। কার্তিকই গুপী সরকার, ফ্যাকটরি ম্যানেজার জীবনবাবু, অন্য কর্মচারীদের নিয়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করে।

আর এই বৃহৎ যজ্ঞে এসে সামিল হয় হোঁৎকার দলবল। কেষ্টচরণ, যদুপতি, নন্দ—এরাই অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্তিকের পিসেমশাই-এর স্বর্গারোহণের পাকা বন্দোবস্ত করে দেয়।

শ্রাদ্ধশান্তির পর এবার ভবতারিণী ঝেড়ে ফুঁড়ে উঠে নিজমূর্তি ধরে। এতকাল তার বিষয়, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব যেন ছাইচাপা ছিল। এবার ছাই উড়ে আগুনই বের হয়।

ভবতারিণী বলে খাতাপত্র-হিসাব-নিকেশের খবর শুনে—বাড়িগুলোর ভাড়াটেদের নোটিস দেন সরকার মশাই। এখন এলাকার চেহারা বদলেছে। ওই ভাড়ায় চলবে না। উচ্ছেদের নোটিস দেন। বস্তি দুটোকেও উচ্ছেদ করে ওখানে পাঁচতলা বাড়ি বানাতে হবে। আর কারখানায় কাল নিজে যাব। মাল এত কম তৈরি হলে কারখানা চলবে কি করে?

ম্যানেজারকেই ধমকায় ভবতারিণী—কি করো তুমি? কেতো?

কার্তিক এখন ক'দিন একটু শান্তিতে আছে। তাকে আর সাতসকালে কলবেরুনো ছোলা-বাতাসা খেয়ে

পথে পথে চক্কর দিতে হয় না। ক'দিনেই তার চুলগুলোও বেশ বেড়েছে। সেই ঠেসি ধুতি-ফতুয়ার বদলে কার্তিক আবার ফাইন ধুতি-পাঞ্জাবি আর কোলাপুরী চপ্পল পরছে। শ্রাদ্ধের সময় বেশ টুপাইস হাতিয়ে এখন সিনেমাও দেখেছে বন্ধুদের নিয়ে। ভেবেছিল দিন তার হেসে-খেলেই যাবে।

কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়ো। পিসেমশাই যদি ভাতে মারে—পিসিমা তার চেয়ে এককাঠি বাড়া। বলে ভবতারিণী—কাল আমার সঙ্গে গাড়িতে ইটভাটায় যাবি, কি হচ্ছে ওখানে দেখতে হবে।

ভবতারিণী কয়েক মাসেই কড়াহাতে এস্টেটের হাল ধরেছে। আর পিসিমার কাছে কার্তিকের দামও বেড়েছে। ফলে কার্তিক এখন ব্যবসাপত্র দেখাশোনার জন্য গাড়ি পেয়েছে। আর শাঁসেজলেও বেশ ফুলে উঠেছে। বাহারও খুলেছে তার।

ওদিকে হোঁৎকা-কেষ্টচরণদেরও দিন বদলেছে। এখন নেপালের চায়ের দোকানে তাদের খুবই খাতির। নেপালের দোকান—ওই সব বাড়ির মালিক ভবতারিণী ঠাকরুন। আর কার্তিক তার ভাবী মালিক। সুতরাং কার্তিকবাবুর বন্ধুদের সেখানে স্পেশাল খাতির।

ওদিকের মাঠে ক্লাবঘরও গড়ে উঠেছে হোঁৎকাদের। আপাতত দরমার বেড়া—মাথায় এ্যাসবেসটাস। তবে হোঁৎকা আশাবাদী। পিসিমাকে একবার খুশি করতে পারলে পাকাবাড়িই হবে ক্লাবের। তাই ক্লাবের নাম দিয়েছে 'রামগতি স্মৃতি সংঘ'।

কেশব হালদার এই অঞ্চলের বহুদিনের বাসিন্দা। ওদিকের একটা বাড়িতে ভাড়া থাকে। অবশ্য ভাড়াটে সে নামেই। কেশব হালদার সাবধানী হিসেবি ব্যক্তি। এবারও সে কর্পোরেশনের ভোটে দাঁড়িয়েছে। তবে কোন দলে যে ভিড়বে শেষ পর্যন্ত তা কেশব হালদারও জানে না। যখন যার পালে হাওয়া—কেশব হালদারও তখন সেই দলে। আর ভোট যখন জমে ওঠে, কেশব সেই সময়েই তাকে বুঝে বাণিজ্য করে। অর্থাৎ কিছু টাকা খিঁচে নিয়ে নাম প্রত্যাহার করে নেয়।

এলাকার মাঠে-পথে হঠাৎ দমাদম বোমা ফাটার শব্দ ওঠে। কে জানে কোনো গোলমাল বাধলো কিনা। বোমা-পটকার আমদানি হয় ভোটের আগে মুড়ি-মুড়কির মতো।

কিন্তু সকলেই অবাক হয়। এ বোমা মাটিতে ফাটে না। এ বোমা হাউই-এর মতো আগুন দিয়ে আকাশে তুলে দিতে হয় আর ফাটে সেই আকাশেই। আর ওই বোমা থেকে জালকাঠি-বোতলভাঙার টুকরো ছুটে আসে না। ছুটে আসে অসংখ্য লিফলেট। লাল নীল হলুদ রঙের ইস্তাহার।

এমনি একটি বোমা ফেটেছে ভবতারিণী ঠাকরুনের বাগানের মাথায়। ঠাকরুন তখন সকালে স্নান সেরে গরদের শাড়ি পরে বাগানে ফুল তুলছিল। শূন্যে ওই বোমা ফাটতে দেখে ভয়ে চিৎকার করে—সরকার, এ্যাই নন্দু সিং—কার্তিক—একি হল রে! বোম ফাটায় কোন্ মুখপোড়া আমার বাগানে। এত বড় হিম্মৎ—

ছুটে আসে পিসিমার হাঁকডাকে গালে সাবান মাখা অবস্থাতেই কার্তিক, সরকার মশাই, সকলে। তখন আসমানে বোম ফেটে গেছে আর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সেই লাল নীল ইস্তাহারগুলো—উড়তে উড়তে এসে ঠাকরুনের গায়ে মাথায়, ফুলের সাজিতেই পড়ে।

কার্তিক একটা ইস্তাহার কুড়িয়ে বলে—ও পিসিমা, বোম কেন হবে? ওই কেশব হালদারের ভোটের ইস্তাহার। কেমন জব্বর লিখেছে দ্যাখো—অক্লান্ত কর্মী—দরদী জনসেবক কেশব হালদারকে 'ঝাঁটা' মার্কা বাক্সে ভোট দিয়া জয়ী করুন।

ততক্ষণে ভবতারিণীর হুঁশ হয়, ওই বিজাতীয় অপবিত্র কাগজগুলো তার গায়ে, ফুলের সাজিতে পড়েছে। এমনিতে ছুঁচিবাই তার, তার ওপর ওই অঘটন ঘটে গেছে, সুতরাং এবার বোমা ফাটায় ঠাকরুনই। মুখপোড়া কেশব হালদারের বিটকেল কাণ্ড দ্যাখো—বোম ফাটাবে আমার ঘাড়ে, ওই বাজে কাগজ—

—বাজে কাগজ নয়, ভোটের কাগজ, ওঁর ঝাঁটা মার্কা বাক্সে ভোট দেবার কাগজ। কার্তিক বলার চেষ্টা করে।

ভবতারিণী ঠাকরুন গর্জে ওঠে—ওর মুখে মারি আধোয়া মুড়ো ঝাঁটা। সরকার—ওই কেশব হালদার

আমাদের খালধারের বাড়ির ভাড়াটে না?

সরকার বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মুখপোড়া তো ন'মাস ভাড়া দেয়নি। এদিকে ভোটে দাঁড়িয়ে র‍্যালা নিয়ে বোম ফাটায় আমারই বাড়িতে। ওর জন্য এই শীতে নাইতে হবে? মুখপোড়াকে নোটিশ দাও। ভাড়া না দেয় তো লাঠিয়াল দে উৎখাত করো ওটাকে। এত বড় হিম্মৎ ওর! কেতো—ওটাকে গিয়ে বল। হঠা ওকে!

ভবতারিণী ঠাকরুন ওই গরদের শাড়ি, ফুলের সাজি সমেতই হড়বড়িয়ে পুকুরের জলে নেমে ভুসভাস করে ডুব দিয়ে পবিত্র হবার চেষ্টা করে।

কেশব হালদার ভেবেছিল অন্যবারের মতো এবারও কোনো ক্যানডিডেট আসবে তার কাছে তার হয়ে কাজ করার জন্য। কেশব হালদার এই দিকের বস্তির অনেক মানুষকে নানাভাবে টপি পরিয়ে, গুলগাপ্পা দিয়ে হাতে রেখেছে। তাদের হয়ে মোকদ্দমার তদ্বির-তদারক করে, নেতাদের কাছে দরবার করে। অবশ্য তার জন্য কেশব হালদার বস্তির মানুষদের নিয়ে জলকল্যাণ সংঘ গড়েছে, নিজেই তার চেয়ারম্যান সেক্রেটারি কাম ক্যাশিয়ার। মাসে একটাকা দু-টাকা করে প্রায় হাজার তিনেক মেম্বারের কাছ থেকে প্রায় হাজার তিনেক টাকা চাঁদা বাবদ আমদানি হয়। এছাড়া বস্তির বহুজন হকারি করে—তাদের হয়েও নেতাদের কাছে যায়, কথা বলে, সেইজন্যও স্পেশাল ডোনেশনও তোলে। সে নেতাদের আমদানি রমরমার খবর জানে। সেই কৌশলে খুদে নেতা বনে গেছে কেশব হালদার। বস্তির ভোট তার পকেটেই ছিল এতকাল। তাই প্রতিবার ভোটে নিজে দাঁড়িয়ে—পরে অন্য কোনো প্রার্থীব কাছ থেকে বেশ টাকা খিঁচে নিয়ে সেই ভোট তাকেই পাইয়ে দিত।

কেশব এবারও দাঁও মারার জন্য ওই সব ইস্তাহার বোমা ফাটিয়ে বাজার তুলছে, আর তার ভোটের অন্যতম সহকারিণী তারই মেয়ে রজনীগন্ধা।

কেশব হালদার মেয়েকে স্কুল ফাইনাল অবধি পাশ করিয়েছিল কোনোমতে। তখন তার মগজে এসব ফন্দিবাজী ছিল না। কোনো কারখানায় কাজ করত। সামান্য মাইনেতে এই ফাঁকা নির্জনে খালের ধারের বাড়িটায় এসে জুটেছিল।

সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে একেবারে অতল অন্ধকারে পড়ে যায়, দিন চলে না—বাজারে এটা সেটা বিক্রি করার চেষ্টা করে। এমনি দিনে স্ত্রী মারা গেল বিনা চিকিৎসায়, প্রায় অনাহারেই।

একমাত্র মেয়েকেও ঠিকমতো খেতে দিতে পারে না। তারপর থেকেই অভাবের তাড়নায় কেশব তার আদর্শ-ন্যায়-বিবেককে পুড়িয়ে নতুন মানুষ হয়ে গেল, তার চাই টাকা—

রজনীগন্ধাকে ওপাড়ার হরেন ডাক্তারের কাছে রেখে দিল। হরেন ডাক্তার কেশবের বন্ধুই, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে। কেশব বলে—মেয়েটাকে ডাক্তারি পড়াব ভেবেছিলাম হরেন, সে সাধ মিটল না, তুমি নিদেন ওকে হোমিওপ্যাথিটাই শেখাও।

রজনীগন্ধা অবশ্য প্রতিবাদ করে, ও কিছুই জানে না হোমিওপ্যাথির—তাছাড়া কে আসে ওর কাছে? রোগীই নেই।

কেশব বলে—হোমিওপ্যাথিতে কম জানলেও চলে—তবে ডাক্তারি শুধু জানলেই হবে না। হাতযশ—রোগী আনার ক্ষমতা চাই। ওসব ওর নেই। তোর হবে। লেগে থাক। তুই হবি এই এলাকার ফার্স্ট লেডি হোমিওপ্যাথ। তারপর তোর বরাত আর আমার হাতযশ। দেখবি ফুল ফুটিয়ে দেব তোর চেম্বারে।

রজনীগন্ধা কথাটা আজও ভোলেনি। চোখের সামনে দেখেছে সে অনেক অভাব, দুঃখ, কষ্টের দিনগুলোকে। আজ সেই দুঃখকষ্ট নেই, কিন্তু আজও অনেক ভাবনা অশান্তি এসে জুটেছে তার সামনে।

ওদিকের ঘরে কেশবচন্দ্রের ডানহাত কালিরাম এন্তার হাউই বোম পটকা বাঁধছে। কোনোদিন সত্যিকার বোমা না ফাটে এখানে!

রজনী বলে—বাবা, কি দরকার এসব করে, কিছু কাজকর্ম করো।

কেশব বলে —কাজই তো করছি। এবার দেখবি ভোটে ঠিক জিতব।

—এসব নাই বা করলে?

হাসে কেশব—জিততে পারলে দেখবি সব খরচা সুদ সমেত উঠে যাবে। ওই নেতাদেরও দেখিয় দেব। যাই, মিটিং আছে খালপারে, আর শোন—বিষ্টু মুদী, নটবর মহাজন এলে বলবি—ওদের টাকা ঠিক সময়ে পৌঁছে দেব, বাড়িওলার সরকার ভাড়ার তাগাদায় এলেও তাই বলবি।

রজনী বলে—মিছে কথা বলতে পারব না।

হাসে কেশব—ছেলেমানুষই রয়ে গেছিস। একালে মিছে কথা না বললে বাঁচবি কি করে? এ যে মিছে কথার যুগ।

রজনী বলে—কেন ওদের টাকা দেবে না?

কেশব বলে—আমি হাত পাততে জানি, উপুড় করতে তো জানি না। ছেলেমানুষ, ও তুই বুঝবি না। ডাক্তারিটা ঠিক ঠিক করে যা, তাহলেই হবে। যা চেম্বারে বসগে—পার্টি এলে হাতে রেখে চিকিৎসা করবি। আমি ঘুরে আসছি পীতুবাবুর গদি থেকে।

রজনী বাবার এই স্বভাবটাকে চেনে। লোকটা আব সোজাপথে হাঁটে না, সোজা কথাও বলে না। নিজেকে খুবই চালাক আর সাবধানী ভাবে।

রজনী গিয়ে ওদিকে তার চেম্বারে বসল। একটা বোর্ডও লাগিয়েছে কেশব হালদার।

রজনী সেবাসদন

ডাঃ মিস্ রজনীগন্ধা হালদার

তারপর ক'টা অক্ষব, যেগুলোর মানে রজনী নিজেই জানে না। কোথাও পড়েওনি—যা শিখেছে ওই হরেন ডাক্তারের কাছে দু-চারটে ওষুধের নাম। অবশ্য কেশব কোথা থেকে বেশ মোটা মোটা কি সব বই এনে আলমারিতে রেখেছে সাজিয়ে, যেন রজনী ওই সব বই পড়ে হজম করে ডাক্তারি করছে। রজনী বলেছিল—ওসবে কি হবে বাবা?

তাব চালু পিতৃদেব অবশ্য বলেছিল—ভেক নইলে একালে ভিক্ষেও মেলে না। ডাক্তারের পশার তো ছার।

দু-চারজন রোগী,বস্তির মেয়েরা আসে ওষুধপত্র নিতে। আর ইদানীং আটাচাকী-রেশন দোকানের মালিক সাহুজী। ওর নাকি মাথা ঘোরে, অকারণে বুক ধড়ফড় করে। মোটা লোকটার বউ-বাচ্চা-ছেলেপুলে সবই বর্তমান। বয়সও হয়েছে। এতকাল সাহুজী মুদিখানার দোকান, রেশনের দোকান, আটাচাকীর ঘর্ঘর শব্দের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে এবার জীবনে অন্ধকার পথে রোজগার করা টাকায় একটু আয়েস করতে চায়।

সেদিন সাহুজী রজনীকে বাজারে তার রেশনের দোকানে দেখে চমকে ওঠে। কেশব হালদারকে সে চেনে, তার দোকানে বেশ কিছু টাকা ধার রেখে আর এদিকে আসেনি।

সাহুজীর বুকে যেন কোকিলের ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে। সেদিন বৈকালে সাহুজী তার ছেলেকে দোকানে বসিয়ে চলেছে খালধারের ওই বাড়িটায়। টাকার তাগিদ তার একটু অজুহাত, ওর চোখের সামনে ভাসছে রজনীর যৌবনপুষ্ট দেহটা।। ডাগর দুচোখ—সুন্দর সুঠাম দেহ।

সাহুজী এসে কড়া নাড়ছে। অসময়ে কড়া নাড়তে দেখে কেশব হালদার ওদিকের জানালার খড়খড়ি ফাঁক করে পাওনাদার সাহুজীকে দেখে খড়খড়ি নামিয়ে সরে এসে মেয়েকে বলে--কে দ্যাখ তো! অবেলায় যত ঝামেলা।

দরজা খুলে রজনীকে বের হয়ে আসতে দেখে সাহুজী এর মধ্যে কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছে, সে দেখেছে রজনীর ডাক্তারখানাব বোর্ডটা। আর রজনীই যে ডাক্তার তাও জেনেছে। চতুর সাবধানী ব্যবসাদার মানুষটা টাকাকড়ির কথায় না গিয়ে বলে সাহুজী—নমস্তে ডাক্তারজী! শুনলো আপনি বহুৎ ভালা দাওয়াই দেন—তাই এলাম। থোড়া দাওয়াই দেনে হোগা।

রজনী দেখছে লোকটাকে। লোকটা বলে—শিরে দরদ করে, সিনে মে ধক্‌ধক্ ঔর আঁখো মে আন্ধার বসে যায়।

রজনী বলে—ওদিকে চেম্বারে গিয়ে বসুন, যাচ্ছি।

কেশব হালদার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ব্যাপারটা সবই দেখছিল। রজনীকে ঘরে আসতে দেখে বলে—মেলা পয়সা ব্যাটার। যা পারিস ওই জলবড়ির নাম করে খিঁচে নে।

রজনী বাবার দিকে চাইল। লোকটা শুধু যেন খিঁচে নেবার মতলবই ঘোরে, রজনী বলে—বাবা, খিঁচে নেবার এত তাল করেও তো কিছুই হল না তোমার। তবে আর এসব কেন? এসব ধান্দা ছাড়তে পারো না?

কেশব বলে—হবে রে, এবার ঠিক হবে। যা, যেচে লক্ষ্মী এসছে—ভালো করে দেখবি। ইনজেকশনও দিবি—মেলা টাকা ওর।

সাহুজীর রোগটা দেহে নয়, মনে। আজ রজনীকে দেখে বেদনাটা যেন উথলে উঠেছে। ডাক্তারের হাতটাই খপ্ করে ধরে বলে—সিনাটা হুম্ হুম্ করে জী।

রজনী ওর ভুষিঘাঁটা কঠিন হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—দেখতে দিন, জোরে নিশ্বাস টানুন—

দেখেশুনে রজনী এবার ওষুধের বাক্স খুলে কয়েকটা পুরিয়া বানিয়ে বলে—দিনে তিনবার খাবেন, সকাল দুপুর সন্ধ্যায়। সাতদিন।

—সাতদিন!

—সাতদিন পরে এসে খবর দেবেন। তখন দেখেশুনে ওষুধ দেব।

কৃপণ সাহুজীর হঠাৎ যেন দরাজ দিল হয়ে গেছে। ফস্ করে পকেট থেকে কুড়ি টাকার নোট সামনে রেখে বলে—আপনার ভিজিট, ওষুধের দাম রইল। নমস্তে। রজনী ডাক্তারি করে এমন রুগী পায়নি। আজ খুশিই হয় সে। তার রুগীদের আধুলি না হয় একটাকা অবধি দৌড়, এর দৌড় অনেক। টাকা তুলে রাখে।

—আসতে পারি?

হঠাৎ একটি তরুণকে দেখে চাইল। বেশ ফিটফাট পোশাক, রজনী অবাক হয়। এও বোধহয় রোগীই। ভালো পার্টি বলেই মনে হয়।

—আসুন।

কার্তিক এসেছে পিসিমার তাড়া খেয়ে। ওই বোম ফাটার পর থেকে পিসিমা কেশব হালদারের ওপর বেজায় চটে উঠেছে। ভালো কথায় না উঠলে ওকে গুপী সরকার তার দলবল দিয়ে লাঠি, দরকার হলে সত্যিকার বোমা মেরেই তাড়াবে।

রজনীর সাইনবোর্ডটা দেখেছে কার্তিক।

রজনী শুধোয়—কি অসুবিধা হয়? জ্বর—পেটের অসুখ? কি কেস? নাড়িটা দেখি।

কার্তিকের হাতটাই ধরে রজনী। সুন্দরী মেয়েটির নরম কোমল হাতের ছোঁয়ায় কার্তিকের দেহমনে ঝড় বইতে থাকে। একেবারে দিশেহারা হয়ে যায় ওই ছোঁওয়ায়।

—কি কেস আপনার?

কার্তিক বলে—আমার নয়, পিসিমার।

হাতটা ছেড়ে দেয় রজনী।

—পিসিমার কি কেস? বাইরে আমার ভিজিট দশ টাকা—আর রিকশাভাড়া। তাহলে চলুন, দেখে আসি।

কার্তিক চেনে তার পিসিমাকে। এই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে হাজির হলে পিসিমা এর ব্যবস্থা তো করবেই, অপরাধে তাকেও বাড়িছাড়া করে দেবে। সে বলে—না, না। যেতে হবে না ওখানে। দেখারও কিছু নেই।

—তাহলে ওষুধ দেব কি করে? বলে রজনী।

কেতো বলে—পিসিমা আপনাদেরই ওষুধ দেবেন—কড়া ডোজের ওষুধ।

—মানে? রজনী অবাক হয়।

বলে কার্তিক—এই বাড়ি ছেড়ে চলে যান, আপনার বাবাকে বলুন, পিসিমা কেস কাছারি পছন্দ করেন না। ভাড়াটেদের তিনি ঠেঙিয়ে, বোমাবাজি করে হটান, তাই এসেছিলাম।

এবার রজনী বুঝতে পারে কার্তিকের আগমনের কারণটা। বলে রজনী—আপনি কে?

—কার্তিক!

রজনী ওর সাজবেশ দেখে বলে—তা তো বুঝলাম। কিন্তু ময়ূরটি কোথায়?

কার্তিক ওর সাইকেলটা দেখিয়ে বলে—আপাতত ওইটাই ময়ূর। কিন্তু পিসিমাকে কি বলবো? আজ আপনার বাবার কাগুজে বোমা ফাটানোর পর ওঁর রাগটা বেজায় চড়ে গেছে।

রজনী বলে—আমি তার কি বলব? বাবাকে বলুন।

কার্তিক বলে—আপনার বাবার দর্শন তো মেলে না। তাই আপনাকেই বলে গেলাম। চলি—নমস্কার।

কার্তিক বের হয়ে আসছে। হঠাৎ এই ভাঙাবাড়িতে এমন চাঁদের মতো মেয়ের সন্ধান পেয়ে যাবে তা ভাবতেও পারেনি কার্তিক। এখনও তার হাতের নরম ছোঁওয়া কেতোর মনে ঝড় তুলেছে। খুশির ঝড়।

সটান এসে ক্লাবের মাঠে সাইকেলটা রেখে দিয়ে কার্তিক বলে—হোঁৎকা, কুলপি মালাই-এর অর্ডার দে।

কেষ্ট অবাক হয়, কুলপি! কি ব্যাপার রে! দমকা কিছু আমদানি হল নাকি!

কার্তিক বলে—আজ বুকের সব জ্বালা জুড়িয়ে কুলপি হয়ে গেছে রে!

—মানে? ফটিক এগিয়ে আসে।

কার্তিক বলে—ওই রজনীগন্ধা, কি মেয়ে মাইরি! ওই বোমা কেশবের মেয়ে র‍্যা। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। কিন্তু বড় কড়া মেয়ে—

ফটিক বলে—তোর কেসটা কি? প্রেমেট্রেমে পড়ে গেলি নাকি?

হোঁৎকা বলে—তা মন্দ নয়। এগিয়ে যা—

কার্তিক বলে—কিন্তু যাই কি করে? এদিকে ওই মেয়ে, ওর বাপটাও মহা ধড়িবাজ।

কেষ্ট বলে—কেশব হালদার চেনে টাকা। ওকে ম্যানেজ করে দেব। কিন্তু মেয়েটা।

হোঁৎকা বলে—প্রেমে পড়লে কড়া মেয়েরাও একেবারে ললিতবঙ্গলতা হয়ে ওঠে। ভয় নেই। মেয়েটা বললি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার—তুই ওর রুগী হয়ে যা।

কেতো বলে—তারপর ওষুধ দিলে খেতে হবে তো? মদন ডাক্তারের ওষুধ কি তেতো! বিশ্রী!

—ও এলোপ্যাথি। হোমিওপ্যাথি ওষুধ ওই মেয়েটার মতোই মিষ্টি। চুষে চুষে লেবেনচুষের মতো খেলেও ক্ষতি হবে না। তবু কাছে ভিড়ে যেতে পারবি, তারপর দেখবি ওর খুউব কাছের মানুষ—মনের মানুষ হয়ে গেছিস। ব্যাস—তারপর ঝুলে পড়।

কার্তিক যেন সেই মিলনের মধুস্বপ্নই দেখছে। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীটা অনেক কঠিন। কল্পনার সঙ্গে তার মিলই নেই। কার্তিকের মনে পড়ে পিসিমার সাবধানবাণী। ওই বিটলে বামুন কেশব হালদারকে উৎখাত করতেই হবে বাড়ি থেকে।

কার্তিক বলে—ওদিকে না হয় সামলানো গেল, কিন্তু পিসিমা? তাঁকে সামলাই কি করে? পিসিমা তো ওই বোম ফাটানো কেশবকে উৎখাত করবেনই বাড়ি থেকে, ন'মাসের বাড়িভাড়া বাকি। ওখানেই ওর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছি জানলে আর রক্ষে থাকবে? আমাকেই উৎখাত করবেন বাড়ি থেকে। পিসিমাকে জানিস তো।

হোঁৎকাও এবার ফিউজ হয়ে যায়। পিসিমাকে ওরাও চেনে, এখন কি করা যায়, তাই ভাবছে।

কেষ্ট বলে—কেতো, তুই ডাক্তারনীর রুগী তো হয়ে যা। এ লাইনের কাজ এগোক। তারপর মাথা ঠান্ডা করে ভেবে এগোতে হবে। পিসিমাকে আনসান বলে টাইম কিল কর।

কেশব হালদার এবার বেশ বিপদে পড়েছে। এর আগে ভোটের মরশুমে ক্যানডিডেট সেজে দু-পাঁচ হাজার টাকা খরচা করে অন্য কোনো ভোটপ্রার্থীর ফেভারে তিনগুণ টাকা নিয়ে সরে যেত।

এবারও ভেবেছিল তেমনি দাঁও মেরে বেশ কিছু টাকা কামিয়ে সরে যাবে ভোটের ময়দান থেকে। তাই এবারের জব্বর কৌশলটাই বের করেছিল—ইস্তাহার বোমা, পথসভা ইত্যাদি।

কিন্তু অন্য কোনো ভোটপ্রার্থীই এবার তাকে বসে যাবার কথা বলেনি, টাকা দেবার কথা তো দূরস্থান। এদিকে কেশব হালদারের জমানো বেশ কয়েক হাজার টাকা গলে গেছে। এবার বুঝেছে লড়তে হবে তাকে—না হয়, সরে পালাতে হবে। আর লড়তে গেলে জিতবে সে আশাও নেই।

রজনী বুঝেছে ব্যাপারটা। বলে সে—নিজেকে খুব চালাক ভাবো না? চিরকালই লোককে ঠকাবে ভেবেছ? এখন গেল তো আট-দশ হাজার টাকা। বোমা ইস্তাহার—যাও, বোম ফাটাও গে এবার!

কেশব হালদার চুপসে গেছে। তবু লড়াকু মরদ সে, ভাঙবে তবু মচকাবে না। বলে—দেখবি ভোটেই জিতব এবার।

—থাক! চা-টা এগিয়ে দিয়ে বলে রজনী—বাড়িওয়ালার লোক এসেছিল, ন'মাস ভাড়া দাওনি, ওদিকে বিষ্টু মুদির দোকানে বাকি।

কেশব বলে—তুইও তো ডাক্তারি করিস। সংসারে কিছু দে।

রজনী জানায়—এ মাসে তো উপুড় হাত করোনি, সংসারে খাওয়াটা জুটছে কি করে? ডাক্তারি—এসব হোমিওপ্যাথি না জেনেই লোক ঠকাতে পারবো না।

কেশব বলে—শিখবি। ওসব শিখে নিবি। একালে অন্যকে ঠকাতে না পারলে নিজেকেই ঠকতে হবে নিদারুণভাবে।

হঠাৎ মোটা সাহুজীকে রিকশা থেকে নামতে দেখে কেশব বলে—ওই সাহুজি এসেছে।

রজনীও দেখেছে লোকটাকে। এর মধ্যে তিনদিন এসেছে, কাল এসেছিল—আজও এসেছে। বলে রজনী—ও আমার পেশেন্ট!

—এ্যাঁ! কেশব যেন ভাবতেই পারে না। বলে সে—মেলা টাকা! একটু ভালো করে দেখবি। আর শোন—ভিজিট, ওষুধের দামও ডবল করে দিবি। যাঃ।

কেশব ছাতাটা নিয়ে বের হয়ে পড়ল। নবীন কুণ্ডু নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও যদি দর ভালো দেয়, কেশব ভোট থেকে সরে দাঁড়াবে। নবীন কুণ্ডুর বিরাট চিটেগুড়-ভেলিগুড়ের আড়ত। ওর সন্ধানেই চলেছে। আর পড়বি তো পড় ভবতারিণী ঠাকরুনের ঘুঘু কর্মচারী গুপীনাথ সরকারের সামনেই।

. কেশব হালদার ছাতাটা নিয়ে বের হয় রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্য ছাড়াও অন্য কারণে। ছাতার আড়াল দিয়ে পাওনাদারদেরও এড়াতে পারে সে। কিন্তু এমন আচমকা এসে পড়েছিল গুপীনাথ যে কেশব আর আত্মরক্ষার সময়ও পায়নি। ফলে হাতেনাতে 'কট্'।

গুপীনাথ বলে—মা ঠাকরুন ক'দিন ধরেই খুঁজছেন আপনাকে কেশববাবু। বাড়িতেও লোক গেছলো। খবর দেয়নি?

কেশব বলে—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। রজনী বলছিল বটে, কিন্তু ভোটের সময়—বড় ব্যস্ত। মা ঠাকুরুনকে বলবেন পরে দেখা করবো।

গুপীনাথের সঙ্গী পাইক নন্দু সিং ওর পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। জানে সেও ওই বাবুটি পাঁকাল মাছের মতো হাতের মুঠো গলিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। তাই আগে থেকেই সে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। কেশবও বুঝেছে ব্যাপারটা।

গুপীনাথ বলে—পরে দেখা করব বলে তো ন'মাস কাটিয়ে দিলেন। এখনও সময় হল না। আজ চলুন তো! ওসব ফক্কিবাজির ভোট পরে হবে।

নন্দু সিংও এবার ফুঁসে ওঠে—চলিয়ে বাবুজী।

ভবতারিণী ঠাকরুন এর মধ্যেই নিজের এলেমে বেশ কয়েকজন এমনি ফাঁকিবাজ ভাড়াটেকে তুলেছে। নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে থানায় যায়, কে বেআইনী মালপত্রের গুদাম করেছে তার বাড়িতে—ব্যাস, ওই অজুহাতে পুলিশ লেলিয়ে দিতে সে বাড়ি ছেড়ে দেয়। কাউকে বা দু-একটা বোমবাজীও করতে হয়েছে

পাড়ার মস্তানদের নিয়ে। এইভাবেই ভবতারিণী কাজ হাসিল করে। ব্যবসাপত্র-কারখানাও চালায় হিসেব করে। কিন্তু ক'দিন ধরে কার্তিককে পাঠিয়ে কেশবকে আনতে পারেনি। কার্তিক এসে বলে—বাড়িতে নাই।

—গেছলি তো?

কার্তিক এর মধ্যে দু-তিনবারই গেছে ওই বাড়িতে। অবশ্য রজনীর কাছে। ইদানীং তার নাকি পেটের গোলমাল, ডাইনে-বাঁয়ে ব্যথা। বদহজম হয়।

রজনীও ক'দিনেই এমন দু-একটা শাঁসালো রুগী পেয়ে ভাবছে ভালোই চিকিৎসা করছে সে। তাই গম্ভীরভাবে ওষুধ দিয়ে বলে—তিনদিন খেয়ে কেমন থাকেন জানাবেন। কুড়ি টাকা।

কার্তিক ইদানীং অফিস থেকে হাতখরচ পায় ভালোই। তার থেকে কুড়ি টাকা দিয়ে বাইরে আসতে হোঁৎকা, কেষ্টচরণ এগিয়ে আসে।

—কি বলল র‍্যা তোর ডাক্তারনী?

—ওষুধ দিল। কার্তিক ওষুধের শিশিটা দেখাতে পেটুক হোঁৎকা শিশিটা নিয়ে সবটাই মুখে ঢেলে এগাল-ওগাল করে বলে—মিষ্টি! বেশ মিষ্টি রে।

কার্তিক বলে—সবটা খেয়ে ফেললি?

—কিৎসু হবে না। হোঁৎকা বলে।

কেষ্ট শুধোয়—কাজের কথা কিছু হল? মানে প্রেমের কথাটথা?

কার্তিক অবশ্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওসব বলতে পারেনি। বলে সে—না রে!

—ধ্যাত্তরি। ওই লেবেনচুষ খেলেই হবে? বলবি তো—তুমি খুব ভালো। তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না—কোনো কম্মের নোস তুই!

কার্তিক চুপ করে থাকে। কেষ্ট বলে—কাল এসে বলবি।

এমন সময় দেখা যায় মোটা সাহুজী রিকশা থেকে নেমে রজনীর চেম্বারে ঢুকল। হোঁৎকা বলে—ব্যাটা আটা চাক্কিওলা এখানে কেন রে?

কেষ্ট বলে—কে জানে? বোধহয় ওবও কেতোব মতোই লভ কেস, দ্যাখ ব্যাটা চাক্কিওলা কেতোর ভাতে হাত না দেয়।

—কি হবে? কার্তিক যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

কেষ্ট বলে—কেসটা দেখতে দে। তারপর ওষুধ দেব। তুই এবার এসে ঠিক ওইসব লভসিনের ডায়ালগ ছাড়বি। বাড়িতে প্র্যাকটিস করে নিবি!

হোঁৎকা বলে—পিসিমার রাগ পড়েছে ওর বাবার ওপর?

কার্তিক বলে—বরং বেড়েছে, আমি তো বলছি, ওর দেখাই পাচ্ছি না।

কেষ্ট বলে—ওইটাই বলে যা। তার মধ্যে মেয়েটার কাছেও এগিয়ে যাবি। তারপর আমাদের হাতযশ আর তোর বরাত!

কিন্তু এর মধ্যে কেশব হালদারকে যে গুপীনাথ সরকার জালবন্দী কাতলা মাছের মতো টেনে এনে ডাঙায় তুলেছে, সেটা দেখে অবাক হয় কার্তিক।

ভবতারিণীও এবার যেন আঁশবঁটি নিয়ে তৈরি। কেশবকে শবেই পরিণত করবে আর কি! প্রথমেই চড়া পর্দায় বাক্যবাণ প্রয়োগ করে—এত বড় হিম্মৎ তোমার বিটলে বামুন, আমার মাথার ওপর বোমা ফাটাও! বোমা দেখাচ্ছ আমাকে?

কেশব কাতরস্বরে বলে—বোমা নয় মা জননী, ইস্তাহার বোমা। ভোটের ইস্তাহার ছড়াচ্ছিলাম।

ভবতারিণী বলে—কতদিন থেকে ডাকছি গা ঢাকা দিয়ে ওই সব হচ্ছে। বাড়ি ছেড়ে দাও। ন'মাসের ভাড়া বাকি, আভি বাড়ি ছাড়তে হবে। এমন জোচ্চোর ভাড়াটে রাখব না।

কেশব বলে—মা জননী, ভোটে অনেক টাকা চলে গেল—

—আমি তার কি জানি? কে বলেছিল দাঁড়াতে? আমি?

ভবতারিণীর কথায় কেশব বলে—আজ্ঞে না। আমারই দুর্মতি হয়েছিল। ওসবে আর শখ নেই। আপনার ভাড়া পাই-পয়সা মিটিয়ে দেব, শুধু মাস দুয়েক সময় দেন মা।

ভবতারিণী গর্জে ওঠে—তারপর আবার ডুব দেবে?

আজ্ঞে না। কদাপিও না। বামুনের ছেলে মা জননীর সামনে পৈতে ছুঁয়ে বলছি—দু মাস, দু মাসের মধ্যে সব টাকা মিটিয়ে দেব। না পারি বাড়ি ছেড়ে দেব।

—ঠিক তো!

কেশব হালদার বলে—আজ্ঞে ঠিক কথা। দু মাস সময় দেন।

ভবতারিণী কি ভেবে বলে—দু মাস নয়, একমাস। একমাসের মধ্যে ভাড়া না দিতে পারলে সরকার ওর মালপত্র খালের জলে ছুঁড়ে ফেলে ওই বাড়ির দখল নেবে। সোজা কথায় না যায়—লোকজন নিয়ে গিয়ে জোর করে তাড়াবে। তারপর পুলিশ-কোর্ট-কাছারি যা করে করুগ গে! মনে থাকে যেন কেশব! আর শোন—ওই বোম ফাটাবে না। খবরদার!

কেশব হালদারের এখন শিয়রে শমন। এদিকে তার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার জন্য এক পয়সা দেবারও কোনো পার্টি আসে না। পকেটের স্বাস্থ্যও খুবই খারাপ। কেশব ভাবছে আবার এসব রাজা হবার স্বপ্ন ছেড়ে নকুল উকিলের মুহুরীগিরিই করবে শিয়ালদহ কোর্টে। তবু দিন গেলে মক্কেলদের মোচড় দিয়ে পনেরো-বিশ টাকা আমদানি হবে।

এখন আমদানিই তো নেই। ভরসা ওই রজনীর হোমিওপ্যাথি। তবু দেখে কেশব সাহুজী, ন'নম্বর মিত্তির বাড়ির রিটায়ার্ড বুড়োও আসে বেশ সেজেগুজে, পাঁচ আঙুলে ঝকঝকে আংটি, মকরমুখো ছড়ি হাতে। বুড়োর ঘোড়ারোগ এখনও যায়নি। মেয়েদের সম্বন্ধে এখনও ওর মনে ক্ষুধা রয়ে গেছে। বুড়োও নাকি রজনীর পেশেন্ট। এলেই পঞ্চাশ টাকা ভিজিট ও ওষুধের দাম বাবদ দেয়।

কেশব তবু ভাবনায় পড়ে। এক মাসের মধ্যে বকেয়া বাড়িভাড়া নশো টাকা না মেটালে ঠাকরুন ঠিক পিটিয়ে উৎখাত করে দেবে। এখন এই ভাড়ায় এতবড় বাড়ি-বাগান, এসব মিলবে না। এ তল্লাটে এখন বাড়িভাড়া হাজারের কম নেই, তাও শুয়োর-খুপরী ফ্ল্যাট। তার উপর দশ-পনেরো হাজার টাকা সেলামি। কোথা থেকে দেবে সে। ফলে দূরে কোথাও যেতে হবে এতদিনের পরিচিত এই পরিবেশ থেকে।

সেদিন কথাটা প্রকাশ করে কেশব রজনীর কাছে।

রজনীরও মন-মেজাজ ভালো নেই। ক্রমশ যেন একটা কালো মেঘের ছায়া দেখছে সে। ওই রেশন দোকান আটাচাকীর মালিক সাহুজীর মতলবটা বুঝেছে এবার। রোগ তার অজুহাত মাত্র। লোকটা আসে—তার হাত ধরার চেষ্টা করে। আজ তো নতুন শাড়িই এনেছে আর একশো টাকা। বলে—খুব ভালো আছে শরীর তোমার ওষুধে, তাই দিলাম। চলো একদিন আমার নতুন গাড়িতে ডায়মন্ডহারবার বেড়িয়ে আসবে।

কোনোরকমে তকে আজ বিদায় করেছে রজনী। একজন যায় তো অন্যজন আসে। মিত্তিরকত্তা এখন তার পেশেন্ট। হাঁপানির রোগী তবু শখ তার ষোলো আনা। এলে আর উঠতেই চায় না বুড়ো—ছেলে-বৌরা কত হেনস্থা করে, তারই পয়সা ভোগ করে তারা, এত বড় দুনিয়ায় তার আপনজন কেউ নেই, তাই এখানে আসে আপনজনের সন্ধানে ইত্যাদি ইত্যাদি। রজনী তাড়াতে পারে না। পঞ্চাশ টাকা ফিজ ও ওষুধের দাম দেয়, সপ্তাহে দু-তিনদিন। এমনি আরও দু-একটা পেশেন্ট জুটেছে। রজনীর মনে হয় সারা সমাজটাই রোগীর ভিড়ে ভরে গেছে। কারও দেহের রোগ, কারও রোগ মনের গভীরে ঘুণপোকার মতো বাসা বেঁধেছে।

রজনী এমনি বিচিত্র লোভী মানুষগুলোকে দেখে এবার চিন্তায় পড়েছে। বাবাকে বলেও লাভ হবে না। লোকটা চেনে শুধু টাকা। তার জন্য হেন কাজ নেই সে করতে পারে না। অথচ কিছুই পায়নি জীবনে, আলেয়ার পিছনে ছুটেছে আর ঠকেছে।

আর রজনীকেও ঠকাবার জন্য যেন সবাই ওৎ পেতে আছে। এ যেন ঊষর মরুভূমির কোথাও তৃষ্ণার

একবিন্দু পানীয় নেই—ছায়াতরু নেই। ধুধু রুক্ষ বালিয়াড়ি।

তবু এর মধ্যে একজনের কথা মনে পড়ে রজনীর। সে ওই কার্তিক মুখুযো, সুন্দর, মার্জিত রুচির তরুণ। তার কাছে আসে, ওষুধপত্র নিয়ে যায়। ঠিকঠাক পয়সাই দেয়। ওই মিত্তিরবুড়ো, সাহুজীর মতো পয়সার লোভ দেখায় না। তার দিকে পাগলের মতো এগিয়ে আসতেও চায় না। ছেলেটা ভদ্র-সংযত। ওকে যেন বিশ্বাস করা যায়।

আজ কার্তিক না এসে পড়লে সাহুজী তার গোবদা হাত দুটো দিয়ে যেন ভালুকের মতো জড়িয়েই ধরত রজনীকে। ভাবতেও ভয় হয়। আজ ওই কার্তিকই তাকে উদ্ধার করেছে ভালুকের কঠিন আলিঙ্গন থেকে। রজনী ভাবনায় পড়েছে, এসব তার একান্ত নিজেরই ভাবনা।

রাতের খাবার ওকেই তৈরি করতে হয়। ডাক্তারির ঝামেলা তারপর সংসার। রাতে খেতে বসে আজ কেশব বলে—খুব বিপদে পড়েছি মা।

রজনী নিজের বিপদে নিয়েই ব্যস্ত, তারপর আবার বাবার বিপদের কথা শুনে বলে—আবার কি হল? ভোটে হারবে তো।

কেশব বলে—ও তো হারবোই। এবার বাড়ি-আশ্রয়টুকুও হারাতে না হয়। এতদিন ধরে এড়িয়ে ছিলুম এবার আর এড়ানো যাবে না। বাড়িউলি ভবতারিণী ঠাকরুনের লোক আজ ধরে নিয়ে গেছল। গিন্নীমা তো সাক্ষাৎ রণচন্ডি। মেলা পয়সা, লোকজনও সব হাতের মুঠোয়। বলেছে একমাসের মধ্যে পুরো হাজার টাকা ভাড়া না দিলে জোর করে তুলে দেবে বাড়ি থেকে। মালপত্র খালের জলে ফেলে দেবে।

বলে রজনী—তাই ভালো হবে, এতদিন কি করেছ? না খেতে পেয়ে অসুখে ভুগে মা গেছে, আমাকেও মুখ বুজে অনেক অপমান সয়ে ডাক্তারির ভান করে লোক ঠকাতে শিখিয়েছ। নিজে রাজা সাজার স্বপ্নে ভোটে দাঁড়াও, বোম ফাটাও, পয়সা ছড়াও, এখন পথেই দাঁড়াবে। আর আমিও বলে দিলাম, ঢের হয়েছে, আর নয়। এবার যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। বুঝবে মজা।

কেশব হালদার আজ যেন নাগপাশে জড়িয়ে গেছে। মুক্তির কোনো পথ নেই। রাত নামে। ঘুম আসে না কেশবের। তার চারিদিকেও যেন এমনি অতল অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ঝিঁঝিঁ ডাকে।

ওদিকে রজনীরও চোখে ঘুম নেই। বারবার এই অন্ধকারে মনে পড়ে কার্তিকের মুখখানা। মনে হয় অন্ধকারে সেই তার জীবনে এতটুকু আশার আলো, আশ্বাস এনেছে।

কার্তিকেরও মনে শান্তি নেই। রজনীর মুখখানা মনে পড়ে শুধু। ফুলের মতো সুন্দর সতেজ। আর ক'দিনেই কার্তিকও যেন নিজের অজান্তেই জড়িয়ে গেছে তার জীবনে।

সেদিন দুপুরের নির্জনতার মাঝে গেছে কার্তিক রজনীদের বাড়িতে কি এক দুর্বার টানে। আমের বোলের মিষ্টিগন্ধে মিশেছে কাঁঠাল ফুলের চড়া সুবাস।

রজনী বলে—কেমন আছেন?

কার্তিক বলে ওঠে—তোমার ওষুধেই সেরে গেছে রজনী।

—তাই নাকি?

কার্তিক বলে—ওষুধও খেতে হয়নি—তোমাকে দেখেই সব অসুখ ভালো হয়ে গেছে। তুমি আমার সর্বরোগহর, ধন্বন্তরী।

রজনী দেখছে ওকে।

কোথায় উদাস দুপুরে কোকিল ডাকছে। কার্তিক বলে—কোকিলের ডাক শুনলে বুকটা কেমন করে। তোমার করে না?

রজনী বলে—কই, না তো।

—চাঁদ দেখলে কিছু হয় না? কার্তিক বলার চেষ্টা করে।

রজনী জবাব দেয়—কি হবে?

কার্তিক বলে মরীয়া হয়ে হোঁৎকার ডায়ালগটা—আমার বুকটা খাঁ খাঁ করে।

হেসে ওঠে রজনী। কার্তিক কেমন চুপসে যায়। বলে—হাসছ তুমি?

রজনী দেখছে ওকে। বলে—ওষুধ খান, সব সেরে যাবে।

এদিকে বন্ধুরাও ওৎ পেতে আছে বাইরে। শুনছে কার্তিকের কথাগুলো। কিন্তু রজনীর জবাবটা ঠিক শুনতে পায় না হোঁৎকার দল। কার্তিককে ওষুধ নিয়ে বের হয়ে আসতে দেখে তারাও এবার জোটে।

—কি বলল রে রজনী?

বলে কার্তিক—পাত্তাই দিচ্ছে না। সব তো বললাম—কোকিল; চাঁদ—হেসেই উড়িয়ে দিল, কী পাষাণ রে!

ফটিক গেয়ে ওঠে—পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম—

হোঁৎকা বলে—থাম তুই। ওই পাষাণকেই গলিয়ে দেব কেতোর জন্য।

কার্তিক রজনীর স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু পিসিমার কথা ভাবতেই কেমন ভয় হয় আজ। পিসিমা তো কেশববাবুদের তুলে দেবেই, তখন রজনীও কোথায় হারিয়ে যাবে। কার্তিক রজনীকে হারিয়ে বাঁচতে পারবে না।

তাই সেইদিন দুপুরেই এসেছে আবার কার্তিক রজনীদের ওখানে। অবশ্য বুদ্ধিটা হোঁৎকাই দেয়। বলে সে—লেগে থাক কেতো। মেয়েদের মন পেতে গেলে ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকতে হবে, যাতে আর কেউ তার ধারে-কাছে না আসতে পারে। যা রজনীর কাছে।

সাহুজী ব্যবসাদার লোক। এর মধ্যে সেও হিসাব করেছে ওই ডাক্তারনীর পিছনে প্রায় শ'খানেক টাকা চলে গেছে, এবার তাকে উশুল করতেই হবে। তাই সাহুজী এবার একটু সাহস নিয়েই বলে—কাল চল গাড়ি আনছি। স্রিফ তুমি আর আমি ঘুরতে যাবে, দুকানে চা খাবে—সিনেমা দেখবে—আংরেজি সিনেমা—ক্যা রজনী, তুমাকে আউর শাড়ি, জেবর—সবকুছ দেবে—প্যার করবে মেরে প্যারী!

রজনী চমকে ওঠে। লোকটা তাকে যেন ভালুকের মতো জড়িয়ে ধরতে চায় দুটো গোবদা হাত দিয়ে, ওর রোমশ বুকের মধ্যে। গায়ের বিশ্রী ঘেমো গন্ধ ওঠে, বোঁটকা গন্ধ।

কার্তিক বাইরে থেকে ঘরটায় ঢুকে পড়ে।

ওকে দেখেই সাহুজীর আবেগ থেমে যায়। চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো অবস্থা ওর। সাহুজী ভাবেনি ওই ছেলেটা এখানে আসবে এই সময়। বলে সাহুজী—অব চলে ডাক্তারজী। পিছু আসবে।

সাহুজীকে চলে যেতে দেখছে ওকে কার্তিক। সেও ভাবতে পারেনি যে ওই লোকটা এইভাবে ওকেও পেতে চায়।

রজনীর সারা মনে আতঙ্কটা এবার অসহায় অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে। বলে রজনী—ওই লোকটি রুগী সেজে এসে এইভাবে অপমান করতে চায়। আজ আপনি না এসে পড়লে কি যে করত লোকটা কে জানে! ও একটা ধূর্ত লোভী জানোয়ার। আপনিই আজ বাঁচিয়েছেন। এরপর কি হবে জানি না।

কার্তিক অবাক হয়। খুশিও হয় এই ভেবে যে রজনী তাকে বিশ্বাস করে। হয়তো ভালোও বাসে। কার্তিকও বুঝেছে তার ওপর নির্ভর করে রজনী। কার্তিকেরও যেন একটা কর্তব্য আছে ওই মেয়েটির জন্য।

বলে কার্তিক—কোনো ভয় নেই রজনী। সাহুজী আর তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমার বাবা এসব জানেন?

রজনী বলে—বাবা যদি মানুষ হত—আমার জীবনটা এভাবে বরবাদ হত না। বাবা চেনে শুধু টাকা। কিন্তু সেই টাকাও রোজগার করার মুরোদ নেই, শুধু ঠকেই গেল। বাড়িওয়ালাও এবার তাড়াবে বলেছে—দশ মাসের ভাড়া বাকি। এদিকে সংসার চলে কি করে, বাবা তার খোঁজও রাখে না। আমার হয়েছে জ্বালা।

কার্তিক আজ রজনীর মনের অনেক কাছাকাছি এসে গেছে, তার জন্য কিছু করা দরকার। কিন্তু সমস্যা পিসিমাকে নিয়ে। পিসিমা কেশবকে তাড়াবেই।

রজনীদের বাঁচাতে হবে।

বাঁচার জন্য কেশব হালদার এবার তার নিজস্ব বিদ্যাটাকেই কাজে লাগিয়েছে। কেশব হালদার এমনিতে

জ্যোতিষচর্চা করত মুহুরীগিরির সঙ্গে।

জ্যোতিষেও তার নামডাক হচ্ছিল। তারপর ওসব ছেড়ে রাজনীতি করতে গেছল। কিন্তু হালে পানি না পেয়ে আবার ওই বাড়ির সামনের চালায় সাইনবোর্ড লটকায়—

জ্যোতিষ কার্যালয়

সামুদ্রিক জ্যোতিষশাস্ত্রী

পণ্ডিত কেশবচন্দ্র দেবশর্মণঃ

জ্যোতিষার্ণব।

এদিকে ডাক্তারখানা আলো করে আছে রজনী, ওদিকে জ্যোতিষ কার্যালয়ে সমাসীন কেশব হালদার অন্য মেকআপে।

কেশব হালদার এখন অন্য মানুষ। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, লুঙ্গি। কপালে সিঁদুরের টিপ। থুতনিতে ছাগলদাড়ি।

সাহুজী এবার মরীয়া হয়ে এগোতে চায়, ওদিকে ঘরওয়ালীর কানেও খবরটা পৌঁছে গেছে। আজ সাহুজীকে তার রাজপুতানীও বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করেছিল— কাঁহা যাতা রে তু? কৌন সে ডাক্তারনী?

সাহুজী খবরটা শুনে চমকে ওঠে। বলে সে—কি আনসান বলছিস এ রুকমোতিয়া। তুহার কো ছোড়কে সারা দুনিয়ায় আপনার দুসরা কৌই না আছে।

—থাম বিল্লি কাঁহিকা! বিল্লি কভি চুহাঁ খানা ছোড়বে না। তু ভি এইসা।

এইভাবে প্রথম পর্ব শুরু, তারপর রুকমোতিয়া তার পতিদেবতার চরিত্র সংশোধন করার জন্য মাত্র হাতের লোটা দিয়ে কয়েকটা মৃদু আঘাত করেছে।

রাজপুতানীর ওই মৃদু আঘাতে সাহুজীর কপাল ফুলে ওঠে আমড়ার আঁটির মত। আর শাসায় বাজপুতানী—ফেব ওদিকে গেলে টেংবি তোড়ে দিবে তুহার।

সাহুজীর মনের অবস্থা ভালো নেই। তাই জ্যোতিষ মহারাজের কাছেই এসেছে। কেশব হালদার অবশ্য ঘুঘু ব্যক্তি! কথায় আছে 'প্রতিভা যাহাকেই স্পর্শ করে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে'। কেশব জ্যোতিষ-ব্যবসা ধরার পর থেকেই তার দু-একজন চর-অনুচর এলাকার বেশ কিছু খবর আনে। আর সাহুজীর হালফিল খবরই এনে দেয় তারা।

কেশব তাই সাহুজীকে এক পলক দেখল। বলে—খুব দুঃসময় যাচ্ছে তোমার সাহুজী, মঙ্গল বক্রী, তাই ঘরে স্ত্রী কুপিতা। বশীকরণ চাই।

সাহুজীকে একেবারে ডাইরেক্ট হিট।

বলে সে চোখ ছলছল করে—কুছ উপায় করিয়ে পণ্ডিতজী।

—হবে। উচাটন বাণ হানবো। কোনো ভয় নেই। কবচ দিচ্ছি—অর্ডিনারী একুশ টাকা, স্পেশাল একান্ন টাকা—আর একস্ট্রা স্পেশাল—হাতমে হাতমে ফল মিলেগা—একশো এক রুপেয়া। ঘরবাসী একদম শান্ত হয়ে যাবে।

সাহুজী ট্যাক থেকে দলাপাকানো শ'রুপেয়ার বাণ্ডিল থেকে একটা একশো টাকার নোট আর ফতুয়ার পকেট থেকে একটা টাকা বের করে কেশবের সামনে রেখে বলে —ওহি একস্ট্রা ইস্পিশাল কবচই লিব আমি।

—জয় শিবশম্ভু। কেশব খুশিতে হাঁক পাড়ে।

মাত্র একশো টাকার জোগাড় হল ঠাকরুনের, বাকি টাকার জোগাড় নেই। অথচ সাত দিনের মধ্যে ভবতারিণী ঠাকরুনের হাজার টাকা না দিতে পারলে রক্ষা থাকবে না।

হঠাৎ রিকশা থেকে ছেলেটিকে নামতে দেখে চাইল কেশব। আজ যেন দিনটা ভালোই যাচ্ছে তার। সাহুজীর পরই দ্বিতীয় মক্কেল আসছে। বেশ শাঁসালো পার্টিই।

কার্তিক রজনীগন্ধার ভালো চায়, ওদের এখান থেকে চলে যেতে দেবে না সে। কিন্তু রজনীগন্ধাদের

অবস্থাও সব জানে সে। তাকে সোজাসুজি টাকা বেশি দিতে সাহস নেই কার্তিকের। যে তেজী মেয়ে, যদি তার মতলব ধরে ফেলে চটে ওঠে!

তাই কার্তিক ভেবেচিন্তে এই মতলবটা করেছে।

কার্তিককে দেখে কেশব একটু ঘাবড়ে যায়। এই নতুন ছোকরাকে পথেঘাটে দেখেছে মাত্র। ঠিক এর হাল সাকিন—অন্য খবর জানে না। তার খবর দেবার লোকরাও এর সম্বন্ধে কোনো খবরই দেয়নি। তাই একটু বেকায়দায় পড়ে কেশব জ্যোতিষার্ণব।

কার্তিক বলে—একটা গোলমালে পড়ে এসেছি। মানে বিষয়-আশয় নিয়ে গোলমাল। আত্মীয়গুষ্ঠী আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে চায়। দয়া করে উদ্ধার করুন এই বিপদ থেকে।

কেশব বুঝেছে পার্টি শাঁসালো। তাই বলে—বসো। কোনো ভয় নেই। কোষ্ঠি আছে?

কার্তিক সেদিকে তৈরি হয়েই এসেছিল। পকেট থেকে কোষ্ঠিটা বের করে দেয়।

কেশব বলে —আমার ফিজ জানো তো? একান্ন টাকা।

কার্তিক অবশ্য জানে। টাকা দিতেই এসেছে সে। তাই বলে—খরচের জন্য ভাববেন না। দুশো-পাঁচশো-হাজার যা চাইবেন দেব। শুধু আমার কাজ যেন হয়।

পাঁচশো, হাজার টাকার গন্ধ পেয়ে কেশব এবার গন্ধগোকুলের মতো আনচান শুরু করে। বলে কেশব—কোনো ভয় নেই। আমার কাছে এসেছ। কোষ্ঠি দেখে বলে কেশব গম্ভীরভাবে—শত্রুপক্ষ উঠেপড়ে লেগেছে। তোমাকে উৎখাত করতে চায়। একেবারে শনি সপ্তমে—বুকের উপর কোপ! কঠিন ব্যাপার হে।

কার্তিক ইদানীং হোঁৎকার আড্ডায় আসার সময় পাচ্ছে না। রজনীগন্ধার সঙ্গেই কিছুটা সময় কেটে যায়। ওদিকে পিসিমার ব্যবসার কাজকর্ম -তাগাদাপত্র ঠিকই করতে হয়। এসব করে হোঁৎকাদের ওখানে যাওয়া হয়নি কার্তিকের। তার ওপর পিসিমার কোপ থেকে এই পরিবারকে বাঁচাতে হবে।

তাই ব্যস্ত কার্তিক।

ওদিকে হোঁৎকা-ফটিক-কেষ্টর দল খবর রাখছে সবই। কেষ্টই সেদিন হোঁৎকাদের জানায়—মাল এখন ডাক্তারনীর রোগী হয়ে গেছে। কি রোগে ধরেছে কেতোকে কে জানে।

হোঁৎকা এদের মধ্যে বেশি বুদ্ধিমান। তাই বলে সে—প্রেমরোগ! ব্যাটা কেতোকে প্রেম রোগে ধরেছে এবার। সব রোগ সারে, এ রোগ ডাক্তারের বাবারও সাধ্যি নেই সারায়।

ফটিক চমকে ওঠে—বলিস কি রে? ডাক্তারেও সারাতে পারে না?

হোঁৎকা বলে—ডাক্তার মানে ওই ডাক্তারনী ব্যাটা কেতোর প্রেমে পড়েছে কিনা দ্যাখ, তাহলে কেস গড়বড়।

কেষ্ট বলে—কোতো কিনা লভ করছে ওই বোমারু কেশবের মেয়ের সঙ্গে? কি হবে র‍্যা! ওর বাপটা তো ডেঞ্জারাস মাল। ইদানীং ভোটে চিৎপটাং হয়ে জ্যোতিষ কার্যালয় খুলেছে।

হোঁৎকা বলে—গ্যাঁড়াকল খুলেছে। মেয়ে যেমন ডাক্তার, বাপ তেমনি জ্যোতিষার্ণব। শালা জ্যোতিষ অর্ণব সমুদ্র নয়, পচা ডোবা রে, শেষে কেতো ডুবল ওই ডোবায়।

ফটিক বলে—বাপ ডেঞ্জারাস হতে পারে মানলাম, মেয়েটা খুব ভালো রে। সুইট—রজনীগন্ধা বড় ভালো।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—চোপ। এদিকে আমাদের কেতোকে সরিয়ে নিয়ে ক্লাবকে বিপদে ফেলেছে—আর তুই বলিস ভালো! কেতোর প্রেমের দাওয়াই আমিই দেব। চল তো দেখে আসি ব্যাটা কেতোকে।

কার্তিককে তখন কেশব হালদার বেশ জম্পেশ করে গেঁথেছে। ছক-ফক এঁকে অং বং বলে শোনায়—বৃহৎ শত্রুসংহার হোম করতে হবে। প্রায় পনেরোশো টাকা খরচ, অন্যথায় কোনো বিধান দেখি না।

কেশব বাড়িভাড়া মিটিয়ে কিঞ্চিৎ প্রফিট রেখেই দরটা হেঁকেছে।

কার্তিকের বাজেট হাজারখানেক টাকা। ওই বাড়িভাড়ার টাকাটাই এনেছে সে।

তাই কার্তিক বলে—আজ্ঞে হাজার টাকার বেশি হলে পারবো না। যা হবার হোক!

বলে কেশব—সম্পত্তি-বিষয় চলে যাবে।

—যায়, যাক। আর নেই। কার্তিক উঠতে যাবে।

কেশব এবার প্রমাদ গণে। ওর কি যাবে জানে না কেশব, তবে তার যে এই বাড়িতে থাকাই ঘুচে যাবে সেটা জানে। তাই কেশব রফা করে।

—ঠিক আছে। এখন হাজারই দাও। হোম কবচ দিই—কাজ হলে তখন খুশি করে দিও।

কার্তিক টাকাটা দিতে এবার কেশব হুঙ্কার ছাড়ে—জয় শিবশম্ভু। আজ অমাবস্যার রাতেই তোমার কাজ করছি। কাল সকালে এসো—কিছু না খেয়ে স্নান করে আসবে, কবচ ধারণ করে যাবে। সব বিপদ কেটে যাবে। আজ উঠি—সব আয়োজন করতে হবে।

কেশব হালদারের পকেটে নগদ এগারোশো মুদ্রা। কেশবের মেজাজটাও তাই গরম। এবার মেকআপ বদলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বের হয়, ভবতারিণীর বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যার পর মন্দিরে আরতি সেরে ভবতারিণী এবার হরিনামের ঝুলি নিয়ে বসে সেরেস্তায়। লোকে বলে ওই ঝুলি থেকেই ভবতারিণীর বদবুদ্ধি-কূটচালগুলো বের হয়, সেই চালে ব্যবসা-হিসাবপত্র চলে।

গুপী সরকার জাবেদা খাতা নিয়ে গিন্নীমাকে সারদিনের আয়, ব্যয়, আমদানির খবর শোনায়। কম আমদানি হলে জেরা শুরু করে। কেন কম হল—কে যায়নি আদায়ে। কারখানায় মাল কম তৈরি হল কেন? চাবিদিকে ওর কড়া নজর।

এমনি সময়ে কেশব হালদারকে আসতে দেখে চাইল ভবতারিণী। বলে ভবতারিণী—টাকা মকুব হবে না। সরকার মশায় চারদিন গেছে—আছে আর তিনদিন। তাবপরই উৎখাত করে দাও এটাকে।

কেশব হালদার এবার পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে বলে—মা ঠাকরুন, ভাড়াটা জমা করে রসিদ দিতে বলুন। হাজার টাকা পুরো আছে।

ভবতারিণী অবাক হয়, সরকাব টাকাটা গুনে বলে—রসিদ দিচ্ছি।

ভবতারিণী শুধায়—সরকারমশাই, কার্তিক তাগাদা থেকে ফেরেনি?

সরকার বলে—আজ্ঞে ব্যারাকপুর গেছে তাগাদায়, ফিরতে দেরি হবে।

কার্তিক সুযোগেব অপেক্ষাতেই ছিল। কেশব হালদারকে মেকআপ বদলে বের হয়ে যেতে দেখে এবার কার্তিক এসে জোটে এবাড়ির অন্দরমহলে।

রজনী সন্ধ্যার পর কুটনো কুটতে বসেছে, কার্তিককে দেখে চাইল। রজনীর মনমেজাজ ভালো নেই। এতদিন এখানে ছিল। এবার কয়েকদিন পরই এই বাড়ি—এই পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কার্তিক বলে—চুপচাপ বসে আছ রজনী?

রজনী বলে—ভালো লাগছে না কিছু কার্তিকবাবু।

—কেন? দরদী কণ্ঠে শুধোয় কার্তিক—কি হল?

রজনী বলে—এখান থেকে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ আমি ভাবতেই পারছি না। তোমাকেও ছেড়ে চলে যেতে হবে, বাবা ভাড়া দিতে পারেনি।

কার্তিক আজ সেই সমস্যার সমাধান করেছে। তবু কথাটা পরিষ্কার করে বলতে পারে না। বলে কার্তিক—দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে রজনী।

রজনী বলে—কি করে হবে?

কার্তিক শোনায়—ঠাকুরকে ডাকো। তাঁর দয়া হলে সবই সম্ভব।

হাসল রজনী, ম্লান বিষণ্ণ হাসি।

ওই হাসিতেই কার্তিকের বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বলে কার্তিক—এত ভেব না রজনী। ঠিক ব্যবস্থা হবেই। একটু চা খাওয়াবে?

রজনী চা চাপায়।

হোঁৎকা-কেষ্ট-ফটিক এসেছে এখানে কার্তিকের খোঁজে। সন্ধ্যার পর বাগানে অন্ধকার যত নামে, ওই দিকের জলা-ঝোপের মশার দলও তত দল বেঁধে এদিকে এসে সুরলহরী তোলে। আর অন্ধকারে ওই তিনমূর্তিকে দেখে মশার দল আজ রক্তের গন্ধে আরও মেতে উঠে জোরদার আক্রমণ শুরু করেছে একসঙ্গে তিনজনের ওপর।

জানালার পাল্লাটা খোলা—তিনমূর্তি ঘরের মধ্যে অল্প আলোয় দেখে কার্তিক বেশ যুৎ করে বসে গরম চা আর কি আরাম করে খাচ্চে।

রজনীও এখন অনেকটা সহজ হয়েছে। বলে সে—কার্তিকদা—যেখানেই থাকি আসবে কিন্তু। ভুলে যাবে না আমায়।

কার্তিক গদগদ কণ্ঠে বলে—তোমাকে ছেড়ে আমি তো বাঁচতে পারব না রজনী। আমি তোমায় ভালোবাসি।

আজ রজনীকে সাহস করে সে কাছেই টেনে নেয়। রজনীও ওর নিবিড় ছোঁয়ায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

বাইরে তিনমূর্তি তখন গুঁতোগুঁতি করে জানালার রড ধরে তন্ময় হয়ে ওই দৃশ্য দেখছে।

কেষ্ট বলে—কি মশা রে! সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিল।

হোঁৎকা বলে ওঠে—কেতোর বরাত দ্যাখ, শালা লগন-চাঁদা, ডাক্তারনীকে কেমন পটিয়ে চা-টা খাচ্ছে, আমরা খামোকাই মশার কামড় খেয়ে জ্বলে মলাম।

ফটিক শোনায়—বলিনি রজনীগন্ধা কেমন ভালো রে, খুব সুইট। কেতোর সঙ্গে যা মানাবে না!

হোঁৎকা থামায় তাদের—এ্যাই, চোপ।

রজনী-কার্তিক জানে না এদের খবর। ওরা দুজনে তখন তাদের স্বপ্ন নিয়েই ব্যস্ত। আজ কার্তিকের জীবনের যেন পরম স্মরণীয় একটা দিন।

খুশিভরে বের হয়ে আসছে কার্তিক। আবছা জ্যোৎস্না উঠেছে। বাগানে কাদের দেখে চাইল। যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয় ওই তিনমূর্তি।

হোঁৎকা বলে—ব্যাটা ক্যাচ কট কট। এ্যা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস কেতো।

কেষ্ট বলে—সাবাস। লড়ে যা কেতো। আমরা তোর পাশে আছি।

হোঁৎকা বলে ওঠে—তা তো থাকলি। ওর পিসিমা যদি জানতে পারে—

চমকে ওঠে কার্তিক। বলে সে—ওরে বাব্বা। সব্বোনাশ হবে রে! একেবারে আউট করে দেবে।

হোঁৎকা বলে—কিন্তু একদিন তো বলতেই হবে। রজনীকে ভালোবাসিস—জানতে পারে যদি পিসিমা!

কার্তিক বলে—কি হবে হোঁৎকা। রজনীকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব নারে। ওর জন্য আমি সব করতে পারি। মরতেও রাজী।

কেষ্ট বলে—এ তো আর এক সমস্যা হল রে।

হোঁৎকা শোনায়—সমস্যার সমাধান করতেই হবে। তবে এসব কথা এখন যেন কাকপক্ষীতে টের না পায়। চুপচাপ থাকবি সবাই।

কেষ্ট বলে—রজনী তোকে ভালোবাসে?

কার্তিক বলে—খুবই। তবে ওই রেশনওয়ালা সাহুজী বড্ড জ্বালাতন করছে ওকে।

হোঁৎকা বলে—বলিস কি রে!

কেষ্ট জানায়—রজনীকে বলিস ও আর জ্বালাবে না। ওর ব্যবস্থা কালই করছি, আসুক বেটা। কার্তিকের পথের কাঁটা আমরাই নির্মূল করে দেব।

কেশব আজ খুশি মনে বাড়ি ফিরছে। হাতে একটা ইলিশ মাছ। ওটা এনেছে সাহুজীর একস্ট্রা স্ট্রং কবচের থেকে। বাড়ি ঢুকে রজনীকে বলে—ইলিশ মাছটা বেশ গরগরে করে ঝাল কর।

রজনী অবাক হয়। বলে—এদিকে বাড়িভাড়া জোটে না—ইলিশ খাবে?

কেশব বলে বুক টান করে—ওসব মিটিয়ে দিয়েছি। দ্যাখ একেবারে কারেন্ট রসিদই আনলাম।

রজনী বিশ্বাস করতে পারে না। রসিদটা দেখে চাইল।

কেশব বলে—দেখলি তো। এবার জমিয়ে প্র্যাকটিস কর—আমিও জ্যোতিষচর্চা করি। এককাপ চা দে—ততক্ষণে কাজটা সেরে ফেলি।

পকেট থেকে দুটো মাদুলি বের করে কেশব। দেখছে রজনী। কেশব খুশিতে গুনগুন করছে আর ওই মাদুলি দুটোতে উঠোনের থেকে শুকনো পাতা মাটি নিয়ে পুরে এবার মোম দিয়ে মাদুলি দুটোর মুখ বন্ধ করে বলে—এটা একস্ট্রা স্ট্রং উচাটন মাদুলি, আর এটা হচ্ছে শত্রুবিনাশন হোমের কবচ!

রজনী বলে—এভাবে লোক ঠকিয়ে লাভ কি বাবা?

হাসে কেশব—এ জগতে তুই কাউকে না ঠকালে নিজেই ঠকবি মা। জয় শিবশম্ভু।

সাহুজী পরদিন সন্ধ্যার পরই ডানহাতে লাল সুতোয় বাঁধা একস্ট্রা স্ট্রং উচাটন মাদুলি পরে এসেছে ডাক্তারনীর কাছে।

কেশব বের হয়েছে কোনো ধান্দায়। তাই লাইন ক্লিয়ার দেখেই এসেছে সাহুজী রজনীর কাছে, মনে সাহস আর বুকে বল নিয়ে।

রজনী একাই বসেছিল। ডাক্তারখানা বন্ধ করার মুখে সাহুজীকে আসতে দেখে বলে—কাল আসবেন।

সাহুজী বলে—বুকে বহুৎ ব্যথা রজনীজী। বহুৎ ব্যথা—ইখানে।

একেবারে গোবদা ভালুকের মতো রজনীকে সাপটে ধরে। ছটফট করছে রজনী। ইয়া গোল চাকার মতো মুখ—তাতে শক্ত ঝাঁটার মতো খাড়া খাড়া গোঁফ আর মুখে জর্দা খৈনির বিশ্রী দুর্গন্ধ, যেন অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে।

সাহুজী আজ যেন রাজ্য জয় করতে চলেছে। খুশিতে গদগদ হয়ে বলে—মেরে প্যারী, মেরে জান—তুহারকে হামি বহুৎ সাবা রুপেয়া, তামাম রেশন দিবে। শাড়ি-জেবর—

কথাটা শেষ হয় না। হঠাৎ বাইরে একটা বোম ফাটার শব্দ ওঠে। তারপর আর একটা।

ওই শব্দে আর ধোঁয়ার জ্বালায় সাহুজীর প্রেমপর্ব থমকে গেছে। এবার খেয়াল হয় তার কোমরের গেঁজিয়ায় ফুড কর্পোরেশনের গুদামে জমা দেবার জন্য প্রায় বিশ হাজার টাকা রয়েছে—ক্যাশ।

প্রেম রইল শিকেয় তোলা। প্রেমিকের চেয়ে এখন নিজের জান বড়, তার চেয়ে বড় ওই টাকা। জান যায় যাক—টাকা যেন থাকে।

সাহুজী নিমেষের মধ্যে রজনীকে ছেড়ে দিয়ে এবার খিড়কির দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যেই বাগান-বনবাদাড় ভেদ করে মত্ত হাতির মতো বিশাল দেহ নিয়ে দৌড়চ্ছে।

হোঁৎকা-ফটিক-কেষ্টচরণ-মদনরা নজর রেখেছিল রজনীদের বাড়ির ওপর। একা পেয়ে সাহুজীকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দেখে তারা বুঝেছিল সাহুজীর মতলব ভালো নয়। কার্তিকের সঙ্গে রজনীর প্রেমপর্বের খবর শোনার পর থেকে ওদেরও রজনীকে রক্ষা করার দায়িত্ব এসে গেছে। আর সাহুজীকে আজ শিক্ষা দেবার জন্যই তারা ওইভাবে আক্রমণের মহড়া দিয়েছে।

ওরাও দেখেছে বনবাদাড় ভেদ করে সাহুজীকে দৌড়তে—ওরা পিছনে আওয়াজ দেয়—দু-একটা পটকাও ফাটায়, সাহুজী দিশেহারা হয়ে দৌড়চ্ছে। কোন্‌দিকে কোথায় যাচ্ছে সেও জানে না—হঠাৎ অবিষ্কার করে সাহুজী, উঁচু পাড় থেকে সে নিচের কোনো কচুরিপানা ভর্তি ডোবার জলকাদায় এসে আছড়ে পড়েছে। ভারী দেহ। তারই ওজনে পা দুটো নরম কাদায় হাঁটু অবধি দেবে গেছে। আর ওই থিকথিকে পচা হিম জলে পড়ে সাহুজী আটক।

প্রেম করায় যে এমনি খেসারত দিতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি সে। কাদা পাঁক থেকে যতই ওঠার চেষ্টা

করছে ততই দেবে যাচ্ছে সে। ভিজছে কোমরের গেঁজিয়ায় এত এত টাকার নোট, আর পচা জলে হালুস লেগে এবার শ্রীঅঙ্গে চুলকানি-জ্বালা শুরু হয়েছে।

হোঁৎকার দল ওইভাবে একটা ডোজ দিয়েই আজ সাহুজীকে পালাবার সুযোগ দিয়েছে।

হোঁৎকা বলে, এতে কাজ না হলে ব্যাটাকে মোক্ষম দাওয়াই-ই দেব। কার্তিকের বাড়া ভাতে ছাই দেবে?

কেষ্ট বলে—আমাদের চেনে না?

ব্যাপারটা রজনী কিছু বুঝতে পারে না। প্রথমে সেও ভেবেছিল চোর-ডাকাতই হবে। লুঠপাটের মতলবে এসেছে। কিন্তু তারপর দেখে আর কেউ আসে না—সাহুজীও তাকে ছেড়ে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল জানপ্রাণ নিয়ে।

রজনী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। হঠাৎ অন্ধকারে বাগানের দিকে থেকে কানে আসে কাদের ওই কথাগুলো।

কার্তিকের জন্যই তাকে বাঁচাতে আজ ওই ছায়ামূর্তির দল সাহুজীকে আক্রমণ করে তাড়িয়েছে। রজনীর মনে হয় একজনও তার জন্য ভাবে। ওই কার্তিকের দলবলই আজ তাকে চরম অপমান, লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

কেশব হালদারের ভাগ্যের চাকাটা যেন এখন কিছুটা মসৃণ গতিতে ঘুরছে। তার ভোটে দাড়ানোটা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য এতদিন কেউ আসেনি। আজ ভুষিমালের আড়তদার, চিটেগুড়ের হোলসেলার গদাই মোষ নিজে ডেকে বলে—কেশববাবু, ভোটে দাঁড়িয়েছি। এখন আপনি যদি না দ্যাখেন তাহলে তো গোহারান হেরে যাবো। গরীবকে একটু দেখুন।

গদাই মোষের দু-পুরুষের ব্যবসা ওই চিটেগুড় আর ভুষি-আলকাতরার। বিরাট পিচ-আলকাতরার গুদাম—ওদিকে চিটেগুড়ের বিশাল আড়ত। মোটা মুষকো ইয়া দশাসই চেহারা, আর তেমনি কুচকুচে কালো। বদলোকে.বলে—গদাই-এর গা ঘামলে যা বের হয় তা ঘাম নয়—আলকাতরাই। অবশ্য এটা রটনা মাত্র। তবে গায়ে বোটকা চিটেগুড়ের গন্ধ। পথ দিয়ে যখন চলে তখন মনে হয় একটা কালো পাথরের স্তূপই চলেছে কাপড় জড়িয়ে।

এ হেন গদাই মোষ এবার কর্পোরেশনের ভোটে দাঁড়িয়েছে। আর হোঁৎকার পাড়ার লোক। ওদের ক্লাবেও ভালো ডোনেশান দেয়। কার্তিককেও চেনে। কার্তিকের মাথাতেই মতলবটা আসে। হোঁৎকাকে বলে—তুই গদাই মোষকে বল—হাজারখানেক ভোটার পকেটে এসে যাবে যদি ওই কেশব হালদারকে বসাতে পারে ওর ফেভারে।

কেষ্ট বলে—যেমন কেশব তেমনি গদাই মোষ। দুটোই হারা পার্টি।

হোঁৎকার মাথায় বুদ্ধিটা খেলে যায়। বলে সে—হারুক ব্যাটারা। কেশবের দুপয়সা আসবে—আমাদের শতকরা কুড়ি করে কমিশন। গদাই মোষের ভোটে কাজ করার দরুনও হাজার পাঁচেক। ক্লাবের ঘরটা পাকা হয়ে যাবে।

গদাই মোষও কার্তিক-হোঁৎকাদের মুখে নিদেন এক হাজার পকেট ভোট পাবার জন্য তার লাখ লাখ দুনম্বরী টাকার থেকে মাত্র হাজার বিশেক টাকা দেবার জন্য তখুনিই রেডি হয়ে যায়।

কার্তিক এসেছে রাতের অন্ধকারে সেই খবর দিতে কেশব হালদারের বাড়িতে। কেশব ওই গদাই মোষের কথা শুনে খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে। সর্বস্ব চলে গেছল ভোটের ফাটকা-বাজিতে। এবার সেটা ফেরৎ আসছে।

কেশব হালদার বলে কার্তিককে—বড় উপকার করলে বাবা, ওরে ও রজনী—

রজনী ওদিক থেকে বাবার ডাকে এসে হাজির হয়। এত রাতে কার্তিককে দেখে অবাক হয় সে। কেশব বলে—ওরে রজনী, বলিনি ভগবান আছেন—

রজনী গম্ভীরভাবে শোনায়—তা উনিই কি তোমার বর্তমান ভগবান?

কেশব বলে—তোর সবতাতেই হাড়জ্বালা করা কথা। এ কে জানিস? কার্তিক—আমার মক্কেল। বাবা

কার্তিক, তুমি কিছু মনে কোরো না, মেয়ে আমার মস্ত ডাক্তার। খুব বিজি কিনা! হ্যাঁ রজনী, কার্তিক এত বড় সুখবরটা আনল, ওকে একটু চা খাওয়া।

কার্তিকও না চেনার ভান করেই বলে—না, না। এত রাতে চা খাব না। ওঁকে কষ্ট করতে হবে না।

কেশব বলে—তাহলে বাবা কার্তিক, চলো। গদাইবাবু তো এখন বাড়ি ফিরেছেন, দরটর ফাইনাল করে পাকা কথা বলে আসি। শুভস্য শীঘ্রম্।

কার্তিক বলে—চলুন।

কেশবের মনমেজাজ আজ খুশি। এর মধ্যে গদাই মোষকে কায়দা করে হাজার দশেক টাকা খসিয়েছে কেশব। আর গদাইয়ের ভোটে প্রধান কর্মকর্তা বাবদও পাঁচ হাজার আগাম পেয়েছে। ভোটের আগে অবধি বেশ তাল মিলিয়ে চলতে পারলে মোষ মশাইয়ের চিটেগুড়ের কিছু দুনম্বরী টাকা কেশবের পকেটে আসবে।

বাজার থেকে আজ বেশ আনাজপত্র, নধর ইলিশ মাছ কিনে ফিরছে কেশব, পথে হঠাৎ কম্বলজড়ানো ভালুকের মতো মূর্তিটা তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে গর্জে ওঠে, তুম জুয়াচোর হ্যায়! ঠক্—

অবশ্য কেশবের এসব কথা শোনা অভ্যাস আছে। কিন্তু নতুন এই মূর্তিটাকে দেখে প্রথমে ঠাওর করতে পারে না, পরে চিনতে পারে।

—আরে সাহুজী! একি হাল হয়েছে?

সাহুজীকে দেখে চেনাই যায় না। সেই পচা ডোবার হালুসের কামড়ে গা-হাত-মুখ ফুলে দাগড়া দাগড়া হয়ে গেছে, মাথার চুলে জমানো পাঁক তুলতে স্রেফ ন্যাড়া হতে হয়েছে। আর বেশ ক'দিন দারুণ জ্বরে ভুগে বেচারা নাজেহাল হয়ে গেছে। প্রেমরোগ ছুটে গেছে। সেই রাতে কোনোমতে বাপুজি প্রাণটা নিয়ে ফিরেছে।

সাহুজী গর্জে ওঠে। তুম একস্ট্রা ইসপিশাল কবচ দিলে—শো রুপেয়া বারবাদ। জানসে কোনোমতে বেঁচে এসেছি- ডাকাতদের হাত থেকে। ওয়াপস্ করো রুপেয়া—

কেশব বলে—চটছ কেন সাহুজী, তোমার নির্ঘাৎ মৃত্যুযোগই ছিল। নেহাৎ ওই কবচের জোরে প্রাণে বেঁচে গেছ। আমাকে খুশি করবে—তা নয়, দাম ফেরৎ চাইছ! গালমন্দ করছ!

সাহুজী কথাটা ভাবেনি এভাবে। যা বোম ফাটছিল মরেই যেত, তবু বলে সাহুজী—ওসব বাত ছোড়ো। তোমার জ্যোতিষী হামি মানে না। রুপেয়া দেনে হোগা!

লোক জুটে গেছে গোলমাল শুনে। আর সেই ভিড়ের মধ্যে হোঁৎকার দলবলও এস গেছে। তারা সাহুজীর ব্যাপারটা জানে। সাহুজীও কেশবকে ঠেসে ধরেছে। বিপন্ন কেশব। জীবনে একশো কেন—একটা পয়সা সে কাউকে দেয়নি। এখন যদি ওই টাকা দিতে হয়, হার্টফেল করবে সে। সাহুও কঞ্জুস। টাকা তার চাইই।

এবার হোঁৎকা বলে—সাহুজী, টাকা উনি দেবেন, কিন্তু ওখানে রাতের বেলা কেন গেছলে, কি করেছিলে সব জানি। রজনী ডাক্তারনীকে তোমার ঘরবালীর কাছে পাঠাই—

এবার সাহুজী চমকে ওঠে। তার ঘরবালীকে এসব কথা বললে কি হবে তা জানে সে। তার সেই রাজপুতানী গিন্নী তাকে আস্ত রাখবে না। হাড়মাস আলাদা করে দেবে।

সাহুজী বলে—আরে, উসব বাত কেনে?

—টাকা নেবে, বাতচিৎ হবে না? তাহলে আজই—

সাহুজী বলে ভীতকণ্ঠে—ব্যাস! ব্যাস! দুনিয়াই দুশমনিতে ভরে গেল। নেহি লেবে রুপেয়া। এ কেশবজী—যাও!

এত সহজে কেশব ছাড়া পাবে ভাবেনি। তাই হোঁৎকার দলের কাছে সে কৃতজ্ঞ। কেশব বলে—তোমাদের তো এখানেই দেখি। বেশ সৎ, পরোপকারী। ত বাবা—গদাইবাবুর হয়ে ভোটে কাজ করো। তোমাদের খুশি করে দেব।

কেষ্ট বলে—পাঁচ জনের পাঁচ হাজার চাই।

কেশব বলে—এসো বাড়িতে। কথাবার্তা হবে।

হোঁৎকার দল এখন কেশবের জ্যোতিষ কার্যালয়-কাম-গদাইয়ের ভোটের অফিসে এসে, গদাই ঘোষের পয়সায় চা-চপ ধ্বংস করে। কেশবও এখন ওদের উপর নির্ভরশীল।

কার্তিকও আসে। তবে কাজের ফাঁকে কার্তিক চলে যায় রজনীর চেম্বারে, না হয় বাড়িতে। এখন কার্তিকও স্বপ্ন দেখছে রজনীকে নিয়ে। রজনীরও মনে হয় তাদের পায়ের তলে মাটি চাই আর তার জন্য কার্তিককেই মনে হয় যোগ্য পাত্র। দুজনে এখন লেকের দিকেও বেড়াতে যায়। সবুজ নির্জনে দুজনে হারিয়ে যেতে চায়।

কিন্তু কার্তিকের জীবনে যত এগিয়ে আসছে রজনী, কার্তিকের ভয়টা ততই বাড়ে। পিসিমার কানে যদি কথাটা ওঠে, সমূহ বিপদই হবে।

কিন্তু এবার রজনীও চাপ দেয়।

—কি গো—বিয়ে-থার ব্যবস্থা করো।

মেয়েদের ওই স্বভাব। আদর দিলেই মাথায় চড়ে বসতে চায়। প্রেম-ট্রেম—ইয়ে-টিয়ে একটু কর। তা নয়—একেবারে ঘাড়ে চাপতে চায় পেত্নীদের মতো।

কার্তিকও বিপদে পড়ে। এবার হোঁৎকাদেরই বলে—কি হবে হোঁৎকা! রজনী বিয়ে করতে বলছে।

কেষ্ট বলে—এ তো সুখবর রে। বিয়ে করে ফ্যাল।

চমকে ওঠে কার্তিক—তারপর! পিসিমা জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে! দূর করে দেবে বাড়ি থেকে। তখন!

হোঁৎকা বলে—তাই তো! তাহলে তুইও যাবি, আমাদেরও কামধেনুবধ হয়ে যাবে। কেষ্টা, সিরিয়াস প্রবলেম। রজনী-কেশবকে ম্যানেজ করা গেছে, এবার পিসিমাকে ম্যনেজ করতে হবে। নাহলে কেতোর গতি হবে না।

কেষ্টা বলে—ওরে বাবা! পিসিমা—ওই রয়েল বেঙ্গল টাইগ্রেসের সামনে আমি নেই।

—তাহলে কেতোর কি হবে? ফটিক শুধোয়।

কেষ্টা বলে—পেরেম করার সময় হিসাব করেনি এখন বুঝুক ঠ্যালা। ওই জাঁদরেল টাইগ্রেসের কাছে ডাল গলবে না। তাই বলি কেতো—ঢের প্রেম হয়েছে, এবার কেটে পড়। গুলি মার রজনীকে!

কার্তিক আর্তনাদ করে ওঠে—তার চেয়ে আমাকে মরতে বল—তাও পারব। রজনীকে ছেড়ে আমি বাঁচব না রে।

হোঁৎকা ভাবছে কথাটা।

পিসিমাকে ম্যানেজ করতেই হবে।

পিসিমা অর্থাৎ ভবতারিণী ঠাকরুন মনে প্রাণে এই ভটচায পরিবারের মহান ঐতিহ্যকে মেনে চলে। ভাসুর, স্বামীর ছবিতে রোজ মালা-ধূপ-ধুনো দেয়।

তার ব্যর্থ বাসনাটা মাঝে মাঝে তার মনকে অস্থির করে তোলে। এত সম্পদ—এত প্রাচুর্য অথচ এ বংশের একমাত্র বংশধর তার ভাসুরের সন্তান দিব্যগতি সন্ন্যাসী হয়েই রইল।

আর এই সবকিছুর মালিক হবে ওই কার্তিক। এ বংশের যে কেউই নয়। হোক না ভবতারিণীর ভাইয়ের ছেলে—সে পরগোত্র।

গুরদেবকেও তার মনের এই বেদনাটা জানায় ভবতারিণী। গুরুদেব প্রায়ই এ ধনী শিষ্যার বাড়িতে আসেন। মহাসমারোহে ওদিকের তিনমহলের বিশাল হলঘরে ভক্তবৃন্দদের সমাগম ঘটে। নামকীর্তন চলে।

আর সে ক'দিন কার্তিকের অবস্থা কাহিল হয়ে ওঠে। গুরুদেবের সামনে প্রণাম করতেই গুরুদেব বলেন—এটি!

ভবতারিণী বলে—এ বাড়িতেই থাকে। আমার ভাইয়ের ছেলে।

গুরুদেব বিচক্ষণ—ত্রিকালদর্শী পুরুষ। বলেন—হুঁ। সোনা বাইরে আঁচলে গিরে। দিব্যগতি রইল

বাইরে—কত কষ্টে রয়েছে হিমালয়ে। আর তারই ঘরে জয় প্রভু! সবই তোমার লীলা।

কার্তিক চমকে ওঠে ওর কথায়। ভবতারিণী বলে—বাবা! সে তো কোথায় রইল জানি না। এইটুন থেকেই হারিয়ে গেল—তাই একেই এনেছি!

গুরুদেব বলেন—তা এ যে নটবর—চাঁচুর চিকুর ওসব কেটে ফ্যালো কর্মযোগী হতে হবে। বিলাসবাসন ত্যাগ করে সংযমী হতে হবে।

কার্তিক এমনিতেই একটু আয়েসী। তার মাথার চুলগুলো মিঠুনের চুলের প্যাটার্নে, পিছনে বেশ ঝুঁটি বাঁধাই চলে। পরনে দিশী ধুতি—টেরিকটের পাঞ্জাবি।

আর গুরুদেবের নির্দেশেই ভবতারিণী কিছুক্ষণের মধ্যেই পাড়ার ইটপাতা ইটালীয়ান সেলুন থেকে এতোয়ারি নাপিতকে ডাকিয়ে এনে কার্তিককে বলির পাঁঠার মতো ওর সামনে হাজির করে বলে—একেবারে সব চুল সাফ করে দে।

কার্তিক আর্তনাদ করে—পিসিমা!

ভবতারিণী বলে—গুরুদেবের নির্দেশ। চোপ! চালা এতোয়ারি।

এতোয়ারি কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্তিককে চুল সাফ করে একেবারে অসুরে পরিণত করে।

মিহি ধুতি-পাঞ্জাবি নেই, মাথায় কদমছাঁট চুল নিয়ে কার্তিককে যেতে হয বাজারে—গুরুদেবের মহোৎসবের বাজার করতে।

হোঁৎকার দল ওদিকেই ছিল। কার্তিকের মনমেজাজ ভালো নেই। ওই গুরুদেব যে একটা বিপদ বাধাবে তা বুঝেছে সে। তার সূচনা এখন থেকেই শুরু হয়েছে।

হোঁৎকা-কেষ্টব দল কার্তিককে অমনি ভেড়াকামানো অবস্থায় দেখে অবাক হয়।

—একি রে!

কার্তিক এবার ফেটে পড়ে—পিসিমার গুরুদেব এসে কি হাল করেছে দ্যাখ। ব্যাটা আমাকে উৎখাত করতে চায় রে। বলে—আমি নাকি উটকো মাল। ও বংশের কোনোকিছুতেই আমার হক্ নেই। দ্যাখ চুল কাটিয়ে ছাগল বানিয়ে দিয়েছে, ভালো ধুতি-পাঞ্জাবির বদলে কি পরতে হয়েছে দ্যাখ।

মোটা ক্যাটকেটে ধুতি আর এই মার্কিনের পাঞ্জাবি, আর সস্তা হাওয়াই চটি। এরপর না তাড়ায় ব্যাটা!

কার্তিকেব ভাগ্যাকাশে যেন দুর্যোগের ঘনঘটা এগিয়ে আসছে। হোঁৎকা বলে—সত্যিই তো! ওদিকে রজনীর প্রবলেম, এদিকে একেবারে বাঁচামরার কেস!

কেষ্ট বলে—চল। এখন গুরুদেবের উৎসবে ভলেনটিয়ারি করে আসি। পিসিমার মনে একটা আস্থা আনতে হবে, আর গুরুদেবটিকে দেখে আসি। পরে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। কেতো, তুই এঁটুলির মতো কামড়ে পড়ে থাক ও-বাড়িতে। তারপর দেখছি কি করা যায়।

ভবতারিণী গুরুদেবের আগমনে বিরাট উৎসব, ভোজন-টোজনের এলাহি ব্যবস্থা করেছে। বেশ কয়েক হাজার কাঙালীকে খাওয়ানো হল। একদিন বিরাট ভোজও হল। আর ভবতারিণী দেখে হোঁৎকার দলই যেন হামলে পড়ে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওই দায় উদ্ধার করে দিল।

ভবতারিণী বলে গুরুদেবকে—বাবা। এদের আশীর্বাদ করুন। আপনার পরম ভক্ত। ক'দিন ধরে উৎসব এদের জন্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল বাবা।

গুরুদেবকে দেখছে ওরা।

গুরুদেব বলেন—দীর্ঘজীবী হও। সংযমী হও। নির্লোভ হও। তবেই ঈশ্বরলাভ হবে বাবা।

ওদিকে কার্তিক দাঁড়িয়ে। ভবতারিণী ধমকে ওঠে—গুরুদেবকে ওদের মতো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর।

গুরুদেব বলেন—তোমার ভাইপোটিকে একটু বিনম্র হতে বল মা। ওর অদৃষ্টে কিছু দুর্যোগ দেখতে পাচ্ছি।

ভবতারিণী বলে কাতরস্বরে—ওকে আশীর্বাদ করুন বাবা। যেন সব বিপদ ওর কেটে যায়।

বলেন গুরুদেব—নিয়তি কেন বাধ্যতে। নিয়মিত কারো বাধ্য নয়, মা। যা ঘটার, তা ঘটবেই। জয় গুরু।

আর কিছুদিনের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে যায়। অবশ্য এত বড় ঘটনা ওই করিতকর্মা ত্রিকালদর্শী গুরুদেবের কোনো হাত আছে কিনা বোঝা যায় না। গুরুদেব এখান থেকে গঙ্গাতীরে পেনেটিতে তার আশ্রমে ফিরে যাবার কিছুদিন পরই ভবতারিণীর বাড়িতে এক সকালে জটাজুটধারী এক বিশালদেহী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে।

—জয় শিবশম্ভু!

সন্ন্যাসী এসে সটান ভবতারিণীর মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়তে গুপীনাথ সরকার এগিয়ে আসে। সন্ন্যাসী বলে ওঠে—তুমি গুপীনাথ না? গুপীনাথ সরকার, আর তুই নন্দু সিং—

গুপীনাথ চমকে ওঠে—বাবা!

নন্দু সিংও এ বাড়ির পুরোনো দারোয়ান। সেও অবাক হয়—মহারাজ!

হাসছে সন্ন্যাসী—চিনতে পারলে না? কোশিস করো—রামধনী কোথায়, যমুনা কোথায়? কাকীমা ক্যায়সা হ্যায়?

গুপীনাথের চোখ ট্যারা। একেবারে এ বাড়ির সব খবরই বলে যাচ্ছে।

খবরটা অন্দরমহলেও চলে যায়। কে এক ছোকরা সাধু এসে এ বাড়ির হাঁড়ির খবর গড়গড় করে বলে চলেছে।

ভবতারিণী খবরটা শুনে চমকে ওঠে। মনে পড়ে তার ত্রিকালদর্শী গুরুদেবের কথা। তিনিই আভাস দিয়েছিলেন যে হয়তো এ বাড়ির বংশধর ফিরে আসবে। গ্রহযোগ তেমনিই বয়েছে।

আর আজ ওই সন্ন্যাসীর খবর শুনে ভবতারিণীয়ও এসে হাজির।

চাতালে বসে আছে সন্ন্যাসী, পাশে ওর চিমটে কমণ্ডল রাখা। ভবতাবিণীকে দেখে গর্জে ওঠে সন্ন্যাসী—জয় শিবশম্ভু।

ভবতারিণী প্রণাম করতে যাবে, বাধা দেয় সন্ন্যাসী—নেহি মাজী। পূর্বজন্মের গুরুজন তুম্। তুমার প্রণাম নেহি লেবে! গুপীনাথ—বসন্তবাবুকো বোলাও।

বসন্ত এ বাড়ির পুরোনো নায়েব। এবার গুপীনাথ বলে—মা, চিনতে পারছেন না মা! এ আমাদেব ছোটবাবু।

ভবতারিণী দেখছে ওকে। হ্যাঁ, অবিকল সেই মুখ-চোখই—দীর্ঘ কুড়ি বছর পর সেই বালক আজ তরুণ-সন্ন্যাসী।

ভবতারিণী এবার গুরুবাক্য স্মরণ করতে পারে। বলে সে—এ্যাঁ। ওরে দেবু! তুই আমার দিব্যগতি—এ বংশের একমাত্র শিবরাত্রির সলতে।

সন্ন্যাসীর বদনকমলে মৃদু হাসি খেলে যায়। বলে সে—জয় শিবশম্ভু! সংসার অসার-অনিত্য-মায়া! তুম কোন—কৌন তুমহারা। সব কুছ মায়া।

ভবতারিণী এবার বলে —ওরে দেবু! আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবি না বাবা। আর তোকে যেতে দেব না। আমার শ্বশুরবংশ আবার বজায় থাকুক বাবা।

সন্ন্যাসী বলে —নেহি মা! সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাস ভি নিলেও তার পূর্বাশ্রম ফিন দর্শন করে চলে যেতে হয়। হামি ভি পূর্বাশ্রম দর্শন করলো—অব যাবে।

—না! ওরে দেবু! প্রাণ থাকতে তোকে যেতে দেব না বাবা। আর তোকে যেতে দেব না! তোর পায়ে পডি—ভবতারিণী একেবারে সটান ওর সামনে চাতালে বডি থ্রো করে।

বাড়ির চাকর-ঝি-লোকজন-দারোয়ানরাও জুটে গেছে। পুরোনো যারা তারও গিন্নীমার আর্জি দেখে বলে —থেকে যান বাবা। মা এত করে বলছেন।

সন্ন্যাসী শেষ অবধি যেন দয়াপূর্বক বলে—ঠিক হ্যায়। তিন রাত্রি রহেগা মায়ী। বাদ হমকো যানেই হোগা হিমালয়মে সাধন-ভজনকে লিয়ে।

ভবতারিণী বলে—তাই এখন থাকো বাবা। তারপর দেখা যাবে।

—মন্দিরমে রহেগা হাম।

সন্ন্যাসীর কথায় বলে ভবতারিণী—না বাবা! এসব ঘরবাড়ি তোমারই! আমি আগলে আছি মাত্র। নিজের ঘরে চল বাবা।

কার্তিক ক'দিন পর এসেছে রজনীদের বাড়ি।

কেশব হালদার এখন গদাই ঘোষের ইলেকশন ক্যামপেন নিয়ে ব্যস্ত। বাড়িতেও থাকে না এসময়। কার্তিক এই মওকায় পিসীমার ব্যবসার তাগাদার নাম করে চলে আসে।

রজনী বলে—পিসিমার ভয়েই গেলে তুমি। নিজে লেখাপড়া জানো, একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নাও। তারপর নিজেরাই ঘর বাঁধবো। কারোও তোয়াক্কা করব না।

কার্তিক বলে—তার দরকার হবে না। পিসিমাকে একবার হাতে আনতে পারলেই ব্যাস। চেষ্টা করছি। তাহলে ও-বাড়িতেই গিয়ে উঠবে বৌ হয়ে।

রজনীও যেন স্বপ্ন দেখছে ওই বিরাট বাড়ির বৌ হয়েছে। টাকা, গাড়ি সবই অঢেল।

হঠাৎ এমন সময় জোর জোর সাইকেলের ঘন্টি শুনে চাইল কার্তিক। কেষ্টর সাইকেলের বেল তার চেনা। খুব জোরে জোরে বাজছে বেলটা। অর্থাৎ জরুরী কোনো খবর আছে।

রজনী বলে—কে এল দ্যাখো।

বাগানের বাইরে কেষ্ট সাইকেল রকে ভিড়িয়ে বেল দিয়ে চলেছে। কার্তিককে আসতে দেখে বলে—শালা কেতো, এদিকে প্রেম করছিস! ওদিকে কেস চৌপট! শীগগির গিয়ে দ্যাখ কি কাণ্ড হচ্ছে তোদের বাড়িতে।

কার্তিক শুধোয়—পিসিমার শরীর খারাপ?

কেষ্ট বলে—না-না। তোর বরাতই খারাপ রে। ডেঞ্জারাস কাণ্ড ঘটে গেছে। শীগগির যা।

কার্তিকও হন্যে হয়ে ছুটল তার সাইকেল নিয়ে। আর বাড়ি ঢুকেই বুঝতে পারে সাংঘাতিক কাণ্ড একটা ঘটেছে।

দোতলার দক্ষিণের ব্যালকনিওয়ালা সেরা ঘরটায় থাকে সে। বারান্দায় বাড়ির লোকজনের ভিড়। কার্তিক ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখে তার খাটের উপর বাঘছাল বিছানো। তার উপর সমাসীন এক তরুণ বিশালদেহী যমদূতের মতো সন্ন্যাসী।

পিসিমা তাকে আদর করে একটা পাথরের থালায় কেজিখানেক নধর সাইজের রাজভোগ, বড় সাইজের কড়াপাকের এতগুলো জলভরা তালশাঁস সন্দেশ নিবেদন করছে। সন্ন্যাসীও এক একটা মাল তুলে তার বিশাল মুখগহ্বরে বিলীন করে দিচ্ছে কোঁৎ করে ঢোক গিলে।

এর মধ্যে বাগানের নারকেল গাছের এক কাঁদি নধর সোনা ডাব কাটা হয়েছে। শশী চাকর এক একটা ডাব তুলে দিচ্ছে, মরুভূমিতে বারিবিন্দুর মতো সন্ন্যাসী ঠাকুরও নিমেষে দু গ্লাস ভর্তি ডাবজল শেষ করে শূন্য খোলাটা হাতে দিচ্ছে।

ভবতারিণী এতক্ষণ পর কার্তিককে দেখে বলে—কোথায় থাকিস মুখপোড়া! ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে এল কত পুণ্যি নিয়ে। পেন্নাম কর।

ঘরের মানুষ! অবাক হয় কেতো।

ভবতারিণী বলে—নয়তো কি? ওই আমার হারানো মানিক দিব্যগতি, এ বংশের কুলতিলক। কি ভাগ্য আমার! স্বর্গ থেকে শ্বশুর -ভাসুর আশীর্বাদ করছে, পুষ্পবৃষ্টি করছে, দেখছিস না?

কার্তিকের চোখে পুষ্পবৃষ্টিটা ধরা পড়ে না। মনে হয় তার সর্বাঙ্গে যেন ইষ্টকবৃষ্টি হচ্ছে।

—পেন্নাম কর। পাদোদক নে হতভাগা!

ভবতারিণী কার্তিকের ঔদ্ধত্যে যেন ক্ষেপে উঠেছে। এবার কার্তিক প্রণাম করে, আর ভবতারিণী

ওই সন্ন্যাসীর পায়ের বুড়ো আঙুল একটা পাথরবাটি ভর্তি জলে চুবিয়ে সেই জল কার্তিককে দিয়ে বলে—খা। পুণ্যি হবে।

কার্তিকের গা গুলোয়। তবু গিলতে হয়।

এবার ভবতারিণী বলে—কেতো। এই দক্ষিণের ঝুলবারান্দাওয়ালা ঘরে আমার দেবু থাকবে, তুই বরং নিচের ঘরেই চলে যা। তোর জিনিসপত্র নিচের ঘরেই রেখে এসেছে শশী।

চমকে ওঠে কার্তিক। একদিনেই দোতলা থেকে একতলায় এঁদো ঘরে নির্বাসন হয়ে গেল তার, আর কিছুদিন এই সন্ন্যাসী মালটি এখানে থাকলে কার্তিককে যে এ বাড়ি থেকেই বিতাড়িত হতে হবে সেটাও বুঝেছে সে। মুখে কার্তিক বলে—তাই হবে।

একেবারে স্বর্গ থেকে বিদায়। কার্তিক দোতলার মোজাইক করা সেরা ঘর থেকে এসে ঠেকেছে নিচের তলায়, বাগানের কাছে একটা এঁদো ঘরের নড়বড়ে তক্তপোশে। খাট-পালঙ্ক-আলমারি আর নেই।

ক'দিনেই কার্তিক আবিষ্কার করে এই বাড়ির পরিবেশও বদলে গেছে। এখন পিসিমা থেকে শুরু করে চাকরবাকর অবধি কেউই তাকে আর মানে না। বাড়ির রাঁধুনি বামুন তো কাল বলে—কার্তিকবাবু, নিচের হেঁসেলেই খাবেন এখন থেকে। এতকাল কার্তিক দোতলায় পিসিমার ওখানে খেত। ওদের রান্না খাবারদাবারও ভালো। পিসিমাই আমিষ হেঁসেলে কার্তিকের জন্য আলাদা করে মাছ-মাংস রাঁধাতো। বলতো—আমি নিরামিষ্যি খাই—তাই বলে তুই কেন খাবি? ঠাকুর দাদাবাবুর জন্য মাছ, মাংস রান্না করে এখানেই দিয়ে যেত।

এতদিনের পর আবার নিচে। সরকার-কাজের লোকদের হেঁসেলেই পাইকেরি ঘ্যাঁট, হড়হড়ে ডাল আর একটুকরো মাছ খেতে হবে।

ঠাকুর বলে—উপরে গিন্নীমা আর সাধু মহারাজের রান্না হবে। আপনার ব্যবস্থা এখানে।

ভবতারিণীর এখন সময় নেই। হারানিধি ফিরে পেয়েছে সে। এখন দেবুকে নিয়েই ব্যস্ত। দিব্যগতি ক'দিনেই কাকীমার আদরযত্নে সংসারী জীবনের মাধুর্য বুঝতে পেরেছে। তিনরাত্রি কেন, প্রায় তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। এখন কাকীমার আদরে সে নতুন মানুষ।

কাকীমাই সেই এতোয়ারি নাপিতকে ডাকিয়ে এনে দিব্যগতির চুল-দাড়ি নির্মূল করে বাহারের চেহারা ফিরিয়ে এনেছে। গেরুয়া বসনও গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এখন দিব্যগতি দিশী ধুতি, টেরিকটের পাঞ্জাবি, সাদা নাগরা পরে ক্লাসিক কিং সাইজ সিগারেট ধরেছে।

কার্তিক সেদিন উপরে গিয়ে দেখে দিব্যগতি আহারে বসেছে। দেখার মতো দৃশ্য।

কাকীমা ওর জন্য সাবেকি আমলের ছোটখাটো গাড়ির চাকার সাইজের সোনারবরণ খাগড়াই কাঁসার থালা—গোটা আষ্টেক ম্যাক্সি থেকে মিনি সাইজের বাটিতে নানা ব্যঞ্জন মায় একটা কেজি পাঁচেক আস্ত রুই মাছের মাথার কালিয়া—তৎসহ দই এক হাঁড়ি আর ডজন খানেক ছটাকি সন্দেশ সজিয়েছে। থালায় দেরাদুন রাইসের সুগন্ধী যুঁই ফুলের মতো ভাত, আসলি গব্যঘৃতে তার রং পীতাভ। ভাতের পরিমাণও কেজিখানেক চালের।

পিসিমা বলে—খাও দেবু, কিইবা খাও। একেবারে পাখির আহার। আর গৃহেই যখন ফিরেছ বাবা—গুরুদেব বলছেন এই বয়স, মাছ খেতে হয়। খাও বাবা।

কার্তিক ওই পাখির আহারের পরিমাণ দেখে চমকে উঠেছে। তার তিন বেলার খাদ্য ওই বকরাক্ষস এক বেলায় সাবড়াচ্ছে। ওখানে একদিন সে বসে খেত—আজ সে বিতাড়িত।

ভবতারিণী কার্তিককে দেখে বলে—তুই! তুই এখানে কেন?

অর্থাৎ আজ কার্তিকের এখানে আসার অধিকারও নেই।

কার্তিক বলে—তাগাদায় গেছলাম, তারই রিপোর্ট দিতে হবে।

এতদিন ভবতারিণী এস্টেটের কাজকর্ম দেখত। আজ ভবতারিণী বলে—ওসব বৈকালে সেরেস্তায় গিয়ে দিবি! যা, এখন যা।

অর্থাৎ তাড়িয়েই দিল তাকে। ওই বকরাক্ষস তখন বিশাল থাবায় একবারে একশো গ্রাম চালের ভাত উইথ সমপরিমাণ ডাল তরকারি সমেত মুখগহ্বরে চালান করে ওই বিশাল মাছের মাথাটায় মড়মড় শব্দে কামড় মারছে।

বৈকালে সেরেস্তায় গিয়ে কার্তিকের চোখ ছানাবড়া। সেরেস্তায় জাজিমের উপরে আসন পাতা, নতুন বিশাল ড্রামের সাইজের তাকিয়া এসেছে। ওইখানে সমাসীন ওই বকরাক্ষস। বিশাল শ্রীঅঙ্গে সিল্কের হীরের বোতাম লাগানো পাঞ্জাবি, চুনোট করা ধুতি—

ভবতারিণী বলে—সরকার মশাই, আজ যার জিনিস তাকেই সব বুঝিয়ে দিন। এই যে কেতো!

বকরাক্ষসই বলে—হিসাবপত্তর এনেছ? সব আদায়পত্র ঠিকমতো নাহলে দূর করে দেব।

চমকে ওঠে কার্তিক ওই বকরাক্ষসের ডায়ালগ শুনে। আজ ভাবছে কার্তিক তার আর এখানে ঠাঁই হবে না। অন্নও উঠল এখানের। বৃথাই সে এইখানে এসে রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল।

হোঁৎকার ক্লাবই এখন কার্তিকের একমাত্র ভরসাস্থল। হোঁৎকা, কেষ্ট, ফটিকের দলও বিপদে পড়েছে। কার্তিক এখন খুবই বেকায়দায় পড়েছে। আউটই না হয়ে যায়। তাদের ক্লাবের অবস্থাও কাহিল। ঠিকমতো ঝালমুড়িও জুটছে না। কার্তিকের হাতে ক্যাশকড়িও দেয় না ওই বকরাক্ষস। পিসিমা তো চিনতেই পারে না এখন কার্তিককে।

হোঁৎকা বলে—মালটা একেবারে গেড়ে বসেছে দেখছি—

কার্তিক বলে—এখন আউট না হয়ে যাই রে। ভাবিছ অন্য কোথাও চাকরি পেলে চলে যাব।

কেষ্টা বলে—এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

হতাশ হয়ে বলে কার্তিক—কি করবি?

—ভাবতে দে। ততদিন লাঠিঝাঁটা খেয়েও পড়ে থাক ওখানে।

কিন্তু এই সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। নিজে ভালো থাকার চেষ্টা করলেও অন্যরা শান্তিতে থাকতে দেবে না। স্বার্থের সংঘাত এখানে কঠিন—তাই অশান্তিও এখানে গজিয়ে ওঠে যখন-তখন।

কেশব হালদার বত্রিশ ভাজার ব্যাপারী। এতদিন সে গদাই ঘোষের ইলেকশন নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বেশ টু পাইস কামিয়েছে গদাই ঘোষকে জেতাবে বলে। তারপর ভোটের অতল কাদায় ঘোষ মশাইকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে তাকে ভোটে আমানত জব্দ করিয়ে ক্লিন কেটে পড়েছে।

কিন্তু কেশব হালদার বসে থাকার পাত্র নয়। আবার সেই জ্যোতিষ ব্যবসাতেই নেমেছে।

রজনীরও মনটা ভালো নেই। কার্তিকের অবস্থাটা সেও জেনেছে। কার্তিক এলে দুজনে বের হয় বাগানে। কার্তিক যেন ভেঙে পড়েছে। কিন্তু রজনী বলে—এত ভেঙে পড়ছ কেন? কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে নাও। আমিও ডাক্তারি করব—তুমি কাজ করবে। দুজনের চেষ্টায় ঠিক আমাদের দিন কেটে যাবে।

কার্তিক বলে—সেই চেষ্টাই করছি।

কেশব হালদার এর আগেও ভবতারিণীকে নেহাৎ সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিল দু-একবার—ভাববেন না মা জননী, আপনাদের বংশধর ফিরে আসবেই।

ভবতারিণী জবাব দেয়নি।

আজ কেশব হালদার একেবারে উইথ মেকআপ অর্থাৎ তান্ত্রিক জ্যোতিষির রক্ত শঙ্খ পরে এসে হাজির হয় ভবতারিণীর বাড়িতে। ভবতারিণীর মনমেজাজ এখন ভালোই। তাই বলে—এসো কেশব।

কেশব বলে—মা জননী, এলাম। কথাটা স্মরণ করাতেই এলাম মা। আমার গণনা যে নির্ভুল সেই কথাই স্মরণ করাতে এলাম। বলিনি —আপনার বংশধর ফিরে আসবেই! কি হল! ঘরের ছেলে ঘরে এলো—অথচ আমার কথা ভুলে গেলেন মা জননী?

ভবতারিণীরও খেয়াল হয় লোকটা বলতো বটে। তাই বলে ঠাকরুন—হ্যাঁ। তোমার গণনা সত্যি হয়েছে।

—হবে না? হতে বাধ্য। সামুদ্রিক জ্যোতিষ কখনও ভ্রান্ত হয় না মা।

ভবতারিণীর মনের বাসনা এবার ধাপে ধাপে উঠছে। সে চায় ওই দিব্যগতির বিয়ে থা দিয়ে সংসারী করতে। শ্বশুরকুলের বংশরক্ষা তাকে করতেই হবে।

দিব্যগতিকে বলেছেও। কিন্তু দিব্যগতি ঠিক মত দেননি বিয়েতে। তাই ভবতারিণী বলে—কেশব, আমার দ্বিবগতির বিবাহের যোগ কবে আছে দেখো তো। মানে যখন ফিরেই এলো—হোক না বয়স একটু বেশি, এখন বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করতে চাই। মেয়ে না হয় একটু বেশি বয়সেরই হোক। কোনো দাবি নেই। মেয়ে পছন্দ হলেই বিয়ে দেব। দ্যাখো ওর বিবাহের যোগ আছে কিনা!

কেশবের বুদ্ধি খুবই প্রখর। আর তার দূরদৃষ্টি আছে। ভবতারিণীর মুখে ওই বিয়ের কথা শুনে সেও এবার কথাটা ভাবছে। তার মেয়ে রজনীর কথা। যদি কোনোমতে এখানে গছাতে পারে রজনীকে, কেশবের কোনো দুঃখ থাকবে না। উলটে বুড়ি চোখ বুজলে সেই হবে এসবের মালিক।

কেশব বলে—কোষ্ঠিটা দেখান।

ভবতারিণী কোষ্ঠিটা তুলে দেয় ওর হাতে। কেশব বিজ্ঞের মতো গম্ভীরভাবে কোষ্ঠি দেখছে। কাগজে আঁকিবুকি দিয়ে অঙ্ক কষেই চলেছে। অনেকক্ষণ পরে বলে—হ্যাঁ! এই তো যোগ বলে যোগ—রাজযোগ রয়েছে মা। জাতকের বিবাহ হবেই—আর শীঘ্রই হবে। আর ওর হাঁড়িতে চাল দিযে যে কন্যা এসেছে সে হবে শিক্ষিতা, সুন্দরী। আর এখান থেকে উত্তর দিকেই রয়েছে সে। আরে এ যে দারুণ যোগ মা—

ভবতারিণী ব্যস্ত হয়ে শুধোয়—কি দেখলে?

—দিব্যগতির রাশ নাম রজনী।

—হ্যাঁ!

কেশব বলে —কন্যার নামও হবে র দিয়ে—ধরুন রানী, রেবতী—

ভবতারিণী বলে—রজনী তো মেয়েদের নামও হয়।

কেশব শোনায়—তাহলে তো রাজযোটক, জাতক পরম সুখী হবে যদি তার রাশনামের সঙ্গে কন্যার নাম মিলে যায়। শাস্ত্রে বলে—রাশনাম্নী, কন্যারত্ন—পুরুষস্য ভাগ্য নির্ধারক। ফলং রাজ্যলাভং—অর্থলাভং। এ শাস্ত্রের কথা মা। রজনী নামের যদি কোনো কন্যা পান, ব্যস, চোখ বুজে বিয়ে দিন।

ভবতারিণী কেশবকে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বলে—কেশব, তুমি একটু খোঁজখবর করো। মেয়ে পছন্দ হলেই বিয়ে দেব। কোনো দাবি নেই। পালটি ঘর হলেই হবে। তোমাকে খুশি করে দেব।

কেশব এবার টিপে টিপে হাওয়া ছাড়ে। বলে সে—মা, রজনী নামে শিক্ষিতা, সুন্দরী কন্যা আছে আমার সন্ধানে। কিন্তু সেখানে—না, না। তা হয় না মা জননী!

ভবতারিণী চায় তার দিব্যগতিকে যত শীঘ্র পারে বিয়ের জোয়ালে জুড়ে দিতে যাতে আর ঘর ছেড়ে না পালাতে পারে দিব্যগতি। তাই বলে—কেন হবে না? সবই তো মিলছে।

কেশব বলে—আমার মেয়ের কথা বলছি মা। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, বড় লক্ষ্মী মেয়ে—শিক্ষিতা, সুন্দরী। কিন্তু আমি তো হতদরিদ্র মা।

ভবতারিণী এখন মেয়ের দরকার। বিয়ে সে শীঘ্রই দিতে চায়। তাই বলে—কেশব, তুমি তো পালটি ঘর। মেয়ে আনব গরিবের ঘর থেকেই। দেখাও তোমার মেয়েকে। যদি পছন্দ হয়, দিব্যগতির ওখানেই বিয়ে দেব। কালই নিয়ে চল তোমার ওখানে, মেয়ে দেখব। পছন্দ হলে বিয়েও হবে দিব্যগতির ওর রজনীর সঙ্গেই।

কার্তিক আসছিল তাগাদা থেকে। এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন কাটছে তার। বৈকালে রোজ ওই দিব্যগতি তাকে চোখ পাকিয়ে ধমকায়—এত কম আদায় হচ্ছে কেন? টাকা গ্যাঁড়াচ্ছো নাকি হে ছোকরা?

কার্তিকের সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। রাগ চেপে বলে—টাকা বহু কষ্টে আদায় করতে হয়। বারবার যাচ্ছি তো।

—না পারো ছেড়ে দাও। চলে যাও এখান থেকে।

দিব্যগতি তাকে তাড়াতেই চায়। তবু কার্তিক পড়ে আছে মাটি কামড়ে। একটা জায়গায় চাকরির কথা চলছে। সেখানে চাকরি পেলে চলে যাবে। রজনীকে বিয়ে করে ওখানেই থাকবে। পিসিমাকে আর পরোয়া করবে না সে। রজনীই এখন তার একমাত্র ভবিষ্যৎ।

কিন্তু হঠাৎ কেশব আর ভবতারিণীর কথা শুনে কার্তিকের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। তার রজনীকেও এবার হারাতে হবে? ওই বকরাক্ষস এসে এখানে তার ভাত তো তুলবেই, তার জীবন থেকে রজনীকেও সরিয়ে নেবে? সব হারিয়ে যাবে তার ওই দিব্যগতির জন্য?

কার্তিকের চোখের সামনে জমাট অন্ধকার নামে। আজ তার সামনে দুনিয়ার সব আলো যেন নিভে যায়।

—বলিস কি র‍্যা!

হোঁৎকাদের কাছে বৈকালেই ছুটে এসেছে কার্তিক। দুপুরে খেতেও পারেনি। চোখমুখ বসে গেছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। ঝড়োকাকের মতো চেহারা হয়েছে তার। বন্ধুদের কাছে এসে চরম সর্বনাশের খবরই দেয়।

কার্তিক বলে—ওই বাড়ি থেকে আউট করল—এবার রজনীকে কেড়ে নেবে ওই বকরাক্ষস। আমি আর বাঁচব না রে। সুইসাইডই করব লেকের জলে ডুবে।

হোঁৎকা বলে—মাথা ঠান্ডা কর। ব্যাটা কেশবটাও হাড় হারামজাদা। ঠিক গিয়ে ফিট হয়ে গেছে পিসিমার কাছে। এবার নিজের মেয়েকেই ওই বকরাক্ষসের হাতে তুলে দেবে।

কেষ্টা বলে—কেতোর কি হবে রে! ও যে মরবে বলছে।

হোঁৎকা শোনায়—বলে কয়ে কেউ মরে না। দেখি ব্যাটার জন্য কি করা যায়! মদনাকে খবর দে।

কার্তিক বলে—কাল সন্ধ্যায় পিসিমা ওই বকরাক্ষসকে নিয়ে রজনীকে দেখতে যাবে। পছন্দ হলে আশীর্বাদ করে বিয়ে পাকা করে দেবে।

হোঁৎকা বলে—কেতো, শ'খানেক টাকা ছাড়। অপারেশনের খরচা আছে।

ভবতারিণী এবার দিব্যগতির বিয়ে দিয়ে সংসারী করবেই। দিব্যগতির অবশ্য অমত নেই। বেশ ক'বছর বড় কষ্টে কেটেছে তার হিমালয়ের গহনে। ছাই মেখে বসে থাকতে হত, আশ্রমের মাঠে কাজও করতে হত—তবেই মিলতো রুটি আর ডাল কম্বল। এখানে এসে দিব্যগতি জীবনের এত আরামের সন্ধান পেয়ে, বুঁদ হয়ে গেছে। বিয়ে হবে তার। টাকা-গাড়ি-বাড়ি—এই আরামের জীবন পেয়ে দিব্যগিত. একেবারে বদলে গেছে।

সন্ধ্যার আগেই ভবতারিণী ঠাকরুন তৈরি হয়েছে, দিব্যাগতিও সেজেছে একেবারে বরের সাজে, শুধু কপালে চন্দন, গলায় মালাটাই নেই। কোঁচানো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবিতে ওই বিরাট লাশখানাকে দৈত্যের মতো দেখায়। পাঞ্জাবিতে একটা থানই লেগেছে। গায়ে ঢেলেছে সেন্ট।

ভবতারিণী দিব্যগতি আর তার খাস ঝি মানদাকে নিয়ে ফিটনে উঠেছে। এখনও পুরোনো আমলের ফিটন ঘোড়া আছে। অবশ্য দিব্যগতির জন্য গাড়িও কেনা হচ্ছে।

কোচবক্সে বসেছে গুপী সরকার, কোচম্যান রহিমের পাশে, ওরা চলছে কন্যা দেখতে কেশবের বাড়িতে শহরের শেষ প্রান্তে। এবার কাঁচা রাস্তা—তাও এবড়ো-খেবড়ো—পিছনের পুরো সিট জুড়ে দিব্যগতির বিশাল দেহটা, ফলে চাকাও দাবছে, আর দিব্যগতি নড়লে-চড়লে গাড়িও কাৎ মারছে বিপজ্জনকভাবে।

কোচম্যান হাঁকে—ঠিক হয়ে বসুন। নড়া-চড়া করলি বিপদ হয়ি যাবে মা।

দিব্যগতি কোনোমতে চেপে বসে।

পথটা বাগানের মধ্য দিয়ে চলেছে। বাঁশবন-আমবাগান—বুক সমান ঘেঁটু ফুলের জঙ্গল, আর অন্ধকার হয়ে গেছে—পথও দেখা যায় না। তবে দূরে শহরের আলো দেখা যায়, বাগানের ওদিকে কেশবের বাড়ি।

আর এমনি সময় উঠল কালবৈশাখী ঝড়। একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস—গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে কে যেন নাড়া দিচ্ছে। কোথাও ডাল ভাঙছে মড়মড় করে। অকাশে মেঘ ডাকছে গুরুগম্ভীর শব্দে।

হঠাৎ দেখা গেল আবছা বিজলির আলোয় অন্ধকারে ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে একদল কঙ্কাল নেচে ওঠে। একটা আবার গাছের ডাল ধরে লাফিয়ে পড়ে ওদের গাড়িটাকেই ঘিরে ফেলে—বিকট হি হি শব্দে ওরা হাসছে। লম্বা পাঁকাটির মতো হাত বের করে বলে—দেবো, আমাদের ছেড়ে মানুষ হয়েছিস! বিয়ে করতে যাচ্ছিস—শালা ভূত, হিঃ হিঃ ভূতের আবার বিয়ে!

কোনো ভূত গর্জে ওঠে—বুড়ির ঘাড় মটকে রক্ত খেয়ে পালিয়ে আয় ভূতের দলে, দেবা! হিঃ হিঃ বিকট শব্দে হাসছে।

দিব্যগতি ঠক ঠক করে কাঁপছে। ভবতারিণী তারস্বরে রাম রাম করছে। ওদিকে মানদা ঢপ করে গড়িয়ে পড়ে মূর্ছা যায়। আর গুপীনাথ সরকার ভূতের ভয়ে লাফ দিয়ে পড়ে কোচবাক্স থেকে—

বিকট শব্দ। রহিমও প্রাণভয়ে জিনদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘোড়াটাকে কষে হাবড়াচ্ছে—ঘোড়াও গাড়ি নিয়ে দৌড়চ্ছে। দিব্যগতির বিশাল দেহটা এক ঝটকায় একটু কাৎ হতেই গাড়িটাও সেই কাতেই গড়িয়ে পড়ে—

ভিতরে ভবতারিণী ঠাকরুনের কপাল ফেটেছে—দিব্যগতি আটকে গেছে গাড়ির মধ্যে পিপের মতো সেট হয়ে। ওদের চিৎকার—আর্তনাদ ওঠে।

তখন ঝড় কিছুটা কমেছে কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে অঝোরে।

ওই বৃষ্টির মধ্যেই হোঁৎকা-কেষ্টা-ফটিক-মদনের দল এসে পড়ে। কোনোরকমে দবজা ভেঙে আহত ভবতাবিণীকে, মানদাকে বের করে। আর ওই কাৎমারা গাড়ির মধ্যে বিশালদেহী দিব্যগতি এমন সেঁটে গেছে যে গাড়ির দরজা ভেঙে তাকে বের করতে হবে। গুপী সবকার খোঁড়াচ্ছে।

ভবতারিণী বলে হোঁৎকাকে—ভাগ্যিস ছিলি তোরা, নাহলে ভূতেই শেষ করত। রাম রাম! কি ক্ষণে যাত্রা করেছিলাম রে! জয় গুরু।

ওদিকে কেশব হালদার সন্ধ্যায় পথ চেয়ে আছে ওদের। রজনী কিন্তু কিছুতেই রাজী হয়নি প্রথমে ওদের সামনে যেতে। বলে রজনী—ওসব বিয়ে-ফিয়ে করব না বাবা।

—তবে কি করবি? খিঁচিয়ে ওঠে কেশব।

—ডাক্তারি করছি, তাই করব।

—কি জানিস ডাক্তারির?

—তুমি কি জানো জ্যোতিষীর!

মেয়ের কথায় বলে কেশব—শোন! বিয়ে-থা হলে রাজরানী হবি। ভবতারিণী ঠাকরুনের অঢেল টাকা। আর ওই দিব্যগতি সবকিছুর মালিক।

রজনীর মনে পড়ে কার্তিকের কথা। কার্তিককে ছেড়ে সে বাঁচতে পারবে না।

কেশব বলে—আসছেন ওরা, দেখা কর। তারপর ওসব ভাববি। নে, তৈরি হয়ে নে মা। বুড়ো বাবার কথাটাও ভাব একবার।

রজনী কোনোমতে তৈরি হয়েছে।

কেশব বাজার থেকে রাজভোগ-সন্দেশ-ফল-দই এসব এনেছে, অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। তারপরই উঠল ঝড়। একেবারে তুমুল ঝড়।

কেশব হতাশ হয়—কি যে হল!

রজনী খুশি হয়। ওই বিয়ের প্রথম চালটাই ভেস্তে গেছে দেখে।

রাত নামে, কেশব তখনও অঝোর বৃষ্টিঝরা আকাশের দিকে হতাশ হয়ে চেয়ে থাকে। তার সব আশা যেন ব্যর্থ হয়ে গছে।

কোনোরকমে রিকশায় চপিয়ে ভবতারিণী আর মানদকে বাড়িতে আনে হোঁৎকা। ডাক্তার ডেকে কপালে ব্যান্ডেজও করায় কার্তিক ঠাকরুনের।

দিব্যগতি ততক্ষণে গাড়ির খাঁচা থেকে মুক্ত হয়েছে কিন্তু ওর পাঞ্জাবি ফর্দাফাই, শৌখিন ধুতি জলে কাদায় লটপটে হয়ে গেছে। কোনো রিকশাওয়ালাই ওই গন্ধমাদনকে তুলতে চায় না। বেশি পয়সার লোভে একজন তুলেছিল রিকশায় কিন্তু দুটো টায়ারই সশব্দে ফেটে যায় তখুনিই। ফলে রহিম কোচম্যান আর গুপী সরকার দুজনে ওই বকরাক্ষসকে হাঁটিয়ে বাড়িতে আনে।

ভবতারিণীর ঝি মানদা বলে—গিন্নীমা। ভূতগুলোর কতা শুনলে? বলে ওই বাবু নাকি মানুষ সেজে এসেছে ভূতের দল থেকে। তাই ওকে ডাকছিল তারা। ও মানুষ নয়—কে জানে কি গো ! নাহলে এত এত মানুষে খায়! ওরে বাপ—আজ শেষই হতাম গো!

ভবতারিণীর কপালে অসহ্য যন্ত্রণা। কেমারেও চোট। আজ তারও মনে হয় সব যেন কেমন ভুতুড়ে কাণ্ডই ঘটে গেল। স্বকর্ণে শুনেছে ভূতগুলো বলছে—বুড়ির ঘাড় মটকে রক্ত খেয়ে দলে ফিরে আয় দেবা!

ভূতগুলো দিব্যগতির নাম জানল কি করে! ভূতেবা বোধহয় সবই জানে, ভবতারিণী মানদার কথায় বলে—আমার কুলদেবতা নাড়ুগোপালের দয়াতেই বেঁচে এসেছি। নাহলে কি যে হত!—যা দেখে আয় দেবু ফিরল কিনা? খাবার দিবি।

মানদা ভবতারিণীর কথায় ভীতকণ্ঠে বলে—ওরে বাবা! না—গিন্নীমা। আমি ওর ঘরে আর যাব না। খেতে দিতে হয় আর কাউকে বল। ও মানুষ না ভূত কে জানে বাবা। যা দেখলাম—শুনলাম, এরপর আব ওদিকে যাচ্ছি না। রাম রাম!

ভবতারিণীও আজ কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ কবে। বারবার মনে পড়ে সেই ভূতগুলোর কথা। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ভূতগুলো অবশ্য এখন তার বাড়ির নিচের তলায় কার্তিকের এঁদো ঘরে বসে মুড়ি আলুর চপ সহযোগে চা খাচ্ছে। হোঁৎকা, মদনা, কেষ্ট, ফটিক এরাই রয়েছে। বাকি ভূতের দল ফিরে গেছে ক্লাবে। হোঁৎকা বলে —এ তো এক ডোজ মাত্র দিইছি কেতো। পরপর এবার ওষুধের ডোজ পড়লে দেখবি ওই দিব্যগতির চরমগতির ব্যবস্থাটা করতে বলবে পিসিমা। বিয়ে করবে বকরাক্ষস—দেখলি তো খেল, পরের খেলও দেখাচ্ছি।

কার্তিক বলে—তোদের ভরসাতেই আছি রে!

হোঁৎকা বলে—বে-ফিকির থাক। মদনা, মালপত্র ঠিক ঠিক রেখে এসেছিস তো!

মদনা বলে —হ্যাঁ। ব্যাটার ঘর ফাঁকাই ছিল, মাল খাটের তলে ওদিকের কোণে রেখে এসেছি। বিশ্রী গন্ধ রে।

—কি মাল, কার্তিক শুধোয়—কোথায় রেখে এলি?

কেষ্টা বলে—পরে শুনবি, দেখবি মজা। এখন ছাদে চল। ছাদটা দেখতে হবে।

হোঁৎকা অবশ্য ভবতারিণীর এখন গুড বুকে। আজ হোঁৎকারাই ওই ভূতের অপারেশন সেরে মেকআপ তুলে ছুটে এসে ভবতারিণীর টিমকে উদ্ধার করে এনেছে।

হোঁৎকা দেখেছে ছাদ থেকে জলের পাইপটা ঠাকরুনের ঘরের মধ্যে দিয়ে নেমে গেছে। আর চোট খেয়ে সেই জলনিকাশী পাইপটা খুলে পড়েছে ওর ঘরে।

ভবতারিণী বলে—সরকার, কালই মিস্ত্রী ডেকে ওটাকে মেরামত করো। নাহলে খাটের কাছেই জল পড়ছে।

গুপীনাথ বলে—কালই করাচ্ছি মা।

বুদ্ধিটা হোঁৎকার উর্বর মস্তিষ্কে খেলে যায়। ওই ভাঙা পাইপ দিয়েও তার অনেক কাজই হবে।

ভবতারিণী ঘুমোচ্ছে।

ও জানে না যে ছাদে এখন বিরাজ করছে হোঁৎকার দল। ওরা কার্তিকের ঘরের পাশেই ধাঙড় ওঠার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠেছে।

ফটিকের গলাটা বেশ সুরেলা, যাত্রার দলে সে বাঁশি হাতে ধড়াচূড়া পরে কেষ্টর পার্ট করে। হোঁৎকা বলে—বেশ ঠাকুর-দেবতার গলার মতো মিষ্টি করে বল। পাইপের মুখে মুখ রেখে ফটিক হোঁৎকার প্রম্পট করা ডায়ালগ ছাড়ছে—

ভবতারিণী—ওঠো—ভবতারিণী।

ভরাটি গলার স্বরে নিজের নাম শুনে ভবতারিণীর ঘুম ভেঙে যায়। কেমন গম্ভীর, যেন দূর আকাশ থেকে দৈববাণীর মতো ভেসে আসছে কানের কাছে। মানুষের স্বর এ নয়।

—আমাকে দেখতে পাবে না। আমি তোমার আরাধ্য দেবতা নাড়ুগোপাল—

ঘুমচোখে ভবতারিণীর ভিরমি খাবার মতো অবস্থা। তবু ধৈর্য ধরে থাকে। বলে সে—ঠাকুর, দয়া করো ঠাকুর।

—তোর ভক্তিতে আমি মুগ্ধ। তাই বলছি তোর দারুণ বিপদ। তোর ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে এক পাপী প্রেতাত্মা। তোর ভাসুরপো অনেকদিন আগেই হিমালয়ে মারা গেছে। তারই দুষ্ট আত্মা এসেছে তোর ঘরে তোর সর্বনাশ করতে। ওই পিশাচকে তুই তাড়া! নাহলে আমিই তোর মন্দির ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হব। ওই পিশাচ আমার মন্দিরও অপবিত্র করতে চায়। তোর সর্বনাশ করবে। সাবধান!

—ঠাকুর! ঠাকুর!

ভবতারিণী ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বালে।

ঘরে কেউ নেই। চন্দনের সুবাস—বাতাসে ক্ষীণ নূপুরনিক্কণ শোনা যায়।

ছাদে তখন কেষ্টা নূপুর নেড়ে মৃদু শব্দ করে চলেছে। হোঁৎকা নিচে পিসিমার ঘরে আলো জ্বলে উঠতে দেখে ইশারায় নূপুরনিক্কণ থামিয়ে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নেমে কেতোর ঘরে সেঁদিয়ে পড়ে যে যেখানে পারে শুয়ে পড়ে অন্ধকারেই।

সারা বাড়ি নিশুতি। কেউ জেগে নেই। ভবতারিণী জেগে উঠে বিছানায় বসেছে। তার সর্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপছে। জেগে উঠেছে মানদা।

—কি হল মা!

ভবতারিণী দৈববাণীর কথা বলতে পারে না। ঠাকুর-দেবতার কথা প্রকাশ করতে নেই, তবে জেনেছে ভবতারিণী তার সমূহ বিপদ, খাল কেটে সে কুমীরই এনেছে।

মানদা বলে—কি হল?

ভবতারিণী বলে—কেমন ভয় ভয় করছে রে।

মানদা শোনায়—আমার কথা মানো মা, বলো তো যোগীন গুণীনকে এনে গুনে গেঁথে দেখাও, বাড়িতে কু হাওয়া এসেছে।

দিব্যগতি চোটচাট খেয়ে ভিজে গোবর হয়ে বাড়ি ফিরে দেখে অন্যদিনের মতো তার ঘরে বিরাট খাবারের থালাও আসে না। খিদেতে পেট জ্বলছে তার, কেউ খাবার আনে না। তাই জল খেয়েই শুয়ে পড়েছিল।

সকালে ওর প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস। ডাক্তার বলে, রোজ দুমাইল হাঁটতে হবে নাহলে এত মাল হজম হবে না।

আজ সকালে বের হয়েছে দিব্যগতি প্রাতঃভ্রমণে। বেশ কিছুটা হাঁটার পর সরকার বাজারের কাছে গিয়ে বাতাসে গরম জিলাবী ভাজার গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। পেটের খিদেটা এবার চনমনিয়ে ওঠে। কাল বৈকাল থেকে খায়নি। সামনে মিষ্টির দোকানে বিশাল পরাতে চাঁই করা গরম জিলাবী দেখে বেঞ্চে বসে পড়ে বলে—ওইগুলো দাও, থালা সমেত।

দোকানদার তো অবাক এ হেন খদ্দের দেখে। ইদানীং দিব্যগতির জামারপকেটে ট্রাম-বাসের বাতিল টিকিটের মতো দু-চারখানা একশো টাকার নোট থাকে। একটা নোট বের করে দোকানীকে দিয়ে ওই বিশাল পরাতে স্তূপীকৃত জিলাবী নিয়ে বসে ইয়া গোবদা হাতের থাবায় একসঙ্গে আট-দশ খানা করে জিলাবী তুলে

মুখে পুরছে, দুবার এগাল ওগাল করে কোঁৎ করে উদর গুহায় চালান করে আবার মুখে পুরছে জিলাবীর তাল।

দেখতে দেখতে পরাতের জিলাবী শেষ—

এবার পড়েছে লাড্ডুর থালা নিয়ে, কেজি পাঁচেক লাড্ডুও ফিনিস —তারপর আবার একশো টাকার নোট দিয়ে একটা ছোট গামলার এক গামলা রাজভোগ টপাটপ মুখে পুরছে।

ততক্ষণে বাজারে রটে গেছে কোনো এক দৈত্য এসেছে আর তার জলযোগের খবরও ছড়িয়ে যেতে বেশ কিছু কৌতূহলী দর্শকও ওই ভোগলীলা দেখতে জুটে গেছে। একাটা ছেলে অন্যকে বলে—বিশে, সরে আয়। ও নররাক্ষস—তোকেও গিলে ফেলবে।

এবার বাল্যভোগ শেষ করে উঠল দিব্যগতি। বাড়ির দিকে রওনা দেয়—ততক্ষণে পিছনে বেশ ছোটখাটো জনতা জুটে গেছে। তারা চলেছে ওই মালটি কোথায় থাকে দেখার জন্য। জনতা ভয়ে ভয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে ওর পিছনে চলেছে। কাউকে ধরে ঘাড় মটকে দেবে কিনা কে জানে!

সকালে মানদা এসেছে ভয়ে ভয়ে দিব্যগতির ঘর পরিষ্কার করতে। এসময় ও থাকে না। কিন্তু মানদা ঘরে ঢুকে খাটের তলায় দেখে হাড়গোড় ছিটানো রয়েছে।

ভয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বিকট চিৎকার করে ওঠে মানদা—ওরে বাবারে—

ছুটে আসে লোকজন, ভবতারিণী ঠাকরুনও।

—কি হয়েছে রে মানদা?

মানদা ভয়ে কাঁপছে। বলে সে —ঘরে দ্যাখোগে হাড়গোড়। মা, বলিনি ও মানুষ নয়। রাতের বেলায় কোথায় যায় সূক্ষ্ম দেহে—দ্যাখোগে হাড়গোড় চিবিয়ে আসে।

—এ্যাঁ!

দেখা যায় সত্যি খাটের নিচে, কোণে—দিব্যগতির ঘরে হাড়ের স্তূপ। ভবতারিণীও কাল থেকেই ভৌতিক কাণ্ডই দেখছে। মনে পড়ে তার সেই দৈববাণীর কথা। কুলদেবতা নাড়ুগোপালও স্বপ্নে তাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন—সাবধান করেছেন ওই লোকটার সম্বন্ধে।

ও নিশ্চয়ই মানুষরূপী কোনো দুষ্ট আত্মা, তার সর্বনাশ করতে এসেছে ওই দুষ্ট আত্মা।

হঠাৎ পূজারী ঠাকুর এসে পড়ে। জানায় সে—সর্বনাশ হয়েছে মা। মন্দিরের কোণে একটা বড় হাড় পড়ে আছে। মন্দির অপবিত্র হয়ে গেছে মা—

এবার দৈববাণী বর্ণে বর্ণে ফলছে, শিউরে ওঠে ভবতারিণী—এ কি সর্বনাশ হল ঠাকুরমশাই, এ কি কুগ্রহ ঢুকল বাড়িতে! কখনও তো এমন হয়নি।

মানদা বলে—বলিনি কু বাতাস এসেছে, সর্বনাশ না হয়। কালই ঘাড় মটকে দিত—নেহাৎ বেঁচে গেছ মা ঠাকুরের দয়ায়।

ভবতারিণী আর্তনাদ করে—এখন কি হবে?

—প্রায়শ্চিত্ত, হোমযজ্ঞ করতে হবে মা। পূজারী বিধান দেয়।

এমন সময় দোতলা বারান্দা থেকে গেটের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে ভবতারিণী।

দিব্যগতির পিছনে বেশ একটা জনতা—কেউ ঢিল, কেউ নর্দমার খিঁচ তুলে ছুঁড়ছে। বিশাল দেহ নিয়ে দিব্যগতি এ বাড়ির গেটে ঢুকে পড়ে, দারোয়ান গেট বন্ধ করে জনতাকে রোখে, কিন্তু তাদের চিৎকার থামে না—নররাক্ষস রে—ধর বকরাক্ষসকে। কে বলে—শালা মানুষ নয়—দৈত্য রে।

দিব্যগতি ঢিল পাটকেল খেয়েছে—কপালে চোট, গায়ে কাদা। তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো চোখ কপালে তুলে ছুটে আসছে। দোতলায় উঠে এসেছে।

তাকে ওই অবস্থায় দেখে ভয়ে এরা সরে যায়। কেউ পালায়, ভবতারিণী দেওয়ালে সেপটে লেগে কাঁপছে ভয়ে। দিব্যগতি ছুটে এসে কোনোদিকে না চেয়ে তার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে

হাঁপাতে থাকে। হিমালয়ের নির্জনে এতকাল বাস করেছে—কিছু বন্যজন্তুদের দেখেছে, কিন্তু মানুষ নামক জন্তুরা যে এমনি উন্মাদ, হিংস্র হতে পারে, এ ধারণা তার ছিল না। ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে এসে এবার দিব্যগতি নিশ্চিন্ত হয়।

ভবতারিণী মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। আর তার কোনো সন্দেহই নেই যে ওই নবাগত মালটি নরদেবতা নয়, অপদেবতা। পাড়ার লোকও সে খবর জেনে গেছে।

মানদা বলে ভবতারিণীকে আমাকে ছুটি দাও মা, এ বাড়িতে আর নয়। কাল বেঁচেছি—এবার ঘাড় মটকে রক্ত খাবে।

গুপীনাথ সরকার ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে বলে—বাড়ি যেতে হবে মা।

পূজারী ঠাকুরও পূজায় বসতে রাজী নয়।

চারিদিকে সমূহ বিপদ।

এবার ভবতারিণী এসেছে কার্তিকেব এঁদো ঘরে। বলে ভবতারিণী—ওরে কেতো, বাঁচা বাবা। এ কি সর্বনাশ হল রে এ বাড়িতে?

কার্তিক আজ অভিমানভরে বলে—তোমার বংশধর এসেছে, এ বাড়ির সর্বেসর্বা। তাকেই বলগে পিসিমা। ঢের হয়েছে, বাইরে একটা চাকরি পেয়েছি। আজই চলে যাচ্ছি এ বাড়ি ছেড়ে।

ভবতারিণী এবার প্রমাদ গণে। চারদিকে বিপদ। এখন একমাত্র ভরসা ওই কার্তিক। আর ওব বন্ধুরা। সেই কার্তিকই যদি চলে যায় এখান থেকে, চরম সর্বনাশ হবে ভবতারিণীব। ওই দৈত্যটা ঘাড মটকে দেবে এবার তার।

ভবতারিণী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—ভুল করেছিলাম বে। মোহেব বশে মহা ভুল কবেছি কার্তিক। আমাকে বাঁচা বাবা, ওই দিব্যগতি মানুষ নয়—প্রেতাত্মা। ও শেষ কবে দেবে আমাদেব। ওব বিহিত কর বাবা।

কার্তিক তবু দাম বাড়াবার চেষ্টা কবে—আমি কি কবতে পারি।

ভবতারিণী বলে—তুই চলে যাস্‌নে। আমার যা কিছু তোর। তোকে চাকবি করতে হবে না। তুই থাক এখানে। নাহলে আমি বাঁচবো না রে। পিসিমার কথা শোন বাবা!

কার্তিক মোচড় দেয়—ঠিক তো!

—হ্যাঁ। নাডুগোপালের দিব্যি করছি। আমাকে বাঁচা বাবা। তাড়া ওই যমদূতকে। তোব বন্ধুদের ডাক।

কার্তিক দেখছে পিসিমা এবাব লাইনে এসেছে। বলে কার্তিক—ওসব প্রেত-ট্রেত বিতাড়ন করতে বড ওঝা, তান্ত্রিক আনতে হবে। নাহলে মেরে ধরে তাড়ালেও ওরা সূক্ষ্ম শরীরে এসে ক্ষতি করবে।

ভবতারিণী বলে—যা করতে হয় কর। টাকাকড়ির জন্য ভাবিস না। হাজারখানেক টাকা রাখ, আজই বিহিত কর ওটার। কি সর্বনাশই করেছি বাবা।

হোঁৎকা-কেষ্টার দল বেশ যুৎ করে নেপাল কেবিনের চপ, কাটলেট খেতে খেতে বলে—কি রে কেতো, অঙ্ক মিলছে তো। বলিনি—এ সিঁড়িভাঙা অঙ্ক। ধাপে ধাপে নামতে হবে।

মদন বলে—শেষ কাজটাও করে ফ্যালো।

হোঁৎকা বলে—গম্বু ওস্তাদ তো নিদেন দুশো টাকা—দুটো বোতল চাইবে এ কাজ করতে গেলে।

কার্তিক বলে—শ'পাঁচেক অবধি উঠতে পারি। কাজ হলে আরও মালকড়ি দেব। আর আমি যদি বাড়িতে পজিশন পাই—তোদের কথা ভুলবো না রে। চল গম্বুদার কাছে।

গম্বুদার পুরো নাম গগনমোহন ব্যানার্জি। এমনিতে সর্বঘটে কাঁঠালি কলা। তারাপীঠে নাকি তার নিজের আশ্রম আছে। কলকাতাতে সে তন্ত্রমন্ত্রও করে আবার শখের যাত্রার দলে অভিনয়ও করে ভীম, মহিষাসুর ইত্যাদি কিছু মার্কামারা রোলে। মেকআপ করে জটাজুট ধারণ করে যখন আসরে হুঙ্কার ছাড়ে, দর্শকদের বুক কেঁপে ওঠে।

এ হেন গম্বুদা ওই হোঁৎকা বাহিনীর কথা শুনে হা হা করে হেসে ওঠে। বলে—এ তো সামান্য কাজ। তোদের জন্য করে দেব। তবে মেকআপ-টাপের খরচটা দিবি আর দু বোতল বিলাইতি চাই। টু বটলস্ ওনলি উইথ চারটি চিকেন কাটলেট।

হোঁৎকা তাতেই রাজী। নাটকের শেষ অঙ্কে এসে থামা যাবে না।

ভবতারিণী ভয়ে কাঁপছে। ওদিকে মানদা, গুপী সরকার, নবু সবাই তটস্থ। সারা বাড়িতে ভয়ের ছায়া নেমেছে।

ভবতারিণী বলে দারোয়ানকে—নন্দু সিং, ওই যমের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে লাঠি নিয়ে ওখানে মোতায়েন থাক, যেন বেরুতে না পারে।

নন্দু সিং বলে—ডর লাগে মাজী।

—তাহলে কারখানার দারোয়ান দুজনকে আনো গুপীনাথ। আটকে রাখো ওকে। ওঝা-তান্ত্রিক না আসা অবধি।

ওদিকে ঘরে বন্ধ দিব্যগতি, বেলা বাড়ছে। তার সেই বাল্যভোগ হজম হয়ে গেছে। এবারে খিদেটা চাগিয়ে ওঠে। ঘরে জলও আর নেই।

দরজা খুলতে গিয়ে দেখে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। খিদে-তেষ্টায় সে নাজেহাল হয়ে দমাদ্দম লাথি মারছে দরজার আর চিৎকার করে —দরজা খোলো! খোলো বলছি—খিদে পেয়েছে।

ওর হুঙ্কারে সারা বাড়ি কেঁপে ওঠে।

ভবতারিণী বলে—খবরদার, যেন বেরুতে না পারে।

জয় তারা! জয় তারা—

বিকটতর চিৎকারে চাইল ভবতারিণী।

এবার যেন ভরসা পায় সে। হোঁৎকা-কার্তিকরা দলবল নিয়ে ঢুকছে, আগে আগে আসছে বিশালদেহী জটাজূটধারী ত্রিশূল হাতে এক বিরাট পুরুষ। ভাঁটার মতো চোখ দুটো লাল—ইয়া কপালে লম্বা করে টানা সিঁদুর।

বাড়িতে পা দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে বাতাসের গন্ধ শুঁকে—এ যে ঘোর দুরাত্মা এক পিশাচের গন্ধ পাচ্ছি মা। সর্বধ্বংসী রক্তপায়ী পাপাত্মার আবির্ভাব ঘটেছে এখানে—

ভবতারিণী মহারাজকে প্রণাম করে বলে—বাঁচাও বাবা ওর হাত থেকে।

গম্বুদা গর্জে ওঠে—কোনো ভয় নেই মা। আমি এসে গেছি। জয় মা তারা—বোম্ বোম্ বোম্ জয় তারা!

এর মধ্যে হোমকুণ্ড তৈরি হচ্ছে কাঠ ঘি হবি সবই এসে গেছে।

বলে গম্বু মহারাজ—তার আগে ভূতকে সযুত করতে হবে। ওকে দেহে-মনে ঘা দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলব—যাতে এ বাড়ি ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না। দু সের লঙ্কা—শুষ্ক লঙ্কা আর পাঁচ সের অশ্বত্থকাঠ তৎসহ ধূপ।

তাই এসে যায়।

দিব্যগতি ভিতরে তখন ক্ষুধা-তেষ্টায় গর্জন করছে—বন্দী হয়ে রয়েছে সে। আর খেতে এরা দেবে না তা বুঝেছে। এও বুঝেছে এখানে কি যেন একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র চলেছে তার বিরুদ্ধে।

তারপরই বন্ধ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে সেই তীব্র ঝাঁঝালো ধোঁয়ার রাশি। গনগনে আগুনে শুকনো লঙ্কাপোড়ার ধোঁয়া ঘরে ঢুকতে এবার কাশির দমকে দিব্যগতির পরমগতি লাভ হবার পথই হয়ে ওঠে।

আর্তনাদ করছে সে—আমাকে বের করে দাও। মরে যাবো। বের করে দাও। ওরে বাবা!

ওর আর্তনাদে গম্বু গর্জন করে—আর গৃহস্থের সর্বনাশ করবি! ব্যাটা ভূত কোথাকার—মানুষ সাজার শখ! দুরাত্মা—

আবার লঙ্কার ধোঁয়া ঝলকে ঝলকে ঘরে ঢুকছে। ওর আর্তনাদ বেড়ে ওঠে।

—ছেড়ে দাও। এখানে থাকব না। চলে যাব। বাঁচাও।

দরজা খুলতেই দিব্যগতি লাফ দিয়ে বের হয়ে আসে। কিন্তু চোখে তখন অন্ধকার দেখছে। মানুষের সমাজের বাইরেই সে ছিল এতদিন হিমালয়ের গুহায়। মানুষ যে এমন সাংঘাতিক জীব এটা তার জানা ছিল না।

কিছু করার আগেই ওরা দিব্যগতিকে বেঁধে ফেলেছে। এবার গম্বু মহারাজ গর্জায়—কেন? কেন এসেছিস এখানে?

হাঁপাচ্ছে দিব্যগতি। আজ তার এখানে আসার চরম মূল্য দিতে হয়েছে। বলে সে—আর আসবো না। চলে যাচ্ছি। দোহাই তোমাদের ছেড়ে দাও আমাকে। ঢের হয়েছে।

গর্জায় গম্বু—ঠিক তো? চলে যাবি?

—এখুনিই। এই মুহূর্তেই।

গম্বু গর্জায়—না হলে তোকে শেষ করব। এবার ত্রিশূল তুলেছে, যেন গেঁথেই ফেলবে।

দিব্যগতি বলে—মেরো না, চলে যাচ্ছি।

আয়োজন করাই ছিল আগে থেকে।

হোঁৎকা-কেষ্টা-ফটিক এসব হিসাব করে রেখেছিল। খোলকর্তাল নিয়ে হরেকেষ্ট বৈরাগীর দলও রেডি। এবার তারাও নামগান শুরু করে।

দুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামছে, সারা এলাকার লোকজন অবেলায় ওই নামগান আর বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখে অবাক হয়।

আগে আগে চলেছে বিশালদেহী এক দৈত্যসদৃশ মানুষ, কপালে গায়ে কাদা শুকিয়ে গেছে, চোখ লাল—টলতে টলতে পবাজিত বিধ্বস্ত ওই জীব মানুষের সমাজ-সভ্য জগতের বুক থেকে ফিরে চলেছে আবার কোন দূর নির্জনে।

পিছনে খোলকর্তাল বাজিয়ে বিশাল জনতা চলেছে ওই বিদেহী আত্মার কুশপুত্তলিকা নিয়ে।

গম্বু মহারাজ মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে—জয় তারা—বোম্ বোম্ বোম্।

ভবতারিণীর গৃহ থেকে সেই দুষ্ট আত্মাকে তারা বিতাড়িত করেছে মহাসমারোহে।

হিমালয়ের কোনো গুহার সামনে এক প্রবীণ সন্ন্যাসী। দেখছে ওই বিধ্বস্ত ক্ষতবিক্ষত দিব্যগতিকে। আবার সে সেই হিমালয়েই তাদের আশ্রমে ফিরে গেছে এই জগৎ থেকে। প্রবীণ মহারাজ বলে—তখনই নিষেধ করেছিলাম বৎস—শুনলে না। মানুষের সমাজে ফিরে গেলে—কিন্তু সেই জগৎ যে কত হৃদয়হীন কঠিন—তা এবার বুঝেছ তো?

দিব্যগতির চোখে জল। গুরুদেবের পায়ে পড়ে বলে—বাঁচান গুরুদেব। মহা ভুল করেছিলাম।

তবু আলো জ্বলে—সানাই-এর সুর ওঠে এই জগতে। ভবতারিণীর বাড়িটায় আজ আলোর মেলা—আনন্দ কোলাহল ওঠে।

কার্তিকের বিয়ে। ভবতারিণী এবাব কার্তিককেই স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর রজনীগন্ধাকেই এ বাড়ির বৌ করে এনেছে।

উৎসব-আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই। হোঁৎকা-কেষ্টা-ফটিক-মদনরা আজ অক্লান্ত পরিশ্রম করে অতিথিদের আপ্যায়ন করছে। কার্তিকও খুশি।

হোঁৎকা বলে—কি বে কেতো! বলিনি সব মেঘ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে এই হোঁৎকার দল। এখন কথাটা বিলিভ করিস তো? রজনীগন্ধা কি বলে?

কার্তিক বলে—সব তোদের জন্যই হয়েছে রে। দিব্যগতির জন্য কষ্ট হয়।

হাসে হোঁৎকা—একজনকে সুখী হতে গেলে অন্যজনকে কষ্ট পেতেই হবে। চল খাবি না? চিলি চিকেনটা দারুণ জমে গেছে।

মধুমাস

চড়াই ঠেলে যাত্রিবোঝাই বাসটা খররোদে ক্লান্ত একটা তাড়া-খাওয়া জানোয়ারের মতো এসে দম নিচ্ছে। রাস্তার দু'দিকে গজিয়ে উঠেছে ঝুপড়ির দোকানপত্র। মনোহরী, ছিট-কাপড়ের দোকান, দু'একটা চায়ের দোকানও, ওই ঝুপড়ির মধ্যে মাথা তুলেছে দু'একটা পাকাবাড়িও, ঝুপড়ি থেকে উন্নীত হয়েছে ওরা পাকা দালানে।

নবকেষ্টর দোকানটা দেখতে দেখতে বদলে গেছে, লম্বা হলঘরে নতুন টেবিল-ফোলডিং চেয়ারও লাগানো হয়েছে, ওদিকে চায়ের কাউন্টার, একদিকে বড় টবে বরফের টুকরো চাপা দেওয়া কোল্ড ড্রিংকসের বোতল।

বাস থেকে রোদে-পোড়া যাত্রীরা এই হলঘরে দু'দণ্ড পাখার নীচে বসে কোল্ড ড্রিংকস খায়, কেউ হাঁক পাড়ে—চা, গরম সিঙ্গাড়া আনো হে।

নবকেষ্টর নজর চারদিকে। সাবধানী মানুষ সে, হিসাবীও। না হলে তার পিতৃদেব এইখানে একদিন ডালায় করে চপ-পিঁয়াজী বেচতো—তখন এত বাসও ছিল না, ছিল না কোনো ঘরবাড়ির চিহ্ন। এ ছিল পরিত্যক্ত রুক্ষ কপিশ প্রান্তর। আজ দিন বদলের পালায় সেই মৃত পতিত প্রান্তরের রূপ বদলেছে, দিন বদলের এই খেলায় গতিকেষ্টর পুত্র নবকেষ্টও তাদের হাল বদলেছে।

এদিকের বাস চলে যেতে না যেতেই আবার ওদিকে এসে দাঁড়িয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর, আরামবাগ থেকে ক্লান্ত যাত্রিবোঝাই বাসগুলো ইস্পাতনগরী দুর্গাপুর ঢোকবার আগে এখানে দম নিচ্ছে।

নবকেষ্ট একা পারে না—তার বাবা গতিকেষ্টর বয়স হয়েছে, দোকানে আর বসে না। তাই ছোট ভাই দেবকেষ্টও আসে। তবে তারও ব্যবসাপত্র আলাদা করে করার ইচ্ছে। সুযোগও খুঁজছে। মটর বাইক হাঁকিয়ে আসে দেবু।

ও বলে—ওই চা-সিঙ্গাড়া-রসগোল্লা-মণ্ডার কারবার কি যে করো? হৈ-হল্লাই বেশি।

গতিকেষ্ট হাসে—ছেলে সাহেব হইছে গো। এই বাপুতি ব্যবসায় মন বসে না।

ভাইকে নবকেষ্ট বলে—এর থেকেই সব রে।

কথাটা দেবুর মনঃপূত নয়। সে আজও অনেক বড় স্বপ্ন দেখে।

এই জনবসত সবে গড়ে উঠেছে।

এর বয়স কয়েক বছর মাত্র। গতিকেষ্টর চোখের সামনে ছবিটা আজও মুছে যায়নি।

দুর্গাপুর-বাঁকুড়া সড়কটা পাতাজোড়া গ্রামের বাইরে দিয়ে সাতজোড়া বনের পাশ চিরে গেছে, পিচের প্রলেপ তখনও পড়েনি, খোয়া পাথর মোরাম ঢাকা পথ, তাও এবড়োখেবড়ো, পথটা গিয়ে নীচের উতরাই-এর শেষে দামোদরের বিস্তীর্ণ বালুচরের সামনে থেমেছে। এখানে বাঁকুড়া থেকে দিনান্তে দু'খানা জরাজীর্ণ বাস ধুঁকতে ধুঁকতে এসে থামত, কিছু যাত্রী নেমে ওই দু'মাইল বালি —কিছু জলধারা পার হয়ে হেঁটে কোনোমতে বেশ কিছু পথ পার হয়ে দুর্গাপুর স্টেশনে পৌঁছত।

বিস্তীর্ণ শালবনের বাইরে ছোট স্টেশনটা পড়ে থাকত, লোকজনের ভিড়ও হত না। সন্ধ্যার পর তারাও চলে যেত, বনে–প্রান্তরে নদীর বালিচর মানাবনে তখন ঘুরত হিংস্র ঠ্যাঙাড়ের দল। ফাঁক পেলেই লুটপাট করত। রাতের আরও গভীরে দুর্গাপুর জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসত বনশুয়োর, চিতা, নেকড়ে দু'একটা, নদীর জলে তাদের তৃষিত জিবের শব্দ উঠত চক্ চক্ চক্।

বর্ষাকালে ওই মরা বালিচরে ঢল নামত। গেরুয়া ঢল। দামোদর তখন দুকূলপ্লাবী সর্বনাশা জলস্রোত বুকে নিয়ে উন্মাদ হয়ে উঠতো। খেয়া নৌকা থাকত, কিন্তু বেশি বান হলে পারাপারও বন্ধ হয়ে যেত। কালো মেঘের দল ছেয়ে আসত দুর্গাপুরের কাছিমের পিঠের মতো ঘন সবুজ অরণ্যসীমার ঊর্ধ্বাকাশে।

গতিকেষ্ট অতীতের সেই দিন থেকে দেখেছে এই গ্রাম, তাদের বনভূমি—নির্জন দিগন্তপ্রসারী তাম্রাভ প্রান্তরকে শীতের কাঠিন্যে, বর্ষার স্নিগ্ধসজল পরিবেশে, গ্রীষ্মের দাবদাহক্লিষ্ট রুক্ষতায়।

পথের ধারে একটা কুঁকড়ে ওঠা বটগাছের নীচে বসে থাকত গতিকেষ্ট তার সামান্য পশরা নিয়ে পথচারীদের সন্ধানে। লোকজনও যাতায়াত তেমন করত না।

গতিকেষ্ট একাই ডালায় কিছু বাসি তেলেভাজা, শুকনো মণ্ডা নিয়ে বসে থাকত।

দূরে থানা—গাঁজা-আফিমের দোকান। কয়েকটা বেঁটে কাঁঠাল গাছ যেন বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে ক্লান্ত হয়ে ধুঁকছে।

প্রান্তরের এককোণে থানা—তার লাগোয়া দু' চারটে থানাবাবুদের বাসাবাড়ি—তারপরেও কিছুটা মাঠ পার হয়ে গ্রাম।

এই রাস্তাটা সভয়ে যেন গ্রামকে এড়িয়ে তাড়া-খাওয়া একটা প্রাণীর মতো বনভূমিতে ঢুকে গেছে, গেছে বাঁকুড়া শহরের দিকে, অন্য একটা রাস্তা গঙ্গাজলঘাটির দিক থেকে সে প্রান্তর-চড়াই পার হয়ে এখানে এসে মিশেছে। জনমানবহীন প্রান্তরে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামত। পথচাবী, গরুরগাড়ি চলাচলও বন্ধ হয়ে যেত, গতিকেষ্ট সারা দিনের বিক্রির সামান্য টাকা পয়সা নিয়ে ঘরে ফিরত, প্রান্তরে তখন আরণ্যক নির্জন অন্ধকার নেমেছে।

—প্যার হো গিয়া।

বিকট একটা যেন আর্তনাদ ওঠে।

গতিকেষ্ট বাড়ির দিকে ফিরছে। চারিদিকে অলোর বন্যা, বড় রাস্তার ধারে আশাপাশের প্রান্তরে এখন বাড়ি উঠেছে—বাহারের বাড়ি। নীল—উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে যায় বাস, ট্রাক-প্রাইভেট গাড়িগুলো, মাইক বাজে। দূর আকাশ সীমান্তে আর আঁধার আকাশে তারার স্নিগ্ধ আলোর আভা নেই, সেখানে ওঠে তীব্র আলোর ঝলক, কি দুঃসহ বেদনায় সেই আকাশ-সীমা রক্তাক্ত। দুর্গাপুর লোহাবখানার স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের পরিত্যক্ত জ্বলন্ত স্ল্যাগের অগ্নিজ্বালা ওঠে।

—কাকা!

কার ডাকে চাইল গতিকেষ্ট। চোখের চাহনি কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। এখন এখানে বসেছে বড় রাস্তার ওদিকে পাশকরা বড় ডাক্তার। সে বলে—ছানি পড়ছে গতিবাবু!

গতিকেষ্ট তবু আবছা দেখতে পায় মেয়েটিকে।

—রমা? ফিরলি নাকি!

—হ্যাঁ, সাতটার বাসে নামলাম। শরীর ভালো আছে তো?

এ গ্রামেরই মেয়ে রমা, ওর বাবা গতিকেষ্টর বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই চেনে গতিকেষ্ট রমাকে।

রমার কথায় বলে গতিকেষ্ট—আর শরীরের দোষ কি মা? সত্তর বছর পর আর শরীর কত সইবে বল?

দুজনে চলেছে গ্রামের দিকে। অনেকেই ফিরছে।

বিষ্টু মুখার্জি পাতাজোড়া গ্রামের এককালে ছিলেন গৌরব। সপ্ততীর্থ, বিরাট পণ্ডিত। কাজোবার বাবুদের টোলের অধ্যক্ষ ছিলেন; নির্লোভ মানুষ। জীবনে কাব্যচর্চা—পঠন-পাঠন নিয়েই ছিলেন। গ্রামে জমিজমা ঘরবাড়ি ছিল, মাঝে মাঝে গ্রামে আসতেন, তখন অনেকেই আসত। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ছিল প্রগাঢ় জ্ঞান। গতিকেষ্টর বাল্যবন্ধু। আজ সপ্ততীর্থ মশায় গ্রামে আছেন, কিন্তু দিন বদলেছে। সেই সঙ্গে তাঁর খ্যাতি-সুনামও অস্তমিত। আজকের পাতাজোড়া, নিউ টাউন-এর লোকজন তাঁকে চেনে না।

রমা তাঁরই মেয়ে। দুর্গাপুর কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে এখন দুর্গাপুর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে সেখানে যাতায়াত করছে কাজের সন্ধানে রমা, বাঁচার জন্য লড়ছে।

গতিকেষ্টও জানে সেটা। আগের দিনে এসব ছিল না। যেভাবে হোক বিয়ে থা হত, কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটত

স্বামীর ঘরে, ছেলেপুলেও হত, সংসার ঘর হত মেয়েদের।

এখন ঘরের ঠিকানা এদের হারিয়ে গেছে।

গতিকেষ্ট শুধোয়—কিছু কাজের খবর হল মা?

রমা হাসল। পায়েব আধছেঁড়া জীর্ণ স্যান্ডেলটা টানতে টানতে বলে ক্লান্তস্বরে।

—বলছেন তো এঁরা, কিছু হবে।

নিউ টাউন অর্থাৎ প্রান্তরে নতুন গড়ে ওঠা পাতাজোড়ার সেই জাঁকজমক, চড়া সুর—আলোর ঝলক গ্রামের মধ্যে নেই। পুরোনো কালের গ্রাম,পথের দু'দিকে গায়ে গায়ে লাগানো মাটির বাড়ি, মাঝে মাঝে দু'একটা পাকাবাড়িও উঠছে আজকের সমৃদ্ধির চিহ্ন নিয়ে। দু'একটা বাড়িতে মিটমিটে বিজলির বাতি জ্বলে—আবার অন্ধকার।

গতিকেষ্টর বাড়িটার চেহারা অবশ্য বদলেছে। আগেকার মাটির বাড়ির ওদিকে ছেলেরা নতুন দালান তুলছে, বিজলি বাতিও জ্বলে সেখানে। সামনে বাগানও করেছে দেবু, বাইরের ঘরে জোরে রেডিও বাজছে, হৈ-চৈ এর শব্দ ওঠে।

গতিকেষ্ট ও-বাড়িতে থাকে না। সাবেক মাটির বাড়িতেই থাকে বুড়ো-বুড়িতে। বলে গতি—চলি মা। কাল যাব বাবাব ওখানে।

—আসবেন।

রমা চলে যায় ওদের বাড়ির দিকে। গ্রামের পথেব বিশেষ কোনো উন্নতি হযনি। যত উন্নতি, আধুনিকতার ছোঁয়া—ঝলমল ভাব লেগেছে নিউ টাউনে। এখানে তার ছিটেফোঁটা মাত্র এসেছে।

ওাদিকে আবছা অন্ধকারে দু একটা আলো জ্বলছে। গ্রামের অতীতের জমিদার শিবপদবাবুর বাড়ি ওটা।

এককালে ওদের ছিল এসব মুলুক, ওই প্রান্তর, বন—আরও আশপাশের পত্তনি। কাছারি বাড়িতে লোকজন—গোমস্তাদেব ভিড় লেগে থাকত। ওদিকে ঠাকুরবাড়ি, নাটমন্দির, সেখানে দোল-দুর্গোৎসবও হত ধূম করে। কত লোক প্রসাদ পেত।

আজ সেই জমিদারবাড়িটা টিকে আছে কোনোমতে তার সব বৈভব হারিয়ে। সামনের বাগানে অতীতের সমৃদ্ধিব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পামগাছ, নিঃশব্দ সে।

সুবিনয় বাবান্দায় আলো জ্বেলে পড়াচ্ছে কিছু ছাত্রদের। শিবপদবাবুব ছেলে সুবিনয়। পথ দিয়ে রমাকে ফিরতে দেখে বলে—এত দেরী?

বমা বলে—বাস ছিল না।

সুবিনয় দেখছে রমাকে। দু'জনেই অতীতের হৃত-বৈভবের শেষ চিহ্ন হিসেবে টিকে আছে ওই পামগাছটার মতোই।

রমা বলে—চলি। পরে দেখা হবে।

গ্রামের এদিকটাকে এক প্রান্তই বলা যায়। সভ্যতার আলো এখানে পৌঁছেনি এখনও। হঠাৎ সরু পথে জোরালো হেড লাইটের আলোটা পড়তে দেখে চাইল, শান্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে এগিয়ে আসছে মোটর বাইকটা।

সেটা এসে থামল ওর কাছেই।

—তুমি!

রমা চাইল। দেবুই দেখছে ওকে।

দেবুর পরনে প্যান্ট, বুশসার্ট। মুখে সিগারেট। রমাও অবাক হয়েছে দেবুকে ওই বেশে দেখে। ইদানীং দেবু বেশ বহাল তবিয়তেই আছে।

—কোথায় গেছলে? দুর্গাপুরে?

ঘাড় নাড়ে রমা। দেবু একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে—কি করতে ওখানে যাও? ঠিক আছে, পরে দেখা হবে। অনেক কথা আছে। চলি।

দেবু মোটরবাইকটা স্টার্ট করে বের হয়ে যায়, দেখে রমা—একা নেই দেবু, তার 'বুলেট' মোটর সাইকেলের কেরিয়ারে তার কোমর ধরে বসে আছে আর একটি মেয়ে, হাতকাটা ব্লাউজ পরে, শাড়িটা ব্লাউজের ওপর জড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

আলো-আঁধারিতে ঠিক চিনতে পারে না ওকে। মনে হয় মুখুজ্যে পাড়ার বুলুদিই। ওরা বের হয়ে গেল অন্ধকারে ঝড় তুলে।

বিষ্টুপদ সপ্ততীর্থ আজ অসহায় একটি মানুষে পরিণত হয়েছেন। শরীরের সামর্থ্য নেই। বারান্দায় চুপ করে বসে আছেন।

তাঁর ছেলে বিলাসকে এর মধ্যে চুল আঁচড়ে পায়জামা আর কলকাদার পাঞ্জাবি পরে বের হতে দেখে ডাকেন—কোথায় চললে?

বিলাস থমকে দাঁড়াল বাবার অসময়ের এই ডাকে। বিরক্তই হয় সে। নিউ টাউনে এখন গজিছে উঠেছে 'নবচেতনা ক্লাব'—সেখানে নাট্য পরিচালক-কাম হিরো সে। বিলাসের কাছে নাটক অভিনয়ই ধ্যান-জ্ঞান। অন্য ভাবনাচিন্তাও নেই তার। সপ্ততীর্থ মশায়ের কথায় বলে বিলাস—একটু নিউ টাউনে যাচ্ছি।

—কোনো কাজ-কম্মের চেষ্টা দেখছ? বললাম দুর্গাপুরে নিমেষবাবুর কাছে যেতে। এত লোক এর মধ্যে এত কিছু করছে, আর তুমি—ওই যাত্রা-নাটক নিয়েই থাকবে?

বিলাসের এই অপ্রিয় সত্যকথাগুলো ভালো লাগে না। দুর্গাপুর কারখানার চাকরি করে গ্রামের অনেকেই দেখেছে বিলাস নতুন গড়ে ওঠা পাতাজোড়ার নিউ টাউনে কতজন বাইরে থেকে এসে ছোটখাটো দোকান, ব্যবসাপত্র করছে, দুর্গাপুরের অনেক চাকুরেই এখানে এসে বাড়িঘর করে জুড়ে বসেছে, এখানে মনে হয় হাওয়ায় পয়সাও উড়ছে, কিন্তু ধরার কায়দাটা সে জানে না। তবু স্বপ্ন দেখে সে দিন বদলাবেই।

একদিন কলকাতার যাত্রার দলের নায়কের পার্ট পাবে সে. সিনেমাওয়ালারা লুফে নেবে তাকে। এখানের এই কঠিন মাটিতে খেটে খেতে হবে না. অপরিচিতের ভিড়ে হারিয়ে যাবে না সে। কথাটা ওই বুড়োকে বোঝাতে পারে না বিলাস। বাবার কথায় বলে—গেছলাম। সামনের সপ্তাহে যেতে বলেছেন।

বিষ্টুবাবু বলেন—তাই যা বাবা।

বিলাস বুড়োর হাত এড়িয়ে বের হয়। সামনে রমাকে দেখে চাইল। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রমা ফিরছে। দাদাকে দেখে বলে—মিথ্যা স্তোকবাক্য আর কত দিবি ওই বুড়ো মানুষটাকে?

বিলাস বোনকে দেখে বলে—যা তো, আর কি বলব বল? ভালো চাকরি চাইলেই মেলে? এ্যাঁ।

—একটা কিছু তো করতে হবে? রমা বলে ওকে।

বিলাস চটে ওঠে—করছি তো! তাই বলে লোহা ঠুকতে পারব না। মানসম্মান নেই?

রমা দেখছে দাদাকে। বলে সে—লোকের কাছে হাত পাতবি তবু মানসম্মান নিয়ে বসে থাকবি? কি এর দাম? আজকের দিনে মানসম্মানের মাপকাঠি টাকাতেই রে!

বিলাস জবাব দিল না। মেজাজটা তার বিষিয়ে গেছে। বের হয়ে পড়ে সে। ওদিকে রিহার্সেলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আজকের সভ্যতা এনেছে মানুষের মনে একটা দুঃসহ জ্বালা, অতৃপ্তি আর অনেক পাবার নেশা। তাই নবকেষ্টর ধ্যান-জ্ঞান পয়সা। রাত্রি নামে নিউ টাউনে। দোকানপত্র বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ হরজিৎ সিংকে দেখে চাইল। জিপ থেকে নেমে এগিয়ে আসে হরজিৎ সিং।

রাস্তার আশপাশে, ভিতরেও অনেক বাড়ি হয়েছে, হচ্ছে। তারও ওদিকে গঙ্গাজলঘাট যাবার রাস্তার

ধারে বনের লাগোয়া বিস্তীর্ণ চড়াইয়ের পাশে হরজিৎ সিং পাথর ক্রাশিং-এর মিল বসিয়েছে। দিনভোর সেখানে ট্রাকবন্দী পাথর আনে, মিলে সাইজ করে ভাঙা হয়। হরজিৎ সিং দুর্গাপুরেই বেশি থাকে। ঠিকাদারীর কাজ করে সেখানে—দেবুই তাকে এনেছে এখানে, দেবুর সঙ্গে পার্টনারশিপ করে ওই প্ল্যান্ট বসিয়েছে। কিন্তু এখন বিপদে পড়েছে তারা, পাথরের বেশ দাম। কিন্তু তাদেব এলাকায় তেমন ভালো পাথর বের হচ্ছে না। পাথর চাই, না হলে বিপদই হবে। হরজিৎ সিং বেশ বুদ্ধিমান, এলেমদার লোক।

নবকেষ্ট ওকে দেখে বলে—এসো সিংজী।

দোকানের ছেলেটাকে বলে—চা দে সিংজীকে!

সিংজী হাসে—আরে থাক দাদা, এ সময় চা আর খাই না। সিংজী চারিদিক চেয়ে বলে গলা নামিয়ে, —দুসরা চীজ খাই থোড়া থোড়া। দাদাজী স্রিফ চা কেন—ইখানে দুসরা চীজের বাজার কি আছে' দিনে চা—রাতমে পিছনে উ চীজ। চায়ের চৌগুণা নাফা—

নবকেষ্ট ভাবছে কথাটা। টাকা—অনেক টাকাই আসবে তার। আর জানে নবকেষ্ট এখানে আর ভিতরের গ্রামে প্রচুর মহুয়া গাছ আছে, বস্তা বস্তা শুকনো মহুয়াও মফস্বলের হাটে বিক্রি হয়। তারই চেনা অনেকে দূর দূরান্তরে চোলাই মহুয়ার মদ তৈরি করে দুর্গাপুরে চালান দিয়ে বড়লোক হয়ে গেল রাতারাতি।

সিংজী বলে—পাথর বিচে কি হোবে, উস্‌সে পানি বিচলে দুটো পয়সা হবে।

নিজের বুদ্ধির কথা ভেবেই সিংজী আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে! কথাটা নবকেষ্টরও মনে ধরেছে, এ ব্যবসায় নগদ লাভ অনেক।

নবকেষ্ট চতুর লোক। মনের ভাবটা চেপে রেখে বলে—ওখানে অনেক ঝামেলা সিংজী?

হাসছে হরজিৎ সিং—বহুৎ ডবপুক আদমি রয়ে গেলে দাদাজী—

ঠিক আছে, ডর হোয়—করবেন না। তবে মার্কেট বহুৎ ফিট আছে তাই বলেছি। চলি—দেবুবাবুকে বলে দেবেন এসেছিলাম। কাল ভেট হবে।

জিপটা হাঁকিয়ে চলে গেল। নবকেষ্ট ক্যাশ গুণতে থাকে।

তার বাবাও বহু বৎসর অতীতে এই জীর্ণ কাঁঠালতলায় দিনান্তে, চপ, পেঁয়াজীর ডালা মাথায় করে খুচরো পয়সা কটা গুণে বাড়ি ফিরত। আজ নবকেষ্ট ব্যাগে টাকার বাণ্ডিল নিয়ে ফেরে গ্রামে। মনে হয় গ্রামে নয়—এখানেই একখানা বাড়ি তুলবে। তুলেছেও।

মনোরমাও তাই চেয়েছিল।

নবকেষ্টর স্ত্রী মনোরমা যখন প্রথম এসেছিল এ-বাড়ির বৌ হয়ে তখন নদী পার হয়ে গরুর গাড়িতে চেপে ধূ-ধূ প্রান্তর, শালবন দেখে বলে—এ কোথায় এলাম গো?

কলকাতার কাছে শ্রীরামপুর টাউনের মেয়ে সে। এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে হাঁপিয়ে ওঠে। বলে সে—এখানে থাকতে পারব না বাপু।

শ্বশুর গতিকেষ্ট তখন সবে রাস্তার ধারে একটা খড়ের চালা বানিয়ে চা বেচছে, শুরু হয়েছে দামোদরের বুকে বাঁধের কাজ। দুর্গাপুরের বন কেটে নতুন শহর, কারখানার পত্তন হচ্ছে। গতিকেষ্ট হিসাবী লোক। গ্রামের দূর মাঠের কিছু ধানজমি বেচে রাতারাতি মুখুজ্যেবাবুদের কাছ থেকে ঘাস হয় না এমন ব্রহ্মডাঙায় একলপ্তে দশবিঘে জমি নিয়ে বসতে গিন্নী ফুঁসে ওঠে—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? ধানের জমি বেচে কিনলে কিনা বেহ্ম ডাঙা!

গতিকেষ্ট বলে—কিনলাম, দেখো ওখানেই সোনা ফলবে।

আজ তাই হয়েছে, নবকেষ্ট অবশ্য নিজেও বেশ কিছু জমি কিনেছে—তবে দর পড়েছে অনেক। বাবা কিনেছিল বিঘে প্রতি পঁচিশ টাকা সেলামী আর বাৎসরিক একটাকা খাজনা, তার পিছনের জমি কিনেছে নবকেষ্ট বিঘেপিছু পঁচিশ হাজার টাকা, এখন বিঘের হিসেব আর নাই, বহু পিছনের ডাঙার দর চার হাজার টাকা কাঠা।

মনোরমাও এখন বদলে গেছে।

রূপ তার ছিল, যৌবনও। ক'বছরে প্রাচুর্যের চিহ্ন হিসেবে দেহে ঈষৎ মেদের সঞ্চার হলেও রূপটাকে বিবর্ণ হতে দেয়নি। ছেলেবেলায় গান-নাচ শিখেছিল শ্রীরামপুরে। তার ইচ্ছা ছিল ছবিতে নামবে; বাবার অবস্থাও তেমন ছিল না। মেয়ের বিয়ে দেবার সামর্থ্যও ছিল না, তাই সেদিনের মনোরমা বাড়িতে কিছু স্বাধীনতাই পেয়েছিল। পাড়ার দু'একজন দাদা হঠাৎ তার দিকে একটু বেশি মনোযোগী হয়ে তাকে শিল্পী তৈরি করার জন্য কলকাতার স্টুডিও পাড়াতেও নিয়ে যেতে শুরু করে। মনোরমা তখন স্বপ্ন দেখছে শিল্পীই হবে।

নিজের রূপযৌবন সম্বন্ধে একটা ধারণা তার ছিল, দেখেছে সে তখন থেকেই পুরুষের চোখে তার জন্য নীরব আর্তি। দু'একটা ছবিতে ছোটোখাটো অভিনয়ও করেছিল। তার জন্য মূল্যও কিছু দিতে হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ বিয়ের যোগাযোগ হয়ে যায়! নবকেষ্ট তখন ওখানের কোনো দোকানে কাজ করে।

এখানে এসে সেদিন মনোরমা ডাক-ছেড়ে কাঁদতে চায়। এ কোন্ এক জগৎ থেকে কোন্ এক দূর নরকে সে নির্বাসিত হয়েছে।

মনোরমার মন কাঁদে এখানে এসে, মরিয়া হয়ে উঠেছিল মেয়েটা। মাঝে মাঝে ভেবেছিল পালাবে এখান থেকে। তার শ্রীরামপুরের দু' একজন দাদাকেও চিঠি দিয়েছিল তাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে, কিন্তু সেই দাদারা বিয়ে হয়ে যাওয়া কোনো মেয়ের জন্য আর কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। তাই সাড়াও দেয়নি।

মনোরমা দুনিয়াটাকে চিনেছে চোখের জলে।

তারপর দিন বদলেছে, নবকেষ্ট এখন অনেক পয়সার মালিক হয়েছে, মনোরমা প্রথমে তাই পয়সা পেয়ে পুরোনো সেই গ্রামের বাড়ি, তাদের সেই পরিবেশ আর শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রাধান্যময় মেটেবাড়িটা থেকে নিউ টাউনের বাড়িতে সে উঠেছে।

ছেলেপুলে হয়নি তাদের, শাশুড়ী বৃন্দা সেকেলে মেয়ে, দুটো ছেলেকে নিয়ে গতিকেষ্টর সংসারে লড়াই করেছে বাঁচার জন্য, মুড়ি ভেজেছে আর চপ-পেঁয়াজী ভেজে স্বামীকে ডালা সাজিয়ে বড় রাস্তার ধারে পাঠিয়ে নিজে সংসারের হ্যাপা সামলাত। সে চেয়েছিল তার কোলজোড়া নাতি আসুক।

কিন্তু তা হয়নি। বলে বৃন্দা,

—ঢলানি মেয়েছেলে! সংসারে মন আছে যে, মা হবেক? বাঁজা তালগাছ হেমানি পাউডার মেখে বসে রইছে। অনেক দেব-দেবীর তাবিচ কবচ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে সব খুলে ফেলত গুণের বৌ। তাই নিয়ে ঝগড়াও হতো শাশুড়ীর সঙ্গে।

এখন মনোরমা সেই বিশ্রী পরিবেশ থেকে সরে এসেছে, নিজের বাড়িটাকে সাজিয়েছে, কার্পেট পেতেছে, দুর্গাপুর থেকে নিজে গিয়ে সোফাসেট, ঘর সাজাবার জিনিসপত্র এনে হাল বদলে ফেলেছে। আর রূপ যেন বেড়েছে। নিউ টাউনের বাসিন্দা তাদের মধ্যে এক সার্থক আধুনিকাকে পেয়ে খুশি হয়েছে। ওই এলাকার কিছু হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এক নতুন শ্রেণীরও পত্তন হয়েছে।

কেউ ভারত কোকিং কোল, কেউ ইস্পাত কোম্পানী, কেউ এ্যালয় স্টিল, কেউ বা ঠিকাদারী— না হয় অন্য কোনো কাজ করে আর নানাভাবে দুটো পয়সাও হাতে পায়। এতকাল গ্রামের অন্ধকার পরিবেশ থেকে এখানে বাড়ি, কাজ, হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে কেমন চমকে উঠেছে তারা।

আধুনিক হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জনাই চেষ্টিত হয়েছে। তাই মনোরমার মতো মেয়েকে তারা সাদরে বরণ করে নিয়েছে তাদের সমাজে।

ইতিমধ্যে মনোরমা নোতুন বাড়িতে তাদের ক্লাবের পত্তন করেছে, আর সভ্য-সভ্যা জুটতেও দেরি হয়নি। অনেকেই তাদের মেয়েদের পাঠিয়েছে মনোরমার ক্লাবে নাচগান শেখাতে। নিজেরাও এসেছে। ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এবার নাটকই নামাবে তারা।

বিলাসও আগেই চিনত মনোরমাকে। জানত বিলাস ওর মনের নীরব জ্বালাটাকে। বিলাসই সেদিন ছিল

মনোরমার যেন আপনজন। দুপুরের স্তব্ধতা নামত, বিলাস আসত পিছনের পুকুরে মাছ ধরার ছল করে, মনোরমাও বের হয়ে গাছের ছায়ায় দাঁড়াত।

—আর পারছি না বিলাস।

বিলাসের দেহ-মনে ওর মাতাল-করা যৌবন যেন ঝড় তুলত। নবকেষ্টর যেন চোখ নেই। বিলাসের মনে হত যদি পারত সে—চলেই যেতো ওকে নিয়ে কোথাও দূরে। মনোরমাও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।

বলত—কোথাও চলে যাই দু'জনে, যেভাবে হোক দিন চলবে। এখানে আর বন্দী হয়ে থাকতে পারছি না বিলাস!

কিন্তু বেকার বিলাস। তারও মনে উঠতো ব্যর্থ ঝড়। বলে সে—অধৈর্য হয়ো না মনো। একটা পথ হবেই। দিন বদলাবে।

এখন দিন বদলেছে মনোরমার। আজ সে পয়সা পেয়েছে, নবকেষ্ট সংসারে কোনোদিন কোনো কথাই জোর করে বলেনি। বাইরে ব্যবসার ক্ষেত্রে চতুর-সাবধানী লোকটা বাড়িতে মনোরমার কাছে চুপ করে থাকে। আগেও ওব বহু অনুযোগ শুনেও কিছু বলেনি।

আজও বলে না।

রাত্রি হয়ে গেছে, নবকেষ্ট বাড়িতে এসে দেখে নীচের হলঘরে তখনও আলো জ্বলছে, রিহার্সেল শেষ করে বিলাস, মনোরমা, শেখরবাবু, আবও কারা কি আলোচনায় ব্যস্ত।

নবকেষ্ট একনজর দেখে মনোরমাকে, হাল্কা রং-এর শাড়ি, ছোট্ট ব্লাউজে তাকে যেন অপরূপ বলেই বোধ হয়। যৌবনের বেগ ওর দেহে মন্থর, চিরস্থায়ী। শাড়িটা কাঁধ থেকে খসে পড়েছে, ছোট ব্লাউজের বাঁধন ঠেলে সুগঠিত বুক, মসৃণ উদরের অনেকটাই প্রকাশিত। সেদিকে খেয়াল নেই মনোরমার, বিলাসের কথায় হাসছে।

--আমি নাচব কি বিলাস, এ্যাঁ—বরং নাচাতে বলো, দেখতে পারি।

নবকেষ্ট দাঁড়াল না। ওই আনন্দের ভোজে তার নিমন্ত্রণ নেই। এতকাল খেটেই চলেছে সে। পয়সাই রোজকাব করেছে, কিন্তু একজায়গায় সে ব্যর্থ। জীবন তার সঙ্গে যেন নিষ্ঠুর রসিকতাই করেছে। তাই মনে মনে নবকেষ্ট লোভী, আর নির্মম। অর্থকেই পরমার্থ বলে জেনেছে এই জীবনে। আর কিছু পাবার দাবী তার নেই। সাধ্যও নেই।

উপরে উঠে গেল, তখনও মনোরমার কলহাস্যের ধারালো শব্দটা আসে তার কানে। নবকেষ্ট দরজা বন্ধ করে টাকার ব্যাগ খুলে সিন্দুকে তুলে রাখে। দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে গাঁথা, আলমারীর পাল্লা সরিয়ে পিছনে গাঁথা আছে সেটা।

ব্যাঙ্কে সব টাকা রাখা যায় না, ইদানীং ঝামেলাও হচ্ছে, তাই এইখানেই রাখে। আর এঘরটায় একাই থাকে সে। মনোরমাও এটার সন্ধান জানে না।

নবকেষ্ট সিন্দুক খুলে দেখে নোটগুলো। থরে থরে সাজানো। বেশ কিছু সোনার বাটও আছে। এগুলোই তার জীবনের একমাত্র প্রিয়বস্তু!

মনোরমার জীবনের এই চরম ব্যর্থতার কথা জানে বিলাসও। মনোরমা এতদিনে আবার তার হারানো দিনগুলোকে ফিরে পেয়েছে।

রাত্রি নামে, ক্লাবের অনেকেই চলে গেছে যে-যার বাড়ি। ভোর হতেই আবার তারা বাসে, সাইকেলে, স্কুটারে বের হবে ধান্দায়।

মনোরমা বলে—দারুণ অনুষ্ঠান হবে বিলাস, সত্যিই তুমি যে এত ভালো অভিনয় করো তা জানতাম না।

বিলাস আর সে খেতে বসেছে।

বিলাস বলে খেতে খেতে—তুমিও জাতশিল্পী মনো। তাই ভাবি এখানে পড়ে 'রট' করছ কেন? এখনও

কলকাতায় গেলে তোমাকে লুফে নেবে।

হাসে মনোরমা। সেই ছায়া-আলোর জগৎকে সে দেখেছিল প্রথম যৌবনের দিনে। তবু আজও সেই জগতের স্বপ্ন দেখে বলে মনোরমা—কি যে বলছো বিলাস। আর কি সেই দিন আছে?

বিলাসের চোখে উচ্ছলতার আভাস। বলে সে—নিজেকে এত ছোট করো না মনো। নিজেকে চেননি এখনও!

মনোরমা হাসল। হাসলে ওর গালে টোল পড়ে। ঢেউ ওঠে চোখের তারায়, সারাদেহে সাড়া জাগে। মনোরমা দেখছে পুরুষের চোখে তার আবেদন আজও ফুরোয়নি।

বিলাস বলে—নিজেই একটা ছবি তৈরী করো না মনো, নিজের ছবিতেই হিরোইন করো, আর আমাকে যদি চান্স দাও হিরো করার, ধন্য হব।

মনোরমা ভাবছে কথাটা।

টাকা কিছু আছে তার, আর এখানে পয়সাওয়ালা মানুষের অভাব নেই, যদি তাদের দু'একজনকে পায়, তাহলে জীবনের শেষ সাধটা ও পূর্ণ করবে।

মনোরমা হাসে। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার জন্য বিলাসের গালে একটু নাড়া দিয়ে বলে—খুব লেগপুলিং হচ্ছে। না?

বিলাস ওর নরম হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় এনে ওর স্পর্শে, চোখের নীরব ব্যাকুলতাটাকে অনুভব করে বলে—তোমাকে নিয়েই বেঁচে আছি মনো। তোমাকে অবলম্বন করেই বাঁচতে চাই।

মনোরমা দেখছে ওকে।

খেয়াল হয়—নবুদা এসেছে না?

মনোরমা বিরক্তিভরে বলে—হয়তো এসেছে—যাও তো। মাঠটায় প্যান্ডেলের ব্যবস্থা কব কাল থেকে। কিছু রোলা—বাঁশ—

বিলাস বলে—ওর জন্য ভাবতে হবে না। কনট্রাক্টর ওই যে পাথরকল মালিক সিংজীকে বলেছি। শিয়ালও যাবে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওইই প্যান্ডেল, লাইট সব দেবে।

মনোরমা এবার বিলাসকে খুশি ভরে কাছে টেনে নিয়ে হালকা আদর করে—তুমি সত্যি কাজের ছেলে বিলু, নাইস বয়।

বিলাসও ওকে কাছে টেনে নিয়ে উষ্ণ-ব্যাকুল ছোঁয়া এঁকে দেয় ওর ঠোঁটে, গালে।

মনোরমা সেদিকে একটু সতর্ক, সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে বলে —কি হচ্ছে, এ্যাই দুষ্টু! রাত হয়েছে।

বিলাস কি স্বপ্নভরা মন নিয়ে ফিরছে। তার জগৎ এক স্বপ্নে ভরা, আজকের দিনের স্বপ্ন। সেখানে প্রত্যাহের অভাব-মালিন্যের ঠাঁই নেই। তাই অসহায় বৃদ্ধ বিষ্টুচরণ সপ্ততীর্থ, বোন রমার কোনো কথাই সেখানে দাগ কাটে না।

নিউ টাউনে আলোগুলো জ্বলছে, তার পরেই কিছু ফাঁকা জায়গা। তারপর গ্রামের সীমা। ওদিকে আলো নেই। নোতুন রোশনী, তার বিকৃত মানসিকতার ছাপ ওখানে যেন কিছু কম।

তবু তার সংক্রমণ লেগেছে এখানেও, এই নতুন গড়ে ওঠা জনপদ।

গ্রামের দিক থেকে গাড়িটা আসছে, রাতের এই সময় গ্রামে মাঝে মাঝে গাড়ি আসে, জমিদার শিবপদবাবুর বিরাট বাড়িটা এখন পরিত্যক্ত প্রায়। সামনের মহলে শিবপদবাবুর বড় ছেলে সুবিনয় থাকে, এখানের স্কুলের মাস্টার।

শিবপদবাবু এখন অসুস্থ। বড় ছেলের কাছেই থাকে। আর ছোট ছেলে থাকে দিল্লীতে। গ্রামে আসেও

না। বাড়ির পিছনের দিকটা নির্জন, এখন ধ্বংসস্তূপ, প্রায় ওগুলো ওদের ছোট তরফের দখলে।

ছোট তরফের প্রতিভূ সুকুমার অবশ্য গ্রামেই থাকে—ওর দিন চলে না। এখন পঞ্চায়েতের প্রধান ভূপতিকে ধরে বোর্ডে একটা কি কাজ পেয়েছে। ওই মুখুজ্যে বাড়ির ছেলে এখন ভূপতি কর্মকারের পিছনে পিছনে ঘোরে আর পতাকা হাতে মিছিলে স্লোগান দেয়।

হঠাৎ গাড়িতে সেই সুকুমারকে দেখে অবাক হয় বিলাস। কাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা আবার ঘুরে চলে গেল। অন্ধকার বাড়িটার ধ্বংসাবশেষে ঢুকে গেল সুবিনয় কেরানীবাবু।

হঠাৎ তারা-জ্বলা অন্ধকারে কার হাসির শব্দ শুনে চাইল বিলাস।

—তুই। শুভি—এত রাতে।

ডোমপাড়ার ঘোতন ডোমের মেয়ে শুভঙ্করী।

মেয়েটাকে এ গ্রামের সবাই চেনে। উদ্ধত-যৌবন আর তেমনি জিবের ধার ওর। তবে গলাটা অদ্ভুত মিষ্টি। ডোমপাড়ার ভাদু পরব একাই ও নাচে-গানে জমিয়ে রাখে।

মেয়েটা বলে—হরিকেত্তন করতে গেছলাম গো।

মুখে ধেনো মদের গন্ধ, কথায় জড়তা। পা দুটোও নড়ছে তালেবেতালে।

বিলাস বলে—মদ খেয়েছিস?

হাসে মেয়েটা—তা স্যামপেন খেয়ে দেখবো না গো? এঁ্যা—যে পুজোর যে মন্তর। শুভিকে রাত-বিরেতে বেচাল দেখে চমকে উঠলে যে, তুমিও কি হরিকেত্তন করতে গেছলা নিউ টাউনে? এঁ্যা—

হাসছে মুখরা মেয়েটা। বলে—তা লবকেষ্টার বউটা মন্দ লয়, এঁ্যা—বেশ ডগমগ। রসালো, লয় গো?

বিলাসের মুখের মতো জবাব দিয়েছে মেয়েটা, বিলাস বাড়ির দিকে পা বাড়াল ওর কথার জবাব না দিয়ে।

মেয়েটা এত রাতে এদিকে কোথায় গেছল কে জানে? বাতাসে যেন মদের গন্ধ ওঠে। শুনেছে এদিকে কারা চোলাই মদও বানাচ্ছে, মেয়েটা সব-তাতেই থাকে।

ওকে ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। তবে বুঝেছে অন্ধকারে এই গ্রামের আকাশ বাতাসেও একটা বিচিত্র পরিবর্তনের ঘা লেগেছে।

শিবদাসবাবুদের দিন ফুরিয়ে গেছে।

জমিদারী গেছে আগেই। বনের আয়পয় কিছু হত কাঠ-গাছ বিক্রি করে, এখন বন সরকারের সম্পত্তি আর তারপরই ফৌত। তাদের ছাদ থেকে দেখা যায় সাতজোড়ার জঙ্গল—যেখানে বাঘ, বনশুয়োর,ভালুক থাকত, আজ সব শেষ। ঘন জঙ্গলকে তেড়ে, শালের সব গভীর মূল উপড়ে সেখানে দু'চারটে ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল রয়েছে মাত্র।

সব রুক্ষ, শূন্য।

শিবপদবাবু শূন্যদৃষ্টিত চেয়ে থাকেন, কাছারিবাড়ির উঠানে ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। তার ছেলে সুবিনয় বি এ পাশ করার পর কাজও পায়নি, এখানের গ্রামের স্কুলে রয়েছে। যা মাইনে পায় আর সামান্য ধানজমির আয়ে চলে কোনোমতে। আর কিছু পতিত ডাঙ্গা পড়ে আছে দূরে বনের ও-প্রান্তে—তার দামই বা কি, ঘাসও হয় না। ওদিকে সভ্যতার আলোও যায়নি।

—কেমন আছেন বাবা?

শিবপদবাবু চাইলেন, দশাসই দেহে এখন ভাঙন ধরেছে। এই বিরাট বাড়িটার মতোই যে কোনো দিন ধসে পড়বে। শিবপদবাবু বলেন—আছি একরকম। বৌমা ফিরেছে?

বৌমা সুনীতিও গ্রামের গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করে। চা নিয়ে এসেছে সুনীতি।

শিববাবু বলেন—এসো মা!

এ বাড়ির বৌরা এর আগের পুরুষে বাড়ির বের হয়নি। আজ একপুরুষেই সব কেমন বদলে গেল।

এ বাড়ির বৌকেও তিনি একটুকু আশ্বাস দিতে পারেননি ভালোভাবে বাঁচার। শিবপদ এর জন্য নিজেই অপরাধী বোধ করেন। সেটা সুনীতিও জানে।

শিববাবু ছাদে বসে দেখতে পান তাঁদের ছোট তরফের ওদিকের জঙ্গলের মধ্যে রাতেরবেলায়, দুপুরের নিঝুম বেলায় কারা যেন যাতায়াত করে। বলেন শিববাবু কথাটা ছেলেকে।

সুনীতিও জানে ব্যাপারটা।

সুবিনয় বলে—তাই নাকি!

শিববাবু বলেন—কি যে হয় ওখানে, কারা আসে তা জানি না।

সুকুমারকে শুধোস তো। বাতাসেও মাঝে মাঝে বিশ্রী একটা বদগন্ধ আসে।

সুবিনয় বলে—দেখছি আমি।

নীচে আসতে সুনীতিও বলে স্বামীকে—ওদের ব্যাপারে নজর দিও না। কিছু বলার দরকার নেই সুকুমার ঠাকুরপোকে এ নিয়ে।

সুনীতি বলে—ওবাড়িটা ওদের অংশ। সেখানে কে কি করছে সেটা জানার দরকার নেই। ওরা ভালো লোক নয়। সুকুমার ঠাকুরপো নানা ঝামেলায় থাকে, কাজ কি আমাদের ওসবের মধ্যে মাথা গলানোর।

সুনীতি কিছুটা জানে ব্যাপারটা।

তাদের স্কুলের তাড়া আছে। ডোমপাড়ায় শুভি এখন এবাড়ির কাজকর্ম করে, শুভি তাড়া দেয়।

—চা করো বৌদি। বেলা যে গড়িয়ে গেল!

সুবিনয় বের হয়েছে। শুভি বলে গলা নামিয়ে—ঠিকই বলেছ বৌদি, ওই সুকুমারবাবু নানা ঝামেলায় থাকে, আর তার গুরু এখন নরু পাল গো।

সুনীতি অবাক হয়। এত খবর সে জানে না। শুভি গ্রামের চলমান গেজেট। ওর যৌবনদৃপ্ত দেহে-মনে এখনও সাড়া জাগানোর আভাস, গ্রামের হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা নটবরদের সে চেনে।

পরেশ পাল এখন গ্রামের মাতব্বর। কোনো রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা সেজে এখন হাল বদলে নিয়েছে। পালপাড়ায় ছিল তার মাটির বাড়ি।

শুভি বলে—তখন দেখনি খড়ের বাড়ির চালখান ছিল ছাউনির অভাবে জরাজীর্ণ, বাতা ভেঙে ভেতরে পড়ে যাবে এই ভয়ে ওর চালে বাঁদরও লাফাত না, মাস্টারি করত ধলডাঙ্গার পেরাইমারি ইস্কুলে, এখন? দ্যাখো গে দোতলা বাড়ি করেছে—মাস্টারি করে কিনা কে জানে—মোটরবাইক হাঁকাই ঘুরছে, পঞ্চায়েতের প্রধান হইছে।

সুনীতি শুনছে ওর কথাগুলো। নরু পাল এখন নরেশবাবু হয়েছে, তাদের স্কুলেরও সেক্রেটারি। সুনীতি তার অন্ধকারের এতসব পরিচয় জানে না। বলে সে—কি বলছিস এসব কথা?

—শুভি ঠিক কথাই বলে গো। সব শালাকেই চিনি আমি। বুঝলা!

সুনীতি বলে—এত চিনে জেনে কি হল তোর?

শুভি হাসে। বলে—তাই ভাবি গো। ভগবান মুখপোড়াকেও বলি জিবে এত ধার কেনে দিলি!

শুভি দেখেছে অনেক কিছু।

কয়েক বছরে তার দেহটা ফুলে ফুলে যেন সেজে উঠেছে। কিন্তু তবু তার বুকে কি নিবিড় ব্যথা জাগে। মনে পড়ে অবিনাশকে। তাদেরই পাড়ার ছেলে, ওর বাবা ভূষণ, অবিনাশের বাবা ছিদেম ডোমপাডার আরও অনেকে মিলে রাতের অন্ধকারে বের হত দূর গ্রামে—বনের পথে ডাকাতি করত। সারা অঞ্চলে ছিল তাদের কুখ্যাতি। মাঝে মাঝে দারোগা পুলিশও এসে হামলা করতো। তাদের ঘর-বাড়ি তছনছ করত, ডোবার জলে নেমে ডাকাতির মালের তল্লাশ হত।

শুভি তখন পাড়ার ইস্কুলে সেলেট বই নিয়ে পড়তে যেতো, দেখেছিল অন্য মেয়েদের চোখে ঘৃণা, শুভির ভালো লাগত না। বাড়িতে বাবাকে বলে—ইসব কেন করো?

হাসত ভূষণ, বলিষ্ঠ দশাসই চেহারা, ইয়া গোঁফ। ভূষণ বলে—অ বৌ, তুর মাইয়ার কথা শোন্? ডোমের ছেইলাকে বলছেক কি না বোষ্টম হতে। এ্যাঁ—

কথাটা বলত অবিনাশও তার বাপকে। কালো ছেয়ালো দেহ অবিনাশের। ডোমদের আর একটা পেশা ছিল। এর-তার ঘরে ঢোল, কাঁসি, ঢাক, এসব থাকত, অবিনাশ বাজাত সানাই। এর মধ্যে ছেলেটা অপূর্ব বাজায়। একটা শিল্পীমন ছিল তার। শিববাবুদের তখনও রমরমা চলেছে, তিনি বলেন —দারুণ বাজাস অবিনাশ!

শুভির কিশোর মনেও সুর তুলেছিল অবিনাশ, ক্রমশ দুর্গাপুর, আসানসোল, শিয়ারসোল রাজবাড়িতে বাঁধা বায়না পেতে শুরু করেছিল, শুভি বলত —বায়েন তুমার বাঁশিতে যাদু আছে গ'।

হাসতো অবিনাশ—মিতেন এ যাদু তোমারই। তোমার ডাগর চোখের চাহনিতে যে সুর খুঁজে পাই গ'!

দু'জনে স্বপ্ন দেখে একটি ঘরের। অবিনাশের নিবিড় স্পর্শে শুভির সারা মনে ঝড় উঠত। সেও বাঁচতে চেয়েছিল।

–শুভি! এ্যাই!

হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল শুভি। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। সুকুমার ফিরছে বাড়ির দিকে, শুভি দেখছে ওকে। লোকটাকে সে সইতে পারে না। ওর ডাকে তার স্বপ্নজাল ছিঁড়ে গেছে।

সুকুমার বলে—আজ যাবি ওই সিংজীর আস্তানায়? ভালো টাকা দেবে—

শুভির সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। বলে সে, —ঘরে মা বুন তোমার নাই?

সুকুমারের জমিদারী রক্ত চাড়া দিয়ে ওঠে। ধমকে ওঠে সে।

—মুখ সামলে কথা বলবি! খুব দ্যামাক দেখি তোর?

শুভি বলে—চোলাই মদের ব্যবসা করছ, জমিদারবাড়ির নাম ডোবাচ্ছ ডোবাও। আমাকে নে টানাটানি কেন বাপু! ওসবে আমি নাই।

সুকুমার চুপ করে যায়। জানে ওর বাবা ভূষণ তার মদের ভাটির পয়লা নম্বর কারিগর। ভূষণের হাতের তৈরি মাল বিলাতী মদকেও হার মানায়, ওর নামেই অন্ধকার মহলে তার মদের এত চাহিদা। তাই শুভিকে চটাতে সাহস পায় না। সুকুমার হাসি ফুটিয়ে বলে—এতেই চটে গেলি!

শুভি বলে—না গো, সুহাগ করব তুমাকে!

মেয়েটা চলে গেল।

সুকুমার দেখছে ওকে। ওর যৌবনমাতাল দেহটা সুকুমারের মনেও ঝড় তোলে। মেয়েটাকে হাতে আনতে পারলে হরজিৎ সিং-এর মতো লোককেও পাকড়াও করতে পারত।

কিন্তু এখনও পারেনি। নবকেষ্ট ওকে হতিয়ে রেখেছে। শুনছে ওরাও নাকি চোলাই মদের কারবারে নামবে, তার একচেটিয়া ব্যবসায় এবার ভাগ বসাবে। সুকুমার আগে থেকেই সাবধান হতে চায়। তাই নরু পালকেই তার দরকার।

নরু পালও জানে না কি করে ধাপে ধাপে সে এত ওপরে উঠে গেছে। আগে দলবল নিয়ে হাটতলায় মিটিং করত, গ্রামের পথ সংস্কার, পুষ্করিণী উদ্ধার—এসব কাজও করত, তারপর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারই ওকে একটা দীঘি সংস্কারের ভার দেয়, গ্রামের কৃষি-মজুরদের এ সময় কাজ থাকে না, তারা দেখে নরু পাল তাদের কাজ দিচ্ছে, ক্রমশ শ্রমিক মহলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নরু। দীঘি সংস্কার, টেস্ট রিলিফের কাজ করিয়ে তার সিংহভাগ নিজে মারার পথও বের করে।

ক্রমশ সমাজসেবা, আত্মসেবা—দুটো একসঙ্গে চালাতে চালাতে পঞ্চায়েতের ভোটেও দাঁড়িয়ে গেল।

তারপরই সে যেন সোনার খনি আবিষ্কার করেছে। নানা কাজের নামে টাকা আসছে, হাজার নয়, এবার

আসছে লক্ষ লক্ষ টাকা। ব্লক অফিসার আর ব্লকের বাবুরাও তার হাতের লোক। নরু পালের দলবলও আছে। তাদেরই একজন সুকুমার।

সুকুমারকে দেখে চাইল নরু। মোটরবাইক থেকে মাটিতে পা রেখে বলে, —কি ব্যাপার রে!

সুকুমার বলে—টাকাটা রাখো নরুদা।

নরু জানে কিসের টাকা। এমন প্রণামী পেতে সে অভ্যস্ত। মুখে বলে— দলের জন্য ডোনেশন, আসলে তার রসিদ কেউ কোনোদিন চায়নি, পায়ওনি। তবে দলের একটা বাড়িও উঠছে রাস্তার ওদিকে। জায়গাটা জবরদখল করা।

নরু শুধোয়—কাজকর্ম কেমন চলছে রে?

সুকুমারের অন্ধকারের কাজের খবর সে জানে। ইদানীং পাতাজোড়ার রাতের অন্ধকারে এক নতুন রূপ ফুটে উঠেছে।

সুকুমার বলে—চলছে কোনোমতে, তবে পিছনে কেউ লেগেছে মনে হয়। ওই সিংজী আর নবকেষ্টও নাকি এসব কাজে নামছে।

নরু পাল মনে মনে খুশিই হয়। প্রতিযোগী বাড়লে দু'পক্ষের কাছ থেকেই প্রণামী পাবে সে। আর দরও হাঁকতে পারবে। সেই খুশিটা চেপে রেখে বলে নরু—তাই নাকি।

সুকুমার বাতাসে কিসের গন্ধ পায়। ইদানীং দেখেছে তস্য বুড়ো কাকা শিবপদবাবুও ছাদ থেকে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বাতাসে কি শোঁকে। হয়তো সন্দেহ করে ছেলেকেও কিছু বলেছে তার চোলাই মদের কারখানার কথা। পুলিশে খবর দিলে হাঙ্গামা হবে।

সুকুমার বলে—থানাতেও একটু বলে রাখবে নরুদা।

নরু পাল বলে—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আবার ওদের জানাব?

অর্থাৎ ভাগ তাদেরও দিতে হবে।

সুকুমার বলে—যদি গোলমাল করে?

হাসে নরু পাল। বলে সে—তখন দেখা যাবে। আমি তো আছি।

সুকুমার ভরসা পেয়ে বলে—তোমার দয়াতেই তো করে খাচ্ছি নরুদা। একটু দেখো-

নরু চলে গেল মোটরবাইকের ইঞ্জিনের শব্দ তুলে। সুকুমার কি ভাবছে।

দেবকেষ্ট ওই এখন দেববাবু। গতিলালের সাবেকি সব কিছু সে মুছে ফেলতে চায় দেহমন থেকে। দেখেছে তার দাদাকে। মনে হয় দেবুর, তার দাদা নবকেষ্ট যেন দুনিয়ায় টাকাটাকেই চিনেছে। দু'হাতে ধরে তুলছে।

দেবুও বসে নেই। তাই এসেছে শিববাবুর কাছে।

শিববাবু চাইলেন ওর দিকে। বৃদ্ধ জমিদারের চোখেমুখে আজ দৈন্যের ছাপ। ছেলে সুবিনয়, বৌমা সুনীতির মাস্টারীর টাকা আর কত, রমাও আসে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে। সুনীতির স্কুলে একজন শিক্ষয়িত্রী নেওয়া হবে, তাই রমাও এসেছে আজ। বলে সে—তুমি একটু খোঁজখবর রাখো বৌদি, সেক্রেটারীকে বলে যদি কাজটা হয়, খুব উপকার হবে।

বাইরের ঘরে বসে শুনছেন বিষ্টুবাবু ওই একটি মেয়ের কাতর আবেদনের কথা। ও যেন কোনোরকমে দু'মুঠো খেয়ে অসহায় বাবাকে বাঁচাতে চায়।

রমা বলে—দাদা তো সংসার দেখল না, কি করে যে দিন চলছে।

কথাগুলো আর্তনাদের মতো ভেসে আসে এঘরে, শিববাবুর কানে বাজছে। দেবুও ঢুকেছে।

—কে?

শিববাবু চশমাটা চোখে এঁটে দেবুর চেহারাটা আগাপাশতলা জরিপ করে একটু অবাক হন—তুমি! গতির ছেলে না?

গতিকেষ্টর জরাজীর্ণ চেহারাটা চোখে ভেসে ওঠে শিববাবুর। সেই গতির ছেলে আজ এক নতুন যুগের

প্রতীক হয়ে উঠেছে। যে যুগে শ্রদ্ধা ভক্তির, বিনয়ের লেশমাত্র নেই। উদ্ধত সে। দেবু প্রণামও করে না। প্যান্টের ভাঁজ নষ্ট হবে বোধ হয় তার। দেবুও শুনেছে ওঘরে রমার কথাগুলো। কি ভাবছিল সে।

শিববাবুর কথার জবাব দেয়।

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার? এখানে?

দেবু নিজেই পুরোনো চেয়ারে বসে বলে—আপনার সাতজোড়ার ডাঙাটার জন্যে এসেছিলাম।

—ওখানে কি হবে? বনের ওদিকে?

দেবু আসল ব্যাপারটা চেপে যায়। মাটির নীচে ওখানে কি পরিমাণ পাথরের স্তর আছে, কি তার এখনকার বাজারদর—এসব চেপে গিয়ে বলে—এমনি কিনে রাখতাম। ভবিষ্যতে যদি ওদিকের চেহারা বদলায়।

হাসেন শিববাবু—ফাটকাবাজি করতে চাও?

দেবু হাসল মাত্র।

শিববাবু বলেন—এ ফাটকাবাজিরই যুগ হে, দেখতে দেখতে সবকিছুই বদলে গেল।

দেবু ওইসব বাজে কথায় যায় না। তার সময় কম, কোনোরকমে ওই নির্জন ডাঙাটা হাতাতে হবে। বেশ বুঝেছে দেবু শিববাবুর সেই জমিদারীর রমরমা আর নেই, যা আছে তা শুধু মেজাজই। শূন্য কুম্ভ, তার আওয়াজই বেশি।

দেবু বলে—হাজার টাকা করে বিঘে দোব।

—হাজার টাকা। শিববাবু চাইলেন ওর দিকে। ওই ডাঙার কোনো দামই ছিল না। নেবার লোকও ছিল না। শিববাবু মনে মনে টাকায় হিসাবটা করে একলপ্তে প্রায় চল্লিশ বিঘা আছে ওখানে। একসঙ্গে এতগুলো টাকা পাবার স্বপ্ন দেখে আজকের নিঃস্ব শিববাবু তাই চমকে উঠেছেন।

দেবুও চতুর ছেলে। টাকার পরিমাণে ও বিস্মিত তা দেখেছে দেবু। ব্যাগ থেকে একটা পাঁচ হাজারী বাণ্ডিল বের করে একটা ডেমি পেপার এগিয়ে দিয়ে বলে—বায়নাপত্র করে যাচ্ছি, এক মাসের মধ্যেই রেজেস্ট্রি করে নোব বাকী টাকা মিটিয়ে।

শিববাবু দেখছেন ওকে। হাঁটু অবধি ময়লা ধুতি পরে তেলেভাজার ডালা মাথায় গ্রামে গ্রামে ঘোরা গতিকেষ্টর ছেলে আজ চল্লিশ হাজার টাকা বের করে সহজেই, আর জমিদার শিববাবুর এম-এ পাশ ছেলে সারামাস খেটে পায় বারশো টাকা।

শিববাবু টাকাটা তুলে নেন। এই টাকারও দাম আজ তাঁর কাছে অনেক।

খুশিমনে বের হচ্ছে দেবু, কাজও হয়ে গেছে। মনে মনে হিসাব করে ওই ডাঙায় কত পরিমাণ কিউবিক ফিট পাথর বেরুবে, তার দাম আজকের বাজারে কম করে দশ-পনেরো লাখ টাকা। টাকা হাওয়ায় উড়ছে, শুধু ধরে নিতে পারলেই হল।

রমা বের হয়ে আসছে বাড়ি থেকে।

গলিটা নির্জন। এককালে জমিদারের কাছারিবাড়ি ছিল, এখন পরিত্যক্ত। উঠানে গজিয়েছে বন-জঙ্গল। দু-একটা গন্ধরাজ, টগরের গাছ দাঁড়িয়ে আছে সেই গৌরবময় অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে।

—রমা।

রমা দেবুকে দেখে চাইল। একই পাড়ার বাসিন্দা ছিল তারা। ছেলেবেলা থেকে এক পাঠশালায়—স্কুলে পড়েছে।

দেবু বলে—পণ্ডিতমশাই কেমন আছেন?

রমা বলে—ওই একই রকম।

দেবু শুনেছে রমা কেন এসেছিল এখানে। কিন্তু ও বেচারা জানে না এখন মুখুজ্যেদের নামে ওই স্কুল হলেও সেটা নামেইমাত্র টিকে আছে, ওই স্কুলের কর্তৃত্ব এখন নরু পালের হাতে।

আজ নরু পাল চলে দেবুদের মতো কিছু নোতুন গজিয়ে-ওঠা মানুষের ইশারায়। একটা পুতুল গড়েছে

তারা নরুকে।

দেবু বলে—স্কুলের চাকরি করবে?

হাসে রমা—কেন? তুমিই দেবে নাকি চাকরিটা?

দেবু দেখছে রমাকে। ওর মুখে সেই হাসিটা মিষ্টি হলেও তাতে যেন কিছুটা ব্যঙ্গের তীব্রতাও রয়েছে।

মনে মনে হাসে দেবু, আজ শিববাবুর সেই জমিদারী মেজাজের কথা মনে পড়ে। কড়া রাশভারি সেই মানুষটাকে ছেলেবেলায় দেবুরা ভয়ে এড়িয়ে চলত। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় দেখে মনে হত যেন, কোনো দেবতাই এসেছেন তাদের দয়া করতে। ফরাসডাঙার ধুতি, আদ্দির গিলেকরা পাঞ্জাবি, হাতে রুপোয় বাঁধানো ছড়ি—সে এক কল্পলোকের মানুষ।

আজ দেবু সেই অতীতের ধ্বংসস্তূপকে কিছু টাকার বিনিময়ে মাথা নীচু করিয়েছে, দেখছে রমাকেও। ওর রূপ, ওই হাসি—দেবু ঘোষ কিনে নিতে পারে।

বলে দেবু রমার কথায়—চেষ্টা করে দেখতে পারি। হয়তো হয়েও যেতে পারে।

রমা দেখছে ওকে। আজ তারও চাকরিটা দরকার। দুর্গাপুরের এমপ্লয়েমেন্ট এক্সচেঞ্জে, এখানে-ওখানে ঘুরে সে ক্লান্ত, হতাশ হয়ে উঠেছে।

রমা বলে—তাহলে দ্যাখো।

দেবু বলে—দরখাস্তটা দিও আজকালের মধ্যে। সামনের সপ্তাহেই কমিটি মিটিং-এ পেশ করব।

রমা বলে—নরুবাবুর কোনো ক্যানডিডেট আছে।

হাসে দেবু—ব্যাপারটা ছাড়ো তো। তাহলে দরখাস্তটা দিও—

রমা চলে গেল।

দেবু এগিয়ে আসছে গাছের ছায়াঢাকা পথ দিয়ে মোটরবাইকটার দিকে, হঠাৎ কার হাসির শব্দে চাইল।

শুভি ওই বাড়ি থেকে কাজ করে বের হচ্ছিল, সেও দেখছে রমা আর দেবুকে।

শুভি বলে—কি কেরামত জানো রে বান্দা,

কি কেরামত জানো।

মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলে হায়

ডাঙায় বসে টানো।।

—মানে? দেবু চাইল।

শুভি সারাদেহে হাসির কাঁপন তুলে বলে—আবার কি খেলা খেলবে গো? খ্যালো, এখন তো তুমাদেরই দিন।

দেবু বলে—কি বলছিস তুই?

শুভি শোনায়—কি আর বলব বাপু, ই'খন আর আমাদের দিকে নজর নাই দেখছি গো!

মেয়েটা চলে গেল ওদিকের গলিপথে।

দেবু মোটরবাইক দাবড়ে বের হল। এখন তার অনেক কাজ।

এবার নিজেই ক্রাশিং মেসিন বসাবে। ওই হরজিৎ সিং-এর সঙ্গে কাজ করবে না। লোকটা একনম্বর ধোঁকাবাজ। আর নবকেষ্টর সঙ্গে তার এখন আঁতাত গড়ে উঠেছে। কেন তাও জানে দেবু, বোধহয় ওই মনোরমার জন্যেই।

কয়েক বছরেই হাল বদলে ফেলেছে মনোরমা।

বিলাসের মনে এক নতুন সুর জাগে।

সামনে তাদের ক্লাবের অনুষ্ঠান, তাই নিয়েই ব্যস্ত। আসা রাখে অনুষ্ঠান শেষ হলে কলকাতায় যাবে,

মনোরমার পাড়ার এক দাদা এখন ছবি তৈরির ব্যাপারে জড়িত। মনোরমা বলেছে ওর কাছেই পাঠাবে তাকে।

ছবিতে একটা চান্স পেলে আর তাকে পায় কে!

—চা হল, রমা।

রমা সকালে চায়ের ব্যবস্থা করেছ। দেখেছে রমা সংসারেব অবস্থা, সামান্য কয়েক বিঘা জমিতে ধান যা হত তাতে চলে যেত কোনোমতে। কিন্তু ইদানীং গ্রামাঞ্চলেও বর্গাদারী ভাগচাষ রেকর্ড হবার পর থেকে সেই ধানও ঠিকমতো পায় না।

বিলাস ভুলে মাঠের দিকে বা চাষীর বাড়িতেও যায় না, ফলে দয়া করে দু-দশ বস্তা ধান ওরা যা দেয়, ওদেব তাতেও ফুরোয় না।

বিষ্টু ভট্টাচার্যও বৃদ্ধ হয়েছেন। চোখেও ভালো দেখতে পায় না। লাঠিভর করে গ্রামের এবাড়ি-সেবাড়ির লক্ষ্মীপুজো, সত্যনারায়ণ পুজো করতে হয় তাঁকে, কিছু আতপচাল, দু-একখানা লালপাড় ধুতি, গামছা-শাড়ি যা পান—তারও খুব দরকার।

রমারও কষ্ট হয়। বুড়োমানুষটার এই খুঁটে-খাওয়ার যন্ত্রণার কোনো লাঘবই করতে পারেনি তারা। এককালে সারা চাকলার সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন বিষ্টুপদ সপ্ততীর্থ। পাতাজোড়া-সগড়তাজা, কাজোরার জমিদারবাড়িতে ছিল তাঁর সম্মানের আসর। তাঁদের সাহায্যেই দিন গুজরান হতো ভালোভাবেই।

আজ সেই শ্রেণীর অস্তিত্বই লোপাট হয়ে গেছে, এসেছে নতুন এক শ্রেণী। ওই নবকেষ্ট, নরু পালদের মতো নীচুতলার মানুষরা আজ টাকার জোরে বুদ্ধির প্যাঁচে সমাজের ওপরে উঠছে। সমাজের প্রতি তাদের কোনো কর্তব্যই নেই, সমাজকে শোষণ করাই তাদের লক্ষ্য। তাই মানুষের পুণ্যবোধই কমে গেছে।

তাই বিষ্টু ভট্টাচার্যকে ওইভাবেই বাঁচতে হবে জীবনের বাকি দিনগুলোয়।

-কই রে চা হল? কি যে করিস?

বিলাস এব মধ্যে পায়জামা পাঞ্জাবি পবে তৈরি। তাব ওই পোশাক আশাক কোথা থেকে জোটে তা জানে বমা। বমাব বাগ হয় দাদাব ব্যবহারে। ও যেন সংসারেব হালটা দেখেও দেখে না।

বাবার পাশেও দাড়ায়নি, আজও তাই দিন গুজরানের ভাবনাটা বাবাকেই ভাবতে হয়। ওর আয়োজনের ত্রুটি হবার উপায় নেই।

রমা বলে— চা ছিল না, দোকান থেকে আনতে হল।

বিলাস বলে—কি করিস সারাদিন?

রমা জবাব দেয়—তুমি কি কবো দিনভোর? সংসার কি কবে চলে তার খবর রাখো? সোমত্ত ছেলে কি করছে খেয়াল রাখো?

বিলাস বলে--চুপ কর তো? ভারি এককাপ চা দিবি তাতেই এত কথা? ঠিক আছে। নবুদার দোকানেই খেযে নোব।

—তাই খেয়ো। আর খোবাকটা ওখানেই জোগাড় কর। লজ্জা করে না দাদা?

মা কলমির শাক নিয়ে ঘরে ঢুকছে। কোমব পড়ে গেছে প্রায়, তাই নিয়েই বুড়ি কাজ করে। ছেলেকে বের হয়ে যেতে দেখে ভবঠাকুরণ বলে— ও মা! চা না খেয়ে চলে যাচ্ছিস যে, অ বিলেস?

বিলাস তেজোদৃপ্ত স্বরে বলে—না। বাইরেই খাব। এত কথা সইব না। বের হয়ে গেল সে.

মা ছেলেকে ডাকে, কিন্তু বিলাস দাম বাড়িয়ে বের হয়ে গেল। মা গজ গজ করে—তোর বড় মুখ রমা?

রমা জবাব দিল না।

দত্তবাড়ির ছোট মেয়েকে প্রাইভেট পড়ায়, কিছু পায় তার জন্য।

বের হয়ে গেল রমা। মনে হয় সংসারের নগ্ন দারিদ্র্যের কথাটা। কিছু কলমি শাক এনেছে মা, আর চালও নেই বাড়িতে। বাবা পুজো করে আতপচাল আনলে আহার্য জুটবে।

ভালো শাড়ি বলতে একখানাই, আর দু'একখানা লাল পেড়ে দেনো মোটা শাড়ি আছে। নিজের হাতে

কেচে তাই শুকিয়ে নিজেই ইস্ত্রি করে রমা। তাই পরে বের হয়। জীবনে শখসাধও কিছুই নেই। তার বয়সী মেয়েদের প্রায় সকলেরই বিয়ে-থা হয়ে গেছে। তার জীবনের কোনো বসন্তের অবকাশ নেই।

—রমা!

হঠাৎ শেলীকে দেখে চাইল রমা। শেলী তার সহপাঠিনী, এখন দুর্গাপুরে কোনো অফিসারের ঘরণী। সুন্দর বাংলো, কোলজোড়া একটি দামাল ছেলে। গাড়ি নিয়ে আসছে বাপের বাড়ি।

শেলী বলে—কোথায় চললি?

রমা দেখছে ছেলেটাকে।

গাল টিপে আদর করে বলে—টুইশানিতে।

শেলী বলে —ওই করবি নাকি জীবনভোর?

জবাব দিল না রমা, এর জবাব তার জানা নেই।

শেলী বলে—দু'দিন আছি। আয় বৈকালে। অনেক কথা আছে।

রমা বলে—দেখি!

চলে গেল শেলী গাড়ি হাঁকিয়ে। রমা দেখছে ওকে। জীবনে ওর সব পাওয়ার পূর্ণতা আছে। স্বামী-সন্তান-প্রাচুর্য-বিলাস। আর তার? দু'বেলা খেতে পাবার আশ্বাস নেই, সমাজের বুকে কোথায় এক নিঃস্বতা, শূন্যতার অতল গহ্বরে সে হারিয়ে গেছে।

রমা ক্লান্ত হতাশ মন নিয়ে চলেছে দত্তবাড়ির দিকে।

মনে হয়, একটা বাঁচার আশ্বাস, চাকরি তারও চাই। যেভাবে হোক। সংসার তাকে সেই বাঁচার চেষ্টার পথে ঠেলে দিয়েছে। আজকের দিন তার কাছে কোনো আশাই আনেনি। মনে পড়ে দেবুর কথা।

ছেলেটাকে এর আগেই চিনেছে সে। হঠৎ গজিয়ে-ওঠা একটা শ্রেণী আজ সব কিছুতে অধিকার কায়েম করেছে পাতাজোড়ার নতুন সাজে, সেখানেই ঝরাপাতার মতো ঝরে যেতে বসেছে শিববাবু, তার বাবা সপ্ততীর্থ মশায়রা। কিন্তু ওদেরও দয়া ছাড়া আজ রমাও বাঁচার পথ দেখে না।

দেবু সকালেই বের হয়েছে জিপ নিয়ে, সেই বনের ধারে জায়গায় এর মধ্যেই ট্রাক-বোঝাই যন্ত্রপাতি এসেছে। ওদের কাজও শুরু করতে হবে। দেবু জানে পাথর তুলে পাঠাতে পারলেই টাকা। আর রাতারাতি কাজ হাসিল করে খুশিই হয়েছে। হরজিৎ সিং আর নবকেষ্টও এই জায়গার পিছনে ঘুরছে।

খুশিমনে ফিরছে দেবু। দুর্গাপুরের বড় ঠিকাদার মিত্তিরবাবুও কিছু টাকা আগাম দেবে, মাল সব তার কাছেই পাঠাতে হবে। মাছের তেলেই মাছ ভাজবে সে। নরু পালকে দরকার, না হলে ওই গ্রামের লোকজনও বাধা দেবে, কিছু চাষের জমিও ফেঁদেছে তারা মধ্যে ওই ডাঙায় জবর-দখল করে।

নরু পাল ক্রমশ দেখছে এই মাটিতে অনেক খেলা।

এতদিন তার জীবনেও কিছু জোটেনি। সামান্য মাস্টারি করেছে কোনো অজগ্রামের মাটির ভাঙা ইস্কুলে, অবশ্য সপ্তাহে তিন-চারদিন যেত কিনা সন্দেহ নরু। আশপাশের গ্রামের লোকের গোলমাল, বৈষয়িক ঝগড়ার মীমাংসা, মামলার তদারকি—এই সবই করত।

ক্রমশ ওদের কাছে সে নিজেকে অতি প্রয়োজনীয় মানুষ করে তুলেছিল, সেই ফাঁকে রোজগারও কিছু হত। তারপর দুর্গাপুরের কারখানা গড়ে ওঠার পর থেকে আজকের সভ্যতার লোভ-লালসা এসে পৌঁছলো এই শান্ত পরিবেশে। মানুষের নানাভাবে অর্থ রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল সমাজের রূপটা।

নরু পাল এই দিনবদলের পালায় হঠাৎ প্রথম সারিতে এসে গেল। তারপর বর্গাদারী রেকর্ড-ভাগচাষী পত্তন, এইসব ব্যাপারে নরু পালের ভূমিকাটাও বিচিত্র।

ওরা পঞ্চায়েত, স্কুল, গ্রামীণ সমবায়—যেখানেই টাকাকড়ি আর প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে সেইসব ঘাঁটিকেই দখল করল। আর জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা, মঙ্গলের বুলি আওড়ে জনসেবার চেয়ে আত্মসেবাই

করে আখের গুছিয়েছে।

অদৃশ্য পথে নরু দেবু আর নবকেষ্ট দুই ভাইয়ের মাঝে একজনের অন্য জনকে ছাড়িয়ে যাবার দুর্বার লড়াই, জানে হরজিৎ সিং-এর অন্ধকারের ব্যবসা, সুকুমারের মদচোলায়ের ঠেক। ওরা অনেক কিছুই করেছে নরু পালকে প্রণামী দিয়ে।

নরু পঞ্চায়েত অফিসে এসে বসে। লোকদের কারো লোনের দরখাস্ত, পাম্পসেট কেনার ভরতুকি, কোনো বর্গাদারের দখল—নানা ঝামেলা থাকে, নরু পাল হাকিমের মেজাজে ওসব মামলার নিষ্পত্তি করে, অবশ্য দুষ্টজনে বলে আড়ালে নরু পালকে ভালোরকম প্রণামী দিলে দিনকে রাত করা যায় পাতাজোড়ার মাটিতে।

নরু পাল দেবুকে দেখে চাইল।

দেবু বলে—নরুদা দেগায়ের ওখানে ক্রাশিং প্ল্যান্ট বসাচ্ছি, ওখানে তোমার কিছু লোকের কাজও দেব। ধর জন বিশেকের।

নরু হিসাবটা করে বিশ ইনটু মাসে দশ টাকা অর্থাৎ দুশো টাকা তার নজরানা আসবে মাসে দলের চাঁদা হিসাবে। নরু বলে—কিন্তু পারমিশন, লাইসেন্স এসবের বড় কড়াকড়ি হে।

দেবু তা জানে। বলে গলা নামিয়ে আজ সন্ধ্যায় বাড়িতে গিয়ে কথা বলব।

নরু জানে সেটা। বলে—এসো। তবে দিনকাল বড় খারাপ।

হরজিৎ সিংও বলছিল ওখানে নাকি তারাই—

দেবু জানায়—সে পথ মেরেছি। সন্ধ্যায় যাব—

হঠাৎ রমাকে দেখে চাইল ওরা। দেবু ভাবেনি রমা নিজেই আসবে এখানে। খুশি হয় দেবু। আজ তার দিন ভালোই যাচ্ছে।

এতবড় ব্যবসাটা হাতে পেয়ে গেল। নরু পালও দেখছে রমাকে। ফর্সা, ছিপছিপে গড়ন। তন্বী মেয়েটিকে দেখে নরু, আগেও দেখেছে। কিন্তু তেজী মেয়েটা তার কাছে আসেনি কোনোদিন। আজ এসেছে।

দেবুই বলে—দরখাস্তটা এনেছ?

রমা এগিয়ে দেয় দরখাস্তটা।

নরু পাল দেখে বলে—কিন্তু দু'তিন জন ক্যানডিডেট তো আছে। তার মধ্যে যোগ্য যে তাকেই নেওয়া হবে।

রমা কথাগুলো শুনছে। জবাব দিল না।

দেবুই তার হয়ে ওকালতি করে—স্থানীয় মেয়ে। আর ওর বাবাও এককালে পণ্ডিত ছিলেন।

নরু পাল বলে—তা তো বুঝলাম হে। এখন একটু এদিক-ওদিক হলে কমিটিই চেপে ধরবে।

হাসে দেবু—তোমার ওপর কে কথা বলবে দাদা? যা হোক কিছু করতে হবে ওর জন্য।

নরু বলে—দেখি।

রমাকে শোনায়—পরে খবর নিও।

রমা বের হয়ে এল। জানে না সে এখানে কিছু হবে কিনা। বাইরে লোকজনের ভিড়। সবাই এসেছে নরু পালের করুণার প্রত্যাশী হয়ে। রমার মনে হয় আগেকার জমিদার শিববাবুদের রমরম্ অবস্থার কথা। তাঁর কাছারি-বাড়িতেও তখন এমনি বহু লোক বহু আবেদন নিয়ে আসত।

আজ চেহারাটা বদলেছে মাত্র। শিববাবুর জায়গায় বসেছে নরু পাল, কিন্তু সেই মানবিকতার ছোঁয়া নেই। ওরা চেনে টাকা! আজকের দিন আরও লোভী—আরও নির্মম, নিষ্ঠুর।

বিষ্টু ভটচায পুজো সেরে ফিরছেন, দুপুরের রোদ চড়চড়ে হয়ে উঠেছে। কোথায় একটা কাক ডাকছে কর্কশ স্বরে, বিষ্টু ভটচায গামছায় সের কয়েক চাল বেঁধে ফিরছেন। কষ্ট হয় ওই রোদে আসতে। ঘেমে উঠেছেন—লাঠি ঠুকে কোনোরকমে আসছেন।

জীবনের ধারাটা যে শেষ প্রান্তে এসে এক নিষ্ঠুর যুগে এমনি বেদনাময় হয়ে উঠবে তা ভাবেননি। ছেলেটাও মানুষ হল না। মেয়ের বিয়েও দিতে পারেননি। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য আজও এই উঞ্ছবৃত্তি করতে হচ্ছে। এ এক দুঃসহ যন্ত্রণা। এ দিন তাঁদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, নিঃস্ব করেছে। পূর্ণতা এনেছে অন্যদিকে। যেখানে তাঁদের কোনো ঠাঁই নেই।

রমা বাড়ি ফিরেছে।

মা বলে—তোর বাবা এখনও ফিরল না।

দেখা যায় বিষ্টু ভটচাযকে গলদঘর্ম হয়ে ফিরে চালের পুঁটুলিটা নামিয়ে দাওয়ায় বসে হাঁপাতে থাকেন। রমা ওই অসহায় ক্লান্ত বাবাকে দেখে চাইল।

মা একটা পাখা দিয়ে বাতাস করছে। বলে সে—একটু জল খাবে?

মাথা নাড়ে বিষ্টু ভটচায। রমা বলে—এই রোদে এসে নাজেহাল হয়ে গেছে।

মা বলে—কেন যে বের হও?

ওটা মায়ের স্তোকবাক্যই। মাও জানে না বের হলে দিনের আহার্যও জুটবে না।

রমা চুপ করে দেখছে। মনে হয় তার মানসম্মান নামক বস্তুটা তুচ্ছ হয়ে গেছে জীবনের এতবড় পরাজয়ের সামনে। পথ তাকে নিতেই হবে একটা।

বিলাস স্বপ্ন দেখে।

মনোরমার বাড়িতে আসর বসেছে। মনোরমা এই নিউ টাউনের বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে যেন পুতুল নাচ নাচাচ্ছে। হরজিৎ সিংও এসেছে। মনোরমার পরনে হালকা সিফন শাড়ি, ওর নিটোল যৌবনমদির দেহের রেখাগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। হাত-কাটা স্লিভলেস ব্লাউজ ওর নরম ছন্দময় হাতের ডোলটা সোচ্চার হয়ে ওঠে।

মনোরমা বলে—আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা ডোনেশন দিতে হবে সিংজী!

হরজিৎ সিং-এর কাছে এটা কিছুই নয়। তাও বলে—আয় বাস্! এতনা? ভাবিজি--

মনোরমা সোফায় ওর কোলঘেঁষে তার দেহের ছোঁয়া লাগিয়ে আদুরে গলায় বলে—মিত্তির সাহেব দিয়েছেন দশ হাজার, তোমার পাঁচ হাজার দিতেও এত আপত্তি কিসের?

হরজিৎ সিং জানে এ টাকা আসবে নবকেষ্টর শেয়ার থেকেই।

তাই বলে—ঠিক আছে। আপনি বোলছেন দিতে হবে।

বিলাস রসিদ কাটছে। জানে সে এ টাকার বেশ কিছুই সরাবে সে। তাকে কলকাতা যেতে হবে।

রাত্রি নামছে।

বিলাস বলে—মনো, অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করতে হবে তো! প্রধান অতিথি, সভাপতি এসব তো চাই।

মনোরমা বলে—নরু পালকেই সভাপতি করেছি। প্রধান অতিথির জন্য তোমার দাদা ডি-এম সাহেবকে বলেছে, না হলে মিত্তিরবাবুই হবেন।

রজনী মিত্তির এখন দুর্গাপুরের বিরাট ঠিকাদার। হোটেলওয়ালা। ওদেরই এখন দরকার।

বিলাস বলে—এবার ছবির কাজে হাত দাও। হিরোইন হতে দেরী কোরো না—

মনো চাইল। তার হাতে এখন রজনী মিত্তিরও এসেছে। মনোরমা বলে—কেন?

বিলাস বলে—যৌবন এখনও আছে। বয়স হলে—

হাসে মনোরমা—কেন? দেখতে কি খারাপ আমি?

বিলাস বলে—না-না। এখনও অনেকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারো তা জানি।

মনোরমা খুশি হয়ে বিলাসের গালে আলতো টোকা মেরে বল—দুষ্টু কোথাকার।

বিলাস জানে এই ইঙ্গিতের অর্থ। মনোরমার বুভুক্ষু মনের ক্ষুধার জ্বালাটা সে জানে। ওর নরম দেহটাকে

কাছে টেনে নেয় নিজের বাহুবন্ধনে। মনোরমা সেই নিবিড় স্পর্শটাকে সারা মন দিয়ে পেতে চায়। ওতে মিশিয়ে আছে যৌবনের উদ্দামতা, কামনার জ্বালা।

বলে মনোরমা—এ্যাই। ছাড়ো! কেউ এসে পড়বে।

বিলাস বলে—দিনরাত পাহারার মধ্যে থাকো কি করে মনো?

মনোরমা মাঝে মাঝে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তবু বলে—তাই ভাবছি এর থেকে মুক্তির পথ কোথায়?

বিলাস বলে—চলো না, কোলকাতায়। যদি ছবির কাজ শুরু করতে হয়, যেতে হব তো!

মনোরমা কি ভাবছে। মাঝে মাঝে একটা উদ্দাম ঝড় যেন তার ব্যর্থ জীবনে কি মত্ততা আনে। মনে হয় সব বাঁধন ছিঁড়ে সেও উধাও হবে এই মেকি খোলস ছেড়ে।

জ্বালাটা বাড়ে নবকেষ্টর ওপরই। লোকটা সব জেনেশুনেও তাকে সেদিন ঠকিয়েছিল নিদারুণভাবে।

নিউ পাতাজোড়ায় এতাবৎ এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। ক'বছর ধরে এখানে নোতুন বসত গড়ে উঠেছে, এসেছে নতুন মানুষ, তারা পাতাজোড়ার অতীত সেই নিঃসঙ্গ প্রান্তরকে দেখেনি। বড় বড় বাড়ি উঠেছে, গাড়ি এসেছে। গড়ে উঠেছে সিনেমা হাউস।

সেই সিনেমা হাউসের মঞ্চটাকে কলকাতা থেকে ফুলের সাজ এনে সাজানো হয়েছে।

বিলাস এসব বিষয়ে পটু। মেয়েদের লালপাড় শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরিয়েছে, তারা সারবন্দী দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজিয়ে শ্রীমান নরু পাল এবং মিত্তির মশাইকে বরণ করেছে বরের মতো গলায় মালা দিয়ে। ডি এম সাহেবও এসেছেন।

মনোরমার সময় নেই।

তার পরনে দামী শাড়ি, খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো। দেহের যৌবনভার নিয়ে সে অতিথিদের আপ্যায়ন করছে।

মেয়েদের নাচ-গানের অনুষ্ঠানের পর শুরু বিলাসের নাটক। বিলাস আর মনোরমার মুখ্য ভুমিকা।

ঘনঘন হাততালি দিয়েছে দর্শকরা।

হরজিৎ সিং ক্ষুব্ধ চাহনিতে দেখছে মনোরমাকে।

নবকেষ্ট ডি এম সাহেবকে তৈলমর্দন করার জন্য ছিল কিছুক্ষণ, তিনি চলে যেতেই নবকেষ্টও বের হয়ে পড়ে। মনোরমার ওই বাড়াবাড়ি যেন সীমা ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু এক জায়গায় সে অসহায়। যেন পরাজিত। তাই সব জ্বালা চেপে থাকে।

এসেছে সুকুমার, সুবিনয় মাস্টারও।

দেবুও রয়েছে। রমাকে দেখে এগিয়ে যায়।

—কি ব্যাপার?

রমা বলে—এদের অনুষ্ঠান দেখতে এলাম।

হাসে দেবু—তা ভালোই। তোমার দাদাই তো হিরো।

বেশ শ্লেষের সঙ্গে বলে দেবু—ভালোই আছে তোমার দাদা। সে তো তোমার জন্য কিছু করতে পারে ইচ্ছা করলেই।

রমা শ্লেষটা হজম করে। জানে তার কাউকে চটাবার সাহস নেই। বলে সে—নিজের জন্যই যে ভাবে না সে ভাববে অন্যের জন্য?

দেবু হাসে।

বলে—নিজের কথা একটু বেশিই ভাবে সে। তাই অপরের কথা ভাববার সময় তার নেই।

এমন সময় নরু পালকে মালা পরে বের হতে দেখে চাইল রমা।

নরু বলে—চলি!

রমা এগিয়ে যায়—আমার দরখাস্তটা?

নরু বলে—পরে দেখা কর। চলি।

রমা দেখছে ওদের। ভিতরে তখন নাটক শুরু হয়েছে।

রমার ওদিকে মন নেই। নাটকের চরিত্রগুলোকে দেখছে সে। বিলাস আর মনোরমার জীবনেরই যেন এ নাটক। এক স্বপ্নজগতের প্রেমলীলা।

বের হয়ে আসে রমা। জীবনে যেখানে এত অভাব-দুঃখ-যন্ত্রণা, সেখানে এরা কোন্ মানসিকতার যুগে বাস করে এই প্রেম আর কামনার স্বপ্ন দেখে—জানে না। রমার ভালো লাগে না ব্যাপারটা।

দু-একজনের মন্তব্যও কানে আসে।

—শালা বিলেস খুব মজা লুটছে ওই নবকেষ্টর বউয়ের সঙ্গে।

অন্যজন বলে—লোট শালা!

হরজিৎ অবাক হয় শিববাবুর কথা শুনে।

হরজিৎ এসেছিল ওই জমিটার জন্যে, ওখানে পাথর যা আছে তার দাম অনেক।

বলে হরজিৎ—আমাকে দিন ওটা। পাঁচশো টাকা বিঘে।

শিববাবু বলেন—ওটা তো দিয়ে দিয়েছি।

ওই জায়গাটা নিয়ে হঠাৎ এদের টানাটানি করতে দেখে অবাক হন তিনি।

হরজিৎ শুধোয়—কাকে দিলেন?

—দেবুকে। দেবকেষ্ট এসেছিল আগেই।

হরজিৎ ঘাবড়ে যায়। ও এসেছিল নবকেষ্ট হাত বাড়াবার আগেই যাতে জায়গাটাকে কব্জা করা যায়। কিন্তু তার আগেই গোপনে নবকেষ্ট ভাইকে দিয়ে ওই জায়গাটাকে হাতিয়ে নেবে তা ভাবেনি। অর্থাৎ তাকে গোপনে তারা এখান থেকে সরাতে চায়।

হরজিৎ তবু শুধোয়—তাহলে দেবেন না? দর কিছু বাড়াব।

শিববাবু বলেন—উপায় নেই। ওটার কাগজপত্র হয়ে গেছে।

হরজিৎ বের হয়ে আসছে।

বৌমা সুনীতিও শুনেছে কথাটা। ও চলে যেতে সুনীতি ঘরে ঢুকে বলে—ওদের ওই জায়গাটার ওপর এত লোভ যখন তখন মনে হয় ওটা রাখলেই ভালো ছিল।

শিববাবু বলেন—তোমরা রাখতে পারতে না মা। চাকরিই করতে হবে। তবু যদি নগদ টাকাটা আসে তাই রাখা। এখন আমাদের যাবারই পালা।

সুনীতিও তা জানে। এক-একসময় এক এক শ্রেণীর ভাগ্যে বৃহস্পতি তুঙ্গী হয়ে ওঠে। এখন ওই নবকেষ্ট, হরজিৎ সিং, মিত্তিরবাবুদের দিন। তারাই অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ধারার ধারক বাহক হয়ে ওঠে। নবকেষ্টর বউ মনোরমা এখানের সাংস্কৃতিক জীবনের জিম্মাদার। তার অনুষ্ঠানও দেখেছে সুনীতি। মনে হয় সমাজের সবদিকেই ওরা আনছে বিকৃতি আর একটা অবক্ষয়।

হরজিৎ সিং বের হয়ে আসছে ওই ধসে-পড়া জমিদারবাড়ি থেকে। ছায়াঘন জায়গাটায় নির্জনতা নেমেছে। হঠাৎ বাতাসে কিসের তীব্র গন্ধ পেয়ে দাঁড়াল সে।

দেখছে চারদিকে। হরজিৎ রসিক ব্যক্তি। সে জানে কিসের তীব্র গন্ধ এটা। এতদিন পর যেন একটা বিশেষ কিছু আবিষ্কার করেছে সে। দেখেছে সুকুমারকে ওই দিকে দু-একজন লোকের সঙ্গে আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বলতে। ওই লোকদের চেনে হরজিৎ সিং।

বিশুয়ার এ এলাকায় নামডাক আছে। নানা অন্ধকারের কাজে তাকে দেখা যায়। এখানে এসময় তাকে

দেখে হরজিৎ কিছু বুঝে নেয় ব্যাপারটা। দেখে ওদিকে কয়েকজন বের হয়ে গেল একটা ঠ্যালা গাড়িতে বেশকিছু কুমড়ো বোঝাই করে। ওগুলো যে ফাঁপা নয়. ওই কুমড়োর মধ্যে বিশেষ বস্তু আছে তাই মনে হয়। না হলে কুমড়ো নিয়ে যেতে এত মন্ত্রণা, সাবধানতা কিসের।

ওরা চলে যেতে এবার হরজিৎ সিং বের হয়ে এসে বলে—আরে সুকুমারবাবু!

সুকুমার হঠাৎ এখানে এই সময় হরজিৎ সিংকে দেখে একটু চমকে ওঠে।

বলে সে—এমনিই, বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম।

হরজিৎ এগিয়ে এসে হেসে বলে—সে হামি জানে। সুকুমারজী কিছু জরুরি বাত ছিল।

সুকুমার চাইল।

হরজিৎ বলে—আপনার ভি লাভ হতো। চলেন বসে থোড়া বাত করে লি।

সুকুমার অবাক হয়ে শুনছে হরজিতের কথাগুলো।

বলে সে—আপনি একলা কতটুকুই কাম করবেন? হামার ট্রাক পাথর লিয়ে আসে—ব্যস ওতে করে পুরো মাল যাবে দুর্গাপুর, বোলেন তো জাদা মাল হলে আসানসোল কোল এরিয়াতে ভি যাবে। এতবড় ফিল্ড কব্জা করিয়ে লিব।

সুকুমার স্বপ্ন দেখছে, রাশি রাশি টাকা আসছে তার। দুর্গাপুরে বাড়ি করবে, গাড়িও কিনবে। বোর্ডের চাকরির নামে নরু পালের পায়ে তেল দিতে হবে না।

বলে সে— কিন্তু তাতে তো হ্যাঁপা অনেক। টাকাও লাগবে অনেক মাল তৈরি করতে।

হরজিৎ বলে—সো হামি ভি দেব। আর পুরা মালের এজেন্ট ভি কিছু রাখতে হবে। তারা ভি ঠেকে গিয়ে, হোটেলে গিয়ে অর্ডার আনবে। ই'কামে লেড়কি হলে ভালো হয়।

—মেয়েছেলে? আর, হোটেলে বারে আমাদের মাল কেন নেবে?

হাসে হরজিৎ।

বলে সে—বড়িয়া এক নম্বর মাল বানাতে হোবে, হামি স্কচের বোতল, শিল সব আনবে, বোতলে উ মাল প্যাক করো—ব্যস স্কচ হোয়ে গেল। ক্যা?

হাসছে হরজিৎ।

সুকুমার ওর মতো উর্বর মস্তিষ্কের লোককে হাতে পেয়ে খুশি হয়। তবু বলে সে—কথাটা ভেবে দেখি সিংজী। দু-একদিনের মধ্যে তোমাকে খবর দেব।

সিংজী ব্যবসায়ী লোক। পাথরের ব্যবসা থেকে নবকেষ্ট দেবকেষ্ট তাকে হটালেও পাথরের খাদের বাইরের ঠাট বজায় রেখে এবার এইসব কাজই করবে সে। এই ব্যবসায়ে লাভের অঙ্কটা অনেক বেশি। শুধু কয়েকটা জায়গায় প্রণামিটা ঠিকমতো দিয়ে যেতে হবে। এখুনিই জবাব চায় না সে, জানে সুকুমারও ভাবছে কথাটা। তার জালে পা-ও দেবে সে। তাই হরজিৎ বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ। ভেবেচিন্তে বাত করবে। অব চলে।

নবকেষ্ট দেখেছে ইদানীং দুর্গাপুরে বহু লোক আসছে নানা জায়গা থেকে। বিরাট বনস্পতির যেমন শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটে, বহু পাখি এসে আশ্রয় নেয় আহার্যের সন্ধানে, তেমনি বহু লোক আসে দুর্গাপুর অঞ্চলে নানা কাজে, ধান্দায়। আর বেশি কিছু মানুষ কিছু বেহিসেবী কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে, সেগুলোর কিছুটা নানভাবে ব্যয় করে জীবনের আনন্দ কুড়িয়ে নিতে। নবকেষ্ট তাই এই নির্জন সমাজে হোটেল খুলতে চায়।

দেবকেষ্ট ওসব শুনেছে। নবকেষ্ট ইদানীং ওর সঙ্গেও ব্যবসা-সংক্রান্ত সব আলোচনাই করে। দু'ভাই-এর উর্বর মস্তিষ্কে এখন ব্যবসাটা বেশ জমেছে।

বুড়ো গতিকেষ্টও দেখছে।

তার সেই চালাঘর আর নেই, বিরাট দোতলা দোকান—সানমাইকার ঝকঝকে টেবিল, চেয়ার, নীলাভ আলো জ্বলছে, স্টিরিও বাজছে, হলঘর গমগম করে। কয়েকজন কারিগর সিঙ্গাড়া-কচুরী বানাতে ব্যস্ত।

আর তার সেই আলুর চপ, বেগুনী এরা পছন্দ করে না। ওদিকে ভিয়েন বসে। হেড কারিগর তদারক করে সন্দেশের পাক, দইয়ের তার।

গতিকেষ্ট দ্যাখেমাত্র।

আবার হোটেল খোলার পরিকল্পনা শুনে বুড়ো চাইল।

—হোটেল! তা ভাতের হোটেল নাকি রে?

নবকেষ্ট বাবার সাবেকিপনায় বিরক্তিভরে বলে—তুমি থামো তো! ভাতের হোটেলে কি হবে? সাহেবী হোটেল বানাব।

গতিকেষ্ট থেমে গেল। ইদানীং ছেলেদের সঙ্গে কথা কম বলে সে। মনে হয় গতিকেষ্ট সত্যিই আজ বাতিলের দলে। দিনগুলো আমূল বদলে গেছে, আর সেই দিনবদলের পালায় গতিকেষ্ট নামক একটি তেলেভাজা বেচা মানুষ আজ বাতিল।

নবকেষ্টর কথায় দেবু বলে—কিন্তু অনেক টাকার ব্যাপারে রে! এত টাকা জড়িয়ে ফেলব? এদিকে ভাবছি আইসক্রীম কলও বসাব, ওদিকে ক্রাশিং মিলের নতুন প্ল্যান্ট বসছে।

নবকেষ্ট তা জানে। বলে সে—জায়গাও ঠিক করেছি, কাইজোড়ের ধারে টিলার নীচেই।

আমবাগানে হোটেল হবে, রাস্তার ধারে, দুর্গাপুর স্টেশনের কাছাকাছি বাগানটাকেও সাজানো যাবে, নদীও আছে। সুন্দর সিনারি। আজকাল লোকে দু'একদিন এসে অমনি নিরিবিলি সবুজে থাকতে চায়। সঙ্গে বারও থাকবে, পুকুরটাকে সাজিয়ে সুইমিং পুল, নৌকা-বিহারের ব্যবস্থাও করা হবে। সঙ্গে রেস্তরাঁ, বার, আব থাকাব ব্যবস্থা হবে।

মনোরমা পরিকল্পনা শুনে খুশি হয়। বলে সে—সুন্দর হবে। মিটিং করা যাবে ওখানে, ফাংশানও।

দেবু হিসাব করে—অনেক টাকার ব্যাপার দাদা। এত টাকা?

নবকেষ্ট বলে—ব্যাঙ্ক লোন পাবো। সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

দেবু তা জানে।

মনোরমা ইদানীং উৎকট সভ্যতাকেই পছন্দ করছে বেশি। দেখছে মনোরমা এইখানে নতুন শহব, নতুন জীবন গড়ে উঠেছে, তবু সাবেকি সমাজ-সংস্কারের প্রাধান্যটাকে এবা কাটাতে পারেনি।

তার এই ক্লাব, অনুষ্ঠান, ফাংশন, অবাধ মেলামেশাটাকে অনেকেই ভালো চোখে দেখে না। গ্রামের মানুষরা এ নিয়ে অনেক কথাই বলে; তাই মনোরমা গ্রাম ছেড়ে নিউ টাউনের বাড়িতেই তার আসর জমিয়েছে, নতুন এক উন্মাদনাময় জীবনের স্রোতে সামিল হয়েছে।

তাই ওই হোটেল তৈরির কথা শুনে বলে মনোরমা—ফার্স্ট ক্লাস হোটেল বানাও বাপু, একেবারে সাহেবি কায়দায়। আর ঠাকুরপো—তোমার হোটেলেই একটা কাজকম্মোও দিও বাপু।

দেবু বলে—দেখি, আগে এতবড় প্রজেক্ট সামলে-সুমলে তৈরি করি, তারপর তো দেখতেই হবে সকলকে।

নবকেষ্ট বলে—দেবু এসব নিয়ে বেশি সোরগোল করিস না, ব্যাটা সিংজী শুনতে পেলে আবার নিজেই পারমিট-ফারমিটের জন্য দৌড়বে। হোটেল ব্যবসাতেও ওদের লোকজন আছে।

দেবকেষ্ট তা জানে। তাই বলে—না, না! ও ব্যাটা জানতে পারবে না। কেউই জানবে না এখন।

মনোরমার সময় নেই। তার সামনে ফাংশনের নানা আয়োজন বাকী। এখানকার কর্মকর্তারা, দুর্গাপুরেব দু-চারজন হোমরা চোমরা নেতা—জেলা সদরের ডি—এম.কেও নেমন্তন্ন করতে হবে।

মনোরমা বলে—কাজ শুরু করো। দেখি—আমার এখন সময় নেই। পরে আলোচনা করব।

বিষ্টু ভট্টাচার্য দুপুরের রোদে ফিরছেন গ্রামে কোনো বাড়িতে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়ে। কাঁকুরে মাটি রোদে তাপে তেতে উঠেছে, পা দেওয়া যায় না। মাথার পাটকরা ভিজে গামছা, তাও রোদের খর তেজে শুকিয়ে গেছে, আর হু-হু গরম হাওয়া বইছে। কোনোরকমে পা ফেলে আসছেন বিষ্টু ভট্টাচার্য। জীবনটা

তাঁর কেটেছে এমনি রুক্ষতার মাঝে, কোথাও কোনো ছায়াতরুর আশ্বাস নেই। ভেবেছিলেন বিষ্টু ভট্টাচার্য তাঁর ছেলে বিলাস একদিন মানুষ হবে, এ গাঁয়ের বহু ছেলেপুলে এখন দুর্গাপুরে চাকরি করছে, বেশ ভালো টাকাও ঘরে আনছে। বিলাসও চাকরি করবে, তাঁর মেয়ে রমারও বিয়ে-থা দেবেন। শেষ জীবনটা শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তা হয়নি!

—ভট্টাচার্য মশায়!

কার ডাকে চাইলেন বিষ্টু ভটচায। ঝাঁ ঝাঁ রোদে কষ্ট হচ্ছে। শুভিও বুঝেছে সেটা। ওদের অবস্থাটা সেও জানে।

শুভি বলে—এই রোদে বের হয়েছেন?

ভটচায বিবর্ণ হাসিতে শীর্ণ মুখ বেদনার্ত করে তুলে বলেন—পেট বড় মালাই রে!

চলে গেলেন ভটচায টলতে টলতে। শুভি দেখছে ব্যাপারটা।

শুভি মেয়েটা সর্বঘটে কাঁঠালি কলা। সুনীতিদের বাড়ির কাজ সেরে ফিরছে সে। মেয়েটাও জেনেছে ওদের বাড়ির পিছনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কি কাজ চলছে। তার বাবা ভূষণ ডোম ওখানের মদ চোলাই ভাটির হেড কারিগর। পয়সা কি পায় জানে না শুভি, তবে বাপটা রোজ বৈকালে বেটোর মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে।

শুভি গজ গজ করে—ময়রা সন্দেশ বানায়, খায় না। আর তুই বাপ এমন কারিগর যে নিজের তৈরি মদে লোকে মাতাল হবার আগেই তুই মাতাল হোস!

ভূষণ নেশার ঘোরে দু-চার টাকা মেয়ের সামনে ছিটিয়ে দাওয়ায় কাতমেরে বসে বলে--মদ কখন খেলাম রে? টেস করতে হয় তো, তাই টুকচেন খাই। নে ট্যাকাগুলোন রাখ্। ভাবছি ইবার বাড়িই করবো, দালান—আর তুর একটা সাঙ্গাও দিব খাসা ছেলের সাথে।

শুভি হেসে ওঠে—ওইটাই বাকী আছে। পাকা দালান দিলেই পুলিশে ধরবেক। ট্যাকা কুথায় পেলা!

ভূষণ মদ গিললেও হুশ হারায় না। বলে সে—তা ঠিক বুলেছিস।

শুভি বলে- আর আমার সাঙ্গা হলে তো চলে যাবো ইখান থেকে ত্যাখন, তুমার কি হবেক?

ভূষণ বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে -হুঁ। শালা ঘরজামাই রাখব তাকে। ভূষণের টাকার অভাব?

শুভি বলে - সে পরে হবে। তার চেয়ে বলি ওই কাজ আর কর না। ওই ট্যাকায় জমি কিনেছি, বাগিয়ে চাষ করো। তুমি আমি দুজনে খেটে আনাজপত্র করি, হাটে পড়তে পাবে না। ঐসব মদের কাজ ছাড়ো, বুড়োবয়সে কুনদিন ফাটকে যাবে?

কথাটা বলেও বোঝাতে পারেনি বাবাকে। মদের গন্ধ না হলে ভূষণের শরীরটা আনচান করে। রোজ আসতেই হয়। শুভি এসেছিল এদিকে, কাজে যাবার মুখে হরজিৎ সিং-কে এখান থেকে বের হতে দেখে দাঁড়াল।

খুশিমনে বের হচ্ছে হরজিৎ, ছায়া ঘন নির্জন ঠাঁইয়ে শুভিকে দেখে চাইল। ওর ছোট শাড়িটার বাঁধন ছাড়িয়ে উদ্ধত যৌবন ঠেলে উঠেছে। সারাদেহে মদের চেয়েও তীব্র নেশা-আনা চাহনি!

—এখানে? কি ব্যাপার সিংজী?

হরজিৎ আসলে ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে বলে—এসেছিলাম শিববাবুর কাছে থোড়া জমিনের জন্যে!

—তাই নাকি! শুভি কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না।

হরজিৎ বলে—খাদানে যাস না কেনে, আয় কাম দিব।

হাসে শুভি —ডর লাগে গো! কাম করব কি?

—ডর! কাহে? হরজিৎ শুধোয় ওকে।

শুভি বলে—তোমাকে গো! যা চাহনি তোমার—

হাসছে হরজিৎ! শুভির নরম গাল টিপে একটু আদর করে বলে—ডরো মৎ! আসবি কিন্তু?

চলে গেল লোকটা। শুভি দেখেছে সুকুমারকেও। সুকুমারের ব্যবসার খবর সে জানে। তার বাবাকেও ফিরতে দেয়নি সুকুমার।

শুভি বলে—একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর!

সুকুমার শুধোয়—কেন রে?

—সিংজীকে দেখলাম কিনা, তাই বলছি। আবার কি সব্বোনাশ করবে কে জানে?

সুকুমার ধমকে ওঠে—থাম তো! যা ত সব বাজে কথা তোর।

হাসে শুভি—আমিই তো বাজে মেয়ে গো! চলি!

চলে গেল শুভি।

সুকুমার ভাবছে কথাটা। সামনে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। হাজার হাজার টাকা আসবে তার হাতে। শুভির মতো দু-একজন মেয়ে পেলে তার ক্যানভাসিং অর্ডার আনার কাজ হত। কিন্তু ওই মেয়েকে বিশ্বাস নাই।

তাই তাকে অন্যদের কথা ভাবতে হবে। আর ভদ্রঘরের নতুন মেয়ে হলেই ভালো হয়, তারা পুলিশের নজরে সহজে পড়বে না।

দেখা যাক হরজিৎ সিং কি বলে।

বিলাস অনুষ্ঠানের পর দেখেছে হাতে বেশ কয়েক হাজার টাকাই আছে। মনোরমার একটা গুণ সে টাকা-পয়সার দিকে নজর দেয় না। বিলাস সেদিকে নিশ্চিন্ত, সেই অনুষ্ঠানের খবর বের হয়েছে দুর্গাপুর বার্তায়, মনোরমা যে জাতশিল্পী সেটাও তারা স্বীকার করেছে। বিলাস বলে—দেখছ মনো, কি লিখেছে ওরা?

মনোরমা ওসব দেখেছে।

ইদানীং নবকেষ্ট, দেবকেষ্ট এক হয়ে এবার ঠিকাদারী আর পাথর কোয়ারির বিজনেসেও নেমেছে। দেবু দেখে এইসব ব্যবসা, নবকেষ্টও গাড়ি হাঁকিয়ে যাতায়াত করে। মিষ্টির দোকানও বিরাটভাবে করেছে দুর্গাপুরে, একটা হোটেলও করবে। তার কাজ শুরু হয়েছে। বাড়িতে থাকার সময় নাই নবকেষ্টর।

বুড়ো গতিকেষ্ট মাঝে মাঝে আসে দোকানে। এবাড়িতে সে আসে না। বিশেষ করে ঘরেব বৌয়েব প্রকাশ্যে অমনি ঢলাঢলি নাটক করার খবরও পেয়েছে। গজ গজ করে গতিকেষ্ট বাড়িতে গিন্নীর কাছে—এইসব মেলেচ্ছ কাণ্ড চলবে?

গিন্নী চেনে তার বৌকে। বলে সে নিজে গিয়ে বলো না? পাঁচ গাঁয়ের লোক যা তা বলছে।

গতিকেষ্ট এর আগেও বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বৌমা মনোরমা বলে —আমি কচি খুকি নই। ভালোমন্দ বুঝি। আর সেকালের সেই দিনও নেই। আপনাদের ভাবতে হবে না?

গতিকেষ্ট চুপ করে গেছল।

আজ মনে হয়, গতিকেষ্টর সেই আগেকার অভাবের দিনগুলোই ছিল ভালো। শান্তি ছিল, সমাজের একটা বাঁধন ছিল।

আর আজ! টাকার জন্যে ছেলেরা সব ন্যায় বিবেক বিসর্জন দিয়ে দিনরাত ঘুরছে। ঘরের বৌও অমনি উদ্ধত, বেপরোয়া। শান্তি কোথায় পায় ওরা জানে না।

গতিকেষ্ট বলে—এর কি দাম জানি না? কি হচ্ছে কালে কালে?

বংশে কোনোদিন এসব হয়নি। আর কি হবে কে জানে? বিষ্টু পণ্ডিতের ছেলেটাও এমনি বখাটে হয়ে যাবে ভাবেনি সে। এযুগে কেউ কারোও কথা শোনে না, তবু কথাটা বলবে পণ্ডিতকে। হাজার হোক জ্ঞানী লোক—একটু প্রতিকারও করবে তার ছেলে বিলাসকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। আর নবকেষ্টকেও বলবে।

নবকেষ্ট কিছুদিন থেকেই দেখছিল তার নিজের ঘরের গোপন সিন্দুকে সাজানো ছিল ঠাস-বোঝাই করে নোটের তাড়া, কিছু সোনার বাটও। এসব এসেছে অনেক অন্ধকার পথে। হরজিৎ সিং-এর ট্রাক নেপাল আরও দূর-দুরান্তরে যায়। সেখান থেকে মাঝে মাঝে চোরা চালানও আনে হরজিৎ। তার বাবদও নবকেষ্ট বেশ কিছু রোজকার করেছে, আর সে সেগুলোকে সোনার বাটে পরিণত করেছে।

সেই গোপন ভাণ্ডারের চাবি থাকে নবকেষ্টর কাছে। মনোরমাও জানে না তার খবর বলেই এতকাল

ভেবেছে নবকেষ্ট। জীবনে তার সবচেয়ে প্রিয়, এই সোনা আর টাকাগুলো। নবকেষ্টর জীবনে আর কোনো তৃপ্তিই নেই, জীবনের একটা দিক থেকে সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। স্ত্রীর কাছে চুপচাপই থাকে অপরাধীর মতো। পুরুষের পৌরুষ নামক বস্তুটা হারিয়ে গেলে সে তখন অসহায় কোনো প্রাণীতে পরিণত হয়।

নবকেষ্ট তাই জীবনে শান্তি পায় ওই টাকা আর সোনাগুলো দেখে। ইদানীং নবকেষ্ট পাথরের কোয়ারিতেও ভালো টাকা আমদানি করছে। আলমারী ঠাস্-বোঝাই হয়ে উঠেছে টাকায়।

মনোরমা নবকেষ্টকে দেখে চাইল।

মনোরমা সেজেছে, কোথায় দুর্গাপুরে কোন্ বড়কর্তার বাড়িতে নেমন্তন্ন যাবে। নবকেষ্টর নাকি তাতে কাজের সুবিধাই হবে। নবকেষ্ট স্ত্রীর এই অপরূপ মূর্তি দেখে কি ভাবছে। মনে হয় টাকা আরও বাড়বে, বড় ঠিকার কাজ পাবে সে। আর মনোরমাও চায় পুরুষের সান্নিধ্য, তাই পেয়ে খুশি থাকুক, নবকেষ্ট পাক টাকার সন্ধান।

বেপরোয়া মনোরমা তা জানে। দু'-একবার গেছে এমন পার্টিতে। পার্টির নামে কি হয় তাও জানে সে।

বিরাট এলাকা জুড়ে ক্লাবটা। গাছগাছালির আঁধার নেমেছে, আলো-আঁধারির মাঝে মনোরমা কোনো এক হোমরা-চোমরা ব্যক্তির সঙ্গে ঘুরছে। হাতে মদের গ্লাস। মনে গোলাবী নেশার আমেজ। সুইমিং পুলের নীলার্দ্র জলে আলোর ঝলক ওঠে।

মিঃ চোপরার হাতগুলো মনোরমা অর্ধনগ্না নরম দেহে সাড়া জাগায়।

—মাই ডারলিং!

মনোরমা দেখছে ওই লোভী মানুষটাকে। ওদের হাতে কাজ দেবার ক্ষমতা আছে, তাই শুধু টাকাই নয়, নারীদেহের উপঢৌকনও তারা আশা করে।

মনোরমা ওর লোভী হাতটাকে থামাতে পারে না। ওর বুকের কাছে হাতটা এগিয়ে আসছে। অন্ধকার নেমেছে দূরের ছায়াকুঞ্জে। এ যেন ওদের ভোগ-সম্ভোগের জন্যই তৈরী। মনোরমার বঞ্চিত মন পুরুষের সান্নিধ্য পেতে চায়, কিন্তু তার মনেও সরীসৃপদের জন্য ঘৃণা জন্মে, ওকে যেন নবকেষ্ট এবার টোপ হিসাবেই ব্যবহার করেছে তার অর্থতৃষ্ণা মেটাবার জন্য।

ওই লোকটা মনোরমার দেহটাকে চেপে ধরেছে—হাঁপাচ্ছে মনোরমা। তার মনে জমেছে ঘৃণার জ্বালা।

ফিরছে নবকেষ্ট আর মনোরমা। মনোরমা শ্রান্ত-ক্লান্ত—ওই নিষ্ঠুর লোভী মানুষটা তার সর্বস্ব লুটে নিয়েছে। মনোরমা বেশ বুঝেছে নবকেষ্টর এই খেলা এইবার শুরু হয়েছে। আজ নবকেষ্ট লাখ কয়েক টাকার পাথর জোগাবার কাজ পেয়েছে। ভবিষ্যতে আবার আসতে হবে মনোরমাকে তার কাজ মেটাবার জন্য। নবকেষ্ট খুশিভরা স্বরে বলে—চোপরা সাহেব খুব খুশি হয়েছে। তোমার কথা বলছিল। বড়দিনের পার্টিতেও আসতে বলেছি।

মনোরমা জবাব দিল না। তার সারাদেহে তখন জ্বালাটা রয়েছে।

বলে নবকেষ্ট—তোমাকে একটা হার দেবো।

মনোরমা জবাব দিল না। চুপ করে থাকে। মনে মনে সে তার পথ ঠিক করে নিয়েছে। এইভাবে সে আর মুখ বুজে থাকবে না।

নবকেষ্ট এতদিন দুর্গাপুরের উপকণ্ঠে পৈত্রিক দোকানটাকে নিয়েই ছিল। সেখানে নোতুন শহর গড়ে উঠছে, আর তিনমাথার মোড়। ইদানীং বহু বাস-ট্রাক-মিনিবাস-প্রাইভেট ওই পথে যাতায়াত করে, সেইসব যাত্রীর কাছেও তার ব্যবসা।

তারও একটা সীমা আছে।

তাই ওই ব্যবসার সার্থকতার পর ওরা পাথরের কোয়ারি, ক্র্যাশিং প্ল্যান্ট, ট্রাক—তারপর হোটেল ব্যবসাতে নেমেছে। দুর্গাপুরের বড় বড় কোম্পানীর সাপ্লাই এজেন্ট হতে পারলে একনম্বর দু-নম্বরী সাপ্লাই-এ ফুলে উঠবে নবকেষ্ট।

দেবুর চেষ্টাতে ব্যাঙ্ক লোনও এসেছে মোটা টাকার, হোটেল তৈরী হচ্ছে, চাই দুর্গাপুরের কর্তাদেরও সাহায্য। তাই নবকেষ্ট এবার মনোরমার মতো উগ্র আধুনিকাকে এগিয়ে এনেছে।

নবকেষ্ট ব্যবসা বোঝে, তাই মনোরমার এই আমূল মানসিক পরিবর্তনটাকে সে প্রশ্রয় দিয়েছিল। সেও পরোক্ষভাবে মনোবমাকে অতি-আধুনিক হবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিল।

কারণটাও ভেবে দেখেছিল নবকেষ্ট। দেখেছে আজকের সমাজে এরও প্রয়োজন আছে। মনোরমা তাই আধুনিক হবার নেশায় মেতেছিল।

রূপ-যৌবন তার আছে, আর আধুনিকতার শান-পালিশে সেটা আরও উদগ্র হয়ে উঠেছিল। নবকেষ্ট তাই ওকে নিয়েই এখন দুর্গাপুরেরে পার্টিতে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে কর্তাদের বাংলোতেও যায় মনোরমা।

নবকেষ্ট বলে—ব্যবসাতে তুমিও পার্টনার মনো, একটু ক্যানভাসিং না হয় করলে! তবু দু-একটা কোম্পানীর সাপ্লাই অর্ডার তো পাচ্ছি। টাকাও আসছে। আজ যাবে মিঃ দেশাই-এর কাছে!

মনোরমা চুপ করে ভাবছে।

জানে মনোরমা নবকেষ্ট এইবার তাকে দিয়ে ওইসব কাজই করাতে চায়। মিঃ করকেও দেখেছে, লোভী একটা মানুষ। মদের নেশায় সেদিন মনোরমার ওপর নির্মম আক্রমণ চালিয়েছিল। অবশ্য তাদের কোম্পানীর সাপ্লাই অর্ডাব পেয়েছিল সে।

এবার নবকেষ্ট ধরেছে মিঃ দেশাইকে।

মনোরমা তাকেও চেনে, দেখেছে পার্টিতে। মোটা গোলাকার পিপের মতো চেহারা, মাথায় চকচকে বিরাট টাক। ভদ্রবেশী কদর্য ওই মানুষগুলোব যে পরিচয় মনোরমা পেয়েছে তাতে শিউরে উঠেছে সে।

নবকেষ্ট বলে—একটু না হয় মিলমিশ করলে—তাব বদলে লাখখানেক টাকা তো ঘরে আসবে ছ'মাসেই।

—টাকাটা তোমার কাছে সব? মনোরমা বলে ওঠে।

হাসছে নবকেষ্ট—ব্যবসা করছি, ওটা চাই তো। আর নাচতে নেমে ঘোমটা টানা কেন! ওসব আজকাল আধুনিকতার অঙ্গ, বুঝলে!

অর্থাৎ দেহদানপর্বও আজকের সভ্য সমাজের একটা শর্ত! মনোরমা কথাটা ভাবতে শিউরে ওঠে। তাব রূপ-যৌবন আছে, অন্তত ভালোভাবে বাঁচার চেষ্টাই করতে হবে তাকে। এই অন্ধকারেব অতলে টাকাব লোভে সে বিলিয়ে দেবে না নিজেকে।

নবকেষ্ট বলে—তাহলে আজ সন্ধ্যায় যাচ্ছ, গাড়ি থাকবে। রাতেব বেলাতেই ফিরতে পারবে। দেশাই লোকটা কিন্তু দিলদরিয়া, দেখো যদি মোটা অর্ডারই পাও।

মনোরমা চুপ কবে থাকে।

ভাবছে সে নবকেষ্টর কথা। তাদের বিবাহিত জীবনের পেছনের দিনগুলোর কথা। শহরের মেয়ে সে, কলকাতার শহবতলীর মেয়েই দেখেছিল সেখানের দিনগুলো, শহরের জীবনের প্রাচুর্যকে। নিজেও অনুষ্ঠানে গান গাইত, স্বপ্ন দেখেছিল শিল্পীই হবে।

এখানে এসেছিল যখন তখন প্রাচুর্য ছিল না, হতাশই হয়েছিল।

তারপর দিন বদলেছে, মনোরমাও বদলেছে। কিন্তু তার জন্য এত দাম দিতে হবে তা জানত না।

নবকেষ্ট জানে মনোরমাকে দিয়ে বাণিজ্যই করাতে হবে তাকে। তার জীবনে কোথায় একটা নিঃস্বতাই রয়ে গেছে—যা এত প্রাচুর্য দিয়েও ঢাকা যাবে না।

মনোরমাকে সেও তাই এড়িয়ে চলে।

আর জানে ভালোবাসা—ইত্যাদি প্রবৃত্তির প্যাঁচে জড়িয়ে গেলে ক্ষতিই হবে তার। নিছক দৈহিক প্রয়োজনটা তার তত নেই। তার জন্য নবকেষ্ট মাঝে মাঝে অন্য পথই দেখে।

রাত্রি নেমেছে।

বসতের বাইরে তার নতুন বাড়ি, বাগানও করেছে নবকেষ্ট সখ করে এই কঠিন মাটিতে। বাগানের ওদিকে একটা আউট হাউসমতো করেছে। দু-একজন বাইরের ব্যবসায়ীর লোকজন সদরের কেউকেটা এলে এখানে থাকে।

বেডরুম—টয়লেট ইত্যাদি সবই আছে।

আর নবকেষ্ট মাঝে মাঝে নিজেও আসে এখানে।

শুভি জানে হালফিল বাবুদের ব্যাপারটা।

তাদের নিয়ে আগেও জমিদারবাবুদের কিছু গোপন লীলাখেলা চলত। ডোমপাড়ার পাখির এখন অনেক বয়স। রূপও ছিল এককালে। পাখি কেন, আরও অনেকেই যেতো বাবুদের আসরে রাতের গভীরে।

আজ দিন বদলেছে।

জমিদারবাবুদেব দিন শেষ। আজ তাদের জায়গায় গজিয়ে উঠেছে নতুন এক শ্রেণী। ওই নবকেষ্ট, সুকুমারবাবুদের দল, নরু পাল—এরাই এখন নতুন সমাজের ভুঁইফোড় শ্রেণী। এদের এড়িয়ে চলার উপায় নেই।

শুভিকে সাজলে এখনও ভালোই দেখায়।

শুভি সেদিন রাতের অন্ধকারে এসেছে নবকেষ্টর বাড়িতে।

মেয়েটা আসে এ বাড়িতে মাঝে মাঝে। মনোরমা যে তাকে দেখতে পারে না তা জানে।

শুভি বলে—বৌদির নজর নাই গো।

মনোবমা শোনায়—তোব তো আছে?

হাসে শুভি—কি যে বল বৌদি! নজর থাকলে কবে কাব সঙ্গে ঝুলে পড়তাম গো। এমন মানুষ নজরেই পডল না।

মনোরমা দেখছে ওকে, বলে একজনকে ধরে থাকবি তুই?

কথাটা তীক্ষ্ণ হলেও মেয়েটার গায়ে বেঁধে না। বলে শুভি—এবার তাই ভাবছি গো।

শুভি জানে মনোরমাব জ্বালাটা। শুভিবও ভয় হয, তবে তার মনে এত চাওয়া নেই। তাই জীবনের সবকিছুকেই সে সহজভাবে মেনে নিয়েছে।

বাত নেমেছে।

নবকেষ্ট আউট হাউসে বসে মদের গ্লাস সামনে রেখে হিসাবপত্র দেখছে। খুশিই হয় মনে মনে। মনোরমাই বড বড় কয়েকটা অর্ডার এনেছে।

এবার হোটেলও তৈরি হয়ে যাবে।

দেবকেষ্টকে চার আনা বখরা দিয়ে রেখেছে, তাও ক্রমশ কেড়ে নেবে। টাকা— অনেক টাকা আসবে তার হাতে।

হঠাৎ শুভিকে দেখে চাইল।

—তুই?

শুভি উঠে আসে, অত আলোয় ওর যৌবনবতী দেহটা নীরব কামনাব ভাষাকে মুখর করে তুলেছে।

নবকেষ্টর মনে ঝড ওঠে।

এই ঝড় মনোরমাও তার সব আধুনিকতা, রূপ দিয়ে কোনোদিনই তুলতে পারেনি। শুভিও তা জানে।

বলে—দেখছ কি গো?

—তোকে।

শুভির সারাদেহে একটা সাড়া জাগে। নবকেষ্টর উপবাসী মন আজ এগিয়ে আসতে চায়। শুভি বলে—বৌদি নাই?

নবকেষ্ট বলে —সে কোথায় গেছে পার্টিতে!

—তাই মনের দুখে নেশা করতে বসেছ?

—নে!

কিছুটা মদ ঢেলে দেয় গ্লাসে।

শুভি হেসে ওঠে। বলে মদে আমার নেশা হয় না গো বাবু!

নবকেষ্টর দুচোখে নেশার সাড়া। বলে সে—তবু খা। একটু বোস না! বোস!

শুভি বসল। জানে তার টাকার দরকার। আর তার কাছে এ যেন নিছক খেলাই। লুব্ধ ওই নতুন গজিয়ে-ওঠা শাহান্‌সাদের একটু খেলিয়েই তার আনন্দ।

শুভি বলে—বসছি।

নবকেষ্ট বলে—এবার সব ছেড়েছুড়ে দোব রে।

হাসে শুভি—তা সন্ন্যাসী হবে নাকি গো!

রাত হয়ে গেছে, ফিরছে মনোরমা। সারা দেহে মনে একটা নীরব জ্বালা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। মিঃ দেশাই কেন, ওমনি লোভী জানোয়ারদের হাতেই তাকে শিকারে পরিণত করেছে নবকেষ্ট।

তার কাছে টাকাটাই বড়!

মনোরমা যেন কঠিন এক জালে জড়িয়ে পড়েছে। ওই মানুষগুলো তাকে মুক্তি দেবে না, মুক্তি দেবে না নবকেষ্টও।

সারা এলাকায় রাতের স্তব্ধতা নেমেছে।

নতুন শহর দিনে মুখর হয়ে থাকে, দোকানপাটে লোকের ভিড়, সন্ধ্যায় আলোয় সেজে ওঠে। এখন যেন ঘুমন্ত পুরী, নগ্ন—নির্জন এক জনপদ।

ক্লান্ত মনোরমার জীবনের মতোই নির্জন নিঃসঙ্গ। বিলাসের কথা মনে পড়ে মনোরমার। ছেলেটা এদের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্য জাতের। নির্লোভ, সৎ—তাই এদের কাছে অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন সে।

কেন জানে না মনোরমার আজ তার কথাই মনে পড়ে। ছেলেটাকে আজ তার প্রয়োজন। এই অর্থলোভী মানুষগুলোকে সে জবাবই দেবে।

এই শোষণের জীবন তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

গাড়িটা এগিয়ে চলেছে দূরে জনবসতের শেষে বাগানঘেরা বড় বাড়িটার দিকে।

দারোয়ান জেগেই ছিল। গাড়িটাকে দেখে গেট খুলে দেয়। গাড়িটা ঢুকে গেল ভিতরে। মনোরমা নেমেছে। হঠাৎ ওদিকে বাগানের মধ্যে আউট হাউসে আলো জ্বলতে দেখে কি ভেবে ওদিকে এগিয়ে গেল।

নবকেষ্ট তখন নেশার ঘোরে অন্য এক জীবে পরিণত হয়েছে। জীবনে কয়েকটা মুহূর্তের জন্যও সে পরিণত হয়েছে অন্য এক জানোয়ারে। শুভি ভাবেনি যে মানুষটা তাকে এই রাত্রি গভীরে এভাবে আক্রমণ করবে। তার উন্মাদ পাশব প্রবৃত্তিটা তার সব কিছু লুটে নেবে।

বের হয়ে আসছে শুভি।

নবকেষ্ট বলে—চলে যাচ্ছিস যে। এ্যাই—

শুভি কিছু বলার আগেই সামনে মনোরমাকে দেখে চাইল।

নবকেষ্ট দেখছে মনোরমাকে।

জড়িতকণ্ঠে বলে—তুমি।

মনোরমা বলে ওঠে—হ্যাঁ।

হাতের কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে বলে—তোমার কাজ হয়ে গেছে।

কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর দাঁড়াল না মনোরমা। আজ তার কাছে একটা অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে। স্ত্রীর কোনো দাবীতে তার কোনো লোভ মোহ নেই। ওরা স্ত্রীকে যখন পশরায় পরিণত করে তখন স্ত্রীর কোনো দাবীকেও মানে না।

মনোরমারও কোনো মোহ আজ নেই।

নবকেষ্ট কাগজটা তুলে নিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কয়েক লাখ টাকার অর্ডারই পাবে বোধহয় এবার। টাকার স্বাদ পেয়ে লোভী মানুষটা একেবারে বদলে গেছে। একটা কুকুরের সামনে যেন একতাল মাংস এসে পড়েছে। দেখছে নবকেষ্ট, শুভি এই ফাঁকে বের হয়ে এল।

নবকেষ্ট খুশি হয় না! মনোরমা কাজের মেয়ে। কালই শহরে গিয়ে অর্ডারটা আনতে হবে।

সাপ্লাইয়ের কাজও শুরু করতে হবে।

নবকেষ্ট পায়ে পায়ে ঘরের দিকে এগোল।

মনোরমার ঘরে এসে দেখে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ, কোনো সাড়াশব্দ নেই। নবকেষ্ট নিজের ঘরের দিকে এগোল।

সকালের আলো আজ মনোরমার মনের অন্ধকারকে দূর করতে পারেনি। জানালা দিয়ে দেখা যায় দূরের তাম্রাভ প্রান্তর, রুক্ষ শালবন-সীমা কাছিমের পিঠের মতো উঠে গেছে। মনোরমা প্রথম যখন এসেছিল এখানে —দেখেছিল কত গভীর ছিল ওই শালবন। সবুজ হলুদ স্বপ্নমাখা সেই বনসীমা আজ মানুষের লোভী হাতে নিঃশেষিতপ্রায়। জেগে আছে তৃণ-তরুহীন রুক্ষ তাম্রাভ প্রান্তর, কি নিঃস্ব তার বুক।

মনোরমার জীবনের মতোই। কোথাও ছায়ার আশ্বাস নেই। কার পায়ের শব্দে চাইল মনোরমা।

বিলাস এসেছে। বিলাস দেখছে মনোরমাকে। থমথমে মুখ-চোখ। কি যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে ওই সুন্দরী মেয়েটির জীবনে।

—কি ব্যাপার? চুপচাপ।

মনোরমা চাইল। আজ মনস্থিরই করে ফেলেছে সে। মনোরমা বলে—আমি আর এখানে একদণ্ড থাকতে হাঁপিয়ে উঠছি বিলাস। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বিলাস দেখছে ওকে।

কাছে এসে ওর পাশে বসে বলে—কি হল?

মনোরমা কি অসহায় বেদনায় ভেঙে পড়ে। এতদিন যে নির্মম পরাজয়, অপমানটা সয়েছিল আজ তার সীমা পার হয়ে গেছে। মনোরমা অশ্রুভেজা স্বরে বলে—আমাকে এই লোভী শয়তানদের হাত থেকে বাঁচাতে পারো না বিলাস?

বিলাস ঠিক আজ মনোরমাকে বুঝতে পারে না।

মনোরমা বলে—টাকার লোভে ওরা সবকিছুকে বিকিয়ে দিয়েছে। স্ত্রীর পরিচয়ও। ওদের কাছে পশরা হয়ে তিলেতিলে শেষ হতে আমি চাই না, পারব না। তুমি বাঁচাও বিলাস—

বিলাস অবাক হয় মনোরমার কথায়।

তার মত অক্ষম মানুষও আজ এইসব শুনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

বলে সে—কি করতে হবে বলো?

মনোরমা চাইল ওর দিকে। ওর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। বলে সে —পারবে বিলাস?

বিলাসও আজ মনোরমার নিবিড় স্পর্শে আর চোখের জলে অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে। বলে সে—পারব মানে! তোমার জন্য আমি সবকিছু করতে পারব।

নরু পাল দেখছে রমাকে।

এতকাল ধরে নরু পাল অর্থ, প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ বুজে খেটেছে। বহু প্যাঁচ কষেছে। এখন টাকা, প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে। আরও পেতে চায়। উপরি হিসাবে নারীদেহের আকর্ষণও জন্মাচ্ছে। কারণ ওই বৃত্তিগুলো মানুষের সহজাত।

সুকুমারও এখন পুরোপুরিভাবে ব্যবসা বড় করেছে। হরজিৎ সিং তার কথা রেখেছে, এখন একনম্বর

মহুয়ার মদ—বিদেশী স্কচের বোতলে পুরে সেই নকলি ছাপ লাগিয়ে বেশ নাফা করছে। নরু পালের আমদানির ভাগও বেড়েছে। সুকুমার বলে—আমি বড় বংশের ছেলে নরু। জমিদার বংশ। কারও ন্যায্য পয়সা মারব না। তবে দেখ না দু'একজন ভালো ঘরের মেয়ে—বেশ স্মার্ট হলে আসানসোল-দুর্গাপুরের বারগুলোও হাতে আসবে, দোকানেও দুনম্বরী মাল চালানো যাবে।

নরু পাল রমাকে দেখে কথাটা ভাবছে।

বলে সে—রমা, স্কুলে এখনও ওই টিচারের পোস্টের স্যাংশন তো আসেনি।

হতাশ হয় রমা। তার বাঁচার জন্য একটা পথ করতেই হবে।

রমা শুকনো গলায় বলে—তাহলে কিছু হবে না?

নরু পাল কি ভাবছে। বলে সে—সদরে লিখেছি। দেখা যাক কখন স্যাংশন আসে। ততদিনে একটা কাজ করতে পারো। তবু কিছু সুবাহা হবে।

রমা চাইল।

নরু পাল, সুকুমার, হরজিৎ ওরা সাবধানী ব্যক্তি। ইদানীং নরু পাল তার ভাইপোর নামে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে একটা ফিনাইল,কালি, গঁদের আঠা ইত্যাদির কারখানাও খুলেছে।

বলে নরু—ওই কারখানার সেল্‌সগার্লের বর্ধমান-বাঁকুড়া আসানসোল ফিল্ডের কিছু দোকানের নাম ঠিকানা আমরাই দেব, সেখানে গিয়ে দেখা করে অর্ডার নিয়ে আসতে হবে। ঘোরাঘুরির কাজ।

রমা চাকরির চেষ্টার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। তার কাছে ঘোরাঘুরি কিছু নতুন নয়।

বাবার ওই জীর্ণদেহ, মায়ের অর্ধাহার চলছে। সামান্য চালের জন্য রোদে বাবাকে গ্রাম গ্রামান্তরে ভিখারীর মতো ঘুরতে হয় পূজকের মুখোশ পরে। সপ্ততীর্থ বিষ্টু ভটচায আজ পথের ভিখারী।

রমার মান-সম্মান প্রশ্ন আর নেই।

রমা বলে—হোক ঘোরাঘুরির কাজ। আমি পারব।

নরু পাল একটু দাম বাড়াবার জন্যই বলে—ভেবে দ্যাখো রমা। জোর করব না। তবে মাইনে এরা মোটামুটি মন্দ দেবে না। ধরো শ'পাচেক পাবে মাইনে আর রাস্তা খরচাও দেবে ওরা।

রমার কাছে এ যেন আকাশের চাঁদ পাওয়া। ওই দিয়ে মা-বাবাকে দু'বেলা খাওয়াতে পারবে। নিজেরও কোনোমতে দিন চলবে। রমা বলে—ঠিক আছে। আমি ওই চাকরি করব।

নরু পাল মনে মনে হাসে। জানত অভাবের জ্বালাটা অনেক তীব্র হলে মানুষের মান-সম্মানবোধও হারিয়ে যায়। তাদের হাতে আসতে বাধ্য হয়। ভাগ্যিস সমাজে এই অভাব-বঞ্চনা আছে, না হলে কোনো অসৎ কাজই বেশ জমিয়ে ব্যবসা হিসাবে করা যেত না। সবাই তখন সৎ হয়ে যেত। যেটা হত এদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাদের অর্থাগমও হত না, প্রতিষ্ঠাও আসত না। সুতরাং এ সবের জনাই তাকে গদি আঁকড়ে থাকতে হবে।

নরু বলে—কাল থেকেই কাজে লেগে যাও, আমি ওদের বলে দিচ্ছি। আর শোন- কম্পিটিশনের বাজার। আমাদের মাল কারা নেয় এসব খবর কোথাও প্রকাশ করবে না বুঝেছ?

রমা মাথা নাড়ে—না, না। কোনো খবরই কোথাও বেরুবে না।

নরু পাল তস্য ভাইপো জমিদার বাড়ির ওদিকে ভাঙা একটা হলঘরকে সাফসুরোত করে সেখানে টেবিল-চেয়ার নিয়ে সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসেছে। মহাকালী কেমিক্যালস্ না কি একটা জবরদস্ত নামও দিয়েছে।

এদিকের কালির ড্রাম—চৌবাচ্চা—বোতলের স্তূপ, ফিনাইলের ড্রাম এসবও রয়েছে। লেবেলটা সাঁটা হচ্ছে বোতলে।

রমা ওখান থেকেই বিলবই ইত্যাদি নিয়েছে। চাকরিতে নেমেছে সে।

বিষ্টু ভটচায কথাটা শুনে চাইলেন। গিন্নী ওপাশে চেয়েচিন্তে আনা কিছু থোড়, বুনো ডুমুর আর কার

ডোবার কলমি শাক কুটছে। মেয়ের আজকেব ওই খাদ্য—কিছু আতপচাল দিযে ঘেঁটে নামানো হবে।

বমা বলে—চাকরি একটা পেলাম মা, আগাম পঞ্চাশ টাকা বাখো।

পাঁচখানা দশ টাকার নেট একত্রে বহুদিন দেখেনি ঠাকরুণ। টাকাগুলো মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলে বেঁধে বলে—ওগো রমু চাকরি পেয়েছে।

বিষ্টুবাবু শুধোন—চাকরি। কোথায়? ইস্কুলে?

রমা বলে—ইস্কুলে এখনও স্যাংশন আসেনি। এলেই হবে নরুবাবু বলেছে। ততদিন ওদের কাবখানার মাল বিক্রির কাজ করছি। মাসে পাঁচশো টাকা মাইনে—তাছাড়া রাহাখরচ, এলাউন্সও দেবে। ভালো বিক্রিবাটা করতে পারলে কমিশনও দেবে।

কাজটা বিষ্টু ভটচাযের ঠিক মনঃপূত নয়। সেকেলে মানুষ তিনি। মেযেদের এমনি ঘুরে ঘুবে মালের অর্ডার আনার চাকরিটা ভালো লাগেনি তঁব। বলেন— এত ঝামেলার কাজ।

মা খুশি হয়েছে। অভাবের জ্বালাটা তাকেই বেশি পোয়াতে হয়। তাই চাকবির খববে বলে—বেশ তো হযেছে। কত মেয়েই এখন কাজ করছে।

বিষ্টু ভটচায চুপ করে যান। দেখেছেন স্ত্রীকে। নিজের মেয়েকে ঘবের ঠিকানা দিতে পারেননি, তাব বোজগারের আশাতেই বসে আছেন তারা। উঠে গেলেন বিষ্টু ভটচায।

গিন্নী গজ গজ কবে—ওই এক হয়েছে। ছেলেটা কি করে তার ঠিক নাই, মেয়ে চাকবি করবে তাতেও সায দেবে না।

বমা জানে এটা। সে বলে—বাবাব কথা ছাডো তো মা। আজ থেকেই বেব হতে হবে।

মা বলে—বেশ তো। ভাতেভাত কবে দিই। খেযে যা বাছা।

সুনীতি শ্বশুবেব ডাকে এগিযে যায় ওঁব দিকে।

শিববাবু মাঝে মাঝে বাড়ির বাইবেব চত্ববে এক আধটু পাযচারী কবেন। বুডো মানুষটাব মনে হয জীবনেব একটা দুঃসহ বোঝাই বয়ে চলেছেন।

বিশাল বাড়ি এদিক থেকে ওদিকে ছডানো, একটা ছোটোখাটো ঘাট-বাঁধানো পুকুরও আছে,। এখন বাডিগুলো প্রায পরিত্যক্ত, ভেঙে পডছে. এককালে যেখানে ছিল সাজানো বাগান, এখন সে সব ঘন আগাছায জঙ্গলে ঢেকে গেছে।

শিববাবুব চোখেব সামনে ভেসে ওঠে কাছাবিব সেই সমৃদ্ধিব দিনগুলো। এখন সবই স্মৃতিতে পরিণত হযেছে। তবু টিকে ছিল বকুলগাছ। দু'-একটা গন্ধরাজের গাছ। এই দৈন্যদশাব মাঝেও বসন্তেব দিনে গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে ওঠে, ওই বকুল গন্ধরাজেব সৌরভে তবু তৃপ্তি পান তিনি।

তাই ওখানেই এসে দাঁড়ান শিববাবু।

ইদানীং দেখেছেন ওদিকে ছোট তরফেব সুকুমাবেব অংশে কি সব কারখানা হয়েছে। নরু পাল তাব ভাইপোকে দিয়ে ফিনাইল, কালি আবও কি সব তৈরি কবায। লোকজন আসে। রাতের আঁধারেও দু একটা ট্রাক আসে-যায়।

সেদিন সকালে শিববাবু বের হযে দেখেন বকুলগাছটিকে কারা ট্রাকের ধাক্কায় ভেঙে দিয়েছে, পড়ে আছে মাটিতে ঝরা ফুলের মাঝে সবুজ গাছটা। কি বেদনায় মুচড়ে ওঠে শিববাবুর সারা অন্তর।

– বৌমা। বৌমা।

সুনীতি ওঁর ডাকে বের হযে আসে। সুবিনয়ও।

বাড়িতে কাজ করছিল শুভি, সেও বেরিয়ে এসে ভাঙা গাছটাকে দেখে বলে ওমা। কুনমুখপোড়া এটাকে ভাঙলো গ'। এ যে দেখি টেরাকের দাগ।

শিববাবু বলেন—আমাদের বাগানে ট্রাক ঢুকিয়ে এইসব করবে?

সুবিনয় দেখেছে ব্যাপারটা। বলে সে —ওই সুকুমারের কারখানার গাড়িই হবে। দেখছি আমি।

দেখার আগেই সুকুমারও এদিকে আসছিল, শিববাবু বেশ রেগে গেছেন। রাগত কণ্ঠে বলেন—এসব কি হচ্ছে সুকুমার?

সুকুমার এখন দিনে-রাতে বেশ রমরমা কারবার চালু করেছে।

নরু পালও তার হাতের লোক। টাকাও আসছে এখন। তাই ওর মেজাজটা এখন আলাদাই।

শিববাবুর কথায় বলে সুকুমার—কে ভাঙল এই গাছটা কাকা?

—তোমাকেই শুধোচ্ছি।

শিববাবুর কথায় সুকুমার জবাব দেয় নিপাট ভালো মানুষের মতো—আমি কি করে বলবো?

শুভি তেড়ে ওঠে—তুমার কারখানাতে রেতের বেলায় গা-ঢাকা দে টেরাক আসে না?

সুকুমার দেখছে মুখরা মেয়েটাকে। বলে সে—ট্রাক! রাতের বেলায়?

সুবিনয় বলে—আসেই তো। তাদেরই কাজ।

শিববাবু বলেন—আমার জায়গাটাকে কি সরকারী পদ পেয়েছ সুকুমার? এখানে ট্রাক আনবে না। ট্রাক আনতে হয় তোমার জায়গা দিয়ে আনবে।

সুকুমার বেশ বুঝেছে এরা বাধা দিতে চায়। এইদিকে ট্রাক আনারই সুবিধা, পিছনে পথ নেই। তাই বলে সুকুমার—জায়গা তো পড়েই আছে, এজমালি অর্থাৎ আমাদের দু'ঘরের জায়গা।

—তাই এখানে রাতদুপুরে যা ইচ্ছা তাই করবে। গাছগাছালি ভাঙবে?

সুকুমার কাকার কথায় চুপ করে কি ভাবছে।

শিববাবু বলেন—এত কি অভাব পড়ল তোমার যে জমিদার মুখুজ্যে বাড়ির অন্দরমহল কারখানার জন্য ভাড়া দিলে?

শুভি বলে—ওর ট্যাকার খুব লোভ গো কাকা! ট্যাকার জন্যে উনি সব করতে পারেন।

সুবিনয় ধমকে ওঠে—থাম শুভি।

বৃদ্ধ শিববাবু রেগে উঠেছেন। সুবিনয় জানে আর বকাবকি করে লাভ হবে না। তাই বলে সে—বলুন বাবা! আর সুকুমার, তোমার লোকদের বলো একটু সাবধানে গাড়ি চালাতে। বেহুশ হয়ে চালায় নাকি?

শুভি জানে যারা চালায় ওই গাডি তারাও সুকুমারের কারখানায় তৈরি মালও ফ্রিতে পায়।

শুভি বলে—তা বেহুঁশ হয়েই চালায় তারা। হুঁশ থাকবেক কি করে?

শিববাবু ছেলে-বৌমার সঙ্গে ফিরছেন বাড়িতে, তাঁর শখের গাছটার জন্য দুঃখ বেশই হয়েছে। যাবার মুখে বলেন—সাবধানে চালাতে বলো ওদের। না হলে ট্রাক আসতে দেব না এখানে। মাঝরাতে কি এমন মাল যায় হে?

সুকুমারের এই কথাগুলো ভালো লাগে না।

ভালো লাগে না ওই নখ দন্তহীন শিববাবুর শাসানি।

তাই বিকালেই সুকুমারকে আসতে দেখে চাইলেন শিববাবু, সুনীতিও স্কুল থেকে ফিরছে। শিববাবু বলেন—এসো সুকুমার। বৌমা সুকুকে চা দাও।

বৃদ্ধ সকালের সেই সংঘাতটাকে ভুলেই গেছেন। কিছু মনে পুষে রাখেননি। সুনীতি চা এনেছে।

সুকুমার বলে—একটা কথা বলছিলাম কাকা।

চাইলেন শিববাবু—সুবিনয়ও এসে পড়েছে।

সুকুমার বলে—ওই সদরের জায়গাটার আপনার অংশ যদি আমাকে ছেড়ে দেন—আমি ভালো দরই দেব। ধরুন দশ হাজার টাকা।

সুবিনয় দেখছে ওকে। সামনেটা শিববাবু এখনও বাগানের মতো করে রেখেছেন, তাদের দেউড়ির শেষ

চিহ্ন ওটা।

শিববাবু বলেন—আজ সদর চাইছ, এর পর চাইবে বসত বাড়িটাই—

সুকুমারের হাতে এখন অনেক টাকা,স্বপ্ন দেখে সে সারা এলাকায় এই ধ্বংসস্তূপ সে দখলে পেয়েছে। এই নির্জন ছায়াঘন এলাকায় বিনাবাধায় সে এলাহি কারবার করতে পারবে। এত বড়ো পোড়োবাড়িতে পুলিশও কোনোকিছুর সন্ধান পাবে না। তাই কাকাবাবুকে গোটা বাড়ি কেনার কথা বলতে দেখে শোনায় সুকুমার—এখন নিউ টাউনে বেশ জমিয়ে হালফ্যাসানের বাড়ি উঠছে, সভ্যশিক্ষিত লোকরাও আসছেন। এই ধসেপড়া বাড়ি ছেড়ে ওখানে যদি নতুন হালফ্যাসানের বাড়ি করে চলে যান আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি। ধরুন—লাখ-দুয়েক দেব।

শিববাবুর ফর্সা মুখ তামাটে হয়ে ওঠে।

সুনীতিও কথাগুলো শুনছে। সুবিনয়ই বলে—ওসব কথা থাক সুকুমার।

শিববাবু বলেন—তুমি যাও। এখন টাকার জোর দেখছি তোমার। যাও—

সুকুমার উঠে পড়ে। বলে সে—আপনাদের ভালোর জন্যই বলছিলাম।

শিববাবু বলেন—আগে হলে দারোয়ান দিয়ে চাবকে তোমার পিঠের ছাল তুলতাম। আজ! আজ দিন বদলে গেছে। তুমি যাও।

শুভি সবই শুনেছে। সকাল থেকে দেখছে সে ব্যাপারটা। সুকুমার যে এমনিভাবে মাথা তুলবে ওই মানী বৃদ্ধের সব সম্মানকে পায়ে দলে তা ভাবেনি।

সুকুমার বের হয়ে আসছে, শুভিকে দেখে চাইল।

কি গো, এত চরচর করে বাড়লে চলে? রয়ে সয়ে বাড়ো বাপু।

সুকুমার ধমকে ওঠে—থামবি তুই?

শুভি বলে—থেমেই তো আছি গো, বাড়ছ তুমিই। তাই বলি এত বাড় বেড়ো না। ভালো নয়।

সুকুমার দাঁড়াল না। হনহন করে চলে গেল। অপমানিত বোধ করে সুকুমার। ইদানীং টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মান-অপমান বোধটা বেশ বেড়েই গেছে। ওই শিববাবুদের দেখিয়ে দেবে সে। গাড়ি-ট্রাক যেমন আনছিল তেমনি আনবে। তার কাজে কোনো বাধাই সইবে না।

সুনীতি-সুবিনয়রাও ব্যাপারটা দেখেছে নিরীহ ভালো মানুষ সুবিনয়।

সুবিনয় স্ত্রীকে বলে—সুকুমারের মতিগতি ভালো বুঝছি না। যদি কিছু করে বসে?

সুনীতিই বলে—কি করবে ও? ওর কিসে আছি আমরা? ও এসে বলবে আর সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে?

শুভি ঘরের কাজ করছিল। সেও দেখেছে এই শান্তিপূর্ণ মানুষগুলোর ভাবনাটা।

শুভি বলে ওঠে—ঠিক বলেছ বৌদি! নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে ওর কথায়? কক্‌খনো না। দেখবে ওর বাড় একদিন কোথায় চুপসে যাবে।

সুবিনয় সন্দেহ করে সুকুমারের ব্যবসাটা ঠিক পরিষ্কার নয়। তাই ওই লোকটার সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার।

হঠাৎ পাতাজোড়ার আকাশে যেন ঝড় তোলে খবরটা।—

প্রথমে এটা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ পুরোনো পাতাজোড়া, নিউ পাতাজোড়া টাউনে অনেক পরিবর্তন এসেছে, এখানের সার্বিক জীবনযাত্রাও বদলে গেছে সত্যি. কিন্তু এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটতে দেখে অনেকেই চমকে ওঠে।

খবরটা সাবেক পাতাজোড়া গ্রামের গতিকেষ্টর মাটির ঘরেও পৌঁছেছে। বুড়ো চমকে ওঠে—এ্যাঁ। কি

বলছিস রে? এ কখনও হয়?

মিষ্টির দোকানের ম্যানেজার ফটিক পুরোনো আমলের লোক। গতিকেষ্টর সেই ডালায় করে তেলেভাজা বিক্রির দিনগুলোকে দেখেছে সে। বলে ফটিক—কখনও হয়নি কত্তা, এখন তো হল। কি যে সব্বনাশা দিন পড়েছে, এরপর আর কি হবে কে জানে?

গতিকেষ্টর মনে হয়, আজকের ওই অতি-আধুনিক সভ্যতা তাদের সব বাঁধন ঘরের ন্যায়-নীতিকেই শেষ করেছে। মানুষ স্বাধীনতা, অগ্রগতির নামে অতিমাত্রায় স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। নিজের সুখ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পাবে না। কোনো আদর্শনীতিকেও মানতে চায় না। তাই এই দুঃখ-বিপদ আসবে এবার প্রতিপদে।

গতিকেষ্ট কি ভাবছে।

ফটিক বলে—বড়বাবু খুব তন্‌ছিট করছে। আপনাকে যেতে বললেন এখুনি।

গতিকেষ্টর গিন্নী বলে—তাই চল বাপু। আহা নবুর বরাতে শেষে এই ছিল। হায় ভগবান।

গতিকেষ্ট বলে—তারও দোষ ছিল না গিন্নী, নিজের পাপেই মানুষ নিজের বিপদ ডেকে আনে। ভগবানেব দোষ কি?

নবকেষ্ট নতুন জগৎ পাওয়ার স্বপ্ন নিয়েই মশগুল ছিল। পাথরের কোয়ারি তাদের সোনার খনিতে পরিণত হয়েছে। দেবুও খাটছে—তারই জোরে নবকেষ্ট মনোরমার আধুনিকত্বকে—তার দেহের টোপ দেখিয়ে কয়েকটা বড় বড় কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছে। দিনরাত টাকা বোজগারের পথই ভেবেছে।

সদরে গেছল, পি ডবল্‌ ডি'র একটা বড় কাজও পেয়েছে।

হঠাৎ আজ দুপুবে ফিরে দেখে মনোবমা বাড়িতে নেই। এমন মাঝে মাঝে বেব হয় মনোরমা, গাড়ি নিয়ে দুর্গাপুরে সিনেমা দেখে বাজারপত্র কেনাকাটা করে আসে।

ভেবেছিল তেমনিই কোথাও গেছে। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে, রাত্রি আসে। মনোরমা তবু ফেবে না। গাড়িও নিয়ে যায়নি, গাড়ি নিয়ে গেছল দেবু।

সেও খবর শুনে অবাক হয—তাহলে গেল কোথায় বৌদি? তোমাকেও কিছু বলে যায়নি?

মাথা নাড়ে নবকেষ্ট। বাড়ির কাজের মেয়েটা এতক্ষণে বলে হৈ চৈ শুনে—দেখলাম দুটো সুটকেশ নে গেছে, গাড়ি এনেছিল দুর্গাপুর থেকে বিলেসবাবু, গাড়িতে দুটো সুটকেশ নে বিলেসের সঙ্গে গেছে।

নবকেষ্ট চমকে ওঠে—সে কি! কোথায় গেছে?

ঝি-টা মাথা নাড়ে—তা কিছু বলে যায়নি।

দেবু বের হয বিলাসের খোঁজে।

নবকেষ্টর মনে ঝড় ওঠে। সে বুঝেছে কোথায় একটা গোলমাল হয়েছে। মনোরমা সেই রাতে দুর্গাপুর থেকে ফিরে আর তার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেনি। ঘৃণাভরা চাহনিতে চেয়ে থাকত। সরে যেত নবকেষ্ট।

মনোরমা বোধহয় সেই নোংরা কাজের প্রতিবাদই করে গেছে।

কি ভেবে নবকেষ্ট নিজের ঘরে ঢুকে এবার তার গোপন সিন্দুকটা খুলেই অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যাবার দুঃখেব থেকেও এই দুঃখ, আঘাতটা আরও বেশি করে লাগে।

তার এতদিনেব হাড়ভাঙা পবিশ্রমে তিল তিল করে সঞ্চিত সব টাকা, অনেক সোনার বাটই আর নেই, মনোরমা গোপনে দেখেছিল নবকেষ্টর এই সঞ্চয়। তারপর কৌশলে সেই আলমারী খুলে প্রায় সবই নিয়ে তাকে পথে বসিয়ে গেছে।

নবকেষ্ট দুঃখ ভুলে এবার রাগে ফেটে পড়ে।

—খুন করেঙ্গা নষ্টা মেয়েছেলেকে। আমার সর্বনাশ করে পার পাবে? দেখ লেঙা।

মাথা চাপড়াচ্ছে, মাথা ঠুকছে নবকেষ্ট। তার সবকিছুই যেন লুট হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ গতিকেষ্ট এসেছে, গিন্নীও ছেলেব এতবড় বিপদে হকচকিয়ে গেছে। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে

ছেলেকে—থাম নবু?

নবকেষ্ট হাহাকার করে।

গতিকেষ্ট এই জীবনে অভ্যস্ত নয়। তা দিনান্তে রোজগার ছিল খুবই সামান্য। তিন, চার, পাঁচ টাকা—বড়জোর। তাই নিয়েই শাক-ভাত খেয়ে সে শান্তিতে ছিল। বেশি লোভ তার ছিল না। এদের যন্ত্রণাটা বেড়েছে অসীম লোভ থেকেই, যা আজকের সভ্যতার প্রধান অবদান।

গতিকেষ্ট বলে—দুঃখ করিস না বাপু। দুশো টাকা পুঁজি নে ব্যবসা শুরু করেছিলি, সেই মূলধনটা বজায় থাকলেই হল। এত বেশির লোভে শুধু দুঃখই বাড়ালি বাপু। খেটে মলি আজীবন, পেলি না কিছুই। শুধু বদনামের ভাগী হলি!

নবকেষ্ট গর্জায়—পুলিশে যাব। জেলে দোব ওদের।

দেবু ফিরেছে। বিলাসকে বাড়িতে পায়নি। সকাল থেকেই সে বের হয়েছে, কোথায় গেছে বাড়িতেও বলে যায়নি।

গিন্নী বলে—ওমা! শেষকালে ওই পণ্ডিতের ব্যাটার সঙ্গেই চলে গেল?

নব গর্জায়—পণ্ডিতের ব্যাটা! শালা শুয়োরের বাচ্চা! পুলিশে যাব।

দেবুও বুঝেছে ব্যাপারটা। জানতো সে বৌদির একটু বিচিত্র স্বভাবের কথা। কিন্তু এমনি করে চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে সর্বস্ব লুটে নিয়ে তা ভাবেনি। দেবু বলে—পুলিশে যাবে যাও, কিন্তু ওসব তো দু'নম্বরী টাকা, বেহিসেবী সোনার বাট। এসব কথা পুলিশকে বল না। উলটে বিপদ হবে।

নবকেষ্ট ভাবছে কথাটা।

মা বলে—এ কি চোরের মায়ের কান্না?

গতিকেষ্ট বলে—তাই গিন্নী! চোর একালের যত পয়সাওয়ালাকে দেখছ সবাই। এরা শুধু চোর নয়, ডাকাত নয়, খুনে ও ঠক। যে যখন যাকে পাবে ঠকাবে, খুনও করবে। তাই মনে হয়, আগেকার সেই অভাবের দিনগুলো ছিল শান্তির। বেশি পাবার হাহাকার ছিল না।

খবরটা সারা পাতাজোড়ারই আলোচ্য বিষয়।

থানার দারোগাও দেবুর পরিচিত। নবকেষ্টবাবুর নাম শুনে এসেছে। লোকজনও জুটেছে।

শুভিও শুনেছে খবরটা।

মেয়েটা পাতাজোড়ার চলমান সংবাদপত্র। শুভি জানতো ব্যাপারটা। মনোরমাকেও ভাল করেই চিনত সে। মেয়ে হয়ে জেনেছিল মনোরমার জীবনের চরম ব্যর্থতাকে। নবকেষ্টকে চেনে সে।

শুভি আরও চেনে বিষ্টু পণ্ডিতের বাড়ির সবাইকে।

বিলাস ছিল অবিনাশের বন্ধু। অবিনাশ ডোমকেও বন্ধু বলে স্বীকৃতি দিতে বিলাসের বাধেনি।

বলত বিলাস—ও জাত শিল্পী রে। আহা কি সানাই বাজায়। মালকোষ, ললিত দরবারি, ওর সানাইয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। শিল্পীর আবার জাত কি? ওকে বিয়ে কর শুভি, ঘরবাসী কর ওকে।

শুভি চুপ করে থাকত। ভালো লাগত বিলাসের কথাগুলো। অবিনাশের বাবা বকত অবিনাশকে।

—ডোমের ছেলে, লাঠি ধরতে পারিস না। মাদী কুথাকার। আর ওই মাইয়াটার সঙ্গে ঘুরিস?

অবিনাশ নিজের জগতেই থাকত। স্বপ্ন দেখত একদিন বড় শিল্পী হবে, কলকাতায় গিয়ে বেতারে অনুষ্ঠান করবে, কনফারেন্সে বাজাবে।

শুভিও স্বপ্ন দেখত—বেশ বড় হবে তুমি!

কিন্তু সব স্বপ্নই রয়ে গেছে। তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গেল অবিনাশ, সেদিন ছুটে এসেছিল বিলাস। তার চোখেও দেখেছিল জলের ধারা। বলে বিলাস—সব্বোনাশ হয়ে গেল শুভি। পাতাজোড়ার এক সত্যিকারের শিল্পী চলে গেল রে।

শুভির সব হারিয়ে গেছে। জলের নীচে মাটিতে সঙ্গোপনে পদ্মফুলের জন্ম, প্রেমের জন্মও মনের অতলে—নীরবে নির্জনে। সে বিকশিত হয়ে ওঠে পদ্মের মতো পূর্ণতার সৌরভ নিয়ে। তারপর আসে ঝরার পালা। বিবর্ণ পাপড়িগুলো খসে পড়ে—স্মৃতিতে থাকে শুধু কিছু ম্লান সৌরভ।

আজ মনোরমার এই প্রতিবাদটাকে সে মনে মনে তাই সমর্থন করে। ওরা বলবে তাকে নষ্টা মেয়ে, কিন্তু মনোরমার মনের তীব্রতা জ্বালাটাকে তারা দেখেনি। বিলাস কিছুটা দেখেছিল। তাই হয়তো এগিয়ে এসেছে সে।

শুভিও এসেছে। দেখেছে দারোগাবাবু গম্ভীর হয়ে নোট করছে—বিলাসবাবুকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

নবকেষ্ট বলে—সে ব্যাটা শূয়োরের বাচ্চার সঙ্গে মেলামেশাও ছিল। দিনরাত পড়ে থাকত এখানে। থ্যাটার করত, ব্যাটা শূয়োরের বাচ্চা।

গতিকেষ্টর বন্ধু ওই বিষ্টু ভটচায। গতি সম্মান করে আজও সপ্ততীর্থকে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ— দেখেছে কত লোক তাঁকে কি শ্রদ্ধা করত। তাঁকে ওইসব অলঙ্কারে ভূষিত করতে দেখে গতিকেষ্ট বলে—তাঁর নামে এসব বলছিস কেন? হাজার হোক বেবাহ্মণ, পণ্ডিত লোক। পাপ হবে।

নবকেষ্ট খিঁচিয়ে ওঠে—থামো তো। ভারি আমার বামুন। ব্যাটা ভিখেরী।

গতিকেষ্ট থেমে গেল। দারোগাবাবু জেরা করে।

—আপনি স্ত্রীকে এ নিয়ে কিছু বলেননি কেন?

নবকেষ্ট চুপ করে যায়। জানে সে তার অক্ষমতার কথা, আর শয়তানির কথা। স্ত্রীকে টোপ হিসাবেও ব্যবহার করেছে সে টাকার জন্য; কি ভাবছে নবকেষ্ট।

দারোগা বলে—জবাব দিন।

শুভি হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে।

চাইল নবকেষ্ট। ধমকে ওঠে সে—চুপ কর।

শুভি বলে—জবাবটা দাও দারোগাবাবুকে? বুঝলা বাবু সোমত্ত মেয়েছেলেরই দোষ। বুক ফাটলেও কিছু বলার নেই।

ধমকে ওঠে দেবা—যা তো।

শুভিকে দেখছে দারোগাবাবু। তার মনে হয় কোথায় একটা কঠিন সত্যকেই নবকেষ্টবাবুরা চাপতে চাইছে। সরে গেল মেয়েটা।

দেবু বলে—যেতে দিন ওর কথা। দারোগাবাবু, খোঁজখবর করুন। অ্যারেস্ট করুন তাদের।

দারোগাবাবু বলে—খোঁজখবর করতে পারি। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, আজকাল আইনও বদলেছে। তিনি স্বামীর কাছ থেকে বিশেষ সঙ্গত কারণে ডাইভোর্স চাইতে পারেন। সেখানে করার কিছু নেই।

গতিকেষ্ট শুনছে কথাগুলো।

নবকেষ্ট বলে—পরে দেখা করব। এখন যা করবার করুন স্যার।

মনোরমা কি ভাবছে। ট্রেনটা ছুটে চলেছে কলকাতার দিকে। মনোরমা বিলাসের দিকে চাইল। ট্রেনটা বর্ধমান পার হয়ে গেছে।

বিলাস শুধোয়—কোথায় উঠবে?

মনোরমা এবার নিজের পথ নিজে বের করতে চায়। সঙ্গে এনেছে বেশ কিছু গহনা আর নগদ টাকার বাণ্ডিল, নিজের নামেও ব্যাঙ্কে বেশ কিছু টাকা সরিয়েছে, সুতরাং আপাতত কোনো ভাবনা তার তেমন নেই। বাপের বাড়িও যাবে না, জানে সেখানে নবকেষ্টর দুনম্বরী টাকাগুলোর জন্যেও সন্ধান করতে আসবে তারা।

মনোরমা বলে—কোনো হোটেলেই উঠব।

বিলাস এখনও মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা। কেমন স্বপ্নের ঘোরেই যেন মনোরমার কথামতো

চলছে সে।

ক্রমশ ট্রেন কলকাতার কাছে এগিয়ে চলেছে, এবার ভাবছে সেও। সেই গজিয়ে ওঠা শহরের পরিবেশ থেকে তারা বনেদী মহানগরীর দিকে চলেছে। এতদিন ধরে বিলাস স্বপ্ন দেখেছিল কলকাতায় গিয়ে পাকাপাকিভাবে থাকবে, তার প্রতিভা বিকাশের পথ একটা পাবে। কলকাতার দু-চারজন নামী-দামী অভিনেতা, কোনো যাত্রা দলের মালিকের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। দু-একজন ফিল্ম ডিরেক্টরও ওদিকে সুটিং করতে গিয়ে দেখেছিল বিলাসের অভিনয়, তার গানও শুনেছিল। সেই যাত্রার দলের মালিক তো বলেছিল—কলকাতায় এলে দেখা করবেন, যদি রাজী থাকেন চলে আসুন।

যাত্রা দলের আজকাল নামডাক অনেক। মাইনেও ভালোই দেয়। বিলাস স্বপ্ন দেখছে, সে এবার মুক্ত পরিবেশে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

মনোরমা বলে—কি ভাবছ? ভয় করছে নাকি?

বিলাস বলে—না পথ করে নিতেই হবে। ওখানে পড়ে থাকলে কোনোদিনই তা হত না।

মনোরমাও ভাবছে কথাটা।

ট্রেন ছুটে চলেছে। মনে হয় এক নতুন জগতের পথে পা বাড়িয়েছে তারা দুজনে। নেই দুজনের কোনো সামাজিক পরিচয়। মনোরমার আজ সামাজিক পরিচয় কিছুই নেই বিলাসের সঙ্গে। সামাজিক পরিচয়টার ওপর তার কেমন যেন বিতৃষ্ণাই এসে গেছে। নবকেষ্ট, তার স্বামী হয়েই তাকে শুধুমাত্র টাকার লোভেই তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে মনোরমার দেহটাকে বাজারের বেসাতিতে পরিণত করেছিল।

মনোরমা দেখছে বিলাসকে।

আজ দু'জনের ভাগ্যেই যেন এক অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়েছে।

শিয়ালদহ অঞ্চলের একটা মাঝারি হোটেলে এসে উঠেছে তারা। মালপত্র নামিয়ে সামনের কাউন্টারে বসা বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলে বিলাস— থাকার জায়গা হবে কয়েক দিনের জন্য?

ভদ্রলোক চোখের নিকেলের চশমাটা ফাঁক করে দিয়ে ওদের দুজনকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে আপাদমস্তক জরিপ করে যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁতপড়া লালচে মাড়ি বের করে বলে—আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করার জনাই তো আছি স্যার। তিনতলার ওপর একটা নতুন ঘর, লাগোয়া বাথরুম, ছাদ—একেবারে সেপারেট পাবেন স্যার, চল্লিশ টাকা পার ডে।

মনোরমা এবার এগিয়ে আসে। বলে সে—ওইটাই দিন। আর খাবারের ব্যবস্থা কি আছে?

বুড়ো বলে—তাও পাবেন মা-জননী, রুমে খাবার-চা-ব্রেকফাস্ট, ডিনার সব দিয়ে আসবে, তার জন্য কুড়ি টাকা পার হেড, মানে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর জন্য ধরুন চল্লিশ টাকা, আর রুম চার্জ চল্লিশ, টোটাল আশি টাকা. আজকালকার বাজারে কলকাতায় ড্যাম চিপ!

বিলাস একটু ঘাবড়ে গেছে বুড়োর স্বামী-স্ত্রী সম্বোধনে।

কিন্তু মনোরমা যেন সে কথাটার কোনো গুরুত্ব দেয় না। বলে—তাহলে সই করে দিই। টাকা শ'পাঁচেক এ্যাডভান্স রাখুন। মালপত্র উপরে তুলে দিন।

মনোরমা নিজেই ভরত রায় আর যুথিকা রায় নাম লিখে সই করে উঠে এল উপরে।

ঘরটা বেশ নিরিবিলি, এদিকে কেউ আসে না। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেশুনে মনোরমা বলে—মন্দ নয়।

বিলাস দেখছে, ঘরে দুটো খাটও রয়েছে। বিলাস মনোরমার দিকে চাইল। মেয়েটার যেন দুঃসাহস একটু বেশিই।

আর দেখেছে খাতায় সহজভাবে ওই নামগুলো লিখতে।

যেন স্বামী-স্ত্রী দুজনে কয়েকদিনের জন্য কলকাতার বেড়াতে এসেছে। বিলাস শুধোয়—ওসব কি লিখলে?

মনোরমা এর মধ্যে বাথরুম থেকে মুখে-চোখে জল দিয়ে কিছুটা ফ্রেস হয়ে এসেছে। নিটোল হাত দিয়ে তোয়ালেটা নরম মুখে ঘষে বলে কৌতুকের সুরে—নতুন নামগুলো খুব খারাপ? তুমি ভরত আর আমি

যুথিকা, যুইও বলতে পারো। বেশ মিষ্টি নাম—বুঝলে বাবু, আসল নামগুলো এবার ভুলে যাও।

বিলাস দেখেছ ওই বয়স্যময়ী নারীকে। বিপদের মুখে সে পুরুষ হয়ে কিছুটা ভাবনায় পড়েছে। আর মনোরমা এতটুকু ঘাবড়ে যায়নি, বরং সহজভাবে মেনে নিয়েছে, নিজেকে তৈরি করেছে।

বিলাস তবু বলে—ওই স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটা—

মনোরমা হেসে ওঠে, এগিয়ে এসে বিলাসকে আদর করে বলে—তাতে আপত্তি আছে? স্ত্রী হিসেবে আমি কি এতই খারাপ। অবশ্য বলত পারো একজনকে ছেড়ে এসেছি, কিন্তু তার সব পরিচয়টা জানো না—ক্রমশ জানবে। তখন নিশ্চয়ই মানবে অন্যায় আমি করিনি।

বিলাস দেখছে ওকে। মনোরমা বলে—স্নানটান সেরে খাবার বলে দাও, খেয়ে দেয়ে একটু নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়ে নিই, তারপরের কথা তখন ঠান্ডা মাথায় ভাবা যাবে।

বিলাসেরও খেয়াল হয়, কাল রাত থেকেই ঝড়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে তারা, দেহমন ক্লান্ত। এবার কিছুটা বিশ্রাম চায়।

শুভি মনে মনে খুশিই হয়েছে মনোরমার এই বিদ্রোহে। নবকেষ্ট এখন অর্থবান, আর ভাগ্য ফেরার সঙ্গে সঙ্গে এখানের মানুষগুলোর জীবনেও নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

মনোরমা চলে গেছে নবকেষ্টকে বেশ আঘাত দিয়েই। মনে হয় বিলাসদার কথা। ছেলেটা এখানে আসত, মনোরমাদের সব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত, ক্রমশ এইভাবেই মনোরমার কাছে আসে। আর তাকে অবলম্বন করেই মনোরমাও এবার নতুন জগতে পাড়ি দিয়েছে।

আগেকার রাতেও দেখেছিল শুভি মনোরমাকে। নবকেষ্টর ওখানে মাঝে মাঝে আসতে হয় শুভিকে। মনোরমাও কিছুটা জানত। সুতরাং শুভির জন্যই নয়, অন্য কারণেই চলে গেছে মনোরমা।

কিন্তু বিলাস ওই পণ্ডিতের ছেলে হয়ে একাজ করবে তা ভাবেনি শুভি। আজকাল সবই ঘটছে। বিচিত্র দিনকাল পড়েছে।

শুভি চলেছে আনমনে।

কাজেও তার আজ মন নেই। মনে হয় এখান থেকে গিয়ে ভালোই করেছে মনোরমা, এই নতুন শহরের একটা নীরব ব্যর্থতার জ্বালা তার মনেও ঝড় তোলে। শুভিও এমনি মুক্তি চায় এখানের জীবন থেকে। অনেকেই এসেছে তার জীবনে। অনেক গুজবই শুনেছে শুভি অনেক পুরুষের। কিন্তু কেউ তাকে বাঁচার কোনো আশ্বাস দিতে পারেনি। দেখেছে, সবাই এক অশান্তির জগতেই মুখ বুজে দিনযাপন করে চলেছে। নবকেষ্ট, বিলাস, নরু পাল চোলাই মদের ভাটির মালিক সুকুমারবাবু, ভূতপূর্ব জমিদার বাড়ির বৌ নন্দিনী সকলেই। সেই যন্ত্রণার জগতেই রয়েছে শুভিও।

—আরে তু।

কার ডাক শুনে চাইল শুভি। হরজিৎ সিং এর গ্যারেজ-কাম-গুদাম-কাম অফিস-কাম ধাবা আর বাড়ির কাছে এসে পড়েছে শুভি।

শহরের সীমানার একটু বাইরে বড় রাস্তা থেকে একটু ওপাশে এককালে দত্তদের বাগান পুকুর ছিল, ছেলেবেলায় আম পাড়তে আসত শুভি। পুকুরে জল থাকত ক'মাস—তারপর শুকিয়ে যেত।

হরজিৎ সিং প্রথমে এসে এই রাস্তার ধারে একটা লম্বা খড়ের চালের ঘর তৈরি করে বেশ কিছু খাটিয়া পেতে পথচলতি ট্রাকওয়ালাদের জন্য হোটেল বানায়। নিজে বসত কম, তার ভাতিজাকেই রেখেছিল এখানে, ক্রমশ বাগানটা কিনে এখানে পাকাবাড়ি তৈরি করে পুকুরটাকে কাটিয়ে হরজিৎ সিং গেড়ে বসেছে।

শুভি ওকেও চেনে। এর আগে নবকেষ্টর আউট হাউসেই মদের আসর বসেছে, শুভিও এসেছে সেখানে।

হরজিৎ সিং ইদানীং নবকেষ্টদের সঙ্গে ব্যবসাপত্র করা ছেড়েছে, কারণ নবকেষ্টই নিজে পাথরের

কোয়ারি, ক্র্যাশিং প্লান্ট চালাচ্ছে। হরজিৎ এখন নিজের ট্রাকের ব্যবসা করে আর জুটেছে সুকুমারবাবুর চোলাই মদের ব্যবসায়। ওর ট্রাকে ওইসব মাল দূরে চালান যায়, হরজিৎ সিং দেখেছে নরু পাল এখানের নেতা হয়েছে। তাকে হাতে রাখা দরকার। কারণ তার ট্রাকে যেসব মাল দুর্গাপুর থেকে যায় সেগুলোর চালান, পারমিট সবই প্রায় ভুয়ো।

তাই নরু পালের যৌথ মদের ব্যবসায় সেও মদত দেয়।

—কি খবর? হরজিৎ নিজেই খবরটা শুধোয়।

—শুন্ লো নবকেষ্টর নরু-মনোরমাজী নাকি উসকো ছোড়কে চলে গেল দুসরা জওয়ান লেড়কার সাথ!

শুভি হেসে ওঠে। বলে—কেনে গো? তোমারও ওকে নিয়ে ভাগবার সাধ ছিল নাকি?

ঠা-ঠা করে হেসে ওঠে হরজিৎ।

মেয়েটা যেন তার মনের কথাই টেনে বলেছে। হরজিৎ সেই চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। নবকেষ্ট তখন মনোরমাকে আরও উপর মহলে ভিড়িয়ে ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছে।

হরজিৎ বলে—বোস শুভি, আরে লেড়কীর জন্যে মালাই চা লিয়ে আয়।

—এত খাতির কেনে গো? শুভি হাসছে।

হরজিৎ শুধোয—তা পাত্তা মিললো কুছু জরুর?

কে জানে। শুভি জানায।

হরজিৎ বলে—শুন্ লো। নবকেষ্টর নাকি বহুৎ রুপেয়া পয়সা ভি লিয়ে ভেগেছে উ?

শুভি চতুর মেয়ে। সে এ-প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে—কে জানে বাপু? তা সিংজী তোমার কাজকারবারও তো বেশ রমরম করে চলেছে। ঘন ঘন চোলাই মদের চালানও যাচ্ছে, ওদিকে দুর্গাপুর কারখানার টানা মাল—

হরজিৎ মুখরা মেয়েটাকে থামাবার জন্য বলে—ছোড উ—ফালতু বাত। তাহলে নবকিষ্ট এখন তোর হাতে পুরা এসে গেল?

শুভি হেসে ওঠে—তুমিও তো আমার বুকে এসে গেছ সিংজী।

—কি যে বলিস! হাসছে সিংজী।

শুভি বলে—উঠি গো।

—ফের আসবি। হরজিৎ ওকেও নেমতন্ন করে। হাসে শুভি, মলিন বিষণ্ণ হাসি। তার জীবনটা যেন এদের হাতের থাবায় ক্ষত-বিক্ষত।

এখন বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছে হরজিৎ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে এখন প্রায়ই ওদের আড্ডা বসে সুকুমারের ধ্বংসস্তূপের ওদিকে কারখানার ঘরে। ঘরটাকে সাফসুতরো করে ওরা হাল বদলে ফেলেছে নতুন চেয়ার-টেবিল—মায় বিশ্রামের জন্য খাটও এনেছে।

সাইনবোর্ডে লেখা বাইরে মহাকালী কেমিক্যালস। রাশিকৃত কালির বোতল—আঠার বোতল, লেবেল, ফিনাইলের বোতল—আরও পিছনে প্রায় বন ঢাকা পোড়ো প্রাসাদের গোপন কোণে তৈরি হয় ড্রাম ড্রাম চোলাই মদ। রাতের অন্ধকারে চালান হয় দূর-দূরান্তে। হরজিৎ বলে—নরুবাবু, নবকেষ্টর বহুৎ দু নম্বর ক্যাস সোনা ভি লিয়ে গেছে ওর বৌটা। আভি হামদের ভি ওই কন্ট্রাক্ট কিছু পেতে হবে। ও কমজোরী হয়ে গেছে।

সুকুমার ভাবছে কথাটা।

বলে সে—তা সত্যি। তবে বৌটা গেল কিনা বিলাসের সঙ্গে!

হরজিৎ বলে—যানে দো। উ যাবে তা হামি জরুর জানতাম।

নরু পাল বলে—এই সুযোগে ওকে আউট করতে হবে।

মদ আর মাংস এসেছে। রাতের আবছা অন্ধকারে একপাল নেকড়ে যেন কোনো মৃত পশুর গাড় মাংস ধরে

টানাটানি করছে কি আদিম লালসায় আর ষড়যন্ত্র করছে কোথায় কার ওপর আবার নখদন্ত নিয়ে লাফ দেবে।

হরজিৎ বলে—লেডি সেলস গার্লরা ভালো অর্ডার ভি আনছে। ওই শুভিকেও কামকে লাগাও—বহুৎ চালু আছে। কোলিয়ারীর ঠেকে ওকে পাঠালে বহুৎ অর্ডার মিলবে।

সুকুমার চেনে শুভিকে। ওই মেয়েটা কাউকে পরোয়া করে না। মুখের ওপর যা-তা বলে। তাই সুকুমার এড়িয়ে চলে ওকে। তাদের ব্যবসার ভিতরে আনতে চায় না।

সুকুমার বলে—ওরে বাপ। বহুৎ শয়তান আছে সিংজী ওই মেয়েটা। ওকে এনো না।

নরু বলে—সিংজীর ওই মেয়েটাকে নজরে ধরেছে।

হাসে হরজিৎ—সাচ বোলা। ভারী প্যারা লেড়কী—ভর জোয়ানী—

সুকুমার বলে —মেয়েছেলের অভাব নাই সিংজী, ওটাকে ঘাঁটিয়ো না, ও মেয়ে নয়। সাপিনী—বিষ ছোবল দেবে। রমা ওই নোতুন মেয়েটাকেই দেখো না। দেখতেও ভালো। ভদ্র—

হরজিৎ সিং-এর চোখে ভেসে ওঠে রমার ছবিটা। শান্ত মেয়ে। দেখতেও মন্দ নয়। এখানে কাজ পেয়ে যেন বেঁচে গেছে। মনে হয় সহজেই হাতে আসবে তার।

রমা কিছুদিনের মধ্যে দুর্গাপুর, আসানসোল কেন্দ্রে এদের ঠিকানা দেওয়া দোকানে দোকানে ঘুরে বেশ ভালো অর্ডার আনছে।

মহাকালীর তৈরি কালির বোতল, ফিনাইল, আঠা—এসব যে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা জানত না। ভজন গ্রোস দরুনে সবাই অর্ডার দেয়। কোনো দোকানদার আবার তার হাতে দশ বিশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলে—দিদি, আমার মালটা দু'একদিনের মধ্যে যাতে আসে তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

প্রথম প্রথম ওসব নিতে চাইত না রমা। কোথায় বাধতো তার, কিন্তু তারাই বলত—রাখুন দিদি, আমাদের হয়ে কাজ তো করছেন, নিতে দোষ কি?

রমা নিতো। আর তার প্রয়োজনও ছিল। সংসারের নগ্ন অভাবটাকে রমাকে ক্রমশ এসব নিতে বাধ্য করিয়েছে। তবু কোথায় তার মনে সান্ত্বনা ছিল বৃদ্ধ বাবা-মাকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পেরেছে সে। বাবাকে সামান্য কিছু চালের জন্য এই গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে বের হতে হয়নি ভিক্ষুকের মতো।

রমা খুশি হয়েছে। সুকুমারও ওর অর্ডারের কপিগুলো দেখে খুশি হয়ে বলে—ভালো কাজই করেছ দেখছি।

রমা বলে—ওদের অর্ডারগুলো একটু তাড়াতাড়ি পাঠাবেন।

সুকুমার বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ। কাজ চালিয়ে যাও, কোম্পানীর উন্নতি হলে তোমাদেরও উন্নতি হবে।

নরু পাল আসে সন্ধ্যার পর। রমাও দিনের শেষে বাইরের কাজ সেরে ফিরে অফিসে কাগজপত্র জমা দিতে যায়। নরু বলে—সামনের মাস থেকে তোমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়ল রমা।

রমা খুশিই হয়। তবু বলে—স্কুলের চাকরীটা কী হল? বলেছিলেন স্যাংশন আসবে—

নরু পালের খেয়াল হয় কথাটা। বলে সে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সদরে আবার লিখেছি। তোমার চাকরী হবেই রমা। মাঝে মাঝে পঞ্চায়েত অফিসে আমাদের পার্টির অফিসে এসো।

অর্থাৎ রমাকে তাদেরই একজন হতে হবে।

রমার সামনে আজ কোনো পথ নেই। ওদের হাতে রাখতে হবে। তাই মাঝে মাঝে পার্টির অফিসে যায়। এর মধ্যে দলের কোনো মিছিলেও যোগ দিতে হয়। পাতাজোড়া গ্রামের পথে সাড়া তুলে ওরা মিছিল নিয়ে ফেরে—ব্লক অফিসের সামনে স্লোগান দেয়। রমাও তাদের সঙ্গে থাকে।

আসে নরু পাল, ভূদেব, সুকুমার আরও অনেকে। কেউ মটরবাইক, মোপেড, জিপ থেকে নামে। ওদের আগেও দেখেছে রমা সাইকেল নিয়ে ঘুরত না-হয় হাটতলায়, চায়ের দোকানের মাচায় বসে আড্ডা মারত। হঠাৎ তারা আজ এই অঞ্চলের গ্রাম-গ্রামান্তরের নেতা সেজে বসেছে। আর টেস্ট রিলিফ, নানা উন্নয়নমূলক কাজের বাবদ তাদের লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা চলে। কিছু কাজ হয় লোক দেখানোর জন্য বাকী টাকার হিসাব

কি করে কি হয় জানে না। তবে দেখে ওদের এক একজনের হাল বদলাচ্ছে।

নরু পাল তেজস্বিনী ভাষায় জনতার সামনে লেকচার দিয়ে চলে, রমাও হাততালি দেয়, দিতে হয় ওই বাঁচার সামান্য রসদ সংগ্রহের জন্য। মাঝে মাঝে মনে হয়, বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণার।

তবু বাঁচার জন্য লড়াই করতে হয়, কারণ জীবনের ধর্ম বাঁচাই।

রমা খুশি হয় তবু কাজ সে করছে। অর্ডারপত্রও অনেকই আনছে রমা। সকালে বের হয়ে যায়, ফেরে বৈকালে অফিসে। সেখান থেকে কাজ বুঝিয়ে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফেরে, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

নরু পালও সন্ধ্যায় হাজির হয় ওই পোড়ো বাড়ির অফিস ঘরে, মাঝে মাঝে আসে জিপ নিয়ে হরজিৎ সিংও। দু-চার পেটি মাল সেও নিয়ে যায়।

নরু বলে রমাকে—বাড়ি যাবে তো।

চাইল রমা। নরুও উঠেছে। ফিরছে তারা নির্জন পোড়ো বাড়ির আগাছাভরা পথ দিয়ে। নরু বলে—স্কুলের চাকরীটা বোধহয় হয়ে যাবে।

রমা আশা ভরে চাইল। বলে সে—দেখুন না। এভাবে রোদে-বৃষ্টিতে ঘুরতে কষ্ট হয়।

নরু আশ্বাস দেয়—তা বুঝি রমা। আমিও চাইছি কাজটা যাতে তোমার হয়। তাহলে এখানে থেকে দলের কাজও করতে পাবরে। মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে গ্রামের মেয়েদেরও একত্রিত করা যাবে। তোমার জন্যই এসব ভাবছি রমা।

রমা দেখছে লোকটাকে।

নরু পালের মনে নীরব কি সাড়া জগে। অন্ধকার আকাশে তারা ফুটেছে, তাই ঝিকিমিকি জাগে পুকুরের জলে। শান্ত গ্রাম পাতাজোড়া যেন তার অতীতের শান্তির মাঝে ফিরে গেছে, যেখানে আজকের সভ্যতার জ্বালা নেই। আজকের উৎকট সভ্যতার জলুস-ভরা নিউ টাউন এখান থেকে অনেক দূরে। কোথায় একটা কোকিল বাগতস্বরে ডেকে চলাছে।

--রমা।

রমা চাইল নরু পালের দিকে। এই মাঝবয়সী লোভী লোকটার কণ্ঠস্বর যেন বিচিত্র। রমার সাবধানী নারীমন ওই কণ্ঠস্বর চেনে, তাই বিস্মিত হয়েছে সে। ক্লান্ত রমা ওকে এড়াবার জন্যই বলে—চলি নরুদা।

—যাবে? নরুর কণ্ঠে যেন হতাশার সুরই ফুটে ওঠে।

নরু বলে—ঠিক আছে—পরে দেখা হবে।

চলে গেল রমা।

শুভির নজর সব দিকেই। পাতাজোড়ার জীবনের অনেক ক্লেদ-গ্লানিকে সে দেখেছে। চিনেছে ওই লোভী মানুষগুলোকে। কে কি করছে এসব খবর শুভির কানে হাওয়ায় ভেসে যায়।

শুভি নজরও রেখেছিল, আজ ফিরছে সে কাজ সেরে, রমাকে দেখে চাইল— তুমি দিদি।

রমা বলে—তুই!

শুভি জানায়—আমার তো আর কাজ নাই তোমার মতো, কেমন চলছে গো চাকরী!

রমা বলে—ভালোই।

শুভি বলে—কিন্তু ওরা ভালো লয় দিদি। ওই সুকুমার, সিংজী নরু পালের দল খচ্চরই। প্রবীর দারোগাকেও দেখি এখানে। কি যে করে ওরা।

রমা বলে—নরুদাও বলেছে স্কুলের চাকরী দেবে।

শুভিও দেখেছে নরু পালকে রমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে।

শুভি বলে— 'ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে,
ভূত বলে আমি পেলাম কাছে'।

ও ব্যাটাও একনম্বর শয়তান দিদি।

রমা শুধোয়—তাহলে ভালো কে রে?

হাসে শুভি—ঠক বাছতে গা উজার হবেক গো। মেয়েছেলে দেখলে ওদের নোলা ছুকছুক করে। বরাতই মন্দ গো আমাদের। লুকে বলে দ্যাশের উন্নতি হইছে, স্বাধীন হইছি। তা বাপু সিংটো কাদের জন্যে? ওই নরু পাল—সুকুমার—লবকেষ্টদের জন্যে। আমাদের দুঃখু এতটুকুও ঘোচেনি। চলি, বাপটো ঘরে যায়নি। দেখে যাই কারখানায়। কে জানে নিশা গিলে কোথায় পড়ে আছে।

রমা দেখেছে ওর বাবা ভূষণটাকে এখানের কারখানার কাজ করতে। বলে সে—কাজ করলে নেশা করবে কখন রে?

শুভি বলে—ওমা জানো না বুঝি, বাপটোকে দে কি করায় ওরা?

—কি রে?

রমার প্রশ্নে শুভি বলে—মদ চোলাই করায় গ' রাশ রাশ বোতল মদ। নকল বিলেতী মদের বোতলে পুরে পাঁচগুণ দামে সেই মদ দোকানে দোকানে বিক্রি করে, চালান দেয়। ধরা পড়লে জেলে না যায় বাপটোও। চলি—

শুভি চলে গেল।

অন্ধকারে একাই দাঁড়িয়ে আছে রমা। তার মনে তখন ওই শুভির কথাগুলো কি একটা অদৃশ্য ঝড় তুলেছে। তারও মনে সন্দেহ জাগে তাহলে এত কালিব বোতল, ফিনাইলের বোতলেরও কি অর্ডাব আনে সে দোকানে ঘুবে।

জরুরি অর্ডার। জোগান দেবাব জন্য তাকেও টাকা দেয তারা, শীঘ্রি শীঘ্রি যাতে মাল পায়, তাহলে কি সব মাল সেগুলো।

কালি, ফিনাইল, গঁদেব বোতল দেখিয়ে সে সবে অন্য বস্তু চালান দেওয়া হয, বিক্রি করা হয়, অন্য নামে।

পুলিশ যদি জানতে পারে? ভাবতেও পারে না কথাটা রমা, মনে হয় ওই অন্ধকারের মানুযদের নিপুণ জালে সে বোধ হয় কোথাও ফেঁসে গেছে।

ভযও হয় তার।

মনে হয় নরু পালকেই ধরতে হবে। যেভাবে হোক স্কুলের কাজটা তার চাই। এখানে থাকতে চায় না সে।

বিষ্টু ভটচায তারই পথ চেয়েছিল।

মাও বসে আছে। মনে হয় তার আজকালের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা। মেয়েকেও ঘর-বরের ঠিকানা দিতে পারেনি। দুমুঠো অন্নের আশ্বাসও দিতে পারেনি, তাই বের হতে হয়েছে মেয়েকে নিজের বৃদ্ধ বাবা-মায়ের অন্ন সংস্থানের জন্য। ছেলেটাও মানুষ হল না।

বিষ্টু ভটচায হ্যারিকেনের আলোয় কোনো এক জাতকের কুষ্ঠি দেখছিল, গোটা পাঁচেক টাকা পাবে এদের বিয়ের ঘোটক বিচার করে। ভূপেন দত্তের কুষ্ঠি, ছেলেটা কোন্ কোলিয়ারীতে কাজ করে, এর মধ্যে দু'হাতে চুরি করে বাড়িও বানিয়েছে, একটা মটরবাইকও করেছে।

বিষ্টু ভট্টচার্যের মনে হয় তার বিলাস যদি কিছু করতে পারত এমনি বাড়ি, গাড়ি, কাঁচা পয়সা। মনে মনে হ'সে সপ্ততীর্থ বিষ্টু ভটচায। এসব কি ভাবছিল সে! সেও প্রলুব্ধ হচ্ছে এযুগের অন্ধকারের জীবনে। তাব ছেলে কেন এসব করে গুছিয়ে নিচ্ছে না এই নিয়ে অনুযোগও করছিল। বিলাস তার নিজের জগৎ নিয়েই কি স্বপ্নের ঘোবে ছিল!

কিছুই করল না বিলাস। কোথায় এক কলঙ্কের ডালি নিয়ে হারিয়ে গেল। কোনো খবরই পায়নি তার।

—কই রমা ফিরল না এখনও?

গিন্নীর কথায় চাইল বিষ্টু সপ্ততীর্থ। রাত হয়েছে। এখনও রমা ফেরেনি, মাঝে মাঝে কোথায় যে যায়!

কিন্তু কিছু বলারও মুখ তাদের নেই।

হঠাৎ রমাকে ফিরতে দেখে চাইল! মা উঠে যায়।

—আয় মা। এত দেরী হল?

রমা বলে—কাজ ছিল মা। টাকাটা রাখো?

কিছু টাকা তুলে দেয় মায়ের হাতে। রমা দেখে মা হাত পেতে টাকাটা নেয়। ওর মুখে ফুটে ওঠে কিছু স্বস্তির ঔজ্জ্বল্য। মেয়ের জন্য নয়, টাকার জন্যই যেন বেশি ভাবিত হয়েছিল তারা। অন্ন সংস্থানের টাকাই বড় এখানে।

মা কোনোদিনই শুধোয়নি কি করে সে, কোথায় যায়। ওদের কাছে রমার নিরাপত্তা, মান-সম্মানের প্রশ্নের চেয়ে টাকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে।

সেদিন বাড়ি ফিরছে রমা; দুর্গাপুরে কয়েকটা দোকানে অর্ডার নিয়ে বেনাচিতির বাজারের দিকে যাচ্ছে। ওখানে শীতল বোস তাদের বড় খদ্দের। গ্রোস দরুনে কালি-ফিনাইলের অর্ডার দেয়। ছোট্ট দোকান। এত মাল কি করে, কোথায় সাপ্লাই দেয় তা জানে না রমা।

বলে ওরা—বাইরে জেলার বহু দোকানে সাপ্লাই দেয়।

চলেছে ওই দিকে। হঠাৎ একটা ছেলেকে সাইকেল থেকে নেমে তার দিকে আসতে চাইল। ছেলেটা তার মুখচেনা, ওই শীতল স্টোর্সে টুলে বসে আড্ডা দিতে দেখেছে তাকে।

ছেলেটা কাছে এসে এদিক-ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বলে—দিদি। আজ দোকানে যাবেন না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবেন শীতল স্টোর্স-এ আসি না। আপনি বরং এখান থেকেই বাসে উঠে সটান স্টেশনে চলে যান।

—কেন? অবাক হয় রমা।

ছেলেটি বলে—এসব কথার জবাব দেবার সময় নেই। যা বললাম করুন, নাহলে আপনারও বিপদ হবে।

ছেলেটা দাঁড়াল না। সাইকেলে চড়ে বের হয়ে গেল।

কি ভাবছে রমা। দোকানে যাবে না এখন।

বাসটা আসতে তাতেই উঠে পড়ে। বাসটা স্টেশনের পথে শীতল স্টোর্স-এর সামনে দিয়ে যাবে। দোকানটা আসতে দেখে চাইল রমা। চমকে ওঠে। বেশ কিছু পুলিশ রয়েছে দোকানে। কি সব খুঁজছে—দু'-একটা পুলিশের গাড়িও রয়েছে। ভিড় করেছে কৌতূহলী মানুষজন।

কে বলে—ব্যাটা চোলাই মাল পুরে নাকি বিলেতি মদ বলে চালাত, ধরেছে পুলিশ।

অন্যজন বলে—কচু হবে। দেবে নাকের ওপর চাঁদির জুতো মেরে, সব ঠান্ডা। কত ব্যাটা যে এসব করছে তা জানিস?

রমার কান, কপাল ঘামছে বিন বিন করে।

মনে পড়ে শুভির কথাগুলো। ওই মুখপোড়াও কি যে করে কে জানে? চোলাই ভেজাল মদের বোতল, সমেত ধরা পড়লে বুঝবে মজা।

আজ রমাও চমকে উঠেছে। কে জানে ওই সুকুমার, হরজিৎ সিং-দের কি মতলব। তাকেও তাদের নোংরা কাজের দলে ভিড়িয়েছে। তখন বোঝেনি আজ বুঝতে পারছে কিছু কিছু। ভয়ে তত শিউরে উঠেছে রমা।

ভীত, ত্রস্ত রমা বাড়ি ফিরছে; মনে হয় তার বাসসুদ্ধ লোক যেন তার দিকেই চেয়ে আছে। সপ্ততীর্থ বিষ্টু ভটচাযের মেয়ে আজ জড়িয়ে পড়েছে চোলাই ভেজাল মদের কারবারীদের সঙ্গে। তাদের বংশে এসব কখনও ঘটেনি।

বাস থেকে নেমেছে রমা। শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে ফিরছে বাড়ির দিকে। মনে হয় দোকান-পসার থেকে, পথ থেকে লোকজন তাঁর দিকে চেয়ে আছে। ওরা সবাই যেন জেনে গেছে তার অন্ধকারের নোংরা জীবনের কথাটা।

মনে হয় রমার সে এখনই গিয়ে বলবে যে আর এ কাজ সে করবে না। কিন্তু শরীরটা ঝিমঝিম করছে। বাড়ির দিকেই চলল সে। বাড়িতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ায় রমা।

উঠোনে বেশ কিছু লোকজন এসেছে, দেখা যায় নবকেষ্টকেও। পুলিশও রয়েছে তার সঙ্গে। নবকেষ্ট এখনও তার চুরি যাওয়া টাকার শোক ভোলেনি। বিলাস-মনোরমার পাত্তা পায়নি। তবু হাল ছাড়েনি সে।

নবকেষ্ট চীৎকার করে—ভালো করে সার্চ করুন স্যার। নিশ্চয়ই মাল এখানেও পাবেন। শালা শুয়োরের বাচ্চা এখানেই কিছু সরিয়ে রেখে গেছে। টাকা-গহনাগুলো মাগী সব নিয়ে যেতে পারেনি। নাগরের ঘরেই রেখেছে।

পুলিশও ঘরের সামান্য মাটির হাঁড়িকুড়ি ভেঙে ছিটিয়ে ফেলেছে। দেখছে কাঁথাপত্র,পুরোনো পুঁথির রাশ জুতোর ডগার আঘাতে ছত্রাকার করে ফেলে।

বিষ্টু ভটচায সপ্ততীর্থের পূর্বপুরুষের সংগৃহীত ওই পুঁথিগুলোকে সে পরম পবিত্র জ্ঞান করে, পুলিশের জুতোর ঠোক্কর খেয়ে সেগুলো ছিটকে পড়ে, ছত্রাকার হয়ে যায়, বহু যুগের পুরোনো তালপাতার বাঁশি।

ওই জুতোর লাথিটা যেন তার বুকে—তারই মাথায় মেরেছে দারোগাবাবু। আর্তনাদ করে ওঠে সপ্ততীর্থ।

—দারোগাবাবু, পবিত্র পুঁথি ওগুলো। লাথি মারতে হয় আমার বুকেই মারুন, ওগুলোকে লাথি মারবেন না।

নবকেষ্ট তখন তার ধনসম্পত্তির শোকে জ্বলছে। মনোরমা, তার স্ত্রীর চলে যাওয়ায় সে এতটুকুও দুঃখ পায়নি। বরং খুশিই হয়েছে। আর মুখ বুজে থাকতে হবে না তাকে।

কিন্তু টাকা! সোনা গেছে। তাই গর্জন করে সে—চোপ। ব্যাটা বুড়ো ভণ্ড শয়তান। ওই নুড়ি পাথরগুলোকে সরিয়ে দেখুন—ঠাকুরের সিংহাসন পাতা হয়েছে, এর নীচেই আছে মাল—

দারোগাবাবু বেটনের ঠোক্করে সিংহাসন উল্টে ফেলে—গড়িয়ে পড়ে শালগ্রাম শিলা, দেবতাও। হাহাকার করে সপ্ততীর্থ।

—দারোগাবাবু! আমার গৃহ দেবতা—

দারোগাবাবু বলে—গৃহদেবতা। বাঁদরের বাচ্চার আবার গৃহদেবতা, শয়তান—

রমা বাড়িতে ঢুকে চমকে ওঠে।

পুলিশ তাহলে তার বাড়িতেও এসেছে মদের ব্যাপারে খানাতল্লাশী করতে। রমার সারা শরীর কাঁপছে।

ওকে দেখে বিষ্টু ভটচায ছুটে আসে। আর্তনাদ করে—ওরে বিলেস আর নবকেষ্টর বউকে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা নাকি নবোর অনেক টাকা, সোনাদানা নিয়ে পালিয়েছে।

চমকে ওঠে রমা—সে কি।

বিষ্টু ভটচায বলে—তাই পুলিশ এসে তছনছ করে দিল সব। ওদের বল মা—ঠাকুরের দিব্যি। আমি কিছু জানি না। বিন্দুবিসর্গও জানি না। সে ছেলের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধও নাই। আমার ঠাকুর কি দোষ করেছে? ওদের বল—বিলেস আজ আমার কেউ নয়—তবু ওরা কেন এসব করল?

পুলিশ বেশ কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করে থেমেছে।

নবকেষ্ট গর্জায়—কোথায় রেখেছে মাল?

—জানি না সব। বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু।

দারোগাও বুঝেছে এখানে কিছু নেই। ওরা উড়েছে সব হাতিয়ে নিয়ে। দারোগাবাবু বলে—চলুন নবকেষ্টবাবু, এখানে কিছুই নাই।

ওরা বের হয়ে গেল।

রমা দেখছে ওদের। সারা বাড়ি ওরা তছনছ করে গেছে, উঠোনে পড়ে আছে ভাঙা হাঁড়ি, ছড়ানো আছে সামান্য বিছানা, ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে বাবার এতদিনের আদরের পুঁথি, বইপত্র, গড়াগড়ি খাচ্ছে

তাদের কুলদেবতা শালগ্রামরূপী নারায়ণ।

ওদের সব কিছুকে ওই নবকেষ্ট এক কঠিন আঘাতে অপমানে চূর্ণ, লাঞ্ছিত করেছে। সপ্ততীর্থ বিষ্টু ভটচাযকে আজ বিলাসের ওই বিচিত্র ব্যবহার আব ওদের অপমান দিয়েছে তীব্র বেদনা।

বিষ্টু বলে—আর বেঁচে আছি কেন বলতে পারিস মা? মান, সম্মান, বংশ-মর্যাদা সব হারিয়ে বেঁচে আছি এখনও।

গিন্নী ওইসব ছড়ানো-ছিটানো জিনিসগুলো কুড়োতে থাকে সযত্নে। রমাও কুড়োচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া পুঁথিগুলো।

বিষ্টু ভটচায বলে—আবার ওসব কুড়িয়ে কি হবে রমা?

রমাও তা জানে না।

বিষ্টু বলে—ওরে এখানে বাঁচা যাবে না। সব হারিয়ে এতবড় অপমান সয়ে এখানে না থেকে চল অন্য কোথাও চলে যাই।

রমার মনে এবার যেন বিদ্রোহ জাগে। ওই নবকেষ্টদের ঔদ্ধত্যের জবাব সে দেবেই।

রমা বলে—না, বাবা। ভয়ে অপমান সয়ে মুখ লুকিয়ে পালাব না। ওই নবকেষ্ট একটা চোর। ওর বন্ধুরাও নীচ, চোর। ওদের এর জবাব দেবই। দাদা কি করেছে জানি না। দোষ নবকেষ্টরও ছিল। আমরাও যাব না।

বিষ্টু ভটচায বলে—ওদের নীচতা, লোভের জবাব কি করে দিবি?

—তবু ভয়ে পালাব না—বাঁচার চেষ্টা করব এই মাটিতেই।

রমার কণ্ঠে কঠিন সুর ফুটে ওঠে, ওর সারা মনে কি এক সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। রমা যেন নিজের মধ্যে একটা কঠিন সত্তাকে ফিরে পায়। নবকেষ্টকে সে শেষ আঘাতই করবে তার জন্য নিজের ক্ষতি হয় হোক।

—পণ্ডিত। অ পণ্ডিত!

বিষ্টু ভটচায দাওয়ায় ঝিম মেরে বসেছিল। গতিকেষ্টর ডাকে চাইল। বুড়ো লাঠি ঠুকে ঠুকে এসেছে খবরটা পেয়ে। গ্রামের পুরোনো মানুষদের মধ্যে তারা দুজনই টিকে আছে অতীতের সেই শান্ত জনপদের অনেক স্মৃতি বুকে নিয়ে। স্মৃতিগুলো আজ কি বেদনায় বিবর্ণ।

গতি দেখছে উঠোনে ছড়ানো পুঁথিপত্র, হাঁড়িকুড়ি—ঠাকুরের সিংহাসন মায় শালগ্রাম শিলা অবধি গড়াগড়ি খাচ্ছে নবকেষ্টর টাকা খোঁজার ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রতীক হয়ে। ওই শালগ্রাম শিলার সামনেই গতিকেষ্টর অন্নপ্রাসন, বিয়ে হয়েছিল। ওই শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে নবকেষ্ট, দেবকেষ্টর অন্নপ্রাশন—বিয়েও হয়েছিল।

আজ সেই পবিত্র শিলারূপী নারায়ণ ওদের লোভের দাপটে ভূলুণ্ঠিত। গতিকেষ্ট চমকে ওঠে—এসব কি সর্বনাশ করে গেছে নবা? এ্যাঁ—শালার ব্যাটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ট্যাকা—ট্যাকা—ওর লোভেই শালারা মরবে পণ্ডিত! এ্যাঁ—

বিষ্টু দেখছে গতিকে।

উত্তেজনায় কাঁপছে গতিকেষ্ট। রমা একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলে—বসো কাকা!

গতি বসল। তবু অস্থিরতা তার যায়নি। বলে—সব শুনে ছুটে এলাম! তা এইসব করেছে? নিজের শালার ব্যাটার মাগকে সামলাবার মুরোদ নাই, ট্যাকার লোভে দাপাবি—ট্যাকায় কি হবে বলো তো পণ্ডিত উদের?

বিষ্টুও চুপ করে থাকে।

গতি বলে—আমাদের ট্যাকা ছিল না, শান্তি ছিল পণ্ডিত। সেই শান্তির দিন, সেই গেরাম সব ওরা টাকার লোভে ঘুচিয়ে দিয়ে নিজেরাই জ্বলে পুড়ে মরছে। বলেও বোঝাতে পারনি।

বিষ্টু বলে—বলেও লাভ নেই গতি, এ ভবিতব্য। তবে দুঃখ হয় কি জানো, দিন বদলাবে সত্যি, কিন্তু মানুষ যদি তার আদর্শ, ধর্মে-নীতিতে ঠিক থাকে তাহলে দিন বদলের সুখ আশে, শান্তি আসে, না হলে

আসে সর্বনাশ

গতি বলে তাই আসছে,

শুভির মনে হয় যেন একটা ঝড়ের মধ্যে দিয়েই চলেছে তারা সবাই। হরজিৎ সিংও বলেছিল—ঘরই বাঁধব শুভি।

ওর কথায় শুভি অবাক হয়—সে কি গো? এ যে ভূতের মুখে রামনাম। তুমি বাঁধবে ঘর?

হরজিৎ বলে—সাচ। ছোট বয়স থেকেই পথে পথে ঘুরলো, এখন শোচলাম ঘর বসাবো।

—তা বিয়ে-থা করো।

হরজিৎ বলে ওঠে—তুই সাদী করবি আমাকে।

শুভি চমকে ওঠে। এতদিন ধরে সেও অন্ধকারের জীবনেই ঘুরেছে। দেখেছে শুধু যন্ত্রণা আর ব্যর্থতাকেই। কোথাও এতটুকু ভালোবাসার স্বাদ সে পয়নি। সবাই লুট করে নিতে চেয়েছে তার সবকিছু।

আজ হঠাৎ হরজিৎ সিং এর মতো বেপরোয়া মানুষের মুখে ওই কথা শুনে চমকে ওঠে শুভি। ওর থিতিয়ে আসা যৌবন হঠাৎ যেন মুখর হয়ে উঠতে চায়। উদ্ধত মেয়েটা হঠাৎ কি লজ্জায় পড়েছে। এ কথা যেন বিশ্বাস করতে পারে না শুভি—বলে তুমি ঠাট্টা করছ সিংজী।

হরজিৎ দেখছে ওকে। শুভির হাতখানা তুলে নিয়ে বলে--সাচ বলছি শুভি। হামার কেউ নাই—ঘর নাই, কেউ মোহব্বৎ করলো না। তুমি আসবে —ঘর বসাবে। শালা হরজিৎ এর টুটি ফুটি জিন্দগী আবার ভরপুর হয়ে উঠবে।

শুভি কি ভাবছে।

চোখের সামনে ওই ছায়াঘন সবুজের ছোঁয়া—কোথায় পাখি ডাকছে। জীবনে সেও এমনি একটু আশ্রয়, নির্ভর চায়। আজ শুভিও স্বপ্ন দেখে। বলে সে– তাই হবে।

হরজিৎ বলে—কাল ট্রাক নে বাইরে যাব। পাঁচ সাতদিন পর ওয়াপস আসব, তখন দেখা হবে, সাদী ভি পাক্কা করবে। আর ওই নরু পাল, সুকুমারদের সাথে কারবার করবে না।

—কেন?

শুভি খুশি হয়। হরজিৎ বলে- দুনম্বরী ধান্দা মাৎ করবে হামি আউর।

শুভির মনে আজ সুর ওঠে। ক'টা দিন। শুভি তার এই খুশির খবরটাকে মনের অতলে চেপে রাখছে চায়। বাবাকেও বলে না, লোকটা দিনরাত মদের নেশাতেই থাকে। নেশার ঘোরে চিৎকার করে এ্যাই হারামজাদি, কোথায় যাস। খতম করে দেব।

শুভি বলে—পিণ্ডির জোগাড় করতে হবে না?

তবু ওর মনের খুশিটা সুনীতির নজর এড়ায় না।

শুভি সুবিনয়ের বাড়িতে কাজ করতে আসে ঠিকমতো।

সুনীতি বৌদি সেদিন শুধোয়—কি ব্যাপার রে শুভি?

শুভির কথায় সুনীতি বলে—উঁহু। বল না রে।

শুভি সেদিন ওকেই কথাটা জানায়। হরজিৎ এর সেই বিয়ের প্রস্তাবের কথা।

সুনীতি বলে—তাই নাকি রে। কিন্তু লোকটা তো শুনি অনেক ঝামেলায় থাকে। নরু পাল, সুকুমারবাবুদের অন্ধকারেও ব্যবসার শুনি মূল সামালদার।

শুভি বলে—ও নিজে বলেছে বৌদি, ওদের এই সব কারবারে আর থাকবে না

—তাই নাকি। সুনীতিও ভাবছে কথাটা। বলে সে—সত্যি হলেই ভালো রে। আর ক'দিন দেখছি না তাকে এখানে। রাতে ওর ট্রাক আসে না।

এত খুশি খুশি ভাব। ব্যাপার কি রে?

শুভি এড়াবার চেষ্টা করে—খুশির আবার কি হল?

খুশি হয় শুভি। বলে সে—ও আমাকে কথা দিয়েছে বৌদি, এবার বিয়ে থা করে ভালোভাবে বাঁচবে। লোকটার জীবনে একটাই শূন্য রয়ে গেছে।

সুনীতি বলে—তাহলে এবার তুইও চললি? আর তো এসব কাজ করতে আসছিস না, তোর বাবাকে বলেছিস?

শুভি বলে—ওটা আবার মানুষ নাকি! সেদিন বলতে গেলাম—তা বলে কি জানো?

সুনীতি চাইল ওর দিকে। শুভি বলে—বিয়ের কথা শুনে গর্জে ওঠে—শালা সিং-এর বাচ্চা বেইমান, নরু পালও ছাড়বে না ওকে।

শুভি বলে—আমিও শুনিয়ে দিয়েছি তোমার নরু পালকে বলো—আমি ওকে বিয়ে করব। আর গোলমাল করলে তোমাদের এক একটার মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবে এই শুভি!

সুনীতি দেখছে শুভিকে। বলে—মাথা ঠান্ডা কর মুখপুড়ি। বিয়ে করে সুখী হ' রে। তবু ভালোভাবে থাকবি। বোধহয় তুই পারবি ওই সিংজীকে সুখী করতে।

শুভি চুপ করে কি ভাবছে। মনে হয় বিয়ের মধ্য দিয়ে একটা গুরুদায়িত্বই সে নিতে চলেছে। তবু তার মনে খুশির সুরই জাগে।

বিপদে পড়েছে নরু পাল, সুকুমারবাবুর দল।

ওদের চোরাভাটির পুরো মালই চালান দিত হরজিৎ তার ট্রাকগুলোয়। ভালো দরই পেত তারা।

কিন্তু ক'দিন আগে হরজিৎ একরকম জবাবই দিয়েছে। এসব কাজ সে করবে না। ফলে এরাও এর মধ্যে আর তেমন কর্বিতকর্মা বিশ্বাসী লোক পায়নি, ক'দিনের তৈরি মদ জমে উঠেছে। এইবার পচে গন্ধ উঠবে, বিপদ হবে ওদের। পিছনে সুবিনয়বাবুর দলও আছে। তারাও গোলমাল বাধাবে। আর হরজিৎ সিং তাদের সমূহ বিপদে ফেলে গেছে।

সুকুমার বলে—এখন কি হবে নরুদা?

নরু পাল বলে—ব্যাটা পথে বসিয়ে গেল রে। দিনে শুধু জল বেচেই হাজার টাকা আমদানি হত, তাও বন্ধ হয়ে গেল।

সুকুমার বলে—ব্যাটা অন্য ধান্দা করছে।

শুভির বাপের রোজকারও বন্ধ, মাল খাওয়াও। সেই-ই বলে—শালা সিং-এর বাচ্চা বিয়ে করবে—ওই শুভিকে। তাই নাকি এসব ব্যবসা করবে না।

নরু পাল এমন খবরে চমকে ওঠে। বলে সে—ওর বাপ এ কারবার করবে। শালা আমাদের ফাঁসাবে—তাহলে ওকে ছাড়ব না।

সারা এলাকার বাতাস বিষিয়ে গেছে, ওই চৌবাচ্চাগুলোর মদ পচছে। এদেরও করার কিছু নেই। সুকুমারবাবুও হাত কামড়াচ্ছে।

হঠাৎ অন্ধকারে সে এসে খবর দেয়—পুলিশ আসছে!

ভাঙা বাড়িটা বিরাট এলাকা নিয়ে ছড়ানো। নরু পাল জানে পিছন দিকে পালাতে হবে, কিন্তু তাদের এই হাজার হাজার টাকার মাল, ব্যবসা এবার বন্ধ করে দেবে!

পালাচ্ছে ওরা।

পুলিশবাহিনী এসে শুভির মাতাল বাপকেই ধরে, বাকিরা সবই সজ্ঞানে ছিল, তারা হাওয়ায় মিশিয়ে গেছে মায় সুকুমারবাবু, নরু পাল সকলেই। আর সেই ধ্বংসস্তূপের পোড়া বাড়ি, জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কৃত হল ওদের এতদিনের গড়ে তোলা মদ চোলাই-এই কারখানা, প্রচুর মালপত্রও

সারা গ্রামে খবরটা বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়তে লোকজনও ভেঙে পড়ে। ওরাও অবাক হয়েছে এসব

কাণ্ড ঘটতে দেখে।

সুকুমার, নরু পালরা বিপদে পড়েছে। সমূহ লোকসান হয়ে গেছে তাদের। আর সেই লোকসানের মূলে ওই হরজিৎ সিং, লোকটাই তাদে ফাঁসিয়েছে। সেদিন শুভিকে আসতে দেখে চাইল সুকুমার। নরু পালও দেখছে ওকে।

শুভি বলে—বাবাকে পুলিশে ধরলেক, তাকে ছাড়াবে নাই?

সুকুমার অবাক হয়ে বলে—তাই নাকি রে? কেন?

শুভি দেখছে ওকে। বলে ওঠে—আসমান থেকে পড়ল নাকি গো? মনে হচ্ছে কিছুই জানো না?

সুকুমার বলে—শুনছিলাম বটে, তোর বাবাটা অমনিই। কাদের চোলাই ভাটিতে গে জুটলো—

শুভির সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। বেশ বুঝেছে শুভি ওরা এখন তাদের কোনো দোষই স্বীকার করবে না।

সুকুমার বলে—লোকটা হাজতে রইল, নরুদা একটু দ্যাখো যদি বেচারা জামিনে খালাস পায়।

শুভি বলে—যার জন্যে চুরি করে সেইই বলে চোর।

—মানে? সুকুমারবাবু চটে ওঠে।

শুভি সর্বাঙ্গে লহর তুলে বলে—ওর মানে তুমি ভালোই জানো আর ন্যাকা সেজো না গো!

মেয়েটা চলে গেল বেশ তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে।

সুকুমার বলে—ছুঁড়ি আবার গোলমাল না করে। সিংজীর সঙ্গে ওর তো খুব ভাবসাব।

নরু পাল কি ভাবছে।

সুকুমার বলে—গোলমাল করার আগেই ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবসা তো এখন গেল দেখছি নরুদা, পাথর খাদানের চেষ্টাই করতে হবে।

ক'দিন ধরে পাতাজোড়ার বাজার, দোকান বাসস্ট্যান্ড এই মদের কারখানা নিয়েই আলোচনা, মন্তব্য হল, বৈকালে দু-একটা চায়ের দোকানে, নবকেষ্টর রেস্তোরাঁতেও নানা আলোচনা হয়।

হঠাৎ সেদিন সকাল হতেই খবরটা পাতাজোড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এ আরও উদ্বেগজনক খবর। আর এই ধরনের ঘটনা এবার প্রথম ঘটল এই অঞ্চলে।

হরজিৎ সিং বাইরে কোথায় গেছল ট্রাক নিয়ে, মাল বোঝাই ট্রাক নিয়ে ফিরছিল, গোবিন্দপুরের জঙ্গলের মধ্যে তার ট্রাকটা পাওয়া যায়, মালপত্রও বেশ চুরি হয়ে গেছে আর ট্রাকের ধারে পড়ে আছে হরজিৎ-এর ক্ষত-বিক্ষত দেহটা। কারা তাকে খুন করে মালপত্র লুট করে নিয়েছে। এই নিয়েই থানাতেও অনেক ট্রাক ড্রাইভার গাড়ি ফেলে পথ বন্ধ করে এসে জুটেছে।

এসেছে নরু পাল, সেও কোনো চায়ের দোকানের মাচায় উঠে চীৎকার করে ঘোষণা করছে—এই হত্যা-ডাকাতির তদন্ত চাই। হত্যাকারীদের ধরতেই হবে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে আমরা সহ্য করব না।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই ভিড়ের বাইরে শুভি। সেও খবরটা পেয়ে হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে আসে, বাবাও হাজতে, বাড়িতে সে একা। সুকুমারবাবু, নরু পালের দল কেউ তার বাবাকে খালাস করতে যায়নি, শুভি জানতো হরজিৎ সিং ফিরলে একটা সুরাহা হবে। দিন বদলাবে তার। তার স্বপ্ন সার্থক হবে।

হঠাৎ ওই সর্বনাশা খবর পেয়ে ছুটে এসেছে শুভি। থানায় এনেছে হরজিৎ -এর প্রাণহীন দেহটা। শুভির সারা মনে ঝড় ওঠে। সবকিছু তার মিথ্যে হয়ে গেল। হরজিৎ প্রাণ দিয়েছে কোনো লোভী শয়তানদের হাতে, যারা শুভিদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে খুশি হতে চায়।

কাঁঠাল গাছের ছায়ায় একাই দাঁড়িয়ে আছে শুভি, আজ বাবাও জেলে—হারিয়ে গেল হরজিৎ সিংও। মনে হয় শুভির, এই হত্যার মূলে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে।

সুকুমারের মুখখানা ভেসে ওঠে। লোকটার অনেক ক্ষতি হয়েছে। নরু পাল তখনও ওজস্বিনী ভাষায়

বক্তৃতা দিয়ে চলেছে—হত্যাকারীর বিচার চাই।

বেশ জানে শুভি—এর বিচার যাতে না হয় তার জন্য নরু পালের কালো হাতই সক্রিয় হয়ে উঠেছে অন্যদিকে। কি ব্যর্থ বেদনায় শুভির সারা মন জ্বলে ওঠে, চোখের জলও শুকিয়ে গেছে। শুভি কাঁদতেও পারে না, কাঁদতে ভুলে গেছে।

একটা ঝড়ে আলোড়িত হয় পাতাজোড়ার শান্ত জীবনছন্দ।

বৈকালের আলো নামে, গতিকেষ্ট এই সময় একটু বেড়াতে বের হয়, ডাক্তার বলেছে হাঁটাচলা করা দরকার। সে পায়ে পায়ে বাসস্ট্যান্ডের কাছে এসে এইসব জটলা দেখে আর খবরটা শুনে অবাক হয়।

ওদের পাড়ার নটবরের ব্যাটা শশী ইদানীং পঞ্চায়েতের মেম্বার। ওকেও নবকেষ্টর বাড়িতে দেখেছে গতি, ছেলেটা একটা মোপেড কিনে ফটফট করে ঘুরে বেড়ায়। শশীই বলে—ওদিকে যাবেন না জ্যাঠা, হরজিৎ সিং-এর ডেডবডি নিয়ে প্রসেশন করছে নরুবাবুরা!

হরজিৎ-এর মৃত্যুর শোকও থিতিয়ে আসে।

হত্যাকারীদের সন্ধান অবশ্য মেলেনি, সেই তদন্তের ফাইল অন্য সব ফাইলের নীচে কোথায় চাপা পড়ে গেছে। কারণ পাতাজোড়ার জীবনে দুর্বার গতি এসেছে। তাই নবকেষ্টর স্ত্রীর পলায়নের কথা, মদের কারখানার বৃত্তান্ত, হরজিৎ সিং-এর মৃত্যুর চেয়েও এবার আর এক বিচিত্রতর ঘটনা ঘটেছে।

নবকেষ্ট মনোরমা চলে যাবার পর বেশ বদলে গেছে। এতদিনের সঞ্চিত বহু টাকাই হাতছাড়া হয়ে গেছে তার। তাই টাকার নেশায় মেতে উঠেছে নবকেষ্ট।

পাথরের খাদান এখন ভালোই চলেছে। দুর্গাপুর-আসানসোল সায় কলকাতা অবধি মাল জুগিয়ে শেষ করতে পারছে না। আরও মাল চাই, ফলে কাজও বাড়িয়েছে।

মজুররাও এবার দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছে, সুতরাং তাদের দাবি মাইনে বাড়াতে হবে, তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে, সস্তায় রেশন দিতে হবে।

দেবকেষ্ট বলে—ওদের কিছু দাবি মেনে নাও।

নবকেষ্ট ধমকে ওঠে—যা দিচ্ছি তাই পাবে না কোথাও, এরপর এসব দাবি মানতে গেলে আরও দাবি করবে। তখন?

কিন্তু অসন্তোষের বীজ একবার অঙ্কুরিত হলে তাকে দমানো যায় না, প্রকৃতির নিয়মেই সেটা বেড়ে চলে। তাছাড়া এখন খাদান—পাথর কোয়ারি, ক্র্যাশিং মিল অনেক বেড়ে চলেছে। শ্রমিকদের মধ্যে এবার নরু পালও এসে হাজির হয়েছে। সুতরাং দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। নবকেষ্ট এমনই আন্দোলনের কথা ভেবে তাদের দমাবার জন্য দুর্গাপুর থেকে দু-চারজনকে এনেছিল, তারাই দু-একটা বোমা ফাটায় শ্রমিকদের হটাতে, আর শ্রমিকরাও ক'জন গুন্ডাকে ঘিরে ফেলে পাথর ছুঁড়ে তাদের কাবু করে। অনেকেই আহত হয়ে পালায়, দুজনকে এরা পাথরের আঘাতে ছিঁচে মেরে ফেলেছে।

ডাঙার ওপর গড়ে উঠেছে হাসপাতাল।

তখন ছিল ছোট, এখন হাসপাতালের ঘর আরও বেড়েছে। সেই বারান্দায় আনা হয়েছে মৃতদেহগুলোকে, পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ।

শান্ত পাতাজোড়ার আকাশে-বাতাসে নামে হত্যা আর মৃত্যুর ছায়া, বাতাসে ওঠে আহতদের আর্তনাদ। এ যেন ছোটখাটো একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

পুলিশ ফোর্স এসেছে সদর থেকে, কয়েক ট্রাক পুলিশ ওই শোভাযাত্রীদের ঘিরে রেখেছে। শ্রমিক জুটেছে বহু, মেয়ে-পুরুষ সবই আছে। তারাও আহত হয়েছে কমবেশি, ওরাও শ্লোগান দিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দেবকেষ্টর খাদানের শ্রমিকরাও। তারাও ধর্মঘটে সামিল হয়েছে।

দোকানপাট সব বন্ধ প্রায়, বাস রাস্তায় বাস ট্রাক আটকেছে পুলিশ, যে-কোনো মুহূর্তে ওই জনতা

মারমুখী হয়ে উঠতে পারে।

নবকেষ্ট-সুকুমার-এর দলও এসেছে।

দেবাকেষ্টও রয়েছে। বলে সে—ব্যাটারা ছুতোয়নাতায় কাজ বন্ধ করবে।

নবকেষ্ট গর্জায়—পুলিশ গুলি চালাচ্ছে না কেন?

শুভিও এসেছে। দেখেছে সে আহত শ্রমিকদের। মালিকের লোক তাদের প্রথমে মারধোর করে, তারপর তারা প্রতিবাদ করছে। শুভি বলে—এলাকার মানুষগুলোর কত্তা কি তোমরা গ, যে গুলি করে মারবা?

নবকেষ্ট ধমকে ওঠে—থাম তো! যা এখান থেকে।

সরে এল শুভি—যাচ্ছি গো। ঘুমন্ত সাপের ল্যাজে পা দিয়েছ কিন্তু! ছোবল না মারে বাপু দেখো।

নরু পাল এবার করার মতো কিছু পেয়েছে। ওদিকে এস পি সাহেব এসেছেন, নরু পাল তাঁকে বলে—লাঠিগুলো চালাবেন না স্যার। ওরা চলে যাবে।

এস পি সাহেব বলেন—কিন্তু খুনের ঘটনা ঘটেছে, আসামীদের অ্যারেস্ট করতেই।

—কিন্তু খুন কে করেছে? এ তো গণধোলাই-এর ফল!

ওদের কথা শোনা যায় না। জনতাও গর্জন করে, স্লোগান দেয়।

গতিকেষ্ট খবর পেয়ে কোনোমতে লাঠিভর দিয়ে দৌড়ে এসেছে। জানে তার দুই ছেলেও খাদানের সঙ্গে জড়িত আছে। ত্রস্ত লোকজন ভয়ে পালাচ্ছে। থমথম করছে চারদিক। দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। এ যেন সেই শান্ত পাতাজোড়ার অতল থেকে কোনো বন্দী এক দৈত্য নিষ্ঠুর রূপ নিয়ে বের হয়েছে, চোখে তার হিংসার আগুন।

কে বলে—অ গতি খুড়ো, ওদিকে যেও না পুলিশ লাঠি, গুলিফুলি চালাবে। ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধেছে গো।

লোকজন দৌড়চ্ছে, কলরব ওঠে।

দেখছে গতিকেষ্ট তার ছেলেদের। ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় নব, দেবুকে। বাপ ব্যাকুল চিত্তে হাঁকে—ওরে নবু, দেবু। চলে আয় বাপ। অ নবু—

দূরে বিকট শব্দে পুলিশের টিয়ার গ্যাসের শেল ফেটেছে, লাঠি চলছে ওদের উপর। শান্ত জায়গাটা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ছুটছে লোকজন, কে লাঠির ঘায়ে ছিটকে পড়েছে।

পাতাজোড়ার এই শান্ত প্রান্তর নিমেষের মধ্যে আজ বদলে গেছে। এত নিষ্ঠুরতা যে জমা ছিল এখানে তা জানত না গতিকেষ্ট।

কলরব, কোলাহল, আর্তনাদ ওঠে।

চীৎকার করছে গতিকেষ্ট—নবু, ওরে দেবু—

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়ে বুড়ো। চোখের সামনে নামে জমাট অন্ধকার।

সারা গ্রামে দাবানলের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। শত শত লোক নিমেষের মধ্যে ওই নিউ টাউনের রাস্তা-মাঠ শূন্য করে পালিয়েছে। ছিটিয়ে পড়ে আছে কিছু আহত লোক। পুলিশ চারদিকে কড়া পাহারা বসিয়েছে। বেশ কিছু লোককে অ্যারেস্ট করে ভ্যানে তুলে পাঠিয়েছে সদরে।

পরদিন সকাল থেকেই পাতাজোড়ার কর্মব্যস্ত জীবন আবার যথারীতি শুরু হয়েছে। লোকাল বাস, এক্সপ্রেস-দূরপাল্লার বাস চলছে, যাত্রীদের ভিড়ও রয়েছে। বাজার বসেছে—গ্রামের চাষীরাও সব্জী এনে বসেছে।

নবকেষ্টর বিরাট সুইট প্যালেস আবার জমেছে খদ্দেরদের ভিড়ে। দেবুও বের হয়েছে জিপ নিয়ে খাদানের দিকে।

আসেনি গতিকেষ্ট।

কালকের ওই গোলমালে কি করে মাথায় চোট পেয়েছিল, ওকে পরে কারা তুলে নিয়ে যায়।

এসেছে নরু পাল, স্থানীয় মাতব্বররা, সুকুমারও। নরু বলে—পুলিশের ওই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা

জমায়েত করব। এর বিচার চাই। নবকেষ্ট-গতিকাকাকে পুলিশই লাঠি মেরেছে। এর প্রতিকার চাই।

সুকুমার বলে —কিছু ডোনেশন তোলো ভূপতি বাজারে, দোকানে, দরকার হয় কলকাতা যাব মিনিস্টারের কাছে।

ভূপতিও একপায়ে খাড়া। সে বের হয় দলবল নিয়ে প্রতিবাদ ফান্ডে চাঁদা সংগ্রহের জন্য।

রমা কাল বিকালে দেখেছে পাতাজোড়ার এক নতুন সর্বনাশা রূপকে। বিষ্টু ভটচাযও দেখেছে সেই রূপটাকে।

ক'দিন ধরে বিষ্টু ভটচায বাড়ির বাইরে বের হয়নি তার বাড়ির সেই ঘটনার পর। গতিকেষ্ট তার বাল্যবন্ধু, দুজনে একসঙ্গে নীলু পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ত।

তারই ছেলে নবকেষ্ট সেদিন তাকে বাড়ি বয়ে চরম অপমান করে গেছে, গতিকেষ্ট তবু এসেছিল পরদিনই। বলে সে—কিছু বলার মুখ আমার নাই বিষ্টু। নবু কিনা এইসব করে গেছে!

বিষ্টু ভটচায বন্ধুকে দেখে বলে—ওসব কথা যেতে দাও গতি দিনকালই বদলে গেছে। না হলে আমার ছেলে বিলাস এইসব কাজ করল—লজ্জার আমারও শেষ নেই।

গতি বলে—নবুর দোষও আছে অনেক। সবাই ওরা পয়সার নেশায় মেতে আর সবকিছুকে বিকিয়ে দিয়েছে হে। মনে হয় বিষ্টু আর বেঁচে আছি কেন? এইসব দেখতে?

জবাব দিতে পারেনি বিষ্টু। তার জীবনের সব ক্ষেত্রেই তো জমাট অন্ধকার। তবু বেঁচে আছে।

আজ গতির খবর শুনে চমকে ওঠে বিষ্টু—সেকি রে। একবার যাব।

রমা বলে—এখনও থমথম করছে চারিদিক। শুনছি গোলমাল হতে পারে। বের হয়ো না এখন বাবা।

বিষ্টু বলে—এ কোন যুগে বাস করছি রে। তুই চললি কোথায়?

রমা বলে—আমার কিছু হবে না বাবা। যাই একটু কাজ সেরে আসি।

রমাও দেখেছে নতুন এক পাতাজোড়ার বিচিত্র জীবনকে, এই বোধহয় সভ্যতার অভিশাপ। কিছুদিনের মধ্যেই পাতাজোড়ার জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনাই ঘটে গেছে।

বিলাস সপ্ততীর্থের ছেলে হয়ে কিনা নবকেষ্টর বউকে নিয়ে লাখেরও বেশি টাকা হাতিয়ে সরে গেছে, সেই প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেছে পাতাজোড়ার ওই মৃত্যু, হাঙ্গামায়।

আবার দেখা যায়, পাতাজোড়ার জীবনযাত্রায় কোথাও কোনো স্তব্ধতা আসেনি এত হাঙ্গামার পরও। সে তার নিজের গতিতে চলেছে আর এখানের নতুন মানুষের দল মৃত্যু-দুঃখ-অবক্ষয়ের মাঝে সেই গতির সামিল হয়েছে। মানুষের রক্তের দাগ এদের গাড়ির চাকায়, মানুষের পায়ে পায়ে মুছে গেছে।

রমার মনের ঝড়টাও এইসব ঘটনায় চাপা পড়ে গেছল। সুকুমারদের চাকরী করবে কিনা ভাবছে এখন। বেশ বুঝেছে রমা ওখানে কি ব্যবসা হয় ওই পথে থাকা ঠিক হবে না। কিন্তু সংসারের অভাব—সেটা যেন অতলস্পর্শী খাদের মতো হাঁ করে আছে, গ্রাস করবে তাদের মানইজ্জত—সবকিছু।

তবু রমা এসেছে নরু পালের কাছে।

নরু পাল ক'দিন খুবই ব্যস্ত। এখন তার সামনে একটা বিরাট কাজ, শান্ত পাতাজোড়ার বুকে উঠেছে ঘূর্ণিঝড়। এসব নরু পালেরই ঘটানো।

এখন দেখেছে নতুন পাতাজোড়ার আশপাশে গড়ে উঠছে ছোটখাটো কারখানা, আর কয়েকটা পাথরের কোয়ারি। বেশ কিছু লোক কাজ করছে, গড়ে উঠেছে নতুন এক শ্রেণী নরু পাল তাদের মধ্যেই নিজের প্রতিষ্ঠা আনার জন্য ওদের ক্ষেপিয়েছে। মজুরি বাড়াতে হবে এই নিয়েই আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু হঠাৎ সেই আন্দোলন যে এমনি হিংস্র হয়ে উঠবে তা ভাবেনি নরু পাল ক'দিন সদরে যাতায়াত করছে, এর মধ্যে গড়ে উঠেছে শ্রমিক আন্দোলন। নরু পাল শ্রমিকদের কাছে চাঁদা বাবদও বেশ কিছু আদায় করে সদরে উকিল দিয়ে ওদের জামিনে খালাস করে এনে পাতাজোড়ার পথে পথে শোভাযাত্রা বের করেছে, ওদের গলায় ফুলের মালা, স্লোগান দিয়ে চলেছে। নরু পাল, তার দলের কিছু কর্মীও রয়েছে, রয়েছে সুকুমারও। রমাকেও যেতে হয়েছে ওদের কালির কারখানার মেয়ে, আরও কিছু মেয়েকে নিয়ে।

শুভি এখন থানার বড়বাবুর বাড়িতেই কাজ করে, মেয়েটাও দেখছে ওই শোভাযাত্রা। এসব পাতাজোড়ার জীবনে নতুন সংযোজন।

রমা ফিরছে শোভাযাত্রার পর। ক্লান্ত বোধ হয়।

ছায়াঘন পথে দুপুরের নির্জনতা নেমেছে। শুভিকে দেখে চাইল। শুভি বলে—কি গো দিদি—মিছিলে গেছলা দেখছি।

রমা চাইল। শুভি বলে—শালা নরু পাল কিন্তু ভালো কল করেছে গো। উঃ কি খজড়া ওই পালের পো।

—কেনরে! ও তো গরীব মানুষের মজুরি বাড়াতে চায়।

শুভি বলে—সাপ হয়ে কাটে আর ওঝা হয়ে ঝাড়ে। ওইতো ওই লোকসের ক্ষেপিয়ে মারামারি খুনোখুনি বাধালেক। বুঝলা নিজের ঝোলে ঝোল টানতে ওস্তাদ উটো। গরীবের কি দুঃখ ঘুচোলেক উ। ওই নাম করে নিজের দিনই ফিরিয়ে লিলেক। দুঃখ ঘুচেছে আমার? তুমার?

শুভি মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা কথাই বলে। বলে সে—সারা গাঁয়ে চুল্লুর ব্যবসা ফেঁদেছে, পণ্ডিতের মেয়ে হয়ে আজ প্যাটের দায়ে তুমাকেও যেতে হয়, সেখানে। আমি তো ছুটলুক, গা-গতরের দাম কি আমার? সবাইকে ওই এক পথে নামাবেক উরা! ভগমানও নাই গো!

রমা নির্জন দুপুরে শুনছে ওর কথাগুলো।

মনে হয় সত্যিই এসব। এক বিরাট জালে এরা নতুন পাতাজোড়ার সবকিছুকে জড়িয়ে ওদের স্বার্থে কাজে নামাতে চায়। তার থেকে মুক্তির পথ যেন নেই।

শুভি বলে—বাপটাকে বলেও পারিনি দিদি, তুমাকে বলছি, উসব ছেড়ে দাও। পুলিশও ইবার ছাডবেক নাই। নতুন দারোগাবাবু খুব কড়া লুক গো।

নতুন বিরাট বাড়ি করেছে নরু পাল। গ্রামের পুরোনো মাটির বাড়ি ছেড়ে নিউ পাতাজোড়ার বিরাট দীঘি (এখন ওর নাম লেক)-র এদিকে বিঘে কয়েক জয়গা নিয়ে নরু পালের বাড়ি, একদিকে পুরোনো আমলের আম কাঁঠাল গাছ। দুপ্রস্ত বাড়ি—বাইরের দিকের দু-তিনটি ঘরে ওর অফিস। দু-চারজন লোকজনও আসে।

সন্ধ্যার পর জায়গাটা নির্জন। এদিকে লোক চলাচলও কম। নবু, দেবু ঘোষ বুঝেছে ব্যাপারটা। পাথরের কোয়ারিতে বেশ কিছু টাকা চলে গেছে। আর নবকেষ্টর বুকের জোর ছিল তার দু'নম্বরী টাকায়। সে সবই প্রায় নিয়ে গেছে মনোরমা। এখন তার জোর কমে গেছে। তবু পাথরের কোয়ারির কাজ চললেও বেশ কিছু আমদানি হবে।

কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনে তাও বন্ধ।

তাই দেবুই এসেছে নরু পালের কাছে।

নরু পাল এটাই চেয়েছিল। পাতাজোড়ার তারা পুরোনো বাসিন্দা। একটা গ্রাম সম্পর্কে বাঁধন তখন ছিল। এ ওকে দেখত, সুখে দুখে পাশে থাকত। এখন এই লোভ, সভ্যতার জ্বালায় সেই অতীতের মনগুলি বদলে গেছে। যে যার স্বার্থের জন্যই পা ফেলে।

নরু দেবুকে দেখে বলে—আয়। কি ব্যাপার?

নরু পাল জানে কেন এসেছে সে। তবু সব জেনেও ন্যাকা সাজে।

দেবু বলে—এলাম নরুদা। এদিকের ব্যবস্থা কিছু করো। কাজকর্ম যে বন্ধ হয়ে গেল সব।

নরু পাল দেখে নেয় বাইরের কেউ আছে কিনা।

তারপর বলে—একটা রফায় এসো।

দেবুও তা জানে। তাই এসেছে সে। দেবু বলে—মাসে হাজার দুই করে দেব তোমাকে—তুমি দেখবে যাতে শান্তিতে কাজ করতে পারি।

নরু পাল মনে মনে হিসাব করে বলে—ওতে কি হবে দেবু? অর্থাৎ আরও টাকা চাই তবেই শ্রমিকদের আন্দোলনকে সে ট্যাকে গুঁজে নেবে। বলে নরু —হাজার পাঁচেক করতে হবে ওটা।

লেনদেন-এর কথা পাকা হচ্ছে, দেবু আগাম টাকাই এনেছে।

রমা আসছিল নরু পালের এখানে। স্কুলের চাকরিটা তার চাই। তার জন্য নরু পালকেই দরকার। দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল, বাইরে দেখেছে দেবুর মটরবাইকটা। এখানে এসে ঘরের ভিতর দেবুর গলা পেয়ে দাঁড়াল। জানালার ওপাশে বারান্দায় এসে সরে গেল রমা। মনে হয় এ বাড়ির বাতাসে যেন কি এক ষড়যন্ত্রের আভাস ফুটে ওঠে। এদের প্রতিষ্ঠার মূলে সেই শঠতা।

দেখতে পায় দেবু নোটের বান্ডিল তুলে দিল নরু পালের হাতে। মাসে দেবে পাঁচ হাজার করে ওকে, তার বিনিময়ে নরু পাল ওই খাদানের শ্রমিকদের স্তোকবাক্য দিয়ে শান্ত করে রাখবে, ওদের রুটির লড়াই-এর পিছনে ছুরি মারবে। বিশ্বাসঘাতক-শয়তানদের জাত-প্রতিষ্ঠাই বাড়বে।

রমা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না এত বড় চক্রান্তটাকে। কিন্তু নিজের কানে শুনেছে সে কথাটা, নিজের চোখে দেখছে ওই টাকার লেনদেন। মজুররা জানবে না তাদের লড়াইকে কিভাবে ব্যর্থ করে একদল লোক নিজেদের পুঁজি বাড়াবে।

রমা এসেছে এদের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে!

নিজের ওপরই ঘৃণা আসে। পায়ে পায়ে সরে এল সে, এসময় এখানে থাকাও নিরাপদ নয়।

দেবু বের হয়ে আসছে। বেশ কিছু টাকা মাসে মাসে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। সমাজসেবা, দেশসেবার নামে এমনি করে নরু পালরা ভাগ বসাবে তাদের রোজগারে, শ্রমিকদের কষ্টার্জিত মজুরীতে।

দেবু বাইরে আসছে, মোটরবাইকে উঠতে যাবে হেড লাইটের আভায় দেখে রমাকে। রমাও ভাবেনি এমনি হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সেও ধরা পড়ে যাবে এখানে।

দেবু অবাক হয়—তুমি! এখানে?

নরু পালের স্বভাব-চরিত্রের খবরও জানে দেবু। তাই রমাকে নির্জন সন্ধ্যায় অন্ধকারে এখানে দেখে অবাক হয়।

রমা ধরা পড়ে গিয়ে বলে—নরুদার কাছে যাচ্ছিলাম, স্কুলের একটা চাকরীর জন্যে।

দেবু দেখছে রমাকে। অসহায় একটি মেয়ে আজ শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই লড়াই করছে, তার বিনিময়ে হয়তো ওদের হারাতে হয় অনেক কিছুই।

দেবু রমাকে চেনে দীর্ঘদিন ধরেই। একসঙ্গে খেলাধূলাও করেছে, আজ নোতুন পাতাজোড়ার পরিবেশ যেন সব অতীতকে ভুলিয়ে তাদের এক কঠিন বর্তমান, নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের দিকেই টেনে নিয়ে চলেছে।

দেবু শুধোয়—একটা কাজ করছিলে না সুকুমারের ওখানে? সেখানেও তো নরুর যাতায়াত আছে, সে চাকরী?

রমা বলে—ওটা ঠিক পোষাচ্ছে না। ঘোরাঘুরির কাজ—তাই নরুদাকে বলেছিলাম—

দেবু বলে—নরু কিছু করবে না।

—তাহলে? রমার মুখে ফুঠে ওঠে বিবর্ণতার ছায়া। রমাও বুঝেছে নরু পাল বাঁহাতে কিছু না পেলে কারো কিছু করবে না। আর তাকে দিতে হবে ওর সর্বস্ব। মান ইজ্জতটুকুও। নরু পাল-এর চাহনিতে সে সেই লোভের ছায়াই দেখেছিল।

দেবু কি ভাবছে। বলে সে—চাকরী করবে?

রমা চাইল। বলে সে—না হলে দিন চলবে কি করে?

দেবু বলে—আমাদের খাদানের অফিসে কজ করবে? হিসাবপত্র রাখা, চিঠিচাপাটি লেখা—

রমা দেখছে ওকে।

দেবুকে বিশ্বাস করতে পারে সে। অতীতের দিনগুলো মনে পড়ে।

দেবু বলে—তাহলে এসো, মাসে পাঁচশো করে দিতে পারি। পরে বাড়াতে পারলে খুশি হব।

রমার কাছে এটাই অনেক বড়। তবু শান্তিতে কাজ করবে। সুকুমারদের ওই নোংরা কাজে সে নেই।

বলে রমা—তাই করবো দেবু।

দেবু বলে—ওঠো গাড়িতে। কাল সকালেই চলে এসো অফিসে।

রমা আশাভরা মন নিয়ে ফিরছে।

নরু পাল বের হয়ে এসেছিল, সেও দেখেছে রমা তার এখানে না এসেই ফিরে গেল দেবুর সঙ্গে। ব্যাপারটা তার ভালো ঠেকে না।

সুবিনয় দেখেছে পাতাজোড়ার এই নতুন চরিত্রকে।

স্কুলের শিক্ষকতা নিয়েই আজ বেঁচে আছে সে, অতীতের সব প্রতিষ্ঠা বৈভব কোথায় মিলিয়ে গেছে। গড়ে উঠেছে নরু পাল, সুকুমারদের রাজত্ব। সমাজের এরাই আজ মাথা। সুকুমার নিজে গাড়ি কিনেছে। ব্লক অফিসের চাকরীটা আছে, অফিসে কখন যায়, কি করে কে জানে। ইদানীং এই এলাকার বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের নিয়েই মিছিল করে।

সুকুমার ভোলেনি শিববাবুর সেই কথাগুলো। সুবিনয়ও তাকে বাড়ির অংশ ছেড়ে দেয়নি। হঠাৎ সেদিন সুবিনয় নোটিশ পায়,'স্কুল থেকে কাজে গাফিলতির জন্য তাকে কেন বরখাস্ত করা হবে না।' বাড়িতে সে টুইশানি করে স্কুলের কাজে ফাঁকি দেয়। চিঠিখানায় সই করেছে নরু পাল। সে-ই স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান।

কথাটা শুনে বৃদ্ধ শিববাবু চাইলেন।

—এ্যাঁ। নরু এখন তোমার অন্নদাতা?

সুবিনয় বলে—ওদের দলে যাই না, ওদের সব কিছুকে সমর্থন করি না।

শিববাবু বলেন—করা সম্ভব নয়।

—তাই ওরা আমাকে সরিয়ে নরু পালের কোনো সম্বন্ধীকে এখানে আনতে চায়। সুকুমারেরও হাত আছে এতে।

শিববাবু অবাক হন—কেন?

—আমরা তাকে এ বাড়ির অর্ধেক বিক্রী করিনি। ওদের কারখানা বাড়াতে দিইনি, তাই।

কথাটা শুনেছে শুভিও। কাজ করছিল সে কুয়োতলায়। ওই সুকুমার, নরু পালদের কাহিনী সে জানে। চুপ করে শুনছে মেয়েটা। শিববাবু বলেন—তাহলে কি করবে সুবিনয়?

সুবিনয় বলে—ভাবছি দে গাঁয়ের স্কুলের চাকরীই নেব। কোনো কৈফিয়তও দেব না। আর বোর্ডে জানাব স্কুলের টাকা, ফান্ড, মায় শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নিয়ে সুকুমাররা কি করছে।

শিববাবু ভয় পান—আবার অশান্তি করবে?

সুবিনয় বলে—করতেই হবে বাবা। ওদের সব কাজ-এর প্রতিবাদ আগেই করা উচিত ছিল করিনি, তাই বেড়ে উঠেছে।

সুনীতিও বলে—তাই হয়েছে বাবা। ওরা আমাকেও নোটিশ দেবে শুনছি চুপ করে এসব সইব না।

শুভি বলে—ওদের সব কেচ্ছা আমি জানি বৌদি। মুখপোড়াদের মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব।

রমা গেছে সুকুমারের কাছে, এ চাকরী সে করবে না। নরু পালও কাল রাতে দেখেছিল ব্যাপারটা ভেবেছিল রমা তার হাতেই আসবে। কিন্তু দেবুর সঙ্গে যেতে দেখেছিল। আজ আবার এখানে এসে কথা বলতে নরু চুপ করে থাকে।

সুকুমার বলে—কাজ ছাড়ব বল্লেই তো ছাড়া যায় না।

—কেন? রমা শুধোয়।

সুকুমার ভাবছে কথাটা। রমা হয়তো তাদের খোঁজখবর জানে। ওকে ছাড়তে চায় না। নরু বলে—মাইনে একশো টাকা বাড়াচ্ছি।

রমা বলে—কাজ অন্যত্র পেয়েছি নবদা, এই ঘোরাঘুরির কাজ সইছে না

সুকুমার এবার ড্রয়ার থেকে একটা ভাউচার দেখিয়ে বলে—দু'হাজার টাকা আগাম নিয়েছ

অবাক হয় রমা - সে কি? আগাম কখন নিলাম।

সুকুমার বলে—রসিদ তাই বলে। এটা শোধ করে যাবে।

রমা এদের শয়তানিতে জ্বলে ওঠে। বলে সে—ও টাকা নিইনি, ওই ভাউচারে টিপ কেটে লাগানো হয়েছে। ওসব আমি দিতে পারব না।

—ততদিন কাজও করতে হবে। এই নিয়ম।

রমা চটে ওঠে। বলে সে -যা হয় করবেন, আমি চললাম।

বের হয়ে যায় রমা।

ওদের জালে রমাকে যেন জড়াতে চায়। ছাড়বে না তাকে। দেবুর কাছেও বলতে হবে কথাটা। তার আগে সুবিনয়দা, সুনীতি বৌদিদের জানাবে কথাটা। তাই ওদের বাড়ি গেছে রমা।

সেখানে গিয়ে সুবিনয়দাকে নোটিশ ধরানোর কথা শুনে রমা বলে ওই শয়তানদের চিনি বৌদি

সুনীতি বলে—এবার ওদের লঙ্কা শেষ করছি।

দেবুও মনে মনে নব পালের ওপর চটে আছে। বেশ বুঝেছে নব তার দলবল নিয়ে এখানে সবার সবকিছু লুটে নিতে চায় ওদের ব্যবসাও করে টাকাটা দিয়েছে নবকে, কিন্তু বেশ বুঝেছে ওদের আঘাত দিতে না পারলে তাদের, এখানের সাধারণ মানুষের মঙ্গল হবে না।

আজ সুবিনয় রমাদের আসতে দেখে দেবু চাইল

সব শুনে ভাবছে দেবু। ওদের আঘাত দেবার জন্য সেও প্রস্তুত।

দোকানদার সমিতির লোকরাও অধৈর্য হয়ে উঠেছে ওদের অত্যাচারে। চাঁদা তোলা জুলুম ক্রমশ বাড়ছে নরু সুকুমারদের

শ্রমিক আন্দোলনের হাওয়াও ঠান্ডা হয়ে গেছে। অবশ্য মাস্তে নরু পাল তাদেরও তার পাত্তা দেয়নি।

দেবুই শ্রমিকদের ডেকে এনে আবার খাদান চালু করেছে। শ্রমিকদের ওরাই বলেছে— তাখন ওই নরু পাল এই হুকুমই দিলেন বাবু, মরালো শিবপুরের নিতে, পটলা আর ক্ষুদিরাম

দেবু বলে ওদের বৌ ছেলেদের আমি কাজ দেব। আসতে বল তাদের।

দেবু তাই এবার মাথা তুলেছে ধীরে ধীরে।

রমা এসেছে এখানে। মেয়ে মজুররাও যেন ভরসা পেয়েছে।

দেবু বলে এসব সহ্য করা ঠিক হবে না সুবিনয়দা।

নব পালও খবর পায়, সুকুমারের ওখানে রাতের গভীরে তাদের আলোচনা সভা বসে। বিলাতী মদও থাকে সুকুমার ভূধর, নরু পালও আছে। ওই রমা মেয়েটাই বোধহয় এসব ঘোঁট পাকাচ্ছে।

সুকুমার বলে —সুবিনয়কে ওরা দলে এনেছে

রাত্রি হয়েছে। হঠাৎ কয়েকটা গাড়ির শব্দে ওরা চাইল। দু তিনটে ট্রাক থেকে পুলিশ বাহিনী নামছে। ঘিরে ফেলেছে জায়গাটা সদর থেকে এস পি নিজে এসেছেন এই রেডে।

নরু পাল এর তখন তুরীয় অবস্থা।

চিৎকার করে সে -এসব জুলুম সইব না। মিনিস্টারের কাছে যা

পুলিশ তখন মহাকালী কেমিক্যালস-এর কালি, ফিনাইলের ড্রামে আবিষ্কার করে শ খানেক জাল বিলাতী স্কচের বোতল-ছিপি, সিলকরা ভেজাল মদ কয়েকশো বোতল।

কারখানায় আসলে কি তৈরী হতো হাতেনাতে ধরেছে তাদের।

সকালেই খবরটা পাতাজোড়া বাজারে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নরু পাল, সুকুমারদের পুলিশ অ্যারেস্ট

করে সদরে চালান দিচ্ছে।

এক রাতেই নরু পাল, সুকুমারের সাম্রাজ্য ধসে পড়েছে, ওদের মুখোস খুলে গেছে।

শুভি বলে—অ মা গো। উকি কাণ্ড গো। ঘোমটার ভেতর ইমন জব্বর খ্যামটা নাচ লাচছিলা বাবুরা। অয় বাপ!

নিউ পাতাজোড়ার বুকে রাতারাতি একটা যুগ শেষ হয়ে এসেছে নতুন অন্য যুগ।

শিক্ষক সুবিনয়কে দেখা যায় আজ নতুন শোভাযাত্রার সামনে, বের হয়ে এসেছে ঘরের বৌ সুনীতি, আরও অনেকে। রমা—শুভিও এসেছে, সামিল হয়েছে খেটেখাওয়া খাদানের অনেকেই। সাধারণ মানুষ, আজ তারা জেগে উঠেছে এক নতুন চেতনায়।

পাতাজোড়ার বুকে একটি পরিবর্তন আনতে চায় ওই মানুষগুলো।

গতিকেষ্টও এখন হাঁটাচলা করছে, বিষ্টু ভটচায এসেছে বন্ধুকে দেখতে।

গতিকেষ্ট বলে—পণ্ডিত কি হল আবার গো?

বিষ্টুও জানে না। তবে শুনেছে ওই নরু পাল বাহিনীর পতনের সংবাদ। বলে সে—নতুন করে একদল এল হে পাতাজোড়ায়।

হাসে গতিকেষ্ট, বলে—কি করবেন উরা। শালা মানুষের মনের লুভ, পাপ এই যুগে বাড়বেকই হে, আসল মানুষ তৈরি না হলে নতুন দলই বা কি করবেক। তবু আশা করব ভালো হোক—মানুষের মতো বাঁচুক সবাই।

বিষ্টু ভটচায কি ভাবছে। বলে সে—এই কাল বড় যন্ত্রণার কাল হে। বড় দুঃখের যুগ। এর কবে শেষ হবে বলতে পারো?

ওরা কেউ তা জানে না। আজকের মানুষ যেন পথ হারিয়ে এক আদিম আরণ্যক জগতে পথ খুঁজে ফিরছে। তাই রমা—শুভি ওরাও সুন্দর জীবনের কোনো স্বাদ পায়নি। বিলাসরাও হারিয়ে যায়। তবু মানুষ নোতুন করে বাঁচার পথ খোঁজে। জীবনের প্রতি তবুও কিছু ভালোবাসা রয়ে গেছে। এই ভাঙনের মাঝে বাঁচতে চায় আবার মানুষ নোতুন করে।

যার যেথা ঘর

বলহরি তিনতলা থেকে উর্ধ্বশ্বাসে নামছে। সিঁড়িগুলো যেন তার চোখের সামনে সব সমতল হয়ে গেছে। তাই দিয়ে নেমে আসছে সে। ভয়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম।

চোখের সামনে দেখেছে মানুষটা কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে আর অন্য লোকটি হাউমাউ করে কাঁদছে। শোকে ভয়ে বোধহয় ঘাবড়ে গেছে সে।

বলহরিরও ধাত ছাড়বার উপক্রম হয়েছে ওই দৃশ্য দেখে। এতকাল চাকরি করেছে এই কৃপাময়ী হোটেলে কিন্তু এমন দৃশ্য কখনও চোখে দেখেনি।

—বাবু! ম্যানেজারবাবু! সব্বোনাশ হয়ে গেছে ম্যানেজারবাবু।

একতলায় ভাঁড়ার-কাম-বেডরুমে গয়াগতিবাবু একটা কেওড়াকাঠের তক্তপোশে শুয়ে ছিল। বেশ একটু গোলগাল চেহারা। হোটেলের বাকী বকেয়া মাছ মাংস এটা সেটা যা পড়ে থাকে ওই গয়াগতিবাবু একাই তার বেশিরভাগ সাবাড় করে।

আড়ালে হোটেলের অন্য ঠাকুর চাকর তাই বলে —দশসেরী গতিবাবু।

গতিবাবুর ভোরবেলায় ওঠা অভ্যাস। হোটেলের ম্যানেজারি তো নয় বাখালি করারই সামিল।

গেট খোলবার আগেই উঠে মুখ হাত ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে গতিবাবু গেটের সামনেই একটু জায়গাতে ওই ভাঁড়ার ঘরের সামনে বা তক্তপোশে সমাসীন হয়। নজর থাকে দু'দিকেই। দুটো চোখই একসঙ্গে দু'দিকে চেয়ে থাকতে পারে।

ভাঁড়ার থেকে কেউ যেন দমকা কিছু বের করতে না পারে। তাই অন্য দিকে চোখ রাখে গেটের দিকে। ভোরের সময় কোনো বোর্ডার চার্জ না দিয়েই যাতে ফট্‌কে না চলে যায়।

সামনে খানকয়েক টোস্ট, অভ্যাসবশেই একটার পর একটা তুলে ওই মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়ে হাড় চিবোনোর মতো মড়মড় করে চিবোতে থাকে। এরপর চা আসবে।

বোর্ডিং-এর বাবুদের তখনও ঘুম ভাঙেনি। দু-একজন দোতলা তেতলার বাবুরা উঠেছেন। নীচেতলার ওপাশের ঘর থেকে জয়ন্তের গলার শব্দ শোনা যায়।

বলহরি ডাকতে ডাকতে নামছে—

—ম্যানেজারবাবু গো! সব্বোনাশ হয়ে গেছে বাবু। তিনতলার ঘরে—ঝুলছেন।

বিরক্ত হয়ে ধমকায় ওকে গতিবাবু—কি যা তা বলছিস?

—যা তা নয় গো। দ্যাখোগে সতেরো নম্বরে। এক বাবু লটকে ঝুলছেন, আর একজনের কি হাউমাউ কান্না।

—কাল যারা এসেছে?

—হি গো বাবু! ভয়ে কাঁপুনি লেগে গেছে বাবু। আমি আর যেচ্ছি না। যেতে হয় আপনিই যান গিয়ে। থানা পুলিস—

গয়াগতিবাবুর টোস্ট চিবোনো বন্ধ হয়ে যায়।

—বলিস কি র‍্যা! আত্মহত্যে —না খুন?

ওপাশের ঘর থেকে জয়ন্ত বের হয়ে আসে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারা। গয়াগতির কথায় বলে—তোমার হোটেলের এই অখাদ্য খেয়ে ঘেন্নায় আত্মঘাতীই হয়েছেন বোধহয়। আর একটাও হবে তোমার ওই বাক্যবাণের চোটে। সে এই অধম শ্রীজয়ন্ত সরকার।

গয়াগতি ফোঁস করে ওঠে।

—রসিকতা থামাও দিকি। এখন আমার শিরে সংক্রান্তি। অরে অ নরহরি,বাবুদের ডাক। যা হয়নি কোনোকালে তাই হল। .... ওরে বাবারে —হেই ভগবান! হেই মা কালী—

ওর হাঁকডাক দেবদেবতারা কেউ আসে না। হোটেলের বাবুদের ঘুম ভেঙে গেছে অনেকের।

জয়ন্তই এগিয়ে যায়। সেই দাপটওয়ালা গয়াগতি ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে

তখনও হাউমাউ স্বরে কান্নার শব্দ শোনা যায়. ওরা দল বেঁধে তেতলায় উঠে ওপাশের ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। দরজা বন্ধ। একটা জানালার এক পাট খোলা।

ভিতর থেকে বিকট আওয়াজ ভেসে আসছে। কাঁদছে যেন লোকটা ভেউভেউ করে।

—হে প্রভু। আমাকে উদ্ধার করো প্রভু!

জয়ন্ত ফিসফিসিয়ে ওঠে—অ ম্যানেজারবাবু, এ ব্যাটাও আবার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবে নাকি?

দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে তার। ভিতর থেকে কোনো সাড়া নেই অন্যান্য বাবুরা দরজায় ধাক্কা দিয়ে চলেছে।

হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে একনজর ভিতরের দিকে চেয়েই হাসিতে ফেটে পড়ে জয়ন্ত। গয়াগতিবাবু ধমকায়—কারো সব্বোনাশ, কারো পৌষ মাস। বিনিপয়সায় থাকছ—আমার বিপদের সময় হাসবেই তো।

জয়ন্ত ইশারায় ওকে ডেকে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখায়।

—দ্যাখো দ্যাখো, ভালো করে দ্যাখো ম্যানেজারবাবু। সং রেখেছ হোটেলে?

গয়াগতি ভালো করে দেখে এইবার তার বিশাল কলজেতে দম ফিরে পায়। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—ও মশাইরা, কি জুড়েছেন প্রাতঃকাল থেকে? ভদ্দরলোকদের আবাসিক হোটেল এটা। ফ্যামিলিম্যান অফিসারবাবু শিল্পীটিল্পী থাকেন। ভোর থেকে এই কাণ্ড জুড়েছেন?

একজন তারস্বরে গীতাপাঠের নামে হাউমাউ করে অমনি মড়াকান্না জুড়েছেন। দেবতা যেন ওঁর ওই বিটকেলি কান্নায় এখুনি পুষ্পরথ এনে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন তাঁকে এই ভবযন্ত্রণা থেকে।

অন্যজন বহির্জ্ঞানশূন্য হয়ে শীর্ষাসন করে রয়েছেন তখনও। এদের হাঁকডাক গলাফাটানো চিৎকার সেই গীতাওয়ান ভদ্রলোক এসে দরজা খুললেন।

গয়াগতি গর্জন করছে—সেই বলহরি কোথায়? ব্যাটা ভোররেলায় দম বন্ধ করে দিইছিল। সেটাকেই আজ নরসিংহবধ করে ছাড়বো। আর আপনাদেরও বলি স্যার এসব বিদঘুটে কাণ্ড পাবলিক প্লেসে করবেন না। পুলিস এসে পড়বে।

গজগজ করতে করতে নামছে গয়াগতি। মোটা শরীর, এই আকস্মিক উত্তেজনায় এইবার তার ক্লান্তি বোধ হয় নীচের তক্তপোশে বসে পড়ে গর্জন করে—পাখাটা খুলে দে নরা।

জয়ন্তই পাখাটা খুলে দিল। হাঁপাচ্ছে গয়াগতি। জয়ন্তকে দেখে এইবার নিজমূর্তি ধরে সে।

-- কি! সাতসকালে এক শম্মা তো নাকদম করে ছেড়েছে, এইবার তুমি কি চাও বলো?

জয়ন্ত বলে— সেই যে টাকার কথা বলেছিলাম—ওটা রেডি আছে।

গয়াগতি কিছুদিন থেকে মতলব করেছে দেশ থেকে কিছু কাপড়চোপড় এনে এখানে ব্যবসা করবে। হোটেলের বাজার মন্দা,তবু সামনের দিকে একটা ঘরে অমনি একটা ব্যবসা ফাঁদলে কিছু আসবে। তার জন্য লোকের দরকার, বিশ্বাসী একজন লোক। যে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে তার সঙ্গে ব্যবসায় নামবে। জয়ন্তই তাকে এমনি একটা আশ্বাস দিয়েছিল।

ছেলেটা ভালো। কয়েক বৎসর এখানে থেকে পড়াশোনা করেছে, মুর্শিদাবাদের দিকে তার বাড়ি বাবার জমিজিরেত কিছু আছে। ছেলেটাও কাজের। তাই গয়াগতি ওর প্রস্তাবটায় সায় দিয়েছিল। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক সেটা হয়ে ওঠেনি। গয়াগতিরই খসেছে বেশকিছু।

আজ জয়ন্তকে আবার ওই কথা বলতে দেখে গয়াগতি চটে ওঠে।

– থাক। আর কারবারে দরকার নেই। এখন মানে মানে যাওদিকি তোমরা। ওই মানিকজোড় ওঘরের ভাড়া কত জানো?

জয়ন্ত হাসে - ঘর। ও তো গুদোমঘর স্যার চামচিকের আস্তানা—

—গুদোমঘর। চামচিকের । আসুন স্যার। ওয়েলকাম! ওরে নরহরি বাবুদের মালপত্রগুলো নামা

গাড়ি থেকে। এ্যাই রিকশাওয়ালা, সামান এইখানে রাখ। ভালো ঘর পাবেন স্যার। ডবল বেড, আলো হাওয়া --

স্টেশনের কাছাকাছি অঞ্চল। যাত্রীদের অনেকেই আসেন দু-একদিনের জন্য। গয়াগতির কাছে তারাই শাঁসালো খদ্দের।

জয়ন্ত তার তুলনায় গয়াগতির বোঝাই। গয়াগতি ওদের নিয়ে পড়ে। জয়ন্ত চেষ্টা করেছিল গয়াগতিকে একটু তালিম দিয়ে কিছু আদায় করতে, কিন্তু আপাতত তা হল না। গয়াগতি তখন ভদ্রলোকের মোটকা গিন্নীকে তার হোটেলের ফ্যামিলি পরিবেশের বর্ণনা করে চলেছে।

—দেখবেন মা জননী, একেবারে হোম কমফর্টার যাকে বলে। রান্নাবান্নাও তেমনি, ঘটি চান তাও পাবেন, বাঙ্গাল রান্না পছন্দ করেন তাই সই। জানালার পর্দা। আর ভদ্রলোক সবাই এখানে। অফিসার আর্টিস্ সাহিত্যিক ডাক্তার এস্টুডেন্ট--

জয়ন্ত ক্ষুণ্ণমনে সরে এল। আপাতত কিছুই হল না। সাহিত্যিক শিল্পী তার বোর্ডার—কথাটা গয়াগতি সবাইকে ফলাও করে বলে। সেই জীবদুটি ওরা একত্রে একঘরে থাকে। অবশ্য তার জন্য গয়াগতির বাক্যবাণ প্রয়োগ বন্ধ হয় না, ওরাও কর্ণের কবচকুণ্ডল পরে বসে আছে। কোনো তিরই তাকে ভেদ করতে পারেনি আজ ইস্তক।

জয়ন্ত কি ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরের দিকে এগোলো।

ওদিকে নরহরি তখন কোনো বোর্ডার চলে যাচ্ছে, তার মালপত্র রিকশায় তুলে গরুড়পক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে বকশিসের আশায়।

যে যার কাজ করে চলেছে। বাণিজ্য করছে এরা ঠিকই। এদের জীবনে অর্জনটাই সত্যি। তার তুলনায় জয়ন্তদের জীবন কেবল অপচয়েই ভরা, জমার অঙ্কে শূন্যই।

বড় হয়ে আছে সেখানে উঞ্ছবৃত্তিই।

—মৃণাল! এ্যাই মৃণাল!

মৃণালের ঘুম এত কাণ্ডকারখানার শব্দেও ভাঙেনি। সে ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে পাশ ফিরে শুল।

এঘরটায় অবশ্য দিনের আলো ঢোকে না সকাল দুপুর সন্ধ্যা কোনো সময়েই। জানলা দু-একটা আছে তাও গলির দিকেই।

মূল বাড়িটার লাগোয়া একতলা টানা টিনের শেড মতো। কোনোকালে এটা মধ্যকলকাতার কোনো বনেদি পরিবারের ঘোড়ার গাড়ির গ্যারেজ অথবা আস্তাবলই ছিল। পরে তার একদিকে দেওয়াল তুলে ঘরই বানানো হয়েছে। গুদামঘর।

ওপাশের অর্ধেকটায় টিনের বেড়া দেওয়া—ওদিকে কোনো দপ্তরীখানার গুদাম। বই-এর ফর্মা থাকে। এপাশে দুটি প্রাণী।

ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড় করানো রয়েছে একটা ইজেলে খানিকটা ছবির আদল। ছবিটা ঠিক বোঝা যায় না—খানিকটা লাল গোলাপী চড়া হলুদ রং যেন থ্যাবড়া করে লাগানো।

একদিকে গাদাকরা বান্ডিল বান্ডিল কার্টিজ পেপারের রোল। তালাভাঙা দুটো টিনের সুটকেস পড়ে আছে খোলা অবস্থাতেই। ওদের মধ্যে এমন কিছুই নেই যার জন্য তালা দিয়ে সেটাকে সংরক্ষিত এলাকায় পরিণত করতে হবে।

একটা দড়ির আলনামতো, সেটায় ঝুলছে ময়লা লুঙি আর দু-একটা প্যান্ট ধুতি। শ্রীহীন ঘরের মেজেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে একটা শান্তিনিকেতনী মোড়া। বাঁশের চোঙায় রংচং করে তুলি একগাদা রাখা। আর দুটো চিত্রবিচিত্র ছাইদানি।

ওই নোংরা ছাতাপড়া দেওয়ালে কয়েকটা ছবি টাঙান। ওগুলো ওই পরিবেশে একেবারেই বেমানান।

—মৃণাল!

মৃণাল জয়ন্তের ডাকে বিরক্ত হয়েই উঠে বসল। দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখখানা। দুচোখ কচলাতে কচলাতে শুধোয়—কি! সাতসকালেই হাঁকডাক শুরু করেছিস, জ্যাকপট্‌ই হয়ে গেল নাকি?

মোড়াটা তুলে সমান করে বসতে বসতে বলে জয়ন্ত—না! একেবারে এম্‌টি পট্‌। গয়াগতিকে জপানো গেল না। মাছি লেগে গেল। সিগ্রেট আছে?

চারমিনার এগিয়ে দেয় মৃণাল, তাও ব্লেড দিয়ে আধখানা করে কাটা। পুরো একটা চারমিনার খাবার বিলাসিতা তার নেই। তাও মাত্র দু'তিন টুকরো পড়ে আছে। তারই একটা ধরিয়ে দু টান টেনে বলে জয়ন্ত—কিছুই হল না। ব্যাটা বোধহয় ধাপ্পাটা ধরে ফেলেছে। ভাবছি এসব পথ ছেড়ে দিয়ে চাকরিবাকরি দেখব। কাঁহাতক পারা যায়। তোকেও বলি—এমনি মাথামুণ্ডছাড়া ছবি না এঁকে চাকরিবাকরি নে। ধর কমার্শিয়াল আর্টিস্ট না হয় কাপড়ের কলে ডিজাইনফিজাইন আঁকবি।

মৃণাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—গয়াগতি কি সত্যি জেনে ফেলেছে সবকিছু?

মাথা নাড়ে জয়ন্ত—না। তবে আর ঠিক ধাতস্থ হচ্ছে না। যা বলছিলাম ওই ডিজাইনের কথা।

মৃণাল উঠে পড়ে—ওঠা যাক। সাহিত্য করে করে তুই একটা ফ্রাশট্রেশনের সামনে এসেছিস। ওযুগের নীতি আঁকড়ে এযুগে বাস করা যায় না। বুঝলি। একটু মডার্ন হ'।

বলহরিকে এদিকে আসতে দেখে ডাক দেয় জয়ন্ত—অ হরিদা!

বলহরি সকালবেলায় একগাদা কাপড় বগলে করে লণ্ড্রীতে যাচ্ছিল, ওদের ডাকে বিরক্ত হযে ওঠে।

—কেন? বাবুরা আপিস যাবেন। তোমাদের কাজকম্মো না থাকতে পারে আমার এখন অনেক কাজ।

মৃণাল বালিশের নীচে থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বের করে বেশ মেজাজের সঙ্গেই বলে—এটা রাখো। আমাদের একটু চা টোস্টও খাওয়াবে না? ভোর থেকে গয়াগতিকে এক দিস্তে টোস্ট-এর পিণ্ডি গিলিয়েছ, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি?

বলহরি ওর কাছ থেকে নোটখানা নিয়ে ভালো করে দেখছে।

হাসে মৃণাল—না, না, আঁকিনি ওটা। জাল নয়—ঠিক চলবে।

বলহরি অবাক হয়েছে।

বোর্ডিং-এর মধ্যে ওই দুটিকে দেখেছে বিচিত্র জীব। লেখাপড়া জানে—ভালোঘরের ছেলে বলেই বোধ হয়। অনেকের তুলনায় ভদ্র—বিনয়ী। অনেকের ভাগ্য ফিরতে দেখেছে এখানে, কিন্তু ওদের ভাগ্য বদলায়নি। একই রয়ে গেছে।

বলহরি নোটখানা ফতুয়ার পকেটে রেখে কাপড় জামার বিরাট বাণ্ডিলটা ফেরে বের হয়ে গেল চা টোস্টের ব্যবস্থা করতে।

মৃণাল এই অবসরে ওই কাপড়ের বাণ্ডিল থেকে একটা জামা কাপড় বের করে নিয়ে জয়ন্তকে বলে—দ্যাখ, এদুটো তোর কাজে লাগবে।

—সে কি রে! কার-না-কার জামা কাপড়।

—দু'দিনের মুসাফির এসেছে সরাইখানায়, আবার উড়ে যাবে দু'দিন পরে কোন্ চুলোয়। সে কলকাতার লণ্ড্রীওয়ালার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে না। গোলমাল হয় ফেরত দেওয়া যাবে। বলবি মিশে গেছল। ব্যস।

বলহরি চায়ের দোকানের ছোঁড়াটাকে নিয়ে ঢুকছে। আপাতত চেপে গেল তারা। বলহরিই খবরটা জানায়।

—বাবু তো এবার তুললেন গো আপনাদের!

—কেন? জয়ন্ত অবাক হয়ে টোস্ট কামড়াতে কামড়াতে চাইল বলহরির দিকে।

ওদের খবর জানে বলহরি। জয়ন্তরা ঘরভাড়াও দিতে পারে না সব সময়। বাকীও পড়ে আছে। তাছাড়া খাবার চার্জ আলাদা। এখানে বড় একটা খায় না ওরা। গয়াগতিবাবুর সেদিকেও লোকসান।

অন্য বোর্ডার থাকতে দিলে ওই হাঁড়িব ভাত আর তলানি ডাল শাকচচ্চড়ি এইটুকু মাছের দাগা দিয়ে রোজ্কার দশ টাকা হিসাবে রোজগার হত। তাই এবার উঠে পড়ে লেগেছে গয়াগতি ওদের তাড়াবার জন্য।

বলহরি বলে—বাবুর খিদে কোনোদিনই মিটবে না। কত কামাচ্ছে লোক ঠকিয়ে ওই হাবিজাবি খাইয়ে। এইবার তোমাদের পিছনেও লেগেছে—

বলহরি বের হয়ে গেল। দেরি হয়ে যাচ্ছে তার।

মৃণাল হাসছে। জয়ন্ত কি ভাবছে। একটা আস্তানা জোটানো কঠিন কাজ, বিশেষ করে এমনি শর্তে। ভাড়া সত্যিই দিতে পারে না তারা ঠিকমতো, খাবারও জোটে না সব দিন।

জয়ন্ত যেন হেরে যাচ্ছে। ভেবেছিল নিজে লিখেই নাম করবে। প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু পয়সার মুখ দেখেনি। বাড়িতে বাবাও বাববার পরামর্শ দিয়েছেন চাকরিবাকরি নিতে, না হয় দেশে ফিরে গিয়ে জমিজিরেত দেখতে। তাঁরও শরীর ভালো নেই। তাছাড়া এখন দেশেও জমিজিরেত থেকে রোজগারও হচ্ছে। ধান চালের দর আছে—পাটের মনও নিদেন ষাট সত্তর টাকা।

ওই ক্ষেতখামার দেখতে হবে মাঠে মাঠে ঘুরে একথাটা ভাবতেই পারে না জয়ন্ত। তাহলে লেখাপড়াই শিখল কেন?

চাকরিবাকরিও পোষাবে না। দু-একবাব করেছে। দশটার মধ্যে নাকে মুখে গুঁজে ট্রামে বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে। আর বড়বাবু থেকে শুরু করে সিনিয়র কেরানীবাবুর নাকনাড়া খেতে হবে—একথাটা ভাবতেই শিউরে ওঠে। চাকরি তার বরাতে সয়নি।

লেখার চেষ্টাই করেছে। এবার এখানের আশ্রয় গেলে কোথায় দাঁড়াবে জানে না।

মৃণাল দাড়ি কামাতে থাকে। একেবারে কামায় না। আশপাশগুলো চাঁছে আর কাঁচি দিয়ে একটু সাইজমতো করে নেয়। শিল্পীদের দাড়ি নাকি রাখতে হয়। মৃণাল বলে—তৈরি হয়ে নে জয়ন্ত। একটু বেরুতে হবে। দুপুরে লাঞ্চ হবে কোনো হোটেলে। একেবারে থ্রি কোর্স লাঞ্চ।

অবাক হয় জয়ন্ত।

—ব্যাপাব কি বলদিকি! জ্যাক্‌পট কি তুইই পেলি তাহলে? সকালেই ফস্ করে পাঁচটাকার নোট বের হল—আবার লাঞ্চ।

হাসে মৃণাল।

—কাল একজিবিশনে একটা ছবি দমকা বিক্রি হয়ে গেল। নগদ পাঁচশো টাকা। এই নে রাখদিকি। গোটা পঞ্চাশ টাকা খসে গেছে বোধহয়: ভাড়াটা গয়াগতিকে দিয়ে রসিদ নিবি।

জয়ন্ত টাকাগুলো দেখছে। তবু মৃণাল কিছুদিন লড়বার ব্যবস্থা করেছে। জয়ন্তের মনে আশার আলো জাগে। বলে সে—বুঝলি মৃণাল, বইখানা বোধহয় ছাপবে এইবার।

মৃণাল বলে—চুরি কর, বুঝিলি। কাফদা কামু জাইদ সাগা এইসব পড়, আর এন্তার এটা ওটা মিশিয়ে লিখে দে। যেন গল্পের মাথামুণ্ড কিছুই না থাকে। আর লিখবি এমন ভাষায় যে একটি লাইনও হোঁচট না খেয়ে কেউ পড়তে পারবে না। ব্যস তাহলেই কাজ সারা। জাতে উঠে যাবি তুই। লেখা যদি বুঝতে পারে, গল্পের সঙ্গে পাঠক যদি তাল রেখে চলতে পারে তুই সেকেলে হয়ে গেলি।

—তাই বলে মানুষের কথা, তাদের সুখদুঃখের কথা বলব না?

মৃণাল জবাব দেয়—তাই কর, আর গয়াগতির এই গুদোমে পড়ে পড়ে চামচিকের আরশুলা তাড়া। কিৎসু হবে না তোর। মালও খেলি না—মেয়েদের সঙ্গে ফ্রিলি মিশলি না—কি হবে তোর?

মৃণাল উঠে তুলি কালি নিয়ে পড়ল। ছবিটায় তুলি টানছে—কখনও মুছছে।

ওপাশের তক্তপোশে দুটো বালিশ একত্রিত করে তার উপর একটা পুরু বোর্ড পেতে মাইনর টেবিল বানিয়ে একতাড়া প্রুফ নিয়ে বসেছে জয়ন্ত। কাজটা শেষ করতে পারলে হয়তো কিছু আসবে।

তাছাড়া কিছুদিন এখন চলে যাবে তাদের।

মৃণাল বলে—চল, এইবার বেরুতে হবে কিন্তু।

অপিসের ভিড় কমে এসেছে। বোর্ডিং-এর স্থায়ী মেম্বরদের অনেকেই বের হয়ে গেছেন। ওষুধের

সেলসম্যান নিধিরাম মিত্র ব্যাগহাতে স্যুট পরে দোতলা থেকে নামছে। লোকটা বেঁটেখাটো গোল চেহারা।

এখানে থাকত এর আগেও। তখন চাকরিতে এত উন্নতি হয়নি। কোনোরকমে থাকত।

সেই নিধিরাম এখন কোনো বন্ধুপথে ভাগ্যের চাকা ফিরিয়ে নিয়েছে। ওষুধ কারখানার এখন পদস্থ কর্মচারী নিধিরামবাবুর পরনে এখন দামী টেরিলিনের প্যান্ট, সার্ট, পেটেন্ট লেদার চকচকে জুতো। টাক পড়েছে তবু বাকি চুলগুলোকে চকচকে করে রাখে ক্রীম মেখে।

নিধিবামই গযাগতিকে টোপটা দিয়েছে

কাবখানাব কিছু মালপত্র এইখানে বাখতে পাবলে সুবিধা হয। একটা ছোটখাটো গুদাম—অপিস তৈবি কববে নীচেকাব ওই শেডঘবে। গুদামভাড়াও পাবে, তাছাড়া দু-একজন বাডতি লোক থাকবে তাদেব খাওযাব চার্জও আসবে গযাগতিব তহবিলে।

নিধিবামবাবুকে তাই খাতিব কবে গযাগতি।

ওই লোকটা তাব চোখেব সামনে ব্যবসা কবে ফুলে উঠেছে। বিশেষ করে ওষুধেব ব্যবসা। মানে জলেব ব্যবসা—লাভেব শেষ নেই।

– নমস্কাব নিধিবামবাবু।

নিধিবামবাবু দাঁডাল।

– তাহলে ওটাব কি কবলেন? খালি হলে কবে নাগাদ? মালপত্র তুলতে হবে। নাহলে অন্য জাযগায ঘব দেখতে হবে। বাডি আজকাল অবশ্য মিলছে।

শিকাব হাতছাডা হতে দেবে না গযাগতি। খালি হয়ে যাবে এইবাব। এই নিয়ে তিন মাসেব ভাডা বাকি পডবে। বাস কেস হলে দোষ স্যাব। মানে ভিক্টিমাইজ হয়ে যাবেন কিনা। ছোঁডাগুলোব এইবাব পিণ্ডি চটকাচ্ছি স্যাব

নিধিবামেব চম্প। তাতে সুবিধাই হবে। চেনে এই দুটি ছেলেকে। নিধিবামেবই একটা ছবি এঁকেছিল ওই মৃণাল। বেঁটেপ গোল চেহাবা—মাথায ইযা টাক

হঠাৎ ওদেব একটিকে দেখে গযাগতি হুংকাব দিয়ে ওঠে ভাডা দেবে না এমনিই থাকবে? সম্পত্তি বাডি পেযেছ, নাহে?

জযন্ত ওদেব কথাগুলো শুনেছে জানে গযাগতি তাদেব তুলতেই চায। আব তাব কাবণ ওই নিধিবাম।

গযাগতি গজায--তাই বলছিলাম ভেকেট কবো উঠে যাও মানে মানে। নইলে এইবাব দাবোযান দিযে ওই হাতাব মালপত্র ফুটপাথে ফেলে দেবো। ভাডা দেবাব মুবোদ নেই --অকম্মাব দল।

জযন্ত ওব চোখেব সামনে একশোটাকাব একটা নোট বেব কবে তাচ্ছিল্যভাবে শোনায- এই যে বসিদ দিন একেবাবে এই মাস অবধি।

গযাগতি ভেবেছিল কার্যসিদ্ধ হযে যাবে ওদেব তুলতে পাববে এইবাব কিন্তু ভাডাব টাকাটা দিতে দেখে একটু বিবক্তই হয জযন্ত বলে —বসিদটা দিন।

গযাগতি বোমা ফাটাব মতো হুংকাব ছাডে—হোটেলেব বিল?

–ওটা হিসাব কবে দেবেন, পাই টু পাই মিটিযে দেব

বসিদটা নিযে গযাগতিব মুখ বন্ধ কবে দিযে জযন্ত ওদেব সেই শেডটাব দিকে এগোল নিধিবামবাবু তখনও দাঁডিযে আছে। ছেলেদুটো মাঝে মাঝে টাকা বোজগাব কবে। তাছাডা তাব সেই ভেজাল ওষুধ তাব লেবেলিং-এর কাবখানাব মতলবটা যেন বানচাল কবে দিল।

নিধিবাম বলে —নোটটা দেখে নিযেছেন গযাগতিবাবু?

গযাগতি আলোয় বড নোটখানা উলটেপালটে দেখে। কে জানে—ওদেব বিশ্বাস নেই। ওই আর্টিস্ট ছেলেটাও ধুবন্ধব।

একবাব গযাগতিব সামনেই তাব সই জাল কবে দেখিযেছিল তাব এলেম।

গয়াগতি তবু নিধিরামকে সান্ত্বনা দেয়।

—জায়গা আপনি পাবেন স্যার। দরকার হলে ওপাশের ফাঁকা জায়গাটাতেই একটা শেড তুলে দোব। খরচা হবে কিন্তু স্যার তাই বলছিলাম, মানে ঠিক ভাড়ায় নয়, একটা বখরার মধ্যে আসতে চাই। কথাটা আপনিও মানবেন, কারণ জায়গা ঘর তোলার খরচা এসব মিলিয়ে—

নিধিরাম ভাবছে কথাটা।

তার মূলধন অবশ্য তেমন কিছুই নয়। তবু পার্টনার করতে হলে সব দিক ভেবে দেখা দরকার। তাই বলে—আচ্ছা পরে ভেবে দেখব।

দুপুর হয়ে অসে। গয়াগতির এই সময়টায় অবসর মেলে। বাবুরা সকলেই প্রায় অপিসে না হয় কাজে বের হয়ে গেছে। দু-দশজন বোর্ডার আসে বাইরে থেকে, কলকাতার নানা কাজ নিয়ে। তাদের অনেকেই মফস্বলের লোক। মোটামুটি সচ্চল অবস্থাব মানুষই।

কাজে আসে সঙ্গে মেয়েরাও আসে। গিন্নীবান্নীদের নিয়ে কাজ সেরে গঙ্গাস্নান, কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর ও মনুমেন্টও দেখে আসে।

গয়াগতির কাছে শাঁসালো খদ্দের তারাই। কলকাতার পাইপের জল যাদের পেটে পড়েছে তারা চালাক হয়ে যায়। বাড়তি পয়সা একটিও তাদের কাছ থেকে সহজে বের করা যাবে না। বিজলীবাতির আলোয় তাদেব চোখের সামনে অন্ধকার ঘুচে গেছে। তাই মাসকারবারী খদ্দেব সে ইচ্ছে করেই বেশি রাখে না।

হোটেলের মাসিক খরচটা উঠে আসে মোটামুটি, এমনি হিসাব করে পনেরো বিশজন মাসিক বোর্ডার বাখে। বেশি সংখ্যায় ওরা থাকলেই খাওয়া থাকা বাথরুম নানা কিছু নিয়ে গোলমাল বাধাবে। আন্দোলনও হয়ে যাবে। আর ছাত্র' ওদের দূর থেকেই পেন্নাম করে গয়াগতি।

খববেব কাগজে যা কীর্তি ওদের পড়েছে, নিজের চোখেও যা দেখেছে তাতে মনে হয়েছে ওরা সব গোখরো সাপেব জাত, ছোবল মারবেই। তাই ওদেব দূরে দূরে রাখে।

দুপুরে খাওযাদাওয়ার পর ওই গেটেব সামনে তক্তপোশে একটু গড়িয়ে নেয় গয়াগতি। মাঝে মাঝে নাকও ডাকে।

—কই রে!

বলহরির এই সময়টা এইখানেই কাটে। বাবুর মাথার পাকাচুল তোলে, না হয় গা হাত একটু ডলাই মলাই করে দেয়। গয়াগতি এখন অন্য মানুষ। সেই চেঁচামেচি করার মেজাজটা থাকে না।

মনিব চাকর ওরা যেন নয়। দুজনে বালাবন্ধু। দুজনে দীর্ঘদিনের পরিচয়।

বলহরি বলে—ও কত্তাবাবু, মাথার চুল যে সবই পেকে গেল। তাই বলছিলাম—

—কি বলছিলি?

বলহরি শোনায়।

—ওই পাকাচুল তোলবার চেষ্টা না করে কাঁচাচুল যে ক'গাছি আছে তুলে ফেলাও। দিব্যি মানাবে।—

গয়াগতি ওর দিকে চাইল। বয়স হবে না? কদ্দিন হল বলদিকি?

—তা বটে!

নির্জন ক্লান্ত দুপুরে দুটি মানুষ যেন অতীতের পথে অনেক দূরে পিছিয়ে গেছে। গয়াগতির এ জীবনের আড়ালে অন্য একটা জীবনও আছে। সেটা তিক্ত বেদনাময় জীবন। বলহরি বলে—বাড়ি একবার ঘুরে আসব ভাবছি, ঢের দিন যাইনি।

হাসে গয়াগতি। —কিরে মন কেমন করছে নাকি বুড়ীর জন্যে?

বলহরি বলে—না। এমনিই। মেয়েটাও বড় হয়ে উঠছে। ছেলেটার পড়াশোনা আছে। জমির ধান-পান তুলতে তো হবে—

বাড়ি, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সকলেরই সব আছে। তার জন্য ভাবনা হয় সকলেরই। কিন্তু তার? তার মনে

পড়ে নিজের হারানো দিনের কথা। দেশেই বাড়িঘর জমিজিরেত সবই ছিল। বহু অতীতের পারে স্বপ্নসবুজ সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। গয়াগতির অবস্থা মোটামুটি মন্দ ছিল না। ....বিয়েথা করেছিল। কচি সবুজরং শাড়ি পরা একটা বৌ-এর কথা এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তার মনে একটা ক্ষীণ স্মৃতিতেই পরিণত হয়েছে। আবছা সেই স্মতি।

...তারপর সব কোন্ দিকে হারিয়ে গেল কি বিরাট এক সর্বনাশা ঝড়ে।

কাদের হাসি কথার টুকরো শব্দে ফিরে চাইল গয়াগতি। এক ভদ্রলোক তার হোটেলে দু'তিন দিন সপরিবারে এসেছেন, তিনিই বাড়ির মেয়েদের নিয়ে, বোধহয় কলকাতা শহর দেখাতে বের হয়েছিলেন। কেনাকাটা সেরে এটা সেটা দেখে ফিরছেন। কলরব করছে ছেলেমেয়েরা। ভদ্রলোকের গিন্নী ওদের থামাবার চেষ্টা করেন।

...কই গো, প্যাকেট দুটো নিয়ে চলো। মীরা, শাড়ির বান্ডিলটা দে। দেখিস ট্যাক্সিতে যেন কিছু পড়ে না থাকে।

বলহরি নিজেই উঠে এসে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের টুকিটাকি মালপত্র খালাস করে দেয়। বোর্ডারদের তুষ্ট করার এটাও পন্থা।

মীরা!

নামটা গয়াগতির খুব চেনা। একদিন সেও শখ করে এই নাম রেখেছিল একজনের।...এইটুকু মেয়ে। মিষ্টি হাসির শব্দ এখনও গয়াগতির শূন্য জীবনে কোথায় সাড়া আনে, সুর আনে।

তখন গয়াগতি স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেনি।

সুদূরের খালবিলে ঘেরা একটি সবুজ গ্রাম থেকে বিরাট মহানগরীতে এসেছে দুটো পয়সা রোজগারের আশায়। একটা হোটেলেই কাজ পায়।

বাজার সরকারি করে— খাতাপত্রর হিসাব রাখে। মাঝে মাঝে বোর্ডারদের খবরদারি করে। স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। ট্রেন থেকে যাত্রী নামলে তাদের পাকড়াও করে তীর্থের পান্ডার মতো। বুলিগুলিও মুখস্থ হয়ে গেছে—ভালো ঘর স্যার। আলো হাওয়া যথেষ্ট। পবিষ্কার—খাবারদাবারও ভাল। চার্জ মডারেট—

অন্য হোটেলের লোকদের সঙ্গে টানাটানি লেগে যেত খদ্দের নিয়ে। তবু জিততো অনেক সময় গয়াগতিই। তার হাবভাব কথাবার্তাগুলোয় মুগ্ধ হতো অনেকে। তখন যৌবনকাল—চেহারাটাও তার ভালোই ছিল। একটা গ্রাম্য সারল্য ফুটে থাকত তার মুখে—গ্রামের লোকদের সেটা ভালোই লাগত।

তাই বোর্ডাররাও আসতেন।

সামান্য মাইনে পেত তখন গয়াগতি। হোটেলের একতলার ভাঁড়ারঘরের একপাশে একটা তক্তপোশে পড়ে থাকত। চালের আটার বস্তা—তেলের টিন—তরিতরকারির ঝুড়িতে ইঁদুরগুলো দাপাদাপি করত—কখনও বা গায়ের ওপর দিয়েই দু-একটা দৌড়ে যেত রাতের অন্ধকারে।

গয়াগতির ঘুমচোখে তখন ফেলে আসা গ্রামসবুজের স্বপ্ন। নোতুন বৌ-এ-র ডাগর দু'চোখের চাহনিতে ডুবে আসে সে। দিন গুনত কবে কলকাতার এই ভিড় আর ব্যস্ততার জীবন থেকে ক'দিনেরজন্য ছুটি পেয়ে বাড়ি যাবে।

হোটেলে পথেঘাটে ও বাবুদের দেখত। স্বামী-স্ত্রী চলেছে ছেলেপুলে নিয়ে বেড়াতে। তার কাঙাল মনও স্বপ্ন দেখতো স্ত্রীকে আনবে কলকাতায়। তারাও এখানে বাস করবে। সুখে থাকবে।

বাড়ি গেলে স্ত্রীর দু'চোখে জল নামত। বুড়ো বাবা মাও খুশি হত। কিন্তু বৌ-ই অনুযোগ করত বারবার।

—এখানে থাকা যায় না। তোমার বাবা মায়ের কথা তো শোননি, একেবারে ছুরির ফলার মতো ফালাফালা করে দেয়। কলকাতায় নিয়ে চল। খুকীও বড় হচ্ছে—

গয়াগতি সেদিন ওদের কোনো আশাই দিতে পারেনি।

তার মনে তখন অন্য স্বপ্ন। কলকাতার সেই নেশার জীবন তাকে পাকে পাকে জড়িয়েছে।

বলে—এই মাইনেতে চলবে কি করে? দুটো পয়সা জমুক, একটু কাজকারবার ফাঁদি, তখন নিয়ে যাব।

—সেই দিন যে কখন আসবে তা ঠাকুব জানেন আর তুমি জানো। তাব চেয়ে বল—গেঁইযা মেযেকে কলকাতাব নিযে যাই কি কবে। সেখানে শুনেছি বাস্তায ঘাটে মেযেবা ঘুবছে—

কি যেন ইঙ্গিত কবত তাব বৌ। গযাগতি হাসতো। বাগতো না।—কি যে বলো। আর ক'টা বছর।

গযাগতি নিজেই তখন হোটেল খোলাব স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বপ্ন তাকে নেশাব মতো পেযে বসেছে। অবস্থা সে বদলাবেই। সামান্য কিছু টাকা জমিযেছেও এমন সময ওই দাঙ্গাব আগুন জ্বলে উঠল সাবা দেশে।

—বাবু! ম্যানেজাববাবু!

গযাগতি যেন অন্য জগৎ থেকে কাব ডাকে ফিবে এল। বোধহয ঝিমচ্ছিল সে। চোখ মেলল। বিরক্তি ভবে চাইল গযাগতি। সকালেব সেই শীর্ষাসন কবা ভদ্রলোক। শীর্ণ টিকটিকিব মতো চেহাবা। কিন্তু বলবাব আগেই সামনেব নডবডে চেযাবটায চেপে বসেছেন তিনি।

গযাগতি উঠে বসল।

তিনটে বেজে গেছে। বাস্তায লোকজনেব ভিড এইবাব শুরু হবে। কলেব জল পডছে একটানা শব্দে। গযাগতি উঠে বসল।

—বলুন।

ভদ্রলোক ঢোক গিলে বলেন —বলতেই এসেছি স্যাব, মানে দেখালম আপনাকেই বিলাই কবতে। পাবি। ব্যাপাবটা একটু প্রাইভেট— মানে পাবসোনাল। নিতান্তই ব্যক্তিগত। আপনাব হাতে উকিলটুকিল আছে? ভাল উকিল। পযসা দোব মশায? মানে আমাব স্ত্রীব নামে একটা মামলা কবতে চাই। ডিভোর্স এব মামলা। অবশ্য স্ত্রীব বযস বেশি নয, তৃতীয পক্ষ কিনা —

গযাগতি লোকটাকে দেখছে। ব্যাপাবটা তাব কাছে বিশ্রী ঠেকে।

ধর্মপ্রাণ লোক —ভোব থেকে আসন কবে, তাব মুখে এসব কথা শুনে বিবক্ত হয সে। একেবাবে চটাতেও পাবে না—খদ্দেব লক্ষ্মী।

তাই গযাগতি এডিযে যায।

দেখব খুঁজেপেতে। তবে কি জানেন—এসব কবে কোনো লাভ নেই। অবশ্য চতুর্থ পক্ষ যদি না কবতে চান।

—মানে?

মিলে মিশে থাকুন না স্যাব। স্বামী স্ত্রী, বলে কথা —

শীর্ণ ভদ্রলোক খাঁক কবে ওঠেন— নো অ্যাডভাইস স্যাব। আমি হিমালযেই চলে যাব। তাব আগে ওকে জবাব দিতে চাই। বুঝলেন? ওই হাবুল দত্ত--ওই যে গীতাভক্ত ব্যাটা, ওটাই তো নষ্টেব মূল। ব্যাটা ভণ্ড দুশ্চবিত্র। বন্ধু! বন্ধুবূপী শযতান। সব টিট কবে দোবো মশায। ডুবে ডুবে জল খাওযা—

শীর্ণ ভদ্রলোক তডাক কবে লাফ দিযে উঠে পডলেন, গযাগতিকে কোনো কথা বলাব অবকাশ না দিযে বেব হযে গেলেন গটগট কবে।

বলহবি চা আনছিল ম্যানেজাববাবুব জন্যে। ইশাবায দেখায।

—মাথা খাবাপ নাকি বাবুব?

গযাগতি কথা বলল না সেও একদিন এমনি ক্ষেপে উঠেছিল। এটা অনেক সময ভুলই। সেই ভুলেব বোঝা বইছে গযাগতি আজ অবধি।

মনে মনে জ্বলছে অনুশোচনায কিন্তু কোনো কিছুই প্রতিকাব কবতে পাবেনি।

আজ দিন বদলেছে। টাকাপযসাব মুখ দেখেছে। তবু অন্তবেব দিক থেকে সে নিঃস্ব হতদবিদ্র হযে গেল একেবাবে। মনেব সেই অভাবটা কোনোদিনই মিটল না তাব। হেলায সে সব হাবিযেছে।

আজ ওই লোকটি তাই ডাইভোর্স-এব মামলাব কথা বলতে চটে উঠেছে গযাগতি। বন্ধু! তাবপবই সন্দেহ। লোকটাকেও ও দেখেছে। গীতা পাঠ কবে—ফোঁটা তিলক কাটে। গযাগতি চাযে চুমুক দিতে দিতে শুধোয—হ্যাঁবে বলাই, ওই লোকটা কেমন বে?

—ওই বাবাজী? সকালে যিনি কানছিলেন? কেন খারাপটা কুনখানে গো! ধার্মিক নোক—কেষ্টনাম করেন।

ধমকে ওঠে গয়াগতি—থাম তুই। যা উনুনে আঁচ দিলে কিনা দ্যাখ। এখুনি বিশ্বগ্রাসী খিদে নিয়ে বাবুরা ঢুকবেন। তাও যদি অপিসে কাজ করতিস। যাস তো সব দিবানিদ্রা দিতে। এত খিদে কিসের বাপু!

খিদেটা সকলেরই পায়। দেহের খিদে মনের খিদে সব মিশে বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষায় পরিণত হয়েছে। সারা শহরে চলেছে জনতার সেই ভুখা মিছিল। এর আর শেষ নেই।

তার মধ্যে এক-আধজন দু-একদিনের জন্য খেয়ে নেয়, সেদিন সে সব ভুলে যায়। এ যেন বেঁচে থাকার যন্ত্রণার মাঝে তৃপ্তির একটু সান্ত্বনা।

মৃণাল আর জয়ন্ত তাই বের হয়েছে। জয়ন্ত তবু এর মধ্যে হিসাব করে চলতে চায়। তাদের দুজনেরই অবস্থা সমান। কোনোদিন একমুঠো জোটে, কোনোদিন বা জোটে না। সেদিনও অবশ্য কাটিয়ে নেয় কোনোমতে। কষ্টটাকে গায়ে মাখলেই কষ্ট, নাহলে ওটা কিছুই নয়। মনের একটা বিচিত্র অনুভূতি মাত্র। ভাবলেই সেটা আরও নিবিড়ভাবে মনের ওপর চেপে বসে।

অবশ্য যা রোজগার হয় সেটা দুজনেরই। জয়ন্তের কাছেই পয়সাকড়ি থাকে। মৃণাল বলে—ছবি আঁকি সেই ভালো, পয়সাকড়ির হিসেব রাখতে হলে এসব ছেড়ে অপিসেই চাকরি নোব। জয়ন্ত, তুই বরং ওসব করেছিস মাঝে মাঝে। তাই ওই হিসেবপত্র তুইই রাখ।

আজ তাই মৃণালকে বেহিসেবি খরচার কথা বলতে জয়ন্ত অবাক হয়।

জয়ন্ত বলে, কিরে আজ নীরায় লাঞ্চ খাবি? মানে ধর আট টাকা দুজনের একবেলার খাইখর্চা! ওতে যে চার দিন চলবে।

মৃণাল হাসে—ওসব হিসেব পরে হবে। দু'দিন না হয় জল গিলেই থাকবি। তাই বলে একদিন জুত করে খাবি না? চল—

জয়ন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই গেছে সেখানে।

দুপুরের গরম এখানের এয়ার কুলারের দৌলতে ঠান্ডা। দেওয়ালের ঘন আকাশী রং-এর ডিসটেমপারের রংটা মনে স্বপ্ন আনে। বাতাসে পিয়ানোর হালকা টুংটাং সুর সেই স্বপ্নকে সুরবর্ণময় করে তোলে।

ওরা দুজনে খেতে বসেছে।

বিরিয়ানী ফাউলকারি স্যালাড, অনেকদিন এসব জোটেনি। গোগ্রাসে গিলছে মৃণাল। জয়ন্ত বলে—একপ্লেট পুরো ওড়ালি যে রে!

মৃণাল তখন মুরগির ঠ্যাং চিবুতে ব্যস্ত। ওর কথায় কান দিল না। জানে এই একবেলায় খাওয়ার জন্য আজ রাতে খাওয়া বন্ধ থাকবে। তবু এখন সেজন্য তার মনে দুঃখ নেই। একপ্লেট স্যালাড এমনিই টম্যাটো শশ্ আর ভিনিগার দিয়ে শেষ করেছে।

হঠাৎ নজর পড়ে ওপাশের টেবিলের দিকে একটি ছেলে আর মেয়ে খাচ্ছে। মেয়েটির মুখে বিশেষ কথাবার্তা নেই। পরনে পোশাকআশাক সাধারণই। মেয়েটি দেওয়ালের ফ্রেসকো ওই নীল আকাশী রং-এর দিকে চেয়ে দেখছে।

—খাও!

মেয়েটি খাবারে হাত দেবার চেষ্টা করে। কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে সে এই পরিবেশে এসে। ছেলেটি বেশ সহজভাবেই গিলে চলেছে। ফাউলকারি কাটলেট ফিশফ্রাই—

মৃণালেরও ইচ্ছে করে। কিন্তু জয়ন্তর ভয়েই ওসব অর্ডার দিতে পারে না।

ছেলেটি খাওয়ার পর বোধহয় পান আনতে গেছে। মেয়েটি তখনও কাঁটা চামচ নিয়ে অনভ্যস্ত হাতে খাবার চেষ্টা করছে।

মৃণাল বলে—বেশ জমেছে কিন্তু ওরা, বুঝলি, দুজনে কেমন খেতে এসেছে। ছেলেটা বোধহয় ভালো চাকরিবাকরি করে।

জয়ন্তও দেখছে ওদের।

মেয়েটি দেখতে বেশ মিষ্টি। এখনও ওর মুখে এই জীবনের উদগ্র সংগ্রামের ছাপ পড়েনি। কি যেন একটা মিষ্টি স্বপ্নের মতো মনে হয় তার। মনে মনে ওদের হিংসা করে জয়ন্ত। কেমন নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রায় ওরা অভ্যস্ত।

আগামী দিনের স্বপ্ন দেখে।

আর তাদের কাছে জীবন ব্যর্থতা বঞ্চনা আর বেদনায় ভরা। ওরা বেহায়ার মতো ঠকে ঠকে ধুকে দিন কাটাচ্ছে।

বলে জয়ন্ত—তা হবে।

মৃণাল জবাব দিল না। সে তখন বিরিয়ানী আর ফাউলকারির সদগতি করছে। বলে—নষ্ট করিস না জয়ন্ত। খেতে না পারিস তুলে দে।

ওর মতামতের অপেক্ষা না রেখে নিজেই বেশ খানিকটা তুলে নিল তার প্লেটে।

কতক্ষণ ওরা বসে ছিল জানে না। তারিয়ে তারিয়ে ফ্রুট স্যালাডটা খেয়ে একটু ওই ঠান্ডা আবহাওয়ায় বসে জিরোতে চায় তারা।

কাজ এখন কিছুই নেই। এখান থেকে বের হয়ে জয়ন্ত যাবে কোনো প্রকাশকের কাছে ধরনা দিতে। যদি কিছু মেলে। তারপর যাবে কোনো পত্রিকা অপিসে সম্পাদককে নমস্কার জানাতে। বিশ্রী লাগে জয়ন্তর। বোধহয় তিনি কথাই বলবেন না। বন্ধু বান্ধব—ধনী গাড়িওয়ালা শখের হবু সাহিত্যিকের দল নিয়ে বসে আছেন। একবার মুখ তুলে ওর দিকে চাইবেন মাত্র। বসতেও বলবেন না। তাঁকে লেখাটার জন্য তাগাদা দিয়ে আবার বেরুতে হবে।

সেই হোটেলের মেন বিলডিং-এ বাবুদের কলরব ভেসে আসবে—ঘনঘন চা টোস্ট যাবে। তাস খেলতে বসেছেন তাঁরা। কোনো উঠতি বড়লোক কলকাতা বেড়াতে এসে ফর্তি করছেন সেটাও দেখতে হবে।

লেখা' লেখার কথা ভুলেই যায় চারিদিকের ওই হরেক মজার ভিড়ে। দুঃখও পায়। সবাই চারিদিকে সব গুছিয়ে নিল- বেকুব সে। তাই এই পথ নিয়েছে।

মনে হয় তার লেখার ওই সব টীমদের ছবিই ফুটিয়ে তুলবে সে। যেন চাবুকের ঘায়ে ওদের ফালাফালা করে সেই নগ্ন ছবিটা দেখাবে—তুলে ধরবে সকলের সামনে।

কিন্তু কি লাভ তাতে! জীবনে সে কি পেয়েছে? কোনো নীরব নিভৃত একটু স্পর্শ—কোন সান্ত্বনা—আশ্বাস। কিছুই নেই। এরই নাম বেঁচে থাকা।

—এ্যাই...

মৃণালের ডাকে চমক ভাঙ্গে।

—খুব সেঁটে ঘুমোচ্ছিস যে ঠান্ডায়। ওদিকে দেখছিস কাণ্ড! সাবাস ব্যাটা। আমাদের চেয়েও সরেস, রসিক ব্যক্তিই বলতে হবে। দ্যাখ না কাণ্ডটা।

তখন ওপাশে সেই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে বেশ একটা ভিড় জমে গেছে। বয় বেয়ারা ম্যানেজারসাব দু-চারজন ভদ্রলোক সকলেই জুটেছে। মেয়েটিকে নানান জন নানা প্রশ্ন করে চলেছে একসঙ্গে।

সেই ছেলেটি নেই। সেই যে পান আনতে গেছে আর ফেরেনি। এদিকে ওদের বিল উঠেছে চৌদ্দ টাকা পুরো। সেটা নেবার জন্য বেয়ারা এসে সেলাম করে দাঁড়ায়।

তারপর থেকেই বেশ কিছু সময় কেটে গেছে।

মেয়েটিকে তখন তারা বলে কথাটা।

—টাকা মিটিয়ে দিয়ে যান। চৌদ্দ টাকা।

মেয়েটি এতক্ষণ কি এক অন্য স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছিল। বাজনার শব্দ উঠছে এখানের আকাশে,

বাতাসও ঠান্ডা হিমেল। বাইরের দুপুরের গরম হাওয়া এখানে ঢোকে না। তার মনেও ওই ছেলেটি কি স্বপ্ন আর আশ্বাস এনেছিল।

কিন্তু পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেছে।

ছেলেটি সেই গেছে আর ফেরেনি। ওরা এইবার মুখ খুলেছে।

—টাকা না দিয়ে এখান থেকে যেতে পারবেন না।

মেয়েটি ওদের ধমকে ঘাবড়ে যায়। তার ডাগর দুচোখ জলে ভরে ওঠে। সে জানাবার চেষ্টা করে।

—বিশ্বাস করুন। টাকা আমার কাছে নেই। থাকলে নিশ্চয়ই দিতাম।

কে ধমকে ওঠে—তবে কি ওই বাজে লক্কামার্কা ছোকরার পাল্লায় পড়ে এমনিই বেরিয়েছিলে? বেশ তবে পুলিসেই দাও ওকে। ঠকিয়ে এমনি করে পেট চালাবে। মেয়ে বলে খাতির করব না।

পুলিসের নাম শুনে মেয়েটি কেঁদে ফেলে।

সে কি বলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। হোটেলের লোকজন আকচারই এসব কাণ্ড দেখছে, ছেলেমেয়ে জোড়ায় জোড়ায় আসে, খেয়েদেয়ে দাম মিটিয়ে চলে যায়।

কিন্তু এমন কাণ্ড বাধাবে এরা তা ভাবেনি।

কে বলে—ছাড়বেন না স্যার। ছোঁড়াটা কাছাকাছি আছে। জানে মেয়েদের কিছু বলবে না, ছেড়ে দেবে, ব্যস দেখবেন যুগলে তারপর চলবেন আবার লীলাখেলা করতে।

মেয়েটি কি বলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কান্না মেশানো কথাগুলো শোনার অবসর ওদের নেই। ম্যানেজার ধমকায়—থামো তুমি। এরই মধ্যে সব শিখেছ। বের করছি তোমার ত্যাঁদড়ামি। ডাক পুলিস ডাক।

মেয়েটি অনুনয় করছে।

—দয়া করে এইবারটি আমায় ছেড়ে দিন। কখনও আর এদিকে আসব না। আমার কাছে টাকা নেই। মিথ্যে করে আমায় ঠকিয়ে গেছে ওই ছেলেটি। ভালো করে ওকে চিনি না—

—থামো তুমি।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে জয়ন্তকে এগিয়ে আসতে দেখে মৃণাল অবাক হয়।

দুজনে খেয়েদেয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল, সামনে ওই গোলমাল দেখে জয়ন্তই এগিয়ে আসে।

মেয়েটি দুইহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। একপাল লোক তাকে ঘিরে মজা দেখছে।

—কত বিল হয়েছে আপনার?

জয়ন্তর কথায় মেয়েটি মুখ তুলে চাইল। ওর কণ্ঠস্বরে কি যেন একটা আশ্বাসের সুর খুঁজে পেয়েছে সে। বিলটা তুলে দিল ওর হাতে।

—চৌদ্দ টাকা।

এটা যেন তার কাছে সামান্যই। জয়ন্ত পকেট থেকে টাকাটা বের করে ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বলে—দেখে নিন!

মজাটা এত শীগ্‌গিরই ফেঁসে যাবে তা ভাবেনি ওরা। টাকাটা বের করে দিতেই অনেকে হতাশ হয়ে সরে পড়ে। জয়ন্ত বলে মেয়েটিকে—যান। এমন সব লোকের সঙ্গে মেশেন কেন? দেখে তো মনে হয় ভদ্রঘরেরই আপনি। যান—বাড়ি চলে যান।

ওর জবাবের প্রত্যাশা না করেই জয়ন্ত এগিয়ে এল। মৃণালও ব্যাপারটা দেখেছে। নিজেদের পেটে খাবার সময় দেখেছে জয়ন্তের হিসাব পদে পদে। অথচ ওই অচেনা মেয়েটির বিল মেটাবার সময় সে টাকার কথা একবারও ভাবল না। একমুঠো টাকা দিয়ে দিল অবলীলাক্রমে।

দুজনে সামনের ফুটপাথে বের হয়ে এল। দুপুরের হু হু রোদ ময়দানের বুকে তপ্ততার আভাস আনে। দমকা হাওয়ায় মেহগনি দেওদার গাছের শুকনো পাতাগুলো ঝরছে, উড়ছে শিরশির করে সেই দামাল বাতাসে।

শীতের শেষ—বসন্ত আসছে। কলকাতার ইট কাঠের রাজ্যের মাঝে ঋতুবদলের একটু ছাপ এইখানেই এসে ছোঁয়া লাগায়। প্রাণের সাড়া জাগে।

মৃণাল বলে—টাকাটা বাজে খরচা করলি একদম।

—কেন? জয়ন্ত অবাক হয়—বিপদে পড়েছিল তাই দিলাম।

মৃণাল বলে—তুই তো দিনরাত বিপদের মধ্যেই রয়েছিস। যে-কোনো মুহূর্তে গয়াগতি স্রেফ গয়ায় পাঠিয়ে দেবে। আর পিণ্ডি তো রোজই উচ্ছুগ্গু করছে আমাদের নামে। আমাদের কেউ দেখে? তবে তুই যে দেখতে গেলি। একমুঠো টাকা—

জয়ন্ত ওর কথার সুরে যেন অন্য কিছুর আভাস পায়।

—তুই রেগেছিস? মানে তোরই টাকা কিনা। ঠিক আছে বাবা দিয়ে দোব এ টাকাটা।

হাসছে মৃণাল।

—শুনছেন।

হঠাৎ পিছনে কার ডাক শুনে ফিরে চাইল ওরা। মৃণাল বিরক্তই হয়। দুজনে আজ খেয়েদেয়ে ম্যাটিনিতে একটা ছবি দেখতে যাবে ভাবছিল। মধ্যে থেকে ওই উপসর্গ জুটতে দেখে বিরক্ত বোধ করে সে।

জয়ন্তকে কিছু বলবার আগে জয়ন্ত ওর দিকে চাইল। হোটেলের সেই মেয়েটি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

—আপনি। আবার কি হল? বাড়ি চলে যান।

মেয়েটি ইতস্তত করে। মৃণাল ওর দিকে চেয়ে আছে। জয়ন্তের মুখ চোখ কেমন বদলে গেছে। বিচিত্র একটু স্বপ্নমাখা মিষ্টি চাহনি।

মেয়েটি বলে—মানে একা যেতে পারছি না- তাছাড়া—

মেয়েটির মুখ কেমন আরক্তিম হয়ে ওঠে। শাড়ির আঁচলটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলবার চেষ্টা করে।

—গাড়িভাড়াও নেই কিনা,—গড়িয়ার ওদিকে থাকি। কোন্ বাসে যাব তাও ঠিক করতে পারছি না।

মৃণাল হতাশ হয়েছে, বিরক্ত হয়েছে। বলে—আসতে পারলেন, যেতে পারবেন না? সেই বন্ধুটাই বা গেল কোথায়?

মেয়েটি ওর দিকে চাইল বেদনাভরা চাহনিতে। জয়ন্তর এটা ভালো লাগে না। সেইই বলে—তুই থাম না মৃণাল। ভদ্রমহিলা বিপদে পড়েছেন—

মৃণাল জবাব দেয়—তাহলে উদ্ধারটুদ্ধার করে তুইই বাড়িতে পৌঁছে দে। আমার কাজ আছে, চলি। ব্লকমেকারের কাছে যেতে হবে—

মৃণাল ওকে একা ফেলে চলে গেল হনহন করে। জয়ন্ত ওকে দু-একবার ডাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু মৃণাল সাড়া দিল না, ওপাশে গিয়ে কলেজ স্ট্রীট যাবার বাসে উঠে পড়ল।

জয়ন্ত আর সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি অপ্রস্তুতের মতো বলে—আপনার বন্ধু রাগ করে চলে গেলেন?

জয়ন্ত এতক্ষণ নিজেকে অসহায় বোধ করছিল। নিবিড় হয়ে মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি।

হোটেলের দু-একজন লোক বোধহয় তাদের দিকে দেখছে। ওদের দৃষ্টি এড়াবার জন্য জয়ন্ত কি ভাবছে। নিজের অন্তরের সুপ্ত পৌরুষকে সে আবিষ্কার করে। জবাব দেয়—না, না। রাগ করেনি ও। মৃণাল অমনিই। খুব ভালো ছেলে।

মেয়েটি হাসছে।

মৃণাল! মৃণাল আপনার বন্ধুর নাম? ও তো মেয়েদের নাম হয়।

জয়ন্ত ওর দিকে চাইল।

মেয়েটির দুচোখে এতক্ষণ কান্নার চিহ্নই প্রকট হয়ে ছিল। সুন্দর মুখ—পাতলা চিবুক—টিকালো নাক—আর ডাগর দুচোখে সেই কান্নার পর ওই হাসিটুকুকে ভারি মিষ্টি বলেই মনে হয়।

—কেন?

মেয়েটি জবাব দেয়—আমার নামই তো মৃণাল। মা অবশ্য মিনু বলে ডাকে।

—তাই নাকি!

জয়ন্ত সহজ হয়ে উঠছে। ওই লোকদের দু-একজন তাদেব দিকে চেয়ে আছে। ওসের দৃষ্টি এড়াবার জন্যই জয়ন্ত সামনের একটা বাসে উঠে পড়ে বলে মেয়েটিকে —ওইদিকে যাচ্ছি, পৌঁছে দেব আপনাকে।

দুজনে বাসে উঠে পড়ে। দুপুরের দিকে ভিড় কম। তাই তারা দুজনে একটা সিটেই বসল। বাসটা ময়দানের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে।

শহরের উপকণ্ঠ। এককালে এসব ছিল জলাভূমি, হোগলাবন। এখন নোতুন মানুষ এসে বসত গড়েছে। তবুও মাঝে মাঝে সেই জলা ঝিল—পুরোনো রেইনট্রি গাছগুলো টিকে আছে, ঘনসবুজ স্বপ্ন নিয়ে।

দুজনে এগিয়ে চলেছে। মিনু আর জয়ন্ত। জয়ন্ত বলে—এইবার যেতে পারবেন তো?

মিনু শোনায়—এতদূর এসে বাড়িতে যাবেন না? মা শুনলে দুঃখ করবেন।

মেয়েটির কথায় জয়ন্ত অবাক হয়। তবু ওর সঙ্গে আর একটু সময় কাটাতে ইচ্ছা করে।... নিজের কাজও হল না আজ।

মনে মনে নিজেই সান্ত্বনা খোঁজে, কাজ তো এতকাল করেছে। অনেকের কাছেই গেছে। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আজকের এই স্মৃতিটুকু তার মনে একটা স্বপ্নের রেশ আনে। বিচিত্র সেই স্বপ্ন।

মেয়েটির সম্বন্ধে তার ধারণা বদলে যায়।

প্রথমে হোটেলে দেখে ভেবেছিল এরা এ জাতেরই। কোনোরকমে ঠকিয়ে দিন চালায়। আর জীবনের সব শুচিতা পবিত্রতাকে ওরা ধুলোমাটির মতো অর্থহীন বলে মনে করে।

তবু কি খেয়ালবশেই টাকাটা দিয়ে তখনকার মতো সাহায্য করেছিল। মৃণাল বোধহয় রাগ করেছে।

কিন্তু ক্রমশ মনে হয়েছে সত্যিকার উপকার করেছে সে। মিনুর মতো মেয়ে কেন গিয়েছিল ওখানে ওইরকম একটা ছেলের সঙ্গে একথা জিজ্ঞাসা করেনি সে।

ছোট্ট বাড়িখানা, সামনে ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকটা কুমড়ো লাউ গাছ উঠেছে। পুঁইশাকও রয়েছে মাচায়। মাটিতে ফুলগাছ লাগিয়ে বিলাসিতা করেনি, তাতে শাকসবজি লাগিয়েছে। ওর মা কোনো স্কুলের টিচার। মা আর মেয়েকে নিয়েই সংসার।

মিনুর ঘরখানাও ছোট্ট। একটা তক্তপোশ ওপাশে সস্তা কাঠের, টেবিলে পরোনো শাড়ি দিয়ে তৈরি টেবিলক্লথ। বইখাতাগুলো সাজানো। জানালায় ওই কাপড়েরই পর্দা। টেবিলে বাড়ির ওই বাগানের দু'একটা গাঁদা—বেলফুলের কলি।

জয়ন্ত চেয়ে দেখছে চারিদিকে। সাচ্ছল্য নেই— অভাবের চিহ্নই পরিস্ফুট। তুব ছিমছাম। এমনি ঘরোয়া পরিবেশের স্বপ্ন দেখে জয়ন্ত। এর তুলনায় তাদের জীবন যেন লক্ষ্যহীন, উদ্দাম।

মৃণাল তার চেয়েও ছন্নছাড়া। তাদের বোর্ডিং-এর সেই স্যাঁতসেঁতে শেডটা এর তুলনায় যেন নরককুণ্ড।

মিনুর মাও আসেন।

বর্ষীয়সী মহিলা। মুখে মিষ্টি একটু হাসির আভা।

—বসো বাবা। মিনু বলছিল তোমার কথা। ওই মেয়েকে নিয়েই হয়েছে জ্বালা। কোনো কথা শুনবে না। পড়াশোনা কর—সামনে পরীক্ষা। তবু বি. এ-টা পাস তো করতেই হবে। মেয়ের সেদিকে খেয়াল নেই।

মিনু চা নিয়ে ঢুকছিল।

শাড়িটা গাছকোমর করে পরা. নিটোল হাতদুটোয় কি মসৃণ পেলবতা। এই শান্ত পরিবেশেই ওকে সুন্দর দেখায়।

মিনু চাযেব কাপটা এগিযে দিযে বলে—মা এইবাব নানা কথা বলবে, বুঝলেন জযন্তবাবু। আমাব জন্য মাযেব নাকি বা‌তে ঘুম হয না।

—হয নাই তো। মাযেব কোনো কথা শুনিস তুই? সামনে পবীক্ষা।

—পডছি।

জযন্তেব কাছে এই মিষ্টি আলোনামা বৈকালটুকু কি বিচিত্র অনুভূতিতে তাব সাবা মন ভবিযে তোলে। মিনু ওকে এগিযে দিতে আসছে বাসবাস্তা অবধি। পথেব ধাবে ছোট ছোট বাডি, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষগুলো আবাব নোতুন কবে ঘব বেঁধেছে।

ওই ঘববাধা বোধহয মানুষেব কাছে চিবন্তন সত্য, নইলে যে ঘব ভেঙে গেল, হাবিযে গেল, দেশান্তরে এসে আবাব নোতুন কবে সেই ঘব বাঁধবে কেন?

পাখি ডাকছে। এখনও এখানে গাছগাছালি আছে। আকাশে শেষ আলোব বং খেলে। একদিনেই জযন্তেব কাছে এই জগৎ নোতুন আকর্ষণীয বলে মনে হয। মানুষগুলোও অনেক ভালো। কলকাতাব সেই নবকেব জীবনেব বাইবেও মুক্ত উদাব সুন্দব জীবনযাত্রা বযে চলেছে মানুষ এখনও সত্যি ভালো বযে গেছে, এইটাই দেখছে আজ সে।

মিনু বলে—আসবেন মাঝে মাঝে, বাডি তো চিনে গেলেন।

হাসে জযন্ত।

—আজই একজনেব সঙ্গে মিশে নিদাকণভাবে ঠকেছেন। আবাব মিশতে চান?

চমকে ওঠে মিনু ওব ফবসা গালে লাল আভা জাগে। সেই দুপুবেব বেদনাদাযক ঘটনা যেটাকে সে ভুলতে চেযেছিল সেই কথাটাই মনে পডে। তাই বোধহয লজ্জাই পেযেছে সে।

তবু মেযেটি একটু সাহসী। তাই বলে—সব মানুষই কি সমান। নাহলে একজন বিপদে ফেলে—আবাব অন্য মানুষ সেই বিপদ থেকে উদ্ধাব কবে। যাকগে ওকথা। তাই বলছিলাম— যদি এদিকে আসেন এলে খুশি হবেন মা। অবশ্য আপনাবা কাজেব লোক দিনবাত ব্যস্ত থাকেন।

হাসতে থাকে জযন্ত।

—না না, কাজেই নেই। মশাই আমাব কাজটাই আলাদা। দশটা পাঁচটাব বালাই আপাতত নেই।

—ব্যবসা কবেন বুঝি?

জযন্ত আসল কথা ভাঙল না। এটা বোধহয তাব মানে অতলেব একটু দুর্বলতাই। চাকবি কবি, ব্যবসা কবি, অর্ডাব সাপ্লাই এব কাজ কবি এসব কথা বলা যায মেযেকে। কিন্তু কোনো মেযেকে বলা যায না যে সাহিত্যকর্ম কবি। এটা আজকেব দিনে সমাজে বেঁচে থাকাব কাছে অবাস্তব একটা পথ।

মিনু চেযে আছে ওব দিকে।

কযঘন্টাব পবিচয, এব মধ্যে কেমন ভালো লেগে গেছে ওকে। বাসটা আসতেই উঠে পডল সে। হাত নাডছে মিনু। বাসটা পথেব বাঁকে মোড নিল। মিনুকে আব দেখা যায না।

জযন্ত কি ভাবছে।

আজকেব দিনটা—এই অভিজ্ঞতাটুকু তাব কাছে বিচিত্র আব নোতুন। ওব এতদিনেব জীবন সম্বন্ধে ধাবণাটাকে বেশ কঠিনভাবে নাডা দিযেছে।

মৃণালও অবাক হয জযন্তেব এইসব কাণ্ড দেখে।

বহুদিনেব বন্ধুত্ব দুজনেব। ওবা স্কুল থেকে একত্রে বেব হযে কলকাতায এসেছিল বেশ ক'বছব আগে। তখনও এত বিডম্বনা যন্ত্রণা বাডেনি এখানে।

যা জুটেছে দুজনেই ভাগাভাগি কবে খেযেছে। দুজনেব বোজগাব অবশ্য তেমন কিছু নেই। তবু সেটা একত্রেই থাকে। বলে—জযেন্ট কো-অপাবেটিভ।

বোর্ডিং-এব সকলেই জানে, ওদেব মানিকজোড বলে। দুটিতে একসঙ্গেই থাকে। আসা-যাওয়াও

করে একত্রে।

আজ মৃণাল একটু বিস্মিত—কিছু বিরক্তও হয়েছে জয়ন্তের ওই কাণ্ড দেখে। জয়ন্ত কিনা আগ বাড়িয়ে ওই মেয়েদের ব্যাপারে এগিয়ে গেল। কিছু টাকা দিলি—ব্যস চুকে গেল। চলে আয়।

তা নয়, আবার দুজনে কোথায় বেরুলেন হাওয়া খেতে। মেয়েটার কথাবার্তাও তার ভালো লাগেনি। ওসব ওদের অভিনয়ই নইলে এতদিন কলকাতায় বাস করছে, চৌরঙ্গীপাড়ায় এসেছে বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে —ফুর্তি করতে, সেই মেয়ে কিনা বলে একা বাড়ি ফিরতে পারব না।

আর জয়ন্তটাও যেন মুখিয়ে ছিল এরই জন্যে। সেও বলা নেই কওয়া নেই চলে গেল। একবার তাকে বলারও প্রয়োজন বোধ করল না। মৃণালের দাম তার কাছে কিছুই নেই। মেয়েটার মুখের কথায় সে তাকে নিয়ে চলে গেল।

মৃণালের মনমেজাজ ভালো নেই।

দুপুরের শোতে সিনেমায় আর যায়নি। যাবার মতো মেজাজও আর নেই। একাই ইডেনের দিকে গঙ্গার ধারে সময় কাটিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। বিকালের ভিড় বাড়ার আগেই বোর্ডিং-এর দিকে ফিরেছে।

মনটা বিষিয়ে গেছে। ওই রোদে বোধহয় মাথাও ধরেছে দারুণ। ট্রাম থেকে নেমে হোটেলের দিকে এগিয়ে আসে।

কটা জরুরি কাজ করতে হবে। ছবির কাজ। কিছু টাকাপয়সাও আসছে এইবার।

মৃণাল জেনেছে বাজারে তার কাজের দাম আছে, চাহিদা আছে। কিন্তু যতটুকু টাকা তার দরকার তার বেশি রোজগার করতে বা তার জন্যে কাজ করতে রাজী নয় সে।

মাথাটা দপদপ করছে।

হোটেলের ওকে একাই ঢুকতে দেখে ম্যানেজার গয়াগতিবাবু একটু অবাক হল। ওই দুটি জীবকে গয়াগতি এড়িয়ে চলে পারতপক্ষে।

তাড়াবার চেষ্টাও করেছে এতকাল, কিন্তু পারেনি। ওদের গায়ে কুমীরের চামড়া রয়েছে। কোনো বাক্যবাণই সেই চামড়া ভেদ করে অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না।

তাছাড়া ওই দুটি জীবকে বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে।

একবার গয়াগতি ওদের ওপর ডাইরেক্ট অ্যাকশনই শুরু করবে বলে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। পরের দিন ভোরে হোটেলের দেওয়ালে গয়াগতি বিরাট একটা কার্টুন, বিশাল গোল চেহারা—কুমড়োর মতো মুখ—জালার মতো পেট, আর তার সামনে একটা বিরাট থালায় পাহাড়প্রমাণ ভাত—বাটিতে বিরাট মাছের মুড়ো—আরও অনেক কিছু এঁকে ম্যানেজারের সম্বন্ধে রসস্নিগ্ধ ছড়া লিখে দুই মূর্তিমান সেটাকে টাঙিয়ে রেখেছিল।

হোটেলের বোর্ডাররা তো দেখে জুত করে পড়ে হেসে বাঁচে না। বাইরের লোক, রাস্তার লোকও পড়েছিল সেটা। অনেকে আবার আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখায় গয়াগতিকে।

গয়াগতি সেদিন এ এলাকায় পরিচিত হয়ে উঠেছিল। ওকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল অনেকেই। বহুকষ্টে ওগুলোকে খুলিয়েছিল সে ওই দুই মূর্তিকে বলে কয়ে।

ওদের ঘাঁটাতে সাহস করে না গয়াগতি। মনে মনে শুধু ফোঁসে মাত্র। নিধিরামবাবুর মতো শাঁসালো খদ্দেরকে এই শেডটা ভাড়া দিলে তার দুদিক থেকেই লাভ হবে। হোটেলের ব্যবসায় আর লাভ নেই। খাওয়াদাওয়া থাকার অসুবিধা হলেই ওরা কথা শোনাবে। আর চাল তো কলকাতা শহর থেকে উবে গেছে। ব্ল্যাকে যা দাম দিয়ে চাল কিনতে হয় তা থেকে আর লাভ করার কোনো পথই থাকে না। তার চেয়ে ওই ওষুধের ব্যবসা ঢের লাভের। জল ঢালো আর লেবেল বদলাও। এক শিশি ওষুধে তিন শিশি হয়ে যাবে। ইনজেকশনে তো আরও লাভ।

কিন্তু তা হতে দেবে না ওই দুটি মূর্তিমান। ...আজ কোত্থেকে টাকা এনে দিয়েছে কে জানে।

বলহরি দোকান থেকে ফিরছিল। মৃণালকে একা আসতে দেখে ওর দিকে চাইল। মৃণালের সেই হাসিখুশি ভাবটা আজ নেই।

—জয়ন্তবাবু কোথায়?

মৃণাল জবাব দিল না। যেন কথাটা শুনতেই পায়নি এমনি ভাবখানা করে সে গিয়ে ওদিক্কার শেডে ঢুকল।

বলহরি অবাক হয়। —কি হয়েছে গো? শরীর খারাপ?

—হ্যাঁ।

মৃণাল আর কথা বাড়ায়নি।

এসে অন্ধকার ঘরটায় চুপ করে শুয়েছে। তার কাছে আজ সব কেমন বিশ্রী লাগছে। মেয়েদের সম্বন্ধে তার ধারণা একটা আছে সেটা মোটেই সুখপ্রদ নয়।

সেও একটি মেয়েকে ভালোবাসতো। স্কুল থেকে কলেজে পড়তে এসেছিল নীরা। সুন্দর একটি মিষ্টি মেয়ে। এখানের হোস্টেলে থাকত, মৃণাল তখন আর্ট কলেজে পড়ে।

দুজনে মাঝে মাঝে ক্লাস পালিয়ে বেড়াতে যেত, চিঠিপত্র লিখত দু'দিন দেখা না হলে। কলকাতার ইট-কাঠের রাজ্যে বাস করে ওরা দুজনে স্বপ্ন দেখেছিল কোনো ভিন্ন জীবনের।

পাস করে ভালো কবে ফার্মে কাজ নেবে মৃণাল তবু মাসমাইনে একটা পাবে, বাঁধা রোজগার থাকবে। তাছাড়াও সে বাইরে কাজকর্ম করবে তাতেও কিছু আসবে।

নীরার দু'চোখে সেই নেশা।

দিনটা বৈকাল কোন্‌দিকে কেটে যেত জানে না। হঠাৎ খেয়াল হত নীরার।

—ইস্! সন্ধ্যা হয়ে এল। বোর্ডিং-এ ফিরতে হবে

কবে আসবে? কাল বিকালে?

আমন্ত্রণ জানাতো মৃণাল। ওর মনের অতল কি নীরার আকৃতি ফুটে উঠত। না বলা একটা কামনার সুর জাগে সারা মনে। নীরাও জানে সে কথা।

ওর হাতখানা ওর হাতে।

যেন ওকে সে ছেড়ে দেবে না আর।

—ছাড়ো!

নীরার চোখে মুখে নীরব ব্যাকুলতার স্পর্শ।

দিনগুলো এমনি করেই কাটত। জীবনের বাইরের দুঃখকষ্ট হতাশা মৃণালকে স্পর্শ করতে পারেনি। সে নিজের মনের ভিতর এই আশার জোরেই সব সহ্য করে নোতুন করে বাঁচার কথা ভেবেছিল।

কিন্তু নীরাকে সে চিনতে পারেনি। তার অন্তরের অতলে অন্য একটা স্বার্থপর লোভী নারীমন লুকিয়ে ছিল সে একদিনের জন্যেও টের পায়নি। যেদিন সেটা পেয়েছিল সেইদিনই তার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সারা মন বিষিয়ে ওঠে।

নীরা মুখের উপরই জানিয়েছিল— তোমাকে ভালো লেগেছিল তাই বলে বিয়ে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

—নীরা।

নীরাও অবাক হয়েছে মৃণালের এই স্বরূপ দেখে। ও যেন লোভী স্বার্থপর একটা মানুষ। নীরা জবাব দেয়—জোর করবে নাকি? এত ইতর তুমি।

মৃণালের নিজের কাছেই ওই স্বার্থপর রূপটা বিশ্রী ঠেকেছিল। ওই মেয়েরাই তাকে এমনি নীচে নামিয়েছিল। আজ সে ওদের কাউকে বিশ্বাস করে না। ঘৃণা করে সারা মন দিয়ে, এড়িয়ে চলে।

অন্তরের কোনো সম্পর্ক তাদের সঙ্গে পাতাতে চায় না। তাতে ঠকতে হবে—বেদনাই বাড়বে তাতে। ওদের সব দম্ভ অহঙ্কার সে পায়ের ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায়

তাই বোধহয় আজ দুপুরে ওই রেস্তোরাঁর মেয়েটিকে অপমান করতে দেখে খুশি হয়েছিল মনে মনে। কিন্তু জয়ন্ত যে এমনি কাণ্ড বাধাবে তা জানত না।

ওর আর দেখা নেই।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই শেডের নীচে স্যাঁতসেতে ঘরখানায় দিনরাত্রির কোনো পার্থক্য নেই। দিনের আলোর এখানে প্রবেশ নেই। হাওয়াও ঢোকে না। বদ্ধ গুমোট ঘরে তবু এতদিন দুজনে শান্তিতে ছিল, দুজনকে কেন্দ্র করে। আজ জয়ন্ত হঠাৎ সেই ছোট্ট ঘরের বন্ধ দরজাটা খুলে বাইরের আলোর দিকে চেয়েছে।

কিন্তু নির্বোধ জানে না ওটা আলো নয়—আলেয়ামাত্র।

মাথাটা দপদপ করছে। চোখ চাইবার ক্ষমতা নেই। ...নীবা বুলু জয়ন্তী আরও অনেকের মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কোথাও কোনো সান্ত্বনা পায়নি সে।

ওরা সবাই সমান। শুধু দুঃখের বোঝা আর আঘাতের যন্ত্রণাই বাড়িয়েছে মাত্র।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে ও চাইল। অন্ধকার নেমেছে ঘরখানায়। ঘরময় এটাসেটা কাগজের বাণ্ডিল ছড়ানো, আলোটা জ্বালতে দেখে জয়ন্ত একা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মৃণাল কথা বলল না। জয়ন্তের মুখে চোখে খুশির ঝলমল আভাস। জয়ন্ত অনেককিছুই বলতে চায়। ওর মনের ব্যাকুলতাটা কথায় কথায় বের হয়ে আসতে চায়।

কিন্তু মৃণালকে চুপ করে থাকতে দেখে অবাক হয়ে সে। মনে হয় আজ ওব অমতেই একটা বিরাট কাজ সে করেছে। নিজের মনের এই খুশির ভাবটা একা স্বার্থপরেব মতো উপভোগ করেছে সেইই। সেই দুপুব থেকে কি এক বিচিত্র জগতেই সে ছিল।

সেখানে ওই মৃণালেব কোনো অস্তিত্বই নেই। ওটা তার একাব জগৎ। সেখানে তারা নিভৃত নির্জনে রয়ে গেছে শুধু মাত্র দুজন। সে আর মিনু।

হঠাৎ সে এই জগতে ফিরে আসে। মৃণালের কথা মনে পড়ে।

—কিরে শরীর খারাপ?

—না। মৃণাল ওর কথার জাবাবে ছোট্ট ওইটুকু বলে চোখ বুজে থাকার চেষ্টা করে।

অন্য সময় হলে তবু কাছে এগিয়ে আসতই জয়ন্ত। আজ সে অন্য জগতেব কথায় মগ্ন। তাই ওইখানে দাঁড়িয়ে জামাটা খুলতে খুলতে বলে—বুঝলি, মেয়েটা সত্যিই ভালো। সঙ্গে করে ওদের বাড়ি অবধি নিয়ে গেল। এবাব বি এ দেবে। ওর মাও দেখলাম খুব ভদ্র। কথাবার্তা বললেন।

মৃণালের অসহ্য মনে হয় ওর কথাগুলো। বদ্ধ ঘরে এই গুমোটে আর ওর ওই কথাগুলো কেমন মাথার যন্ত্রণা বেড়ে ওঠে। ওসব কথা—ওই ন্যাকামো তাব কাছে বিশ্রী লাগে। তাই উঠে পার্কে একটু ফাঁকায় একা যেতে চায়।

ওকে উঠতে দেখে জয়ন্ত তার কথার ফোয়ারা বন্ধ কবল।

—উঠছিস যে?

—মাথা ধরে গেছে। একটা অ্যাসপিরিন খেয়ে একটু ফাঁকায় বসব পার্কে।

জয়ন্তর এই কথাটা আগেই বলা উচিত ছিল। সে সব কথা বলেনি। এতক্ষণ নিজেব কথাগুলোই গলগল করে বলে চলেছে সে।

ভুলই করেছে। তাই ওসব কথা থামিয়ে বলে—চল, আমিও যাচ্ছি। বললি না কেন—অ্যাসপিরিন নাহয় আমিই আনতাম। তুই যেন দিন দিন কি হচ্ছিস।

মৃণাল কথা বলে না। জয়ন্ত বলে ওই সঙ্গে খেয়েও আসবে পাঞ্জাবির দোকানে।

খবরটা বলহরিই দেয় গয়াগতিকে।

—মানিকজোড় যে আবার চললেন গো। তাই বলছিলাম ওদুটোকে পাববেন না।

গয়াগতিও দেখেছে ব্যাপারটা ওই তক্তপোশে বসেই। সন্ধ্যার পর কাজের চাপ বিশেষ থাকে না। গয়াগতি তখন তাক থেকে জীর্ণ গীতা নাহয় ভক্তমাল গ্রন্থখানা খুলে পড়বার চেষ্টা করে।

ইদানীং তার ধর্মে একআধটু মতি হয়েছে। বিশেষ করে রাত্রি হলে সেই আগেকার কথাগুলো মনে পড়ে। স্ত্রীকে সে ক্রমশ অবিশ্বাসই করতে শুরু করে। তাই দেশের বাড়িতে সে থাকতে চায় না। কলকাতায় আসতে চায়। তাই নিয়ে বাড়িতে বুড়ো শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়াও হয়। বুড়োও লেখে ছেলেকে নানান কথা।

চটেমটে গয়াগতিই সেদিন স্ত্রীকে চরমপত্র দিয়েছিল।

গয়াগতি গীতায় মন দিয়েছিল, বলহরির ডাকে ফিরে চাইল। দেখে জয়ন্ত আর মৃণাল দুজনে বের হয়ে যাচ্ছে। গয়াগতি বলহরিকে হুকুম করে—বাবুদের বলে দে রাতদুপুরে ফিরলে গেট বন্ধ হয়ে যাবে। এটা সরাইখানা নয়, হোটেল। ভদ্রসজ্জনদের আবাসিক হোটেল।

জয়ন্ত একবার ফিরে চাইল কথাটা শুনে। ওর মন বিষিয়ে গেছে। বেশ কড়া স্বরে সে শোনায়—আমরাও ভাড়া দিয়ে থাকি। বলে দাও বলহরি উনি যেন সেই কথাটা ভুলে না যান।

গয়াগতি তড়াক্ করে লাফ দিয়ে উঠল চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো। জয়ন্তরা তখন রাস্তায় নেমে গেছে। গয়াগতি গীতা ভক্তমাল গ্রন্থ ফেলে লাফাচ্ছে।

—গরম। আমাকে গরম দেখানো। টাইট করে দোব। গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দোব আপনাদের।

হঠাৎ সামনেই দোতলার সেই প্রাণায়ামবাবুকে দেখে চুপ করল। একটু গলা নামিয়ে বলে—ওই ইতরদের কথা বলছিলাম স্যার। জ্বালিয়ে দিল—

--উকিলের আর দরকার হবে না মশায়। দিইছি এক নম্বর ঠুকে। ভাবছি এইবার আপনার নামেও এক নম্বর ঠুকে দোব।

অবাক হয় গয়াগতি—কেন স্যার?

—লোককে ঠকাচ্ছেন। ওই ছাদের উপর এইটুন ঘর—আর খাবার তো বিশ্রী। চার্জ নিচ্ছেন দিনে দশ টাকা। টু মাচ্। তাই ভাবছি আর এক নম্বর জুড়ে দোব। নোটিশ দিয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক কথাগুলো গয়াগতির মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে উপরে উঠে গেল। গয়াগতি তখনও ব্যাপারটা সামলে ওঠেনি। এমন সময় সেই গীতাপাঠকরা মোটা ভদ্রলোককে দেখে গয়াগতি ওর দিকে চাইল।

—কি বলে গেল মশায় ওই হলধর?

গয়াগতি ওর দিকে চাইল। হলধরবাবু সিটকে —ইনি পেটমোটা গোলগাল চেহারার লোক। গয়াগতি বলে--শাসিয়ে গেলেন।

মোটা ভদ্রলোক বলে—ও অমনিই মশায়। আপনি কিছু মনে করবেন না।

গয়াগতি জবাব দিল না। ওরা একে একে শাসিয়েই যাবে--সব সইতে হবে তাকে। মায় ওই চ্যাংড়া দুটোর শাসানি অবধি।

গয়াগতি বলে—বুঝলি বলহরি, এ কারবার তুলেই দোব। লোককে থাকতে দোব, খেতে দোব তিন বেলা, আর তার বদলে এই ধ্যাসানি সইতে পারব না। ঢের হয়েছে।

হঠাৎ কারও মিষ্টি হাসির শব্দে চাইল গয়াগতি। নোতুন খোর্ডার আসছে। বোধহয় কপোত-কপোতী বলহরি এগিয়ে যায়।

—আসুন স্যার, কোনো অসুবিধে হবে না ডবল-সিটেড রুম—দক্ষিণ খোলা, সামনেই পার্ক।

দেখে শুনে একটা ঘর দিন।

গয়াগতি ওদের দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। দেখছে আপাদমস্তক। মালপত্র বলতে দুটো সুটকেশ মেয়েটি দেখতে সুন্দর। বেশ চটপটে। সেই বলে —দিন কয়েক থাকব।

গয়াগতি ছেলেটির কাছ থেকে টাকাপত্র নিয়ে খাতায় সইসাবুদ করিয়ে ঘরের ব্যবস্থা করে দিল। চাকর ওদের ঘরে পৌঁছে দিতে গেছে মালপত্র, ওরা উঠে গেল। দেখে হোটেলের এঘর ওঘর থেকে

অনেক কৌতূহলী দৃষ্টি ওদের দুজনকে দেখছে ছেলে মেয়েটির কোনোদিকে নজর নেই। তারা আপন স্বপ্নে বিভোর হয়ে চলেছে।

গয়াগতির কাছে এ দৃশ্য নোতুন নয়। অনেকের জীবনে এসব দেখেছে সে। কতজন এসেছে, এখানে দু'দিনের জন্য আশ্রয় পেয়েছে। আর সে। তার জীবনে এসব যেন স্বপ্নই।

গয়াগতির ভালো লাগে তবু এই ঘরবাঁধার দৃশ্য দেখতে। ঊষর জীবনে ওইটুকুই তার সান্ত্বনা।

--বলহরি, দুজনে বেশ মানিয়েছে, না রে? নোতুন বিয়ে করে কলকাতা বেড়াতে এসেছে।

বলহরি ঘাড় নাড়ে।

—তা মন্দ মানায়নি কিন্তু গো।

হোটেলের সব ঘর ভর্তি থাকলে ওর মনটা খুশি খুশি থাকে। এখন মরসুম চলেছে। তাছাড়া বোর্ডারের অভাব আর হয় না। তাই গয়াগতি যে এ ব্যবসা ছেড়ে যাবে না তা বলহরিও জানে। সুতরাং ওর সেই কথাটা কানেই তোলেনি।

সারাদিনের হিসাবনিকাশ নিয়ে বসেছে। গয়াগতি তবু বলে—ওই কোণের চালাঘরের জীবদুটোকে তুলতে পারলে একটু খেলিয়ে ব্যবসা করা যেত, বুঝলি?

বলহরির কিন্তু ছেলেদুটোকে ভালো লাগে। হোটেলের অন্য বাবুদের মতো গরম মেজাজে তারা কথা বলে না। বলহরিকে রীতিমতো সমীহ করে কথা বলে, বলহরিও ভালোবাসে তাদের। মাঝে মাঝে ওই হতচ্ছাড়াপনার জন্য শাসনও করে। তবু ওই লাগামছেঁড়া ঘোড়ার মতো বেপরোয়া দুটো ছেলেকে বশে আনতে পারেনি।

তবু ভালাবাসে তাদের। গয়াগতির কথায় বলহরি খাতা থেকে মুখ তুলে বলে—কার জন্যে এত ব্যবসা ব্যবসা করছেন গো? এ্যাঁ! এ তবু বটবৃক্ষ হয়ে আছেন। অনেক পাখপাখালী আশ্রয় পায়, ওদুটোও না হয় রইল। খামোকাই ওদের পিছনে লেগে লাভ কি হবে?

গয়াগতি হাসছে। বলহরি জানে না কি লাভ হবে ওর। কাঁচা পয়সা দমকা কিছু আসবে আর কি। বলহরি বলে চলেছে—এত পয়সা পয়সা করতে নাই। কেন--কিসের লেগে করবেন?

গয়াগতি চুপ করে গেল। তার আপনজনরা সব কোথায় হারিয়ে গেছে। স্ত্রী মেয়ে ঘর সব কিছু কোন্ দিকে চলে গেছে। কোথায় আছে তারা তাও জানে না। অথচ গয়াগতি পয়সা পয়সা করে ধুঁকছে।

গয়াগতি একটু চুপ করে জবাব দেয়—ওদুটো শয়তানকে দূর করবই, নাহলে ওরাই বিপদে ফেলবে কোনোদিন।

বলহরি রান্নাঘরের দিকে উঠে গেল। খাবার জায়গা করা হয়েছে টানা হলঘরখানায়। কারো কারো খাবার আবার ঘরেই পাঠাতে হবে। নোতুন ওই স্বামী স্ত্রীর খাবারের সঙ্গে মাংস দই সন্দেশও চাই।

গয়াগতি কার ডাকে মুখ তুলে চাইল।

—নমস্কার! ভালো আছেন?

দোতলার কোণের ঘরের মিস সরকার উপরে ওঠবার মুখে গয়াগতিকে একা দেখে কি ভেবে এগিয়ে আসে। ভদ্রমহিলা কয়েক মাস এখানে রয়েছে। মেয়েদের স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস। সেই সঙ্গে দু-একটা টুইশনিও করে। শক্ত সমর্থ পেটা চেহারা, মেয়ে হলেও কেমন একটা পুরুষালী ভাব ওর চোখে মুখে সারাদেহে। গলার স্বরটা পর্যন্ত ক্যারক্যারে ভারের।

প্রমীলা সরকার এসে বসল তক্তপোশের উপরই।

গয়াগতি একটু সরে বসল এদিক ওদিক চেয়ে। এখন এদিকে কেউ বড় একটা আসে না, খাওয়াদাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে সবাই।

প্রমীলা সরকার বলে—কেমন আছি খবরও নেন না একবারও।

প্রমীলা সরকার কথা বলার ফাঁকে ইতিমধ্যে দু' একবার ব্যাগ খুলে ছোট্ট আয়নার সামনে পাউডার পাফ করে নিয়েছে মুখে। গয়াগতি ওকে এড়াবার কথা ভাবছে। প্রমীলা সরকার ততই যেন ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলতে চায়।

—বুঝলেন গতিবাবু, অনেক লোকই দেখলাম, কিন্তু আপনার মতো এমন পার্ফেক্ট জেন্টলম্যান আমার চোখে পড়েনি। ও নো নো। প্লীজ! ভাববেন না বাড়িয়ে বলছি।

রাত হয়ে গেছে। ওরা দুজনে বসে আছে পার্কের একটা বেঞ্চে। জয়ন্ত আর মৃণাল। জয়ন্ত বলে—বললাম হাওয়ায় চল, মাথা ছেড়ে যাবে। তুই তো সারাদিন রোদে রোদে ঘুরেছিস?

মৃণাল জবাব দেয়—তোর মতো গাছের ছায়া আর জুটল কই?

জয়ন্ত হাসছে। খাওয়াদাওয়া সেরেছে তারা পাঞ্জাবীর হোটেলে। রুটি ডাল আর ফাউ-এর মেলে একটু চাটনি—সেইসঙ্গে পেঁয়াজ। আর কুমড়ো পুঁইশাকের একটু ঘ্যাঁট মতো। তবু পেটটা ভরানো যায়।

জয়ন্ত বলে—সত্যি রে, মেয়েটা ভালো।

মৃণাল জবাব দেয়—ভালো সবাই। খারাপ শুধু আমরাই। এদিকে গয়াগতি যা পেছনে লেগেছে টেঁকা যাবে না বোধহয় বেশিদিন।

জয়ন্ত তা জানে।

তাই বলে—দেখি চেষ্টা করে। একটা আস্তানা জোটাতে হবে তো। তবে গয়াগতিকে সহজে ছেড়ে দোব না। তাই ভাবছিলাম, একটা বাঁধা মাইনের কাজকম্মো যদি জুটতো নিতাম।

মৃণাল ওর দিকে চাইল। কথাটা তার কাছে নোতুন ঠেকেছে। বাঁধা মাইনে—আশ্রয় নিশ্চিন্ত একটু নির্ভর এসব কথার অর্থ ঠিক কি তা জানে না সে। তবে মনে হয় জয়ন্ত যেন কোথায় হার মানছে—না হয় অন্য কিছু ভাবছে।

মৃণাল বলে—একদিনেই যে বদলে গেলি তুই।

জয়ন্ত মাথা নাড়ে—না না। জয়ন্ত কোনোদিন হার মানবে না।

তবু সমস্যাটা বড় হয়েই ঠেকে তার সামনে। ওরা ফিরছে হোটেলের দিকে। আবার সেই বদ্ধ গুমোট ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে। হাওয়া নেই, পাখা লাগাবার সামর্থ্য তাদের কাছে স্বপ্ন।

তবু ওরা বেঁচে আছে কোনো অনাগত গৌরবোজ্জ্বল দিনের কল্পনা নিয়ে।

নাইট শো ভেঙেছে বোধহয়।

হাসিখুশি মানুষের ভিড় জমছে সিনেমা হাউসের সামনের পথে। ছেলেমেয়েরা চলেছে। কেউ চলেছে যুগলে, কোনো সামান্য রোজগেরে কেরানীবাবুও তার শীর্ণ বৌকে নিয়ে ছবি দেখে ফিরছে। ওদের মুখে সেই ক্ষণিকের পাওয়া তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্য চিরন্তন হতাশাকে কিছুক্ষণের জন্য চাপা দিয়ে রেখেছে।

মৃণাল বলে—মানুষগুলোর দিকে চেয়ে দ্যাখ, মনে হয় যেন বিচিত্র এক জীব। লুকিয়ে ছাপিয়ে এতটুকু পেয়েই খুশি।

জয়ন্ত আজ ওই মনোভাবকে স্বীকৃতি দিতে পারে না। মৃণাল অনেক কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে, নাহয় সে সব স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যাবার পর থেকে সারা মনে ওই বিকৃতি আর জ্বালা।

আজ জয়ন্ত এত অভাবের মাঝেও বাঁচার আশ্বাস দেখেছে মিনুর চোখে—ওদের জীবনযাত্রায়। জ্বালা নেই—আছে স্নিগ্ধ একটু জ্যোতি। তাই বলে জয়ন্ত —তবে কি নিয়ে বাঁচবে মানুষ বলতে পারিস?

মৃণাল বলে—এর নাম বেঁচে থাকা? তুই আমি এরা সকলে বেঁচে আছে বলে তুই বিশ্বাস করিস? ধুঁকে ধুঁকে আমরা শেষ হয়ে গেছি। তাই মনে হয় হাউই-এর মতো জ্বলেই ফুরিয়ে যাব।

জয়ন্ত চুপ করে কথাগুলো শুনছে। তার লেখার মধ্যেও সে জীবনের সেই হতাশা আর জ্বলাটাকে বড় করে দেখেছে, কিন্তু সেইটার শেষ কোথায় জানে না। বাইরের জীবনের জ্বালা আর হতাশা তার লেখাতেও সৃষ্টিকেও বিভ্রান্ত করে তুলেছে। মৃণালের ছবিতেও তাই স্নিগ্ধতা নেই—আছে জ্বালা আর অস্থিরচিত্ততার

প্রকাশ। দুজনেই যেন পথ খুঁজছে কোনো অন্ধকার আদিম অরণ্যে।

হোটেলের বাইরের আলো নিভে গেছে। ভিতরে ঢুকেছে ওরা দুজনে। উঠানের ওপাশে শেডের দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কার হাসির শব্দে এদিকে চাইল তারা।

জয়ন্ত দেখে দোতলার সেই ফিজিক্যাল-ট্রেনড্ প্রমীলা সরকার গয়াগতির কাছ ঘেঁষে বসে গদগদকণ্ঠে কি বলবার চেষ্টা করছে আর হাসছে খিলখিল করে।

ওর সেই পুরুষালী ভাবের মধ্যেও একটু চিরন্তন নারীত্বের ছোঁয়া লেগেছে।

গয়াগতি হঠাৎ সামনেই ওই দুই মূর্তিকে দেখে হকচকিয়ে যায়। এই ধিঙ্গী মেয়েটার এই হ্যাংলামোপনা ওদের দুজনের নজরেই পড়েছে।

প্রমীলা সরকারের ওদিকে দৃষ্টি নেই। সে বলে চলেছে—সত্যি চলুন না গতিবাবু. একদিন তারকেশ্বর ঘুরে আসি। নাইস আউটিংও হবে, আর আপনারও ঠাকুরের ভক্তি রয়েছে, বাবাকে দর্শন করে আসবেন।

গতিবাবুর মাথায় তখন ঠাকুরের কলকের ধোঁয়া ঠেলে উঠেছে। তাই গর্জন করে সে—এই যে তোমাদেরই খুঁজছিলাম। খুব তো লম্বা লম্বা বাত করে গেলে তখন, এখন শোনো- নোটিশ দিচ্ছি তোমাদের, এক মাসের মধ্যে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। নাহলে-

জয়ন্ত হাসছে।

—বেশ তো চলছিল, হঠাৎ কেন তেউড়ে গেলেন স্যার! আমরা বাধা দোব কেন? চলে আয় মৃণাল।

ওরা দুজনে চলে গেল। গয়াগতি বোম ফাটাব মতো গর্জন করে--কি বললে ছোকরা?

প্রমীলা সরকার হাসছে ওর গায়ের কাপডচোপড় যেন ইচ্ছে করেই খানিকটা অসংযত করেছে। বয়স হলেও এখনও তার স্বাস্থ্য নিটোল অটুট।

গয়াগতিকে বলে প্রমীলা খুশিভরা কণ্ঠে— বাজে কথায় কান দেন কেন? আপানিও দেখছি ছেলেমানুষই রয়ে গেলেন। তবে কি জানেন—আই লাইক দিস এনারজি। তাহলে এই রবিবারই চলুন। উঠি -কাল ভোরেই আবার স্কুলের মেয়েদের স্পেশাল ড্রিল ফিজিক্যাল ফিট-এর শো আছে। আসুন না গতিবাবু, আই শ্যাল বি ভেরী প্লীজড্।

গয়াগতির অবস্থা তখন দুঃসহ। যা হবার হয়ে গেছে। গয়াগতি তবু নিষ্ঠুরভাবে ওই মেয়েটিকে কড়া কথা বলতে পারে না। জানায়—কাজ আছে অনেক।

—কাজ কাজ আর কাজ! সারাজীবন কি করলেন তাহলে গতিবাবু? একটু অবকাশ, এতটুকু জীবনের উপভোগ, স্বপ্নরচনা কিছুই কি নেই? না না, কোনো কথাই শুনব না। কার্ড রইল। কাল সকালেই যেতে হবে আপনাকে—আমি কিন্তু ছাড়ব না।

ওর হাতটাই ধর ফেলবে বোধহয়। গয়াগতি ওকে এড়াবার জনাই বলে—আচ্ছা, ঠিক আছে। যাব।

—গুড নাইট। প্রমীলা খুশি হয়ে উঠে গেল। ওর গলায় গুনগুন সুর ওঠে।

গয়াগতির যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। বলহরিকে আসতে দেখে গর্জে ওঠে—এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

বলহরি আসছিল এইদিকে। কিন্তু সিঁড়ির ওখান থেকে ওই প্রমীলাকে গয়াগতির সঙ্গে হেসে কথা বলতে দেখে একটু অবাক হয়েছিল। গয়াগতির এতকাল এসব দোষ ছিল না। অন্তত তেমন কিছু সে নিজে কোনোদিনই দেখেনি।

আজ হঠাৎ সে যেন কি বিচিত্র দৃশ্য দেখেছে, তাই ঘাবড়ে গিয়ে দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল।

মেয়েটার সঙ্গে গয়াগতির চেনাশোনা অনেকদিন থেকেই।

গয়াগতির হাঁকে বলহরি বলে—একটু কাজ ছিল।

গয়াগতি কি ভেবে থেমে গেল। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ তার জীবনে কোথায় যেন একটু দখিনহাওয়া এসেছে। সেই খবরটা সে জানাতে চায় না কাউকে। চুপ করে কি ভাবছে।

জীবনে গয়াগতি অনেক ভুলই করেছে। তাই সব হারিয়ে গেছে তার। স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে সে শাসন

করেছিল। তার বাবা মা'র অমতেই বীরত্ব দেখাবার জন্য স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল জোর করে। মেয়ে তখন কোলে।

শ্বশুরবাড়ির অবস্থাও মন্দ ছিল না। তারাও গয়াগতির এই অন্যায় অপমানকে সহ্য করেনি। তারাও বলেছিল—মেয়ে তাদের বানের জলে ভেসে আসেনি। ঠিক পুষতে পারব তাকে। ও আর শ্বশুরবাড়ি যাবে না।

গয়াগতি তখন বোঝেনি যে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। তখন সে বড়বাজারের ওদিকে একটা হোটেলে সামান্য কাজ করে।

রাত হয়ে গেছে।

হোটেলের বাবুরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর। ঘুমোয়নি একটি মানুষ। ঘুমুতে পারেনি ওই গয়াগতি। আজ অতীত আর বর্তমান তার মনে একটা ঝড় তুলেছে।

সময়ের হালকা পাখায় ভর করে দিন মাস বছর কোন্ দিকে কেটে গেছে। ঝড় উঠেছে, দিকজোড়া, দেশজোড়া ঝড়। সেই ঝড়ও আবার থেমেছে। কিন্তু গয়াগতির ঘর সেই ঝড়েই ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার স্ত্রী মাধবী আর সেই ছোট্ট মেয়েটির কোনো খবর পায়নি।

পাকিস্তানের সেই সর্বনাশা ধ্বংসের আগুনে তার শ্বশুরবাড়ির সবকিছুই পুড়ে গেছে। অনেকেই মারা গেছে, কে কোথায় আছে কি নেই সে খবরও পায়নি গয়াগতি।

আজ সে পয়সার মুখ দেখেছে। সেই কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ার সময় থেকেই বরাত ঠুকে এই বাড়িটা সস্তায় লিজ নিয়েছিল, তারপর থেকেই গয়াগতির দিন বদলেছে।

তার জীবননদীর এক কূল ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, অন্য কূলে গড়ে উঠেছে চরভূমি। সেটা আজও ঊষর ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আজ প্রমীলা সরকার হঠাৎ তার শূন্যমনে ঝড় তুলেছিল। এর সূত্রপাত হয়েছিল আগে থেকেই। মেয়েটার কেমন গায়ে পড়া স্বভাব। গয়াগতি ওকে এড়িয়ে চলে।

আজ তবু তাকে কড়াকথা বলতে পারেনি। হয়তো গয়াগতির মনের অতলে কোথায় ভালো লেগেছিল তার সান্নিধ্যটুকু। ঘুম আসে না। গয়াগতি কি ভেবে হোটেলের তেতলা, দোতলার বারান্দা দিয়ে ঘুরতে বের হয়। এটা তার অনেকদিনের অভ্যেস।

বোর্ডাররা যদি জানে মালিক ম্যানেজারবাবু রাতদুপুরেও তাদের নিরাপত্তার জন্য তদারকি করে বেড়াচ্ছে, তাতে হোটেলেরই সুনাম বাড়ে। চাকর-বাকররা সাবধান থাকে।

তেতলার সেই হলঘর আর গয়াগতির বাবুর ঘর থেকে কার চাপাকান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। হলধরবাবুরই গলা। মোটা গদাধরবাবুর নাকডাকার শব্দ ঠিকই চলেছে।

আর সব বাবুরা ঘুমোচ্ছে।

নিধিরামবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে। লোকটা তখনও হিসাব করছে বোধহয়। চালু কারবার তার। গয়াগতি বেশ দু'পয়সা পেত ওর সঙ্গে ভিড়তে পারলে, কিন্তু ওই গুদামঘরটা খালি করাতে পারলে তবে সেটা সম্ভব।

ওকোণে প্রমীলার ঘরের আলো নেভানো। ওখানের বাতাসে একটু চাপা সুবাস ওঠে।

ধীরে ধীরে নেমে এল গয়াগতি। নিস্তব্ধ প্রাণহীন রাজ্যে একা সে জেগে আছে। হঠাৎ ওপাশের শেডে আলো জ্বলতে দেখে বিরক্ত হয়। ছোঁড়াদুটো এখনও ঘুমোয়নি বোধহয়। সারারাত জেগে একটা ছাইপাঁশ কিসব লেখে আর একটা ছবি আঁকে।

মিটার উঠছে। রাত দশটার পর আলো নেভানোর কথা। ওরা তবু শুনবে না। আজ গয়াগতির চোখে পড়ে গেছে সেটা।

জয়ন্তের লেখাটা আজ এগিয়ে চলেছে। এত বেদনার মাঝেও জীবনের একটা মাধুর্য সে খুঁজে পেয়েছে।

মানুষ ভালোবাসে—এইটাই তার ধর্ম। এই তার কাছে সত্য।

সেই ভালালাগার চোখ দিয়েই সে বেদনাময় জীবনকে মানুষকে নোতুন চোখে দেখে। লেখার মধ্যেও স্নিগ্ধ সেই প্রেমের আভাস তার লেখাকে আজ তার অজান্তেই ভিন্ন মেজাজের স্পর্শে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। সে দেখছে চারদিকে ওই আশ্বাস।

আজ রাতের সেই সিনেমার শো ভাঙার পর ঘরে ফেরা মানুষের চোখে দেখেছে ক্ষণিক তৃপ্তি ভালোলাগার আশ্বাস। দেখেছে ওই গয়াগতির শূন্য ব্যর্থ জীবনেও কতটুকু অন্বেষণের চেষ্টা।

মৃণাল এসবে বিশ্বাস করে না। তার কাছে মনে হয় এসব একটা মস্ত ভুলের নেশা। মানুষ আজও সেই আদিম আরণ্যক স্বভাবেরই রয়ে গেছে। আজকের এই সভ্যতার মুখোশ তার কাছে আদৌ সত্য নয়। ওটা ভানমাত্র। সে স্বার্থপর—হিংস্র—আদিম। এত যুগের সভ্যতা মানুষকে মূলগতভাবে বদলাতে পারেনি।

এই বঞ্চনা তার কাছে পরম সত্য। নীরাও তাকে ঠকিয়ে গেছে। ঠকিয়েছে বাসন্তী। ওরা অভাবকে মেনে নিতে পারেনি। ভালোবাসার ভান করেছিল মাত্র। তাই মেয়েদের সে ক্ষমা করতে পারেনি।

তার মাও তার মনের সামনে কোনো গৌরবোজ্জ্বল মাতৃত্বকে ফুটিয়ে তোলেনি। ছেলেবেলা থেকেই মাকে দেখেনি।

শুনেছিল ক্রমশ আসল কথাটা। তাকে এতটুকু অবস্থায় ফেলে তার মা নাকি স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল কোথায়। মাতৃস্নেহও তার কাছে একটা শব্দমাত্র। ওর অনুভূতিতে সেই চেতনার কোনো সুন্দর রূপই ফুটে ওঠেনি। সেখানেও শূন্যতার হাহাকার আর জ্বালা।

দুনিয়ার সবাই তাকে ঠকিয়েছে। তাই সেও যেন একজায়গায় নির্মম, নিষ্ঠুর। তার তুলির ভাষায় সেই নির্মম সত্যটাকে সে ফুটিয়ে চলেছে। মেয়েদের সম্বন্ধে তার ধারণা ওই একটাই। ওরা শুধুমাত্র ভোগের বস্তু। পানপাত্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরোয় আকণ্ঠ পানের পর, তাদের ফেলে দেয় মানুষ। ওরা সেই ব্যবহারই পাবার যোগ্য।

ইজেলের উপর ছবিটায় রং চাপিয়ে চলেছে মৃণাল। মুখে সিগারেট ধরানো। এক একবার চেয়ে দেখছে সেই চড়া বংগুলোর দিকে—আবার তুলিতে করে খানিকটা রং ইজেলে চাপিয়ে টানতে থাকে। বলিষ্ঠ সেই রঙের রেখাগুলো কোনো যৌবনমতী নারীর তুচ্ছ দেহটাকে প্রকাশ করে ফেলছে। ও যেন একটা মাংসপিণ্ডমাত্র। সুগঠিত সুন্দর সুঠাম।

কিন্তু তবু ওর একটা বস্তু নেই, সেটা হচ্ছে অন্তর। আজকের দিনে সে সব হারিয়ে শুধু ওই দেহসর্বস্বই হয়ে উঠেছে।

জয়ন্ত ছবিটাকে দেখে চমকে ওঠে।

—কি করছিস মৃণাল।

মৃণাল ওর কথায় মুখ তুলে চাইল—কেন? ঠিকই করছি।

জয়ন্ত বলে ওঠে—একটা শালীনতা সম্ভ্রম রুচিবোধও নেই তোর! কদর্য একটা ছবি আঁকছিস, এর সার্থকতা কি?

মৃণাল তুলি টানতে টানতে গম্ভীরভাবে বলে — তুই আগে বুঝতিস। মানুষের কাছে আজ নীতিবোধ শালীনতার কি অর্থ বল? চারিদিকে যা দেখছিস সেটা কি খুবই রুচিপূর্ণ? আমি শিল্পী সেই কুরুচিটাকেই তুলে ধরে চাবকাতে চাই ওদের সামনে। মোহ আমার নেই জয়ন্ত, তাই সত্যিকারের রূপটাকে ফোটাতে আমি চাই। তোর চোখে মোহ লেগেছে তাই সামান্য স্বার্থ আর এতটুকু পাবার কাঙালপনার জন্য সেটাকে চাপতে চাস। চেপে রেখে মিথ্যা কথা মিষ্টি করে বলে লোককে ঠকাতে চাস।

হঠাৎ সামনেই গয়াগতিকে দেখে ওরা দুজনে থেমে গেল। গয়াগতি বোধহয় এইবার যা-তা কথা বলবে। ওরা রোজই এমনি করে। হোটেলের সবাই শুয়ে পড়লে ওরা আলো জ্বেলে কাজ করে রাতভোর।

সেই ফাকটাই ধরা পড়ে গেছে বোধহয়।

গয়াগতি দেখছে ওই অর্ধসমাপ্ত ছবিটাকে। চমকে উঠেছে সে। এমনি করে কেউ আঁকতে পারে কোনো মেয়ের ছবি এটা জানত না সে। হকচকিয়ে গেছে।

গয়াগতি একটু সামলে নিয়ে গর্জন করে—রাতভোর আলো জ্বলবে, খর্চা দেবে কে?

জবাব দিল না ওরা।

গয়াগতি শাসায়—এইসব নোংরামি এইবার বন্ধই করবো। কি হচ্ছে এসব?

মৃণাল গম্ভীরভাবে জবাব দেয়—যেটা আপনাদের মনের অতলে রয়েছে, আমি সেইটাকে সত্যরূপে ফুটিয়ে তুলছি মাত্র। এটা এতটুকু মিথ্যা নয়।

গয়াগতি কথাটা শুনে চকিতের জন্য চমকে ওঠে।

—কি বললে ছোকরা? আবার আমাকেও অপমান করা হচ্ছে। আচ্ছা!

চলে গেল গয়াগতি। জয়ন্ত কলম থামিয়ে ওদের বচসা শুনছিল, বলে—দিলি তো চটিয়ে। এইবার মেন অফ্ করে দেবে।

—দিক না। দেখি ওটাকে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গযাগতি সেসব কিছুই করল না। এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির নীচে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

ঘুম আসে না।

কথাটা ভাবছে। মনের মধ্যে একটা দুঃসাহস কি অন্য প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে মাথা তুলছে।

কোথায় যেন বেড়াতে গেছে তারা। গয়াগতি আর ওই প্রমীলা সরকার। মুক্ত সবুজ মাঠ, নারকেল গাছগুলো হাওয়ায় কাঁপছে। ওদের শনশন শব্দ কানে আসে। পাখি ডাকছে।

মিষ্টি সোনারোদ পড়েছে ঘাসের ওপর--ধানক্ষেতে। কোথায় মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে। প্রমীলার হাসির শব্দ ওঠে।

হারিয়ে গেছে তারা দুজনে।

হঠাৎ কার ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল গয়াগতি ওই জীর্ণ তক্তপোশে। ঠিক বিশ্বাস করে না—স্বপ্নই দেখছে না সত্যি।

—যাবেন না? আজ স্কুলের মাঠে যাবেন বলেছিলেন।

খেযাল হয় গয়াগতির।

না স্বপ্ন নয় সত্যি। হোটেলে তার সেই জালঘেরা সিঁড়ির নীচের ঘরখানাতে শুয়েছিল সে। কলের জল পড়ার শব্দ ওঠে। বাবুরা দু-একজন উঠেছেন।

তেতলাব গদাধরবাবুর ঘর থেকে হাউমাউ করে গীতা পড়ার শব্দ কানে আসে।

—গতিবাবু!

প্রমীলা ওকে ডাকছে। এরই মধ্যে ওর স্নান হয়ে গেছে। আকাশী রঙের পাড়বিহীন শাড়ি পরনে, সাদা ফুলহাতা ব্লাউজ, মুখে তবু একটু কমনীয়তা ফুটে ওঠে।

গয়াগতি বলে—যাব।

প্রমীলা কার্ডখানা এগিয়ে দিয়ে বলে—আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব কিন্তু।

গয়াগতি ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন দেখছে ও বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। কার পায়ের শব্দে গয়াগতি মুখ তুলে চাইল। বলহরি দেখেছে ব্যাপারটা। চুপ করে চায়ের কাপ আর টোস্ট-এর প্লেটটা নামিয়ে দিল। ও যেন ওসব কিছুই দেখেনি—বোঝেওনি,ভাবখানা এইরকম আর কি!

গয়াগতি বলে—বাজারের টাকা নিয়ে গিয়ে বাজার করে আনবি। সকালে একটু কাজ আছে। বেরুব।

মাথা নাড়ে বলহরি। মনে মনে সে অবাক হয়েছে বাবুর এই পরিবর্তনে।.....মেয়েটাও তেমনি।

বলহরি কথাটা বলতে গিয়ে থামল।

গয়াগতি তখন চা পর্ব সেরে সুটকেশ খুলে ধোয়া ধুতি পাঞ্জাবি বের করছে। সেজেগুজেই বেরুবে সে। গায়ে একবার হাত বুলিয়ে শুধোয়—হ্যাঁরে, দাড়িটা খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে না? সাবান জল আনদিকি, একবার ব্লেডটা টেনে নিই। কি বল?

—হিমানী পমেটম্ আনব? বলহরি নির্বোধের মতো শুধায়।

গয়াগতি আজ ধমকায় না। হাসছে সে।

হঠাৎ হলধরবাবুকে নামতে দেখে ওর দিকে চাইল গয়াগতি। হলধর সামনের নড়বড়ে চেয়ারটায় বসে বলে—তাহলে এইবার বুঝবে গদাধর। আরে মশাই যে পরস্ত্রীর দিকে নজর দেয়, সে মহাপাপী, যতই গীতা পাঠ করুক না কেন, দেখবেন ও সহজে মুক্তি পাবে না।

হঠাৎ বলে ওঠে হলধর—আমার চিঠিপত্র আসেনি?

—কই না তো।

—নীল খামে চিঠি আসবে মশায়, দেখবেন সেগুলো যেন অন্য কারো হাতে না পড়ে। ওই গদাধর তো সেই চিঠির জন্য ওত পেতে আছে। বুঝবে এইবার কোর্টে—

হঠাৎ গদাধরবাবুকে ভারী শরীরটা নিয়ে নামতে দেখে হলধর উঠে পড়ল। ওকে এড়িয়ে থাকতে চায় সে।

গদাধর বলে—এখানে কি করছ? চল ওপরে চল। কাজের সময় ওঁকে ডিসটার্ব কর না।

গদাধরের ডাকে হলধর উঠে পড়ল চুপ করে।

গয়াগতি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।—

লোকটা এত সহজে মুক্তি দেবে তা ভাবেনি। গয়াগতি সেজেগুজে তৈরী হয়ে ছিল, এইবার বের হয়ে পড়ে।

বহুদিন পর গয়াগতি যেন জীবনের সেই সহজ সুন্দর দিকটাকে দেখতে পায়। সেটাকে সে এতকাল কাজ আর নানা ভাবনায় ভুলে গেছিল।

গাছের সবুজ প্রহরা মাঠটার চারিদিকে।

সবুজ মাঠে সাদা পোশাকপরা মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাতাসে উড়ছে ওদের লাল ফিতের ফুলগুলো। একসঙ্গে ব্যায়াম করছে তারা।

গান গাইছে।

গয়াগতি হারানো দিনগুলোকে খুঁজে পায়। প্রমীলার গলা শোনা যায়। পাড়বিহীন শাড়ি সাদা ফুলস্লিপের ব্লাউজ পায়ে কেডস্ আর সাদা মোজা পরেছে।

আজকের এই অনুষ্ঠানের সেই দলনেত্রী।

গাড়িতে করে অনেক হোমরাচোমরা এসেছেন, মহিলারাও রয়েছেন। প্রমীলা ওদের সঙ্গে হেসে কথা বলছে। গয়াগতির দেখে খুব ভালো লাগে। তারই হোটেলে থাকে প্রমীলা সরকার—দেখে মনে হয় যে সে প্রাণী এ নয়।

ভালো সোসাইটিতে ওর যাতায়াত আছে। গয়াগতিও একটা চেয়ারে বসেছে ওই প্রজাপতির মেলায়।

মৃণাল সকালেই বের হয়েছিল, একটা ছবির ব্যাপারে এক জায়গায় কথাবার্তা বলে ফিরছিল, মাঠে ওদের ভিড় দেখে সেও দাঁড়িয়েছিল। দেখছিল ওই রঙিন সাজগোজকরা বিচিত্র সমাজের জীবদের। মাপা হাসি হেসে ওরা কথা বলে।

এখানে এসেছে শুধু রূপের পসরা মেলে পুরুষের কাছে নিজেদের দাম যাচাই করতে।

হঠাৎ মৃণাল ওই সমাজের পাশে গয়াগতিকে দেখে অবাক হয়। গয়াগতি বেশ সেজেগুজেই এসেছে। দাড়ি কামানো—গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী—পরনে কাঁচি ধুতি—পায়ে চকচকে পামসু। সে দুচোখ দিয়ে কি দেখছে।

ওর দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে মাঠের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারে মৃণাল। প্রমীলা সরকার ব্যায়াম করাচ্ছে। তালে তালে উঠছে নিটোল হাত দুটো। ব্লাউজের নীচে দিয়ে নিটোল শরীরের রেখাগুলো উদগ্র হয়ে ওঠে।

মৃণাল হাসতে গিয়ে পারল না। চুপ করে সরে এল। কি একটা মূল্যবান আবিষ্কারই করেছে সে। কি ভেবে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পেন্সিল স্কেচ করতে থাকে ওদের, আরও ওই বিচিত্র দর্শকদের।

সবাই যেন খড়গোঁজা মানুষ, ওদের মনের অতলে অন্য কোনো ভাবনা নেই, একটা মাত্র বুভুক্ষাই উদগ্র হয় উঠেছে, আদিম সেই বুভুক্ষা।

কয়েকটা স্কেচ করে নিয়ে সরে পড়ল মৃণাল।

ওর চোখের সামনে মানুষের সেই একটি রূপই ধরা পড়েছে। ওরা ঠকতেও রাজী আছে, তবু সেই চিরন্তন পাপটাকে ভুলতে রাজী আছে, আদমও পারেনি। তার জন্য এই কষ্টকে মেনে নিয়েছিল সে। আজও মানুষ বারবার সেই ফাঁদেই ধরা দিয়েছে। তবু মুক্ত হতে চায়নি। সেই দুর্বলতা লোভকে ওরা ভালোবাসা নাম দিয়ে পবিত্রতার পর্যায়ে তোলবার চেষ্টাও করেছে। সব ফেরেববাজি--ভণ্ডামি।

মানুষমাত্রেই ভণ্ড। কাপুরুষ—মিথ্যাবাদী।

তাই গয়াগতিকেও আজ এখানে দেখে অখুশি হয়নি সে বরং খুশি হয়েছে সে এই ভেবে যে লোকটা এতদিন সবাইকে ঠকিয়েছে, এইবার নিজে ঠকবে--দুঃখ পাবে।

মৃণাল এগিয়ে চলে।

অফিসের ভিড় শুরু হয়েছে। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরাও চলেছে ক্লাসের দিকে। মৃণাল দিনের আলোটাকে সহ্য করতে পারে না। ওটায় তার চোখ জ্বালা করে। তাই কালো চশমা পরে সে। ওতে নিজের মনের আয়নায় ফুটে ওঠা কদর্য ছাপটাকে অন্য লোকের সামনে ঢেকে ভালোমানুষ সেজে থাকা যায়।

হঠাৎ কার ডাকে থমকে দাঁড়াল মৃণাল।

নীরা।

সেই আগেকার যৌবন মন যেন হঠাৎ সত্য হয়ে মৃণালের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। নীরার দেহে এসেছে মাংসল আভাস। সেদিনের সেই চিন্তা ভাবনা শীর্ণ মেয়েটির মনে আজ এসেছে নিশ্চিন্ততার আভাস। দেহে তাই মাংস একটু বেড়েছে। ওটা একটু বাড়ে আরামে আর তোয়াজে থাকলে। পানও খায় আজকাল—কেমন যেন গিন্নী গিন্নী ভাব ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়।

নীরা শুধোয়— কেমন আছ?

মৃণাল বেশ জানে এ প্রশ্নের জবাবের জন্য নীরার মোটেই ভাবনা নেই। ওটা শুধোতে হয়। তাই জবাব দিল না মৃণাল ওকথার। বলে—তুমি তো ভালো আছ? কত্তার ভালো চাকরি, নিজেও কাজ করছ।

হাসে নীরা।

—বাইরে অবশ্য সবাই তাই বলে। যাকগে—সেই হোটেলেই আছ তো?

—হ্যাঁ। আমাদের দিন বদলাল কই।

হাসে নীরা।

—কেন, আজকাল এত নাম করেছ। শুনেছি ছবির দামও বেশ পাও। তবে?

মৃণাল জবাব দেয়—বাইরে অবশ্য সবাই তাই বলে।

নীরা খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে।

—তেমনি দুষ্টু রয়ে গেছ তুমি, একটুও বদলাওনি। চলি।

ট্রামে উঠে গেল নীরা।

মৃণাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের কারো সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল নেই।

হাসি আসে। অনেকেই তার দিকে চেয়ে আছে।

মেয়েছেলেটিকে তার সঙ্গে সহজভাবে হেসে কথা বলতে দেখে ওরা বোধহয় হিংসা করছিল। অথচ জানে না ওরা মৃণাল ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়নি—ওদের কথা ভাববার সময় তার নেই।

টাকার দরকার। ছবি বিক্রি করতে হবে। নীরার ওই গোলগাল চেহারার ছবি একটা আঁকলে ভালো দামে বিক্রি হত। ওর ছবি এখন বোধহয় ভালো আঁকতে পারবে না সে।

ও এখন বদলে গেছে। একজনকে ভালোবেসে ঘর বেঁধেছে। সুখী হয়েছে।

জয়ন্ত ওদের জীবনেই সেই আশ্বাসভরা সত্যকে নিয়ে এই মিথ্যার মাঝে মহৎ সাহিত্য রচনা করবে।

মৃণালের জগতে ওরা বাতিল—ওদের কোনো অস্তিত্ব আর নেই।

জয়ন্ত লিখে চলেছে। ক'দিন ধরে নোতুন লেখাটা নিয়ে পড়েছে সে। একটি মেয়ের কাহিনী। চারিদিকে তার হতাশার অন্ধকার—পরাজয়ের কালিমা।

তারই মাঝে সেও হতাশ্বাস হয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল স্রোতে ভেসে যাওয়াই জীবন, তাই অনেক বেদনায় নিজেকে তিলে তিলে হত্যাই করতে বাধ্য হয়েছিল। তার মনের মধ্যে বিবেক আর লোভে দুটোর সংগ্রাম চলেছে। কোথাও আলো নেই। হঠাৎ এমনি দিনে সে একজনের নিবিড় সংস্পর্শে এল। দুটি সংগ্রামমুখর ক্লান্ত জীবন দুজনের মাঝে কি আশ্বাস খোঁজে!

এতকাল যে জ্বালাধরানো লেখা লিখেছে, তার থেকে এর স্বাদ আলাদা। তার লেখায় সেই হতাশা আর পরাজয়টাই বড় হয়ে উঠত এতকাল। হেরে যাচ্ছে—সেই হেরে যাওয়ার রাগে তার কলম যেন হুল ফোটাতে চাইত সকলের মনে। কিন্তু আজ তার মনে হয় ওটা ভুলই।

বেলা কত জানে না। লিখে চলেছে। মাঝে মাঝে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে দুচার টান টেনে একটু ভেবে নেয়, আবার লিখতে থাকে। শেডের একটা ভাঙা জানালা দিয়ে একফালি আলো লুকিয়ে এসে ঢুকেছে এই বিচিত্র ঘরখানায়। নোংরা কালি রং মাখা কাপড় লুঙ্গিও ঝুলছে দড়ির আলনায়। ওপাশে ইজেলে সেই অর্ধসমাপ্ত নগ্ন নারীমূর্তির বিকৃত রূপটা যেন ব্যঙ্গ করছে জয়ন্তকে।

জয়ন্ত তবু ওদিকে নজর দেয়নি। কাজ করে চলেছে সে।

চোখের সামনে একটি মেয়ের রূপ ফুটে ওঠে জীবন্ত হয়ে। সবকিছু থেকে—সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন সে নয়। তারই মাঝে সে নিজের রূপে নিজের সাধনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার চরিত্রের সেই বাড়িটার জন্য তাকে কল্পনা করতে হয় না। সেই ছোট্ট বাড়ি —চারিদিকে সবুজ গাছগাছালি, উঠানে গাঁদা সন্ধ্যা মালতীর ফুলগুলোকে সে দেখে এসেছে।

—তুমি!

পর্দাটা সরিয়ে ঢুকছে মিনু। হাতে বই খাতা। পরনে সাদা খোলের লালপাড় শাড়ি আর আটপৌরে লাল একটা ব্লাউজ। যেন ওই আঁধার ঘরে অতর্কিতে একঝলক আলো এসে পড়েছে।

মিনু এগিয়ে আসে। দুচোখে তার মিষ্টি হাসির আভা। বলে সে —সেদিন থেকেই নিরুদ্দেশ হলেন, তাই ভাবলাম লোকটার খবর নিই।

হাসে জয়ন্ত।

—কেন, আমার অস্তিত্বেও সন্দেহ করেছিলে নাকি? অবশ্য অনেকেই এমন করে।

মিনু ওর দিকে বেদনাহত চাহনিতে চাইল। ও জানে জয়ন্ত বোধহয় সেইদিন রেস্তোরাঁয় সেই ছেলেটির কথাই বলতে চায়।

জয়ন্ত আঘাত দিতে চায়নি। তাই বলে—যাক ওকথা। বসো। কোথায় বা বসবে—এই তক্তপোশেই বসো।

মিনু দেখছে ঘরের চারিদিক। জীর্ণ দেওয়ালে রকমারি ছবি টাঙানো। মৃণাল ঘরময় ছবি ছড়িয়ে রেখেছে।

মিনু বলে—এসব—

জয়ন্ত হাসে।—সেই বন্ধুটির আঁকা। নামকরা শিল্পী।

—আর আপনি লিখিয়ে। কিন্তু এসব করে লাভ কি বলতে পারেন? বেঁচে থাকতে হলে—

জয়ন্ত বলে—নাটবল্টু, নিদেন জানালা দরজা ইট এইসব বানাতে হবে। নিদেন কাগজের ঠোঙাই। তবু কাগজে লিখে দিন চলবে না, আর বিয়েথা করে ঘরসংসার করা তো দূরের কথা।

—বাঃ রে তাই বলেছি নাকি!

—বলোনি। তবে বলতে চেয়েছিলে।

হঠাৎ মিনুর নজর পড়ে নোতুন সেই অর্ধনগ্ন অসমাপ্ত ছবিটার দিকে। লজ্জায় ওর মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। জয়ন্ত যেন দেখেনি।

মিনু বলে—আপনার বন্ধুটি কী! ছিঃ ছিঃ!

জয়ন্ত বলে—মৃণালের সঙ্গে পরিচয় হলে খুশি হবে।

—থাক। নমুনা যা দেখেছি তাতে তার পরিচয় করার সাধ নেই। মেয়েদের সম্বন্ধে উনি কি ভাবেন?

নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রবেশ করছে মৃণাল। চটের পর্দাটাকে সেইই রঙিন করে তুলছে। সেটা এখন বিবর্ণ—ছেঁড়া। তবু ওটাই তাদের পর্দার কাজ করছে। মৃণাল ঢুকছে। সামনেই ওই মেয়েটিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে জয়ন্তের সঙ্গে গল্প করতে দেখে একটু অবাক হয়। তবু বলে—ঠিক ভাবেন তিনি। তবে আপনাদের সঙ্গে সেটা মেলে না এই যা।

মিনু ওর ওই জবাবে চুপ করে যায়। দেখছে মানুষটাকে। দীর্ঘ চেহারা, মুখে অল্প দাড়ি, পরনে ময়লা প্যান্ট হাওয়াই সার্ট, বগলে কয়েকটা কাগজের রোল।

তামাটে রোদপোড়া চেহারায় একটা ঋজুতা ফুটে ওঠে।

জয়ন্ত পরিচয় করিয়ে দেয়।

- মৃণাল, এই মিনু। আর মৃণাল আমার বন্ধু।

মৃণাল ব্যস্তভাবে ছবির তাড়ার মধ্যে থেকে কোনো একটা ছবি খুঁজছিল। খুঁজতে খুঁজতে জবাব দেয়—ওঁকে চিনি। তা এখানে এসে ভুলই করেছেন।

মিনু ওর কাঠ কাঠ কথায় একটু সচকিত হয়ে ওঠে। জয়ন্তও অপ্রস্তুত হয় ওর কথায়। মিনু প্রশ্ন করে

--কেন?

মৃণাল মুখ না তুলেই জবাব দেয়--মোহ ভেঙে যাবে। বুঝলেন, আর যাই হোক না কেন এমনি অন্নাভক্ষঃ ধনুগুণঃ অবস্থার যুবকের সঙ্গে প্রেম করা যায় না। তাই বলছিলাম— সেদিন রেস্তোরাঁয় দেখে ভেবেছিলাম শাঁসালো মক্কেল, আসলে তা মোটেই নই আমরা।

মিনুর ফরসা মুখ চোখ রাগে অপমানে রাঙা হয়ে ওঠে। ওকে এইভাবে অপমান করবে ভদ্রলোক তা ভাবতেই পারেনি।

মিনু বলে—আপনার বুঝি মেয়েদের সম্বন্ধে ওই একমাত্র ধারণা?

জয়ন্ত থামাবার চেষ্টা করে।

—ওর কথা কানে তুলোনা। মৃণাল এমনিই।

একজ্যাক্টলি! আপনি ঠিকই ধরেছেন। মৃণাল জবাব দেয় তীক্ষ্ণ হাসি হেসে। অবশ্য এর জন্য দায়ী আমি নই। যা সত্য সেইটাই বলেছি মাত্র। যাক। এসেছেন যখন তখন নিজের চোখেই সব দেখে যান। আমাদের প্রসপেক্ট কিছুই নেই বোধহয়। তা আপনি তো পড়াশোনা করেন দেখছি। মোহমুক্ত মন নিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখবেন কষ্ট পাবেন না।

জয়ন্ত ইতিমধ্যে বের হয়ে গেছে একটু চায়ের সন্ধানে। বলহরির একটা সাইড কারবার আছে। চা বিক্রি করে সে কর্তাবাবুর চোখের আড়ালে।

জয়ন্ত ওকেই কিছু পয়সা আগাম দিয়ে বলে —তিন কাপ চা আর তিনটে কেক জলদি করে কাউকে দিয়ে আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দাও বলহরিদা। চটপট।

জয়ন্ত অর্ডার দিয়েই ফিরে এসে দেখে মৃণাল আর মিনু দুজনে কথা বলছে। মিনুর মুখে নীরব একটা

রাগের ছায়া। মৃণাল ওকে আঘাত দিয়ে কথা বলেই তৃপ্তি পায়।

—জয়ন্ত লিখছে। ওর লেখা বই বিক্রি হয় না—উই-এ কাটছে। যেহেতু ও সত্য কথা বলে। জীবনের কঠিন সত্যকে প্রকাশ করতে চায়। আমি ছবি আঁকি সে ছবিও বাজারে চাহিদা নেই। কারণ ডগমগ গিন্নী নাহয় চরিত্রহীনা নারীরও লক্ষ্মীশ্রীময়ী চেহারা আঁকতে পারি না। সুতরাং এই শেডে পড়ে থাকি আর বাড়িওয়ালা বাকি ভাড়ার জন্য গলাধাক্কা দেয় সহ্য করি। জুটলে খাই, না জুটলে তেলেভাজা আর জল, ব্যাস সারাদিন ঢেকুর তুলে কাটিয়ে দিই। এরপরও প্রেম করতে গেলে ঠকানো ছাড়া রাস্তা থাকবে না। তাই বলছিলাম—

জয়ন্ত ওর কথায় অবাক হয়েছে। মৃণাল এমনি করে কথাগুলো বলবে তা ভাবতেই পারে না।

জয়ন্ত বলে—কি বলছিস যা-তা?

মৃণাল হাসে!—তোর ভালোর জন্যই বলছি।

বলহরি নিজেই চা নিয়ে ঢুকেছিল এদের ঘরে। সামনে ওই মেয়েটিকে দেখে একটু অবাক হয়। দুটো হতচ্ছাড়ার ঘরে এমনি সুন্দর ছিমছাম একটি মেয়ে আসতে পারে এটা ভাবেনি সে। হোটেলে এতকাল কাজ করছে—দেখেছে অনেককিছুই।

এই হোটেলের ঘরেই অনেক লীলাখেলা দেখেছে ওই মেয়েছেলে নিয়ে। অনেক কান্নাহাসির নাটক অভিনয় হয়ে গেছে। আজও দেখেছে প্রমীলা সরকারের ওই ব্যাকুলতায় গয়াগতিবাবুর মতো নীরস প্রাণেও রসের ঢেউ জাগে।

মৃণাল বলহরিকে দেখে অবাক হয়।

—আবার চা কেকও এনেছ দেখছি, কি রে জয়ন্ত এরই মধ্যে দমকা খরচা করে ফেললি? আজ রাতের খাওয়ার পয়সা আছে তো—না কুঁজোর জল খেয়ে ব্যোম হয়ে কলম ধরবি? অবশ্যি খালিপেটেই লেখাটা ভালো হয়।

বলহরি ওগুলো নামিয়ে চলে গেল।

জয়ন্ত কিছু বলবার আগেই মিনু উঠে দাঁড়িয়েছে। রেগে গেছে সে। বলে—থাক! ওতে দরকার নেই। এমনিই এসেছিলাম।

মৃণাল জবাব দেয়—কিন্তু এমন ব্যবহার পাবেন তা ভাবেননি এই তো? কিন্তু ওই যে বললাম এইটাই নিছক সত্য। মিথ্যা কল্পনার রং এঁকে রঙিন করে কোনো লাভ নেই। এ যুগে এই পেটের তাগিদে প্রেম স্বপ্ন সব ব্যর্থ আর মিথ্যাই হয়ে গেছে।

মিনু বইগুলো তুলে নিয়ে বের হয়ে যায়।

অপমানে তার মুখ রাঙা হয়ে গেছে। মৃণাল কেক চিবুতে চিবুতে হাসছে। --সেকি না খেয়ে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। অতিথি নারায়ণ—

জয়ন্ত ওর পিছুপিছু আসছে। --মিনু, মিনু—ওর কথায় রাগ করো না।

মিনু গজরাচ্ছে--ইতর নীচ অভদ্র, এমন জানলে সত্যিই আসতাম না।

সে দাঁড়ায় না, হনহন করে বের হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ সামনেই প্রায়ান্ধকার সরু করিডোরে একজন মোটা মতো লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে হাত থেকে বই খাতাপত্র ছিটিয়ে পড়ে যায়।

চমকে ওঠে মিনু অতর্কিতে এই ধাক্কায়।

গয়াগতিও চমকে উঠেছে।

মেয়েটি রেগে অপমানিত হয়ে আসছিল, একেবারে তার ঘাড়েই পড়েছে।

গয়াগতি ফিরছিল সেই মাঠ থেকে। তার চোখের সামনে বিচিত্র একটা জগতের রঙিন ছবি। সেই কথাই ভাবতে ভাবতে সে আসছিল।

প্রমীলাও খুশি হয়েছে তাকে দেখে। গয়াগতির মনটা হালকা—মনে হয় প্রমীলা আর সে কোনো স্বপ্ন রাজ্যে বিলীন হয়ে গেছে। কলকাতার এই একঘেয়েমির জীবন থেকে বের হয়ে যাবে তারা একদিনের জন্য।

হঠাৎ সামনে ওই মেয়েটি এসে পড়তে দেখে হকচকিয়ে যায়। মেয়েটি রাগে অপমানে যেন ভেঙে পড়বে। জয়ন্ত এসে পড়েছে। গয়াগতির ম্যানেজারসুলভ সেই স্বভাবটা এইবার জেগে ওঠে।

—কি ব্যাপার?

মিনু সামনে ওই মোটা লোকটির ঘাড়ে পড়েছিল, জয়ন্ত হেঁট হয়ে বই খাতাগুলো কুড়োচ্ছে।

গয়াগতি বলে—কে হন উনি?

মেয়েটিই জয়ন্তকে দেখিয়ে বলে আমতা আমতা করে —মানে—আমার আত্মীয়।

গয়াগতি কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। ওই হতচ্ছাড়াদের তিনকুলে কেউ আছে বলে এতকাল সংবাদ পায়নি। আজ এমনি একটি মেয়েকে আসতে দেখে অবাক হয়। তাছাড়া ওদের মধ্যে একটা মানঅভিমানের কিছু ঘটেছে সেটাও জানতে বাকি থাকে না তার।

গয়াগতি শুধোয়—আত্মীয়! হন না হবেন?

মিনু জবাব দিল না। হেঁট হয়ে বইগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বের হয়ে গেল। জয়ন্তও বাকি বইগুলো নিয়ে ওর পিছুপিছু চলেছে ট্রাম লাইন অবধি।

মিনু রাগে জ্বলে উঠেছে।

জয়ন্ত বলে—ও অমনিই। ননসেন্স! তবে মনের দিক থেকে এত খারাপ ও নয়। একটু পাগলামিই বলতে পারো।

মিনু বলে—ওই পাগলের সঙ্গে বাস করেন কি করে? নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এখানে পড়ে আছেন তা বুঝতে পেরেছি। ছিঃ ছিঃ এমন জানলে এখানে আসতাম না।

জয়ন্তও নিজে আজ অপমানিত বোধ করে মৃণালের ব্যবহারে।

—সত্যি আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিনু। তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ নেই এরপর।

মিনু জয়ন্তর অসহায় অবস্থাটা কল্পনা করে নিজেও লজ্জা পায়। এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারত। জয়ন্তের দিকে চেয়ে থাকে সে।

জয়ন্ত বলে— এমন জানলে তোমাকে আসতে বলতাম না।

মিনু বলে—এইখানে টিকে আছেন কি করে জানি না। তবে মনে হয় এখানে থাকলে আপনার স্বাধীন চিন্তাধারাও বিকৃত হয়ে উঠবে।

কথাটা জয়ন্তও ভেবেছে, কিন্তু এত নিবিড়ভাবে এতদিন ভাবেনি।

জয়ন্ত বলে—তোমাদের ওখানে একদিন যাব ছুটির দিন।

ও যেন যাবার জন্য অনুমতি চাইছে। মিনুর মনের মেঘ কেটে গেছে। কালো মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের মিষ্টি আলোর মতো একটু হাসি জেগে ওঠে।

জয়ন্ত ওই হাসিটুকু দেখে আশ্বাস পায়। মিনু বলে—আসবেন।

একটু থেমে বলে মিনু তার নিজের কথাটা।

—আপনি হয়তো দুঃখ পাবেন, কিন্তু আপনার বন্ধুটিকে এ আঘাত দিতে বাধ্য হয়েছি আমি। ওঁর ধারণাগুলো যে মিথ্যা এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম।

জয়ন্ত খুশি হয় মনে মনে।

তার কাছে এটাই বড় বলে বোধ হয়। এত দুঃখ অপমানের মধ্যে মানুষ সামান্য পেয়ে খুশি হতে চায়। এটা তার মোহ—দুর্বলতা নয়।

তার স্বভাবজাত মাধুর্যই বলা চলে একে। এই আশ্বাস নিয়েই সে চলেছে জীবনের ব্যর্থ বন্ধুর পথে।

ট্রাম আসছে। জয়ন্ত ওকে তুলে দিল।

মিষ্টি একটু হাসি মিনুর হালকা ঠোঁটদুটোকে রাঙিয়ে তোলে।

—আসবেন কিন্তু।

ওর নিটোল হাতটা একবার নড়ে ওঠে কি বিচিত্র ছন্দে।

জয়ন্ত এতদিন কথাটা মনে মনে ভেবেছে। লেখার বাজারে তার নাম হয়েছে। কিন্তু মৃণালের মতো জ্বালা ভরা মন নিয়ে এতদিন লিখেছে। কোথাও কোনো সত্য কোনো আদর্শকে সে বিশ্বাস করেনি। তাই তার লেখাও জোরালোই হয়েছে কিন্তু মন ছোঁয়নি পাঠকসমাজের। কোথায় একটা খামতি রয়ে গেছে।

আজ মনে হয় তার জন্য নিজের মনের ওই হাহাকারটাই দায়ী। মৃণালের সঙ্গ তার সান্নিধ্যই তাকে বারবার এই পথে যেতে বাধ্য করিয়েছে। আজ তাকে সহ্য করতে পারে না। বাস্তব জীবনে মৃণালও অনেক নীচই। নইলে ঘরে পেয়ে একটি মেয়েকে এভাবে অপমান করতে সাহসী হত না। তার কারণ জয়ন্তকে তার ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই জয়ন্তের সব মনোবৃত্তি দৃষ্টিকোণকে সে প্রভাবিত করতে চায়, তার ব্যক্তিগত জীবনেও ছায়াপাত করে সব ঔজ্জ্বল্য সব শান্তিকে বিঘ্নিত করে তুলতে চায়।

আজ ওর ব্যবহার জয়ন্তের কাছে জ্বালাকর অস্বস্তিকর বলেই মনে হয়। মিনুও সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

একটা পথের সন্ধান করছে জয়ন্ত, সেটা হবে তার নিজস্ব পথ, তার জন্য চাই একটু নির্ভর—একটু শান্তিপূর্ণ আশ্রয়। কারও নিবিড় সান্নিধ্য আর আশ্বাস।

এখানের ওই অনিশ্চিত জীবনে তার যেন অশ্রদ্ধা এসে গেছে।

ঢুকছে হোটেলে এইসব ভাবতে ভাবতে। ভালো লাগে না তার। মিনু এসেছিল—

—এই যে! শোনো, ইদিকে শোনো!

জয়ন্ত দাঁড়াল। ওকে ডাকছে গয়াগতি। জয়ন্ত কি ভেবে এগিয়ে যায়।

গয়াগতি দেখেছে সব ব্যাপারটা। মেয়েটিকে তার ভালো লাগে। শান্ত সুন্দর একটি মেয়ে। কিন্তু তাকে এদের পাল্লায় পড়তে দেখে গয়াগতি মেয়েটির জন্য দুঃখবোধ করে। ওর বরাত মন্দ। ছেলেদুটো তাকে ঠকাবেই। আজই তার সূত্রপাত হয়ে গেছে।

মেয়েটিকেই সাবধান করে দিত গয়াগতি আজই। কিন্তু সময় পায়নি। তাই আজ জয়ন্তকে সে সাবধান করে দিতে চায়। জয়ন্তের দিকে চেয়ে থাকে গযাগতি লাল দুটো চোখ মেলে। বলে ওঠে কঠিন কণ্ঠে—ক্যান্দিন এসব নাটক চলছে? এই প্রেম প্রেম খেলা?

জয়ন্ত অবাক হয়।—কি বলছেন এসব?

—ঠিকই বলছি। ভাবে কিছু বুঝি না। সাহিত্য কবিতা লেখা হচ্ছে আর উনি ছবি আঁকছেন। মাথা কিনে নিয়েছেন আর কি! শেষ কথা বলছি—ফের যদি এইসব লটঘট ব্যাপার এখানে ঘটতে দেখি একেবারে ঢাকী ঢুলী বেসজ্জন করে দেব, বুঝলে। রক্ষে রাখব না। সেদিন চিনবে গয়াগতিকে।

জয়ন্ত বলার চেষ্টা করে।

—আমার আত্মীয়স্বজন কেউ আসবে না?

—আত্মীয় তিনকুলে তোমার কে আছে হে? চালচুলো নেই, একটা পয়সা রোজগার কবার মুরোদ নেই, আবার নষ্টামি আছে। সাবধান করে দিলাম।

জয়ন্ত আজ চুপ করেই ওর কথাগুলো শুনছিল, জবাব দেবার সাধ্য তার নেই। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলেই বোধ হয়। মৃণালও মিনুকে অপমানই করেছে। গয়াগতিও করতো, কিন্তু মিনুকে সামনে পায়নি, তাই তাকেই অপমান করে শোধ তুলতে চায়।

আজ নিজের এই অসহায় অবস্থাটা তাকে সবচেয়ে বেশি বেদনা দেয়। তার যেন কোনো কিছু পাবাব অধিকার নেই।

চুপ করে ঘরে ফিরে গেল জয়ন্ত। আলো থেকে বাতাস থেকে ফিরে গেল গুমোট সেই অন্ধকার শেডের মধ্যে। মৃণাল সেই অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবিতে রং চাপাচ্ছিল, কদর্য দেহটা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, ওকে ঢুকতে দেখে হেসে ওঠে মৃণাল। কঠিন - ব্যঙ্গের হাসিই।

জয়ন্ত বেদনাহত চোখ তুলে ওর দিকে চাইল।

মৃণাল বলে—খুব এক্‌টো করে এলি তাহলে? প্রেমনিবেদন—এ্যাঁ।

—মৃণাল!

জয়ন্ত ওর হাসি থামাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মৃণাল হাসছে। টিনের শেডে ওর হাসিটা ধ্বনিপ্রতিধ্বনি তোলে।

—ওই গয়াগতি কি বলছিল? উপদেশ দিচ্ছিল তোকে? দ্যাখ—তাহলে অন্যায় করিসনি তুই? ওর চোখেও ঠেকেছে ব্যাপারটা।

মৃণাল বিজ্ঞের মতো বলে—ওদের বিশ্বাস করিস না, ঠকবি। তার চেয়ে নিজের কাজ কর—আর স্রেফ জীবনটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে যা। জীবন—বাঁচার অর্থ—মানবিকতা—রেনেসাঁর কালে ছিল এসব চিত্তবিলাস থাকা সম্ভব। এখন?

ধোঁয়া ছেড়ে কাগজের বান্ডিলের মধ্যে থেকে একটা বোতল বের করে। মদ খায় মৃণাল, তবে ইদানীং ওটা বেড়েছে। একটা গ্লাসে ঢেলে জয়ন্তর দিকে এগিয়ে দেয় বোতলটা।

—দু'ঢোক গেল, দেখবি সব সাফ্ হয়ে গেছে। বিবেকটিবেক ওই ধ্যানেশ্বরীতে ডুবিয়ে দে, দেখবি সব ফালতু রং ধুয়ে মুছে গেছে। ভোগ করে নে। বুঝলি—

—মৃণাল!

জয়ন্ত চীৎকার করে ওঠে। মৃণাল হাসছে।

—সেন্টিমেন্টাল ফুল। ইডিয়ট।

কোথাও কোনো আশ্বাস নেই। চারিদিকে ওই শূন্যতার জ্বালা। জয়ন্তর মনে হয় মানুষ যেন মরছে। ধুঁকছে চারিদিকে। মনের সব সৌন্দর্য ভাবনা মুছে গেছে। জয়ন্ত যেন হেরে যাচ্ছে। সব ধারণা যখন এমনি করে চুরমার হয়ে যায় মানুষ তখন কোনও পথের সন্ধান পায় না। এদিকে ওদিকে ঘুরে মরে লক্ষ্যভ্রষ্ট পথহারা নৌকার মতো, চারিদিকে তার উত্তাল সমুদ্র।

জয়ন্ত নিজেকেও আজ মনে করে ওদের সকলেরই সে বোঝা। এই অসহায় অবস্থাটা সে পার হতে চায়, বাঁচতে তাকে হবেই। আজ ওই অনিশ্চিত জীবনের পথ ছেড়ে সে নোতুন পথে চলবে।

কি ভেবে কাগজের অফিসেই যায়।

সহকারী সম্পাদক ভদ্রলোক তার পরিচিত। তার লেখারও ভক্ত। তিনিই বলেছিলেন তাকে কাগজে চাকরির কথা। সুবিনয়বাবুর কাছে সেদিন কথা দিতে পারেনি জয়ন্ত ওই মৃণালের জন্য।

মৃণালই ব্যঙ্গের স্বরে বলেছিল—তবে আর কি—রিপোর্টারের চাকরি পাবি, পার্টিতে যাবি—একটু দ্রবটবা গিলতে শেখ এখন থেকেই। দীক্ষাটা বরং আমিই দিই তোকে। এরপর যা বেরুবে কলম দিয়ে তাইই সাহিত্য হবে। গাড়ি বাড়িও হবে, ভাবনা কি, ঝুলে পড়।

মৃণালের কথাবার্তাগুলো যে কত বাজে আর অন্তঃসারশূন্য সেই কথা এবার বুঝছে জয়ন্ত। তাই মনস্থির করেই ফেলেছে।

দুপুরের রোদে রাস্তার পিচ গলছে। বাতাসেও বেশ গরম একটা ভাব। ওর চারিপাশে ওই হৃদয়হীনতার ওমনি জ্বালা। জয়ন্ত তারই মধ্যে দিয়ে কাগজের অপিসের ঠান্ডা হাওয়াময় বাড়িটায় ঢুকল। লিফ্‌টে করে উপরে উঠে চলেছে সুবিনয়বাবুর ঘরের দিকে।

এয়ার-কুলার লাগানো ঘর। ঝকঝকে আলো জ্বলছে। এখানের বাতাস হিমেল, স্নিগ্ধকর। জয়ন্তের জ্বালাভরা মন এইবার ঠান্ডা জল খেয়ে একটু বসে জয়ন্ত কথাটা পাড়ে।

—আপনার কথাটা ভেবে দেখলাম সুবিনয়দা—

সুবিনয়বাবু জয়ন্তকে ভালোবাসেন। ওর লেখার উপর আস্থা আছে তাঁর। তাই সুবিনয়বাবুও চেয়েছিলেন জয়ন্তকে টিকে থাকার মতো একটা ব্যবস্থা করে দিতে, তাহলে বোধহয় একটু নিশ্চিন্তে জয়ন্ত

লেখাপড়া করতে পারবে।

ওই বিক্ষুব্ধ মন আর ভুলের মাসুল দিয়ে দিয়ে আর যাইই করা যাক না কেন সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনিও জানেন জয়ন্তের সেই বন্ধুটিকে। তাই জয়ন্তকে নিজে সেদিন কথাটা বলেছিলেন। জয়ন্ত তখন কোনো উত্তর দেয়নি।

আজ ওকে এই অবস্থায় আসতে দেখে সুবিনয়বাবু চুপ করে ওর কথাগুলো শোনেন। নিজের ভুল নিজে বুঝে তবে জয়ন্ত তার পথ ঠিক করে নিক।

জয়ন্ত বলে—ভেবে দেখলাম লেখার উপর নির্ভর করলে লেখার জাত নষ্ট হয়ে যায়। সেদিন ঠিকই বলেছিলেন আপনি। যদি কাজটা পাই আমি করতে রাজী আছি সুবিনয়দা।

সুবিনয়বাবু হাসলেন। আঙুলের ডগে বাজার-এর বেল টিপতে বেয়ারা আসে।

—দুটো টোস্ট আর আমাদের দুজনের জন্য চা আনো।

সুবিনয়বাবু খুশি হন। বলেন—একটা দায়িত্ব থাকলে সব কাজই মন দিয়ে করে মানুষ। তাছাড়া সাহিত্যের উপর নির্ভর না করে তোমার খুশিমতো কাজ করে যাও। এ চাকরিতেও সাহিত্যের অনেক খোরাক তুমি পাবে। সেটাও কাজে লাগবে। জীবনের অনেক দিক তোমার চোখের সামনে নোতুন করে ফুটে উঠবে। দরখাস্তখানা দিয়ে যাও। ওটা একটা ফর্মাল ব্যাপার। সামনের মাস থেকেই লেগে যাও।

জয়ন্ত তবু নিশ্চিন্ত হয়।

আজ তার নিজের জন্য ভাবতে হবে না। মৃণালের ওই কথাগুলোও শুনতে হবে না। গয়াগতির নাকের উপর টাকাটা ফেলে দেব, তখন গয়াগতি কিরকমভাবে হাঁ করে তার দিকে চেয়ে থাকবে সেই কথাটা ভাবছে সে।

সুবিনয়বাবু বলেন—এর মধ্যে দু-একবার এসে মনুবাবুর কাছ থেকে কাজকর্মের ধারাটা বুঝে নিও। ও তোমার অসুবিধে হবে না। লেখার জোর থাকলে সব খবরই সাহিত্য হয়ে উঠবে।

বৈকাল নেমেছে। নীচতলার প্রেসে কর্মব্যস্ততা শুরু হয়। বড় বড় মেসিনগুলো চলছে। প্রুফ নিয়ে কর্মচারীরা যাতায়াত করছে। জয়ন্ত ওই কর্মব্যস্ত জীবনেরই শরিক হতে চলেছে।

দু-একজন চেনা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও দেখা হয়ে যায়। খবরটা ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে। খুশি হয়েছে অনেকেই। তারাও আশ্বাস দেয়।—চলে আয়। সব ঠিক হয়ে যাবে।

জয়ন্ত হালকা মন নিয়ে পথে নামে। ওই জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় ও নিশ্চয়ই ভুল করেনি, ভালোই করেছে। এমনি করে দুর্বার একটা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকা যায় না।

গয়াগতির চোখের সামনে সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে। কেমন যেন চেনা চেনা মুখ। মিষ্টি চেহারা। একনজর দেখেই ওর ভুল হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি দাঁড়ায়নি। ওদের ব্যবহারে জ্বলে পুড়ে পালিয়ে গেছে।

—কি ভাবছেন?

ঢুকছে প্রমীলা সরকার। সকালের দেখা সেই মেয়েটিকে এখন আর চেনা যায় না। একটা রঙিন শাড়ি পরেছে—ব্লাউজটার রংও তেমনি। মুখে পাউডারের প্রলেপ। গয়াগতি ওর দিকে চাইল। মেয়েটি বসে পড়ে ওর সামনে।

—কেমন দেখলেন বলুন সকালের ফাংশান।

হাসে গয়াগতি।—চমৎকার!

প্রমীলা বলে চলেছে—বুঝলেন, একাই সব ম্যানেজ করতে হয় কিনা! মিঃ দত্ত, ডি-এম, আলিপুর আমার খুব চেনা। তিনিও এসেছিলেন। মিঃ দুধোচমল চামেরিয়া,কোলপ্রিন্স, তিনি নিজে প্রিসাইড করলেন। আমাকে খুব স্নেহ করেন। মিঃ তরফদার, আয়রন মার্চেন্ট, ওই যে কথা বলছিলেন —রোটারিয়ান মিঃ বাসু, চেইন অব ইনডাস্ট্রি করেন, তিনিও এসেছিলেন। ওঁরা আমায় খুব ভালোবাসেন, লাইক এনিথিং।

উনিই বলেন—এসব সামান্য চাকরি করে কি হবে পলি, ভালো হোটেল কর, লাকসারি হোটেল—আমি ব্যাক করব। উনি আবার আমাকে আদর করে পলি বলে ডাকেন।

গয়াগতি কথাটা ভাবছে। কিছুটা ওই সমাজের পরিচয় পেয়েছে সে।

বলহরি চা নিয়ে আসছিল, তাকেই ধমকে ওঠে গয়াগতি—এক কাপ চা আনলি যে, দেখছিস না উনি আছেন। একা চা খাব?

বলহরি একটু অবাক হয়ে জবাব দেয়—এতকাল তাই তো খেতেন, এখন যে দুজনে খাবেন একত্রে তা তো জানতাম না। আনছি তাহলে—

প্রমীলা সরকার মুখ টিপে হাসছে। আজ রাতারাতি তার সম্মান বেড়ে গেছে। প্রমীলা বলে—একদিন চলুন, ঘুরে আসি। দিনরাত কাজ আর কাজ নিয়ে আছেন কি করে? একটু রিক্রিয়েশন তো চাই।

গয়াগতিও ভাবছে কথাটা।

ওকে হাতে রাখলে সে এই হোটেলের হাল বদলে দিতে পারবে। কিছু রদবদল করে একেই ডিলাক্স হোটেল বলে চালাবে। প্রমীলার কথায় জবাব দেয় গয়াগতি—তাই ভাবছি।

প্রমীলা শোনায়--দু-একটা ভালো হোটেলের বিধিব্যবস্থা ম্যানেজমেন্টও দেখে নিন। ট্যুরিস্ট লজের হোটেলের কেতা—ঘর সাজানো—এসব না হয় দেখে আসবেন। কাছে তো অশোকা হোটেল রয়েছে ডায়মন্ডহারবারে। নাইস প্লেস—বিরাট নদী।

বলহরি চা দু'কাপ এনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল, চলে সে ঠিক যায়নি, একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুনছে ওদের কথাগুলো। মেয়েটাকে তার ভালো লাগে না। চালবাজ আর তম্বিহাম্বি সার ওর। গয়াগতিকে হাঁ করে বসে ওর কথা শুনতে দেখে বলহরি মনে মনে চটে উঠছে।

আপাতত কিছু না বলে সরে এল সে।

সিঁড়িতে হলধর একগাদা কাগজপত্র বগলে করে তুলছিল। বেশ চড়া গলায় সে বলে—দিলাম স্যার। এইবার বুঝবেন কোর্টে। ওই ভোটকা গদাধর কিনা আমার স্ত্রীকে ফুসলে নিয় যাবে এত বড় সাহস তার। নাহয় কারবার ডকেই উঠেছে, বিজনেস ডুবে গেল, ঘরসংসারও ডুবিয়ে দিবি?

হঠাৎ ওপাশে প্রমীলাকে বসে থাকতে দেখে হলধর থেমে গেল। দু'হাত তুলে নমস্কার জানায় পরিচিতের মতোই।

প্রমীলা মুখ ফিরিয়ে বসল, ওর নমস্কারে সাড়াই দিল না। হলধর আমতা আমতা করে।

—রাগ করেছেন ম্যাডাম? ভেরি স্যরি—

প্রমীলা বলে—এখন কাজের কথা বলছি,আপনি আসুন।

হলধর ধমক খেয়ে উঠল। বলে—কাজের কথা তো প্রায়ই অনেকের সঙ্গেই বলেন। তা কাজ কিছু গোছাতে পারলেন কি? চলি—হ্যাঁ, গদাধরের সঙ্গে একটু কাজের কথা বলতে পারেন।

গয়াগতি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। তবু হলধরকেই সে ধমকায়।—আপনি এখন যান।

—তা যাচ্ছি। তবে দেখবেন আপনাকেও যেন কোর্টঘরে যেতে না হয়।

গয়াগতি নিজমূর্তি ধরে।

—কি বললেন? আদালত দেখাচ্ছেন আমাকে? আপনি পাগল নাকি?

হলধর হাসছে, বিচিত্র সে হাসি। বলে—ছিলাম না, তবে হয়ে গেছি বোধহয়। কারণ কি জানেন? ওই কাজের কথা ঠিক শুনতে পারিনি কিনা—তাই। চলি। নমস্কার স্যার ম্যাডাম বোথ।

লোকটা চলে যেতে প্রমীলা যেন রাগে ফেটে পড়ে। —ওই সব ননসেন্স লোককে হোটেলে থাকতে দিয়েছেন আপনি? দূর করতে পারেন না?

প্রমীলার সেই মিষ্টি স্বভাবের রেশটুকু মুছে গেছে। গয়াগতি ওকে খুশি করতে পারলে যেন নিজেকে ধন্য মনে করবে। তাই বলে—চলো, কালই ঘুরে আসি একটু।

প্রমীলা কি ভাবছে। তার মুখের সেই কালো ছায়াটা সরে যায় ধীরে ধীরে। আবার খুশির আভাস ফুটে ওঠে।

—সত্যি।

প্রমীলা উঠে গেছে নিজের ঘরে। গয়াগতির মনে তখনও একটা মিষ্টি আমেজ ফুটে ওঠে। বলহরিকে সিঁড়ির নীচে একফালি আলোর নীচে বসে নিবিষ্টমনে কি একটা ছোট বই দেখতে দেখে এগিয়ে যায়।

—কি রে? হিসাবের খাতা?

চমকে ওঠে গয়াগতি ওর হাতে সেই রেসের ঘোড়া আঁকা বই দেখে।

—এ্যাঁ! ব্যাটা মরবি এইবার! ঘোড়ারোগ ধরেছে তোর?

বলহরি মুখ তুলে চাইল। জবাব দেয়—তা আজ্ঞে, যদি আপনারই মতিভ্রম হয় আমি তো কুন ছার। হোটেল তো লাটে উঠবে এবার তাই ভাবছি ঘোড়ার বাজিতেই যদি মবলক কিছু মেলে!

গয়াগতি বলহরির কথাটা শুনে চমকে ওঠে। বুড়ো লোকটা যেন একটা সত্যি কথাই বলেছে। এতকাল গয়াগতির এসব ভাবনাই ছিল না। হঠাৎ হোটেলের একজন মহিলাকে নিয়ে তার এই মেতে ওঠার ব্যাপারটা অনেকেরই নজরে পড়েছে।

গয়াগতি তবু সহজ হবার চেষ্টা করে। পয়সার দিক থেকে সে খুব হিসেবি। ওসব বাজে খরচা সে করবে না। তাই বলে—থামদিকি বলা। জাপানে ছুঁচ বিকোতে এসেছিস। যা, বাবুদের খাবার ঠাঁই করতে বল। রাত হয়েছে।

বলহরি চলে গেল। গয়াগতি কি ভাবছে।

হঠাৎ গদাধরকে আসতে দেখে ওর দিকে চাইল গয়াগতি। হলধর বোধহয় উপরে গিয়ে ওকে বলেছে কিছু। গয়াগতি মনে মনে তৈরি হয়ে নিয়েছে।

গদাধর টুলের ওপর বসে বলে—হলধর কি সব বলে গেছে শুনলাম!

গয়াগতি বলে—একজন বোর্ডার মহিলাকে—

গদাধর বলে—ওর কথা ছেড়ে দিন মশায়। চালু কারবার ডুবে যাবার পর থেকেই এইসব পাগলামি শুরু হয়েছে। তাছাড়া মানে ফ্যামিলি লাইফেও খুব অসুখী। এখানে এসেছে যদি একটা মীমাংসা কিছু হয়। কিন্তু রোগ ওর বেড়েই গেছে।

গদাধরবাবুর কথাগুলো শুনেছে গয়াগতি। কোথায় একটা দুঃখ রয়ে গেছে তার জীবনে। তাই হয়তো এই জ্বালা।

গয়াগতির জীবনেও এমনি একটা ক্ষত রয়ে গেছে। সেটাকে ভুলতে চেয়েছে সে বারবার। প্রমীলা সরকারকে তাই হয়তো ভালো লাগে। রাতের অন্ধকারে সেই হতাশাময় জীবনটা আরও বেদনাময় বলেই বোধ হয়। তাই হয়তো বাঁচার আশ্বাস খোঁজে।

দুপুরে সেই মেয়েটির মুখখানা মনে পড়ে। অন্ধকারের মধ্যে যেন একটু আলোর সন্ধান আনে সেই চকিত চাহনিটুকু।

মৃণাল একটু অবাক হয়েছে। সেই দুপুরে বের হয়ে গেছে জয়ন্ত না খেয়ে এখনও ফেরেনি। মৃণাল আজ যা-তাই বলেছে। মেয়েটিকে দেখে কেমন অবাক হয়েছিল মৃণাল। জয়ন্তের মনের সেই দুর্বলতাটা তার চোখের ওপর ফুটে উঠেছিল। মৃণাল এই ছলনা সহ্য করতে পারেনি।

তাই বলে জয়ন্ত বের হয়ে যাবে তখুনিই ভাবেনি মৃণাল। দুপুরের খাবার পয়সাও বোধহয় ওর কাছ নেই। ও ভয়ানক সেন্টিমেন্টাল। ঠুনকো এই ভাবনা নিয়ে ওরা ফেনিয়ে সাতপাতার গল্পই লিখে ফেলে। ওয়ার্থলেস ওই জীবগুলো!

মৃণাল একবার বৈকালে বের হয়েছিল। কাজের মধ্যে কাজ ওই কফি হাউসে আড্ডা জমানো। টেবিলে কয়েকজন ঘিরে বসে সিগ্রেট ওড়ায় আর কপি গেলে, সেই সঙ্গে সবকিছুকে ধূলিসাৎ করে দেয় তাদের চীৎকারে।

জয়ন্ত তখনও ফেরেনি। একা শূন্য শেডটায় ফিরে কাজ করবার চেষ্টা করে সে।

গয়াগতিকে আসতে দেখে একটু অবাক হয় মৃণাল। গয়াগতি বলে—কই জয়ন্ত ফেরেনি?

—না।

গয়াগতি শুধোয়—সেই মেয়েটিকে চেনো? দুপুরে এসেছিল?

মৃণাল অবাক হয়। —মেয়েছেলে? এখানে?

উঠে গিয়ে ইজেলের সেই ক্যানভাসে ঢাকা কাপড়টা খুলে দিতেই সেই বর্ণোজ্জ্বল নগ্ন মেয়েটির ছবিটা ফুটে ওঠে। চমকে উঠেছে গয়াগতি।

—রামো চন্দর! এই সব আঁকো তুমি! বাঃ! আছো বেশ।

মৃণাল হাসে।

—একজন কায়া নিয়ে আছে, আর আমি আছি ছবি নিয়ে, আর শ্রীগয়াগতি দে আছেন স্বপ্ন নিয়ে। এ্যাঃ— শুধুহাতে কেউ বসে নেই। যে যেভাবে পারছে মজা লুটছে। ..... চলবে?

কাগজের তলা থেকে একটা বোতল টেনে বের করে।

গয়াগতি গর্জন করে—মজা দেখাব এইবার। পুলিসে খবর দোব। এটা ভদ্রলোকের থাকার জায়গা, বদ্‌নেশার ঠাঁই এ নয়! সেই হতভাগা এলে পাঠিয়ে দিও।

বের হয়ে গেল গয়াগতি। সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে তার ওদের ব্যবহারে। এর একটা হেস্তনেস্ত করবে সে।

নিধিরামবাবু ট্যাক্সি থেকে নেমে ভিতরে আসছে। একজন লোক পিছনে ওষুধের বাক্স ক'টা আনছে। গয়াগতিবাবু ওকে সামনে দেখেই বলে—পাপ এইবার বিদেয় করবো নিধিবাবু। জায়গা আপনি পাবেন। তবে সেলামী কিছু দিতে হবে। মানে—একটু কৌশলেই তুলব কিনা, খর্চার ব্যাপার আছে।

নিধিরামবাবু অখুশি হয়নি। সেও চেয়েছিল এইটে। মাঝে মাঝে মালপত্র তাকে এখানেও আনতে হয়। তাই গয়াগতির কথায় বলে—তাতেও রাজী আছি মশায়। দিন ঘরখানা। হ্যাঁ—আমার ঘরে আর জায়গা নেই। এই পেটি দুটো নিচে আপনার ঘরে একটু রাখব। কালই চলে যাবে।

গয়াগতিবাবু ওকে চটাতে পারে না। তাই রাজী হয়।

বেশ তো রাখুন।

গয়াগতি মনে মনে ওদের তাড়াবার কথা ভাবছে।

এত ভাবনার মধ্যেও আগামীকালের সেই কথাগুলো মনে পড়ে। সে আর প্রমীলা দুজনে বাইরে যাবে। কতকাল কলকাতার বাইরে যায়নি—আজ সেই কথাটা মনে পড়ে।

ভালো লাগে, প্রমীলার বয়স হলেও তার মনের সেই মাধুর্যটুকু হারায়নি।

জয়ন্ত আজ পথ পেয়েছে।

বৈকালে কাগজের অপিস থেকে বের হয়ে একজনের কথাই মনে পড়ে বারবার। মিনুকে আজ অপমান করেছে মৃণাল। জয়ন্ত সেই অপমানের কোনো প্রতিকার করতে পারেনি তখন।

আজ সে তার মত-পথ-ধারণা সব বদলেছে। মিনুর জন্যেই এই পথ নিয়েছে সে। এই সুখবরটা মিনুকে জানাত পারলে সবচেয়ে খুশি হবে সে।

তাই ওখানেই যেতে মন চায়।

বাসগুলোতে যাত্রী ধরবার ঠাঁই নেই। ওরই মধ্যে তবু ঠেলেঠুলে উঠল জয়ন্ত। কার পা মাড়িয়েছে, কাকে ঠেলা দিয়েছে অন্যায়ভাবে, কাকে ধাক্কা মেরেছে নানা অভিযোগ ওঠে। সে আজ ওসব সহ্য করবে আরও সকলের মতো। তাই চুপ করেই থাকে। বাসটা ছুটে চলেছে।

মিনু বাড়ি ফিরেছে একটু দেরি করেই। দুপুরের রোদ ফাঁকা রাস্তায় শূন্যতা এনেছে। গাছগুলোর পাতা সব বিবর্ণপ্রায়। মা মিনুকে দেরি করে ফিরতে দেখে শুধোয়—এত দেরি কেন রে?

মেয়ের জন্য মায়ের ভাবনার শেষ নেই। ওই এক মেয়ে তার অবলম্বন। এতবড় পৃথিবীতে সব তার

যেন হারিয়ে গেছে। এয়োতির চিহ্ন ধারণ করে সে কিন্তু স্বামীর সংবাদ জানে না। অনেকদিন আগেই সেই মানুষটাও হারিয়ে গেছে।

মিনু মায়ের এই উৎকণ্ঠা আর দুঃখটা বোধহয় বোঝে না। তাই মায়ের এই ব্যগ্র কণ্ঠস্বরে সে বিরক্তই হয়। তাছাড়া আজ দুপুরের ঘটনাটা তার মনে বিরাট একটা আলোড়ন এনেছে। মিনু অনেক আশা নিয়ে জয়ন্তের ওখানে গিয়েছিল। কিন্তু এভাবে অপমানিত হয়ে আসবে তা ভাবেনি। সেই লোকটা যা-তা বলেছিল, জয়ন্তের প্রতিবাদেও কান দেয়নি সে। তার স্বপ্ন কামনা কি নিষ্ঠুর আঘাতে খানখান হয়ে গেছে। কান্না আসে।

মায়ের ডাকে নিজের ঘর থেকে জবাব দেয়--শরীরটা ভালো নেই। মাথা ধরেছে।

মায়ের মন ব্যাকুল হয়।— যা রোদ পড়েছে, তার মধ্যে এতখানি রাস্তা আসিস। একটু জিরিয়ে নিয়ে স্নান কর, ভালো লাগবে।

মিনু জবাব দিল না।

মাকে এসব কথা বলা যায় না। তার আজ খিদে তেষ্টাও নেই। সবকিছু তার সামনে আজ বিষিয়ে উঠেছে। গুমরে কাঁদতে ইচ্ছে করে। রাগ হয়। সেই লোকটার কথার জবাব দিয়ে আসতে পারেনি। চুপ করে সব আঘাত সহ্য করে এসেছে। অসহায় রাগে ফুলছে সে।

দুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামে। সুবাসিনী মেয়ের ঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখে চুপ করে শুয়ে আছে মিনু।

মায়ের মনে হয় শরীর খারাপ ওর একটা অজুহাত। একটা কিছু হয়েছে যেটা মিনু মাকেও জানাতে চায় না।

—চা খাবি না?

মিনু জবাব দিল না। ওর সারা মনে কি তোলপাড় চলেছে। জীবনে সে দু-একজন ছেলের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু ঠকেই ফিরে এসেছে বারবার। কোথাও কোনো সান্ত্বনা পায়নি। জয়ন্তকে দেখে মনে হয়েছিল ও সেই ছেলেদের দলের নয়। তাই তার সঙ্গে মিশেছিল। ভালো লেগেছিল ওকে। ওর হোটেলেই যেতে সাহস করেছিল।

কিন্তু এবারও নিদারুণভাবে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে। সেই পরাজয়ের দুঃখটা ভুলতে পারেনি সে।

বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বের হয়। সবারই ওপরে জমে উঠেছে তার নিদারুণ ঘৃণা আর তিক্ততা।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল মিনু। ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না জয়ন্ত আসবে তাদের এখানে—আজই। জয়ন্তের মুখে কি তৃপ্তির আবেশ। মুখে সারাদিনের ক্লান্তি উত্তেজনার পর একটু হাসি ফুটেছে—তাতে আশ্বাসই ফুটে ওঠে।

--তুমি।

জয়ন্ত ওপাশের টুলটা নিয়ে বসতে বসতে বলে—ভেবেছিলে আর বোধহয় আসব না? ভুল বুঝতে তোমাদের জুড়ি নেই।

কথার জবাব দিল না মিনু।

বিছানায় উঠে বসল, গায়ে জামাকাপড় ঠিক করে নেয়। ওর কান্নাভিজে মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটে ওঠে।

জয়ন্ত শোনায়—সত্যি আজকের ঘটনা আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে মিনু, আমার পথ আমি ঠিক করে নিয়েছি।

সপ্রশ্ন চাহনিতে ওর দিকে চাইল মিনু। তার অপমানটাও জয়ন্ত বুক পেতে নিয়েছে, তার প্রতিবাদ করেছে এ খবরটা জেনে তার তৃপ্তিই হয়।

জয়ন্ত বলে—মৃণালটা একটা রাস্কেল। ওর সঙ্গে সব সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দোব। ভালো চাকরিও একটা ঠিক হয়ে গেল আজই।

খববেব কাগজেব অপিসেব চিঠিখানা দেখায় জয়ন্ত। মিনুব মন থেকে ধীবে ধীবে সেই কালো জমাট মেঘটা কেটে যায়। ডাগব দুচোখে ফুটে ওঠে খুশিব আবেশ। মিনু বলে—সত্যি।

জয়ন্ত শোনায়— সামনেব সপ্তাহ থেকে হোটেলেব অন্য ঘবে চলে যাব। সিঙ্গল সিটেড রুমই নোব। পডাশোনা কাজকম্মো কবতে হবে। এইবাব একটু নিশ্চিন্তে কাজ কবা যাবে মিনু।

মিনুব দুচোখে কি স্বপ্নাবেশ। জীবনে এতদিন সে ঠকেছে। এবাব কিন্তু সত্যই ঠকবে না সে।

জয়ন্ত বলে চলেছে—এভাবে অপমান কববে তোমাকেও, ভাবতে পাবিনি। ওব সাহায্য মাঝে মাঝে নিয়েছি, তাবই শোধ তুলেছে আজ মৃণাল। তবে আব নয়।

সুবাসিনী বান্নাঘবে ব্যস্ত ছিল। জয়ন্তেব গলা শুনে বেব হয়ে এসেছে দেখে মিনুব শবীবও ভালো হয়ে উঠেছে। দুজনে কি গভীব আলোচনায় মগ্ন।

হাসছে মিনু।

সেই মেয়েব দিকে চেয়ে থাকে সুবাসিনী। ওদেব মনেব ভিতব কি আছে কে জানে। আবাব ভুলই কবে না বসে।

নিজেব জীবনেও সেই ভুলেব বোঝা বয়ে চলেছে সে আবাব সেই দুঃখ তাব মেয়েব জীবনে আসুক এ কল্পনাও কবতে কষ্ট পায় সুবাসিনা। জয়ন্তকে দেখে ভালোই লেগেছে তাব

মিনুকে বেব হয়ে আসতে দেখে সুবাসিনী ওব দিকে চাইল।

মিনু বলে— একটু চা আব কিছু খাবাব থাকে তো দাও না

সাবাদিন খায়নি মেয়ে। মা তাই বলে —তোব জন্যে? আয বান্নাঘবে

মিনু হাসছে সলজ্জ মিষ্টি একটু হাসি। বলে মাকে — জয়ন্তবাবু এসেছেন দুজনেব জন্যই দাও কিছু।

ইতিমধ্যে জয়ন্ত বেব হয়ে এসেছে সুবাসিনীকে প্রণাম কবে। খুশি হয়ে আশীর্বাদ কবে সুবাসিনী।

বেঁচে থাকো বাবা

মিনু বলে ভালো চাকবি হয়েছে ওব। বড কাগজেব স্টাফ এখন।

—তাই নাকি।

খুশিতে উপচে ওঠে সুবাসিনীব মুখ।

বসো বাবা। আমি চা টা আনছি।

সন্ধ্যা নেমেছে। কলকাতাব ইট কাঠ আব ঘিঞ্জি বাডিব মাথায় নামা প্রাণহীন ম্লান অন্ধকাব এ নয়। গাছগাছালিব ফাঁকে —আকাশেব গায়ে এখানে বঙেব সাডা জাগে, ধীবে ধীবে সেই বঙেব খেলা ফুবিয়ে আসে কালো কালিব আস্তব। পাখিদেব কলববে একটি দিনেব সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

আকাশে তাবাগুলো ফুটে উঠেছে দু একটা কবে।

মিনু আব জয়ন্ত কি স্বপ্ন দেখছে।

জয়ন্ত বলে— এবাব আব তোমাব যাওযাব অসুবিধা হবে না

কথাটা জানতে পেবে অবাক হয় মিনু।

-সাবাদিন বাগ কবে না খেয়ে আছ?

হাসে জয়ন্ত —এমন দু একদিন না খেয়েই থাকতে হয মাঝে মাঝে। মৃণাল বলে দুঃখটাকে এমনি কবে মেনে নিলে কাজেব জোব আসে।

— ছাই। ওই মৃণাল একটা হোপলেস জীব। ও সিনিক তো বটেই। তাই মদ গেলে। তুমি ওব কাছ থেকে যত তফাতে থাকতে পাবো সবে যাও। হ্যাঁ— বাতে কিন্তু এখানেই খেয়ে যাবে।

কদিনেব পবিচয়, এব মধ্যেই ও অনেকেখানি সহজ হয়ে উঠেছে জয়ন্তেব সামনে।

সুবাসিনীও কথাটা শুনে অবাক হয়। জয়ন্তকে তাব খুব ভালো লেগেছে। ওবা কেমন ছন্নছাড়া হয়ে

গেছে জীবনে ঠকে ঠকে। স্নেহ প্রীতি ভালোবাসার ওপর ওদের বিশ্বাস নেই। সেইটা যদি ফিরে পায় ওরাও সুখী হবে, বড় হবে।

মিনু বলে—ও আজ রাতে এইখানে খেয়ে যাবে মা।

হাসে সুবাসিনী। —বেশ তো।

জয়ন্ত অনেকদিন বাড়ির পরিবেশের কথা ভুলে গেছে। কোনো দায়িত্বও নেই, তার কথাও কেউ ভাবেনি। কোনোদিন খেতে জোটে পাইস হোটেলে—না হয় বলহরিকে ঘুষ দিয়ে একথালা কড়কড়ে ভাত একটু ঘ্যাঁট মতো আর মাছের টুকরো মেলে একটু তাই দুজনে ভাগ করে খায় চোরের মতো। রাতে পাঁউরুটি আর গুড়—এই তাদের খাদ্য।

আজ এখানের আয়োজন সামান্যই। ভাত ডাল—কুমড়ো আলু এটা সেটা দিয়ে তরকারি, আর মাছের ঝাল। তাই যেন অমৃত বোধ হয়।

মিনু বলে—এই খিদে চেপে কি করে ছিলে?

হাসে জয়ন্ত —বললাম তো অভ্যেস আছে।

সুবাসিনী মিনুকে ধমকায়। কি এমন খেয়েছে বাছা যে তুই কথা শোনাচ্ছিস। ভাত ভাঙো বাছা, আর একটু ঝাল দিই। মিনু, তোকে ভাত দেব?

—না।

ঘরোয়া স্নিগ্ধ পরিবেশে জয়ন্ত তার মনের সেই জ্বালাটাকে ভুলতে পারে। সেও এমনি একটি ছোট্ট ঘরের স্বপ্ন দেখে। সবুজ ঘাসের বুকে চাঁদের আলো পড়বে—উঠোনে ফুটবে দু-চারটে সন্ধ্যামালতীর ফুল, কলাগাছের দীঘল পাতায় বাতাস কাঁপবে—উছলে উঠবে চাঁদের আলো।

মিনু আর সে এমনি একটি ঘর বাঁধবে। সুখী হবে তারা।

লেখার কাজও এগোবে—দুবেলা দুমুঠো আহার্যের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না।

সুবাসিনীর মনে একটু ক্ষীণ আশার সুর জাগে।

মিনুর মুখ চোখে দেখেছে সে কি তৃপ্তির স্পর্শ। মেয়েকে দেখেছিল আজ সকালে, মুষড়ে গিয়েছিল। সেই মিনুই বদলে গেছে এখন।

জয়ন্তর কথা ভাবছে সে

এবার যেন ওই হতভাগিনী মেয়েটা আর দুঃখ না পায়।

রাতের অন্ধকারে একফালি চাঁদের আলো পড়েছে নারকেলগাছের পাতায়, ওই ছিটকে থাকা জনবসতে। কোথায় দোতারার সুর ওঠে। মনটা কোন্ সুদূরে হারিয়ে যায় জয়ন্তের। এত জ্বালা বিভ্রান্তির মধ্যেও মানুষ মরেনি। জীবনের এতটুকু শান্তির স্পর্শ আজও তারা চায়।

জয়ন্ত আজ নোতুন করে দেখেছে মিনুকে—ওই পরিবেশকে।

রাত হয়ে গেছে, হোটেলের বাবুরা অনেকেই নিদ্রামগ্ন। ওদের সারাদিনের কাজের পর হোটেলে ফিরে তাস নাহয় ফ্লাশ খেলার নেশা আছে। তাও সীমিত। তারপরই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে।

আবার পরদিন থেকে সেই একঘেয়ে জীবনযাত্রার ভিড়ে সামিল হয়ে যায়। কোনো ভাবনাচিন্তা নেই। গয়াগতির কারবার এদের নিয়েই।

তবু গয়াগতির চোখে আজ ঘুম নেই।

ওই প্রমীলা সরকার তার মনে ঝড় তুলেছে। বলহরি পর্যন্ত এটা পছন্দ করে না জানে, কিন্তু গয়াগতির মনে হয়েছে এতকাল পর আজ যেন সে কিছুটা পথের হদিস পেয়েছে। ব্যবসাও ভালো চলবে। পাইকারী হোটেলের কারবার তুলে ডিলাক্স হোটেল খুলবে। প্রমীলা হবে রিসেপসনিস্ট-কাম ম্যানেজ্রেস। খদ্দেরের অভাব হবে না। তাছাড়া গয়াগতির শেষ জীবনেও একটা নির্ভরের প্রয়োজন।

বামনিধিকে ঘরটা দিতে হবে।

গয়াগতি তখনও ঘুমোয়নি। হোটেলের গেট দরজাগুলো বন্ধ করে ভাঁড়ারঘরে চাবি দিয়ে তবে সে নিশ্চিন্ত হয়। চাকরবাকরদেরও বিশ্বাস নেই। তাই চোখ মেলে থাকে।

হঠাৎ জয়ন্তকে এত রাত্রে ঢুকতে দেখে গয়াগতি ওর দিকে চাইল।

—এত রাত্রে ফিরলে ছোকরা—এটা কি আড্ডাখানা? তোমাকে নোটিশ দিচ্ছি। একজন মাল টেনে ন্যাংটো মেয়ের ছবি আঁকবেন—অন্যজন ফিরবেন রাতদুপুরে।

জয়ন্তের মনে আজ নোতুন করে বাঁচার স্বপ্ন। তাই কঠিন হয়ে উঠেছে সে। শোনায়—নোটিশ আমিই দেব আপনাকে গয়াগতিবাবু। আপনার হোটেলে থাকব না—তবে যাবার আগে এতদিন যে অত্যাচার করেছেন আমাদের ওপর তার জবাব দিয়ে যাব

গয়াগতি এতদিন দেখেছে ওরা চুপ করেই থাকে ওর কথায়। আজ জয়ন্ত মুখ খুলেছে এবং এইসব কথা বলছে দেখে ঘাবড়ে গেছে সে।

জয়ন্ত দাঁড়াল না। ওর মুখের ওপর কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে সে চলে গেল ভিতরে। গয়াগতি এইবার গর্জায়।

—জবাব! জবাব দেবেন উনি! ....দেখে নোব।

মৃণাল ঝিমুচ্ছিল। আজ সে বেশ খানিকটা মদ গিলেছে। জয়ন্ত তখনও ফেরেনি। মৃণালের মনে হয় মেয়েটার জন্যই জয়ন্ত দুঃখ পেয়েছে আজ।

হঠাৎ জয়ন্তকে ঢুকতে দেখে মৃণাল চাইল ওর দিকে।

—ফিরে এলি? তা মেয়েটা কিছু বলছিল?

জয়ন্ত ও নিয়ে ওর সঙ্গে কোনো কথাই আলোচনা করতে চায় না। বলে মৃণাল—মেয়েদের নিয়ে গল্প লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়, বুঝলি, প্রেম করা যায় না। কি লিখছিস নোতুন—নবপ্রেমের কাহিনী, না পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামীর জন্য ত্যাগ?

জয়ন্ত ওর কথাগুলো শুনছে। জবাব দিল না। ওর কাছে সবকিছুই নির্মম ব্যঙ্গেরই বস্তু। সারাদিন কোনদিকে কেটেছে—এত রাত্রে তাই শরীরটা ক্লান্ত বোধ হয়।

শুয়ে পড়ে সে ওদিকে চটের পর্দাটা টেনে দিয়ে। হাসছে মৃণাল।

—হোপলেস—সেন্টিমেন্টাল ফুল তুই একটা। তোদের মনের মধ্যে শুধু লোভ—তাই বিপ্লবী কোনোদিনই হবি না। তোদের লেখাও তাই পোশাকীই থেকে যাবে। জলো—পানসে—

মৃণাল কোনো সাড়া না পেয়ে বোতল খুলে মদ ঢালতে থাকে। সব কেমন নিরুত্তাপ বোধ হয় তার।

নেশাটা জমে উঠেছে। মনে হয় মৃণালের এরা সবাই পিছিয়ে পড়েছে। তার মতটাই সে বড় করে দেখেছে। ওদের চারিপাশে শুধু দেখেছে লোভ, ভণ্ডামি আর প্রতারণা। দুটো সত্তা ওদের প্রত্যেকেরই। মনের অতলের সেই লোভী নীচ আদিম জীবটাকে সে চেনে। তাকে চাবকে সে ক্ষতবিক্ষত করতে চায়।

হঠাৎ সামনেই কাকে দেখে অবাক হয় মৃণাল। হোটেলের সকলেই শুয়ে পড়েছে, প্রাণহীন এই সুপ্তিমগ্ন হোটেলের ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে প্রমীলা সরকার।

ওর মুখে চোখে প্রসাধনের বাহুল্য, বয়সের ছাপটাকে ঢেকেছে সে ওই প্রলেপে। নিটোল স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েও এখনও যৌবনের দুকূল প্রবাহে কোন্ নিঃস্বতার বালুবেলায় হাহাকারে ভেঙে পড়ে।

মৃণালের নেশাজড়ানো চোখের দিকে চেয়ে আছে প্রমীলা। ওর পরনে একটা শাড়ি, নীচের জামাও বোধহয় নেই।

—আপনি!

প্রমীলা সাহস পেয়ে চারিদিকে দেখছে। ওদিকে পুরু চটের পর্দা, এদিকটায় কেউ নেই। প্রমীলা সাহস পেয়ে টুলটায় বসে অগোছালো কাপড়টাকে ঠিক করতে করতে দু'চোখের চাহনিতে মদির করে তুলে বলে—আমার একটা পোর্ট্রেট এঁকে দিতে হবে।

অবাক হয় মৃণাল।

—বাতদুপুরে পোর্ট্রেট আঁকাবার জন্য এসেছেন?

—সময় আর কোথায় বলো? তাই ভাবলাম শিল্পী লোক, মুড়ে থাকবে, এই সময়ই কথাটা জানাই।

হাসছে মৃণাল তা ভালোই করেছেন।

হাসছে প্রমীলাও। তার হারানো যৌবনের মৃতপ্রবাহ বয়ে আজকের অন্ধকারে কোনো ফিরে আসা মনকে সে স্পর্শ করেছে।

মৃণাল বলে—ছবি একটা এঁকেছি আপনার।

—সত্যি!

প্রমীলা ওর কাছে এগিয়ে আসে। দুচোখে ওর কৌতূহল। মৃণালের হাতটাই ধরে ফেলে সে, মৃণালের নেশাভরা মনে তবু কোনো সাড়া জাগে না। ওই ভণ্ডামিকে ভোলবার জন্যই যেন মদ গেলে সে।

—দেখি!

মৃণাল সামনের ইজেলের ঢাকাটা তুলে দিতেই চমকে ওঠে প্রমীলা। তার সেই হাসিভরা মুখখানা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। রাগে ফেটে পড়ে সে।

নগ্ন সেই মেয়েটার কুৎসিত শরীরটা ওর সামনে ফুটে ওঠে। ওর দুচোখে কী বীভৎস সর্বনাশা নেশা! ওর কাছে দেহটাই বড়—তারই নেশায় সে মেতে উঠেছে। একটি নারীর এই কঠিন কদর্য রূপ যে তাকে কেন্দ্র করেই আঁকা সেই কথাই বলে মৃণাল।

—কেমন দেখছেন? ওর সঙ্গে আপনার কিন্তু হুবহু মিল আছে প্রমীলা দেবী।

—কি বল্লে? ইডিয়ট! জানোয়ার ব্রুট শয়তান! আমি অমনি?

প্রমীলা রাগে কাঁপছে। ও যেন লাফ দিয়ে গিয়ে ওই ছবিটাকে টুকরো টুকরো করে দেবে।

হঠাৎ ওপাশের কার হাসির শব্দে ফিরে চাইল মৃণাল। সিঁটকে লম্বা হলধরবাবুও বোধহয় ঘুমোয়নি। সে লক্ষ্য রেখেছিল প্রমীলার ওপর। এখানে তাকে এসে ঢুকতে দেখে সিঁটকে লোকটাও পিছুপিছু এসে ঢুকেছিল।

ওই দৃশ্য দেখে হলধর খ্যাকখ্যাক শব্দে হেসে ওঠে।

প্রমীলাও দেখেছে লোকটাকে। কি ভেবে প্রমীলা কথা বাড়াল না, রাগ চেপে বের হয়ে গেল।

হলধর তখনও ওই ছবিটার দিকে চেয়ে রয়েছে আর খ্যাকখ্যাক শব্দে হাসছে। বলে ওঠে—ঠিক করেছ ভায়া। ইউ আর কারেক্ট। একেবারে কারেক্ট। ওই ওদের স্বরূপ। ধন্যবাদ। আমার ফার্মে তোমাকে চিফ আর্টিস্ট করে নোব ইয়ংম্যান। ভালো মাইনে দেব।

মৃণাল বিরক্ত হয়।—যানদিকি মশায়।

হলধর ওর কথা কানে তোলে না। ছবিটা দেখছে মন দিয়ে। শুধোয়—কত টাকা দাম এর? এটা আমি কিনব—তবে হ্যাঁ ওই ইডিয়ট গদাধরটা যেন না জানতে পারে। ওটা গীতা পাঠ করে, কিন্তু মহাশয়তান। ভণ্ড এক নম্বরের। ওই মেয়েটার মতোই, বুঝলে—

জয়ন্তের ঘুম ভেঙে গেছে।

সে বিছানায় শুয়ে শুয়েই প্রমীলার কথাগুলো শুনেছে—শুনেছে ওই হলধরের কথা।

জীবনের পথে বিচিত্র সব মানুষের জটলা। ওরা কোথায় যেন বিকৃতির একসূত্রে বাঁধা। মৃণালের চোখের সামনে তাই ওইটাই পরম সত্য।

গদাধর চোখে চোখে রেখেছিল হলধরকে।

লোকটা এককালে ব্যবসায় অনেক টাকাই রোজগার করেছে। গদাধরকে সেই আশ্রয় দিয়েছিল সেদিন। কিন্তু বাতিক ওই সন্দেহের। এই করেই তার পারিবারিক জীবনে একটা সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। স্ত্রীকেও সহ্য করতে পারেনি হলধর। অত্যাচার করত—অন্যায়ভাবে শাসন করত। ও যেন সব লোকদের সঙ্গেই প্রেম করছে। এই শাসন সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীও চলে যায়।

সেই থেকেই হলধরের মাথাও কেমন বিগড়ে গেছে। ব্যবসাও ডুবেছে। সামান্য যা সঞ্চয় ছিল তাই

থেকেই এখন চলছে। আর ওই গদাধবের দয়ায় টিকে আছে কোনোরকমে। ওকে সেইই কলকাতায় আনে চিকিৎসার জন্য এই হোটেলে।

গদাধর তাকে নজরে নজরে রেখেছে। রাতের অন্ধকারে ওকে বের হয়ে আসতে দেখে ওর পিছুপিছু গদাধরও এসেছিল। ওই উঠানের ওদিকে শেডটা থেকে অন্ধকারে কাকে বের হয়ে আসতে দেখে এগিয়ে যায় গদাধর।

—আপনি।

চমকে উঠেছে সে। পথ আটকে দাঁড়িয়েছে গদাধর ওই মেয়েটির। ভেতর থেকে হলধরের সেই হাসির শব্দ কানে আসছে।

প্রমীলা এমনি সময় ওই লোকটির সামনেই পড়ে যাবে তা ভাবেনি অতীতের অনেকদিনের সঙ্গী ওই গদাধর। যে অতীতকে প্রমীলা ভুলতে চেয়েছিল, আবার বাঁচতে চেয়েছিল নোতুন করে সেই অতীত যে এমনি প্রেতাত্মার মতো তার সামনে এসে দাঁড়াবে তা ভাবেনি।

গদাধর বলে— শুনছিলাম কলকাতায় কোথায় আছেন। তা এইখানেই দেখা পাব ভাবিনি। হলধরকে ওভাবে ফেলে চলে এসেছিলেন সেদিন, স্বামীর প্রতি কোনো কর্তব্যই কি মনে পড়েনি? লোকটার কারবার ডুবে গেল, মাথা খারাপ হয়ে গেল সেই থেকে।

প্রমীলার কাছে ওসব কুস্বপ্নের মতোই লাগে। হলধরকে কোনোদিনই সহ্য করতে পারেনি সে। সেই অত্যাচার আর মিথ্যে সন্দেহের কথাও ভোলেনি। ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠেছিল প্রমীলা। তাই একদিন এই চরমপথই নিয়েছিল। আজ কঠিন হয়ে ওঠে প্রমীলা গদাধরের কথায়।

—তার জন্য আমি দায়ী নই। নিজের সর্বনাশ যদি নিজে করেন কে ঠেকাবে? আমি মেনে নিতে পারিনি - সরে এসেছি। পথ ছাড়ুন।

প্রমীলা ওকে সাফ জবাব দেয় এ নিয়ে কোনো কথা বলবেন না

হলধর বের হয়ে এসেছে শেডের নীচ থেকে। দেখে প্রমীলা চলে গেল হনহন করে। গদধর ওর সঙ্গে কি সব কথা বলছিল।

হলধর বলে— কিহে স্বামিজী, পুরোনো প্রেম আবার ঝালাচ্ছো নাকি? রাংঝালে রং আর জোড়া লাগে না, বুঝলে? চলো—ঘরে গিয়ে জ্ঞানযোগ পড়বে চল।

গদাধর বলে -আমি কেস করব। পুলিশের সাহায্য নেব।

হলধর হাসছে খ্যাঁকখ্যাঁক করে। পালানো বৌ ধরে নিয়ে যাবে? যাবে না হে--ও রঙে মজেছে। বুঝলে?

জয়ন্ত বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। শুনেছে সে ওদের কথাগুলো। রাতের থমথমা অন্ধকারে হোটেলের মানষগুলো ঘুমুচ্ছে। এদের চোখে ঘুম নেই। অতীতের হারানো অন্ধকারে এরা নোতুন ছেঁড়া তার বেঁধে সুর তোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। বেসুরই ওঠে। জীবনের কোনো তৃপ্তির সুর তাতে ফোটে না, ওঠে শুধুমাত্র হাহাকার।

দোতলার ওদিককার ঘরে আলোটা জ্বলছে। জানালার ফাঁক দিয়ে একটু আলোর রেখা এসে পড়েছে সরু বারান্দায়। প্রমীলা পালাচ্ছে নিজের ঘরের দিকে। অন্ধকারে সে লুকোতে চায়।

নিজের মনের সেই লোভী মূর্তিটা ঢাকতে পারেনি সে, ওই মাতাল শিল্পীর চোখে সেইটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। ধরা পড়ে গেছে সে ওই নির্মম হলধরের সামনে। আজও সে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী সেই পরিচয়টাকে পিছন ফেলে এসেছে প্রমীলা দীর্ঘ দশ বছর আগে।

আবার নোতুন করে বাঁচতে চেয়েছিল সে। সেই বাঁচার দিনে ওরা দুজনে এসে জুটেছে শনিগ্রহের মতো তার জীবনে। প্রমীলা থমকে দাঁড়াল।

নিধিরামবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে। সে ঘুমোয়নি।

জীবনে তার পরমার্থ অন্য কিছু। টাকা। তার জন্য সে রাজপুরে ভেজাল ওষুধ তৈরি করে চলেছে।

ইনজেকশনের অ্যামপুলে জল ভরে দামী ইনজেকশনের লেবেল সাঁটছে। গ্যাস সিলিন্ডার থেকে পাইপে গ্যাস এনে বার্নার জ্বালিয়ে অ্যামপুলগুলোর মুখ বন্ধ করছে।

ভেজালের যুগে ও ঠিকই তার কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। প্রমীলাও বাঁচতে চেয়েছে এই ভেজালের যুগে। নিজের সম্পূর্ণত্ব কারো একালে নেই। সবাই ভাঙা ফুটো সবকিছুকে জোড়াতালি দিয়ে মেকির বোঝাই বেসাতি করে চলেছে।

প্রমীলাও মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। যা কিছুই আসুক সে আজ পিছোবে না।

গয়াগতি ঘুমুচ্ছে। জীবনের এই নাটকের অন্তরালে তার নিজের কথাটাও ভুলে গেছে সে। তার চোখের সামনে নোতুন কি জগতের কথা। প্রমীলাকে বোধহয় ভালো লেগেছে।

তাই ভুলে গেছে তার অতীতের সেই চেনা মুখখানাকে। একদিন সেও জোর করে তাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করিয়েছিল। আর তারা ফেরেনি কোনোদিনই।

তবু গয়াগতি আবার নোতুন কি আশ্বাস পেয়েছে। ঘুমুচ্ছে আজ সে বেশ শান্তিভরা মন নিয়েই।

প্রমীলার ঘুম ভেঙেছে ভোরে। রাতে ঘুম ভালো হয়নি। অনেককিছুই ভেবেছে সে। মনে হয় এখান থেকে সরে গিয়ে তারা বাঁচবে। তাই গয়াগতিকে তার দরকার।

দুজনে ট্রেনে চলেছে।

গয়াগতির মনে খুশির আভাস জাগে। অনেকদিন পর সে পয়সা খরচা করবার একটা কারণ পেয়ে খরচ করে চলেছে। ভাঁড়ে চা খাবে না তাই ট্রেতে করে চা আনিয়েছে। চা, টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ।

প্রমীলা বলে—এত বাজে খরচ করছেন কেন?

—করলামই বা। দেখছি ব্যাটারা কেমন লাভ করে। দ্যাখ না—কুল্যে এক টাকা পাঁচ সিকের মাল দিয়ে দমকা চার টাকা খসিয়ে নিল। সবাই একালে ঠগ, বুঝলে?

প্রমীলা হাসল। ও জানে না প্রমীলার জীবনেও কত গলদ রয়ে গেছে। সবাই এখানে ভিতরের সেই পরিচয়টাকে ঢেকে মিথ্যার মুখোশ টেনে চলেছে।

—কি এত ভাবছ প্রমীলা?

প্রমীলা ওর দিকে চাইল। এসব ভাবনার কথা জানানো যায় না। তাই জবাব দেয়—কই না তো! আচ্ছা—কেউ যদি কিছু বলে, আপনার বোর্ডাররা?

হাসছে গয়াগতি!—কারো তোয়াক্কা করি না, বুঝলে? দরকার হয় ওদের মুখের মতো জবাব দিতে আমি পারব।

প্রমীলা হাসছে। সেও ওই লোকটিকে আজ নিজের পথে নিয়ে যেতে চায়।

বলে—কলকাতার চেয়ে পুরীতে হোটেল ব্যবসা ভালোই চলে। ওখানে মানুষ থাকে দরকারে, বারোমাসই হিসেব করে চলে সে—এখানে সে আসে বেড়াতে। দমকা খর্চা করতে—

হাসছে গয়াগতি—তা যা বলেছ। ভাবছি আর একটা হোটেলই না হয় করব পুরীতে। সেই ভেবেই তো যাচ্ছি সেখানে।

প্রমীলা খুশি হয় মনে মনে।

লোকটার টাকা বেশই আছে। তাছাড়া কলকাতা থেকে সরে আসতে চায় সে। গয়াগতি ওকে দেখছে। ট্রেনের জানালা দিয়ে উতলা বাতাস এসে লাগছে ওর মুখে চুলে। উড়ছে উতলা আঁচল। ওর গোল মুখখানায় কচিকচি একটা ভাব ফুটে ওঠে।

গয়াগতি বলে—ওসব মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে তুমিও এসো, দুজনে হোটেলের ব্যবসা করি, তুমি পুরীর হোটেলে থাকবে।

প্রমীলা কি ভাবছে। ওর এতদিনের শূন্য জীবন পূর্ণ করে নিতে চায় ওইটুকু দিয়ে। পাগল একটা মানুষকে সহ্য করতে পারেনি তাই সব ফেলে পালিয়ে এসেছিল, শূন্যতার বেদনাই ছেয়েছিল সারা মন। আজ সেই

কাঙ্গালমন সব পেতে চায়।

ওরা দুজনে কল্পনার বিচিত্র জগতে উধাও হয়ে চলেছে।

গদাধর সকালেই হোটেল শূন্য দেখে অবাক হয়। প্রমীলা নেই—গয়াগতিও চলে গেছে কি কাজে। কোথায় গেছে ঠিক জানে না।

বলহরিই এখন ম্যানেজার। গদাধরবাবুর কথায় বলহরি একটু অবাক হয়।

—আজ্ঞে তা তো জানি না, ম্যানেজারবাবু কোথায় কাজে যাবেন বললেন—

—আর ওই দোতলার মাস্টারনী?

বলহরি ব্যাপারটা একটু ঘোরালোই মনে করে। এমন কাণ্ড আকচারই ঘটছে। কিন্তু গয়াগতিবাবুই যে জড়িয়ে পড়বে এইভাবে তা ভাবেনি। সে ভালোমানুষের মতো জবাব দেয়—দিদিমণি বলছিল ইস্কুলেরমেয়েদের নিয়ে কোথায় বেড়াতে যাবেন। বোধহয় তাই গিয়েছেন। যান তো মাঝে মাঝে।

হলধর দাঁড়িয়ে ছিল। ওর কথা শুনে সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ওঠে।

—তা ভালো। ওহে গদাধর, ওসব আর কেন? তোমারও বয়েস হয়েছে। ওনাদের জন্য ভেবে আর তোমার লাভ নেই।

গদাধর ওসব কিছু কথা শুনতে অভ্যস্ত। তবু হাত থেকে এত সহজে ওকে নিষ্কৃতি দেবে না—ওই মেয়েটাকে।

তাই চুপ করে কি ভাবছে।

মৃণালও শুনেছে সব কথা। সেও এসে পড়ে। এতকালের মধ্যে গয়াগতি কোনদিনই বাইরে যায়নি। ওর এই হঠাৎ বাইরে যাবার মূলে কি আছে তা অনুমান করে হাসছে মৃণাল।

হলধর বলে—তুমি একটা বেকুব হে ছোকরা।

—কেন?

—ওই ছায়া এঁকেই দিন রাত কাটালে —আর কায়া কিনা ফুরুৎ দাঁ! উড়ে গেল। বুঝলে ছোকরা ওদের বাঁধা যায় না।

গদাধর ওকে থামিয়ে দেয়—চুপ করদিকি তুমি।

হলধর বলে—চুপ করেই তো আছি। সব দেখছি আর চুপ করে আছি। করতে পারলে কিছু?

গদাধর গর্জায়—করব। করব এইবার, অনেক কিছু দেখেছি। এই হোটেলেরই সর্বনাশ করব এবার চলদিকি—

লোক জুটে গেছে। বোর্ডারদের মধ্যেও খবরটা চাউর হয়েছে। গয়াগতি আর সেই প্রমীলা সরকার দল বেঁধে নাকি হাওয়া খেতে গেছেন ক'দিনের জন্য।

খবরটা শুনেছে জয়ন্ত। সে অনেকদিন ধরেই গয়াগতিকে দেখেছে। লোকটা হঠাৎ এমনি একটা ভুল করে বসবে ঠিক ভাবতে পারে না। তবু তার কাছে মনে হয় ওরা ভুল করেছে। বাঁচার আগ্রহ ওদের এই পথেই নিয়ে গেছে।

যে যার কথা ভাবুক। জয়ন্ত আজ নিজের পথ ঠিক করে নিয়েছে। হোটেল থাকুক না থাকুক তাতে তার যায় আসে না। মৃণালও যা ভালো বোঝে করুক। আজ থেকে জয়ন্ত কাজে যোগ দিচ্ছে। আগামও কিছু পাবে। অন্য ব্যবস্থাই করবে সে।

কথাটা মৃণালকে জানায় না সে। শুধু বলে—ক'দিন পর চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

অবাক হয় মৃণাল—চলে যাবি? হেরে গেলি তাহলে—

হাসছে মৃণাল। সেই বিশ্রী হাসিটাকে সহ্য করতে পারে না জয়ন্ত, বলে—এত হাসির কি হল?

মৃণাল বলে—চলে যাচ্ছিস এখান থেকে? ওই গয়াগতিও গেছে—অবশ্য তিনি ফিরে আসবেন, আর তুইও যাবি—অল রট্! বুঝলি হ্যাকনিড ওই মেয়েদের ফাঁদেই পা দিবি; নিজের কাজকম্মো সাধনা শিক্ষা—

জয়ন্ত জবাব দেয়—সে আমি বুঝব। তোর মতো জ্বালাভরা চোখ নিয়ে দুনিয়াকে চারপাশকে দেখে আমি ঠকতে চাই না। আমি অন্য দৃষ্টিতে মানুষকে দেখি—তাদের বাঁচার সাধনাকে ভালোবাসাকে আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। তোর মতো অনুনাসিক দৃষ্টি নিয়ে শিল্পী সেজে জীবন থেকে সরে থাকার ভান আমি করি না।

মৃণাল ওর সতেজ কণ্ঠস্বরে অবাক হয়। জয়ন্ত আজ কথার জবাব দিয়েছে। এ কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে সতেজ ব্যক্তিত্ব। মৃণাল চুপ করে গেছে।

জয়ন্ত বলে—ওসব কথা না ওঠাই ভালো। দুজনের মতবাদ আলাদা, মিলবে না, তাই সরে থাকার ঠিক করেছি।

চলে গেল জয়ন্ত; মৃণাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বলহরি কথাটা শুনেছে। দুজনে একত্রে ছিল অনেকদিন। তবু ওদের ভালা লাগত বলহরির। এত দুঃখকষ্টের মাঝেও তারা নিজেদের নিয়েই সুখী ছিল।

বলহরি বলে—দুনিয়ার এই নিয়ম মৃণালবাবু। সবই কেমন ভেঙে যায়।

জয়ন্ত বের হতে যাবে হঠাৎ হোটেলের সামনে পুলিসের গাড়ি এসে থামতে সেও দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামছে সেই গদাধর। পুলিশ অফিসারকে কি বোঝাচ্ছে:

—ঘর ছেড়ে চলে এল মশায়। লোকটার মাথাই খারাপ হবার জোগাড় ওই বৌ বৌ করে, আর তিনি কিনা এখানে এসে লীলে করছেন।

অফিসার ভদ্রলোক শুধোল—সেই প্রমীলা সরকার আছেন হোটেলে?

লোকজন জুটে গেছে মজা দেখার জন্য। গদাধর হড়বড় করে অনেক কথাই বলে চলেছে। গয়াগতির নামও জড়াতে ছাড়ে না। ওরা ধরে নিয়েছে প্রমীলা গয়াগতির সঙ্গেই বের হয়েছে। বোধহয় অন্য কোথাও তাকে সরিয়ে দেবে গয়াগতি।

জয়ন্ত কথাগুলো শুনছে। বিপদে পড়বে এইবার নিরীহ লোকটা। গদাধরও সাংঘাতিক লোক খুঁজে খুঁজে এসে এমনি করে ধরবে তা ভাবেনি ওরা।

জয়ন্ত এসব কথা ভাবে না। এখানের জগতের জীব আর সে নয়। আজ থেকে পদস্থ কর্মচারী, লেখাপড়া নিয়েই থাকবে। নিজের কথাই ভাববে সে। অপিসে যেতে হবে। তার ডিউটির কিছু ঠিক নেই। খবরের কাগজে অপিসের কাজে দিনরাত মানলে চলবে না। ওই কর্মব্যস্ত খবরের ভিড়ে দুনিয়ার প্রাণপ্রবাহে সেও সামিল হয়ে গেছে।

কথাটা ভেবেছে সুবাসিনীও।

জয়ন্তের আসা যাওয়াটা দেখেছে। মিনুর মনের কথাও জানে। ছেলেটির কেউ আপনজন নেই লেখাপড়া শিখেছে- ভালো চাকরিও পেয়েছে। তাছাড়া সুবাসিনী ওর লেখা বইপত্রও পড়েছে। নামও আছে বাজারে। পয়সাও রোজগার করবে।

কোথায় একদিকে ওরা একেবারে বঞ্চিত হয়ে আছে। এতটুকু স্নেহ প্রীতির অভাবেই তাজা ওই গাছগুলো গ্রীষ্মের নিষ্করুণ হৃদয়হীনতার উত্তাপে শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে।

মিনু যদি খুশি হয় হোক। সুবাসিনীও মনে মনে কি আশা করেছ। ছেলেটি ভালো। যদি ওরা বিয়েথা করে সুবাসিনী খুশি হবে। এতকাল অনেক দুঃখ সয়ে সংসারের বোঝা বয়েছে একা। এবার ওরা বুঝে নিক এই সংসারের ভার। নিষ্কৃতি পাবে সুবাসিনী।

তাই বোধহয় জয়ন্তের সঙ্গে এসব আলোচনা করতে চায়। একটু খোঁজখবরও নেবে। সবকিছু যথাসম্ভব যাচাই করারও দরকার। সুবাসিনী কি ভেবে নিজেই দুপুরের পর বের হয়েছে কলকাতায় ওই জয়ন্তের হোটেলের সন্ধানে। ঠিকানাটা মিনুর কাছ থেকে আগেই জেনেছিল। পরে জয়ন্তের মুখেও হদিসটা নিয়েছে কথায় কথায়

শিয়ালদহ থেকে নেমে সোজা ট্রাম লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসে। দুপাশের বাড়িগুলোর দিকে সাইনবোর্ডটা পড়ছে সুবাসিনী। বৈকালের রোদ পড়েছে রাস্তায়। লোকজনের ভিড় শুরু হয়েছে। ওই ভিড়ের মধ্যে সুবাসিনী চলেছে।

অনেকদিন পর এদিকে আসছে সে। সামনেই তিনতলা বাড়িটায় ওই সাইনবোর্ড দেখে দাঁড়াল। কি ভেবে ভেতরে ঢুকল সুবাসিনী।

বলহরি দাঁড়িয়ে আছে।

সকাল থেকেই হোটেলে ঝড় বয়ে গেছে। গয়াগতি নেই। পুলিস এসে তাকেই নানা কথা শুনিয়ে গেছে। ধমকও দিয়েছে কড়া করে। বলে গেছে আবার আসবে তারা।

হলধরের বৌ নাকি ওই প্রমীলা সরকার।

বলহরিও শোনায়—যে যার বউ নিয়ে থাকুক না মশায়, আমরা হোটেল চালাই, আশ্রয় দিই, টাকা নিই। ওসবে কি দরকার বলুন?

গয়াগতি আজ বের হয়ে বিপদে ফেলে গেছে বলহরিকে। মৃণালও সারাদিন বের হয়নি। আজ জয়ন্তের কথায় সেও চমকে উঠেছে। এতদিন জয়ন্ত চুপ করে সব সহ্য করে এসেছে, তাকে আঘাত দেবার জন্য একবার কথা বলেনি।

দুজনে এতদিন বাস করছে আজ জয়ন্তকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে একটি মেয়ে

মৃণালের এই দুঃখটা বলহরির চোখ এড়ায়নি। বেশ বুঝেছে মৃণাল—এইবার একা পেয়ে গয়াগতি তাকেও তাড়াবে হোটেল থেকে। নিধিরামবাবুও তাকে কথাটা প্রকারান্তরে জানিয়ে যায়। বলহরিকেও বলে মালপত্রগুলো ওই শেডে রেখে দিও বলহরি। ম্যানেজারও বলে গেছেন।

অন্যদিন হলে মৃণালও প্রতিবাদ করত, আজ সে চুপ করেই থাকে। সেই জোর আর নেই। বলহরিই বলেছিল নিধিরামবাবুকে ম্যানেজারবাবু এলে মাল তোলার ব্যবস্থা করবেন নিধিবাবু, এখন ওসব থাক।

জয়ন্ত সেই এগারোটা নাগাদ বের হয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি।

এক ভদ্রমহিলাকে এইদিকে আসতে দেখে বলহরি চাইল। ভদ্রমহিলা ওদেরই জিজ্ঞাসা করে—জয়ন্তবাবু এখানে থাকেন?

মৃণাল ওকে দেখছে। বয়স হলেও ভদ্রমহিলার মুখে চোখে স্নিগ্ধতার আমেজ, কণ্ঠস্বরও মিষ্টি। মৃণালই ওকে বসতে বলে।

বলহরি খবর দেয়।

ওই জয়ন্তবাবুর বন্ধু, এইখানেই ওঁরা থাকে। জয়ন্তবাবু তো অফিসে বের হয়েছেন। একটু অপেক্ষা করতে পারেন, হয়তো ফিরবেন।

জয়ন্তের সম্বন্ধেই আলোচনা করে সুবাসিনী। এ ছেলেটিকে ভালো লেগেছে বলহরিও বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। সেই একদিন এসেছিল মেয়েটি—তারই মা। মেয়ের চেহারায় মায়ের আদল ফুটে ওঠে।

বলহরি পান দোক্তাও এনেছে মৃণাল বলে—চা খাবেন তো?

সুবাসিনী ওদের ব্যবহারে খুশিই হয় মনে মনে জয়ন্তের সম্বন্ধে কথাগুলো সত্যিই। মিনু ভুল করেনি। সুবাসিনীর মনটা তাই হালকা খুশিতে ভরে ওঠে। জয়ন্তের ফেরার পথ চেয়ে আছে সে। যদি দেখা হয় ভালোই হবে।

জয়ন্তের কাছে এ কাজের প্রথম দিন বেশ ভালোভাবেই কেটে যায়। টেলিপ্রিন্টারে দেশ বিদেশের খবর আসে। সারা পৃথিবীর খবর। সেগুলোকে বেছেবুছে বাংলায় তর্জমা করে নিউজ করতে হয়। বিচিত্র খবরের ভিড়ে মানুষগুলোও যেন নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। ফোনে খবর আসছে।

সারা দুনিয়া চলছে—চারদিকে সেই চলার বহু বিচিত্র সংবাদ। জয়ন্তের কাছে নোতুন এই দুনিয়াটা ভালোই লাগে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কাজ শেষ করে জয়ন্ত হোটেলেই ফিরবে না কোথায় যাবে সময় কাটাতে তাই ভাবছে। লেখার তাগাদাও আছে। এতদিন পর ওর এই কাজের খবর পাবার পর থেকে প্রকাশকরাও একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওর লেখা চাই।

হাসে মনে মনে জয়ন্ত। একটা নিজের কাজ করার ঠাঁই দরকার। চোখের সামনে ভেসে ওঠে শান্ত সেই সন্ধ্যার পরিবেশ। এমনি নিরালা একটু জগতে সে কাজের কথা ভাববে। মিনুর কথা মনে পড়ে।

স্টেশনে ভিড় শুরু হয়েছে। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ভিড়। হঠাৎ ওই ভিড়ে জয়ন্ত গয়াগতিকে দেখে অবাক হয়। ফার্স্ট ক্লাস থেকে নামছে গয়াগতি আর প্রমীলা। বোধহয় ডায়মন্ডহারবারই গিয়েছিল। ফিরছে বৈকালে। ও জানে না আজকের কাণ্ডগুলো। নিরীহ লোকটাকে ওই প্রমীলাই বিপদে ফেলতে চলেছে।

জয়ন্ত এগিয়ে যায়।—ও গতিবাবু।

গয়াগতি দাঁড়াল। ওকে এখানে দেখে মনে মনে চটে ওঠে গয়াগতি। ছোকরা তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছিল কিনা কে জানে! তবু ওর ডাকে এগিয়ে এল।

জয়ন্ত খবরটা দেয়।

—হোটেলে আজ পুলিস এনেছিল গদাধর। ওই প্রমীলা দেবীর স্বামী নাকি কেস করেছে। ওই হলধরই ওর স্বামী। পুলিস নিধিরামবাবুরও খোঁজ করছিল—

—পুলিস!

চমকে ওঠে গয়াগতি। এসব ঝামেলায় পড়তে হবে তা ভাবেনি। এইবার খেয়াল হয় তার। সারা দিনে বেশকিছু টাকা দমকা খরচ করে ফেলেছে। মায় নিজের অনেক গোপন কথাও ভাবের ঘোরে বলে ফেলেছে ওই মেয়েটিকে।

প্রমীলা সরকার কি ভাবছে।

একটা দিন তার মনে মুক্তির আস্বাদ এনেছিল। ডায়মন্ডহারবারের সেই ঝাউবন—নদীর অবাধ হাওয়া তাকে উতলা করে তুলছে। মুক্ত সেই পরিবেশ থেকে কি বদ্ধ নরকে এসে পড়েছে প্রমীলা। প্রমীলাই বলে—আপনি এগিয়ে যান গতিবাবু, আমি পরে ফিরব একটু কাজ সেরে।

গয়াগতি কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না। প্রমীলা বলে—দুজনে একসঙ্গে ফেরা ঠিক হবে না। আপনি যান। কোনো ভয় নেই—সব দায়িত্ব আমারই। আমি পরে যাব। জিজ্ঞাসা করলে বলবেন আমার খবর জানেন না।

প্রমীলা নিজে চলে গেল অন্যদিকে।

গয়াগতি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে। বলে ওঠে—জয়ন্ত, চল হোটেলে ফিরবে তো? পুলিস টুলিসের কাণ্ড এসব কি বলদিকি। ওদের বৌ নিয়ে যাক না কেন। কে তাদের রাখতে বলেছে। আর আমিও যেতে চাইনি, সত্যি কথা। ও বলল—নোতুন হোটেল খুলবেন তা ট্যুরিস্ট লজও দেখে আসুন। ওই তো নিয়ে গেল আমায়।

দুজনে ফিরছে হোটেলের দিকে। গয়াগতি আজ জয়ন্তকে বিশ্বাস করতে পারে। বলিয়ে কহিয়ে লেখাপড়া জানা ছেলে ওরা। নানা মহলে যাতায়াত আছে। জয়ন্তই বলে—ওসব ঝামেলা ওরা বুঝবে। আপনি কিছুই জানেন না। আপনার হোটেলে থাকেন—চার্জ দেন, এইটুকু সম্বন্ধ।

গয়াগতি পথ পায়। তাই সেও জানায়—ব্যাস! ওই তো সত্যি কথা।

আজ মস্ত একটু ভুল করছে সে। তবু রক্ষে দুজনে একত্রে হোটেলে ঢোকেনি। তাহলে সেই পাগলাটা রক্ষে রাখত না। গয়াগতির মনে হয় আজ অতীতের কথা। জয়ন্তকেই শোনায়—বুঝলে একদিন আমার সবই ছিল ঘরসংসার স্ত্রী মেয়ে। কিন্তু সব সেদিন নিজের দোষেই হারিয়েছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি।

জয়ন্ত মানুষটিকে আজ নোতুন করে চেনে। ওর ওই কাঠিন্যের অতলে কোথায় একটা স্নেহভরা ব্যর্থ মন রয়ে গেছে। জয়ন্ত তার প্রীতির স্পর্শেই ওই মানুষটির স্বরূপ চিনেছে—প্রকৃত স্বরূপ।

হোটেলে ঢুকছে দুজনে। বলহরি দৌড়ে আসে ওদের দেখে। সেও নিশ্চিন্ত হয়েছে গয়াগতিকে একা ফিরতে

দেখে। হলধরও তেতলার বারান্দা থেকে দেখছে লোকটাকে। গদাধর হোটেলের সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিল, জোড়ে মিললে হাতেনাতে ধরবে, একজন ফোটোগ্রাফারও রেডি করে রেখেছিল স্ন্যাপ নেবার জন্য।

ফোটোগ্রাফার বলে—ছবি তুলব?

গদাধর হতাশ হয়েছে। বলে—না। দরকার নেই।

ওরা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাহলে প্রমীলা গয়াগতির সঙ্গে যায়নি হয়তো এদের খবর পেয়ে সরে পড়েছে মেয়েটা। তবু হাল ছাড়লে চলবে না।

গয়াগতি বুক ফুলিয়েই ঢুকছে। বলহরিরও ঘাড় থেকে বোঝা নামে। বলে—এসছেন তাহলে। .. জয়ন্তবাবু একজন মহিলা আপনাকে ডাকছেন। ওই তো বসে আছেন।

গয়াগতি ওদিকে চাইতেই অবাক হয়। ভদ্রমহিলার মাথায় ঘোমটা খসে পড়েছে দু'চোখে বিস্মিত দৃষ্টি। গয়াগতির পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। দীর্ঘ কতগুলো বছর তার সামনে হারিয়ে গেছে, ফিরে গেছে সে অতীতের সেই দিনগুলোয়।

স্মৃতিসবুজ সেই দিন। সুবাসিনীকে সে ভোলেনি। ওকে হারিয়ে এতদিন ধরে শুধু অন্বেষণই করেছে। তার আর ঘর বাঁধা হয়নি।

সেই হারানো সুবাসিনী আজ নিজে এসেছে—খুঁজে খুঁজে তারই সামনে দাঁড়িয়েছে।

প্রকম্পহাতে সুবাসিনী ওর ঘোমটাটা তুলে দিয়ে দাঁড়াল। গয়াগতি এগিয়ে যায়।

—তুমি। তুমি এখানে? ভালো আছ তো?

সুবাসিনী সেই আড়ষ্টভাব কাটিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে। আজ তার মনে সেই পুঞ্জীভূত অভিমান ঝরে পড়ে।

-এতদিন তো খবরই নাওনি। কত ঝড় বয়ে গেল তোমার স্ত্রী মেয়ে তারা বেঁচে রইল না মরে গেল একথাও ভাবোনি

গয়াগতি জবাব দিতে পারে না। সেও অনেক খুঁজেছিল। কিন্তু সে কথা জানানো বৃথা। তাই দোষই স্বীকার করে আজ। কোনো তর্ক করে এই পরম পাওয়াটুকুকে হারাতে চায় না সে।

সুবাসিনী বলে—ভালোই আছি। মেয়ে বড় হয়েছে। তোমার কথাও শুধোয়, কিন্তু জবাব দিতে পারিনি।

গয়াগতির মনে আজ খুশির আবেশ। সবই আছে তার।

জয়ন্ত চেয়ে দেখছে দৃশ্যটা। তার কাছে অনেককিছুই বিচিত্র বলে বোধ হয়। খবরের রাজ্যে এও একটা বিশেষ খবর।

সুবাসিনী বলে—ওরা জয়ন্ত তোমার খোঁজে এসেছিলাম।

গয়াগতি অবাক হয়।

—ওকে চেনো? জয়ন্ত? ভালো ছেলে, এম এ পাস করে ভালো চাকরি করছে। বুঝলে—এসব দিকে ওদের খেয়ালই ছিল না। আমিই ধমকে ওকে কাজ নিতে বাধ্য করিয়েছি।

জয়ন্ত চুপ করে থাকে। সুবাসিনী বলে—মেয়ে বড় হয়েছে। জয়ন্তকে সেও চেনে। বোধহয় এখানে আসে মিনু কলেজ ফেরত। তাই ভাবছিলাম যদি ভালো ছেলে হয়, ওদের মতে বাধা দোব না।

গয়াগতির চোখের সামনে আগেকার সেই ঘটনাটা ভেসে ওঠে একদিন দেখেছিল এই বারান্দায় সেই মিষ্টি মেয়েটিকে। ফরসা দোহারা চেহারা, ওর মুখখানা দেখে চমকে উঠেছিল গয়াগতি। এ যেন সুবাসিনীরই যৌবনের চেহারা। কিন্তু তারে কোনো কথা শুধোতে পারেনি।

মেয়েও তার বাবাকে চেনে না। পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল।

গয়াগতির চোখের সামনে সেইদিনের দৃশ্যটা ভেসে উঠেছে। ওই তার মেয়ে। আজ তার অনেককিছুই ফিরে পাচ্ছে সমাজের বাইরের পরিত্যক্ত একটি নাম-পরিচয়হীন প্রাণী সে নয় সেও আজ সব পরিচয়

ফিরে পেয়েছে। জয়ন্তকে দেখছে সে। সুবাসিনীর কথার জবাব দেয় গয়াগতি—ওসব ভাবনা আর ভাবতে হবে না তোমায়।

বলহরি কোত্থেকে মিষ্টি এনে হাজির করেছে। গয়াগতি ধমকে ওঠে—এসব কেন?

বলহরি শোনায়—এতবড় সুখবর আর মিষ্টিমুখ হবে না? কিগো জয়ন্তবাবু?

জয়ন্ত চুপ করেই হাসতে থাকে।

হঠাৎ গদাধরকে ঢুকতে দেখে গয়াগতি—পিছনে সেই পুলিশ অফিসার। আজ গয়াগতির সাহস বেড়েছে। ওদের সে পরিচয় করিয়ে দেয় সুবাসিনীর সঙ্গে।

—আমার স্ত্রী।

গদাধরও অবাক হয়। তাহলে প্রমীলার ব্যাপরাটার সঙ্গে গয়াগতির কোনো যোগই নেই। হলধর খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসছে। ওর পাগলামি যেন বেড়ে উঠেছে।

সুবাসিনী আজ খুশিমনে ফিরছে। গয়াগতিই ওকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে যাচ্ছে। নিজের মেয়েকেও দেখে আসবে। গয়াগতি আর সুবাসিনী ট্যাক্সিতে উঠছে।

প্রমীলা সরকার ফিরছিল একাই। হঠাৎ হোটেলের সামনে ওদের দুজনকে দেখে থমকে দাঁড়াল। গয়াগতির সঙ্গে গাড়িতে উঠছে সধবা একটি বয়স্কা মহিলা। দুজনের বেশ হাসিখুশি ভাব। প্রমীলা দেখে চমকে উঠেছে। তার মনের সব কল্পনা তাহলে মিথ্যা।

ওরা চলে যেতে প্রমীলা ঢুকছে, বলহরিই শোনায়—বাবুর স্ত্রী। অনেকদিন দেখা ছিল না—এইবার আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে কিনা, বাবু এইবার শ্বশুর হবেন গো।

প্রমীলা উপরে উঠে চলেছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ।

আজ সে হেরে গেছে। পরাজিত হয়েছে জীবনযুদ্ধে। তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। আবার সেই স্কুল আর সেই জীবন। তিলে তিলে তার সারা মন বিষিয়ে তুলেছে।

ঘরে ঢুকতে যাবে, সামনে ওই হলধরকে দেখে দাঁড়াল। লোকদুটো তার দিকে নজর রেখেছে। হলধর ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। প্রমীলা গর্জে ওঠে—পথ ছাড়ো।

—ছাড়ব, কিন্তু কতদিন পথ চেয়ে থাকব। সেইটা বলে দাও। এবার কিন্তু সহজে ছাড়ছি না। যেতে তোমাকে হবেই। নাহয় চলো কোর্টে—

প্রমীলা ওই পাগল লোকটাকে এড়াতে চায়। তার সামনে সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে, কোনোরকমে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

হলধর তখনও হাসছে।

—ঠিক আছে। এই দরজায় পাহারা রইলাম। এবার আর পালাতে দিচ্ছি না।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়ে পড়ে। পুলিস বারকয়েক আসা যাওয়া করছে খবর পেয়েছে নিধিরাম। তার ঘরে নানা কিছু সাজসরঞ্জাম রয়েছে ওই জাল ওষুধ তৈরির। পুলিস তারও খোঁজ করছে। তাই নিধিরাম মালপত্র সরাবার চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি। গোছগাছ করে দুটো বাক্স রিক্‌শাতে তুলতে যাবে, এমন সময় পুলিসের নজরে পড়ে।

—কি আছে ওতে?

নিধিরাম সরে পড়বার চেষ্টা করে, কিন্তু আর তা পারে না। দেরি হয়ে গেছে। মালপত্র সমেত ধরা পড়ে যায় এতদিন পর।

—আর কি কোথায় আছে?

বলহরিই বলে দেয়—দুটো পেটি নীচে রেখেছেন বাবু। ওই যে ওনার মাল। বলছিলেন গুদামঘর ভাড়া নেবেন।

পুলিস অফিসার হাসেন।

—তাহলে কাববাব বেশ জোবই চলছে বলতে হবে। তোলো ওই দুই পেটি। আপাতত থানায চলুন নিধিবামবাবু।

গদাধব নিজেব দবকাবে পুলিসেব পেছনে ঘুবছিল। পুলিসকে অন্য মামলায ব্যস্ত হতে দেখে বলে—স্যাব, আমাদেব কেসটা? মানে ভদ্রমহিলা ফিবেছেন—

অফিসাব ভদ্রলোক বিবক্তিভবা স্ববে বলেন—দেখুন, স্বেচ্ছায যদি তিনি না যেতে চান আমবা ধবে পাঠাতে পাবি না। কোর্টে যান। তাছাডা ভদ্রমহিলা তো বইলেন কাল আসা যাবে।

গযাগতি চমকে উঠেছিল। হোটেলেব অনেকেই ভিড কবেছে।

মৃণাল স্থিবদৃষ্টিতে চেযে আছে। তাব হিসাবে একটা মস্ত ভুল হযে গেছে।

হলধব চীৎকাব কবছে গদাধব তাকে থামাবাব চেষ্টা কবে।

ওদেব সব চেষ্টা ব্যর্থ হযে গেছে। সেই প্রমীলা সবকাবেব বন্ধ দবজাটা খোলা। পুলিস এসেছে।

কাল বাত্রে প্রমীলা স্লিপিং পিল খেযে ঘুমিযেছিল। এই জ্বালা ব্যর্থতাব হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেযেছে সে চিবকালেব জন্য। সেই ঘুম আব ভাঙেনি।

ওবা পাহাবা দিযেও তাকে আটকাতে পাবেনি। প্রমীলা কি নিদাকণ হতাশা আব অপমান বুকে নিযে চলে গেল।

গযাগতি অবাক হয।

—তাই বলে এমনি কবে আত্মহত্যা কববে?

মৃণাল চুপ করে বসেছিল। জযন্তও আজ সবে যাচ্ছে। এতদিন ওকে আটকে বাখাব বৃথা চেষ্টা কবেছিল মৃণাল। তাব ধ্যান ধাবণা দৃষ্টিকোণ সবই কি প্রচণ্ড আঘাতে চুবমাব হযে গেছে মেযেদেব সম্বন্ধে তাব এতকালেব ধাবণাটা যে ভ্রান্ত তাও বুঝেছে সে।

নাহলে চলে যাবে কেন প্রমীলা?

ওবা দেহসবস্বই নয

তাব অতলে একটি ব্যাকুল মনও বযে গেছে যে মন বাচতে চায, ভালোবাসতে চায, সুখী হতে চায।

তাই প্রমীলা স্বপ্ন দেখেছিল সাবা মন দিযে। সেই স্বপ্ন নিদাকণভাবে ব্যর্থ হযে যেতে তাব কাছে জীবন অর্থহীন বলে মনে হয, দুর্বিব বোঝাই হযে ওঠে।

সেই অসহ্য যন্ত্রণাব বোঝা বইতে সে পাবেনি। হেবে গেছে।

মৃণাল বলে—মেযেটা তাহলে ভালোই ছিল গতিবাবু।

গযাগতিবাবু নিজেকেও অপবাধী বলে ভাবে মনে মনে। ওব কথায জবাব দেয—তা তো ছিলই হে। ওবা খাবাপ নয—খাবাপ কবে ওকে একালেব লোভী মানুষ অব পাপীব দল। তাবা ভেবে নেয মেযেমাত্রই ভোগেব বস্তু। তাবা ঠকাতেই জানে পুরুষকে। খুব পণ্ডিত ওই পুরুষেব দল।

মৃণাল জবাব দিল না।

মনে হয তাই বোধহয ঠকেছে মৃণাল। জযন্তও সেই কথা বলে। সে সুখী হতে চলেছে। জ্বলছে মৃণাল কি দুঃসহ জ্বালায।

জযন্তেব মনে আজ অন্য সুব। লেখাব ক্ষেত্রে সেই প্রীতি আব দবদী মনেব স্পর্শ তাকে সিদ্ধিব দ্বাব প্রান্তে এনেছে। সেই লেখাটা বেব হযেছে ভালো একটা কাগজে।

চাবদিক থেকে প্রশংসা আসছে। কোনো নামকবা পবিচালক সেই গল্প ছবি কবতে চলেছেন। উপন্যাসেব হিন্দি অনুবাদও বেব হচ্ছে। নতুন লেখায হাত দিযেছে আবাব।

এই কৃতিত্বেব একজন অংশীদাবও আছে।

সে ওই মিনু। জযন্ত সাবাদিনেব কাজেব পব এই মুক্ত উদাব পবিবেশে ফিবে আসে। মহানগবেব সেই বুকচাপা ঘিঞ্জি স্যাঁতস্যেঁতে চালাটায শ্বাস উঠে গেছে তাদেব। জযন্ত এখন ঘব বেঁধেছে শহবেব উপকণ্ঠেব

সেই ছোট্ট সুন্দর সবুজের মাঝে।

সুবাসিনীও নিশ্চিন্ত হয়েছে। আজ তার সব ফিরে পাবার দিন।

মিনুও সুখি হয়েছে জয়ন্তকে কেন্দ্র করে। জয়ন্ত নাম করছে, লিখছে এখন, তার মনে সেই প্রসন্নতার স্পর্শ। এ দুনিয়াকে মানুষকে সে দরদী মন নিয়েই বিচার করেছে। সুখী হয়েছে।

মাঝে মাঝে দেখা হয় মৃণালের সঙ্গে।

মৃণাল তেমনিই রয়ে গেছে। কোথায় উল্টোডাঙ্গার দিকে একটা চালাঘরে নিজের স্টুডিও মতো করেছে। সেইখানেই থাকে।

বলে সে— এ আমার রোগই বলতে পারিস; সারবে না এটা। এই করেই একদিন ফুরিয়ে যাব। মনে হয় কি জানিস? জীবনে অপরকে আঘাত করতে গিয়ে নিজেই সেই আঘাত ফিরে পেলাম। শূন্য হয়ে গেলাম।

মদেই ডুবে থাকে সে।

রাত নামে।

আকাশের বুকে চাঁদের আলো জাগে। নারকেল গাছের পাতায় উছলে পড়ে সেই চাঁদের আলো, পাখি ডাকে।

সুপ্তিমগ্ন এই পৃথিবীর এক কোণে জয়ন্ত তখনও লেখায় ব্যস্ত।

তার জগতে তখন মানুষগুলো সজীব হয়ে ওঠে।

প্রমীলা সরকার—মৃণাল—মিনু—গয়াগতি—ওরা আরও অনেকে। সেই হলধরের কান্না সে ভোলেনি। সেও ভালোবেসেছিল, কিন্তু প্রমীলাও ভুল বুঝেছিল তাকে।

ওরা পথ হারিয়ে ফেলে এই ভিড়ে।

বাঁচার নিশানা আশ্বাসটুকুও ফুরিয়ে যায়। তাই হার মানে। ঠকে যায়। সেই পরাজয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে জয়ন্ত।

সে ভালোবেসেছে এদের সবাইকে—নিজেকে।

ছায়ানট

নশীরাম দত্ত জাবেদা খাতা খুলে বসেছে। বাইরের চত্বরে দু-চারজন খাতক বসে আছে। সাল জাবেদা খাতাখানায় ওদের হিসাব-পত্তর সব লেখা।

মূল টাকা কত তারিখে কে নিয়েছে, তার সুদ—তস্য সুদ যোগ দিয়ে মূলধনটা আবার দ্বিগুণে পৌঁছেছে বছর ঘুরতে না ঘুরতে,আবার সেই ডবল মূলটাকার সুদ —তস্য সুদ জমছে, সুদ মূল বেড়েই চলেছে।

যে টাকা খাতক জমা দিয়েছে, সেটা অবশ্য জমা পড়েছে, কিন্তু চক্রবৃদ্ধিহাবে সেই সুদমূলের গতি কোনো ভাবেই কমে না, পৌনঃপুনিক যোগফল যা দাঁড়ায় তার খবর শুনে রতন পাল-এর ধাত ছাড়বার উপক্রম হয়।

অস্পষ্টস্বরে শুধায়—আজ্ঞে! ইটা কেমন হিসাব হল?

লিলম পাঁচকুড়ি টাকা, তখনই কুড়ি টাকা সুদ কেটে চারকুড়ি হাতে দ্যালেন, বছরের এমাথায় ধান উঠলি দ্যালাম দুকুড়ি টাকা, বাকি রইল দুকুড়ি মূল আর সুদ।

নশীরাম এর সরকার বিজয় ঘোষ কিছু বলবার আগেই নশীরাম নাকে নিকেলের চশমা লাগিয়ে বলে –

– দেখি হিসাবটা। এাই তো—

তারপর সুদ আর মূলের লীলাখেলার কথাটা সে যা জানায় তাতে রতন পাল কেন উপস্থিত খাতকদের মধ্যে পরাণ ঘোষ, বিষ্টু আখুলি, হৃদয় পান ইত্যাদি সকলেরই তখন অবস্থা কাহিল।

মনে হয় এ যেন সাপের ব্যাঙ ধরা।

ব্যাঙটা যতই চিঁ চিঁ করুক সাপ নড়ে-চড়ে তাকে পুরোটা গিলে বসবেই।

পরাণ বলে—দত্তমশায় আমার হিসাবে দুকুড়ি টাকা জমা ন্যান, পরে এসে বাকি টাকার হিসাব দেখে মিটাবো কিছু।

নশীরাম বলে—বেশিদিন টাকা ধার ফেলে রেখো না বাবাসকল। জানো তো—টাকারাও বাচ্চা পাড়ে। তাই ওসব ছা পোনা বেশি হবার আগেই ওই হিসেবনিকেশ করে দাও।

হিসেবনিকেশ করতে ওরাও চায়।

কিন্তু পারে না। সামান্য কয়েক বিঘে জমির মালিক, অনেকে পরের জমি ভাগে চাষ করে, সারাবছর খেটে মালিককে দিয়ে যা থাকে তাতে নশীরামের মতো লোকের ঋণ শোধ হবার নয়।

বিষ্টু আখুলি বলে— হিসেব তো নিকেশ করতি চাই দত্তমশায়, কিন্তু হিসেব কুন কালেই নিকেশ হবে না। আমাদিগকে নিকেশ করবে।

নশীরাম দত্ত হাসে।

কি যে বলিস বাবা। আমার হিসেবে কোনো গোলমাল নাই বাবা। দ্যাখ, দেখে নে।

নশীরাম তার খাতাপত্র সবই মেলে ধরে।

কিন্তু ওই পিঁপড়ের সার ধরানো এদের অনেকের কাছেই জটিল হেঁয়ালির মতোই মনে হয়।

বেলা হচ্ছে।

বর্ষার ছোঁয়া লেগেছে। আকাশ ঢেকে কালো মেঘ জমছে, এসময়ে গ্রামের মানুষের সময় নেই। মাঠে চাষ শুরু হয়েছে পুরোদমে।

সবুজ ধান চারাগুলোকে তুলে বড় জমিতে কাদা করে সারবন্দী কামিনের দল পুঁতে চলেছে। কাজ ওদের সকলেরই। চাষ প্রায় সারা হয়ে আসছে।

তবু চেষ্টা করে ওরা যে যত আগাম পুঁততে পারবে চারা তত ভালো হবে। আষাঢ়ের প্রথমদিকেই এবার বর্ষা নেমেছে মাঠে ধান অনেক পোঁতা হয়ে গেছে। বাকি জমিগুলোও পোঁতার জন্য তাড়া চলেছে।

এক পশলা বৃষ্টি নামে।

ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছে বৃষ্টিভেজা কাশবন,তালগাছগুলো বাতাসে পাতা নাড়ছে।

নশীরামের খেয়াল হয়।

মাঠে এখনও পুরোদমে মজুর লাগিয়ে কাজ চলেছে। ওদিকে ধান পোঁতা শেষ করে পাট কাটতে হবে। বহু জমি নশীরামের, অবশ্য ইদানীং সরকার নানা আইন করে জমি বেশি রাখতে দেবে না কাউকে। জোতদার নামক শ্রেণী তারা তুলে দিতে চলেছে।

কিন্তু নশীরামের উর্বর মস্তিষ্কে এমন কিছু হিসেব আছে যা দিয়ে ওই জমির পরিমাণ-এর ব্যাপারটাকে সে চাপিয়ে দিয়ে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে চলেছে। তার জমি বেশি নেই

তবে তস্য পুত্র মদন, অর্ধাঙ্গিনী, ভাইপো, সমন্ধী, তার ভাগ্নে ইত্যাদির নামে ছড়ানো জমি যা আছে তাও কম নয়।

নশীরাম আজও মাঠে যায়।

কারণ সকলেই নাকি তার মতো ধার্মিক নয়। ওরা ধম টর্ম মানে না। মালিককে ফাকি দেয়। কাজের সময় আলের মাথায় বসে ফুক্ ফুক করে বিড়ি টানে, তামাক খায়। আর জল খাবার নাম করে আধঘণ্টা কামাই করে।

তার মজুরদের জল খাবার বরাদ্দ একপাই হিসেবে মুড়ি, জলে ভিজোলে সেই মুড়ি এইটুন হয়ে যায় পাঁচ-সাত মুঠোয় তা শেষ হয়ে যাবে কয়েক মিনিটে।

কিন্তু সেইদিকে যায় না ওরা।

আলের মাথায় গোল হয়ে বসে এক মুঠ এক মুঠ করে মুড়ি চিবোতে থাকে কুড়কুড় করে পাকা আধঘণ্টা ধরে দাঁত এর ব্যায়াম করাবে, চোয়াল খেলাবে

নশীরাম বলেও পারেনি ওদের।

বলে নশীরাম- ধম্মো তোদের নেই র‍্যা।

নশীরামের নিজ ধর্মের প্রতি ভক্তি বেশ আছে। আর একটু বেশি মাত্রাতেই আছে। নিজেও কোনো গুরুদেবের কাছে মন্তর টন্তর নিয়ে বেশ ভক্তিমান হয়ে উঠেছে। তিলক পরে গলায় কণ্ঠি।

আগে তেমন আয় পয় ছিল না। জমিদারী উঠে যাবার মুখে এ গ্রামের জমিদার ভুবন সেনের কাছ থেকে কিছু দিয়ে নায়েবকে হাত করে বেশ জমি এর তার নামে নিয়েছিল। তাই থেকেই ক্রমশ ফুলে উঠেছে।

ইদানীং তো ধানকল, তেলকল, সুদি কারবার নানা কিছু ব্যবসাপত্র করে দাঁড়িয়ে গেছে নশীরামবাবু।

তবুও মাঠে যেতে হয় তাকে।

বলে- ওহে রতন, বিষ্টু,আজ সব ওঠো বাবা তোমাদেরও চাষবাষ এর কাজ আছে। ধান পোঁতা হয়ে যাক। পাট ওঠার মুখে আবার হিসেব হবে

তবে ওই কথা— হিসেব নিকেশ করো। বুঝলে।

নশীরাম ওদের বিদেয় করে।

এবার মাঠের দিকে যাবার আয়োজন করে ওদিকে বিরাট মন্দির অট্টালা বানিয়েছে। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাও করেছে নশীরাম।

তার ওপাশে লাগোয়া ঘরে বেসুরো গলায় গান আর দুম দাম তবলার শব্দ শুনে চাইল

শুধোয় সে —মদন আড়তে যায়নি সরকার?

মদন নশীরামের একমাত্র পুত্ররত্ন।

বাবার একেবারে বিপরীত। দোকান—ব্যবসায় বোঝাবার চেষ্টা করে মদন অবশ্য বসে কিছুক্ষণ। কিন্তু বাবার মতো এখনও আসনসিদ্ধ হতে পারেনি।

তবে ইয়ারবন্ধু, সহচর কিছু আছে।

তারাও এসে পড়ে এই বৈঠকখানা ঘরে, হারমোনিয়াম, তবলা নামে। সঙ্গীত সাধনা শুরু হয়।

মদন নাকি বিরাট কালোয়াতি গাইয়ে হবে তার উপর চলছে যাত্রার মহড়া।

নশীরাম বেশ ধূম করে মন্দিরে ঝুলন উৎসব করে। এবার মদন জেদ ধরেছে, একরাত কেত্তন হবে, আর দু'রাত তাদের দলের যাত্রা হবে।

বাইরের দলও আসে। এবার তারা গাইবে একরাত।

সেই যাত্রার মহড়াই চলছে বোধহয়।

নশীরাম বলে—মদন তাহলে ওইসব যাত্রা-গান নিয়েই থাকবে সরকার? ক'দিনে সর্বস্ব যাবে তবু নজর নাই?

এর বেশি কিছু বলার সাহস নেই নশীরামের।

ছেলেকে মানুষ করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার ছেলের মায়ের কাছে নাজেহাল হয়ে এখন হাল প্রায় ছেড়ে দিয়েছে নশীরাম.মনটা ভালো নেই।

নশীরাম লোকসান দেখতে পারে না। বহু কষ্টে তিল তিল করে সে এই বিষয় করেছে, তাই ছেলের বিচিত্র ব্যবহারে গজগজ করে বের হল বাড়ি থেকে মাঠের দিকে। আবার বৃষ্টি নেমেছে।

ততক্ষণে গ্রামের বাইরে এসে পড়েছে নশীরাম, ছাতাটা খুলতে গিয়েই বিপদ। ছাতার শিকের ফাঁকে কাপড়ের ভাঁজে রয়ে গেছে একটা আরশুলা।

ছাতা মেলতে সে ছটফট করে, দৌড়াদৌড়ি করে, বৃষ্টিতে মাটিতে পড়ে ভেসে যাবে এইবার।

দৃশ্যটা দেখে নশীরাম ছাতাটা বন্ধ করে ফেলে। আরশুলা ঘরের লক্ষ্মী, ওই আরশুলা হয়তো লক্ষ্মীরূপে তার ঘরে বিরাজমান। সেই আরশুলাকে সে কিছুতেই ঘরের বাইরে ফেলে লক্ষ্মীহীন হতে যাবে না।

আরশুলা সমেত ছাতা বন্ধ করে আবার ওই বৃষ্টিতে বাড়ি ফিরে তার ঘরের মধ্যে এসে লক্ষ্মীরূপী সেই আরশুলাকে ছেড়ে দিয়ে আবার নশীরাম বের হচ্ছে।

তার স্ত্রী দেখছে ব্যাপারটা। ওদিকে বাইরের ঘরে শীতের বৃষ্টির আমেজে চা আর তেলেভাজা চলছে তাও দেখেছে। গানের আসর বসিয়েছে মদন।

এমন সময় স্ত্রীর কথায় দাঁড়ায় সে।

—ফিরে এলে যে? বৃষ্টিতে ভিজে গেছো তবু ছাতা খোলোনি?

এসব তুক-তাক্ বিশ্বাসের কথা নশীরাম কাউকে জানাতে চায় না। ছেলের বিলাস আর গিন্নীর ওই ন্যাকামি দেখে হাড় জ্বলে গেছে তার।

নশীরাম গর্জন করে—আমার খুশি। যার যা ইচ্ছে করছে, দেখতে পাও না? ওদিকে এত মজুর লেগেছে তোমার ছেলেকে একবার তো যেতে বলতে পারতে?

গিন্নী বলে—ওমা, এই বৃষ্টিতে যাবে ও।

ফুঁসিয়ে ওঠে নশীরাম।

—ও যাবে না, ওর বাপ যাবে! যত্তো সব। বের হয়ে গেল নশীরাম ছাতা মেলে মাঠের দিকে। তখন বৃষ্টি কিছুটা ধরে এসেছে।

বর্ষাকালের বৃষ্টির ধারাই এই।

আসে মেঘ ঝাঁপিয়ে আবার কিছুটা বৃষ্টির পর সরে যায় মেঘগুলো।

সেনকর্ত্তা দেখছেন বৈঠকখানায় বসে।

আনমনে তানপুরার সুর তোলেন।

বিষণ্ণ সকাল—একদিন সেনকর্ত্তাদের এই দিকের রমরমা ছিল। এইটাই ছিল সদর।

কাছারি বাড়ি। সেনবংশের তিনিই বেশ হিস্যার মালিক। তখন বাড়িতে গান বাজনার রেওয়াজ ছিল। নিজেও ভালো গাইতেন।

এখন জমিদারি চলে গেছে। আয় পয়ও নেই। বিরাট বাড়িটা ধসে পড়ছে, অন্য সরিকরা অনেকেই কেউ চাকরি-বাকরি, কেউ ব্যবসা-পত্র নিয়ে চলে গেছেন বাইরে।

সেনবাবুর দুই ছেলেও শহরে বাস করছে সরকারি চাকরি নিয়ে। কোনোরকমে এবাড়ির শেষ বংশধর হিসেবেই সেনকর্ত্তা গিন্নীকে নিয়ে রয়ে গেছেন।

এমনি বর্ষার দিনে মনে পড়ে হারানো অতীতের কথা। আজ তার রেওয়াজ করা হয়নি। ডাক দেন তিনি। —অতুল। অতুলরে। একটু তামাকের দরকার।

অতুল ওদিক থেকে সাড়া দেয়।—আজ্ঞে যাই কর্ত্তামশায়।

ছেলেটা এখানেই থাকে। সেনকর্ত্তা মশায়ের আশ্রয়ে থাকে। সুন্দর চেহারা আর তেমনি গান গায়। বাবা-মা ওর কেউ নেই।

সেনকর্ত্তা ওকে কয়েকবছর আগে এখানে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ক'বছরেই অতুল সেনকর্ত্তার বৈঠকখানায় গান-এর রেওয়াজ শুনে শুনে নিজেই ওসব গাইতে পারে।

সেনকর্ত্তা সেবার ওর এই গান শুনে অবাক হন, বসন্তের সব পর্দা নিখুঁতভাবে গলায় তুলেছে। জয়-জয়ন্তিও গায চমৎকার।

সেনকর্ত্তার এখানে থাকত—গরু বাছুরগুলোকে খেতে দিত, রাখাল না এলে চরাতে নিয়ে যায় মাঝে মাঝে। সেনকর্ত্তা বলেন—তুইও গান শেখ অতুল। সকাল-সন্ধ্যা বসবি।

কয়েক বছরের মধ্যে অতুল এখন বেশ ভালো গান গাইতে পারে। ওটা যেন তার স্বভাবের সঙ্গে মিশিয়ে আছে। অতুলকে দেখে বলেন সেনকর্ত্তা।

—কোথায় যাচ্ছিস রে?

অতুল বলে—রাখাল আসেনি, গরুগুলোকে একটুন চরিয়ে আনি, নালে বাদলার দিন বেতে যাবে গো। অতুল বুঝেছে কর্ত্তামশায়ের তামাক চাই।

সে বলে, তামাক চাই তো, দাঁড়ান সেজে দিয়ে যাই। সেনকর্ত্তা তামাক পেয়ে খুশি।

শুধোন—যাত্রা কেমন হবে রে? মদন দত্ত তো শুনছি খুব নাম করছে। তুই কিসের পার্ট করবি?

—কিষ্ট সুদামায় কিষ্টের পার্ট করব। পাঁচখান একদম গান আছে। মাষ্টার তুলে দিছে তিন খান। সাঁঝবেলায় শোনাব।

খেয়াল হয় অতুলের। বলে সে—

—এখন আকাশ চকোসা হয়েছে, যাই এবেলা ঘুরে আসি।

গরুগুলো নিয়ে বের হল সে। পরাণ ঘোষ মাঠে চলেছে।

ধান ভালোই হয়েছে এবার। নিড়োতে হবে। তবু ভাবনায় পড়েছে সে। ওই নশীরাম-এর ওপর রাগও হয়। লোকটা যেন পিশাচ।

কি করে ওর ঋণ শুধবে জানে না।

এদিকে বাড়িতে তার মেয়েও উঠছে পর পর দুটি। ললিতার বিয়ে দিতে পারলে হয়, তারপরেই আন্নাকালী। তারও হাঁফালো গড়ন।

মেয়ের বিয়ের জন্য বাড়িতেও তাড়া দেয়।

কিন্তু পরাণের করার কিছুই নেই। তবু বলে-

—দেখছি। বিয়ে তো হুট্ বললেই হয় না।

ওটা তার অক্ষমতার নামান্তর মাত্র। বেলা হয়ে আসছে।

পরাণ বলে—মাঠে যাচ্ছি গো উত্তরের মাঠে ধান নিড়োতি লাগবে। দিন ভর ওখানেই থাকব। ললিতাকে বলো ভাত নিয়ে যাবে।

পরাণ বের হয়ে যায়।

ললিতা ওদিকে তার বন্ধুর বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। কাজের ফাঁকে একবার চলে আসে সই-এর বাড়িতে।

মেঘ একটু ধরেছে।

পথে নেমে চাইল ললিতা। অতুল গরু ক'টা নিয়ে চলেছে মাঠের দিকে।

ললিতা চেনে ওকে ভালো করেই।

ছেলেটাকে ভালো লাগে তার। ললিতাদের বাড়িতে এককালে তার দাদু বেঁচে থাকতে কীর্ত্তনের আসর বসত। বুড়ো নিজেও ভালো পদাবলী গাইত।

অতুল তখন থেকেই আসত এ-বাড়িতে।

খুব দাদু বলত—খাসা গলা রে তোর অতুল। তালজ্ঞানও সুন্দর। তোর হবে!

ওর দাদুও দু-চারটে পদ শিখিয়েছিল তাকে। ললিতাও গাইত দাদুর সাথে। সে বেশ কিছুদিন আগের কথা। দাদু মারা যাবার পর সেই পাট সব উঠে গেছে। ললিতা অতুলকে দেখে বলে—

— ওমা কেষ্টঠাকুর যে গো। গোঠে চলেছ বুঝি ধবলী কমলীদের নিয়ে। তা পীতধড়া বনমালা এসব কই?

অতুল চাইল ওর দিকে।

ললিতার কথায় বলে—রাধিকাই নাই তাই শোকে-দুঃখে ওসবও নাই। এমনিই গোঠে চলেছি।

ললিতা হাসে—সখ কত। চলে গেল সে গলি পথ দিয়ে।

অতুল গরুগুলোকে তাকিয়ে নিয়ে চলেছে উত্তরের মাঠের দিকে।

গ্রামের লাগোয়া সব জমিতেই ধান চারা। ওদিকে বাবুদের খানিকটা ফাঁকা ডাঙ্গা কোনোমতে বেঁচে আছে। এককালে বাগান ছিল। দামী গাছ—ভালো আমগাছগুলো সব কাটা পড়ে গেছে। দু-একটা গাছ টিকে আছে কোনোরকমে, ওদিকে শুরু হয়েছে ধান ক্ষেত।

অতুল গরুগুলোকে এনে ওই ফাঁকা মাঠটায় ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জল পেয়ে ঠাই ঠাই ঘাস গজিয়েছে। অতুল চেয়ে আছে দিগন্তপ্রসারী ওই মাঠের দিকে।

মেঘগুলো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, কয়েকটা টুকরো একত্রিত হয়ে এক পশলা বৃষ্টির আয়োজন করছে। দিগন্ত ছেয়ে আবার বৃষ্টি নেমেছে।

ওদিকের মাঠে দু-একজন ধান নিড়োচ্ছে, দূরে নশীরামের ওপাশের একটানা জমিতে বেশকিছু মজুর ধান পুঁতছে। এ পাশের ধানগাছে এসেছে কালচে ছায়া।

অতুল গরুগুলোকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে মাঠের এদিক বটতলায় এসে দাঁড়াল, বৃষ্টির জলপাওয়া মাটিতে সবুজ ঘাসগুলো ঘন হয়ে উঠেছে, গরুগুলো খাবার পেয়ে মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে, এদিক ওদিক পালাবে না ওরা এখন। দিগন্তপ্রসারী মাঠে এসেছে নোতুন ধানের ইশারা। এর মধ্যে এবার ধান গাছে কালচে সবুজ রং এসেছে। পয়লা আষাঢ়ে বর্ষা নেমেছে, চাষ এবার বেশ ভালোই হবে বোধহয়।

ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির মিষ্টি একটা সুর আছে। ধানগাছের, বটগাছের পাতায় জমা জলে বৃষ্টি যেন নাচের আসর বসিয়েছে। গুনগুন সুর ওঠে অতুলের গলায়। সেনকত্তার বৈঠকখানায় বসেছে সেই সুরটা, সে শুনেছে কতদিন।

ভগবান অতুলকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করেছেন। মা, বাবা কেউ ওর নেই, বাবা কবে মারা গেছে,

মাটির ঘরটা মিশিয়ে গেছে ধুলোয়। মাকেও তার মনে পড়ে না। বেওয়ারিস ছেলেটা এখান ওখান ঘুরছিল তখন খিদের জ্বালা সহ্য করে।

ভুবন সেন মশায় তাকে আশ্রয় দেন এক বর্ষার রাতে। সেই থেকে ছেলেটা ওর বাড়িতেই আছে।

এ গ্রামের জমিদার ছিল ঐ সেন বংশ। এককালে খুবই বোল বালান্ত ছিল তাঁদের। বিরাট প্রাসাদ, নাটমণ্ডপ, কাছারীবাড়ি সবই ছিল। এখনও আছে, তবে বাড়িগুলোই টিকে আছে কোনোমতে। জমিদারী এখন আর নেই। সেনকত্তাই টিকে আছেন সেই বাড়ির শেষ প্রতিভূ হয়ে। সৌখিন লোক। আর মেজাজও তেমনি। সাধ্য নেই তবু মানুষটা এখন কোনোরকমে টিকে আছেন। অতীতে গান-বাজনার সখ ছিল। নিজেও ভালো গাইতে পারেন বিষ্ণুপুররে ঘরওয়ালার গান। মেঘমল্লার-এর সুরটা তুলে নিয়েছে অতুল ওকে গাইতে দেখে।

—বৃষ্টির ওই সুরে মিশেছে ওর সুর। বরষ রে—বরষরে—

কতক্ষণ গেয়েছিল জানে না। হঠাৎ খেয়াল হয় ছেলেটার চীৎকারে!

নশীরাম দত্ত গাঁয়ের কিপ্‌টে মহাজন, শীর্ণ পাকানো চেহারা, বদবুদ্ধির ডিপো। গ্রামের সর্বস্ব গ্রাস করতে করতে অমনি কাঠ হয়ে গেছে নিজে। তবু খিদে মেটেনি তার।

নশীরাম গর্জন করছে—এই হারামজাদা, তা -না না সুর হচ্ছে, এদিকে গরুতে ধান ক্ষেত মুড়িয়ে দিল খেয়াল নাই? এ্যাঁ—চোখেও দেখিস না?

কোন্ ফাঁকে দুটো গরু মাঠ ছেড়ে ধান ক্ষেতে নেমে তাজা ধানগুলো খেতে শুরু করেছিল, সেই ফাঁকে নশীরাম এসে পড়েছে।

দৌড়ে যায় অতুল, গরু দুটোও এবার বুঝতে পেরে উঠে গেছে। কিন্তু ক্ষতি যা করার করেছে ধানক্ষেতে।

নশীরাম এবার লাফ দিয়ে এসে ধরেছে অতুলকে, লোকটা সিটকে হলে কি হবে, ওর হাতগুলো কাঠি কাঠি, কিন্তু সাঁড়াশীর মতো কঠিন, আর গলায় জোরও বেশ।

মাঠের ধান খেয়েছে গরুতে এমনি ক্ষতিটা দেখে নশীরামও এগিয়ে এসে খপ করে অতুলের গোছা চুলের মুঠি ধরে ছাতাটা দিয়ে বেদম ঘা কতক পিটিয়ে চলেছে। মার খাচ্ছে অতুল মুখ বুঁজে।

—ছাড়েন, ছাড়েন, কত্তা!

পরাণ ওদিকের জমিতে ধান নিড়চ্ছিল, নশীরামকে ওইভাবে ছেলেটাকে মারতে দেখে এগিয়ে এসে সেও কাকুতি মিনুতি করে ছাড়াল ওকে। বেচারা।

ছেলেটাকে বেশ পিটিয়েছে সে, কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে, নশীরাম নেহাৎ দয়া করে যেন ছেড়ে দিল। তবু গর্জাচ্ছে সে বেশ রাগের মাথায়।

—আজ ছেড়ে দিলাম, এরপর দেখলে শেষ করে দেব। ওই সেনকত্তাকে বলবি, গরুর পাল খোঁয়াড়ে পুরে দেব, তোকেও মাঠে পুঁতে রেখে দে যাব। উঃ কি খেতি হয়ে গেল আজ। হন্‌হন্ করে চলে গেল নশীরাম দত্ত।

পরাণ দেখছে ক্ষতির পরিমাণটা খুবই সামান্য। মাত্র গরুগুলো সবে নেমেছিল দু-এক ঝাড় ধান মুখ দিয়েছে, সাধারণ ব্যাপার। এ নিয়ে এত বড় শাস্তি দেবার দরকার ছিল না।

পরাণ শুধোয়—লেগেছে খুব নারে?

অতুল গুম হয়েছিল। এভাবে তাকে মারবে দত্তমশায় তা ভাবেনি। বেশ খুশি হয়ে গান করছিল ওই ছেলেটা। গানের মাঝে কি তৃপ্তি পায় অতুল, তার শূন্যতা সব ভরে ওঠে। কিন্তু তারপরেই এভাবে মারবে তাকে ওই নশীরাম তা ভাবতে পারেনি। ওরা মারতেই জন্মেছে আর তারমতো হতভাগারা জন্মেছে সেই মার খেতে। অতুল বলে বেদনার্ত সুরে,—নাঃ লাগেনি গো।

হঠাৎ কে তীব্র সুরে বলে ওঠে—না। তা লাগবে কেন? ওকি মানুষ, ও তো পাথর। ওকে লাগে না।

চাইল অতুল কথাটা শুনে, ললিতা ওই ঝিমঝিম বৃষ্টির মধ্যে জামবাটিতে করে ওর বাবা পরাণ মোড়লের জন্য খাবার এনেছে। এ সময় মাঠ ছেড়ে গিয়ে খেতে সময় নষ্ট হয়, তাই ললিতাই খাবার আনে মাঠে। নশীরামের ব্যাপারটা সেও দেখেছে।

ললিতা বলে—চুপ করে মার খেলে কেন? জবাব দিতে পারলে না লোকটাকে? অতুল চুপ করে থাকে। ললিতা যেন নিজের জবাবটা পেরে যায়।

বলে সে—বড়লোক তাই যা খুশি কববে? এর বিচার নাই? এমনি করে মারবে?

ললিতা এই জগৎটাকে চেনে না। ও জানে না এর নিয়ম। সদ্য কিশোরী মেয়েটি বলে—আমি হলে ওর মুখে থাপ্পড় মারতাম। মারা ঘুচিয়ে দিতাম।

পরাণও প্রতিবাদ করতে পারেনি। কারণ পরাণ ওই নশীবামের কাছে তার স্ত্রীর অসুখের সময় কিছু টাকা নিয়েছে, শুধু পরাণ কেন গ্রামের অনেকেরই টিকি বাঁধা আছে ওই লোকটার কাছে। তাই ওর অনেক অন্যায় অত্যাচার সইতে হয় তাদেব। তারা অক্ষম অসহায়। এটা জানে তাবা। তাই পরাণ প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য বলে ছেলেটাকে,

—নে, তুইও একগাল খেয়ে নে অতুল। খিদে লেগেছে, নাবে?

ললিতা বলে ওঠে, বেশি কবেই ভাত এনেছি বাবা। তুমি খেয়ে নাও, পরে আমরা খাচ্ছি। ওরও হয়ে যাবে।

কালো মেঘস্তব আকাশ ছেয়ে এগিয়ে আসে, শালবন সীমা পার হয়ে, ললিতা আর অতুল ফিরছে গ্রামের দিকে।

মেয়েটাব মাথায় খাবাবের শূন্য কাঁসার বাটি - ওব চলায় জাগে ছন্দ, নিটোল দেহে সাড়া জাগে। বৃষ্টি নামে আকাশ ছেয়ে। কালো মেঘগুলো নেমেছে দিগন্ত জুড়ে। এমন বৃষ্টি ওদেব উপর দিয়ে ঝরে যায়। শিহবণ জাগে ওদের দেহে মনে।

গ্রামের পরিবেশে বর্ষার এই বিচিত্র রূপটাকে কি মুগ্ধ চাহনি মেলে দেখে অতুল। ওর মনের অতলে একটা শক্তি আছে হয় তো আকাশ থেকেই জন্মেছে যা তাকে ওই বেদনাগুলোকে ভুলিয়ে দেয়। দেখছে অতুল বৃষ্টি ভেজা ওই মাঠ, গাছ-গাছালি ওই ললিতাকে।

সব কেমন সতেজ সুন্দর। এই বিচিত্র সৌন্দর্যেব জগতে তাই সুব ওঠে, ছন্দ জাগে, ললিতার দেহে ফুটে উঠেছে সেই ছন্দ। ললিতা শুধোয়—কি দেখছ?

অতুল বলে— তোকে। তোকে দেখলে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যাইরে। মনে হয় এ জগতে শুধু দুঃখই নেই—আনন্দও আছে। ললিতা বলে

সেনকত্তাব ওখানে থেকে ওই সব বাবুদেব মতন ভালো ভালো কথাই শিখেছ, আর গান,ওতে কাজ হবে? দিন চলবে? পেট ভববে?

—তবে? অবাক হয় অতুল। অন্য কোনো কথা সে ভাবেনি। নোতুন কথা শুনছে।

ললিতা বলে—সেনকত্তাকে বলো না—তোমাকে ওদেব কিছু জমি ভাগে দেন, কোনোরকমে চাষ-বাস ফেঁদে একটু ঘব করো। চাষ বাস করবে

হাসে অতুল ওর কথায়—ওমনি করে যারা চাষ বাস কবে একটু কুঁড়ে বাঁধে তাদের অবস্থা দেখছে সে। ধান যা হয় তা মালিককে ভাগ দিয়ে যেটুকু থাকে তাতে বছরে চলে না। এখানে ওখানে জনমজুরি করতে হয়, বর্ষাব আগে মাঠে চাষ কবার জন্য ধার দেনা করতে হয়, না হয় মহাজনের কাছে হাত পাততে হয় আর সেই ঋণ কোনোদিনই কারো শোধ হয় না। ফড়িং-এব মতো লাফ দিয়ে সেই ঋণের অঙ্কটা বেড়ে চলে মাত্র। দুঃখ তাদের বেড়েই চলে, বলে ওঠে অতুল।

—এমনি করে মাটিতে পড়ে থেকে চাষ করে কি লাভ হয় তা দেখিসনি তুই তোর বাবাকে দিয়ে? ওই মহাজন নশীরামেব খপ্পরেই পড়তে হবে আবার।

ললিতা এর জবাব জানে না। তবে এটাও মিথ্যা নয় তা জানে।

অতুল বলে, তার চেয়ে এই ভালোরে? কোনো আশাও নেই—লোভও নাই। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে থাকতে পাচ্ছি, গান-টান শিখছি মনের আনন্দে, এই ভালো।

ললিতা ঠিক বোঝাতে পারে না কথাটা অতুলকে। ললিতা কি ভাবছে।

মনে হয় ওই অতুল এক জায়াগায় কেমন জেদি। অভিমান ভরে বলে ললিতা—আমার কোনো কথাই তোমার ভালো লাগে না তো জানি!

না হলে অমনি করে জানোয়ারের মতো মার খাও। জবাব দিতি পারো না?

অতুল বলে—এসব কিছুর জবাব একদিন দেব রে ললিতা, দিন বদলাবেই।

- —ছাই হবে।

ললিতা অভিমান করে বলে।

বৃষ্টি চলেছে, গ্রামের তালবন ঘেরা পুকুরে পদ্মপাতাগুলো কাঁপছে, হাওয়া সুর তোলে তালবনে। কালো মেঘ ছায়া ঘনিয়ে আসে ললিতার ডাগর চোখে। অতুল ওই বৃষ্টি-ভেজা নরম মুখখানার দিকে চেয়ে শুধোয—এই রাগ করলি?

—না, বাড়ি যেতে হবে চলি।

এগিয়ে গেল ললিতা ওদের বাড়ির দিকে।

সেনকর্তাদের এদিকটা গ্রামের পুরোনো অঞ্চল। জমিদারী চলে যাবার পর থেকে গ্রামজীবনেও একটু নোতুন শ্রেণী গজিয়ে উঠেছে। তারা ওই বৈশ্য শ্রেণী, জমিদারদের বোল বোলাও ফুরিয়ে গেছে, তাদের আমদানী বন্ধ। বাড়ছে অন্য একটা শ্রেণী।

হঠাৎ কোনো গোপন পথে নশীরামের ছোট দোকানটা ফেঁপে ফুলে ওঠে, ক'বছরেই নশীরাম ওদিকে ধানকল বানিয়েছে, বাড়ি করেছে। আরও বাড়াতে চায় বাড়িটা, কিন্তু পরাণ মোড়লের খামার আর বাড়িটা থাকার জন্য নশীরাম তার বাড়ির দৈর্ঘ্য ঠিক বাড়াতে পারছে না, তবু ওদিকে গুদাম- কলবাড়ি নোতুন বৈঠকখানা ইত্যাদি করেছে, লোকজন আসা-যাওয়া করে ব্যবসার খাতিরে। তাই জায়গাটা জমজমাট।

তার তুলনায় সেনকর্তাদের পাড়াটা এখন নিঝঝুম। এদিকে লোকজন বিশেস আসে না এখন।

পুরোনো বাড়িগুলোয় চুনকাম হয়নি, বালি পলেস্তারের চাকলা খসে পড়ছে, ওদিকের প্রাসাদের মাথায় দু-একটা বট-অশ্বত্থ গাছও সুদখোর মহাজনের মতো ওদের গায়ে বসে শোষণের শিকড় চালিয়েছে। এখন আর রমরমা নেই। বৃষ্টির আঁধারে থম থম করছে। কাছারীবাড়ির ঘরগুলো শূন্য, লোকজনও নেই।

অতুল গরুগুলোকে গোয়ালে বেঁধে ওদের জাবনা দিয়ে বের হয়ে এল। ওখানে একটা ঘরে তার আস্তানা।

– অতুল

ডাক শুনেই চাইল অতুল। ওদিকের বৈঠকখানা ঘরে সেনকর্তা বসে আছেন, তক্তপোষের ওপর সাদর পাতা, ওপাশে তবলায় বোল তুলছে নিতাই পাত্র। সেনকর্তার পার্শ্বচরই।

তামাক দে। কই হে ভূষণ, ধর একটু। বৈকাল হয়ে আসছে ভীমপলাশই ধর, না হয় জয়জয়ন্তি। সেনকর্তা শূন্য ঘরে আসর জমিয়েছে।

ভূষণ এখানের মধ্যে গান গায়। তানপুরায় সুর মিলোচ্ছে ভূষণ। বিষণ্ণ সন্ধ্যা নামছে, মেঘছায়া ঘেরা আকাশ, কালো ধোঁয়াটে মেঘটা অনেক নীচে নেমে এসেছে, বৃষ্টির ধারা ঝরছে। নির্জন ধ্বংসস্তুপের মধ্যে সুর ওঠে ভূষণের।

কলকেটা নামিয়ে ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে অতুল। টিকের লালচে আভাস প্রায়ান্ধকার ঘরে একটু

আভা আনে।

এককালে রম রম করত এই কাছারীবাড়ি। প্রজাপাটক-আমলা-থৈলা গায়কের ভিড় দেখেছে এখানে অতুল। এখন সব শূন্য। কলকেটা ফুঁ দিয়ে ধরাচ্ছে, টিকের লাল আভা পড়েছে অতুলের মুখে। কলকেটা ফুরসিতে বসাচ্ছে অতুল। সেনকত্তা দেখেছে ওর মুখের দাগটা।

শুধোয়—কি হয়েছিল রে? তোর মুখে কপালে কিসের দাগ ওসব? এ্যাই অতুল? অতুল চুপ করে থাকে।

—জবাব দে! ধমকে ওঠেন সেনকত্তা। অতুলের কথাটা না বলে উপায় নেই। ওর ধমকে বলে অতুল—আজ নশীরামবাবুর মাঠে আমাদের দুটো গরু নেমে গেছল, ধানও খেয়েছে, তাই ছাতা দিয়ে দত্তমশায়—

—এমনি করে মেরেছে? ছিঃ ছিঃ।

সেনকত্তা দেখছে ছেলেটাকে। অতুলই বলে ওঁকে সান্ত্বনার সুরে,

—লাগেনি ত্যামন গো। তাছাড়া দোষ তো আমারই—দেখিনি ব্যাপারটা।

চুপ করে থাকেন সেনকত্তা। ভূষণ গ্রামের যাত্রার দলের সঙ্গীত শিক্ষক, মোশন মাষ্টারও। সে বলে ওঠে—

—এমনি কপাল কাটা, নাকফোলা নিয়ে পরশু জন্মাষ্টমীর যাত্রার আসরে নামবি?

সেনকত্তা বলেন—এ গ্রামে ওই নশীরামই সব, তার ঠাকুরবাড়ির আসরে ও গাইবে না মাষ্টার। এতটুকু দয়া—বিবেচনা যার নেই তার ওখানে গানও বের হবে না ওর। ও গাইবে না ওদের যাত্রায়। চুপ করে থাকে অতুল।

গান গাইতে সে চায়, ওই গানের মধ্যেই সে তার সব দুঃখ বেদনা বঞ্চনাকে ভুলতে পারে। আর কোথাও তার জন্য কোনো প্রীতি, সম্মান, স্বীকৃতি নেই, কিন্তু ওই গানের আসরে দেখেছে অতুল তার গানে লোকের চোখে জল নামে, দু'চোখ উলসে ওঠে মানুষের কি খুশিতে।

কিন্তু এবারের আসরে সে গাইতে পারবে না। একথাটা এতক্ষণ ভাবেনি! এখন মনে হয় সেনকত্তার হুকুম তাকে মানতেই হবে। সেনকত্তা ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই শুধোয়—খেয়েছিস? না মার খেয়ে পেট ভরে গেছে?

এসে খেয়েছে সে। মাথা নাড়ে অতুল। সেনকত্তা বলেন অতুলকে,

—তাহলে বোস! গা দেখি জয়জয়ন্তি। শুদ্ধ সুর লাগাবি, নাহলে নশীরাম তোর কপাল ফাটিয়েছে আমি লাথ মেরে তোর নাকটাই ফাটাব এবার। —নে ধর। সুর দাও মাষ্টার।

সেনকত্তা নিজেই আলাপ শুরু করেন, অতুলের মিষ্টি গলাটা ওই সুরে এসে মেশে, যেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। নীল জলের পাশাপাশি প্রবাহে একটি শ্বেতধারা মিলে মিশে দূরে এক হয়ে কোন অসীমে হারিয়ে যায়।

—পাখীরা ফিরে এল কুলায়
সাঁঝের খেয়ায় বেদনা বহে নদীর কলতানে—

সন্ধ্যা নামছে জীর্ণ ধ্বংসস্তূপে, মেঘে মেঘে আঁধার ঘনিয়ে আসে। ওদের খেয়াল নেই, অন্ধকারের বুকে ওই সুর ওঠে, দিন শেষের সুর। কি অপূর্ব তৃপ্তিতে অতুলের মন ভরে ওঠে। দুঃখ অপমান সব ভুলে গেছে সে ওই সুরের রাজ্যে প্রবেশপথ পেয়ে।

তাই বোধহয় ছেলেটা সব কষ্টকে সহ্য করতে পেরেছে অন্তরের ওই অনাবিল তৃপ্তির প্রসাদে। মান অপমান তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে।

পরাণ মণ্ডল কথাটা ভাবছে।

বর্ষার মরসুম এবার ভালোই, রোয়া পোঁতার কাজ চুকে গেছে। এখন মাঠে কিছু ইউরিয়া ফসফেট ছড়িয়ে ঘাস নিড়িয়ে দিচ্ছে। দেবতা বৃষ্টির জোগান ঠিকমতো রাখলে এবার সে ভালো ধানই পাবে।

এবার নশীরামের দেনাটা নিদেন অর্ধেক শোধ করে দেবে। ওই লোকের কাছে দেনার জন্য তার ভয় হয়। মাঠের আলে সাপের ব্যাঙ ধরা দেখেছে, ব্যাঙ্‌টা প্রথমে দাপায়—চীৎকার করে, কিন্তু সাপটাও চুপচাপ ওকে ধরে থাকে। আর ক্রমশ ব্যাঙটাকে গিলতে থাকে, একেবারে গিলে ফেলে ক্রমশ। আর মুক্তি পায় না সে।

ওই নশীরাম তেমনি সাপের জাত, দেনদারকে ধরলে আর ছাড়ে না। গ্রামের বসন্ত, ভুবন গরাই, মিতন ঘোষ, মায় ভবঠাকরুণ-এর জমি জিরেত বাগান সব গ্রাস করেছে নশীরাম দেনার দায়ে। নশীরামের চেয়ে সরেশ তার ওই বাঘাটে ছেলেটা, মদন। সেটা আরও শয়তান, ওদের হাত থেকে যেভাবে হোক রেহাই পেতে হবে পরাণকে। ওদের দেনা মিটিয়ে দেবে। তামাকটা টানছে পরাণ, সারাদিন জলে কাদায় কাজ করে বাড়ি ফিরে এই ভাবে দাওয়ায় বসে তামাক টানতে আরাম লাগে। বেশ সুখী সুখী বোধ হয় তার।

কিন্তু আরাম আমেজ ওসব তার বরাতে যেন নেই। এককালে পরাণ ছিল গৃহী বৈষ্ণব। ওর বাবাও ভালো কীর্তন গাইত। তখন গ্রাম-গ্রামান্তরের জমিদার বাড়িতে দোল-রাশ-ঝুলন পালা-পার্বণ লেগেই থাকত, তার বায়নার অভাব হত না।

বাড়িতে অন্য পরিবেশ ছিল। তার বাবা কীর্তন গেয়েই কিছু জমি জিরোত করেছিল। পরাণকেও বলত তার বাবা—এসব শেখাব। পরাণের গলায় সুর ছিল না। ও বুঝত চাষাবাস মাঠের কাজ। সেই কাজই করত। পরাণের বাবা গোপীনাথ বলত—ঘরানা শেষ হয়ে যাবে রে।

তবু ললিতা পরাণের মেয়েটা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। সেই দাদুর সঙ্গে গাইত। গোপীনাথ বলত—ললিতাও তবু কিছু শিখছে।

ললিতাও দাদুর কাছে কীর্তন শিখেছিল। ভালোই গাইত ছোট্ট মেয়েটা।

কিন্তু পরাণ পড়েছিল চাষবাস নিয়ে, আজ মনে হয় নিজের জালেই জড়িয়ে গেছে সে। বাবার কোনো উত্তরাধিকার সে পায়নি।

ললিতা সন্ধ্যার পর এখনও দাদুর পটটা রেখেছে। ওদিকের ঘরে সেই ঠাকুর দেবতার পটগুলো রয়েছে। ধুপ-ধুনো খঞ্জনি বাজিয়ে ললিতা কীর্তন গাইছে। ওর ভজনের সুর স্তব্ধ বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। ললিতার মায়ের ডাকে চাইল পরাণ হুঁকোটানা বন্ধ করে।

এককালে দেখতে শুনতে ভালোই ছিল ললিতার মা। কিন্তু মা মারা গেলে হঠাৎ পরাণ তারপর রাজলক্ষ্মীকে ঘরে আনে। সৎ মেয়েকে তাই সহ্য করতে পারে না সে, গরীবের সংসারে এসে খেটে খেটে এখন সেই রং কালি হয়ে গেছে, হাড়কণ্ঠি বের হয়েছে। রাজলক্ষ্মী কথাটা প্রায়ই বলে, এখন আরও বেশি ভাবনায় পড়েছে সে।

ললিতার দিকে চেয়ে সেই ভাবনাটা বাড়ে মাত্র। মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে। তার নিজের মেয়েরাও আছে বলে রাজলক্ষ্মী--কথাটা ভেবেছ, মেয়ে গলায় ঠেকেছে, আর কতকাল ঘরে রাখবে, পাত্রটাত্র দেখ এইবার। বিয়ে থা দিতে হবে?

বলে ওঠে পরাণ—সে তো বুঝছি ছোট বৌ। মেয়ে তোমার একটি নয় আরও দুটি আছে। একটাকে পার করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, তারপর কি হবে কে জানে। সংসার চলবে কি করে?

কথাটা সত্যি,ললিতার পর রাজলক্ষ্মীরও দুটি মেয়ে প্রমীলা, আন্নাকালী আরও দুটি মেয়ে রয়েছে তার। গরীবের সংসারে মেয়ে হয়ে জন্মানো যেন অপরাধই। ওদেরও অপরাধ সমস্যাও বাবা মায়ের।

রাজলক্ষ্মী দিশে পায় না। বলে সে,

—রামপুরের ছেলেটিকে দ্যাখো না, যেভাবে হোক জমি জিরেত কিছু বন্ধক রেখে গায়ের রাং রত্তির বেচে একটাকে তো পার করি। পরের কথা পরে ভাবা যাবে। পরাণ কঠিন সমস্যায় পড়েছে। তবু কী

ভেবে বলে সে,

—অতুল তো রয়েছে। শুনেছি সেনকত্তা ওকে ভালোবাসে, যদি কিছু জমিটমি ওকে ভাগে দেয় তাহলে একটা কথা বলতে পাবি। তবু গাঁয়েই থাকবে মেয়েটা। রাজলক্ষ্মী স্বামীর দিকে চাইল।

অতুলকে সেও ভালোভাবে চেনে কিন্তু চাল-চুলো নেই তার, আর এমনিতে যাত্রার আসরে গান গায়, পড়ে থাকে সেনকত্তাব কাছাবীবাড়িতে ওদের রাখালি করে, ফাইফরমাস খাটে। দেখতে শুনতে অতুল ভালোই। ফর্সা সুন্দর চেহারা। এককালে এই গ্রামেই ঘোষদের বাড়ির সরিকান ছিল ওরা। এখন কিছুই নাই, নামটাই বয়েছ। মা চায় তার মেয়ে বোজকারী পাত্রেব হাতে পড়ুক। না হয় জমিজায়গা, ঘর বাড়ি থাকবে তার, মেয়ে গিয়ে আশ্রয় পাবে। নিজের ঘর গডতে পারবে। কিন্তু এখানে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। ছেলেটার ওপরও ভরসা কবা যায় না। ললিতার মতো মেয়েকে তার হাতে তুলে দিতে পারে না রাজলক্ষ্মী।

তাই বলে সে--চাল নাই চুলো নাই বাউণ্ডুলেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে? যাত্রা গেয়ে বেড়ায়।

চুপ করে যায় পরাণ। কি ভেবে বলে কুণ্ঠিতস্বরে অপরাধীর মতো—

—রামপুরের পাত্র তো অনেক টাকাই চায। দেব কোত্থেকে? ওদিকে দত্তমশায়েব টাকা শুধতে পারছি শেষকালে জমিজিরেত ধরে টান না দেয, যা লোক ওটা।

ললিতাও উঠে এসেছে ঠাকুরঘব থেকে। বাবা-মাযেব কথাটা শুনেছে সে।

বর্ষাব রাত। ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। আবছা আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আছে ললিতা, বাবা-মায়ের কথাগুলো কানে আসে তাব। বারবার মনে হয গরীবের ঘরে মেয়ে হযে জন্মে শুধু নিজের জীবনেই নয়- এদের সকলেব জীবনেই সে অভিশাপ এনেছে। নিদারুণ এক অভিশাপ। অতুলেব কথা মনে পড়ে তাঁব।

অতুলকে তারও ভা.লা লাগে, স্বপ্ন দেখে সেও। কিন্তু কোথায যেন একটা দুস্তর বাধা রয়ে গেছে। সে বাধা উত্তীর্ণ হবাব কোনো পথই জানা নেই ললিতার।

তবু অতুলেব অস্তিত্বটা তার কাছে কি একটি সুবেব পরশের মতো সুখকব বোধহয়। চুপ করে কি ভাবছে ললিতা।

- দিদি খাবি না? ছোটবোন প্রমীলার ডাকে চাইল ললিতা।

গ্রামে কেবোসিনও মেলে না, অনেক কৈজৎ কবে কিনতে হয। তাই একটা টেমি জ্বেলে কোনোরকমে খাওয়া সেরে নেয তারা। পরাণও খেতে বসেছে। এ যেন কোনো মতে বেঁচে থাকার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। ললিতাও এগিযে যায়।

নশীরাম দত্ত সামান্য অবস্থা থেকে এখন গুছিয়ে নিয়েছে। এককালে তেজারতি ব্যবসা কিছু ছিল, জমিদারী যাবার মুখে হিসাব কবে সেই টাকায় আর বন্ধকী সোনা পাঁচগুণ দামে বেচে কিছু জমি আর ব্যবসায় লাগিয়ে আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

তার দূরদৃষ্টি ছিল। জমিদারী চলে যাচ্ছে, নশীরাম তখন উঠে পড়ে লেগেছিল। সেনকত্তার কাছারীতে ধর্না দিয়ে পড়ে থেকে আর কিছু টাকা নাযেবকে খাইয়ে নশীরাম বেশ জমি নিজের নামে—স্ত্রীর নামে—ছেলের নামে—আরও বেনামীতে ব্যবস্থা করে নিয়েছে। রেশনের দোকানের চিনি-কেরোসিন তেল চোরাবাজারে কিনেছে পিপে দরুনে। আর বিক্রী করেছে তিন[illegible]। তার থেকেই ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসার পত্তন করেছে। ধানকল, তেলকল করেছে। কিন্তু স্বভাব [illegible] তেমনি কিপটে রয়ে গেছে। এইটুন ধুতি আর ফতুয়া তার পোশাক। চাষ-এর সময় নিজে এখনও মাঠ অবধি যায়। স্বনামী বেনামীতে বহু জমিই রয়েছে তার। আব সেই জমি পয়সা সবই রক্ত মাখানো। তাই ইদানীং খুব ধর্মে মতি হয়েছে নশীরামের।

ঘটা করে মন্দির—নাটমন্দির বানিয়েছে, সেখানে পয়সা দিয়ে দেবতাকে যেন টেনে এনে পাথরেব

মূর্তির কারাগারে বন্দী করে রাখতে চেষ্টা করেছে নশীরাম। আর সন্ধ্যাবেলায় হরিনামের ঝুলি নিয়ে আরতির পর বসে কীর্তন শোনে—মালা জপ করে বিড়বিড় করে।

অবশ্য গ্রামের মন্দ লোকে বলে, ওর মালা জপ করা ঠিক নয়। মন্দিরের শান্ত পরিবেশে একাগ্র হয়ে বসে সুদের হিসেব করে। কোনদিক থেকে কোন অবাধ্য খাতককে ঘায়েল করতে হবে তারই মতলব ভাঁজে ঠান্ডা মাথায় বসে বসে। তস্য পুত্র মদনও উঠছে এখন।

মদনই ব্যবস্থা করেছে। ঝুলন উপলক্ষ্যে নশীরাম দেবভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য বিরাট উৎসব করবে ঠিক করেছে। এতে নামভক্ত বাড়বে আরও।

মদন অবশ্য বাবার মতো নয়। একটু অন্য ধরনের। বাবার এই কিপ্‌টেমি সে পছন্দ করে না। সে একটু রসে-বশে থাকতে চায়। তাই নিয়ে নশীরামের সঙ্গে বেশ কথা কাটাকাটি হয়, কিন্তু মদনের মা জননী বাসন্তীবালাই তার একমাত্র সন্তানের এহেন অবমাননায় ফুঁসে ওঠে। নশীরামকে বেশ চড়া গলায় শোনায় তার গিন্নি, ছেলের হয়ে। —ওই টাকা পয়সা হামলে কুড়িয়ে আনছো —ওসব কি সঙ্গে যাবে? না যক্কির মতো বুক দে আগলাবে?

মদন সেবার তার সঙ্গীত-চর্চার জন্য একটা দামী হারমোনিয়াম ভুগী তবলার বরাত দিয়ে এসেছে। সেই ব্যাপার নিয়ে এসব কথার অবতারণা। নশীরাম বলে ওঠে—টাকা খরচার ব্যাপারে।

—টাকা কি খোলামকুচি যে ওড়াতে হবে? টাকা রোজগার করতে শিখল না, টাকা ওড়াবে কেন এমনি করে? গয়েনদার হবে মদনা? যত্তোসব!

বাসন্তীবালা বলে—নাতো কি তোমার মতো পাটকাঠি হয়ে অমনি লোকের পিছনে ঘুরবে টাকার ধান্দায়।

তারপরই বাসন্তীবালার চরম অস্ত্র প্রয়োগ শুরু হয়—আমার পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একমাত্র ছেলে তাকে তুমি দেখতে পারো না। সে কিছু সখ আবদার করলেই তুমি ক্ষেপে ওঠো।

মদন জানে মা জননী তার দিকেই। মায়ের ভরসাতেই মদন গাইয়ে হবার স্বপ্ন দেখে। যাত্রার দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়েছে।

মাও বাবাকে এবার কোণঠাসা করেছে।

নশীরামের বাইরের খাতকদের কাছে যত হাঁক-ডাক। বাড়ির গিন্নিকে সে সমীহ করে। গিন্নীর কথায় কি বলার চেষ্টা করে সে। কিন্তু গিন্নি তখন শোনায়—

ঠিক আছে মা-বেটায় বাবার ওখানেই চলে যাব। তুমি থাকো তোমার টাকার পুঁটলি নিয়ে। আমরা তোমার কে? টাকাই তোমার সব?

এইবার নশীরাম বেকায়দায় পড়ে। কান্নাকাটি চোখের জল-ফল তার অনেক দেখা। বহু বেদনায় এসে তার সামনে কান্নাকাটি করে, সে এসবে ঘাবড়ায় না। কিন্তু গিন্নির চোখের জল তাকে বেকায়দায় ফেলে। জানে এর পর শুরু হবে উপবাস পর্ব। আর সেই সঙ্গে চলবে বাক্যবাণ। তীব্র, তীক্ষ্ণ, নির্মম সেই বাণগুলো বিদ্ধ করবে নশীরামকে দিনরাত্রি।

নশীরাম তাই বলে—ঠিক আছে। দাও টাকা, আনুক ওগুলো। তবে সমঝে চলতে বলো। চুপ করে গিন্নি।

নশীরাম বংশধর মদনকে তবু শোনায় বেশ কড়াস্বরে,

—গান বাজনা করবি কর, তবে ব্যবসাপত্র ঠাঁটবাট বজায় রেখে করতে হবে। যাত্রার দলে পার্ট করলেই চলবে না। পয়সা—পয়সাই আসল, তার মর্ম বুঝতে হবে। বুকের রক্ত বুঝলি? ওই পয়সা—চিনতে হবে বাপধন।

মদন অবশ্য শোনে কথাগুলো কান দিয়ে। হাজার হোক বাপ্‌কা বেটা। মদন টাটেও বসে। ও দেখে আড়তদারির ব্যবসা। মাথা, বুদ্ধি, অর্থ সব নশীরামের। মদন কোনোরকমে টাটে বসে চা সিগ্রেট খায়, পরনে তার টেরিকটনের নিভাঁজ পাঞ্জাবী, হাতে সিগ্রেট। মেজাজটা অন্যরকম।

মালপত্র ওজন হচ্ছে।

নশীরাম মাঝে মাঝে এসে দেখে সবকিছু। ছেলেকে বলে গলা নামিয়ে,—মাল দেবার সময় দু'নম্বরী বাটখারা, আর কেনার সময় এক নম্বরী বাটখারা যেন চাপায় খেয়াল রাখিস বাপ। নইলে পড়তা থাকবে না।

মদনও জানে ওজনের এই কারচুপি।

বাপের শিক্ষায় সেও ব্যবসায় অন্ধকার দিকগুলো ভালোই চিনেছে। বলে সে, ওসব ঠিক আছে বাবা। আমি দেখছি। নশীরাম মনে মনে খুশি হয়।

মদন ক্রমশঃ বাপকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাবার চেয়ে তার তরুণ মনে লোভটা আরও বেশি করে দানা বাঁধে, সে দেখেছে পেতে গেলে নিজের জোর এবং দাপটও দেখাতে হবে মানুষকে। নাহলে তারা ভয় করবে না।

নশীরাম বিনয়ী, মিষ্টভাষী, লোকে বলে মিছরির ছুরি।

কেউ কখনও নশীরামকে ব্যবসায় টাটে বসে রাগতে দেখেনি। খাতককে হেঁকে ডেকে গলা তুলে কথা বলে না। শুধু মুখের ভাবটা একটু কঠিন হয় মাত্র। কাউকে হেসে বলে,

—টাকা, সুদ এসব তো দিতে হবে বাবা। না হলে চালাব কি করে।

মুখে নির্বিকার ভাব। কিন্তু মনের ভিতর একটা হিংস্র সরীসৃপ মাথা তোলে সঙ্গোপনে। নাশা পথ দিয়ে ছোবল মারে সে। নীরবে সে মানুষের সর্বনাশ করতে পারে, গোপনে মামলার শমন চেপে একেবারে ডিক্রী জারি করে আদালত থেকে বাঁশগাড়ির হুকুম এনে লোকের জমি কেড়ে নেয় অকস্মাৎ।

কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি মুখে হরিনাম ওর।

কিন্তু মদন ওর তুলনায় বিপরীত। উগ্র দাম্ভিক সে। টাকার অভাব তার নেই, তাই জীবনকে ভোগ করতে চায় কাজের পর

দু চারজন ইয়ার বন্ধুও জুটে গেছে।

রতন গদাধর ওরা সব সন্ধ্যায় এসে মদনের বৈঠকখানায় হাজির হয়, রতন তবলায় ঠেকা মারে—আর মদন তখন বিকৃত সুরে কোনো রাঙ্গা তারা ফুলটুল নিয়ে—কি গানের দুটো লাইন গেয়ে চলে।

একটু বেশি রাত হলে নটবর আসে চাদর চাপা দিয়ে। সব সময়েই ও চাদর গায়ে দেয়, কারণ চাদরের নীচে ঢাকা দিয়ে অনেক কিছুই আনা যায়। ওকে ঢুকতে দেখে গদাধর বলে—

—এত দেরী? এদিকে মদনের গলা কাঠ হয়ে গেছে। সুরের মেজাজ আসছে না। নে বের কর। চল দরজাটা বন্ধ করে দি। দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিয়ে আসে গদাধর। নটবর বলে এবার,

—সরেশ মাল কি সহজে মেলে? শালা রসো বলে দু'বোতল এনেছি যেন কত্তার জন্যে, আর তো নেই গো?

মদন চটে ওঠে সেদিন। তার চেয়ে মাল খাবার অধিকার যেন সেনকত্তারই বেশি। গদাধর বলে,

—সেনকত্তা এখন বাসিনীর হাতের চোলাই খায়, পয়সা কোথায় এত রে? এঁ্যা টাকা দিচ্ছি—ওই মাল দে।

নটবর বলে ওঠে—তাই বলে রসোর মুখের ওপর টাকা ফেলে বোতল দুটো নে এলাম। 'বেলাক নাইট', নাও গুরু। মদ বের হয়।

মদন গ্লাসে চুমুক দিয়ে একটু ধাতস্থ হয়। মদন বলে মৌজভরা স্বরে,

—এবার ঝুলনের সময় দু'পালা যাত্রা হবে। ভূষণ মাস্টারকে বলেছি। তবে কেষ্টসুদামায় আমাকে কেষ্টর পার্ট করতে দিতে হবে। আর কাজললতায় হিরোর পার্ট। নাহলে নাই দলে।

গদাধর বলে ওঠে—তুমি ছাড়া আর ওই পার্ট কে করবে গুরু? ওই ভূষণমাস্টার তো অতুলকে নিয়ে পড়েছে। বলে, যা গায়, অতুলের—জুড়ি মেলা ভার। মদন কথাটা শুনেছে, দেখছে সে অতুলকে। এই

গ্রামের ঘোষপাড়ার ছেলে। এখন বাড়িটা ওদের ভিটেপুরী হয়ে গেছে। অনাথ ছেলেটা সেনকত্তাদের বৈঠকখানার একটি ঘরে থাকে। সেনকত্তার দু-চারটে গরু আছে দেখাশোনা করে আর সেনকত্তার ফাইফরমাস খাটে। ওখানেই খেতে পায়। হতদরিদ্র ছেলেটাকে কিন্তু ভগবান একদিক দিয়ে দিয়েছে রূপ আর ওই গানের গলা। সেনকত্তার ওখানেই রেওয়াজ করে। ভূষণ মাষ্টারও যায় ওখানে।

মদন এটা সহ্য করতে পারে না। সেইই হবে আরও বড় গাইয়ে, আর বড় অভিনেতা। এটা তাকে হতেই হবে, তাই নিজেই মোটা টাকা খরচা করে দলে ঢুকেছে।

মদনের সহচরবৃন্দ জানে মদনের ওই মনোভাবটা। তারাও পাকা স্বার্থে এটাকে সমর্থন করে।

নটবর বলে—ধ্যাৎ অত্‌লো আবার কি গান জানেরে? মদনবাবু গাইলে পাখপাখালী অবধি কাঁদবে। মদন খুশি হয়ে বলে তোরা গদাধর ভূষণের নামেই বলে,

ভূষণ মাষ্টার—সেনকত্তার ওখানে যায় কিনা, আর অত্‌লো ওখানে চামচেগিরি করে তাই এত টান ভূষণের।

নটবর ঘোষণা করে—ওই অত্‌লো এই পার্টে নামলে আমরা নাই? শালা কবিস্ তো গরু রাখালি আর চাকরের কাজ, সে হবে কিনা হিরো। আমাদের গুরু কি কমতি নাকি?

রতন বলে—শ্লা অতুলের কিন্তু বাহার আছে। আজ তালতলায় ধান দেখতে গেছি, বৃষ্টি নেমেছে। আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছি, ওমা,শালা অত্‌লো আর পরাণের ওই ডব্‌কা মেয়েটা দু'জনে একটা ঝুপি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কি কথা বলছে, কথার আর শেষ নাই। মস্তান হয়ে গেছে দুজনে।

বৃষ্টিতে ভিজে মেয়েটাকে যা দেখাচ্ছিল না মাইরী। জব্বর।

রতন একটা ইঙ্গিত করে।

নটবর বলে—শ্লা রিয়েল কেষ্ট ঠাকুর রে, এ্যাঁ। রাধিকাও জুটে গেছে। তাহলে বল যুগল মিলন দেখে এলি রত্‌না?

কথাটা ভাবছে মদন। ওর চোখে নেশা লাগে।

পরাণের মেয়ে ললিতাকেও সে দেখেছে। এর মধ্যেই অবশ্য মদন ওই বন্ধুদের কল্যাণে আর তার পিতৃদেবের টাকার জোরে সেই অন্ধকারের জীবনের স্বাদও পেয়েছে, নারী মাংসের স্বাদ পেয়ে ধীরে ধীরে লোভী একটা জানোয়ারে পরিণত হয়েছে মদন।

তার নজর ওই ললিতার দিকেই পড়েছে, কিন্তু কেন জানি না ঠিক এগোতে পারেনি। মেয়েটাও এড়িয়ে গেছে তাকে। আজ ললিতার সঙ্গে ওই বাউণ্ডুলে অতুলের ঘনিষ্ঠতার কথা শুনে মনে মনে চটে উঠেছে মদন। মদের নেশাটা জমেছে ধীরে ধীরে। দেহের কোষে কোষে কি চাপা উত্তেজনা আনে মদনের ওই মেয়েটার ছবি।

নটবর বলে— মেয়েটা কিন্তু সরেশ মাইরী, বেশ লচকদার। শুনেছি গানটানও গায় ভালো। দারুণ গলা।

মদন বলে—অতুলের কাছে শেখে নাকি রে? কি গান শেখায় রে?

হাসে গদাধর—ব্যাটা কলির কেষ্ট আর কি শেখায় কে জানে মাইরী।

মদন ওর হয়ে কথাগুলো শুনছে। তার সারা মনে একটা তৃষ্ণা জাগে। সেই সঙ্গে অদম্য একটা লোভও জাগে মদনের মনে। জন্মগত একটা লালসাই।

এখানে মাটির সবকিছু ভালো যা আছে সবতাতেই যেন পাবার অধিকার তার আছে এইটা বিশ্বাস করে মদন। দেখেছে তার বাবাকে। সকলের সবকিছু নানা ছলে সে ঠকিয়ে না হয় জোর করে দখল করে তিলে তিলে নিজের সাম্রাজ্য গড়েছে, সেই সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী সে।

ললিতার যৌবনমদির দেহের লাবণ্যমাখা ছবিটা নোতুন করে দেখেছে সে। মদের নেশাটা চোখে গোলাবী আমেজ আনে। নটবর দেখছে মদনকে। ধূর্ত নটবর জানে কোন্ পুজোর কি মন্ত্র। নটবর বলে,

—এত ঘাবড়াচ্ছো কেন গুরু। আমরা তো আছি, পার্ট তো হবেই। যাই ওই ছুঁড়িটাকে পটাতে হবে? তাও হয়ে যাবে। অতুলকে আউট করে দেব!

গদাধর বলে, —ও নিয়ে ভেবো না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পরাণ মোড়ল তো তোমাদের হাতে বাঁধা আছে গো। যাবে কোথায়?

মদন ভাবছে কথাটা। অতুলকে আজ সে যেন সহ্য করতে পারছে না।

এক জায়গায় বাবার মতো হিসাবী আর সাবধানী ওই মদন। পরাণ মোড়লের জমি তাদের কাছে বাঁধা আছে বেশ কিছু টাকার দায়ে, এটা জেনেছে মদন। মনে মনে সে একটা পথ খুঁজছে এবার।

ললিতা জানে না এসব ব্যাপার। চঞ্চলা কিশোরী নিজের জগৎ নিয়েই খুশি। সকালবেলায় তার কাজ বাসন মাজা, গরু বাছুরগুলোকে সামলানো। পরাণও ভোরে উঠে গোয়ালে যায়; ললিতা বাছুর ধরে থাকে, দুধ দোহানো হলে ছেড়ে দেয় বাছুরটা। বাছুরটা মায়ের বাঁটের অবশিষ্ট দুধটুকু খেতে থাকে। বাসন মেজে উঠে, নিকিয়ে স্নান সেরে আসে ললিতা। বাড়িব লাগোয়া দু-একটা টগর, জবা, গন্ধরাজ ফুলের গাছ আছে। সেখানে ফুল তুলে ঠাকুর পুজো করে, আপন মনে দাদুর শেখানো ভজন কীর্তন দু'চার কলি গায় ঠাকুরের সামনে।

বাড়িতে তখন অন্য পর্ব শুরু হয়েছে। পরাণ মাঠে যাবে, ছোটবোন প্রমীলা,আন্নাকালী পাঠশালে যাবে,তাই রাজলক্ষ্মী চা চাপিযেছে। চা মুঁড়ি খেয়ে ওরা বের হবে। পরাণও গরুগুলোকে বাথানে গরুর পালে জিম্মা করে দিয়ে এসেছে, চা খেয়ে সে বের হবে মাঠের কাজে।

মদন সকালে একটা মতলব নিয়েই কথাটা বলে। নশীরামও ছেলের হঠাৎ মতিগতি দেখে খুশি হয়। মদন বলে বাবাকে—বাকী খৎগুলো তামাদি হবার আগেই একটু তাগাদাপত্র করা দরকার বাবা। সেনকত্তা, ভজন রায়, গুপীনাথ, পরাণ মোড়লের খৎগুলোর এবার আদায় কিছু করতে হবে। না হলে তামাদি হয়ে যাবে।

নশীরাম বলে—তুইও একবার দ্যাখ। তারপর ধান ওঠার মুখে যা করার দরকার করবি। টাকা আদায় করতেই হবে বাবা।

মদন পরাণ মোড়লের বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ভিতর থেকে সুরটা কানে আসছে। ভজন গাইছে ললিতা। মিষ্টি সুর। মদনের মনে পড়ে একুট আগে সেনকত্তার ওখানে এই সুরটা শুনেছে সে। অতুল সকালবেলায় রেওয়াজ করছিল ওখানে ওই গানই।

মদন সকালবেলাতেই সেনকত্তার ওখানে গেছল ইচ্ছে করেই তাদের বাকী টাকার তাগাদা দিতে।

সেনকত্তা সকালে রেওয়াজ করছে, অতুলও রয়েছে। মদনকে দেখে গান থামাল ওরা।

মদন তাগাদা দেয়।

—বাবা পাঠালেন টাকাটা পড়ে আছে এতদিন ধরে। এবার দিতে হবে।

অতুলের সামনেই যেন সে সেনকত্তাকে অপমান করতে চায়। সেনকত্তা বলে,

—তোমার বাবাকে বলো পরে দেখা করব।

মদনকে যেন এড়িয়ে গেল সে। মদন কি বলতে যায়।

সেনকত্তা বলে —বাবাকে বলো যা বললাম।

এখানে এসে তার রাগটা যেন হঠাৎ বেড়ে ওঠে। অতুলের মুখেও এই ভজন শুনেছি। একদিন ললিতাও সেই সুরে একই গান গাইছে। সুন্দর গানটাকে উপভোগ করার মন মানসিক অবস্থা তার নেই; মদন যেন হেরে যাচ্ছে।

অতুলের কাছে মেয়েটা গান শেখে, ওদের দুজনের মধ্য যে নিবিড় যোগাযোগের কথা শুনেছে সেটা সত্যিই। আর এব্যাপারে পরাণ মোড়লের সায় আছে সেটা বুঝতে দেরী হয় না মদনের।

মদন এগিয়ে গিয়ে হাঁকে—মোড়ল ঘরে আছ?

অবাক হয় পরাণ মোড়ল মদনকে সকালেই এ বাড়িতে আসতে দেখে।

রাজলক্ষ্মীও শশব্যস্ত হয়ে বলে—এসো বাবা! বসো।

দাওয়ায় একটা মোড়া এগিয়ে দেয় রাজলক্ষ্মী ওকে বসতে।

প্রমীলা, আন্নাকালী চা মুড়ি খেয়ে স্কুলে বের হয়ে যাচ্ছে, ললিতা পুজো শেষ করে বাইরে এসে মদনকে দেখে দাঁড়াল। মদনের মুখচোখে গত রাতের মদের ছাপটা মুছে যায়নি। তখনও দু'চোখ লালচে, সেই চাহনিটা দেখে একটু চমকে ওঠে ললিতা। অন্য এক চাহনি ওর চোখে।

সদ্য যুবতী মেয়েটিও পুরুষের চোখে ওই লালসার জ্বালাটাকে দেখেই চিনেছে। সরে গেল ললিতা।

মদন দেখছিল ওকে কি যেন এক বিচিত্র চাহনি মেলে, নেশা ধরা চাহনি। মেয়েটা এই সকালের আলোয় কি একটি উজ্জ্বল বিন্দুর মতো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার সামনে। এতকাল রাতের অন্ধকারে যাদের দেখেছে -এ সেই অন্য পাড়ার মেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কেমন নেশা ধরায় মদনের সারা মনে ললিতার উপস্থিতি।

--চা খাবে তো?--

রাজলক্ষ্মী চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়। আজকাল গ্রাম ঘরেও চায়ের প্রচলন হয়েছে। কারণ অন্য কিছু দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করার চেয়ে এটা সস্তা, আর ঘরে দুধও তেমন নেই যে সকালের প্রাতরাশ হবে দুধ মুড়ি দিয়ে। সে পর্ব উঠে গেছে। তাই চা মুড়িই এখন সম্বল। অতিথি আপ্যায়নও হয় চা দিয়ে। মদন বলে—চা তো খেয়ে এলাম। বাবা একবার দেখা করতে বলেছে পরাণ কাকা। মানে টাকাগুলো অনেকদিন হল পড়ে আছে, শেষকালে সুদেমূলে একটা বিরাট হয়ে গেলে তখন শোধ করতে অসুবিধা হবে তাই বলছিলাম কিছু কিছু করে দিয়ে দাও। মদন দেখাচ্ছে পরাণকে।

যেন এবার জালে ফেলেছে লোকটাকে। মদন খুঁজছে ললিতাকে। সে দেখাতে চায় ললিতাকে তার ক্ষমতাটা। তাতে ললিতাও এমনি অগ্রাহ্য করতে সাহস পাবে না। সমীহ করবে তাকে কিন্তু ললিতা দাওয়ায় নেই সে ভিতরে চলে গেছে তখন।

পরাণ মোড়লও একটু ঘাবড়ে গেছে। টাকা তাকে দিতেই হবে। কিন্তু এখন তেমন টাকা হাতে নেই। তাই পরাণ বলে,

--দেব বাবা। বিপদের সময় নিছি, দেব বৈকি। তবে একটু সময় দিতে হবে। মদন বলে—দেখো কথাটা ভেবে। আমাকেই ভার দিয়েছে।

কথাটা জানিয়ে উঠে পড়ল মদন। চায়ের কাপটার দিকে তার নজর নেই। মদন চলে গেল চায়ের কাপটা অমনি ফেলে রেখে, যেন ইচ্ছে করেই এদের আতিথেয়তাকে অগ্রাহ্য করে গেল

ঘর থেকে শুনেছে কথাটা। দেখেছে মদন চলে যাবার সময়ও যেন দু'চোখ দিয়ে তাকেই খুঁজছিল। ললিতা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে ওকে।

পরাণ রাজলক্ষ্মী দুজনেই ভাবনায় পড়ে। এখন চাষের মরশুম। আউস ধানও পাকেনি। পাট বিক্রি হয়েছিল সে টাকাও চাষ আর সংসারে ঢুকে গেছে। পরাণ বলে - এখন কি করে দিই টাকা!

রাজলক্ষ্মী ভয়ে ভয়ে বলে- মদন এসেছিল একবার দেখা করে এসো বাবার সঙ্গে।

ললিতা চেয়ে দেখছে বাবা মায়ের অসহায় মূর্তিটা। তার মনে হয় এই গরিবের সংসারে সেই ই যেন আরও যন্ত্রণা বাড়িয়েছে তাদের

পরাণ অসহায় কণ্ঠে বলল দেখি, যাব আজ কি বলে দেখে আসি

দুঃখের জীবনের স্রোতের পাশাপাশি আর একটি প্রবাহ ঠিকই চলেছে। ছোট গ্রামটায় উৎসবের সাড়া জাগে। নশীরাম দত্ত এবার বেশ জাঁক জমক করেই ঝুলন করছে। দু'দিন খিচুড়ি ভোগ হবে। যাত্রা হবে। মন্দিরটা সাজানো হচ্ছে চুনকাম করার পর।

মদনের সময় নেই নটবর, গদাধর, রতন, বিপিন দাশ আরও অনেকেই কাজে লেগেছে। নশীরাম অবশ্য খুব খুশি হয়নি মদনার উৎসবের প্ল্যানে।

গিন্নিকে বলে—এমনি করে পয়সা নয়-ছয় করবে মদন? এত ঘটোবাটার কি দরকার ছিল?

বাসন্তী ও পাড়াপড়শীকে দেখাতে চায় তার বৈভব। স্বামীর মতো হতদরিদ্র হয়ে থাকতে চায় না সে। তাই বলে—বেশ করছে। ঠাকুর দিয়েছে—ঠাকুরের কাজে ঘটা করবে না? তুমি বাবু বাধা দিও না বাপু।

নশীরাম চুপ করে যায়। দেখছে সে ব্যপারটা, তার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে আসছে ঘটার ব্যাপার দেখে।

কিন্তু কিছু বলার সাধ্য নেই নশীরাম দত্তের। বুকটা চড় চড় করছে তার। গিন্নি আর তস্য পুত্র মদনই সব আয়োজন করছে। পুজো হবে, দরিদ্র নারায়ণ ভোজন করানো হবে। দরিদ্র নারায়ণ! কথাটা শুনলে গা জ্বালা করে নশীরামের। হাড় হাভাতে ভিখারীর দল, কাজ করবে না। আবার নারায়ণ সেজে বসবে। তাদের সেবায় ঘটা হবে দশ মণচাল—পাঁচ মণ ডাল। আরও অনেক কিছু।

তারপর ভোগরাগ ব্রাহ্মণ ভোজনের নামে লুচি সন্দেশের ঘটা তো আছেই। নশীরাম দেখছে ঠাকুর। রান্নার লোক, শহর থেকে এত টাকার জিনিসপত্র হাট-বাজার, মাছ বাদ্যি-বাজনা, ডাইনামো—লাইট সব এসে গেছে। বিজলিবাতি জ্বালা হবে। এই আলোতে যাত্রা হবে।

সারা গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেছে। এমন কাণ্ড এই গ্রামে প্রথম হচ্ছে। আর করছে নশীরাম বাবুর ছেলে মদনই। পঞ্চগ্রামে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে। মন্দিরের বাইরের বড় মাঠটায় যাত্রার ম্যারাপ বাঁধা হবে। ওদিকে দু-চারটে দোকানপত্র বসছে।

সেনবাড়ির রাস-এর সময় এমন জাঁকজমক হত। মেলা বসত। তখন ওদের খুব রমরমা। কিন্তু ক'বছর থেকে সেই উৎসব এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। নমো নমো করে কোনোমতে পুজাটা হয়। মেলাও বসে না, যাত্রা গানও হয় না।

কয়েক বছর পর এই গ্রামে আবার মেলা বসাচ্ছে নশীরাম বাবু। মদন বলে বাবাকে—এটা কি কম কথা। নশীরাম অবশ্য হিসেবী লোক। বলে সে,

শুধু নাম ফাটিয়ে ঢাক বাজিয়ে কি হবে বাবা? টাকা যা খরচা হবে তাতো ফিরে আসবে না। সুদে বসালে এই হাজার কয়েক টাকা কত হয়ে ফিরত বল দিকি। গিন্নি বলে—তোমার ওই এক কথা।

তবু মদন দমেনি। নশীরাম অবশ্য খুব অখুশী হয়নি, কিন্তু পাছে ছেলে আরও দমকা ঘটা করে সেই ভেবেই মুখ ব্যাজার করে রয়েছে।

মদনের সময় নেই।

দুপালা গান হবে। নটবর, গদাধর, বিপিন-এর দল রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত। সকাল থেকে মহড়া চলছে—দুপুরে খাবার ব্যবস্থা এখানেই। মাংস ভাত—

হঠাৎ খবরটা আনে ভূষণমাষ্টার। মদনও রয়েছে আসরে।

ভূষণ বলে—ভর্তি গাজনে ঢাক ফেঁসে গেল মদন। কেন? মদন শুধোয়।

ভূষণ খবরটা দেয়—অতুল এবার যাত্রার পার্ট করছে না।

সারা রিহার্সাল ঘরে স্তব্ধতা নামে। লোকনাথ সুদামার পার্ট ভালোই করে। অতুল করছিল কেষ্ট। জানে অতুল গানে গানে জমিয়ে দেবে যাত্রা। কিন্তু অতুল পার্ট করবে না শুনে বলে সে—কি হবে গো মাষ্টার? তা পার্ট করবে না কেন?

খবরটা অনেকেই জেনেছে এরমধ্যে। অতুলকে নাকি নশীরামবাবু কাল মাঠে খুব মেরেছে। সেই রাগে অতুলের গর্জনে সেনকত্তাই নিষেধ করেছে তাকে। আর ওরা জানে সেনকত্তা পার্ট না করতে দিলে অতুল করবে না।

মদন কথাটা শুনে মনে মনে এবার খুশি হয়। অন্য সময় হলে সেনকত্তার অসহযোগের জন্য গর্জে উঠত সে। কিন্তু এখন তারই সুযোগ করে দিয়েছে সেনকত্তা। রাধানাথ বলে—কি হবে মাষ্টার? গান হবে না?

ভূষণও ভাবনায় পড়েছে। এই কম সময়ে কাকে তেমন পাবে ভাবছে সে। বলে ভূষণ—তেমন হলে শহরের রাধিকা নাট্যসমাজ থেকে ভোম্বলকেই আনতে হবে হায়ার করে। গান বন্ধ হবে না।

এবার নটবরই ধুয়ো ধরে হায়ার করে বাইরে থেকে প্লেয়ার আনতে হবে কেন? আমাদের মদন বাবুর ওসব পার্ট মুখস্থ আছে। করে দেবে। আর গান তো শুনেছেন মদনবাবুর।

চমকে ওঠে ভূষণ।

ওদিক থেকে গদাধর বলে—আলবৎ হবে। মদনই পারবে ওই পার্ট। কেমন মানাবে তাই বল।

বিপিনও মদনের অনুগত। সে দেখছে নটবর, গদাধর, মদনকে হাতে করেছে, সুতরাং সেও জোগান দেয়।

—যা মানাবে না, দারুণ। কিছু ভেব না মাষ্টার, আজ থেকেই লেগে যাও। ওঠো মদন দা—

দলের অনেকেই চমকে উঠছে মদনের নাম শুনে। কালো বখাটে মার্কা চেহারা। অত্যাচারের ফলে চোখ দুটো কোঠরে বসে গেছে। দাঁতটা উঁচু—নাকও থ্যাবড়া গোছের। পর্ট করেছে এর আগে দু'চার সিন। তাকে মেন রোল করাবার জন্য দল বেঁধে লেগেছে ওরা।

দু-একজন অমত করলেও ভয়ে সেটা প্রকাশ করতে পারে না। তবু ভূষণ আমতা আমতা করে।

এই কম সময়ে কি হবে ওসব পার্ট!

নটবর বলে—কেন হবে না। নাহলে তুমি ক্যামন মাষ্টার হে। আর গুরুকে তৈরি করে দাও। দুশো টাকা বেশি পাবে। মদনকেই ঠেলে তুলেছে তারা।

মদন অবশ্য খুশিই হয় যোগ্য সহচরদের এই নিষ্ঠায়। পার্টটা শুনে শুনে কিছুটা মুখস্থ হয়েছিল, তাই কোন রকমে বলে যায়।

গদাধর বাহবা দেয়—সাবাস গুরু। দ্যাখো দ্যাখো, ক্যামন গড গড় করে পার্ট বলছে গুরু।

ভূষণ মনে মনে শিউরে ওঠে। পার্ট বলছে সত্যি কিন্তু ওই পার্টে কোনো ভাবই নেই। মদন তখন কেষ্টর গান ধরেছে। মাথা নাড়ছে স্তাবকের দল।

—হ্যাঁ! জব্বর হবে মাষ্টার। অতলো কি ভাবে? ও পার্ট না করলে যাত্রা হবে না? এ্যাঁ!

গদাধর বলে—রাজা বিনে রাজ্য আটকায় না—এ তো তুচ্ছ ব্যাপার। চালাও গুরু।

পাড়াতে গ্রামে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। এরাই প্রচার করছে মদন যা পার্ট করছে দারুণ। এবার দত্ত নাট্য সমাজের যাত্রা যা হবে কলকাতার দলের মতোই। মেদিনীপুরের নামী যাত্রার দলের গানও হবে এই আকারে—তাদের চেয়ে মদনের দলের গান কোনো অংশে খারাপ হবে না।

মদনও ক'দিনেই পাকা অভিনেতার মর্যাদা পেয়েছে। মনে মনে ময়ূরের মতো পেখম মেলে ঘুরছে সে।

তাই এসেছে নিজেই সেনকত্তাকে নিমন্ত্রণ করতে। সেনবাড়ির ধ্বংসস্তূপ পার হয়ে আসছে। ওদিককার ঘরে সেনকত্তা আর অতুল রেওয়াজ করছে। অতুলের মনটা ভালো নেই। এবার যাত্রায় সে পার্ট করছে না।

সেই দুঃখটাকে রেওয়াজ করেই ভুলতে চায়।

এমন সময় মদনকে আসতে দেখে চাইল সেনকত্তা।

মদন দেখছে ঘরখানাকে। ওদিকে সোফাগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা। তুলো বের হয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে আছে স্প্রিংগুলো। দেওয়ালে এককালে নীল রং ছিল; এখন খাবলা হয়ে চুন কালি খসে বিবর্ণ ক্ষতে ভরে গেছে দেওয়ালটা।

মেঝেতে সতরঞ্চিটা ধুলোয় বিবর্ণ। তক্তপোসে বসে সেনকত্তা তানপুরা হাতে রেওয়াজ করছিল—মদনকে ঢুকতে দেখে চাইল।

মদন বলে—কাল থেকে আমাদের ঠাকুরবাড়ির উৎসব। আমাদের দলের যাত্রাও হবে দু'রাত্রি, একপালা হবে বাইরের দলের। আপনাকে যেতে হবে।

মদন তাকে ইচ্ছে করেই জানায়,

—এবার আমাদের দুটো বই-এ আমাকেই নামতে হল।

অতুলকে তো পাওয়া গেল না। অবাক হয় সেনকত্তা—তুমি করছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কৃষ্ণ সুদামার কৃষ্ণ, আর কাজললতাতেও হিরোর পার্ট করছি। যাবেন কিন্তু। আপনাদের মতো জ্ঞানী-গুণী লোকের সামনে অভিনয় করলে ভুল ক্রটি শুধরে দিতে পারবেন। বিনয়ে গলে পড়ল মদন।

কিন্তু মনে মনে যেন জানাতে চায় সেনকত্তাকে যে তার বাগড়া দেওয়া সত্ত্বেও যাত্রা হচ্ছে। যাত্রা আটকানোর সাধ্য তার নেই।

সেনকত্তা সেটা বুঝলেও মুখে বলে,—যাব বৈকি! নিশ্চয়ই যাব।

বের হয়ে এল মদন বিজয়ীর মতো। সেনকত্তার এই বাধা দেবার জবাব কিছুটা দিয়েছে সে। বাকীটা দেবে যাত্রার আসরে। অতুলকে দেখেও দেখেনি মদন, তাকে যেতেও বলেনি। একেবারে তাচ্ছিল্য করেই বের হয়ে এল সে।

ও বলে যাবার পর স্তব্ধতা নামে ঘরে।

সেনকত্তা দেখছে অতুলকে। অতুল ভেবেছিল ওরা তাকে ডাকতে আসবে। কিন্তু তা আসেনি, ওরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

সেনকত্তা বলে— কিরে অতুল!

অতুল চুপ করে বসেছিল। বাইরের চত্বরে বৈকালের আলো পড়েছে। আগাছা গজিয়েছে চত্বরে। কাল কাসিন্দের বন—তেলাকচুর লতা ঝুলছে।

সেনকত্তার ডাকে অতুল এই নিঃস্তব্ধার ছবিটা থেকে চোখ সরিয়ে এদিকে চাইল।

সেনকত্তা বলে—দ্যাখ্ কেমন গান হয় এবার।

ওসব না করে ভালোই করেছিস। রেওয়াজ কর। শহরে গাইতে হবে।

উঠে পড়ে সেনকত্তা। বৈকালে বেড়াতে বের হয় নদীর ধারে। চলে গেল সেনকত্তা। শূন্য ঘরে একাই অতুল রেওয়াজ-এর চেষ্টা করে।

ম্লান, বিষণ্ণ বৈকাল নামছে।

অতুল প্রথমে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল যাত্রায় নামতে না পারার জন্য। যাত্রার আসর যেন তাকে ডাকে। ডেলাইটের আলো—লোকজনের ভিড় তাব মাঝে অতুল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার গানে অভিনয়ে। ওইটুকু তার বড় সান্ত্বনা।

কিন্তু এবার সে উপায় নেই, সেনকত্তাও বলেছেন—যাত্রার আসরে রং মেখে গান না গেয়ে এবার শহরের আসরে গান গাইবি অতুল। রেওয়াজ কর। শহরে নাম করতে পারলে তোকে আটকায় কে। হয়তো কলকাতাতেই ডাক পড়বে তোর।

একটা নোতুন স্বপ্ন অতুলের মনকে আচ্ছন্ন করেছে। তাই নোতুন এক সাধনায় মেতে উঠেছে সে। বৈকালের আলো নামছে, হঠাৎ নির্জন পরিবেশে ললিতাকে দেখে ও চাইল। —তুই?

ললিতা এসেছে সকালের সেই খবরটা নিয়ে। আরও শুনেছে ললিতা এবার মদনের যাত্রার আসরে নামছে না অতুল। ললিতা ভেবে নিয়েছে এখানেও যেন একটা চক্রান্তই চলেছে, ওকে বাতিল করার চক্রান্ত।

ললিতা বলে—এলাম। তোমার তো দেখা নাই, খুঁজে বার করতে হয়। তোমাকে নাকি এবার যাত্রার দল থেকে বাদ দিয়েছে ওরা শোনলাম।

অবাক হয়ে চাইল অতুল। একথা তো শোনেনি, মনে হয় অতুলের হয়তো এইটাই সত্যি, সেনকত্তা কথাটা আগে ভূষণ মাষ্টারের কাছে শুনে তাকে এইভাবে ঘুরিয়ে নিরস্ত করেছে, যাতে অতুল দুঃখ না পায়। অতুল এবার নোতুন করে ভাবছে কথাটা। তার শিল্পী মনে এই চক্রান্তের সংবাদটা কি বেদনা

আনে। শুধোয় অতুল—তুই কোথায় শুনলি?

ললিতা বলে—সব্বাই জানে, গাঁ শুদ্ধ সবাই বলাবালি করছে ওই মদন দত্তরই কাজ এসব। বেশি টাকা দেয় বলে তাই সেই-ই যা করবে তাই হবে। তোমাকে তাই সরিয়ে দিয়ে নিজেই কেষ্ট সাজছে। ক'দিন থেকে এন্তার চেঁচিয়ে পাট মক্‌সো করছে।

কি ভাবছে অতুল। তাহলে এসব ষড়যন্ত্রই। তাকে কোনোমতে এরা প্রকাশ পথ পেতে দেবে না।

ললিতা বলে চলেছে—ওই মদন একটা শয়তান। মহাপাজি। তেমনি ওর দলবল।

আজ সকালে মদনবাবু আমাদের বাড়ি এসেছিল। যা মুখ চোখ ওনার —আমি তো ভয়ে কাঁটা। কে জানে মদ-ফদ খায় কি না? শুনছি ও-ই তোমাকে হটিয়ে তোমার পাটগুলো করছে। অতুল ভাবছে কথাটা।

কি অসহায় বেদনায় তার সারা মন ভরে ওঠে।

বলে সে এখানে ওরা আমাকে এমনিভাবে মারবে, সব মান ইজ্জতটুকু কেড়ে নেবে তা জানি ললিতা। তাই ভাবি এখানে পড়ে থেকে কি হবে, চলে যাব যেদিকে দুচোখ যায়। ওরা লোভি, শয়তান। সব পেতে চায়রে।

ললিতা দেখছে ছেলেটিকে। অতুলের জন্য আজ ললিতার সারা মনে একটি বেদনার্ত আভাস জাগে। কি সান্ত্বনা দেবে জানে না সে। তবে ললিতার মনে হয় অতুলের কথাটা সত্যি। ওই নশীরাম মদনরা লোভি, শয়তান। সকলের সব কিছু কেড়ে নিতে চায় ওরা। জমি-জিরেত, টাকা,সম্মান, প্রতিষ্ঠা সব কিছু।

ললিতা আজ সকালে মদনের সে লোভি রূপটাকে দেখেছে। বাবার কাছে এসে নিজেদের দলখদারীর কথাটা ঘোষণা করে গেছে। আর ললিতা দেখেছে ওই মদনের লোভি হিংস্র সত্তাটাকে। অতুলের কথাই সত্যি মনে হয়।

ওদের হাত থেকে মুক্তির পথ সন্ধান তারা জানে না। ললিতারও ভয় হয়। সন্ধ্যা এখানে আগেই আসে। পুরোনা গাছগুলো ওই ভাঙা প্রসাদের রাজ্যে দিনের আলো মুছে মুছে অন্ধকার নামছে, ললিতা বেব হয়ে আসছে নির্জন পথে একা। বাড়ির দিকে চলেছে।

হঠাৎ ওই তেলাকচু কালো কাসিন্দের জঙ্গলের মাঝে কাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

হাসছে মদন, কিবে ললিতা। এখানে এসেছিলি গুরুর কাছে গান শিখতে? এই নিরিবিলিতে, এ্যাঁ।

তা গুরু পেয়েছিস ভালো। কলির কেষ্ট দেখছি। তার জন্য রাধা একেবারে ওপাড়া থেকে এপাড়ায় ছুটে এসেছে সুর শুনে।

ললিতা থমকে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে অপমানে ওর ফর্সা মুখটা টসটসে হয়ে উঠেছে। মদনবাবুকে এসময়ে এখানে নিরিবিলিতে পথে দেখার কল্পনা করেনি সে। মদন ফিরছিল ওপাড়া থেকে নেমতন্ন সেরে, সেও এই নির্জনে ললিতাকে দেখে বুঝে নিয়েছে কোথায় এসেছিল ললিতা।

মদন এগিয়ে আসে। বলে সে—গান ভালোই গাও তো শোনাও একদিন। বৈঠকখানাতেই আয়োজন কবি।

ললিতা খুশি হয়নি। সে বলে—গান আমি গাইতে পারি না।

—লজ্জা! কিরে! মদন যেন হাতটা একটু এগিয়ে দেয় ওর গাল ছুঁয়ে আদর করার ভঙ্গিতে।

চমকে ওঠে ললিতা। চারিদিকে ধ্বংসপুরীর রাজ্য, লোকজন নেই। এমনি অবস্থায় মদন ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা করেই অপমান করতে চায় ওকে হাতে পেয়ে। ললিতা বলে ওঠে, পথ ছাড়ো।

ওর কণ্ঠস্বরে এবার কাঠিন্য ফুটে ওঠে, সেটা মদনেরও নজর এড়ায়নি। কিন্তু মদন ওটা গ্রাহ্য না করেই বলে হাল্‌কা স্বরে—

—পথ ছাড়ব বইকি, তবে গান একদিন শোনাতে হবে মাইরি। এত রাগছিস্‌ কেন? অতুলকে গান

শেখাতে পারিস্—আমি শুনলেই দোষ। আমিও গান গাই বাবা। তোকে দরকার হলে আমিই শেখাব—খুব যত্ন করে শেখাব।

হঠাৎ সামনের রকে অতুলকে বের হয়ে আসতে দেখে ললিতা যেন সাহস পায় অতুলও ঘর থেকে ললিতার ওই চড়া স্বর শুনে বের হয়ে এসে সামনে মদন দত্তকে দেখে একটু অবাক হয়। অতুল এগিয়ে আসে মদন দত্তের দিকে। বলে সে,—আপনি এখানে?

মদন অতুলকে এখানে বের হয়ে আসতে দেখবে ভাবেনি। অতুলও একটু রেগেই রয়েছে। নশীরামের অহেতুক মারটা সে ভোলেনি। মারার দাবী যেন তাদের আছে। দাবী আছে যাকে তাকে অপমান করার। ললিতার চাহনিতে দেখেছে অতুল একটা ভয়ের চিহ্ন। মনে মনে তৈরি হয়েছে।

অতুল আজ একটু শক্ত হয়ে উঠেছে, তার হারাবার কিছুই নেই। সবই আগে হারিয়ে গেছে। সে নশীরামের ঘাতকও নয়। অতুল শুধোয় চড়াস্বরে, —এখানে কি করছেন মদনবাবু?—

মদন একটু ঘাবড়ে গেছে। বলে সে, না সেনকত্তার কাছে এসেছিলাম। ফেরার পথে ললিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই এমনি কেমন আছে, গান টান কেমন চলছে তাই শুধোচ্ছিলাম। অতুল বলে ওঠে—পথ আগলে ভয় দেখিয়ে সেটা না করলেই পারতেন। আমাদের মান অপমান নাই মদনবাবু, আপনাদের আছে। সেটা নাকি খুব দামীও।

সেটা হারাবেন না। যান। যান এখান থেকে। ওকে কঠিন ভাষাতেই আজ ওই অতুলের মতো তুচ্ছ একটা ছেলে দাবড়ে উঠেছে। মদন ওর সাহস দেখে অবাক হয়। আর ভয়ও পেয়েছে, কারণ স্বভাব ভীতু ওরা। বাধা পেলেই থমকে দাঁড়ায়।

থমকে দাঁড়াই। তাই দপ করে জ্বলে উঠতে গিয়ে পারে না। অতুল তার তুলনায় অনেক শক্তিমান, আর মদন দেখেছে ওর রাগটা, হাত চালাতেও পারে বোধ হয়। সরে আসছে সে। কানে আসে অতুলের কথাগুলো। তার উদ্দেশ্যে বলছে, জানোয়ার কোথাকার। গালে থাপ্পড়া মারতে পারলি না কেন ললিতা?

ললিতা চুপ করে থাকে। কি ভেবে বলে সে ভীত স্বরে, —ওদের চটিয়ো না।

অতুল বলে—মাথা নীচু করলে ওরা আরও পেয়ে বসবে। চল্ তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ললিতা আর অতুল আজ দু'জনে একটা লোভী জানোয়ারের নগ্ন হিংস্র স্বরূপকে দেখেছে, চমকে উঠেছে ললিতা।

বলে সে—আমার ভয় করে অতুল ওরা সব করতে পারে।

অতুল গর্জায়—ছাই করবে! যাত্রার আসরে গাইতে দেবে না এই তো? গাইব না।

মদন রাগটা চেপে যাত্রার আখড়ায় এসেছে গুম হয়ে।

তখনও ললিতার সেই সুন্দর মুখখানার কথা মনে পড়ে, অতুল আজ তাকে রীতিমতো শাসিয়েছে ওই মেয়েটার সামনে, অপমানই করেছে তাকে।

ললিতাও মজাই দেখছিল তখন। মদন দত্তও দেখে নেবে ললিতার ওই হাসি থাকে কোথায়? আর অতুলের ওই শাসানির জবাব সে দেবেই।

আখড়ায় এসে মদন তাই অতুলের সম্বন্ধে কথা শুনে চাইল ওদের দিকে। দেখছে ওই রমণী মুখুজ্যেকে। অতুলের জন্য তার আপশোসটা যেন বেশি।

রমণী বললে—খাসা গায় হে ছেলেটা। দেখতেও যেমন, গলাখানাও তেমনি। পাট, কাজ খুব সুন্দর। আসর মাতিয়ে দেয় নেমেই। এবার নামছে না কেন অতুল?

নটবর বলে ওঠে থামো তো রমণী. অতুলো নামবে না বলে কি যাত্রা হবে না রূপগঞ্জের? আলবাৎ হবে, ও পার্ট করবে মদনবাবু? দেখবে কেষ্ট হবে অরিজিন্যাল আর গানও শুনবে। তেমনি সরেশ গান।

গদাধর সায় দেয়—ওই অতুলোর চেয়ে অনেক সরেস হবে। বাইরের দলও আসছে, টাকা লেনেওলা পার্টি—ভাগ্গব অপেরা। তাদের গানের সঙ্গে আমাদের গান মিলিয়ে নিও হে। পাল্লাদে

গাইব। রতন তাড়া দেয়।

—কই হে মাষ্টার,মহড়া শুরু করো মাইরী, তা নয় রঙ্গগঞ্জ করে কালহরণ করছ, তিন দিনের মাথায় গান, কি হবে? ধ্যাড়াবে শেষমেষ।

ভূষণ মাষ্টার বিপদে পড়েছে, তারও ভয় ভয় করছে।

মদন দত্ত বলে—এবার সাজ ভাড়া করার সময় সদর থেকে সখীর ব্যাচও নিয়ে এসো মাষ্টার। সেরা নাচিয়ে চাই। যা লাগে দেব আগাম। নালে মাইরী রাজসভার সিনে 'নিত্তকী' নাই—শ্যালা রাজসভা মানায়।

রতন সায় দেয়—ঠিক কথা।

মহড়া শুরু হয়েছে। টাকা দেয় মদন। এবার গানের পুরো টাকা তারাই দিচ্ছে, সুতরাং বলার কিছুই নেই। তবু খুঁত খুঁত করে ভূষণ মাষ্টার আড়ালে। —কি গান হবে রে রমণী, ওহে নবশশী। মদন কি করছে ওই পার্ট?

পয়সা আছে মদনের বাবার সত্যি, কিন্তু মদনের চেহারাটা বখাটে গোছের। অত্যাচারের ফলে গালগুলো বসে হাড় ঠেলে উঠেছে, চোখগুলো কোটরে ঢোকা আর গলার স্বরও তেমনি কর্কশ। পার্ট করছে তেমনি, তার গান কেষ্টর গান। এর কোনো তাললয়ও নেই। সুরও নেই। কিন্তু বলার কিছু নেই।

রতন বেমক্কা তবলায় চাটি মেরে মদনের গানের উপর হৈ চৈ করে—সাবাস্ গুরু, সুরে ভরিয়ে দিলে মাইরী।

রমণী পার্ট থামিয়ে দেখছে ওদের কাণ্ড। কিন্তু বলার কিছু নেই। আড়ালে বলে—এ যে ভূতের কেত্তন হচ্ছে মাষ্টার।

ভূষণ মাষ্টার চুপ করে থাকে। নশীরামের কাছে হাত পা তার বাঁধা। মদন দত্ত মাসে কিছু করে টাকা দেয়। তাতেই সংসার চলে কোনোমতে। তাই ভূষণ বলে—যে যা করছে করুক রমণী, তোর পার্ট তুই করে যাবি। এরা বুঝলো না টাকা দিয়ে প্রতিভাকে কেনা যায় না। তার দাম আলাদা। বল্লাম শুনলে না। আমি কি করব বল।

তবু গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। জাঁকিয়ে ঝুলন উৎসব হচ্ছে এবার।

কথাটা এর মধ্যে ছড়িয়ে গেছে চারিপাশে।

শান্ত গ্রাম। পূজার সময় দু-একটা প্রতিমা হয় আবার তারপর চুপচাপ। যে যার কাজ নিয়েই থাকে মাঠে-স্টিমারে দিনভোর। বাড়ি ফিরেও শান্তি নেই।

কেরোসিন তেল মেলে না। কোনোমতে একটু আধটু জোগাড় হয়—যাদের ছেলেপুলে পড়ে ওটা চলে যায় হ্যারিকেন জ্বালাতে।

অন্য সকলে পাটকাঠি জ্বেলে না হয় বড় জোর কুনি জেলে সন্ধ্যাবেলাতেই রাতের খাওয়া চুকিয়ে নেয়। ওদের পাট চুকে যায়।

....ভোরে উঠে আবার গরুবাছুর সামলে মাঠে যেতে হয় সকালেই। সন্ধ্যার মাঝে মাঝে হরিসভার চাতরে দু-চারজন জোটে, কিছু কথাবার্তা হয় ওই চাষবাস, না হয় ফসলের—অজন্মা, দরপত্র এসব নিয়ে। তাও কিছুক্ষণ মাত্র। যে যার ঘরে ফিরে শুয়ে পড়ে।

কোনো উৎসবের প্রয়োজন নেই প্রাচুর্য নেই। আনন্দের অবকাশও সীমিত।

চাষবাস হয়ে গেছে। এবার ধানও লেগেছে ভালো, ভগবান যদি বৃষ্টি সময়ে চালিয়ে যায়, এবার তাহলে কিছু আমদানী হবে। ফসল ভালোই পাবে তারা।

এখন কাজের চাপ একটু কম।

তাই ঝুলন উৎসবের ওই ঘটা পটা হবে শুনে গ্রামের সকলেই বেশ খুশি।

গুপীনাথ হাটের ওদিকে তেলেভাজা ফুলুরীর দোকার করে। সকালের দিকে কিছু কেনাবেচা হয়,

দুপুরে সে-ও মাঠে কাজ করে। সন্ধ্যায় কোনোদিন চলে, কোনোদিন চলেন না। চলে শুধু হাটবার। সপ্তাহে দু'দিন হাট, সেদিন কেনাবেচা ভালোই হয়। গুপীনাথ খুশি হয়েছে।

সে মদনবাবুদের রাতের ভাজাটাজা জোগায়। নটবর, নোটন সবাই আসে। তারা চালায়। ওদের কাছেই গুপীনাথ খবরটা পেয়েছে। একেবারে কম্মো কত্তাদের মুখর খবর। গুপী সেদিন চাতরে খবরটা জানায়।

—হাঁ গো। শোনলাম ইবার এলাহি কারখানা হবে। নোতুন নাটমন্দির প্রতিষ্ঠা হল কিনা, তাই বিরাট করে যাত্রা হচ্ছে, গাঁয়ের দল গাইবে দুপালা, আর মেদিনীপুরের নামী দল আসছে একপালা গাইবে, রম রমা ব্যাপার হবে।

বাজী—মেজিক আসবেক, দোকান পশারও বসবেক। মদনবাবু রঙ্গীন কাগজ ছেপে পঞ্চগেরামী ছড়িয়েছে, সদরেও গেছে কাগজ ছড়াতে।

ব্যাপারটা দেখেছে অনেকেই।

এক সপ্তাহ ধরে মেলা বসবে। আব ওইসব আয়োজন হবে।

তাই খুশির সাড়া জাগে। একটা কিছু করার মতো কাজ পেয়েছে তারা। গ্রামের চাতরে মদন দত্ত গাঁয়ের ছেলেদের সব ডেকেছে। ভিড় জমেছে তাদের । গ্রামেব কিছু মাতব্বরও আছে।

মদন গ্রামের ছেলেদের কাছেও হিরো হয়ে উঠতে চায়।

মদন বলে চলেছে তোদের সব ভলেন্‌টিয়ার হতে হবে; ওদিকে মন্দিরের ভিড়, যাত্রার ভিড়, মেলার সব কাজ করতে হবে।

সহচব নোটন, বতন, গদাধরবাও এসেছে।

রতন বলে—মদনদা ব্যস্ত থাকবে। গদাই হবে তোদের ক্যাপটেন। গদাই শীর্ণ প্যাকাটির দেহ আর মুরগীর কলজের মতো এইটুন বুক ফুলিয়ে বলে—আমার কাছে আসবি সবাই। নাম লিখে ব্যাচ দিয়ে ডিউটি দিয়ে দেব।

ছেলেবাও সায় দেয়।

ভলেনটিয়ার-এর পদটাও বেশ বড়সড়ই, সকলেই তাই আগ্রহ প্রকাশ করে।

নিতাই পাল বলে,

—হ্যাঁরে মদনবাবুই গাঁয়ের হাল ফিরিয়ে দেবে। কি কাজের ছেলে। মাতব্বররা অনেকেই সায় দেয়।

—তা সত্যি। এতবড় মেলা যাত্রা-টাত্রা কে কবায হে। কার এত বড় হিম্মৎ আছে।

একবাক্যে সকলেই স্বীকার করে—এমন হিম্মৎ কারও নেই।

আছে ওই মদনের। এদিকে চুল ছিঁড়ছে নশীরাম দত্ত।

অবশ্য মাথার চুল তার ক'গাছায় এসে ঠেকেছে। গোটা মাথা জুড়ে এখন বেশ চক্‌চকে একটি টাক। লোকে বলে,

—টাকার গরমে সব চুল উঠে গিয়ে মাথাজোড়া টাক পড়েছে নশীরামবাবুর।

কিন্তু নশীরাম জানে টাক পড়ুক না পড়ুক তার কি আছে, আর এতদিন ধরে বুক দিয়ে হামলে পড়ে সেই টাকা সোনাদানা সম্পদ সে রক্ষা করেছে। লোকের বহু চোখের জল অভিশাপকে তুচ্ছ করে শুধু টাকা—জমি বাড়িয়ে গেছে সে নানাভাবে।

আর এবার যেন তার সব সঞ্চয় ধরে টান ধরেছে তার ছেলে আর অর্ধাঙ্গিনী। ওদের চাপেই শেষ হবে নশীরাম।

মন্দির করিয়েছিল—কিন্তু নাটমন্দির করার মতলব তার ছিল না।

তার স্ত্রী বাসন্তীবালা সেবার শহরে গিয়ে কোনো মন্দিরের লাগোয়া নাটমন্দির দেখে এসে বায়না ধরে—

---মন্দির হবে, নাটমন্দির থাকবে না। এ কেমন কথা গো?

নাটমন্দির করতে হবে বাপু।

আর বাসন্তীবালা তার দাদাকে ধরে এনে তাকে দিয়েই সব ব্যবস্থা করায়। নশীরামের সম্বন্ধী ছোটখাটো কনট্রাক্‌টরি করে, এবার মৌকা পেয়ে ভগ্নীপতিকেই নামিয়ে দেয়। —আমি করে দেব জামাইবাবু, বেশি খরচা পড়বে না।

কাজে নেমে গিয়ে তারপর বুঝতে পারে নশীরাম কি এক বিপদে পড়েছে। বাসন্তীবালাও ফর্দ বাড়িয়ে চলেছে। এটা করো ওটা করো—মার্বেল পাথর বসাতে হবে মেজেতে, বেশ নাম লেখা থাকবে-টাকবে।

নশীরাম ফুঁসে ওঠে। —এবার ফতুর করে দেবে।

বাসন্তীবালা বলে--ঠাকুরের দয়াতেই এসব হয়েছে, সেই ঠাকুরকে কিনা ঠকাবে? মাগো কি হবে গো। আমার পাঁচটা নয় সাতটা নয়—একটা পোলা, তার অকল্যাণ করবে গো। ....নশীরাম বিব্রত হয়ে বলে,

—আর চীৎকার কোরো না। থামো বাপু। হবে।

নশীরাম চিঠি পেতে মার খেয়েছে। বেশ বুঝেছে শালাবাবু নাটমন্দির করার নাম করে ভগ্নীপতিকে 'লাট' করে গেছে। তবু যাহোক দেখতে ভালোই হয়েছে নাটমন্দির।

সেই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে এবার মাতৃদেবীর যোগ্য সন্তান মদন উঠে পড়ে লেগেছে। এবার ঝুলনযাত্রায় ঘটা করে নাটমন্দির উদ্বোধন করা হবে।

তবে উদ্যোগপর্বের ফিরিস্তি শুনে আর ফর্দটা দেখে নশীরামের ধাত ছাড়ার উপক্রম। চীৎকার করে সে, মদনের মুখের সামনে—

—পথে বসাবি এবার তোরা দুজনে। তুই অর তোর মা!

বাসন্তীবালা অবশ্য ছেলের ওই মেলার খবর আর যাত্রার খবরপত্র, মহোৎসব—খিচুড়ী ভোগ এর প্ল্যান সবই শুনেছে। ছেলেকে পাঠিয়েছে বাবার কাছে এ নিয়ে আলোচনা করতে, নিজে ছিল বাইরে, বাসন্তীবালা জানে লোকটা অমনিই।

পয়সা আমদানীর খবর ওর কেউ জানে না। দশটা টাকা বাজে খরচা হয়ে গেলে গাঁ শুদ্ধ লোক জানতে পারে। ছেলেকে দেখে ওইভাবে চীৎকার করে উঠেছে নশীরাম।

ছেলের মাকেও ঠেস দিয়ে কথা বলতে দেখে এবার স্বয়ং বাসন্তীবালাই আসরে অবতীর্ণ হয় স্বমূর্তি ধরে।

—কি বললে? আমি তোমাকে ডুবিয়েছি? আমি আর তোমার ছেলে? তা জানি—আমাদের দেখতে পারো না।

ঠিক আছে। থাকো তুমি তোমার টাকা আর সোনাদানা নিয়ে। আমরাই সব কেড়ে নিচ্ছি?

দরকার নেই ওতে। মায়ে পোয়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।

বাসন্তীবালা অবশ্য সে মেজাজটা ইচ্ছামতো চড়াতে নামাতে পারে। দুচোখে জল ভরে আসে। নশীরাম বলে গলা নামিয়ে।

—আহা তাই বলেছি নাকি। তবে যা করবে একটু হিসাবকরে করতে হবে তো। নাটমন্দিরের পেছনে এতগুলো টাকা গেল, আবার—

বাসন্তীবালা বলে

—তাহলে থাক ওসব। পড়ে থাক নাটমন্দির। কি হবে ওসব করে।

মদন মায়ের দিকে চাইল। তার প্ল্যান মাফিক কাজ শুরু হয়ে গেছে। দু'রাত্রি যাত্রা হবে। আর অতুল যাত্রা করবে না, মদনও পিছপা নয়।

সে নিজে নায়ক সাজছে, এতবড় গৌরবটা থেকে ক্ষুণ্ণ হবে সে। মেলার হ্যান্ডবিল বের

করেছে—সেই-ই সেক্রেটারী। দোকানপত্রও আসবে। বাইরের যাত্রার দলকে বায়না করা হয়েছে।

ম্যাজিক—মরণকূপের খেলওয়ালারা এসে জায়গা দেখে গেছে।

এসময় খেলা হবে না, যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। এসব হলে মদনের আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ থাকবে না।

মদন মায়ের ওই গৃহত্যাগ করার তানে সায় দিতে পারে না মন থেকে। তাই আর্তনাদ করে সে,

—মা! তাহলে মুখ থাকবে না আমার? বাসন্তীবালা ধমকে ওঠে।

—বড় মুখ করে এসব করতে যাস্ কেন? তোর কিপটে বাপকে চিনিস না? মদন আর্তকণ্ঠে বলে,

—কি হবে মা? বাসন্তীবালা ছেলের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে বলে,

—ঠিক আছে। আমি তো মরিনি। আমার সোনাদানা, টাকা যা আছে তাই দে কর ওসব। এসব কার জন্য? এ্যাঁ। আর তোর ছোট মামাকে খবর দে—সে এসে দাঁড়িয়ে থেকে শুভকাজ করিয়ে যাবে।

স্বামীকে শোনায়,

—তোমার কানাকড়িও নেব না। চল বাবা মদন। ও দেখুক—ওর কানাকড়ি না নিয়েও কাজ হয় কিনা। চমকে ওঠে নশীরাম।

ছোট সমন্ধিকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে সে। নাটমন্দির করার নাম করে একবার তাকে পথে বসিয়ে গেছে, আবার এই মেলা উৎসব চালানোর ভার যদি তারমতো এলেনদার লোকের হাতে পড়ে নশীরামকে পথে বসিয়ে দেবে।

নশীরাম আর্তনাদ করে ওঠে,

—শোন না! এত চটো কেন?

বাসন্তীবালা থামল। জানত জালে ফেলেছে ওকে। নশীরাম ঘাড় ধরে করবেই। নশীরাম কোণঠাসা বিড়ালের মতো রুখে উঠতে গিয়েও পারলো না।

ছি ছি করছে সে।

আমি তো নিষেধ করছি না তবে যা করবে একটু বুঝে সুঝে হিসেব করে চলতে হবে তো?

মদন বলে,

—এত বেশি কিছু করিনি। আর একবারই তো হবে এসব। কত লোক হাঁ করে বসে আছে। নামডাক হবে আমাদের।

নশীরাম কোনোরকমে আঘাতটা সহ্য করার চেষ্টা করে। জানে প্রতিবাদ করার সাহস সাধ্য কোনোটাই তার নেই।

নশীরাম দেখছে গিন্নীকে।

কে জানে আবার কি নাটক শুরু হবে।

অগত্যা মিন্ মিন্ করে বলে সে,

ঠিক আছে। তবে বাপু একটু টিপে খরচা কর। পয়সা একবার বেরুলে আর ঘরে ঢোকে না। থাকলে তো তোরই থাকবে বাবা। তাই বুঝলি, একটু হিসবে করে চলতে হবে। পুরোদমে মেলার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছে।

মদন তার দলবলদের নিয়ে এখন ব্যস্ত। গদাধরের পিছনে ঘুরছে একপাল ছেলে। ওদের লিডারএখন সে।

মেলার একদিকে দোকান পশারি এসে বসেছে।

মনোহারি দোকান, ওদিকে চার পাঁচটি খাবারের দোকানের ঘর তৈরি হচ্ছে।

না—গুপীনাথও তার দোকান ফেঁদেছে। চপ—কাটলেট, পাঁপড় ভাজা, পেঁয়াজি সবই থাকছে। ওদিকে কয়েকটা নাগরদোলা এসে বসেছে। ছেলের দল এখন থেকেই মেলায় জমছে।

মদনের অবকাশ নেই।

শহর থেকে জেনারেটার এনে মন্দির নাটমন্দিরে তার টাঙ্গিয়ে টুনি বাল্‌ব সাজিয়ে ঝলমল আলোর বন্যা বইয়ে দেবে সে।

ওদিকে তৈরি হয়েছে যাত্রার দলের আসর। সেখানেও বিজলির আলো জ্বলবে। মাইক-লাইট এসে গেছে। দোকানের এত আলো ফেলে যাত্রার আসরে অভিনেতাদের ঝকমকে করে তোলা হবে। নাচের দৃশ্যে সেই আলো আবার এই বেগুনী, এই লাল-নীল-হলুদ হয়ে উঠবে।

একজন যেন এই আনন্দের জগৎ থেকে বিসর্জিত হয়েছে। অতুলও থাকতে পারেনি। সেও নীরব দর্শকের মতো এসেছে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে চুপ করে দেখছে তাদের আয়োজন।

সাজের বাক্স—লাইটের সরঞ্জাম—সখীর ব্যাচের ছেলেরা নামছে ট্রাক থেকে। শহরের সাজ ভাড়া দেবার পার্টিই ওসব জোগান দেয়।

অতুলের ওই ঝলমলে আসরে নেমে সব হাততালি কুড়িয়ে নেবার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি আজ, সেনকত্তার কথাগুলো ভুলতে পারে না সে।

যতই আয়োজন করুক, অতুল ওখানে যাত্রা গাইবে না।

নশীরাম বাবুর সেই মারটা ভোলেনি সে। তাকে নির্দয়ভাবে মেরেছিল তুচ্ছ কারণে। হঠাৎ চাইল অতুল।

মদন-নটবর-গদাইরা ব্যস্ত হয়ে যাত্রার সেই মালপত্র চেক করছিল। দূরে অতুলকে দেখে গদাই বলে,

—ছোটবাবু, অত্‌লো ব্যাটা ঘুর ঘুর করছে, এখনও যেন ওকে সেধে এনে পার্ট দেবে কেউ?

রতন বলে,

ভারি ডাঁট ব্যাটার। আরে তুই কি জানিস গান অভিনয়ের। ছোটবাবুর কাছে এখনও তোকে শিখতে হবে। মদনও দেখছে তাকে।

অতুল জবাব দেয় না। ওদের ওই কথাগুলো শুনেছে। সরে এল সে। ওই উৎসবের আসরে আজ তার কোনো স্থান নেই।

দূরে কোলাহল, মেলার কর্মব্যস্ততার শব্দ আসে। চলছে অতুল তার আস্তানার দিকে।

হঠাৎ ললিতাকে দেখে চাইল। ললিতা এগিয়ে আসে।

—তুমি! মেলার দিকে গিয়েছিলে নাকি গো? অতুল জানায়,

—ওখানে যাবার কোনো অধিকারই আমার নেই। আমি ওখানে গান করছি না। যাবও না।

ললিতা শুনেছে কথাটা। সেদিন নিজে দেখেছিল ললিতা নশীরামবাবু কিভাবে মেরেছিল তাকে।

ললিতা বলে—ওখানে গাইবে না তুমি। নশীবাবু কি সব কিছুরই মালিক যে যা ইচ্ছে তাই করবে? অতুল চুপ করে থাকে।

তবু মনে মনে একজনের কাছে সমর্থন পায় সে। ললিতা বলে, —ওই আলো—আর বাদ্যিই হবে। যাত্রা যা হবে তা জানা আছে। দেখবে কি হয়।

অতুল বলে —তুই যাবি কিন্তু, আমি গাইছি না।

তবু তুই কেন যাবি না?

ললিতা বলে যাবো বৈকি। মদনবাবু ক্যামন দাঁড় কাক থেকে ময়ূর সাজে দেখতে যেতে হবে বৈকি। আর খবর সবই দেব তোমাকে।

ছোট্ট গ্রামটা বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। নশীরাম যেন বুক চাপড়ায়, করার কিছুই নেই, তবু মনে মনে এবার কঠিন হয়ে ওঠে সে। সব দেনাদারের বুকে হাঁটু দিয়ে এ টাকা তুলবে। ওরা যেন নশীরামের এমনি অর্থ ব্যয় ও অপচয় দেখে মনে মনে খুশি হয়েছে। ও দেখে নেবে তার দেনাদারদের।

শহর থেকে ডাইনামো এনে বিজলীবাতি জ্বালা হয়েছে, নাটমন্দির—মন্দিরের গায়ে অসংখ্য ছোট

ছোট বাল্‌ব্‌ জ্বেলে আলোর বাহার এনেছে চারিদিকে।

পরাণ মোড়ল, দুঃখীরাম ও পাড়ার বসন্ত ঘোষ অনেকেই ঠাকুর দেখতে এসে নশীরামকে বলে,

—এলাহি কাণ্ড করেছেন কত্তা। যা বাহার হয়েছে আলোর, আহা যেন ইন্দভূষণ গো।

পাতা পেতে খাচ্ছে গ্রামের অনেকে। ভোজ চলছে সমানে। শিল্পী বাসন্তীবালা সেজেগুজে সারা গায়ে গহনা পরে এদিক-ওদিক তদারক করছে। ওর পরনে দামী কড়িয়াল শাড়ী। বাসন্তী নশীরামকে সেই হাঁটু অবধি ধুতি-ফতুয়া পরে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে অবাক হয় স্বামীর কাছে এসে বলে সে—একি! কাজের বাড়ি, তুমি ওইভাবে ঘুরছ? ওই বেশে একটা —

ফুঁসে ওঠে নশীরাম। বলে, ছাদ্ধ হচ্ছে আমার। তোমরা মা ব্যাটায় আমার টাকার ছাদ্ধ করছ, আমার ছাদ্ধ করছ। এসব হচ্ছে কি? এ্যাঁ গাঁ শুদ্ধ লোককে খাওয়াচ্ছ, রোশনী দেখাচ্ছ—যাত্রা শোনাচ্ছ, কার পয়সা ওড়াচ্ছ এমনি করে? আবার বলে—এই বেশে ঘুরছ কেন?

বাসন্তীবালাও মুখ ঝাপ্‌টে ওঠে। তা তো বলবেই। দুনিয়ার ওই টাকাটাই তোমার সব। লজ্জা করে না সং সেজে ঘুরতে যাও। লোকজন আছে পঞ্চগ্রামের। মান্যি-গণ্যি লোক, ওদের একটু দ্যাখো। যাও পোশাকটা বদলে এসো। নশীরাম বলে ওসব দেখা আছে।

ওই গণ্যি-মাণ্যি লোকেদের অনেকেরই জমি বন্ধকী না হয় ঋণের খৎ তার সিন্দুকে রয়েছে। বিলেও বাকী যা পড়ে আছে তাও কম নয়। আর ওরা তাই নশীরামের এই অপব্যয়ে খুশি হবে বৈকি। এবার নশীরাম দেখিয়ে দেবে ওদের। পাই পয়সাও ছাড়বে না কারো। এটাকা সব তুলতে হবে।

ওদিকে নাটমন্দিরে লোকজন আর ধরে না। এর মধ্যে চারদিকের ফাঁকা জায়গায় চট চাটাই বিছিয়ে দর্শকরা বসে জায়গা দখল নিয়েছে। ওদিকের টালা ইস্কুল বাড়িতে বাঈয়ের যাত্রাদলের লোকদের থাকার ব্যবস্থা করেছে মদন। তারাও এসে বসেছে আসরের পাশে এদের গান শোনার জন্য। কৃষ্ণসুদামা পালা হচ্ছে এখানের দলের।

পঞ্চগ্রামের লোক জমায়েত হয়েছে। সেনকত্তাও এসেছেন, এসেছে গ্রামের মাষ্টাররা। আসর জমে উঠেছে।

ছেলেমেয়ের দলও ভিড় করেছে। একঘণ্টা হয়ে গেছে জোর কনসার্ট বাজছে। রতন বাবরি চুল নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে দুন্দাব ঢোল পিটে চলেছে। কর্নেট বাজছে বিকট শব্দে। ঘণ্টা বাজার পর শুরু হয়েছে সখীর নাচ।

সিটি বাজছে আর তত জলদে নাচ চলতে চলতে সখীর দল প্রস্থান করছে। এবার শেষ ঘণ্টা বেজে যায়, ঢুকছে সুদামাবেশী রমনী মুখার্জী, গরীব ব্রাহ্মণ সখা। তার রাজাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণ। সে চলেছে রাজ সন্দর্শনে দ্বারকাধামে, ডাকছে সে বংশীধারী কৃষ্ণকে কাতর স্বরে বনমধ্যে।

এবার গীতকণ্ঠে কৃষ্ণের প্রবেশ ঘটেছে আসরে।

এতক্ষণ বেশ চলছিল, গোলমাল বাধিয়েছে এবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। চোয়াড়ে বেসুরো গলায় বিকট গানের ধমকে চমকে ওঠে দর্শককূল। এ পার্ট তারা দেখেছে এর আগে অতুলকে করতে। যেমনি তার চেহারা তেমনি গলা, আর অভিনয়।

তার জায়গায় জোর করে মদন দত্ত অভিনয় করছে এই চরিত্রে, কথাটা কিছু লোক শুনেছিল। ভেবেছিল হয়তো মন্দ করবে না সে, কিন্তু তার গান আর অভিনয়ের নমুনা দেখে ওরা চমকে উঠেছে।

কে চীৎকার করে—কেষ্ট! না পাতি হাঁসরে। মদনকে কোকিলের ডিম পুড়িয়ে গেলে বলো মাষ্টার।

ভিন্ন গ্রামের লোকদের উপর নশীরামের তত জোর নেই। তাছাড়া পাশের গ্রাম নূরপুরের যাত্রার দলের নাম ডাক আছে। গ্রামের সম্মান বলে কথা। এরাও এবার ক্ষেপে উঠে। এরা চীৎকার করে—চুপ করো। চুপ করো সব। আসরে গোলমাল করবে না।

কেষ্ট ততক্ষণে রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে। মদন ভাবেনি যে লোকজন তাকে এভাবে অপদস্থ করতে

সাহস করবে তাদের ঠাকুরবাড়ির চত্বরে বসে। নটবর হুঙ্কার ছাড়ে সাইলেন্ট। সাইলেন্ট। কেউ গোলমাল করলে বের করে দেব, হ্যাঁ।

মদন ওদের ধমকে থেমে গেছে, চারিদিকে শুধু মাথা আর মাথা। জনসমুদ্র যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। ভূষণ মাষ্টার আসরে ছিল, ওকে থেমে যেতে দেখে চুপি চুপি বলে, গান ধরো মদন, কোনো ভয় নাই। মদন কোনোরকমে গলা চড়িয়ে গান শুরু করে।

বেসুরে, বেপর্দা গলা, তবু কোনোরকমে গানটা আধশেষ করে প্রস্থান করে। হাসির শব্দ ওঠে।

সাজ ঘর গিয়ে এবার মদন ঘাবড়ে যায়। তখনও গোলমাল চলছে আসরে।

ললিতাও এসেছিল তার পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে যাত্রার আসরে। আর এখানে এসে ওই বিকট গান আর মদনের অসুর-বেশী শ্রীকৃষ্ণ-কে দেখে হেসে ফেলে। মদনও দেখেছে সেটা।

সাজঘরে এসে মদন গর্জে ওঠে আমার এগেনেষ্টে দলবাজি করে আওয়াজ দিচ্ছে, এসব চক্রান্ত, দেখে নেব।

ভূষণ মাষ্টার প্রমাদ গণে, এখন কোনো রকমে আসর চালাতে হবে। নাহলে গ্রামের দলের বদনাম, তার তো বটেই।

ভূষণ বলে—এখন ওসব রাগ রোষ ছাড়ো, মদন শান্ত হয়ে পার্ট করো, একটু জমিয়ে তুলতে পারলে সব থেমে যাবে। চা খাও। ওরে হরিপদ—ফটিক, পরের সিন রাজপথ, তোদের।

হরিপদ বলে—সে হবে গো। বাবুকে শান্ত কর একটু। বেজায় ঘাবড়ে গেছে।

অবশ্য মদনের চেলারা তৈরি ছিল। নটবর এরমধ্যে গেলাসে একটু তাজা 'বেলাক নাইট' ঢেলে এনে বলে—খেয়ে ফেলো গুরু টকাস্ করে, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। যা করছ না মাইরী—লোকজন ট্যারা। শুধু ক-শালা ফুট্ কাটছিল। এবার আসরে চলো —আমরাও রেডি। গোলমাল করলে তুলে নে যাবো না? গুম করে দেব ওদের।

মদন যেন জোর পায়, মদের কবোষ্ণ অনুভূতিটা তার চুপসে পড়া মেজাজটাকে আবার চাঙ্গা করে তোলে। এবার নতুন উদাম নিয়ে সে আসরে যাচ্ছে। রাজসভার দৃশ্য—জমকালো পোশাক পরেছে মদন।

মহা উৎসাহে এবার গান ধরে ঢুকছে আসরে মদন। আর গলাটা যেন বের হয় না, ওদিক থেকে আওয়াজ ওঠে বদলি কেষ্ট নামাও, নাহলে পাল চাপা দেব মাইরী। হটাও ধিনি কেষ্টকে।

কে বিকটস্বরে হুকুম করে—কেটে পড মদনা, বাপের সুদ আদায় কর গে, তোকে দিয়ে কেষ্ট হবে না, বকাসুরের পার্ট কর গে।

এদিকে নটবরের দল গর্জন করে--সাইলেন্ট, বের করে দেব! ইউ—

কলরব ওঠে। হঠাৎ ডায়নামোটা বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিকে অন্ধকার নামে, কারা যেন বোধ হয় ডায়নামোর তার কেটে দিয়েছে। মেরামত চলছে, নশীরাম এতক্ষণ তবু সহ্য করেছিল। এসব ভূতেব কেত্তন দেখে আর মদনের গান শুনে তারও মাথা গরম হয়ে গেছে, গর্জায় সে।

—এই তোর কেষ্ট, ভেবেছিলাম গান টান তবু ভালো হবে। এই তোর মুরোদ, ছ্যাঃ ছ্যাঃ অর্থনষ্ট, মনকষ্ট, এসব থামা!

ভূষণ থামায় নশীরামকে।

কোনোরকমে আলোও জ্বালা হয়। এবার বেশ বুঝেছে ভূষণ ওরা মদনের ওই গান—ওই অভিনয় আদৌ সহ্য করতে পারছে না। অভিনয় হতে দেবে না। সাজঘরে মদন রেগে গিয়ে সাজ খুলে ফেলেছে, গর্জাচ্ছে—দেখে নেব সব্বাইকে।

বারবার তার মনে পড়ে মেয়েদের মধ্যে সেই ললিতার মুখখানা। উত্তেজনার বশে আসরে তাড়া খেয়ে কৃষ্ণের বাবরি চুল খসে পড়েছে, গোঁফটাও। হাসির শব্দ ওঠে। মদন ঘামছে আসরে।

ওদিকে কলরব উঠেছে, দেখেছে ললিতাও হেসে গড়িয়ে পড়ে খুশিতে আসরের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের

ওই দুরবস্থা দেখে। তারপরই আলো নিভে যায়। কোনোরকমে বের হয়ে আসে মদন, নাহলে বোধ হয় ক্রুদ্ধ দর্শককুল শ্রীকৃষ্ণকেই আজ ধরাশায়ী করে ফেলত ওই আসরে।

ভূষণ বলে—নাককাটা যাবে গান না হলে। মদন গান গাইতেই হবে।

রমণী বলে—গান করাতে চাও, যেভাবে হোক ধরে আনো হাতে পায়ে ধরে ওই অতুলকে। এ পার্ট তার করা, তাকেই নামিয়ে দাও, নাহলে মুখ রক্ষে হবে না মাষ্টার।

অনেকেই সার দেয়—তাই করো মাষ্টার! নাহলে মুখ দেখাতে পারব না।

মদন শুনছে কথাগুলো। নটবর-রতন-গদাধরও উঠে এসেছে। বাইরে চীৎকার করছে জনতা। রাত জেগে এসেছে ওরা, এতরাতে কোথায় ফিববে। ওদের গান শোনাতেই হবে।

এখন মদনের জেদ—মান-সম্মানের চেয়ে দলের মান-সম্মানই বড় হয়ে উঠেছে, গ্রামের বদনাম।

বিবিঞ্চিবাবু, মাতব্বর নলিনী বায়, সেনকত্তাও এসে পডেন। ঠিক হয়—ধবে আন অতুলকে।

সেনকত্তা বলেন—মধু গিয়ে বল অতুলকে আমি ডেকেছি। এখুনি যেন চলে আসে।

ভূষণ এনাউন্স কবে দাও গান হবে। আধ ঘণ্টাব মধ্যে শুরু করছি নোতুন করে। ততক্ষণ কনসার্ট আর সং দিয়ে আসর মাতিয়ে রাখো।

গ্রামেব এই উৎসবে সব লোকই গেছে, যায়নি শুধু অতুল। তার ওখানে যাবাব কোনো ইচ্ছাই নেই। সেনকত্তা সন্ধ্যার পর বের হচ্ছে। অতুল তখন গরু বাছুর সামলে এসে দাওয়ায় বসেছে তানপুবা নিয়ে।

সেনকত্তা কোথায যাচ্ছে তা জানে অতুল।

সে কিছু শুধোলো না। সেনকত্তা চলে গেল।

এসে স্তব্ধ বাডিটায একা যেন প্রহরীব মতো বসে আছে অতুল। পথ দিয়ে এপাড়া ওপাড়া থেকে কলরব করে যাত্রা শুনতে চলেছে সকলে। ওই আনন্দেব ভোজে তার নিমন্ত্রণ নেই। কে জানে কেমন গান হবে। ওসব কথা ভাবার মতো মানসিক অবস্থা তাব নেই। তাকে তৈরি হতে হবে সদরের বড় আসবের জন্য। সেখানে দু-একবাব গেছল সেনকত্তাব সঙ্গে। মানী লোকদের আসর। সেখানেই গান গাইতে হবে তাকে .. কাকে আসতে দেখে চাইল অতুল।—তুই।

এগিযে আসছে ললিতা। পবনে নীল ডুরে শাড়ি, কপালে কাঁচাপাকার টিপ। আজ সেজেছে ললিতা। মেয়েটাব দেহ ঘিবে একটা আলগা শ্রী আছে। যৌবনের মুখর ছন্দ ওব দেহে। তাই সামান্য সাজলেই ওকে আবও সুন্দরী দেখায়। অতুলেব সেই চোখও আজ যেন নেই।

ললিতা বলে—বসে আছো যে। যাত্রা শুনতে যাবে না? কত লোক যাচ্ছে। অতুল বেদনার্ত চাহনি মেলে চাইল ওব দিকে।

ওকে কেউ যেতেও বলেনি। একদিন ও নাহলে এ গ্রামেব যাত্রা হতো না। কত নাম-ডাক ওর। আজ যাত্রা কবতেও দেযনি তাকে, এমনকি ভূষণ মাষ্টার বলেনি, যাত্রা শুনতে যেতে।

ওই সমাজে অব তার কোন ঠাঁই নেই। অধিকার নেই সেই কথাটা নিষ্ঠুব ভাবেই ওবা জানিয়ে দিযেছে তাকে।

অতুল বলে ওখানে যাবার কোনো নেমতন্নও নাইরে। ওরা চায় না আমি ওখানে যাই!

ললিতা চুপ করে থাকে।

মনে পড়ে সব কথাগুলো। মদনকেও অপমান কবেছিল সেদিন অতুল তার জন্যই, ললিতা বলে,

—তাহলে আমি যাব না। যাত্রা যা হবে তাগে বুঝেছি। অতুল বলে সে কিরে। না—না। তুই না গেলে পরাণ কাকা, কাকীমা কি ভাববে। তুই যা। আমি নাই বা গেলাম।

ললিতাকে বাধা দেয়নি অতুল। ববং সেই-ই জোর করে তাকে যাত্রার আসরে পাঠায়। নিজে একাই

বসে আছে ওই ভগ্নপুরীতে। রাত নামে।

স্তব্ধ রাত্রির হিম বাতাসে ভেসে আসে যাত্রার দলের কনসার্ট-এর সুর। ঢোলের গুরু গুরু শব্দ। ওই সুরটা অতুলের মনে ঝড় তোলে। এর পরই শুরু হবে কেষ্টোর একনম্বর সিন। গীতকণ্ঠে বনপথেব সিন।

এই বই-এর সব সিন, সংলাপ গান তার মুখস্থ।

আজ সেখানে গাইছে অন্যজন। অতুল এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

গান—ওই বাজনা তখনও তার মনে ঝড় তুলছে। সেই ঝড়টাকে চেপে রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

আজ সে ওই আসরের কেউ নয়।

কাঁথার গরমে চোখ বুজে আসে। ঘুমের অতলে সব জ্বালা-ভাবনাকে সে ভুলতে চায়।

মনে হয় সদরের আসরে গান গাইছে সে।

সকালের রাগ-এ আনন্দের ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে। সারা হলে ছড়িয়ে পড়ে সুরটা, তন্ময় হয়ে গাইছে অতুল।

হঠাৎ দরজায় কাদের ধাক্কা—কলরব শুনে উঠে বসল অতুল। তার ঘুম ভেঙে গেছে। —কে? অতুল ডাকছে।

অন্ধকারে হাতড়ে হ্যারিকেন জ্বেলে দরজা খুলতে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে মধু আর ভূষণ মাষ্টার নিজে। অবাক হয় অতুল।

—কি ব্যাপার গো? তোমরা?

মনে হয় অতুলের যাত্রার বাদ্যি তখনও শোনা যায়। ভূষণ বলে,

—শীগ্‌গীর চল্। সেনকত্তা তোকে আসরে ডাকছে অতুল।

—সেনকত্তা ডাকছেন কেন গো? শরীর খারাপ নাকি ওর।

অতুল চমকে উঠে। কে জানে শরীর খারাপ হয়েছে বোধহয়।

ভূষণ বলে— সে সব কিছু নয়। উনি বললেন তোকে ডেকেছে যেতে। কি দরকার আছে বলো।

আসরে তখন ঐক্যতান বাদন চলেছে।

আর পিছনে চলেছে অন্য নাটক। নশীরাম হিসাবী লোক—সে বুঝেছে এত ঘটা সব বরবাদ হয়ে গেছে মদনের জন্য। গান না হলে এবার বরবাদই হবে। তাই নশীরাম গর্জাচ্ছে মদনকে লক্ষ্য করে।

—ছাগল দিয়ে যব মাড়াই হয় না। তুই একটা ছাগল—পাঁঠা! এখন যেভাবে হোক শেষ রক্ষা কর সেনমশায়।

না হলে হাজার হাজার মানুষ পাল কেটে দেবে। তেরপল জ্বালিয়ে দেবে, তছনছ করে দেবে সব। মদন গুম হয়ে আছে।

সেনকত্তা বলে—আপনি শান্ত হন নশীরামবাবু, একটা ব্যবস্থা হবে। আমি ব্যবস্থা করছি।

এমনি সময় ভূষণ মাষ্টার অতুলকে নিয়ে ঢোকে।

অতুল প্রথমে বুঝতে পারেনি এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেছে।

মদন অবশ্য এর মধ্যে বাইরের যাত্রা দলের অধিকারীকে ডেকে শুধিয়েছিল কেষ্ট করার মতো কোনো লোক তার দলে আছে কিনা। যা টাকা লাগে দেবে। কিন্তু তাদের দলেও ওই রোল কেউ করেনি।

এবার অতুলকে নিয়ে আসতে দেখে মদনলাল চোখ মেলে চাইল মাত্র। সর্বাঙ্গ জ্বলছে তার রাগে। কিন্তু বলার কিছু নেই।

নশীরাম বলে অতুলকে —তুই মান রাখ অতুল।

আজ প্রাণের দায়ে নশীরাম স্বীকার করে —রাগের বশে কিছু বলেছি, তা ভুলে যা বাবা। এখন পঞ্চ-গেরামী লোকের সামনে আমার মাথা বাঁচা।

সেনকত্তা বলে—তৈরিই অতুল। এই বেশকারী দাঁড়িয়ে দেখছ কি। অতুল বসে পড়—কেষ্টার পার্ট

করবে, ওকে মেকআপ করো।

অতুল কি বলতে চায়। কি বলবে তা জানে সেনকত্তা। সে বলে,

এখন কোনো কথা নয় অতুল। পার্ট দ্যাখ—পার্ট সড়গড় করে নে। সব তো তোর করা। ওহে ভূষণ—এ্যানাউন্স করো এই সং-এর পরই নোতুন করে শুরু হবে পালা। এবার কেষ্টার পার্ট করছে—অতুল ঘোষ।

ভূষণ খুশি হয়েছে, সে তখন ঘোষণা করছে বিশেষণ সহযোগে। —জনপ্রিয়, স্নেহধন্য অভিনেতা অতুল ঘোষ এবার কেষ্টর ভূমিকায় নামছে।

কলরব —কোলাহল থেমে যায়।

সুর ওঠে। মদন এই ফাঁকে রেগে বের হয়ে গেল। ওর দিকে কেউ চায় না। ওরা তখন অতুলকে নিয়ে ব্যস্ত।

আবার গান শুরু হয়।

দর্শকরা স্তব্ধ—উৎকর্ণ হয়ে শুনছে তারা। সুদামার প্রার্থনা ব্যকুল আহ্বান পূর্ণ করেছেন ভগবান। সুরে সুবে ভরে ওঠে বাতাস। ভগবান যেন যুগে যুগে এমনি করেই ভক্তের ডাকে সাড়া দেন ঃ

—ওরে আপনজন তারে না ফেরাতে পারি—

যে ডাকে আমারে ব্যাকুল চিত্তে যুগ যুগ ধরে ব্যাকুল রোদ—

টিমে যৎ—নিপুণ লয়কারী—সুবেলা গলায় প্রতিটি পর্দা শ্রুতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সুরটা বাজছে। সারা আসর স্তব্ধ হয়ে আছে। মুগ্ধ হয়েছে ললিতা—দু'চোখে তার বিস্ময় কি নীরব প্রশংসা। আজ সেই সাধারণ ছেলেটার মধ্যে কি এক অন্য পরিচয় পেয়েছে সে। ওকে ওরা জোর করে ডেকে আনায় বাধ্য হয়েছে।

হাজারো মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে। আর তেমনি অভিনয় করেছে অতুল।

সারা আসরে নেমেছে স্তব্ধতা। একটু আগেই ওই আসর যে মারমুখী হয়ে উঠেছিল কেউ ভাবতে পারে না।

নশীরামও বসেছিল একপাশে। সে এবার দৃশ্যান্তর হতে বলে—মদনা করবে ওই পার্ট, কামারের কাজ কুমোরে করে, ধবতে না জানলে পুড়ে মরে। ছ্যা-ছ্যা— এতগুলো টাকাই বরবাদ করছিল সে। নাঃ ছোঁড়াটা গায ভালোই।

মদন আসর ছেড়ে বের হয়ে গেছে, ওদিকের বৈঠকখানায় এসে এবার মদন গর্জাচ্ছে—ষড়যন্ত্র, কি গাইছে ওই অত্‌লো? সব শালা বেইমান। দেখে নেবো ব্যাটাদের।

রতন বলে—এখন শান্ত হও গুরু। নটবর, দে গুরুকে একটু দ্রব্য দে। কেন খামোকা মাথা গরম করছ?

মদন গর্জায়—ওই অত্‌লোকে ঠান্ডা করতেই হবে।

হাসে নটবর—এ একটা কথা। ও তো নস্যি গো। এক টানেই সাফ হয়ে যাবে। মদন ভোলেনি ললিতার হাসি।

সে বলে—আর ওই দ্বিতীয়টা, পরাণের মেয়ে ওই ললিতা। ছুঁড়ির কি হাসি দেখলি।

দল বেঁধে হেসে গড়িয়ে পড়ছে আসরে।

মদনের কথায় ওরাও চটে ওঠে। গদাধর এদের মধ্যে সবচেয়ে এলেমদার। বলে সে—একদিন চলো তাহলে তুলে আনি ওটাকে।

নটবর বলে—রোয়াব্‌ পানতুয়া করে দেব না।

গুরুকে কায়দা করে এইভাবে অপমান করবে ওরা।

মদন মদ গিলছে। সহচরবৃন্দ তখন নানাভাবে গুরুর এই অপমানের শোধ নেবার পরিকল্পনা করছে। মদনের সারা মনের অতলে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। এর সোধ সে নেবেই। রাগটা পড়ে অতুল আর

ললিতার উপরই। পরাণ মোড়লের কথাও ভাবছে সে। আসরে তখন নোতুন করে গান জমে উঠেছে। বাইরের যাত্রাদলের অধিকারী গগন গুছাইত হিসেবী লোক। অনেকদিন ধরে দল চালাচ্ছে। গুণী শিল্পীর কদর জানে সে।

অতুলকে দেখেই বুঝেছে সে, জাত শিল্পী এই ছেলেটা।

অতুলের গান শুনে আর অভিনয় দেখেই বুঝেছে ছেলেটার মধ্যে বস্তু আছে। আর সম্পদ ওর চেহারা—গলা। একেবারে নিখুঁত সাধা গলা। বৈঠকি গান গাইতে পারে। তাই তার কণ্ঠস্বর সহজেই সা থেকে তীব্র মধ্যম ছাড়িয়ে পঞ্চমে উঠে যাচ্ছে পুরো মেজাজ নিয়ে। এমন অভিনয়ও দেখেনি সে!

তখন মন দিয়ে দেখছে অতুলের অভিনয়।

একাই সারা আসর ভরিয়ে দিয়েছে সে। আর তার অভিনয়ের জন্যই দলের অন্য সকলের অভিনয়ও একটি পর্দায় বাধা হয়ে গেছে।

গান যখন শেষ হয়েছে তখন ভোরের শুকতারা বর্ষার শেষ আকাশে জ্বলজ্বল করে। কলরব করে আসরের তৃপ্ত লোকজন ঘরে ফিরছে। আবছা চাঁদের আলো মুছে মুছে আসছে বৃষ্টি ধোয়া ঘন সবুজ গাছ-গাছালির বুক থেকে।

ফিরছে অতুল তার আস্তানার দিকে। হঠাৎ কাকে দেখে দাঁড়াল।

—খাসা গেয়েছো তুমি! আজ ওই জানোয়াবটার মুখের মতো জবাব দিয়েছো গো! ললিতা যেন তার জন্য দাঁড়িয়েছিল।

—তুই! অতুল ললিতাকে দেখে চাইল। ব্যাকুলভাবে শুধোয় অতুল,

—তোর ভালো লেগেছে গান?

ললিতার দুচোখে খুশির আভা। বলে সে,

—সারা আসরের হাজার মানুষকে থামিয়ে দিলে? ওর গানের সময় যা কাণ্ড হচ্ছিল, ওই মদনকে বধই করে দিতো গো। একেবারে কীচক বধ!

অতুল বলে—গাইতে যেতাম না। আসরেও যাইনি। ওরা এসে ডাকাডাকি শুরু করল। সেনকত্তা বললেন—তাই নামলুম শুধু। দেখিয়ে দিলাম আমিও গান জানিরে। ওদের চেয়ে ভালো জানি।

ললিতা দেখছে ওকে খুশি ভরা চোখে।

ঘাড় নাড়ে ললিতা। অতুল বলে,

—তুই ছিলি তাই গান এত ভালো হয়েছে রে।

ললিতার ডাগর চোখে, গালে কি সলজ্জ আভা ফুটে ওঠে। কি খুশিতে ভরে ওঠে ললিতার সারা মন।

সকাল হচ্ছে, প্রথম আলো পড়েছে গাছে পাতায়—আকাশে রঙের তুফান জাগে, পাখিদের কলরব ওঠে। একটি নোতুন মন নিয়ে ফিরছে ললিতা বাড়ির দিকে। সারা গ্রামে চত্বরে-দোকানে কালকের গানের আলোচনাই চলছে, অতুল, ওদের মান রেখেছে। বনমালী বলে বেশ হাঁকডাক করে,

—আরশুলা আবার পাখি, মদন আবার গাইয়ে। কাল অতুলো গাঁয়ের মান বাঁচিয়েছে হে। হ্যাঁ গাইল বটে! কি হে পরাণ? ক্যামন শুনলে বলো?

পরাণ দোকানে গরুর জন্য খোল নিতে এসেছিল। সে বলে,

—তা যা বলেছেন কাকা। আহা যেন সুধা ঢেলে দিল কানে। কি গান গাইল অতুল।

কথাটা ওঠে সেনকত্তার বৈঠকখানাতে। ভূষণ মাস্টারও এসেছে। বদ্যিনাথ ডাক্তারও এসে হাজির হয়। ভূষণ বলে,

—মদন তো বোঝেনি, তাই ভাবলাম এ শিক্ষে ওর হওয়া দরকার। টাকা দে সব কিছু হয় না।

বদ্যিনাথ বলে—তা যা বলেছ হে। আজ তো নোতুন পালা। দেব ক্যামন গায় অতুল।

ভূষণ বলে—একটু রিহার্সাল দিতে হবে আজ সেনকত্তা, অতুলকে পাঠিয়ে দেবেন। ও বোধহয় ঘুমুচ্ছে এখন ডেকে কাজ নাই। পরে উঠলে বলে দেবেন।

ভূষণ আজও তার দলের গানকে সুন্দরতর করে তুলতে চায়। লোকটার ধ্যান-জ্ঞান এই্ই। সেনকত্তা বলেন—ঠিক আছে।

খবরগুলো সবই পৌছে যায় মদনের কাছে। মদন আজ বৈঠকখানায় বসে আছে গুম হয়ে। রতন—গদাধর—এসেছে। মদন আজ চুপসে গেছে।

ওদিকের সব আয়োজন ঠিকই চলেছে। গদাধর বলে,

—গাঁয়ের লোকদের কথা সবই শুনেছি, শালারা বোঝে কচু। অত্‌লো আবার গাইয়ে? ছ্যা!

মদন গর্জে ওঠে, কালকের রাতের শোধ আমি নেবই। সব কটাকে দেখে নেবো। ওরা পালা করে এসব করছে। নশীরাম হিসেবী লোক।

কালকের রাতে তার ছেলের কাণ্ড দেখে ঘাব্‌ড়ে গেছল। আর রাগটা মদনের উপর জমে আছে নশীরামের অনেকদিন থেকেই। এমন অপব্যয়—অপচয় আর ওই বখাটে রতনদের সঙ্গে মেশাটা কোনোদিনই পছন্দ করেনি নশীরাম। তবু অতুল কাল ধনপ্রাণ বাঁচিয়েছে নশীরামের।

নশীরাম সকালে লোকজনদের কাজের ফর্দ দিয়ে টাকার হিসাব-নিকাশ করছে। স্ত্রীকে আসতে দেখে চাইল। ওর আস্কারাতেই মদনটা এইসব করেছে। তবু রাগটা চেপে কাজ করছে নশীরাম।

বাসন্তীবালা দেখেছে কাল যেন দলবেঁধে ওরা মদনকে অপমান করেছে।

কাল ওই গোলমাল হতে বেগে উঠেছিল সেও। নিজের চোখে বাসন্তীবালাও দেখেছে ব্যাপারটা।

স্বামীকে আজ সকালে সে বলে—মদনকে কাল মুখপোড়া গান করতে দিলে না। হিংসেয় গান বন্ধ করে দিল বাছার।

তাহলে আজ আবার এসব কেন?

ওমা, কি সুন্দর গাইছিল মদন, আর ওরা কিনা থামিয়ে দিল।

মুখপোড়া হিংসুকের দল। স্ত্রীর কথায় এবার নশীরাম ধমকে ওঠে —থামবে তুমি। সবটাতেই ছেলের কোনো দোষই দেখতে পাওনা।

ওই বিকট আর হাঁড়ি-চাঁছা গলা নিয়ে কেষ্ট মানায়? না গান হয়?

বাসন্তী ফুঁসে ওঠে—ছেলেকে যা তা বলবে? ওমা—

—আলবাৎ বলব! কোথায় সেটা? নশীরাম আজ ক্ষেপে উঠেছে। এমন সময় মদনকে নেমে আসতে দেখে চাইল। বলে ওঠে নশীরাম,

—বুঝলি, মহাজন জোতদারের ছেলে—এবার ওসব ঘোড়ারোগ ছেড়ে দিয়ে আমার কাজে নাম। তা নয় গেলেন গান করতে? কাল দিত ইঁট মেরে মাথা ফাটিয়ে বেশ হত। ধনে-প্রাণে মারত ওরা।

দেখলি গান কাকে বলে—ওই গরু রাখালটা এসে মাৎ করে দিল। তোর মুখে ঝামা ঘসে দিল। তাই বলছি—বাপের ব্যাটা যদি হোস আর গানের নাম করবি না। উঃ কত লোকসান হয়ে গেল বল দিকি।

মদন চুপ করে থাকে। বরং বাসন্তী বলে ওঠে;

—ছেলের সখ সাধ নেই। সাতটা নয়—পাঁচটা নয়, একটা মাত্র ছেলে, তাকেও মানিয়ে নিতে পারো না? ওই তোমার দোষ।

নশীরাম গর্জন করে। —ছেলেকে হুঁস বুদ্ধি একটু আনতে বলো এবার।

মদন রাগে, অপমানে জ্বলছে, তবু কিছু করার নেই। মনে মনে গজরাতে থাকে মাত্র চুপ করে।

বিশু পাগলা এ গ্রামের স্বাধীন নরপতি। চালচুলো একটু আছে সেটা হাউলার একটা চালায়। যত্রতত্র ঘোরে—একমাথা চুলদাড়ি। ময়লা কাপড়—কেউ দিলে খায়, না দিলে অভিযোগ নেই। একটা বাখারির তৈরি তলোয়ার হাতে নিযে মাথায় একটা পাতার মুকুট পরে বীরদর্পে সে চলাফেরা করে এ গ্রামে সম্রাটের মতোই।

প্রতিদিন সকালে শ্রীমান বিশু বাংলায় শেষ স্বাধীন নরপতির মতো মেজাজ নিয়ে একবার গ্রাম টহল দিয়ে আসে। গুপীনাথ-এর চায়ের দোকানের মাচায় এসে বসে ফর্দ করে—চা আর বিস্কুট লাগাও গুপী। জলদি—

লেড়ো বিস্কুট আর চায়েই খুশি। বলে বিশ্বনাথ বেশ তারিয়ে তারিয়ে,

—এ আমার নজরানা বুঝলি। রোজ সকাল উঠে একবার গ্রামটা দেখে আসতে হয় সব ঠিক আছে কিনা, নাহলে ঘনঘন নোটিশ আসছে বাবা বিশ্বনাথ নাকি মন্দির সমেত কৈলাসে চলে যাবে। ব্যাটাকে শাসনে রাখতে হয়। সেই বিশু পাগল আজ সকাল থেকে যত্রতত্র কালকের মদনের গান গাইছে। মদনের মতো হেঁড়ে গলায়—আর সেই কায়দায় সে গেয়ে চলে।

লোকজন ছুটে যায় চারিদিকে। হাসছে সবাই। বিশু পাগলা বলে মদনা শ্রীকেষ্ট হলে আমি শ্লা কংস হে। এমন ভাগ্নেকে খতম করে দেব।

ললিতা আর কজন দল বেঁধে জল আনতে যাচ্ছে কলে। তারাও জমেছে। বিশু পাগলার সেই গান শুনছে আর হাসছে, এমন সময় সাইকেলের ঘন্টি শুনে চাইল। পথের ভিড়ে মদন সাইকেলে যাচ্চিল, সে আটকে গেছে। সামনে বিশু পাগলা তখন তাকেই মুখ বিকৃত করে অঙ্গী-ভঙ্গী করে নাচছে। মদনের মাথায় রক্ত উঠে যায় দৃশ্যটা দেখে।

সাইকেল থেকে নেমে গিয়ে পাগলা বিশুকেই একটা ঘুঁসি মারতে দুর্বল লোকটা ছিটকে পড়ে। নাক দিয়ে ওর সামান্য রক্তটুকুই ঝরছে।

মদন গজরায়—বাঁদরামি করলে খুন করে দেবো এবার।

জনতার দিকে চেয়ে থাকে মদন, কেউ প্রতিবাদ করলে সেও ছাড়বে না তাকে। মদন যেন ক্ষেপে উঠেছে। হঠাৎ ললিতার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—অমনি করে মারবে লোকটাকে? রক্তপাত করবে?

মদন অবাক হয় ওর সাহসে। মেয়েটা অতুলের প্রশ্রয় পেয়ে বেড়ে উঠেছে। আজ মদন চটে ওঠে।

সেইদিন বৈকালেও দেখেছিল তাকে সেনবাড়ির ওখানে। দেখেছিল ওর চোখে ভয়ের ছায়া। আজ দেখছে ঘৃণা—আর প্রতিবাদ। মেয়েটা তাকেও আজ ভয় করে না। ঘৃণা করে।

চাপা রাগে মদন যেন ফেটে পড়ে; কোনোরকমে রাগ সামলে বলে মদন,—অন্যায় করলে কাউকেই আমি ছাড়ব না। পিটিয়ে সিধে করে দেব।

সাইকেলে উঠে এবার বীরদর্পে চলে গেল মদন। ওরা ধরাধরি করে তুলছে বিশুকে। বিশু ক্ষীণ আর্তনাদ করে ওঠে—খেংড়ে কাঁদছে অসহায় লোকটা। ললিতার আজ দু'চোখে ফুটে ওঠে ঘৃণা। সারা মন দিয়ে ললিতা ওদের ঘৃণা করে মদনের এই দুঃসহ জ্বালাটাকে বাড়িয়ে তুলছে অতুল। আজ রাত্রির আসরে লোক ধরে না। আরও দূর-দূরান্তরের গ্রামের মানুষ এসেছে অতুলের গান শুনতে। কালকের খ্যাতি আজ তাকে নায়ক করে তুলেছে এই এলাকায়।

অতুল আজও অপূর্ব গাইছে। কাজল করছে অতুল, আর লতা সেজেছে ওপাড়ার শরৎ, ভূষণ মাষ্টার খুশি হয়েছে। একেবার জমাটি পালা হচ্ছে। গগন গুছাইত যাত্রার গান হবে কাল। এবার গগনও ভাবনায় পড়েছে, বেশ বুঝেছে কোনো গীতবহুল পালা তার এখানে গাওয়া যাবে না, কারণ এই অতুলের মতো ভালো গাইয়ে তার দলে নেই। তাকে অন্য ধরনের পালাই গাইতে হবে এখানে মান বজায় রাখতে গেলে।

মদন একবার দূর থেকে দাঁড়িয়ে শুনছে গানটা, নটবর-গদাধর রতনরাও আসেনি আসরে। ওরা তাদের দলপতিকে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় তাজা মদের আসর বসিয়েছে। আর মাংস এনেছে নিবু সর্দার। মুরগীর মাংস এ বাড়িতে ঢোকে না। উৎসব চলছে কিন্তু তাতে বাধেনি, নিবু সর্দার বলে—আমি আনছি ছোটবাবু।

নিবু সর্দারও ইদানীং ছোটবাবুর ভক্ত হয়েছে মদের লোভে আর পুলিশের ভয়ে। নিবুর নামে থানায় অনেক রিপোর্ট আছে, চুরি ডাকাতি তো করেই, ফৌজদারীতেও তার জুড়ি নেই। তাই নশীরামের তাকে দরকার হয়, কিন্তু নশীরাম সাবধানী লোক। ওকে ডাকে গোপনে—কাজ করায় গোপনে। আব মদনের কাছে আসে নিবু নিজের তাগিদে বেশ সহজভাবেই।

মদন বলে সামনের ঝুলনে এসব করছি না। যাত্রা-ফাত্রা তুলে দেব।

নটবর বলে—তোমাকে আগেই বলেছিলাম গুরু, বাঈনাচ করাও।

মদন বলে—তাই করব এবার। মদন বুঝেছে তার পয়সাতে যাত্রাগান হয়, নাম কুড়োয় অনেক লোক। এটা সে হতে দেবে না। অতুলের সুবিধে হয়ে গেছে। মদন ভাবছে কি করে অতুলকে জব্দ করা যায়।

ললিতার কথা মনে পড়ে। দুজনে বেশ জমেছে, মদন সেখানে কোনো পাত্তাই পায়নি। ললিতা তাকে যেন ঘৃণা করে। মদন বলে—পয়সা খরচা করব আমি নাম কিনবে অন্যজন, পিরীত করার পথ করে দেব ওই ব্যাটা অতুলের?

নটবর বলে—হুকুম দাও গুরু, শালার পিরীত ছুটিয়ে দেব।

মদন অন্য কথা ভাবছে। এবার সে শোধ এর নেবেই। অন্ধকারে যেন একটা সরীসৃপ তার বিষাক্ত ফণা তুলছে চরম আঘাত দেবার জন্য। এদের খ্যাতির প্রাসাদে হানা দিয়েছে ওই নামগোত্রহীন ছেলেটা। ওকে ছেড়ে দেবে না মদন।

....অতুল আজও গানেব পর আবছা রাত্রির অন্ধকাবে কাকে খুঁজছে। পথে লোকের ভীড়। তাদের মুখে অতুলের গানের কথা, অতুলের ওই প্রশংসা যেন ভালে লাগে না। তার কাছে একটি আপনজনের খ্যাতিব দামই অনেক বেশি।

আসবে দেখেছে অতুল ললিতাকে দেখেছে তার গানেব সময় ওর দুচোখে কি লহর খেলে যায়। ওর নীরব চাহনি উৎসাহিত করেছে অতুলকে। প্রাণ ঢেলে গেয়েছে সে।

সেন বাড়ির নির্জন পথে ললিতাকে দেখে চাইল অতুল—কেমন লাগল রে গান?

ললিতা এগিয়ে আসে। বলে সে—পয়সা থাকলে তুমাকে আজ আমিও একটা মেডেল দিতাম গো। বাহাবের গান গেয়েছ গো।

অতুল আজ কি একটি জয়ের আনন্দে কাছে টেনে নেয় ললিতাকে। ওর নরম উষ্ণ দেহের স্পর্শ সাবা মনে কি সাড়া জাগায়? অতুল দেখছে ওকে। আজ বদ্যিনাথ ডাক্তার তাকে একটা মেডেল দিয়েছে। কি ভেবে অতুল লাল ফিতের বাঁধা সেই চকচকে মেডেলটা ললিতার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলে,

—মেডেল যেটা পেয়েছিলাম তাতে তোরও ভাগ আছেরে, তাই তোকেই এটা দিলাম।

চমকে ওঠে ললিতা—কি বলছ? মেডেল পাবার ভাগ্যি কি আমার হবে গো? এ তোমার গো।

হাসে অতুল—কেন হবে না? তুই খাসা গাস। আর আজ তোকে দেখে সুর আমার মধুর হয়ে উঠল রে। তাই এ মেডেলে তোরও ভাগ আছে রে।

কাছে টেনে নেয় ললিতাকে।

ভোরের শুকতারা জেগেছে, আঁধারে ফুটে উঠেছে আলোর আভাস। কলরব করে ঘুম ভাঙা পাখির দল। ললিতার সারা মনে কি আবেশ জাগে। বলে সে—যাই গো।

হঠাৎ সামনে নটবরকে দেখে চাইল। ওকে চেনে ললিতা, নটবর দেখেছে ললিতার গলায় সেই মেডেলটা। বলে ওঠে নটবর বেশ ভরাট গলায়।

—তুইও কি খ্যামটা গাইতে গেছিলি নাকি ললিতে, যে মেডেল পেয়েছিস। বাঃ।

তাহলে এক আসর নেচে দে মদনবাবুর ওখানে। ইনাম পাবি।

ললিতা ফুঁসে ওঠে—মদনের পা চাটছিস তোরা, তোদের মদনবাবুর মুখে আমি লাথি মারি। বুঝলি।

ললিতা চলে গেল শুনিয়ে।

নটবর চমকে ওঠে। তাদের পালন কর্তার নামে সাত সকালে এই সব কথা শুনবে তা ভাবেনি। রাগটা চেপেই চলেছে সে বাড়ির দিকে। কথাটা যথাস্থানেই পেশ করবে সে যথাসময়ে।

ঘুমিয়ে পড়েছে অতুল।

দুচোখে ওর ঘুমের আবেশ ছাপিয়ে কার মিষ্টি হাসির শব্দ ওঠে। কোথায় যেন চলেছে দুজন, সে আর ললিতা—গ্রাম ছাড়িয়ে কোন মেলার পথে, শীতের ঝরা পাতায় ঢাকা পথ, ওদিকে ধান ক্ষেতের সোনালী সীমান্ত, দুজনে চলেছে সেই সোনাঝরা পথে।

—হাঁটছে ললিতা—অতুল যেন তাকে ধরতে পারে না। এগিয়ে চলেছে চঞ্চলা মেয়েটি, সামনে নদীর বালুচরের বুকে রূপালী জলের রেখা।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল।

সেনবাড়ির সরকার ডাকছে তাকে—অতুল! এ্যাই!

চোখ কচলে ঘুমের চটকা ভাঙে অতুলের। মনে হয় কি যেন স্বপ্ন দেখছিল সে। দিনের আলো পড়েছে জানালা দিয়ে।

সরদার বলে—বৈঠকখানায় যা। কত্তা ডাকছেন তোকে।

গগন গুছাইত নিজেই এসেছে খুঁজে খুঁজে এইখানে। বেশ গল্পবাজ লোক গগন, এরমধ্যে আসর জমিয়ে বসেছে। অতুলকে দেখে ওর দিকে চাইল।

বলে সে সেনকত্তাকে,

—কথাটা তাহলে ওকেই বলি কত্তামশায়।

অতুল শুধোয়—কি কথা?

অতুল অবাক হয়। গগন গুছাইতকে দেখেই চিনেছে অতুল। যাত্রার দলের অধিকারী।

দুদিন ধরে ওকে দেখেছে অতুল, আসরে বসে ওর গান শুনতে। আজ ওকে এখানে এসে কি কথা পাভার ব্যাপার জানাতে সে অবাক হয়।

সেনকত্তা বলে - ঠিক আছে বলেন আপনিই। ওর যদি মন চায় রাজী হবে।

গগন গুছাইত বেশ গুছিয়ে বলে—তোমার গান শোনলাম। সুন্দর দৃশ্য। ভালো অভিনয় করতে পারো, এখানে থেকে কি হবে? তার চেয়ে আমার দলে চলে এসো। খোরাকী পাবে একবেলা আর রাতে জলপানি, মাইনে কিছু দেব। প্রথম সনে একটু কমই পাবে। ধরো মাসে দুশো টাকা। পরে উন্নতি হবে।

অতুলের মনে হয় এই গ্রাম আর ললিতাকে ছেড়ে তাকে হারিয়ে যেতে হবে ওই পথে পথে যাযাবরের মতো। তার সাধনারও অনেক বাকী, এখন শিখতে হবে তাকে।

সেনকত্তা দেখছেন অতুলকে। টাকা—ওই সুযোগে পেয়ে হয়তো ছেলেটা লুফে নেবে, এখানে তো কিছুই পায় না। চলে যাবে এখান থেকে সব ফেলে।

সেনকত্তা তবু ওই ছাত্রটিকে নিয়ে নিজের জীবনের নিঃসঙ্গতাকে ভুলে আছেন, সেও চলে যাবে। এ বাড়ির সব সুর থেমে যাবে।

চুপ করে কি ভাবছে অতুল। সেনকত্তা ওর এই ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে চান না। যেতে চায় যাক ও। তাঁর কষ্ট হবে, কিন্তু করার কিছু নেই। ও নিজের পথেই যাক। কিন্তু অতুলের কথায় অবাক হন সেনকত্তা।

অতুল বলে ওঠে, আপনার কথাটা মনে থাকবে অধিকারী মশাই, কিন্তু এখন যেতে পারব না।

সেনকত্তাই শুধোন—কেন রে? যেতে পারবি না কেন?

অতুল বলে এখনও গান বিক্রি করার মতো পুঁজি, সাধনা কিছুই নাই গো। আপনি তো জানেন। তাই যাব না এখন। আরও কিছুদিন ঠাঁই দ্যান কত্তাবাবু।

গগন গুছাইত হতাশই হয়। তবু সে বলার চেষ্টা করে।

—ওখানে শিখবি বাবা। শিক্ষাব সময পাবি।

হাসে অতুল, বলে সে- এখানে তাব চেযে বেশি শিখব, তাই এখন ক্ষমা কবতে হবে। এ শিক্ষা ওখানে হবে না।

গগন গুছাইত অনেক আশা করেই এসেছিল এখানে। তার দলে এমনি একজন এ্যাকটব গাইযেকে পেলে নোতুন কিছু পালা তৈবি কবে, সে আসাম—উত্তববঙ্গে এবাব পাল্লা দিয়ে গাইতে পারবে কলকাতাব দলেব সঙ্গে।

আব তাব দলেব দু-একজন টপ আর্টিষ্ট—একটু গডবড কবছে। অতুলকে পেলে তারাও ঠান্ডা থাকত।

তাই সাত-পাঁচ ভেবে গগনবাবু অতুলেব জন্য দবটা একটু বেশিই হেঁকেছিল। ভেবেছিল ছেলেটাব চাল চুলো নেই। টাকাব লোভে ঠিক দলে এসে যাবে।

কিন্তু এককথায এই টাকা—প্রলোভন সব কিছু ছেড়ে দিতে পাববে অতুল এটা গগন ভাবেনি। সেনকর্তাও অবাক হযেছে।

অতুলেব কথায মনে মনে খুশি হযেছে সেনকর্তা। ছেলেটা বেইমান নয, তাব আবও বেশি কিছু শেখাব সাধনা কবাব আগ্রহ মনে মনে খুশি হয়েছে সেনকর্তা। তবু বলে সেনকর্তা—ভেবে দ্যাখ অতুল কথাটা।

গগন গুছাইত তখনও আশা ছাডেনি। বলে সে,

—দ্যাখ অতুল। দলে গেলে ভালো হবে।

অতুল তাব মনস্থিব কবেই ফেলেছে। বলে সে

—ভেবে দেখেছি গগনবাবু, এখনও দলে যাবাব মতো যোগ্যতা আমাব হযনি যদি কোনোদিন যাত্রাব দলে যাই—আপনাব দলেই যাব কথা দিলাম

গগন একটু হতাশ হযে বলে—তাহলে চলি কর্তাবাবু। চলি অতুল।

কথাটা যেন মনে থাকে বাবা গুণীব কদব আমি দিতে জানি। তাই নিজেই এসে কথাটা পেড়েছিলাম। গান শুনতে এসো কর্তা। দেখা হবে।

চলে গেছে গগন গুছাইত। আজ ওদের দলেব গান, তাই আমন্ত্রণ জানিযে গেল সে। বৈকাল নামছে।

শীত শেষেব ম্লান আলোয নির্জন বাড়িটাব বুকে কি বিষণ্ণতা জমে ওঠে। দুজনে বসে আছে। অতুল আব সেনকর্তা। সেনকর্তা কি ভাবছে

অতুল তানপুবায সুব তুলছে আনমনে। রিনি রিনি সুবটা স্তব্ধতাব বুকে ঘুবে ফেবে। সেনকর্তা দেখছে ছেলেটাকে। কি মাযায এই বন্দীপুবীতে যেন আটকে আছে অতুল তাবই মতো। কোনো ভবিষ্যৎ নেই এখানে।

সেনকর্তা বলে—এখানে পডে কি হবে অতুল। ওদেব দলে গেলে ভালো কবতিস, লাভই হত বে।

অতুল বলে—লাভ লোকসানেব হিসেবটা নশীবাম দত্ত ভালো বোঝেন গো। ওটা আমি ঠিক বুঝি না। ভালো লাগল না গেলাম না

ওই পেশাদাবী যাত্রাব দল গান গাইতে মন চায না কর্তামশায়।

অতুল ভাবছে আব একজনেব কথা। এই মাটিব সঙ্গে, ললিতাব সঙ্গে—সে যেন কোনো অদৃশ্য বাঁধনে জডিযে পড়েছে। ছাযাসবুজ জগৎ থেকে যেতে সে চায না। ভালোবেসে ফেলেছ এদেব সবাইকে। কথাটা বোঝাতে পাবে না সে সেনকর্তাকে।

গুনগুন সুব তোলে সে আশাবরীব সুব।

তন্ময হযে ওই সুবেব বাজ্যে যেন হাবিয়ে গেছে অতুল। শান্ত সমাহিত একটি জগৎ—এখানে লোভ নেই, হানাহানি নেই। সুন্দব অনুভূতিগুলো মানুষেব নীচতাব ঊর্ধ্বে। সেই জগতে হারিয়ে যেতে চায় সে।

উৎসব শেষ হযে গেছে। তিনদিন ধবে উৎসবেব পব মন্দিবেব আশপাশেব সেই আলো নিভে

গেছে। লোক সমাগমও নেই।

দোকানিরা চলে গেছে। ফাঁকা হয়ে গেছে মাঠটা।

এখন সেখানে নেমেছে স্তব্ধতা। গ্রামের মানুষও যে যার কাজে ডুবে গেছে আবার। আউস ধান পাকার আগেই পাট-এর ব্যাপার শেষ করতে হবে। ডোবায়, জলার ধারে পাট কাচছে, বাঁশের আলনায় শুকুতে দিচ্ছে, জমা হচ্ছে পাটকাঠির রাশ। বাতাসে পাট পচার গন্ধ ওঠে।

ওদিকে মাঠেও কাজ চলছে পুরোদমে।

মাঠের কাজ শেষ করেই সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে পরাণ।

সেদিন পরাণই কথাটা বলছিল তার স্ত্রীকে। সন্ধ্যার পর প্রমীলারা পড়ছে, ললিতা রুটি করেছ। পরাণ হুঁকো টানতে টানতে বলে স্ত্রীকে,

—বড় যাত্রার দল দুশো টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে ঝুলোঝুলি করছে অতুলকে, বুঝলে ললিতার মা—ভাবছি বিয়ে থা দিয়েই দিই ওর সঙ্গে। একটা মেয়ের তবু গতি হবে।

ছেলেটাও ভালো। তুমি বাবু ভেবে দ্যাখো—তবু খুব কমসমেই হবে সেনকত্তারে ধরলে। তারপর এই দে গাঁয়ের ছেলেটার সাথে প্রমীলার বিয়ের কথা পাকা করি। তবু দুটো দায়তো পার হবো। ওরা দেখে গেছে এখানে এসে। ওদের পছন্দ হয়েছে পমীকে।

ললিতা কথাটা শুনছে। সারা মনে কি শিহরণ জাগে।

অতুলকে কেন্দ্র করে তার স্বপ্নটা সত্যি হোক। বেশি কিছু চাওয়ার তার নেই। একটি সত্যিকার ভালো মানুষকে ভালোবেসে ললিতা ধন্য হতে চায়। ঘর বাঁধতে চায়। অতুলও কথাটা শুনেছে।

ইদানীং অতুল গ্রামের মধ্যে দেখেছে অনেকেই তাকে ডেকে কথা বলে। নশীরাম দত্ত স্বয়ং সেদিন বলে,

—সন্ধ্যার পর মন্দিরে এসে এক-আধটু কীর্তন ভজন গাইবি অতুল।

আহা সেদিন যা গাইলি খুব ভালো লেগেছিল রে। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস্ অতুল একটু অবাক হয়। সেই রাত্রির গানের পর দেখেছে অতুল গ্রামের মধ্যে তার মান একটু বেড়েছে। কিন্তু স্বয়ং নশীরামবাবু এভাবে কথা বলবে তার সঙ্গে এটা ভাবেনি। ওর গদিতে মালপত্র নিতে এসেছিল সেনকত্তার জন্য।

নশীরাম বাবুর কথায় দোকানের অন্যান্য খদ্দেররাও একটু অবাক হয়। সুদখোর—ঘোর বিষয়ী—নশীরামের দত্তকেও ওর সুর বেশ বদলে দিয়েছে।

লোকটার মতিগতি বদলাচ্ছে। অতুল বলে,—তা আসব।

আসেও দু-একদিন। অতুল সেদিন ফিরছে বাড়ির দিকে, হঠাৎ ললিতাকে দেখে দাঁড়াল। ললিতা বলে—শুনছি দত্ত মশায়ের বাড়িতেও যাচ্ছ আজকাল?—কেন রে! অবাক হয় অতুল।

ললিতা বলে—এত কাজের লোক যে আর আমাদের ওখানেও যাও না। মা কত নাম করে তোমার।

তারা জ্বলছে নির্জন আকাশে। নদীর দিকের চরে কাশফুল ফুটেছে, চাঁদের আলোয় ঢেউ জেগে কাশবনে। বাঁশবনে বাতাসের সুর ওঠে।

বিচিত্র একটি জগৎ। স্বপ্ন-আনা পরিবেশ।

দুজনে সে জগতে হারিয়ে গেছে। ললিতা বলে অতুলকে,

—এবার বাবা মা রাজী হয়েছে।

—কি ব্যাপার রে? শুধোয় অতুল।

বলে ওঠে ললিতা—জানি না যাও। খেয়াল কিছু আছে তোমার? আমার কথা ভাবার সময় কোথায়? আমিই যেচে আসি। আর আসব না। অভিমানে ওর দু'চোখ ছলছল হয়ে ওঠে। কাছে টেনে নেয় তাকে অতুল।

—পাগলি কোথাকার!

একটি নিঃশেষ মুহূর্ত। দুটি মন যেন একটি সুরে বাঁধা পড়েছে।

দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে মদন দত্ত। সে যাচ্ছিল এই পথে।

ললিতাকে একলা দেখে এই নির্জন জায়গাতে মুখোমুখি হবার জনোই এসেছিল মদন, কিন্তু জানত না তার এখানে কোনো স্থান নেই। ললিতার মন জুড়ে আছে আর একজন। তাই বারবার ব্যর্থ হয়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে মদন। রাতের আবছা আলো আঁধারিতে একটা বিষধর সাপ যেন উদ্যত ফণা তুলে পিছিয়ে এল! সবে এল মদন দত্ত।

অতুল জীবনে কিছুই পায়নি। প্রীতি ভালোবাসা সম্মান স্বীকৃতি কিছুই। তাই এই কদিনের পাওয়ার স্বপ্নে এ জগৎ সম্বন্ধে তার ধারণাটা বদলে আসছে। একটা আশার স্বপ্ন দেখে সেও।

ললিতা আসবে তার জীবনে। নশীরাম এর মতো লোক তাকে ভালোবাসে। সেনকত্তা বলেছেন কিছু জমি জিরেতও দেবেন। এই গ্রামেই থাকবে সে, ঘর বাঁধবে।

মদন ওপাশের একটা ঝুপসি মাদার গাছের ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখছে ললিতা আর অতুলকে। ওদের দুজনের স্বপ্নের জগতে তার ঠাঁই নেই। মদন দত্তের সারা দেহেমনে একটা দুর্বল জ্বালা।

সেই যাত্রাগানের রাত্রির অপমানটা ভোলেনি মদন। সব রাগটা পড়েছিল অতুলের উপরই। ক্রমশ দেখছে মদন গ্রামের অনেকেই তাকে দেখে আড়ালে হাসাহাসি করে।

কিন্তু পাগলা তো প্রকাশেই ওর মতো বিকট গলার গান গায় আর একনা করে ভেংচায়। অনেকেই উপভোগ করে সেটা। চাল চুলোহীন অতুলই এখন সব স্নেহ আর প্রশংসা কুড়িয়েছে এখানের মানুষের।

আর মদন দত্তের ললিতার উপর নজর দেবারও উপায় নেই। সব খ্যাতি পাবার পথ আটকে রেখেছে ওই অতুল।

আরও দেখেছে মদন অতুল আজকাল তাদের বাড়িতেও তার বাবার কাছে বেশ নামী লোক হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যায় কেত্তন গাইতে যায়।

আজই দেখছে মদন নশীরামবাবুর শরীরটা ভালো নেই। মন্দিরে বেশীক্ষণ বসতে পারেনি। উপরের ঘরে চলে গেছে, আর অতুলকেও সেখানে নিয়ে গেছল। সেখানে বসেই অতুল নশীরামবাবুকে ভজন গান শুনিয়েছে।

হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় আসে মদনের।

আজ মদন এক চালেই বাজিমাৎ করবে। অতুলের এতদিনের মান সম্মান—তার সুনাম সব কিছুই আজ শেষ করবে মদন।

এই সুযোগ সে ছাড়বে না।

অন্ধকারে কি জ্বালা আর হিংসায় মদনের দুচোখ জলে ওঠে। মদন সরে গেল। মনে মনে আজ মদন নিশ্চিন্ত হয়। অতুলকে একটা জব্বর আঘাত দিতে পারবে সে। সকলের মনে অতুল ধারণাটা বদলে দেবে।

আঁধারে হারিয়ে গেল মদন।

ললিতা আর অতুল তখনও দাঁড়িয়ে আছে রাতের তারা জ্বালা অন্ধকারে। দুজনে তাদের নিজেদের স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে। ওরা জানতেও পারেনি যে পিছনে একটা চক্রান্ত ঘনীভূত হচ্ছে। অন্ধকারে তাদের উপর বিষ ছোবল দেবার জন্য তৈরি হয়েছে একটা হিংস্র জানোয়ার।

অতুল আর ললিতা ফিরছে বাড়ির দিকে। এ পথ তাদের চেনা।

রাতের অন্ধকারে গ্রাম নিশুতি হয়ে আসে। হাল্কা কুয়াশা ফিকে আভাস নেমেছে গাছের পাতায়। তারাগুলো জ্বলছে।

অতুলও ভাবছে কথাটা। গগন গুছাইত যাবার সময়ও তাকে বলে গেছে তোমার জন্য দরজা খোলা

আছে অতুল। ভেবে দেখো, দু-একমাস পরও যদি দলে আসতে চাও আমার গদির ঠিকানা দে গেলাম, একটা পোস্টকার্ড লিখে চলে এসো। অতুল অবশ্য তাকে কোনো পাকা কথা দেয়নি।

এর মধ্যে কথাটা ভাবছে। ললিতা আজ তার মনের অতলে সেই আশ্বাস এনেছে। অতুল নোতুন করে কথাটা ভাবছে।

ললিতাকে এগিয়ে দিয়ে ফিরছে অতুল। ওর মনে আজ কি স্বপ্নের রেশ জাগে।

ফিরছে অতুল। মনে মনে ওর আজ নোতুন একটি সাড়া জাগে। সেও ঘর বাঁধবে, একজনকে নিয়ে সুখী হবে। ললিতার ডাগর, দু'চোখের চাহনি ওকে বিমুগ্ধ করেছে। কি সুর আনে সারা মনে।

অন্ধকারে ওর ঘরের এদিকে এসে থামল অতুল।

সন্ধ্যার পর থেকেই এই দিকের ঘরগুলো নিঝুম হয়ে যায়। মনে হয় অন্ধকারে কে যেনে বারান্দা থেকে বের হয়ে ওদিকে মিলিয়ে গেল।

—কে! ডাকছে অতুল।

কিন্তু কোনো সাড়া পায় না। মনে হয় কোনো সিঁদকে চোরই হবে। কিন্তু তার চুরি করাব কোনো সম্পত্তিও নেই। দরজাটা খোলা।

হয়তো বাতাসেই খুলে গেছে। অতুল ঘরে ঢুকে দেশলাই জ্বেলে হ্যারিকেনটা ধরায়। কোনো কিছু ওলট-পালট-এর চিহ্নও নেই ঘরে। তার সম্পত্তি বলে দড়ির আলনায় দোদুল্যমান কয়েকটা ধুতি-পাঞ্জাবি। এসব ঠিকই আছে।

অতুল নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ে।

ক'দিন ধরে অতুলের মনটা বেশ ভালোই ছিল। গ্রামে তাকে এখন দু-একজন বড় শিল্পী বলে মানে-টানে। পরাণ ঘোষও খুশি হয়েছে।

বাড়ি এসে ললিতার মা রাজলক্ষ্মীকে বলে,

—ক্যামন গাইল বলো অতুল—একেবারে আসর মাতিয়ে দিল। আন্নাকালী, ললিতারাও গিয়েছে। অতুল সত্যিই মাৎ করেছে আসর। আন্নাকালী বলে,

—হ্যাঁ বাবা। এই দত্ত মশায়ের ছেলে মদনাকে মনে হয়েছিল কেষ্ট নয় দাঁড়কাক। অতুলদা আসতে আসর যেন আলো হয়ে গেল।

ধমকে ওঠে ললিতার মা—থাম তো। যা রাত হয়েছে শোগে যা। রাজলক্ষ্মী খুশি হয়নি।

চেয়ে দেখেছে ললিতার মুখচোখে খুশির আভা, তাই আরও চটে উঠেছে রাজলক্ষ্মী।

কিন্তু আবার ব্যাপারটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে নশীরাম দত্ত মহাশয়ের মতো হিসেবী লোক, নিজেই। গ্রামের মধ্যে এখন নশীরাম দত্তই একনম্বর নাগরিক। মা লক্ষ্মী তাকে দিয়েছে প্রচুর। তাই তার কাজগুলোর উপর গ্রামের অনেক মানুষই ভালো-মন্দ বিচার করে। অনেকে তার মর্জির উপরই বাস করছে এই গ্রাম—পাশের গ্রামে।

এ হেন নশীরাম দত্তমশায় নিজে ওই অতুলের গানে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের ঠাকুরমন্দিরে রোজ সন্ধ্যায় কীর্তন শোনাবার ব্যবস্থা করেছে। অনেক লোকজন আসে। হরিপদ ভট্টাচার্য-র কথকথা হয়, কোনোদিন রাসু চকোত্তী রামায়ণ পাঠ করে। তারপর অতুলের ভজন—পদাবলী কীর্তন হয়।

নশীরাম বাবু এসে তিলক ছাপ কেটে ভক্তিভরে বসে চোখ বুজে নাম গান শোনে। পরাণ বলে স্ত্রীকে,

—দেখে এসো মন্দিরে, দত্তমশায় অতুলকে ক্যামন স্নেহ করেন। শুনছি এবার ওর একটা গতিও করবেন দত্তমশায়।

ললিতা ঘরের ভিতর থেকে উৎকীর্ণ হয়ে বাবার কথাগুলো শোনে। অতুলের এই সৌভাগ্যে খুশি হয় ললিতা। কি স্বপ্ন দেখে।

বাইরে পরাণ বলে চলেছে তার স্ত্রীকে,

—দেখবে দত্তমশায় অতুলকে তার গদিতে খাতা সরকারীর পদ দিয়ে রেখে দেবে। সেদিন শোনলাম, অতুল নাকি সেনকত্তাদেব ওখানে আর থাকবে না। দত্তমশায় ওকে নিজের ভিটেতে ঘর তুলে নিতে বলেছেন।

অতুল এই গ্রামের ছেলে, এককালে ওদের বাড়িঘর, জমিজিরেত সবই ছিল। বাবা মারা যাবার পর অতুলের মাও মারা গেল। বেচারা অতুল তখন ছোটো। ভেসে ভেসে বেড়ানো-গোছের অবস্থা। ওই সেনকত্তা তখন ওকে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন।

আর অতুলের বাড়িঘর ধ্বসে ভিটেপুরী হয়ে যায়। জমি জায়গা ওই দত্তমশায় গ্রাস করেছিল দেনার দায়ে। সেই দত্তমশায় আবার খুশি হয়ে অতুলকে নাকি বাড়ি তৈরি করিয়ে দেবে।

রাজলক্ষ্মী এবার একটু আগ্রহ দেখায়।

শুধোয় সে--তাই নাকি গো?

অতুল সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাবার কারণ আছে। ললিতার বিয়ে থা দিতে পারছে না যদি ছেলেটার ঘর জমি হয়, তাহলে পায়ের তলে মাটি পায় ছেলেটা, ভরসা করে তাকে এবার মেয়ের বিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ললিতা ওঘরে জানালার বাইরে চেয়ে আছে। খামার বাড়ির উপর মাদার গাছে এসেছে লাল ফুলের রাশি। ডাল ফুটে কি উচ্ছ্বাসে রক্তলাল ফুলগুলো বের হয়। রাতের অন্ধকারে একটা ঘুমভাঙা পাখি ডেকে চলেছে।

ললিতা কি স্বপ্ন দেখে বাইরের আলো আঁধারির রাজ্যে।

অতুল জানে না এসব কথা। তবু সেও ভাবে কোনোদিন তার দিন বদলাবে। থিতু হবে সে। সকালে রেওয়াজ করতে বসে এখনও।

সেনকত্তাও বসেন।

উদাত্ত কণ্ঠে আলাপ করে অতুল। সকালের প্রথম আলোয় তার মনের আঁধারও যেন মুছে যায়।

সেনকত্তা শুধোন, —কি রে সন্ধ্যায় ভজন কীর্তন কেমন হচ্ছে?

অতুল মন্দিরে কীর্তন সেরে সেখানেই প্রসাদ পায়। নশীরামবাবুই তার বরাদ্দ করেছে।

খানকয়েক লুচি, তরকারি, পরমান্ন—সঙ্গে গুড়, কোনোদিন বিশেষ ভোগ-এর ব্যাপার থাকলে সন্দেশও মেলে।

অতুল বলে—ভালোই চলছে কত্তামশায়। লোকজন অনেকেই আসে। রামায়ণ না হয় ভগবত পাঠ হয় তারপর ভজন শুরু করি।

সেনকত্তা বলেন,—মন দিয়ে ভক্তিভরে গাইবে রে। ভজন গান পবিত্র জিনিস। মাথা নাড়ে অতুল।

—তা বাপু গান গেয়ে তুই নশীরামের মতো লোকের মনেও দাগ বসাতে পেরেছিস্। আমারও ফাটল ধরিয়েছিস দেখছি।

হাসে অতুল--কি যে বলেন কত্তামশাই!

সেনকত্তা ফুরসীর নল টানতে টানতে বলেন—

—দ্যাখ, বুড়োর তো এখন অনেক টাকা, ধানজমি, কিছু নজরানা আদায় করতে পারিস কিনা। ব্যাটা তুই তো এখন ওর সভাগায়ক হয়ে উঠেছিস রে?

নশীরাম দত্ত নিজে অবশ্য হিসেব করে সাত-পাঁচ ভেবেই অতুলকে তার মন্দিরে গান গাইতে বলেছিল। ছেলেটা গান গায় সুন্দর। বেশ ভক্তি-টক্তি আসে গান শুনলে।

আর নশীরাম জীবনে টাকা-জমিজমা অনেক রোজগার করেছে। এখন তার নাম-ডাকও চাই। মন্দির—নাটমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে।

কিন্তু ওই মার্বেল পাথর মন্দিরে নাটমন্দিরে লোকজন বিশেষ আসে না। পথচলতি মানুষ দূর থেকে প্রণাম করে চলে যায়।

নশীরাম দত্ত তাই রোজ সন্ধ্যায় বেশ কিছু মানুষকে এখানে টানবার আয়োজন করে ফেলে। মার্বেল পাথর বসানো নাটমন্দিরে এখন রীতিমতো ভিড় করছে গ্রামের আশপাশের গ্রামের লোকজন, বুড়ো বুড়ি। পাঠ হয়—ভজন কীর্তন হয়।

নশীরামও রোজ সন্ধ্যায় সেজেগুজে নামাবলী গায়ে তিলকছাপ লাগিয়ে হরিনামের ঝুলি হাতে করে বসে যায়। লোকজন যারা আসে তারাও অবাক হয়।

কথাটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে, নশীরাম দত্ত পরমভক্ত হে, লোকের সব্বোনাশই করে না। দেবসেবা—দানধ্যান করছে।

কথাটা কানে যায় নশীরামের। খুশি হয় সে মনে মনে।

আর দেখেছে মদনের যাত্রার মহড়াটা বন্ধ হয়েছে এদের নামকীর্তনের ভজনের জন্য। মনে মনে আরও খুশি হয় নশীরাম। ছেলেটাও সিধে হবে এবার।

বাবার কথামতো মদনকেও আসতে হয় মন্দিরে। দু-একদিন তাকেও বেসুরো গলায় গান গাইতে হয়। ভক্তবৃন্দ ওই গানও শোনে।

মদনের সারা মনে জ্বালা ধরে।

ওদিকে বসে আছে অতুল। নশীরাম তাকে কি বলছে। মদন চুপ করে থাকে।

ওই অতুল ললিতাকেও তার করেছে, তার কাছে ভেড়ার পথ আর নেই, আর এদিকে বাবাকেও হাত করেছে। দেখেছে মদন ভোগ হয়ে যাবার পর বাবা অতুলকে প্রসাদ খেতে বসিয়ে তবে বাড়ির ভিতর যায়।

মদনের চ্যালা নটবর বলে,

—তা মদনবাবু আমরা প্রসাদ পাই না কেন, উদিকে শ্লা অত্‌লোকে খাতির করে বসিয়ে দিব্যি লুচি মেঠাই খাওয়াচ্ছে কত্তা?

মদন গজরায়। —দাঁড়া না শালার দফা শেষ করেছি।

সেদিন বৃষ্টি নেমেছে। নশীরামবাবুর শরীরটাও ভালো নেই। বৈকালে দু-একজন খাতক এসে কিছু টাকা দিয়ে গেছে। আর মধুগঞ্জের হরেণ সাহা তিন ভরি সোনার গোটহার বন্ধক রেখে তার গদিতে কিছু মাল কেনার জন্য টাকা নিয়ে গেছে।

সেইসব জিনিসপত্র নশীরাম নিজের সিন্দুকে তালাচাবির মধ্যে রাখে। কাউকে সে বিশ্বাস করে না। চাবি থাকে তার কোমরে ঘুনসিতে। ওই মালপত্র এনে আর নীচে নামেনি সেদিন নশীরাম।

সন্ধ্যার সময় আরতি হচ্ছে মন্দিরে। তখনও বৃষ্টি চলেছে। অতুল যথারীতি এসেছে। কিন্তু ভক্তরা আজ গরহাজির। দু-একজন যারা এসেছিল আরতির পর তারাও ফিরে যায়।

নশীরাম বাবু বলেন—অতুল চল আজ ঘরে বসেই একটু নাম শোনাবি চল।

বাইরে বৃষ্টি আর হাওয়া চলেছে, শরীরটাও যুত নেই।

ঘরে চল। ওখানেই নামগান করা যাবে।

নশীরাম অতুলকে নিয়ে তার নিজের ঘরেই গিয়ে বসল।

...বৃষ্টির রাত। মদনের বন্ধু-বান্ধবরা এমনি বর্ষার মরশুমে অনেকেই আসে মদনের কাছে। এমনি বাদলার ওপাশে গুণীর দোকান থেকে কিছু গরম ঝাল ঝাল তেলেভাজা আসে, আর নটবর জোগাড় করে আনে একনম্বরী তাজা মাল। ওদের আসর জাঁকিয়ে বসে।

আজ নাটমন্দিরও ফাঁকা—অন্ধকার নামে। নামকীর্তন হয়নি—জায়গাটা নির্জন। মদবাবুর অনুচরেরা

হাঁকিয়ে বসেছে।

নটবর বলে—ছোটবাবু ব্যাটা অতুলোকে নিয়ে কত্তামশায় নিজের ঘরে গেল। ওখানেই আজ কেত্তন গানটান হবে বোধহয়। শ্লা যা ডাউরি আর বাদলা, ভক্ত টক্তবা শ্লা আজ আর জুটবে না।

নোটন বলে,

—ভালোই হল। ফুর্তি করে নিরিবিলিতে বসে মাল খাওয়া যাবে। অন্য দিন যা ঝামেলা করে না? মেজাজ বিগড়ে দেয়। মদনও ব্যাপারটা দেখেছে।

আরও নিশ্চিন্ত হয় বাবার ঘর থেকেই খঞ্জনির শব্দ উঠছে। ওখানেই রয়েছে অতুল।

মদন এবার যেন পথ পেয়েছে। ওর মনের অতলে একটা কঠিন শয়তান ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। এতদিন অপেক্ষা করে আজ অতুলের চরম আঘাত করার পথই করে নেবে সে।

অতুলের জন্য ঘরে-বাইরে অপমানিত হয়েছে মদন। ললিতার মুখখানা মনে পড়ে। কি ভাবছে মদন। ওর মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে। মনের অতলে অন্ধকার গহ্বরে জেগে ওঠা বিষধর কোনো সাপ যেন মুখ খুলে ধীরে ধীরে ফণা তুলছে সঙ্গোপণে চরম আঘাত করার জন্য।

পরদিন সকালেই হৈ-চৈ পড়ে যায় নশীরামের বাড়িতে। বিরাট কাণ্ড ঘটেছে।

নশীরামেরও মাথা ঘুরে গেছে এব্যাপারে। এতদিন এ বাড়িতে এসব হয়নি। তার ঘরের দেরাজে বেশ কিছু টাকা ছিল, আর একটা সোনার হার সেদিনই দেরাজেই রেখেছিল নশীরাম. সেইগুলোই পাওয়া যাচ্ছে না সকাল থেকে।

বাসন্তীও অবাক হয় খবরটা শুনে।

এঘরে বাইরের লোক এসেছিল কাল সন্ধ্যায় একমাত্র অতুল। নশীরামের মাথার রক্ত উঠেছে এতগুলো টাকার শোকে। তিন ভরি সোনার হারও চলে গেছে। আর্তনাদ করছে নশীরাম।

মদন এদিক ওদিক খুঁজে এবার বের হয়ে যায়। যেভাবেই হোক এ মাল সে বের করবেই।

নশীরাম আর্তনাদ করেছে- সর্বনাশ হয়ে গেল রে আড়াই হাজার টাকা নগদ, তিন ভরির হার গেল, পথে বসব এবার। মারা পড়ব ধনে প্রাণে। কে নিল রে। রাতের বেলায়।

অতুল আস্তানায় ফিরে শুয়ে পড়েছে খাওয়া দাওয়ার পর, তার ঘরের দরজাটা ভেজানো থাকে। হঠাৎ সকালে লোকজন আর রতনদের নিয়ে মদনকে তেড়েফুঁড়ে আসতে দেখে অতুল অবাক হয়।

দু একজন কৌতূহলি দর্শকও জুটে গেছে।

মদন বলে -কাল থেকেই বাড়িতে আড়াই হাজার টাকা, সোনার হার পাওয়া যাচ্ছে না তুই চলে আসার পর। অবাক হয় অতুল—সেকি।

গর্জে ওঠে মদন। —ন্যাকা কিছু জানো না।

বের কর। ওই সব তুই নিয়েছিস।

—না! প্রতিবাদ করে অতুল। গোলমাল চীৎকারে শুনে এবার সেনকত্তা বের হয়ে আসেন বৈঠকখানা থেকে। —কি ব্যাপার মদন. দলবল নিয়ে সকালে? কি হয়েছে?

মদন বলে--কাল সন্ধ্যার পর বাবার ঘর থেকে টাকা-গহনা সব চুরি হয়ে গেছে, অতুলই গেছল সেখানে। তাই ওর ঘরটা একটু দেখব আমরা। সেটা নিশ্চয় এনেছে।

চমকে ওঠে অতুল—সেকি।

সেনকত্তা বলেন—অতুল কখনোই ওসব কাজ করতে পারে না। আর ও [illegible] কেউ ওসব এখানে আনে?

মদন বলে—বাধা দিলে পুলিশ আসবে সেনকত্তা। আমাদের খুঁজতে দিন।

অতুল বলে ওঠে—দেখতে চাও দ্যাখো। বলছি তো ওসব কাজ করি না।

মদন, গদাধর ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক হাতড়াতে থাকে। পুরোনো একটা বাক্সই সম্বল, তাতে খান

কয়েক ধুতি, জামা-ই থাকে সেখানেও নেই। হঠাৎ মদন ওদিকের তাকে কিছু পুরোনো রেকর্ড জাবেদা কাগজের নীচে থেকে বের করে টাকার তাড়া আর সেই হারটা। চীৎকার করে ওঠে সে এই যে, এখানে রয়েছে।

অতুল অবাক হয়—ওখানে এলো কি করে?

মদন গর্জে ওঠে—ন্যাকা।

সেনকত্তাও বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা মিথ্যে নয়, মাল বের করেছে ওখানে থেকেই।

মদন এবার লাফ দিয়ে অতুলের উপরে পড়ে নাকেই একটু ঘুঁসি মেরে গর্জে ওঠে—শালা চোর! কেত্তন শোনাতে যাও এই মতলবে। শয়তান চল এবার।

মদন বেশ জোরেই কয়েকটা চড় মেরেছে। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে অতুলের। সেনকত্তা কিছু বলার আগেই রতন, গদাধরের দল অতুলকে সেই চোরাই মাল-গহনা সমেত টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। সারা গ্রামের লোক জলস্রোতের মতো ভেঙে পড়ে নশীরামের উঠানে চোরকে দেখতে।

নশীরাম হারানিধি ওই টাকার বাণ্ডিল আর সোনার হারটা পেয়ে জড়িয়ে ধরে এবার নিজমূর্তি পরিগ্রহ করে। তার কাছে ধর্ম—ওই পুণ্য টুন্যর চেয়ে, পরমার্থের চেয়ে যে অর্থই বড় ওটাই প্রমাণিত হয়ে গেছে। শীর্ণ হাতে বন্দী রক্তাক্ত অতুলের গালে দুটো চড় মেরে গর্জে ওঠে, এ্যাঁ, তোকে ভেবেছিলাম ভালো ছেলে? ব্যাটা চোর।

অতুল প্রতিবাদ করে —না। চুরি আমি করিনি। ঠাকুরের নামে বলছি করিনি। ওটা কি করে আমার ঘরে গেল তা জানি না। বিশ্বাস করুন

বদ্যিনাথ ডাক্তারও একটা থাবড়া কসে বলে বিকৃত কণ্ঠে—সাধুরে।

পা গজিয়ে গেছে রে! তোকে শিল্পী বলে জানতাম, ব্যাটা এখন দেখছি তুই চোর—জোচ্চোর, বিশ্বাসঘাতক।

পরাণ মোড়লও ছুটে এসেছিল খবরটা পেয়ে। সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা।

সে অবাক হয়, গ্রামের সব মানুষই আজ নশীরামবাবুকেই সমর্থন করে। মদনও বেশ কয়েক ঘা দিয়েছে। এবার ক্লান্ত হয়ে থানায় জারি করে।

—নিয়ে চল ওকে, চল ব্যাটা।

নশীরাম হিসেবী লোক। জানে থানা পুলিশ করলে ওই টাকা হারও জমা দিতে হবে থানায়। টাকা কড়ি সে হাতছাড়া করতে চায় না। তাই মহত্ব দেখাবার জন্য নশীরাম বলে,

—ওসব থাক মদন, আমাদের টাকা গহনা পেয়ে গেছি এই ঢের, ওকে আর থানায় দিয়ে কি হবে? বেচারা। দে ঘা কতক আরও দিয়ে দে বরং।

সমবেত জনতা নশীরামের দয়ায় মুগ্ধ হয়। মহৎ ব্যক্তি সন্দেহ নাই ওরে। গদাধর ততক্ষণ অতুলকে এক ঘুঁসিতে ধরাশায়ী করেছে।

পরাণ মোড়লের পায়ের নীচের থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তবু বলে পরাণ,

আর মারবেন না বাবু, মরে যাবে ছেলেটা। পরাণ এখনও বিশ্বাস করেনি।

কে রায় দেয়—এত বড় শয়তানের মরাই ভালো। মরুক ওটা।

পরাণ ঠিক ভাবতে পারে না এটা কি করে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু শুনেছে সে, সোনা গহনা সব পাওয়া গেছে অতুলের ঘরে, আর অতুল কাল এসেছিল নশীরাম দত্তের ঘরে সন্ধ্যার মুখে। পরাণ কি ভাবছে।

কাজে যেতেও মন নেই তার। কোনোরকমে বাড়ি ফিরে এল।

দেখছে ললিতাকে। দুচোখে তার জল। সেও শুনেছে ওই চুরি আর অতুলকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্দয়ভাবে প্রহারের কথা। রাজলক্ষ্মী বলে পরাণকে,

—কি গো তখন তো বলতে খুব ভালো ছেলে অতুল, এখন। ছিঃ ছিঃ বখাটে বাউণ্ডুলে একটা চোরের হাতে মেয়েকে দিতে, এ্যাঁ—তার চেয়ে মেয়েকে দড়ি কলসি কিনে দাও।

ললিতা সরে গেছে আড়ালে' প্রমীলা নিজে ওই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দেখে এসে খববটা দিয়েছে দিদিকে। প্রমীলাও শুনেছে দু-একজনের কথা। দিদির দু'চোখে জল দেখে প্রমীলা বলে—ও এসব করেনি দিদি।

রাজলক্ষ্মী শুনেছে সব।

দত্ত বাড়ীর মদনদা কি সব বলেছে তাকে। তারও মনে হয় এ সব সত্যি। প্রমীলা বাবাকে ফিরে এসে ওই কথা বলতে দেখে সে জানায়।

—ওই মদনের কারসাজি মা। অতুলদা চোর নয়। ওকে চোর সাজিয়েছে ওই মদনবাবুই।

রাজলক্ষ্মী ধমকে ওঠে—থাম তুই।

ললিতা কোনো কথাই ভাবতে পাবছে না। তাব সব ধারণাগুলো বদলে যাচ্ছে। কি এক নিষ্ঠুর আঘাতে তার সব স্বপ্ন হারিয়ে গেল, এর মূলে কোনো সত্য নেই। সে বিশ্বাস করে অতুল এসব কাজ করেনি। করতে পারে না।

বাজলক্ষ্মী গজ গজ কবছে—উঃ কি সর্বনাশ গো! চোর ডাকাতটাকে আর এমুখো হতে দিও না। এ বাড়িতে যেন না ঢোকে আর।

ললিতার অসহ্য বোধ হয়।

বলে সে—দুনিয়াব সবাই চোর না। ও চুবি করেনি। কখ্খনো এ-কাজ ও করতে পারে না। এসব মিছে কথা মা। রাজলক্ষ্মী মেয়ের দিকে চাইল।

ললিতার মনেব দুর্বলতাব খবর সে জানে। প্রথম থেকেই সে অতুলের সঙ্গে ওর মেলামেশা, অতুলের এখানে আসাটা সমর্থন করেনি। মুখ ফুটে প্রতিবাদ না করলেও মন থেকে সায় তার ছিল না। আজও মেয়েকে অতুলের সাধুতা সম্বন্ধে বলতে দেখে এবার ফেটে পড়ে রাজলক্ষ্মী।

—থাম তো তুই। হাতে-নাতে ধরল আবার বলে কিনা চুরি করেনি। ওই চোরটাকে এমুখো হতে দেখলে ঝেঁটিযে বিষ ঝেড়ে দেব আর তোকেও বলি ললিতা বেশি বাড়াবাড়ি করিস্ না।

একটু লাজ-লজ্জা বোধ রাখবি। নাহলে তোকেও এবাব ছেড়ে দেব না। অনেক সয়েছি। ললিতা ফুঁসে ওঠে—কি কববে। দূর করে দেবে?

বাজলক্ষ্মী গর্জে ওঠে—তাই দেব।

—তা তো দেবেই। ললিতার চোখের সামনে ওই মানুষগুলোব রূপ বদলে গেছে। সবকিছু যেন কেড়ে নিতে চায় ওরা।

ললিতা শোনায়—তাই দিও। আমি তো তোমাদের বোঝা হয়েই আছি। সেই বোঝাটাকে এবার দূর করে দিও। তোমরাও বাঁচবে—আমিও বেঁচে যাব।

পবাণ এগিয়ে আসে। মা-মেয়ের এই তিক্ত ঝগড়াটা থামাতে চায় সে। এসব ভালো লাগছে না তার। পরাণ বলে স্ত্রীকে —আঃ থামো তো তুমি।

রাজলক্ষ্মী শোনায়—থেমেই তো আছি। তোমার মেয়েব গুণের কথা শোনো। এইবার কোনোদিন মুখে চুনকালি না দিযে কোথায় পালাবে ও। ললিতা গুম হয়ে শোনে কথাগুলো। পরাণ স্ত্রীকে থামাবার চেষ্টা করে—

—কি যা তা বলছ। থামো দিকি। গরীবের সংসার, তবু এ সমস্যাগুলো যেন ঘণীভূত হয়ে ওঠে রাজলক্ষ্মীর মনে। তাই কি জ্বালায় সে জ্বলে উঠেছে।

দযা করে থানা পুলিশ করেনি, আহত অতুলকে ছেড়ে দিয়েছে মদন নশীরামের কথায়। আজ মদন মনে মনে খুশি হয়েছে, নোতুন শক্তি পেয়েছে সে। অতুলের উঁচু মাথা—তার সেই গুণ, প্রতিষ্ঠা সব কেড়ে নিতে পেরেছে সে কৌশলে।

ওই মতলবটা করেছিল মদনই।

এর আগে দেখে এসেছে মদন অতুলের ঘরখানা। সেই রাতের বেলায় এক ফাঁকে ওই সব বাবার ঘর থেকে নিয়ে গিয়ে ওই অতুলের ঘরের পচা কাগজের নীচে রেখে এসেছিল গোপনে। তারপরই এসব করেছে।

একমাত্র সেই-ই জানে এই ব্যাপারটা।

আর গ্রামশুদ্ধ লোক কেন, পঞ্চগ্রামী লোক জেনেছে অতুল লোভ সামলাতে না পেরে চুরিই করেছে। সে নশীরাম দত্তের বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছে—সে চোর। তাকে বিশ্বাস করা যায় না।

মার খেয়ে অতুল কোনোরকমে টলতে টলতে আসছে। কপাল নাক মুখ কেটে গেছে, চাপ চাপরক্ত জমেছে মুখে কপালে। সারা গায়ে অসহ্য বেদনা। ঠিক দেখতও যেন পায় না আজ। নেশাগ্রস্তের মতো টলতে টলতে আসছে। চোখে তার শূন্য বিহ্বল দৃষ্টি। দু'পাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন রাত্রে ওই মানুষগুলোই তাকে অভিনন্দিত করেছিল তার গান শুনে। আজ তাদের চোখে ফুটে উঠেছে দুঃসহ ঘৃণা। ওদের চোখে আজ অতুল ঘৃণ্য চোর ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোনোরকমে আহত দেহখানাকে টানতে টানতে এনে জীর্ণ ঘরের ময়লা বিছানায় হাজির হয়।

কুঁজোর জলটা খানিক খেয়ে লুটিয়ে পড়ে অতুল নির্জন ঘরে।

আজ মনে হয় এই মুখ সে কাউকে দেখাতে পারবে না। যেভাবেই হোক তাকে চোর সাজানো হয়েছে, সব কেড়ে নিয়েছে অতুলের ওই মানুষগুলো। মদনের কথা মনে পড়ে—তার মুখে বিজয়ীর নিষ্ঠুর হাসি, যেন লুণ্ঠনকারী একটা দস্যু সে। তার সব কিছু লুট করে নিল।

অতুলের করার কিছুই নেই।

সেনকত্তাও দেখেছেন—কিন্তু কিছু বলার মুখ তার নেই।

অতুলের কাছে এই গ্রাম—এই আশ্রয় আজ যেন জেলখানায় পরিণত হয়েছে। অতুল ক্রমশ বল ফিরে পায়। এবার ভাবতে পারছে না সে— তার নিজের অপমানের কথা। এর জবাব আর এখানে থেকে দিতে পারবে না সে। মদনই চক্রান্ত করে তার সব কেড়ে নিয়েছে।

মান সম্মান প্রতিষ্ঠা সব। ললিতার কথা মনে পড়ে -তার সামনে এই মুখ সে আর দেখাতে পারবে না। তার এতদিনের স্বপ্ন হারিয়ে গেল। একটা চোরকে ললিতাও মেনে নিতে পারবে না, চাইবে না হয়তো।

এখানের পালা তার ফুরিয়ে গেছে।

কোথায় যাবে জানে না। তবু চলেই যাবে সে। এখানে তার ঠাঁই আর নেই, উঠে দাঁড়াল অতুল। দু-চারখানা কাপড়-জামা আর কয়েকটা টাকা মাত্র সম্বল। এতবড় দুনিয়ায় তার কেউ নেই—কিছু নেই। যা কিছু ছিল আশা, ভবিষ্যৎ আশ্রয় তাও কেড়ে নিয়েছে ওই মদন দত্ত। রাত্রি নেমেছে।

অন্ধকার রাতে সব হারিয়ে পথে নামল একটি তরুণ। কোথায় যাবে জানে না। হাঁটাপথে এখান থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে রেল ইস্টিশান, সেখানে গিয়ে ট্রেনে উঠে কোনো শহর বাজার না হয় গঞ্জে যাবে। নিজের পরিশ্রমে নোতুন করে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে, এখানে আর থাকতে পারবে না সে। হৃদয়হীন, বিচারহীন এই মানুষগুলো তার কেউ নয়।

রাতে ঘুমতে পারে না ললিতা।

সারা বাড়ি ঘুমে আচ্ছন্ন। দাওয়ায় একপাশে মাদুরে পড়েছিল সে। বারবার মনে পড়ে অতুলের কথা। একটা নিরীহ লোককে এভাবে মেরেছে ওই মদন। ললিতা জানে এই রাগের কারণটা কি।

মদনকে চিনেছে সে—দেখেছে তার চোখের সেই হিংস্র লালসাভরা চাহনি। আজ ললিতার মনে হয় মদনের জ্বালার কারণটা। অতুলকে সে সহ্য করতে পারেনি। কারণ ললিতার মনে অতুলের জন্য ভালোবাসার সন্ধান সে জেনেছিল, অতুলকে ললিতার আজ দরকার। ললিতা জানে অতুল চুরি করে

নি—একথা ললিতা মানে না। তারপাশেই দাঁড়াবে ললিতা। তাকে আঘাত দিতে সে পারবে না।

তারাগুলো রাতের অন্ধকারে শিহর জাগায়। স্তব্ধনিশুতি গ্রামের পথ ধরে চলেছে ললিতা, সাবধানে উঠে, দরজা খুলে বের হয়ে এসেছে সে। চলেছে সেন পাড়ার দিকে। আঁধার নামা পথে চলেছে সে।

বাঁশবনে একটা তক্ষক কর্কশ-স্বরে ডেকে ওঠে। কোথায় একটা রাতজাগা পাখি ডাকছে।

থমকে দাঁড়াল ললিতা। অন্ধকারে কার যেন পায়ের শব্দ ওঠে। দেখছে সে সাবধানী দৃষ্টি মেলে। নাঃ কেউ কোথাও নেই।

ললিতা কি উত্তেজনা নিয়ে এসে উঠল রাতের অন্ধকারে ওই বাড়িটায়।

অতুলের ঘরটা সে চেনে। নির্জন রাতে এগিয়ে চলেছে সে।

থমথমে আঁধার—পথ চিনে আসছে ললিতা।

এগিয়ে চলেছে মেয়েটা। ঘরটার দরজা খোলা, বিছানাটা পড়ে আছে। কেউ কোথাও নেই।

শূন্য জলের কুঁজোটা গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেউ নেই ঘরে। অতুল নেই। চলে গেছে সে কোথায়।

ললিতা কি দুঃসহ বেদনায় ভেঙে পড়ে। এমনি একটা কিছু ঘটবে ভেবেছিল সে। তার মতো সৎ একটা ছেলে এত বড় মিথ্যা অপমান সহ্য করে এখানে ভিখারীর মতো পড়ে থাকবে না। সে চলে যাবে।

আজ তাই হয়তো কি অভিমানভরে হারিয়ে গেল অতুল। এ গ্রামের মানুষকে এমনকি ললিতাকেও ভুল বুঝে গেল সে। ললিতা যে তার জন্য সব বাধা তুচ্ছ করে ঘর ছেড়েও বের হয়েছিল এ খবরটা অতুলের অজানা রয়ে গেল চিরকালের জন্যই।

কি শূন্যতার বেদনায় ললিতার মন হাহাকার করে ওঠে। বের হয়ে আসছে সে।

আজ রাতের এই নিবিড় তমসার অতলে ললিতা অনুভব করে তার জীবনের এই ব্যর্থতার বেদনাটা, চোখের সামনে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার নিবিড়তর হয়ে। এই অতলান্ত অন্ধকারে তার জন্য কি নিষ্ঠুর বেদনাময় অধ্যায় রচিত হতে চলেছে জানে না সে। তবু তার সাবধানী নারী মন সেই ভয় ভীত-ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আজ সে নিঃসঙ্গ—একা।

ও জানে মদন দত্ত তাদের একজনকে আজ শেষ করেই থামবে না, এবার আঘাত আসবে তার উপরও।

ললিতার সাবধানী মন সেই কথাটাই ভাবছে। এতদিন তবু পাশে ছিল অতুল, একটা সান্ত্বনা, নির্ভর তার ছিল। আজ সেও কি অভিমান ভরে তাকে ফেলে চলে গেছে।

ফিরছে ললিতা। দু'চোখে তার জল নামে। স্তব্ধ ঘুম নামা বাড়িটার কাছে এসে সাবধানে ঢুকলো সে বাড়িব মধ্যে, না, কেউ এরা জাগেনি। কেউ টের পায়নি তার হতাশ হয়ে ফিরে আসার কথাটা।

সকাল বেলাতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। অতুলকে পাওয়া যাচ্ছে না। অতুল নেই। কালই কোথায় চলে গেছে রাতের অন্ধকারে।

রাজলক্ষ্মী খবরটা পাড়ার কালীমন্দিরে শুনে এসে বেশ সোচ্চার ঘোষণা করে—মা মুখ রেখেছেন। চোরটা গাঁ ছেড়ে উধাও হয়েছে। পাপ গেছে।

—হবে না! মুখ দেখাবে কি করে।

পরাণ মাঠে বের হচ্ছিল। কাল থেকেই তার মন মেজাজ ভালো নেই।

খবরটা শুনে বলে পরাণ—তাই নাকি। চলে গেল সে। কোথায়?

রাজলক্ষ্মী দেখছে মেয়েকে আর পরাণকে বলে ওঠে,

—চমকে উঠলে যে, দরদ যে ধরে না। চোরটা গেছে শান্তি আসবে এবার। ললিতা বলে ওঠে—চোর গেছে, কিন্তু যারা তাকে চোর বানিয়েছে সেই ডাকাত শয়তানের দল গাঁয়েই আছে মা। তারা এবার কি করে তাই দ্যাখো।

রাজলক্ষ্মী মেয়ের দিকে চাইল।

ও বলে ওঠে পরাণকে—দে গাঁয়ের ওরা প্রমীলার সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়, তার আগে ওই বড়

রাজকন্যাকে বিদেয় করো। গোবিন্দ বৈরাগী নাকি সংসার করবে শুনলাম, বলে কয়ে দ্যাখো না ওকে। যদি রাজী হয়।

বুড়ো গোবিন্দ বৈরাগীর জমিজমা আছে। সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করতে চায়। পরাণ কথাটা শুনে জবাব দিল না। উঠে গেল মুখ ভার করে।

রাজলক্ষ্মী বলে—উঠে গেলে যে? কথাটা কানে গেল না?

পরাণ বলে—আধবুড়ো লোকটার হাতে ললিতাকে তুলে দেবে তুমি?

রাজলক্ষ্মী ফুঁসে ওঠে—মেয়ের কীর্তি সবাই জানে। তবে কি রাজপুত্র পাবে তুমি? এদিকে একরাশ টাকার দেনা ঝুলছে দত্তমশায়ের কাছে। কি হবে তা জানো? ওই অভাগীর জন্যে সর্বশান্ত হতে হবে? আর কেউ নেই আমার? তাদের কথাও তো ভাবতে হবে।

ললিতা মায়ের কথাগুলো শুনছে। বলে ওঠে সে,

—আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না মা। তোমাদের এতই যদি বোঝা হয়ে থাকি—বলে দাও, আমার পথ নিজেই আমি দেখে নিতে পারব।

পরাণ থামাবার চেষ্টা করে ওদের। সকালবেলাতেই তার মেজাজটাও বিগড়ে দিয়েছে ওরা।

সারাদিন মাঠের কাজ আছে। তাই পরাণ বলে,

—সাত সকালে ওসব কথা ছাড়ো দিকি।

রাজলক্ষ্মী বলে—ওই গোবিন্দকে বলে দ্যাখো। চিরকাল ওই মেয়েকে ভাত দিতে পারব না। ললিতার মনের জ্বালা চোখের জল হয়ে ঝরে।

মদন আজ নিশ্চিন্ত হয়েছে। এতদিন পর একটা কাজের মতো কাজ করেছে। ললিতার কথা মনে পড়ে। এবার মদন এগোতে পারবে।

মদনের বৈঠকখানায় আজ ফূর্তির হাট বসেছে। মদন এন্তার ঘটা করে মদ-মাংস বিলিয়েছে। নিবু সর্দরও টলছে।

রতন বলে—শ্লা অত্‌লো ফৌত গুরু। এবার লাগাও যাত্রাগান—যে শালা ট্যাঁ ফুঁ করবে তাকে এবার তুলে নে যাবো।

মদনের মনে এখন অন্য স্বপ্ন—ললিতার কথাই ভাবছে সে।

নশীরাম এবার ধর্মভাব ছেড়ে নিজ মূর্তি ধারণ করেছে।

বেশ বুঝেছে ধর্মঠাকুর, ভজন এসব নিয়ে মেতে উঠে তার লোকসানই হয়েছে।

মদনও বলে ওসব যাত্রার কাত্রায় আর নাই। চোর বাউণ্ডুলের পথ ওসব।

নশীরাম খুশি হয় ছেলের কথায়।

বলে সে—ওই করে কত টাকা জলে গেছে জানিস্? এবার চেষ্টা কর যাতে সে সব টাকা উঠে আসে। চারদিকে ছড়ানো টাকাগুলো তোল এবার। দরকার হলে নালিশ করেও আদায় করতে হবে। উঃ, ভালোমানুসী করতে গিয়ে ঢের শিক্ষা হয়েছে আমার। মদন তাই উঠে পড়ে লেগেছে।

সেনকত্তাকেও কড়া তাগাদা দিয়ে এসেছে, পুলিন দাসের নামে নালিশও রুজু করেছে। নিতাই পালকে সেদিন ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে বেশ কড়া ধমক দিয়েছে মদন তাদের কাছারিতে।

—টাকা না দিতে পারলে জমিই জবরদখল করে নেব। কোর্টে যেতে হয় তুমি যাবে। আমি যাবো না নিতাই।

নিবু সর্দারের এখন কাজ বেড়েছে। গোফ পাকিয়ে সায় দেয় সে,

—তাই করেন ছোটবাবু, দেখবো নিতাইয়ের বাপের সাধ্যি কেমন?

খবরটা শুনেছে গ্রামের পথে। মদন দত্তই এবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কোনোদিন তার উপরই এবার চড়াও হবে। অজানা ভয়ে শিউরে উঠে লোকটা।

সেদিন হঠাৎ মদনবাবুকে তাদের বাড়িতে আসতে দেখে পরাণ একটু ঘাবড়ে যায়। ললিতা ঝাঁট দিচ্ছিল। রাজলক্ষ্মী এগিয়ে এসে খাতির করে তাকে।

—বসো বাবা।

পরাণ চুপ করে থাকে। মদন মোড়াটা টেনে বলে,

—তোমার কাছে বাবা পাঠালো পরাণ কাকা, টাকার দরকার। অনেক খরচপত্র হয়ে গেছে আর বিলেও বাকী ফেলে রাখতে চাইছে না বাবা। সবাইকে তাগাদা দিচ্ছি, তাই বাবা তোমার কাছে পাঠাল।

পরাণ কথাটা ভাবছে। সেও শুনেছে গ্রামের অনেককেই কড়া তাগাদা দিচ্ছে নশীরাম আর মদন। তার কাছেও আজ এসেছে।

রাজলক্ষ্মী শুনছে কথাগুলো। কি ভাবছে সে। পরাণ জানে না এই সময় কোথা থেকে টাকা দেবে সে নশীরামকে। মদন বলে চলেছে তোমার টাকা পেলে ভালো হয়। পরাণ কি জবাব দেবে জানে না। রাজলক্ষ্মী বলে ওঠে এবার,

—ওরে ললিতা, তোর মদনদাকে একটু চা করে দে। আয় না সামনে—বুঝলে বাবা মদন, মেয়ের আমার খুব লজ্জা। আরে মদনকে লজ্জা কি! ঘরের ছেলে। ললিতা চায়ের কাপটা এনে দেয়, কোনোমতে মদন চেয়ে থাকে ওর দিকে। এ চাহনির ভাষা অন্যরকম।

পরাণ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। প্রমীলা, আন্নাকালী স্কুলে গেছে। রাজলক্ষ্মীর চোখে কি একটা নিষ্ঠুরতা ফুটে ওঠে। রাজলক্ষ্মী বলে পরাণকে,

—তুমি এখন মাঠে যাও, পরে দেখা করবে মদনের সঙ্গে।

পরাণ যেন পালাতে পারলে বাঁচে। সে বের হয়ে গেল পাটক্ষেতের দিকে। রাজলক্ষ্মী বলে,

তোমরা কথাবার্তা বল বাবা, আমি কল থেকে এক কলসী জল নিয়ে আসি। আসোনা তো বাবা এদিকে—এসে কথা বলব। তা বাবা একটা খুব ভালো কাজ করেছ। গাঁয়ের! উঃ—একটা চোর ওই অতুলো, কে জানতো বাবা। কোনদিন আবার কার সব্বোনাশ করত কে জানে।

মদন বলে— অনেকেই তো দোষ দেয় আমাকে। মারধর করে তাড়িয়ে দিইছি নাকি। তবু আপনি বললেন অসল কথাটা।

রাজলক্ষ্মী শোনায়— তুমি গুণী, পরোপকারী ছেলে বাবা, গেরামের কার বাড়িতে আবার কী সব্বোনাশ করত কে জানে, তাকে তাড়িয়ে ভালোই করেছ। আমি আসছি বাবা! বসো কিন্তু।

ললিতা দাওয়ায় একা দাঁড়িয়ে আছে। মা বের হয়ে গেল দরজাটা ভেজিয়ে। ললিতার চোখের সামনে আজ বিপদের কালোছায়া ফুটে উঠেছে। বেশ বুঝেছে মায়ের ব্যাপারটা। আজ মা তাকে এ সংসারের স্বার্থে ওই জানোয়ারের হাতে তাকে দিতেও দ্বিধা করবে না।

—কথা কইছ না যে। মদনের ডাকে চাইল ললিতা। নির্জন বাড়িটায় তারা দুজনে রয়েছে।

মদনের চোখ-মুখে কি লালসার ছায়া ফুটে ওঠে। মদন বলে বেশ গদগদ সুরে, —তাহলে গান শোনাচ্ছ কবে? একদিন চলো। বেশ বাজিয়ে গান শোনা যাবে।

ললিতা চাইল ওর দিকে। বলে ওঠে সে চাপা স্বরে—বাঈজী নই আমি।

হাসছে মদন। মদন এতকাল যেসব মেয়েদের দখল করেছে তারা যেন ললিতার তুলনায় কাদার তালমাত্র। একটা তেজী মেয়ের বিষদাঁত ভেঙে আজ মদন নিজের পৌরুষ-এর প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বাড়িটা নির্জন। আর জেনেছে মদন এ বাড়ির মানুষদের সে কিনে নিতে পারে। সেই জোরেই সে ললিতাকেও দখল করতে চায়।

ললিতা দেখছে মদনকে। মা সেই যে বাইরে গেছে এখনও ফেরেনি ইচ্ছে করেই সেটা বুঝেছে ললিতা। মদন ওর দিকে চেয়ে হালকা স্বরে বলে—সুন্দর দেখায় তোমায়। ক্রুদ্ধস্বরে ললিতা বলে—জবাব দিয়েছি তো। যাব না।

মদন বলে—না গেলে জোর করেই তুলে নিয়ে যেতে পারি, তা জানো। তাতে গড়বড় করলে তোমার বাবার জমি বাড়ি সব কিছু কেড়ে নিয়ে পথে বের করে দেব।

তুমি এটা না বুঝলেও তোমার মা বুঝেছে। তাই বলছিলাম—

ললিতা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে ওঠে—

—কত বড় ইতর তুমি তা জেনেছি। একটা নিরীহ ছেলেকে চোর সাজিয়ে তাকে মারধর করে তাড়িয়ে এবার আমার উপর চড়াও হবে তা আমি জানি।

মদন চাইল ওর দিকে—তাই নাকি।

মেয়েটা আজ মরীয়া। ললিতা জেনেছে তার চরম সর্বনাশের কথা। ভয় আর করে না সে। ললিতা বলে ওঠে,

—সেই রাত্রে তুমিই অতুলের ঘর খোলা পেয়ে রাতের বেলায় সেখানে ওই টাকা গয়না রেখে এসেছিলে তাক চোর বদনাম দিতে। তুমিই করেছ এসব!

মদন দপ্ করে জ্বলে —হ্যাঁ। তাই নাকি! তীক্ষ্ণস্বরে বলে মদন—খুব যে দবদ দেখছি এখনও।

ললিতা বলে—আর তার ঘরে তোমার দামী জুতোর ছাপ আজও আঁকা রয়েছে, পড়েছিল এই রুমালটা!

চমকে ওঠে মদন। ললিতার হাতে ওই প্রমাণটা আসবে এটা সে ভাবেনি।

রুমালটা নিতে যায়, কিন্তু সরে গেছে ললিতা। মদন ওকে ধরে কেড়ে নিতে যাবে ললিতা সরে যায়, এমন সময় জল নিয়ে ঢুকছে রাজলক্ষ্মী।

মদন উঠে দাঁড়াল। বেশ রেগে গেছে সে।

মদন বলে—আজ চলি। পরাণ কাকাকে আজই পাঠিয়ে দেবে।

বের হয়ে গেল মদন রাগতভাবে।

ললিতা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাজলক্ষ্মী বেশ বুঝেছে কোথায় একটা দারুণ গোলমাল হয়ে গেছে। মদনকে এভাবে বের হয়ে যেতে দেখে চটে ওঠে রাজলক্ষ্মী। এগিয়ে এসে ললিতার সামনে গর্জে ওঠে সে।

—মুখপুড়ি, কি হয়েছে যে চলে গেল মদন এমনি করে।

ললিতা বলে—ওকে শুধোলেই পারতে। আমাকে শুধোচ্ছো কেন?

রাজলক্ষ্মী গর্জায়—একটু ভালো করে কথা কইতেও পারিস্ না, এত ডাঁট কিসের লা? ভালো কথা বলতে শিখিস্ নি?

ললিতা বলে—মেয়েকে দিয়ে ছলাকলা শিখিয়ে ব্যবসা করতে বলো—লজ্জা করে না তোমার? তুমি মা হয়ে এই কথা বলছ?

রাজলক্ষ্মী চমকে ওঠে। তার মনের গোপন কথাটা এভাবে জানবে আর তারই প্রতিবাদ করবে এমনি স্পষ্টভাবে ললিতা, এ সহ্য করতে পারে না রাজলক্ষ্মী। রেগে উঠেছে সে। --কি বললি?

ললিতা বলে—ঠিকই বলেছি।

রাজলক্ষ্মী এবারে রাগের বশে সজোরে একটা থাপ্পড় কসে গর্জে ওঠে—লজ্জা আমার করবে কি লা—ওই চোরটার সঙ্গে তোর লীলাখেলার কথা কে না জানে? তুই কি তা জানিস্ না?

—মা! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে ললিতা। কী তীব্র অপমানে ঘৃণায় তার দু'চোখ ফেটে জল নামে।

হঠাৎ দরজার সামনে পরাণকে দেখে রাজলক্ষ্মী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। পরাণ শুনেছে সবই মেয়ের ওই প্রতিবাদ আর্তনাদ। রাজলক্ষ্মীর এই নীচ প্রবৃত্তির কথা ভেবে চমকে ওঠে পরাণ।

বলে সে—কি বলছ বৌ, মা হয়ে নিজের মেয়েকে এতবড় বদনাম কেউ দেয়? কাঁদিস না মা।

ললিতা সরে গেল ঘরের মধ্যে। রাজলক্ষ্মী তবু দমে না। সে গর্জায়।

—ওই মেয়ের পাপেই সব যাবে এবার। ওর কথাবার্তা শুনেছ? ছিঃ ছিঃ।

পরাণ গরীব হতে পারে। তবু সে বাবা। মাটির কাছাকাছি থাকা ওই সৎ মানুষটা বলে,

—যা হয় হোক ছোট বৌ, এর প্রতিবাদ আমি করবই। আমার মান-সম্মান বিকিয়ে দিতে পারব না ওই লোভী শয়তানদের কাছে। তার জন্য পথে নামতে হয় তাও নামব।

রাজলক্ষ্মী গলা তুলে চীৎকার করে।

—তাই হবে। পাপ—ওই পাপের জন্য আমার সব যাবে। সৎ মেয়ে ক্যামন হবে?

পরাণও স্ত্রীকে যেন আজ সহ্য করতে পারে না। সে নিজেও দেখছে রাজলক্ষ্মী মনের নীচতাটাকে। বলে ওঠে পরাণ,

— বাজে বকোনা, কে পাপী তা বুঝতে পারোনি?

ফুঁসে ওঠে রাজলক্ষ্মী—আর তুমি! তুমি আর ওই লবলাটুকে মেরে একেবারে পুণ্যবান, ধোয়া তুলসী পাতা। থাক! ঢের দেখা আছে আমার!

ললিতা কিছু বলতে পারে না।

বারবার মনে পড়ে হারানো অতুলের কথা। আজ সে পাশে থাকলে এতবড় অপমান দুঃখটাও সইবার ক্ষমতা আসত তার। কিন্তু সেও নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে।

ললিতার মনে হয় এবাড়ির বাতাসে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

রাজলক্ষ্মী সারাদিন গজগজ করছে, এ সংসারে যেন ধুঁইয়ে উঠছে একটা অশান্তির আগুন। সৎ মেয়েকে নিয়ে এতকাল তবু সংসার করেছে রাজলক্ষ্মী। কিন্তু আজ সংসারকে বাঁচানোর জন্য, নিজের দুটি মেয়ের ভবিষ্যতের জন্যই ওই সৎ মেয়ে ললিতাকে সে একটু কাজে লাগাতে চেয়েছিল। তার জন্য এসব কথা শুনতে হবে ভাবেনি।

পরাণও আজ আঘাত পেয়ে গুম হয়ে বসে আছে দাওয়াতে।

বেকালে নবু সর্দারকে হাজির হতে দেখে চাইল পরাণ।

এবার আর মদন আসেনি এসেছে নবু সর্দার গোঁফটা পাকানো, নবু বলে—কত্তাবাবু যেতে বলেছে পরাণ, খুনিই চল।

পরাণ জানে কি বলবে কত্তাবাবু।

তবু সে সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। আজ মনে মনে তৈরি হয়েই নিয়েছে। বলে নবুকে—তুমি যাও, আমি একটু পরে আসছি ওখানে।

মদন এখন বাপের যোগ্য সন্তানের মতোই ব্যবহার করছে। বাবাকে হাতে রাখা দরকার। মনে মনে সে একটা পথ ভেবে নিয়েছে। এর আগেও এমন কাজ করিয়েছে, এবারও করাবে। তাই বাবার বিশ্বাস অর্জন করতে চায় সে। নশীরামও পরাণকে আসতে দেখে চাইল। মদনও রয়েছে। নশীরাম বলে,

-তাহলে টাকার কি করছিস পরাণ। টাকাপত্র মিটিয়ে দে নাহলে আমাকে এবার অন্য ব্যবস্থাই দেখতে হবে।

পরাণ বলে—কিন্তু এখন টাকা কোত্থেকে দেব কত্তা। মেয়েটার বিয়ে থা দিতে হবে—তারও কিছু করতে পারছি না।

মদন চটে ওঠে—তোমার সব কিছু হবে, আর আমাদের টাকাই দেবে না?

শুনলাম পাট বিক্রি করেছ দেড় হাজার টাকার কালই—

নশীরাম চমকে ওঠে—সে কি রে! এই—ফাঁকি দিতে চাস্? ঠিক আছে। মদন কালই ব্যবস্থা কর। পরাণ ওই জমি ক'খানা ছেড়ে দে বাবা।

চমকে ওঠে পরাণ—সামান্য টাকা নিলাম,তার জন্য তিনখানা সরেশ জমি ছেড়ে দিতে হবে? খাবো কি? সংসার চালাতে হবে কত্তা।

মদন গর্জে ওঠে—ওই জমি বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছিলে—সুদে মূলে এখন চার হাজার হয়ে গেছে

তা জানো?

—চা-র হাজার।

পরাণ ঋণের পরিমাণ শুনে চমকে ওঠে। মনে হয় এই লোকগুলো যেন তাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে শেষ করতে চায়, সর্বস্ব লুট করে নিতে চায় কোনো ডাকাতের দল।

পরাণ রুখে ওঠে—মিথ্যে কথা। পাঁচকুড়ি দশ টাকা—আর একবার তিনকুড়ি টাকা নিছি, তার জন্য চার হাজার টাকা দিতে হবে? মগের মুলুক। দেব না এত টাকা! ওর ঔদ্ধত্যে এবার নশীরাম, মদন চটে ওঠে।

নশীরাম গর্জে ওঠে—না দাও, আমরাও দেখে নেব।

পরাণ আজ ক্ষেপে উঠেছে।

সেও শোনায়—তাই যেও, পরাণ মোড়লও দেখে নেবে তোমাদের ওই মাঠে, ন্যায্য যা পাবে বলো —ওসব গোঁজামিলের হিসেবে নাই। দেব না। তাতে যা পারো করোগে?

পরাণ ফুঁসছে—ধাপ্পা, ছাই, রাত দিন হয় না? তোমরাই চোর, ডাকাত।

বের হয়ে গেল পরাণ। মদনের মুখ চোখ রাগ অপমানে লাল হয়ে ওঠে।

ওদিকে দাঁড়িয়ে ছিল নবু সর্দার। সেও শুনেছে সব। নশীরামকে মদন বলে, শুনলে ওর কথা। শাসিয়ে গেল?

নশীরাম দত্ত রাগলে ধীরে ধীরে কথা বলে, বেশ শান্ত স্বরে। বহুকালের সাধনায় নশীরাম ওই ক্রোধটাকে অন্তর্মুখী করে তুলতে পেরেছে। নশীরাম বলে,

—উত্তেজিত হোস্ নে মদন। সব সইতে হবে। এখন ওকে লাফাতে দে, আমি পরে সব ব্যবস্থা করছি।

মদন এত সহিষ্ণু নয়। বলে সে—তুমি সইতে পারো বাবা, ওই ছোট মুখে বড় কথা আমি সইব না। এর ব্যবস্থা আমি করবোই।

নশীরাম চুপ করে থাকে। দিনকাল বদলাচ্ছে। জানে সে আগেকার মতো এক কথায় জমি থেকে তাড়াতে পারবে না। নানা ঝামেলা হবে। আজকাল তাই ওই পরাণের মতো লোকেরা যেন মাথায় উঠেছে। অথচ এদের শায়েস্তা না করতে পারলে নশীরামদের দিনও শেষ হয়ে আসবে। এ শুধু বেঁচে থাকার প্রশ্ন।

দেনদারও আজকাল মুখ খুলে সোচ্চার হচ্ছে, তাদের ভয়ে মহাজন যদি চুপসে যায় কাজ কারবার করা যাবে না।

নশীরাম কি ভেবে বলে— ব্যবস্থা করতে হবে গোপনে। দিনকাল ভালো নয় রে মদন। বুঝে-সুঝে পা ফেলতে হবে বাবা।—তা ওই পাট বেচেছে কোথায় শুনলি? টাকা পেয়েছে?

মদন বলে—শশীর আড়তে বেচেছে, শশীই বল্লো। আর টাকা আজই পাবে, প্রায় দু'হাজার টাকা।

নশীরাম হঠাৎ হেসে ওঠে, সে হাসে খিক্ খিক্ শব্দে। সেই হাসিটায় কি শয়তানি মাখানো। মদন বাবাকে দেখছে।

নশীরাম এবার বলে ওঠে—এতগুলো টাকা ঘরে রাখবি, দিনকাল তো ভালো নয় রে। মানে চুরি ডাকাতি হতে কতক্ষণ। বোকা মানুষ কিনা—ঠকবি, পস্তাবি শেষে আর কি। জয় গুরু।

মদন বাবার কথাগুলো শুনে চমকে ওঠে। বাবা তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে। আবার সেই ভাবনাটা খুব যুক্তিসঙ্গত। বাবার দিকে চাইল সে।

মদন যেন পথ পেয়েছে।

যেভাবে হোক পরাণের মতো অবাধ্য লোকদের শায়েস্তা করতেই হবে। মদন দেখিয়ে দেবে কি করতে পারে সে। একটা সুন্দর পথ নির্দেশিকা সে পেয়েছে। আর কায়দা করে কাজটা গুছিয়ে তুলতে

পারলে এক ঢিলে দুই পাখিই মারতে পারবে সে। মদন সেই কথাই ভাবছে।

পবাণ রেগে বাড়িতে ঢুকে দাওয়ায় বসল। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে।

সারা পরিবারের লোকজন, তার স্ত্রী, ললিতাও তারই পথ চেয়েছিলে। প্রমীলা, আন্নাকালী শুনেছে তাদের বিপদের কথা। তাই বাবাকে ফিবে গুম হয়ে বসতে দেখে ললিতা এগিয়ে আসে। শুধোয় সে ভয়ে ভয়ে,—ওরা কি বলছিল বাবা?

বলে ওঠে পরাণ—নিইছিলাম দুশো-তিনশো টাকা জমি বন্ধক রেখে এখন বলে চার হাজার টাকা দিতে হবে। না হলে জমির দখল নেবে জোর করে।

চমকে ওঠে ললিভা—কি বলছ বাবা।

রাজলক্ষ্মী এবার ফুঁসে ওঠে—জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাস করবে—এইবার মজা দ্যাখো। সব কেড়ে নেবে—

পরাণ গর্জে ওঠে—আইন নাই? জোর ওর একাব? আসুক জমির মাথায় দেখে নেব ওকে। আমিও ছাড়ব না।

রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—ভারি মরদ। তার চেয়ে ওদেব হাতে পায়ে ধরে মিটিয়ে নাও গে। আর তোকেও বলি ললিতা—এত ডাঁট কিসের। সংসারের মুখ চাইলে কথাটা ভাবতিস না। সংসারের কল্যাণ হোক তা ভাববি কেন সৎমা যে যা তা বলবে।

পবাণ বলে—এমন কল্যাণে দরকার নাই বৌ। ধম্মো আছে—এখনও দিন-রাত হচ্ছে। ভগবান আছে—তিনি এর বিচাব করবেন। আর আমি ছাড়ব না। কি করে দেখব।

ললিতা গুম্ হয়ে গেছে। তাব চোখের সামন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

সারাদিন বাড়িব মানুষগুলো মুখ বুজে রয়েছে। ওদের সকলের মনে কি ভয় জাগে। রাজলক্ষ্মীই গজগজ কবে—আমাব দোষ। যা ভালো বোঝ কর দুজনে। আমি কে?

ললিতা চুপ করে ভাবছে।

রাত্রি নেমেছে। মায়ের মনোভাব বুঝে শিউরে উঠেছে ললিতা। সৎমা আজ তাকেই পশবা করে এই বিপদ পাব হতে চায়।

মদনেব লালসাভরা চাহনিটা মনে পড়ে। তাকে যেন বিক্রি করতে চায় ওই জানোয়ারটার হাতে। বিনিময়ে রাজলক্ষ্মী ভাবছে তারা সুখে থাকতে পারবে। মদন দত্ত তাদের সব কেড়ে নেবে না।

ললিতার ঘুম আসেনি।

সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। রাতের বাতাস বয়, বাঁশবনে সুর ওঠে, তারাগুলো মেঘে ঢেকে আসে। বর্ষার শেষ শরতের আভাস এসেছে বাতাসে। নদীর ধারের বিস্তীর্ণ চরে কাশফুল ফুটেছে—তবু বর্ষার রেশ এখনও যায়নি।

ঘোর করে মেঘ ঢেকে আসে। বৃষ্টি নামে। ঘুম নামা গ্রামে বৃষ্টি নেমেছে।

হঠাৎ কাণ্ডটা ঘটে যায়। পরাণ ওঠবার আগেই অন্ধকারে কে তার বুকের ওপর বসে টুঁটি টিপে ধরেছে। চীৎকার করতে পারে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে, বীভৎস মুখগুলো অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো পাঁচিল টপকে ঢুকেছে— রাজলক্ষ্মী ভয়ে বিবর্ণ।

প্রমীলা এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'চোখে ওদের আতঙ্কের জমাট ছায়া। আন্নাকালী চীৎকার করে উঠতে যাবে—ওদের হাতের একটা চড়ে ছিটকে পড়েছে সে। লোকগুলো এবার ললিতার দিকে আসে।

ললিতা চমকে উঠেছে। সেই মুহূর্তে দুটো শক্ত হাত তার মুখ টিপে ধরে একটা ন্যাকড়া গুঁজে দেয় ওর মুখে। ছটফট করছে মেয়েটা। ওই অন্ধকার বৃষ্টির রাতে ওই নরপিশাচরা তাকে টেনে বের করে আনে দাওয়ায়—তুলে নিয়ে চলেছে, অসহায়ভাব দাপাচ্ছে সে। ছটফট করছে। মনে হয় দম বন্ধ হয়ে যাবে—

পিছনের পাট ক্ষেতের মধ্যে ওকে এনে ফেলেছে সেই শয়তানের দল।

ঘরের মধ্যে বন্দী পরাণ চোখের সামনে দেখে তার সামান্য সঞ্চয় আর সদ্য পাট বেচা টাকাটা রেখেছিল চালের হাঁড়ির মধ্যে ন্যাকড়ায় বাঁধা অবস্থায় ওই দানবের দল সেটাও লুট করে নিচ্ছে। তার করার কিছু নেই। বৃষ্টি নেমেছে।

ললিতার অস্ফুট গোঙানির শব্দ ওঠে, হাত পা বাঁধা, মুখটায় ন্যাকড়া গোঁজা—চীৎকার করার সাধ্য নেই। তবু সারা দেহের শক্তি দিয়ে সে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে। রাতের জমাট অন্ধকারে শন্ শন্ হাওয়া হাঁকে, ওর অর্ধনগ্ন দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটা শয়তান। ঠিক বুঝতে পারে না কে সে। বলিষ্ঠ কঠিন দুটো হাত তাকে পিষে ফেলতে চায়। কাদা ভিজে মাটিতে সে কোনোমতে গড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই শয়তানটা তার উপর দানবের শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়েছে। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা।

অসাড় হয়ে আসছে ললিতার সব চেতনা।

ভেজা ঘাস পাটের গাছগুলো গায়ে ঠেকে —তার প্রতিবাদের সব শক্তিটুকু ফুরিয়ে আসছে।

মুখ চোখ বেঁধে, কণ্ঠরোধ করে সেই দানবটা তাঁর সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে।

একটা অব্যক্ত তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে মেয়েটা............

চীৎকার করার চেষ্টা করে – কিন্তু পারে না। জমাট অন্ধকার অতলে সে হারিয়ে যাচ্ছে—তলিয়ে যাচ্ছে।

আর কিছুই তার মনে নেই।

সকালের আলো ফোটার আগেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ার পাড়ার সারাগ্রামের লোক ছুটে আসে। পরাণ স্তব্ধ নির্বাক হয়ে মাথা ঠুকছে।

রাজলক্ষ্মী চীৎকার করে - ডাকাত পড়লো কি না আমার বাড়িতে। সর্বস্ব লুটে নে গেল, আর কালামুখীকে বারবার বলেছি এমনি করে গাঁয়ে ঘুরবি না। কার মনে কি আছে কে জানে? আজ তাই এই সব্বোনাশ হয়ে গেল।

ললিতা ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে, এ কান্নার তার শেষ নেই। মুখে গায়ে মাথায় কাদা—আর সারা মুখে দুঃসহ কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছে নিষ্ঠুর একদল লোভী জানোয়ার রাতের অন্ধকারে।

পরাণের সব কিছু লুট করেছে—সে টাকা আবার আসবে কোনোদিন কিন্তু ললিতার গেছে সর্বস্ব, সেই সম্পদ আর কোনোদিনই ফিরে পাবে না সে। আজ তার সব হারিয়ে গেছে।

নশীরামও এসে পড়েছে গোলমাল শুনে। সঙ্গে এসেছে গিরীন পণ্ডিত, মনোহর মুখুটি—পাড়ার আরও অনেক মাতব্বর।

নশীরাম বলে—আহা। কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল রে পরাণ। এ্যা—বাবা কি বোকা তুই রে। নগদ এতগুলো পাট বেচা টাকা হাতে করে ঘরে এনে রাখলি আজকালকার দিনে? কি যে দিনকাল পড়েল? পুলিশে খবর-টবর দিয়েছিস্? পরাণ গুম হয়েছিল। এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে সে,

– পুলিশ কাকে ধরবে কত্তা। আমার ঘর থেকে টাকা নে গেলে তবু জানতাম। ডাকাতরা আমার সর্বস্ব লুটে নে গেছে কত্তা। কি অপরাধ করেছিল আমার ললিতা—যে তার ইজ্জতটুকুও লুট করে নেবে? ক্যানে? ক্যানে?

আর্তনাদ করে ওঠে পরাণ। নশীরামও শুনেছে কাহিনীটা। তবু বলে নশীরাম,

—সবই ভগবানের বিচার,তুই কি করবি বল? এসব ভগবানের মার।

চীৎকার করে পরাণ—ভগবান। ভগবান আর নাই। থাকলে এমনি অনাচার হলো তার পিতিকার হবে না? দোষীর সাজা হবে না?

এব কোনো প্রতিকাব হয না। ওবা আর্তকণ্ঠে চীৎকাব কবে আব ললিতা চোখেব জল ফেলে। গিবীন পণ্ডিত বলে এবাব বেশ ভাবিক্কি চালে।

—এ্যা। এই কাণ্ড কবে গেছে। তাহলে মেযেটাব সব গেছে—তোব জাতজন্মোও নিয়ে গেল ব্যাটাবা। ছিঃ ছিঃ এ যে ভীষণ অপবিত্র ব্যাপাব বে। গ্রামে, ঘবে, সমাজে আব শুচিতা কিছু বইল না।

কি যেন ঘৃণা ভবে চাইল মনোহব মুখুটি পুণ্যবাণ লোক সে। তাই বলে সে,

—চলো পণ্ডিত। এখানে আব না থাকাই ভালো। তাও মেযেকে এখন ঘবে বেখে কববি কি বে? এ্যা—

পার্বতী ভট্টাচার্য বলে, বাবু তোব মেযেব ব্যাপাব স্যাপাব ঠিক ভালো ছিল না। সেই অতুল চোবটাব সঙ্গে তো খুব মাতামাতি ছিল। হ্যাবে সেই অতুলোই ডাকাতেব দল নে কাল আসেনি তো তোকে ঘা দিতে? কে জানে বাপু।

চমকে ওঠে পবাণ। —না।

হাসছে নশীবাম—তাহলে ডাকাতদেব চিনেছিস্ বল। বাস যা এইবাব পুলিশ গে নামগুলো বলে দে বাপা। কোমবে দড়ি দে নে যাক। পাপীব শাস্তি হোক।

বাজলক্ষ্মী দাওযা থেকে ওদেব কথাগুলো শুনছে। অতুলেব নাম শুনে চমকে উঠেছে সে। কে জানে—হযতো সম্ভবই। অতুলই। অতুল দলবল তৈবি কবে এখন ডাকাতই হযেছে বোধ হয। পবাণেব দিকে চাইল সে।

বাজলক্ষ্মী বাতেব অন্ধকাবে ওই ডাকাতদেব কাউকে চিনতে পাবেনি, কিন্তু তবু একটা সন্দেহ তাব মনে বাসা বাঁধে। মনে হয ওই ললিতাও চেনাতে পাবে এখন চেপে যাচ্ছে ব্যাপাবটা। এসব অতুলেব কীর্তিই।

পবাণ নশীবামেব কথায় জানায

কাউকে চিনতে পাবিনি কত্তা। ওদেব মুখ ঢাকা ছিল কালোকাপড়ে। মুখে কপালে বং মাখা ছিল। চিনব কি কবে?

হাসে নশীবাম কে জানে বাপ। তোদেব লীলাখেলা তোবাই জানিস। নশীবাম যেন খববটা শুনে এবাব মনে মনে বেশ নিশ্চিন্ত হয ওবা চিনতে পাবে না ডাকাতদেব। নশীবাম এবাব পবেব চালটা দেবাব জন্য তৈবি হয। ললিতাব চাপা কান্নাব সুব ভেসে আসে। নশীবাম বলে—যা হবাব তা তো হয়ে গেল সমাজ ধর্ম বালও তো ভাবতে হবে কি বল চাটুয্যে?

তবে পার্বতী, মনোহব খুড়ো যা বলল সেটাও ভাববাব কথা তোব ওই নষ্টা মেয়েব ব্যাপাবে একদিন গ্রাম ষোলআনা ডেকে যা হয বিহিত কবতে হবে বাবা। পার্বতী ওই বায ঘোষণা কবে।

—কবতেই হবে। নাহলে গ্রামেব আবও মেযেদেব ববাতে কি ঘটবে কে জানে? ওকেও এব জন্য শাস্তি দিতে হবে।

পবাণেব কাটা ঘাযে নুনেব ছিটে দিতে এসেছে যাবা, পবাণ ওদের কথায বলে, —ওব দোষ কি কত্তা? হাত-মুখ বেঁধে নে গেল—আমাকেও বেঁধে ফেলল। ওব কি দোষ বলেন যে তাব উপব অবিচাবেব, অত্যাচাবেব প্রতিকাব কববেন না—তাকেই দণ্ড দেবেন? ই কি বিচাব কত্তা? ই কেমন ধাবা কথা আপনাদেব?

গ্রামেব অনেকেই এসে জুটেছে। বিন্দে ঠাকবুণও খববটা পেযে কোমব বাঁকিযে লাঠি হাতে এসে হাজিব। দেখছে বিন্দে ঠাকুবণ গ্রামেব মাতব্ববদেব।

দত্তমশায, পার্বতী ভট্টাচার্য নবেন মুখুটি যাদব ঘোষ সকলেই এসেছে।

পার্বতী ভট্টাচার্য সমাজেব মুখ বাখাব জন্যই কথাটা বলেছে। নশীবামবাবুও সায দেয তাতে। কিন্তু পবাণকে আজ ওইভাবে ওদেব মুখেব উপব রুখে উঠে কথা বলতে দেখে অনেকেই অবাক হয়।

নশীবাম দত্তও শুনেছে কথাটা। ব্যবসাযী লোক সে। এমনিতে বাগ কবলে সেটা মুখে প্রকাশ কবে না, কাজে কবে। আব পবাণেব সর্বস্ব তাব হাতেই। এবাব ওই পবাণেব জমি-জাযগাই দখল কবে নেবে।

নশীরাম চুপ করে থাকে।

বিন্দি ঠাকুরণ ফুঁসে ওঠে— কি বলছিস্ রে পরাণ। এ্যা—ছোট মুখে বড় কথা বলিসনি? দত্তমশায় চাইল ওর দিকে।

মনে মনে খুশি হয়েছে সে এই সমর্থনে। পার্বতী ভট্চায্দেরও নশীরাম বাবুকে খুশি রাখা দরকার।

পার্বতী ভট্চায্ বলে এসব কাণ্ড তো শুনি অনেকদিন আগে থেকেই চলছিল রে পরাণ। ললিতা কান্নায় ভেঙে পড়েছে ঘরে।

তবু কথাগুলো শোনে সে। আজ ওরা তাক রক্ষা করতে পারেনি, এসেছে এতবড় বিপর্যয়ের পর তার অপরাধের কৈফিয়ৎ নিতে।

অসহায় রাগে অভিমানে জ্বলে ওঠে ললিতা।

বের হয়ে এসেছে। কান্না ভেজা গলায় শুধোয় সে,

—কি আমার দোষ বলুন আপনারা? এতবড় বিপদে কেউ একটা অসহায় মেয়েকে রক্ষা করতে আসেন নি, এসেছেন আজ তার সর্বস্ব লুট হয়ে যাবার কৈফিয়ত নিতে?

পরাণ চাইল মেয়ের দিকে।

ওরা সবাই চুপ করে গেছে হঠাৎ ললিতার ওই ধ্বংসস্তূপের মতো মূর্তিটাকে দেখে। পরাণ বলে—যা মা, তুই ভিতরে যা।

বিন্দি ঠাকরুণ রুখে ওঠে—আজ একথা ক্যানে বলছিস লা?

পরাণ—মেয়েকে তো বেশ নটী করে তুলেছিলি?

পরাণ ধমকে ওঠে—যা ললিতা। ললিতা বাবার ধমকে ভিতরে গেল।

বিন্দি ঠাকরুণ ফুঁসে ওঠে—আগেও দেখেছি ওই বোবা অতলোব সঙ্গে কতো ভাব। দু'জনে এখানে ওখানে

গুজগুজ-ফুসফুস-হাসাহাসি হচ্ছে। তখন তো শাসন করিস্নি? আজ তো এমন হবেই।

নশীরাম ব্যাপারটাকে আপাতত থামাবাব জন্য বলে মহানুভবতা দেখিয়ে,

—এখন ওসব কথা ছাড়ো পিসী। যা হবাব হয়ে গেছে, গ্রামে ডাকাতি বলে কথা, এখন পুলিশে খবর দিতে হবে।

দরকার হয় ছেলেদের নিয়ে ডিফেন্স পার্টি করার কথা ভাবতে হবে, যাতে গৃহস্থ শান্তিতে থাকতে পারে।

এখন এ নিয়ে ঝামেলা করে লাভ নেই। পার্বতী ভটচায্ বলে।

—ওসব তো হবেই। কিন্তু পরাণেরও বিহিত করতে হবে দত্তমশায়।

আপনি মহাশয় লোক। ওর বিপদের কথা শুনে দৌড়ে এসেছেন। ও বলে কিনা তখন কোথায় ছিলেন?

বিন্দী ঠাকরুণ বলে,

—তোর সোমত্ত মেয়ে বেচাল করবে, আর পাহারা দেবে পাড়ার লোক। মুখে ঝ্যাটা এমন মেয়েব আমিও বলছি পার্বতী, ষোলআনা জড়ো করে এর বিচার করতে হবে। না হলে ওই মেয়ে আরও জ্বালাবে। চল সবাই।

পরাণ চুপ করে যায়।

ওরা তার এই বিপদের দিনে এসে মেয়েটার চরম সর্বনাশে এতটুকু সমবেদনা দেখায়নি। উল্টে শাসিয়ে গেলো এইভাবে। পরাণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা তাকে কি নিদারুণ দণ্ড দেবার জন্যই যেন দল বেঁধে বের হয়ে গেল।

ললিতার দুচোখে জল নামে। অভিমানে অপমানে কাঁদছে সে। আজ তার এই চরম সর্বনাশের দিনে বার বার একজনের কথা মনে পড়ে।

অতুল আজ নেই। আজ সে পাশে থাকলে তবু সান্ত্বনা পেত। কিন্তু মনে হয় যারা আজ তার সব

কেড়ে নিয়েছে তাদের চক্রান্তেই অতুলকে চরম অপবাদ নিয়ে চলে যেতে হয়েছে এখান থেকে।

আর তারপরেই ওরা আক্রমণ করেছে ললিতাকে। এতবড় অবিচারের কোনো বিচারই হবে না তা বুঝেছে ললিতা।

রাজলক্ষ্মীর সামনে আজ সব বাধাগুলো মাথা তুলছে। তার সংসারে এতবড় বিপর্যয় নেমেছে ওই সৎ মেয়েটার জন্যই। প্রমীলার বিয়ে ঠিক-ঠাক। তবু যেভাবে হোক বিয়েটা হয়ে যেত, কিন্তু পাত্রের কাকাও এসে পড়েছে সেই রাতের খবর শুনে। সমাজে সাড়া পড়েছে। তাই বলে সে,

—দাদা বৌদির মত নাই এখন বিয়েতে, তাছাড়া গেরাম ঘরে দু-চারটে কথা শুনছি। আপনার ঘরের ঠিক আব্রু পর্দা ত্যামন নাই। এ বাড়ির সঙ্গে কাজ করি কেমন করে? চমকে ওঠে পরাণ এই কথা শুনে। বলে সে,

—একটা বিপদ হয়ে গেল দাশমশায়, তা প্রমীলা আমার লক্ষ্মী মেয়ে।

দাশমশাই বলে—ওসব কথা থাক পরাণ, বিয়ে বলে কথা, জেনে-শুনে দাগী ঘরের মেয়ে বৌ করে নিয়ে গিয়ে সমাজে বিপদে পড়ব কেন বল।

রাজলক্ষ্মীর পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। চমকে উঠেছে সে কি আঘাতে।

এতবড় সর্বনাশ আসবে তা ভাবতে পারেনি। এইবার সেও বুঝেছে চারিদিক থেকে একটা সর্বনাশের কালোছায়া তাদের সংসারে জীবনের সব আলোটুকুকে গ্রাস করবে।

এর একটা বিহিত সে করবেই, রাজলক্ষ্মীও তৈরি হয়েছে।

পরাণও কদিন কাজে বের হতে পারেনি। দেখেছে ওই ললিতাকে, তার সারা মন কি বেদনায় গুমরে ওঠে। ললিতার সেই সুন্দর রূপ—সেই গান আর নেই। মূর্তিমান অভিশাপ-এর মতো পাথর হয়ে একোকোণে বসে থাকে দিনভোর।

বাইরেও যায় না, দিনরাত সে ভাবে কি সব আকাশ পাতাল। মনে হয় যেন পাগল হয়ে যাবে ললিতা?

রাজলক্ষ্মী এবার গর্জে ওঠে- এমনি করে ঘরে বসে বসে শুধু গুষ্টীর সর্বনাশই করবি তুই?

চমকে ওঠে ললিতা। অসহায় কণ্ঠে বলে, —মা। আমি কি করব।

রাজলক্ষ্মী ফুঁসে ওঠে দড়ি কলসী জোটে না? এই কালামুখ নিয়ে এখনও বেঁচে আছিস কেন? নিজের পথ নিজে দ্যাখ- রেহাই দে আমাদের? তোর জন্যই এ সংসারের সব যেতে বসেছে। মান সম্মান অন্য মেয়েগুলোর ভবিষ্য অবধি- সেটা বুঝিস না পোড়ামুখী।

পরাণও বুঝেছে সেটা।

তবু সে বাপ হয়ে অসহায় মেয়েটার জন্য দুঃখ বোধ করে। স্ত্রীর কথায় বলে সে কি বলছো ছোটবৌ? ও তোমার মেয়ের মতোই।

রাজলক্ষ্মী বলে –ঠিকই বলছি। সৎ মেয়ে। তখন থেকেই ডানা গজিয়েছিল। বার বার বলেছি ওই নাচুনী মেয়েকে সামলাও, এখন হোল তো? মুখ পুড়িয়ে কুল মজিয়ে এবার বাড়িকে বেশ্যাখানা বানিয়ে ছাড়বে। ছিঃ ছিঃ--

—মা। চমকে ওঠে ললিতা।

পরাণও বাধা দেয়—যা তা বলবে না?

রাজলক্ষ্মী বলে ওঠে– সব গেল তবু চুপ করে থাকব? ঠিক আছে– এবার আর কিছু না পারি, এ সংসার ছেড়ে আমিই চলে যাব। তোমরা থাকো বাপ মেয়েতে যা খুশি করো গে– দেখতে আসব না আমরাই চলে যাব।

ভাতের হাঁড়িটার উপর রাগ দেখিয়ে এক লাথি মেরে সব ছিটকে ফেলে পরাণ বের হয়ে গেল। গর্জাচ্ছে রাজলক্ষ্মী —মরণ।

ললিতা আজ লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে উঠেছে এখানে থাকলে এই গঞ্জনা সয়ে অন্ধকারের জীব হয়েই বাঁচতে হবে।

ললিতা জানে না কি করবে সে।

মাঝে মাঝে খিড়কির বাগানে এসে একাই দাঁড়ায়। দেখছে ললিতা, পাড়ার তার বান্ধবী রেখা, পটল, কমলা আগে আসত তাদের বাড়িতে। দুপুরে বসত ওদের তাসের আসর। ভাদু পরবরে আসরে ললিতার ছিল বিশেষ মর্যাদা। তার মতো সুন্দর গান গাইতে কেউ পারত না।

এককালে সেই ছিল ওদের প্রিয়জন।

এই একটি রাতের ঘটনা তার জীবনের সব কিছুকে বদলে দিয়েছে। আর তাস খেলতে কেউ আসে না এদের বাড়িতে। কমলা, পটলারা স্নান করতে যায়—ওকে দেখে সরে গেল।

ওদের ভাদুর আসর বসেছে, কিন্তু কেউ তাকে ডাকতেও আসেনি। ওর গানেরও কদর করে না কেউ। আজ ললিতাকে তারাও বিষাক্ত কীটের মতোই ঘৃণা করে।

ঘরে বাইরে তার জন্য জমে আছে শুধু ঘৃণা আর লাঞ্ছনাই। কোনো পথই তার নেই এখানে বাঁচার। তিলে তিলে এমনিভাবে মরতে হবে তাকে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দূর থেকে অন্য মেয়েদের আনন্দ, কোলাহল গানের সুর ভেসে আসে। ওই আনন্দের জগৎ থেকে সে আজ নির্বাসিত।

একাই ফিরছে বাড়ির দিকে, হঠাৎ মদনকে সাইকেল থেকে নামতে দেখে চাইল ললিতা। সেই রাত্রির ঘটনার পর থেকে ললিতা বাইরে বের হয়নি। মদনকে দেখছে ক'দিন পরই। মদন ওকে নির্জন পথে দেখে এগিয়ে আসে।

—এই যে। সবই শুনলাম ললিতা।

ললিতা দেখছে ছেলেটাকে। মদনের চোখে মুখে খুশি, লালসার ছাপ ফুটে উঠেছে। ললিতা সরে আসার চেষ্টা করে।

ডাকছে মদন। বলে সে,

—একটু দাঁড়াও না, এখন আর এত লজ্জা কিসের? এ্যাঁ—রাতের অন্ধকারে কোন শ্রা এসে মধু খেয়ে গেল লুটেপুটে দোষ যত আমাদের বেলাতেই।

ললিতার মুখ-চোখ রাগে অপমানে লাল হয়ে ওঠে, কি বলছ?

মদন বলে—ঠিক কথাই বলছি ললিতা, যাক্‌গে যা হবার হয়েছে। এবার আমার দিকেও একটু তাকাও। তাহলে এসো একদিন সন্ধ্যায় ফাঁকে আমার বাড়িতে। আর তো হারাবার কিছু নাই, তবে আর লজ্জা সজ্জা কেন? এ্যাঁ।

চমকে ওঠে ললিতা।

আজ বুঝেছে সে তার ভালোভাবে বাঁচারও অধিকার নেই। একটি রাত্রের সর্বনাশ তার জীবনে এনেছে কি নিঃস্বতার কালো ছায়া, অপমানের তীব্র দহন জ্বালা। ললিতা রাগে ফেটে পড়ে—যাবে তুমি?

মদন বলে—যাচ্ছি। এত রাগ করছ কেন? এসো তাহলে, দাম আমি ভালোই দেব।

চলে যাচ্ছে মদন, রাগে অপমানে দুচোখ ফেটে জল নামে।

পরাণ পথ দিয়ে ফিরছিল। কিছুদিন থেকে ওই টাকার অভাব, এতবড় ডাকাতির সর্বনাশ, নশীরামের জমি কেড়ে নেবার হুঙ্কার সব মিলিয়ে পরাণের মাথার ঠিক নেই। ললিতাকে সে ভালোবাসতো সবচেয়ে বেশি, তার জীবনের বিপর্যয় পরাণকে বিব্রত করে তুলেছে। তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কথাগুলোও ভেবেছে। ললিতার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে পরাণের ধারণাটা আজ কেমন বদলে যায়। দূরে তারার আবছা আলোয় দেখেছে পরাণ, ললিতা আর একটি ছেলেকে। ছেলের হাসি ঘনিষ্ঠ হয়ে কি কথা বলছে। এগোতে পারে না পরাণ। থমকে দাঁড়িয়েছে ওই দৃশ্যটা দেখে। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলছে। ললিতাও তাকে ঠকিয়েছে।

ছেলেটা চলে যেতেই এবার পরাণ রাগে গর্জাতে গর্জাতে এসে মেয়ের চুলের মুঠি ধরেছে। ললিতা চাইল। —বাবা!

পরাণ ওর চোখে অপমানের অশ্রুটাকে আজ দেখতে পায় না।

গর্জে ওঠে পরাণ—কার সঙ্গে রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফষ্টি-নষ্টি করছিলি মুখপুড়ি। এত কাণ্ডের পরও তোর হুঁস হয়নি। কে ওই ছোঁড়াটা?

চমকে ওঠে ললিতা তার বাবার এমনি কথা বলতে দেখে। কোনোদিনই বাবা তার সঙ্গে এসব কথা ভাববে সে স্বপ্ন দেখেনি। এত দুঃখের মধ্যে ললিতার ওই একটাই সান্ত্বনার ঠাঁই ছিল। আশ্বাস ছিল। আজ সেই বাবাকে এই কথা বলতে দেখে চমকে ওঠে ললিতা। আর্তনাদ করে সে,

—বাবা!

পরাণ রাগে, অপমানে দিশাহারা হয়ে গেছে। ঠকেছে সে এই সংসারে সকলের কাছেই। ললিতাও ঠকিয়েছে তাকে।

গর্জন করে পরাণ—কে ওটা বল। বল মুখপুড়ি—এদ্দিন কারো কথা বিশ্বাস করিনি, আজ নিজের চোখে যা দেখলাম তাতে আজ দয়া-মায়া সব ঘুচে গেছে।

ললিতা কি বলতে চায়। রাগে অপমানে ললিতা জানাতে চায়—এসব মিছে কথা বাবা!

পরাণ ফেটে পড়ে—মিছে কথা। ফের নষ্টামি – আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। চল—দেখছি তোকে। শেষ করে দেব এই পাপকে।

চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ললিতাকে বাড়ির উঠানে এনে ছিটকে ফেলে। ললিতা আছড়ে পড়ে প্রচণ্ড ধাক্কায়।

গর্জাচ্ছে পরাণ—মান সম্মান কিছুই রাখবি না, ফের ওই সব নষ্টামি।

সৎমা রাজলক্ষ্মী ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়েছে। পরাণ এতদিন ওই প্রথম পক্ষের মেয়েকে সতিাই ভালোবাসতো। রাজলক্ষ্মী সেটাকে সহ্য করতে পারত না। অনেক কথাই বলেছে ওর নামে, পরাণ বিশ্বাস করেনি। সেই পরাণকে আজ ওই মূর্তিতে দেখে রাজলক্ষ্মী মনে মনে খুশি হয়েছে। সে চায় আজ একটা হেস্ত নেস্ত করুক পরাণ। তবু রাজলক্ষ্মী ভালামানুষী দেখায়। —কি করছ? সোমত্থ মেয়ের গায়ে হাত

গর্জায় পরাণ—সরে যাও তুমি, ওই নষ্টা মেয়েকে আজ শেষ করব। নিজের চোখে যা দেখেছি তাতে সব ভুল আমার ভেঙেছে।

রাজলক্ষ্মী শুধোয়, আবার কি দেখলে ওর কাণ্ড। ওতো রোজই দেখি, আঁধারে কোথায় যায় কে জানে? ওর কীর্তির কথা পাঁচ গায়ের লোকও জেনেছে। পরাণ হাঁফাচ্ছে—শেষ করে দেব। দূর করে দেব।

রাজলক্ষ্মী ব্যাপারটাকে আপাতত থামাতে চায়। বলে সে,

—আর পাড়া মাথায় করে চেঁচাতে হবে না. ঘরের কেলেঙ্কারীর কথা আর জাহির করো না। থামো দাও।

পরাণ চুপ করে মনে মনে গজরায়।

কাঠ হয়ে গেছে ললিতা। কপালে রক্তের দাগ, সারা মন তার কি চরম অপমানের বেদনায় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। উঠে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল সে। বেশ বুঝেছে এদের বোঝানো বৃথা। এরা আজ তাকে চরম অপমানই করেছে। অবিশ্বাস ঘৃণা দিয়ে ওর জীবন বিষিয়ে দিয়েছে। এখানে আর তার কোনো ঠাঁই নেই—সেই কঠিন, নির্মম সত্যটাই সে ঘোষণা করবে এইবার।

ললিতার সব হারিয়ে গেছে। মরতেও ভয় পায় সে। সে অন্যায় কিছু করেনি। তাই এদের অন্যায়, অবিচারের প্রতিবাদই করবে অন্যভাবে।

ললিতা আজ ভাবছে নিজের কথা। পথ তার সামনে একটাই। ওই মৃত্যুই। অন্ধকার নেমেছে।

রাত্রির প্রহর গুনছে ললিতা তার উপস্থিতিই এখানে এনেছে শুধু অশান্তি আর জ্বালা। আজ সে নিজের পথই দেখে নেবে। এই কলঙ্কের দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি চায় ললিতা।

রাত্রির অন্ধকারে বের হয়ে যায় ঘর থেকে শূন্য হাতে। কোথায় যাবে জানে না—কি এক

স্বপ্নাবিষ্টের মতো ঘুম ঢাকা মাঠ জনপদের পাশ দিয়ে হারিয়ে গেল সে এই দুঃসহ অপমান আর যন্ত্রণার রাজ্য থেকে. একজনের কথা মনে পড়ে ললিতার, সে অতুল, সেও আজ এতবড় দুনিয়ার পথে কোথায় হারিয়ে গেছে তারই মতো।

অতুল সেই রাত্রে ইষ্টিশানে এসে শেষ রাতের ট্রেনে উঠে বসেছে। শেষরাতে কামরায় যাত্রীরা ঢুলছে, অতুল চলেছে। সকাল হয়ে গেছে। কোথায় যাবে জানে না —একটার পর একটা স্টেশন নামছে উঠছে যাত্রীদল। এতবড় পৃথিবী অতুল যেন এখানে হারিয়ে গেছে।

কোথায় নামবে ভাবেনি। মোটামত একজন লোক ওকে শুধোয়—কোথায় যাওয়া হবে ভায়া? কেষ্টপুরেব মেলায় নাকি?

অতুল ওর দিকে চাইল। গোলগাল, ভালোমানুষী ভাবের চেহারা। গায় একটা ধুসো চাদর জড়ানো। অতুল জানে না কোথায় কেষ্টপুর। লোকটা পকেট থেকে ন্যাপ্থা টিনের কৌটা বের করে বিড়ি নিয়ে নিজে ধরাতে গিয়ে কি ভেবে ওব হাতে একটা দেয়—নাও ভায়া।

অতুল লোকটার বিড়ি নিল। লোকটা বলে এবার ওখানে দোকান দিইছি, শাল্লা পাশদোকানীটার অসুখ, বাড়ি চলে গেল, খবর পেয়ে নিজেকেই আসতে হল চাকদহের দোকান ফেলে। বুঝলে ভায়া, ভালো লোক পাওয়া এখন ভাগ্যের কথা। আমার নাম বসন্ত --বসন্ত স্টোর্স। চাকদা নেমে নাম বললেই সবাই চেনে।

বসন্ত বিড়িটা ধরাতে যাবে। হঠাৎ চা-ওয়ালাকে সামনে দেখে বসন্ত বলে —চা খাওয়া যাক্। ওরে দে দু'ভাঁড় চা।

মনসাপুজো উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা হয় কেষ্টপুরে। এরা অনেকে চলেছে সেখানে। বসন্ত শুধোয় অতুলকে।

—ভায়ার কি ব্যবসাপত্তর আছে নাকি? কিসের দোকান দিয়েছ মেলায়।

ছিট কাপড়ের। না অন্য কিছুব?

অতুল শুনছে ওব কথাগুলো। আজ তার সামনে একটা প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে। এতদিন পরে সেই বাঁচার কথাটাই ভাবতে হচ্ছে তাকে। ওসব কিছু তার নেই।

অতুল বলে—দোকানপত্র নেই। একটা কাজকর্ম খুঁজছি। যদি ভালো লাগে থেকে যাব সেখানেই। পিছুটান কিছু নেই আমার।

বসন্ত পাত্র লোক চেনে। অতুলকে দেখছে সে। তার চোখে ভালো মানুষই বোধ হয় ছেলেটাকে। বসন্ত বিশ্বাসী সৎলোক খুঁজছে। শুধোয় সে,—থাকবে আমার ওখানে? তবে ভায়া মেলা খেলায় দোকান—যাযাবরের জীবন। পোষাবে তো? আর বেশি দিতেও পারব না।

অতুল বলে— মন্দ কি? আমারও ঘর নাই। পথে নেমেছি তাই বলে,

হাসছে বসন্ত-- ভালো কথা বলছ ভায়া। ঠিক আছে—চলো তাহলে। খোরাকী, জলপানি পাবে, আর এখন কম-সম দেব। কাজ শিখলে তখন একশো টাকা মাইনে। এখন তিন মাস ট্রেনিং থাকতে হবে, হাতখরচ পাবে তিরিশ টাকা। থাকা খাওয়া ফিরি! জলপানি আট-আনা।

দারুণ লোভনীয় প্রস্তাব। অতুল সায় দেয়—ঠিক আছে।

বসন্ত খুশি হয়—ব্যাস। চলো।

....ট্রেনটা থেমেছে পরের ইষ্টিশানে। কাতার দিয়ে লোকজন, মেলার যাত্রী নামছে। গাছ-পালা ঘেরা ছোট গ্রামের বুক চিরে ওদিকে খোয়াঢালা রাস্তা চলে গেছে, শান্ত একটি গ্রাম লোকজনের ভিড়ে ভরে উঠেছে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে।

ওদিকে নদীর বিস্তীর্ণ বালুচরের ধারে ছায়া নামে আম কাঁঠালের বাগান। উর্বরা তীরভূমি ছায়া ছায়া বিরাট গাছের আশে-পাশে মেলা বসেছে - দোকান পশার জমেছে। দূর-দূরান্তর থেকে মেলার যাত্রীরাও

আসছে, গরুর গাড়ির ভিড় জমেছে।

ওদিকে মন্দিরের সামনে প্রশস্ত চত্বর। সেখানে বিরাট সামিয়ানা টাঙানো। বসন্ত বলে যাত্রাগান, কবি গানটান হয় এখানে ক'দিন ধরে। আর দোকান পশারের পটি ওদিকেই শুরু। কেমন মেলা হে বলো দিকি?

ভিড়ও প্রচুর।

অতুল বলে—বেশ বড় মেলা দেখছি।

বসন্ত বলে—বেচা-কেনাও বেশ হয় বাবা। মা মনসার মাহাত্ম্য আছে। পেন্নাম করো মন্দিরে।

অতুল এসে ঠাঁই পেল বসন্ত পাত্রের দোকানে। টিনের বেড়া, ছাউনি করা অস্থায়ী দোকান—সামনে মজবুত টিনের ঝাঁপ—সবই পোর্টেবল। এ মেলায় দশদিন জমিয়ে বসে আবার টাটবাট খুলে নিয়ে যেতে হবে অন্যত্র। তাই এই ব্যবস্থা। তবু বেশ ফেঁদে বসেছে বসন্ত।

দোকানে একটা বাচ্চা চাকর আছে। এর ফাঁকে পিছনের চালায় তোলা উনুনে সে ভাতে ভাত না হয় কিছু করে নেয়।

বসন্ত বলে—অতুল চান খাওয়া করে একটু জিরিয়ে নাও দোকান লাগবে বৈকাল চারটে থেকে। এখন জিরোও আমি মায়ের পুজোটা দিয়ে আসি। জাগ্রত দেবী হে।

অতুল বলে—চলুন দাদা, আমিও সঙ্গে যাই। তবু দেবী দর্শনে কিছু পুণ্যি হোক্। যা বরাত। মায়ের দয়া না হলে মরে যাব।

কাল রাত্রে একফোঁটা ঘুম হয়নি অতুল মেলা ঘুরে পুজো দিয়ে এসে ভাত খেয়েই শুয়ে পড়ে। আজ মনে তার শান্তি এসেছে—তবু অযাচিতভাবেই আহার, আশ্রয় পেয়ে গেছে। শুয়েছে, কি ক্লান্তিতে দুচোখ বুজে আসে তার।

একটা সুর ওঠে।

সবুজ গাছ গাছালির বুকে ফুলে ফুলে উড়ে যায় ভ্রমরের দল, বাতাসে দুরাগত ফটিক জল পাখির দীর্ঘতান সুরে ভেসে আসে, শিরীষ ফুলের মিষ্টি সুবাসে আমন্থর সেই বাতাস।

. .বৈকাল নামছে।

মুলতানের সুর ওঠে—সামনে তার ললিতা। তার দীঘল চুল ছুঁয়ে আঁধার নামছে, আকাশের তারার প্রতিবিম্ব জাগে তার, কালো ডাগর দু'চোখের তারায়। যেন কোনো অনাবিল তৃপ্তির গহনে হারিয়ে গেছে সে আর ললিতা।

হঠাৎ বিকট শব্দে যেন ঝড় উঠেছে, উড়ছে বালির রাশ, শোঁ শোঁ গর্জন ওঠে বাতাসে, দুজনে সেই ঝড়ে কোথায় হারিয়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে অতুল—ললিতা।

ঘুমটা ভেঙে যায়। চমকে ওঠে অতুল। কি যেন স্বপ্ন দেখছিল সে।

বাইরে মেলায় কোথায় বিকট স্বরে মাইক বাজছে, কলরব ওঠে। মেলার সারা পরিবেশটা বদলে গেছে। সাজ সাজ রব পড়েছে। দোকানীরাও তৈরি হচ্ছে। লোকজন, যাত্রীদের ভিড় জমছে। মাইকে হিন্দী গানের ধমক উঠেছে। ওদিকে সার্কাসের তাবুতে ব্যান্ড বাজছে ঝপ্‌র ঝপর করে শান্ত জায়গাটায় হাজারো মানুষের কলরব ওঠে।

বসন্ত বলে—ওরে বাবা ধুনো-গঙ্গাজল দিয়ে টাট খোল। হেসাকলাইটে তেল পুরে রেডি রাখ। জয়বাবা সিদ্ধিদাতা গণেশ। অতুল ভায়া—একটু নজরে রাখবে। মাল দেখতে শুনতে এসে না হাতিয়ে নে যায় বাজে লোকে।

অতুল একাজ কখনও করেনি।

বসন্ত পাত্রের কাটা কাপড়ের ব্যবসা। ছেলেদের জামা-প্যান্ট, মেয়েদের ব্লাউজ-সায়া-সেমিজ-তোয়ালে-গেঞ্জি এ সবই বেচে। আর রকমারি স্টাইলের জামা। বাওবা সুট, সফ্‌রি, লক্ষ্ণৌ-চিকনের

পাঞ্জাবী. পায়জামা—সবই মেলে এখানে। খদ্দেরের ভিড় জমে ওঠে। অতুল মাল দেখাচ্ছে আর সহজভাবেই বলে খদ্দেরদের,

—ছেলেকে এটা মানাবে দিদি। একেবারে উত্তমকুমারের মতো লাগছে, আর মেয়েকে ফ্রকটা পরান ব্যস, দেখুন হেমামালীনির মতো লাগবে।

সব মা তাদের ছেলেমেয়েকে ওই স্বপ্নের নায়ক-নায়িকা বলেই ভাবে। তাই এইসব জামা প্যান্ট, ফ্রকই বিক্রি হচ্ছে এন্তার। বসন্ত পাত্রও অবাক হয় অতুলের কথাবার্তা শুনে। আর তেমনি চটপটে অতুল।

—মাসীমা, এটা দেখুন। দারুণ মানাবে মেয়েকে। দামও খুবই সস্তা—

ও বসন্ত দা, চারটে ফ্রক, প্যান্ট, তিনটে তোয়ালে—দামটা নাও!

বসন্ত দাম নিচ্ছে। সবদিক তার নজর। বলে—ওহে ওই পাঞ্জাবীটা দেখাও।

মেলার লোকজন কমে আসে। তখন অনেক রাত্রি, অতুল একদিকে বসে আছে, হিসাবপত্র করছে বসন্ত পাত্র। আজ সে খুব খুশি। বসন্ত ক্যাশ দেখে বলে,—বুঝলে অতুল, আজ বিক্রি ভালোই হয়েছে। সাড়ে পাঁচশো টাকা। তুমি ভায়া একদিনেই যা বোল-চাল দিতে লেগেছ, তাতে মনে হয় পাকা দোকানী হে। বেশ বেশ। লেগে থাকো, উন্নতি হবে তোমার। ব্যবসা এমন জিনিস একবার এর মধ্যে ঢুকে গেলে ব্যস—দেখবে সব জুটে যাবে। মা লক্ষ্মীর দয়া হে। ওরে পদা—ঝাঁপ বন্ধ কর।

অতুলের তবু ভালো লাগে না।

শুয়েছে খেয়ে-দেয়ে। ক্লান্তি আসে, নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে যাত্রার আসর থেকে কর্নেট ফ্লুট-এর সুর ভেসে আসে। গান চলেছে আসরে—

শীত শেষের রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে শব্দটা ওঠে।

মন্দিরের সামনে বিরাট সামিয়ানার নীচে যাত্রার আসর বসেছে। অতুল ক্লান্ত আর যেতেও মন নেই তার। ওই গান যাত্রার অভিনয় সব যেন ভুলে গেছে সে। আজ অন্য পথেই এসেছে অতুল।

পার্ট-এর শব্দ কানে আসে। চেনা পালা—এই পালা তাদের গাঁয়েও হয়েছে।

এ পালার বিবেকের পার্ট সে করেছে কয়েকবার। ধনীর চক্রান্তে কোন চাষী মেয়ে অত্যাচারে জর্জরিত, তার মুক্তির পথ নেই। ভগবানও তাকে ভুলে গেছে। ওই সুরে ওই গানের ভাষায় মনে পড়ে অতুলের ফেলে আসা সেই গ্রামের কথা। মনে পড়ে ললিতাকে—সেনকর্তার বৈঠকখানার জীর্ণ ঘরে এখন রাত্রির নিস্তব্ধতা নেমেছে, ললিতা আর সে দুজনে রিহার্সেল দিত। আজ সেসব পরিণত হয়েছে স্মৃতিতে

...ওই সুরটা তার ঘুমের মাঝে আজ বার বার কি ব্যাঘাত আনে. সারা মনে আনে দুঃসহ কি যন্ত্রণা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না অতুল, ঘুম ভাঙে সকালের আলোয়। বসন্ত পাত্র এর মধ্যে উঠে স্নান সেরে ফেলেছে। অতুল উঠেছে।

বসন্ত বলে—চা খাবে নাকি ভায়া? পদা—আজ মাছ আন। রাঁধ বেশ জমিয়ে।

বিক্রিবাটা ভালোই হয়েছে, তাই মেজাজটা ভালো বসন্তের। মাছের বরাদ্দ হয়ে গেল।

গগন গুছাইত দল নিয়ে এবার এখানের আসরে গাইতে এসেছে। যাযাবর জীবন, এখানে তিন আসর গাইবার পর তাকে যেতে হবে চকদিঘির মেলায়—ওখান থেকে তারকেশ্বরে দু'পালা গেয়ে চলে যাবে আরামবাগ. সেখানের গান-এর পরই বিষ্টুপুরে পুজোর সময় গাইতে হবে চারদিন। টাকা দেয় ওখানে ভালোই কিন্তু গান ভালো না হলে যশ হয় না। আর গাইয়েও চায় ওখানে জবরদস্ত। এখনও সেখানে গানের চর্চা আছে, গানের কলেজ আছে। সাধারণ মানুষও গান বোঝে। গোঁসাই প্রভুদের বাড়ি—ওঁদের ঘরওয়ালা গান যাত্রার আসরে আনার চেষ্টা করেছিল গগন, হঠাৎ সেই অতুলের সঙ্গে দেখা হতে তাই তাকে দলে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আসেনি সে। পুরোনো স্টাফ নিয়েই যাত্রা চালাচ্ছে।

কিন্তু তার নোতুন গাইয়ে এ্যাক্‌টার জোগাড় করার মতলবটা দলের মধ্যে কি করে চাউর হয়ে যায়। তারপর থেকেই গগন মুস্কিলে পড়েছে।

তার হিরো কাম গাইয়ে ওই শিশিরকুমারও তখন থেকেই বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে, কেউ জুটতেও দেরী হয়নি তাদের সঙ্গে।

শিশিরকুমার-এর অভিনয় নাম-ডাক হচ্ছে যাত্রার দলে। এদের হিরোইন পুতুলরানীই ইদানীং শিশিরকুমারের সঙ্গে জমে উঠেছে।

অবশ্য তাতে বিশেষ নজর দেয় না গগন। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে কাছাকাছি থাকলে এসব ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। আগেও গগনের দল ছিল, তার বাবার আমলের দল। চণ্ডীচরণ নিজের হাতে এই নিস্তারিণী অপেরা গড়েছিল তার স্ত্রীর নামে। তখন ছেলেরাই মেয়ের পার্ট করত। বেশ চলছিল দল। কিন্তু কয়েক বছর ধরেই ধারাটা বদলে গেছে। মেয়ের রোলে মেয়ে চাই। না হলে দল চলে না। মেয়ে অভিনেত্রীরা ঢুকল দলে।

ওই পুতুলকে এনেছিল গগন তাদের পাশের গ্রাম থেকে। ওদের অবস্থাও ভালো নয়, ওর মা ঝি-গিরি করে, ধান ভেঙে দিন চালায়, পুতুল তবু প্রাইমারী স্কুলে পড়তো—গান গাইতো কেষ্টযাত্রার গান শুনে শুনে। গলাটিও সুরেলা ছিল।

সেই পুতুলদাসী এখন হিরোইন হয়েছে আর শিশিরের মনের মানুষ হয়ে উঠেছে। ওই মেয়েটাই সেবার কলকাতা বেড়াতে গেছল শিশিরের সঙ্গে। সেখানে চীৎপুরের যাত্রার আসরের গদিগুলোয় ঘুরে এসেছে দুজনে, তারপরই দাম করেছিল—মাইনে বাড়াতে হবে তার। এ-টাকায় থাকবে না সে।

তাও বাড়িয়েছে গগন। কিন্তু তাতেও মন ভরেনি পুতুলের।

বলে সে--কলকাতার দলে চলে যাব। সেখানে কদর আছে। আর নামী দল—সেখানেই যাব এবার।

গগন পুতুলের জন্য ভাবে না। তার দলে এখন তিন চারজন ভালো মেয়ে অভিনেত্রী আছে। লেখা তো পুতুলের চেয়েও দেখতে ভালো, গানও দারুণ গায়। পুতুল সেটা বোঝে। লেখাকে আর দলকে সে কায়দায় ফেলতে পারবে না জানে, তাই শিশিরকুমারকেই হাত করেছে। তার মনেও এবার স্বপ্ন জাগিয়েছে পুতুল, কলকাতার কোনো দলে গেলে শিশির সেখানে 'টপ' হয়ে যাবে। নাম-যশ-মাইনে ভালো পাবে, কথাটা অতুলই বুঝিয়েছে তাকে।

শিশির তখন থেকেই সুযোগ খুঁজছে আর গগনের বিপক্ষে প্যাঁচ কসছে।

পুতুল বলে—তোমাকেও তাড়াবে ওই গগন গুছাইত, নাহলে সেই আদাড়ে গাঁয়ের গাইয়ে ছেলেটার পিছন ঘোরে এত করে।

—তাই নাকি। শিশির অবাক হয়।

ঘটনাটা ঘটেছিল ওই নশীরামবাবুর আসরে গাইতে এসে। শিশিরও দেখেছে সেই রাতে অতুলের অভিনয়।

গানও অপূর্ব গায় ছেলেটি।

গগন গুছাইত তাকেই দলে নেবার চেষ্টা করছে এমন একটা কথাও শুনেছিল শিশির। ততটা গুরুত্ব দেয়নি। আজ পুতুলের মুখে খবরের সঠিক কারণটা শুনে চটে ওঠে। পুতুল বলে,

—তাই বলছিলাম মান-ইজ্জৎ নিয়ে বরং এ দল ছেড়ে কলকাতার দলেই চাকরীর চেষ্টা করো। নাম হয়েছে।

কলকাতার গণবাণী—লোকনাট্য—সত্যম্বর সব্বাই তো তোমাকে বলেছিল।

শিশিরের মনে হয় কথাটা সত্যি। চলেই যাবে সে। যাবার আগে গগনের তলেতলে এই বেইমানির জবাব দেবে সে। একেবারে ভরা আসরে ডুব দেবে তারা দুজনে।

তবে গগন দলের মধ্যে তার অনুচরও কিছু রাখছে। এতবড় দল চালিয়ে গগন এই ব্যাপারগুলো

জানে। সেদিন গুপীনাথের কথা শুনে অবাক হয় গগন।

গুপীনাথ বলে—ওনারা দুজেনই লেঙ্গী মারবে বোধহয়। একটু সময় থাকতে হুঁসিয়ার হন কত্তা, না হলে ভত্তি গাজনে ঢাক ফাঁসাবে ওরা। যাত্রার দলে এমন হয়।

—তাই নাকি! গগন ভাবনায় পড়ে।

কাল এখানে সকালে এসেছে তারা। নায়কপক্ষ গ্রামের বাইরে নদীর ধারে ইস্কুলে তাদের বাসা দিয়েছে। যাত্রার দলের নিজেদের ঠাকুর-চাকব দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করায় গগন। রান্নার মেনুও বাঁধা থাকে।

খেতে বসেই বিভ্রাট বাধে আজ।

শিশির, পুতুলরাণী দলের টপ্। ওদের জন্য একটু স্পেশাল ব্যবস্থাই করেছে গগন। মাছ অন্যেরা পায় একপিস, ওদের জন্য দু'পিস করে, আর শিশির গাইয়ে, তার জন্য ঘি আর মাছের মাথা এ দুটো আইটেমও থাকে স্পেশাল হিসাবে।

মাছ ভালো মেলেনি আজ, তাই মাছ-এর মাথাটা বেশ বড়সড় ছিল না, ঠাকুর পাতে দিতেই শিশির চমকে ওঠে,—বাটি কই? চারটে বাটি দেবার কথা, বাটি কোথায়? আর এইটুকু মাথা?

ঠাকুর কি জবাব দিতে যায় তার আগেই টপ্ অভিনেতা শিশির মাছের ঝোলসমেত মাথাটা ছুঁড়ে মেরেছে ঠাকুরের মুখে—সেটা রিবাউন্ড করে পড়েছে ঝোলের বাটিতে।

তারপরেই কাণ্ডটা বেধে যায়।

চীৎকার করে ওঠে ঠাকুর, হাতের বালতির ঝোল, মাছ মেজেময় গড়াচ্ছে। ঠাকুব বলে—আব এ কাম্ করবো নাই। থাকলো তুমার হাতা খুন্তি আমি চললাম গুছাইত মশায়। ই শালা কাজে নাই।

দৌড়ে আসে গগন গুছাইত, দলের অনেকেই। একটা চেঁচামেচি শুরু হয়।

দলে বৃকদার, ঘটোৎকচ পার্ট করে মতিরাম পাঠক। মতিরাম-এর বিশাল চেহারা দেহের মতোই বুদ্ধিটাও মোটা।

লোকটা সাতে-পাঁচে থাকে না।

খায় দায়—পার্ট করে হুঙ্কার ছেড়ে। এমনিতে নিরীহ গোছের।

সেও দেখেছে ওই শিশির আর পুতুলের কাণ্ডগুলো, এতদিন কিছুই বলেনি। ওরা দলের লোকেদেরও যা তা বলে। আজ ওইভাবে খাবার নষ্ট করে ঠাকুবকে মারতে দেখে মতিরাম গর্জে ওঠে—এসব কি করছ শিশির? ওকে এভাবে হেনস্থা করবে কেন? মারবে তুচ্ছ কারণে? ওকি করবে?

শিশিরও রুখে জবাব দেয়,

—বেশ করেছি।

—মানে। যা ইচ্ছে তাই করবে? এত লোকের খাওয়া নষ্ট করবে। তুমি লাটসাহেব?

শিশির উঠে এসে মতিরামকে মারতেই যাবে—মতিরাম ওর হাতটা ধরে গর্জে ওঠে,

তোমার নাটক ছুটিয়ে দেব শিশির। কীচকবধ করে দেব।

পুতুলও চীৎকার করে—এইভাবে অপমান করবে, গায়ে হাত তুলবে? কলরব ওঠে। গগন গুছাইত এসে পড়ে একে ওকে ধরে কোনোরকমে মারামারিটা থামালো। দলের সকলেই জুটে গেছে। কেউ দাবী জানায়—

—শিশিরবাবুকে মাপ চাইতে হবে ঠাকুরের কাছে। এসব বাড়াবাড়ি চলবে না ওর ওখানে।

শিশিরের আত্মসম্মান ঘা দিতে সেও জলে ওঠে। বেশ সগর্বেই প্রতিবাদ করে সে—নেভার। দরকার হয় দলই ছেড়ে দেব। এই ছোটলোকের দলে কাজ করব না। শিশিরকুমারের মান-সম্মান আছে।

সেও খাবার ফেলে চটিটা গলিয়ে হন্‌হন্ করে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। পুতুলও রাগে দিশাহারা হয়ে উঠে পড়েছে। সেও বের হয়ে গেল ওর পিছু পিছু।

গগন বিপদে পড়ে—কি বাধালি বল দিকি মতি? সন্ধ্যায় গান, আর দুপুরে এই কাণ্ড। ওরে

বাবা—গান না হলে দলশুদ্ধ সব্বাইকে ঘিরে ধরে ঠ্যাঙাবে, মালপত্র সব কেড়ে নেবে। এখন করি কি বল দিকি? গ্রামে মারা পড়ব এইবার?

গোঁয়ার মতিলাল বলে—ওকে দলে আনলে আমি থাকছি না। ওই দুটোকে নে দল চালাও।

পবন, রামকান্ত, শুধাময়, অলকা, লেখা এবং ইলাও বলে,

আমরাও নাই। দিনরাত যা তা বলে, সহ্য করে আসছি এতদিন। ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না আমাদের। যেতে দাও ওদের।

—অন্য পালাই গাইব আজ। মতিলাল বলে।

গগন পড়েছে বিপদে। সারা দল দুই শিবিরে বিভক্ত।

দিশেহারা হয়ে গেছে সে। আজকের পালা 'কাজল লতা', কাজল করে শিশির। আর গান মন্দ গায় না। ওই পার্ট করার মতো দলে আর কেউ নেই, বারবার মনে পড়ে সেই গাঁয়ের আসরে সখের যাত্রার দলের অতুলের কথা। নেহাৎ দূরের পথ—না হলে আজই লোক পাঠিয়ে তাকে ধরে এনে আসরে নামিয়ে দিত গগন গুছাইত। একজন-দুজন শয়তানির জন্য দলকে বিপন্ন করত না। গগন জানে, শিশির, পুতুল দলে থাকবে না। সামনের মরসুমেই চলে যাবে যুগলে। এদের সকলকে তার চাই। বারবার অতুলের কথা মনে পড়ে। তাকে পেলে আজ গগন শিশিরের মুখে ঝামা ঘসে দিত।

কিন্তু সে উপায়ও নেই।

শিশির সেটা ভালোই জানে।

তাই খাওয়া-দাওয়া ফেলে রেখে এসে গুম্ হয়ে নিজের ঘরে ঢুকেছে।

পুতুলরাণীও তারপরই এসে হাজির হয়।

গজ গজ করছে সে—মান সম্মান দিতে জানে না যে দল, সে শ্লা দলে আমি নাই শিশিরবাবু। কদ্দিন ধরে তোমাকে বলেছি চলো—এখান থেকে। না হলে অপমান হবে, তখন কথা কানে তোলোনি। আজ কথাটা ফলল তো? ওরা . দলের লোক দে গায়ে হাত তোলাবে। ওই শ্লা গগন গুছাইতের-ই প্যাঁচ এসব।

কথাটা ভাবছে শিশির। বলে সে—তাই এ দলে আর কাজ করব না পুতুল। আজই চলে যাব। তুইও যাবি তো?

পুতুল ডাগর চোখে মাখো মাখো খুশির চাহনি এনে বলে,

—যাইবী। যাবে তো কলকাতায়? তোমার সঙ্গেই তো তাই ভাবছি গো বাবু।

এমন সময় ঝড়ো কাকের মতো উস্কোখুস্কো অবস্থায় গগনকে ঢুকতে দেখে চাইল শিশির। পুতুলের চোখেও সেই মাখো মাখো চাহনি মুছে গিয়ে জ্বালা ভরা চাহনি ফুটে ওঠে। গগন বলে,

—শিশিরবাবু, তুচ্ছ কারণে এমন রাগারাগি করতে নাই, দলে এমন টুকটাক কাণ্ড ঘটে থাকে। চলুন-মুরগীর মাংস আনিয়েছি খেয়ে নেবেন। চলো মা লক্ষ্মী।

ফুঁসে ওঠে মা লক্ষ্মীরাণী পুতুল—না। জুতো মেরে গরুদান নাইবা করলেন অধিকারী মশায়।

শিশির শোনায়—এ দলে আর নাই আমরা। আজই নোটিশ দিলাম।

গগন চমকে ওঠে—সে কি। এখন কাকে কোথায় পাই বলেন? দলশুদ্ধ সবাই বিপদে পড়ব। আজ এখানের পালাটা উদ্ধার করে দ্যান শিশিরবাবু।

শিশির গর্জে ওঠে—নেভার। হাতিকা দাঁত মরদকা বাত। ও বের হলে আর ফেরে না মশাই। শিশিরকুমার এ দলে আর কাজ করবে না। আমার পাওনা মিটিয়ে দেন—চলে যাব। আজকার গান-ফান আপনি সামলাবেন।

পুতুল বলে—ঠিক কথা।

গগন আর্তনাদ করে—কি হবে শিশিরবাবু।

শিশির বলে—জানি না। বলেছি এ দলে কাজ করব না। নো কানেকশন। ব্যস। যান তো মশাই।

মদের বোতলটা নিয়ে বসে। গগন কাঁপতে কাঁপতে বের হয়ে এল।

বাইরের বারান্দায় দলের মতিলাল, গণেশ—আরও অনেকে যায় লেখা, ইলা, দু'এক মহিলা শিল্পীও ভিড় করেছে। তারাও বুঝেছে বিপদের গুরুত্বটা।

এমন কাণ্ড মাঝে মাঝে বাধে, আসরে হাজার হাজার লোক জমেছে—হঠাৎ দল সময় মতো এলো না, না হয় দলের টপ হিরো-হিরোইন কোথায় আটকে গেছে, আসতে পারেনি। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অধৈর্য যাত্রারসিক দর্শককুল দানবকুলে পরিণত হয়ে আসর তছনছ করে দেয়, সাঁঝের রাত্রি—যন্ত্রপাতি লুটপাট হয়, বাকী অভিনেতা অভিনেত্রীও প্রাণ ভয়ে এদিক ওদিক দৌড়ে জান বাঁচায়। সেইরকম একটা বিপদের মুখে আজ এদের সবাইকে ফেলেছে ওই শিশিরকুমার।

গণেশ শুধোয় গগনকে বের হয়ে আসতে দেখে,

—কি বলল অধিকারী মশাই?

গগন হতাশা ভরে মাথা নাড়ে—এ দলে আর নামবে না সে।

মেয়েদের কে ভীত কণ্ঠে শুধোয়,

—কি হবে তাহলে?

কথাটা ভাবছে গগনও।

মনে হয় কর্মকর্তাদের সময় থাকতে জানানো ভালো। আর জানাতে হবে কথাটা অন্যভাবে। শিশিরবাবুর জন্যই ভাবনা। পুতুলের পার্ট অন্য মেয়ে ভালই করবে। ওদের জানাতে হবে শিশিরবাবুর শরীর খারাপ, আজ নামতে পারবেন না। আজ রাতে তাদের পালা হবে 'পণরক্ষা'। তাতে শিশিরের তেমন ভূমিকা নেই। আর দলের পরিচালক ভূণিকে পাঠাবে এক্ষুণি অতুলের সন্ধানে। আজকের রাত্রিটা ঠেকাতে পারলে কাল বেলা দশটা নাগাদ ভূণি মল্লিক রূপজগৎ থেকে সেই অতুলকে তুলে আনবে। ওরা বুক ঠুকে শিশিরকে চ্যালেঞ্জ করে 'কাজল লতা' নামাবে।

মতিলাল বলে—তাই করো অধিকারী মশাই। অতুলকে পেলে ওই শিশিরের পোদে লাথি মেরে তাড়াবে। আজকের রাতটা 'পণরক্ষা' ই হবে বলে এসো। আগে এনাউন্স করে দিক।

গগন চলেছে মেলার সদর অফিসের দিকে। কথাটা এইবেলা জানানো নিরাপদ। ওদেরও দোষ থাকবে না। আর ভূণিকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। ওখান থেকেই ভূণিকে রওনা করিয়ে দেবে, আজ রাত্রে রওনা হলে কাল ভোরে রূপজগৎ পৌঁছবে—অতুলকে গিয়ে সোজা ট্যাক্সিতে করে এখানে ফিরে আসবে বেলা দশটা নাগাদ। চলছে গগন—মেলায় তখন লোকজন বিশেষ নেই।

গগন হঠাৎ ওদিকে একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চে কাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। ঠিক ঠাওর করতে পারে এবার। ওকে এই মেলায় চায়ের দোকানে দেখবে ভাবতে পারেনি সে। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। ভূণিও বলে—ওই তো কত্তা। সেই রাতের ছেলেটা গো।

গগন তখন দৌড়চ্ছে ওর দিকে। গগন গুছাইত এবার হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে অতুলকে ধরেছে।

—আরে অতুল না? এখানে? চিনতে পারছ বাবা। সেই যাত্রার আসরে দেখা।

অতুল দুপুরে একটু এদিক ওদিক ঘুরে দোকানে ফেরার আগে চায়ের দোকানে বসেছে। এমন সময় এসে তাকে ধরেছে গগনবাবু। হাঁপাচ্ছে গগন গুছাইত।

অতুল চিনতে পারে—অধিকারী মশায় না? ভালো আছেন? তা এখানে শুনলাম আপনার দলের গান হচ্ছে।

গগন বলে—তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মা মনসার ইচ্ছায়। খুব জাগ্রত দেবী। তোমাকেই খুঁজছিলাম হে; মা কর্ণে শুনে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। চলো—জরুরি কথা আছে।

একরকমে টেনেই নিয়ে গেল গগন তাকে নদীর ধারে গাছের ছায়াময় একটা জায়গায়। বলে, -বাসায় বড্ড গোলমাল, কথাটা এখানেই বলি। বড্ড বিপদে পড়েছি ভায়া —দলের মানইজ্জৎ সব

যেতে বসেছে। তুমিই বাঁচাতে পারো বাবা।

গগন তার বিপদের কথাটা জানায় অকপটে, জানায় ওই শিশির আর পুতুলেব ব্যবহারের কথা। অসহায়ের মতো বলে গগন আর্তকণ্ঠে,

—তুমিই আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পাবো ভায়া। উদ্ধার করো। আজই 'কাজললতা' বই-এ নেমে পড়ো—ব্যস। না হলে ধনে-প্রাণে মারা যাব।

অতুল ভাবছে কথাটা।

ওই কাপড়ের দোকানে কাজ করে সে জীবন কাটাতে পারবে না। এভাবে কাটার জন্য পথে বের হয়নি সে। একটা প্রতিজ্ঞা আর জ্বালা নিয়েই বের হয়েছিল সব হারিযে।

ওই লোকগুলোর মিথ্যা অপমানের জবাব তাকে দিতেই হবে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে সে, প্রমাণ করবে তার যোগ্যতা। গান গাইবে সে। সামনেব সেই গান আর যাত্রাব আহ্বান। সে ধাপে ধাপে উঠবে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে তার নাম-যশ। ললিতার কথা মনে পড়ে। একদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অতুল তাকে কাছে আনবে। সেদিন কোনো বাধাই থাকবে না। ওকে ভাবতে দেখে গগন গুছাইত বলে,

—চারশো না হয পুরোপুরি পাঁচশো টাকাই মাইনে দেব, অতুল আজ মুখ রাখতে পারো তুমি, কেনা হয়ে থাকব তোমার। ওই পাঁচশো টাকাই দেব বাবা।

অতুল কথাটা ভাবতে পারে না।

তার সামনে আজ ভাগ্য যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। তবু বসন্ত পাত্রের কথা মনে পড়ে। সে দযা করে তাকে আশ্রয দিয়েছে, আজ তাকে না বলে আসা যাবে না।

—কি ভাবছ ভাযা। গগন ছটফট করছে।

অতুল বলে, একবাব আমার মালিককে বলতে হবে অধিকারী মশাই।

গগন বলে—তাব দল থেকে ছাডবে কেন হে তোমাকে বাপধন। কেউ ছাড়ে?

হাসে অতুল—আজ্ঞে তাব যাত্রাব দল নাই কাপডেব দোকান আছে এই মেলাতেই। ওখানেই কাজ করছি।

—এ্যাঁ। কাপডের দোকানে কাজ করছ? তবু যাত্রার দলে আসোনি?

গগন বলে ওঠে—তাজ্জব লোক তুমি। চলো দেখি তোমাব মালিককে।

বসন্ত পাত্র সব শুনে অবাক হয়।

অতুল যে এতবড গুণী লোক—তাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে টানাটানি করছে দলে নেবাব জন্য এটা ভাবতেই পারে না সে।

বসন্ত বলে—এ্যাঁ। ওহে অতুল—তুমি শিল্পী। আগে তো বলোনি।

যাকগে—আমার যা হয হবে। তুমি যাও ভায়া, ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন। আর এসব কাজ তোমাকে মানায় না। তা খেযে যাও।

—অতুলকে তুলে নিযে আসে ছোঁ মেরে। বলে সে,

ওখানেই খাওয়া-দাওয়া হবে। রাত্রিতে পালা। এখন থেকে গড়াপেটা একটু করে নিতে হবে। এতগুলো গান অবশ্য ভায়ার সব তোলা আছে তবু যন্ত্রীদের সঙ্গে রিহার্সাল চাই তো। চলো--

যাত্রার দলের বাসায় স্তব্ধতা নেমেছে। গগন, ভূপিকের কি হবে কে জানে। ওরা গর্জাচ্ছে শিশিরেব উপরই। মেয়েরাও ভয়ে চুপ করে গেছে। এমন সময় গগনকে খোদ অতুলের হাত ধরে ঢুকতে দেখে অবাক হয় তারা।

গগন গুছাইত যে একদিনের মধ্যে এই মেলাতে এমন কাণ্ড বাধাবে তা ভাবতে পারেনি। একেবারে নোতুন কাকে ধরে এনে মহড়া শুরু করেছে আর গাইছেও তেমন অতুল।

সুরলা দরাজ ভরাটি গলা—সব পর্দাগুলো ফুটে ওঠে। তেমনি অভিনয়।

চেহারাটিও সুন্দর। চোখে পড়ে।

মতিরামই খুশি হয়েছে সবথেকে বেশি। দলের সকলেই অবাক হয়। মতিরাম বলে,

এ তোমার নতি দানব ওই শিশিরের চেয়ে অনেক ভালো গাইয়ে এ্যাকটর গগনবাবু, দারুণ জমবে। মানাবেও অপূর্ব। সাবাস।

অলকা প্রমোশন পেয়েছে আজ নায়িকার ভূমিকায়। পুতুলকে টেক্কা দেবার জন্যই উঠে পড়ে লেগেছে সে। দলের সকলেই অবাক হয়ে গেছে। এ একটা সাংঘাতিক কাণ্ড বাধিয়েছে গগন গুছাইত রাতারাতি।

খবরটা পৌঁছে গেছে শিশিরের কাছেও। পুতুলই কথাটা শুনে দেখে গেছে।

শিশির ভেবেছিল এবার নিস্তারিণী অপেরাকে দয়ে মজিয়ে দিয়ে সে মজা দেখবে। এসে ঘরে শুয়ে আছে শিশির। ওদিকে দলের অন্য লোকদের মুখে আষাঢ়ের ছায়া নেমেছে।

হঠাৎ পুতুল এসে ঘরে ঢুকে বেশ উত্তেজিতভাবেই খবরটা দেয়।

—ওদিকে গগন গুছাইত-এর কাণ্ড দেখেছ বাবু।

- কি হল? শিশির উঠে বসে।

বলে ওঠে পুতুল। গগন কোত্থেকে একজন নোতুন অভিনেতা ধরে এনে মহড়া দিচ্ছে। মতিলাল অলকরা—ও নাকি তোমাকেও টেক্কা দেবে ওই রোলে।

চুপ করে কি ভাবছে শিশির। নিজের সম্বন্ধে তার ধারণাটা অনেক বড়। বলে সে নিস্পৃহ কণ্ঠে—

ছাড়ো তো। কি কেলেঙ্কারি হয় আজ রাতে দেখবে। পাল চাপা দিয়ে সাজের বাক্স কেড়ে নিয়ে ঠেঙিয়ে হাড় না ভাঙে এদের। ঢের দেখা আছে।

পুতুল বলে—কে জানে বাপু। তার চেয়ে যা হবার হয়েছে মিটিয়ে নাও এই বেলা। মানে এখনই কলকাতায় গিয়ে আর কোনো দলে কাজ মিলবে?

শিশির ওকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দেয়।

-মজাটাই দ্যাখো না পুতুল।

এবার শিশিরও মিটমাট করতে রাজী। তাই বলে সে,

গগন এসে হাতেপায়ে ধরতে পথ পাবে না। গ্যাট হয়ে বসে থাকো।

সারা মেলায় খবরটা ছড়িয়ে গেছে যে যাত্রার দলের টপ অভিনেতা নাকি নামছে না আজ। ওর সঙ্গে মালিকের ঝগড়ার খবরটাও অতিরঞ্জিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মেলায়। খবরটা শুনে নায়কপক্ষ, মেলা কমিটির সেক্রেটারী ছুটে আসে ব্যস্ত হয়ে।

গগন তখন একটু নিশ্চিন্ত মনে এসে তার ডেরায় বসেছে, এতকাল যাত্রার দল চালিয়ে সে শিল্পী চেনে। নিশ্চিন্ত হয়েছে সে দারুণ গানই হবে। বুকে বল পেয়েছে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নায়কপক্ষকে ঢুকতে দেখে গগন চাইল।

ভদ্রলোক বলে,

—কি সব শুনছি অধিকারী মশাই। যাত্রার আসরে নাকি শিশিরবাবু নামছেন না আজ!

গগন চাইল ওর দিকে। ফুরসী টানতে টানতে মেজাজ নিয়ে জানায় —এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন মশাই? যাত্রা গাইবে আমার দল—ভালো না লাগলে ফুরণ দেবেন না। গোলমাল করে দর্শকরা, তারা আমার ছাল তুলবে। আপনাদের কি?

ওরে চা দে বাবুকে। বসুন বসুন। কোনো ভয় নেই। গগন গুছাইত এ্যদ্দিন যাত্রা গাইছে। আজ দেখবেন ক্যামন গান হয়, ভালো হলে কিন্তু বকশিস দিতে হবে মশায়।

ভদ্রলোক গগনের কথাগুলো যেন তবু ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। কোনোরকমে জানায়—দেখবেন মশায় যেন মান ইজ্জত থাকে আসরের।

অতুলও বুঝেছে ব্যাপারটা। এ তার একটা কঠিন পরীক্ষা। আর এর উপরই নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ—সবকিছু এই পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। আজ ললিতার কথা মনে পড়ে—তার দিকে সাগ্রহে সে চেয়ে থাকত আসরে।

আজও মনের অতলে জেগে আছে তার সেই চাহনি—সেই নীরব ব্যাকুল অনুভূতিটুকু। এই তার সম্বল।

চুপ করে বসে আছে অতুল। ভাবছে তার চরিত্রটা। নোতুন রূপ দিতে হবে—গাইতে হবে তাকে প্রাণ ঢেলে। প্রাণবন্ত অভিনয় করতে হবে।

সাজঘরে ব্যস্ততা চলেছে। অতুলের মেক-আপ হয়ে গেছে। সামনে গগনকে দেখে হেঁট হয়ে প্রণাম করে সে।

আজ ওই তার জীবনে সেই চরম সুযোগ এনে দিয়েছে। আর অতুল ওর আশীর্বাদ চায় সারা মন দিয়ে এই পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। গুরু গুরু, কনসার্ট বাজছে ঢোলের শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাসে। গগন উচ্ছ্বসিত অতুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—জয় রামকৃষ্ণের, কোনো ভয় নেই রে।

ঠাকুরের নাম করে আসরে নেমে যা, প্রথম গানখানা জমিয়ে ধরবি, ব্যস। আর পার্ট—এগিয়ে গিয়ে শুধু চেঁচিয়ে বলে যাবি। জয় রামকৃষ্ণ।

ও রামকৃষ্ণ দেবের খুব ভক্ত, পকেটে ঠাকুরের একটা ছবিও থাকে সব সময় সেটা বের করে কপালে ঠেকিয়ে দেয় অতুল।

কনসার্ট শেষ হয়ে আসছে। ঢোলের গুরু গুরু শব্দে যেন বুক কাঁপছে অতুলের। তবু নিজেকে মনে মনে তৈরি করে নিয়েছে। ললিতার দু'চোখ যেন আজও তার দিকে আশা ভরে চেয়ে আছে। অতুলের অন্ধকার জীবনে কি আশ্বাস আনে উজ্জ্বল একটি আলোর বিন্দুর মতো।

শিশিরও এসেছে আসরের একদিকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। জনতার মধ্যেও খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে, তারা অনেকেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে শিশিরকে দেখে।

কে বলে—গান খারাপ হলেই মেরে খতম করে দেবো ব্যাটার।

ওদিক থেকে একজন শোনায় শিশিরকুমারের বদলি কে নামে দেখি গড়বড় করলে স্রেফ পাল চাপা দিয়ে রাখব। রেডি থাকিস নরে।

নরেও আওয়াজ দেয় ঠিক আছে গুরু যাত্রার হাল যা তা করে দেব।

হঠাৎ গুঞ্জন কলরব ছাপিয়ে সুর ওঠে মিষ্টি সুরেলা একটি কণ্ঠস্বর, একেবারে পঞ্চমে উঠেছে। তীব্র সা থেকে পা অবধি সুরটা খেলছে অবলীলাক্রমে। কলরব যাদুমন্ত্রে থেমে যায়। স্তব্ধতা নামে আসরে।

—সাবাস ভাই কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানায়।

কয়েক মিনিট মাত্র, সারা আসর স্তব্ধ হয়ে যায় ওর সুরে। গানটা বাতাসে যেন ছড়িয়ে যায়।

অতুল আসর জয় করে নিয়েছে। তেমনি চেহারা - পার্টও করছে ভালো। এত দর্শকের মন থেকে শিশিরের কথা একেবারে মুছে গেছে। ওরা খুশি। কে বলে,

এর গান অনেক ভালো হে, সাধা ওস্তাদী গলা। শিশির ফিশির এর ধারে কাছে আসে না। আর শিশিরের মতো গম মেরে এ্যাকটিং করে না, ফ্রি এ্যাকটিং, স্টেজ ফ্রি দেখছ।

কথাটা শিশির নিজের কানেই শোনে। চাদর মুড়ি দিয়ে ভিড়ে সেও দাঁড়িয়েছিল। সকলের চোখ মঞ্চের নোতুন অভিনেতার দিকে। বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে আজ তারা নোতুন এক শিল্পীর অভিনয় দেখছে, গান শুনছে। ও তাদের মন ভরিয়ে দিয়েছে সুরে সুরে, অভিনয়ে। পুরানো সাবেকি ধরনের অভিনেতা শিশিরকে আজ এক রাতেই তারা ভুলে গেছে। জেগে উঠেছে নোতুন এক শিল্পী।

শিশির চমকে ওঠে তার সর্বনাশে। শিশির সেখানে তুচ্ছ হয়ে গেছে, একরাতেই শিশিরকে এরা ভুলে গেছে, বাতিল করে দিয়েছে নির্মমভাবে বর্তমান দর্শকদল।

হাততালি দিয়ে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছে নোতুন অভিনেতাকে ওই অতুলকে। শিশির বের হয়ে

এল। মুখখানা তার বিবর্ণ হয়ে ওঠে রাগে-লজ্জায় অপমানে। আজ তার ভুল সে বুঝেছে কিন্তু করার কিছু আর নেই। তার দাম পরিণত হয়েছে কানাকড়িতে।

গগন গুছাইত সাজঘরের মুখে দাঁড়িয়েছিল, কাঁপছে তার বুক। অতুল যদি প্রথম দিনেই ধ্যড়ায় তারও দফা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই অতুল রাজ্য জয় করে ফিরছে। তখনও হাতাতালির শব্দ ওঠে। দুরু দুরু বুকে ফিরছে অতুল, গগন ওকে জড়িয়ে ধরে।

জয় ঠাকুর। দেখলি অত্‌লো ঠাকুর দয়াময় সে। ব্যাস—এবার চালিয়ে যা বাবা।

মতিলাল খুশি হয়—কি অধিকারী মশায়, দেখলে তো এ সম্মার কথা মিথ্যে হয় না। চালিয়ে যাও ভায়া। শ্লা শিশির লাগে কোনখানে? আর্টিস। চারটে বাটি চাই—লে শালা, বাটি-গেলাস এখন ইয়েতে ঢুকে যাবে। ভাঁটি?

গান শেষ হয় বিরাট একটা জয়ের মধ্যে দিয়ে। পরের দিন পালাও ঘোষিত হয়। নায়কপক্ষও খুশি। আজকের গানের মতো গান বহুকাল হয়নি এখানে। নায়কপক্ষ খুশি হয়ে দুটো মেডেলও দিয়েছে, আর অতুলকে বকশিস্ করে একান্ন টাকা নগদ।

ছুটে আসে বসন্ত পাত্র। মুখে পান—মোটা দেহ নিয়ে এসে অতুলকে জড়িয়ে ধরে বলে দোকানদার বসন্ত পাত্র,

—এ্যা এ যে বুকুড়ির ভেতর খাসা রামশাল চালরে। বন্ন চোরা আম, তুই এসেছিস কাটা কাপড়ের দোকানে কাজ করতে। নির্ঘাত বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলি?

হাসে অতুল— না দাদা। বাড়িঘর আমার নাই। পথেই বের হয়েছিলাম, তুমি ঠাঁই দিলেছিলে সেদিন দয়া করে।

বসন্ত পাত্র বলে—আগুনকে চেপে রাখা যায় না ভায়া, ফুঁড়ে বেরুবেই।

শিশির, পুতুল দু'জনের মাথাতেই আকাশ ভেঙে পড়েছে। ওরা বুঝেছে এখানের পালা শেষ হয়ে গেল তাদের। এরপর থাকার কোনো মুখ নেই।

পুতুলও চুপ করে আছে। ক্ষতি তারও হয়েছে। দুজনেই আজ একরাতের মধ্যে খ্যাতির আসন থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে নেমেছে। পুতুল বলে,

—ট্যাকা মিটিয়ে নে চল বাবু, এখানে আর কি?

কথাটা ভেবেছে শিশিরও।

গগন খুশিভরে বাসায় ফিরে এসেছে। ওদের দিনভর ধকল গেছে।

আজ রাতে খাওয়াতে হবে ভালো করে। ঠাকুর খুশি হয়ে রাঁধছে। তার মান-ইজ্জত রেখেছে অন্য বাবুরা। গগন ব্যস্ত হয়ে বলে—একটু চা কর, ওরা এসে পড়বে। হঠাৎ শিশির আর পুতুলকে আসতে দেখে কঠিন চাহনিতে গগন ওদের দিকে চাইল।

গগন এবার ওদের হাতে পেয়েছে। টাকা আগাম দাদন যা দেওয়া আছে সেটার কথাও ভাবছে সে। শিশির বলে,

—আমাদের এ মাসের টাকাটা মিটিয়ে দেন গগনবাবু।

—টাকা।

গগন এবার ফেটে পড়ে। বলে সে—আগে দু'জনের দাদনের টাকা মিটিয়ে দ্যান—সে টাকার কথা না তুলে বলছেন মাইনের কথা? জানেন বেডিং স্যুটকেশ আটকে রাখতে পারি? দলকে আজ পথে বসালেন, আবাব টাকা দেব শিশিরবাবু।

শিশির চুপ করে থাকে।

আইনত তারাই বেশি টাকা নিয়ে বসে আছে। গগন তবু বলে,

—যাক্ গে—নিন দু'শো টাকা রাহা খরচা। দয়া করে এবার যান।

নমস্কার!

যাত্রার দলবল আসর থেকে ফিরছে। দেখা যায় আবছা আঁধারে একটা সাইকেল রিক্সায় মালপত্র তুলে বের হয়ে যাচ্ছে শিশির আর পুতুল।

ওদের ওই কথা ভাবার সময় নেই।

গুপীনাথ বলে—মুখ রেখেছ অতুল। আহা! জীতা রহো ভায়া।

অতুল ওই শিশিরের ঘরেই ঠাঁই পেয়েছে।

খেতে বসেছে সকলে। যাত্রার দলের রীতি-কানুন কিছু আছে। এক নম্বর সাজের বাক্স পাবে টপ অভিনেতা, একলা ঘর পাবে সে, আর খাবার জায়গাও হবে তার আলাদা। বিশেষ ব্যবস্থা কিছু থাকে। চাকরও থাকে আলাদা।

সেই ভাবেই অতুলের বসার জায়গা হয়েছে। অন্য সকলের থালা, বাটি, গেলাস নেই। শিশিরের জন্য ব্যবস্থা থাকে আসন, চারটে বাটি-গ্লাস, লেবু, পেঁয়াজ—পাতে ঘি, মাছের মাথা আর দু'পিস মাছ।

অতুল খেতে বসে চমকে ওঠে—এসব কি অধিকারী মশাই, শ্লা জামাই এসেছি নাকি গো? এমনি করে আমাকে খাওয়াচ্ছ!

ওদের পাতের দিকে চেয়ে বলে অতুল,

—ভ্যালা খাতির। এ্যা– হঠাও এসব। অতুল ওই বাটি-আসন ছেড়ে মাছের মুড়ো, ঘি ফেলে রেখে বলে,

ওইখানে একসঙ্গে খাবার দিও ঠাকুর, ওসব বাটিফাটি—মাছের মুড়ো দেবে না। ঘি খেলে রোয়া উঠে যাবে। ঘি সইবে না মাইরী। এইখানেই বসলাম, মতিদার পাশে। দলের সকলেই খেতে বসেছে টানা বারান্দায়। গগনও রয়েছে ওদিকে। হঠাৎ অতুলের ওই কাণ্ড দেখে সকলেই অবাক হয়। যাত্রার দলের এতদিনের নিয়ম এটা। শিশিরও ভাগ করেছে, এবার তাই নিয়েই ঝগড়া। কিন্তু সব বদলে দিয়েছে অতুল।

সে এদের সঙ্গে একভাবে খেতে বসে মতিলালের পাশে। গগন গুছাইতও অবাক হয়। কি বলাতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু থামিয়ে দেয় অতুল,

ঠিক আছে অধিকারী মশায়। এ নিয়ে আপনার ভাবনা কিছুই নেই। বেশ তো খাচ্ছি।

এতদিনের মধ্যেই অতুল এদের আপনজন হয়ে গেছে। এই যাত্রার দলের মধ্যে মনগড়া ব্যবধানটাও মুছে দিয়ে সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশে গেছে সে।

এই জীবনকেও মেনে নিয়েছে অতুল।

নিস্তারিণী অপেরার নাম এখন খুব। গগন গুছাইতও দলের রেট বাড়িয়ে দিয়েছে। অতুল, অলকা—মতিলালদের নামে দলের নাম, আর অতুলের নাম দর্শকদের মুখে মুখে ঘোরে।

শীতের শুরু। দিগন্তপ্রসারী ধান ক্ষেতে এসেছে সোনা ধানের মঞ্জরী, গাছের পাতা ঝরে, বাতাসে উড়ে উড়ে ফেরে ঝরা পাতার দল, রাঢ়ের পথে পথে ঘোরে যাযাবর এই মানুষগুলো। বৈরাগীতলার মেলা, সেখান থেকে কীর্নাহারের বাবুদের বাড়ি—বাজারে কয়েক পালা গেয়ে যায় লাভপুর—আমদপুর বাজার।

রাঢ়ের লালধুলো ওড়ে—অতুল দুচোখ মেলে মেলে দেখেছে এই প্রকৃতি বিচিত্র জগৎটাকে। আসরে তার নামডাক হয়েছে তবু গানের সাধনা সে ছাড়েনি।

অলকা দেখেছে বিচিত্র এই মানুষটিকে। যাত্রার আসরের পর ফিরে আসে বাসায়। মতিলাল গুপীনাথ-এর দল এর মধ্যে বাসায় ফিরে ধেনো মদ আর মেলার দোকান থেকে আলুর চপ-ঘুঘনি আনিয়ে বসেছে।

মতিলাল বলে, আরে অতুল ভায়া—এ্যাদ্দিন যাত্রার দলে রইলে তবু আহ্নিকে বসলে না। কি হে তুমি?

অতুল ওই মদটাকে সহ্য করতে পারে না। বিশ্রী লাগে তার।

মনে পড়ে বার বার এমনি তারাজ্বলা রাতে একজনের কথা, সে কোনো নিভৃত পল্লীর সবুজে পড়ে আছে তার পথ চেয়ে। একটা চিঠি দিয়েছে সে সেনকর্তাকে, ললিতার খবর জানে নিশ্চয়ই। হয়তো লজ্জায়—অভিমানে তাকে চিঠি দেয়নি।

ললিতা খুশি হবে নিশ্চয়ই এসব শুনে। চোখের সামনে সেই গ্রামের ছায়াঘন পথটার ছবি ফুটে ওঠে। সেই ছায়াঢাকা পথে আজও অতুল যেন ফিরে যায়। সে আর ললিতা ঘুরছে। অতুলের গানের সুর ওঠে তারাজ্বলা আকাশে। ললিতা বলে—তুমি অনেক বড় গাইয়ে হবে। নাম-যশ হবে তোমার। সেদিন আমাকে ভুলে যাবে।

হাসে অতুল—ধ্যাৎ।

চমক ভাঙা মতিলালের ডাকে। হাসছে সে। বলে মাইরী। বসে পড়ো ওরে গুপী, দে গুরুকে এক গ্লাস দে!

অতুল বলে নাঃ থাক। ওসব খাই না মতিদা!

বের হয়ে গেল অতুল। তখনও মনে ললিতার সেই স্মৃতি জাগে।

অলকাও দেখেছে ব্যাপারটা। দেখেছে অতুলের কোনো অহঙ্কার নেই, কোনো বদনেশাও নেই। আর তার সঙ্গে ব্যবহার ভদ্র—মেয়ে হয়ে অলকা ওই তরুণটিকে কেন্দ্র করে কি একটা স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এগোবার সাহস তার নেই। কোথায় একটা স্বতন্ত্র রয়ে গেছে অতুলের মনে।

অলকা থমকে দাঁড়াল অতুলের ঘরের বাইরে।

অতুল বাতাসে বসে তানপুরায় সুর তুলে কানাড়ার আলাপ করছে। রাত্রির গহনে।

শুদ্ধ স্তব্ধ একটি সাধক। বেহাগ-এর বেদনা ওই সুরে ফুটে ওঠে।

অতুল তন্ময় হয়ে গাইছে বিষ্ণুপুর ঘরানার সেই গান!

আজি নিঝুম রাতে
কে বাঁশী বাজায়—
সুরে বেদনা হানে--

অলকা চুপ করে শুনছে – যেন তার মনের গহনের নীরব ব্যর্থ বেদনাটা গুমরে ওঠে। তারাগুলো জ্বলছে--বাতাসে ওঠে রাতের ওই হাহাকার।

হঠাৎ চাইল অতুল ওর দিকে– অলকা।

অলকা এগিয়ে আসে। বলে সে--তুমি ওদের ওখানে ও যাও না। মতিদার ঘরে –একা একা রেওয়াজ করো।

হাসে অতুল—ওসব ভালো লাগে না অলকা। এই নিয়েই বেশ আছি।

অলকা দেখছে ওই সাধক শিল্পীকে। তার চোখে-মুখে বেদনার ছায়াটা তার নজর এড়ায়নি। অলকা বলে,

—কেন যাত্রার দলে এলে? এত ভালো গাও তুমি।

চমকে ওঠে অতুল---একথা ললিতাও শুধিয়েছিল। বলে ওঠে অতুল,

—আর একজনও এইকথা শুধিয়েছিল অলকা—ঠিক তোমারই মতো। সে বলেছিল এ পথ নাকি ভালো নয়। তাকে কথা দিয়েছি অলকা। এ পথেও ভালো থাকা যায়।

অলকা চাইল ওর দিকে।

অতুল বলে ওঠে—আমাদের গ্রামের মেয়ে ললিতা। সে ভালো গান গায়। তাকে কথা দিয়েছি—শিল্পীর জীবনের পিছল পথে আমি হারাব না।

অলকার মনে কথায় যেন একটা বেদনা জাগে। অতুল যে সেই ললিতাকে ভোলেনি আজও. রাতের

অন্ধকার পথহারা নাবিক যেভাবে ধ্রুবতারার দিকে চেয়ে থাকে—আজও অতুল তারই দিকে চেয়ে আছে এটা বুঝেছে অলকার নারী মন।

এখানে অলকার কোনো স্থান নেই

অলকা বলে—তার সঙ্গে দেখা করোনি এরপর? চিঠিপত্র দাও তো?

কি ভাবছে অতুল। বলে সে—একবার যাবো এবার! যেতে হবে সেখানে। অনেকদিন দেখা হয় নি।

কি ব্যাকুলতা, অতি ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠে। অলকা মনে মনে ললিতাকে আজ হিংসা করে, শ্রদ্ধা করে সে অতুলকে মনে মনে। একজনকে সে নিঃশেষে ভালোবেসেছে।

হঠাৎ সুযোগও এসে যায়।

সেদিন সুলতানপুর থেকে শিউড়িতে এসেছে তারা, দুপাল' গান আছে বড়বাগানে, ওইখানেই বায়না করতে আস দে গাঁ থেকে নায়েকপক্ষ।

গগন অবশ্য এবার বেশিদরেই বায়না করেছে। তার দলের চাহিদা অনেক বেশি।

তারাও বলে গেছে অতুলকে চাই কিন্তু। টাকা যা চাইবেন দেব।

দ গাঁ-এ যেতে হবে শুনে চমকে ওঠে অতুল। এরপর সেখানে তাদের যাত্রা।

অনেক স্মৃতি জড়ানো সেই পরিবেশ। তাদের গ্রামের পাশের গাঁ। কতদিন গেছে, দে গাঁয়ের হাটে বিরাট দিঘীর ধারে জাগ্রত শিবমন্দির, সেখানেই গান হবে। —গগন বলে,

কি অতুল, তোর সেই পুরোনো গ্রাম আমি বাপু দুশো টাকা কম করেই কবুল নিয়েছি। চল—ক'মাস তো যাসনে। এবার ঘুরে আসবি বলরামপুর থেকে আসব সেরে গরুর গাড়িতেই চলে যাব সিধে মাঠ পথে, ক'ঘণ্টার পথ ফিরতি সময় পার হয়ে, টানা রামজীবনপুরে এসে গান হবে রাতে।

ওদের প্রোগাম করাই থাকে ছকবন্দী ভাবে। গগন সেই ছকে ঘোরে যাযাবরের মতো।

অতুল কি ভাবছে। গগন বলে— তাহলে দল পরিচালককে ওখানে পাঠিয়ে দেব আগে। ঠাকুর চাকর নে চলে যাব।

অলকাও শুনেছে কথাটা। এখানে ওদের বাসার ওইদিকে একটা ছোট্ট খাল বয়ে গেছে দুদিকে গাছ-গাছালির ভিড়। চাঁদের আলো পড়েছে ঘাসের বুকে।

অলকা অতুলকে দেখে এগিয়ে আসে

অতুল গানের পর এসে বসেছে খালের ধারে। তার কাছে মতিলালদের মদের আড্ডা ভালো লাগে না। এমনি চাঁদনী রাতে সে আর ললিতা বেড়াত। নিজের মনের অতলে সেই ছবিগুলোই জেগে ওঠে। অলকাকে দেখে চাইল অতুল।

ওর মনের অতলে ললিতার চিন্তার কথা জানে ওই অলকা। অলকা ওর কাছে এসে বলে,

—তাহলে এবার যাচ্ছ ললিতার কাছে? এবার কিন্তু তাকে নিয়ে ঘর বাঁধো।

অতুল চাইল। অলকা বলে—এবার আমার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আর বলছিলাম—নাম-যশও হয়েছে মাইনেও ভালো পাচ্ছো, বিয়ে থা করো এবার। আমিই না হয় বরণডালা সাজাব।

অতুল ভাবছে কথাটা।

ললিতাকে সে এবার ঘরে আনবে। টাকা পয়সা ভালোই পায়। সুখী করবে ললিতাকে। অলকা দেখছে ওর দু'চোখে আশার সেই আভাস

অলকা বলে,

—অধিকারীকে দুদিন দল ছুটি করতেই বলব। এবার সামনের লগ্নেই তাহলে শুভ কাজটা সেরে ফেলো বাবু, বরণডালা আমরাই সাজাব। বরযাত্রীর অভাব হবে না।

অতুল বলে—খুব মজলামি করছ দেখছি? অবাক গাঁ'র ধারে অলকা। হাসছে মেয়েটি

দলের মধ্যে এখন অলকা যেন সত্যিকার সুখী পরিবারের শান্তির সন্ধান পেয়েছে।

গনন গুছাইত-এর দল এখন নামকরা দলে পরিণত হয়েছ। বায়নার সময় গগন নায়েক পথের সঙ্গে টাকার চটুক্তি করে। আর করে নেয় বাসার পাকা কথা।

কয়েকখানা ঘর ছেড়ে দেয় তারা দলের থাকার জন্য। ওরা এইভাবেই পথে পথে সংসার গড়ে তোলে। গাড়ি থেকে মালপত্র নামায়। রসুইদার আগে এসে খাবার তৈরি করে রাখে। ওরা গান গায়, গানের শেষে আবার রাতের অন্ধকারেই বাসে করে উধাও হয়ে যায় অন্যত্র।

গানের পর গগন গুছাইত বাসায় ফিরছে। এখানে দুদিন গান আছে। আজ তাদের যাবার তাড়া নেই। খেয়ে দেয়ে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারবে তারা।

গগন গুছাইত ঘরে বসে হিসাব করছে।

মতিলাল বলে—দল রাখতে চাও না তুলে দিতে চাও গগনদা? গগন দেখছে ওদের।

এখনও মদ খেতে বসেনি। তাদের এসে কথাটা বলতে দেখে গগন ঘাবড়ে যায়।

—কি ব্যাপার হে?

মাইনে বাড়াবার আন্দোলন করবে কিনা কে জানে। দল ভালো চলছে, আমদানীও হচ্ছে। কিন্তু কিছু দেবার কথা উঠলে গগন কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ে।

মতিলাল বলে,—এদিকে বিপদ হয়ে গেছে গগনবাবু, অতুল তো ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসেছে। মনে হয় দলে আর থাকবে না।

চমকে ওঠে গগন।

—কি হল আবার? ওরে অতুল! এ্যাঁ—কি করেছে সে! ব্যাকুল হয়ে ওঠে গগন। চটিটা পায়ে গলিয়ে শশব্যস্ত হয়ে অতুলের ঘরের দিকে যাবে, বাধা দেয় পরেশবাবু।

—কথাটা পুরো শোনো গগনদা, তারপর দৌড়বে? দাঁড়াল গগন।

মতিলাল বলে—ও ব্যাটা 'লাভ'-এ পড়েছে।

চমকে ওঠে গগন—এ্যাঁ। কিসে পড়েছে?

--লাভ! লাভ জানো —প্রেমে পড়েছে গো। অলকা কলকলিয়ে ওঠে। গগন এতদিন যাত্রার দল চালাচ্ছে। একবার শিশির আর পুতুলের প্রেম নিয়ে বিপদে পড়েছিল। সে ধাক্কা কোনোমতে সামলে নিয়ে আবার দল চালু করেছে, দুটো পয়সা আমদানী করছে এই সময় অতুল আবার ফ্যাসাদ বাধিয়েছে।

গর্জে ওঠে গগন—ফের এই কাণ্ড। তা প্রেমিকটি কে? সেটাকেই আজি দল থেকে দূর করব। একটা করে ছোঁড়া আসে,মানুষ করি আর ওই ব্যাদড়া মেয়েগুলো সব গোল পাকাবে। আজ দেখছি আমি ---মেয়েটা কে বল তো অলকা?

মতিলাল বলে ওঠে,

—তুমি একটু বুদ্ধু গগনদা, আরে দলের কোনো মেয়ে সে নয়। তার গ্রামের একটি মেয়েকে ভালোবেসে ঘর ছেড়েছিল। এবার ওই গ্রামের পাশেই যাচ্ছো বলি ছেলেটার বিয়ে থা দিয়ে দাও। শান্ত হয়ে পুরো মেজাজে এখানেই চাকরী করবে অতুল। বুঝলে?

গগন গুছাইত এবার ধাতস্থ হয়ে আরাম করে গদিতে বসে বেশ মিষ্টি করে হেসে বলে,

—তাই-ই বলবি তো? তা নয় কি সব আজে-বাজে কথা বলে যা ভয় ধরিয়ে দিস!

মতিলাল বলে,

---ওর বিয়েরও খুব ইচ্ছে গগনদা। অলকাকে সব বলেছে। তাই বলছিলাম এখানে দুরাত দলের গান হবে, একরাত দল বসতি করে বিয়েটা দিয়ে দাও মাইরি। কিছু ঘটা হবে।

গগন গুছাইত অতুলের জনাই আজ রম রম ব্যবসা করছে। বলে সে—হবে!

সেও চায় ছেলেটা বিয়ে থা করুক। তাতে মতি-গতি ভালো থাকবে? তাই গগন বলে,

—তাই হবে!

অলকা বলে ওঠে—সব আয়োজন ওখানেই হয়ে যাবে মতিদা, ফর্দটর্দ করে ফেলো। তা গগনবাবু দুদিনের মধ্যে বিয়ে টিয়ে বলে কথা, সব হবে তো?

হাসে গগন। বলে সে,

—তিন ঘণ্টার যাত্রার পালার কত রাজ্যি ওলট পালট করে দিচ্ছি, আর তিনদিনে একটা ছেলের বিয়ে দিতে পারব না? ও নিয়ে ভাবতে হবে না।

অলকা কেন দলের সকলেই খুশি হয়। ওদের এই যাযাবর সংসারের একজন তবু সুখী হবে। আজ অতুলের জন্য তারা সকলেই ভাবছে।

ওরা আশা করে আছে সেই আনন্দ উৎসবের।

দে গাঁয়েও খবরটা ছড়িয়েছে, এ অঞ্চলের সবাই জেনেছে ওদের কথা। অতুল এখন নামকরা গাইয়ে। সেনকর্তাকে অতুল অবশ্য আগেই চিঠি দিয়েছিল। দে গাঁ থেকে অনেকে এসেছে এই গ্রামে নিমন্ত্রণ করতে। সেনকর্তা বলেন ওদের দেখে,

—নিশ্চয়ই যাব, অতুল আসছে। শুনছি এখন ভালোই গাইছে সে। যাব বৈকি!

মদন দত্ত বেশ বহাল তবিয়ৎ-এ আছে। এখন পুরোপুরি বিষয়ী সে।

নশীরাম-এর কাজ কারবারের সব লোংবামিগুলোই আত্মস্থ করে এখন জাঁকিয়ে বসেছে। নশীরাম দে গাঁয়ের কর্মকর্তাদের বলে যাত্রার নিমন্ত্রণের কথা।

—আমি তো বাবা এসব বুঝি না। মদনই যাবে।

মদন অবশ্য মুখে খুশির ভাব দেখালেও মনে মনে জ্বলে ওঠে।

বৈঠকখানা থেকে ওরা চলে যাবার পর মদনের মুখের দিকে চেয়ে ওর অনুগত জন বুঝেছে মদন বেশ খুশী হয়নি অতুলের এখানে গান গাইতে আসার ব্যাপারে।

রতন বলে, অতলো আবার যাত্রা গাইতে আসছে এখানে? ব্যাটা চোর!

নটবর বলে—গুরু, আবার লাগাও যাত্রা। এবার দেখি দিই গাঁয়ের লোককে, যাত্রা কাকে বলে।

রতন শোনায়,

—অতুল আর এ্যাক্টর গাইয়ে। তার গান শুনতে যেতে হবে?

ওরগুলা আবার পাখী। তাই বলছিলাম গুরু লাগাও আর এক পালা গান। তুমি কি কমতি আছ?

মদন ভাবছে কথাটা।

অতুলকে সে জঘন্য অপবাদ দিয়ে এখান থেকে তাড়িয়েছিল, ভেবেছিল সব মুছে গেছে। তাকে ভুলে যাবে সবাই—কিন্তু অতুল এতদিন আড়ালে থেকে শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে এসেছে এখানে আবার ওর সেই মিথ্যা চক্রান্ত করে তাড়িয়ে দেবার শোধ নিতে। সারা এলাকায় মানুষের মুখে মুখে ফিরছে তার নাম। মদনকে তারা সেই সম্মান দেবে না কোনোদিনই।

গদাধর বলে—ব্যাটা চোর আবার গাইবে? ঠিক আছে গুরু, দলবল নে যাব। আওয়াজ দিয়ে হটিয়ে দেব আসর থেকে অতুলোকে।

ওরা গোপনে কি চক্রান্ত করছে। এবারও অতুলকে হটিয়ে দিতে হবে। অপমান করতে হবে।

কয়েকমাস পর ফিরছে অতুল। দে গাঁয়ে তখন বৈকাল নামছে। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েই আসরে নামতে হবে। অতুলের সারা মনে নিবিড় উত্তেজনা জাগে। বারবার আশা করে সে ললিতা নিশ্চয়ই আসবে। আজ সে গাইবে মন প্রাণ দিয়ে ওই ললিতার জন্যই।

আসরে কনসার্ট বসে গেছে। সাজ ঘরে হঠাৎ সেনকর্তাকে আসতে দেখে এগিয়ে যায় অতুল, উঠে গিয়ে প্রণাম করতে সেনকর্তা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন. বলেন তিনি খুশীভরা সুরে,

—তুই হারিয়ে যাবি না তা জানি রে। আজ আমার মুখ উজ্জল করেছিস তুই। তোর গান শুনতে সারা এলাকার লোক ভেঙে পড়েছে রে। বেঁচে থাক বাবা। জয়ী হ!

অতুলের দিকে চেয়ে থাকেন তিনি।

ওর মুখচোখে আজ জয়ের চিহ্ন। ভাগ্য ওকে বঞ্চিত করেনি। গমগম করছে আসর। তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

মদনও দলবল নিয়ে এসেছে। পালা শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দৃশ্যেই অতুল ঢুকছে গানের পশরা নিয়ে। ক'মাসে অতুল নিজেকে আরও তৈরি করেছে। পাশে রয়েছে অনেক বড় অভিনেতারা, তাই অতুলের অভিনয় আরও সুন্দর হয়ে ওঠে, আর গানে গানে ভরিয়ে দেয় সবার মন।

সারা আসরে স্তব্ধতা নামে। দে গাঁ, রূপজগতে —এ অঞ্চলের হাজারো মানুষ ভেঙে পড়েছে আসরে সবাই মুগ্ধ। হ্যাঁ—তাদের অতুল আজ গাইছে। অপূর্ব গাইছে।

সেনকত্তা শুনছে সারা মন দিয়ে। অতুলের দুচোখ ওই জনতার ভিড়ে কাকে অন্বেষণ করছে। চেনা অচেনা মুখের ভিড়—অগুনতি মাথা। জনসমুদ্র—তার ওদিকে মেয়েদের ভিড়। অতুল গেয়ে চলেছে তার সুর ছড়িয়ে পড়ে কি ব্যাকুলতা নিয়ে। মন্ত্রমুগ্ধ জনতা শুনছে স্তব্ধ হয়ে তার গান।

দুচোখ দিয়ে সে ওই জনারণ্যে খুঁজছে একজনকে। কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে পারে না। মনে হয় ললিতা ইচ্ছে করেই তাকে দেখা না দিয়ে ওই ভিড়ের মধ্যে রয়ে গেছে। তাই অতুল তাকে শোনবার জনাই প্রাণ দিয়ে গাইছে।

—সাধু! সাধু! হাততালি পড়ে।

মদন, রতনের দলও থমকে গেছে। এই গদাধর মন্ত্রমুগ্ধ জনতার মাঝে রতনকে হুঁশিয়ার করে—চুপ করে গান শোন রতন। গোলমাল করলে এরা ছাল খুলে নেবে।

মদন অবশ্য কিছুক্ষণ পরই উঠে আসে। তার সারা মনে আগুন জ্বলছে অতুলের এই খ্যাতিতে, ব্যর্থ জ্বালায় জ্বলছে সে।

রাত নেমেছে। গান শেষ হবার পর সেনকত্তা, ভূষণ মাষ্টার আরও অনেকে ছুটে আসে। পুরোনো দিনের ভূষণ আজ খুব খুশি হয়েছে।

ভূষণ মাষ্টার বলে—বেঁচে থাক বাবা! হ্যাঁ গাইলি বটে।

সেনকত্তা বলেন—কাল ওখানে যাবি অতুল। কতদিন যাস্‌নি

অতুলকে যেতে হবে ওই গ্রামে। সেখানে ললিতার সঙ্গে দেখা করতেই হবে তাকে। তাকে অনেক কথা বলার আছে।

অতুল বলে কাল যাব কত্তামশাই।

পরাণ ঘোষ ক'মাসেই একেবারে বদলে গেছে।

জমি জারাত যা ছিল তার বেশির ভাগই চলে গেছে নশীরাম দত্তের কবলে, তবু নশীরাম বলে,

—এখনও সুদ কিছু বাকী আছে পরাণ।

পরাণ বলে—পরাণের পরাণটা ছাড়া আর তো কিছুই নাই গো দত্তমশায়, আর সব গেছে, এবার এই পরাণটাই নাও, দ্যাখ যদি দেনা শোধ হয়।

নশীরাম দত্ত জবাব দিল না।

পরাণ এখন অন্যের ক্ষেতে-খামারে জনমজুরীই করতে শুরু করেছে। নিজের গরু, বাছুর, বলদ প্রায় সবই গেছে। ছাউনির অভাবে গোয়ালটা ধসে পড়েছে, উঠোনে ছিল অতীত ধানের মরাই। গৃহস্থের লক্ষ্মীর ঠাট। আজ সেই মরাইও নাই।

উঠোনটা শূণ্য।

রাজলক্ষ্মী পরের বাড়ি থেকে ধান এনে তাই থেকে চাল তৈরি করে সামান্য কিছু মজুরী পায় কোনোরকমে কায়ক্লেশে বেঁচে আছে মাত্র।

অন্নাকালীর বিয়েটা কোনোমতে হয়ে গেছে। আর সেটাও হয়েছিল ললিতার মৃত্যুর খবরের পর, পাত্রপক্ষ দয়া করে মেয়েকে ঘরে নিয়ে গেছে।

কিন্তু এই বাজারে দুজনের আর ছেলেটার খরচা চালানোও দায় হয়ে উঠেছে। নিজের জমির খড়ও পায়নি। জমির মাথার বাঁশ গাছ কিছু ছিল, জমি দখল করে নিয়েছে নশীরাম। সুতরাং বাঁশ, খড় কিছুই পায়নি, আর তাই ঘরও ছাওয়ানো হয়নি। গোয়ালবাড়িটা ধসে পড়েছে আগেই। এবার বড়ঘরখানাও ছাউনির অভাবে ধসেছে। মন-মেজাজ ভালো নেই।

যাত্রায় অতুলের গাঁইতে আসার কথাও জেনেছে পরাণ, কিন্তু যেতে পারেনি। অতুলকে এইসব কথা সে শোনাতে পারবে না। সেই ললিতার স্মৃতি—ওদের কথা—অতীতের গান ভরা দিন সব কিছু হারিয়ে গেছে তাদের জীবন থেকে।

এখন তার জীবন জোড়া অভিশাপ আর অভাব।

সেই অভাবের চাপ কি নিষ্ঠুর অভিশাপে যেন শেষ হতে চলেছে পরাণ। তার স্ত্রী রাজলক্ষ্মীও আজ ভাবে অতীতের কথাগুলো। নিরীহ নিরপরাধ মেয়েটাকে মা হয়ে সেই ই দিয়েছিল সবচেয়ে বড় ব্যথা।

তারপরও নদীর ধারের গ্রাম, এখানে ওখানে খুঁজেছিল তারা, কিন্তু ললিতার কোনো খবরই আর পায়নি। কোথায় হারিয়ে গেছে মেয়েটা, বোধ হয় আর বেঁচে নেই।

অতুল এসব খবর জানে না।

কাল রাত্রে যাত্রার আসরে ওই হাজার হাজার মুখের মধ্যে সে খুঁজেছিল তার প্রিয় ললিতাকে। আশা করেছিল তার খবর পেয়ে ললিতা ছুটে আসবে। কিন্তু দেখতে পায়নি।

মনে মনে ভেবেছিল অতুল বোধহয় অভিমানই করেছে, তার উপর অভিমান করার কথাই ললিতার। এতদিন হয়ে গেল কোনো খবরই নেয়নি অতুল ললিতার। আজ মনে হয় ললিতা ঠিকই করেছে। তবু মনটা খারাপ করে তো।

ব্যাপারটা অলকার নজর এড়ায়নি।

গান শেষ হয়েছে। দারুণ ভালো গান জমেছিল আজ। অতুল গেয়েছেও অপূর্ব। কিন্তু অলকা জানে ওর মনের অতুলের বেদনার কথা। দেখেছে আসরে কাকে বার বার যেন চোখ মেলে খুঁজেছে অতুল।

গান শেষ হবার পর সাজঘরে এসে রং টং তুলে বাসায় ফিরছে তারা। তখন যাত্রার প্রাঙ্গণের ভিড়, কলরব সব থেমে গেছে। রাতের তারাগুলো নির্জন অন্ধকারে ঝিকমিক্ করে।

অলকার ডাকে চাইল অতুল।

—কি রে?

অলকা শুধোয়—ললিতা আসেনি, না?

ঘাড় নাড়ে অতুল। অলকা বলে,

—তুমিও বেশ বাপু, এতদিন হয়ে গেল একটা চিঠি লিখেও জানাবে তো? মেয়েরা কি এতই ফ্যালনা?

হাসে অতুল।

অলকা বলে—কাল একবার যাও ওদের বাড়িতে, বুঝলে। ঢের মান-সম্মান কুড়িয়েছ, তবু একজনের কাছে না হয় নীচুই হবে।

অতুল ভাবছে কথাটা।

অলকার কথাটাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। অলকা বলে,

তুমি যদি যেতে না পারো, বল আমি না হয় দূতীগিরি করি। মান-ভঞ্জনের পালায় বিন্দেদূতীর পার্টও বেশ আছে গো।

অতুল ধমকে ওঠে—থাম্‌তো। খুব বেড়েছিস অলকা। অলকা হাসিভরা মুখে বলে,

—না গো। এভাবে দুজনে দুদিকে ঘুরবে তা হয় না। দলের সবাই অলকা নয় অতুলদা, যে চিরকাল তোমাকে আগলে রাখবে। তাই বলছিলাম—কাল নিজেই যাও।

অতুল চলেছে ওই গ্রামের দিকে।

এই পথে একটি বালক বহুদিন যাতায়াত করছে। কাঠের আল, কাদর পার হয়ে এখানে বটগাছের নীচে দিয়ে চলে গেছে পথটা, সামনে দেখা যায় সেনবাড়ির উঁচু নামী গাছ দু'একটা, ভাঙা বাড়িগুলো। ওদিকে তিরোল গাছটা তেমনিই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

দিঘীর ধারে কদম গাছে এসেছে ঘন পাতার সমারোহ, শীতের দিন। মাঠ থেকে সোনা ধানের ভারা এসেছে খামারে, বাতাসে ওঠে পাখির সুর, একটা চাতক পাখির ডাক ভেসে ওঠে বাতাসে।

অতুল মাঠ পার হয়ে গ্রামে ঢুকেছে। বিনোদ মুদির দোকানে দু-একজন ছেলেমেয়ে কেনা-কাটা করতে এসেছে। ওদের দু-একজন দেখছে তাকে। অতুলের পরণে তার দামী ধুতি—গায়ে কাজ করা পাঞ্জাবী, পায়ে পামসু। ওরা যে অতুলকে চিনতো এ সে নয়।

ওদিকে বটগাছের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে অতুল পরাণের বাড়ির দিকে। তার গলা শুনে ললিতা ছুটে বের হয়ে আসবে।

পরাণ কাকাও হাজির হবে।

ক'মাসে ললিতা অনেক বদলে গেছে বোধহয়। অতুল কি স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়।

বাড়িটার হাল—বাইরের রূপ একেবারে বদলে গেছে এর মধ্যে। সামনে গোয়ালটা নেই। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, মাটির দেওয়াল ধ্বংসপুরীতে পরিণত হয়েছে। সেই শ্রী সৌন্দর্য আর নেই।

দাওয়াটা নিকোনো নেই—বড় ঘরটার ছাউনি খসে খসে পড়ছে। কি নিরাভরণ নিঃস্বতা আর আসন্ন সর্বনাশের কালো ছায়া নেমেছে এখানে।

নিস্তব্ধ চারিদিক।

ওদিকে দু-একজনকে দেখেছে, তারাও অতুলকে আসতে দেখে হয়তো অবাক হয়েছে। কিন্তু কিছু বলে না তারা, এড়িয়ে গেল অতুলকে।

অতুল ওই ভাঙা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

কোথাও কোনো কলরব, ললিতার গানের সুর, সাড়া কিছুমাত্র নেই। এখানে যেন মানুষজন থাকে না। ভিটেপুরী হয়ে গেছে।

—কাকীমা! পরাণ কাকা! ডাকছে অতুল!

কে ভেতরে এসো।

পরাণই সাড়া দেয়।

পায়ে পায়ে ঢুকলো অতুল। ওকে দেখে চমকে ওঠে পরাণ। তুই! অতুল!

পরাণের বুক জীর্ণ করে কি হাহাকার ওঠে। ওদিকে দাওয়ায় এসেছে রাজলক্ষ্মী।

অতুল দেখছে শ্রীহীন—নিরাভরণ নগ্ন বাড়িটাকে। আজ সব যেন হারিয়ে গেছে তাদের। অতুল শুধোয়, এরা সব কোথায়, ললিতা—

রাজলক্ষ্মী মা হয়ে জানে অতুল কেন এসেছে এ বাড়িতে। পরাণও বোঝে—আজ অতুলের নাম-ডাক হয়েছে। টাকার অভাব নেই। হয়তো ললিতাকে বিয়েই করত সে

কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। শূন্য হাতে শুধু অপমান আর কলঙ্ক সয়ে হারিয়ে গেল মেয়েটা ওই কালীদহের গভীরে।

আর্তনাদ করে ওঠে রাজলক্ষ্মী, —সে আর নেই বাবা। দুঃখে, কি লজ্জায় মা আমার কালীদহের ঘূর্ণিতে নিজেকে শেষ করে দিয়ে গেছে।

চমকে ওঠে অতুল।

—কি বলছ?

—হ্যাঁরে। পরাণ কান্না ভেজা স্বরে বলে—মা আর নেই রে। কালীদহে ডুবে গেল, মরা দেহটাও কোথায় ভেসে গেছে। সে আব নেই।

অতুলের দুচোখের সামনে নামে অতল অন্ধকাব।

তার এতদিনেব আশা-স্বপ্ন-ভালোবাসা সবকিছু এমনি ব্যর্থ হয়ে যাবে ভাবেনি সে।

ললিতা নেই।

হয়তো তার জন্যই ললিতা অভিমানে নিজেকে এভাবে শেষ করে দিয়েছে। শুধু ললিতাবই সব হারিয়ে যায়নি, সব হাবিয়ে ললিতা তবু দুঃখকে ভুলেছে. শান্তি পেয়েছে কালীদহের অতলে, কিন্তু অতুল পড়ে বইল এতবড় পৃথিবীতে।

সে আজ শূন্য—রিক্ত—একা।

হয়তো তার জন্য ললিতাকে অনেক গঞ্জনা, লাঞ্ছনা শুনতে হয়েছে। আব সে সব বেদনার্ত ইতিহাস কোনোদিনই প্রকাশ পাবে না।

পবাণ বলে মা আমাব লক্ষ্মী ছিল অতুল, মা চলে যাবার পব থেকে আমার জমি জিরেত সব চলে গেল, সব শান্তি-সুখ হারিয়ে গেল আমাব সংসাব থেকে।

মাকে দুঃখ দিয়েছিলাম আমবাও, অনেক দুঃখ। সেই পাপেব প্রায়শ্চিত্ত করছি।

রাজলক্ষ্মী চোখের জল মুছে বলে অতুলকে,

—এসো বাবা।

অতুলেব বসাব ইচ্ছাও আব নেই। এখান তার কোনো প্রয়োজন আর নেই। এরা তার কেউ নয়। ললিতা সব পরিচয়ই মুছে দিয়ে গেছে।

অনেক যন্ত্রণা-গঞ্জনায় অপমানে সে জ্বলেছে। সেদিন অতুল তাকে কোনো আশ্বাস দিতে আসেনি। ললিতার মৃত্যুব জন্য নিজেও দায়ী সে।

আব এরাও। আজ চোখের জলেব কোনো দামই নেই।

রাজলক্ষ্মী চোখের জলে আজ যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সেই রাতের করুণ কাহিনী, চমকে ওঠে অতুল!

ললিতাব ওপব এতবড় জঘন্য অত্যাচার হয়েছে ভাবতেই পারেনি সে। তাই লজ্জায় অপমানে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে সে। হারিয়ে গেছে অতুলের সবকিছু।

অতুলের এখানে আব কিছুই নেই। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল—স্বপ্ন দেখছিল সে এতদিন। কিন্তু নিষ্ঠুব বিধাতার কি পরিহাসে সব হারিয়ে গেছে।

—বসবে না বাবা? রাজলক্ষ্মী এগিয়ে আসে। অতুল কিছু টাকা বের করে।

অতুল পরাণেব সামনে নোটগুলো দিয়ে বলে কিছু টাকা রইল। —জমিটা ছাড়িয়ে নেবেন কাকা।

পবাণ আজ হু- হু কান্নায় ভেঙে পড়ে। বলে সে—এ টাকা দিচ্ছ বাবা, কিন্তু তোমাকে আজ সবচেয়ে বড় দুঃখ দেইছি আমিই। ললিতাকে তাড়িয়ে দিইছি। কত খুঁজলাম, কোথাও তার কোনো পাত্তাই পেলাম না। মনে হয় মা আমার দুঃখ লজ্জায় বোধহয় নিজেকেই শেষ করেছে। আর্তনাদ আর হাহাকার বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। অতুল দাঁড়াল না।

হাতের শাড়ি, টাকাগুলো নামিয়ে দিয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মতো শূন্য বেদনাহত মন নিয়ে বের হয়ে এল অতুল। তার সব আজ হারিয়ে গেছে। তার কেউ নেই—ফিরছে সে উদভ্রান্তের মতো।

চমকে ওঠে অলকা ওকে দেখে।

গ্রামের বাইরে স্কুলবাড়িতে বাসা দিয়েছে ওদের। অলকাও জানে অতুল গেছে ললিতার সঙ্গে দেখা করতে, ওকে আজ আনবে—পরিচয় করিয়ে দেবে তার সঙ্গে। অলকাও ললিতার পথ চেয়েছিল।

হঠাৎ অতুলকে ওভাবে ফিরতে দেখে এগিয়ে যায় অলকা। বিস্মিত হয়েছে সে।

ঝড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে ফিরছে অতুল, চোখে শূন্য চাহনি।

কি আঘাতে সে জীর্ণ হয়ে গেছে। —

এ্যাই শুনছ? ললিতা কি বলছে?

অলকা এগিয়ে আসে। মনে হয় ললিতার কাছে কোনো আঘাত পেয়েই ও এভাবে বদলে গেছে অলকা বলে,

—ললিতার মান আমিই ভাঙতে যাব। চলো ও বেলাতেই যাব। দেখছি কেমন মেয়ে সে। কি বলেছে তোমাকে? এ্যাই অতুলদা।

তারদিকে চাইল অতুল। বলে সে শান্তস্বরে,

ললিতা চরম অপমানে, লাঞ্ছনায় হারিয়ে গেছে অলকা। তাকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে, সব ছেড়ে দিয়ে তাকে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে হয়েছে। সে এখানে নেই, হয়তো বেঁচে নেই।

—সেকি! চমকে ওঠে অলকা।

অতুলের রুদ্ধ আবেগ এবার বেদনায় অশ্রু হয়ে ঝড়ে পড়ে। অলকা দেখছে ওকে।

শূন্য রিক্ত প্রান্তরে, শীতের রুক্ষতার মাঝে একটি শূন্য ব্যর্থ জীবনের বেদনা ওতে মিশেছে, ওকে কি সান্ত্বনা দেবে জানে না অলকা। অতুল গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল কোনো কথা না বলে।

খেতেও আসেনি অতুল।

গগন খবর পেয়ে ছুটে আসে। সারা দলের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে।

গগনকে দেখে অলকা বলে —এখন যাবেন না অধিকারী মশায়, ওকে একটু একা থাকতে দিন।

গগন বলে খায়নি, ওবেলায় গান আছে, শরীর-টরীর খারাপ হল কি না দেখব না?

অলকা বলে—এখন যান, পরে কথা বলবেন এখন মন-মেজাজ ভালো নেই। ওকে বিরক্ত করবেন না। একটু নিরিবিলিতে থাকতে দিন।

এখন কিছু বলতে গেলে বিগড়ে যাবে। হয়তো বলে বসতে পারে আজ গাইতে পারবে না।

চমকে ওঠে গগন গুহাইত ওর কথায়। বলে সে,

ওরে বাবা। তাহলে ওই হাজার হাজার জনতা টাক ফাটিয়ে দেবে না। কি সব ঝামেলা বাধায় বুটমুট। পেরেম-টেরেম এই দুঃখেই করিনি। সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা এখন কি হবে বল দিকি।

গগন গুহাইত ভাবনায় পড়ে এবার। পেরেম-টেরেম নিকুচি করেছে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। অতুল তখনও গুম্ হয়ে বসে আছে নিজের ঘরে।

সব চেতনা তার কি গাঢ় বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কিছুই তার নেই। জীবনভোর এই যন্ত্রণা আর শূন্যতাকে বুকে বয়ে ফিরতে হবে। ললিতা কি নিদারুণ অভিমান আর অপমানে হারিয়ে গেছে।

কে জানে বেঁচে আছে কিনা। গান গাইতেও ইচ্ছে নেই অতুলের। সুর ভুলে গেছে অতুল কি বেদনায়। হঠাৎ গগনকে ঢুকতে দেখে চাইল। গগন দেখছে অতুলকে যেন মড়া পুড়িয়ে এসেছে সে। গগন বলে,

—একি। ওঠ অতুল। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। তবু তো বাঁচতে হবে কাজ করতে হবে রে।

অতুল বলে—ভালো লাগছে না অধিকারী মশায়। এখানে একজন সব হারিয়ে কেঁদে ফিরে গেছে, এরা তার জীবনটা দুঃখ অপমানে কালো করে সব কেড়ে নিয়েছে, এখানে দাঁড়িয়ে গান আমার বের হবে না অধিকারী মশায়। আমি গাইব না। এদের গান শোনাতে পারব না।

চমকে ওঠে গগন—সে কি কথা রে।

আজ আসর ভরে উঠেছে। দূর থেকে গরুর গাড়ি-সাইকেল-রিক্সা ভ্যান আসছে কাতারে কাতারে। লোকজন-এর ভিড় জমছে। আর আজ অতুল বসে গেলে দলেরই বিপদ হবে। গগন ছটফট করে।

সে বলে—ওরে মরে যাব বাবা। এসব কথা ভাবিস না।

অতুল চড়া স্বরে বলে—এখানে আর থাকব না, আমি চলেই যাব। তুমি থাকো তোমার দল নিয়ে।

অলকাও শুনছে কথাটা।

গগনকে বিপন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে অলকা।

অলকা এখানে এসে সেনকত্তার কাছে শুনেছে কাল অতুলের গান—তাকে মিথ্যা অপমান করে তাড়াবার কথাটা। আজ অলকার মনে হয় অতুল এসব কথা ভাবেনি।

মদন দত্তও এসেছে দলবল নিয়ে। এর মধ্যে রতন কথাটা ছড়িয়ে দেয় শ্লা অতুলো আর গাইবে না এখানে।

মদন খুশি হয়। বলে সে—আজ দে শ্লার দলের মালপত্র লুট করিয়ে। অতুলের দফাও শেষ হয়ে যাবে।

অলকা ওদিকে মদনদের কথা শুনে এসেছে এসব অতুলের কাছে। আজ দলের সমূহ বিপদ। মদনের দল শেষ প্রতিশোধ নেবেই। অলকার কাছে ওদের সব চক্রান্তই পরিষ্কার হয়।

ললিতাকে হয়তো তারাই অপমান করেছিল কৌশলে সেই রাত্রে। তাকেও তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল না হয় তার সব কিছু লুট করে ভোগ করতে চেয়েছিল. অন্তরালের ইতিহাসটা সে জেনেছে। জেনেছে অতুলকে কোন্ মহাজনের ছেলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মেরেছিল।

অলকা দেখছে অতুলকে।

বলে ওঠে অলকা যারা তোমাকে চোরের মতো মেরে তাড়িয়েছিল, তোমার সুনাম কেড়ে নিতে চেয়েছিল আজ এতদিন পর নাম যশ করেও তাদের কাছেই আবার হার মেনে রাতের অন্ধকারে এখান থেকে পালাবে অতুলদা চোরের মতো।

চমকে ওঠে অতুল।

মনে পড়ে মদনের দলের সেই অত্যাচারের কথা। তারা চায়নি অতুলের নাম-যশ হোক এখানে। তাই সেদিন চলে যেতে বাধ্য করেছিল তাকে রাতের আঁধারে মুখ লুকিয়ে।

আজও অতুল গান না গেয়ে এখান থেকে চলে গেলে তাদের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। আর কোনোদিনই এ মাটিতে ফিরতে পারবে না সে।

অলকা বলে—তুমি আজ এভাবে পালাতে পারবে না। দুঃখ বেদনা সব আছে, তবু মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ওদের চক্রান্তকে তুচ্ছ করে তুমি যে কত বড় শিল্পী, তাকে দমাবার চেষ্টা মদন দত্তের নেই, সেই পরিচয় দিয়ে যাবে। তুমি হারবে না। গাইবে—গাইতে হবে আজও।

অতুল দেখছে ওকে। ওর কথাগুলো মনে হয় সত্যি। অতুল কি ভাবছে।

সেও জবাব দিতে চায়, সেও খুঁজবে এবার ললিতাকে, আবার তাকে ফিরে পাবে, সুখী হবে ললিতা আর সে।

সে এই পথ নিয়েই চলতে চায়, তবু মনটা কি বেদনায় বিবর্ণ হয়ে আছে। অসহায় কণ্ঠে বলে অতুল অলকার কথায়।

—গাইতে চাইরে , কিন্তু সব কেমন দুঃখে ভরে গেছে। সুর আসছে নারে।

অলকা বলে—তোমার সেই সব হারানোর দুঃখের সুরে এদের মন ভরিয়ে দিতে পারো না অতুলদা? যাতে এই হাজার হাজার মানুষ তোমার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে—সেই জানোয়ার যারা ললিতাকে সর্বনাশ করেছিল তাদের ঘৃণা করে। পারতেই হবে অতুলদা—অতুল ভাবছে।

অলকা আজ চায় অতুল তার জীবনের সবচেয়ে সেরা আসর করবে এখানে। অলকা জানে ওর জীবনের বেদনাটাকে। বলে সে,

—হাসির হাল্‌কা পালা নয়, হারানো ফুল। পালা গাইব আমরা।

সঙ্গীত বহুল বিয়োগান্ত প্রেমের কাহিনী। গগনও এসে পড়ে।

অলকা বলে—হারানো ফুল গাইব আজ। অতুল যেন নোতুন করে ভাবছে কথাটা।

গগন আশান্বিত হয়ে ওঠে। বলে সে, —তাই কর বাবা। আজকের পালা হবে হারানো ফুল। গোঁসাই প্রভুর সেই গানটাও থাকবে আজকের পালায়।

গগন আর দাঁড়াল না। কোনোরকমে রাজী করিয়েছে অতুলকে—এবার বের হয়ে যায় সে কথাটা ঘোষণা করতে।

অলকা বলে—চলো। গরম জল করতে বলেছি, স্নান করে কিছু হাল্কা খাবার খেয়ে নেবে। সারাটা দিন এইভাবেই বসে আছো।

অতুলকে নিয়ে যায় সে। অতুল এই দুঃখের দিনে অলকার সেবার কি অকৃত্রিম সান্ত্বনা খুঁজে পায়।

স্তব্ধ আসর কাঁপিয়ে অতুলের সুর ওঠে। ছায়ানট রাগে বন্দী গানটা এই নাটকীয় পরিবেশে সকরুণ আবেশ আনে। হারিয়ে আছে তার প্রিয়তমা—সর্বহারা কোনো রাজপুত্র তার নিজের নাম পরিচয়ও জানে না, কি বেদনায় সে গাইছে অরণ্যের নির্জনতায় ব্যাকুল সুরে,

—শূন্য এ বুকে পাখী মোর
আয় —ফিরে আয়।
তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল
অকালে ঝরিয়া যায়।

সেনকর্তা, দে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট— আরও সকলের চোখের পাতা ভিজে আসে। ভূষণ মাষ্টার বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ছায়ানটের বেদনা-হাহাকার নিঃস্বতার যেন বনমর্মরে ফুটে ওঠে।

তুই নাই বলে ওরে উন্মাদ
পাণ্ডুর হল আকাশের চাঁদ--
কাঁদে নদীর জল করুণ বিষাদ—
ডাকে আয়—ফিরে আয়।

সারা আসরে নেমেছে বিষাদের ম্লান আভা, হ্যাঁ, অতুল পেয়েছে তার দুঃখটা আকাশে বাতাসে মুখর করে তুলতে। আজ ললিতার জন্য তার এই হাহাকার যেন রতি বিলাপের মতো দিক দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। দু'চোখে ওদের জল নামে।

সেনকর্তা সাজঘরের মধ্যে এসে জড়িয়ে ধরেন, অতুল ওর বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সেনকর্তা জানেন ওর এই বেদনাবিধুর ইতিহাসটা। ললিতার অপমান তাকেও স্পর্শ করেছিল, সান্ত্বনা দেবার ভাষা তার নেই।

বলেন—শান্ত হ অতুল। ভগবান একদিকে তোকে পূর্ণ করে দিয়ে আর একদিকে তোকে শূন্য করেছেন। তারই এ ইচ্ছা রে। মেনে নেওয়া ছাড়া পথ নেই। মেনে নিয়েই চলতে হবে রে।

এমন যাত্রা পালা অনেকদিন হয়নি।

গান ভাঙার পর কলরব করে জনতা। ধন্যবাদ -সাধুবাদ দেয় অতুলকে।

নায়কপক্ষ এসে পড়েছে বাসায়।

গগনকে খুঁজে বের করে বলে, কর্তা আর একদিন গাইতে হবে। যা চান দেব, যত টাকা বলেন।

আর একদিন—

গগন কথা দিতে পারে না। বলে সে—ডাইরীটা দেখি, ওদের সঙ্গে আলাপ করে এসে বলছি স্যাররা।

গগনের লোভ হয় আর একপালা দেড়া ফুরনেই পেয়ে যাবে এখানে। তবু কথা দিতে পারে না—তাই অতুলের কাছে এসেছে, মতিলালরা ততক্ষণে আহ্নিকে বসে গেছে। ওদের বলে লাভ নেই। এখানে গান করার জন্য দরকার তার অতুলকে।

অতুল রং তুলে গোছগাছ করছে। গগনের কথায় ওর দিকে চাইল। গগন বলে তাহলে কথা দিই, আর একদিন থেকে একপালা গেয়ে যাই এখানে।

অতুল বলে ওঠে, আপনি থাকুন, গান আমার এখানে এই আসরে শেষ রজনী, এই রাতেই চলে যাব। আমি এখানে থাকতে পারছি না অধিকারী মশাই। আমাকে মাফ্‌ করুন।

গগনও বুঝতে পারে ওর মনের অবস্থা।

অলকাও এসে পড়েছে গগনকে এখানে দেখে। সেও বলে গগনকে—

কেন লোকটাকে দুঃখ দিতে চান অধিকারী মশায়। আজ রাতেই চলুন কাল দুবরাজপুরে পৌঁছে তবু বিশ্রাম নিতে দেন অতুলদাকে। আজ সারাদিন খায়নি লোকটা। ওর দিকেও তো দেখবেন।

গগন বলে—না না। তা ভালোই বলেছিস অলকা, গানের চাহিদা থাকা ভালো। না করে দিই গে নায়কদের। আর গান এখন হবে না, ডেট নাই।

বের হয়েছে ওরা অনেক রাতে। বাস এর মধ্যে ছাদে, বাক্স, বেডিং সাজের বাক্স ঠাসা। ওর মধ্যে হুড়িয়ে ছিটিয়ে চলেছে ওরা। ঘুম নামা অচেনা জগৎ, অতুল এমনি এক রাত্রেই এই পথ ধরে এ গ্রাম থেকে বের হয়ে গেছল, ভেবেছিল অনেক কিছু পেয়েছে। তাই খুশি মনে ফিরছিল এখানে অতুল আরও অনেক পাবার আশা নিয়ে, কিন্তু সেদিন অতুল জানতো না আরও কত বড় আঘাত রয়ে গেছে তার জন্য।

এই মাটি, এই গ্রাম আবার তার সব কেড়ে নিয়ে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর পথে একা এই অতুলকে। ললিতা কোথায় কে জানে—অতুলের আজ অকারণেই বার বার তাকে মনে পড়ে এমনি তন্দ্রাহীন রাতে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে।

—চাদরটা জড়িয়ে নাও। হিম পড়ছে। কার ডাকে চাইল অতুল,

অলকা পিছনের সিটে বসেছিল। সে ওর গায়ে চাদরটা তুলে দেয়।

অতুলের মনে হয় তার দুঃখের দিনে আজ পাশে পেয়েছে অলকাকে যে নিঃস্বার্থ সেবায় তার মন ভরে দিয়েছে। ভাবে অতুল দুনিয়া থেকে সবকিছু একেবারে মুছে যায়নি। এখনও তাই মানুষ বেঁচে আছে আশা নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে।

কোনো আশা নেই, কোনো ভালোবাসা নেই, আশ্বাস নেই ললিতার জীবনে। সবকিছু তার বিষিয়ে গেছে।

মরেই সে মুক্তি পাবে বেঁচে থাকার এই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে।

রাত্রি নেমেছে।

বের হয়ে এল ললিতা বাড়ি থেকে। সারা গ্রাম নিশুতি।

তারাগুলো ঝিক্‌মিক্‌ করে আকাশে। রাতের ঘুমঢাকা পথে নেমে দু'চোখে জল আসে ললিতার। কোথায় যাবে সে তা জানে না.

এতদিন তার সব ছিল।

বাবা-মা-বোন একটা আশ্রয়। নিজের স্বপ্ন—সে সব মিথ্যা হয়ে গেছে কোনো নিষ্ঠুর বঞ্চনায়।

পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো নদীর ধারে।

তখনও ভরানদীতে বেশ স্রোত, জায়গাটা বিরাট দহ—জল ঘোরে। সেবার দত্তদের নৌকাটা ওই

ঘূর্ণিতে পড়ে লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে তলিয়ে গেছল লোকজন সমেত। দুজনকে পাওয়া গেছল অনেকে নীচে। তখন আর বেঁচে নেই।

ললিতা থমকে দাঁড়াল।

কল কলশব্দ ওঠে মত্ত জলাধারায়। মনে হয় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সে শেষ করে দেবে নিজেকে। কিন্তু পারে না।

থমকে দাঁড়াল। হাতের পুঁটলিটা নামাল—জলে ঝাঁপ দিতে গিয়েও পারে না সে।

এত দুঃখকষ্ট সবকিছুর মধ্যেও কোথায় নিজেকে সে ভালোবাসে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেবার এই দহে ডুবে যাওয়া মরা লোকগুলোর সেই ফুলে ওঠা বিকৃত দেহ, আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখমুখ। ওরা মরার আগে বোধহয় বাঁচার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টাই করেছিল।

ললিতা পারল না।

মনে পড়ে বার বার অতুলের কথা। তার হাসি—সেই সুর যেন তাকে ডাক দেয়। বাঁচার কি আশ্বাস আনে। কোথায় গেছে অতুল জানে না ললিতা।

তবু সে তাকেই খুঁজছে।

এই রুদ্ধ উষর পৃথিবীতে ওই অতুলই তাকে ঠাঁই দিতে পারে। আশ্বাস দিতে পাবে।

ওই একটি মানুষ আজ তার সবচেয়ে আপন।

অন্ধকার আকাশ।

রাত শেষ হয়ে আসছে। সব তারার মাঝে একটি প্রদীপ্ত শুকতারার মতো যেন জেগে আছে অতুলের চাহনি। ললিতার পথ চেয়ে সেও হয়তো জেগে আছে।

—ললিতা!

চমকে ওঠে ললিতা।

কে ডাকছে তাকে চুপি চুপি। বাতাসে ভেসে ওঠে সেই আহ্বান।

ললিতা চাইল।

অতুল।

অতুলের দেখা নাই। তবু মনে হয় তার ডাকই শুনেছে সে। মরা আর হল না তার। ললিতা কি যেন সন্ধান করছে। কোথায় যাবে সে জানে না।

হঠাৎ আঁধার কাঁপিয়ে গুম্ গুম্ শব্দটা ওঠে।

চাইল ললিতা। অন্ধকারের বুকে দূরে আলো মালার মতো শেষ রাতের অন্ধকার চিরে ট্রেনটা নদীর ব্রিজ পার হয়ে চলেছে দূরে, এ দিগন্ত থেকে বেরে হয়ে দূর দিগন্তের মিশিয়ে গেল।

চাইল ললিতা।

ওই রেলগাড়িটার গতিপথের দিকে হঠাৎ খেয়াল হল তার। অনেক দূর থেকে আসছে গাড়িটা, যাবে কোনোদিকে কে জানে। ললিতার জীবনের পথও যেন তেমনি অন্ধকারে ঢাকা।

ললিতা চলেছে এই রেললাইনের দিকে। ইষ্টিশন অনেক দূরে। মেঠো পথ ধরে নির্জন রাতের অন্ধকারে চলছে ললিতা কি এক স্বপ্নের ঘোরে।

অন্যসময় কখনও একা দিনের বেলাতেই এ পথ দিয়ে যায়নি। দু'একবার ইষ্টিশানে এসেছিল, সেবার মেলা দেখতে গেছলো পরের ইষ্টিশানের মনসাতলায়।

সেই আধ চেনা পথ দিয়ে চলেছে ললিতা।

তখনও রাত রয়েছে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এসে স্টেশনে পৌছল।

এবার ভয় হয় চেনা-জানা তাদের গ্রামের কেউ আছে বোধহয়। চাদরটা দিয়ে সর্বাঙ্গ ভালো করে

জড়িয়ে এদিক-ওদিক সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখতে থাকে ললিতা।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়।

নাই। কেউ চেনা-শোনা নেই।

একটা ট্রেন এসে ঢুকছে। তখন ভোর হয় হয়। পুব আকাশ সব ফর্সা হয়ে আসছে। পাখিগুলোর ঘুম ভাঙতে ওরা কলরব শুরু করেছে। কুয়াশা ঢাকা মাঠ পার হয়ে দু-চারজন যাত্রীর আনাগোনা শুরু হয়েছে। ওদিকে প্লাটফর্মে চায়ের দোকানদার সবে উনুনে আঁচ দিচ্ছে।

অর্থাৎ লোকজন, যাত্রীদের ভিড় শুরু হবে এইবার, তাই সরে যেতে হবে ললিতাকে। সামনে ট্রেনটা এসে থেমেছে। এরপর আবার কখন গাড়ি কে জানে।

ললিতাও জানে না কোথায় যাবে সে, এতবড় দুনিয়ায় তার ঠাঁই কোথাও নেই। সামনের কমরাতেই উঠে পড়ল ললিতা। ট্রেনটা তখন ছেড়ে দিয়েছে।

নামবারও উপায় নেই। সবে আলো ফুটছে। দূরে তাদের গ্রাম থেকে আসার মেঠো সড়কটা দেখা যায়। তখনও সেই পথটা যেন কি অদৃশ্য মায়ায় তাকে ডাক দেয়, কিন্তু ফেরার পথ তার নেই।

ট্রেনটা চলছে বেশ জোরে, ক্রমশ সেই পথ, তার চেনা জগৎটা পিছনে পড়ে রইল, হারিয়ে গেল ললিতা।

চেকার ভদ্রলোক ওকে দেখে এগিয়ে আসেন। —টিকিট!

ললিতার চমক ভাঙে। পয়সাও তেমন কিছু নেই, টিকিটও কাটেনি।

ভদ্রলোক বলেন—সামনেই জংশন, বর্দ্ধমান। ওখানেই নেমে যেও, তারপর গেলে যদি ধরা পড়ো বিপদ হবে।

দয়া করেই বোধহয় তিনি ললিতাকে ছেড়ে দিলেন। ললিতাও চুপ করে বসে থাকে।

শহরেও কাউকে চেনে না।

এতবড় শহর দেখেনি এর আগে। গঙ্গাস্নান করতে কাটোয়ায় গেছে দু-একবার। কিন্তু বর্দ্ধমান তার চেয়েও বড় শহর। বড় রাস্তা পার হতেই হিমসিম খেয়ে যায়। ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে বাস ট্রাকগুলো।

কোনোরকমে এ পারে এসে দাঁড়াল ললিতা, কোথায় যাবে জানে না। জলতেষ্টাও পেয়েছে। খাবার জল কোথায় মেলে তাই দেখছে।

সামনের দোকানেই গিয়ে ঢুকল। চেয়ার টেবিল পাতা। অনেক লোকজন খাচ্ছে।

—একটু জল দেবেন?

ছেলেটা খিঁচিয়ে ওঠে—দানছত্র পেয়েছ? পয়সা থাকে তো বসে পড়ো —কি খাবে বলো। না থাকে—সরো দিকি বাপু। সরে আসছে ললিতা।

এরা শহরের লোক। তাদের গ্রামে তাদের বাড়িতেও অচেনা কেউ এসে এক গ্লাস জল চাইলে তারা এগিয়ে দেয়।

কিন্তু এখানে জলও দেয় না তারা।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল।

মাঝবয়সী মোটা কালো একটা লোক। পরনে ধুতি, ফতুয়া। ওকে বলে—জল খাবে? এসো, হ্যাঁরে, ভোঁদা একগ্লাস জল দে।

লোকটা বোধহয় দোকানের মালিকই।

সেই ছেলেটাই মুখ বোদা করে জল এনে দেয়। লোকটা দেখছে ললিতাকে। বলে—দুটো জিলিপি দে ভোঁদা—বসো।

ললিতার ভয় হয়, এবার পয়সা চাইবে। তাই বলে সে—পয়সা আমার কাছে তত নেই। ওসব খাব না। একগ্লাস জল দিলেই হবে।

লোকটা বলে—দাম দিতে হবে না। খাও তুমি। ললিতা একটু অবাক হয়।

লোকটা শুধোয়—কোথায় যাবে?

ললিতা চাইল। এর জবাব সে জানে না, লোকটা দেখছে তাকে।

বলে সে—বাড়ি থেকে চলে এসেছ বুঝি রাগ করে? তা বাড়িই বা কোথায়?

ললিতা লোকটার কথার সুরে কি আশ্বাস পায়। তার গ্রামের নাম বলে সে। কিন্তু অনেক দূরের কোনো ছোট্টগ্রাম, সেই গ্রামের খবর জানে না দোকানদার।

ললিতা বলে—কেউ আমার আর নেই। তাই পথেই বের হয়েছি—যদি কোথাও ঠাঁই পাই।

হরিচরণ নিজের চেষ্টায় ছোট দোকান থেকে এখন এই দোকানটা করেছে। পয়সা দুটো পেয়েছে, কিন্তু বাড়ীতে স্ত্রী চিররুগ্ন—দু'তিনটে ছেলে মেয়েকেও দেখার তেমন কেউ নেই।

স্ত্রীরও অসুখ লেগেই আছে। সংসারের হালও টলমল, ছেলে মেয়েদেরও অসুবিধা হয়। নিজে পড়ে থাকে দোকান নিয়ে। সরবার উপায় নেই।

জানে কাঁচা পয়সা—চুরি চামারি করে খেয়ে বসবে। তবু হঠাৎ এই মেয়েটাকে দেখে কি ভাবছে হরিচরণ। দেখেশুনে ভালো ঘরের মেয়ে বলেই বোধহয়।

হরিচরণ বলে—কাজ করবে তুমি? মানে ধর আমার বাড়িতেই থাকবে। আমার গিন্নীর শরীর ভালো নয়, তাকে একটু দেখাশুনা, ছেলেমেয়েদের একটু হেপাজত করা এই আর কি!

ললিতা ভাবতে পারেনি যে এত সহজে সে একটা আশ্রয় পাবে। লোকটাকে দেখে মন্দ বলে বোধহয় না। তাছাড়া বাড়িতে স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সংসারে থাকবে। কিছুটা ভরসা করতে পারে।

ললিতা কি ভাবছে।

হরিচরণ-এর এমনি একজন মেয়ের দরকার। সংসারের কাজ-এর সুবিধে হবে। হরিচরণ বলে, —খাবে দাবে থাকবে। পরণের কাপড জামা দেব, আর মাসে যা হোক কিছু টাকা দেব।

ললিতা ঘাড় নাড়ে—ঠিক আছে।

হরিচরণ খুশি হয়ে বলে—তুমি একটু বসো। দুপরে খেতে যাব—তখনই নে যাব সঙ্গে করে।

হরিচরণের গিন্নীকে ললিতা দেখে এগিয়ে যায়। হরিচরণ দুপুরে বাড়ি ফিরেছে। ললিতাও দেখছে লোকটার সংসারের হাল। দুটো বাচ্চা মেয়ে খেয়েছে এখনও এঁঠো কাঁটা যত্রতত্র ছড়ানো। কাকে ছড়াচ্ছে এঁঠো ভাত বারান্দাময়। এখনে ওখানে ছড়িয়ে আছে বাসন—ওদের জামা-প্যাণ্ট।

গিন্নী ওদের সাড়া পেয়ে বের হয়ে এসেছে।

কালো পোড়া কাঠের মতো চেহারা, লম্বা-হাত ক'খানা সার। আর শীর্ণ কাঠি কাঠি হাতে সোনার চুড়িগুলো পরে আছে, গলায় হার। ওই গহনাগুলো ওকে মানায়নি।

গিন্নীর নাকটা খাঁড়াব মতো।

শুধোয় সে হরিচরণকে—ওটা কে? বেশ সোমথ মেয়ে একটাকে তো দেখছি জুটিয়ে এনেছো? এ্যাঁ!

ললিতা চমকে ওঠে ওর ফাটা কাঁসার মতো গলার আওয়াজে। মনের সব জ্বালা আর তীব্র সন্দেহের কাঠিন্যে সেই সুর আরও বিশ্রী, কর্কশ হয়ে ওঠে।

হরিচরণ তার স্ত্রীকে চেনে। নিজেও কাজ করতে পারবে না। সংসার দেখবে না, আর একজন কাজ করার লোক হঠাৎ এসে গেছে, তাকে এনেছে কিন্তু গিন্নী তাতেও খুশি নয়।

ওর জিবের ধার জানে হরিচরণ। এতদিন ওর বাক্যবাণে জ্বলে মরছে তবু নিরীহ লোকটা মুখ বুঁজেই রয়েছে সবকিছু। হরিচরণ বলে,

—তোমার শরীর খারাপ। ছেলেমেয়েদেরও অসুবিধা হচ্ছে। একে পেয়ে গেলাম, বেশ ভালো ঘরের মেয়েই। বাড়িতে থাকবে, রান্না-বান্না করতে পারবে। তোমারও সেবাযত্ন হবে।

গিন্নী খ্যাঁক করে ওঠে। —আমার সেবাযত্নের কথা ভেবে দেখছি তোমার ঘুম নাই? এ্যাঁ—

গিন্নী দেখছে ললিতাকে। বয়স বেশি নয়। সারা দেহে যৌবনের ঢল। মুখ-চোখও বেশ টলমল। এককথায় চোখে লাগার মতো মেয়েই।

—গিন্নী এবার গর্জে ওঠে।

—কোত্থেকে জোটালে? এ্যাঁ—তা এতই যদি সখ আলাদা বাসা কবে 'রাখনী' করে রাখোগে, আদর সোহাগ করবে। ঘটা করে তাকে এ বাড়িতে এনে আমাকে সেবা কবাব নামে নিজে বাসলীলা করবে আব তাই সইতে হবে?

ললিতাব সাবা মুখ অপমানে বিবর্ণ হয়ে যায়।

কি বলতে যায় সে।

গিন্নী ধমকে ওঠে—থামো। ওসব ঢ্যাম্‌নামি ঢেব জানি। আমার ঘরে বসে আমারই সব্বোনাশ করার মতলব; এবার বলি ওই মিন্‌সেকেও, তিনকাল গে এককাল গেছে, এখনও পাপ মতি ঘুচল না?

পরক্ষণেই হরিচরণ অপ্রস্তুত হয়ে গেছে।

তাই এই লোক আনার জন্য বাডিতে এমনি অভ্যর্থনা জুটবে তা ভাবতে পারেনি। বলে সে,

কি যা তা বলছ?

গিন্নী এবাব সামনে পড়ে থাকা মুড়ো ঝাঁটা একগাছ' তুলে নিযে পতিদেবতাকেই আক্রমণ করেছে। ে-দোব মুখ ভেঙে। ওই পাপেই আমার সব গেল।

হবিচবণ সরে গিযে আত্মবক্ষাব চেষ্টা কবে। এবাব ওই হাতিযার হাতে গিন্নী ললিতার দিকেই রুখে দাঁড়াল।

—বলি যাবে না ঝেঁটিযে আপদ বিদেয কবতে হবে? এ্যাঁ—যাও—

ললিতাও ওই শীর্ণ কালীব উৎকট রূপ দেখে ঘাবড়ে গেছে। ওই বোগজীর্ণ প্যাকাটিব মতো দেহে এত তেজ। ওই গলায় এত দাপট থাকতে পাবে তা ভাবেনি। সাঁই সাঁই ঝাঁটা ঘুবছে, এগিয়ে আসছে ওই বণরঙ্গিণী।

ললিতা এমন অভ্যর্থনাব জন্য তৈরি ছিল না।

বের হযে এল সে। মহিলা ওব মুখেব উপব সশব্দে দবজা বন্ধ কবে গর্জাচ্ছে—এমুখো হলে ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেব। আব দেখছি ওই অনামুখো মিন্‌সেকে, এতবড় সাহস বাড়িতে বেশ্যামেয়ে এনে পুষবে।

আশপাশেব বাড়িব জানালা খুলে অনেক বৌ-ঝিদের কৌতূহলী মুখ ফুটে ওঠে। ললিতাও বুঝতে পাবে অনেকেই দেখছে তাকে।

লজ্জায় অপমানে দুচোখ ফেটে তাব জল নামে।

পাযে পাযে এগিয়ে যায় ললিতা, বাস্তাঘাটও চেনে না। তবু মনে হয যেভাবে হোক এই পাড়া থেকে বেব হয়ে যেতে হবে তাকে।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত অপমানিত ললিতা বড বাস্তায এসে পড়েছে। কাল থেকে খাওয়া নেই—ভেবেছিল সে একটু আশ্রয় পাবে। চাকরীটা সহজেই হাতে এসে পড়েছিল, শহরেব মানুষদের সম্বন্ধে ধাবণা বদলে গেছল তাব। ওবা সত্যি ভালো। তার বিপদ জেনে লোকটি তবু তাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু এব পবের ব্যাপাবটা যা দেখেছে তাতে শিউরে উঠেছে ললিতা। এত কদর্য, এত নীচ হতে পারে কোন মেয়ে এ ধাবণা তাব ছিল না। যাবে না জেনেই ললিতাকে ওরা কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছে।

এগিয়ে চলে ললিতা।

ইষ্টিশান-এর খোঁজ করে সেইদিকেই আসছে। একবার পথে বেব হয়েছে সে। থামবে না—দেখবে অন্য কোথাও তার জন্য কোনো আশ্রয় আছে কিনা।

সকালেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে।

পরাণ হাহাকার করে ওঠে—মেয়েটাকে তুমিই তাড়ালে, মা হয়ে এতবড় অপমানের উপর এই ঘা মারতে পারলে তুমি।

ললিতার মায়ের রাগ তবু যায়নি।

বলে সে—দ্যাখো আর কেউ গেছে কিনা? কোনো মুখপোড়ার সঙ্গে তার আসনাই ছিল, ও মেয়ে ডুবে ডুবে জল খেতো তা জানি। এবার মুখ পুড়িয়ে চলে গেল।

পরাণ তবু একথা মানতে চায় না। বলে সে, '

—না। আমার ললিতা তেমন নয়। কখ্‌নোই নয়।—

ললিতার মা শোনায়,

—তবে কোথায় গেছে দ্যাখো খুঁজে। ঘরে ফিরলে ঘটা করে এনে বসাও পাদ্য অর্ঘ দিয়ে। এ্যাঁ—

আমি বলে দিচ্ছি ও মেয়ে ঘরে ঢুকলে আমিও এবাড়িতে আর থাকব না। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো। উঃ কি কালামুখো মেয়ে গো। এমনি করে কুল মজিয়ে বেইরে গেল।

গ্রামেও সাড়া পড়েছে।

হঠাৎ নদীর ধারে আলু বাড়ী চাষ করতে গিয়ে এককড়ি ঘোষ দেখতে পায় একটা পুঁটলি। খান দুয়েক শাড়ি, জামা রয়েছে।

এই দহে এমন দুএকটা ঘটনা ঘটে গেছে এর আগেও।

মিত্তিরদের বড় বৌ এখানেই ডুবে মরেছিল, ডুবেছিল তার পরেও মুখ্যুজ্যেদের ছোট মেয়ে, তাদের মৃতদেহগুলো ভেসে উঠেছিল অনেক নীচের কাশবনে উজলপুরের ভাটিতে। এ জায়গাটায় সম্বন্ধে ওদের অনেকের মনেই গভীর আতঙ্ক রয়ে গেছে।

এককড়িও পুঁটলিটা এনে হাজির করে গ্রামের চাতরে। লোকজন জুটে যায়। নদীর দহে পাশে পড়েছিল, খবর পেয়ে ছুটে আসে পরাণ ঘোষও।

মাথা ঠুকে কাঁদতে থাকে সে।

—একি সব্বোনাশ করে গেলি মা।

তবু পরম সান্ত্বনা পরাণের তার মেয়ে কলঙ্কিনী নয়, বরং কলঙ্কের অপমানের প্রতিবাদ করে গেছে সে।

পরাণ ওর স্ত্রীকে আজ চীৎকার করে শোনায় কান্না ভিজে গলায়।

—দ্যাখো। মা আমার বের হয়ে যায়নি। বরং এইসব মিথ্যা জ্বালার হাত থেকে বাঁচার জন্য মা আমার নিজেকেই শেষ করে দিয়ে গেছে।

আজ ললিতার সম্বন্ধে অনেকেরই যেন ভুলটা ভেঙে গেল। আজ তাদের মনে হয়, যে কলঙ্ক তারা মেয়েটার মুখে মাখিয়েছিল সেটা সব সত্যি নয়।

তার এ সবে কোনো হাত ছিল না।

মদন দত্ত, তার অনুচর দু একজনেও এসেছিল চাতরে। তারাও দেখেছে সব।

নটবর বলে—ছুঁড়ি শেষ মেষ ডুবে মলো ছোটবাবু?

মদন দত্ত সেই বাদলার রাতে ওর চরম সর্বনাশ করেও থামেনি। ক্রমশ পরাণের জমিটুকুও কেড়ে নিয়েছিল এবার জানতো সে ললিতা অভাবের তাড়নাতেই তার হাতের মুঠোয় আসবে।

কিন্তু মেয়েটা তা হতে দেয়নি।

নিজেকেই এভাবে শেষ করে মদনের লোভী হাত থেকে যেন পালিয়ে গেছে।

মদন ব্যাপারটাকে তবু এদের সামনে তুচ্ছ করার ভঙ্গীতে বলে,

- যেতে দে ওসব বাজে ঝামেলা। চলতো—অনেক কাজ আছে। তহশীল আদায়পত্রের অনেক বাকী।

মদন দত্ত এখন নশীরামের যোগ্য পুত্রই হয়ে উঠেছে। বাপের চেয়ে আরও কঠিন হাতে সে আদায়পত্র

করে চলেছে।

কিন্তু মদনের মনে হয় কোথায় সে হেরে গেছে।

এই ললিতা তার হাত ফসকে বের হয়ে গেল।

পরাণ আর্তনাদ করছে। গুম্ হয়ে আছে ওর স্ত্রী। মনে হয় কোথায় একটা ভুলই করেছে তারা। ললিতা আজ নেই, কে জানে কোথায় সে। বেঁচে আছে কিনা তাও জানে না। তবু বলাই রায়, এককড়ি, গ্রামের অনেকে ওদের এই চরম বিপদে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

—আমরাও খুঁজে দেখছি নদীর ধারে পরাণ, যদি সন্ধান মেলে।

পরাণ-এর মন মানে না। জানে সে—ওই সান্ত্বনা আজ অর্থহীন।

চুপ করে একটা বেঞ্চে বসে আছে ললিতা।

প্লাটফর্মে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ির কথা মনে পড়ে; আজ তাদের সে ভুলে যেতে চায়। ভুলে যেতে চায় সে গ্রামের সেই ছায়ানিবিড় জগতের ছবিটাকে।

আজ সে পথের যাত্রী।

রাত্রি নামছে। যা ছিল তাই দিয়ে একটা পাউরুটি কিনে জল খেয়ে দিন কাটিয়েছে। তখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই নোতুন আশ্রয়ের ছবিটা।

এত দুঃখেও হাসি পায় ললিতার।

রাত্রি নেমেছে। প্লাটফর্মের যাত্রীরাও অনেকেই যে যার ঘরে চলে গেছে। আর দু-একটা ট্রেন গেলেই এই বড় প্লাটফর্মটা ঘুমিয়ে পড়বে।

দু একটা লোককে দেখেছে ললিতা তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে। আশে-পাশে ঘুরছে তারা। কেমন ভয় ভয় করে ললিতার; একটি যুবতী মেয়ে সঙ্গে কেউ নেই। মুখ-চোখে অসহায় বেদনার ছাপ ওদের নজর এড়ায়নি, কে জানে কি বিপদ আবার আসবে।

একটা ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। মাঝ রাতের গাড়ি।

কি ভেবে ললিতা ওই গাড়িতেই উঠে পড়ল। বেশ ভিড় রয়েছে গাড়িতে, লোকজন শুয়ে, বসে জায়গা ভরিয়ে রেখেছে। দাঁড়িয়ে রইল ললিতা। ট্রেনটা চলতে শুরু করে কিছুক্ষণ পরেই।

—বসো। দাঁড়িয়ে আছ কেনে? এ্যা। কে তাকেই বলছে কথাটা।

ললিতা চাইল, শীর্ণ লোকটা ওকেই ডাকছে।

বেঞ্চের এদিকে, ওদিকে যাত্রীরা ঢুলছে, ঝিমুচ্ছে, লোকটাকে দেখছে ললিতা। পাকানো চেহারা, গায়ে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, বুকের সামনে পানের কষ লাগার দাগ, ফুক্ ফুক্ করে বিড়ি টানছে। চোখ দুটোয় ঘুমের জড়তা।

বসলো গিয়ে ললিতা পাশে।

লোকটা শুধোয়—কোথায় যাওয়া হবে? এ্যা। সঙ্গে তো কেউ নাই দেখছি।

লোকটা তাকে দেখছে ভালো করে। অবলম্বন একটা পুঁটলি মাত্র?

রাতের অন্ধকারে অজানা পথে ট্রেনটা ছুটে চলেছে চাকার শব্দ তুলে। দু'একটা ষ্টেশন দাঁড়াচ্ছে, কেউ বিশেষ ওঠানামা করে না। আবার চলছে গাড়িটা। লোকটা সন্ধানী চোখ মেলে দেখছে তাকে।

চুপ করে থাকে ললিতা। সে জানে না কোথায় যাবে। তাই জবাবও দেয় না ওর কথায়। কামরায় অনেকেই ঘুমুচ্ছে।

দেখছে লোকটাকে, ওই চাহনিতে যেন একটা ধূর্ত ভাব ফুটে ওঠে। একটু ভয় হয় ললিতার। মেয়েদের কাছে পুরুষের চাহনি খুবই চেনা। ওর চাহনিতে তেমন একটা কিছু ভাব রয়েছে!

হাসছে লোকটা। বলে সে,

—লজ্জার কি আছে। আমার নাম রেবতী। রেবতীনন্দন দাস, সাকিম আসানসোল।

তারপরেই বলে লোকটা—বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছো বুঝি? তা একা একা? না আর কেউ?

ললিতা চমকে ওঠে।

রেবতী বলে ভয় নেই, পুলিশে খবর দিতে যাব না। একাই দেখছি।

ললিতার মনে হয় নেমে পড়বে সামনের ইষ্টিশনে। কিন্তু লোকটি তাও যেন বুঝে ফেলেছে। বলে সে,

—রাতের বেলায় এখানে নামা ঠিক হবে না। বেলা হোক, দিনবেলায় নামবে অন্য কোথাও। ভয় কি? বসো।

গুম্‌ হয়ে থাকে ললিতা।

বর্ধমান-এর নাম শুনেছিল, সেখানেই এসেছে গাড়িটা। বিরাট ইষ্টিশান—অনেক লাইন লোকজনের ভিড়। নামতে ভয় হয়, কোথায় যেন হারিয়ে যাবে সে। ললিতা চুপ করে বসে থাকে।

—চা খাও। চাইল ললিতা। এর মধ্যে নেমে গিয়ে রেবতী একভাঁড় চা এগিয়ে দেয় তার হাতে। তেষ্টাও পেয়েছিল ললিতার। চা-এর দরকারও বোধ করে, তাই ওটা নিয়ে চা খেতে থাকে।

রেবতী বলে—বাড়িতে কেউ তেমন নেই আমার। পথে পথে ঘোরার চেয়ে আমার ওখানেই দু-চার দিন থেকে যাও, রাগ করলে আমিই পৌঁছে দেব তোমার বাড়ীতে।

ললিতা জবাব দেয় না ওর কথায়।

রেবতী ওকে বলে—অবিশ্যি কি জানো দোষ-টোস করবো না, কারো বাড়ি থেকে আইবুড়ো মেয়ে বের হয়ে গেলে ফেরা মুস্কিল। তাই বলছিলাম ভয় কি? পথে ভগবান দেখা করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে একটা গতি ঠিক হয়ে যাবে। রেবতী কাজের লোক হে।

ললিতা বাইরে কখনও বের হয়নি। হঠাৎ লোকটাকে এভাবে এগিয়ে উপযাচক হয়ে সাহায্য করোতে দেখে তার মনে একটা সন্দেহ জাগে। ওকে এড়াতে চায় সে। তাই একটা পথ আছে হঠাৎ মনে পড়ে যায় কথাটা। তাদের গ্রামের কোনো মেয়ের বিয়ে হয়েছে বোলপুরে। বলে ললিতা- বোলপুর যাবো —দিদির বাড়ি।

বোলপুর তাদের গ্রামের বুয়ার বিয়ে হয়েছে। হঠাৎ লোকটার হাতে এড়াবার জনাই সে বলে কথাটা। রেবতী আরও ধুরন্ধর, সে বুঝেছে মেয়েটি তাকে এড়িয়ে যাবার জনাই বলেছে কথাটা। রেবতী একটু হেসে দরদীর মতো বলে, —তাই নাকি, ঠিক আছে বোলপুরের রেলওয়ে পুলিশ থানাতেই দিয়ে যাব। তোমাকে ওরা পৌঁছে দেবে। অবশ্য তোমার বাড়িতেও খবর দেবে।

ললিতা বিবর্ণ হয়ে যায় ভয়ে। চুপ করে বসে থাকে সে।

সকাল হয়েছে। সূর্য ওঠা আকাশ মুক্ত প্রান্তরের রূপ বদলাচ্ছে, উঁচু-নীচু চড়াই ধান ক্ষেতে এসেছে সোনালী রং। হঠাৎ একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে কাদের কলরব করে কামরায় উঠতে দেখে চাইল ললিতা। একজন বয়স্কা মোটা মতো মহিলা, সঙ্গে আরও তিন চারজন কমবয়সী মেয়ে—দু-তিনজন পুরুষও রয়েছে। ওরা ভিড় করে উঠছে, ওদিকে কে বলে,

—তোমরা এ কামরায় ওঠো, আমরা মালপত্তর নিয়ে ওখানে উঠছি। বোলপুরে নামতে হবে। ও মাসী। আগে থেকে তৈরী থেকো বাপু।

বয়স্কা মহিলা বলে—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আর গোপাল, সব দেখেশুনে বোলপুরে নামবি। যা ভুলো মন তোর।

ললিতার পাশে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসে মোটা মতো মেয়েটি। বলে,—ও মেয়ে একটু বসি বাছা!

ললিতা ওদের দেখে মনে বল পেয়ে বলে—বসুন মাসীমা।

মহিলা একটু যুৎ করে বসে শুধোয়—কোথায় যাবে বাছা?

ললিতা জবাব দেবার আগেই রেবতী জানায়—আজ্ঞে আমরা যাব সাঁইথে।

ললিতা অবাক হয লোকটার কথায়।

রেবতী বিড়িটার শেষ টান দিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বলে,

—পিসীমার খুব অসুখ, তাই পিসতুতো বোন আমার ওখানে ছিল ওকে নিয়ে যাচ্ছি। বয়স হয়েছে তো—শ্লেষার ধাত। সেবা যত্ন করার দরকার।

ললিতা এবার ফেটে পড়ে রাগে।

—কে আপনার পিসতুতো বোন। আমি চিনি না আপনাকে। ওসব কথা কেন বলছেন?

রেবতী একটু ঘাবড়ে গেছে, হঠাৎ সামলে নিয়ে বলে মহিলাকে—মানে ওর মাথাটা একটু কেমন হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

ললিতা দেখছে রেবতীকে। বিচিত্র লোকটা সহজভাবেই ওই মিথ্যা কথাগুলো বলে চলেছে। ললিতা বুঝেছে ওকে সে কোনোমতে নিয়ে যেতে চায়। ললিতা এবার তৈরি হচ্ছে প্রতিবাদ করার জন্যই। রেবতী বলে চলেছে—

ছেলেবেলায় টাইফয়েডের পর ভুল বকে-টকে, তারই চিকিৎসা করাতে গেছলাম আমাদের গাঁয়ের কন্দ কবরেজের কাছে। খুব নামী কবরেজ।

ললিতা এবার ফুঁসে ওঠে—মাসীমা। ওই লোকটা ভোর রাতে গাড়িতে উঠেছে, তখন থেকেই পিছু লেগেছে। ওকে আমি চিনি না—জানি না। ও আমার কেউ নয়।

হঠাৎ কেঁদে ফেলে ললিতা। ও জানাতে পারে না তার চলে আসার কথাটা। কিন্তু ওর কান্নায় বয়স্কা মহিলা এবার বুঝতে পারে ব্যাপারটা। ওই রেবতীর দিকে চেয়ে দেখছে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে প্রবীণ বয়স্কা মহিলাটি।

রেবতীর পাক দেওয়া চেহারা, চোখের কোলে কালির দাগ—পাঞ্জাবীতে পান খেয়েছে তারই পরিচয়, চেহারায় একটা মূর্তিমান অত্যাচার আর লালসার ছায়া। মহিলার চোখ এড়ায় না। ললিতাকে দেখছে সে। একেবারে গ্রামের শান্ত মেয়ে। বাইরে কখনও বের হয়নি ওর কথাটা সত্যি মনে হয় মহিলার।

ললিতা বলে—ও পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিল। ওর সঙ্গে না গেলে পুলিশে দিয়ে দেবে বলছে।

মহিলা এবার মেদের মৈনাক নিয়ে নড়ে চড়ে বসে হাঁক পাড়ে ভরাটি গলায়

—গোপলা। শোন—দ্যাখ তো একে।

ওদিক থেকে ইয়া জুলাপওয়ালা কালো মোটা লোকটা এগিয়ে আসে।

ডাকছ মাসী। কাছে এসে দেখছে রেবতীকে।

দলের মেয়েরাও এবার অবাক হয়েছে একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখে।

গোপালও গোলমালের গন্ধ পেয়ে এগিয়ে আসে আস্তিন গুটিয়ে। কামরার লোকজনও কৌতূহলী হয়ে ওঠে

রেবতী এবার বিপদে পড়েছে, বেশ বুঝেছে তার ধাপপা এরা বুঝে ফেলেছে। গাড়িটা একটা হলট স্টেশনে থামতে চলেছে। এবার রেবতী লাফ দিয়ে উঠে বলে ললিতাকে,

—তোর পাগলামি আমি ছুটিয়ে দেব। দাঁড়া বড়দাকে ডেকে আনি ওপাশের কামরা থেকে, বৌদিকেও আনছি।

রেবতী বলে—একটু দেখবেন মেয়েটাকে, আমি ভাজবৌ আর দাদাকে আনছি

এই বলে গাড়ি থামবার মুখেই নেমে পড়ে। নীচু খোয়াঢালা প্লাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে সে।

বিশুদা—অ-বিশুদা

গোপালও দেখছে তাকে, রেবতী তখন ট্রেনের কামরাগুলোর সামনে হেঁকে চলেছে,

—ভাজবৌ, আ বিশুদা। হাঁকছে আর অন্য কামরার দিকে এগিয়ে চলেছে। বাঁশী বেজে গেছে। ওর ডাক থামেনি।

ট্রেন এখানে থামে না বেশিক্ষণ, আবার চলছে গাড়িটা, গোপাল দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, ও বলে ওঠে,

—অ মাসী, শ্লা যে ট্রেনেই উঠল না গো। ফিকির করে সটকে গেল শ্লা। এ্যা—ওই যে দৌড়চ্ছে ধানমাঠ দে।

লোকটা যে ধড়িবাজ-জোচ্চোর মেয়েটাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিপদেই ফেলতো এবার বুঝেছে তারা।

ললিতার দুচোখে জল নামে। শুধায় মহিলাটি ললিতাকে,

—কোথায় যাবে বাছা? একা—জানো না শোন না বের হয়েছ? কি বিপদে পড়তে বলো দিকি?

ললিতা এবার বলে—আমাকে একটু ঠাঁই দিন মাসীমা। কোথাও যাবার ঠাঁই আমার নাই।

—সেকি মা! জানা নেই, শোনা নেই, সোমত্থ মেয়ে, বাড়ি কোথায়?

বয়স্কার কথায় বলে ললিতা,

—বাড়িতে আমার ঠাঁই হয়নি মাসীমা, বিনা দোষে সব আমার হারিয়ে গেছে, তাই অনেক দুঃখে পথে বের হতে হয়েছে। কোথাও ঠাঁই না পেলে রেলে গলা দিয়েই শেষ করে দেব নিজেকে ঠিক করেছি।

—আহা! বেচারা!

মাসী দুঃখ বোধ করে মেয়েটার জন্য। দেখছে সে ললিতাকে। কি ভেবে বলে, চুপ কর বাছা। সামনে বোলপুর ইষ্টিশানে নামব, চলো এখন। পথে কোথাও আবার বিপদে পড়বে। তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।

কি ঝামেলা দ্যাখো দিকি।

ওপাশের মেয়েটিকে বলে ওঠে—ও বিমলি ঃ পান দে বাছা। জর্দা দিবি। কেমন দিশে বিশে ঘুলিয়ে যাচ্চে সব। ওমা কি হল দেশটা।

পান-জর্দা মুখে দিয়ে মাসী যেন মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে চেষ্টা করে কি করবে সে এমন অবস্থায়।

লবঙ্গবালা এর আগে নিজেই ছিল নামকরা ঝুমুর নাচিয়ে, এ দিগরের বহু মেলায় ঘুরেছে, নাম ডাকও ছিল তখন। মাতঙ্গিনীর দলে সেইই ছিল মূল গাইয়ে। এখন বয়স হয়ে গেছে আর মেদের ভারে দেহটাও ভারি হয়ে উঠেছে। মাতঙ্গিনী মরে যাবার পর দলের ভার এসে পড়ে লবঙ্গের উপর. লবঙ্গ নিজে এপথে ছিল। ব্যবসা বোঝে। তাই লবঙ্গবালা এখন দল জমিয়ে নিয়েছে।

এ দলের বাঁধনদার দু'কড়ি ধরও নামী লোক এ লাইনে। সে তাকেই এখন বাঁধনদার করে রেখেছে লবঙ্গবালা। দল ভালোই চলে। কোনো মেলায় চলেছে বায়না নিয়ে।

অজয়ের মরা বালিচর পার হয়ে ট্রেনটা ঢুকছে বোলপুর ইষ্টিশানে। এরা মালপত্র গুছিয়ে নেয়। লবঙ্গ বলে ললিতাকে,

—চলো গো মেয়ে।

ললিতাও নামলো ওদের সঙ্গে। অচেনা জায়গা দেখছে সে বাইরে বড় বড় বাড়ি—ধানকলের চিমনিগুলি। স্টেশনের বাইরে দু'তিনটে গরুর গাড়িতে মালপত্র তুলে এবার শহর ছাড়িয়ে চলেছে ওরা। ললিতা চুপ করে বসে আছে গাড়িতে। ধূলি ধূসর পথ ধরে চলেছে। অবাক হয়ে নোতুন দেশটাকে দেখছে ললিতা। লাল—খোয়াই মাটি এর লাল। মাঠগুলো বিস্তীর্ণ শস্যরিক্ত!

ওরা দুপুর নাগাদ এসে পৌছায় মেলায়। নদীটা বাঁক নিয়েছে—সেই বাঁকর মাথায় আমবাগান—অর্জুন, বাঁশবনের জটলা, ওদিকে মাথা তুলেছে মন্দির। বহুকালের পুরোনো মন্দির।

সেই দেবতার উৎসবকে কেন্দ্র করে এই মেলা বসেছে। সারবন্দী ঘরও উঠেছে খড়ের ছাউনির।

বিস্তীর্ণ মাঠে দোকান পসার বসেছে, সার্কাস-এর তাঁবু পড়েছে—ওদিকের কাঠের আসবাব, গরুর

গাড়ির চাকা, জানালা-দরজা সব বিক্রি হচ্ছে।

ললিতা এতদিন দর্শক হয়েই ছিল তাদের ওখানের অনেক মেলায়। কিন্তু মেলার ভিতরের এই রূপটাকে দেখেনি। ওদিকে খড়ের চালার অস্থায়ী ঘরে বাসার ব্যবস্থা হয়েছে তাদের।

মালপত্র নামাচ্ছে ওরা। ললিতা দ্যাখে হারমোনিয়াম—তবলা, হেসাক্ আরও বাক্স-টাস্ক নামছে।

মাটিতে মাসী একটা শতরঞ্জি পেতে বসে তদারক করছে। ওদিকে সেই মোটকা গোপাল রান্না শুরু করেছে। হাত লাগায় মেয়েরাও।

ললিতাও গিয়ে কুটনো কুটতে বসেছে। সেই-ই শুধোয় মেয়েদের,

—এ কিসের দল? যাত্রার?

বিমলি বলে—কখনও দেখনি এসব না? আমরা ঝুমুরের দল গো।

ঘাড় নাড়ে ললিতা। মধবী শুধোয়,

—নাচ গান জানো?

গান গাইতে পারে ললিতা কিন্তু কোনোদিন ভাবেনি যে মেলায় আসরে এত লোকের সামনে গাইতে পারবে সে। তাই বলে ললিতা,

—না। ওসব শিখি নাই তো।

ওপাশ থেকে বিমলি বলে, তাহলে মাসী বিশ্বিপত্তর গুকিয়ে দেবে। তবে দ্যাখো না, চেহারাটা আছে, একটু নাচ যদি শিখতে পারো কন্দর্পের কাছে। ও তো মাসীর খুব পেয়ারের। তবে কি জানো শালার ছুঁক ছুঁক বাই আছে। কি রে মাধু, তোকে কি বলেছিল মিনসেটা।

মাধুরী বলে ওঠে —আমার কাছে সোহাগ কাভাতে এলে বঁটি দে নাক ঝোড়ে দেব কন্দর্পের, শালা মা মেগো।

কন্দর্পকে কেন্দ্র করে হাসির সাড়া পড়ে। বিমলি শাড়িটা কোমরে জড়িয়ে উঠে বলে—আমাকে সেদিন শ্লা মাল খেয়ে জাপটে ধরে আর কি।

হাসছে মাধুরী— ওমা। সে কি রে?

বিমলি বলে —আমিও এক লক্কা সরিয়ে দিয়ে বললাম তোর পিরীতের মুখে ঝাঁটা।

মিনসের কি আলানি। শ্লা খচ্চর।

ললিতা দেখছে এদের সবাই জানে ভাষা খড়-কুটো। আর ওইসব কথা শুনে ভয় পায় সে। কাকে শুধোয়,

--তোমার ঘর কোথায় ভাই? বিয়ে হয়েছে?

--বিমলি হেসে ওঠে—ওমা ঘর বর এসব কি কথা লা? আমাদের ঘর সব ঠাঁই আর বর—চাস তো নিত্যি নোতুন বরই জুটে যাবে। এক হাঁড়িতে দুদিন খাবি কি লা? নিত্যি নোতুন ধরবি।

ললিতা চমকে ওঠে।

সহজ জীবন এ নয়। কি যেন যন্ত্রণায় এরা বিবর্ণ হয়ে গেছে। ওদের হাসিতে সেই বিকৃতিই ফুটে ওঠে।

বৈকাল থেকেই শুরু হয় এদের প্রসাধন পর্ব। মেয়েরা সাজগোছ করতে বসে।

মাসীও তাড়া দেয়,

--কই লা হল তোদের? ওরে কন্দর্প আজ জমিয়ে গাইতে হবে বাবা! নোতুন কিছু বাঁধ। ওদিকে বিদ্যুৎবালার দলে শুনলাম নোতুন মেয়ে এসেছে—ভালো নাচে গায়।

কন্দর্প বলে —ওর জন্য ভেবোনা মাসী। কন্দর্প ওসব পরোয়া করে না, রং ছুটিয়ে দেব। কই গো মাধু—এক খিলি পান দাও না সখী, তোমার মিঠে হাতে পান খাই।

মাধুরী তখন সাজগোজে ব্যস্ত, ললিতাই পানটা এগিয়ে দিতে যায়। কন্দর্প দেখছে ললিতাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে। বলে,

—তুমি নোতুন এয়েছ দলে না? নাচ জানো? বেশ তো ছিপ্ ছিপে বাঁধন—পাতলা কোমর। চোখের ভাবও আছে যে গো মিষ্টি মিষ্টি। এ্যাঁ।

ললিতা কি লজ্জায় চুপ করে থাকে। হাঁসছে কন্দর্প টেনে টেনে।

বলে ওঠে কন্দর্প,

—ও মাসী, নোতুন মেয়েটাকে এবার তালিম দিই, দেখবে কি মাল বানিয়ে দেব। বুঝলে ললিতা—বিজলী বানিয়ে দেব তোমাকে।

মাসী বলে—তুই যা তো কন্দর্প—ওই তোর রোগ। ছুক ছুক স্বভাব তোর গেল না।

হাসে কন্দর্প—কি যে বলো মাসী। চলো গো সখীবৃন্দ—কুঞ্জে চলো এবার। রাসলীলা শুরু করি গ।

আমতলায় সামিয়ানার নীচে আসর বসেছে। চারিদিকে ভিড় করেছে দর্শকরা। মাসী একপাশে পানের বাটা নিয়ে বসেছে। কন্দর্পর পরনে সাদা ধুতি পাঞ্জাবী, একটা চাদর বরের বাপের মতো কোমরে বাঁধা।

ললিতা ভয়ে ভয়ে এসে বসেছে একপাশে। ওদিকে বসেছে অন্য দলের মেয়েরা।

আসর ধরেছে লবঙ্গবালার দল। ঢুলি-ঢোলে তখন গরম বোল তুলছে। কন্দর্প বরের বাপের মতো পোশাক পরে মাজা দুলিয়ে নেচে চলেছে ঢোলের তালে তালে আর আসর বন্দনার গান গাইছে।

এরপর উঠছে বিমলি, মাধুরী আরও দু·তিনজন। বিমলি চড়া গলায় সুর ধরেছে। বিচিত্র এক ধরনের গান।

ললিতা গান অনেক শুনেছে, সে নিজেও গাইতে পারে! কিন্তু এ গান, এ নাটক লাস্য আর হালকা চালই সম্বল। নাচছে ওরা ঘুরে ফিরে আসরে।

ওদিকে বসে আছে বিদ্যুৎবালার দল।

এদের আসরেব পর ওরা আসর নেবে। কন্দর্প বেশ রসিয়ে রসিয়ে বিদ্যুৎবালার দলকে শাণিত তির ছুঁড়ছে। আর বিমলিরা ধুয়ো ধরে নেচে চলেছে।

—বাহবা ভাই। ঘুরে ফিরে সখী। জলদে নাচ চলাব পর এবা বসেছে। ঢোল-এ তেহাই বাজে।

এবার বিদ্যুৎবালা নিজেই উঠেছে।

বয়স এখনও বেশি হয়নি, ছিপছিপে চেহাবা—মাজা মাজা রং। ওর গলাটা দ্রব্যগুণে একেবারে বেটাছেলের মতো ভরাটি—ঘ্যান ঘ্যান করছে।

বিদ্যুৎবালা ধুয়ো ধরে,

—ও বুড়ো নাগর পান খেয়েছে লো
যেন আগুন জ্বলে টিকেতে
মিনসের পাশে ধুমসী বসে
দে নুড়ো জ্বেলে সে মুখেতে—

বিদ্যুৎবালাব নাচনীরা নেচে গেয়ে গানের ধুয়ো ধরে,

—ও বুড়ো নাগব পান খেয়েছে লো,

এরপর বিদ্যুৎবালার বাঁধনদার কেষ্ট আবার উঠে যেন গরল ছড়াতে থাকে এদের বিরুদ্ধে। এ দলের মুখেই আগুন দিয়ে দিল সে।

দাঁড়কাক আবার ময়ূর হবে
সাজতে বড় সাধ লো—
লবঙ্গ হবে ঝুমুরওয়ালী
দেহ বেচা যার কাজ লো।

অশ্লীল ইঙ্গিতে কন্দর্প গর্জে ওঠে--কেষ্টা। মুখ সামলে।

হাসছে আসরের লোক। তারাও খেউরের নেশায় মেতে উঠেছে। বলে চালিয়ে যাও ভাই।

লবঙ্গের মোটা দেহ অপমানে এই শীতেও ঘামছে। তবু কোনোরকমে থামায় সে কন্দর্পকে। বলে লবঙ্গ,

—জবাব দিবি পরে, আর ছুঁড়িগুলোকে বল—নাচ কি ভুলে গেল। গান গাইতে শেখেনি ওরা।

দর্শকরা নোন্‌তা ঘিয়ের গন্ধে মেতে উঠেছে। বাহবা ওঠে, আজকের আসর নিয়েছে বিদ্যুৎবালাই। ওর নোতুন গাইয়ে মেয়েটা যেন আগুনের শিখার মতো নেচে চলেছে।

গানের পর ওরা ফিরে আসে বাসায়, মেলায় তখন কলরব, বাজি-বাজনা থেমেছে। লোকজন ঘরে ফিরছে। শীত রাতের হিমগুড়ি কুয়াশা নামে শস্যরিক্ত প্রান্তরে। মুখ বুঁজে ফিরছে এরা। শশী গজ গজ করে।

ললিতা কিছুটা বুঝেছে যে আজ হেরেই এসেছে তারা গানের আসরে।

মাসী বাসায় ফিরে ধপ্ করে বসে এবার গলা চড়ায়। চেঁচাতে শুরু করে।

—বিমলি, মাধু, বলি গান কি ভুলে গেছিস্ লা? গলা সাধবিনী--দিনরাত ফষ্টি-নষ্টি করবি! আর যত বলি নেশাভাং বেশি করিস্ না সামলে চল, গলা-গতর ভেঙে যায়। কে শোনে তার কথা। দোব সব কটাকে তাড়িয়ে দল তুলে—শ্যাল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে, তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল।

কন্দর্প গুম্ হয়ে বসে আছে। সে বলে,

—এদের একটাও যদি ভালো গাইতে পারতো আজ এভাবে হারতাম না মাসী, গান বাঁধছি - গলায় তুলতে হবে তো ঠিক মতন।

মাসী গর্জাচ্ছে।

সারা বাসায় যেন ঝড় বইছে। ললিতা চুপ করে বসে আছে।

গোপালের রান্না হয়ে গেছে। ডাকছে সে —খাবে নাই গো তোমরা। রাত ভোর হাঁসল আগলে বসে থাকব?

মাসী মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে—ছাই দিয়ে যা, এইবার ওই জুটবে কপালে। কন্দর্প নোতুন মেয়ে চেয়ে দ্যাখ্। ওদের তাড়াবো সব কটাকে না হলে দলই তুলে দেব।

বিমলিরা আজ চুপ্‌সে গেছে

ওরা জানে এখানে মাসীর আশ্রয়ে তবু গান গেয়ে নেচে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে আছে, নাহলে অন্য দলে দেহপশারিনী সাজতে হয়। নিষ্ঠুর, নির্মম, ঘৃণ্য সেই জীবন। এবার যেন সেই অন্ধকার নরকেই তাদের যেতে হবে। শিয়াল কুকুরের ভোজে লাগবে এবার তারা। মেয়েরা তাই চুপ করে গেছে।

মাসী বলে —যদি ঠিকঠিক গান করতে পারিস করবি, নাহলে কাল থেকেই দল তুলে দেব। শেষ কথা বলে গেলাম।

মাসী ওঘরে গিয়ে ঢুকল।

ওদের মধ্যে স্তব্ধতা নামে। ওরা সকলে চুপ করে আছে।

কন্দর্প বলে—এবার কি হয় তাই দ্যাখ। বুড়ো বয়সে এবার কোথায় যাই কে জানে, আর তোরাও এবার মরবি ওই নরকে

বিমলি, মাধুরী পটল অশান্ত মেয়েরা মাসীর এই রুদ্র মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেছে। আজ আসরে বিদ্যুৎবালা চরম অপমান করেছে তাদের। তাদের দলের নোতুন মেয়েটার নাচও যেমন—গানও তেমন। ঢং করে নেচে আসর মাৎ করেছে। এতকালের দল লবঙ্গবালার, তাকে পাত্তা দেয়নি। কন্দর্পও ভাবনায় পড়েছে। তাদের দলের মেয়েরা পুরোনো, একটা নোতুন ভালো মেয়ে পেলে কন্দর্প তাকে তৈরি করে নিয়ে আবার দল গড়ে তুলতো। কন্দর্প বলে—একটা গাইয়ে মেয়ে পেলে দেখতাম রে, কি হবে এবার

কে জানে!

ললিতা চুপ করে বসে আছে।

আজ সন্ধ্যায় সে দেখেছে ওদিকের আম বাগানের ধারে দেহপশারিনীদের ঘৃণা জীবনের কিছুটা। সারবন্দী তালপাতার খুপরী ঘর—বাইরে কঙ্কাল সার মেয়েগুলো সস্তা পাউডার মেখে ঝলমলে শাড়ি পরে বিড়ি টানতে টানতে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দের-এর আশায়। ওই তাদের জীবিকা।

ওই ওদের পরিণতি, একদিন রোগে ভুগে অনাহারে পচে মরে। এই জীবনকে কোনোদিন দেখেনি ললিতা। চমকে উঠেছে আজ এত কাজ থেকে এই জীবনকে দেখে।

ওই বিমলি, মাধুরী, বাসন্তীদের জন্য অপেক্ষা করে আছে সেই জীবন। সে নিজে কোথায় যাবে কে জানে। হয়তো রেবতী তাকে সেই ঘৃণ্য অন্ধকার জীবনেই ঠেলে দিত। আজ মাসীর জন্যেই বেঁচে এসেছে, ঠাঁই পেয়েছে এদের আশ্রয়ে। কিন্তু এদের কীর্তিটাও দেখেছে।

এদের জন্য তাই ললিতা কথাটা ভাবছে। গান গাইতে পারে ললিতা।

সে বলে—বাঁধনদার মশাই!

কন্দর্পের মেজাজটা ভালো নেই। বিড়ি টানছে বসে বসে। ললিতার কথায় বলে,

তোমার আবার কি হল? দুগ্গা বলে ঝুলে পড়োগে ওই পাড়ায়।

ললিতা বলে—বরাতে যদি থাকে তুমি ঠেকাতে পারবে না। তবে বলছিলাম গান একটু আধটু গাইতে পারি। আমায় দিয়ে হবে? আমি পারব?

কন্দর্প চাইল ওর দিকে।

দেখছে মেয়েটিকে। ছিপছিপে সুন্দরী—একঝলক বিজলীর মতো ওর রূপ। দেহটা যেন নাচের জন্যই তৈরি ও জানে না। কন্দর্প তার এতদিনের চোখ দিয়ে বুঝতে পারে। শুধোয়—গাইতে পারো? গান টান আসে?

ওরে বিমল হারমোনিয়ামটা আন্। দেখি নোতুন ময়না কি বলে।

মেয়েরাও ভিড় করেছে। দাওয়ায় হারমোনিয়ামটা এনেছে একজন।

কন্দর্প বলে—লাগাও মাইরী, দেখি তুমি ক্যামন গাইয়ে। জয় মা কালী—জমিয়ে দে মা!

ললিতার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতুলের মুখখানা। একটা হাল্কা চালের গান সে গাইতো, কোনো পালার গান।

ললিতা হাসতো। সেও তুলেছিল গানখানা। অতুলের গলায় সেই হাল্কা চালের গানের ঠেক—

লচক ছন্দ আর সুরটা আজও ভোলেনি সে। এতদিন গায়নি। কিন্তু তার অভ্যস্ত গলায় সুর-ছন্দ আসতে দেরী হয় না। ললিতা বেশ সহজভাবেই গানটা এবার গাইছে।

সুরের গলায় তাল মান লয় সব ফুটে ওঠে।

—সখী, আমায় বাঁধবি কিসে বল?
রূপ দিয়ে নয় ভালোবাসায়
হৃদয় টলমল।
প্রেম নয় রে, চোখের কাজল।
চোখের জলে যায়রে মুছে, দাম কি
তার বল্?

সঠিক ছন্দ গলার মুড়কি মোচড়গুলো নিপুণ ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে। বিমলি এবার চীৎকার করে ওঠে,

—ওস্তাদ গো? হায় হায়

ওরাও ধুয়ো ধরেছে—

কন্দর্প পোড়া বিড়িটা কি উত্তেজনার আবেশে ফেলে দিয়ে সোজা উঠে পড়েছে। নিখুঁত সুরেলা গলা, আর গাইবার ঢং তাল লয় মান সবতাতেই নিপুণতা আছে। ঝুমরীর দলে বহুকাল এ জিনিস আসেনি। মাতঙ্গিনীর গলা—তার ছাঁচ, গলার কাজ ছিল এমনি দানাদার।

সুরটা উঠেছে অন্ধকারে।

চমকে ওঠে লবঙ্গবালা। রেগে গিয়ে স্বীকার করে আজ সে। ক্ষেপে উঠে বাসায় ফিরে চীৎকার করে না খেয়েই ঘরে এসে শুয়েছিল, ঘুম আসেনি। নোতুন তেমন গাইয়ে না পেলে এভাবে হেনস্থা হওয়ার চেয়ে দল তুলে দেবার কথাই ভাবছিল। দুঃখ হয়, এতদিনের পর হেরে গিয়ে দল তুলে দেবে।

হঠাৎ গানটা কানে আসে। চমকে উঠেছে লবঙ্গ, বিছানায় উঠে বসেছে। এ যেন তার যৌবনের সেই মাতঙ্গিনীর গানই শুনছে। বন্দেজী লয়কারী গান। ঝুমুর দলের মধ্যে মাতঙ্গিনী এনেছিল নোতুন প্রাণের সাড়া অমনি গানের জন্য।

তারপর মেয়েরা এসেছে সমাজ বিতাড়িত হয়ে কোনোরকমে দু'এক কলি গাইতে শিখেই পেটের দায়ে আসরে নামছে। ফলে গানের উন্নতি হয়নি। সস্তা, রং, চপ, চুটকি আর খেউরি গেয়েই ঝুমুর গানকে নীচেই নামিয়েছিল, লোক-সমাজে ঝুমুর গানকে তুলে ধরছে বিকৃতরূপে তারা নিজেদের অক্ষমতার জন্যই।

হঠাৎ ওই গানটা শুনে লবঙ্গ বের হয়ে আসে। নোতুন কে গাইছে।

হ্যারিকেনের আলোয় দেখে ট্রেন থেকে আনা ললিতাই গাইছে আর বাকি মেয়েরা মায় কন্দর্প অবধি নাচছে কি আনন্দে। বেদম নাচ চলেছে।

গানটা তখনও গাইছে ললিতা তন্ময় হয়ে। কন্দর্পের গায়ের ধুসো চাদরটা কোমরে জড়ানো। বিমলিও তালে তালে ভাউ বাৎলে নেচে চলেছে। ওদের নাচ গান এক ছন্দে ফুটে ওঠে লবঙ্গের চোখে। ওর মুখ চোখে ফুটে ওঠে আশার আনন্দ এমনি একটি নোতুন গান জানা মেয়েই খুঁজছিল সে।

কন্দর্প মাসীকে দেখে বলে

—পেয়েছি গো ঠাকরুণ। খ্যামটি খুঁজছিলাম তার চেয়েও সরেশ। পথ থেকে ই যি মানিক কুড়িয়ে এনেছ গো। দ্যাখো এবার কি করি গান যা জানে আমাকেই শিখিয়ে দেবে গো। নাচ—শুধু ঢং আর ভাউ বাৎলে দেব বাস। চালাও পানসী। তোমার বিদ্যুৎকে এবার কানা করে দেব মাসী।

লবঙ্গ দেখছে ললিতাকে। এবার যেন নোতুন করে চিনতে পারে ওকে। লবঙ্গ বলে,

সে কি রে দেখবি চেষ্টা করে দ্যাখ বাছা—মন চায় তো এপথে আয়, না হলে জোর করব না ললিতা।

মাসী কি ভেবে শোনায়,

—এ পথে বড়ো দুঃখ আর ঘেন্না, বড দুঃখের জেবন বাছা।

ললিতার জীবনে ওই ঘৃণা অপমান সবই জমাট হয়ে উঠেছে। সামনে তার কোনো পথই নেই। তবু এই গানের মধ্যে তৃপ্তি পায় সে। বলে ললিতা,

—আর তো সব পথে কাঁটা দিয়ে এসেছি গো মাসী। অনেক জ্বালা সয়েছি। দেখা যাক্ এখানের জ্বালাটি ক্যামন।

কন্দর্প বলে বাস। তাহলে কাল থেকেই লেগে যা। একদিনেই তৈরি করে দেব।

কালই গাইয়ে দেব তোকে। খান তিনেক গান তুলে নে আর নাচ।

মাসী বলে—কাল গান বন্ধ। পরশু গুরুবার। ওইদিনই প্রথম নামবে আসরে ললিতা, বিদ্যুৎবালার দলের সঙ্গেই পাল্লা হবে। পারবি তো রে?

ললিতা বলে—দেখা যাক মাসী, আশীর্বাদ করো যেন তোমার মুখ রাখতে পারি।

লবঙ্গ মাসী বলে—কাল পরশু তালিম নে দিনভোর—আর কন্দর্প ভালো করে ছড়িয়ে দে কথাটা নোতুন গাইয়ে এনেছি দলে। সেরা গাইয়ে।

খবরটা বিদ্যুৎবালার দলেও পৌঁছেছে। ছড়িয়ে পড়েছে মেলায়, গ্রাম-গঞ্জে। দু'দিন ধরে ললিতাকে তালিম দিচ্ছে। গানগুলো কন্দর্পের কাছ থেকে ললিতা তুলে নিয়েছে সহজেই, তার নিজস্ব সেই ভঙ্গীতে আরও সার্থক করে গাইছে। নাচের বেশ কিছু ঠাটও তুলেছে।

মাসী নিজে দেখে বলে—একটা নাচই নাচবি তুই, বাকিগুলো নাচবে ওরা। গানটাই বেশি গাইতে হবে তোকে। বিমলি, মাধু নাচবে।

ঝুমুর গানের বেশ কিছু মুগ্ধ শ্রোতা আছে এই অঞ্চলে। তাদের কাছে লবঙ্গের দলের নামও জানা। সেদিনের আসরে বিদ্যুৎবালা হঠাৎ বেকায়দায় ফেলেছিল তাদের।

অনেকে খুশি হয়নি।

তারপর দিন আর গায়নি লবঙ্গের দল।

অনেকেই মনে প্রশ্ন জাগে। বিদ্যুৎবালা একা আসর পেয়ে গেয়েছে। পালার পয়সা সব পেয়েছে।

—বিদ্যুৎবালা বলে, লবঙ্গের দলই উঠে না যায়।

বিদ্যুৎ-এর দলের লোক নাকি সেই খবরই এনেছে।

কিন্তু পরদিন মেলায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। লবঙ্গবালা হেরে চলে যাওয়ার পাত্রী নয়। দু'দিনে সে নোতুন মেয়ে এনে তৈরি করে আসরে নামাচ্ছে। বন্দেজী গান জানা মেয়ে। আর পথে পথে ঘোরা মেয়েও নয়। গেরস্থ ঘরের গান-নাচ শেখা মেয়ে। দেখতেও দারুণ, বয়সও বেশি নয়।

বিদ্যুৎবালার দলের গুপ্তচরবাহিনীর একজন এর মধ্যে এদের বাসায় এসে দেখে গেছে, ললিতার নাচ, গানও শুনছে। সে গিয়ে বিদ্যুৎ-এর দলে খবরটা জানায়।

—হ্যাঁগো মাসী নিজের চোখে দেখে এলাম। গানও গায় খাসা। নিপাট মিষ্টি গলা, মাল ফাল খায় না—তাই গলায় যেন মধু ঝরছে মেয়েটার।

বিদ্যুৎ-এর দলের বাঁধনদার পালমশাই বলে,

—থাম তো তুই। একেবারে কুষ্ঠি-ঠিকুজী দেখে এসেছে। ওসব ঢের দেখা আছে। আসুক আসরে, এবারে তুলো-ধোনা করে দেব না।

বিদ্যুৎবালাকে অভয় দেন পালমশাই।

—এই নিয়ে ভেবো না বিদ্যুৎ। আমি তো আছি। আমি থাকতে তোমার দলকে কেউ টানতে পারবে না। দেখবে আজকের আসরে কি করি।

এপক্ষও তৈরি। লবঙ্গের দলের লোকও ওদের ডেবায় খবর ঠিকই আনে। কন্দর্প আজ বুকে বল পেয়েছে। লবঙ্গও পুরোনো আমলের থেকে দল চালিয়ে আসছে। ওরা এবার ভরসা পেয়েছে।

অজানা ভয়ে বুক কাঁপছে ললিতার। এ পথে কোনোদিন আসেনি। কিন্তু আজ ভাগ্য তাকে এমনি পথেই এনেছে। সেও শেষ চেষ্টা করবে, মাসী তাকে আশ্রয় দিয়েছে, এদের তাকেও মনে রাখতে হবে।

আসর ভরে গেছে লোকের ভিড়ে। এর মধ্যে দর্শকরাও দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে। একদল বলে—লবঙ্গবালার দল কি আজকের রে। পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। দেখবি আজ।

বিদ্যুৎবালা দুদিনের বিজয়ী মেজাজ নিয়ে এসে বসেছে আসর জাঁকিয়ে।

লবঙ্গবালাও লোকজন, মেয়েদের নিয়ে আসরে এসে নমস্কার করে ঢুকল। ললিতা কেমন ঘাবড়ে যায় এত লোক দেখে। মাসী বলে,

—ঘাবড়াবি না। ভয় কি?

ওদিকে বিদ্যুৎও দেখেছে তাদের। ললিতাকেও দেখেছে বিদ্যুৎ। তার সেই জয়ের মেজাজটা রয়েছে। বলছে সে তার দলের মেয়েদের,

—ভয় কি লা? নোতুন মেয়েটার ভয়ে ঘাবড়ে গেলি নাকি? এ্যাঁ!

তিন তুড়িতে উড়িয়ে দেবো দ্যাখ না। অ পালমশাই আজ কিন্তু কাঁচা রং গাইবে এন্তার।

—বিদ্যুৎবালা সেদিনের জয়ের গৌরবে আজ আসর ধরেছে প্রথমে।

পালমশাই লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেয়ে নেচে-কুঁদে আসর বন্দনা করে ধুয়ো ধরেছে—সেই রঙের ধুয়ো। কাঁচা খেউর ছড়াচ্ছে। আর বিদ্যুৎও নাচিয়ে মেয়েদের নামিয়েছে, ওরা আসর গরম করে তুলছে যেন লবঙ্গবালার দল উঠে পাত্তা না পায় এ আসরে।

কন্দর্প বিড়ি টানতে টানতে বলে অ মাসী, আসরে যে গাঁজলা ছুটিয়ে দিলে গো? কাঁচা খিস্তী গাইছে।

লবঙ্গ বলে—দিক। মাতঙ্গিনীর দল তার গানই গাইবে। ঘাবড়াসনি ললিতে, ঠিক ঠিক গেয়ে যাবি। কোনো ভয় নাই।

—ওদের রং ছিটানো শেষ, এবার এদের পালা। হারমোনিয়ামে গৎ বাজছে। বাঁশের বাঁশিও দিয়েছে আজ, বেশ মিষ্টি লাগছে পরিবেশটা। মোটা সুর ধরেছে অতীন বাঁশিতে। লবঙ্গ আসর ধরেছে।

হঠাৎ মিষ্টি একটা সুর আলতোভাবে বাতাসে ভেসে আসে, চমকে ওঠে আসর ভর্তি লোক, সুরটা বেজে ওঠে—আসরে দাঁড়িয়েছে ললিতা এই প্রথম তবু সে এতটুকু ভয় পায়নি। মনে হয় চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অতুল। তার গানই গাইছে সে।

সেই সুরটা ভেসে আসে,

—সখি আমায় বাঁধবি কিসে বল?
রূপ দিয়ে নয় ভালোবাসায় হৃদয় টলমল।

রং ছড়ানো সস্তা আসরের সব বেশ কেটে গিয়ে যেন আঁধার ফুঁড়ে আলো আসছে, সাধারণ মানুষকে এমনি গানের সন্ধান এরা দিতে পারেনি—আজ নোতুন রূপে সেই গান এনেছে ললিতা।

বন্দেজী গলা—নিখুঁত লয়কারী ঢোলে যোলকুশি আড়া বাজছে নাচের ছন্দে। একটি আলোর বিন্দু যেন আসরে ছড়িয়ে পড়েছে নাচের ভঙ্গীতে।

বাহবা—কি বাহবা।

মুগ্ধ দর্শকদের মধ্য থেকে সাবাস ধ্বনি ওঠে। ললিতার গলা আরও সোচ্চার হয়ে ওঠে পুরো জোয়ারীতে।

সপাটে পঞ্চমে গলা তুলেছে ললিতা—আলোর ঝিলিক খেলছে যেন মেঘঢাকা আকাশের গায়ে। দর্শকরা চুপ করে গেছে।

অবাক হয় বিদ্যুৎবালা। লবঙ্গ আজ অন্য পথে গেছে। মাতঙ্গিনীর গান শুনেছে বিদ্যুৎ। এ সেই হারানো দিনের বন্দেজী গান ফিরে এসেছে নোতুন রূপে।

বিদ্যুৎ এবার ঘাবড়ে গেছে। এর জবাব তার দিতে পারবে না।

লবঙ্গবালা ভাবতে পারেনি, ললিতা এতখানি ব্যাপার ঘটিয়ে দেবে, কিন্তু একা সেই-ই আজ আসর মাৎ করেছে তার গান দিয়ে

ধুয়ো ধরে কন্দর্প,

—পাঁকেতে পদ্ম ফোটে তাই
পাঁককে পদ্ম বলে?
বিদ্যুৎ শুধু নামই তার,
থাকে না সে মেঘের কোলে।

বিদ্যুৎবালার মুখটা তামাটে হয়ে ওঠে। কিন্তু বেশ বুঝেছে আজকের আসরে তাকে নোতুন অস্ত্রে কাৎ করেছে লবঙ্গ। ওই নোতুন মেয়েটির তুল্যি কেউই নেই, এবার ওই মেয়েই হবে মধ্যমণি। ললিতার গানটা জেগে ওঠে,

—ভেবে দ্যাখ মন—কি করে দিন কাটে?

পোড়া পেটের দায়ে,

রং মেখে সং সেজে কি হায়

ফুরিয়ে যাবি ভবের হাটে।।

রূপ যোবন, দু'দিন বই তো নয়,

তাই দিয়ে বিকিকিনি,

করিস্ যেন পথে-ঘাটে।।

ও ভেবে দ্যাখ্ মন রে—

টপ্পার কাজগুলো ছড়িয়ে পড়ে ফুলঝুরির মতো নানা বর্ণে।

প্রশংসা ওঠে চারিদিকে। .... ললিতারা এবার আসর ছাড়তে উঠেছে কেষ্ট পাল —বিদ্যুৎ-এর দলের।

বেঁটে টাক মাথা মানুষটা আবার সেই কুৎসিত খেউর শুরু করতেই দর্শকরা গর্জে ওঠে—এ্যাই কেষ্ট, খবরদার বাজে ভাড়ামি করবে না, ওই ধাঁচে গান গাইতে বলো, নাহলে ওই পোঁদ নাচানো থামিয়ে দেব।

কে ধমকে ওঠে—খবরদার কেষ্টা। টাকে ইট মারব।

কেষ্ট পালের টাক ঘামছে। ওই পুঁজি, ওই সাধনা তার নেই, তার দলের মেয়েদেরও তেমন নেই। এ এক নোতুন কলে পড়েছে সে।

বিদ্যুৎবালার মুখটা তামাটে হয়ে গেছে। রেগে গেছে সে। আজ লবঙ্গ তাকে হারিয়েছে।

বলে সে—আসর ছেড়ে দে কেষ্টা। গাইব না এখানে।

হৈ হৈ করে ওঠে জনতা।

কে বলে, তাই যাও। ওহে কন্দর্প— তোমার দলই গাক্। যেতে দাও ওই পাতিহাঁস-এর দলকে। হঠ্‌রে। ওই ললিতাকেই গাইতে দাও কন্দর্প। দু-চারখানা ভালো গান শুনি।

সেই রাতে ললিতা দেখেছিল নোতুন এক জগৎকে, ওই আলো-আঁধারির রাজ্যে তার গান কি সাড়া এনেছে। ওদের চোখে মুখে দেখেছে কি এক উত্তেজনা। ললিতার নিজের সারা মনে তারই সংক্রমণ। নোতুন একটি মাদকতা তার সারা মনকে গ্রাস করেছে।

আজ লবঙ্গবালার দল হৈ চৈ করে বাসায় ফেরে। কন্দর্প এর মধ্যে খুশির ধমকে এক পাইট ধেনো গিলে বেশ আমেজে আছে। বিমলি বলে,

—আজ দলের মান রেখেছিস ললিতা।

—ললিতার সারা মনে কি নিবিড় উত্তেজনা। সেও জানত না যে তার দ্বারা এ নাচ গান হতে পারে।

খোলা আসরে দাঁড়িয়ে সে আজ ওই মানুষগুলোকে যেন হাতের মুঠোয় এনেছিল। আজ ললিতার মনে হয় নিজেকে সে মেলে ধরবে। ভয়ে, অপমানে কুঁকড়ে থাকবে না। তারও ক্ষমতা আছে, এতদিন সেই ক্ষমতার সন্ধান সে পায়নি। শুধু অপমান, গঞ্জনা সয়ে মরতেই চেয়েছিল। আজ তাকে ফিরে পেতে হবে অনেক কিছু, কি যেন নেশার মতো এই চাওয়ার স্বাদ তাকে পেয়ে বসেছে আজ।

লবঙ্গ বলে—ওরে অ ললিতা, নে কিছু টাকা কড়ি রাখ্। নোতুন জামাকাপড় কিনবি। আর ফি মাসে খোরাকী ছাড়াও হাতে পাবি সত্তর টাকা।

অনেক টাকা।

বিমলি বলে—তাহলে দলেই রইলে কিন্তু ললিতা। দেখো ভাই চলে যেওনা।

কন্দর্প রঙের ঘোরে বলে,

হিয়ার টান গো, কন্দর্পের পেরেমে পবে গেছে ও। আব দেখবা ললিতা তোমাকে কি বানিয়ে ছাড়ি। এতদিন পর শিষ্যা একটা পেয়েছি মাইরি। আহা--

ললিতার কাছে এই মেলার জীবন, ওই গান, আলো-আঁধাবিব রাজ্যটাই অনেক সত্যি বলে বোধ হয়। আর কোনো ঠাঁই তাব নেই। ঘব থেকে ওকে বেব করে দিয়েছ মানুষগুলো, তাব মনে একটা রাগই বযে গেছে। সে তাই যেন প্রতিশোধ নিতে চায়--জ্বালিয়ে দিতে চায় ওদের ওই লোভী মানুষগুলোকে।

অতুলের কথা মনে পড়ে। অন্ধকাব, নিঃসঙ্গ রাত্রে দুঃসহ সেই জ্বালা আব একটা অপরাধ বোধ হয় কুবে কুবে খায় তাকে।

আজ ললিতার সাবা দেহে মনে নোতুন একটি সত্তাব জন্ম নিয়েছে। এই ললিতাকে সে চেনে না। এতক্ষণ নিজেকে ভুলে গিয়ে ললিতা অন্য এক জগতে হাবিযে গেছল। আলো ঝলমল—সুরময় একটি জগৎ, হাজাবো মানুষেব কলবব, কোলাহল ছাপিযে ওদেব সামনে নিজেকে মেলে ধবেছিল একটি তারই নোতুন সত্তা।

ললিতা এতদিন সহ্য করেছে, অভাব অভিযোগ, অপমান আব গঞ্জনা। পায়নি জীবনে কিছুই।

একজনকে ভালোবেসে ঘব বাঁধাব স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু সেই স্বপ্ন সার্থক হযনি। হারিয়ে গেছে অতুল কোনো অন্ধকাবে তাকে একা ফেলে বেখে।

ললিতাকে তাই চরম লাঞ্ছনা সহ্য করে সব হাবিযে পথেই বের হতে হযেছিল। কোথাও ঠাঁই না পেলে মবতেই হত। তবু এবা তাকে তুলে এনেছে, আজ তাব জীবনেব অতলান্ত অন্ধকারেব মাঝে একটি বিচিত্র জগতেব সন্ধান দিয়েছে। এই তাব জগৎ।

ললিতাব পিছনেব কোনো পবিচয় আব নেই।

আপনজনও কেউ নেই সব হাবিযে গেছে। অতুলেব কথা মনে পডে।

ভালোবাসাব স্বপ্নই দেখেছিল ললিতা। কিন্তু মনে হয সাত্যি তাব কি দাম।

অতুলও তাব কোনো খোঁজই কবেনি। বেঁচে আছে কিনা ললিতা তাব জন্য কোনো ব্যাকুলতা তাব নেই। এই দুনিয়া শুধু স্বার্থপরই

ললিতা তাই এই পথকেই মেনে নেবে।

লবঙ্গবা দল নিয়ে ফিরেছে।

ওদিকে ঝিমলি, পটল, মাধুবীবা হৈ চৈ করছে। কন্দর্প বসে গেছে ওদেব দলে। এদিকে ললিতাকে একলা দেখে চাইল লবঙ্গ। কি ভাবছে মেয়েটা।

লবঙ্গ জানে না ওব সঠিক পবিচয়। তবে এটা বুঝেছে যে মেযেটা বাড়ি থেকে অনেক দুঃখ, অপমান সহ্য কবেই বেব হয়ে এসেছে

আজকেব খ্যাতিব নেশাটাও দেখেছে লবঙ্গ।

লবঙ্গ এগিযে আসে—কি বে একা বসে আছিস্?

ললিতা চাইল ওব দিকে।

লবঙ্গ এখন আব ওকে ছাড়তে চায না। দলের জন্যই ওকে দরকাব। লবঙ্গ বলে—ঠান্ডা লাগাস্‌নে, ঘবে যা। ওদেব ওখানে যাস্‌নি কেন?

ললিতা জবাব দিল না।

চুপ কবে থাকে। লবঙ্গ বলে,

—পিছনের কথা ভেবে লাভ কি বল? সে সব দিন তো আব ফিবে আসবে না। আর বলি বাছা—যাবা এমনি কবে পথে বেব কবে দিতে পেবেছে, তাবা কি এমন আপনজন রে?

কথাটা সত্যি।

ললিতাও ভাবছে আজ তাদেব আঘাতেব কথা।

লবঙ্গ বলে,

---এই খানেই থাকতে হবে বাছা। সব দুঃখ ভুলে, হেসে খেলে বাঁচতে হবে, না'হলে দুঃখের কথা ভাবলে কূল পাবি না বাছা।

যা হিম লাগাস নে। গলায় কিছু জড়িয়ে নে। গলাই এখন মূলধন। গতর-গলা এসবের যত্ন নিতে হবে।

ভোর হয়ে আসছে। খড়ো ঘর—বাঁশের ঘের। হু হু হাওয়া আসে। ঘুম ভেঙে গেছে ললিতার। তখনও এদের অনেকেরই ঘুম ভাঙেনি। সারা মেলার লোকজন দোকানীরা অনেক রাত অবধি মেলায় বেচা-কেনা সেরে ভিড় সামলে ঘুমুচ্ছে।

ললিতা বের হয়ে এল চাদর জড়িয়ে।

ওদিকে চলেছে পায়ে পায়ে। গ্রামের বাইরে বাগানে মেলা বসেছে। এদিকে ফাঁকা মাঠ। তখন সবুজ হয়ে আছে ছোলা, মটর কলাই-এর পাতায়। শিশির ঝলমল করে।

ললিতা জানে না তার গ্রাম এখান থেকে কত দূরে।

এখন রোদহয় সূর্যের প্রথম আলো পড়েছে সেখানে। পাখিরা কলরব করছে।

একই পরিবেশ, কিন্তু ললিতার সেখানে কোনো ঠাঁই নেই। আজ নোতুন পরিচয়ে তাকে বাঁচতে হবে।

লবঙ্গের ঘুম ভাঙে সকালে। বের হয়ে এসে এদিক ওদিকে ললিতাকে না দেখে একটু অবাক হয়। গেল কোথায় মেয়েটা।

ওদিকে রাত অবধি মাল খেয়ে ঘুমুচ্ছে অন্য মেয়েরা। কন্দর্পও নাক ডাকছে।

লবঙ্গ কোথাও ললিতাকে না দেখে চমকে ওঠে।

কে জানে বিদ্যুৎ-এর দল ওকে ভাগিয়ে নিয়ে গেল কিনা।

চমকে ওঠে লবঙ্গ। ওর হাঁক-ডাকে জেগে ওঠে সকলে।

লবঙ্গ বলে—ললিতাকে দেখছি না। কোথায় গেল?

কন্দর্প চমকে ওঠে---এাঁ। শালা কেষ্ট পাল ভাগিয়ে নে গেল নাকি? কাল রাত থেকেই কেটেছে নাকি?

--গোপলা। লবঙ্গ বলে—দ্যাখ তো। কোথায় গেল।

হৈ চৈ পড়ে যায়।

হঠাৎ ললিতাকে দেখে চাইল। লবঙ্গ বলে,

—অ মা। কোথা গেছলি?

ললিতা বলে—কি ব্যাপার। ভোরে উঠে একটু ঘুরে এলাম মাসী। কই চা ফা হল গোপালদা?

আবার সহজ অবস্থা ফিরে আসে এখানে।

চা নিয়ে বসেছে সকলে। ললিতার মনে হয় ছিন্নমূল কিছু মানুষ জীবনের তীব্র গরল জ্বালায় ছিটকে পড়ে এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে। এ যেন একই পরিবার। সুখে-দুঃখে এরা একত্রে থাকার চেষ্টা করছে।

মেলায় কালকের গানের আলোচনা হয় অনেক জায়গায়তেই। হৈ-চৈ করছে তারা।

আজ বৈকালে আসর জমবে আবার।

বিদ্যুৎবালাও চেষ্টা করবে. কন্দর্প বলে,

—গাইতে দাও মাসী। দেখবে আজও ওদের কোণঠাসা করে দেবো। কি গো ললিতে? নোতুন গান খান তুলে নাও বাপু। নাচটাও অভ্যাস করো, হয়ে যাবে ক্রমশ।

গোপাল বলে,

—এতেই রক্ষে নেই গো। দলের নাম ছুটিয়েছে ললিতাদি রাতারাতি কিন্তুক।

লবঙ্গও সেটা জানে।

ক্রমশ এখানে অন্য মেলা চলছে তাদের দলকে সেখানে গান গাইতে নিয়ে যাবার জন্য।

কন্দর্প বলে— এবার দলের নাম-ডাক বাড়ছে। একটু কসে বায়না নিস মাসী। টাকা কিছু বাড়াবে কিন্তু।

লবঙ্গও তা জানে।

বলে সে—তাই হবে কন্দর্প। তুই বাপু মেয়েটাকে আর একটু যত্ন করে তালিম দে।

কন্দর্প বলে—সে তোমাকেই ভাবতে হবে না দ্যাখ্ না ক'মাসেই ওকে কি বানিয়ে দিচ্ছি।

লবঙ্গের চোখে ললিতা কি সম্ভাবনা আনে।

তার সূত্রপাত হয় এখানের মেলাতেই।

ললিতার নাম ছড়িয়ে পড়ে। পর পর তিনদিনের আসরে লবঙ্গবালার দলের নাম বের হয় আরও বেশি করে। আর ললিতার গান-নাচই তার প্রধান আকর্ষণ।

লবঙ্গবালা এবার নিশ্চিন্ত হয়। বুড়ো বয়সে দল তুলে দিতে হবে। সেই অবস্থাতেই পড়ত যদি না দৈবাৎ সেদিন ট্রেনের কামরায় ললিতাকে কুড়িয়ে পেত।

মাসী বলে—অ ললিতে, সময়ে খাওয়া নাওয়া করবি মা। এ সাধনার জেবন। আর পারিস তো ওই ছুঁই পাশগুলো ছুঁবি না।

ললিতাও সেই কথাটা ভেবেছে। দেখেছে দলের মেয়েদের। সন্ধ্যার পর ধেনো না হয় চোলাই মদও এসে যায়, আর মেলার সস্তা ঘুগুনি, আলুর দমও আসে। লঙ্কায় লালচে, বিষ ঝাল। সেই চাট দিয়ে ওরা মদ গেলে, আসর থেকে ফিরে রাতের বেলাতেও মদের নেশায় বেঁহুস হয়ে থাকে।

এর প্রধান উদ্যোক্তা ওই কন্দর্প।

লোকটা শয়তান, বাস্তুঘুঘু চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে। সেই চোখে দেখেছে ললিতা সুব্ধ চাহনি। মদ গেলে লোভের দহনে তার সেই চোখের চাহনিটা তখন ভয়াল হয়ে ওঠে। মেয়েরা ফিসফিসিয়ে বলে—ওটা রাক্ষস। উদু উবু মেয়েছেলে গিলে ফেলে। ওর ধারে কাছে যাস নে ললিতে, গিলে খাবেক তুকে।

হাসে কন্দর্প কি যে বলো মাহবী। তুমি আমাকে ভয় পেও না ললিতা সখী ওরা ব্যাটাছেলে পেলে গিলে খায় গো।

ললিতা হাসে। তবু এড়িয়ে থাকে লোকটাকে

কিন্তু নাচ গানের রেওয়াজের সময় দেখেছে লোকটা নাচের ভঙ্গী দেখাবার ছল করে গায়ে পিঠে হাত দেয়, সেই হাতটার নরম স্পর্শ ললিতা টের পায় তবু সাবধানে থাকে।

লবঙ্গেরও নজর আছে ওর দিকে।

এ মেলায় কৃতিত্বের পর তারা চলেছে এবার সাদিপুরের মেলার দিকে। ক'মাস ওদের অনুষ্ঠানে হুক বাঁধা বাড়ছে এর পল্লীপ্রান্তরে এখন ওখানে ছড়ানো মেলার অভাব নেই। ওরা সেখানে গিয়ে আসর বসায় আর ভালো নামডাকওয়ালা দল হলে মেলা কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়ে যায় বায়না করে ভালো দল গেলে মেলার নামডাক বাড়ে।

এ মেলায় কিছুদিন গান করার পর মেলা উঠে যায়। সাজানো হাট ভেঙে যায় —প্রান্তরে পড়ে থাকে এঁটো পাতা—ছাই গাদা -খুটি পোঁতার দাগ। এত লোকের পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে যায়। নেমে আসে শূন্যতা।

এরা যায় আবার নোতুন জমজমাট মেলায়।

খেলা ভাঙ্গার খেলা চলে এদের জীবনে। পথে পথেই ঘোরা কুমুদীর দল, দেহপশারিনী দল—কিন্তু দোকানদাররা এইভাবে এক হাট থেক অন্য হাটে ঘোরে পথেই কাটে তাদের জীবন, পথেই সংসার। আবার জীবনটাও কোনোদিন এমনি করে পথেই হারিয়ে যায়।

ললিতা ক'মাসে এই বিচিত্র জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

এ যেন গড়ানো পাথর, কোথাও শেওলা জমে না।

কন্দর্প বলে—এবার জলেশ্বরের মেলায় চলেছি সখী। ভালো আসর। এটাকে জমিয়ে ধরতে পারলে ব্যস্। আবার গায় কে।

ললিতার উপরই যেন দলের মান-সম্মান নির্ভর করছে।

লবঙ্গ বলে—মেয়ে আমার চৌকস্ রে। এখানেও নাম-যশ পাবে। তাহলে দেখবি বদনবাবুদের ওখানেও বেশ ক'পালার বায়না হবে।

কন্দর্প হাসে—তাই তো বলছি মাসী, কি গো সখী পারবে তো?

বদনবাবু এই দিগরের বিরাট ব্যবসাদার। আট-দশটা ধানকল, কি সব কারখানার মালিক। লবঙ্গবালারও চেনা মানুষ। তখন বদনবাবু এত বড়লোক হয়নি। লবঙ্গের গান শুনে একটা সোনার হার দিয়েছিল তাকে।

এখন বদনবাবু ও দিগারের সেরা দল বেছে নিয়ে তার ওখানে স্পেশাল নাচগান করায়। শহরের কলকাতার কিছু লোকজনও আসে। বদনবাবুর সেদিকে দরাজ দিল।

বদনবাবু বলে—বাঈজীর পিছনে টাকা ঢালার থেকে লোকশিল্পী মেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে।

লবঙ্গ জানে সেই উৎসাহটা কি ধরনের। বদনবাবুর রাত্রির অন্ধকারে রূপটাকেও চেনে সে। তবু তার আসর দিগরের নামী আসর। নিজেই বিরাট মেলা বসায়—আসর বসায়। টাকাও দেয় তিনগুণ।

ললিতা ভাবছে কথাটা।

নোতুন মেলার পরিবেশে এসে পড়েছে তারা। কন্দর্প নেমেই দৌড়লো।—বাসাপত্রের ঠিক করে আসি।

ললিতা এই জীবনে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কোনো বাগান-দিঘীর চারপাশের মাঠে দোকানপত্র বসে। একদিকে যাত্রা—কবিগানের আসরের সামিয়ানা, অন্যদিকে সার্কাস—বাজী—ম্যাজিকের তাঁবু। অন্যদিকে দোকান পসরা আর তাদের জন্য এলাকাও প্রায় নির্দিষ্ট থাকে।

সারবন্দী কিছু অস্থায়ী ঘর—আর তাদের আসর বসে এদিকে। তার একটু ওপাশেই প্রায়ান্ধকার পরিবেশে তালপাতা, সরকাঠির বেড়া দেওয়া একটানা ঘরগুলো জমা হয় দেহপশারিনীর দল। অন্ধকারে তারা এদিক ওদিক অপেক্ষা করে, প্রায়ান্ধকার জগতে আসে বুভুক্ষু মানুষগুলো।

ওই মেয়েদেরও দেখেছে ললিতা।

ঝিমলি বোধহয় তাদের ঝুমুরির দল উঠে গেলে ওদের দলেই নামতে হবে এই কথাটাই বলেছিল। ওরা নাচ-গান তেমন জানে না। তাই দেহটাকেই বিকি করতে বাধ্য হয়েছে বাঁচার তাগিদেই। আর কিছু আছে, তারা এককালে গাইতো—নাচতো। ঝুমুরির দলেই ছিল। সেই সম্পদ হারিয়ে যেতে গিয়ে ওই অন্ধকার নরকেই পড়েছে।

ললিতা চমকে উঠে কথাটা ভাবল।

মাসীও বলে—তাই বলি ললিতে রূপ, যৌবন, গলা থাকতে আখের গুছিয়ে নিয়ে সরে যাবি, না'লে ওই নরকে গে পড়বি। কুকুর শ্যাল-এ ছিঁড়ে খাবে।

ওই ছুঁড়িগুলোর মতোন ছাঁই পাশ গিলে আর অত্যাচার করে দেহ-গলাটাকে শেষ করিসনে।

এই জীবনের গভীর বেদনাটাকে এতদিন দেখেনি। কিন্তু ভয় হয় ললিতার। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে যেন এক অতল গহ্বরের সামনে এসে পড়েছে, যার সামনে থেকে ফেরার পথ তার জানা নেই।

বার বার মনে পড়ে সেই ফেলে আসা ঘর, সেই শান্ত দিনগুলো আর অতুলের কথা। সব কোনো রাত্রির দেখা স্বপ্নে পরিণত হয়েছে তার কাছে। বাস্তবে আজ সে-সবের কোন অস্তিত্বই নেই, শুধু সব হারিয়ে ললিতা আজ নাম পরিচয়হীন একটি বিচিত্র নারীতে পরিণত হয়েছে।

গান গেয়ে, নেচে আজ তাকে হাজারো মানুষের মন ভুলিয়ে বেঁচে থাকাব মাশুল দিতে হচ্ছে। মনে হয় এই জীবনের যন্ত্রণা, দুঃখকে ভোলবার জন্যই বিমলি, মাধুরীরা মদ খায়।

তবু দেখেছে মাধুরীকে।

নেশার ঘোরে সেদিন হু-হু করে কাঁদে। জড়িতকণ্ঠে চীৎকার করে—আমার ঘর, ছেলে--সব কোথায় হারিয়ে গেল।

শালা কুত্তার দলের মুখে আমি থুথু দিই।

ওয়াক থু— মদের ঘোরে চীৎকার করে সে।

মাসী গজরায়—মরণ। ছুঁড়ির সাতকেলে ভাতার এসে শঙ্খ বাজো ঘরে নে যাব না গো। চুপ কর।

কন্দর্প দেখেছে ওই মাধুরীর বিবশ দেহটা, জড়িয়ে ধরে আদর করে—চুপ কর মাধু।

আবার দিনের পড়ন্ত আলোয় এরাই সব দুঃখ ভুলে মোহিনী সাজে সেজে আসরে নাচ গানের তুফান তোলে।

ললিতাও তার অজান্তেই এদেরই একজন হয়ে গেছে।

এ মেলাতে এসে পথের সংসাব খুলে আবার ক'দিনের জন্য ঘর বাঁধে তারা। গোপাল রসুইদারও উনুন পেতে হাট-বাজার করতে বের হয়।

মেলাতেই এত লোকের থাকা-খাওয়া, তাই ক'দিনের জন্য আনাজপত্র, নুন তেলের দোকানও বসে। গোপাল বাজাব-হাট করে এনে বলে,

—তরকারি কুটে দাও গো দিদিরা।

কন্দর্প এদিকে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে। নোতুন দু-একটা গান তুলতে হবে। পুরোনো নাচগানগুলোকে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

কন্দর্প হারমোনিয়াম এর সুর তুলে গান শেখানোর পালা নিয়ে পড়েছে। বলে সে,

—গোপাল, একটুন কড়া করে চা বানাও মাইরী। গলা কাঠ হয়ে গেল।

মেয়েরাও চায়ের কাপ বের করে।

কে আনায় গরম আলুর চপ, বেগুনী।

সকাল-সকাল খেয়ে দেয়ে দুপুরে ঘুম দেয়। উঠে বৈকালে তারপর থেকেই সাজগোজ-এর পালা শুরু হয়।

এই নাচ গান চলে রাত দুপুর অবধি। আসর জমলে আরও দেরী হয়। গানের ফাঁকে ফাঁকে শীত রাতের ঠান্ডা কাটানোর জন্য মদও গেলে। তখন এদের দিশেবিশে থাকে না।

নাচ-গান আর রং খিস্তীর উষ্ণতার এরা বদলে যায়। গান থামে, তখন রাত্রি অনেক। মেলার স্তব্ধতা নামে। রোশনী নিভে যায়।

ক্লান্ত ঝুমুরের দল বাসায় ফিরে যা হোক কিছু মুখে দেয় কেউ; কেউ মদে চুর হয়ে এলিয়ে পড়ে। ঘুম নামে।

মেলার ঘুম ভাঙে অনেক বেলায়।

রাত অবধি নেচে-গেয়ে তারা ক্লান্ত। দোকানদারদের খাটা-খাটুনির পর শুতে রাত্রি হয়। দর্শকরাও দিনেরবেলায় এদিকে ভিড় করে না। মেলা জমে আবার বৈকাল থেকে। তাই সকালে ওদের ওঠার কোনো তাড়া নেই।

সকাল থেকে বেলা দুপুর অবধি সারা মেলার মানুষ জন দোকানদার ওই ঝুমুর দলের মেয়েদের জীবন চলে ঢিমে তালে।

বেলায় উঠেছে ললিতা, চায়ের গ্লাসটা নিয়ে বাইরে এসে দেখে লবঙ্গবালা এর মধ্যে উঠে স্নান সেরে জাঁকিয়ে বসেছে পাশে, রয়েছে একটি মাঝবয়সী লোক। মাসী বলে ললিতাকে,

--পেন্নাম কর ললিতে। মহৎ ব্যক্তি। চাকলার মধ্যে ধনী মানী লোক। তোর গান শুনে দেখতে এসেছে। এরপর এখান থেকে ওদের মেলাতেই যাব।

ললিতা দেখছে লোকটাকে। পরনে গবমেব পাঞ্জাবী, শাল। বেশ যুৎসই চেহারা। একজোড়া গোঁফ যেন শিকারী বিড়ালের মতো ঝুলছে, চাহনিটাও বিচিত্র।

মাসী ওকে খাতির করে বসিয়েছে। কন্দর্প ছুটোছুটি করে ভালো ফুলকাটা কাপে চা বিস্কুট এনে দেয়—নিন্ স্যার।

লোকটা যে বেশ দামী এদের কাছে তা বুঝেছে ললিতা। মাসীর কথায় উঠে এসে প্রণাম করে। ঘুম থেকে উঠে এসেছে। ললিতার কাপব আলুথালু, জামাটাও আলগা রয়েছে।

ললিতাব সুঠাম দেহের রেখাগুলো স্পষ্ট হযে ওঠে।

উদ্দাম যৌবন বাধা মানে না। ললিতা দেখেছে ওই লোকটার চোখে কি লালসা ভরা চাহনি, দুচোখে দিয়ে তার পুরুষ্ট যৌবনকে চেটে চেটে খাচ্ছে লোকটা। ললিতাও ইচ্ছে করে একটু হাসল।

ছুরির ফলাব মতো সেই হাসিটা ওই লোকটার বুকে চেপে বসে।

কন্দর্প দেখছে ব্যাপারটা। লোকটাও লোভী নেকডেব মতো। লবঙ্গ বলে,

তাহলে বদনবাবু, ওই কথাই রইল। এখানের মেলা সেরে সিধে আপনাদের মেলায় যাব। গরুব গাড়ি পাঠাবেন খান চারেক। তবে ক্ষুরণ কিন্তু দেড়শো টাকাই লাগবে। গান-নাচ দেখে নেবেন।

বদনবাবু গদগদ হয়ে বলে নিশ্চযই। ওব জন্য ভাববে না। নাও, ধরো আগাম বাখো। আর ললিতাকে কিছু ইস্পেশাল বকশিয দিয়ে যাচ্ছি, ধবো পঞ্চাশ টাকা।

লবঙ্গ বলে –নে উনি দিচ্ছেন।

ললিতা বুঝতে পাবে লোকটা টাকা দেবাব ছল করে ওর নরম হাত দুটো একটু বেশি করে ধরতে চায়। চোখ দিয়ে যেন গিলে খাচ্ছে তাকে।

এই চাহনিগুলো চেনে ললিতা।

এক নিষ্ঠুর রাত্রে দেখেছিল দৈত্যগুলোর চোখে এমনি চাহনি, সবকিছুই লুট করে নিয়েছিল তাব। যেন তাদের স্বগোত্রীয় একজন। ললিতা তাদের এবাব একহাত দেখে নেবে। ঘৃণা করে সে ওই মানুষগুলোকে। এবমধ্যে দেখেছে ও বিচিত্র জীবদেবও।

সেদিন আসর ছেড়ে আসছে—তখনও দর্শকদের দাপাদাপি চলছে, এই কদিনে ললিতা নাচটাও রপ্ত করেছে, তার নাচ গান যেন আসরে ঝড় তোলে এখন। সেই রাত্রে ললিতা হঠাৎ কার ডাকে দাঁডাল।

একটি তরুণ এগিয়ে আসে, কাছে এসে কটা নোট দেখিয়ে ওর হাতটা ধরেছে। টলছে ছেলেটি মদের নেশায়। ওকে টাকাব লোভ দেখিয়ে ওই অন্ধকারে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ললিতা ওর টাকাগুলো নিযে বলে—এদিকে এসো না। ঘরে।

ছেলেটার মুখ চোখ চক্‌চক্ করে খুশিতে।

ছেলেটা কি নেশার ঘোরে আসছে, ওপাশে খাডা পুকুরের খাদ, জল অনেক নীচে, হঠাৎ ললিতা অন্ধকারে ওর গায়ে পড়ার ভান করে একটা ধাক্কা দিতেই ওর মাতাল দেহটা গড়িয়ে নীচের পুকুরেই পড়েছে, ঝপ্ করে শব্দ ওঠে।

ছেলেটা কিছু বোঝবার আগেই সটান ছিটক পড়েছে এই শীত রাতে সোয়েটার, চাদর সমেত ওই দিঘীর জলে। হাবুডুবু খাচ্ছে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে।

হাসছে ললিতা খিল্ খিল্ করে।

--কোথায় গেল হে নাগব। এ্যা শীতের রাতে চুম্বুরি ভিজে হয়ে গেল গো। পাপ নেয়ে ধুয়ে এসো মাইরী।

এ যেন তাব কাছে একটা খেলা।

কন্দর্প আসছিল পিছু পিছু, ও দেখেছে ললিতাব সঙ্গেব ওই ছেলেটিকে। এ পথে এসব হয়।

কন্দর্প তবু মনে মনে চটে উঠেছে। ললিতা ওকে দেখে দাঁড়াল। মেলাব আলোব একটু আভাস আসে এখানে, সেই আলোয় ওকে দেখে চিনতে পাবে- তুমি

কন্দর্প বলে—ই সব ভালো লয় বে। যাব তাব সঙ্গে মিশিস না। ওকে জলে ফেলে দিলি?

হাসে ললিতা। বিচিত্র একটা বাঁধভাঙা হাসিব ঝলক তুলে বলে,

—মাইবী। চটেছ। শ্লা তোমাব ভাগ কেড়ে খাচ্ছিল গো।

কন্দর্প এগিয়ে আসে। তাব দেহমনে কি নেশা জাগে। একদিন যেন এমনি একটি ডাকেবই অপেক্ষা কবছিল সে—ললিতা।

হাসছে ললিতা। বলে সে,

বেশি জ্বালিও না মাইবী পথ ছাডো তো। নাহলে তোমাকেও ওই পুকুবেব জলে চুবিয়ে দেবো নোতুন নাগবেব মতো।

-এাই। কন্দর্প সাবে দাড়াল। হন হন করে চলে যায় ললিতা বেশ গর্বিনীব মতোই।

আজেও বদনবাবুকে টাকা দিতে দেখে কন্দর্প। মেয়েটা যেন কাঁদানেব কি ঝড তুলেছে ঘাবে বাইবে। কন্দর্প চুপ কবে দেখে মাত্র

তেজী মেয়েটাব পিছনে সে লেগে আছে প্রথমদিন থেকেই, কিন্তু দেখছে ললিতা ঠিক বিমলা, মধুদেব দলেব মতো নয়। একটা তেজ ওব আছে।

কন্দর্প এগোবাব চেষ্টা কবেও থেমে আছে, কিন্তু হাল ছাডেনি। জানে কোন পথে এগোতে হবে তাকে। এ জগতে কেউ ই আসবে তাকে কন্দর্প বেহাত হতে দেবে না। নাচ গান শিখিয়ে আজ ললিতাকে ধুমুব দলেব সেবা নাচিয়ে কবে তুলেছে। ওব জন্যই ললিতাব এই নাম। এব প্রতিদান একদিন উসুল কবে নেবে ওই ধূর্ত লোকটা

ও জানে বদনবাবুব স্বভাবেব কথা।

ভাল টাকা সে দেয় টাকা দিয়ে সব কিনে নিতে চায় লোকটা। মাসীকেও বদনবাবুর টোপ গিলতে দেখে খুশি হয় কন্দর্প

বদনবাবুব মেলাব বাইবে টিনেব ঘবগুলোয় ওদেব থাকাব ব্যবস্থা হয়েছে। পাকা ঘব। ওদিকে খালেব পাবে বদনবাবুব বাগান বাডি।

মেলাব আসবেব ভিডে বদনবাবু তাব মানী অতিথিবা যান না তাদেব জন্য আলাদা আসব বসে ওই বাগানেব হলঘবে

সেজেগুজেই গেছে ওবা।

কন্দর্প আজ পাট ভাঙা ধুতি, পাঞ্জাবী, সিল্কেব চাদব গলায় ঝুলিয়েছে। ললিতাবে মাসী দামী শাডি কিনে দিয়েছে। সাজলে-গুজলে মানায়ও চমৎকাব মেয়েটাকে।

কন্দর্প বলে ওকে দেখে,

—ই যে মোহিনী মূর্তি হয়েছ গো সখী, মাথা ঘুবিয়ে দেবে বদন বক্সীব। জমকালো আসব। হলঘবে ফবাস এব উপব গালচে পেতে বসেছে বদন বক্সী। তাব সাজপোষাক বিচিত্র। আতবদানী থেকে আতব ছডানো হচ্ছে কাঁচেব পাত্রে মদও আসছে আসবে।

ললিতাকে গ্লাস না তুলতে দেখে বদন বক্সী বলে

—খাও

ললিতা বলে—খাই না ওসব

বদন বক্সীব মোটা দেহটা হাসিতে কেঁপে ওঠে। খিক খিক কবে হাসছে সে অবাক হয়ে।

—এ্যাঁ। অমৃতে অরুচি। অ মাসী তোমার ললিতে সখী কি গো?

ঠিক আছে। নাচো ভাই—নাচিয়ে দিতে হবে বুঝলে?

মদের ফোয়ারা চলেছে। কন্দর্পের চোখটা লাল—বাঁধনদার তখন গড়ানদারের পরিণত হয়েছে। ক্লান্ত ললিতা এখানের আসরে এসে চমকে উঠেছে। নাচ গানটা এখানে গৌণ, অন্য কিছু একটা কাণ্ড ঘটতে পারে।

মাসীও কখন উঠে গেছে।

হঠাৎ চমক ভাঙে ললিতার। বদন বক্সী এগিয়ে আসছে তার দিকে।

লোকটাকে বুড়ো ভালুকের মতো দেখাচ্ছে।

হাসছে সে —কি হল। শোনো—কাছে এসো মাইরী। কত খুশি হয়েছি তোমার নাচ দেখে, মাইরী ললিতা।

ওকে দুটো কঠিন হাত যেন পিষে ফেলতে চায়। অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে ললিতা—না। না।

ওকে ওদিকে নির্জন ঘরে টেনে নিয়ে চলেছে জানোয়ারটা মনে পড়ে ললিতার সেই বৃষ্টি মুখর এক নিষ্ঠুর রাতের কথা। সেদিনও একদল জানোয়ার তাকে এমনি করে টেনে নিয়ে তার সর্বস্ব লুট করেছে।

আজও তেমনি একটা কঠিন থাবা এসে পড়েছে তার মুখে। চোপ! সতীপনা?

ছিটকে ফেলে তাকে লোকটা।

বাধা দিতে চায় ললিতা, মদ্যা লোকটা কঠিন হাতে তকে ঠেসে ধরেছে। তার মনে হয় দেহের সব ভার দিয়ে যেন পিষে ফেলবে তাকে।

—ললিতার সব প্রতিবাদ কোনদিকে হারিয়ে যায়। হেরে যাচ্চে সে। অসহায়, বেদনায় দুচোখ দিয়ে জল নামে। রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে ললিতা কি দুঃসহ গ্লানির অতলে।

তবু রাত্রি শেষ হয়, আবার সূর্য ওঠে মাঠে প্রান্তরে।

ললিতা গুম্ হয় বসে আছে। লবঙ্গ দেখেছে তাকে ওভাবে বসে থাকতে, কথা বলে না সে। লবঙ্গ জানে কালকের রাত্রির কাহিনীটা, তার নীরব সম্মতিও ছিল, বিনিময়ে অবশ্য বদন বক্সী তাকেও বেশ ভালো দামই দিয়েছে।

মাধবী, বিমলিরাও অনুমান করেছে ব্যাপারটা।

কন্দর্প খুশি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। চায়ের গ্লাসটা এনে নামিয়ে দিয়ে বলে, চা খাও সখী, সাত সকালে এমন উদাস হয়ে কার কথা ভাবছ গো?

ললিতা বলে—যমের কথা।

হাসে কন্দর্প--বালাই ষাট! সে কি গো। কত রং রঙ্গিলার জেবন। ঝম্-ঝম্ আসছে কাঁচা পয়সা। এই তো বয়েস। জেবনটাকে ভোগ করে নাও গো। তা নয় ভাবছ কিনা যমের কথা।

ললিতার সারা মন কি দুঃসহ গ্লানিতে ভরে উঠেছে। কন্দর্প সরে গেল। ললিতা একাই বসে আছে। এখানে ভেবেছিল কিছু সান্তনা পাবে, নির্ভর কিন্তু দেখেছ আজ এখানেও সেই শ্বাপদের রাজ্য। কাল রাত্রির ঘটনাকে ভুলতে পারে না ললিতা। সারা দেহ মন কি ঘৃণায় রি রি করে।

লবঙ্গের ডাকে চাইল।

লবঙ্গ জানে সবই। বদন বক্সী তাকেও ভালো পাওনাই দিয়েছে খুশি হয়ে। দু-এক জায়গায় এভাবে নৈবদ্য দিতে হয় লবঙ্গকে। নাহলে দল-এর সুনাম বজায় রাখা যাবে না, বদন বক্সীর মতো লোকজন হাঙ্গামা করে এখান থেকে উঠিয়ে দেবে। অন্য মেলাতেও গিয়ে হাঙ্গামা করবে। তাই এসব দেবতাকে খুশি রাখতে হয়।

মেয়েটাকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে লবঙ্গ বলে,

—অ ললিতা, বেলা হয়ে গেল যা তেল মেখে আভাং করে দিঘীর জলে চান করে এসে খেয়ে দেয়ে

একটু ঘুমো। সন্ধ্যায় আবার আসর আছে।

ললিতা চাইল ওর দিকে।

বলে সে—এসব আর ভালো লাগে না মাসী। ওই নাচ গানের নামে যা কাণ্ড চলে, জানলে এ পথে অসতাম না।

লবঙ্গ অবাক হবার ভান করে।

মরণ। আরে বাবু এই বয়স— এখন দমকা কিছু রোজগার করে নে। কিছু পুঁজি করে নিজেই দল খুলবি।

ললিতা বলে—এত সুখে কাজ নাই। এ নরক থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি।

লবঙ্গ খুশি হয় না ওর কথায়।

ললিতা উঠে চলে গেল।

কন্দর্প লক্ষ্য করছিল ওদের। লবঙ্গ বলে ওকে

—কথা শুনলি কন্দর্প। বলে কিনা নরক থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। তা'র সেদিন টেরেনে দেখে না নে এলে কুন স্বগ্‌গে যেতিস্ লা?

ললিতাকে শুনিয়েই কথাটা বলে লবঙ্গ। ললিতা শুনেও জবাব দিল না। কন্দর্প বলে—ক্যানে মেজাজ খারাপ করছ মাসী। পেথম দিন একটু মনে ঘা লাগে, দাগা পেয়েছ গো। ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে।

কন্দর্প ভরসা দেয়—উ সব আমার হাতে ছেড়ে দাও।

লবঙ্গ বলে— চলে যাব বলছে শুনলি না?

কন্দর্প হাসে—থামো তো। এই লাইনে অভিমন্যুর চক্রব্যূহের মতন গো। যে শালা-শালি একবার এই লাইনে এসেছে তাকে আর বেরুতে হবে না। এই পথেই একদিন ফুটে যাবে। কে ঠাঁই দেবে বলো এই আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতাগুলোনাকে বলে? হ্যাঁ— আর সাতপাকের মাগ বলে কিনা ঘরে ঢুকবি না। তা শ্লা পথে পথেই রইলাম।

কথাটা শুনেছে ললিতা চা। করতে যাবার মুখে।

কি ভয় হয়। এই লাইনকেও সেও চিনছে ক্রমশ। কথাটা সত্যি। এই মেয়েদের জন্য কোথাও কোনো সান্ত্বনা নেই। আশ্রয় নেই। আজ তার অজান্তে ললিতাও এই গোলক ধাঁধায় হারিয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামে।

মেলার রোশনী জ্বলে। সার্কাস এর তাঁবু থেকে ব্যান্ড-এর শব্দ ওঠে।

কলরব, কোলাহল ওঠে মেলায়। এদেরও আসর বসে। বুকের জ্বালা চেপে রেখে মুখে রং মেখে বিকৃত বিগত যৌবন লাস্য ফুটিয়ে তুলে এরা প্রেমের গান গায়।

কন্দর্প কোমরে চাদর বেঁধে নেচে নেচে ধুয়ো ধরে।

সেই আসরে সামিল হয়েছে ললিতা। মুখ বুজে সব গ্লানি, অপমান সহ্য করে বেঁচে থাকার মাশুল দিয়ে চলেছে।

এ মেলার পালা শেষ। শীতের ঝরাপাতা ঝরে, এরাও আবার রওনা হয় সাপুর-এর মেলায়।

পথে পথে ঘোরা। এদের ওদিকের দেহপশারিনীদের আস্তানা। তাদের দলও মেলা থেকে অন্য মেলায় যায়।

এই পথেই বকুলের সঙ্গে জানা শোনা।

শীর্ণ চেহারা। নাক-মুখ বেশ টিকালো। এককালে ফর্সা ছিল—এখন বিবর্ণ, শুকিয়ে গেছে দেহটা কি অত্যাচারে।

ওদের দলের রক্ষক হাতকাটা পদ্ম। গরুর গাড়িগুলো চলেছে ধূলিধূসর পথে।

দুপুর বেলায় মাঠের মাঝখানে কোনো দিঘীর বটগাছের নীচে গাড়িগুলো কিছুটা বিশ্রাম নেয়। গরুগুলোকে খেতে দেয় গাড়োয়ান। দলের গোপালও এই সময়ের মধ্যে মাটির হেঁটেল দিয়ে

কোনোরকমে উনুন বানিয়ে কাঠকুটো জ্বেলে খিচুড়ি বানিয়ে নেয়।

ললিতা ওদিকে আরও কয়েকটা গাড়ি দেখে এগিয়ে যায়। মেয়েরা রয়েছে। হাতকাটা পঞ্চা আর মাঝবয়সী একটি মহিলা ললিতাকে দেখে চিনতে পারে।

—ওমা। লবঙ্গবালার দলের লোক তুমি তো? তোমার গান শুনেছি বাছা। বসো।

গাছের ছায়াতেই বসতে বলে। পথ— এই মাঠ, এ যেন এখন তাদেরই দখলে।

ললিতা শুধায়—আপনাদেরও ঝুমুরের দল বুঝি?

মহিলা বলে—না বাছা। সাধ ছিল ঝুমুরের দলই করব। তা খরচার ব্যাপার। আমার দল মানে—

—ইঙ্গিতটা বুঝেছে ললিতা।

মেলায় এদের দেখেছে অন্য চত্বরে। ফিরে আসছে ললিতা। মেয়েটির ডাকে চাইল।

—শোন ভাই। আমার নাম বকুল। তোমার গান শুনেছি।

চাইল ললিতা।

এ দিকটা একটু নির্জন। কয়েকটা বট অশ্বত্থগাছের ছায়া নেমেছে। মেয়েটির গায়ে জড়ানো একটি ময়লা চাদর। উস্কো-খুস্কো চেহারা। কাসছে সে।

বকুল বলে—দলে খুব বেশিদিন আসো নি, না?

ঘাড় নাড়ে ললিতা।

বকুল বলে—এ পথ সব সমান ভাই। মেয়ে হয়ে জন্মানোর অনেক জ্বালা। তা আর কোনো পথ পেলে না, এলে এই লাইনে।

চাইল ললিতা। এ তারও মনে অতলের কথা।

দিনরাত নীরব গ্লানিতে সে জ্বলছে। আজ ওর মুখেও এই কথা শুনে ললিতা কি জবাব দেবে জানে না।

বকুল বলে—কিছু মনে করো না ভাই। তোমার রূপ গুণ আছে, ভালো গাইতে পারো। তাই কথাটা বললাম। এককালে আমিও গাইতাম লীলাবতীর ঝুমুরের দলে। দেহ গেল—কি বিষে গলাও গেল। সেদিন আর কোথাও ঠাঁই না পেয়ে এসে ঠেকলাম এই নরকে।

জেবনটা জ্বলে পুড়ে গেল ভাই। জানি না এ জ্বালার কবে শেষ হবে। কালরোগে ধরেছে—এবার মনে হয় ছুটি মিলবে ঐ নরক থেকে।

দেখছে ললিতা বকুলকে।

দুচোখে ওর জল নামে কি অনুশোচনায়। শীর্ণ দেহটা কাসির চোটে বেঁকে যায়। কোনোরকমে সামলাবার চেষ্টা করছে সে।

বকুল যেন আজ ললিতার সামনে একটি প্রশ্ন তুলেছে।

ললিতা দেখেছে একটি রূপবতী মেয়ের জীবনের চরম সর্বনাশ ওরই জীবনে। নিজের কথা মনে পড়ে।

অজানা ভয়ে বুক কাঁপে ললিতার।

কন্দর্প ডাকছে ওদিক থেকে—সখী। সখী গো। এসো অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ললিতা তাদের গাড়ির দিকে।

ততক্ষণ এরা গান সেরে পাতায় বসে গেছে। লবঙ্গ বলে ললিতাকে। কোথায় ছিলি এতক্ষণ। নে, খেয়ে নে পাট চুকিয়ে গাড়ি ছাড়তে এক প্রহর রাত নাগাদ গোসাপুরের মেলায় পৌঁছাব। আজ আর আসর ধরা হবে না। দল বস্তি হয়ে গেল।

কন্দর্প ডাকে—এসো সখী। ঘি ও দেইছি, আর আচার আছে।

বিমলি বলে—সখীকেই ঘি, আচার খাওয়াচ্ছে মাইরী, আমাদের আর লজরে ধরে না বুঝি।

ললিতাকে বলে—যা লো ললিতে, ডাকছে নাগর এত করে।

মেলায় এসে পৌঁছেছে ক্লান্ত হয়ে ওরা।

কন্দর্প এর মধ্যে তদ্বির তদারক করে বাসার ব্যবস্থা করেছে। শীতের দিনে পাকা কয়েকটা কামরাই জুটে যেতে ওরা খুশি হয়।

কন্দর্প বলে—ক্যামন বাসা জোটালাম দ্যাখো। পাকা ঘর, পাকা পায়খানা। থাকবে আরামে খাবে ভালো। কই হে গোপাল পাক-শাক শেষ করো বাবা। একটু বসছি আহ্নিকে।

কন্দর্প মদের বোতল আর কড়া ঝাল দেওয়া পিয়াজীও এনেছে। তার আহ্নিক শুরু হয়ে যায়। আজ গান নেই নিশ্চিন্তে আরাম করেই মদ গিলছে লোকটা।

মদের নেশাটা ওকে ধীরে ধীরে পেয়ে বসছে। কন্দর্প দেখেছে এতদিন। এখন এ দলের সে অন্যতম কর্তা। মাসীকেও তার উপরই ভরসা করতে হয়।

তাই সাহসও বেড়ে গেছে তার।

রাত নেমেছে।

মেলাও নিশুতি। কন্দর্পের ঘুম আসে না। এ দিকের ঘরটা একাই দখল করেছে সে।

অন্ধকারে হঠাৎ কাকে ওঘর থেকে বের হয়ে সামনের বাথরুমের দিকে যেতে দেখে চাইল। আবছা ল্যাম্পের আলোয় চিনতে পারে মূর্তিটাকে।

ললিতা।

মাতাল লোকটার এতদিনের প্রতীক্ষার যেন অবসান হতে চলেছে। সাবধানে এগিয়ে যায় কন্দর্প, ফিরছে ললিতা।

কন্দর্পকে দেখে চমকে ওঠে সে।

—বাঁধনদার। কন্দর্পর দুচোখ জ্বলছে কি লালসায়।

কন্দর্প ওকে ধরে ফেলেছে। বলে সে, —তোকে পেথমদিন থেকেই নজরে ধরেছে ললিতা, তাই এত করে শেখালাম। তাকে আজ কি করে তুলেছি। তুই আমাকে একটু দেখবি না।

মাতাল লোকটা ওকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

ললিতা ওর বাঁধনমুক্ত হবার জন্য ধাক্কা দেয়।

গর্জে ওঠে কন্দর্প সতীপনা। শ্লা শ্যাল শকুনিতে খায় তখন তো কথা নাই, আমি হলেই দোষ!

এগিয়ে আসে লোকটা।

দুহাতে ললিতাকে পিষে ফেলতে চায়। ললিতার সারা মনে কি দুঃসহ জ্বালা। বার বার মানুষের এই ঘৃণ্য পাশব রূপটাকেই দেখেছে সে। সারা দেহ মনে কি অসহ্য একটা অনুভূতি। সব শক্তি একত্রিত করে ললিতা কন্দর্পকে ধাক্কা মেরেছে। অতর্কিতে ধাক্কায় ছিটকে পড়ে কন্দর্প ওপাশের পচা নর্দমায়।

নিজেকে মুক্ত করে হাঁপাচ্ছে ললিতা।

গোলমালে লবঙ্গের ঘুম ভেঙে গেছে। সজাগ ঘুমই তার। বাইরে এসে দেখে ললিতার কাপড় চোপড় এলোমেলো রাগে গজরাচ্ছে। ওদিকে পচা নর্দমা থেকে উঠে কন্দর্প কাদামাখা অবস্থায় গর্জাচ্ছে।

— সতীপনা। ঢের দেখেছি এমন মেয়েছেলে।

ললিতা সামনে লবঙ্গকে দেখে বলে,

—ই সব কি ইতরামি কাণ্ড মাসী?

কন্দর্পও উঠে আসছে। লবঙ্গ দেখছে— বুঝেছে ব্যাপারটা।

কন্দর্প গজরায় গায়ে হাত দিইছি কি না দিইছি দ্যাখ মাসী কি হেনস্থা করলে! ও কি ভাবে? ও কি দলের সব? যে এত ডাঁট। ওকে তাড়াও না হলে আমিই চলে যাব। এমনি করে অপমান করবে।

লবঙ্গের দুজনকে দরকার। জানে ললিতা কোথাও যেতে পারবে না হুট করে, কিন্তু কন্দর্প চলে যেতে পারে। আর ললিতার ব্যবহারে মাসীও বিরক্ত হয়েছে। বদন বক্সীকেও নাকি ধাক্কা দিয়েছিল ললিতা। সেরপুরে মাধব দাসকে জবাবই দিয়েছিল।

আবার কন্দর্পকে ওই ভাবে অপমান করেছে।

লবঙ্গ বলে—তোকেও বলি ললিতা। এত ভাঁট কিসের লা। তোকে মানুষ করেছে—একটু না হয় ভুল করেছে তাই বলে মানী লোক ওই কন্দর্প, তাকে হেনস্থা করা ঠিক হয়নি বাপু। ম্যাষ্টার মানুষ হাজার হোক।

ললিতা চুপ করে থাকে।

বেশ বুঝেছে তার এই প্রতিবাদ— ভালোভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা এখানে অপরাধ। তার উপর চরম অপমানের কোনো বিচারই এখানে হবে না।

সরে গেল ললিতা।

কন্দর্প তখনও গজরাচ্ছে—ওকে সমঝে চলতে বলো মাসী, ওই ভাঁট ভেঙে দেবো, তবে আমার নাম কন্দর্প ধাড়া। হ্যাঁ।

গুম হয়ে এসে ঘরে ঢুকেছে ললিতা।

মেয়েদের দু-একজন জেগে উঠেছে। তারাও দেখেছে ব্যাপারটা। কাদা মাখা অবস্থায় কন্দর্পকে দেখেছে। ললিতা ঘরে ঢুকতে বিমলি বলে—ঠিক করেছিস্ ললিতে। ওই হারামজাদা মিন্‌সেটা জ্বালিয়ে দিলে হাড় মাস!

ললিতা গুম হয়ে থাকে।

মনে হয় এখানে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ওই নরকের কীটও তাকে ছাড়বে না। এখানের পরিবেশটা বিষিয়ে উঠেছে। ললিতা এই জীবনের আতঙ্ক আর কালো ছায়ানটকে দেখেছে। এরা তাকে বাঁচতে দেবে না। শেষ করে দেবে।

সকাল হয়েছে, ললিতা গুম হয়ে বসে আছে।

দলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে। চা-ও খায়নি ললিতা। চায়ের গ্লাসটা পাশে নামানো, ঠান্ডা জল হয়ে গেছে।

লবঙ্গকে আসতে দেখে চাইল ললিতা। লবঙ্গ ওকে দেখে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলে— মাথা গরম করিসনে ললিতা—সব এ লাইনে মানিয়ে নিতে হবে ললিতা— বাঁধনদার , নায়েকপক্ষ ওদের খুশি রাখতে হয় বাছা। তাছাড়া বলে না খদ্দের লক্ষ্মী?

—মাসী! চমকে ওঠে ললিতা।

যেন একটা বিচিত্র অন্ধকার রাজ্যে এসে পড়েছে সে। এখান থেকে মুক্তির পথ তার জানা নেই। মুখ বুজে এই চরম অপমান সয়ে সয়ে বাঁচতে হবে? এই জঘন্য রূপটাকে সে দেখেনি আগে আজ দেখে চমকে উঠেছে। কোনো আশ্বাস নেই এখানে। মাসী এসব জেনেশুনেই তাকে এই নরকে টেনে নামিয়েছে।

ললিতা বলে—চলে যাবো এখান থেকে।

হাসে মাসী—কোথায় যাবি লা? সারা দুনিয়াতেই এই জানোয়ারের ভিড়ে ভরে গেছে। ঘরে থেকে তবে কেন সব হারালি মুখপুড়ী? সেখানে বাঁচাতে পেরেছিলি নিজেকে?

চমকে ওঠে ললিতা। কথাটা মিথ্যে নয়। মাসী বলে।

—আবার কোথায় গিয়ে পড়বি, তার চেয়ে মেনে নে— আমাদের জীবন তো এই পাঁকেই ভরা লো। কেঁদে কি করবি বল? হেসে-খেলে দিন কাটা— তারপর একদিন এই আঁধারেই হারিয়ে যাবি। ব্যস্ ভবের খেলা শেষ।

ললিতা কি বলবে জানে না। দু'চোখ দিয়ে তার জল নামে।

এই আলোভরা গানের সুর ওঠা মেলার জীবনে অতলে যে এমনি দুঃসহ যন্ত্রণা রয়ে গেছে সেটাকে এবার চিনেছে ললিতা।

ললিতা মেলার পথ দিয়ে চলেছে, তাদের এলাকাটার ওদিকে সারবন্দী দেহ পশারিনীদের ঘর, ওখানে কিসের জটলা শুনে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ললিতা।

একটা তালপাতার ঝুপড়ির মধ্যে খড় বিছিয়ে জীর্ণ শয্যায় পড়ে কাৎরাচ্ছে একটি মেয়ে, চমকে ওঠে ললিতা? ওকে চেনে। সেদিন দেখছিল ওই বকুলকে সেই পৃথিবীর ধারে এক দুপুরে। তার হতাশ বেদনাভরা কথাগুলো মনে পড়ে ললিতার। আজ ওকে এই পথের ধারে ঝুপড়িতে এইভাবে পড়ে থাকেত দেখে চমকে ওঠে। তার কথাগুলো সত্যি হতে চলেছে। ওর গায়ে ঘা, শীর্ণ দেহটা মিশিয়ে গেছে মলিন বিছানায়। পাশে মালশায় একটু জল মাত্র। আর কিছু নেই।

ওই বোধহয় ওষুধ আর পথ্যি বকুলের।

চমকে ওঠে ললিতা। এই ওদেব শেষ পরিণতি।

কয়েকজন মেয়ে আর ওদের দেখা-শোনার ভার একটা হাতকাটা হোঁতকা পঞ্চার ওপর। চীৎকার করে হাতকাটা পঞ্চা।

—পাঁচ টাকার ওষুধ দিলাম, আর কত দেব? ও শালী সারেও না—মরেও না। থাক পড়ে। মরলে টেনে ফেলে দিয়ে যাব।

একটি মেয়ে বলে—ওর রোজকার তো খেয়েছিলি তখন পঞ্চা।

লোকটা কি বলে শোনে না ললিতা, চুপ করে সরে এল। সারা মনে কি ভয় জমেছে তার।

সকালের আলো নেমেছে আমবাগানে, দিঘীর ওদিকের সারবন্দী দোকানের ঘুম ভাঙছে দিনের শুরু। কিন্তু এখানে নেমেছে বেদনার অতল রাত্রি। এ রাত্রিব পথে নোতুন করে সামিল হয়েছে ললিতা। সে হারিয়ে যাবে।

তার উদ্ধারের কোনো পথই আব নেই। ললিতার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আজও রাত্রে সেই নাচ গান। আর মাসীর পেয়ারেব কন্দর্প যেন নেকড়ের মতো ঘুরছে, তার হাত থেকে কি করে বাঁচবে জানে না ললিতা।

এই প্রতিবাদেব কোনো দাম নেই—হারিয়ে যেতে হবে তাকে।

বদনবাবুর কথা মনে পড়ে। লোভী হিংস্র একটা জানোয়ার এখানের মেলা কর্তৃপক্ষের মাঝেও আছে তেমনি মানুষ।

মুখ বুজে বাসায় এসে বসল ললিতা।

মাধুরী বলে—পেথম পেথম সম্মান করে, তারপর –সব সয়ে যায়। না হলে বাঁচবি কি করে লা।

ললিতা বলে- এর নাম বাঁচা?

বাঁচতে পারেনি ললিতা। কোনো এক রাত্রে ওই কন্দর্প ই তার সব লুট করে নিয়ে বিজয়ীর মতো বের হয়ে যায়। এসেছিল মেলার বড়বাবু নিবারণ ঘোষও।

ললিতাব আর্ত চীৎকার ওরা থামিয়ে দিয়েছিল, হাতের মুঠোয় ধরিয়ে দিয়ে যায় কিছু টাকা। ললিতা অসহায় রাগে, অপমানে সেই রাত্রে ভেঙে পড়ে।

পালাবার কথা ভাবছে, কিন্তু কোথায় যাবে জানে না। সারা দুনিয়াটা ওদের ভিড়ে ভরে গেছে।

এ মেলার পালা শেষ।

এখানেই ললিতার সব হারিয়ে গেছে। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এই জীবনকে। চোখের জল আর ফেলে না, জল শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে তার।

মেলা উঠে যাচ্ছে।

সব আলো নিভে গেছে, এতদিন ছিল সাজানো জগৎ। দোকানগুলো উঠে গেছে, পড়ে আছ এঁটোপাতা, ছাই, বাতিল কাগজের ঠোঙা, মেলার কলরব, কোলাহল কমে গেছে। গরুর গাড়িতে

ট্রাকে করে চলেছে দোকানীরা। যাত্রার ম্যারাপ খুলে নিয়েছে, ললিতাও চলে যাবে। গরুর গাড়িতে মালপত্র উঠছে।

ললিতা হঠাৎ ওদিকে ঝিলের ধারে একটা চিতার আগুন দেখে দাঁড়াল। শূন্য প্রান্তর।

ওই পশারিনীর দলও চলে গেছে, কিছু দলও যাচ্ছে এবার। সেই যাবার মুখে ওরা চিতার আগুনে তুলে দিয়ে গেল তাদের একজন সঙ্গিনীকে। হাতকাটা পঞ্চাও রয়েছে, মারা গেছে অসুস্থ বকুল।

নাম পরিচয় নেই এমনি অজানা কোনো পরবাসে প্রান্তরের ধারে এসে যাত্রা শেষ করে গেল সেই হতভাগিনী। এতবড় দুনিয়ার তার জন্য কেউ নেই— কোনো আশ্রয় নেই। হারিয়ে গেল অজানা অন্ধকারে একটি মেয়ে।

চমকে ওঠে ললিতা।

তার অজানতেই সে এমনি এক জীবনের পথে সামিল হয়ে গেছে। এ যুগের অত্যাচার পাপ যন্ত্রণার অতলে হারিয়ে যেতে হবে তাকেও কোনোদিন এমনি করেই।

ললিতা মাসীর ডাকে চাইল। ওদের গাড়ি তৈরি। উঠে পড়েছে সকলেই। ললিতা এগিয়ে গেল।

কন্দর্প বলে—কি দেখছিলে এ্যাঁ। শ্যাল-কুকরের মতো মরে এরা বুঝলি? তাই বলছিলাম ললিতে, রূপযৌবন থাকতে থাকতে যা পারো রোজগার করে নাও, ব্যস। মাসীর মতো দল গড়ো। যুত করে বসে খাবে।

ললিতা ওর কথাগুলোয় কান দেয় না। দু'চোখ ছেয়ে জল নামে তার। বার বার মনে পড়ে আজ অতুলকে। কিন্তু কোথায় তারা—দু'জনে দু'দিকে হারিয়ে গেছে।

এতবড় পৃথিবীতে ললিতা নিঃসঙ্গ নিঃস্ব। কোথাও যাবার ঠাঁই তার নেই।

এমনি করেই একদিন পথেই ফুরিয়ে যাবে ললিতা ওই বকুলের মতোই অনাহারে—বিনা চিকিৎসায়। পাশে কেউ থাকবে না। গরুর গাড়ির চাকার শব্দ তুলে ওরা চলেছে আবার অন্য কোনো মেলার দিকে।

গগন গুছাইতের দল এখন নামকরা দল। সারা দেশের এখানে ওখানে তার বায়না। বড় মেলাগুলোতেই দু-একটায় যেতে পারে সে। তার বেশি আসর শহরে, গঞ্জে। নামী দলেই পরিণত হয়েছে তার দল।

অতুল, দে গাঁয়ের থেকে গান করে এসে বদলে গেছে। চুপচাপ থাকে। গান গায় -সেখানে কোনো ফাঁকি তার নেই। বাসায় ফিরে আসে। চুপচাপ থাকে।

অলকাও দেখেছে বিচিত্র মানুষটিকে।

—দাদা! কি যেন হয়েছে তোমার।

অতুল চাইল ওর ডাকে।

হাসে অতুল— আমার জন্য তোর এত ভাবনা কেন রে?

জবাব দেয় না অলকা। লোকটিকে যেন আগলে রাখে সে।

মতিলাল, গুপীনাথের দল বলে অতুলকে—হা হুতাশ করে কি লাভ ভায়া, একটু খাও দেখবে দুনিয়ার রং বদলে গেছে। তাছাড়া এই যাযাবরের জীবন, যাত্রার জীবন তো নয়, এতে অমৃত খেতে হয়। না হলে দেহ মন কোনোটাই টেকে না।

হাসে অতুল ওদের কথায়।

অলকা বলে--থামো তো মতিদা! যত আজে বাজে কথা তোমার?

মতিলাল হাসে ঠা ঠা করে। বলে সে—যেমন তোর দাদা তেমনি তুই!

দেখালি মাইরী অলকা! এ্যাঁ—যৌবনে যোগিনী হয়েই থাকবি রে?

অতুল আড়ালে বলে অলকাকে,

—তুই কেন আমার জন্য আজে বাজে কথা সইবি অলকা?

অলকা বলে,

বলুন গে ওরা। তোমাকেও বলি দাদা, যে গেছে তার পথ চেয়ে কতদিন কাটাবে? লাভ কি?

অতুল কি ভাবছে। মনে পড়ে ললিতার কথা। মনে হয় জীবনে প্রেম একবারই আসে। শতদলের মতো ফুটে ওঠে সেই প্রেমের কমল, স্মৃতি সুরভিতে মন ভরে তোলে।

তারপর আসে ঝরে যাবার পালা।

ঝরে যায়—সব হারিয়ে যায়।

সে ভালোবেসে ছিল একজনকেই। আজও সেই স্মৃতির বেদনা তাকে উদ্বেল করে তোলে, অলকা বলে,

—সেই মুখপুড়ি তবু জানলো না যে একটা মানুষ তার জন্য বিবাগী হয়ে রইল। ধন্যি তুমিও যা হোক।

হাসে অতুল।

জীবনের চরম নিঃস্বতাকে সে হাসি দিয়েই ঢেকে রাখতে চায়, কিন্তু কি বেনদায় সেই হাসি পাণ্ডুর হয়ে ওঠে।

এই যাত্রার জীবনেই রয়ে গেছে অতুল। কাজের মধ্যে নিজেকে ভুলিয়ে রাখে। তার বেদনাকে গানেব সুরে মূর্ত করে, তার শিল্পেব মাঝে বাব বার সে যেন খুঁজেছে ললিতাকেই। যাত্রার দলেব পরিক্রমা থামেনি।

গগন দল নিয়ে এসেছে বিষ্ণুপুরের মেলায়।

বহুদিনের পুরোনো আসর তার, আর নামকরা জায়গা। শ্রোতারাও এখানে খুব মার্জিত রুচির। ওদিকে বিস্তীর্ণ মধ্যে বহু পুরাতন মন্দিব। এপাশে লালবাঁধের জলরাশি—ওদিকে গড়ের ধাবে রয়েছে দল-মাদল কামান। এর মাটিতে ছড়ানো বহু ইতিহাসের ঐশ্বর্য। আজই লালবাঁধের জলেব বিস্তারে কোনো চাঁদনি রাতে ভেসে ওঠে লালবাঈ-এর গানের সুর। রাজাকে ভালোবাসার অপরাধে লালবাঈকে ওই বিস্তীর্ণ জলরাশির অতলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবু যেন লালবাঈ-এর বিদেহী আত্মা আজ যুগ-যুগান্তর সীমা পার হয়ে বিষ্ণুপুরেব আকাশে কি সুরের স্মৃতি নিয়ে জেগে আছে রাত্রির তমসায়।

লালদিঘীর ধারে একটা বড় বাড়িতে তাদের বাসা দেওয়া হয়েছে। গগন গুছাইত বলে দলের সকলকে।

—খুব হুঁশিয়াব বাবা। সকলকে প্রাণ ঢেলে গান করতে হবে। এ মাটি তো সুরের তীর্থ রে অতুল, সেই বাদশাহী আমলের থেকে সুর জেগেছে এখানে। সেদিনও ছিলেন যদু ভট্ট, রাধিকা গোঁসাই, গেণু গোঁসাই, দেখিস বাপু যেন মুখ রাখতে পারিস দলের।

অতুলও ভাবছে কথাটা। সেও গাইবে এখানে প্রাণমন দিয়ে।

এ মেলাব নাম-ডাক বহুদূর অবধি বিস্তৃত। বাঢ় বাংলার দূরদূরান্তর থেকে আসে দোকানপত্র। যাত্রাগান—কবি-ঝুমুরের দল, বিস্তীর্ণ মাঠ-এ কৃষি প্রদর্শনীও বসে।

ক'মাসেই ললিতা বদলে গেছে। এই জীবনকে তার মেনে নিতে হয়েছে।

তবু কি একটা তীব্র বেদনা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

হয়তো পথের একটা টান আছে, নেশা আছে। তাই চলতি পথের বৈচিত্র্য ললিতাকে কিছুটা এই যন্ত্রণা ভুলিয়েছে।

বাসটা চলেছে সবুজ প্রান্তর পার হয়ে। এখানে রুক্ষ মাটির রং বদলাচ্ছে। লালচে হয়ে উঠেছে মাটি আর শালবনও শুরু হয়েছে। নোতুন দেশে আসছে তারা।

লবঙ্গ বলে—ওরে কন্দর্প, খুব নামী ঠাঁই বাবা। ওলো মেয়েরা এবার হুঁশিয়ারী গাইতে হবে। এর নাম বিষ্ণুপুর। এর মাটিতে সুর আছে বাবা।

ললিতা চুপ করে বসে আছে।

শালবন পার হয়ে আসছে শহরের দিকে।

এই বিষ্ণুপুরের নাম শুনেছিল সে গ্রামে। অতুল গাইত এখানের ঘরগুণার গান। সেই সুর আজও ভোলেনি সে। বার বার মনে পড়ে সেই অতুলের, হারানো দিনগুলোকে। কি বেদনায় সব হারিয়ে গেছে। শহরের ঢোকার মুখেই বিশাল বাঁধটা দেখা যায়—দিগন্ত অবধি জল টল টল করে।

মাসী বলে এই সেই লালবাঁধ লো। লালবাঈ ছিল মস্ত গাইয়ে নাচিয়ে, বিষ্ণুপুরের রাজার এখানে গাইতো। তারপর মরণ দশা—বাঈজী আচ্ছিস থাক্। তা নয় গেল রাজার সঙ্গে প্রেম করতে, রাজ্যের সব্বোনাশ হয় হয়। নৌকায় করে রাতে দুজনে বের হয় ভ্রমণে, গান আর গান। একদিন সব সুর—গান থেমে যায়। লালবাঈকে আব পাওয়া যায় না।

বহুকাল পবে ওই দিঘীর নীচে উঠেছিল শেকল-জড়ানো একটা কঙ্কাল চেহারা। স্তব্ধ হয়ে শুনছে ললিতা। একটি শিল্পীর জীবনের চরম পরিণতির কথা। মাসী বলে চলেছে,

—ওই দিঘীর বাতাসে চাঁদনী রাতে এখনও ভেসে আসে করুণ সুর। লোকে বলে লালবাঈ-এর সুর।

ললিতা চুপ করে শুনছে। একটি মেয়ে অতীতে ভালোবাসার জন্যই নিজেকেই শেষ হতে দিয়েছিল। কোনো নিষ্ঠুর দানবের দল তাকে সুখী হতে দেয়নি। সব কেড়ে নিয়েছে তার।

সেই ঘটনার আজও শেষ নেই। তাকেও সব হারিয়ে আজ এ পথে পথে ঘৃণ্য বিষাক্ত জীবন নিয়ে ফিরতে হয়।

ললিতা বলে—লালবাঈরা আজও বেঁচে আছে মাসী?

লবঙ্গ শোনায়—মরণ দশা! বাসায় গে চান-টান কবে জিরিয়ে নিতে হবে, এতটা পথের ধকল কি কম রে। রাতে আবার গান আছে।

কন্দর্প অভয় দেয়। —ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

ভাবছে কথাটা ললিতা।

ওদের চালাগুলোর আশে পাশে মহুয়া শাল গাছের জটলা। শীত শেষে শাল গাছেব পাতায় এসেছে হলুদ আভা—পলাশের মেশায় মাটির রং লাল, দিঘীর দিগন্তপ্রসারী কালো জলে কি আদিম রহস্য নিয়ে অতীতের একটি স্মৃতি জেগে ওঠে। কোনো বিষণ্ন সন্ধ্যায় দিঘীর পদ্মবনে উঠত ম্লান সুরভি মিশে থাকা উদাস সুর আর ব্যাকুল আত্মনিবেদনের ব্যর্থ মিনতি।

ললিতাও ব্যর্থ হয়েছে। একাই বেব হয়েছে ললিতা একটু ফাঁকায়। মেলার অঙ্গন থেকে আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ে।

যাত্রার আসর বসেছে। বড় দলের গান হচ্ছে। সেখানে জমেছে হাজারো মানুষ। শুব্ধ বাতাসে ওদের পার্টগুলো কিছুটা শোনা যায়। একাই এদিকে দাঁড়িয়ে আছে ললিতা। নিঃস্ব একটি মেয়ে। বুকভরা একটি জ্বালা নিয়ে নিঃসঙ্গ ব্যর্থ জীবনের বোঝা বয়ে ফিরছে।

গান। তাব গানও ব্যর্থ হযে গেছে। ভেবেছিল সে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইবে, কিন্তু এ গানের শুচিতা নেই। যৌবন-মদির বিকৃত কামনার আর্তনাদ।

মাসী বলে - বং গাইবি না। মাজা দুলিযে চোখ মেরে রসের গান গাইবি। তবে তো আসব জমবে। কি পেয়েছে সে এই পথে এসে।

হারিয়ে গেছে সব কিছু। রাত্রি নামছে—তারাজ্বলা বিষণ্ন রাত্রি। এদিকে মেলার ভিড় শুরু হয়েছে। হঠাৎ চমকে ওঠে ললিতা।

লালবাঁধের জলের দিক থেকে আসছে হিমবাতাস—এখনও শেষ শীতের বিবর্ণ ঝড়ে পড়া পত্রবনে, হাহাকার ভরা বাতাসে ওব সুরটা উঠেছে ব্যাকুল একটি করুণ কান্নাব রেশ নিয়ে। কান পেতে শোনে ললিতা।

শুনা এ বুকে,

পাখি মোর, আয়, ফিরে আয়।

তোরে না হেরিয়া সকাল্যব ফুল

অকালে ঝরিয়া যায়।

চেনা—খুব চেনা গলা, এ গান সে শুনেছে বহুবাব, ঐ সুব— এব জন্যই যেন কান পেতে ছিল সে এতদিন, পথে পথে সে অন্বেষণ কবে ফিবেছে কি ব্যাকুলতা নিয়ে। আজ যেন সন্ধান পেয়েছে তাব।

এগিযে চলেছে ললিতা— ঐ ব্যাকুল আহ্বান, বোদনভবা মিনতি তাকে উতলা কবে তুলছে

মাসী অবাক হয়। দলেব গান। ওবা তৈবি হচ্ছে আসরে যাবাব জন্য, বড আসব। এ সময ললিতাকে না দেখে খুঁজছে তাকে।

ললিতা নেই। চলেছে কি স্বপ্নাবিষ্টেব মতো ললিতা বাতেব অন্ধকাবে।

অতুল আজ এখানে গাইছে ওই 'হাবানো ফুল' পালা। গানগুলোই এব অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এ মাটিতে ওই গানের জন্ম, আজ গেণ্ গোঁসাই মশাই নেই—তবু সেই স্মৃতি, সেই সুব বযে গেছে এখানেব অগণিত মানুষেব মনে। সেনকর্ত্তা ছিলেন তাব সাক্ষাৎ ছাত্র—তাই অতুল এ গান গায, ওঁব তালিমেই।

ছায়ানটেব সেই সুব সব ব্যাকুলতা নিযে ছডিযে পডেছে আকাশে বাতাসে। সাবা আসবে নেমেছে স্তব্ধতা।

গগন গুছাইত খুশি হযেছে।

না। অতুল আজ তাব দলেব মুখ বেখেছে এখানে। শ্রোতাদেব মধ্যে থেকে প্রশংসাধ্বনি ওঠে সাধু। সাধু।

অতুল তন্ময হযে গাইছে কি ব্যাকুল বেদনা মূর্ত হয ওই সুবে সুবে।

আজও এমনি অজানা অন্ধকাব পথে পথে ঘুবছে কাকে খুঁজে খুঁজে অতুল। মনে পডে ললিতাব কথা।

হাততালি পডছে, সাবা আসবেব মানুষ ওকে বিমুগ্ধ অভিনন্দন জানায

ফিবছে অতুল সাজঘবেব দিকে, এসময মনটাও তাব বিষণ্ণতায ভবে ওঠে—হাবিযে গেছে সে। সেই ললিতা আব ফিবে আসবে না তাব জীবনে।

বিষ্ণুপুব এককালে ছিল সুবেব বাজা, এখনও এখানেব মানুষ গান বোঝে, বাতাসে সেই সুবেব বেওয়াজ এখনও টিকে আছে

ওই কাতাবে কাতাবে মানুষ এসেছে আসবে, চাবিদিকে শুধু জনতা। আসবে আলোব আভা, সেই আলোব বৃত্তে জীবনেব একটি করুণ বেদনাব বেশ নিযে ব্যাকুল সুবটা উঠছে

ওই ফিরে এসে

ওরে চঞ্চল।

হৃদয় ফুটিবে বনে

ফুলদল।

ধূসর আকাশ, হইবে সুনীল -

তোর চোখের চাওয়ায় --

- বাহবা

চাবিদিকে স্তব্ধ প্রশংসাব সুব ওঠে।

একজন কি স্বপ্নাবিষ্টের মতো এসে দাঁডিয়েছে ওই জনতাব মাঝে। ললিতাও এসেছে। সন্ধ্যাব আকাশে সে ওই সুব শুনেছে চিনেছে—অতুলেব গলা।

তাব সাবা দেহমনে কি ঝড ওঠে। এগিয়ে এসে থমকে দাঁডায়। অতুলকে দেখছে সে— আবও সুন্দব

হয়েছে দেখতে। গানও গাইছে তেমনি।

ললিতা যেন স্বপ্ন দেখছে।

কতদিন রাত্রি, কত দুঃখের পথে বারবার মনে পড়েছে ওই মুখখানা। তাকে কতদিন খুঁজেছে সে পথে পথে। আজ অতুলও যেন ব্যাকুল হয়ে খুঁজছে তাকে, ওর গানের সুরে সেই ব্যাকুলতা—আর্তি।

ললিতার খেয়াল হয় ভিড় কমে গেছে।

যাত্রাগান শেষ হয়েছে আজকের মতো। খালি হয়ে গেছে সাজানো আসর, সামনে একটা ঝাকড়া বকুল গাছে আঁধার নামা পাতায় ফুলের ম্লান সুরভি ওঠে, কি বেদনার আভাস নিয়ে।

এগিয়ে যায় ললিতা।

তার সারা দেহ-মনে কি অস্থিরতা।

অতুল সাজঘর থেকে সাজ-গোজ তুলে ফিরছে বাসার দিকে। ভাঙা পুরোনো বাড়ির জগৎ। উঁচু গড়ের প্রাচীরে অন্ধকার জমেছে।

অতুল আজও যেন ললিতার স্বপ্ন দেখে। ওই গানটা বার বার তার মনেও কি নিবিড় বেদনা আনে। ছায়ানট-এর সুরে সুরে ঝড়ে পড়ে অতুলের জীবনের বেদনাটা।

কাকে আজও যেন ব্যাকুলচিত্তে সে খুঁজে চলেছে এই পৃথিবীর পথে পথে।

—ললিতা তার হারিয়ে গেছ। হারিয়ে গেছে অতুলের সব স্বপ্ন।

—কে!

চমকে ওঠে অতুল।

আবছা তারার আলোয় সে কাকে দেখে চমকে ওঠে। এখানে মিশে আছে বহুযুগের কত হাসি কান্নার আবেগ, হারানো প্রাণের কত অভিসার।

—ললিতা এগিয়ে আসে।

সরে যেতে পারেনি সে। আজ এই রাত্রির নির্জনে সে এগিয়ে এসেছে অতুলের কাছে।

ললিতা বলে—হ্যাঁগো আমি। কালীদহের জলে ডুবতেই গেছলাম, কিন্তু পারিনি। সরে এসেছিলাম শুধু তোমার কথা ভেবেই। আবার দেখা হবে—

—ললিতা! আমিও গেছলাম যে তোর খোঁজে। সেদিন শুনলাম তুই আর নেই।

ললিতার দুচোখে নামে কি বেদনার অশ্রু। কাঁদছে সে।

অনেকদিন রাত্রির অন্বেষণের পর আজ ললিতা খুঁজে পেয়েছে অতুলকে। অতুল দেখছে ওকে।

ললিতা বলে--ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছিলাম। তোমার গান শুনেই চিনেছি, তাই ছুটে এলাম।

অতুল ওকে কাছে টেনে নেয়।

—ললিতা!

ললিতা সারা মন দিয়ে ওই ছোঁয়াটুকু অনুভব করে আজ।

আজ তার সারা মনে ব্যকুল একটা ঝড় ওঠে হাহাকার নিয়ে। অতুলকে তার জীবনের চরম বেদনার কথাটা জানাতে পারে না সে।

ললিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বলে ওঠে অতুল কাঁদিস নে ললিতা। কান্নার দিন এবার শেষ হবে রে? এবার আমরা ঘর বাঁধবো আবার। ছোট্ট একটি ঘর, সব কিছু ভুলে গিয়ে আবার সুখী হবি তুই।

অতুল ওকে কাছে টেনে নিতে চায়। চমকে ওঠে ললিতা। কি ব্যর্থতার গ্লানি অশ্রু হয়ে ঝরে।

তার সারা দেহ আজ পাপের বিষ, ওই শয়তানের দল আজ তার দেহটাকে বাজারের পশরায় পরিণত করেছে, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই তাকে এই ঘৃণ্য জীবনকে মেনে নিতে হয়েছে। আর্তনাদ করে উঠে ললিতা।

—না, না! না তা হয় না অতুল। তা হয় না।

—ললিতা। কেন —কেন হয় না ললিতা?

দু'চোখে ছাপিয়ে জল নামে ললিতার। আজ সে বুঝেছে সুন্দরভাবে বাঁচার সব আশা স্বপ্নকে সে নিজের পায়ে দলে পিষে নিজের মৃত্যুব পথ সে খুঁজে নিয়েছে। সুস্থ সুন্দর জীবনে কোনো অধিকার নেই আজ ললিতার। কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি ললিতা আবার তার সব ফিরে পাবার ভাগ্য আসবে। কিন্তু সেই পরম পাবার অধিকার সেদিন থাকবে না।

পোকায় কাটা ফুলে পূজো হয় না।

আজ ললিতা নিঃস্ব-রিক্ত একটি বাতিল জীব। তার পাবার কোনো অধিকার আব নেই।

অতুল ডাকছে ওকে—ললিতা। শোন!

দুচোখে জল নামে ললিতার। এই নিষ্ঠুর পবিহাস তাব জীবনকে কি হাহাকারে ভরে দিয়েছে।

আর্তনাদ করে ওঠে ললিতা।

—না। তা হয় না আর, আজ আমি পচে গেছি, নষ্ট হয়ে গেছি। ওই শয়তানরা আমার দেহটাকে কুরে খেয়ে বিষাক্ত পচা করে তুলছে। সেই গরলের জ্বালা আমার সারা দেহ মনে, পোকায় কাটা ফুলের দেবতার পুজো আর হয় না গো!

কি দুঃসহ কান্নায় ভেঙে পড়ে ললিতা।

অতুল জানে না ওব এই ক'মাসেব জীবন। সেও বাড়ি থেকে হাবিয়ে গেছে, তারপর এতদিন খুজে হঠাৎ আজ তাকে পেয়েছে।

অতুল ওব কোনো কথাই শুনতে চায় না।

ললিতাই তাব কাছে সত্য, তাকে কোনো পাপই স্পর্শ করেত পাবে না।

—ললিতা। শোন ওসব ভাব আমাব।

ললিতা ওকে বোঝাতে পারে না কথাটা।

সবে যায় অধিকাবে। কি দুঃসহ বেদনায়, কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে ওর দেহ। পালাচ্ছে ভীত-ত্রস্ত একটি মেয়ে।

অতুল খুঁজছে ওকে —ললিতা।

আসব থেকে বেব হয়ে এসেছে অলকা অতুলের পিছু পিছুই। নির্জন তারাজ্বলা পথে এই ধ্বংসপুরীব রাজ্যে অলকা দেখছে ওই মেয়েটিকে।

চমকে ওঠে অলকা।

অতুল আজ হারানো ললিতাকে খুঁজে পেয়েছে। ওবা সুখী হবে, অলকাও খুশী হবে। দেখেছে অলকা অতুলের সাবা মনে একটি মেয়ের জন্য এই অকপট ভালোবাসা। এমনি প্রেম যে নারী পায় তাকেও হিংসা করে অলকা।

ললিতাকে দেখছে সে।

শুনছে অতুলের ব্যাকুলতা, ললিতার বুক ভরা ভালোবাসা। তাব জীবনের চরম ব্যর্থতার বেদনা ঝবে পড়ে ওব চোখের জলে। অতুলের এই ভালোবাসা পাবাব অধিকাব সে হারিয়ে কি দুঃসহ কান্নায় ফেটে পড়ে

অন্ধকাবে মিলিয়ে গেছে আবাব ললিতা।

অলকা দেখছে অতুলকে। ও যেন নিশির ডাকেব মতো ঘোরে চলেছে। —অতুলদা।

ফিরে চাইল অতুল—তুই। অলকা!

এগিয়ে আসে অলকা। অতুল বলে,

—ললিতাকে এতদিন পর খুঁজে পেয়েছিলাম রে।

কত করে ডাকলাম। তবুও আমাকে এড়িয়ে গেল। আমার উপর অভিমান করেই সরে গেল সে। ওকে আমিই সেদিন ফেলে চলে এসেছিলাম রে। আজ তাই কাছে এসেও সরে গেল।

অলকা বলে—কালই খুজব ওকে। এখানে সে কোথায় আছে। আবার ফিরে আসবে সে।

অতুল কি ভাবছে।

এত কাছে পেয়ে সে হারাতে পারবে না ললিতাকে। খোঁজ সে করবেই। যেখান থেকে হোক সে ললিতাকে এবার বের করবেই। আবার সুখী হবে তারা।

অলকা বলে, চলো—বাসায় চলো অতুলদা। কাল সকালেই ওকে খুঁজে আনব।

হিম পড়ছে। ফিকে চাঁদের আলোয় কুয়াশার চাদর জড়ানো লাল বাঁধের ধারে এসে থমকে দাঁড়াল ললিতা। সারা দেহমনে কি একটা অসহ্য উত্তেজনা। দুচোখ ছেয়ে জল নামে, সব হারানোর অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

কোনোদিকে তার পথ নেই

এই অন্ধকার নরকেই হারিয়ে যেতে হবে তাকে। তার জন্য কারো প্রেম— শান্ত গৃহের আশ্বাস আর নেই। ভালোবাসার অধিকারও সে হারিয়েছে। ওই অতুল আজ প্রতিষ্ঠিত, তার সুন্দর জীবনকে সে নিজের স্বার্থের কলুষ দিয়ে বিষিয়ে দিতে পারবে না।

হঠাৎ চমকে ওঠে ললিতা!

কুয়াশার ফিকে অস্বচ্ছতার একটা সুর ভেসে ওঠে—দূরাগত বিচিত্র রহস্যময়ী একটি সুর। বিস্তীর্ণ অতল দিঘীর ওপার থেকে দেখা যায় না। স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে কোনো নর্তকীর নূপুরের শব্দ ওঠে—ভেসে আসে গানের সুর।

নৈনা, রাত বিত গয়ে!

গানের সুর কি এক বিচিত্র আহ্বান। সব যন্ত্রণা-গরল জ্বালার থেকে মুক্তি পাবার একটি আমন্ত্রণ। ললিতা শান্ত,স্তব্ধ, বিমুগ্ধ হয়ে শুনছে ওই গান। সুরটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

কে যেন ডাকছে তাকে ওই অতল প্রশান্তির দিকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যায় ব্যর্থ একটি নারী। সারা মনে সেই অপূর্ব সুরের রেশ, দুচোখে তার উজ্জ্বল একটি আলোকবিন্দুর আশ্বাস।

ললিতা উৎকর্ণ হয়ে শোনে সেই সুর।

কুয়াশাভরা লালবাঁধের বুকে পদ্মবনে দেখা যায় যেন একটি ডিঙি বয়ে চলেছে। চাঁদের আলোয় তার সাজা জরির কাজ করা ছত্রি, ঝালর ঝকমক্ করে।

দূর অতীতের বুকে আজ সেই লালবাঈ-এর সুরই নয়—তার আর্তিটুকুও যেন দেখছে সে।

তার জীবনের মতোই শূন্য নিঃস্ব সেই সুরের পশরা মেলা জীবন। সেখানে দিয়েই যেতে হবে সবকিছু, বিনিময়ে কোনো কিছু পাবার অধিকার তার নেই। জীবনের বহু শূন্য রাত্রিই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে।

ললিতার জীবনেও তাই কোনো কিছু পাবার অধিকারও নেই। তার সব হারিয়ে গেছে।

মনে পড়ে অতীতের একটি রাত্রির কথা, কালীদহের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে, নিজেকে শেষ করে দেবে। কিন্তু পারেনি। বার বার মনে পড়েছিল অতুলের সুর—হাসিভরা মুখখানা—কি আশ্বাস ভরা স্বপ্ন। তারা ঘর বাঁধবে—সুখী হবে। একদিন হারানো মানুষটাকে ফিরে পাবে ললিতা।

সেই অন্বেষণ কেটে গেছে কত দিন রাত্রি, তার মাসুল দিতে গিয়ে কবে নিঃস্ব, শূন্য একটা পূতিগন্ধময় নরকে গিয়ে নেমেছে সে।

আজ অতুলের সেই ব্যাকুল আহ্বানে সে ভীত আর্ত হয়ে পালিয়ে এসেছে। এতবড় লজ্জা--এতবড় দৈন্যকে ঢাকার উপায় তার নেই।

নিজের স্বার্থে ভালোবাসাকে সেই নরকে সে নামাতে পারবে না। তার প্রেমের অমর্যাদা সে করবে না। সে বেঁচে থাকবে অতুলের সুরে—তার কৃতিত্বে, তার প্রেমের স্বপ্নে কোনো ছায়ানটের ছায়াসঙ্গিনী হয়ে।

এর বেশি কিছু চাওয়ার তার নেই।

সুরটা যেন ডাকছে তাকে--নৈনা বীত গয়ে—

—ব্যাকুল এক আহ্বান— দূরে অতলে দিঘীর পদ্মবনে লাল পদ্মফুলের মেলা বসেছে, সেই আলো ভরা ফুল গন্ধময় জগতের সন্ধানে হারিয়ে গেল ললিতা লালবাঁধের অতলে—জলে একটু আলোড়ন জাগে, আবার থেমে যায়।

তারাগুলো কুয়াশার হারিয়ে যায়। স্তব্ধতা নামে লালবাঁধের জলরাশির বুকে। ছোট্ট একটা শব্দ তাও মিশিয়ে গেছে।

রাতভোর লবঙ্গ ছটফট করে।

এতবড় আসরে আজ গান গাইতে পারেনি তারা। সন্ধ্যায় পর থেকেই ললিতাকে আর খুজে পায়নি। কন্দর্প সারা মেলা চষেছে।

লবঙ্গ, বির্মলরা'ও গেছে এদিক-ওদিক।

কিন্তু কোনো খোঁজই মেলেনি তার।

লবঙ্গ বলে কোথায় গেল ললিতা?

কন্দর্প মেয়েটার উপর চটেছিল। বলে সে,

—বেয়াড়া মেয়েটা বোধহয় ভেগে গেছে মাসী, কাল আবার খুঁজব। যাবে কোথায়? এই লাইনে থাকলে কন্দর্প ঠিক খুজে বের করে ওর দফা নিকেশ করে দেবে।

লবঙ্গ কেন দলের সকলেই এবার ভাবনায় পড়েছে। ওরা জানে ললিতা না থাকলে মাসী দলই তুলে দেবে। কন্দর্প সকালেই আবার বের হয়েছে ললিতার সন্ধানে।

সকালের আলো ছড়িয়ে পড়ে প্রান্তরে। ঘুম ভাঙছে মেলার। ওদিকে লালবাঁধের জলের ধারে লোকজনের ভিড় দেখে এগিয়ে যায় কন্দর্প।

ঘের জালে মাছ ধরছিল জেলেরা, সেই জালে উঠেছে একটি মেয়ের মৃতদেহ। ঠিক চিনতে পারে না তারা। কন্দর্প মেয়েটিকে দেখে চমকে ওঠে। শান্ত, প্রাণহীন দেহটা, মাথায় একরাশ চুল, কাদায় মাখামাখি। মুখে ওর প্রশান্তির ছায়া। অনেক জ্বালা থেকে ওই ললিতা আজ মুক্তির পথ পেয়েছে।

ছুটে বাসায় এসে ঢোকে কন্দর্প। হাঁপাতে হাঁপাতে জানায়—সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে মাসী। ললিতা নাই—লালবাঁধের জলে কাল রাতে ডুবে গেছে।

--এ্যাঁ! চমকে ওঠে লবঙ্গবালা।

কঁকিয়ে ওঠে--ই কি সব্বোনাশ হলরে! মুখপুড়ি—কালামুখী এ কি কাণ্ড করে গেল!

ভিড় জমেছে লালবাঁধের ধারে।

অতুলও খুঁজতে বের হয়েছিল ললিতাকে। সেও এসে পড়েছে। স্তব্ধ নির্বাক চাহনি মেলে দেখছে অতুল তার হারানো ললিতাকে।

কাল রাতে ওকে দেখেছিল আলেয়ার মতোই।

শুধু চকিতের জন্য অতুলের মনে কি আলোর আভা এনে আবার অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে ললিতা চিরদিনের জন্য।

—অতুলদা!

অলকার ডাকে চাইল অতুল।

দু'চোখ ওর জলে ভরে আসে। অতুল বলে,

—ও চলে গেল অলকা। নিজের জীবনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে আজ শান্তি পেয়েছে। সংসার, সমাজ ওকে কোনোদিন কিছুই দেয়নি। দিয়েছে শুধু জ্বালা আর আঘাতই। তাই কি অভিমানে ও হারিয়ে গেল।

তবু হারিয়ে যায়নি ললিতা একজনের মন থেকে।

আজ সেখানে রয়ে গেছে তার জন্য একটি ব্যাকুল স্মৃতির স্পর্শ। আজও যাত্রার আসবে আসরে রাঢ়ের পল্লীপ্রান্তরে ঘোবে অতুল। মনে তার সেই অনুভূতির ব্যাকুল, চিরন্তন হাহাকার। তার সুরে সেই বেদনার্ত ব্যাকুল আহ্বান ধ্বনিত হয়,

—তুই ফিরে এলে ওরে চঞ্চল।
আবার ফুটিবে বনে ফুলদল।
ধূসর আকাশ হইবে সুনীল
তোর চোখের চাওয়ায়।
শূন্য এ বুকে—পাখী মোর
আয়, ফিরে আয়।।

ললিতা আর ফেরে না। মুক্ত-বিহঙ্গীর মতোই ললিতা আজ দূর আকাশের অসীমে পলাতকা। অতুলের স্মৃতিতে সে রয়ে গেছে ছায়ানটের বিধুব বিষণ্ণতার মাঝে।

অতুল আজ তাকে খুঁজে ফেরে—এ খোঁজার শেষ নেই। এ জ্বালা বাবণেব চিতাগ্নির মতোই ত্রিকাল পার হয়ে মানুষের মনে বহ্নিমান, প্রদীপ্ত।

— সমাপ্ত —